চৌধুরী

চতুর্দ্দশ খণ্ড—১৩

কলিকাতা

চতুর্দ্দশ খণ্ড নব্যভারতের সূচী।

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	অনুকারী অবতার। (শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী, (এম-এ, ডি-এস-সি)	৭৩
২।	আত্ম বা নিগূঢ় বৈষ্ণবদর্শন। (শ্রীকালীনাথ দত্ত) ...	৩৪৫, ৪১৯, ৪৫৮, ৬২৩
৩।	আত্মা বা বাইওপ্ল্যাজম্ (শ্রীগুরুপ্রসন্ন সোম)	৪৫৩
৪।	আশাশিশু নিরাশার মন্দিরে। (সম্পাদক)	১
৫।	আসুর-যুদ্ধজয়ী বীরের কথা। (সম্পাদক)	৬০৯
৬।	আচার-তত্ত্ব। (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, এম্-এ)	৫৬৯
৭।	ইউরোপ-ভ্রমণ। (শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, (Bar-at-law)	৪৯০
৮।	উত্তরা কি কমলমণি হইতে পারে? (শ্রীমধুসূদন সরকার)	১১৭
৯।	উদ্বাহ-বিচার। (শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত)	৩৬, ২০০
১০।	কংগ্রেস, উহার শক্তি ও সাহিত্য এবং শরীর গঠন। (শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়) ...	৫৩৭
১১।	কবি বলরামদাস। (শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী)	৪৪২
১২।	কবীর প্রকাশ। (শ্রীমনোরঞ্জন গুহ)	৬৩
১৩।	কলাশ্রী। (পদ্য) (শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল)	২৫৭
১৪।	কৃষিকার্য্যের উন্নতি। (শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম-এ)	১৩৮
১৫।	খোকার বিলাতের পত্র।	৫০৫,৫৮২
১৬।	গরিবসেবা। (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম্ এ বি,এল)	৩১৩
১৭।	গল্প। (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস)	৪১৪
১৮।	জড়বাদ। (শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)	৩৬৮
১৯।	জীবন। (পদ্য) (শ্রীকালীনাথ ঘোষ)	৪৮৮
২০।	তীর্থদর্শন। (শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ)	২০৮
২১।	দার্শনিক মতভেদ। (শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু)	৪৭০, ৫৯৪
২২।	দিনা[illegible] হিন্দুরমণী জানকীবাই। (শ্রীচন্দ্র শেখর সেন, Bar-at-Law)	১৪৫
২৩।	দুষ্প্রাপ্য পুস্তক। (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম-এ)	১৪৮
২৪।	দুঃখ। (শ্রীশিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম-এ)	২২৫
২৫।	নবযুগ। (পদ্য) (শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু, এম-এ)	৬৩০
২৬।	নিরাকারের সাকাররূপ। (শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল)	২১৮, ২৩৫
২৭।	নিশ্বাস। (পদ্য) (শ্রীকালীনাথ ঘোষ)	৭৮
২৮।	নীতি-শিক্ষা। (শ্রীঈশানচন্দ্র বসু)	৪০,১১১,১৭৪
২৯।	নেপালের পুরাতত্ত্ব। (শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ-বিএল) ...	১২২,১৬১,৪৪৯
৩০।	প[illegible]রত্নী। (শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী, এম-এ, ডি-এস-সি)	৪০৫
	[illegible] কোরাণের সত্যতা। (শ্রীসৈয়দ আবদুল গফার)	৪৯, ৩০৫
	পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ।	৫৯৯
।	পরিচয়। (পদ্য) (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এ)	৩৬
।	পারস্য ভাষা ও ফার্দ্দোশী। (শ্রীগোপালচন্দ্রশাস্ত্রী এম-এ, ডি এস্-সি, ...	৬৬
	পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব দরিদ্র-বন্ধু মনোমোহন। (সম্পাদক)	৩৭৬
	প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ...	৫৬, ২২১, ৩০৯, ৪৪৭,৫৩৪, ৬১৩, ৬৬২

বিষয়। পৃষ্ঠা।

নব্যভারত।

চতুর্দ্দশ খণ্ড।

আশা-শিশু—নিরাশার মন্দিরে।

আশা ধরিয়া মানুষ বাঁচে, আশা অবলম্বনে জাতি সজীব হয়, আশা-কুহকে মাতিয়া দেশ উন্নত হয়। আশা না থাকিলে মানুষ মৃত, জাতি নির্ব্বাণ, দেশ ভস্মীভূত। বাঙ্গালীর, ভারতীয় জাতির, বা ভারতের কি আশা আছে যে, তাহাকে জীবন্ত বা উন্নত বলিব?

ব্যক্তিগত জীবনে দেখিয়াছি, বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত হৃদয়ে কত আশা-শিশু জন্মিয়াছিল, কিন্তু দু দশদিন পরেই তাহা ঢলিয়া পড়িয়াছে, সফল হয় নাই। যত্ন করি, চেষ্টা করি, আশা কিছুতেই বাঁচে না। সকল উদ্যম পরাস্ত, সকল সাধ অপূর্ণ—আশা-শিশু এ জীবন-সরসিতে মাথা তুলিল কই? মায়ার ঘোরে ডুবিয়া, অজপা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া, অশেষ সুখ বিলাসে মাতিয়া তুমি ভাই বড় মানুষী চালে চলিয়া, গাড়ী ঘোড়া হাকিয়া কতই আশা-স্বপ্ন দেখিয়া চমকিত হইতেছ, ভাবিতেছ, কি যেন পাইলে আর কি! কিন্তু আমি ঐ সকলের মধ্যে কেবল মরীচিকাই দেখিতেছি। চতুর্দ্দিকে মহা মরুভূমি, অজানিত, অকথিত, অব্যক্ত; পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ পথিক হাহাকার করিতেছে, প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, আশা-মরীচিকা দেখিয়া যতই ছুটিতেছে, ততই বঞ্চিত হইতেছে। জল মিলিল না, তৃষ্ণা মিটিল না, পথিকের জীবন যায় যায় হইয়াছে। আমি সংসার-মরুতে দগ্ধ পথিক, কই জল পাইলাম, কেবল পুড়িলামই, কই আশা মিটিল? কেবল ছুটিলামই, কেবল খাটিলামই, কই জল মিলিল? বাল্যকাল হইতে কর্ম্মকাণ্ড ধরিয়া ছুটিতেছি, কই ভাই শান্তি-বারি মিলিল বলত? বাল্যকাল হইতে আশা করিতেছি, নিঃস্বার্থ প্রেম নামক যে একটা জিনিস আছে শুনিয়াছি, তাহা ধরিয়া এ জাতি বিশ্ব-প্রেম-ধামে পৌঁছিবে,—এক কথায় বাঙ্গালী মানুষ হইবে। যত লেখা, যত চর্চ্চা, যত কথা—সব ইহারই জন্য। যত বয়স বাড়িতেছে, ততই প্রত্যক্ষ করিতেছি, নিঃস্বার্থ কথাটা অলীক স্বপ্নবৎ উপেক্ষিত হইতেছে প্রায় সর্ব্বত্র; সকলেই, না হয়, অনেকেই, বৃথা মায়ায় মজিয়া, যাহা লক্ষ্য নয়, যাহা কর্ত্তব্য নয়, তাহা ধরিয়াই মহা তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে;—দিবারাত্রি শুনিতেছি, কেবল স্বার্থ, স্বার্থ, কেবল স্বার্থ! ভালবাসা মিথ্যা, স্ত্রী পুত্র মিথ্যা, পিতা মাতা মিথ্যা, আত্মীয় পরিজন মিথ্যা, দেশ মিথ্যা, জাতি মিথ্যা; সত্য কেবল স্বার্থ,—অমিশ্রিত, অনাবিল, স্ব এবং অর্থ! আপনার নাম, আপনার কাম, আপনার বিদ্যা, আপনার

বুদ্ধি, আপনার ঐশ্বর্য্য, আপনার সম্পদ; যা কিছু সবই কেবল আপনার জন্য! একান্নবর্ত্তী পরিবার-সংরক্ষণ, এক জাতীয়ত্ব-গঠন, ধর্ম্ম-সংস্থাপন এবং ভাষা-সংস্করণ,—এ সকলই বাতুলের প্রলাপ! বড় হইতে চাও, এ সকল ভুলিয়া কেবল "আপন", কেবল "অহং" কেবল "স্ব" লইয়া ডুবিয়া থাক। আপন যশ, আপন প্রশংসা, আপন গুণ-কথন, আপন গুণ-শ্রবণ, আপন কথা প্রচার, দিবারাত্রি এই সকল লইয়া মাতিয়া থাক, "পরার্থ" কথাটা অভিধান হইতে তুলিয়া দিয়া, কেবল "স্বার্থ" কথার জয় ঘোষণায় ব্যাপৃত রহ! বড় কঠিন সমস্যায় পড়িয়াছি। আমার আশা-শিশু এই নিরাশার মরুভূমিতে প্রেম-জল বিনা, এতদিন পর, শুষ্ক হইতে চলিয়াছে। এতদিন যে আশা-শিশু ধরিয়া বাঁচিয়াছিলাম, সে আশা-শিশু মরিলে আর বাঁচিয়া কাজ কি? বৃথা লেখা-লেখি, বৃথা বকাবকি, বৃথা যন্ত্রনা, বৃথা কল্পনা করিয়া লাভ কি? মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়াই কি শ্রেয়? ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে যে কথা, প্রতি জাতি সম্বন্ধেই সেই কথা, প্রতি দেশ সম্বন্ধেই সেই কথা। ব্যক্তিত্বটুক বাদ দিলে, কথাটা এই দাঁড়ায়, বাঙ্গালীর, ভারতবাসীর এবং এই ভারতের কি আশা আছে যে, তাহা লইয়া জীবন ধারণ করিবে? মৃত্যু শ্রেয় নয় কি? অথবা মরণের গাঢ় অন্ধকারে সকল নিমগ্ন নয় কি? হায়, প্রকৃত জীবনের পরিচয় কোথায় পাওয়া যায়!!

পশুপক্ষীরা নিজ নিজ লইয়া দিবানিশি কেবল ব্যস্ত। মানুষও যদি কেবল তাহাই করিবে, তবে মনুষ্যের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যার এত গরিমা কেন? মানুষ তবে পশুর দলে মিলিয়া স্বেচ্ছা-বিহার, স্বেচ্ছাগতিবিধি করিয়া স্ব-সুখ-সাধনে ব্যস্ত থাকুক। এতকাল পরে পশুর ধর্ম্ম যদি শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বিবেচিত হইয়া থাকে, তবে আর কেন? স্বাধীনতার বিজয়-নিশান গগনে তুলিয়া, নির্ভয়ে স্বেচ্ছাচারিতার ভুবন-বিজয়ী সঙ্গীতে তান ধরিয়া দেও, সকল আন্দোলন নির্ব্বাণ হউক, বল, পশুপক্ষীই জগতে শ্রেষ্ঠ আদর্শ। জন্ম মরণই পশুপক্ষীর জীবনের লক্ষ্য, আমরণ নিজসুখ অন্বেষণই উদ্দেশ্য, যতটুক বুঝি আর শ্রেষ্ঠগুণ ত বড় দেখিতে পাই না। সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন বিবর্ত্তনবাদীই পশুপক্ষী-সমাজের উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। চিরকালই তাহারা একই ভাবে আছে, নড়েচড়ে, খায় শোয়, কয়েক বৎসর পর মরিয়া যায়। মানুষের অত্যাচারে কোন কোন জন্তু আরো অবনতির রাজ্যে যাইতেছে, কিন্তু উন্নতি কোথাও দেখি নাই। কিম্বা উন্নতির কথা ত কোন পুস্তকেও পড়ি নাই। গো, মহিষ, ছাগল, কুকুর, হরিণ ব্যাঘ্র হইতে শ্রেষ্ঠতর জীবের অভ্যুত্থানের কথা পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডারবিন-প্রমুখ ব্যক্তিগণও বলিতে পারেন নাই। ইহারা আদিতে যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে; চিরদিনই একই রূপ খায়, একইরূপ বেড়ায়, একই রূপ ডাকে, একই রূপ থাকে। বৈচিত্র্য নাই, রূপান্তর নাই, আদিতে যেমন, আজও তেমনি। আহার, নিদ্রা, রিপু-সেবা; ইহাই জীবনের লক্ষ্য এবং জীবনের পরিণতি। কোন আশা নাই, কোন উন্নতির পিপাসা নাই। মানুষ যদি আশা-বঞ্চিত, উন্নতির কামনা-রহিত, পরভাবনা-বর্জ্জিত, স্বার্থ-পরিচালিত হয়, তবে পশুতে আর মানুষে পার্থক্য কোথায়? কোনই পার্থক্য নাই।

বাঙ্গালী জাতির, কেবল বাঙ্গালী কেন

সমস্ত ভারতীয় জাতির মনের উপর দিয়া এমন একটা বিষাদ-কালিমা রেখা অঙ্কিত হইতেছে যে, দিনদিন সকল উদ্যম, আশা-ভরসা-হীন হইয়া পড়িতেছে। দাঁড়াইয়া নীরবে অপমান বা প্রহার সহ্য করিতে ভারত-বাসীর মত এমন কেহই পারে না। স্ফূর্ত্তি নাই, উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, চেষ্টা নাই, যেন কলের পুতুল আর কি! কোন একজন বিদেশীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালী এমন একজাতি, যাহারা শুইতে পাইলে বসে না, বসিতে পারিলে দাঁড়ায় না, দাঁড়াইতে পাইলে হাটে না এবং হাটিতে পাইলে দৌড়ায় না।" বাস্তবিক, ভারতের সমস্ত জাতি সমূহই যেন দিনদিন এই কথার জীবন্ত সাক্ষী রূপে দেদীপ্যমান হইতেছে। পরাধীনতার তীব্র আঘাতে, দারিদ্র্যের ঘোর পীড়নে, ম্যালেরিয়ার দারুণ আক্রমণে এবং চরিত্র-হীনতার অসহ্য দংশনে জাতি সাধারণের শরীরের তেজ নাই, মনের স্ফূর্ত্তি নাই;—মনুষ্যের যাহা থাকা প্রয়োজনীয়, তাহা যেন কিছুই নাই। ইংরাজ, ভারতের তেজ ও বীর্য্যে শক্তি ও সামর্থ্যে, চিরদিনের জন্য, এমন তরল অহিফেন ঢালিয়া দিয়াছে যে, সমস্ত মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চল, নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। ইচ্ছামাত্র ইংরাজ ঝালোয়াড়ের রাজাকে পথের ভিখারী সাজাইতেছেন, ইচ্ছামাত্র গলায় ফাঁসি দিয়া তেকেন্দ্রজিৎকে অমর ধামে প্রেরণ করিতেছেন, ইচ্ছামাত্র, বড় বড় মহামহোপাধ্যায়দিগকে অসৎকাজের সং সাজাইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া তামাসা দেখিতেছেন, তুরি ভেরী বাজাইয়া বড়বড় হিতৈষীদিগকে খেতাবের মোহিনী মায়ায়, সাপুড়িয়ার বংশী-মুগ্ধ সর্পের ন্যায় বশ করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। আর তোমাকে, আমাকে, তাহাকে, নিত্য ইংরাজ অপমান নির্যাতনের উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া বিকট হাস্য হাসিতেছেন। তুমি জাতীয় মহাসমিতির ক্ষণিক উৎসাহে ভুলিতেছ, ভাই, দেখিতেছ না, দিন দিন এজাতি কেমন মৃতবৎ নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে? পরনিন্দা শিক্ষিতদিগের দিন দিন কণ্ঠের ভূষণ হইতেছে, পরশ্রীকাতরতা দিন দিন শিক্ষিতদিগের অঙ্গাভরণ হইতেছে, হিংসা বিদ্বেষ, যাহা নীচ জন-যোগ্য, তাহা এখন ষোল আনা শিক্ষিতদিগের হৃদয়ে রাজ্যাধিকার বিস্তার করিতেছে; সহানুভূতি, সমবেদনা, পরদুঃখকাতরতা, সব গঙ্গায় ভাসিয়া গিয়াছে। তুমি ভাই, কি অর্থে বল যে, এজাতির উন্নতি-সূর্য্য অদূরে? বাঙ্গালীর, ভারতবাসীর আছে কি? কেবল চিৎকার, কেবল বক্তৃতা, কেবল কাগজে কালীর আচড় কাটা, আর কি? জীবন থাকিলে এত অত্যাচার, এত অবিচার, এত দুর্নীতি, এত ব্যভিচার, এ সোণার ভারতে ধর্ম্মের নামে, রাজনীতির নামে বিকাইত না! বৃথা ভাই আশা-মরীচিকার স্বপ্ন দেখিতেছ, আজ এভারত আশা-হারা, তেজ-হারা, বীর্য্য-হারা, সম্মান-হারা, সর্ব্বস্বহারা। এভারত আজ ঘোর স্বার্থপরতায় নিমগ্ন।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম যে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলনীতি, যে দিন হইতে সেই ধর্ম্মের দুর্জ্জয় প্রভাব মন্দীভূত হইয়াছে, যে দিন হইতে ব্যাস বাল্মীকির ধর্ম্মাদর্শময় উজ্জ্বল সাহিত্যের স্থলে স্বেচ্ছা-প্রেম-লীলাময় নাটকাদির আদর বৃদ্ধি পাইয়াছে, যে দিন হইতে শ্রীচৈতন্যের প্রেম ভক্তির নামে ব্যভিচারের কদর্য্য লীলা-স্রোতে দেশ ভাসিতেছে, সেই দিন বুঝিয়াছি, এ দেশের আর আশা ভরসা নাই। যে দিন ষোড়শবর্ষীয় বালক সিরাজকে সিংহাসন-

চ্যুত করিয়া, খাল কাটিয়া ইংরাজ-লোনা-জল আনায়ন করার জন্য কৃতঘ্নদিগের গুপ্ত মন্ত্রণা-সভা বসিয়া গিয়াছে, সেই দিন এদেশের আশা-সূর্য্য ডুবিয়াছে? এখন আছে, দিগ্-দিগন্ত ব্যাপিয়া কেবল নিরাশা, নিরানন্দ, নিরুদ্যম, স্ফূর্ত্তিহীন পরাধীনতা, আত্মমর্য্যাদা-হীন তোষামোদ, আর স্বার্থ-চালিত দাসদিগের বিকট চিৎকার। নিন্দা পরে করিও, ভাই, একবার ভাবিয়া দেখ, কথাটা সত্য কি না?

জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রথম কথা প্রেম, মধ্য কথা পবিত্রতা, শেষ কথা দয়া। কেবল প্রেম, কেবল পবিত্রতা, কেবল দয়া। মহাত্মা বুথ বলেন, তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র কেবল এই কয়টী কথায় "Love" নিবদ্ধ। তিনি বলেন, প্রেমে অসাধ্য সাধিত হয়। আমরা দেখিতেছি, বাস্তবিকই প্রেমের দুর্জ্জয় তেজে দুর্ব্বল, অসহায়, ক্ষীণ বুথ অসাধ্য সাধন করিয়া জগৎকে মোহিত এবং স্তম্ভিত করিতেছেন। সহস্র সহস্র প্রতিনিধি জাতীয় মহাসমিতিতে একত্রিত হইয়া যাহা করিতে পারিতেছেন না, একা বুথ অঙ্গুলীনির্দ্দেশে তাহা সাধন করিতেছেন। কথা—কেবল প্রেম, শাস্ত্র কেবল প্রেম, অস্ত্র কেবল প্রেম। আমরা মিলিতে চাই, এই প্রেমটাকে দূরে ফেলিয়া দিয়া। গঙ্গায় প্রেম-মণি ভাসাইয়া, মন্ত্রণা-সভা বসাইয়া, ভারত উদ্ধার করিতে চাই!! সিরাজের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, সিরাজকে মারিবার জন্যই মন্ত্রণা-সভা বসাইতে এদেশের লোকেরা চায়। পিতৃ-মাতৃ বিচ্ছেদ ঘরে ঘরে, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘরে ঘরে, একান্নবর্ত্তী-পরিবার-প্রথা, পাশ্চাত্য পরিশ্রম-সমতা-সাধনের শিক্ষা-কুহকে ভাঙ্গিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, ঘোরতর দারিদ্র্য ভারতের গ্রাম, দেশ, রাজ্য সমূহকে গ্রাস করিতেছে, আর আমরা নিজ সুখ লইয়া, নিজ গৌরবে স্ফীত হইয়া গাড়ী চড়িয়া, হ্যাটকোট পরিয়া, রাশি ২ অর্থ ঢালিয়া, মন্ত্রণা-সভা করিতেছি। ধিক, ধিক, শতধিক! দশ বৎসরে যে সভা একটা কাজ হাতে লইতে পারিল না, সে জাতীয় সভার আবার নাম কর? ধিক, ধিক, শতধিক!! ভারতের দারিদ্র্য-সমস্যার মীমাংসা আজও হয় নাই, আজও নিরন্নদিগের টেক্সের ভয় যায় নাই, আজও জমীদারের অত্যাচার কমে নাই, আজও দরিদ্রের ঘরের সুন্দরী স্ত্রী কন্যা ধনীর অত্যাচারের অতীত হয় নাই, বলিব কি, বরং দিন দিন আরো অত্যাচার বাড়িতেছে, টাকার বলে দরিদ্রদিগের নির্ব্বাসন-কথাও ঢাকা পড়িতেছে। সমবেদনা কোথায়? কোন্ মুখে নির্লজ্জের ন্যায় বল, দেশের জাতীয় সভা দাঁড়াইয়া আশার স্বপ্ন জাগাইতেছে? অশিক্ষার ঘোরান্ধকারে ভারত নিমজ্জিত, অধীনতার তীব্র অত্যাচারে নিষ্পেষিত, দেখ দেখ, চাহিয়া দেখ, চক্ষু থাকে ত চাহিয়া দেখ, বৃথা চীৎকার ভিন্ন সতী নারীকে উদ্ধার করিতে, বিপন্ন নির্ব্বাসিত রাজার সহায় হইতে, অত্যাচারিত ও নির্ব্বাসিত মূক প্রজাকে রক্ষা করিতে এদেশে কোন হিতৈষী নাই। হিতৈষী নামটা লাটসভায় বসিবার এবং রায় বাহাদুর খেতাব প্রাপ্তির পূর্ব্বাভাস মাত্র। না খাটিয়া, না জীবন দিয়া, না পরের জন্য ভাবিয়া, না পরের জন্য সর্ব্বস্ব ঢালিয়া, আর কোন দেশে হিতৈষী নাম বিকায় নাই! আবেদন করার পরামর্শ দিবার জন্য, আবেদনের আয়োজনের জন্য বা ভিক্ষাবৃত্তি শিক্ষার জন্য কোন সভার প্রয়োজন আছে কি না, তুমি জান, এজগতের কোন বিখ্যাত হিতৈষী জানেন না। রবার্ট এমেট জানেন না, পার্কার জানেন না, ম্যাট্সিনি জানেন না, গ্যারিবল্ডি

জানেন না। প্রেম কই, ভালবাসা কই, স্বার্থ-ত্যাগ কই, জীবন-ত্যাগ কই? বৃথা হুজুগ, বৃথা আয়োজন, বৃথা আশা-মরীচিকা!

আমি চাই একটু সুশীতল প্রেম বারি। ভারত মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, ভারত চায় একটু সুশীতল প্রেম-বারি। বক্তৃতাময় যুদ্ধ নয়, ভাবময় লেখালেখি নয়, ভারতের জাতিসমূহ চায় একটু সহানুভূতি মাত্র। কাট কাট মার মার করিয়া এজাতির কখনও উদ্ধার হইবে না;—নরশোণিত-ধারা-প্লাবনে এদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইবে না। সকল অসাধ্য সাধিত হইবে,কেবল প্রেমে। ফরাশী-বিপ্লব কি প্রেম-মন্ত্রে ফ্রান্সকে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছে? আজও সেখানে নব-বিপ্লবের সম্ভাবনা আছে—স্বাধীনতার প্রশান্ত ধ্বজার নিম্নেই পরাধীনতার বিষময় কাল-ভুজঙ্গ লুকায়িত আছে। প্রকৃত স্বাধীনতা মনে,—বাহিরে নহে। বাহিরের স্বাধীনতা,পরাধীনতার বিকৃত খোলস্ মাত্র। প্রকৃত স্বাধীনতা,স্বার্থ-ত্যাগে, জিতেন্দ্রিয়তায়, রিপু-সংগ্রাম-জয়ে, অজেয় আত্ম-মর্য্যাদা ও জাতীয়ত্ব বোধে। প্রকৃত স্বাধীনতা,দয়া,প্রেম ও পুণ্যসঞ্চয়ে। বাহিরের স্বাধীনতা, দেশকে, সমাজকে, কেবল শ্রীহীন এবং উচ্ছৃঙ্খল করে। তাহা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। যাহাতে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি, বংশের শ্রীবৃদ্ধি, তাহাই বাঞ্ছনীয়। তাহা কেবল প্রেম-পুণ্যে অর্জ্জন করা যায়। সকল ভাই এক মায়ের সন্তান, সকল ভাই এক মাতৃ-ক্রোড়ে লালিত পালিত, অথচ থাকে দূরে দূরে, আরো দূরে, আরো দূরে! ছি, এমন করিয়া কি একতা হয়? এমন করিয়া কি মহাবল লাভ করা যায়? দাঁড়াও ভাই, আমার পার্শ্বে ভাই হইয়া দাঁড়াও, আমি,তুমি, সে—সকলে জমিয়া যাই, সকলের স্বার্থ ভুলিয়া একাত্মক হই, তোমাকে আমি তুলি, তুমি আমাকে তোল,—মহাবলে সকলে বলীয়ান হই। তবে ত হইবে। দূর দূর দূর—অপ্রেম,অপ্রেম,অ-প্রেম—স্ব,স্ব,স্ব—হায় এরূপ করিয়া একতার ঘর বাঁধা যায় না! ভাঙ্গিল, আর যোড়া লাগিল না! লাগিল কই? মিলন কই? কঙ্গ্রেস কোথায়? অপ্রেম-আগুনে ঘর বাড়ী সব পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়, দুর্ভিক্ষে নরনারী মরিয়া দেশ শূন্য করে, তর্পণ করিবেন, বংস-রান্তে কঙ্গ্রেস।—অথবা মৌখিকপ্রেম, অথবা, গলাবাজি, অথবা উষ্ট্রাধির কুহক! হায়রে মহামেলায় অপার আশা-ছাউনি!!

অশ্রুতে সিক্ত হইয়া মহাত্মা বিদ্যাসাগর বলিতেন,"এদেশের নিম্নশ্রেণীর গতি ফিরিবে না, এদেশের আর আশা নাই।" বলিতেন, "যে দেশে মাতৃজাতির হতাদর, সে দেশের মঙ্গল নাই। যে দেশে পুরুষে রমণী বধ করিয়া সুখ পায়, সে দেশের মঙ্গল নাই।" এ সকল কথা জীবন্ত সত্য। পরের জন্য কাঁদিয়া, পরের জন্য ভাবিয়া, পরের জন্য সর্ব্বস্ব ঢালিয়া বিদ্যাসাগর চলিয়া গেলেন, তাঁহার বংশধর, তাঁহার প্রত্যক্ষ-মূর্ত্তি, আজ ধনীর আসনে উপবিষ্ট, পিতৃ কীর্ত্তি ডুবাইয়া, ভৃত্যের তৈলসেবায় পুলকিত! বলিব কি যে, এদেশের মঙ্গল-আশা আছে? আর যাঁহারা এদেশের হিতৈষী, তাঁহারা নিজের গাড়ী সানন্দে মনুষ্য-ঘোড়ার দ্বারা চালিত হইতে দিয়া ধন্য এবং কৃতার্থ হইতেছেন!! যে শোক ক্রন্দনে পরিণত, তাহা গভীর নহে, যে আনন্দ বাহ্য-উৎসবে পর্য্যবসিত, তাহা কদাচ বিমল আনন্দ নহে। দেখিয়াছি, এক সময়ে যাহারা মনের আবেগে সানন্দে হিতৈ-ষীর গাড়ী টানে,অন্য সময়ে তাহারাই গলাধাক্কা দিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করে। উহাতে

আত্মহারা হইয়া হিতৈষী নামে যাঁহারা কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা যতদিন এদেশে, ততদিন নিশ্চয় বলিতে পারি, এদেশের কোন আশা নাই। যাঁহারা দান-খাতায় টাকা লিখিয়া তাহা প্রদান করাকে অধর্ম্ম মনে করেন,—খাটাইয়া ভৃত্যের বেতন দেওয়া যাঁহারা অধর্ম্ম মনে করেন, বিদ্যাসাগর বলিতেন, যাঁহারা পিতা মাতার পরিচর্য্যাকেও অধর্ম্ম, অসভ্যতা বা অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়,মনে করেন,তাঁহারা যে দেশের হিতৈষী,যে দেশের নেতা,হায় হায়,যে দেশের আশা কোথায়? তুমি ভাই অপূর্ব্ব যুগল মূর্ত্তি দেখিয়া ভুলিতে পার, আমি দেখিতেছি, সকলই আশা-মরীচিকা! বিদ্যাসাগরের ন্যায় পুণ্যশ্লোক ক্ষণজন্মা লোকের সম্মান-কীর্ত্তি যেদেশে প্রতিষ্ঠিত হইল না, সে দেশের সকলই আশা-মরীচিকা।

সত্য কথা বলিলে নির্যাতন কর, সহিব, জেলে পাঠাও যাইব, হত্যা কর, রক্ত ঢালিয়া দিব। তোমার ভয়ে আমি সত্য চাপা দিতে পারিব না। এমন করিয়া কথনও এদেশ উদ্ধার হইবে না। স্বার্থ নামক পদার্থটাকে বিসর্জ্জন দিতে এবং প্রেম-পুণ্যে ভূষিত হইতেই হইবে; আমি না পারি, সরিয়া দাঁড়াই, তুমি না পার অম্লান চিত্তে সাধু মহাজনদিগের জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া সরিয়া দাঁড়াও। পুণ্যবান মহাত্মাদিগের অভ্যুত্থানের আশা-শলিতা ধরিয়া এস নয় ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া থাকি; তবুও যেন মনুষ্যত্বের নামে কলঙ্ক না আনয়ন করি। যদি তুমি আর আমি কাহাকেও ভালবাসিতে না পারিলাম, কেবল প্রেমের নামে কলঙ্কই আনিলাম,তবে এস ভাই, আর অপেক্ষা না করিয়া, মৃত্যুর পথ দিয়া চলিয়া দেশকে ও সমাজকে পবিত্র করি। পুণ্যময় দেশ পুণ্যময় থাকুক, আমাদের ন্যায় অধার্ম্মিকদিগের দ্বারা যেন কখনও দেশ কলঙ্কিত না হয়। আমাদের নাম ডুবুক, কার্য্য ডুবুক, সব ডুবুক, কিছুই যেন না থাকে। আমাদের কথা ডুবুক, বক্তৃতা ডুবুক—সব ডুবুক। স্বার্থ যখন বলি দিতে পারি নাই, প্রেম-সাধনে যখন অসিদ্ধ, তখন আর কাজ কি ভাই? এস তুমি আর আমি, সকল হুজুগ ছাড়িয়া মৃত্যুর পথ দিয়া চলিয়া যাই। যাহা হওয়ার ঢের হইয়াছে—কলঙ্কের উপর কলঙ্ক, অধর্ম্মের উপর অধর্ম্ম, পাপের উপর পাপ; বোঝা যারপর নাই গুরুতর হইয়াছে। আশা ভরসা নাই যখন, তখন আর কেন, এস, চলিয়া যাই। এস, পলায়ন করি। এস, নিবিয়া যাই।

নব্যভারতের আশা কোথায়? আশা, প্রেম, পবিত্রতা ও দয়ায়; আশা, জাতীয় ধর্ম্ম এবং জাতীয় ভাষায়। এ সকল ছাড়িয়া,ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই দাঁড়াইয়া, কেহই, এই ঘোর নাস্তিকতা ও অবিশ্বাস-বাদ প্রচারের দিনে, চরিত্র ও ধর্ম্মজীবনের পার্থক্য-সংস্থাপনের দিনে, অথবা ভিতর-বাহিরের একীকরণ-বিনাশের যুগে, অথবা চরিত্রহীন, বিশ্বাসহীন পুনরুত্থানের দিনে আশা করিতে পারেন না যে,এই ভারতে আবার জাতীয় ধর্ম্ম নামে একতার একটা সাধারণ ভূমি সৃজিত হইবে। আশা করিবার কিছু নাই, যদি কখনও হয়, তবে তাহা বিধাতার বিশেষ কৃপা মনে করিব। ধর্ম্মের অবস্থা ভারতে এখন কেমন, সকলেই জানেন। জৈনদিগের নিকট বুদ্ধদেবের নাম কর, কাণে অঙ্গুলি দিয়া বলিবে, "বাবু, এমন কথা মুখে আনিবেন না।" যেন কি ভয়ানক অপরাধের কথা! কবিরপন্থীদিগের নিকট নানকপন্থীদিগের নাম কর, চটিয়া লাল

হইবে! শাক্ত বৈষ্ণবের বিবাদ চির-প্রসিদ্ধ কথা। খ্রীষ্টান, মুসলমান ও হিন্দুর বিবাদ চিরপরিজ্ঞাত! এখন নব্যদলের মধ্যে বাকী রহিলেন, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানী দল। তাঁহাদের ভিতরের গৃহ-বিবাদ, বিশ্বাসহীনতা ও চরিত্র-হীনতার কথা মনে হইলে, অথবা চাকচিক্যময় বিলাসিতা,রিপু-পরায়ণতা বা সাংসারিকতার কথা ভাবিলে, পরোপকার ও স্বার্থনাশের প্রতি অবহেলা ও ভ্রূ-কুঞ্চনের কথা স্মরণ হইলে, আশা হয় না, বিশ্বাস হয় না যে, এই ধর্ম্মসমাজ বিধাতার পবিত্র নামকে দীর্ঘকাল পবিত্র রাখিয়া,সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা পূর্ব্বক প্রেম,পবিত্রতা ও দয়ারূপ সম্মিলনের পবিত্র সূত্রে ভারতীয় অসংখ্য জাতিসমূহকে বাঁধিতে পারিবে! বোধ হয় যেন, এসমাজ দিন দিন কিছু আদর্শহীন হইতেছে। বোধ হয় যেন এসমাজ দিন দিন কিছু কিছু ধর্ম্মহীনও হইতেছে। পবিত্রতার আদর্শ খর্ব্ব হইলে, প্রেমের আদর্শ বিসর্জ্জিত হইলে, চরিত্রের আদর্শ ডুবিলে, কেবল ধর্ম্মের খোলস লইয়া কেহ বৈকুণ্ঠ, স্বর্গ বা মুক্তি ধামে পৌছিতে পারে না। চরিত্র-হীনতা ও রিপু পরতন্ত্রতার পথ দিয়া, স্বার্থ-পরতা ও বিলাসিতার পথ দিয়া, ব্রাহ্মসমাজ যেন ক্রমে ক্রমে প্রেম-হীন রাজ্যে উপনীত হইতেছে! প্রেম, পুণ্য ও দয়া সাধন এখন কথায় ও বক্তৃতায়। দিন দিন এ সকল সৎগুণ কথার কথা হইয়া উঠিতেছে। প্রচারকদিগের মৌখিক প্রেমের কথায় বিশ্বাস করিয়া তুমি একথা বলিতে না চাহ, না বলিও, আমি কিন্তু আশার কোন চিহ্ন দেখি না। শ্রাদ্ধের গামছা বা ভোজনদক্ষিণার সিকি দুয়ানি পর্য্যন্ত প্রচারগণ নামিয়াছেন, বলিতেছি না। তবে একথা ঠিক যে, তাঁহারা নীতি ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ঠিক রাখিয়া,পবিত্রতার উচ্চ আদর্শ ধরিয়া,ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষের আদর্শ ঠিক রাখিয়া চলিতে পারিতেছেন,মনে করিতে পারি না। দুপয়সা,দশ পয়সার মায়ায় না হউক, পাঁচশত বা দশ সহস্রওয়ালা লোকের মমতায় তাঁহারা প্রেমপুণ্যের কেনা বেচা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এ কথা বলিতে পারি। এহেন লোকদিগের দ্বারা ভারতে একতা সাধিত হইবে, ভাই তুমি আশা করিতেছ? করিয়া বাঁচিয়া থাক; আমি কিন্তু ভাই মরীচিকায় পুড়িয়া মরিতেছি। ছাই, ছাই, চতুর্দ্দিকে কেবলই ছাই!!

আর আশা কোথায়? রাজনীতির সুবৃহৎ ক্ষেত্র গেল, ধর্ম্মের প্রাঙ্গণ গেল, বাকী রহিল কি? নিরাশা-মন্দিরের একটুকু ক্ষুদ্র, একবিন্দু পরিমাণ স্থানে এখন আশা-শিশু খেলা করিতেছে,—একটু একটু শ্বাস টানিতেছে। এখন এই ক্ষীণ শ্বাসটুক গেলেই প্রাণটা যায়, দেশটাও রক্ষা পায়। সে স্থানটুক—জাতীয় ভাষা। জাতীয় ভাষা একটা হওয়া চাই—নিশ্চয়ই চাই, নচেৎ জাতির রক্ষা নাই। কিন্তু আশা-শিশু এখানেই বা বাঁচে কই? ছোট গাছটীকে বাঁচাইতেছিলেন সে সকল মহারথীগণ,আজ তাঁহারা কোথায়? কোথায় রামমোহন, কোথায় বিদ্যাসাগর, কোথায় অক্ষয়কুমার, কোথায় মাইকেল, কোথায় কেশবচন্দ্র, কোথায় প্যারিচাঁদ, কোথায় বিহারীলাল,কোথায় দীনবন্ধু,কোথায় রাজকৃষ্ণ, এবং আজ কোথায় বাঙ্গালা ভাষার রাজাধিরাজ বঙ্কিমচন্দ্র। এই আশা-শিশু বড় হইতে না হইতে আজ তাঁহারা কোথায়? হায় হায় হায়, প্রাণ ফাটিয়া যায়, আজ সুকুমার শিশু সাহিত্য পরনিন্দায়, পর-হেলায়, বিদ্বেষ ও ঘৃণার উষ্ণ নিঃশ্বাসে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, কে রাখে, কে দেখে, কে

বাঁচায়? সোণার বঙ্কিমচন্দ্রের সিংহাসনে কে বসিবে, সে চিন্তায় সকলে আত্মহারা, কেহ বঙ্কিমের ভাষার দোষ কীর্ত্তনে ও কেহ কালীপ্রসন্নের গুণকীর্ত্তনে ব্যস্ত, কেহ নবীনচন্দ্রের স্ফুট প্রতিভার মহিমা কীর্ত্তনে ও মাইকেলের প্রতিভার খর্ব্বীকরণে ব্যস্ত—কেহবা সকলের নিন্দা ঘোষণা করিয়া আপনি বড় সাহিত্যিক ধুরন্ধর বলিয়া সর্ব্বত্র মহিমান্বিত হইবার জন্য লালায়িত!! হায়রে হিংসা-বিদ্বেষ-কীট, তুই কোন্ প্রাণে এই সুকুমার আশা-শিশুর নব মুকুলিত অঙ্কুর বিনাশে লালায়িত? হায় হায় হায়, শেষ আশা ঢলিয়া পড়িলে এদেশ, এজাতি বাঁচিবে কেমনে? সাহিত্যের আদর্শ আজ কাল বড়ই পরিম্লান হইতেছে। পরনিন্দা, পরচর্চ্চায় সাহিত্য পরিপূর্ণ, কবি এখন অনুকরণের বাজারে বা অপহরণের বাজারে মৌলিকতার বিনিময়ে বাহ্য-চটক-ময় প্রাণহীন শিল্প-সৌন্দর্য্য খুঁজিতেছেন, প্রবন্ধ-লেখক এখন ঐ বাজারে বিজ্ঞতা ক্রয়ের ফিকিরে ঘুরিতেছেন, অথবা টাকার বাজারে এপ্রেন্‌টিসের চেষ্টায় আছেন, সমালোচক খোষামুদী বা নিন্দার বিষ উদ্গীরণের চেষ্টায় আছেন, ইতিহাস-লেখক এখন খোষামুদীর তৈল পাত্র হাতে লইয়া, স্কুলের বালকদিগের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় আছেন। সাহিত্যের জন্য সাহিত্য-সেবা, মৌলিক সাহিত্যের সেবা করিতেছেন—অতি অল্প লোক!! ঋণ করিয়াও, নিন্দা-ভাজন হইয়াও আদর্শ সাহিত্যের সেবা করিতে হইবে, এদেশের ভাবী উন্নতির বীজ ইহারই মধ্যে নিহিত—না করিলে চলে না, এরূপ ভাব সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ না হইলেও, এরূপ ভাবেই বা সাহিত্যের চর্চ্চা করে কয় জন? সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ—সৌন্দর্য্য-পিপাসা ও ধর্ম্ম-নীতি-পিপাসা চরিতার্থ করা! সে আদর্শ আজ কাল বড় একটা দেখি না। সাহিত্যেও ব্যবসাদারী ঢুকিয়াছে! সাহিত্যে বিজ্ঞাপন-কুহক প্রবেশ করিয়াছে। সাহিত্যিকগণও আজ প্রশংসা ও সম্মানের কাঙ্গাল। তাঁহারা দেশ চালাইবেন কি, বিবিধ প্রকারে দেশ আজ তাঁহাদিগকে চালাইতেছে। ইহা কি কম পরিতাপের বিষয় যে, মানুষ পুস্তক লিখিয়া আবার প্রশংসার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়? কেন বাপু, যদি তোমার এতই দুর্দ্দশা হইয়া থাকে, এতই গৌরবের কাঙ্গাল হইয়া থাক, স্কুল-পাঠ্য পুস্তক লেখ, ক্ষমতা না থাকে, দশ জনের পুস্তক হইতে দশটা গল্প তুলিয়া কীর্ত্তি রাখ—একটু তোষামোদ করিতে পারিলেই বা কিছু ঘুষ দিতে পারিলেই তোমার নামের কীর্ত্তিটা থাকিবে, দশটা টাকাও পাইবে। আদর্শ সাহিত্য-সেবকেরা কি চান? লোকের প্রশংসাও না, নিন্দাও না; তাঁহারা প্রকৃত সৌন্দর্য্যের উপাসক, নীতির উপাসক—প্রশংসা-নিন্দা-নিরপেক্ষ। সাহিত্য-সেবক প্রশংসা-নিন্দা-নিরপেক্ষ হইলে তবে বিশুদ্ধ সাহিত্যের উদয় হয়। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃষ্ণদাস, মুকুন্দরাম এক দিনের জন্যও প্রশংসা-লালায়িত হন নাই। প্রশংসা-লালায়িত হন নাই, রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বিহারীলাল ও বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহাদের বিমল সাহিত্যের ঔজ্জ্বল্যে আজ চতুর্দ্দিক পূর্ণ। আজ সাহিত্যের নেতৃত্ব পদের আশায় বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ বঙ্গবাসীর প্রশংসার জন্যও লালায়িত!! পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিক জীবন মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িলেও আমরা ইহাপেক্ষা অধিকতর দুঃখিত হইতাম না। আর বলিব কি? বলিতে লেখনী লজ্জায় অভি-

ভূত হয়, মহা প্রতিভাশালী, পূর্ব্ব গগনের উজ্জ্বল নক্ষত্র নবীনচন্দ্র, পুস্তকের সমালোচনার জন্য আজ দ্বারে দ্বারে ভিখারী! নব্যভারতে তাঁহার নাকি কি নিন্দা ঘোষণা করা হইয়াছে, এজন্য তিনি নব্যভারতের প্রতি বিরক্ত! এই বিরক্তি, নব্যভারতের অনুকূল বন্ধুদিগের ভালবাসা ও অনুরাগসিংহাসন টলাইতে পত্রের মস্তকে চড়িয়া চতুর্দ্দিকে নাকি ঘুরিতেছে!! ইহাতে নবীন চন্দ্রের প্রতিভা বাড়িতেছে, না কমিতেছে, না বুঝিয়া আমরা অবাক্ হইয়া ভাবিতেছি, এদেশের হইল কি? নবীনচন্দ্রের প্রতিভার জয় ঘোষণা করিবার জন্য অথবা প্রতিভা প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশে আসরে নামিলেন শেষে একজন বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতের নবজাত শিশু। এইরূপ আত্মমর্য্যাদাহীন প্রশংসাব্যাকুলতা দেখিয়া আমরা ভাবিতেছি, নবীন চন্দ্র তবে কি প্রকৃত প্রতিভাশালী কবি নহেন? যদি তাহা না হন, তবে এদেশের সাহিত্যের আশা কোথায়?

হেমচন্দ্র এক প্রকার সাহিত্য-জগত হইতে বিদায় লইয়াছেন। চন্দ্রনাথ এখন স্কুলের পাঠ্য লিখিতেছেন, অক্ষয় চন্দ্র নির্জ্জন সাধন করিতেছেন, এবং যোগেন্দ্রনাথ গবর্ণমেন্টের দাসত্বে বিব্রত। যাঁহাদের নিকট অনেক আশা, এইরূপ এক এক করিয়া দেখি, সকলেই দূরে দূরে যাইতেছেন। পূর্ব্ব যুগের সমস্ত পত্রিকা গিয়াছে, গত বৎসর নবযুগের অতি গৌরবের "সাধনা" উঠিয়া গিয়াছে, জন্মভূমি দারুণ ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত রোগীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে ফিরিতেছেন। ভারতীর তার কন্যাদ্বয়ের উপর ন্যস্ত করিয়া আদর্শ মহিলা দেবী স্বর্ণকুমারী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছেন। প্রেম, পবিত্রতা ও দয়া এ বঙ্গে জাগাইবে কে, ভাবিয়া ঠিক পাই না।

আদর্শ সাহিত্যের জন্য সাহিত্য-সেবা আমরা দেখিতে চাই। নীতিমূলক মৌলিক সুকুমার সাহিত্য দেখিতে চাই। সেই আশা লইয়া নব্যভারতের জন্ম। সেই আশা এখনও ইহাকে সজীব রাখিয়াছে। কিন্তু আশা-শিশু নিরাশার মন্দিরে এখন যারপর নাই মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে, শিশু বাঁচিবে কিনা, কে জানে!! যদি না বাঁচে, তবে আমরা বলিতে পারি, নব্যভারতও সহানুভূতি ও সাহায্য অভাবে মৃত্যু-মুখে ছুটিবে! অথবা নব্যভারত যে অধীনতার ঘোর তিমিরে, সেই তিমিরেই পড়িয়া থাকিবে!! বিধাতার বিধানে কি আছে, তিনিই জানেন। আমরা নিরাশার মন্দিরে আশা-শিশুকে মৃতপ্রায় দেখিয়া কেবল বিধাতাকে স্মরণ করিতেছি। তাঁহার কৃপা বর্ষিত হউক, নচেৎ রক্ষা নাই, নচেৎ আর রক্ষা নাই।

ভারত, মিসর ও খ্রীষ্টধর্ম্ম। (১)

ধনধান্য-পূর্ণ ভারতীয় ঐশ্বর্য্যের যশ অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচারিত হইয়াছিল। সেই যশে আকৃষ্ট হইয়া সেকালে আরব্যোপসাগর-কূলনিবাসী জাতিগণ ভারতবাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বালুকাময় মরুদেশ তাহাদের কোন বাধা-বিপত্তি ঘটাইতে পারে নাই। উষ্ট্রের সাহায্যে সেই মরুভূমি অতিক্রম করিয়া তাহারা পণ্যদ্রব্যজাত ভারত হইতে লইয়া আসিত। পুরাতন বাইবেলে লিখিত আছে যে, ভারতোৎপন্ন দ্রব্যাদি অনেক দূরবর্ত্তী দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক আনীত হইত:—

"And they sat down to eat bread; and they lifted up their eye and looked; and

behold, a company of Ishmaelites came from Gilead with their camels bearing Spicery and Balm and Myrrh, going to carry it down to Egypt."

Genesis XXXVIII. 25.

"এবং তাহারা রুটি খাইতে বসিয়াছিল; তৎপরে চক্ষু তুলিয়া দেখিল; এবং দেখিতে পাইল, একদল ইস্মেলাইট মসলা, ঔষধি এবং নানাবিধ সুগন্ধী দ্রব্য উষ্ট্রযানে লইয়া গাইলিয়ড হইতে আসিতেছিল। সেই সমস্ত পণ্য দ্রব্য তাহারা ইজিপ্টে লইয়া যাইতেছিল।"

কিন্তু শুদ্ধ উষ্ট্রের সাহায্যে এত দূর-দেশীয় বাণিজ্য-ব্যবসা চালান বড় সহজ কথা নহে। অনেক কাল এইরূপ ব্যবসায়ে থাকিয়া বণিকেরা দেখিল যে, তাহা অতি কষ্টসাধ্য এবং তাহাতে অনেক বিপৎপাতও হয়। ভাবিল, অন্য কোনরূপে এই বাণিজ্য চালাইতে পারিলে সুবিধা হইতে পারে। তখন তাহারা মহাসমুদ্র ও নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, সমুদ্র তাহাদিগকে তরঙ্গ তুলিয়া যেন হস্তোত্তলন করিয়া ডাকিতেছে। নদী বহিয়া যাইবার সময় যেন বলিয়া যাইতে লাগিল, এই পথ দিয়া আইস, আমি তোমাদিগকে ভারতোপকূলে লইয়া যাইব। তাহারা সামান্য সামান্য কার্য্যের নিমিত্ত সামান্য সামান্য নৌকা প্রস্তুত করিত। সেই নৌযানের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কিরূপে বড় বড় অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিতে পারিবে, তাহার উপায় দেখিতে লাগিল। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই; বহু পরিশ্রমে তাহারা বৃহৎ বৃহৎ পোত প্রস্তুত করিল। তৎপরে বহুদর্শন আসিয়া সহায়তা করাতে তাহাদের সামুদ্রিক বাণিজ্যে আর কোন অসুবিধা রহিল না।

তাহাদের দেখা-দেখি ভূমধ্য-সাগরের উপকূল-নিবাসী জাতিসমূহও সেই বাণিজ্য ব্যবসায়ে ক্রমে ক্রমে মাতিয়া উঠিল। সেই জাতিসমূহ দেখিল, আমাদের এই সাগরোপকূলে তিন মহাদেশ অবস্থিত—ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এসিয়া। এই সামুদ্রিক বাণিজ্যে ইজিপ্ট-বাসিগণও যোগ দিয়াছিল। ইতিহাসবেত্তা বলিতেছেন:—

"We find accordingly, that the first voyages of the Egyptians and Phœnicians, the most ancient navigators mentioned in history, were made in the Mediterranean. Their trade, however, was not long confined to the countries bordering upon it. By acquiring early possession of ports on the Arabian gulf, they extended the sphere of their commerce, and are represented as the first people of the West who opened a communication by sea with India."

W. Robertson on Ancient India.

"এজন্য আমরা দেখিতে পাই যে, ইজিপ্ট এবং ফিনিসিয়া-বাসিগণ ইতিহাসে অতি প্রাচীনকালীন নাবিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহারা প্রথমে ভূমধ্য-সাগর মধ্যেই নিজ ব্যবসা কার্য্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাহাদের সেই ব্যবসা কেবল সেই সাগরোপকূলস্থ দেশসমূহে বহুদিন আবদ্ধ থাকে নাই। আরব্যোপসাগরের কূলে কতিপয় বাণিজ্যোপযোগী স্থান তাহাদের হস্তগত হওয়াতে, তাহাদের বাণিজ্য বিস্তৃত হইল এবং তদবধি ইতিহাস-বেত্তাগণ বলেন, সেই পাশ্চাত্য জাতি ভারতের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধের প্রথম সূত্রপাত করেন।"

এই বাণিজ্যহেতু ভারতের ধনে সিডন এবং টায়ার (Sidon and Tyre) ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সেই ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ডেভিড এবং সলমনের (David and Solomon) রাজত্বকালে ইহুদীজাতিও সেই বাণিজ্যে নামিয়াছিলেন। কথিত আছে, সলমন তদ্দ্বারা প্রভূত ধনরাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, সেই প্রাচীনকালে ফিনিসিয়ানেরা এবং সমস্ত গ্রীকজাতি এক "Ionians" নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। একজন ফরাসী ইতিহাসবেত্তা বলিতেছেন:—

"I will merely, therefore, remark here, that the Hellenic races were known to the East, in the olden times, by the name of Ionians. For the Javan of Scripture, when read according to the letters, is merely Ian, and occurs in Joel."

Egypt's place in Universal History By Baron Bunsen.—Vol I B I See II.

"এজন্য এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইল যে, সমগ্র প্রাচ্যদেশে সমুদায় হেলেনিক জাতি আয়োনিয়ান নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। কারণ, ধর্ম্মগ্রন্থে যাহাকে যবন বলে, তাহা আর কিছুই নহে, জোইলোক্ত "আয়োন" শব্দ মাত্র।

নিজ ইজিপ্টেও গ্রীকেরা Ionians বা Javan যবন বলিয়া পরিচিত ছিল। ভারতেও তদ্রূপ। এই যবনদিগের সহিত যাহারা যাহারা ভারতে যাইত, সকলেই এক যবন নামে অভিহিত হইত। এই যবনেরা, কি স্থলে, কি জলে, দুই পথেই বাণিজ্য-ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের সহিত আরবেরাও মিলিত হইয়াছিল। এই দেখুন, ঐতিহাসিক কি বলিতেছেন :—

"Besides the maritime range of Tyre and Sidon, their trade by land in the interior of Asia was of great value and importance. They were the speculative merchants who directed the march of the caravans laden with Assyrian and Egyptian products across the deserts which separated them from Inner Asia—an operation which presented hardly less difficulties, considering the Arabian depredators whom they were obliged to conciliate and to employ as carriers, than the longest coast voyage."

Grote's History of Greece, Part II Chap XVIII.

"সিডন এবং টায়ারের সুবিস্তৃত জলপথের বাণিজ্য ব্যতীত আয়োনিয়ানেরা স্থলপথে মধ্য-এসিয়ায় যে ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল, তাহাও কিছু সামান্য নহে। তাহাদের স্বদেশ এবং মধ্য-এসিয়ার মধ্যে যে সুবিস্তীর্ণ মরুদেশ অবস্থিত, সেই মরুদেশ দিয়া এসিরিয়া এবং ইজিপ্ট দেশোৎপন্ন দ্রব্যভার উষ্ট্রপৃষ্ঠে লইয়া মহাব্যবসা চালাইত। সুদূর জলপথে যত কষ্ট, তদপেক্ষা এই স্থলপথীয় ব্যবসা অত কষ্টসাধ্য ছিল না। তাহার কারণ, যাহারা কষ্ট দিবার পাত্র সেই আরবীয় দস্যুগণই কার্য্য চালাইবার জন্য বৃত্তিভোগীরূপে নিযুক্ত হওয়াতে তাহাদের ধনলিপ্সা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল।"

স্থলপথের ব্যবসাবলম্বন করিয়া যবনেরা যেমন ভারতের উত্তরাঞ্চলে যাইত, জলপথেও অনেকে ভারতের দক্ষিণ উপকূলে যাতায়াত করিত। এই বাণিজ্যসূত্রে যবনেরা শুদ্ধ যে, ভারতে আসিত, এমত নহে, এখানে ব্যবসা চালাইবার জন্য অনেকে বাস করিত। এই হেতু আমরা দেখিতে পাই, মহাভারতে ভারতের উত্তর পশ্চিম এবং দক্ষিণ অঞ্চলের কোন কোন স্থান যবনপুর নামে অভিহিত হইয়াছে। সভাপর্ব্বান্তর্গত দিগ্বিজয়-পর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, সহদেব দক্ষিণদিকে দিগ্বিজয়ে গিয়া :—

"পাণ্ড্য, দ্রবিড় উড্রকেরল, অন্ধ্র, তালবন, কলিঙ্গ উষ্ট্র, কর্ণিক, রমণীয়া, আটবীপুরী ও যবনপুর দূত দ্বারা বিজয় করিয়া করসংগ্রহ করিলেন।"

নকুল খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে বিনির্গত হইয়া সেনাগণ সমভিব্যাহারে পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি সমস্ত দেশ হইতে কর সংগ্রহ করিয়া :—

"পরিশেষে সাগরগর্ভস্থ পরম দারুণ ম্লেচ্ছপহ্লব, বর্ব্বর, কিরাত, যবন ও শকদিগকে বশীভূত ও তাহাদিগের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট অন্যান্য পার্থিবদিগকে জয় করিলেন।"

গ্রোট যবনদিগের জলপথের বাণিজ্য ব্যাপারের এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন :—

"Such was the state of the Greeks as traders at a time when Babylon combined a crowded and industrious population with extensive commerce, and when the Phenician merchant-ships visited in one direction the Southern coast of Arabia, perhaps even the island of Ceylon—in another direction the British Islands."

Part I Chap. XX.

"যে সময়ে ব্যাবিলনের পরিশ্রমী লোকবহুল বিস্তৃত

বাণিজ্যে সংযুক্ত হইয়াছিল, যে সময়ে ফিনিসীয় বাণিজ্যপোত একদিকে আরবের দক্ষিণকূল এবং সম্ভবতঃ সিংহলদ্বীপ, অন্যদিকে ব্রিটিস দ্বীপ পর্য্যন্ত যাইত, সেই সময়ে বণিকব্যবসায়ী গ্রীকজাতির অবস্থা এইরূপ।"

সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত যে, যবনেরা যাইত, গ্রোটও একথা বলিতেছেন। এই যবনেরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও দেখা দিয়াছিল। আশ্বমেধিক পর্ব্বে অর্জ্জুনের দিগ্বিজয় বর্ণনস্থলে মহাভারত বলিতেছেন :—

"পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কিরাত, যবন, ম্লেচ্ছ ও আর্য্যপ্রভৃতি যে সমুদায় ধনুর্দ্ধর পরাজিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সকলেই অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।"

মহাভারতের সময় ধরিলেও যবনেরা অনেককাল হইতে ভারতের সংস্রবে আছে বলিতে হইবে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

"সগর রাজা স্বীয় গুরু ঔর্ব্বঋষির বাক্যে তালজঙ্ঘ যবন, শক, হৈহয় এবং বর্ব্বরদিগের প্রাণবধ করেন নাই ; বিকৃতবেশী করিয়াছিলেন।"

এই সগর রাজার কথা রামায়ণে উক্ত আছে বটে, কিন্তু রামায়ণে যবনের উল্লেখ নাই। এমন কি, সুগ্রীব যখন্ সীতান্বেষণের জন্য বিনত নামা বানরকে সম্বোধন করিয়া ভারতের সমস্ত ভৌগলিক বিবরণ দিতেছেন, তখনও তাহার মুখে যবনের নাম উক্ত হয় নাই। তাহাতেই প্রতীত হয়, রামায়ণের সময় ভারত যবন-সংস্রবে আইসে নাই। মহাভারতের কাল অথবা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে তাহার যবন স্পর্শ ঘটিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন ;—

"রাজা ভরত দিগ্বিজয় করিতে গিয়া কিরাত, হূণ,যবন, পৌণ্ড্র,কঙ্ক, খশ, শক এবং অন্যান্য অব্রহ্মণ্য নৃপতি ও সমস্ত ম্লেচ্ছ জাতিকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।"

কালিদাসের "শকুন্তলা" নাটকেও আমরা রঙ্গভূমিতে একজন "যবনিকার" প্রবেশ দেখিতে পাই। বিষ্ণুপুরাণে যবনের কথা এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে :—

"পূর্ব্বে কিরাতা যস্য স্যুঃ পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ।
২অংশ ৩অধ্যায়—৮।

"এই ভারতের পূর্ব্বভাগে কিরাতগণ এবং পশ্চিমে যবনেরা আছে।"

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, যবনেরা অনেক কাল পূর্ব্বে ভারতে উদয় হইয়াছিল। তখন মহম্মদ বা মুসলমানের নাম গন্ধও ছিল না। মহম্মদের কথা দূরে থাক, তখন খ্রীষ্টেরও জন্ম হয় নাই। তখন আরবেরা মুসলমান নহে। সুতরাং গ্রীকজাতি সমূহ পূর্ব্বকালে যে যবন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই যবনেরা বহুকাল হইতে ভারতে যাতায়াত করিত। এক্ষণে মিসরের কথা।

এই যবনেরা যাহাকে ইজিপ্ট বলিত,তাহার প্রকৃত নাম মিসর ছিল। ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন, ইজিপ্টের হিব্রু নাম Mizraim. মিজ্‌রেমের অর্থ মিসরদ্বয়। কারণ,পূর্ব্বে মিশর দেশ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—উচ্চ এবং নিম্ন মিসর। রাজা Menes এর সময় উক্ত রাজ্যদ্বয় একচ্ছত্র হইয়া মিজরেম নাম ধারণ করিয়াছিল। বাইবেলে হিব্রু ভাষায় এই মিজরেমের কথাই উল্লেখ আছে। এই দেখুন Bunsen কি বলিতেছেন :—

"The Mythological System which we meet with at the first dawn of the empire of Menes, owes its existence therefore, in the primeval time, to the amalgamation of the religion of Upper and Lower Egypt. This however means nothing more than that it originated in the same manner as the empire of Menes, which owed its existence to the union of two *Misr*, by which process it became Mizraim and took its place in history."

অন্যত্র :—

"The Hebrew name of Egypt, Mizaim *i. e.* the two Misr, contains a similar allusion."

যে গ্রীকজাতি মিসরের নাম ইজিপ্ট দিয়াছিল, হিব্রুবাইবেল গ্রীকভাষায় অনুবাদ সময়ে তাহারাই মিসরকে ইজিপ্ট নামে অভিহিত করিয়াছেন। হোমরের সময় হইতেই মিসর দেশের নাম ইজিপ্ট হইয়াছিল। Odysseyর চতুর্থ সর্গে মেনেলিয়সের বৃত্তান্তে প্রতীত হয় যে, হেলেন যখন প্যারিসের সঙ্গে সমুদ্র দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি এক প্রবল ঝটিকাঘাতে নীল নদের ধারে আনীত হন। তখন সেই নদের নাম ইজিপ্টস Egyptus বা স্বর্ণদী ছিল। তদবধি সেইদেশ ইজিপ্ট বলিয়া হোমর এবং গ্রীক জাতির নিকট পরিচিত হয়। গ্রীকবিদ্যার প্রচারের সহিত ইউরোপময় মিসর ইজিপ্ট নামেই প্রসিদ্ধ হয়।

হিব্রুভাষায় মিসর (Misr) নাম যেমন প্রসিদ্ধ, প্রাচীন আরব গ্রন্থেও তেমনি। সেই মিসর নামেই ইজিপ্ট উক্ত হইয়াছে। সেই জন্য মুসলমান রাজত্ব কালে ভারতেও ইজিপ্ট, মিসর বলিয়াই পরিচিত হইয়াছে। সেইদেশ হইতে যে দ্রব্য ভারতে আনীত হইত, তাহার নাম আজিও "মিস্‌রী" (মিশ্রী) রহিয়াছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের শুধু যে ধনগৌরব দেশবিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, এমত নহে, জ্ঞানেও তাহার যশসৌরভ চারিদিক বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহুদীজাতীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী নৃপতি এজন্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন:—

"The wisdom of all the children of the East country."—I. Kings—IV—30.

ধন, মান ও জ্ঞানে ভারত তখন অদ্বিতীয়। তাই সেই যশে আকৃষ্ট হইয়া প্রসিদ্ধ মিসর সম্রাট ওসিরিস (Osiris) দিগ্বিজয় কালীন ভারতে আসিয়াছিলেন। তথায় তিনি নাইসা (Nysa) নামক রাজ্য স্থাপন করিয়া যান। এই দেখুন ইতিহাসবেত্তা কি বলেন:—

"In India he (Osiris) built Nysa in honour of Nysa in Arabia, not far from Egypt, where, as the heir of Zeus, he had received an education conformable to his rank."—Bunsen.

সম্ভবতঃ এই নাইসা নগরই যবনরাজ্য; কারণ, সেকালে কি আরব, কি গ্রীক, কি মিসরবাসী সকলেই এক যবননামে অভিহিত হইত। আমরা বিষ্ণুপুরাণেও দেখিতে পাই, পুরুবংশে আটজন যবনরাজ হইয়াছিলেন।

"ততঃ ষোড়শ শকাভূভুজোভবিতারঃ। ততশ্চ অষ্টৌযবনাঃ।"

বিষ্ণুপুরাণ—৪র্থ অংশ—১৪অ-১৪।

অনন্তর ষোলজন শকবংশীয়, তৎপরে আটজন যবনরাজা হইবে।

এস্থলে বোধ হয়, ওসিরিস-প্রতিষ্ঠিত যবন নগরের কথারই উল্লেখ হইয়া থাকিবে।

সে যাহা হউক, যে সময় হইতে ভারতে যবনেরা আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে সময়ে ভারত ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, বীর্য্য ও জ্ঞানে সম্পন্ন হইয়া সভ্যতার চূড়ান্ত শিখরে উঠিয়াছিল। বিদেশিগণ ভারতে আসিলেই তাহার এই সভ্যতায় আকৃষ্ট হইত। কারণ, ভারতে সকলই নূতন; তাহার লোক সমাজ নূতন ধরণে গঠিত; তাহার আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, পূজা পদ্ধতি—সকলই বিদেশীর চক্ষে নূতন। সেই পুরাতন জনসমাজে নূতন কথা ও ধর্ম্মের নূতন মত অনেক শুনা যাইত। জন্মান্তরবাদ, অদৃষ্টবাদ, কর্ম্মফলবাদ, প্রভৃতি বৈদিক মত এবং হিন্দু দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, সকলই বিদেশিগণের চক্ষে নূতন ও বিস্ময়কর। যাহা কেহ কখন শুনে নাই, যাহা শুনিতে অতি মধুর, তাহা ভারতে ছিল। মহা মহা মুনি ঋষি ও যোগিগণ

সনাতন আর্য্যধর্ম্মকে অতি মনোহর বেশে এবং পবিত্র মূর্ত্তিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত দেখিয়া কোন্ বিদেশী না মোহিত হইবে? বিশেষতঃ তখনকার কালে ধর্ম্মানুষ্ঠান অনেকেই সাত্ত্বিকভাবে করিতেন। এখনকার মত প্রাণশূন্য বাহ্যাড়ম্বর ও রাজসিক ব্যবহারের তত গৌরব বৃদ্ধি হয় নাই। সুতরাং সেই পূজা পদ্ধতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে মোহিত হইয়া যবনেরা, আরব এবং মিসরবাসিগণ তাহাদিগকে স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। ওসিরিস ভারত হইতে গিয়া স্বদেশে মিসর ধর্ম্মের সূত্রপাত করেন। তাই পুরাতন মিসর, আরব এবং গ্রীসদেশে ভারতীয় পৌরাণিক ধর্ম্মতন্ত্রের (Mythology) প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ভারতে যেমন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ প্রধান জাতি ছিলেন, গ্রোট বলেন, মিসরেও তদ্রূপ পুরোহিত এবং রণদক্ষ জাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। তৎপরে ব্যবসাবলম্বী বৈশ্যজাতি। ধর্ম্মের তুলনা করার এস্থান নহে, নহিলে আমরা দেখাইতে পারিতাম, পুরাতন আরব, গ্রীস ও মিসরীয় ধর্ম্মতন্ত্রের সহিত ভারতীয় পৌরাণিক ধর্ম্মতন্ত্রের কতদূর সাদৃশ্য।

ভারতীয় সভ্যতা যত প্রাচীন, গ্রীস ও মিসরীয় সভ্যতা তত নহে। এই দেখুন, জর্ম্মন দার্শনিক Frederick Schlegel এর মত কিঃ—

> "The Egyptian problem seemed at last to be solved. The civilzation of Egypt was derived from Meroe (Ethiopia) that of Meroe incotestably from India."
>
> Baron Bunsen.

ইথিয়োপিয়ার সভ্যতা যখন ভারতীয় সভ্যতা হইতে সমুৎপন্ন এবং ইথিয়োপীয় সভ্যতাই মিসরীয় সভ্যতা রূপে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা যে, কোথা হইতে আসিল, এ প্রশ্নের সমাধান হইতে আর বাকী রহিল না।

জনশ্রুতি প্রাচীন ইতিবৃত্তের প্রধান উপকরণ। এই জনশ্রুতি অনুসারে Diodorus Siculus প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ মিসরের ইতিহাস সংগ্রহ করেন। সেই ইতিহাসের গণনায় প্রতিপন্ন যে, মিসরীয় সভ্যতাও অত্যন্ত প্রাচীন—ভারতীয় সভ্যতার মতই প্রাচীন। কিন্তু Bunsen দেখাইয়াছেন যে, মিসরবাসিগণের বর্ষগণনা স্বতন্ত্র ছিল। সৌর ও চান্দ্রমাস ধরিয়া প্রাচীন মিসরে বর্ষগণনা হইত না। তথায় ঋতুপরিবর্ত্তনে যেমন নীলনদের মূর্ত্তিভেদ হইত, সেই মূর্ত্তিভেদ ধরিয়া কালনির্ণয় হইত। সুতরাং ঋতু পরিবর্ত্তন অনুসারে মিসরে বর্ষগণনা হইত। আমাদের যাহা একবৎসর, মিসরগণের তাহা দশ বৎসর। এইরূপে মিসরীয় সভ্যতা অত্যন্ত প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মিসরের বর্ষগণনা হইতে দশক বাদ দিলে আর তত প্রাচীন বোধ হইবে না। ঐতিহাসিক Bunsen এর প্রমাণ পদ্ধতি এত বিস্তৃত যে, তাহা এস্থানে ব্যাখ্যাত হইতে পারে না।

সে যাহা হউক, মিসরে যখন ভারতীয় ধর্ম্মতন্ত্রের অনুরূপ ধর্ম্মতন্ত্র প্রচলিত, তখন জুডিয়ার অনেক অগ্রগণ্য লোক মিসরে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। সেই সময় মোসেস (Moses) মিসর-ধর্ম্মে বিশিষ্টরূপে শিক্ষিত হন। তৎপরে তিনি মিসর হইতে স্বদেশবাসিগণকে লইয়া কেমন করিয়া তথা হইতে পলাইয়া আসেন, তাহা তৎকৃত প্রাচীন বাইবেলেই বিবৃত হইয়াছে। স্বদেশে আসিয়া তিনি ইহুদী-ধর্ম্মের পত্তনস্বরূপ পুরাতন বাইবেলের প্রথম পাঁচখানি ধর্ম্ম-গ্রন্থ লিখিয়া যান। তাহাই চিরকাল ইহুদীধর্ম্মে Law বলিয়া সম্মানিত ও অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। মোসেসের প্রসিদ্ধ দশ-আজ্ঞা (Ten

Commandments) মিসর ধর্ম্মের বিয়াল্লিশ আজ্ঞারই সারসংগ্রহ। নিজে পাদ্রী Hoare সাহেব তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, মিসর ধর্ম্মের সার-গর্ভ উপদেশ সকল ইহুদী ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি *। মিসরধর্ম্ম যখন ভারতীয় মূল বৈদিক ধর্ম্ম হইতে সমুত্থিত, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, পরম্পরা সম্বন্ধে পুরাতন বাইবেলের ভিত্তি-ভূমি ভারতীয় ধর্ম্মের উপর স্থাপিত। এক মাত্র বৈদিক ধর্ম্মই মূল ধর্ম্ম; অপরাপর সমস্ত ধর্ম্ম তাহারই শাখা মাত্র। মতামত সকল পর্য্যালোচনায়ও একথার যাথার্থ্য প্রতি-পাদিত হয়।

মোসেসের পঞ্চ গ্রন্থ হইতে সমুদায় পুরাতন বাইবেলের সৃষ্টি; অন্যান্য গ্রন্থাবলী তাহারই বিস্তার মাত্র। হিন্দুধর্ম্মের দেব দেবীর অর্চ্চনা পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া যেমন হিন্দু-ধর্ম্মের শাখা বৌদ্ধধর্ম্মের স্বতন্ত্রতা ও সৃষ্টি, মিসর ধর্ম্মের দেব দেবীর পূজা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তেমনি মোসেসের ধর্ম্ম প্রণালীর স্বতন্ত্রতা ও সৃষ্টি। হিন্দুধর্ম্মের ভক্তি-পথের রস গ্রাহী হওয়া সহজ কথা নহে; এজন্য সকলে তাহার মর্ম্মভেদ করিতে সমর্থ হয়েন না। অনেকে স্বর্গের সোপানকে স্বর্গ বলিতে চান না, এজন্য দেব দেবীর উপাসনাকে অলীক বলিয়া জ্ঞান করেন। মোসেস এইরূপ ভ্রান্তি-তে পতিত হইয়া মিসর ধর্ম্মের দেব-দেবীর উপাসনা-পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম জ্ঞানমূলক; সেই জ্ঞান মিসরধর্ম্মে প্রতিভাত হয় নাই, এমত নহে। কারণ, মোসেসের ধর্ম্মতন্ত্রেও তাহার পরিচয় আছে। এই জ্ঞান দ্বিবিধ—ঐন্দ্রিয়িক বা মায়িক জ্ঞান এবং পরম বা অধ্যাত্ম জ্ঞান। মোসেসের ধর্ম্মতন্ত্রে আমরা যে Paradise এর আভাস পাই, তাহাতেই এই দ্বিবিধ জ্ঞানের বিলক্ষণ নিদর্শন দেখিতে পাই। যে জ্ঞান পাপপুণ্যবিরহিত, যাহা মনুষ্যের দেবত্ব, দেবতার সহিত যাহার ঘনিষ্টতা, সেই জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া এডাম এবং ইভ সৃষ্ট হইলেন। যত দিন এডাম এবং ইভ এই জ্ঞানে জ্ঞানী, তত দিন তাহাদের আনন্দ-সম্ভোগ (Paradise ভোগ)। সেই জ্ঞান-সম্পন্ন এডাম এবং ইভের পাপ নাই পুণ্য নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, শত্রুতা নাই, মিত্রতা নাই, কেবলই দেবত্বের আনন্দ, ভোগ। কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফলাস্বাদন করিয়া যখন তাহাদিগের মায়িক জ্ঞান জন্মিল, তখন তাহাদের অন্তরে ভেদজ্ঞান সঞ্জাত হইল। এই ভেদজ্ঞান সঞ্জাত হওয়াতে ইভ লজ্জাবস্ত্র গ্রহণ করিয়া আপনার নগ্নতা আবৃত করিলেন।

মোসেসের ধর্ম্মে পরমজ্ঞানকে Innocence বলিয়াছে; তাহার কারণ এই, অন্যে ভেদ-জ্ঞানরহিত পরমজ্ঞানীকে জ্ঞানশূন্য মূঢ় বলি-য়াই বোধ করে। ব্রহ্মদর্শী শুকদেব এইরূপ অন্য কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভা-গবত হইতে শুকদেবের বৃত্তান্ত পড়িলে মোসে-সের Paradise এর অর্থ বিশদ হইয়া আসিবে।

"শুকদেব পরমযোগী, ব্রহ্মদর্শী ও ভেদজ্ঞানবিহীন। তাঁহার বুদ্ধি একমাত্র পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কোন বিষয়েই ধাবিত হইত না। তিনি মায়ানিদ্রায় আচ্ছন্ন নহেন, সেই জন্য অন্যে তাঁহাকে জ্ঞানশূন্য মূঢ় বলিয়া বোধ করে। শুনিয়াছি, যে সময়ে তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া উলঙ্গবেশে বনগমন করেন, তৎকালে পথি-পার্শ্বস্থ কোন সরোবরে কতকগুলি অপ্সরা ক্রীড়া করিতে-

* See "Religion of the Ancient Egyptians" in the Nineteenth Century, December 1878, by the Reverend John Newnham Hoare.

ছিল। নগ্ন শুকদেবকে দেখিয়া তাহারা কিছুমাত্র লজ্জিত হয় নাই। কিন্তু যখন ব্যাসদেব পুত্রের অনুসরণ ক্রমে পরক্ষণেই সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সুরকামিনীগণ উত্থান পূর্ব্বক আস্তে ব্যস্তে নিজ নিজ বসন পরিধান করিল। মহর্ষি তাহাতে বিস্মিত হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ বিচিত্র আচরণের কারণ কি? তোমরা শুককে উলঙ্গ দেখিয়া সঙ্কুচিত হইলে না; কিন্তু আমাকে বসনাবৃত দেখিয়াও লজ্জিত হইলে? তাহারা উত্তর করিল, ঋষে, আপনার স্ত্রীপুরুষ বলিয়া ভেদজ্ঞান আছে; কিন্তু আপনার পুত্র শুকের তাহা নাই। আপনার ভেদজ্ঞান থাকাতে আপনি বসনাবৃত হইয়াছেন এবং আমরাও আপনাকে দেখিয়া বসনাবৃত হইলাম"।

হিন্দুধর্ম্মের এইরূপ ভেদজ্ঞানরাহিত্যই Innocence। যখন এই চরমাবস্থায় মনুষ্য উপনীত হয়, তখন তাহার পাপপুণ্য ও কর্ম্মের ফলাফল বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই তাহার মুক্তাবস্থা। এইরূপ মুক্তাবস্থাই মোসেসের Paradise এবং এড্যাম ও ইভের Innocence. কিন্তু মানবের যতক্ষণ ভেদজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ তাহার অহংজ্ঞান বর্ত্তমান। এই অহংজ্ঞান লইয়া আত্মার জীবত্ব। প্রধানা-প্রকৃতি বা অনন্ত মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব সমুদ্ভূত। অহঙ্কারতত্ত্বই অনন্ত প্রকৃতি হইতে জীবের জীবত্ব দান করে। জীব-সৃষ্টি হইতে সুতরাং অহঙ্কারের সৃষ্টি? অহঙ্কারের সৃষ্টি হইতে মায়াজ্ঞান ও পাপপুণ্যের সৃষ্টি। এই সৃষ্টি-রহস্যকে মোসেসের ধর্ম্মে এড্যামএবং ইভের পতন বলিয়া প্রতীত হয়; তাহাই আধুনিক খ্রীষ্টধর্ম্মে Doctrine of original sin বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যখন জীব সাধনাবলে পাপপুণ্যের ফলাফল হইতে মুক্তিলাভ করে, তখনই তাহার সংসারে যাতায়াত ঘুচে, তাহার জীবত্বের মোচন হয়; জীব তখন মুক্ত। বৈদিক ধর্ম্মের মুক্তিবাদ মিসর ধর্ম্ম দিয়া ইহুদী ধর্ম্মে, এবং ইহুদী ধর্ম্ম দিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে গিয়া তাহা যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা দেখাইলাম। বৈদিক মূলতত্ত্ব ঠিক একই আছে। বুঝিবার দোষে তাহা অন্য রূপ ধারণ করিয়াছে।

মোসেস এইরূপ অনেক বৈদিক তত্ত্ব মিসর ধর্ম্ম হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া স্বপ্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থাবলিতে প্রবিষ্ট করিয়াছেন। তিনি দেবদেবীর অর্চ্চনা গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু সেই দেবদেবীর অর্চ্চনা মধ্যে যে মানসিক সূক্ষ্ম সাকার উপাসনা আছে, মোসেস তাহা গ্রহণ করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম প্রণালীতে সমাবিষ্ট করিয়াছেন। কালক্রমে মোসেসের ধর্ম্ম যখন বাহ্যাড়ম্বরপরিপূর্ণ হইয়া প্রাণশূন্য হইল, তখন সেই ধর্ম্মে প্রাণ সঞ্চার করিবার জন্য একজন ধর্ম্মসংস্কারকের প্রয়োজন হইল। ইহুদী ধর্ম্মে যিনি নূতন জীবিত-ভাব দিয়া তাহাকে নূতন আকারে দেখাইয়াছেন, তাহার নাম যীশু। তিনি নূতন-ভাব সঞ্চারিত করিয়া ইহুদী ধর্ম্মের যে নূতন আকার দিয়াছেন, তাহাই নূতন বাইবেলের বিষয়। কিন্তু যীশুর এই সঞ্জীবনী শক্তিও যে বৈদিকধর্ম্ম প্রণোদিত, তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শন করিতেছি।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

বিদেশী বাঙ্গালী। (২)

সনাতন গোস্বামী।

দিল্লীর মুসলমান সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আওরাঙ্গজেব্ যখন হিন্দুর হিন্দুত্ব নাশের ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, ঠিক যে সময়ে মধ্য-ভারতে মহারাষ্ট্রীয়গণ একত্র হইয়া ভারতভূমি হইতে ম্লেচ্ছ মুসলমানের নাম নিশান পর্য্যন্ত লোপ করিয়া, আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের প্রস্তাব করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে,পশ্চিমোত্তর প্রদেশের অন্তর্গত মথুরার যমুনাতটস্থিত এক পর্ণ কুটীরে বসিয়া বাঙ্গালী বৈরাগী সনাতন গোস্বামী, ভারতে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম স্থাপন, হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা এবং মুসলমান অত্যাচারের নাশ জন্য, হিন্দু-সমাজাগ্রগণ্যদিগকে ডাকাইয়া আপনার সঙ্কল্পিত সাধু উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য প্রয়াস পাইতেছিলেন। কিন্তু সেই মহান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইতে হইতেই, দিল্লী হইতে আওরঙ্গজেব-প্রমুখ যবন-সেনা মথুরায় আসিয়া পৌঁছিল, দলে বলে মথুরা, বৃন্দাবন এবং সমগ্র ব্রজধামকে ছাইয়া ফেলিল। বলা বাহুল্য, এই ঘটনার কয়েক বর্ষ পূর্ব্ব হইতে সনাতন গোস্বামী মথুরায় যাইয়া বাস করিতেছিলেন।

যবনসেনা মথুরা লুণ্ঠন করিল, অসংখ্য হিন্দুরমণীর সতীত্ব হরণ করিল, অগণ্য হিন্দু-শিশুকে তরবারীর আঘাতে যমসদনে প্রেরণ করিল, বহু হিন্দুকে 'লাইল্লা' পড়াইয়া তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুসলমান করিল,সহস্রাধিক হিন্দুদেবমূর্ত্তি চূর্ণীকৃত হইল, হিন্দুগ্রন্থাদি অনলকুণ্ডে অদৃশ্য হইল এবং নগরের পার্শ্বে ও মধ্য দেশে যবনমসজিদ নির্ম্মিত ও স্থাপিত হইল। বাঙ্গালী বৈরাগী সনাতন গোস্বামী দেখিলেন, তাঁহার কোনও উদ্দেশ্যই সংসাধিত হইল না। তিনি মেরু (বর্ত্তমান নাম হাট্রাশ্ রেলওয়ে ষ্টেশন) নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। ঐ নগর এখনও বর্ত্তমান; এক্ষণে হাট্রাশ দুই ভাগে বিভক্ত। এক অংশ, হাট্রাশ সহর; অপর অংশ হাট্রাশ জংশন। পূর্ব্বে এই নগরে স্বাধীন হিন্দুরাজা থাকিতেন, তাঁহার এক বিশাল মৃণ্ময় দুর্গ ছিল, ঐ দুর্গের ভগ্নাংশ এখনও বর্ত্তমান। (মথুরা হইতে হাট্রাশ দুই দিনের পথ) এখানকার রাজাকে স্ব বশে আনিয়া সনাতন গোস্বামী মথুরাপ্লাবিত যবনের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করিলেন, কিন্তু সে ষড়যন্ত্র কার্য্যে পরিণত হইল না, মুসলমানেরা আপনা হইতেই স্বল্পকাল মধ্যে দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

মথুরা যখন লুণ্ঠিত হইতেছিল, সেই সময়ে মথুরার "শ্রীগোবিন্দ" "শ্রীগোপীনাথ" এবং "শ্রীমদনমোহন" এই তিনটি প্রধান হিন্দু দেবমূর্ত্তি ছিল। এতন্মধ্যে শ্রীগোবিন্দ-মূর্ত্তিকে হিন্দুরা অত্যন্ত ভক্তি করিত এবং ইহাকেই প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি বলিয়া বিশ্বাস করিত। সনাতন গোস্বামী, এই তিনটি মূর্ত্তিকে যবন হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। কি প্রকারে তিনি এই মূর্ত্তিগুলিকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত ইতিবৃত্ত এখনও পাওয়া যায় না। প্রবাদ আছে, ঘোরতর রাজনৈতিক কৌশলে, তিনি এই তিন মূর্ত্তিকে যবন হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। মদন মোহন মূর্ত্তিকে তিনি কেরোলী নামক রাজ্যে

লইয়া যান এবং তথায় উহা স্থাপিত করেন। ঐ মূর্ত্তি তথায় এখনও বহুল সম্মানের সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছে। অপর দুই মূর্ত্তি জয়পুরে তিনি স্থাপনা করেন। বলা বাহুল্য, রাজপুতানা ভ্রমণকারী হিন্দু মাত্রেই ঐ দুই মূর্ত্তি অবশ্যই দর্শন করিয়া থাকিবেন।

আমরা প্রথমে শ্রীমদনমোহন মূর্ত্তির বিষয় বর্ণনা করিব। কেরোলীরাজ্য,ভরতপুর এবং জয়পুর রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত এবং চোলপুর রাজ্যের ইহা পার্শ্বস্থিত। রাজপুতানার মধ্যে ইহা এক সম্মানিত দেশীয়রাজ্য। হিণ্ডন্ রোড্ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কেরোলীরাজ্য প্রায় ২১ ক্রোশ দূর। সনাতন গোস্বামীর এস্থানে আসিবার পূর্ব্বে, মাংস ভক্ষণ, সুরাপান প্রভৃতি ক্রিয়ায় এখানকার লোকেরা দ্বিতীয় জগাই মাধাই বলিয়াই পরিগণিত হইত। রাজা ক্ষত্রিয়; শিকার করা,পশুবধকরা, সুরাপান করা, মাংস ভক্ষণকরা, তাঁহার বর্ণোচিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ছিল না। প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম অথবা ধর্ম্মনীতি কাহাকে বলে, রাজাধিরাজ হইতে কৃষক পর্য্যন্ত কেহই জানিত না। ঠিক এই সময়ে সনাতন গোস্বামী আসিয়া কেরোলীতে পদার্পণ করিলেন। সংক্ষেপে বলিতেছি, তাঁহার চরিত্র বলে, অমিত বিদ্যাবলে, প্রগাঢ় জ্ঞানগর্ভ বিচার বলে, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান বলে,কেরোলীর মহারাজা, সুতরাং তৎসঙ্গে তাঁহার সমগ্র অমাত্যবর্গ এবং প্রজাগণ—বাঙ্গালী বৈরাগীর অটল ভক্ত হইয়া উঠিলেন। সনাতনের মদনমোহন কেরোলীতে স্থাপিত হইল। রাজা, লক্ষাধিক অর্থ ব্যয় করিয়া,অতি বিশাল,অতি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ঐ মন্দির এখনও বর্ত্তমান। রাজা ও রাজবংশ, ঐ মদনমোহনের শিষ্য হইলেন, অর্থাৎ শ্রীমদনমোহনকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন মন্দিরের ব্যয়ের জন্য লক্ষাধিক টাকার বার্ষিক "জায়গীর" নির্দ্দিষ্ট হইল; ঐ জায়গীর এখনও বর্ত্তমান। রাজা, ইচ্ছা করিলেও ঐ মৌরশী (চিরস্থায়ী) জায়গীর কাড়িয়া লইতে পারেন না। ক্রমে সমগ্র রাজ্য মদনমোহনের ভক্ত হইয়া উঠিল। শ্রীমদনমোহনকে এবং শ্রীসনাতন গোস্বামীকে, লোকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করিল। এইরূপে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও মূর্ত্তির স্থাপনা ক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া গেলে, তিনি আপনার সঙ্কল্পিত বৈষ্ণবধর্ম্ম স্থাপনের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। সে উদ্দেশ্যও ঈশ্বর পূর্ণ করিলেন। জগাই মাধাই প্রমুখ লোকেরা সংশোধিত হইল, রাজ্যে ধর্ম্মের শান্তি, প্রেমের উৎস, ভক্তির কোমলতা, সর্ব্বত্রই দেখা দিল। রাজা, নিজে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ক্রমে বৈষ্ণবের সংখ্যা বাড়িয়া উঠিল। এস্থলে বলা আবশ্যক, যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, মাংস বা বা পলাণ্ডু ভক্ষণ না করিলেই মহাবৈষ্ণব হয়, তাঁহারা কি মহা ভ্রান্ত!! সনাতন গোস্বামী, নিজে বৈষ্ণব কুলচূড়ামণি এবং গোস্বামী কুলাগ্রগণ্য হইয়াও কখনও রাজাকে বলেন নাই যে, "তুহি মাংস খাইওনা"। তিনি নিজে গোঁড়ামীর কখনই প্রশ্রয় দিতেন না; ইংরাজী বিজ্ঞান না শিখিয়াও তিনি এখনকার ইংরাজী বিজ্ঞানে শিক্ষিত,অথচ মহা কুসংস্কারসম্পন্ন নব্য যুবার ন্যায় কুসংস্কারাপন্ন ছিলেন না। প্রকৃত ধর্ম্ম তাঁহারাই জানিতেন; এখনকার ধর্ম্মধ্বজীতা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল। এখনকার ধর্ম্মালোচনা কেবল একটা সখের জিনিষ' মাত্র অথবা 'উদর পূরণ' করিবার একটা উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহার দৃষ্টান্ত জন্য কেবল সেই স্বার্থপর, বুদ্ধিহীন,

সময়-সেবী বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র খানার নাম লইলেই যথেষ্ট হইবে, যে সংবাদ পত্রের "হাড়ে হাড়ে স্বার্থ এবং প্রতি পেশী ও নাড়ীতে মন্দবুদ্ধি জড়িত হইয়া রহিয়াছে।" বম্বাই গেজেটের কোনও মহাজ্ঞানী পত্র প্রেরক উপরি উক্ত হতভাগ্য বাঙ্গালা সমাচার পত্রের এইরূপে গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, কেরোলীতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্থাপন এবং সংস্কৃত শিক্ষার আলোচনার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া, সনাতন গোস্বামীর চিত্ত আর একটি মহৎভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই মহাবৈষ্ণব রাজপুতানাবাসীর উন্নতিতেই কেবল ব্যস্ত ছিলেন না, স্বজাতীয় (বাঙ্গালার) উন্নতিতেও তিনি কখনও পৃষ্ঠপদ হয়েন নাই। বাঙ্গালীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা তাঁহার জীবনের এক মহামন্ত্র ছিল। রাজাকে হাতে পাইয়া তিনি এই মহামন্ত্রের আহুতি দিতে ইচ্ছা করিলেন। কেরোলীর রাজাকে তিনি বলিলেন, "শ্রীমদনমোহনের পূজা রাজপুতানার কোনও ব্রাহ্মণ দ্বারা হইতে পারিবে না। ইহা, অতি দুর্দ্দিনে, মহাকষ্টে, বাঙ্গালী কর্তৃক মথুরা হইতে কেরোলী নগরীতে আনীত হইয়াছে; ইহাকে এক প্রকার বঙ্গবাসীরই বিগ্রহ বলা যায়। সুতরাং, অদ্য হইতে আমি এই নিয়ম করিতে চাহি, যত দিন এই রাজ্যে এই মূর্ত্তি ও এই মন্দির বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন বাঙ্গালী বৈষ্ণব অথবা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রীমদনমোহনের মূর্ত্তির পূজা হইতে থাকিবে।" রাজাও তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন; কেবল মৌখিক প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহা নহে, প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। ঐ মন্দির মদনমোহন মূর্ত্তি, জায়গীর, স্থাবর—অস্থাবর জঙ্গম সমুদয় সম্পত্তি, আইনানুসারে, বাঙ্গালী পুরোহিতকে বংশাবলীক্রমে উৎসর্গীকৃত করা হইল। এখন পর্য্যন্ত ঐ মন্দিরের পুরোহিত বাঙ্গালী। কাহার সাধ্য যে, কেরোলী রাজ্য হইতে বাঙ্গালী পুরোহিতকে তাড়াইয়া দেয়? আজি যদি বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালী পুরোহিতকে দেশত্যাগী করেন, ইহা নিশ্চয় যে, সমগ্র কেরোলী হিন্দুসমাজ বিদ্রোহী হইয়া দণ্ডায়মান হইবে। এখন ভাবিয়া দেখ, একজন সর্ব্বত্যাগী বাঙ্গালী বৈরাগীর যত্নে, বীরপ্রসূ রাজপুতানার এক প্রবল হিন্দুরাজ্য দুর্ব্বল বাঙ্গালীর কেমন অদ্ভুত ক্ষমতা স্থাপিত হইয়াছে!! ভারতবর্ষ মধ্যে রাজপুতানার ন্যায় কোনও প্রদেশে ধর্ম্মের নামে লোক অধিকতর আন্দোলিত হয় না। শ্রীমদনমোহনের পুরোহিত সমগ্র কেরোলীর আধ্যাত্মিক গুরু ও পরামর্শ দাতা। তাহাতেই বলিতেছি, এক জন বিদেশী বাঙ্গালীর যত্নে রাজপুতানার কেমন বাঙ্গালী জাতির অতুল আধ্যাত্মিক ক্ষমতা জন্মিয়াছে, দেখিলে কি? এই আধ্যাত্মিক শক্তি, রাজনৈতিক শক্তির সহিত মিলিত হইয়া, রাজপুতানার অপর অংশে কেমন আর এক আশ্চর্য্য সুফল প্রসব করিয়াছে, তাহাও আমরা পরে দেখাইতেছি। ধন্য সনাতন গোস্বামী! ধন্য বৈষ্ণব কুলচূড়ামণি! প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম, যাহা ক্ষত্রিয় রাজাগণ কুরুক্ষেত্র সমর কালে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা তুমিই কলিযুগে, আদর্শ বাঙ্গালী ও আদর্শ বৈষ্ণবরূপে, রাজপুতানায় স্থাপন করিয়া সহস্রাধিক ক্রোশ দূরেও জননী জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছ। এখনকার ধর্ম্মধ্বজী ও মিথ্যাধর্ম্মান্দোলনকারী-হিন্দুকুলকলঙ্কদিগের জানা উচিত, কেবল বাবু বা ব্রাহ্মনিন্দা করিলেই ধর্ম্মান্দোলন হয় না; নিজের চরিত্র ও জ্ঞানবলে, সমাজের

অসচ্চরিত্রতা ও কুসংস্কারকে (সাধুসনাতন গোস্বামীর ন্যায়) যিনি অপনোদন করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম-সংস্থাপক। গোস্বামী বুঝিতেন, রাজনৈতিক শক্তি না জন্মিলে, ধর্ম্মসংস্থাপনের শক্তি জন্মিবে না। তাহাতেই তিনি সকল স্থলে রাজাকে প্রথমে হাতে করিয়া, প্রধান প্রধান গণ্য মান্য অধিবাসীকে বশীভূত করিয়া, ধর্ম্মস্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। স্বজাতিবৎসল, উদারচেতা, রাজনৈতিক কৌশলী অথচ ধর্ম্মাত্মা সনাতনের জীবনের অপর অংশ বর্ণনা করিবার সময়, সে কথা উত্তম রূপে বুঝাইব।

পাঠকদিগের বোধ হয় স্মরণ আছে, শ্রীগোপীনাথ এবং শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তিদ্বয়, সনাতনের নিকট এখনও যত্নে রক্ষিত। গোপীনাথ মূর্ত্তিটিকে তিনি যোধপুরে লইয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। এই সময়ে যোধপুরে এক ক্ষুদ্র সংগ্রাম চলিতেছিল, সুতরাং তথায় এই সময়ে যাইলে, কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে, ভাবিয়া, যোধপুরে তিনি যাইলেন না। জয়পুরে তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন। রাজপুতানার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দেশীয় রাজ্যে, তাঁহার বহু যত্নের রক্ষিত শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি স্থাপিত হইল। মথুরা লুণ্ঠিত হইয়াছে, হিন্দুমূর্ত্তি সমূহ চূর্ণীকৃত হইয়াছে, এ কথা জয়পুরের মহারাজা এবং তথাকার লোকেরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় শ্রীগোবিন্দ এবং শ্রীগোপীনাথ মূর্ত্তিকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন শুনিয়া, জয়পুরাধিপতি এবং তত্রত্য সমগ্র হিন্দু পরম পরিতোষ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এ স্থলে বলা আবশ্যক, আকবরের সময়ে যখন যশোহর হইতে সল্লাদেবী আনীতা হইয়াছিল, তখন আধুনিক জয়পুর নগর নির্ম্মিত হয় নাই। কিন্তু গোস্বামী মহাশয় যখন গোবিন্দ মূর্ত্তি লইয়া আইসেন, তখন জয়পুর সহর নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে এবং ধন ধান্যে লোকালয়ে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মহারাজা বাহাদুর, সনাতনের নিকট হইতে গোবিন্দ মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন এবং এই মূর্ত্তি কোথায় স্থাপন করিলেন, পাঠক জানিতে ইচ্ছা কর কি? রাজপ্রাসাদের সম্মুখেই এক রমণীয় উদ্যান, সেই উদ্যানের মধ্যভাগে এক মনোহর প্রস্তরময় মন্দির নির্ম্মিত হইল, এবং সেই মন্দিরে বাঙ্গালী সনাতনের গোবিন্দ মূর্ত্তি রক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হইল। ঐ মন্দির এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত এবং ঐ মূর্ত্তি ঐ মন্দির এরূপ ভাবে স্থাপিত যে, মহারাজা এবং মহারাণী প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গবাক্ষ খুলিলেই, তাঁহাদের মহারাধ্য শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয় এবং দৃষ্টিগোচর হইলেই রাজা ও রাণী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন; যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রভাতের প্রণাম না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাজা ও রাণীর স্নান ও আহার হয় না। সুতরাং প্রতি প্রভাতেই গোবিন্দমূর্ত্তিকে দর্শন করিতে হয়। ঐ মন্দির ৩ লক্ষ ৬২ সহস্র মুদ্রায় নির্ম্মিত, এবং ঐ মূর্ত্তির স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কার এবং হীরা, মণি প্রভৃতির মূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। ঐ মূর্ত্তি জয়পুরে 'গোবিন্দজী' বলিয়া বিখ্যাত। প্রকৃত প্রস্তাবে ইনিই জয়পুরের অর্দ্ধ শক্তি; প্রকৃত প্রস্তাবে ইনিই জয়পুরের রাজা। সে কথা পরে বলিব। ভাবিলেও, স্বজাতি মহিমায় হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে যে, এক এক জন কাঙ্গালী বাঙ্গালী বহু দূরদেশে যাইয়াও কি অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন!! ধন্য বাঙ্গালী জাতি!! কে বলে, বাঙ্গালীর আর ভরসা নাই? যে

বলে, সে অর্ব্বাচীন, সে অল্প বুদ্ধি। যে জাতি সনাতন গোস্বামীর জন্মদাতা, সে জাতি চিরকালই জগতের আরাধ্য, জগতের অনুকরণীয়।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে যে, শ্রীগোপীনাথ নামে আর একটি মূর্ত্তি, গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে ছিল। এই মূর্ত্তিটিকেও তিনি জয়পুরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। জয়পুর নগরের মধ্যভাগে, বাজারের মধ্যে, লোকালয়ের কোলাহলের মধ্যে, এই অত্যুচ্চ মহামন্দির আজিও মহাসম্মানের সহিত বর্ত্তমান। শ্রীগোবিন্দের মূর্ত্তির পরেই শ্রীগোপীনাথের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, গোস্বামী মহাশয় নিশ্চিন্ত হইলেন এবং অবসর পাইয়া অপরাপর দিকে আপনার চিত্তবৃত্তিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পাঠক মহাশয়ের সুবিধার জন্য, এস্থলে শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথের মূর্ত্তির প্রভাব সম্বন্ধে কিছু বলিয়া রাখি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জয়পুরের সমগ্র রাজবংশ, শ্রীগোবিন্দজী দেবের ভক্ত এবং শিষ্য। এক্ষণে এই বিগ্রহের প্রতি দিবসীয় খরচা, নিত্যব্যয়, প্রায় এক সহস্র টাকা। এতদ্ভিন্ন দেওয়ালী, হোলী, প্রভৃতি বড় বড় উৎসবের ব্যয় স্বতন্ত্র। দিবসে প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় এবং সায়াহ্নে প্রায় ৭টার সময় মন্দিরের দ্বার, সর্ব্ব সাধারণের দর্শনের জন্য, নিয়ম মত খোলা হয়। ঠিক ঐ সময়ে না যাইতে পারিলে, ঐ দিবস দর্শন হয় না। অসংখ্য লোক প্রতিদিন ঐ নিয়মিত সময়ে মন্দিরে উপস্থিত হইয়া থাকে এবং শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তিকে দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করে। একাদশী, দ্বাদশী, হোলী, দেওয়ালী, সোমিত্তি প্রভৃতি উৎসবে, মন্দিরে এত জনতা হয় যে, কাহার সাধ্য তথায় অক্ষতশরীরে প্রবেশ করিয়া বাহিরে আইসে? রাজাধিরাজ হইতে পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র কৃষাণ পর্য্যন্ত, গোবিন্দের নামে ভক্তিতে উচ্ছলিত হয়। গোবিন্দের নামে কাহাকে শপথ করাইলে, সে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারে না। কেননা এই নামের এমনই মাহাত্ম্য যে, জয়পুরের লোকেরা জানে, গোবিন্দের ক্রোধে সে ব্যক্তি সবংশে বিনাশ হইবে। জয়পুর নগর এবং জয়পুর রাজ্যের সমগ্র হিন্দু গোবিন্দের ভক্ত। রাজা এবং প্রধান প্রধান রেইসগণ (ক্ষমতাশালী ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ) গোবিন্দের শিষ্য। গোবিন্দকে দর্শন না করিয়া অনেকে আহার, স্নান, বিদেশ গমন অথবা শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না। শত শত রাজার রাজমুকুট গোবিন্দের পদারবিন্দে লুণ্ঠিত হইতেছে। জয়পুর রাজ্যের সমগ্র আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্দ্র—গোবিন্দের মন্দির। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ক্রিয়া, শাস্তি বিচার, প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের যাহা কিছু অঙ্গ, শ্রীগোবিন্দের মন্দিরে তাহার মীমাংসা না হইলে জয়পুরী বীরহিন্দু তাহা মানিবে না। মন্দিরের অনুজ্ঞা ও অভিমতি অকাট্য। রাজার সিংহাসন টলিয়া যাউক, ক্ষতি নাই, কিন্তু গোবিন্দের আদেশ অমান্য করে, কাহার সাধ্য? এখন ভাবিয়া দেখ, গোস্বামী মহাশয়ের যত্নে বঙ্গবাসীর কি অপূর্ব্ব সম্মান, কি অপূর্ব্ব ক্ষমতা, রাজপুতানায় স্থাপিত হইয়াছে!!

জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত খেৎড়ী, শিকোড়, সূরযপুরা প্রভৃতি কয়েকটি অতি প্রাচীন রাজ্য আছে। এগুলি হিন্দুরাজ্য এবং পুরাকাল হইতে প্রবল প্রতাপান্বিত কিন্তু আকারে ও আয়ে অবশ্য তুলনায় ক্ষুদ্র।

শ্রীগোপীনাথজী দেবের ইহারা ভক্ত ও শিষ্য। শ্রীগোবিন্দ দেব যখন জয়পুর রাজ্যের রাজা, উপরি উক্ত তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্যের শ্রীগোপীনাথজী দেবই অধিপতি। তাহা হইলেই দেখ, সমগ্র জয়পুর এবং জয়পুরে সম্মিলিত আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য একজন সর্ব্বত্যাগী বাঙ্গালী বৈরাগীর চরণতলে পতিত। রাজপুত বীরের যে হস্ত কোটি কোটি যবন বীরের মস্তককে দ্বিখণ্ড করিয়াছে, যে হস্ত কখনও বাদসাহের হস্তের সহিত মিলাইয়া করমর্দ্দনে প্রশ্রয় দেয় নাই, আজ সেই হস্ত এক জন দুর্ব্বল, ভিখারী, কাঙ্গালী বাঙ্গালীর চরণ স্পর্শ করিয়া কৃতকৃতার্থতা লাভ করিতেছে। ভাবিলেও রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়; সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে দেখিলে জাতীয় মহিমার গৌরবে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

একথা বলা বাহুল্য, কেরোলীর রাজার ন্যায়, জয়পুরের মহারাজাও শ্রীগোবিন্দের জন্য জায়গীর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। খেৎড়ী প্রভৃতির রাজাও শ্রীগোপীনাথের মূর্ত্তির যথারীতি বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত জয়পুর রাজভাণ্ডার হইতেও এই বিগ্রহের ব্যয়ের জন্য প্রচুর অর্থ আসিয়া থাকে। গোস্বামী মহাশয় এই সকল রাজার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া লইয়াছেন যে, "যত কাল জয়পুর, খেৎড়ী, শিকড়, প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত শ্রীগোবিন্দ এবং শ্রীগোপীনাথের মূর্ত্তির পূজা বাঙ্গালী বৈষ্ণব বা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।" তদবধি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এবং বাঙ্গালী বৈষ্ণব দ্বারাই পূজাদি চলিয়া আসিতেছে। সমুদায় জায়গীর, স্থাবর—অস্থাবর—জঙ্গম সম্পত্তি প্রভৃতি বাঙ্গালীর হস্তেই ন্যস্ত। তদ্ব্যতীত যাহা কিছু আমদানী হয়, তাহার উপরে বাঙ্গালী পুরোহিতেরই সর্ব্বতোময় প্রভুত্ব ও অধিকার। ফল কথা, এই দুই মন্দিরে "বাঙ্গালী যাহা করিবে, তাহাই হইবে; যাহা বাঙ্গালীর অভিপ্রেত নহে, তাহা হইতে পারে না।"

এক্ষণে দেখা গেল, গুণাকর বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় (প্রথম প্রস্তাব দেখুন) অম্বর শৈলে সল্লাদেবী প্রতিষ্ঠিতা করিয়া বাঙ্গালী শক্তির যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, সনাতন গোস্বামীর আগমনে তাহা বিশাল তরুরূপে পরিণত হইল। রাজপুতানার ধর্ম্মশক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি; এই শক্তির নিকটে আর সকল শক্তিই হীণপ্রভঃ হইয়া যায়। বিদ্যাধরের ও সনাতনের চেষ্টায়, সমগ্র জয়পুর রাজ্যটিকে বাঙ্গালাজাতি যেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে টানিয়া রাখিয়াছে। শ্রীসল্লাদেবী, শ্রীগোবিন্দজী, শ্রীগোপীনাথজী প্রভৃতির পৌরহিত্য করার অর্থে স্পষ্টতঃ এই বুঝায় যে, "সমগ্র রাজ্যের আধ্যাত্মিক শক্তিকে একচেটিয়া (ইজারা অথবা Monopolise) করিয়া লওয়া।" যদি সমগ্র রাজ্যের আধ্যাত্মিক শক্তি (যাহাকে সাধারণ ভাষায় ধর্ম্মশক্তি বলে) তোমার হাতে রহিল, তাহা হইলে তোমার হাতে না রহিল কি? তুমি এই শক্তির সুন্দর ও ন্যায়তঃ প্রয়োগে, রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিদ্বয়ও একচেটিয়া করিয়া লইতে পার। অনেকবার জয়পুরে, বাঙ্গালী তাহা করিয়া লইয়াছে।

দুঃখের বিষয়, প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যাধর ও সনাতনের রাজপুতানার জীবনী সমালোচনা করিলে এক মহা প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া উঠে। কিন্তু সে অবসর আমাদের নাই, "নব্যভারতে"ও বোধকরি সে স্থান নাই। কেবল এই কথাটি পরিশেষে

দেখাইতে চাহি (এবং দেখাইয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিতে চাহি) যে, ইহাঁদের রাজপুতানায় আগমনে বাঙ্গালী জাতির কি প্রকারে উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

কেরোলীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেরোলীতে প্রায় তিনশত বৎসর হইতে বাঙ্গালীর গমনাগমন চলিতেছে। রাজকার্য্যে বাঙ্গালী, কৃষিকার্য্যে বাঙ্গালী, ব্যবসায়ে বাঙ্গালী, ধর্ম্ম কর্ম্মে বাঙ্গালী। এমন এক এক ঘর বাঙ্গালী কেরোলীতে আছেন, যাঁহারা সার্দ্ধ দুই শত বৎসর হইতে পুরুষানুক্রমে এস্থানে অবস্থান করিতেছেন। অম্বর, সঙ্গানীর, জয়পুর, খিৎড়ী, শিকোড় প্রভৃতি স্থানেও অসংখ্য বাঙ্গালী। জয়পুর রাজ্য ত এক্ষণে এক প্রকার বাঙ্গালী উপনিবেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে তিনশত বৎসরের গৃহস্থ, এমন ৩০ জন বাঙ্গালী পাওয়া যায়। ৫ পুরুষ, ৭ পুরুষ, ১০ পুরুষ হইয়া গিয়াছে, এমন বাঙ্গালী, এখানে প্রায় ৫০ ঘর। বাঙ্গালা ভাষা বুঝেনা, পরিচ্ছদ মাড়োয়ারীর মত, অথচ বাঙ্গালীকুলে জন্ম—নামটি কেবল বাঙ্গালী নাম—এমন বাঙ্গালী এখানে আমি ২২ জন দেখিয়াছি। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুতানায় বাঙ্গালী ৩৭৮ জন।

জয়পুর রাজ্যে এখন একবার বাঙ্গালীর প্রভুত্ব শুনিয়া মোহিত হইয়া যাও। জয়পুরের শিক্ষা বিভাগ বাঙ্গালীর হস্তে; কলেজটি বাঙ্গালীর দ্বারাই স্থাপিত, প্রিন্সীপাল মহাশয় বাঙ্গালী, প্রধান প্রধান অধ্যাপক বাঙ্গালী। দেওয়ানী বিভাগ বাঙ্গালীর হস্তে ন্যস্ত। পূর্ব্বে বাবু হরিমোহন সেন মহাশয় দেওয়ান ছিলেন। এক্ষণে তাঁহারই পুত্র বাবু মহেন্দ্রনাথ সেন (৺ মহাত্মা কেশব বাবুর ভ্রাতা) দেওয়ানী বিভাগ চালাইতেছেন। বাবু হারাণচন্দ্র মুন্সেফ্। চিকিৎসা বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশীয় অমাত্য বাবু যদুনাথ দে। মিউনিসিপালীটীর প্রধান কর্ম্মচারীও বাঙ্গালী। ধর্ম্ম বিভাগের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ষ্টাম্প কার্য্যের কর্ত্তাও বঙ্গবাসী। যে দিকে যাও, বাঙ্গালীকেই দেখিবে। মহারাজার শিক্ষক বাঙ্গালী ছিলেন। মহারাজার বর্ত্তমান প্রাইভেট্ সেক্রেটরী বাঙ্গালী ভদ্রলোক। কিন্তু সমগ্র রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা কেহ জানেন কি? জয়পুরে তাঁহার অতুল প্রভুত্ব, অমিত প্রভাব, অসাধারণ রাজনৈতিক কৌশল দেখিয়া, "বাঘে ছাগে একঘাটে জল খায়"। ইঁহার নাম রায় বাহাদুর বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সি, আই, ই। সত্য কথা বলিতে হইলে, ইনিই জয়পুরের রাজা, ইনি যাহা করেন, রাজার তাহাই গ্রাহ্য হয়। কাহার সাধ্য, ইঁহার অনুজ্ঞা ও অভিমতকে টলাইয়া দেয়? জয়পুরে বাঙ্গালীর এই ক্ষমতার মূল, বিদ্যাধর ও সনাতন গোস্বামী।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড়নগর। (৫)

পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষ।

বাইশহাজারীদর্গা।—মালদহ হইতে দিনাজপুরের রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে প্রথমতঃ বাইশ হাজারী দর্গা-দ্বার ও তাহার অনতিদূরে এই দর্গা অবস্থিত। এই দর্গা সাহজালাল উদ্দিন-নামক একজন প্রসিদ্ধ পীরের নামে অভিহিত হয়। বস্তুতঃ ইহা তাঁহার সমাধিস্থান

নহে, কারণ এদেশে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। মুসলমান অধিকারের প্রাকালে সাহজালাল-উদ্দিন একজন বিখ্যাত পীর ছিলেন। পারস্যের অন্তর্গত তাব্রিজ নগরে তাঁহার জন্ম হয় ও ১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেখ শুভোদয় নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে,রাজা লক্ষ্মণসেনের সময়ে সাহজালালউদ্দীন এদেশে আগমন করেন। লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে সাতিশয় সমাদর করিতেন এবং তিনিই পাণ্ডুয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রাম তাঁহাকে পীরোত্তর স্বরূপ প্রদান করেন। এই দর্গা একটী মস্‌জিদে অবস্থিত। এই মস্‌জিদ ১০৭৫ হিজরীতে (১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে) চাঁদখাঁর দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইহার রক্ষার জন্য ২২ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি আছে। এই স্থানে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে একটী মেলা হইয়া থাকে। তাহাতে প্রায় ৫।৬ হাজার মুসলমানের সমাগম হয়। এই মস্‌জিদের মধ্যে দুইখানি অতি জীর্ণ হস্তলিখিত পুস্তক আছে। উভয় খানিই সেখ শুভোদয় গ্রন্থের অনুলিপি,কিন্তু এত জীর্ণ যে, পাঠোদ্ধার হয় না। মালদহ জিলার অন্তর্গত ভাইয়োভিকাহ নামক গ্রামের রায় বংশের পূর্ব্ব পুরুষগণ এক সময়ে এই দর্গার সম্পত্তির মতোলী বা কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। এই রায় মহাশয়দিগের বাটীতে এই পুস্তকের এক খানি অনুলিপি আছে। উক্ত রায় বংশের কিঙ্কর নারায়ণ রায় নামক কেবল পূর্ব্বপুরুষের সময় এই পুস্তক লিখিত হয় বলিয়া বোধ হয়। এরূপ প্রবাদ আছে যে, যে সময়ে ঢাকার রাজধানী হইতে পাণ্ডুয়ার ২২ হাজারী ও ছয় হাজারী দর্গার নিষ্কর ভূমির দান কর্ত্তার ও দান পত্রের অনুসন্ধান হইয়াছিল, সেই সময়ে উক্ত বিষয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ এই গ্রন্থ খানিকে উপস্থাপিত করেন। প্রবাদ আছে যে,ইহা গঙ্গা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল। ফলতঃ সেই সময়েই এই গ্রন্থ জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থখানি ২৭ অধ্যায়ে বিভক্ত। কোন কোন অধ্যায় অসম্ভব উপন্যাসে পরিপূর্ণ। ইহা লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধের রচিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ভাষা ও রচনা এরূপ অশুদ্ধ সংস্কৃতে পরিপূর্ণ যে,কিছুতেই হালায়ুধের রচনা বলিয়া বোধ হয় না। গ্রন্থে সময় নির্দ্দেশক যে সকল শাক লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ভ্রম নাই। লোক পরম্পরায় ও বংশ পরম্পরায় যে সকল উপাখ্যান ও শ্লোক চলিয়া আসিতেছিল, তাহাই ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থের সারমর্ম্ম এই যে, ৬০৮ হিজরীতে লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব সময়ে,মকদমসাহ জালালউদ্দীন নামক এক দরবেশ গৌড়ে আগমন করেন। লক্ষ্মণসেন তাঁহার অলৌকিক কার্য্যকলাপে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কতকগুলি গ্রাম নিষ্কর প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে রাজা ও দরবেশ উভয়েই আপন আপন বংশের পরিচয় প্রদান করেন।

ছয় হাজারী দর্গা।—২২ হাজারী দর্গার কিঞ্চিৎ উত্তরে নূরকুতুব নামক পীরের এই দর্গা অবস্থিত। ইহার নিকটে একটী ছোট মস্‌জিদের মধ্যে তাহার সমাধিস্থান। চতুর্দ্দিকে আরও কতকগুলি সমাধি আছে। ইহার প্রায় সিকি মাইল দূরে কুতুবের বাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার কোন কোন গৃহের ইষ্টকগুলি উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত।

পাণ্ডুয়ার সোনামস্‌জিদ।—পূর্ব্বোক্ত দর্গার কিছু উত্তরে এই মস্‌জিদ অবস্থিত। ইহা গ্রেনিট প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার উপরে ৯টী গুম্বজ আছে। ৯৯০ হিজরীতে (১৫৮৫

খ্রীষ্টাব্দে) এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়, ইহা এক্ষণে ভগ্নপ্রায়।

একলাখী মস্‌জিদ।—সোণা মস্‌জিদের কিছু উত্তরে এই মস্‌জিদ অবস্থিত। কথিত আছে যে,এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যভাগে সুলতান দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন ও তাহার দুই পুত্রের সমাধি আছে। ইহা আকারে একটী বর্গক্ষেত্রের ন্যায়। ইহার প্রত্যেক দিক্ ৮০ ফিট এবং উপরে একটী প্রকাণ্ড গুম্বজ; তাহার ভিতরের ব্যাস প্রায় ৩২ হাত। প্রাচীর প্রায় ৮ হাত প্রশস্ত। সম্মুখ দ্বারের উপরিভাগে এখনও একটী ভগ্ন বিষ্ণুমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

আদিনা মস্‌জিদ।—একলাখী মস্‌জিদের দুই মাইল উত্তর পূর্ব্বে দিনাজপুরের রাস্তার পূর্ব্বদিকে আদিনা নামক প্রসিদ্ধ মসজিদ। এই মস্‌জিদ গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট এবং ভারতবর্ষের মধ্যে পাঠান স্থপতি-বিদ্যার আদর্শ-স্বরূপ। ইহার আয়তন, উপাদান ও নির্ম্মাণ কার্য্য দর্শন করিলে চমৎকৃত ও মোহিত হইতে হয়। ইহার নিম্ন অর্দ্ধ কৃষ্ণবর্ণ মার্ব্বল প্রস্তরে এবং উপরের অর্দ্ধ ইষ্টক নির্ম্মিত। ফার্গুসন সাহেব বলেন যে, ইহার আকৃতি ও পরিমাণ ডামস্কস্ নগরের মস্‌জিদের ন্যায়। ইহা আকারে একটী প্রশস্ত আয়তক্ষেত্র, ৫০০ ফিট দীর্ঘ, ৩০০ ফিট প্রশস্ত এবং ৬২ ফিট উচ্চ। ইহার চতুর্দ্দিকেই খিলান ও গুম্বজযুক্ত গৃহ, মধ্যভাগ অনাবৃত। কথিত আছে যে, সমুদয়ে প্রায় ৪০০ গুম্বজ ছিল। ইহার অধিকাংশই পড়িয়া গিয়াছে, প্রায় ৪০ টী মাত্র গুম্বজ এক্ষণে দণ্ডায়মান আছে। পশ্চিম দিকের গৃহে ৫২৬ হাত উচ্চ মঞ্চের ন্যায় প্রস্তর নির্ম্মিত একটী উচ্চ আসন আছে। ইহাকে বাদসাহ কবতখ্‌ত বা সম্রাটের সিংহাসন কহে। এখানে বাদসাহ ও উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত অমাত্যবর্গ উপাসনা করিতেন। প্রাচীরের গাত্রে নানারূপ কারুকার্য্য ও কোরাণের শ্লোক খোদিত আছে। এই সিংহাসনের দক্ষিণ দিকে একটী উচ্চ বেদী আছে। এই বেদী হইতে ইমাম সকলকে উপদেশ দিতেন। বেদী ও তাহার উপরে উঠিবার সোপান কৃষ্ণবর্ণ মার্ব্বল প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার অনতিদূরে একটী সমাধি আছে। এই সমাধিটী বোধ হয় ধন লোভে খনিত হইয়াছিল, তৎপরে মেরামত করিয়া রাখা হইয়াছে। মেজর ফ্রাঙ্কলিন বলেন যে, ২৬০ টী স্তম্ভের উপর এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত ছিল; তন্মধ্যে ১৩০ টী তাঁহার সময়ে (১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে) বর্ত্তমান ছিল। তদুপরি বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত সুন্দর গুম্বজ সমূহ অবস্থিত ছিল। তিনি বলেন যে, এই অসাধারণ মস্‌জিদের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা লেখনীর অসাধ্য, চিত্রকরের তুলীর প্রয়োজন। এরূপ প্রকাণ্ড মস্‌জিদ বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কোন স্থানেই নাই। এখানে আনুমানিক অন্যূন ২০ হাজার লোক একত্রে উপাসনা করিতে পারিত। বোধ হয় বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে বাদসাহ সমস্ত অমাত্যবর্গ ও সৈন্য সামন্ত লইয়া এখানে উপাসনা করিতেন। পূর্ব্বোক্ত সিংহাসনের পশ্চিমদিকে প্রবেশদ্বার। ইহার প্রস্তরগুলি অত্যন্ত মসৃণ ও শীতল। দ্বারের বহির্দ্দেশে একটী উচ্চ বারান্দা। এই বারান্দার দ্বারের উপরিভাগে এখনও একটী প্রস্তর-খোদিত ভগ্ন বিষ্ণুমূর্ত্তি সংলগ্ন দৃষ্ট হয়। ইহা এক খণ্ড পৃথক প্রস্তর দ্বারা আবৃত ছিল। এক্ষণে সেই প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া গিয়াছে এবং হিন্দুদেবালয় লুণ্ঠনের

সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইরূপ নিদর্শন আরও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। এই মস্‌জিদের পূর্ব্বদিকে একটী মকরমুখ পয়ঃপ্রণালী সংলগ্ন আছে। ইহাও কোন হিন্দু দেবালয় হইতে নীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহার বহির্ভাগে একখানি প্রস্তরে খোদিত আছে যে, সেকেন্দর সাহর আদেশানুসারে ৭৭০ হিজরীতে (১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দে) এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়। আদিনা শব্দের অর্থ শুক্রবার। শুক্রবার মুসলমানদিগের উপাসনার দিন। শুক্রবারের উপাসনার জন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম আদিনা মস্‌জিদ।

সাতাইশ ঘর।—আদিনা মস্‌জিদের প্রায় এক মাইল পূর্ব্বে একটী পুষ্করিণী ও তাহার তটে একটী বাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহাকে লোকে সাতাইশ ঘর বলে। এই বাটীর প্রাচীরে সংলগ্ন পয়ঃপ্রণালী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরী দর্শনে অনুমিত হয় যে, ইহা বাদসাহ বা স্ত্রীলোকদিগের স্নানাগার ছিল।

মালদহের কাট্‌রা বা দুর্গদ্বার।—পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মালদহ নগর পাণ্ডুয়ার বন্দর ছিল। এই স্থানে একটী পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার ভিতরে একটী সরাই ছিল। বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদিগের বাণিজ্য দ্রব্য এই স্থানে রক্ষিত হইত। মহানন্দার অপর পারে একটী স্তম্ভ স্থিত। ইহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহার চতুর্দ্দিকে কতকগুলি প্রস্তর সংলগ্ন আছে। কেহ কেহ বলেন যে, শত্রুর আগমন দূর হইতে অবগত করাইবার জন্য এই সকল প্রস্তর খণ্ডের উপর প্রদীপ জ্বালান হইত।

মালদহের সোণামস্‌জিদ।—এই মস্‌জিদ মৌসুকনামা একজন সদাগরের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। তাঁহার ভ্রাতা পূর্ব্বোক্ত সরাই প্রস্তুত করেন। এই মস্‌জিদের শিলালিপির মর্ম্ম এই:—এই উপাসনা স্থান পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছিল। ইহা ভারতবর্ষে কাবা নামে খ্যাত ছিল। ৯৭৪ হিজরীতে (১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে) ইহা নির্ম্মিত হয়।

তাণ্ডব বা তাঁড়ার বিবরণ।

গৌড়ের ধ্বংশের ১১ বৎসর পূর্ব্বে আফগান নরপতি সলিমান সাহ করানী গৌড় নগর অস্বাস্থ্যকর বলিয়া তাণ্ডানগরে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন। গৌড়ের নিম্নে গঙ্গা-প্রবাহ শুষ্ক হইয়া যাওয়ায়, বোধ হয়, উহার স্বাস্থ্যহানি জন্মে এবং এইস্থানে রাজধানী স্থাপিত হয়। তৎকালে গঙ্গানদী বর্ত্তমান পাগলা নদীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল। প্রাচীন তাণ্ডানগর গৌড়ের দক্ষিণ পশ্চিমে ভাগীরথীর অপর পারে এবং পাগলা নদীর উত্তর পারে অবস্থিতছিল। ইহা অনেক দিন হইল পাগলার উদরসাৎ হইয়াছে। নগর অথবা তাহার কোন ভগ্নাবশেষই এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। বর্ত্তমান সময়ে মহদীপুরের পশ্চিমে পাগলা ও ভাগীরথী নদীর মধ্যে যে তাঁড়া নামক গ্রাম আছে, ইহারই সন্নিকটে প্রাচীন তাণ্ডা অবস্থিত ছিল। এই নগর বিশেষ বৃহৎ বা বহু জনপূর্ণ ছিল না, কিন্তু ইহা মোগল শাসন কর্ত্তাদিগের প্রিয় বাসস্থান ছিল। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে সাসুজা আওরঙ্গজীবের সেনাপতি মীরজুমলা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া রাজমহল হইতে তাণ্ডায় আশ্রয় লন এবং ইহারই নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া ঢাকায় পালায়ন করেন। ইহার পরে রাজধানী ঢাকাতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তদবধি তাণ্ডার নাম বিলুপ্ত হয়।

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

সুখ ও দুঃখ। (২)

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, জীবের অর্জ্জিত কর্ম্ম বা অদৃষ্ট উহাদের সুখ দুঃখের কারণ। ঈশ্বর যে প্রাণি-দিগের সুখ ও দুঃখের কারণ হইতে পারেন না, তাহাও দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আমরা বলিয়াছি যে, হিন্দুদর্শনের এইরূপ সিদ্ধান্তে দোষ আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষের আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই; আজ প্রধানতঃ দুইটী মাত্র দোষ ও আপত্তির আলোচনা ও সুখ দুঃখ সম্বন্ধে আর দুই চারিটী কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কর্ম্ম ধর্ম্মা-ধর্ম্মভেদে দুই প্রকার। ধর্ম্মকর্ম্মের আচরণে সুখ, ও অধর্ম্ম কর্ম্মের আচরণে দুঃখ পাইতে হয়। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মের আচরণ-নিবন্ধন যে সংস্কার জন্মে, তাহাই অদৃষ্ট-পদ-বাচ্য। এখন বুঝিতে হইতেছে যে, অদৃষ্টই যদি প্রাণী-বর্গের সুখ দুঃখের বিধায়ক ও কারণ হয়, তবে এই অদৃষ্টই বা প্রথমে কোথা হইতে আসিল? যে বস্তু যাহার কারণ, সে বস্তু তাহার নিয়ত পূর্ব্বে বর্ত্তমান না থাকিয়াই পারে না। কারণ হইতেই কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, যখন মনুষ্যাদি সৃষ্ট হয় নাই, যখন জগতের অস্তিত্বই ছিল না, তখন অবশ্যই অদৃষ্টও ছিল না। তৎপর যখন প্রথম প্রাণী-সমূহ সৃষ্ট হইল, তখন হঠাৎ অদৃষ্টই বা কি করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া পড়িল? প্রাণী জন্মিবার পর, তবে ত সে কর্ম্ম করিয়া অদৃষ্ট জন্মাইবে? কিন্তু যখন সেই প্রাণীরই অস্তিত্ব নাই, তখন অদৃষ্টও ত ছিল না—ইহা বলিতেই হইবে। তবে কেমন করিয়া এই সুখ দুঃখ সমাকুল বিচিত্র প্রাণী-রাশি সৃষ্ট হইল? ইহা একটী গুরুতর আপত্তি। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, অদৃষ্টই যদি সুখ দুঃখাদির কারণ হইল, তবে সেই দুরন্ত অদৃষ্টের খণ্ডন হওয়া অসম্ভব। তাহা হইলেই বুঝিয়া দেখ, সমাজের অন্তরে কেমন একটী মলিন আবর্জ্জনা আসিয়া প্রবেশ করিল! সামাজিক লোকে সর্ব্বদাই প্রতি-কার্য্যে এই অখণ্ডনীয় অদৃষ্টের দোহাই দিয়া অসাড় ও নিস্পন্দ হইয়া পড়ে! "অদৃষ্টে থাকে অন্ন মিলিবে; চেষ্টা করা বৃথা"—এইরূপ উক্তি এই অদৃষ্টবাদ হইতেই ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িয়াছে!!

কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, এই আপত্তি দুইটী অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়-মান হইবে। প্রথম আপত্তির উত্তরে বেদান্ত-দর্শনে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহারই মর্ম্ম প্রদান করিতেছি। শঙ্কর এইরূপে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেনঃ—

"বিভাগাদূর্দ্ধং কর্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বর প্রবর্ত্ততাং নাম, প্রাক্ তু বিভাগাদ্বৈচিত্র নিমিত্তস্য কর্ম্মণোঽভাবা-ত্তুল্যৈবাদ্যা সৃষ্টিঃ"।

—অর্থাৎ প্রাণী সৃষ্টির পর তাহাদের কৃত কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর সুখ দুঃখের বিধান করুন্ তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণীবৈচিত্রের কারণ-স্বরূপ কর্ম্মের অসদ্ভাব হেতু সুখ দুঃখ আসিতে পারে না। এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে শঙ্করাচার্য্য বলেন—

"নৈষঃ দোষঃ, অনাদিত্বাৎ সংসারস্য।"

অর্থাৎ এরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কেননা সংসার অনাদি,—সৃষ্টি প্রবাহের আদি নাই। যদি জগতের আদি অন্ত থাকে, তবে উল্লি-খিত দোষটীও অখণ্ডনীয় হইয়া পড়ে। কিন্তু

বীজাঙ্কুরন্যায়ে অনাদিভাবে আবহমান কাল পর্য্যন্ত জগৎ চলিয়া আসিতেছে। বীজ ব্যতীত বৃক্ষ হয় না, বৃক্ষ না হইলে বীজ হয় না ; এই বীজ ও বৃক্ষের যেরূপ আদি নাই, অদৃষ্টও জগতের সেইরূপ আদি নাই। বরং সংসারের আদিমত্ব স্বীকার করিলেই দোষ হয় ; কেননা আদি থাকিলে, অকস্মাৎ বিনা কারণে প্রবৃত্তি হওয়াতে মুক্তাত্মাদিগেরও পুনর্ব্বার জন্মিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে। আরো দেখ, কর্ম্ম না হইলে শরীরের উৎপত্তি সম্ভবে না, আবার শরীর না হইলে কর্ম্ম সম্ভবে না ;—এইরূপ একটী অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু সংসার অনাদি বলিলে, বীজাঙ্কুরন্যায়ে এ দোষ আসিতে পারিল না। তারপর, পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে আমরা বলি যে, কার্য্য মাত্রই কারণ-সমূহের অধীন। একটী মাত্র কারণ হইতে কার্য্য উৎপত্তি হয় না। মাটী ত সর্ব্বত্রই রহিয়াছে ; তবে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ঘট উৎপন্ন হয় না কেন ? সুতরাং বলিতেই হইবে যে, চক্র, দণ্ড, কুম্ভকার প্রভৃতি অন্যান্য কারণের অভাবে ঘট উৎপন্ন হইতেছে না। তবেই স্থির হইতেছে যে, যদি কারণ-কলাপ সমুদায় একত্র না হইলে কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তবে কেবল অদৃষ্টের বলে সংসারযাত্রা চলিবে কেন ? চেষ্টাদি অপর কারণ সমূহেরও সদ্ভাব চাই। আর এক কথা, প্রতিবন্ধকের অসদ্ভাবও একটী কারণ। অদৃষ্ট, কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইতে পারে, কিন্তু মানুষ চেষ্টা দ্বারা তাহার খণ্ডন করিতে সমর্থ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বোত্থাপিত আপত্তি দুইটী অকিঞ্চিৎকর এবং বালুকাগৃহের ন্যায় দৃঢ়।

এখন দেখিতে হইতেছে যে, এই সুখ দুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার কি কোনও উপায় নাই ? কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে মনুষ্য এই বৈষম্যের অবস্থার অতীত হইয়া যাইতে পারে ? দ্বন্দ্বাতীত হইতে পারিলেই মনুষ্য মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়। উপাসনা বল, ভক্তিবল, নিষ্ঠাবল, যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য দ্বন্দ্বাতীত হইতে পারে,—যতদিন না সেইরূপ অনুষ্ঠান করিতে পারিবে, ততদিন মনুষ্যজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। হায় ! এ নিদারুণ মরীচিকার ত অন্ত নাই !! এ জল-কল্লোলের বিরাম নাই ! ! একটীমাত্র সুখের লহরী তোমার গাত্র স্পর্শ করিল, অমনি তুমি বাহ্যজ্ঞান হারাইলে ; অমনি আবার তদপেক্ষা আর একটী সুখের লালসায় ধাবিত হইলে !! এইরূপে, সমুদয় সুখের ভাজন হইলেও তোমার আশা মিটিবে না,—তোমার বাসনার তৃপ্তি হইবে না। মন আরোও সুখ পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিবে। বিষয়-সংস্পর্শ-জনিত সুখ প্রাপ্তির বিরাম কদাচ হইবে না। তরঙ্গের পর তরঙ্গ ! আন্দোলনের পর আন্দোলন ! যতদিন সংসার, যতদিন, তোমার দেহ মন ও ইন্দ্রিয়, ততদিন এ বিক্ষোভের সীমালঙ্ঘন করিতে পারিবে না। বৃদ্ধ মনু সাধ করিয়া বলেন নাই—"ন জাতু কামঃ কামানা মুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে"।—এ অগ্নি নিবিবার নহে ; এদারুণ তৃষ্ণা অপগত হইবার নহে !!! এ পিপাসার অন্ত থাকিলে, এ গোলোক ধাঁধার দ্বার থাকিলে, চিন্তা ছিল কি ? উপভোগেই যদি সুখের শান্তি হইত, তবে বলিতে পারিতাম যে "মানব ! তুমি চিরজীবন সুখেরই অন্বেষণ কর"। শুধু কি

তাই? এ সুখের খেলাতেও দুঃখ আছে। অভাবই দুঃখ। একটি সুখের উপভোগজনিত আমোদ লাভ করিলে;—সেই উপভোগের সময়েই তোমার অতৃপ্ত-বাসনা, ততোধিক আর একটী সুখের লালসায় তাহার তাৎকালিক অভাব-জনিত দুঃখে কাঁদিয়া উঠে। আবার এদিকে চাহিয়া দেখ;—তুমি ঘোর ক্লেশে, যাতনায়, দারুণ-দাবানলে, অর্দ্ধ ঝলসিত হইয়া হায় হায় করিতেছ। দুই দিন চলিয়া-গেল; তোমার সে দুঃখ-বহ্নি নিবিল;—কিন্তু তুমি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আরো সুখের কামনা করিতে থাকিলে! তাই ত বলি, এ মরীচিকার অন্ত নাই!! এই সুখদুঃখের অন্ত নাই, সীমা নাই। ইহারা সাগর-তরঙ্গবৎ অসীম, অনন্ত;—যাইতেছে, আসিতেছে!!!

তাই বলিতেছিলাম, এই সুখ দুঃখের তাড়না হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় কি? যতদিন এই দুঃখ (Pain) আছে, ততদিন মানব দুঃখ নিবৃত্তির পথ খুঁজিবে,—দুঃখ যাইয়া যাহাতে সুখ হয়, তজ্জন্য লালায়িত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে। ততদিন তাহার পক্ষে "শান্তি" লাভ সুদূরপরাহত। আবার যতদিন এই সুখ (Pleasure) আছে, ততদিন তদপেক্ষা আরো সুখবৃদ্ধির প্রত্যাশায় মানুষ ইতস্ততঃ ঘুরিবে। ততদিন তাহার পক্ষে "শান্তি" লাভ সুদূরপরাহত। ততদিন মনুষ্যের চিত্ত-বিক্ষেপ অনিবার্য্য। নির্ম্মল শান্তি ও আনন্দ (Peace and Happiness) লাভ করা ততদিন ঘটিবে না। সুখ ও দুঃখের সীমা অতিক্রম করিতে না পারিলে প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হইয়া মনুষ্য-চিত্ত প্রশান্ত-ভাব ধারণ করিতে পারে না। ঝটিকা অপগত হইলে, প্রকৃতির রুচিরতার অনুভব করা যায়। এখন আমরা দেখিব, সুখ দুঃখ-জনিত চিত্ত-বিক্ষেপ নিবারণ করিয়া পরমানন্দময় শান্ত সমাহিত অবস্থা লাভ করিবার কোন উপায় আছে কিনা?

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি, কর্ম্মই মনুষ্যের সুখ দুঃখের কারণ। সুতরাং এই সুখ দুঃখ অতিক্রম করিতে হইলে, তাহার কারণের মূলোচ্ছেদ করা আবশ্যক। কর্ম্মধ্বংশ করিতে পারিলে, সুখ দুঃখ আর মানবের মনে অভিঘাত উপস্থিত করিতে পারিবে না। কি করিয়া তবে এই কর্ম্ম-ধ্বংশ করা সম্ভব? কর্ম্ম বাসনা হইতে উৎপন্ন হয়। হিন্দুদর্শন এ কথা বারম্বার বলিয়া দিতেছে। জার্ম্মনদার্শনিক সপেনহর ও(Schopenhauer) এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন:—

> "The action of the body is simply the objectified act of the *will*. The whole body is nothing but the will objectified, *i.e.* the will become the notion or representation, the objectivity of the will."

এই (will) বা বাসনা ধ্বংশ করিবার কি কোন উপায় নাই? আছে, উপায় আছে। মানব! নিরাশ হইও না। তুমি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীব; বিধাতা তোমায় সমস্ত রূপ অধিকার দিয়া সংসারে পাঠাইয়া দিয়াছেন। চেষ্টা করিয়া, যত্ন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, বিধাতা তোমার মঙ্গলের জন্য,—তোমার উদ্ধারের জন্য সমস্ত আয়োজন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। তোমার স্বাধীনতা (Free will) দ্বারা সেই আয়োজন গুলি সংগ্রহ ও নিজের উপযোগী করিয়া লইতে পারিলেই হইল। যে কারুণিক, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার বহুপূর্ব্বে মাতৃবক্ষে দুগ্ধ-ভাণ্ডার সৃজন করিয়া তাহাতে অমৃতের ধারা পূরিত করিয়া রাখেন,—সেই মঙ্গলময় পুরুষ,—মনে করিও না যে, তোমার জন্য কিছু অপূর্ণ রাখিয়াছেন! তিনি তোমার

হৃদয়দেশে এরূপ শক্তি নিহিত করিয়াছেন যে, অনুশীলন করিলে, এই তুচ্ছাদপিতুচ্ছ তুমিও একদিন ব্রহ্মভূত হইয়া যাইতে পার! তবে উহা অনুশীলন-সাপেক্ষ। তোমার স্বাধীনতাও সেই অনুশীলনের জন্য। সংসারে সমস্তই আছে, চেষ্টা না করিলে তুমি তাহার কিছুরই অধিকারী নহ।

"* * * A world, where the food does not drop into the mouth and the stream does not leap up at the lips, and no spontaneous blankets fall on and off the shoulders with winter winds and summer heat."

তুমি গোবৎস নহ, যে ভূমিষ্ঠ হইয়াই সন্তরণ দিতে পারিবে। সন্তরণের বীজ তোমাতে উপ্ত রহিয়াছে; অনুশীলন কর দেখিবে উহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। তাই বলি উপায় আছে। দর্শনশাস্ত্র তোমায় সে উপায়ও বলিয়া দিয়াছে।

বাসনা ধ্বংশ করিতে হইলে, জ্ঞানচর্চ্চা প্রয়োজনীয়। জ্ঞানাগ্নি বাসনা-জীবকে দগ্ধ করিতে সক্ষম। কিন্তু এই দুরূহ জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে হইলে ক্রমশঃ অভ্যাস ও শিক্ষা করিতে হয়। একেবারেই জ্ঞানী হওয়া সহজ নহে। চিত্ত শুদ্ধি হইলে তবে তাহাতে জ্ঞানের আলোক প্রতিফলিত হয়। এই চিত্তশুদ্ধিও অভ্যাস-সাপেক্ষ। হঠাৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করা জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে। এ রাজ্যে আসুরিক বলে কিছুই হয় না। এ রাজ্যে কৌশল ও অভ্যাস আবশ্যক। প্রাত্যহিক আবশ্যকীয় কর্ম্মগুলি ছাড়িয়া দেওয়া অসম্ভব হইলেও, তাহাদের প্রবৃত্তি-মার্গ ঘুরাইয়া দিয়া কৌশলে এরূপ করা যায় যে, ঐ কার্য্যগুলিই সেইভাবে ক্রমশঃ অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া যায়। এইরূপ নিষ্কামভাবে কর্ম্মের অনুশীলন ও অভ্যাস করিতে করিতে জ্ঞান জন্মিলেই বাসনা ধ্বংশ হইয়া যায়। বাসনা ধ্বংশ হইলেই সুখ দুঃখজনিত চিত্তবিক্ষেপ নষ্ট হইয়া মানব মন শান্ত হইয়া যায়। কিরূপে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, ভগবদ্গীতায় তাহার প্রণালী অতি বিস্তৃতভাবে কথিত আছে। এইরূপে জ্ঞান জন্মিলে, মানব মনে আর নূতন কর্ম্ম বীজ জন্মিতে পারে না। সুতরাং তখন শান্ত সমাহিত হইয়া মানবাত্মা, পরমাত্মার পরমানন্দ পানে বিভোর হইয়া যায়।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গালার প্রাচীন কবি।

যাঁহারা স্বকীয় প্রতিভায় এই সঙ্গীতময় রসাল বঙ্গভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহারা সুদূর অতীতে শস্য-শ্যামলা বঙ্গের শ্যামল বৃক্ষ-ছায়ায় উপবেশন করিয়া বাঙ্গালীর রীতি, চরিত্র, আশা আকাঙ্ক্ষা গঠন করিয়াছেন, আমরা সেই প্রাচীন কবিগণকে আর চিনি না। যাঁহারা তাঁহাদিগকে চিনিতেন, যাঁহারা তাঁহাদের মধুর কোমল কাব্যগুলি উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে গ্রথিত করিয়া পুষ্প চন্দনে পূজা করিতেন, আমাদের সেই পূজনীয় পিতামহগণ আর নাই। তাঁহাদের সেই কাষ্ঠফলকাবদ্ধ অমূল্যরত্ননিচয় আমাদের অনাদরে ও অবজ্ঞায় কীট দষ্ট হইয়া বা পচিয়া ক্রমে পঞ্চভূতে মিলিয়া যাইতেছে। তৎসহ সেই প্রতিভাবান্ বঙ্গের কৃতী সন্তানগণের নাম চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইতেছে। এখনও যত্ন করিলে ইহাঁদের নাম কথঞ্চিৎ রক্ষা করা যাইতে পারে।

বঙ্গদেশ কবিজননী। বঙ্গভাষা সঙ্গীতময়। সুদূর অতীত হইতে এ পর্য্যন্ত যে কত কবি এদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা সহজ নহে। বঙ্গের প্রতি প্রদেশ, প্রতি পরগণা কবির আবির্ভাবে পবিত্র। বঙ্গের গৃহে গৃহে সঙ্গীতময় কাব্য। এমন কোন উচ্চ বর্ণের গৃহস্থ নাই, যাহার গৃহে অনুসন্ধান করিলে দুই একখানি প্রাচীন কাব্য না পাওয়া যায়। এমন কোন পরগণা নাই, যেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ দুই একজন কবি জন্মেন নাই। মুদ্রা যন্ত্রের অভাবে, কীটের প্রভাবে, অগ্নিদাহে গৃহস্থের অনাদরে, কত কাব্য যে চিরদিনের জন্য বিলয় পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও বিস্ময়কর। যত্নে সংগ্রহ করিলে যে কোন জাতির সহিত বাঙ্গালী গীতিকাব্য লইয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারেন।

বঙ্গভাষার বাল্যাবস্থায়, রামায়ণ ও মহাভারত প্রধান গীতকাব্য। ব্যাস বাল্মীকির চরণ-চিহ্ন অনুসরণ করিয়া বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কত ভিন্ন ভিন্ন কবি যে রামমঙ্গল ও ভারতমঙ্গল গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নির্ণয় করা সহজ নহে। ইদানীং মুদ্রা যন্ত্রের কৃপায় কাশীরাম দাস ও পণ্ডিত কৃত্তিবাস ওঝার নাম দিগন্ত বিশ্রুত হইলেও, যাঁহারা প্রাচীন কাব্যাদির কিছুমাত্র অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের পূর্ব্বে ও পরে বহু কবি মহাভারত ও রামায়ণ গীতে পরিণত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের অনেকের গ্রন্থ একবারে লোপ পাইয়াছে। অনেকের গ্রন্থ খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, অনেকের গ্রন্থ পূর্ণ অবস্থায় আজিও বিদ্যমান আছে। আমরা যথাসাধ্য এই সকল কবি এবং তাঁহাদের অমৃতময় কাব্যের বিবরণ পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। আশা আছে, আমাদের অসম্পূর্ণতা ও অক্ষমতা কালে কোন ভাগ্যবান বঙ্গ সন্তান পূর্ণ করিবেন।

ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী।

ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী ব্যাস-প্রণীত মহাভারত গীত আকারে রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থারম্ভে কবি ব্যাসের বন্দনায় লিখিয়াছেন—

"ব্যাসের চরণাম্বুজে মোর নমস্কার ॥
কৃপাবান হও মোরে দেহ শক্তিদান।
তোমার রচিত মহাভারতের গান ॥
গাইব সতত আমি বাঞ্ছা করি মনে।
তোমার দাসের দাস দ্বিজ ত্রিলোচনে ॥
রচিল ভারতগ্রন্থ রচিত তোমার।
হরিপদে সদাচিত্ত রহুক আমার ॥"

আদিপর্ব্ব।

ত্রিলোচন, কিশোর বয়সে এই রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সমগ্র গ্রন্থ আমরা পাই নাই। এই জন্য ত্রিলোচনের পরিচয় ও রচনার কাল জানা যায় নাই। ত্রিলোচনের মহাভারতের যে অংশ আমরা পাইয়াছি, উহা ন্যূন পক্ষে একশত বৎসরের লেখা। যে প্রদেশে উহা পাওয়া গিয়াছে, সে প্রদেশ ত্রিলোচনের নিবাসভূমি নহে। হস্তলিখিত গ্রন্থের বিস্তৃতির কথা মনে করিলে কবিকে অন্ততঃ ২০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয়।

ত্রিলোচনের লেখনী কবিত্বের দিব্য গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থের যে অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠেই তদীয় অমৃতময় কবিত্বের মধুরতায় মোহিত হইতে হয়। তাঁহার রচনার পরি-

চয় জন্য আমরা উহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম।—

কৃষ্ণের বন্দনায়—

"সুশোভন শ্রীচরণে, দেখিয়ে নখের কোণে
লোমকূপে চতুর্দ্দশ পুরী।
মহিমা লাবণ্য বেশ, নিরূপণ করি শেষ
কার শক্তি কহিবারে পারি॥
নবঘন শ্যামতনু, গজকর সম জানু,
শ্যামল সুন্দর কলেবর।
পীতাম্বর পরিধান, মকরন্দ করে পান,
পাদপদ্মে ভকত ভ্রমর॥
আজানুলম্বিত কর, শঙ্খচক্র গদাধর,
সুশোভিত শোভে শতদলে।
সে চাঁদ অধরে সাজে, বিনোদ মুরলী বাজে,
বনমালা বিরাজিত গলে॥
অগোর চন্দন অঙ্গে, শোভে গোরোচনা সঙ্গে
তিলক চন্দন শোভে ভালে।
মস্তকে মুকুট মণি, সহস্র তপন জিনি,
কাণ শোভে মকর কুণ্ডলে॥
জয় প্রভু জগৎপতি, মোরে কর অবগতি,
মোরে প্রভু হও কৃপাবান্।
তোমার চরণ পদ্ম, হৃদয়ে করিয়া সদ্য,
চক্রবর্ত্তী ত্রিলোচন গান।

ত্রিলোচন প্রথমে, গুরু, গণেশ, কৃষ্ণ ও ব্যাসের বন্দনা, পরে মহাভারতের গুণ কীর্ত্তন ও মহাভারত নাম উৎপত্তির কারণ লিখিয়া 'মার্কণ্ডেয় মুনির বিষ্ণুমায়া দর্শন' নামক উপাখ্যান হইতে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। কাশীরাম যেমন লোকমুখে শুনিয়া 'পয়ার' রচনা করিয়াছিলেন, ত্রিলোচন তাহা করেন নাই। তিনি নিজে সংস্কৃত জানিতেন। গ্রন্থ মধ্যে স্থানে স্থানে শ্লোক উদ্ধার করিয়া অতি সরল অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা একটী শ্লোক ও তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম।

'তত্রৈব গঙ্গা, যমুনা চ তত্র।
গোদাবরী তত্র, সরস্বতী চ।
সর্ব্বানি তীর্থানি বসন্তি তত্র।
যত্রাচ্যুতোদার কথা প্রসঙ্গঃ॥

ত্রিলোচনের অনুবাদ—

জাহ্নবী যমুনা গোদাবরী সরস্বতী।
প্রভৃতি যতেক তীর্থ ধরণীতে স্থিতি॥
অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গ যথায়।
সকল তীর্থের গম্য জানিহ তথায়॥

ব্যাস-রচিত মহাভারতের সহিত কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনেক বৈষম্য আছে। ত্রিলোচনের সহিত ব্যাসের অনেকটা মিলের সম্ভাবনা ছিল। কেননা কাশীরামের ন্যায় ত্রিলোচনকে 'কথকের' মুখাপেক্ষা করিতে হয় নাই। তবে সম্পূর্ণ মিল অসম্ভব। কেননা আধুনিক কবিদিগের ন্যায় গ্রন্থের অনুবাদ ইঁহাদিগের লক্ষ্য ছিল না। মহাভারত অবলম্বনে গীত রচনাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন ও বিশেষ বিশেষ ভাবের স্ফূরণের জন্য ইঁহাদিগকে ব্যাসোক্ত কোন বিষয় পরিত্যাগ, এবং গ্রন্থান্তর হইতে কোন বিষয় সংযোজন করিতে হইয়াছে। আমরা ত্রিলোচন রচিত ভারতরত্ন অখণ্ড পাই নাই। এজন্য ক্ষুব্ধ হৃদয়ে পাঠকদিগকে ত্রিলোচনের ভারতের প্রথম অংশটি উপহার দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

"সর্ব্ব আগে বন্দিলাম শ্রীগুরুচরণ।
যার কৃপালেশে খণ্ডে ভবাদি বন্ধন॥
গুরু কৃষ্ণ এক আত্মা নাহি ভিন্ন ভেদ।
অজ শিব জানে ইহা জানে চারি বেদ॥
গুরু কৃষ্ণ এক আত্মা ভিন্ন বপু হয়।
স্বরূপ বচন ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
গুরুরূপে কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষিতিতে প্রকটে।
শ্রীগুরু করুণা হৈলে কর্ম্ম সূত্র কাটে॥
আগম নিগম শাস্ত্র যতেক পুরাণ।
যজ্ঞ হোম মহোৎসব কর্ম্ম দিয়া দান॥

পর্য্যটন দরশন যতেক তীর্থাদি।
প্রভাস পুষ্কর সুরধুনী সুরনদী॥
গুরুসম তুল্যময় বেদবিধি বলে।
সর্ব্ব তীর্থ ফল পাই শ্রীগুরু সেবিলে॥
গুরু কৃপা বলে মুক্ত হয় পশুযোনি।
শ্রীগুরু চরণ পদ্ম জানহ তরণী॥
সকলের পরাৎপর গুরু মহাশয়ে।
দিব্য জ্ঞান প্রকাশিত কটাক্ষে হৃদয়ে॥
চক্ষুদান দিয়া গুরু করিল উদ্ধার।
কোটী কোটী দণ্ডবৎ চরণে তাহার॥
শ্রীগুরু কমল পদে আমার শরণ।
নমো গুরু মহাশয় দুর্গতি ভঞ্জন॥
আমি অতি শিশুমতি কিশোর বয়েস।
অপার মহিমা তব না জানি বিশেষ॥
যে বোলাও তাহা বলি তাহা মাত্র জানি।
শ্রীগুরুচরণ বন্দম লোটায়া ধরণী॥
গুরুকৃষ্ণ পদাম্বুজে রহ মোর মন।
শ্রীগুরু বন্দনা কহে দ্বিজ ত্রিলোচন॥"

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

কবীর-প্রকাশ।

(কবীর সাহেবের মূলদোঁহা ও তাহার পদ্যানুবাদ।)

প্রেম-অঙ্গ।

এহ্ তো ঘরহৈ প্রেমকা খালাকা ঘর নাহিঁ।
শীশ্ উতরে ভুঁইধরে তব্ পৈঠে প্রেম মাহিঁ॥১॥

এইত প্রেমের ঘর মেসোঘর * নয়।
মাথা কাটি তার পর, মাটিতে করিয়া ভর
প্রবেশ করিতে হেথা হয়॥১॥

প্রেম ন বাড়ী উপজে প্রেম ন হাট বিকায়।
রাজা রাণা জো রুচে শীশ্ দেয়্ লে জায়॥২॥

ঘরে না উপজে প্রেম হাটে না বিকায়।
রাজা রাণা ধনীগণে, রুচি হলে প্রেম ধনে
মাথা দিলে তবে প্রেম পায়॥২॥

প্রেম পিয়ালা জো পিয়ে শীশ্ দক্ষিণা দেয়্।
লোভী শীশ্ ন দে শকে নাম প্রেমকা লেয়্॥৩॥

প্রেমের পিয়ালা পান যেই জন করে
মস্তক দক্ষিণা করে দান,
লোভীজন মাথা দিতে শক্তি নাহি ধরে
সে সুধু প্রেমের করে নাম॥৩॥

আয়া প্রেম কহাঁ গয়া দেখ্‌থা সব্ কোয়্।
ছিন্ রোঁয়ে ছিনমেঁ হঁসে সোতো প্রেম ন হোয়্॥৪॥

এই প্রেম এসেছিল গেল বা কোথায়,
সকলে দেখেছে সে সময়,
ক্ষণেক হাসায় আর ক্ষণেক কাঁদায়
সে প্রেমত প্রেম কভু নয়॥৪॥

প্রেম প্রেম সব্ কোই কহে প্রেম ন চিহ্নে কোয়্।
আঠ পহর ভীনা রহে প্রেম কহাওয়ে সোয়্॥৫॥

কথায় ত প্রেম প্রেম সকলেই বলে
কেহত চিনে না প্রেম কি যে,
সেইত প্রকৃত প্রেম যার স্পর্শ ফলে
দিবা নিশি প্রাণ থাকে ভিজে॥৫॥

প্রেমীঢুঁড়ত মৈ ফিরুঁ প্রেমী মিলে ন কোয়্।
প্রেমী সোঁ প্রেমী মিলে গুরু ভক্তি দৃঢ় হোয়্॥৬॥

কত ঘুরিতেছি প্রেমিকের অন্বেষণে
প্রেমিক মিলে না এক জন,
প্রেমিক হইলে মিলে প্রেমিকের সনে
দৃঢ় হয় গুরু-পদে মন।

জা ঘট প্রেম ন সঞ্চরে তা ঘটজান মশান।
জৈসে খাল লুহারকী শ্বাস লেত বিন প্রাণ॥৭॥

যে দেহে না হলো হায় প্রেমের সঞ্চার
সে দেহ ত নিশ্চয় মশান,
প্রাণহীন দেহে যেন নিশ্বাস তাহার
কামারের ভস্ত্রার সমান॥৭॥

---

* হিন্দুস্থানে এরূপ প্রচলিত কথা আছে "এতো মসো ঘর নয় যে অনায়াসে অবাধে ঢুকিবে?"

প্রেম বণিজ নহি কর শকে চড়ে ন নামকী গৈল,
মানুষকেরী খালরী ওড়ফিরে জেয়ে। বৈল ॥৮॥

প্রেমের বাণিজ্য নাহি জানে সেই জন,
নামের গলিতে * নাহি যায়,
মানুষের আবরণ করিয়া ধারণ,
পশুহেন ঘুরিয়া বেড়ায় ॥৮॥

প্রেম বিনাধীরজ নহী বিরহ বিনা বৈরাগ।
সত্‌গুরু বিনা মিটে নহি মন মন্‌সাকা দাগ ॥৯॥

প্রেম বিনা ধৈর্য্য শিক্ষা কভু নাহি হয়,
বিরহ বিহনে নহে বৈরাগ্য উদয়।
সদ্গুরুর কৃপা যদি ভাগ্যে নাহি জুটে,
হৃদয়ের দাগ আর কিছুতে না ছুটে ॥৯॥

জহাঁ প্রেম তহাঁ নেম নঁহি তহাঁ ন বুধ ব্যোহার।
প্রেম মগন জব্ মনভয়া তব্ কোন্ গিনে তিথিবার ॥১০॥

প্রেমের বাজারে নাই নিয়মের মেলা,
পীরিতির ঘরে নাই পাণ্ডিত্যের খেলা,
প্রেমের সাগরে মগ্ন হয় যবে মন
কোন্ তিথি কোন্ বার কে দেখে তখন ? ১০

প্রেম পাউরী পহর কর ধীরজ কাজল দেয়্
শীল সিন্দুর ভরায় কর এয়ো পিউকা সুখলেয়্ ॥১১॥

প্রেমের পাঞ্জুরী পর যুগল চরণে,
ধৈর্য্যের কাজল দাও যুগল নয়নে,
শীলতার সিন্দুর শিথীর'পরে পর,
প্রিয়তম সঙ্গে রঙ্গে সুখেবাস কর ॥১১॥

প্রেম ছিপায়া না ছিপে জা ঘট পরঘট হোয়্।
জোপৈ মুখ বোলে নঁহি তো নৈন দেতহৈ রোয় ॥১২॥

হৃদয়েতে হয় যদি প্রেমের বিকাশ
ঢাকিলে না রাখা যায় ঢাকি,
বদন যদি বা তার নাদেয় আভাস
কাঁদিয়া প্রকাশ করে আঁখি ॥১২॥

পীয়া চাহে প্রেমরস রাখা চাহে মান।
এক ম্যান্‌মে দোখড়গ্ দেখাশুনা ন কান ॥১৩॥

বাসনা মনেতে করে প্রেমরস পান,
অথচ রাখিতে চাহে আপনার মান,
কখন ত দেখিনাই শুনি নাই কাণে,
দুইখানি খড়্গাথাকে একই পিধানে ॥১৩॥

পিয়ারস পিয়া সো জানিয়ে উতরে নহী খুমার।
নাম অমল মাতারহে পিয়ে অমীরস সার ॥১৪॥

প্রিয়ের সে প্রেমরস যার ভাগ্যে জুটে,
নেশার আবেশ তার কখন না ছুটে,
সুধারস সার পান করি সেই জন,
নাম-মদিরায় মত্ত থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥১৪॥

কবীর প্যালা প্রেমকা অন্তর লিয়া লগায়।
রোম রোমমে রমি রহা আওর অমল ক্যা খায় ॥১৫

কবীর কহেন এই অন্তরে আমার,
প্রেমের পিয়ালা লাগায়েছি অনিবার,
রোমে রোমে প্রেমানন্দে ভিজা এ শরীর
বল আর কোন্ নেশা খাবেন কবীর ? ॥১৫

কবীর ভট্টী প্রেমকী বহুতক বৈঠে আয়।
শিশ্ সোঁপে সো পীয়সী নাতর পিয়া ন যায় ॥১৬॥

কবীর কহেন হেন আছে বহু জন,
প্রেমের ভাঁটিতে আসি বসে অনুক্ষণ।
কিন্তু যেই মাথা দেয় সেই করে পান,
নতুবা পানের আর নাহিক বিধান ॥১৬॥

জব্ মৈঁথা তব্ গুরু নহী অব্ গুরুহৈ হাম নাহি।
প্রেমগলি অতি সাঁকরী তামেঁ দো ন সমাহি ॥১৭॥

না ছিলেন গুরু আমি ছিলাম যখন,
আমি নাই তাই গুরু আছেন এখন।
জানিও প্রেমের গলি সংকীর্ণ এমন।
একত্র চলিতে তাতে না পারে দুজন। ১৭।

নৈনোকী কর কোঠরী পুতলী পলঙ্গ্ বিছায়।
পলকোঁকো চিক্‌ডাল্‌কে পিয়াকো লিয়ারিঝায় ॥১৮॥

কুঠরী করিয়া লও দুইটী নয়নে,
পুতলি পালঙ্ক তাহে বিছাও যতনে,
পলকের চিক্ টাঙ্গাইয়া চারি ধার,
প্রিয় সঙ্গে রঙ্গে কর আনন্দ-বিহার ॥১৮॥

* নাম সাধনের প্রণালীতে।

জব্ তক্ মরণে সে ডরে, তব লগ্ প্রেমী নাহি।
বড়ী দূরহৈ প্রেম ঘর সমঝ লেহু মন মাহি ॥১৯॥

যত দিন থাকে প্রাণে মরণের ভয়
প্রেমিক সে হইবে কেমনে ?
প্রেমের যে ঘর সেত দূর অতিশয়
ভাবিয়া দেখনা কেন মনে ? ॥১৯॥

লৌলাগি তব্ জানিয়ে ছুট্ ন কবহু যায়্।
জীবত্ লৌলাগিরহে মূএ মাহি সমায় ॥২০॥

অন্তরে লাগিলে প্রেম জানিও তখন
পলক লালসা নাহি টু'টে।
হৃদয়ে লাগিয়া রহে জীবন্তে যেমন
মরিলেও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে ॥২০॥

লৌলাগি কল্ না পড়ে আপবিসরজন দেহ্ (দেঃ)
অমৃত পীয়ে আত্মা গুরুসে জুড়ে সনেহ্ (সনেঃ) ॥২১॥

প্রেমিকের বিরাম বিশ্রাম কোথা আর ?
আত্ম বিসর্জ্জন যার দান,
গুরু সঙ্গে প্রেম যোগে যুক্ত হ'য়ে তাঁর
আত্মা সদা সুধা করে পান ॥২১॥

জৈসী লৌ পহিলে লগী তৈসী নিবহে আওর।
আপ্নি দেহ কি কো গিনে তারে পুরুষ করোর ॥২২॥

নব অনুরাগ-স্রোত যেই বেগে ধায়।
সেভাবে বহিলে অনিবার।
আপনার দেহের দিকেতে কেবা চায়
কোটী জনে করয় উদ্ধার ॥২২॥

লাগি লাগি ক্যাকরে লাগি নাহি এক।
লাগি সোই জানিয়ে জো করে কলেজে ছেক ॥২৩॥

প্রেমিক প্রেমিক বল, প্রেমিক কোথায় ?
প্রেমিক দেখি না এক জন,
জানিও প্রেমিক সেই যেই জন হায়,
হৃদ্‌পিণ্ড করেছে ছেদন ॥২৩॥

লগী লগন ছুটে নহী জীভ্ চোঁচ্ জর্ জায়।
মীঠা কহা অঙ্গারকো জাহি চকোর চবায় ॥২৪॥

প্রেমিকের প্রেম কভু নাহি ছুটে জানি
জিহ্বা ওষ্ঠ যদি জ্বলে যায়,
উত্তপ্ত অঙ্গার খণ্ড তারে মিষ্ট মানি
চকোর যেমন তাহা খায় ॥২৪॥

জোতু পিয়াকী প্যারণী আপনা কর লেরী।
কলহ কল্পনা মেট্‌কে চরণো চিত্ দেরী ॥২৫॥

প্রিয়ের প্রেয়সী যদি হও লো সুন্দরি,
রাখ তাঁরে করিয়া আপন।
কলহ কল্পনা সব দূরে পরিহরি
চিত্ত কর চরণে অর্পণ ॥২৫॥

পিয়াকা মারগ্ কঠিন হৈ খাড়া হো জৈসে।
নাচন নিকসী বাপুরী ফির ঘুংঘট কৈসে ॥২৬॥

প্রিয়ের যে পথ তাতে সুকঠিন চলা
সেই পথ যেন খাঁড়া ধার।
নাচিতে বাহির যদি হয়েছ গো বালা
কেন তায় ঘোম্‌টা আবার ? ॥২৬॥

যা খোজত ব্রহ্মাথকে সুর নর মুনি দেবা।
কঁহে কবীর শুন সাধয়া কর সদ্‌গুরু সেবা ॥২৭॥

যাঁর অন্বেষণে ক্লান্ত নর ঋষি সবে,
ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ,
কবীর কহেন শুন সাধুগণ তবে
সেবা কর সদ্‌গুরু চরণ ॥২৭॥

এহ্ তো ঘর হৈ প্রেম্‌কা মার্গ অগম অগাধ।
শীশ্ কাট্ পগ্‌তল্ ধরে তব্ নিকট প্রেম্‌কা স্বাদ ॥২৮॥

এই ত প্রেমের ঘর, সে ঘরে যে চলে
(পথ অতি অগম অগাধ,)
মাথাটী কাটিয়া রাখি চরণের তলে
তবে ত প্রেমের পায় স্বাদ ॥২৮॥

প্রেম্ পিয়ালা ভরপিয়া রাচ্ রহে গুরু জ্ঞান।
দিয়া নগাড়া প্রেম্‌কা লাল খড়ে মৈদান ॥২৯॥

প্রেমের পিয়ালা করি ভরপুর পান,
অতিশয় দৃঢ় হয় গুরুপদে জ্ঞান।
প্রেমের দামামা যাই বাজিয়া উঠিল
গুরুর সে প্রিয় শিষ্য মাঠে দাঁড়াইল ॥২৯॥

প্রেম বিকন্তা মৈ শুনা মাথা সাটে হাট।
পুছত বিলম্বন কীজিয়ে তত্‌ছিন্ দীজে কাট ॥৩০॥

মাথার দরেতে প্রেম হাটেতে বিকায়
এই কথা করিনু শ্রবণ,
জিজ্ঞাসিতে দেরি তবে করোনা বৃথায়
কেটে দাও তখন তখন ॥৩০॥

জোতু প্যারা প্রেমকা শীশ্ কাট কর গোয়।
জবতু য্যাসা করেগা তব্ কুছহোর তোহোয় ॥৩১॥

প্রেমের পিয়াসা যদি হয়ে থাকে মনে
মাথা কেটে ফেলে দাও তবে,
এরূপ করিতে যবে পারিবে তখনে
যদি কিছু হয় তবে হবে ॥৩১॥

প্রেম্ প্রীতমে রঁচ রহে মোক্ষ মুক্তিফল পায়্।
শব্দ মাহি তব্ মিল রহে নহী আওয়ে নহি যায় ॥৩২॥

প্রেমেতে প্রীতিতে যার রুচি থাকে মনে
মোক্ষ মুক্তি ফল সেই পায়।
শব্দের সঙ্গেতে থাকি অভেদ মিলনে
আর কভু না আসে না যায় ॥৩২॥

আওর স্মরৎ বিসরী সকল লৌলাগি রহে সঙ্গ।
আও জাও কাসোঁ কহুঁ মন রাতাগুরু রঙ্গ ॥৩৩॥

অন্যস্মৃতি যাহাকিছু সব গেল ভুলি
প্রেমে মগ্ন চিত্ত অনুক্ষণ,
হেথা এসো হোথা যাও কাকেইবা বলি
গুরুরঙ্গে রঙ্গিয়াছে মন ॥৩৩॥

জব্ লগ্ কথনী হম্ কথী দূর রহা জগদীশ্।
লৌলাগি কল না পড়ে অব্ বোল্না হদীস ॥৩৪॥

ততদিন বহুদূরে ছিলেন ঈশ্বর,
ছিনু যবে বক্তৃতার ঘোরে,
এবে চিত্ত প্রেমে মগ্ন নাহি অবসর,
এখন যা কথা ঠারে ঠোরে ॥৩৪॥

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

উদ্বাহ-বিচার। (৩)

কন্যাবিক্রেতাগণের পাশব ব্যবহার এবং অতিরিক্ত পণভার হেতু সমাজে যে সকল অনিষ্টকর ব্যাপার সর্ব্বদা ঘটিতেছে, আমরা তাহার একটী তালিকা সংগ্রহ করিয়াছি; কিন্তু বাহুল্য ভয়ে সমস্ত প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম না। নমুনা স্বরূপ দুই চারিটী ঘটনার কথা মাত্র পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। বর্ত্তমান সমাজ যে কি ভয়ঙ্কর হিংস্রতার আবাস স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আশা করি ইহা দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইবে। ঘটন সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিগণের নাম, ধাম ইত্যাদিও সংগ্রহ করিয়াছি। নাম প্রকাশ করিলে হয়তো অনেকেই আমাদের প্রতি রুষ্ট হইবেন, তাই ক্ষান্ত রহিলাম। আবশ্যক হইলে সময় মতে তাহাও প্রকাশ করিব।

হাবড়াতে এগার মাস বয়সের একটী কন্যা এগার শত টাকা পণ গ্রহণে ৩৪ বৎসর বয়স্ক এক যুবকের নিকট বিবাহ দেওয়া হইয়াছে; এবং বীরভূমের অন্তর্গত মোহনপুর গ্রাম নিবাসী ভট্টাচার্য্য বংশীয় কোনও ব্যক্তি ৩০ বৎসর বয়সে, পনর মাস বয়ঃক্রমের একটী মেয়ে সাড়ে সাত শত টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিয়াছেন! এই প্রকারের অসাময়িক ও অস্বাভাবিক বিবাহ একমাত্র কন্যাকর্ত্তাগণের অর্থ-লালসা হেতুই সঙ্ঘটিত হইতেছে। ইহা অপেক্ষা বেশী পণ দিতে হইবে বলিয়াই বরপক্ষও এই প্রকারের অপগণ্ড শিশু-বিবাহ করিতে সম্মত হয়। সমাজে এই প্রকারের ঘটনা অনেক ঘটিতেছে; ভবিষ্যতে আরও যে কত ঘটিবে, তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে?

এই ত গেল শিশু পাত্রীর বিবাহের কথা। বুড় বরের বিবাহের কথা ভাবিতে গেলে চমৎকৃত হইতে হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কন্যাবিক্রেতাগণ কন্যা সমর্পণের পাত্রাপাত্র বিবেচনা করেন না, তাঁহাদের কেবল টাকার দিকেই নজর। এ কথার প্রমাণ জন্য নিম্নে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি:—

বর্দ্ধমানের মহারাণীর জনৈক উপগুরু ৬৩ বৎসর বয়সে ১২ বৎসর বয়ঃক্রমের একটী কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বরিশালে, উত্তর সাবাজপুর পরগণার অন্তর্গত গোবিন্দপুরের কর বংশীয় কোনও মহাত্মা ৮৪ বৎসর বয়সে, এক সরলা বালিকার মাথা খাইয়াছেন। উক্ত জিলায় রায়েরকাঠি নিবাসী জনৈক ভট্টাচার্য্য ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ৯ বৎসরের একটী বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নারায়ণগঞ্জ সবডিভিসনের এলাকায় বারিসার নিবাসী চক্রবর্ত্তী বংশীয় কোনও ব্রাহ্মণ ৭০ বৎসর বয়সে কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তঃপাতী কয়বা গ্রামের ৭ বৎসর বয়সের একটী বালিকার পাণি-পীড়ন করিয়াছেন। এই কার্য্যে তাঁহাকে ষোল শত টাকা পণ দিতে হইয়াছিল। পণ প্রভাবে এই প্রকারের কত অনিষ্টকর ঘটনা যে অহরহঃ সমাজে ঘটিতেছে, তাহার খোঁজ কে লয়?

লোক আপনার পালিত গরুটী বিক্রয় করিবার সময়ও একটুকু ইতস্ততঃ করে। যাহার নিকট বিক্রয় করিতেছে, সে কি প্রকৃতির লোক, গরুটী যত্নে রাখিবে কি না, এবং উপযুক্তরূপে আহার যোগাইবে কি না, ইত্যাদি বিষয় একবার ভাবিয়া দেখে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সমাজের কন্যাবিক্রেতা মহাপুরুষেরা আপন আপন আত্মজাগণকে সামান্য গরু অপেক্ষাও উপেক্ষণীয় মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেবল কন্যার দর বৃদ্ধির দিকেই দৃষ্টি রাখেন, তাহার সুখ দুঃখের কথা একবারও ভাবেন না। এই সকল অভিভাবকও যদি মনুষ্য নামের অধিকারী হয়, তবে আর রাক্ষস কাহাকে বলিব? ইহারা যদি জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক বলিয়া সমাজে সম্মান লাভ করিতে পারে, তবে এই ভু ভারতে নিরয়গামী জঘন্য লোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কন্যার বাজার দর-দেখাইবার নিমিত্ত আরও কয়েকটী ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। ফরিদপুরের অন্তর্ব্বর্ত্তী ঢেউখালী নিবাসী জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাড়ে তেরশত টাকায় পাত্রী ক্রয় করিয়াছিলেন। টাঙ্গাইলের এলাকাস্থ আড়বা নিবাসী কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তেরশত টাকা পণ দিয়া, ফরিদপুর জিলার পোড়াগাছা নিবাসী কালী কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় চৌদ্দশত টাকা মূল্যে, এবং বরিশাল জিলার ভোলা মুনসেফী আদালতের সেরেস্তাদার বাবু বিনোদলাল ঠাকুরতা মহাশয় সাড়ে বারশত টাকাপণে কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। এই প্রকারের আরও অনেক সংবাদ আমরা অবগত আছি, তাহা সম্যক রূপে উল্লেখ করা অসম্ভব।

পাত্রীর বাজার এইরকম গরম হইলে সকলের পক্ষে বিবাহ ঘটিয়া উঠা সহজ নহে। বিশেষতঃ সামান্য গৃহস্থের সংসারে তিন চারিটী অবিবাহিত পুরুষ থাকিলে, তাহাদের সকলের বিবাহ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব; সমাজে এ কথার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এমনও দেখা গিয়াছে, অর্থাভাবে পণ যোগাইতে অসমর্থ হেতু অনেক ব্রাহ্মণের ভাগ্যে এ যাত্রায় আর বিবাহ ঘটিয়া উঠিল না। কাজেই তাহাদের বংশলোপ হইয়াছে বা হইতে চলিয়াছে। এই প্রকারের অন্ততঃ দুই একটী ঘটনাও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, এমন লোক অতি অল্পই পাওয়া যাইবে। সমাজের দুর্দ্দিন ও দুরবস্থা ইহা অপেক্ষা বেশী আর কি হইতে পারে? আজকাল মেয়ের বাজার কটুকু নামিয়াছে বটে, কিন্তু এখনকার

প্রচলিত পণ-ভার বহন করিয়া বিবাহ করাও যে সে লোকের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে।

পাত্রী বিক্রয়ের ফল, আমাদের সমাজে, বর বিক্রয়ের ফল অপেক্ষা অধিকতর বিষময় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কন্যার বিবাহ দেওয়া আজ কালের হিন্দু সমাজে কষ্টকর হইলেও, এপর্য্যন্ত ভিন্ন জাতীয় পাত্রে কন্যা সম্প্রদান হওয়ার কথা শুনা যায় নাই। কিন্তু পাত্রী ক্রয় করিতে যাইয়া, অনেক সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ জাতি কুল পর্য্যন্ত খোয়াইয়াছেন। কন্যার বাজারে দর ও কাট্‌তি দেখিয়া, অনেক ধূর্ত্ত লোকের অর্থ-লালসা জাগিয়া উঠিল। তাহারা ভিন্নদেশ হইতে নানাবিধ অন্ত্যজ জাতির কন্যাকে—অনেকস্থলে বেশ্যাদিগকে পর্য্যন্তও অর্থে বা প্রলোভনে বশীভূত করিয়া, ব্রাহ্মণের কন্যা পরিচয় দিয়া, নানা স্থানে লইয়া চলিল। পূর্ব্ববঙ্গে সাধারণ ভাষায় এই শ্রেণীর পাত্রীগণ "ভরার মেয়ে" বলিয়া অভিহিত। চক্রান্তকারিগণের কেহ পাত্রীর পিতা, কেহ পিতৃব্য এবং কেহবা ভ্রাতা সাজিয়া, দেশে যে দরে পাত্রী বিক্রয় হয়, তাহাদের আমদানীকরা পাত্রী তদপেক্ষা সুলভ দরে বিক্রয় করিতে লাগিল। অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মণ অভাব হেতু ঐ সকল সম্প্রদায়ের পাত্রী ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল হতভাগার দুরবস্থার কথা স্মরণ করিলে যুগপৎ লজ্জা ও বিষাদের উদয় হয়। ইহাদের আর্থিক অপচয়ের কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, অন্ত্যজ জাতির কন্যা বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া অনেকেই সমাজচ্যুত বা জাতিচ্যুত হইয়া অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা বিবাহ-বিভ্রাট ও সমাজ-বিপ্লবের দিন আরও আসিবে কি? এই শ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তির নাম ধাম আমরা অনুসন্ধান দ্বারা সংগ্রহ করিয়াছি; তাহা প্রকাশ করাতে সমাজের কলঙ্ক ঘোষণা ব্যতীত অন্য কোনও ফল নাই।

কতিপয় কন্যাপণ-প্রথা-সমর্থনকারী লোকের সঙ্গে আমাদের আলাপ আছে। তাঁহারা বলেন, কন্যাপণ প্রথা প্রচলিত থাকায় আমাদের সমাজে দুইটী উপকার সাধিত হইতেছে;—

(১ম) অনেক দরিদ্র ব্যক্তি কন্যা বিক্রয় করিয়া সম্পত্তিশালী হইতেছেন।

(২য়) সমাজে বাল্য-বিবাহের পরিমাণ কমিতেছে।

আমরা কিন্তু এই দুই কথার একটীকেও সমর্থন করিতে পারিতেছি না। সত্যবটে, অনেকে কন্যা বিক্রয় করিয়া বিস্তর অর্থ লাভ করিতেছেন, কোন কোন মহাপুরুষ উপর্য্যুপরি চারি পাঁচটী পর্য্যন্ত মেয়ে বিক্রয় করিয়া, অনেক সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত করিয়া, আপনাদের অর্থ-পিপসা মিটাইতেছেন, কিন্তু অবস্থা ফিরিয়াছে কয়টী লোকের বল দেখি? না হয় মানিয়া লইলাম, অবস্থা ফিরিয়াছে কিম্বা ফিরিতে পারে। একই সমাজের একজনকে নির্ধন করিয়া আর একজন ধনী হইলে মূলতঃ লাভ লোকসান কিছুই হয় না; লাভের মধ্যে একটী ঘোর পাপকার্য্য প্রশ্রয় পায়। অর্থোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে উপায়টী সৎ কি অসৎ, ইহাও বিবেচনা করা উচিত। অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনের পথ বন্ধ করা নীতিজ্ঞ ও বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। চৌর্য্য এবং দস্যুতা দ্বারাও লোক ধনী হইতে পারে; বিদেশী লোকের টাকা কড়ি চুরী বা লুঠপাট করিয়া আনিলে তাহাতে বরং দেশের মূলধন মূলতঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তবে কি চুরী এবং ডাকা-

ইতি সমাজের কল্যাণকর? কন্যা বিক্রয় যে একটী অসৎ কার্য্য, তাহা আমরা দৃষ্টান্ত এবং শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি। উহা চৌর্য্য এবং দস্যুতা হইতেও ঘৃণনীয়।

কন্যাপণ প্রথা পোষণ-কারিগণের শেষোক্ত কথাটীও নিতান্ত অমূলক। সচরাচর দেখা যায়, কন্যার অভিভাবকগণ অর্থলোভে অতি অল্প বয়সেই কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন; আমরা এবিষয়ের দুই একটী দৃষ্টান্তও দিয়াছি, সুতরাং এস্থলে, কন্যাপক্ষে, তাহাদের যুক্তি কোন ক্রমেই দাঁড়াইতে পারে না। মূল্য বৃদ্ধির দুরাশায় কোন কোন ব্যক্তি কন্যার বয়স বেশী করিয়া বিবাহ দেন বটে, কিন্তু ঐ প্রকারের ঘটনা শতকরা দশটী ঘটে কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ যে মন্দ অভিপ্রায়ে কন্যাগণের ঐরূপ বয়ঃবৃদ্ধি করিয়া বিবাহ দেওয়া হয়,তাহা ভাবিলে দেখা যাইবে,সেই বিবাহে সমাজের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী হইতেছে। পক্ষান্তরে, পণ যোগাইতে অশক্ত বলিয়া অনেক পুরুষ উপযুক্ত সময়ে বিবাহ করিতে পারিতেছেন না। এই ব্যাপার দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন, পুরুষের বাল্য বিবাহ দিন দিন কমিয়া সমাজের উপকার সাধন করিতেছে। কিন্তু এইরূপ বাল্য-বিবাহের বাধাতে বঙ্গদেশের অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার উচ্ছন্ন হইতেছে। অনেকে অনুমান করেন, কন্যার বাজার দর এই প্রকার চড়া থাকিলে বঙ্গদেশের বংশজ, শ্রোত্রীয় প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণকুল কালে একবারে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে। কামরূপ হইতে একজন লিখিয়াছেন, কন্যাপণের পরিমাণাধিক্য হেতু তদঞ্চলের ব্রাহ্মণ বংশ একবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে। বিপক্ষগণ বোধ হয় মেলথাসের থিওরি আবৃত্তি করিয়া বলিবেন, ইহাও সমাজের মঙ্গলকর ঘটনা! আমরা এই মঙ্গলের পায়ে শত শত নমস্কার করি।

এই গেল এক ফল। এই প্রকার বাল্য-বিবাহ নিবারণের দ্বিতীয় ফল, অনূঢ়া বাল-বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি। অধিকাংশ স্থলে ৪০ বৎসরের পুরুষের সহিত ৭ বৎসর বয়সের বালিকার বিবাহ হয়। কোন কোন স্থলে ৮৪ বৎসরের বৃদ্ধের সঙ্গে কচি বালিকার বিবাহ হইয়া থাকে। আজ কালকার মানুষের গড়পরতা আয়ুষ্কাল যে রকম, তাহাতে এইরূপ বিবাহ যে বালিকার বৈধর্ব্ব দশার পূর্ব্ব সূচনা, তাহা বলা বাহুল্য। আবার, স্ত্রী পুরুষের এই রকমের অসম বয়সে বিবাহের ফল যে কত বিষময়, সে কথা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

এবম্বিধ বাল্য-বিবাহ নিবারণে আরও একটী ফল আছে। এই প্রথায় অনেককে বাধ্য হইয়া, আজীবন কৌমার্য্য অবলম্বন করিতে হয়। যাঁহাদের কপালে বিবাহ ঘটে, তাঁহারাও প্রায়ই যৌবন অতীত হইবার পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পারেন না। ইহাঁরা সকলেই মুনিব্রতধারী, তাহা নহে। ইন্দ্রিয়ের উদ্বেগ, অত্যাচার সকলের ন্যায় ইহাঁদিগকেও ভোগ করিতে হয়। সুতরাং ইহাঁরা যে অবসর ও সুবিধামত সমাজের পবিত্রতা নষ্ট করিতেছেন না, ইহা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে?

কন্যা বিক্রয় প্রথা যে সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এবং সমাজের অহিতকারী, এ কথা আমরা কথঞ্চিৎরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। পুত্র-পণ প্রথার ন্যায় কন্যা বিক্রয় প্রথা দ্বারাও সমাজ দিন দিন হীন ও দরিদ্র হইতেছে। বিশেষতঃ পুত্র অপেক্ষা কন্যাগণ পিতা মাতার নিতান্ত মুখাপেক্ষী। সামা-

জিক নিয়মে বিদ্যাজনিত জ্ঞানে ইহারা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। আপনার হিতাহিত বিচারে ইহাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই। তাহাতে আবার অতি অপরিপক্ক বয়সে—অধিকাংশ স্থলে অতি শৈশবেই ইহাদের বিবাহ হয়। এই রূপ নিঃসহায় এবং আশ্রিত হৃদয়সম কোমল লতিকাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা কত দূর যে নৃশংসতার কার্য্য, তাহা আর কি বলিব?

আমাদের ইহাই একমাত্র প্রার্থনা, ভগবানের আশীর্ব্বাদে, এই সকল ঐহিক ও পারত্রিক অহিতকর ব্যাপারের প্রতি সমাজের কর্ত্তাগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক,—সমাজে ফুল চন্দন বর্ষিত হউক

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত

নীতিশিক্ষা। (২)

ইংরাজ রাজত্বে নীতিশিক্ষা সম্ভব কি না?

নীতিশিক্ষা বিষয়ে গত ফাল্গুন মাসের নব্যভারতে যাহা ব্যক্ত করিয়াছি, তাহাতে বিদিত হইবে যে, ইংরাজী চর্চ্চা দ্বারা শত বৎসরেও আমাদের উপযুক্ত নীতি শিক্ষা হইল না। আর, এই প্রণালীর শিক্ষা দ্বারা কস্মিন্ কালে এদেশীয়েরা প্রকৃত প্রস্তাবে নীতিমান হইবে, তাহারও চিহ্ন দেখা যায় না। তবে কি ইংরাজ রাজত্বে আমাদের নীতিশিক্ষা অসম্ভব? তাহাও তো বিশ্বাস করিতে মন চাহে না। ইংরাজ রাজত্বের অস্তিত্ব ও শ্রীবৃদ্ধি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। কিন্তু নীতিবিহীন হইয়া তো থাকিতে পারিব না।

বিপন্নায়াং নীতৌ সকলমবশং সীদতি জগৎ।

নীতিবিহীন হইলে জগতের সকলই অবশ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। আমাদের সেই দশা নিকটবর্ত্তী হইতেছে। অতএব আমরা এই দুর্গতি পরিহারের জন্য ব্যাকুল হইয়া সর্ব্বদা প্রার্থনা করি, ইংরাজ-রাজ যথার্থ ধর্ম্মরাজের ন্যায় আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম রক্ষা করুন।

আমাদের ন্যায় অনুকূল প্রজাদিগকে লইয়া রাজা অসাধ্য-সাধন করিতে পারেন। যে গুণে সহস্র ক্রোশ অন্তরে থাকিয়া ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতের উপর অখণ্ড শাসন বিস্তার করিতেছেন এবং সমস্ত পৃথিবীর লোক তাহা নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া অবাক্ হইয়া আছে, সেই গুণে তাঁহার রাজ্যের প্রজাদিগের নীতিপালন-ঘটিত সুখ সম্পদ ও মঙ্গল দৃশ্য সকলকেই চমৎকৃত করিয়া তুলিবে, সন্দেহ নাই।

ইংরাজ রাজার অধীনতায় এদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান, শিখ, পারসি, ও তাহাদের নানা শাখায় বিভক্ত শত সম্প্রদায়ের লোক বাস করিতেছে। সকলের পক্ষে রাজার সমদৃষ্টি এবং এক নীতি থাকা আবশ্যক। ইংরাজ ভূপতি প্রজাদিগের সহস্র প্রকার রীতি নীতি ধর্ম্ম কর্ম্ম দর্শন করিতেছেন, তন্মধ্যে কোন্‌টীকে আদর ও কোন্‌টীকে অনাদর করিবেন? এই জন্য তাঁহাকে সাধারণ বিদ্যালয়ে কেবল জ্ঞানোপার্জ্জনের ব্যবস্থা রাখিয়া রাজধর্ম্ম পালন করিতে হইতেছে। অথচ নীতি শিক্ষার অভাবে দেশে সর্ব্বাঙ্গীন সুশাসন স্থাপন হয় না, এজন্য মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করিতেও হইতেছে। যাহা হউক তথাপি ইংরাজ প্রভু নিষ্কলঙ্ক রাজ-

নীতি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, বলিতে হইবে। এবম্প্রকার বিশাল ভারত মধ্যে যে একছত্র রাজ্যাধিকার, তাহাও দুর্লভ ছিল। ঈশ্বর ইচ্ছায় তাহা সুসাধিত হইয়াছে। ভারতীয় সমস্ত রাজগণ বহুকাল হইতে বিবাদপরায়ণ হইয়া পরস্পরের বল ক্ষয় করিতেছিলেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলে, সেই শোচনীয় অন্তর্ব্বিবাদের শান্তি হইয়াছে। আর কিছু না হইলেও, ব্রিটিস্‌সিংহ দ্বারা এই বিনয় স্থাপনকে অতি শ্লাঘনীয় জ্ঞান করিতে হয়।

এরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইংরাজগণ এ দেশীয় রাজ্যারম্ভে আমাদিগকে নির্ব্বিবাদে কাল হরণ করিবার এক পাট্টা দিয়াছিলেন আর দেশীয় লোকেরাও তাহার কবুলতি দিয়াছেন। দুই পক্ষে দুই প্রধান ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। পাট্টাদাতা—স্যর্ উইলিয়ম জোন্স; কবুলতি-দাতা—জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। কবুলতির নাম—বিবাদ ভঙ্গার্ণব। (স্যর্ উইলিয়ম জোন্স জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন দ্বারা হিন্দু আইনের সার সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে একখানি গ্রন্থের নাম বিবাদ ভঙ্গার্ণব) এই বিবাদ ভঙ্গার্ণব তন্ত্রে পরম্পরায় সকলেই বশীভূত হইয়া ক্রমে সকল বিবাদ ভঙ্গ করিয়া ফেলিতেছেন। ইহাতে নীতিশিক্ষার পথ পরিষ্কৃত হইতেছে। এখন আশা করা যাইতে পারে যে, অতঃপর শান্তভাবে সকলে নীতি চর্চ্চা করিতে সমর্থ হইবেন।

এই আশা যদি সকলের মনে স্থান না পায়, তাহার এই কারণ বলিতে পারি যে, তাহাদের মনে এখনো বিবাদের কণা রহিয়াছে। বিবাদ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইলেই নীতিশিক্ষার পক্ষে আর কোন বাধা বা অভাব থাকিবে না। এই বিষয়ে সংশয় পরিহারের জন্য ইহা আলোচনা করা আবশ্যক যে, পূর্ব্বে কি বিবাদ ছিল; কি প্রকারে তাহার ভঙ্গ বা নিবারণ হইতেছে; এবং অতঃপর কিরূপ নী[illegible]শিক্ষা সম্ভব।

১। এ দেশের রাজায় রাজায় বিবাদ। এই বিবাদানলে মোগল, পাঠান, রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় নরপতিগণ পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হইয়াছেন। দীর্ঘকালের এই কাল-অনলে এই মন্ত্র দ্বারা পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইয়াছে,—"হে ভারতের রাজা, সর্দ্দার ও অধিবাসীগণ! তোমরা কেহই স্বাধীন নহ। তোমরা এক চক্রবর্ত্তী রাজার অধীন। সেই চক্রবর্ত্তী রাজা বা সম্রাট তোমাদের দেশের মধ্যে কেহই নয়। অতএব তোমরা চক্ষু-শূল ত্যাগ করিয়া সুখী হও। তোমরা প্রসন্ন নেত্রে দেখ,—তোমাদের সাম্রাজ্য-শক্তি সমুদ্র পারে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। সেই অতুল শক্তির অধিকারিণী মহামহিমান্বিত শ্রীশ্রীমতী ভিক্‌টোরিয়া ব্রিটনেশ্বরী। আর যাঁহারা তোমাদিগকে স্বল্পকাল মধ্যে কর-কবলিত করিয়াছেন, তাঁহারা স্বয়ং ইংলণ্ডাধিপতি নহেন, তদ্দেশবাসী কতিপয় সমবেত বণিক্ মাত্র।" এবম্বিধ অবসন্নদশার মূল স্বরূপ হিংসা দ্বেষ ও অন্তর্ব্বিবাদকে দূরে ত্যাগ করিয়া এক্ষণে এতদ্দেশীয়েরা নীতিপালন করাকে অতীব কর্ত্তব্য জ্ঞান করিবেন। কারণ তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন,—
"বিপদন্তা হ্যবিনীত সম্পদঃ।"

২। হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ। এই বিবাদ কেবল হিন্দুদিগের পূর্ব্বাচরিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য ঘটিয়াছিল, বলিতে হইবে। "দারুণ রক্তপাতে এবং 'জহর ব্রতের' অনল শিখায় সেই পাপের" শান্তি ভোগ হইলে

বিবাদ আপনা হইতে প্রশমিত হইয়াছে। এক্ষণে হিন্দু মুসলমান উভয়েই তুল্য তপস্বী। উভয়েই শৌচাচার-রত ও পরমার্থ-পরায়ণ। হিন্দুদিগের ন্যায় মুসলমানেরাও বলেন,— বাসনা-নাশের দ্বারাই পরমার্থ সাধন হয়। তন্নিমিত্ত এই তিনটী অস্ত্র অবলম্বনীয়।—

খাঞ্জরে খামুসি ওসামসিরে জো।
নেজয়ে তন্হাই ওতরকে হেজো॥

অর্থাৎ (১) মৌনব্রতরূপ খড়্গ, (২) ক্ষুধা দমনরূপ তরবারি এবং (৩) নির্জ্জনবাস ও নিদ্রাত্যাগ রূপ ভল্ল। এই তিন অস্ত্র উদ্যত (মরত্বব্) না রাখিলে কোন প্রকার বাসনাকে নষ্ট করা যায় না।

ইহাতে প্রতীতি হইবে যে, যুদ্ধ-তৎপর মুসলমানেরা এক্ষণে 'খামুসি' অর্থাৎ মৌনকে খড়্গ রূপে, 'জো' অর্থাৎ ক্ষুধা দমনকে তরবারিরূপে এবং 'তন্হাই' ও 'তরকে হেজো' অর্থাৎ নিদ্রা ত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তা করাকে ভল্লরূপে গ্রহণ করিয়া বাসনা-নাশ দ্বারা পরমার্থ সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব ও নীতি কথায় তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পরিপূর্ণ। তাহাতে আমাদের আশ্চর্য্য এই হয় যে, এমন শাস্ত্রাবলম্বী লোকেরা কিরূপে অতি নিষ্ঠুর কর্ম্ম সকল করিতে পারিত। বোধ হয়, এক্ষণে কোরাণ ও গীতা, উভয় শাস্ত্র হইতে এই এক অর্থে উপদেশ পাইব,—"শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাংসমে যুক্ততমো মতঃ।"

৩। ইংরাজী ও সংস্কৃতে বিবাদ। ইংরাজ রাজত্বের নিতান্ত প্রারম্ভে সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় এ দেশীয় হিন্দু ও মুসলমানগণের শিক্ষা দানের বিধান হইয়াছিল। ১৭৮১ অব্দে স্থাপিত কলিকাতার মাদ্রাসা, ১৭৯১ অব্দে স্থাপিত বারাণসীর কলেজ, ১৮২৩-২৫ অব্দে স্থাপিত আগরা ও দিল্লীর কলেজ, এবং ১৮২৪ অব্দে স্থাপিত কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ এই বিধানের ফল। ইহার পরে ইংরাজীর প্রচলন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার কন্যা-রূপিণী দেশ-প্রচলিত ভাষাও বলবতী হইয়া উঠিল। এই গোলযোগে শিক্ষা সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষগণের বিবাদে অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইলে পর ১৮৩৯ অব্দে স্থিরীকৃত হইল যে, ইংরাজী, সংস্কৃত ও দেশ প্রচলিত, এই তিন ভাষাতেই শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। তদবধি শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা, তত্ত্বাবধায়ক, পরীক্ষক, অধ্যাপক ও স্কুল-সম্পাদকগণ অবিক্ষিপ্ত চিত্তে একপথে চলিয়া আসিতেছেন এবং একমনে শিক্ষাদানের সুপদ্ধতি নিরূপণের চেষ্টা করিতেছেন। এই সুলক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, নীতি শিক্ষারও সুপ্রণালী নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে।

৪। হিন্দু ও খ্রীষ্টান মিশনারির বিবাদ। এই বিবাদ এখনো মিটে নাই; কিন্তু মিটিবার পন্থায় আসিয়াছে। প্রথমতঃ খ্রীষ্টান মিশনরিরা এ দেশে স্কুল প্রকরণে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। মান্দ্রাজ, মুম্বই, (বোম্বাই) বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিম, সর্ব্ব দেশেই মিশনরিরা এ বিষয়ে অগ্রণী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় লোকেরাও স্কুল কলেজাদি স্থাপন করিয়া মিশনরিদিগের একাধিপত্যের খণ্ডন করিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষা সাক্ষাৎ অর্থকরী, এ জন্য সকলে আগ্রহ পূর্ব্বক মিশনরিদিগের বিদ্যালয়ে পড়িতে গিয়া থাকে। কিন্তু ছাত্রদিগকে খ্রীষ্টান করা মিশনরিদিগের মুখ্য অভিসন্ধি। এ জন্য তাঁহারা যে সকল চেষ্টা করেন, তাহা হিন্দুদিগের দৃষ্টিতে বিদ্রোহজনক প্রতীতি হয়। এই বিষয়ে

বহু বিবাদ চলিয়াছিল। মিশনরিরা অনেক আইনের সাহায্য পাইলেন। হিন্দুগণ নিরুপায় হইয়া ক্ষণিককাল ভাবিয়া ক্ষান্ত রহিলেন। পরন্তু স্বভাবক্রমে এই বিবাদ খর্ব্ব হইয়া আসিতে লাগিল। কারণ, হিন্দু সন্তানেরা আর সহজে খ্রীষ্টান হয় না। সম্প্রতি মিশনরিরা বালকদিগের সম্বন্ধে হতাশ হইয়া বালিকাদিগকে খ্রীষ্টান করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই দুরাশা টুক্ কাটিয়া গেলেই তাঁহাদের হস্ত হইতে হিন্দুদিগের নিস্তার হয়। মুসলমানদিগের সহিত খ্রীষ্টান মিশনরিদিগের ধর্ম্মান্তর-ঘটিত যদি বিবাদ থাকে, তাহা মৌখিক বা কেবল পুস্তকগত। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় কেহ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে না; অতএব মিশনরিদিগের সহিত তাঁহাদের মনোমালিন্য নাই বলিলেই চলে। মিশনরিদিগের খ্রীষ্টান করিবার অভিসন্ধি না দেখিলে, তাঁহাদের নিকট নিষ্কামভাবে নীতি শিক্ষা গ্রহণ করিতে সহজে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে।

৫। "দেশী" ও "বিলাতী" নামধেয় বিবাদ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বড় বড় জাহাজ এবং সেই জাহাজ হইতে টাকার বৃষ্টি, এদেশীয়দিগের চিত্তকে প্রথমে অত্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছিল। কিছুকাল পরে ইংরাজ বাহাদুর রেলওয়ে প্রভৃতি অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক বস্তুবৎ সৃষ্টি প্রকাশ করিলে এ দেশীয় লোকেরা তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও কর্ম্মপটুতা দেখিয়া আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করে। ইহার পূর্ব্বাবধি উক্ত বাহাদুরগণ মুখে যাহা বলুন, মনে মনে এ দেশীয়দিগের সকল বিষয়েই ন্যক্কার বোধ করিতেন। ক্রমে এই ভাব আইন আদালতে ফুটিয়া পড়ে এবং "নেটিব" বলিয়া ইহাদিগের নামকরণ হয়। "নাই বলিলে সাপের বিষও থাকে না"—এই একটী কথা এ দেশে প্রচলিত আছে। সত্য সত্যই এই প্রতাপশালী জাতির অবজ্ঞায় এবং "নাই" "নাই" শব্দে এ দেশীয়দিগের শক্তি সামর্থ্য সকলই অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তাহারা হীন হইতে হীনতর অবস্থায় অবতারিত হইল। * এইরূপে এ দেশীয়েরা আপনাদের হীনতা হেতু স্বকীয় বা স্বজাতীয় সমস্ত বিষয়কে হেয় জ্ঞান করিয়া বিলাতী বস্তু মাত্রেরই পক্ষপাতী হয়। কিন্তু হিন্দুদিগের বহুকালের রীতি নীতি আচার ব্যবহার একবারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে নাই। তাহাতে "দেশী" ও "বিলাতী" নামে বহু বিষয়ের দ্বন্দ্ব হইতে থাকে। এই দ্বন্দ্ববাতাহত হইয়া হিন্দুসমাজ বিপ্লুত ও বিপর্য্যস্ত হইবে, ইহা কাহারও বা আকাঙ্ক্ষিত, কাহারও বা আশঙ্কিত ছিল। পরন্তু সে বাত্যারও প্রশান্তি লক্ষণ দেখা যায়। "যাহা ভাল,—যাহা উৎকৃষ্ট, তাহা অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত।" এই নীতি এবং তদনুগত রুচি বজায় রাখিয়া এ দেশীয়েরা বিচার করিতেছেন, প্রকৃত পক্ষে স্বদেশীয় বা স্বজাতীয় কোন্ বিষয়টী ভাল, কোন্ বিষয়টী মন্দ। যাহা প্রকৃতার্থে উৎকৃষ্ট, তাহা রক্ষা বা গ্রহণ করিতে হিন্দুদিগের আপত্তি হইতে পারে না। এই ব্যবস্থায় "দেশী-বিলতী" বা স্বজাতীয়-বিজাতীয় বিবাদের

* রাজা রামমোহন রায় ১৮৩১ অব্দে ইংলণ্ডে গিয়া পার্লেমেণ্টের সভ্যদিগের নিকট এই দরবার করিয়াছিলেন যে, আপনারা ভারতবাসীদিগের উপযুক্ত মর্য্যাদা বিধান করুন, তাহাদের সদ্গুণাবলী উজ্জীবিত হইবে। The English works of Raja Ram Mohun Roy Vol. II. Pages 593, 594.

মীমাংসা হইয়া যাইবে, এবং সুশিক্ষা ও সদাচার অবাধে চলিতে থাকিবে,—এমন বিবেচনা হয়।

৬। আপনা আপনি বিবাদ বা ভিক্ষারি বিবাদ। রাজায়-রাজায় যে বিবাদ হইত, সে কথা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। আপনা-আপনি বিবাদও তাহারই প্রতিরূপ;—কেবল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, এই প্রভেদ। ভিক্ষার অরি, এই অর্থে ভিক্ষারি বা ভিখারি শব্দ গ্রহণ করিলে আমাদের এই বিবাদের প্রকৃতি ঐ শব্দে বিলক্ষণ অভিব্যক্ত হয়। বর্ত্তমান কালের নিয়মানুসারে যে ভিক্ষারিরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে দলে দলে এক বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণে সমবেত হয়, তাহারা এক এক মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণের উপলক্ষে আগ্রহাতিশয় প্রযুক্ত পরস্পরকে শত্রু মনে করিয়া কি প্রকার কোলাহল ও পরস্পর কটুবাক্য প্রয়োগ করে, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাভের জন্য পরস্পরের সেইরূপ হানাহানি বা কাড়াকাড়ি প্রসিদ্ধ হইয়াছে। জ্ঞানানুশীলন বিষয়েও আমরা ঐরূপ পরপ্রত্যাশী। ইতিহাস, ভূতত্ব ও বিজ্ঞানাদি বিষয়ে আমরা ইংরাজী ঢোলের কাঁসি বাজাইয়া থাকি। তাহাতেই আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে দম্ভ ও মত্ততার সীমা থাকে না। এই বিষয়েও আমাদের মধ্যে বিবাদের প্রশমন হইতেছে। আমরা বুঝিতেছি যে, পরস্পর বিবাদ ও কোলাহল করিলে মুষ্টিভিক্ষাও মিলিবে না; দ্বারবান হাঁকাইয়া দিবে; আর পরের চক্ষুতে দেখা এবং নিজের চক্ষুতে দেখায় বহু অন্তর।

ভারতে এই সকল বিবাদ থাকিতে থাকিতে যে নীতি শিক্ষার সমুচিত ফল লাভ হইবে না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আর এই সকল বিবাদের মীমাংসা হইয়া গেলে এদেশে যে সুমহৎ নীতি তন্ত্রের উদয় হইবে, তাহাতে পৃথিবীর পক্ষে নূতন শ্রী আবির্ভূত হইবে, এমনও বলা যায়। "ইংরাজ রাজত্বে বাঘে বলদে একত্র জল খায়" এই বাক্য প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই বাঘ ও বলদ পরস্পরের দিকে আড়ে আড়ে চাহিয়া থাকে, ইহাও সত্য। আর সুযোগ পাইলে এই শোণিত-পিপাসু বাঘ যে বলদের স্কন্ধে দন্ত পরামর্শ না করে, তাহাই বা কে বলিবে? কিন্তু নীতি-মাহাত্ম্যে এমন শুনা যায় যে, তৎপ্রভাবে বাঘ ও বলদ সদ্ভাবে পরস্পরের গাত্র লেহন করিতে থাকে। ভারতের পক্ষে এই দৃশ্য অসম্ভব নহে। সুনীতি ও সদ্ধর্ম্মের এইরূপ অমৃতময় ফল ভারত-বৃক্ষে পূর্ব্বকালে প্রসূত হইয়াছিল, পরেও জন্মিতে পারিবে। ইংরাজ রাজত্বের গুণে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান, পারসি, শিখ এবং আজিকার উন্নত ব্রাহ্ম প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা এক মাতার পুত্রের ন্যায় নির্ব্বিবাদে ভারতের কল্যাণ এবং আত্ম কল্যাণ সাধনে রত হইলে, পূর্ব্বকালীন সেই স্বর্গীয় সদ্ভাবের দৃশ্য কি পুনরাবির্ভূত বোধ হইবে না? আর তদ্দ্বারা পৃথিবীর পক্ষে কি নূতনতর শিক্ষাদান সংরচিত হইবে না? ভারতবর্ষ বহুল নূতন পদার্থের উৎপত্তি স্থান। এস্থানের নীতিতন্ত্রও সেইরূপ অপূর্ব্ব শোভা, মাধুর্য্য ও কল্যাণ বহন করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

শ্রীভগবদ্‌গীতা।

পঞ্চম অধ্যায়।

সন্ন্যাস যোগ।

"নিবার্য্য সংশয়ং জিষ্ণো কর্ম্মসন্ন্যাসযোগয়োঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চম মুক্তি মব্রবীৎ॥" (স্বামী)
অধ্যায়াভ্যাং কৃতো স্বাভ্যাং নির্ণয়ঃ কর্ম্মবোধয়োঃ।
কর্ম্ম তত্ত্যাগয়োর্দ্বাভ্যাং নির্ণয়ঃ ক্রিয়তেঽধুনা।" (মধু)

অর্জ্জুন—

কর্ম্মের সন্ন্যাস কৃষ্ণ, যোগ পুন আর
করিলে প্রশংসা তুমি ; এ দুয়ের মাঝে
শ্রেয় যাহা—কহ মোরে নিশ্চয় করিয়া। ১

শ্রীভগবান—

সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ—হয় উভয়েই
মুক্তির কারণ ; কিন্তু তাহাদের মাঝে
কর্ম্মযোগ শ্রেয়তর—কর্ম্মত্যাগ হতে। ২

(১) কর্ম্মের সন্ন্যাস—শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিশেষ পরিত্যাগ (শঙ্কর)। সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যাপার বিরতি রূপ জ্ঞানযোগ (বলদেব)।

যোগ—শাস্ত্রীয় কর্ম্ম বিশেষের অনুষ্ঠান (শঙ্কর)। সর্ব্বেন্দ্রির ব্যাপাররূপ কর্ম্মানুষ্ঠান (বলদেব)।

শ্রেয় যাহা—চতুর্থ অধ্যায়ের ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৩ ২৪, ৩৩, ৩৭ ও ৪১ শ্লোকে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু অধ্যায় শেষে অর্জ্জুনকে কর্ম্ম-যোগ অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। স্থিতি ও গতি যেমন পরস্পর বিরোধী অর্থাৎ যুগপৎ এক সময়ে হয় না, তেমনি কর্ম্মানুস্থান ও কর্ম্মসন্ন্যাস পরস্পর বিরোধী। ইহাদের মধ্যে এক সময়ে একেরই সাধনা সম্ভব। এই জন্য এ উভয়ের মধ্যে কোনটী শ্রেয়, তাহা অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন (শঙ্কর)।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, প্রথম চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মযোগ কর্ত্তব্য। তাহাদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে জ্ঞানযোগের সহায়ে আত্মদর্শন লাভ হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগাধিকারীর পক্ষেও কর্ম্মনিষ্ঠা শ্রেয়, ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে। আর চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত হই-য়াছে যে, কর্ম্মযোগের জ্ঞানাংশ কর্ম্মাংশের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয়, তাহা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিবার জন্যই অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন হইয়াছে (রামানুজ)

(২) সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ—মুক্তির কারণ— পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, জ্ঞানহীন সন্ন্যাস বা শুধু কর্ম্মত্যাগ অতি নিকৃষ্ট। ইহাতে কোন ফল নাই। এই স্থানে এরূপ কর্ম্মসন্ন্যাসের কথা উপদিষ্ট হয় নাই। প্রকৃত সন্ন্যাস দুই রূপে হইতে পারে। প্রথমতঃ, সাংখ্য জ্ঞানে আত্মার স্বরূপ—তাহার নিষ্ক্রিয় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া, কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া আত্মাতে অবস্থান হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও জ্ঞান লাভ হেতু সেই কর্ম্মে আত্মার অকর্তৃত্ব অনুভব করিয়া কর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত থাকা যাইতে পারে।

এই স্থলে কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস বুঝিতে হইলে দুই একটী দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিতে হয়। মানুষের সাধারণতঃ দুই রূপ শক্তি আছে ধরিয়া লওয়া যায়। এক জ্ঞানশক্তি,আর এক কর্ম্মশক্তি। কেহ কেহ বলেন, জ্ঞানশক্তি আত্মার স্বরূপ, আর কর্ম্মশক্তি আত্মার গুণ বা ধর্ম্ম নহে, ইহা প্রকৃতি হইতে জাত ও প্রকৃতির অধীন। সুতরাং আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতে হইলে কর্ম্মত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু কর্ম্মত্যাগ সহজ কথা নহে। কদাচিৎ কখন এমন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন, যাঁহার জ্ঞানশক্তি পূর্ণ বিকাশিত ও কর্ম্ম-সম্পূর্ণ সংযত। এরূপ লোক অনায়াসে কর্ম্মত্যাগ করিয়া "নিত্যবোধ স্বরূপ" আত্মাতে বা জ্ঞানে অবস্থান করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষমাত্রে কত-

কটা প্রবৃত্তি লইয়া ও প্রবৃত্তির অধীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এই প্রবৃত্তি পূর্ব্ব জন্মসংস্কারজও বোধ হয় কতকটা পিতৃমাতৃজ। এ প্রবৃত্তি স্বাভাবিক, ইহার মূল বাসনা, ইহা আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ বা বিতৃষ্ণা উৎপাদন করে। আমাদিগকে নিজ সুখলাভ করিতে ও দুঃখ দূর করিতে প্রবৃত্ত করায়। এই প্রবৃত্তিই আমাদিগের কর্ম্মশক্তি উৎপাদন করে। ইহাই আমাদের জ্ঞানশক্তিকে মলিন বা অভিভূত করিয়া রাখে। যাহাদের স্বভাব জড় তামস ভাবাপন্ন, তাহাদের জ্ঞানশক্তি সম্পূর্ণ অভিভূত। যাহাদের প্রকৃতি তত জড় ভাবাপন্ন নহে, যাহারা রজঃ শক্তি বলে নহে, যাহাদের প্রকৃতি স্বভাবতঃ কর্ম্মমুখী, তাহারাও শুদ্ধজ্ঞানে অবস্থান করিতে পারে না। তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক কর্ম্মবৃত্তি সংযত করিয়া কর্ম্মহীন হইয়া থাকিতে পারে না।

প্রায় সকল লোকেই এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের কর্ম্মযোগ অবলম্বনীয়। এই কর্ম্মযোগ সাধনার মূলমন্ত্র আত্মজয়। ইহার জন্য স্বার্থ একেবারে বিসর্জন দিতে শিক্ষা করিতে হয় 'সর্ব্বভূত হিতে রত' হইয়া লোক সংগ্রহার্থ কার্য্য করিতে হয়, সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করিয়া 'সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা' হইতে শিক্ষা করিতে হয়, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সংযত করিয়া—কাম ক্রোধ বেগ সম্বরণ করিয়া—রাগ দ্বেষ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া 'সাম্যে' অবস্থান করিতে হয়। এই স্বার্থত্যাগ ও আত্মজয় হইতে ক্রমে চিত্ত নির্ম্মল হয়। সে অবস্থায় কর্ম্মযোগী কর্ম্ম করিয়াও সন্ন্যাসী থাকেন।

প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য চিত্তের নির্ম্মলতা নিতান্ত প্রয়োজন। পূর্ব্বে আমাদের জ্ঞান শক্তি ও প্রবৃত্তিজ কর্ম্ম শক্তির কথা যে বলা হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে সাধারণতঃ এই কর্ম্ম শক্তির অধিক স্ফূর্ত্তিতে জ্ঞান শক্তি মলিন হইয়া পড়ে। এই জন্য প্রবৃত্তি দমন করিয়া এই কর্ম্মশক্তির সংযম শিক্ষা করিতে হয়। তাহা দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে সেই নির্ম্মল অন্তঃকরণে তাহাতে অধ্যাত্ম জ্ঞান স্বতঃ স্ফূর্ত্ত হয়।

এস্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, জ্ঞান উৎপত্তি সম্বন্ধে দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বলেন যে, প্রমাণ ও পরীক্ষার দ্বারা আমাদের জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি ও বৃদ্ধি হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ সকল জ্ঞানের মূল। এই মতানুসারে প্রকৃত আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। কেন না, শুধু প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ তর্ক, বা যুক্তির দ্বারা এই জ্ঞান লাভ হয় না। প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্ম বা আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহা জর্ম্মান পণ্ডিত-প্রধান কাণ্ট নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন করিয়া দেন।

আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে সাধারণ প্রচলিত দার্শনিক মত এই যে,এই জ্ঞান অনাদি অনন্ত। ব্রহ্মই এই জ্ঞানময় বা চিন্ময়। জীব চিত্তে এই জ্ঞান প্রতিফলিত হয়। চিত্ত যত নির্ম্মল হয়,ততই এই জ্ঞান পরিষ্কাররূপে স্ফূর্ত্ত হইতে থাকে। নির্ম্মল দর্পণে সূর্য্য প্রতিবিম্ব যেমন পূর্ণ প্রকাশিত হয়—নির্ম্মল চিত্তে সেইরূপ আত্মজ্ঞানও পূর্ণ বিকশিত হয়। কোন কোন বিলাতী পণ্ডিতও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। স্পাইনোজা, কূজে, হেগেল প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত এই মতের পক্ষপাতী। তাহার পর চিত্ত নির্ম্মল হইলে আর নিত্য নৈমিত্তিক শাস্ত্রীয় কর্ম্মের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু তখন জ্ঞান পরিপাক জন্য ধ্যানযোগ আবশ্যক হয়। ধ্যান পরিপাকে প্রকৃত বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, আত্মদর্শন হয়।

গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে, আমাদের বুদ্ধি প্রথমতঃ বিক্ষিপ্ত বা অব্যবসায়াত্মিকা থাকে। পরে সাধনা দ্বারা আমাদের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মে। এই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি দুইরূপ; সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি। সাংখ্য বুদ্ধির ফল জ্ঞানযোগ; তাহার পরিণাম সন্ন্যাস; ও তাহা হইতে ধ্যানযোগ বলে "সমাধিতে অচলা বুদ্ধি" হইয়া 'যোগ' বা ব্রহ্ম নির্ব্বাণ অর্থাৎ ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়। সেইরূপ যোগবুদ্ধি হইতে কর্ম্মযোগে রত হওয়া যায়। তাহার পরিপাক জ্ঞান, তাহা হইতে সন্ন্যাস ও শেষে ধ্যানযোগে সিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয়।

এস্থলে যে কথা বলা হইল, ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, জ্ঞান উৎপত্তির পূর্ব্বে কর্ম্মসন্ন্যাস বৃথা। জ্ঞানের দ্বারা আত্মার অকর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি করিতে হয়। এই অকর্ত্তৃত্ব উপলব্ধিই প্রকৃত সন্ন্যাস। সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ের দ্বারাই এই জ্ঞান লাভ হয়। নতুবা কর্ম্ম করা বা কর্ম্মত্যাগ করা উভয় স্থলেই আত্মকর্ত্তৃত্ব বোধ বা অভিমান থাকে। যতদিন

আত্ম কর্তৃত্ব থাকে, ততদিন সাধনার অবস্থা। কেন না কর্তৃত্ববোধ বা অভিমান দূর করিবার জন্যই সাধনা। যখন অভিমান দূর হয়, আত্মকর্তৃত্ব বোধ নষ্ট হয়, তখন কর্ম্ম করা বা কর্ম্ম ত্যাগ করা সমান কথা। তখন কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন হয়। ইহাই প্রকৃত কর্ম্ম-সন্ন্যাস অবস্থা। কর্ম্মযোগে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও এই সন্ন্যাস অবস্থা লাভ করা যাইতে পারে।

আর একরূপ সন্ন্যাসের কথা শঙ্করাচার্য্য উল্লেখ করিয়াছেন। বেদান্ত বাক্যার্থ উপলব্ধি হইলে ক্রমশ নিদিধ্যাসন পরিপাকে যে অদ্বৈত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যাহাতে জীব ও ব্রহ্মে ঐক্য জ্ঞান জন্মে, যাহাতে জগৎ মিথ্যা ধারণা হইয়া কেবল একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান মাত্র অবশেষ থাকে, যাহাতে এ জগৎ জ্ঞান বা দ্বৈত জ্ঞান একেবারে লোপ হইয়া যায়—সেই জীবন্মুক্ত নিস্পন্দ অবস্থায় কোনরূপ কর্ম্ম সম্ভব হয় না। কিন্তু এইরূপ কর্ম্ম সন্ন্যাস অবস্থা বা নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থান গীতায় কোথাও স্পষ্ট করিয়া উপদিষ্ট হয় নাই। গীতার পূর্ণ মুক্ত পুরুষের আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ভগবান, তিনি কেবল চিন্ময় বা চিদানন্দময় নহেন; তিনি পূর্ণ সচ্চিদানন্দময়। তিনি নিষ্ক্রিয় হইয়া কেবল জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করেন না বা কেবল পূর্ণ আনন্দে নিমগ্ন থাকেন না। তিনি কর্ম্মে রত।

তিনি নিজে কর্ম্মহীন হইয়াও—লোক হিতার্থ—জগৎ রক্ষার্থ কর্ম্ম করেন। সুতরাং তাঁহার দিব্য জন্ম কর্ম্ম বুঝিলে—কর্ম্ম তত্ত্বের আমরা গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারি। অর্থাৎ আমরা যদি সাধনা সিদ্ধ হইয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারি—তথাপি সে অবস্থায়ও আমরা লোক সংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিব। তখন মুক্ত হইয়াছি বলিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিব না। সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করিলে বা ব্রহ্মে অবস্থান করিলেও এই জন্য কর্ম্ম পথে বাধা হয় না।

অতএব গীতা হইতে আমরা এই মহতীতত্ত্ব জানিতে পারি যে, সাধনার প্রথম অবস্থা হইতে জ্ঞান লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের কর্ম্মযোগ কর্ত্তব্য। তাহার পর জ্ঞান লাভ হইলে, নিজে নিষ্ক্রিয় হইয়াও—জগতের জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্ম-শক্তি যদি আমাদের প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়—তবেই তাহা দূষণীয়; কিন্তু যদি ইহা এই নির্ম্মল সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান দ্বারা চালিত হয়—তবে তাহাতে কোন দোষ নাই। কেননা জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম্মের দোষ নষ্ট হইয়া যায়। শাস্ত্রে আছে, জীব মায়া বা প্রকৃতির দ্বারা বশীভূত বা মোহিত, আর ঈশ্বর এই মায়ার বা প্রকৃতির নিয়ন্তা। জীব ও প্রকৃতিজ কর্ম্মশক্তির অধীন না হইয়া—জ্ঞান দ্বারা তাহাকে নিয়মিত করিলে—ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়—বা মুক্ত হয়, এ কথা বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক, এই শ্লোকে গীতায় যে কর্ম্ম সন্ন্যাস ও যোগের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা সাধনা অবস্থার কথা। অর্জ্জুনের প্রশ্নের মর্ম্ম এই যে, জ্ঞান লাভের জন্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞানযোগ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য—না কর্ম্মযোগ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ইহারই উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, উভয় মার্গেরই শেষ পরিণাম এক—তবে কর্ম্ম মার্গ শ্রেয়, কেননা জ্ঞান-মার্গে একেবারে—অর্থাৎ কর্ম্মযোগের পূর্ব্বে অবলম্বন করিলে তাহাতে বিশেষ কষ্ট আছে।

স্বামী এই শ্লোক এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—"আমি বেদান্তবিদ্ আত্মতত্ত্বজ্ঞের জন্য কর্ম্মযোগের কথা বলি নাই। ইহাদের কর্ম্ম সন্ন্যাস প্রয়োজন, কেবল অবিবেকী দেহাত্মবিদ্দিগের সংশয় ছেদ জন্য পরমাত্মজ্ঞানের উপায়ভূত কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছি। এবং কর্ম্মযোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে যাহার আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তাহার কর্ম্ম সন্ন্যাস-বিহিত—ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়েই ভূমিকা বা অধিকারীভেদে তুল্যরূপে উপকারী।"

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "অনাত্মবিদ্দিগের পক্ষে কর্ম্ম সন্ন্যাস হইতে পারে না—তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; এজন্য যাহারা আত্মবিদ্, তাহাদের মধ্যে কর্ম্মযোগ বা জ্ঞানযোগ কোনটী শ্রেয়—অর্জ্জুনের ইহাই জিজ্ঞাস্য—অনেকে এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু এ অর্থ সঙ্গত নহে। কেননা প্রকৃত আত্মজ্ঞান হইলে কর্ত্তৃত্বজ্ঞান বা দ্বৈতজ্ঞান থাকে না—সুতরাং তখন কর্ম্মযোগ সম্ভব হয় না। এইজন্য অর্জ্জুনের প্রশ্নের অর্থ এই যে, কর্তৃত্বজ্ঞান থাকা কালে—অর্থাৎ প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে কর্ম্মযোগ ও কর্ম্ম ত্যাগ ইহাদের মধ্যে কোন্টী শ্রেয়; এবং দ্বিতীয় শ্লোকে তদনুসারেই ভগবান উত্তর দিয়াছেন।"

রামানুজ বলেন, "যে জ্ঞানযোগশক্ত, তাহারি

জে'ন সে নিত্য সন্ন্যাসী—দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা
নাহি যায় ; হে অর্জ্জুন, দ্বন্দ্বহীন যেই
অনায়াসে হয় মুক্ত বন্ধন হইতে। ৩
"সাংখ্য আর যোগ ভিন্ন"—কহে বালকেরা,
পণ্ডিত না কহে কভু। উভয়েরি ফল
হয় লাভ—ভালরূপে একে আস্থা হলে। ৪
সাংখ্য হতে যেই স্থান হয় লাভ, হয়—
তাই লাভ যোগ হতে ; সেই ত দেখেছে
সাংখ্য আর যোগ এক যে ইহা হেরেছে। ৫
কিন্তু হে অর্জ্জুন, যোগ বিনা এ সন্ন্যাস
হয় বড় দুঃখে লাভ ; যোগযুক্ত মুনি
অচিরেতে ব্রহ্মেতেই করেন প্রয়াণ। ৬

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

পক্ষেও কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয় সাধনই মোক্ষের কারণ।"

বলদেব বলেন, "যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার পক্ষেও কর্ম্মযোগ দোষাবহ নহে ; কেননা কর্ম্মযোগে জ্ঞান উৎপন্ন করে, ও জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহাকে দৃঢ় করে, এবং তাহা সুকর ও প্রমাদ শূন্য।"

(৩) নিত্যসন্ন্যাসী—সেই কর্ম্মযোগীই নিত্য-সন্ন্যাসী (শঙ্কর রামানুজ) সেই বিশুদ্ধ চিত্ত কর্ম্মযোগী জ্ঞানযোগনিষ্ঠ অর্থাৎ কর্ম্মান্তর্গত আত্মানুভবজাত আনন্দ পরিতৃপ্ত (বলদেব, রামানুজ)। পরমেশ্বরার্থ অনুষ্ঠিত নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান কালেও যে রাগদ্বেষ শূন্য থাকে, সেই নিত্যসন্ন্যাসী (স্বামী)। সে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও নিত্যসন্ন্যাসী থাকে (মধু)।

বন্ধন—সংসার (স্বামী),জ্ঞানের বন্ধন (মধু)।

(৪) সাংখ্য—অর্থাৎ কর্ম্মসন্ন্যাস; পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত কর্ম্মসন্ন্যাসের প্রতিশব্দ স্বরূপ 'সাংখ্য' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (শঙ্কর)। সাংখ্য—জ্ঞাননিষ্ঠা ও তদঙ্গ সন্ন্যাস (স্বামী)।

উভয়েরই ফল—নিঃশ্রেয়স ফল (শঙ্কর)। আত্মাবলোকন রূপ ফল লাভ পক্ষে কর্ম্মযোগ সাংখ্য-যোগের অপেক্ষা করে না (রামানুজ)। সাংখ্যযোগে যেরূপ মোক্ষ লাভ হয়, কর্ম্মযোগেও জ্ঞান দ্বারে সেই-রূপ মোক্ষলাভ হইতে পারে (স্বামী)।

ভালরূপে আস্থা হলে—সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠিত হইলে (শঙ্কর)। নিজ অধিকার অনুসারে যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইলে (মধু)।

(৫) সাংখ্য হতে যেই স্থান—সাংখ্য প্রবচনে আছে, "জ্ঞানান্ মুক্তিঃ (২।২৩), এবং "বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ" (২।২৪) আর "সমাধি সুষুপ্তি মোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা"। (৫।১১৬)। অর্থাৎ জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়, মিথ্যা-জ্ঞান বন্ধনের কারণ, আর সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষে, ব্রহ্মরূপ লাভ হয়।

তাই লাভ যোগ হতে—সাংখ্য ও যোগ, এ উভয়ের একটী নিবৃত্তি রূপ ও অপরটী প্রবৃত্তি রূপ বলিয়া ভিন্ন হইলেও—উভয়ের শেষ পরিণাম একই (বলদেব)। জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসে যেমন মোক্ষ হয়, তেমনি জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়ভূত ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, নিজ ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিলে, পরমার্থ জ্ঞান সন্ন্যাস লাভ দ্বারা সেই ফলই লাভ হয় (স্বামী, শঙ্কর)। মধুসূদন বলেন, যদি কাহাকেও একেবারে সন্ন্যাস পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া মুক্তিপথে যাইতে দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বজন্মে তাহার কর্ম্মযোগ হেতু চিত্তশুদ্ধি হইয়াছিল। কেননা শাস্ত্রে আছে,

যান্যতেঽন্যানি জন্মানি তেষু নূনং কৃতং ভবেৎ।
সৎকৃত্য পুরুষেণেহ নান্যথা ব্রহ্মনি স্থিতিঃ।"

সেইরূপ যাহারা এখন কর্ম্মনিষ্ঠারত ভবিষ্যতে বা অন্য জন্মে তাহাদের জ্ঞান নিষ্ঠা হইবে, ইহা বলা যায়। (এই অর্থ সংকীর্ণ বোধ হয়)।

সেই ত দেখেছে—সেই সম্যক্ দর্শী পণ্ডিত। (মধু)।

(৬) অর্জ্জুন প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কর্ম্ম সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ ইহার মধ্যে কোন্টী শ্রেয়ঃ ? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছিল, কর্ম্ম সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। ইহার অর্থ এই যে, জ্ঞান লাভের পূর্ব্বেই কর্ম্মযোগ, কর্ম্ম সন্ন্যাস হইতে শ্রেষ্ঠ—কিন্তু জ্ঞান লাভের পরে পারমার্থিক সন্ন্যাস বা সাংখ্যযোগই শ্রেয় (শঙ্কর)। চিত্তশুদ্ধির পূর্ব্বে কর্ম্মযোগ কর্ম্ম সন্ন্যাস হইতে শ্রেষ্ঠ (স্বামী, এইরূপ বলিবার কারণ কি, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

পবিত্র কোরাণের সত্যতা। (১)

এসলাম-ধর্ম্মের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত মুসলমানগণ অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের নিকট অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত এই দাবি করিয়া আসিতেছেন যে, কোরাণ ঈশ্বর-প্রেরিত ও কোরাণের প্রত্যেক শব্দ ঈশ্বর-বাণী। এসলাম-ধর্ম্মাবলম্বিগণ এই দাবি যে বর্ত্তমান সময়ের অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগেরই নিকট করিয়া আসিতেছেন, তাহা নহে; তাঁহারা ১৩০০ বৎসর হইতে এই দাবি পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নিকট, তাঁহাদের শত সহস্র গুরুতর বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও, আজ পর্য্যন্ত জাজ্জ্বল্যমান রাখিয়াছেন। পবিত্র কোরাণের এই দাবি সাব্যস্থ করাইবার জন্য এসলাম যে সকল প্রমাণ দর্শাইয়া আসিতেছেন, উক্ত প্রমাণগুলি এরূপ নহে যে, তাহা কেবলমাত্র প্রকারান্তরে বিশ্বাস করিয়া লইবার জন্য অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণকে অনুরোধ করা হইয়াছে; বরঞ্চ তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের এসলাম-ইতিহাস বা এই পবিত্র কোরাণ সম্বন্ধে কিঞ্চিতমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, ঐ সকল প্রমাণের দ্বারায় কোরাণের ঐ দাবি সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য তাঁহাদিগকে বাধ্য করা গিয়াছে। পবিত্র কোরাণের ঐ দাবি অন্যান্য উদাহরণের দ্বারায় প্রমাণ করাইবার পূর্ব্বে, ব্যক্ত করা আবশ্যক যে, কোরাণে এই দাবির পরিপোষক কোনরূপ প্রমাণ বা উক্তি আছে কি না?

এই দাবির পোষকতায় কোরাণ হইতে যে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাঁহার সার মর্ম্ম এই, অর্থাৎ কোরাণ এই কথা বলিতেছেন, "আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়াছি ও আমি স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী। যদ্যপি ইহাতে কেহ কোন প্রকার সন্দেহ করেন, তবে তিনি নিজে কিম্বা তিনি যাঁহাকে এই কার্য্যের নিমিত্ত অত্যন্ত উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিবেন, তাঁহার দ্বারায় এই কোরাণের কোন এক পংক্তির সদৃশ রচনা করিয়া আনয়ন করুন। তাহা কদাচ পারিবেন না।" কোরাণের এই উক্তির দ্বারা এসলাম স্পষ্টই প্রমাণ করাইয়া দিতেছে যে, এই পবিত্র কোরাণ ঈশ্বর-প্রেরিত, ঈশ্বর বাণী ও অলৌকিক গ্রন্থ। এই প্রকার গ্রন্থ রচনা করা মনুষ্যের অসাধ্য।

কোরাণের এই উক্তিটীকে যদি ন্যায়শাস্ত্র (Logic) মতে বর্ণনা করা যায়, তাহা হইলে তাহার এইরূপ বর্ণনা হইবে; অর্থাৎ "এই-প্রকার বাক্য কোন মনুষ্য রচনা করিতে পারে না" "যে প্রকার বাক্য মনুষ্য রচনা করিতে পারে না, তাহা ঈশ্বর-বাক্য।" "এইজন্য এই প্রকারের বাক্য (অর্থাৎ কোরাণ) ঈশ্বর-বাক্য"। প্রথম দুইটী বর্ণনা যদ্যপি সত্য প্রমাণ হইয়া যায়, তাহা হইলে শেষ বর্ণনাটী আপনা আপনি সহজেই বিনা প্রমাণে প্রমাণিত হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রথম দুইটী বর্ণনা এরূপ সহজ নহে যে, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি শুনিবামাত্রই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, এই জন্য ঐ দুইটী বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করা আবশ্যক। প্রথম পদ অর্থাৎ "এই প্রকার বাক্য মনুষ্য রচনা করিতে পারে না;" ইহার প্রমাণ দ্বিবিধ। প্রথম ঐতিহাসিক, দ্বিতীয় জ্ঞান-

সঙ্গত। কেবলমাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বিশ্বাস করাকে আমি ঐতিহাসিক প্রমাণ বলি না। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ এসলাম ধর্ম্মের বিশেষ তত্ত্ব লইয়া তাহার যে ইতিবৃত্ত যথাযথরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং যে সকল ইতিহাস জ্ঞানবান পাঠকগণের নিকট বিশ্বাসের যোগ্য, আমি তাহাকে ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।

ঐতিহাসিক প্রমাণ সম্বন্ধের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, প্রথমতঃ ইহাই প্রমাণ করা আবশ্যক হইতেছে যে, যে কোরাণ বর্ত্তমান সময়ে এসলাম সমাজে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা বাস্তবিক সেই প্রাচীন কোরাণ কিনা, যাহা আরবি পায়গাম্বরের সময়ে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারই জীবিতকালে সম্পূর্ণ হইয়াছিল?

এই প্রমাণটী অতি সহজেই হইয়া যাইতে পারে। কারণ পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষিত ও বিদ্বান, খ্রীষ্টান, ইহুদি, হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভৃতি যাবতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ, যাঁহারা এসলাম ধর্ম্মের বিষয় কিঞ্চিৎ মাত্রও অবগত আছেন, তাঁহারা কোনমতেই ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না যে, এসলাম-ধর্ম্ম আবিষ্কারক আরব্যদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভাষাও আরবি ছিল এবং এই পবিত্র কোরাণও আরবি ভাষায় আরব্যদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ১৩০০ বৎসর হইল এই কোরাণ অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইহার বিশ্বাসীগণের সংখ্যাও কুড়ি কোটীর অধিক। দেখা যাইতেছে যে, মুসলমান সম্প্রদায় সমস্ত পৃথিবীর যাবতীয় দেশ, মহাদেশ, দ্বীপ, উপদ্বীপ প্রভৃতিতে বিস্তৃত রহিয়াছেন। এ কথা স্বীকার্য্য যে, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে যেরূপ অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে নানা শাখা হইয়াছে, তদ্রূপ এসলাম ধর্ম্মেও নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় হইয়া পরস্পরে বিভিন্ন হইয়া আছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত এসলাম-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নিকট কোন প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন কোরাণ দৃষ্টিগোচর হয় না, কোরাণ সর্ব্বত্রই একই প্রকারের রহিয়াছে। কোন স্থানের কোন সম্প্রদায়ের কোরাণ যে কোন দেশ বা যে কোন সম্প্রদায়ের দ্বারায় লিখিত হউক না কেন, তাহাতে এক শব্দেরও প্রভেদ বা পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায় নাই। যদি এই প্রকার পরিবর্ত্তন বা প্রভেদ হইত, তাহা হইলে সেই প্রভেদ ও পরিবর্ত্তন সেই দেশের সেই সম্প্রদায়ের সেই সময়ের কোরাণে থাকিত; পূর্ব্ব সময়ের কিম্বা অন্য দেশবাসীদিগের কোরাণের সহিত কদাচ ঐক্য হইত না। এইরূপ পরিবর্ত্তিত কোরাণ আজ পর্য্যন্ত কোনও স্থানে পাওয়া যায় নাই। অতএব এই প্রমাণের দ্বারায় এসলাম প্রমাণিত করিয়া দিতেছে যে, যে কোরাণ এই সময়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা বাস্তবিকই সেই কোরাণ; যাহা আরবি পায়গাম্বরের জীবিতকালে অবতীর্ণ ও সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তাহাই বিনা পরিবর্ত্তনে আজ পর্য্যন্ত এসলাম-সমাজে-জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে।

এস্থলে এসলাম ধর্ম্মের কোন শত্রু, এসলাম ধর্ম্মের ইতিহাসে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত, এরূপ সন্দেহ বা দোষারোপ করিতে পারেন যে, হাজরাত ওস্মান, যিনি কোরাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রণম্য, তিনিই কোরাণ সংগ্রহ কালীন তাহাতে কোন প্রকার যোগ বা পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন, এবং সেই সময়ে সমস্ত মুসলমানগণ তাঁহারই অধীনস্থ থাকায়, তাঁহার কৃত কার্য্যের উপর কেহ কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করেন নাই,

বা করিতে পারেন নাই। এসলাম ধর্ম্মের ইতিহাস বা ক্রিয়াকলাপের প্রতি সম্যক্‌রূপে দৃষ্টি করিলেই এ অমূলক সন্দেহ তিরোহিত হইয়া যায়। এস্থলে পাঠকগণের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে,হাজ্‌রাত মহম্মদের (দারূদ্‌) জীবিত সময় হইতে এসলাম সমাজে কি প্রকার কোরাণের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে? মহম্মদ প্রতিদিন ৫ বার উপাসনার (নামাজের) সহিত কোরাণ পাঠ করা সমস্ত মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্বরূপ পরিগণিত করিয়া গিয়াছেন;—কোরাণের শিক্ষা মুসলমানগণের সত্যপথ-প্রদর্শক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, ইহা ভিন্ন কেবল মাত্র কোরাণ পাঠ করাকে একটী মহাপুণ্যের কার্য্য বলিয়া নিরূপিত করিয়া গিয়াছেন। এই সকল উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া আরব্য উপদ্বীপের সমস্ত স্ত্রী ও পুরুষগণ,যাঁহারা আরবি পায়গাম্বরের জীবিত সময়ে এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,সকলেই সাধ্যমত কোরাণ মুখস্থ রাখিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন কোরাণ বেদ কি বাইবেলের ন্যায় অত্যন্ত বৃহৎ পুস্তক নয় বলিয়া এবং আরবি ভাষাতেই কোরাণ অবতীর্ণ হওয়ায়, সকল মুসলমানের পক্ষে কোরাণ মুখস্থ রাখা অত্যন্ত সহজ ছিল। কোরাণ অবতীর্ণকালে আরবদেশে কোন প্রকার লেখা পড়ার সরঞ্জাম ছিল না; এদিকে কোরাণ মুখস্থ ও স্মরণ রাখিবার জন্য আরবি পায়গাম্বরের বিশেষরূপ তাড়না ছিল। সুতরাং তৎকালের মুসলমানগণ, যতদূর সম্ভব, সকলেই কোরাণ মুখস্থ রাখিতেন। এসলাম ইতিহাস ও হাদিশ্‌ সকলের দ্বারা বিশেষরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, আরবি পায়গাম্বরের জীবিতকালে সাহাবাদের মধ্যে শত শত লোক এরূপ বর্ত্তমান ছিলেন, অতি বিশুদ্ধরূপে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাঁহাদের কোরাণ মুখস্থ ছিল। স্বীকার্য্য, বর্ত্তমান সময়ের কোরাণের ন্যায় তাৎকালিক কোরাণে কোন প্রকার খণ্ড, কি পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় আদির কোন নির্দ্দেশ ছিল না; কিম্বা সমস্ত কোরাণ এক পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, আরবি পায়গাম্বরের সময় সমস্ত কোরাণ একেবারেই অবতীর্ণ হয় নাই। তাহা আবশ্যক মত, কতক কতক করিয়া, অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং যখন যে পরিমাণে অবতীর্ণ হইত,তাহা কোন অস্থি বা চর্ম্মাদিতে লিখিয়া রাখা হইত। সাহাবাগণ তাহা মুখস্থ করিয়া লইতেন এবং পায়গাম্বর সাহেবও নিজে স্মরণ রাখিতেন। উক্ত সময়ে কোরাণ মুখস্থ রাখিবার প্রথা এরূপ দৃঢ়তর ছিল যে, আরব দেশের বনবাসী জাঙ্গলি বদ্দু জাতিরাও উপাসনা ও পাঠের জন্য কোরাণ সাধ্যমত স্মরণ রাখিয়াছিল। কিন্তু ঐ বদ্দু জাতি বা হেজাজ হইতে দূরদেশবাসী মুসলমানগণের উচ্চারণ, মক্কা, মদিনাবাসীদিগের উচ্চারণ হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ছিল। ইহার কারণ এই যে, হয়ত তাঁহারা পবিত্র কোরাণের শুদ্ধ উচ্চারণ জানিতে পারিয়াছিলেন না, কিম্বা জঙ্গলি, বদ্দু, কি স্মরণ-শক্তি-বিহীন লোকেরা তাহাদের স্বীয় দেশে কোন প্রকার ভ্রম বশতঃ কোরাণকে অশুদ্ধরূপে পড়িয়া থাকিবেন। যখন শত শত আন্‌সার ও মহাজেরিনগণ * এবং অন্যান্য আরব দেশের

* টীকা। আন্‌সার ও মহাজেরিন তাঁহাদিগকে বলে, যাহারা হাজ্‌রাত মহম্মদের (দারূদ) মক্কা হইতে মদিনা যাইবার কালে সঙ্গে গিয়াছিলেন ও মদিনায় যাহারা হাজ্‌রাতকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

নিকটস্থ সহরবাসীগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া এই ধর্ম্ম-পুস্তককে আপনাদের পরিত্রাণের একমাত্র সম্বল জানিয়া সাধ্যমত অন্যান্য লোকদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন, প্রেরিত পুরুষের অন্তিমকাল পর্য্যন্ত, কোরাণের বহু সংখ্যক হাফেজ বর্ত্তমান ছিল। অনন্তর হাজ্‌রতের পরকাল গমনের পর হাজ্‌রাত আবুবাকার খালিফার পদে অধিষ্ঠিত হইবার কালে মোশা এনামা ফির্জ্জারের* যুদ্ধে অনেকগুলি কোরাণের হাফিজ নিহত হইয়া যাওয়ায়, হাজ্‌রাত উমারের পরামর্শমতে হাজ্‌রাত আবুবাকার, এই প্রকারের যুদ্ধে সমস্ত হাফিজগণ নিহত হইয়া গেলে ভবিষ্যতে কোরাণের কতকাংশ বা সম্পূর্ণ লোপ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কায় সশঙ্কিত হইয়া, যে সমস্ত কোরাণ হাজ্‌রাতের জীবিতকালে অস্থি চর্ম্মাদিতে লিখিত হইয়া একটী বাক্সে অতি যত্নে রক্ষিত ছিল, ঐ বাক্সটীকে জনৈক কোরাণের হাফেজ শাবিতের পুত্র জায়দের দ্বারায় আনাইয়া ও অন্যান্য উপযুক্ত কোরাণের হাফিজের দ্বারায় ঐ সমস্ত রক্ষিত কোরাণকে ঐক্য করাইয়া ও মিলাইয়া অতি বিশুদ্ধরূপে একত্রিত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি কোরাণের ভাবী বিনাশ-আশঙ্কা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তৃতীয় খালিফা হাজ্‌রাত ওস্‌মানের সময়ে (যাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে অর্থাৎ যিনি কোরাণ সংগ্রহকারী পদবিতে বরিত আছেন) ইহা জানিতে পারা গেল যে, যে "এরাক" ও "শ্বাম" প্রভৃতি দেশবাসিগণের কোরাণ পাঠে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা হইয়াছে। "শ্বাম" অধিবাসীগণ বলিতেছিলেন যে, আমরা যে কোরাণ আসাওয়াদের পুত্র মেকদাদের নিকট পাঠ করিয়াছি, তাহাই সটীক এবং "এরাক" বাসীগণ বলিতেছিলেন যে, আমরা যে কোরাণ আবুমুশা আশোয়ারির নিকট পাঠ করিয়াছি, তাহাই বিশুদ্ধ। আরও অন্যান্য দেশবাসিগণও এই প্রকার কোরাণ পাঠে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা করিয়াছিলেন। ইহাতে ইহাই জানা যাইতেছে যে, সে সময় তাঁহারা কোরাণের শ্রেণীবদ্ধতায় ভুল এবং কোরাণের শুদ্ধ উচ্চারণে (কেরাতে) কোন প্রকার বিভিন্নতা করিয়া থাকিবেন। এই ভুল ও বিভিন্নতা সকল দূরীকরণ মানসে হাজ্‌রাত ওস্‌মান, যে কোরাণ হাজ্‌রাত আবুবাকার হাফিজগণের দ্বারায় প্রেরিত পুরুষের জীবিত সময়ের কোরাণের সহিত ঐক্য করাইয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। ঐ কোরাণ হাজ্‌রাত পায়গাম্বারের সহধর্ম্মিণী বিবি হাফ্‌জার নিকট হইতে আনাইয়া, তাহা হইতে কয়েকখণ্ড অবিকল নকল করাইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এবং যে সকল কোরাণে বিভিন্নতা ঘটিয়াছিল, ঐ সমস্ত কোরাণকে একত্রিত করিয়া ভবিষ্যতের বিভিন্নতা নিবারণের জন্য আগুনে পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। পাঠকগণের এস্থলে বেশ স্মরণ আছে যে, হাজারত পায়গাম্বরের জীবিত সময়াবধি অনেকগুলি কোরাণের হাফিজ বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই হাজারাত ওসমানের প্রতি এরূপ দোষারোপ করিতে পারিলেন না যে, তিনি কোরাণে কোন প্রকার ভুল বা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কোরাণের শুদ্ধ উচ্চারণে (কেরাতে) যে বিভিন্নতা হাজারাত ওসমান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও সটীকরূপে তিনি কোরা-

* মোসাএনামা যে সকল ব্যক্তি নিজকে পায়গাম্বর দাবি করিয়া অতি গুরুতররূপে যুদ্ধ করিয়াছিল।

(৩)

অথবা আকাশে আনন্দের দেশে
যথা ক্ষণতরে নক্ষত্র ফুটিয়া
আঁধার সাগরে পুনঃ খসি পড়ে,
মিশে যায় কে জানে কোথায়!
মানব জীবন তাহারি প্রায়?

(৪)

এই যদি মানব জীবন,
তবে হায় কেন অকারণ,
দুদিনের তরে, ধূলা ঘর ক'রে
বাসনা-পুতুলে আনন্দে সাজায়
কাল সাগরের মোহন বেলায়,
শত বার ভাঙ্গে গড়ে শতবার
গায় কতবার হৃদয় তাহার
"কিছু না কিছু না সমুদয়
চরাচর মিছা মায়াময়"
তবুও আবার তাহাই চায়
পরাণ তার পাগল প্রায়?
এই ভাবে কত ছুটিয়া ছুটিয়া
নিরাশায় কত কাঁদিয়া কাঁদিয়া
অবসন্ন মনে আকুল পরাণে
সংসারের স্রোতে ডুবিয়া যায়!
কেবা তার পানে ফিরিয়া চায়?

(৫)

এই যদি মানব জীবন
তবে বল কেন অকারণ
দুদিনের যশ, মান অভিমান
তার তরে এত তৃষিত পরাণ?
তবে কেন মোহের নিদ্রায়
চিরমগ্ন; জাগিতে না চায়?

(খ)

না, না, এই মানব জীবন
নহে মাত্র নিশার স্বপন;
নহে এ সংসার মোহের আগার
নহে জগতের কার্য্য সমুদয়
অর্থ-শূন্য বাল্য-খেলা প্রায়।

(১)

বিধির ইচ্ছায় মানব হেথায়
এই দেশ হ'তে অনন্তের পথে
সবে তারা করিবে প্রয়াণ
এই জীবনের প্রথম সোপান।
নিজ কর্ম্মফল, ভুঞ্জিবে সকল
এই জীবনের পরীক্ষার স্থল;
সুখ দুঃখ তাঁহারি প্রেরণ
পাপ পুণ্য তাঁহারি সৃজন।
প্রেম, ভক্তি, দয়া, স্বার্থ, মোহ, মায়া,
দুই পথ তাঁহারি বিধান
তিনি এই জগতের প্রাণ।

(২)

সাহসে নির্ভর করি
হৃদে তাঁর নাম স্মরি
স্বীয় কার্য্য করিলে সাধন;
সংসারের দুঃখ শেষে
লভে জীব পর-দেশে
চিরশান্তি—অনন্ত-জীবন।

শ্রীবিহারিলাল গুহরায়।

কি তুমি?

কি তুমি, ঊষার আলো, ফুলের সুবাস ধার;
বিহগের সুধাকণ্ঠ, স্নিগ্ধ জ্যোতি জ্যোছনার।
কিগো তুমি, দিবসের আনন্দিত হাসি রাশি,
নিশার সুখের স্বপ্ন নয়নে বেড়াও ভাসি।
শরতের পূর্ণশশী, মৃদু উর্ম্মি যমুনার;
বসন্তের হাসি রাশি, অশ্রুধারা বরিষার।
কি তুমি সুদূর বনে মোহিনী বাঁশির সুর,
সাগরের গভীরতা, হিরকের কহিনুর।
প্রভাত-অরুণ-রশ্মি, মলয়ের সমীরণ,
আকাশের ধ্রুবতারা স্থির রাখ প্রাণমন।
কি তুমি যুবার প্রেম, বালকের সরলতা,
অনলের আকর্ষণ, কুসুমের পবিত্রতা।
তুমি সেই পারিজাত, স্বর্গের সুন্দর ফুল,
কেন গো মানব তুমি, বুঝি বিধাতার ভুল।

শ্রীশৈবলিনী দেবী।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। বিবাসিনী—(উপন্যাস) শ্রীরামশঙ্কর রায় প্রণীত। এই পুস্তকখানি উৎকল ভাষায় রচিত। প্রাচীন স্থপতিবিদ্যা, পূর্ত্তকার্য্য এবং শিল্পনৈপুণ্যে উৎকলদেশ জগৎবিখ্যাত। প্রাচীন সাহিত্যের গৌরবও উৎকলে যথেষ্ট আছে। পরাধীনতায় দেশের সকল গৌরবই দিন দিন ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়; উড়িষ্যার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। কোনার্কের বালুকাময় মরুক্ষেত্রে, একাম্রকাননের মালভূমিতে, পুরীর সমুদ্রতটে, ধউলি, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির নির্জ্জন প্রদেশে, কাটজুড়ীর তটভূমিতে, অথবা নাম করিয়া কত বলিব, সমগ্র উৎকলদেশে যে প্রতিভা আজিও পরিস্ফুট রহিয়াছে, তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইল? অবশ্য শিল্পাদিতে উৎকলের যত গৌরব, সাহিত্যে তত নহে। কিন্তু তবুও উড়িষ্যার প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করিলে যে একটা কাব্য-প্রিয়তা এবং সাহিত্য-সেবার তন্ময়ত্ব দেখা যায়, একালে তাহা কই? উৎকলবাসীর দীর্ঘনিঃশ্বাসে কেবল "তেহি নো দিবসাঃ গতাঃ" শব্দিত হইতেছে। একালের শিক্ষায় যে নূতন রকমের সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে, সে সাহিত্য উড়িয়া ভাষায় অতি অল্প। যাহা কিছু আছে, তাহাও খাঁটি উড়িয়ার লেখনী প্রসূত নহে বলিয়া বড়ই দুঃখ হয়। বামড়া এবং ময়ুরভঞ্জের রাজা যে প্রকার সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক, তাহাতে আশা হয়, একদিন উৎকলের সাহিত্য সুপুষ্ট হইয়া সম্বলপুর হইতে চাঁদবালী পর্য্যন্ত, ময়ুরভঞ্জ হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত এক জাতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবে।

উপরে বলিয়াছি যে, উৎকলের একালের সাহিত্য খাঁটি উড়িয়ার দ্বারা বড় অধিক পরিচালিত নহে। অথচ সকলেই উৎকলবাসী। কিন্তু মূলতঃ প্রধান প্রধান লেখকেরা (বামড়ার রাজা ব্যতীত) বিদেশীয়। সুকবি রাধানাথ রায় হইতে এই সমালোচ্য গ্রন্থলেখক রামশঙ্কর রায় পর্য্যন্ত সকলেই বিদেশীয়। আমি এ গণনায় অসার "কইলি" লেখক এবং কটক সহরের অদ্ভুত বর্ণনাকারীদিগকে বাদ দিয়াছি। ক্ষুদ্র দেশ বলিয়াই কেহ কেহ তাহাদের নাম জানে, এই মাত্র। রামড়ার রাজা, রাধানাথ রায় এবং মধুসূদন রাও কবিতা লিখিয়া বিখ্যাত। রাধানাথ রায় মহাশয়ের বাঙ্গালা কবিতাবলি বঙ্গদেশে আদৃত এবং মধুসূদন রাও মহাশয়ের নব্যভারতে প্রকাশিত 'ঋষিচিত্র' সর্ব্বত্রই বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইঁহারা সকলেই সুকবি। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, রাধানাথ বাবুর কবিত্ব শক্তি, বাঙ্গালায় বর্ত্তমান সময়ের কোন কবি অপেক্ষা ন্যূন নহে; এবং তাঁহার চন্দ্রভাগা একালের যে কোন কবির উৎকৃষ্ট কবিতার সহিত প্রতিযোগীতা করিতে পারে। কিন্তু একালের বিশেষ সাহিত্য "নবেল", এ পর্য্যন্ত রামশঙ্কর বাবু ভিন্ন অন্য কেহ লেখেন নাই। উপন্যাসের বিষয়ীভূত গল্পটী যে প্রকার মনোরম, বর্ণনাও তেমনি সরস হইয়াছে। উপন্যাস ভাল হইলে সর্ব্বজন-প্রিয় হয়, কাজেই ইহা দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সাহিত্য-চর্চ্চা যত বৃদ্ধি পায়, এমন আর কিছুতে নহে আমরা আশা করি, রামশঙ্কর বাবুর বিবাসিনী উৎকলের সর্ব্বত্র আদৃত হইবে। অবশেষে গোটাকতক ক্ষুদ্র রকমের ত্রুটীর কথা উল্লেখ করিব। ১ম; মুদ্রাঙ্কন দোষ। কটক প্রিন্টিং কোম্পানির মত বিখ্যাত ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াও যে বিবাসিনীতে এত বানান ভুল রহিয়া গিয়াছে, এটা ভাল কথা নয়। ২য়; স্থানে স্থানে ভাষা দোষও দৃষ্ট হইল; সেটা কাহার অনবধানতার ফলে? ৩য়তঃ; গ্রন্থকার অনেক স্থানে বড় অতিদীর্ঘ প্রাকৃতিক বর্ণনা করিয়াছেন। এ প্রকার বর্ণনা শুধু অনুপযোগী, তাহাই নয়; ইহাতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতিও জন্মিতে পারে।

ভারত, মিসর ও খ্রীষ্টধর্ম্ম। (২)

পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভারতের সহিত বাণিজ্য-ব্যবসায়ে গ্রীশ, মিসর ও আরব, এই তিন দূরদেশ প্রধানতঃ অতি প্রাচীন কাল হইতে সংস্পৃষ্ট হইয়াছিল। সেই দেশবাসিগণ তদ্দ্বারা শুদ্ধ যে অতুল ধনের অধিপতি হইয়াছিল, এমত নহে, ভারতের জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া নিজ নিজ দেশ ভারত-সভ্যতায় আলোকিত এবং আর্য্য-ধর্ম্মের দেব-দেবীর অর্চ্চনায় ভূষিত করিয়াছিল। সকলেই জানেন, গ্রীশ এবং মিসরের প্রাচীন ধর্ম্ম-প্রণালীর সহিত আর্য্যজাতির পূজা পদ্ধতির কত সৌসাদৃশ্য। আরবেতিহাস পর্য্যালোচনায়ও প্রতীত হয়, মহম্মদ জন্মিবার পূর্ব্বে আরবেরা বহুকাল হইতে দেবদেবীর অর্চ্চনা করিত। মোসেস্ যখন মিসর হইতে স্বদেশে আগমন করেন, তখন তিনি আরব দেশে সেই অর্চ্চনাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আসেন। মহম্মদের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে মক্কানগরে কাবা (Caabah) নামক বিখ্যাত দেবালয়ে কৃষ্ণ প্রস্তরের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খ্রীষ্ট জন্মিবার অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ডায়োডোরস সিকিউলস (Diodorus Siculus) এই দেবালয়ের সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন। এই দেবালয় জেমজেম (Zemzem) নামক প্রসিদ্ধ উৎস পার্শ্বে স্থাপিত ছিল। এব্রাহ্যাম-পত্নী হ্যাগার (Hagar) স্বীয় পুত্র ইসমাইলের সহিত এই উৎস দর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালীন মক্কানগরে তাঁহার দেহ পতন হয়। দশ ঘর পুরোহিত বংশ এই কাবার দেব-সেবায় নিয়োজিত ছিল। কোরিশ নামক সেই পুরোহিত বংশ হইতে মহম্মদের জন্ম হয়। আরবদেশময় দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও মক্কার দেবালয়ই প্রধান তীর্থস্থান ছিল। বৎসরে বৎসরে মক্কার মেলা দেখিতে দেশবিদেশ হইতে দলে দলে যাত্রী আসিয়া সেই তীর্থ-স্থানকে ধূমধামে পরিপূর্ণ করিত। কার্লাইল (Carlyle) বলেন:—

"Mecca became the fair of all Arabia and thereby indeed the chief staple and warehouse of whatever commerce there was between the Indian and the Western countries,—Syria, Egypt, even Italy. It had at one time a population of 100,000 men; buyers, forwarders of those Eastern and Western products; importers for their own behoof of provisions and corn."

"মক্কাই সমুদায় আরবদেশের ব্যবসা-স্থান ছিল। সিরিয়া, মিসর এমত কি, ইটালী পর্য্যন্ত সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের সহিত ভারত বাণিজ্যের এই প্রধান স্থান। তথায় লক্ষ লক্ষ লোক খরিদ বিক্রয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নানা দ্রব্যজাত এবং শস্যাদি আমদানি ও রপ্তানি করিত।"

ভারতবাণিজ্যে নিযুক্ত শত সহস্র আরবীয় বণিক এই মহানগরেই যাতায়াত করিত। সেই বণিকগণের সহিত সুতরাং ভারতীয় সভ্যতা এবং পূজাপদ্ধতিও আরবে আসিয়া প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, মিসররাজ ওসিরিস আরবীয় নাইসা নামক স্থানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে ভারত-যশে আকৃষ্ট হইয়া ওসিরিস নিজে ভারতে গিয়া তথায় আর এক নাইসা নগর স্থাপন করিয়া আসেন। ওসিরিস আরবে বিদ্যা ও ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিয়া ভারতে গিয়া সেই শিক্ষার সম্পূর্ণতা সম্পাদন করেন।

পরে মিসরে গিয়া তিনি মিসর ধর্ম্মের সূত্রপাত করেন। স্লিগেলের মতে মিসরসভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা হইতে সমুৎপন্ন।

তবেই প্রতিপন্ন হইতেছে, ভারতবাণিজ্য-সূত্রে যে আরব, মিসর ও গ্রীক জাতি প্রাচীন ভারতের সহিত লিপ্ত ছিল, তাহাদেরই দেশে আর্য্য সভ্যতা, জ্ঞান ও ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল। কই, আর কোন দেশে সে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের উদয় হয় নাই ত? যদি বল, যেরূপে ভারতে জ্ঞানধর্ম্মের সঞ্চার ও উন্নতিসাধন হইয়াছে, সেইরূপেই প্রাচীন গ্রীশ, মিসর ও আরবে তাহা সঞ্জাত হইয়াছিল। সেই তিন দেশ ব্যতীত যদি অন্য কোন দেশে আর্য্যধর্ম্ম ও পূজাপদ্ধতি দেখা দিত, তাহা হইলে সে যুক্তি একদিন সারবতী বলিয়া গ্রাহ্য হইত; কিন্তু যখন ভারতসংস্পৃষ্ট জাতি ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে সে প্রকার পূজাপদ্ধতি দেখা যায় না, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, তাহা ভারতসংস্পর্শেরই ফল-স্বরূপ। মোসেস মিসর হইতে ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে আসিয়া তাহা কেমন প্রচার করেন, তৎপ্রণীত গ্রন্থমধ্যেই তাহা উক্ত হইয়াছে। এই ইহুদী ধর্ম্মের আলোক তৎকালে চারিদিকেই বিকীর্ণ হইয়াছিল। তাহা কৃষ্ণসাগরের উপকূলেও গিয়াছিল। সেই উপকূলবাসিগণ ওডিনের (Odin) সহিত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় স্বদেশীয় বিদ্যালোক ও ধর্ম্মপদ্ধতি প্রচার করেন। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্ম্মপদ্ধতি উত্তর ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতীয় বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার এইরূপে ইউরোপময় নানা সূত্রে সংসিদ্ধ হইয়াছে।

ওদিকে ভারতে শাক্যসিংহ উঠিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞানালোকে পুরাতন ও জর্জ্জরিত আর্য্যধর্ম্মে এক নূতন জীবন সঞ্চারিত হইয়াছে। অশোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। নববলে ও নববীর্য্যে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারে উন্মত্ত হইয়া অশোকরাজ খ্রীষ্টীয় সার্দ্ধ দ্বিশতবৎসর পূর্ব্বে দেশবিদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকগণকে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার শাসনে (Edicts) প্রকাশিত, তিনি পঞ্চ যবন-রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোক বিস্তারের জন্য প্রচারক পাঠাইয়া দিলেন। সেই পঞ্চ যবন রাজ্যের নাম সিরিয়া, মিসর, ম্যাসিডন, সাইরিণ এবং ইপাইরস। এই সমস্ত দেশ ভারতে তখন যবন-রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল।

সিরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের পতাকা উড্ডীন হইল। নূতন বলে বৌদ্ধধর্ম্ম মৃতপ্রায় ইহুদী ধর্ম্মকে সঞ্জীবিত করিল। অনেকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এসিনিস্ (Essenes) নামে বিখ্যাত হইলেন। এসিনিসগণ সিরিয়াদেশে মৃতসাগরের (Dead Sea) পশ্চিম দিকে বাস করিতেন। এই এসিনিসগণের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন।

ইউরোপীয় ইতিহাস-বেত্তাগণের নিকট আমরা জানিতে পারি যে, প্রাচীন ইজিপ্ট ইউরোপীয় সভ্যজগতের জ্ঞান-গুরু ছিলেন। যে গ্রীশ এককালে জ্ঞান-গৌরবে পূর্ব্বতন ইউরোপীয় অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহার পণ্ডিতগণ ইজিপ্ট হইতেই শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেন। থেলিস হইতে প্লেটো পর্য্যন্ত যত প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত সকলেই ইজিপ্টের বিদ্যালয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া স্বদেশে মহা যশস্বী হইয়াছিলেন *। অন্যান্য গ্রীক

*এই সকল বিখ্যাত পণ্ডিত ইজিপ্টে গিয়াছিলেন।— Thales, Pythagoras, Democritus, Empedocles and Plato তাঁহারা সকলেই নব নব বৈদিক মতের প্রচারক।

দার্শনিকগণ আবার তাঁহাদের নব নব মতে দীক্ষিত হন। গ্রীশ রোমের শিক্ষাগুরু-ছিলেন। রোমের সাম্রাজ্য-বিস্তারের সহিত তাহার জ্ঞানেরও প্রচার হইয়াছিল। সুতরাং সমস্ত ইউরোপ জ্ঞানলাভের জন্য ইজিপ্টের নিকট সাক্ষাৎ এবং পরম্পরা সম্বন্ধে ঋণগ্রস্থ ছিলেন।

এদিকে ভারতের জ্ঞানাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া গ্রীশ এবং ম্যাসিডনের সুধীগণ এলেক-জাণ্ডারের (Alexander) সঙ্গে ভারতে আসিতে কষ্ট বোধ করেন নাই। এরিষ্টটল (Aristotle) আসিয়া এদেশীয় ন্যায় বিদ্যার যাহা কিছু জ্ঞান-লাভ করিয়াছিলেন, গ্রীশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাকে ডালপালা দিয়া নিজ মতে সাজাইয়া প্রচার করিয়া দিলেন। পির্হো (Pyrrho) ভারতীয় যতিগণের (Gymnosophists) সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের মুখে বেদান্তের মায়াবাদ শুনিয়া ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের অসিদ্ধতা বুঝিয়াছিলেন। তাই পির্হো স্বদেশে আসিয়া সংশয়বাদের (Sceptical School) নেতা-স্বরূপ হইলেন। ভারতের ঐশ্বর্য্য এইরূপে সমগ্র পাশ্চাত্য দেশকে আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং তাঁহার জ্ঞান-দীপের রশ্মি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল।

সংসারের কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধ গ্রীশ পতিত হইল; কিন্তু তাহার জ্ঞানালোক নিবিল না। সেই জ্ঞানদীপ ভগ্ন হইয়া আলোক পড়িল—রোমে এবং জুডিয়ায়। জিনোর (Zeno) মহান্ উপদেশ সকল রোমের অস্থিমজ্জাকে শক্ত করিয়া দিল। গেলিলি (Galilee) যখন অনেক যবনের বাসভূমি হইয়াছে, গ্রীক দর্শন ও বিদ্যা যখন প্যালেষ্টাইনের চারিদিকে আলোচিত হইতেছে, যখন নিকোলস, জোসেফস (Nicholas, Josephus) প্রভৃতি অনেক বড় বড় ইহুদী গ্রীক দর্শনে সুপণ্ডিত হইয়া গ্রীক মত সকল জুডিয়ার সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন, যখন দুই শত বৎসর হইতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসীগণ প্যালেষ্টাইনের চারিদিকে বৈদিক জ্ঞানালোচনায় বিলাসী এবং ঘোর বিষয়ী ধনলুব্ধ ইহুদীগণকে লজ্জা দিতেছেন, যখন তাহাদের মতামত সর্ব্বত্র প্রবেশ লাভ করিতেছে, এমত সময়ে যীশুর জন্ম হইল।

লোকে বলে যীশু পণ্ডিত ছিলেন না। কিন্তু পুরাতন বাইবেল-জ্ঞানে তিনি বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। প্রফেটগণ তাঁহার ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, তিনি হিব্রুভাষা ভাল জানিতেন না। হিব্রু মিশ্রিত সিরীয় ভাষায় তিনি কথা কহিতেন। সেই ভাষায় বৌদ্ধ মতামত অনেক প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল। যে গেলিলিতে তিনি বাস করিতেন, তথায় অনেক জাতীয় লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ফিনিসীয়, সিরীয়, আরব এবং গ্রীকেরা তথায় ইহুদীগণের সহিত একত্র থাকিত।

ইহুদীজাতীয় প্রফেটগণের মধ্যে ইলিয়সের (Elias) নাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই প্রফেটকে লোকে দেবতুল্য জ্ঞান করিত। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক যোগ-সাধনায় গিরিগুহায় বাস করিতেন। তাঁহার শান্ত আশ্রমে দ্বেষহিংসা ছিল না। বন্য মৃগগণ তথায় হিংসাপরিত্যাগ করিয়া সুখে বিচরণ করিত। তিনি সময়ে সময়ে কেবল ব্যুত্থানকালে যখন যোগভঙ্গ হইত, তখন এক একবার গিরিগুহা হইতে বিনির্গত হইয়া

লোকলোচনের সাক্ষাৎ হইতেন। তাঁহার সম্বন্ধে E. Renan কি বলিতেছেন, দেখুন—

"This giant of Prophets and his rough solitude of Carmel, where he shared the life of wild beasts, dwelling in the hollows of the rocks, whence he issued like a thunder-bolt to make and unmake kings, had become, by successive transformations, a sort of superhuman being, sometimes visible, sometimes invisible, and one who had not tasted of death. It was generally believed that Elias would return and restore Israel".

এই যোগ-সাধনা জুডিয়া মধ্যে কোথা হইতে আসিল?

জন (John the Baptist) আর এক জন সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি মৃগ-চর্ম্মে শরীরাবৃত করিয়া যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি কেবল যথাকালে বন্য ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। এই দেখুন, Renan তাঁহার সম্বন্ধে কি বলেন—

"From his infancy John was subjected by vow to certain abstinences. The desert by which he was, so to speak, surrounded, attracted him from early life. He led there a life like that of a Yogi of India, clothed with skins or cloth of camel's hair, having for food only locusts and wild honey."

এই জন, বৌদ্ধগণের "অভিষেককে" পরিশুদ্ধির উপায় জ্ঞান করিতেন। তাঁহার মতে পাপক্ষালনের নিমিত্ত আন্তরিক অনুতাপমাত্র যথেষ্ট নহে, দেহ পর্য্যন্ত পবিত্র করা চাই। চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহশুদ্ধি চাই। "স্নান" দেহশুদ্ধির নিদর্শন মাত্র, শুধু দেহশুদ্ধি নহে, আন্তরিক চিত্তশুদ্ধিরও নিদর্শন। পূর্ব্বে কেবল জলস্পর্শ করাইয়া ইহুদী-ধর্ম্মে লোককে গ্রহণ করা হইত। জন একেবারে অবগাহন স্নানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই স্নানরীতি ভারতে বরাবর ছিল। আর্য্যধর্ম্মে স্নান সমস্ত ধর্ম্ম সংস্কারের পূর্ব্বে আবশ্যক। বৈদিক ধর্ম্মে স্নান চতুর্ব্বিধ বারুণ্য, বায়ব্য, আগ্নেয় এবং ব্রাহ্ম। ব্রহ্ম-চর্য্যান্তর সমাবর্ত্তন সময়ে স্নানকারীকে "স্নাতক" বলে। বৌদ্ধধর্ম্মের "অভিষেক" বৈদিক রীতিমাত্র। জন এই স্নানের নিয়ম কোথা হইতে পাইলেন? তিনি যোগি-বেশেই বা কিহেতু সাজিলেন? লোকে জ্ঞান করিত, তিনি পূর্ব্বজন্মে ইলিয়স (Elias) ছিলেন, কেবল কায়া পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছেন। এই জন্মান্তরের কথা বা কোথা হইতে আসিল? Renan এ কথার রহস্য এইরূপ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন—

"Infact, might there not in this be a remote influence of the Munis of India? Perhaps, some of those wandering Bhuddist monks who overran the world, as the first Franciscans did in later times, preaching by their actions and converting people who knew not their language, might have turned their steps towards Judea, as they certainly did towards Syria and Babylon. On this point we have no certainty. Babylon had become for sometime a true focus of Bhuddhism. Bhoudast (Bodhisattva) was reputed a wise Chaldean, and the founder of Sabeism. Sabeism was, as its etymology indicates, Baptism—that is to say the religion of many baptisms—the origin of the sect still existing called christians of St. John or Mendaites."

"বাস্তবিক এ সমস্তের রহস্য পর্য্যালোচনা করিলে ভারতীয় মুনি ঋষিগণের বিষয় স্মরণ হয়। তাঁহারা যেন তত দূর হইতেও এখানে তাঁহাদের শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। যে সমস্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী প্রচার-ব্রতে ব্রতী হইয়া, তৎপরবর্ত্তী কালের ফ্র্যান্সিস্ক্যান্ নামক খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীগণের ন্যায়, পৃথিবীর চারিদিক ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং তদীয় ভাষানভিজ্ঞ বিদেশীগণকে কেবল ধর্ম্মাচার ও সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান প্রভাবে শিষ্য করিতেন, বোধ হয়, তাহাদের মধ্যেই কোন কোন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী জুডিয়াভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে ব্যাবিলন এবং সিরিয়াতে গিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের জুডিয়াতে যাওয়ার কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ব্যাবিলন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত কেন্দ্রস্থান হইয়াছিল। বোধিসত্ত্ব ক্যাল্ডীয় জ্ঞানী

বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনিই শৈব-ধর্ম্ম (Sabeism) প্রতিষ্ঠিত করেন। শৈব ধর্ম্মের ব্যুৎপত্তি-লভ্যার্থই 'অবগাহন স্নান সংস্কার'। এই শৈব ধর্ম্মই বহু স্নান সংস্কার সম্পন্ন "বাপ্তিস্ম" ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্ম হইতেই বিখ্যাত সেণ্টজন সম্প্রদায়ভুক্ত 'মেনডাইটিস' নামক খ্রীষ্টানগণের উৎপত্তি।"

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বৌদ্ধ অশোক স্বধর্ম্ম প্রচারার্থ সিরিয়ায় কতিপয় বৌদ্ধকে প্রেরণ করেন। তাঁহারাই দলবল বৃদ্ধি করিয়া সিরিয়া এবং ব্যাবিলনকে নিজ ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যের কেন্দ্র স্বরূপ করিয়াছিলেন। জন তাঁহাদেরই একজন মন্ত্র শিষ্য হইয়া বৌদ্ধ অভিষেক প্রণালী গ্রহণ পূর্ব্বক "বাপ্তিস্ম সংস্কার" প্রচার করেন। জন সিরিয়া দেশেই "মৃত সাগরের" পূর্ব্বদিকে থাকিতেন। ইলিয়স (Elias) প্রফেট এই বৌদ্ধযোগী হইয়া গিরিগুহাবাসী হইয়াছিলেন। Renan স্পষ্ট না বলুন, এ কথার আভাস দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আভাস ফুটাইয়াই আমরা এ কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি।

সকলেই জানেন, যীশু জন কর্ত্তৃক দীক্ষিত হন। যতদিন না তিনি জনের মন্ত্র-শিষ্য হইয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার হৃদয় খুলে নাই। জন তাঁহাকে অভিষেক করিয়া লইয়াছিলেন। এই জন কারাবাসের নিগ্রহও সহ্য করিয়া অনায়াসে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি সিংহাসনের মায়ায় প্রলোভিত হয়েন নাই। কেবল বৌদ্ধধর্ম্ম-শিক্ষা প্রভাবে জনের এতদূর নিবৃত্তি জন্মিয়াছিল।

অন্য দিকে মিসর-ধর্ম্ম হইতে জুডিয়ায় বৈদিক ধর্ম্মের অনেক আলোকপাত হইয়াছিল। যীশু জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই ইহুদী ফাইলোর (Philo) মত জুডিয়ার সর্ব্বত্র আলোচিত হইয়াছিল। তিনি গ্রীক দর্শনে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ইজিপ্টে গিয়া তথাকার ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। মিসর-ধর্ম্মে এক জন সুদক্ষ পণ্ডিত বলিয়া তিনি বিখ্যাত হয়েন। তাঁহার অনেক শিষ্য জুডিয়ায় মিসর-ধর্ম্মমতের উপদেশ দিতেন। মিসর-বিদ্যার আলোচনার সঙ্গে বৈদিক মত সকল জুডিয়াতে সুপ্রচারিত হইয়াছিল। যীশুর মন যে এই শিক্ষা প্রভাবেই নীরস্নান হয় নাই, এমত কথা কে বলিতে পারে? স্থান ও কাল-মাহাত্ম্যে তিনি অবশ্যই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। Renan বলেন—

"The writings of Philo have the inestimable advantage of showing us the thoughts which, in the times of Jesus, stirred souls occupied with great religious questions. Philo lived, it is true, in quite a different sphere of Judaism from Jesus; yet, like him, he was quite free from the Pharisaic spirit which reigned in Jerusalem. Philo is, in truth, the elder brother of Jesus. He was sixty-two years of age when the prophet of Nazareth had reached the highest point of his activity, and he survived him at least ten years."

"যীশুর সময়ে ধর্ম্মচিন্তাশীল লোকের মনে যে যে মহান্ ধর্ম্ম কথার উত্থাপন ও আলোচনা হইত, ফাইলোর গ্রন্থাবলি তাহার অদ্বিতীয় প্রমাণ। যীশু জুডিয়ার মধ্যে থাকিয়া ইহুদী ধর্ম্মাচারের যেমন সকলই দেখিতে পাইতেন, ফাইলো দূরে থাকিয়া তেমন পাইতেন না সত্য, তথাপি জেরুসালেমের ধর্ম্মপুরোহিত ফ্যারিসিগণের যেরূপ বাহ্যাড়ম্বর পরিপূর্ণ, সাত্ত্বিকতাশূন্য, অবিশুদ্ধ ধর্ম্মাচার ও ব্যবহার ছিল, সেই মলিনতা হইতে যীশু যেমন বিমুক্ত ছিলেন, ফাইলোও তদ্রূপ। বাস্তবিক, ফাইলো যেন যীশুর অগ্রজ ভ্রাতা ছিলেন। যখন যীশুর ক্রিয়া কলাপের গৌরব চূড়ান্ত সীমায় আসিয়াছিল, তখন ফাইলোর বয়ঃক্রম বাষট্টি বৎসর, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি অন্যূন দশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন।"

যীশু-অভ্যুদয়ের ঠিক পূর্ব্ব কালে ফাইলোর মত সকল তখনকার পাশ্চাত্য সভ্য সমাজের সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছিল। ব্যাবিলন

ও সিরিয়া হইতে সিসিলী পর্য্যন্ত পণ্ডিত-মণ্ডলী তাঁহার মত সকল আলোচনা করিতেন। জুডিয়াতেও ফাইলোর স্কুল (ধর্ম্ম প্রচার মন্দির) স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য হইত; কারণ, ইহুদী হইয়াও তিনি গ্রীক দর্শনের আলোকে মিসরধর্ম্মের মতামত পরিস্থাপন করিয়াছিলেন এবং মিসরধর্ম্মের মতামত তাৎকালিক বৈদিক বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সমঞ্জসীভূত হইত। সে সময়ে সিরিয়ায় সর্ব্বজাতির সম্মিলন হইয়াছিল। সিডন এবং টায়ারের ফিনিসিয়গণ, আরব ও ইজিপ্টবাসী, ব্যাবিলন ও পারস্য দেশীয়েরা ইহুদীগণের সহিত সিরিয়ায় একত্রিত হইয়াছিল। এই সিরিয়ার সংস্পর্শে আসিয়া একদা মহম্মদ অদ্বয় ব্রহ্মভাবে পরিপূর্ণ হইয়া স্বদেশ ও স্বজাতি মধ্যে তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না, আমাদের "মিশ্রদেশ" এই সিরিয়া ছিল কি না? অনেকের অনুমান, সিরিয়াই মিশ্রদেশ; কেহ কেহ বলেন, মিসরই মিশ্রদেশ বলিয়া পরিচিত। এই সিরিয়ার উপকণ্ঠে জন (John) বাস করিতেন এবং ইলিয়স একদা যোগসাধনে গিরিগুহা মধ্যে দেহ রাখিয়াছিলেন। জিসস, জনের নিকট দীক্ষিত হইয়া টাইবিরিয়স হ্রদের (Lake of Tiberius) চারিধারে জেলেদের সঙ্গে বহু দিন মিশ্রিত হইয়া অনেককে নিজ মতে আনিয়াছিলেন। জোসেফস বৃদ্ধ বয়সে যে যোগী বান্নুর (Banou) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তিনি শাকান্ন ভোজন এবং বৃক্ষপত্রের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সিরিয়ার মরুদেশে নিজ আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। এসময়ে যেমন একদিকে অনেকে গ্রীক দর্শনের অনুবর্ত্তন করিতেন, অনেকে আবার ফাইলোর স্কুলে জ্ঞানলাভ করিতেন, অন্যদিকে অনেকে তেমনি বৌদ্ধধর্ম্মের সন্ন্যাস গ্রহণে যোগী হইয়া গিয়াছিলেন। কি ইহুদী বিদ্যা ও ধর্ম্ম, কি গ্রীক দার্শনিক তত্ত্ব, কি আরব ও মিসরধর্ম্ম, সকলই তাৎকালিক বৈদিক বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া ইহুদীজাতি মধ্যে যে জ্ঞানরাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, সেই জ্ঞানের প্রভাব ও গৌরবে সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রতিবোধিত হইয়াছিলেন। জনের গ্রন্থ আরবদেশে লিখিত, এবং আরবীয় জ্ঞানশক্তি তাহাতে সঞ্চারিত ছিল। যদিও ইহুদীজাতি বিজাতীয় ধর্ম্মের ও বিজাতীয় জ্ঞানের বিদ্বেষী ছিলেন, তথাপি সাক্ষাৎ ও পরম্পরাক্রমে সেই ধর্ম্ম ও জ্ঞান তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইত। যীশু সেই বিজাতীয় কলঙ্কস্পর্শ হইতে যে একেবারে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, এমত অনুমিত হয় না। তিনি জনের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বৌদ্ধেরা যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প ও দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দিতেন, যাহা তাহাদের গ্রন্থে অনেক স্থলে বিদ্যমান ছিল, যীশুও সেইরূপ পন্থাবলম্বন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক যীশুর Parables ইহুদী ধর্ম্ম-সাহিত্যের এক নূতন সামগ্রী। তিনিই তাহার প্রথম পথ দেখান। কোথা হইতে তিনি Parables পাইয়াছিলেন? তৎকালে বৌদ্ধেরা যদি সিরিয়ায় না থাকিত, তাহাদেরও উপদেশ-রীতি যদি তদ্রূপ না হইত, তবে একদা বলা যাইতে পারিত, তাহা যীশুর স্বরচিত শিক্ষা-রীতি। যীশুর চরিতাখ্যায়ক Renan কি বলিতেছেন, শুনুন—

"It was in the Parable, especially, that the Master excelled. Nothing in Judaism could have served him as a model for that charming style. It was a creation of his. No doubt, there are to be found in Bhud-

dhist books some parables precisely of the same tone and of the same form as the gospel parables; but it is hard to allow that a Bhuddhist influence had any effect on them."

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পচ্ছলে শিক্ষা দেওয়া রীতিতেই আমাদের গুরুর মত গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইহুদী ধর্ম্ম গ্রন্থাবলিতে এমত কিছুই ছিল না, যে আদর্শ হইতে তিনি সেই মনোহর রীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে রীতি তাঁহারই সৃষ্টি। বৌদ্ধগ্রন্থাবলিতে নিশ্চিত সেই রীতির অনেক দৃষ্টান্ত ছিল—যাহা ঠিক তদনুরূপ, ঠিক সেই ধরণের ও সেই প্রকৃতির—তথাপি যীশুর গল্পাবলি যে বৌদ্ধগল্পাবলির অনুকরণ, একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায় না।"

সাদৃশ্য আছে বলিয়াই যে যীশুর গল্পচ্ছলে শিক্ষারীতি বৌদ্ধরীতি হইতে গৃহীত হইয়াছিল, একথা বলিতে Renan সাহসী নহেন। অথচ তিনিই বলিয়াছেন, অনেক বৌদ্ধ-ভ্রমণকারী সিরিয়া এবং ব্যাবিলনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। এসিনিস ধর্ম্ম-সম্প্রদায় তাহার ফল। জনও যে একজন এসিনিস ছিলেন, এমত আভাসও তিনি দিয়াছেন। জিসস্ জনের শিষ্য। অথচ জিসসের নিকট যে বৌদ্ধ উপদেশ-রীতি একেবারে অপরিচিত ছিল, একথা তিনি কেন মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিলেন না, আমরা বুঝিতে পারি না? তাঁহার সেই রীতি পরিচিত হইবার অন্য কারণও আছে।

জন, এন্টিপস্ (Antipas) কর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হইয়া নিগৃহীত এবং নিহত হন। সেই নৃশংস রাজার ভয়ে যীশু কোন স্থানে দুদিন স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি তজ্জন্য নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। কে বলিতে পারে, তিনি এই সময়ে ভারতাঞ্চলে আইসেন নাই? সে যাহা হউক, তাঁহার জীবনী লেখকেরা বলেন, গুরু জনের (John) মৃত্যুর পরই তিনি এন্টিপসের ভয়ে মরুদেশে গিয়া অনেক দিন অতিবাহিত করেন। এই দেখুন Renanএর কথা—

"Jesus, fearing an increase of ill-will on the part of Antipas, took the precaution to retire to the desert. Many people followed him there."

সিরিয়ার মরুদেশে যে সকল আশ্রম ছিল, যীশু তথায় ভ্রমণ করিয়া পালাইয়া বেড়ান। এই সকল আশ্রমে বান্নুর (Banou) ন্যায় অনেক বৌদ্ধমতাবলম্বী সন্ন্যাসী বাস করিতেন। সম্ভবতঃ এই সন্ন্যাসীগণের নিকট হইতে এবং জন কিম্বা বান্নুর ন্যায় যোগীগণ হইতে যীশু গল্পচ্ছলে শিক্ষা দিবার রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

বাস্তবিক, যীশু জুডিয়া মধ্যে যে জ্ঞানরাজ্যে বাস করিতেন এবং তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া যাহাদিগের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তিনি সেই জ্ঞান ও সংস্পর্শের ফল। তিনি পুরাতন বাইবেলের উপদেশ বিলক্ষণ জানিতেন। মোসেসের গ্রন্থাবলির তথ্য তিনি সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। প্রফেটগণের গ্রন্থ ও বাইবেলান্তর্গত ধর্ম্মগীত সকল তাঁহার প্রবৃত্তিকে প্রভূত বলে উত্তেজিত করিয়াছিল। তিনি ইহুদীধর্ম্মের সারমর্ম্ম ও সাত্ত্বিক ভাব বিলক্ষণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিলেল (Hillel) সিরাকের পুত্র জিসস (Son of Sirach) * এবং ইহুদীধর্ম্মের ধর্ম্মযাজক র‍্যাবিগণ (Rabbis) যীশুকে অনেকাংশে গড়িয়া আনিয়াছিল। তাঁহার খ্রীষ্টান জীবনী লেখকগণ তাঁহার গৌরব বাড়াইবার জন্য হাজার কেন বলুন না যে, তিনি কিছুতেই মিশিতেন না, কোন কথায় থাকিতেন না, কিন্তু Renan দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার

* তৎকালে তাঁহারা অতি সাত্ত্বিক লোক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

উপদেশ মধ্যে তদানীন্তন ইহুদীজগৎ ও জ্ঞানরাজ্য সমস্তই আভাসিত এবং প্রতিফলিত হইয়াছে। তিনি না মিশিলে কি হইবে, জগৎ তাঁহাতে মিসিয়াছিল। এজগতে কেহ একেবারে অবিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। গৃহে একাকী থাকিলে কি হইবে, বাহিরের বায়ু যে সর্ব্বত্র বহিতেছে। যিনি যে কালে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাকে সেই কালের সামাজিক শক্তিতে অবশ্য নীয়মান হইতে হয়, যে সমাজ দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত থাকেন। সেই সমাজের জ্ঞানবায়ু তাঁহার মানসক্ষেত্রে নিশ্চয় প্রবাহিত হয়। যীশুও অবশ্য এই সাধারণ নিয়মের অধীন ছিলেন, এবং সেই নিয়ম পরতন্ত্র হইয়া তিনি অনেক বিষয়, অজ্ঞাতভাবেই হউক, বা জ্ঞাতসারেই হউক, পরের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। Renan বলিতেছেন—

"There is no one so shut in as not to receive some influence from without. * * * We should say, there are great moral influences running through the world like epidemics, without distinction of frontier and race. The interchange of ideas in the human species does not take place only by books or by direct instruction. Jesus was ignorant of the very name of Buddha, of Zoroaster and of Plato. He had read no Greak book, no Bhuddhist Sutra, nevertheless, there was in him more than one element, which, without his suspecting it, came from Bhuddhism, Parseeism or from the Greek wisdom. The great man, on the one hand, receives every thing from his age; on the other, he governs his age.

* * * * * *

Jesus, doubtless, sprang from Judaism but he proceeded from it as Socrates did from the schools of the Sophists, as Luther from the middle ages, as Lamennais from Catholicism, as Rousseau from the eighteenth century. A man belongs to his age and race even when he re-acts against his age and race.

"সম্পূর্ণরূপে বহিঃসম্পর্ক রহিত হইয়া কেহ থাকিতে পারে না। ধর্ম্মের এত তরঙ্গ পৃথিবীতে বহিতেছে যে, সে তরঙ্গ হইতে কোন জাতি বা কোন দেশ অব্যাহতি পায় না। মহামারীর ন্যায় তাহা সর্ব্বদেশেই ব্যাপ্ত হয়। শুদ্ধ গ্রন্থ বা সাক্ষাৎ মৌখিক উপদেশেই লোকের কথাবার্ত্তা চলে না। বুদ্ধদেব, জোরোয়াস্তর এবং প্লেটোর নাম পর্য্যন্ত হয় ত জিসস শুনেন নাই। কোন গ্রীকগ্রন্থ বা বৌদ্ধসূত্র, তিনি হয় ত পড়েন নাই, তথাপি জিসসের অন্তরে এমত অনেক বিষয় ছিল, যাহা তাঁহার অজ্ঞাতসারে বৌদ্ধসূত্র পার্সীধর্ম্ম অথবা গ্রীক দার্শনিকতত্ত্ব হইতে গৃহীত হইয়াছিল। যে যুগে বড়লোকেরা জন্মগ্রহণ করেন, এক পক্ষে যেমন তাঁহারা সেই যুগের ফল, অন্য পক্ষে আবার তাঁহারা সেই যুগের নিয়ামক। জিসস নিশ্চয় ইহুদী ধর্ম্মোৎপন্ন; কিন্তু তিনি সেই ধর্ম্মের সেইরূপ ফল, যেমন সক্রেটিস, সোফিষ্ট দর্শনের, লুথর মধ্যযুগের, ল্যামেনে ক্যাথলিক ধর্ম্মের এবং রুসো অষ্টাদশ শতাব্দীর ফল। লোকে জনসাধারণের এবং নিজ কালস্রোতের বিরুদ্ধে যাইলেও তাঁহাকে সেই কালেরই লোক বলিতে হইবে।"

তবেই Renan স্পষ্টই বলিতেছেন, জিসস্ নিজ সময়ের এবং সমাজের ফল। এক কালে যখন বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড হিন্দুসমাজে অনেকাংশে ব্যভিচারে পরিপূর্ণ হইয়া প্রকৃত সাত্ত্বিকধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তখন যেমন বুদ্ধদেব সমুত্থিত হইয়া বৈদিক জ্ঞানাত্মক ধর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়া সমাজে সাত্ত্বিকতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; আবার যখন বৌদ্ধ এবং অপরাপর সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের শুষ্ক জ্ঞানালোচনায় এবং সাত্ত্বিকতাশূন্য ক্রিয়া কাণ্ডে ভারতীয় হিন্দু সমাজে বৈদিক নিষ্ঠা তিরোহিত হইয়াছিল, তখন যেমন ভগবান্ শঙ্কর ভারতে প্রকৃত বৈদিক নিষ্ঠা ও ধর্ম্মপথের পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন, এককালে বঙ্গসমাজে যখন প্রকৃত সাত্ত্বিক ধর্ম্ম নানাবিধ তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের তামসিক আচারে মৃতপ্রায় হইয়াছিল, তখন যেমন চৈতন্যদেব প্রকৃত পবিত্রতা ও ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়া সাত্ত্বিক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, জিসস্ তেমনি বাহ্যাড়ম্বর-

পূর্ণ ইহুদী সমাজে প্রকৃত সাত্বিক ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি লোকের মনে আন্তরিক নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উদাত্ত ধর্ম্মনীতি সকল তাঁহার মনে আন্তরিক ধর্ম্ম-ভাব আরও উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিল। জনের উপদেশে তিনি ইহুদী ধর্ম্মের বহির্দ্দেশ হইতে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি নূতন কিছুই করেন নাই। পুরাতন জর্জ্জ-রিত ইহুদীধর্ম্মে তিনি নূতন প্রাণ-সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। সেই কার্য্যে তিনি কেবল ভগবানের সহায়প্রার্থী হইয়া তাঁহা-রই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ভগবানকে অহরহঃ ডাকিতেন এবং তাঁহাকে এতদূর নিকটস্থ ভাবিতেন, যেন তিনি তাঁহারই অঙ্কে সর্ব্বদা রহিয়াছেন, এরূপ জ্ঞান করিতেন। তিনি ভগবানকে পিতার মত প্রীতি করিতেন এবং সেই প্রীতি লোককে শিক্ষা দিয়াছিলেন। যে ভগবৎপ্রেম চৈতন্যদেব শিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনিও সেই প্রেমের ঈষৎ মাত্রায় পরিপূর্ণ হইয়া ইহুদী সমাজে তাহা প্রচার করিয়া-ছিলেন। এই ভগবৎপ্রেম ও শরণাসক্তি জিসস্ কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন? তাঁহার ভগবানে পিতৃজ্ঞান ও প্রেম কোথা হইতে আসিল? জিসসের চরিতাখ্যায়কেরা বলেন, এই ভগবৎপ্রেম ও শরণাসক্তি জিসসের নিজ সম্পত্তি। কিন্তু জিসস্ কি তাৎকালিক ধর্ম্ম-সংসার হইতে অবিচ্ছিন্ন ছিলেন, এবং সেই ধর্ম্মসংসারে কি সেই আসক্তি ও প্রেম বিদ্য-মান ছিল না যে বলিতে হইবে, জিসস্ তাহা কোথাও হইতে শিক্ষালাভ করেন নাই? হিলেল, সিরাকের পুত্র জিসস্ এবং সাত্বিক র‍্যাবিগণ তাঁহাকে কি শিক্ষা দিয়াছিলেন? পুরাতন বাইবেলোক্ত ধর্ম্মগীত এবং জবের গ্রন্থে কিরূপ ধর্ম্মভাবের উত্তেজন হইত? নিজ গুরু জন এবং এসিনিসগণের বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত-প্রভাব কি? বৌদ্ধধর্ম্মের বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিবৃৎ তত্ত্ব কি খ্রীষ্টধর্ম্মীয় পিতা, পুত্র এবং পবিত্রাত্মার অনুরূপ তত্ত্ব নহে? Arthur Lillie বলেন, জিসস্ যে ত্রিবৃৎ তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। বুদ্ধ—জগৎ-কারণ রূপে পিতা, ধর্ম্ম—পরমাত্ম-জ্ঞান এবং বাক্য রূপে পুত্র এবং মানবের পবিত্রতা সাধন ও জীবের সহিত পরমাত্মার মিলন জন্য যেমন সঙ্ঘই উপায় তদ্রূপ খ্রীষ্টধর্ম্মীয় পবিত্র-প্রেতাত্মা। এই পিতা পুত্রের ভাব খ্রীষ্টধর্ম্মে ওতপ্রোত হইয়া আছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক এবং এসিনিসগণ সিরিয়া এবং ব্যাবিলনে বৈদিক ধর্ম্মের জ্ঞান, পবিত্রতা ও সন্ন্যাসধর্ম্ম চারিদিকে প্রচার করিয়াছিলেন। কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি বৌদ্ধগণ বিরোধী; তাহারা কেবল চিত্তশুদ্ধি, বিষয়-বৈরাগ্য ও জ্ঞানের মাহাত্ম্য ভালরূপে বুঝি-য়াছিলেন। বিষয়াসক্তি সন্ন্যাসীর নিতান্ত অপ্রীতিকর। বৌদ্ধধর্ম্মের এই সমস্ত নীতি জন (John) গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া-ছিলেন এবং তদীয় শিষ্য যীশুকে তাহা বিধি-মত শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই জন্য আমরা যীশুর উপদেশ মধ্যে বিষয়-বৈরাগ্য, চিত্তশুদ্ধি ও আন্তরিক পবিত্রতা সাধনের ঔচিত্য, কর্ম্ম-কাণ্ডের প্রতি বিদ্বেষভাব, ভগবানের প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং তজ্জন্য সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক শরণাপন্ন হইয়া * তাঁহারই প্রেমে ভোর হইয়া থাকা—এ সমস্তই দেখিতে পাই। জুডিয়া এবং সিরিয়াতে ভারতীয় জ্ঞান ও ধর্ম্ম, কি বৌদ্ধগণ, কি এসিনিসগণ, কি গ্রীক

* গীতার ১৮ অ, ৬২ এবং ৬৬ শ্লোক দেখ।

পণ্ডিতগণ, কি মিসর ধর্ম্মমতাবলম্বিগণ, সকলেই প্রচার করিয়াছিলেন। পুরাতন বাইবেলেও ভারতীয় বৈদিক জ্ঞান নিহিত ছিল; কারণ, তাহা মোসেস্ লিখিত গ্রন্থাবলিরই বিস্তার মাত্র। জবের গ্রন্থ আরবীয় ধর্ম্মভাবে পূর্ণ। যীশু জুডিয়া এবং সিরিয়াতে লালিত এবং শিক্ষিত, সুতরাং তাঁহার উপদেশ সমূহ যে বৌদ্ধধর্ম্মভাবে এবং কিয়ৎপরিমাণে বৈদিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি?

বৌদ্ধেরা যেমন ত্রিবিধ তত্ত্বের উপদেশ দিতেন, ফাইলোর শিষ্যগণও সেই শিক্ষা দিতেন। কেহ কেহ এজন্যও বলেন, ফাইলোর ত্রিবাদ হইতে খ্রীষ্টধর্ম্মীয় ত্রিবিধ তত্ত্ব গৃহীত হইয়াছে। যীশু মিসর ধর্ম্মমত হইতে শুদ্ধ যে ত্রিবিধ তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এমত নহে, তাঁহার (Doctrine of Faith) যাহাকে ভক্তিবাদ বলিলে ঠিক হয় না, কারণ, হিন্দু ভক্তিবাদ আরও বিস্তৃত ও গুরুতর বিষয়, কিন্তু যাহাতে ভক্তিবাদের কথঞ্চিৎ আভাস আছে—তাহাও মিসর ধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। একথা আমরা পরে আলোচনা করিব।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (১)

'Nature and God are the companions that no one can ever quit, change as man may his place, his age, his society: they fill the very path of time on which he travels and the fields of space into which he looks."

দর্শন-শাস্ত্র যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যুক্তি আবহমান কাল হইতে মানবমনে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। যুক্তির প্রভাবে মনুষ্য অপ্রত্যক্ষ ও অজ্ঞাত বিষয় নির্দ্ধারণে সক্ষম হয়। এতাদৃশ মহিমান্বিত যুক্তি যে দার্শনিকতত্ত্বের মূলীভূত ভিত্তি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যুক্তির কষ্টি-পাথরে যে জ্ঞানের পরীক্ষা না হইয়াছে,—সে জ্ঞান অন্ধ;—সে জ্ঞানে মনুষ্যের অনুসন্ধিৎসু মন কদাচ নির্বৃতি লাভ করিতে পারে না। পণ্ডিতপ্রবর প্রবর (Kant) বলেন, অজ্ঞাত-পদার্থের নির্ণয়ে (Knowledge of the unconditioned) প্রমাণ ও যুক্তি বড় একটা কার্য্যকরী নহে। ভারতীয় দর্শনকারগণ কিন্তু একথা স্বীকার করেন না। ইঁহারা কেবলমাত্র প্রমাণ ও যুক্তি বলেই জ্ঞেয় পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া অদৃশ্য, অজ্ঞাত ব্রহ্ম-পদার্থ ও পরকালাদির নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন এবং আমরা দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি যে, ইঁহারা ইউরোপীয় মনীষীগণ অপেক্ষা এবিষয়ে অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইঁহারা প্রমাণ ও যুক্তি বিষয়ে কতদূর পারদর্শী, সে কথা বারান্তরে বলিব। আজ্ আমরা দেখিব, হিন্দুদর্শন এই জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে কিরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। "ঈশ্বর জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কি প্রকারে—কি কৌশলে—কিরূপ যন্ত্রে—কোথায় থাকিয়া কি দিয়া নির্ম্মাণ করিলেন? যদি এই সকল বিষয় বুদ্ধিতে আরোহণ করাইতে চাও, তবে যুক্তিকুশল সংস্কৃতাত্মা পুরুষের আন্তর-সৃষ্টির দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর—সমাহিত হইয়া চিন্তা কর—বুঝিতে পারিবে যে, ঈশ্বর কি প্রকারে কি কৌশলে এই বিচিত্র

জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলতঃ যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা, শক্তি, পরিমাণ কিছুরই ইয়ত্তা করা যায় না"। একজন ইংলণ্ডীয় বৃদ্ধ পণ্ডিত বলেন যে,

"We find that our thought seizes, with instinctive persuation, on two opposite aspects of existence,—that which *appears* and that which *is*—the transient phenomenon and the abiding ground. Phenomena alone, supported by no nucleus of the *real* would be as but flaping drapery hanging upon no solid form, but folded round the empty outline of a ghost."

হিন্দুদর্শনও এই কথাই বলেন। জগৎ ও ব্রহ্ম, নিত্য ও অনিত্য—এই দুইটীই মনুষ্য জ্ঞানের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র পদার্থসঙ্কুল জগৎ, একটী অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন মহান্ চৈতন্য হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত";—সেই ঋতও সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে পদার্থ-পুঞ্জ সৃষ্টি হইয়াছে। উপাদান পরিণত হইয়াই, নূতন পদার্থ অভিজাত হইয়া থাকে। কর্ত্তা পুরুষ, উপাদান লইয়াই নূতন পদার্থের গঠন করেন, ইহাই ত জাগতিক নিয়ম। 'কর্ত্তৃত্ব' কাহাকে বলে? "কর্ত্তৃত্বঞ্চ তদুপাদান-গোচরাপরোক্ষ জ্ঞান-চিকীর্ষা কৃতিমত্ত্বং"। উপাদান বিষয়ক প্রত্যক্ষ, চিকীর্ষা বা গঠনেচ্ছা এবং তদ্বিষয়ক কৃতি বা যত্ন,—এই তিনটী লইয়াই কর্ত্তৃত্ব। যিনি যে পদার্থের কর্ত্তা হউন্, তাঁহারই এতিনটীর আবশ্যক। মৃত্তিকারূপ উপাদান হইতে ঘট নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে, কুম্ভকারের মৃত্তিকার প্রত্যক্ষজ্ঞান, ঘট-নির্ম্মাণের ইচ্ছা এবং নির্ম্মাণ-বিষয়ক যত্ন,—এই তিনটী অবশ্যই থাকিবে। সেই জন্যই কুম্ভকারকে আমরা ঘটের কর্ত্তা বলি। তবে এ পরিদৃশ্যমান্ জগতের উপাদান কে? জগৎ-কর্ত্তা পরমেশ্বর, কিরূপ উপাদানকে পরিণত করিয়া এ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন? কিরূপ উপাদান লইয়া, বিধাতা এই পদার্থ-পুঞ্জ নির্ম্মিত করিয়াছেন?

এজগৎ ঈশ্বর-সৃষ্ট। জগৎ-সৃষ্টি সম্বন্ধে ঈশ্বরের অসাধারণ 'কর্ত্তৃত্ব'। সেই কর্ত্তৃত্বের ফলেই এই জগৎ কার্য্যাকারে আবির্ভূত হইয়াছে। জগৎ কার্য্য, এবং ব্রহ্ম উহার কারণ। হিন্দুদর্শন সমূহ, স্বীয় স্বীয় বিভিন্ন প্রণালী অনুসারে এই কার্য্য-কারণের তত্ত্ব ও সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। কার্য্য-কারণবাদের জটিল তর্কের মধ্যে আজ আমরা প্রবেশ করিব না; সে কথা পৃথক্ এক প্রবন্ধে বলিবার ইচ্ছা রহিল। আজ্ কেবল, প্রধানতঃ ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্ত এই দর্শনত্রয়ের জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে কিরূপ কারণ-নির্দ্দেশ ও সৃষ্টি সম্বন্ধে ঈশ্বরের কিরূপ কর্ত্তৃত্ব স্বীকার প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব। ভিন্ন ২ দর্শন কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; তাহারই কতিপয় মত লইয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

হিন্দুদর্শনানুসারে, কারণ প্রধানতঃ তিন প্রকার। (ক) উপাদান বা সমবায়ী কারণ (Substantial or material cause)। (খ) নিমিত্ত কারণ (Instrumental cause)। (গ) অসমবায়ী কারণ (Non-substantial or immanent cause)। আমরা উপাদান ও নিমিত্তকারণ সম্বন্ধেই দুই এক কথা বলিয়া প্রবন্ধের অবতারণা করিব। সাংখ্য ও বেদান্ত যাহাকে উপাদান কারণ বলেন, ন্যায়দর্শন তাহাকেই সমবায়ী কারণ বলিয়াছেন। যাহার সহিত সমবেত হইয়া কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম উপাদান কারণ।

উপাদান কারণের সহিত নিমিত্ত কারণের প্রভেদ এই যে, জায়মান কার্য্যের শরীরে উপাদান কারণ সংযুক্ত থাকে। নিমিত্ত কারণটী সেরূপ থাকে না। ঘটরূপ কার্য্যের উপাদান কারণ মৃত্তিকা এবং নিমিত্ত কারণ দণ্ড, সলিল, কুম্ভকার প্রভৃতি। ঘটরূপ কার্য্যের শরীরে মৃত্তিকারূপ উপাদান সংলগ্ন থাকিবে, কিন্তু নিমিত্ত কারণের সংস্রবও থাকিবে না। ফলতঃ, যে দ্রব্যের গাত্রে কার্য্য জন্মে, বা যে দ্রব্য বিকৃত হইয়া কার্য্য জন্মায়, তাহারই নাম উপাদান। কারণে যে কার্য্য-শক্তি বিলীন হইয়া থাকে, সে উপাদান কারণেই থাকে, 'নিমিত্ত কারণে নহে।

"Instrumental cause is the active, effective agent, while substantial cause is passive, yielding itself to be acted on by it."

এখন দেখা যাউক, জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে ঈশ্বর কিরূপ কারণ। ন্যায়মতে ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন না। এ মতে, পরমাণু জগতের উপাদান কারণ, এবং ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ মাত্র। পরমাণু রূপ উপাদান লইয়াই, জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর সংযোগাদি ক্রিয়াবলে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। সাংখ্য-প্রণেতা কপিল স্পষ্টতঃ ঈশ্বর স্বীকার না করিলেও, তাঁহার "পুরুষ" কেই বাস্তবিক পক্ষে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করা যাইতে পারে। অথবা, সেশ্বর সাংখ্য পাতঞ্জলের মতে, ঈশ্বরই প্রকৃতি ও পুরুষের অধিষ্ঠাতা ও উহাদের সংযোগে-বিধানকর্ত্তা। যাহাই হউক, সেশ্বর সাংখ্য বা নিরীশ্বর সাংখ্য উভয় মতেই, প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ। ঈশ্বর বা পুরুষ নিমিত্ত কারণ মাত্র। পুরুষ সংযোগে, অথবা ঈশ্বরেচ্ছায় প্রকৃতি-পুরুষ-যোগে, উপাদানভূত প্রকৃতিই পরিণতা হইয়া এই জগতের আকারে পরিণত হইয়াছে। বেদান্ত একটু বিভিন্ন-পথে গিয়াছেন। তাঁহার মতে, জগৎ মিথ্যা—অবিদ্যা-কল্পিত বা অধ্যস্ত—বলিয়া একমাত্র ব্রহ্মই, জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে, অবিদ্যাশক্তি জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন এবং সঙ্গে ২ ব্রহ্মও তাহাতে বিবর্ত্তিত হইয়া আছেন। এই অবিদ্যা, কল্পিত বা মিথ্যা পদার্থ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, অবিদ্যা উপাদান কারণ হইলেও, ব্রহ্মই বাস্তবিক উপাদান কারণ। সুতরাং ইঁহার মতে, ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত পদার্থ মিথ্যা বলিয়া, একমাত্র ব্রহ্মই, জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। এমতে, ব্রহ্ম জগতের কেবলমাত্র নিমিত্ত কারণ হইতে পারেন না। এই ত্রিবিধ দর্শনের মতেই, জগৎসৃষ্টি-কার্য্যে আর একটী নিমিত্ত-কারণ স্বীকৃত হইয়াছে। তাহার নাম সৃজ্যমান-প্রাণী-কৃত কর্ম্ম বা অদৃষ্ট। অর্থাৎ উপাদান কারণ ও অদৃষ্টাদিরূপ নিমিত্ত কারণ সহকৃত হইয়া, ঈশ্বর এই জগতের সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন। অদৃষ্ট স্বীকার না করিলে যে কিরূপ গুরুতর দোষ হয়, তাহা আমরা বিগত চৈত্র-সংখ্যার নব্যভারতে "সুখ ও দুঃখ" নামক প্রবন্ধে প্রতিপাদন করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সঙ্গে, আমরা পাঠককে সেই প্রবন্ধটীও পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। সংক্ষেপে এইরূপ বিবরণ দিয়া, এখন আমরা উপরোক্ত দর্শন সমূহের মত সকল পৃথক্ ২ বিশ্লেষ করিয়া একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি। আমরা এই প্রবন্ধে, সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন্ দর্শনের "প্রণালী" কিরূপ, তদ্‌বিষয়ে আলোচনা

করিলাম না। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই যে, এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন্ দর্শন কিরূপ "কারণ" নির্ণয় করিয়াছেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদর্শন মাত্র।

প্রথমতঃ ন্যায়-মতেরই অনুসরণ করা যাউক। ন্যায়মত এইরূপঃ—জগতের ঘট পটাদি প্রত্যেক পদার্থই অবয়ব-বিশিষ্ট (Extended)। দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমস্ত সাবয়ব-পদার্থই সংযুক্ত বা মিলিত হইয়াই আত্ম লাভ করিয়া থাকে। তন্তু-সমূহ মিলিত হইয়া পটের উৎপত্তি হয়। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, যে সমস্ত পদার্থ সাবয়ব, তাহারা সমস্তই তৎসমান-জাতীয় দ্রব্যের একত্র মিলনেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেক সাবয়বী পদার্থকে বিশ্লেষ বা বিভাগ করিতে করিতে যে স্থলে বিভাগ কার্য্য শেষ হয়, সেই পদার্থের অতীব সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য চরম অংশ বা অবয়বকে পরমাণু বলা যায়। বস্ত্র অবয়বী পদার্থ; সূত্র সেই বস্ত্রের অবয়ব। অর্থাৎ সূত্রগুলি মিলিত বা সংযুক্ত হইয়াই বস্ত্র উৎপাদিত হইয়াছে। আবার সূত্র অবয়বী; অংশু তাহার অবয়ব। এইরূপ অংশু অবয়বী; তদংশ তাহার অবয়ব। এইরূপে ক্রমে বিভাগ করিতে করিতে যেস্থলে আর বিভাগ হইবে না, তাহাই পরমাণু-পদ-বাচ্য। গিরি সমুদ্রাদি সমস্ত জগৎ সাবয়ব; সুতরাং সাবয়ব বলিয়া তাহাদের আদি ও অন্ত আছে। সুতরাং পরমাণুই জগতের কারণ। বিভাগের একটী শেষ স্থান স্বীকার করিতেই হইবে। কেন না, অস্বীকার করিলে প্রকাণ্ড পর্ব্বত ও ক্ষুদ্র সর্ষপের পরস্পর পরিমাণগত কোন ভেদই থাকে না। উভয়ই সমান হইয়া পড়ে। ন্যায়মতে, পরমাণু নিরবয়ব; সুতরাং নিত্য। কেন না, যাবতীয় সাবয়ব পদার্থের বিনাশ দৃষ্ট হয়। পরমাণু নিরবয়ব; সুতরাং একটী পরমাণু যে অন্য আর একটী পরমাণু হইতে বিভিন্ন, ইহা প্রতিপাদনের জন্য, নৈয়ায়িকেরা "বিশেষ" নামে, পরমাণুগত একটী ভেদক ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন*। ইঁহাদের মতে, পৃথিবী, জল, বায়ু ও তেজের চতুর্ব্বিধ পরমাণু কল্পিত হইয়াছে। সৃষ্টিকালে, অদৃষ্টরূপ নিমিত্ত কারণের সদ্ভাব ও প্রভাব হেতু, ঐ সমস্ত পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। সেই ক্রিয়াবলে, একটী পরমাণু অন্য একটী পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হয়। ইহাকেই দ্ব্যণুক বলে। এই দ্ব্যণুক দৃশ্য পদার্থ। এইরূপ দ্ব্যণুকাদিক্রমে পরিদৃশ্যমান্ বায়ু, অগ্নি, শরীর, ঘট, পর্ব্বত প্রভৃতি নিখিল জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইঁহারা বলেন যে, কারণে যে গুণ বর্ত্তমান থাকে, কার্য্যে তাহারই সমান জাতীয় গুণ সংক্রমিত হয়। ভিন্ন জাতীয় গুণ আইসে না। সুতরাং ব্রহ্ম, জগতের উপাদান কারণ হইলে, জগৎরূপ কার্য্যে কারণের গুণ-চৈতন্য সংক্রমিত হইত। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, পরমাণুই এই জগতের উপাদান। অদৃষ্টের ন্যায়, ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ মাত্র। কেবল অদৃষ্ট কারণ হইতে পারে না, কেন না পুরুষ কর্ম্মের বা অদৃষ্টের নিষ্ফলতা দৃষ্ট হয় (ন্যায়সূত্র ৪।১।১৯); আবার কেবল ঈশ্বরও কারণ নহেন, কেন না তাহা হইলে পুরুষেচ্ছা ব্যতিরেকেই ফল হইতে পারিত (ন্যায়সূত্র, ৪।১।২০-২১); অতএব অদৃষ্টেরও সহকারিতা আবশ্যক। প্রবন্ধ বাহুল্যভয়ে, সংক্ষেপে এ সমস্ত কথা বলিতে হইল।

* এই জন্য কণাদ স্বীয় গ্রন্থের নাম "বৈশেষিক"।

অতএব দেখা গেল যে, স্থায়মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ এবং পরমাণু উপাদান কারণ।

দ্বিতীয়তঃ, সাংখ্যদর্শনের মতানুসরণ করিয়া দেখা যাউক্। ইঁহার মতেও প্রকৃতি উপাদান কারণ। সুখ দুঃখ ভোগের বীজ-ভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল ভোগের জন্য এবং অপবর্গ-লাভের জন্য,প্রধান ও পুরুষের সংযোগ হয়। "পুরুষার্থ প্রবর্ত্তিকা প্রকৃতিঃ," এবং "পুরুষস্থ বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে তদ্বদব্যক্তং"। পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সিদ্ধির জন্যই প্রকৃতি, কার্য্যকারে পরিণত হয়। অথবা সেশ্বর সাংখ্যমতে পুরুষ বা জীবাত্মার অদৃষ্টের জন্য বা ভোগার্থ, ঈশ্বরই প্রকৃতি পুরুষে সংযোগ ঘটাইয়া দেন। এবং সংযোগ ফলে মহৎ ও অহঙ্কারাদি ক্রমে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি হয়। গীতারও এইরূপ মত বলিয়া বোধ হয়। পুরুষ বাস্তবিক, অসঙ্গ উদাসীন। কিন্তু প্রকৃতিসংযোগহেতু, প্রকৃতির সুখদুঃখাদি স্বীয় আত্মাতে আরোপিত হইয়া, পুরুষ ও সুখী দুঃখী জ্ঞান করে। "যোগঃ অবিবেক কৃততাদাত্মাধ্যাসঃ" (শ্রীধর স্বামী)—অর্থাৎ পুরুষে অজ্ঞানজনিত তাদাত্মধ্যাস, বা প্রকৃতিস্থ হেতু প্রকৃতির গুণারোপকেই প্রকৃতি পুরুষ-যোগ বলিয়া বুঝিতে হইবে। পুরুষের অদৃষ্টই এই সংযোগের কারণ। "কর্ত্তৃত্বাদিকং অচেতনস্যাপি চেতনাদৃষ্টবশাৎ চৈতন্যাধিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি, যথা বৎসাদৃষ্টবশাৎ স্তন্যপয়সঃ ক্ষরণং"। পুরুষ-সন্নিধান আছে বলিয়াই, প্রকৃতির 'কর্ত্তৃত্ব বলিয়া বোধ হয়; আবার প্রকৃতি-সন্নিধান আছে বলিয়াই পুরুষের 'ভোগ' হয়। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রকৃতিই ভোগ্য অদৃষ্টরূপ নিমিত্ত কারণ-যুক্ত-পুরুষের ভোগের জন্য, এই জগদাকারে পরিণতা হইয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সেশ্বর-সাংখ্য মতেও প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ এবং ঈশ্বর নিমিত্ত-কারণ। এই প্রকৃতিরূপ উপাদান কারণে কার্য্যজননী শক্তি লুক্কায়িত ছিল।

তৃতীয়তঃ, বেদান্ত-দর্শন। এমতে, একমাত্র ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। কিন্তু এমতের বিস্তৃত বিবরণ আর এক দিন বলিব।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

রাজগৃহ।

আপনি রাজগৃহের কথা শুনিতে চাহিয়াছেন*। রাজগৃহ আমি কখন দেখি নাই। আপনার চিত্ত-বিনোদন ও অনুসন্ধানে সাহায্যের জন্য সংগ্রহ করিয়া একয়টী কথা লিখিলাম।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে রাজগৃহ পবিত্র ও প্রসিদ্ধ স্থান। মহাভারত ও পুরাণে রাজগৃহের উল্লেখ আছে। ফাহিয়ান ও হুয়েন্থসাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এবং মহাবংশে রাজগৃহের ইতিহাস পাওয়া যায়। কনিংহাম

* আমি বিগত চৈত্রমাসে রাজগিরি গিয়াছিলাম। অনুসন্ধানের সাহায্যের জন্য বন্ধুবর শ্রীযুক্তবাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র রায়চৌধুরী, এম্-এ, মহাশয়ের নিকট রাজগৃহ সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক বিবরণ জানিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর। সাধারণের অবগতির জন্য তাহা নব্যভারতে প্রকাশ করিলাম। ইহার পর রাজগিরির ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিব। ন, স,।

ও অন্যান্য প্রত্নবিতেরা রাজগৃহ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। রাজগৃহের অপর নাম গিরিব্রজ। পাঁচটি পর্ব্বতে রাজগৃহ পরিবেষ্টিত, এজন্য রাজগৃহের নাম গিরিব্রজ হইয়াছিল। সে পাঁচটি পর্ব্বতের নামও কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত ভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা বৈভার, বিপুল, বৃষভ বা পাণ্ডব, গৃধ্রকূট বা চৈত্যক ও ঋষিগিরি এই নামগুলি গ্রহণ করিলাম।

বৈভারো বিপুলশ্চৈব রত্নকূটো গিরিব্রজঃ
রত্নাচল ইতিখ্যাতা পঞ্চৈতে পাবনা নগা।
পঞ্চানাং শৈলমুখ্যানাং মধ্যে মালেব রাজতে
সরস্বতী পুণ্যতোয়া পুণ্যারণ্যাদ্বিনিঃসৃতা ॥বায়ুপুরাণ

বহুকাল পর্য্যন্ত মগধের রাজধানী ছিল বলিয়া, ইহার নাম রাজগৃহ হইয়াছিল। সে কথা পরে বলিব।

বায়ুপুরাণে লিখা আছে ঃ—

কীকটেষু গয়া পুণ্যা নদী পুণ্যা পুনঃপুনা।
চ্যবনস্যাশ্রমঃ পুণ্যঃ পুণ্যং রাজগৃহং বনম্ ॥

মহাভারতের মতে উপরিচর বসু রাজগৃহের জঙ্গল কাটিয়া যজ্ঞ করিয়া এখানে একটি নগর স্থাপন করেন। রামায়ণেও একথার উল্লেখ আছে ঃ—

কুশাম্বস্তু মহাতেজাঃ কৌশাম্বীমকরোৎপুরীম্।
কুশনাভস্তু ধর্ম্মাত্মা পুরঃ চক্রে মহোদয়ং ॥
অমূর্ত্তরজসো নাম ধর্ম্মারণ্যং মহামতিঃ।
চক্রে পুরবরং রাজা বসুর্ণাম গিরিব্রজম্ ॥
এষা বসুমতী নাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ।
এতে শৈলবরাঃ পঞ্চ প্রকাশন্তে সমন্ততঃ ॥
সুমাগধী নদী রম্যা মগধান্ বিশ্রুতো যযৌ।
পঞ্চানাং শৈলমুখ্যানাং মধ্যে মালেব শোভতে ॥

তাঁহার পুত্র বৃহদ্রথ রাজগৃহে মগধের রাজধানী স্থাপন করেন। বসু-প্রতিষ্ঠিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ গিরিব্রজের বহির্ভাগে উত্তরদিকে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। জরাসন্ধের সিংহাসন এই রাজগৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাক্যসিংহের জীবিতকালে পাটলি গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হয়। মিথিলার ব্রিজিদিগের প্রাদুর্ভাব সঙ্কুচিত করিতে গঙ্গার দক্ষিণ পার্শ্বে পাটলিগ্রামে দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। উদারাশ্ব রাজগৃহ হইতে রাজধানী তুলিয়া আনিয়া পাটলিপুত্রে স্থাপিত করেন। তদবধি রাজগৃহের পতিত দশার প্রারম্ভ। ব্রডলি সাহেব অনুমান করেন, বিহারের নিকটবর্ত্তী কুশাগ্রপুর রাজগৃহের পূর্ব্বে মগধের রাজধানী ছিল। কনিংহাম বলেন, কুশাগ্রপুর রাজগৃহের নামান্তর মাত্র। শাক্যসিংহের প্রব্রজ্যা গ্রহণকালে বিম্বুসর রাজগৃহের রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র অজাত-শত্রুও রাজগৃহে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বায়ুপুরাণ উদয়াশ্বকে অজাত-শত্রুর পৌত্র এবং মহাবংশ পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উদয় খ্রীঃ পূঃ ৪৫০ অব্দে জীবিত ছিলেন।

বৈভার গিরির দক্ষিণ পৃষ্ঠে প্রাচীন শতপর্ণী গুহা। এইখানে বুদ্ধদেবের তিরোধানের অব্যবহিত পরে বৌদ্ধদিগের প্রথম সভা সমাহূত হয়। আজকাল ইহার নাম সোণ-ভাণ্ডার। তিব্বতীয় গ্রন্থে ইহার নাম ন্যগ্রোধ গুহা। হুয়েন্থসাঙ বলেন, ইহা বৈভারের উত্তর পৃষ্ঠে অবস্থিত ছিল। বৃষভ পাণ্ডব বা রত্নকূটের পার্শ্বে পিপ্পল গুহা অবস্থিত ছিল। ভোজনান্তে বুদ্ধদেব এইখানে নির্জ্জনে বসিয়া সমাধিগত হইতেন। ইহা শতপর্ণী গুহার আধ ক্রোশ পূর্ব্বে। ইহার উপর আজকাল একটি ক্ষুদ্র জৈন মন্দির দেখা যায়। বিপুলগিরির শিরোদেশে একটি বৃহৎ চৈত্যের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মহাভারতে ইহাকেই চৈত্যক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। গৃধ্রকূট ও

ঋষিগিরির উপর অনেকগুলি জৈন মন্দির এখন দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজগৃহের উষ্ণপ্রস্রবণের কথা প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা সরস্বতী নদীর উভয় কূলে অবস্থিত। কতকগুলি বৈভার গিরির পূর্ব্বপাদে, অন্যগুলি বিপুল গিরির পশ্চিম পাদে অবস্থিত। বৈভারের উষ্ণপ্রস্রবণের নাম গঙ্গা-যমুনা, অনন্তঋষি, সপ্তঋষি, ব্রহ্মকুণ্ড, কাশ্যপঋষি, ব্যাসকুণ্ড ও মার্কণ্ডকুণ্ড। বিপুলগিরির উষ্ণপ্রস্রবণের নাম সীতাকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, গণেশকুণ্ড, চন্দ্রমা কুণ্ড, রামকুণ্ড ও শৃঙ্গীঋষিকুণ্ড। শৃঙ্গীঋষি কুণ্ডকে মুসলমানেরা মকদুমকুণ্ড নাম দিয়া আপনাদের করিয়া লইয়াছে। ইহার পার্শ্বে চিল্লাসা নামে এক পীরের সমাধি স্তম্ভ অবস্থিত আছে। এই পীর প্রথমে আহীর জাতীয় হিন্দু ছিলেন,তখন নাম ছিল চিলোয়া—মুসলমান হইয়া চিল্লাসা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই সকল প্রস্রবণের মধ্যে সপ্ত ঋষি প্রস্রবণের জল সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ। প্রাচীন রাজগৃহ বা পুরাণ রাজগিরির আড়াই মাইল উত্তরপূর্ব্বে বিখ্যাত গৃধ্রকূট। এখন ইহার নাম শৈলগিরি। বর্ত্তমান রাজগৃহের প্রায় এক মাইল দক্ষিণে প্রাচীন রাজগৃহ অবস্থিত ছিল। অজাত-শত্রুর পিতা শ্রেণীক বিম্বসর নূতন রাজগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই "নূতন" রাজগৃহ সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল।

রাজগৃহের সাত মাইল উত্তরে বিখ্যাত নালন্দের বিশ্ব বিদ্যালয় অবস্থিত ছিল।* নালন্দের এখন নাম বড়গ্রাম বা বড়া গাঁও। কনিংহাম বলেন, এই নালন্দে সারিপুত্রের জন্ম হয়। হুয়েন্থসাঙের মতে নালন্দের দুই ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে কলপিনাক গ্রামে সারিপুত্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মৌদ্গল্যায়নেরও জন্মগ্রাম নালন্দ। একথাও সত্য নহে। নালন্দের দেড় মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে কুলীক গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। বর্ত্তমান জগদীশপুরের নিকট এই গ্রাম অবস্থিত ছিল। এক সময়ে নালন্দ এত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল যে,পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল বিদেশে নালন্দের অংশ বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকিবে।

নালন্দ মঠের দক্ষিণে একটা বৃহৎ দীঘিকা ছিল। শুনা যায় নালন্দ নামে এক নাগ এইখানে বাস করিতেন। তাঁহার নাম হইতে এই স্থানটীর নালন্দ নাম হয়।†

সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন্থসাঙ্গ ভারত পর্য্যটনে আগমন করেন, তিনি আসিয়া রাজগৃহ ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পান। সেই ভগ্নাবশেষ স্তূপাকারে এখন কোথায় কোথায়ও পতিত আছে। কিন্তু অধিকাংশই হিন্দু, জৈন ও মুসলমানের ধর্ম্মালয় বা দেবমন্দিরে পরিণত হইয়াছে। এখন আর সে স্তূপ দৃষ্টে প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির নির্দ্দেশের উপায় নাই।

হুয়েন্থসাঙ্গ বলেন, গৃধ্রকূট পর্ব্বতে বুদ্ধদেব সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরিক-সূত্র প্রচার করেন। রাজগৃহের অনতিউত্তরে কারণ্ডবেণুবন অবস্থিত ছিল। ইহার উত্তরেই কারণ্ডহ্রদ। ইহার উত্তর পশ্চিমে নূতন রাজগৃহ। চীন পরিব্রাজক নূতন রাজগৃহকেও ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলেন।

* "Nalanda which afterwards became the representative of Buddhism in Central India was founded by two upashaka brothers Mudgar-Gorrina and Shankar. At first Abhidharma was taught at Nalanda but afterwards it was the principal chosen seat of Mahayan."—Taranath.

† এই স্থলে বসাইবার জন্য রাজগৃহের একখানি ম্যাপ ক্ষীরোদ বাবু প্রেরণ করিয়াছিলেন; ম্যাপ খানি প্রস্তুত করিতে বিলম্ব হইতেছে, একারণ এস্থলে দেওয়া হইল না। রাজগৃহের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সহিত এই ম্যাপ দেওয়া যাইবে। ন.স.।

পঞ্চম শতাব্দীতে ফাহিয়ান নালন্দকে সামান্য একটি গ্রামমাত্র দেখিয়াছিলেন। দুইশত বৎসরে নালন্দ সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হয়। শক্রাদিত্য, বুদ্ধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্য ও বজ্রগুপ্ত রাজার যত্নে নালন্দের এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। হুয়েন্থসাঙ এইরূপে নালন্দের বর্ণনা করিয়াছেন :—

"গুণবান ও ক্ষমতাবান সহস্র সহস্র শ্রমণ নালন্দে বাস করেন। ইঁহাদের মধ্যে শত শত জনের সুখ্যাতি দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহারা পবিত্র ও অনিন্দনীয় চরিত্র। যুবা বৃদ্ধ তাঁহারা সকলে দিবারাত্র ধর্ম্মালোচনা করেন। তর্কশাস্ত্র শিখিবার জন্য দূরস্থ নগর হইতে পণ্ডিতেরা এখানে আগমন করেন। অনেকে নালন্দ বিহারের-ছাত্র বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিয়া বিদেশে অর্থ ও সম্মান উপার্জ্জন করে।

প্রাচীন ও নূতন ন্যায় শাস্ত্রে অভিজ্ঞ না হইলে, কেহ নালন্দবিহারের আলোচনায় যোগ দিবার অধিকার পায় না। কত বিদেশীয় পণ্ডিত বিহারের দ্বাররক্ষকদিগের নিকট তর্কে পরাস্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়। দশ জন প্রবেশার্থীর সাত আট জন প্রবেশাধিকার পায় না। অদ্যাপি অনেকে ধর্ম্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতী, স্থিরমতী, প্রভামিত্র, জীনমিত্র, জ্ঞানচন্দ্র, শীঘ্রবুদ্ধ ও শীলভদ্রের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরব লাভ করে।

বিহারের চতুর্দ্দিকে শত শত স্তূপাবশেষ পতিত রহিয়াছে। দক্ষিণপার্শ্বে বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি অবস্থাপিত রহিয়াছে পশ্চিম পার্শ্বে বুদ্ধবিহার। গন্ধপাত্র হস্তে লইয়া অবলোকিতেশ্বরকে কখন কখন বুদ্ধবিহারে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। অবলোকিতেশ্বর বিহারের দক্ষিণপার্শ্বে একটি বিহারে বুদ্ধদেবের নখ ও কেশ রক্ষিত আছে। ব্যাধিগ্রস্ত লোক এখানে আসিলে ব্যাধিমুক্ত হয়। ইহার একপার্শ্বে একটি অদ্ভুত বৃক্ষ আছে। উহা পাঁচ ছয় হাত উচ্চ। বুদ্ধদেব দন্তধাবন করিয়া দন্তকাষ্ঠ প্রক্ষেপ করিলে, ঐ কাষ্ঠ নবজীবন লাভ করিয়া এই বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। সহস্রাধিক বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু এবৃক্ষের কেহ কখন হ্রাস বৃদ্ধি দেখে নাই। এক পার্শ্বে রাজা বালাদিত্য প্রতিষ্ঠিত বিহার। ইহা আয়তন ও সমৃদ্ধিতে বোধিমূলস্থ মহাবিহারের অনুরূপ। এক পার্শ্বে পূর্ণ বর্ম্মরাজা প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ মূর্ত্তি। উহা উচ্চতায় পঞ্চাশ কি ষাট হাত। এক পার্শ্বে শিলাদিত্য প্রতিষ্ঠিত একটি পিত্তল-নির্ম্মিত বিহার। এইরূপ কতশত বিহারে নালন্দ শোভমান হইয়াছে।"

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

অনুকারী অবতার।

কোনও দেশে কোনও ব্যক্তি, ক্রিয়া বা গুণ বিশেষে প্রতিপত্তি লাভ করিলে, সেই দেশের লোকেরা সেই প্রকার কর্ম্ম করিয়াই অথবা "প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির" অনুকরণ করিয়াই বিখ্যাত বা কার্য্যকুশল হইতে প্রয়াস করে। সংসারের এই রীতি এবং নীতি। ধর্ম্ম জগতেও এই রীতির অন্যথা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অনুকরণ করা সর্ব্বথা অন্যায় নহে, কিন্তু অনুকরণ দ্বারা সত্যকে অসত্য অথবা অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা, ধর্ম্ম ও ন্যায়-বিরুদ্ধ। অনেকে অবতার-

দিগের অনুকরণ করিয়া জগতে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের ইতিবৃত্ত এ পর্য্যন্ত একাধারে সংগৃহীত বা প্রকাশিত হয় নাই। মহম্মদের জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুর পরে অনেক অনুকারী অবতারের অভ্যুদয় হইয়াছিল; খ্রীষ্টসম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় ঋষতক মুনির পুত্র ব্রাহ্মণ "দ্বিতীয় রাম" বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় নিহত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের সার্দ্ধ ত্রিমাস পরে নন্দবর্ধাণ গ্রামে এক ব্যক্তি "শ্রীকৃষ্ণের আত্মা" বলিয়া ঘোষিত হওয়ায়,যদুকুলোৎপন্ন অম্বারিষ্ঠের হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চৈতন্যের মৃত্যুর পরে শান্তিপুর নবদ্বীপ এবং কাটোয়ায় অনেকে দ্বিতীয় চৈতন্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। অম্বিকা কালনা নামক এক নগরে ঐ সময়ে নিস্তারিণী নাম্নী এক ব্রাহ্মণী ছিল, সে বলিত "শ্রীচৈতন্যের আত্মা আমার দেহে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমিই এখন শ্রীচৈতন্য"। তথাকার লোকেরা এই ব্রাহ্মণীকে হত্যা করে। নিস্তারিণী ডাকিনী (ডাইন) উপাধিতে বিশেষিতা হইত। খ্রীষ্ট ও মহম্মদের সমকালে এবং তাঁহাদের মৃত্যুর পরে যে সকল ব্যক্তি "মিথ্যা অবতার" বলিয়া পরিঘোষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের ইতিবৃত্ত বাঙ্গালা ভাষায় এপর্য্যন্ত প্রচারিত হয় নাই; এই কৌতুককর বিবরণ পড়িবার যোগ্য।

খ্রীষ্টের জীবিতাবস্থায় দুই ব্যক্তি বিশু বলিয়া পরিচয় দেয়; একের নাম পলোনিয়স্, ইহার গ্রীশে নিবাস ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম বার্-জিজশ,য়িহুদী জাতি হইতে এব্যক্তি উৎপন্ন হয়। ইহাদের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। বার-জিজশের উল্লেখ বাইবেলে আছে। খ্রীষ্টের মৃত্যুর তিনবর্ষ পরে থিউদাস নামে এক ব্যক্তি অভ্যুদিত হয়, ইহার চারি শত শিষ্য হয়, কিন্তু স্বল্পকাল মধ্যে সকলেই প্রবঞ্চক বলিয়া নিহত হয়। ইহার পরে গালিলি দেশীয় য়ুদাস নামে এক ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, তাহারও ঐদশা হয়। (১) খ্রীষ্ট-শিষ্য ফিলিফ ভ্রমণ করিতে করিতে সেমেরিয়া নগরে উত্তীর্ণ হয়েন এবং শিমন নামে একব্যক্তিকে দেখিতে পান। শিমন "মন্ত্রসিদ্ধ এবং যাদুকর" বলিয়া প্রথম প্রথম লোকের নিকট পরিচয় দিত,অবশেষে "ভবিষ্যদ্বক্তা" বলিয়া পরিচয় দেয়। (২) ফিলিফ, যুক্তি এবং ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণ বাদানুবাদ দ্বারা সিমনকে পরাস্ত করেন। সিমনের হৃদয়ে খ্রীষ্টের মাহাত্ম্য এমন দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয় যে,সে অবশেষে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যায়। হেরোদশ নামে এক য়িহুদী রাজসিংহাসনে আরোহণ করতঃ মুকুট ধারণ করিয়া আপনাকে প্রথমে ঈশ্বর,তদনন্তর দ্বিতীয় খ্রীষ্ট বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। ইহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে,স্বর্গ হইতে দূত আসিয়া হেরোদেশের ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাহাকে মারে। (৩) মাসিদোনিয়া হইতে (সেণ্ট্) সাধু পল এবং সাধু লুকাস পরিভ্রমণ করিতে করিতে পথে এক স্ত্রীলোককে দেখিতে পান, এই স্ত্রীলোক "অবতার" বলিয়া পরিচয় দিয়া কুসংস্কারসম্পন্ন লোকের নিকট হইতে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিত। পল ইহাকে সংশোধন করেন। ইহাতে যাহাদের স্বার্থের হানি হইয়াছিল, তাহারা পলকে প্রহারিত ও

(১) বাইবেলের Acts of the Apostles গ্রন্থের Chap. V. শ্লোক 34 হইতে 37 দেখ।

(২) Acts of the Apostles Chap. VIII. Verses 5 to 25 দেখ।

(৩) Acts of the Apostles Chap. XII Verse. 21.

বন্দীকৃত করিতে ক্রটি করে নাই। (৪) সেকেন্দরা নগরের আপোলোশ নামে এক য়িহুদী সদ্বিদ্বান অনুকারী অবতার বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সেই জন্য ক্রমে সাধু পলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি আপনার উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তন করেন এবং খ্রীষ্টের শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন। ইহার অনেক বৎসর পরে য়িহুদীরা আবার খ্রীষ্টের অনুকরণ করে, কিন্তু তাহাতে সফলকাম হয় নাই। সাধুপলের ব্যক্তৃতায়, তর্কে, যুক্তিতে, চরিত্রে, অনুকারী অবতারেরা এরূপ মোহিত হইয়াছিল যে, তাহারা আপনাদের কৃত্রিম শাস্ত্র সমূহ ভস্মীভূত করিতে বাধ্য হয়। বাইবেলে লিখিত আছে—

"Many of them also which used curious arts brought their books together, and burned them before all men: and they counted the price of them, and found it fifty thousand pieces of silver. So mightily grew the word of God and prevailed"—Acts of the Apostles. Chap. XIX. Verses 19-20.

ভস্মীভূত গ্রন্থের মূল্য ৫০ হাজার মুদ্রার কম ছিল না।

মুসলমান ধর্ম্মের স্থাপয়িতা মহম্মদ সম্বন্ধে জর্জ্জ সেল লিখিয়াছেন "যে উপায়ে মহম্মদ স্বকীয় প্রতিপত্তি উপার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছিল, আসিয়ার অনেকে সেই উপায়ে ক্ষমতা ও যশোপার্জ্জনে ক্রটি করে নাই। (৫) মহম্মদের জীবিতাবস্থায় যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অবতারত্বের প্রবল সমকক্ষতা করিয়াছিল, মোসেলামা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মুসলমানেরা সাধারণতঃ ইহাকে 'মিথ্যাবাদী' বলিয়া পরিচিত করে। মোসেলামা, হানিফা বংশ হইতে উৎপন্ন এবং ইয়ামানা প্রদেশের এক প্রধান ব্যক্তি। হিজরির নবম বর্ষে হানিফাগণ ইহাঁকে দৈত্য কার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং ঐ বৎসরে ইনি আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া পরিচয় দিয়া ইহা ঘোষণা করেন যে, "আমি পৃথিবীকে মূর্ত্তি পূজার দণ্ড হইতে বাঁচাইবার জন্য এবং একমাত্র ঈশ্বরের পূজার বিস্তৃতি জন্য ধরাতলে অবতার রূপে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। (৬) আমার হস্তেও পরমেশ্বর এক কোরাণ দিয়াছেন। ঐ কারণের কিয়দংশ এইরূপ—"স্ত্রীলোকের উদর হইতে মোসালেমা নিঃসৃত হইয়া মনুষ্য শরীরে ধরাতলে ঈশ্বরের একমাত্র পূজা বিস্তৃত করিবে।" (৭) আবুল ফার্গশ নামক আরব্য গ্রন্থকার উপরিউক্ত কৃত্রিম কোরাণের অনেক অংশ আপনার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিয়দ্দিন পরে বহুশিষ্যের নেতা হইয়া ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলে, মোসেলামা মহম্মদকে এক পত্র লেখেন, ঐ পত্রের মর্ম্ম এই—"পত্র প্রেরক—ঈশ্বরাবতার মোসেলামা। পত্রপ্রাপক—মহম্মদ। অনুরোধ এই যে, পৃথিবীকে তুমি দুই ভাগে বিভক্ত কর। আমি অর্দ্ধেক আপনি লইয়া বাকী অর্দ্ধেক তোমাকে দিব।" ইহার উত্তরে মহম্মদ লিখিলেন, "পত্র প্রেরক—ঈশ্বরাবতার মহম্মদ। পত্র-প্রাপক—মিথ্যাবাদী মোসেলামা। পৃথিবী ঈশ্বরের, তিনি যাঁহাকে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকেই পৃথিবী দেন। ঈশ্বরভক্তগণের মঙ্গল হউক।" মহম্মদের জীবিতকাল পর্য্যন্ত মোসেলামা বড়ই পরা-

(৪) Acts of the Apostles, Chap. XV. Verses 12 to 40.

(৫) "As success in any project seldom fails to draw in imitators, Mahomed's having raised himself to such a degree of power and reputation by acting the prophet, induced others to imagine they might arrive at the same height by the same means." Al Koran by George Sale. Vide Preliminary Discourse. Page 139. (Chandos classics).

(৬) Abulfed P. P. 160 and 9.

(৭) Hist. Dynast. P. 164.

ক্রান্ত হইয়া উঠেন। হিজরীর একাদশ সনে আবুবেকর, মোসেলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে সৈন্য প্রেরণ এবং সেনাপতির পদে খালেদ ওয়ালীদ সাহেবকে নিযুক্ত করেন। এই যুদ্ধে মহম্মদের কাফ্রিদাস ওয়াশা, মোসেলামাকে নিহত করে। মহম্মদের পক্ষের লোকের জয় হয়, মোসেলামার অনেক লোক মহম্মদকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করে এবং দশ হাজার ব্যক্তি নিহত হয়। (৮) মদ্দাজবংশ হইতে সমুৎপন্ন আয়হালা নামে এক ব্যক্তি আঁস ও অর্ব্বি জাতিদিগের শাসনকর্ত্তা ছিল। যে বৎসর মহম্মদ মরেন, সেই বৎসরই এই ব্যক্তি অবতার বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করে। ইহার অপর নাম দুল্‌হেমার। এই ব্যক্তি বলিত "স্বর্গ হইতে সোহায়েক ও শোরায়েক নামে দুই দূত আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আমি প্রত্যাদিষ্ট হইয়া থাকি।" এই ব্যক্তির স্মরণ শক্তি, বক্তৃতা শক্তি, চাতুরী এবং দৈহিক বল অতি উচ্চশ্রেণীর ছিল। লোকে সেই জন্য শীঘ্র শীঘ্র ইহার শিষ্য হইয়া পড়ে। দুলহেমার অনেক দেশ জয় করিয়া অনেক রাজাকে বধ করে, কিন্তু চারি মাস কাল অতিবাহিত না হইতে হইতেই দুলহেমার সংহত হয়। ইহার কিছু পরে তোলেহা নামে এক প্রবীণ ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া পরিচয় দেয় এবং শেশাজ নাম্নী এক রমণী "নারী-অবতার" নামে বিখ্যাতা হয়। এই তোলেহা মহম্মদভক্ত মুসলমানদিগের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মির্শরে পলায়ন করে এবং তথায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রাণ বাঁচায়। শেশাজ, মোসেলামার স্ত্রী। শেশাজের ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। 'আল হজ্‌দর উল্‌ হাশীম্' নামক প্রাচীন আরব্য গ্রন্থে লিখিত আছে, শেশাজের ৫ হাত লম্বা দীর্ঘ কেশ ছিল এবং সে যেখান দিয়া চলিয়া যাইত, তথায় যেন অগ্নি-বৃষ্টি হইত। (৯) আল আব্বাস জাতির তৃতীয় খালিফের রাজত্বকালে খোরাসান দেশীয় হাকীম হাশীম নামে এক ব্যক্তি অভ্যুদিত হয়েন। ইনি আলমেহেদী খালিফের বাটীতে প্রথমে গোমস্তা, তদন্তর আবু মোসালেমের অধীনে সৈনিকের পদে নিযুক্ত হয়েন। সেনা নিবাসে কাজ করিতে করিতে হাশীম আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া পরিচয় দেয়। আরবের লোকেরা ইহাকে আল বোর্কাই বলিয়া ডাকিত। হাশীম আপনার মুখখানি কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিত, এই জন্য ইহার বোর্কাই নাম হইয়াছিল। লোকে বলিত, ইহার মুখশ্রী এতদূর সুন্দর ও জ্যোতির্ম্ময় ছিল যে, সাধারণ লোক তাহা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া যাইত, এইজন্য ইহাকে মুখখানি ঢাকিয়া রাখিতে হইত। মুসা সম্বন্ধেও আমরা তাহাই পড়িয়াছি। নখশব এবং কাশ নগরে হাশীম অনেক অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। প্রবাদ এই যে, একদিন একটা কূপ হইতে হাশীম চন্দ্রমাকে উঠাইয়া লইয়া ছিলেন, সেই দিন হইতে পারস্যভাষায় তাহার সাজেন্দা অর্থাৎ চন্দ্রদ্রষ্টা নাম হইয়াছে (১০)। হাশীম

(৮) Ockley's History of the Saracens, Vol. I. P. 15 and Al Soheli, P. 158.

(৯) "She had hairs as long as seven feet and seven inches. Sesaja was a girl of exquisite beauty and to whichsoever side she turned her face the people cried out by saying here is the fire from heaven."
—Al Huzdur. Intro. P. 32.

(১০) George Sale's Koran. Preliminary Disc. Page 141.

বলিত, ঈশ্বরের আত্মা আমাদের দেহে বিরাজ করিতেছে, সুতরাং আমি অর্দ্ধেশ্বর। এই কথায় খালিফেরা তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে, সেনারা পৌছিলে হাশীম একটা দুর্গে পলাইয়া আশ্রয় লয়। খালিফ-সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করিলে হাশীম পলায়নের অন্য উপায় না দেখিয়া, আপনার পরিবারস্থ সকলকে বিষপাণ করাইয়া নিহত করেন, এবং তাহাদের মৃতদেহ অগ্নিতে দাহ করেন। অবশেষে অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইয়া নিজেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। প্রবাদ আছে, ইহার মস্তকের কেশ ভিন্ন সমগ্র দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল। (১১) প্রবাদ আছে, হাশীম আপনার শিষ্যগণকে জীবিতাবস্থায় বলিয়াছিল যে, "আমি মরিলে আমার অমর আত্মা আমার অদগ্ধ শুভদেহে প্রবিষ্ট হইয়া স্বর্গে যাইবে এবং তথা হইতে আবার জগতে ফিরিয়া আসিবে।" ১৬৩ হিজরীতে হাশীমের মৃত্যু হয়। খোরেন দেশের বাবেক নামে একব্যক্তি সন হিজরীর ২০১ বর্ষে অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই ব্যক্তি "লামজবী" ছিল, অর্থাৎ কোনও গ্রন্থ বা কোনও ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত না, অথচ সকল ধর্ম্মকেই মান্য করিত। আফশীদ নামক যোদ্ধাকে মুসলমানেরা ইহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং আফশীদ ইহাকে পরাজয় করিয়া নিহত করিতে উদ্যত হইলে, বাবেক গ্রীশে পলাইয়া যায়। তথায় ধৃত হইয়া হত হয়। বাবেক অতীব নিষ্ঠুর ও অধার্ম্মিক ছিল। প্রায় দুই লক্ষ মনুষ্যকে বাবেক অকারণ হত্যা করিয়া আপনার কৃত্রিম মতের প্রচার করিয়াছিল। তাহার মত সম্বন্ধে কোনও বিশেষ বিবৃতি পাওয়া যায় নাই। আরব্য আলতবারী গ্রন্থে বাবেকের কিঞ্চিৎ উল্লেখ আছে। হিজরী ২৩৫ অব্দে মামুদ ফরাজ নামে এক ব্যক্তি বলেন "আমি দ্বিতীয় মুসা। প্রথম মুসার আত্মা আমাতে আবির্ভূত হইয়াছে।" এই ব্যক্তি ধৃত হইয়া পাদসা মোতাবক্কেলের সম্মুখে আনীত হইলে, পাদসা হুকুম দেন যে, "আমার প্রত্যেক সিপাহী যেন ইহার গলদেশে প্রহার করে।" এইরূপে প্রহারিত হইয়া মামুদ শমন সদনে প্রেরিত হয়। হিজরী ২৭৮ সনে কর্ম্মাটীয়ান জাতি মুসলমানদিগের সহিত বিরোধ উপস্থিত করে, ইহারা মুসলমান ধর্ম্মের ভয়ানক বিরোধী। ইহাদের নায়কের নাম কিউফা। এই ব্যক্তি প্রচার করে যে "আমি ৫০ বার উপাসনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছি এবং আমিই প্রকৃত ইমাম ও মহম্মদ।" ইনি আরও বলিতেন "আমিই খ্রীষ্ট, আমিই যোহন্না এবং আমিই জগতের আত্মা।" অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহার প্রভুত্ব চলিয়াছিল, তাহার পরে নিহত হয়। ইহার পরে মতান্নবি অথবা আবুল বাতেনা এক সুপ্রসিদ্ধ আরব্য কবি অবতার বলিয়া পরিচয় দেয়। রাজারা ইহাকে কয়েদ করিয়া রাখে, অবশেষে এই ব্যক্তি "অবতার" বিশেষণ পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলে, মুক্তি প্রাপ্ত হয়। কাব্য লিখিয়া মতান্নবি বহুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সকল অর্থ লইয়া সপরিবারে তিনি টাইগ্রীষ নদের তট দিয়া যাইতেছিলেন, পথে ডাকাইতেরা আসিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলে। (১২) হিজরী ৩৫৪ সনে

(১১) Vide Mr. Bayle's Dic. Hist. Art. (Abumuslimus. Letter B.)

(১২) Motanabbis Manuscript quoted by D'Herbel, Page 638.

ইহার মৃত্যু হয়। মুসলমান সাহিত্যোল্লিখিত সর্ব্বাবশিষ্ট অনুকারী অবতারের নাম তুর্ক-বাওয়া; ইহা প্রকৃত নাম নহে, কিন্তু এই উপাধিতে তিনি প্রসিদ্ধ। ইনি আমাসিয়া নগরে ৬৩৮ হিজরীতে প্রথম দেখা দেন। ইশাহক নামে ইহার এক শিষ্য ছিল, সে ব্যক্তি ইহার বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে। ইহারই চেষ্টায় ৬ হাজার তুর্ক অশ্বারোহী সেনা একই দিনে ইহার মতগ্রহণ করিয়া দীক্ষিত হয়। যুদ্ধের সময় বাওয়া বলিতেন, "ঈশ্বরের আমিই একমাত্র পূর্ণ ও সত্য অবতার।" ইহার শিষ্যেরা মুসলমান ও খ্রীষ্টানদিগকে বড়ই নির্য্যাতন করিয়াছিল। অবশেষে খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা একত্র হইয়া ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ইহাকে নিহত করেন। আমেদ হানবল নামে জনৈক মহা বিদ্বান বলিয়াছিলেন, "আমি অবতার নহি, কিন্তু মহম্মদের মৃত আত্মার সহিত আমার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হয়।" লোকে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিল। ইহার মৃত্যুতে প্রায় বিশ সহস্র খ্রীষ্টান মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। (১৩)

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

নিশ্বাস।

কোথাকার বায়ু তুমি?
কেন আস? কেন যাও?
কার সমাচার নিয়ে
কোন্ দেশে যেতে চাও?
কাহারে হারায়ে যেন
লক্ষ্যহারা-দিশাহারা!
বিরাম বিশ্রাম নাই,
খুঁজে খুঁজে হও সারা!
ফুরাবে কি কোন দিন
তোমার ঐ অন্বেষণ?
অথবা কি চিরদিন
উদাসীন এ ভ্রমণ?

২

ধরি ধরি স'রে যাও,
মহাশূন্যে মিশে যাও;
কে তুমি? কেমন তুমি?
পরিচয় নাহি দাও।
আকাশে তোমারি আশে
চেয়ে চেয়ে মিছে চাই?
শূন্য যে তোমাতে পূর্ণ,
কই তবু দেখা পাই?
অথচ রয়েছ ঘেরে
আমারে আমারি তরে;
অপেক্ষা উপেক্ষা নাই;
বসেছ হৃদয়-ঘরে।
বড় কাছে, বড় কাছে;
এত কাছে কেহ নয়;
জীবনের মূলে তুমি;
তুমি যেন আমিময়।
আছ তুমি—আছি আমি;
নাই তুমি—নাই আমি;
তোমাতে আমার আমি;
আমাতে আমার তুমি।

৩

এ দেহ তোমারি তরে;
আমার কি অধিকার?

(১৩) "It is related that on the day of his death no less than twenty thousand Christians embraced the Mahomedan faith." Sale's Koran, Prel. Disc. page 122 and Khalecan (Arabic work). বাইবেলে উল্লিখিত আছে, পেণ্টেকস্টের উৎসবে পিটর একদিনে তিন হাজার লোককে খ্রীষ্টান করেন। এই কথা লইয়া, খ্রীষ্টানেরা বড়ই মাতামাতি করিয়া থাকে। এখানে দেখুন, এক দিনেই বিশসহস্র খ্রীষ্টান স্বেচ্ছায় মুসলমান হইয়াছিল।

তুমি সর্ব্বময় যার
　আমি তার কে আবার ?
তুমি আস, তুমি যাও,
　অবাধে হৃদয়-ঘরে ;
কলের পুতুল আমি
　দেখি শুনি চুপ ক'রে।
একটু অস্ফুট রব
　উঠে পড়ে নিশিদিন ;
একটু ধমনী নাচে
　কভু দ্রুত, কভু ক্ষীণ ;
একটু হৃদয় কাঁপে
　কেন কাঁপে—তাকি জানি ?
একটু কি যেন হয় ?
　একটু—আর না জানি।

৪

কে বলিবে কেন এই
　গমনাগমন-খেলা ?
কেন না ধরিতে পারি ?
　কেন করি তোলা-ফেলা ?
উঠে পড়ে নিশিদিন,
　কে তারে গণিয়া রাখে ?
চুপে চুপে কথা কয়,
　কে কত জাগিয়া থাকে ?
রূপ-রস-গন্ধ নাই,
　পরশ শবদ আছে ;
পরশ-শবদ ধ'রে
　কে যাবে তাহার কাছে ?
অতি দূরে,—অতি কাছে ;
　ব্যবধান আছে—নাই ;
অচেনা-আত্মীয়-সম
　জানা আছে,—চেনা নাই।
হেন আপনার জন
　কেমনে হইবে চেনা ?
এত কাছে, তবু কেন
　যে অচেনা—সে অচেনা ?

বড়ই আকুল চিতে
　প্রবেশি হৃদয়-দ্বারে ;
কি যে দেখি, কি যে শুনি,
　বলিতে বচন হারে।
গভীর-গম্ভীর-ধীর
　মধুর-মোহন রবে
পরিপূর্ণ প্রাণ-মন,
　বচন কেমনে ক'বে ?
"আমি আছি", "আমি আছি",
　কে বলে অভ্রান্ত স্বরে ;
"তুমি আছ", "তুমি আছ",
　নিশ্বাস স্বীকার করে।
আসে যায় যত বার,
　ওই কথা তত বার ;
ধ্বনি সনে প্রতিধ্বনি
　উঠিতেছে অনিবার।
দুজনার সে কথার
　শেষ নাই, ক্লেশ নাই ;
যত শুনি তত যেন
　মৃত দেহে প্রাণ পাই।

৬

কে আর বধির রবে ?
　কেমনে ভুলিব আর ?
নিশ্বাস বহিয়া আনে
　কি আশার সমাচার।
আমি ঘুরি যার তরে ;
　বলি "কোথা-কই-কই" ?
সে বলে "তোমারি ঘরে,
　চেয়ে দেখ ওই—ওই"।
জানিতাম বহু দূরে
　আমার দেবতা যিনি,
কে জানিত এত কাছে—
　এত কাছে ব'সে তিনি !

নিশ্বাস তাঁহারি দূত,
কাছে কাছে সবাকার ;
তাঁরি সাক্ষী-প্রতিনিধি,
সাকারেতে নিরাকার।
পাছে না চিনিতে পারি,
তাই কাছে থাকাথাকি;
পাছে না শুনিতে পাই,
তাই এত ডাকাডাকি।
নিশ্বাস-ইঙ্গিত পেয়ে
জেগে তাই ব'সে আছি ;
বলি আর শুনি তাই
"তুমি আছ," "আমি আছি"।
নিশ্বাস শিখায়ে দেয়
ছুটি কথা সাধনায়,
ও মন্ত্র আপনি ব'লে
আমারে বলাতে চায়।
নিশ্বাস সামান্য নয়,
নিশ্বাস জাগায়ে দেয়;
নিশ্বাস বিশ্বাসী করে,
নিশ্বাস চিনায়ে দেয়।

কোথায় তোমায় তবে
বুঝিতে রহিল বাকি ?
কেমনে নিশ্বাস আর
ছলিবে অদৃশ্য থাকি ?
মহাকাল-বক্ষ হ'তে
ক্ষুদ্র সে তরঙ্গ তুমি ;
মহাপ্রাণ-অংশ তুমি,
বুঝেছি বুঝেছি আমি।
যে নাম তোমার হ'ক,
দিনু "তুমি আছ"—নাম,
যে কাম তোমার র'ক,
তুমি নও মোরে বাম।
নিশ্বাস, তোমারি সাথে
প্রবেশি হৃদয়-ঘরে ;
নিশ্বাস তোমারি স্বরে
চিনে লই প্রাণেশ্বরে।
কঠোর সাধন-পথ
আর না খুঁজিতে চাব ;
এমন সহজ পথে
সহজে চলিয়া যাব।

শ্রীকালীনাথ ঘোষ

শ্রীভগবদ্গীতা।

পঞ্চম অধ্যায়।

যোগযুক্ত শুদ্ধচিত, আত্মজয়ী যেই
জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতে ভাবে আত্মবৎ—
কর্ম্ম করি হেন জন লিপ্ত নাহি হয়। ৭

(৭) যোগযুক্ত—কর্ম্মযোগ যুক্ত।

শুদ্ধচিত্ত—রজস্তম মলায় অকলুষিত,সত্বযুক্ত (গিরি মধু)।

জিতেন্দ্রিয়—বিষয়ানুরাগ শূন্য (বলদেব)।

আত্মজয়ী—দেহ জয়ী (শঙ্কর, স্বামী)।

সর্ব্বভূতে ভাবে আত্মবৎ—(মূলে আছে, "সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা")। অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত ভূতগণের আত্মভূত আত্মা বা চৈতন্য যাহার, অথবা যে সম্যক্‌দর্শী (শঙ্কর)। যে জড় অজড় সর্ব্বত্র কেবল আত্মমাত্র দর্শন করে (মধু)। সর্ব্বজীবে আত্মভূত অর্থাৎ প্রেমাস্পদগত আত্মা বা দেহ যাহার। এস্থলে সকল আত্মার একত্ব উল্লিখিত হয় নাই (বলদেব)। দেবাদি সর্ব্বভূতে প্রকৃতি পরিণাম হইতে নানা আকারে প্রতীয়মান হেতু তাহা আত্মাকারে দর্শন করা অসম্ভব। প্রকৃতি-বিযুক্ত সর্ব্বজীবদেহে জ্ঞানের একাকারতা জন্য যে সাম্য, তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে (রামানুজ)। বলা বাহুল্য যে রামানুজ, বলদেব ইঁহারা দ্বৈতবাদী ; জীবভাব নিত্য এবং ব্রহ্মের স্বরূপ হইলেও ব্রহ্ম হইতে জীব ভিন্ন, ইঁহারা এই মত প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

'নাহি কিছু করি আমি'—করে ইহা মনে
যোগরত তত্ত্ববিদ্; দর্শন, শ্রবণ,
স্পর্শ, ঘ্রাণ, শ্বাস, নিদ্রা, ভোজন, গমন। ৮
আলাপ, গ্রহণ, ত্যাগ, উন্মেষ, নিমেষ—
ইন্দ্রিয়েরা এ সকল ইন্দ্রিয় বিষয়ে
প্রবর্ত্তিত—এই রূপ করিয়া ধারণা। ৯

ব্রহ্মে সমর্পণ করি আসক্তি ত্যজিয়া
করে কর্ম্ম যেই জন, সেত নাহি হয়
পাপে লিপ্ত—পদ্ম পত্র জলেতে যেমন। ১০
কায় মন বুদ্ধি আর সুধু ইন্দ্রিয়ের
সহায়ে—যোগীরা করে কর্ম্ম আচরণ,
আসক্তি করিয়া ত্যাগ আত্মশুদ্ধি তরে। ১১

জ্ঞান পরিপাকেই এইরূপ 'সর্ব্বভূতে আত্মভূত আত্মা' হওয়া যাইতে পারে। অজ্ঞান নষ্ট হইলে যখন আদিত্যবৎ জ্ঞান উদয় হয় (১৬), তখন পণ্ডিত সর্ব্বজীবে সমদর্শী হয় (১৮), অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়া মনকে সেই ব্রহ্মে বা সাম্যে স্থির করিয়া রাখিতে পারেন। ধ্যানযোগে এইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞান আরও বিশদ হয়। এই জন্য গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ॥ ২৯
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৩০

বেদান্তে 'তত্ত্বমসি' রূপ যে মহাবাক্য আছে, এই তত্ত্ব তাহারই সম্প্রসারণ মাত্র। জর্ম্মাণ পণ্ডিত খ্যাতনামা সপেনহর, তাঁহার কৃত "World as Will and Idea" নামক পুস্তকে, এবং আধুনিক জর্ম্মাণ পণ্ডিত পল ডুসেন তাঁহার দর্শন গ্রন্থে কেবল এই একটী মাত্র তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া বুঝাইয়াছেন। ইহা তাঁহারা তাহাদের উক্ত গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। এই তত্ত্বই অদ্বৈতবাদের মূলসূত্র; ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মূল ভিত্তি।

কর্ম্ম করি—লোকসংগ্রহার্থ অথবা স্বাভাবিক কর্ম্ম করি (স্বামী)।

লিপ্ত—অনাত্মবিষয়ে আত্মাভিমান প্রযুক্ত লিপ্ত (রামানুজ, বলদেব)।

(৮) তত্ত্ববিদ্—আত্মযাথাত্ম্যতত্ত্ববেত্তা (শঙ্কর)।

দর্শন, শ্রবণ……—দর্শন শ্রবণাদি দ্বারা এস্থলে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপার, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ব্যাপার, পঞ্চ প্রাণ বায়ু ও পঞ্চ পৌণবায়ুর ব্যাপার এবং অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের ব্যাপার উল্লিখিত হইয়াছে (মধু)। (তৃতীয় অধ্যায়ের ২য় শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

(৯) এইরূপ করিয়া ধারণা—সকল ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যে অকর্ম্ম বা আত্মার অকর্ত্তৃত্ব দর্শন করিয়া। ইহাই সম্যক দর্শন। এইরূপ অবস্থাতেই সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসের অধিকার হয়। কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন হেতু এই অধিকার হয় (শঙ্কর)। ইন্দ্রিয়গণ আমার 'বাসনা' অনুসারে পরমাত্মা দ্বারা প্রেরিত হইয়াই এইরূপে প্রবৃত্ত হয়—ইহা ধারণা করিয়া (বলদেব)। মধুসূদন এই শ্লোকের আরও এক অর্থ করেন। তিনি বলেন, প্রথমে কর্ম্মযোগে যুক্ত বা সমাহিত হইয়া পশ্চাৎ অন্তঃকরণ শুদ্ধি দ্বারা তত্ত্ববিদ্ হইয়া আমি কিছু করি না এইরূপ মনে করেন। এ অর্থ অসঙ্গত নহে। আমি কিছু করি না, ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ ব্যাপারেই প্রবর্ত্তিত হয়, কর্ম্মযোগী ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াও কর্ম্মযোগ রত হয়েন, এই অর্থও হইতে পারে।

(১০) ব্রহ্মে সমর্পণ করি—ঈশ্বরে কর্ম্ম নিক্ষেপ বা সমর্পণ করিয়া। অর্থাৎ স্বামীর জন্য যেমন ভৃত্য কর্ম্ম করে, সেইরূপ প্রভু ঈশ্বরের জন্য আমি কর্ম্ম করিতেছি—আমার নিজের জন্য নহে, এইরূপ ধারণা সহ কর্ম্ম করিয়া (শঙ্কর, মধু, স্বামী)। কিন্তু রামানুজ ও বলদেব ভিন্ন অর্থ করেন। তাঁহারা বলেন, এস্থলে ব্রহ্ম অর্থে বিশ্বাত্মক প্রকৃতি। কেননা, গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে, "মমযোনির্মহদ্ব্রহ্ম"; শ্রুতিতে আছে, "তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে।" প্রকৃতি বা প্রধানের পরিণামেই দেহ ইন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন হয়। এই জন্য এই প্রকৃতিতেই দর্শনাদি কর্ম্মের কর্তৃত্ব আরোপ করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু গীতাতে এই প্রকৃতিকে (বা অপরাপ্রকৃতিকে) পরমাত্মার বা পরমপুরুষেরই অংশ বিশেষ বা একরূপ অভিব্যক্তি, ইহা বলা হইয়াছে। সুতরাং তদনুসারে কর্ম্ম ব্রহ্মে আরোপ করাও যাহা, প্রকৃতিতেও আরোপ করাও তাহা। তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, (কর্ম্মব্রহ্ম সমুদ্ভব) অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—আমাতেই সমস্ত কর্ম্ম সংন্যস্ত করিয়া কর্ম্মযোগ করিতে হইবে (৩।৩০)।

পাপ—দেহাত্ম অভিমান রূপ পাপ (বলদেব), পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্ম (মধু)।

(১১) কায়, মন, বুদ্ধি…ইন্দ্রিয় সহায়ে—কায়কর্ম্ম—যথা স্নানাদি, মনকর্ম্ম—যথা ধ্যানাদি, বুদ্ধি-

কর্ম্ম ফল করি ত্যাগ, শান্তি নিষ্ঠাজাত
করে লাভ যোগীগণ। নহে যোগী যেই
বদ্ধ হয় কাম বশে—ফলাসক্তি হেতু। ১২
সর্ব্ব কর্ম্ম মনবলে করিয়া সন্ন্যাস,
চিত্তজয়ী দেহী—সুখে নবদ্বার পুরে
করে বাস, না করিয়া কর্ম্ম—না করায়ে। ১৩

কর্ম্ম—যথা তত্ত্বনিশ্চয়াদি, ইন্দ্রিয়কর্ম্ম—যথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি কর্ম্ম (স্বামী)। কায় মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সাধ্য কর্ম্ম (রামানুজ)।

সুধু—(মূলে আছে 'কেবলৈঃ') সুধু বা কেবল—এই বিশেষণ কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়—প্রত্যেক সম্বন্ধেই প্রযুক্ত (শঙ্কর, মধু)। কেবল—অর্থাৎ মমত্ব বুদ্ধি শূন্য (শঙ্কর, মধু)। কর্ম্মাভিনিবেশ রহিত (স্বামী)। কেবল—অর্থাৎ বিশুদ্ধ (বলদেব)।

আত্মশুদ্ধি তরে—অনাদি দেহাত্মাভিমান নিবৃত্তির জন্য (বলদেব), চিত্তসত্ত্বশুদ্ধির জন্য (শঙ্কর, মধু)। প্রাচীন কর্ম্ম বন্ধন বিনাশ জন্য (রামানুজ)।

(১২) যোগীগণ—(মূলে আছে 'যুক্ত')—ঈশ্বরার্থ আমি কর্ম্ম করি, আমার নিজের কোন ফল-লাভার্থ নহে—এইরূপে যে সমাহিত সেই যোগী (শঙ্কর, মধু)। পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ (স্বামী)। আত্মাপরায়ণ বা আত্মাতিরিক্ত ফলে স্পৃহাশূন্য (রামানুজ)।

নিষ্ঠাজাত শান্তি—অর্থাৎ প্রথম কর্ম্মযোগে সত্ত্বশুদ্ধি, পরে জ্ঞান প্রাপ্তি, পরে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস, শেষে জ্ঞাননিষ্ঠা—এই কর্ম্মনিষ্ঠা ক্রম হইতে জাত মোক্ষাখ্য শান্তি (শঙ্কর, মধু)। অত্যন্ত শান্তি বা মোক্ষ (স্বামী। কর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা স্থির আত্মানুভবরূপ নিবৃত্তি (রামানুজ)। স্থির শান্তি (বলদেব)।

কামবশে—কামনা হেতু কর্ম্মে প্রবৃত্ত (শঙ্কর, স্বামী)।

(১৩) সর্ব্ব কর্ম্ম—নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য ও প্রতিসিদ্ধ এই সকল কর্ম্ম (শঙ্কর) বিক্ষেপ কারণ সকল কর্ম্ম (স্বামী)।

মনোবলে—বিবেক বুদ্ধিতে, কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন করিয়া (শঙ্কর)। দেহাকারে পরিণত প্রকৃতিতে কর্ত্তৃত্ব সংন্যস্ত করিয়া—ও আত্মার অকর্ত্তৃত্ব স্থির করিয়া বিবেকযুক্ত মনে (রামানুজ, বলদেব)। গিরি বলেন, মনের দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস লাভ করিলেও লোক-সংগ্রহার্থ বাহ্যিক সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হইবে।

সন্ন্যাস—স্বামী ও মধুসূদন বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত কয় শ্লোকে চিত্তের অশুদ্ধ অবস্থায় সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ, ইহা বুঝাইয়া দিয়া এই শ্লোক হইতে বুঝান হইয়াছে যে, শুদ্ধচিত্তের কর্ম্মসন্ন্যাস কর্ম্মযোগ অপেক্ষা শ্রেয়। সুতরাং এস্থলে সন্ন্যাস অর্থে কর্ম্ম পরিত্যাগ। কিন্তু এ অর্থ ঠিক সঙ্গত বোধ হয় না। গিরি এবং বোধ হয় শঙ্করাচার্য্য বলদেব ও রামানুজ সকলেরই মতে এই শ্লোকে আত্মার কর্ম্ম সন্ন্যাস মাত্র উক্ত হইয়াছে। জ্ঞান বলে আত্মার কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি লোপ হইলে, তাহার কোন কর্ম্মই থাকে না। তাহার কোন কর্ম্মে প্রয়োজন থাকে না। দেহ-শক্তিদ্বারা বা কায়মন বাক্যের দ্বারা যে কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তাহা হয় দেহের রক্ষা জন্য, না হয় লোকসংগ্রহ জন্য প্রয়োজন, তাহা নিজের জন্য নহে। এরূপ ব্যক্তি দেহশক্তিকে ও অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়াদির পর-প্রয়োজনার্থ কর্ম্মে নিয়োগ করেন মাত্র।

প্রভু নাহি লোক তরে করেন সৃজন
কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্ম কিম্বা কর্ম্ম ফল যোগ—
কিন্তু হয় প্রবর্ত্তিত স্বভাবই কেবল। ১৪

দেহী—যাঁহার দেহাদি সংঘাত ব্যতিরিক্ত আত্মা এই জ্ঞান হইয়াছে, তিনি দেহকে গৃহের ন্যায় বাসস্থান মাত্র মনে করেন, তাহাতে আত্মবোধ থাকে না—এরূপ লোক (শঙ্কর) লব্ধজ্ঞান জীব (বলদেব)।

সুখে—আয়াসের হেতু কায়মনোবাক্য দ্বারা কর্ম্ম চেষ্টা ত্যাগ করিয়া, প্রসন্নচিত্ত হইয়া, আত্মা ব্যতিরিক্ত সকল বাহ্য বিষয়ে প্রয়োজন শূন্য হইয়া (শঙ্কর) শরীর ক্লিষ্ট হইলেও সকল প্রকার ক্লেশ শূন্য হইয়া (গিরি)।

নবদ্বার পুরে—দুই বাহু, দুই কর্ণ, দুই নাশা, মুখ, পায়ু ও উপস্থ এই নয় দ্বার যুক্ত দেহে।

করে বাস না করিয়া কর্ম্ম—অর্থাৎ জ্ঞান লাভ দ্বারা যে প্রারব্ধ কর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয় নাই, তাহা দগ্ধ হইলেও, যে পরিমাণ প্রারব্ধ কর্ম্ম-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, ও যাহার ফলে দেহ লাভ হইয়াছে—কর্ম্ম সন্ন্যাসী সেই দেহে বাস করে। তাহার বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও, এবং সে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও সেই দেহ ধ্বংশ হয় না। সাংখ্য-দর্শনে আছে জীবন্মুক্ত হইলেও "চক্রবৎ ধৃত শরীরং।" অর্থাৎ কুম্ভকার চক্র ঘুরান বন্ধ করিলেও যেমন তাহা আরও কতক্ষণ ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ সংস্কার বীজ ধ্বংশ হইলেও সেই সংস্কার-জাত দেহ তাহার স্বাভাবিক ধ্বংশের সময় পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়।

(১৪) প্রভু—আত্মা (শঙ্কর, মধু)। ঈশ্বর (স্বামী)। ইন্দ্রিয়াদির স্বামী—জীব (বলদেব)। নিষ্ক্রিয় আত্মা (রামানুজ)। এখানে স্বামীর অর্থ অধিক সঙ্গত বোধ হয়। পরবর্ত্তী শ্লোকের 'বিভু' ও এই শ্লোকের 'প্রভু' বোধ হয় একার্থক।

লোকতরে—(মূলে আছে 'লোকস্য') অর্থাৎ এই জীবের (শঙ্কর, বলদেব)। দেব, তির্য্যক, মনুষ্য স্থাবরাত্মক প্রকৃতি সংসর্গে বর্ত্তমান লোকের (রামানুজ)

কর্ম্ম—রথ ঘট, প্রাসাদ আদি ঈপ্সিত কর্ম্ম (শঙ্কর)।

বিভু নাহি লন কারো পাপ বা সুকৃতি;
অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান রহে আবরিত
যেই হেতু হয় মুগ্ধ জীবগণ সবে। ১৫

কিন্তু আত্মজ্ঞান দ্বারা হয় যাহাদের
সে অজ্ঞান বিনাশিত, তাহাদের জ্ঞান
প্রকাশে পরমে সেই—আদিত্যের প্রায়। ১৬

স্বভাব—অবিদ্যালক্ষণ প্রকৃতি—মায়া (শঙ্কর, মধু)। অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত বাসনা (বলদেব, রামানুজ) অনাদি অবিদ্যা ও কাম প্রবৃত্তি বা স্বভাব (স্বামী)।

প্রবর্ত্তিত—আত্মা কর্ত্তা নহেন, প্রকৃতিই কর্ম্মের মূল। আত্মা চৈতন্যময়, তাঁহার সহিত কর্ম্মের কোন রূপ আপেক্ষিক সম্বন্ধ নাই। অনাদি অবিদ্যাই জীবের পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়।

স্বামী বলেন, শ্রুতিতে উক্ত আছে, "এষ এব সাধু কর্ম্মকারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উপনীষতে, এষ এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য অধোনীষতে।" এই শ্রুতি অনুসারে অস্বতন্ত্র পুরুষ পরমেশ্বরের দ্বারা শুভাশুভফলযুক্ত কর্ম্মে প্রযুক্ত হয়। সুতরাং ঈশ্বরের প্রেরণা বিনা পুরুষ কর্ম্মত্যাগ করিয়া জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিতে পারে না, এরূপ সংশয় হইতে পারে। আর এরূপ স্থলে পরমেশ্বরকেই এ লোকের "বৈষম্য নৈঘৃণ্যের কর্ত্তা" বলিতে হয়। অর্থাৎ এখানে আমরা একজনকে পাপে রত, অন্য একজনকে পুণ্য কর্ম্মে লিপ্ত এইরূপ প্রভেদ দেখিতে পাই; অন্য দিকে একজন সুখী আর একজন দুঃখী, এ পার্থক্যও দেখিতে পাই। পার্থক্যের কর্ত্তা ঈশ্বর, জীব নহে, জীব তাহার কৃত কর্ম্মের জন্য দায়ী নহে, ঈশ্বর অন্যায় করিয়া একজনকে বৃথা কষ্ট দেন, একজনকে বা সুখী রাখেন, এইরূপ ধারণা করিতে হয়। ইহার উত্তরে বেদান্ত দর্শনে (২।১।৩৪) আছে' "বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যেন সাপেক্ষত্বাৎ" (৪র্থ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ জগতের অনাদি বাসনা ও কর্ম্ম বীজ হইতেই সৃষ্টিতে বৈষম্য হয়। ঈশ্বর সেই কর্ম্ম ও বাসনা শক্তির নিয়ামক মাত্র। নতুবা তিনি নির্লিপ্ত ও অকর্ত্তা। এই কর্ম্ম ও বাসনা হইতে জগৎ প্রবর্ত্তিত হয়। এই তত্ত্ব এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

(১৫) বিভু—ঈশ্বর (শঙ্কর, মধু, স্বামী)।

নাহি লন—ঈশ্বর পাপ, অথবা পূজাদি লক্ষণ যাগ হোমাদিজ সুকৃত ভক্তের নিকট হইতে গ্রহণ করেন না (শঙ্কর)। ঈশ্বর ভক্তকে অনুগ্রহ বা অভক্তকে নিগ্রহ করেন না। (স্বামী)।

মধুসূদন বলেন,, "উক্ত 'এষ এব সাতু... ইত্যাদি শ্রুতি উক্ত বাক্যে, এবং

"অজ্ঞো জন্তুরনীশোয় মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ।
ঈশ্বর প্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা॥"

ইত্যাদি স্মৃতি বাক্য যদিও আপাততঃ পরমেশ্বরে বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য আরোপিত হয়, কিন্তু এই সকল শ্রুতি স্মৃতি বাক্য ব্যবহারিক। শঙ্কর বলেন, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্ম শাস্ত্রই অবিদ্যা-প্রসূত। পরমার্থতঃ জীবের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, পরমেশ্বরের কারয়িতৃত্বও নাই।"

বলদেব বলেন, "বিভু অপরিমিত বিজ্ঞান আনন্দ ঘন, অনন্তশক্তিপূর্ণ, নিজে পরিপূর্ণ আনন্দ মগ্ন, সুতরাং তিনি অন্যত্র উদাসীন পরমাত্মা। অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত বাসনা নিবন্ধন বুভুক্ষিত ও নিজ সান্নিধ্য মাত্রে পরিণত প্রধানময় দেহবান জীবকে বিভু, সেই বাসনা অনুসারে কর্ম্ম করান মাত্র। শাস্ত্রে আছে,

"যথা সন্নিধি মাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে।
মনসো নোপকর্ত্তৃত্বা তথাসৌ পরমেশ্বরঃ॥
সন্নিধানাৎ যথাকাশ কালাদ্যাঃ কারণং তরোঃ।
তথৈবা পরিণামেন বিশ্বস্য ভগবান্ হরি॥"

বলদেব আরও বলেন, শ্রুতিতে যে "স অকাময়তঃ" বলিয়া ব্রহ্মের ঈক্ষণ বা ইচ্ছা হইতে জগৎ সৃষ্টির কথা আছে, তাহা এই অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, বলদেব বৈষ্ণব ও দ্বৈতবাদী ছিলেন। এই জন্য এস্থলে তাঁহার ব্যাখ্যা ও মধুসূদনের অদ্বৈত-বাদানুসারে ব্যাখ্যা কিছু স্বতন্ত্র।

অজ্ঞানের দ্বারা—আবরণ বিক্ষেপ-শক্তিযুক্ত মায়া নামক মিথ্যা তামস অজ্ঞানের দ্বারা (মধু)।

রহে মুগ্ধ—জীব, ঈশ্বর, জগৎ—ইহার মধ্যে ভেদরূপ ভ্রম উৎপাদনের অধিষ্ঠাতা অজ্ঞান কর্ত্তৃক পরমার্থ সত্য আবৃত থাকায়,—প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতা—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ—ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগ, ইত্যাদি ভেদযুক্ত সংসার রূপ মোহ আবরণে জ্ঞান বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। (মধু)।

জ্ঞানাবরণ রূপ কর্ম্ম দ্বারা জীব দেহাত্মাভিমানরূপ মোহে আবৃত হয়, ও সেই অভিমান মত কামনানুসারে কর্ম্ম করিয়া মুগ্ধ থাকে।

(১৬) আত্মজ্ঞান—আত্মবিষয়ক বিবেকজ্ঞান (শঙ্কর), বেদান্ত বেদ্য অদ্বৈতজ্ঞান (মধু)।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্বং জ্ঞান প্লবেনেব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।" ৩।৩৬
অন্যত্র, "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মানি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।"
অন্যত্র, "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।৪।৩৮

এইস্থলেও সেই জ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে।

যাহাদের—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ বলেন, "এই 'যাহাদের'—অর্থাৎ এই বহুবচন প্রয়োগ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জীবাত্মা (বা পুরুষের) বহুত্বই প্রকৃত সত্য, উহা কেবল উপাধিক নহে। জীব ও ঈশ্বর এক-স্বভাব হইলেও ভিন্ন। পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১২ শ্লোকে যে বহুজীববাদ ও ঈশ্বরবাদ উক্ত হইয়াছে, তাহা যে ব্যবহারিক বা উপাধিক নহে, তাহাই যে প্রকৃত তত্ত্ব—তাহা এই শ্লোক হইতেই বুঝা যায়।

অজ্ঞান—গীতার অনেক স্থলে এই 'অজ্ঞান' শব্দের উল্লেখ আছে। সুতরাং ইহার অর্থ এস্থলেও একটু বিশদ করিয়া বুঝা উচিত। শাস্ত্রে মায়া, প্রকৃতি, অজ্ঞান ও অবিদ্যা, এই চারিটী কথা আছে। বেদান্ত মতে অজ্ঞান ও প্রকৃতি একার্থক। অজ্ঞানের সাত্ত্বিক অংশকে মায়া, ও রাজস ও তামস অংশকে অবিদ্যা বলে। এই মায়া উপহিত ব্রহ্মই, ঈশ্বর ও অবিদ্যা উপহিত চৈতন্যই জীব।

বেদান্ত মতে এই অজ্ঞান সদসদাত্মক। অর্থাৎ ইহা আছে এরূপ বলা যায় না, ইহা নাই এ কথাও বলিতে পারা যায় না। ইহা অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ ইহার প্রকৃত স্বরূপ ব্যবহারিক জ্ঞানে বুঝিবার কোন উপায় নাই। বেদান্ত মতে এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নাই সত্য, কিন্তু তাহা হইতেই এই বহুত্বময় জগৎ যে প্রকাশিত হইয়াছে, মায়াবাদী না হইলে ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। মায়াবাদেও জ্ঞানের আবরক অন্য বস্তুর কল্পনা করিতে বাধ্য হইতে হয়। শঙ্করাচার্য্য (বেদান্ত দর্শনভাষ্যে) বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, অনাদি কালপ্রবর্ত্তিত বাসনা বা সঞ্চিত কর্ম্মশক্তি আছে। তাহাই অনির্ব্বচনীয় মায়া। তাহাই জগতের বৈষম্যের কারণ। পরমেশ্বর তাহার নিয়ন্তা মাত্র। সাংখ্য মতে ইহাই প্রকৃতি, আর বেদান্ত মতে ইহাই মায়া। সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতির পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত। বেদান্তে মায়ার পৃথক অস্তিত্ব স্পষ্ট করিয়া স্বীকৃত হয় নাই। বেদান্ত মতে জীব ও ব্রহ্ম এক। কিন্তু ব্রহ্ম ও মায়া যে এক, ইহা স্পষ্ট বলা নাই। গীতায় কেবল সাংখ্য ও বেদান্ত মত সামঞ্জস্য করিয়া, মায়া ও ব্রহ্ম এক, মায়া পরমেশ্বরের প্রকৃতি বা স্বভাব, ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। চণ্ডীতে এই মায়াকেই পরমেশ্বরের চিন্ময়ী উপাস্য শক্তি বলা হইয়াছে।

ব্রহ্ম চৈতন্যে মায়া আছে বলিয়া, বা মায়া ব্রহ্মেরই অংশ বলিয়া এই জগৎ ব্রহ্ম চৈতন্যেই প্রতিভাত। জীব-চৈতন্য ব্রহ্মচৈতন্যের অংশ ব্যবহারিক ভাবে বলা যায়। এই জন্য জীব চৈতন্যেও এই জগৎ প্রতিভাত।

যাঁহারা দ্বৈতবাদী, তাঁহারা আমাদের এই জগৎ জ্ঞানকে, অর্থাৎ দিককালে সংস্থিত এই বৈষম্যময় কর্ম্মাত্মক জগতের জ্ঞানকে অজ্ঞান বলেন না। ইহাদের মতে জীবের বাসনা বা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কার মতে কর্ম্মপ্রবৃত্তিই প্রকৃত অজ্ঞান (রামানুজ)।

এই অজ্ঞান সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী মধুসূদন যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উল্লিখিত হইল। তিনি বলিয়াছেন, "অজ্ঞান কেবল জ্ঞানের অভাব নহে। উহা ভাব রূপ। কেন না, উহা জ্ঞানকে আবরণ করে, ও জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়। যাহা নাই তাহার বিনাশ অসম্ভব। অজ্ঞান যাহার বিষয় ও আশ্রয়, সেই বিষয় ও আশ্রয়ের প্রমাণ জ্ঞান হইতেই নিবৃত্তি হয়, ইহাই ন্যায়শাস্ত্র সঙ্গত সিদ্ধান্ত।"

"অজ্ঞান—আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি বিশিষ্ট। আবরণ দ্বিবিধ। প্রথম, যাহা সৎ তাহাকে অসৎ বলিয়া ধারণা, অর্থাৎ যাহা আছে, তাহার অস্তিত্ব না জানা; দ্বিতীয় যাহা আছে, তাহাকে প্রত্যক্ষ না করা বা তাহার স্বরূপ না জানা। প্রথম আবরণ—পরোক্ষ অপরোক্ষ ও সাধারণ প্রমাণ জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হয়। পর্ব্বতে অগ্নি না দেখিয়াও কেবল ধূম দেখিয়া পর্ব্বতে অগ্নি আছে, অনুমান প্রমাণ দ্বারা এই জ্ঞান হইতে পারে। বেদান্তবাক্য হইতে ব্রহ্ম আছেন, এই পরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে। দ্বিতীয় আবরণ প্রত্যক্ষ দ্বারা নষ্ট হয়। বেদান্ত বাক্য হইতে ব্রহ্ম আছেন, ইহা জানিয়াও ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে আমার যে অজ্ঞান থাকে, তাহা সাধনা বিশেষের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে দূর হইতে পারে।" (এই অজ্ঞানের অর্থ আরও বিশদ বুঝিতে হইলে অদ্বৈত-ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি হইতেই এই জগতের সৃষ্টি ও বিকাশ হয়। মায়াবাদ মতে এই অজ্ঞান হেতুই জ্ঞাতা, জ্ঞানে—জ্ঞেয় বিষয়রূপে প্রকাশিত হয়। অজ্ঞান দূর হইলে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ভাব একীভূত হয়, তখন পূর্ণপ্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। জ্ঞানের এই সকল তত্ত্ব এস্থলে আলোচ্য নহে।

প্রকাশে পরমে সেই—(মূলে আছে 'প্রকাশয়তি

তৎপরং')। অর্থাৎ সর্ব্ব জ্ঞেয় বস্তু যে পরমার্থতত্ত্ব জ্ঞান তাহাই প্রকাশ করে (শঙ্কর)। পরিপূর্ণ ঈশ্বর স্বরূপ প্রকাশ করে (স্বামী)। 'সেই' অর্থাৎ সেই জ্ঞান, পরমে অর্থাৎ দেহাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীব ও ঈশ্বরে প্রকাশ করে (বলদেব)। 'সেই' স্বাভাবিক ও 'পরম' অর্থাৎ অপরিমিত অসঙ্কুচিত জ্ঞান সর্ব্ব বিষয় যথাবস্থিত প্রকাশ করে (রামানুজ)। ব্রহ্মজ্ঞান শুদ্ধ সত্বপরিণাম ব্যাপক ও প্রকাশরূপ, উহা প্রকাশ মাত্রেই অজ্ঞান দূর হইয়া পরম অর্থাৎ সত্য-জ্ঞান-অনন্ত আনন্দরূপ এক অদ্বিতীয় পরমাত্মতত্ত্ব প্রকাশ করে (মধু)।

আদিত্যের প্রায়—সূর্য্য যেমন উদয় হইয়াই অন্ধকার নষ্ট করতঃ বাহ্যবিষয়কে, আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত করে, সেইরূপ পরমার্থ জ্ঞান উদয় হইলেই অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া যায়। (হস্তামলকে নবম শ্লোক ও তাহার ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের টীকায় এই শ্লোকোক্ত তত্ত্বের আভাস দেওয়া হইয়াছে। সেস্থলে বলা হইয়াছে যে, আমাদের জ্ঞানের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্বন্ধে দর্শনশাস্ত্রে মতভেদ আছে। এক শ্রেণীর দার্শনিকদিগের মতে আমাদের কোন সহজাত জ্ঞান থাকে না। ক্রমে ক্রমে আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির সহায়ে জ্ঞানার্জ্জন করি। বাহ্য ও আন্তর প্রত্যক্ষই আমাদের সকল জ্ঞানের মূলীভূত কারণ। ইহারা প্রত্যক্ষবাদী। মায়াবাদী দার্শনিকগণের মতে বাহ্য বিষয়ের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। জ্ঞাতা স্বয়ংই জ্ঞান পথে বা ইন্দ্রিয়াদি পথে বাহিরে গিয়া আপনার জ্ঞেয় বিষয় সৃজন করে। আর আমাদের জ্ঞানে এই বাহ্য বিষয়রূপ ছায়া পড়ে মাত্র। তৃতীয় শ্রেণীর দার্শনিকদিগের মতে ব্যবহারিক ভাবে জগৎ সত্য বটে। কিন্তু ইন্দ্রিয় পথে সেই জগতের ছায়া আমাদের অন্তরে আসিয়া আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন করে না। উহা জ্ঞান শক্তির বিকাশ করে মাত্র। অথবা জ্ঞান বহির্মুখী হইয়া সূর্য্যের ন্যায় আপনিই জগৎপ্রকাশ করে ও নিজে প্রকাশিত হয়। আমাদের জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। উহা চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের স্বভাব। জীব সেই ব্রহ্ম চৈতন্যের অংশ বলিয়া তাঁহা হইতেই জ্ঞান লাভ করে। অথবা ব্রহ্মের জ্ঞান জীবের অন্তরে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে মাত্র। তবে জীবের অন্তর মলিন বলিয়া সে জ্ঞান প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট হয়। অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে পূর্ণ জ্ঞান তাহাতে আপনিই প্রতিভাত হয়। তাহার জন্য শাস্ত্র বিহিত প্রমাণের প্রয়োজন নাই। এই অন্তঃকরণের মলিনতাই অজ্ঞান। অজ্ঞান দূর হইয়া জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হইলে এই বহুত্বময় জগতের মধ্যে একত্ব বা ব্রহ্মদর্শন হয়। তখন 'তৎ' 'ত্বং', 'অহং' 'ইদং' ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এই শেষ মত বেদান্ত শাস্ত্রের ও গীতার।

এই তত্ত্বজ্ঞান বা সর্ব্বব্যাপক জ্ঞান (Universal impersonal reason—Cousin) বা এই অজ্ঞানবন্ধনমুক্ত জ্ঞান (Pure knowledge freed from the bondage of affects—Spinoza) বা এই অনাপেক্ষিক জ্ঞান (Absolute reason—Hegel) বা এই পরমার্থ জ্ঞান (Transcendental reason—Kant) বা এই নিত্যবোধ স্বরূপ চৈতন্য (শঙ্কর), স্বতসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান। ইহা ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। অর্থাৎ ইহা ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় প্রমাণাদি দ্বারা উৎপন্ন হয় না। ইহা ব্যক্তি বিশেষের অজ্ঞানাবরণ দ্বারা, সেই অজ্ঞানাবরণের ঘনত্ব অনুসারে, অল্পাধিক পরিমাণে মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় আবৃত থাকে। কেবল যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণজনিত বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা এই পরমার্থ জ্ঞান আবরিত থাকে, তাহা নহে। কেননা বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান সত্যজ্ঞান। এক বিজ্ঞানেই সর্ব্ব বিজ্ঞান হয়—ইহা বেদান্তের সার সিদ্ধান্ত। তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অর্জ্জিত কর্ম্ম ও বাসনা জাত সংস্কার ও তদনুরূপ প্রবৃত্তি দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান আবরিত থাকে। প্রবৃত্তি দমন হইলে, অভিমানাত্মক অহঙ্কার নষ্ট হইলে, সংস্কার ধ্বংশ হইলে, তবে চিত্ত নির্ম্মল হয়। তখন চিত্তে প্রকৃত জ্ঞান প্রতিভাত হইতে পারে। ইহাই প্রকৃত জ্ঞান লাভের পথ। বেদান্ত শাস্ত্রে ও গীতায় ইহা বুঝান হইয়াছে। সমগ্র ইউরোপীয় দার্শনিক দিগের মধ্যে স্পাইনোজাই প্রধানতঃ এই তত্ত্ব কতক বুঝিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

এ সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিতে হইবে। কেবল প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক অনুমান প্রমাণ হইতে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইতে আত্মা ঈশ্বর বা জগতের মূল তত্ত্বের কোন জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। কেননা তাহা প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের বিষয় নহে। এই কারণে বলা যাইতে

পারে যে, বাহ্য বিষয়-জ্ঞান চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে বলিয়া তাহা তত্ত্ব জ্ঞানের অন্তরায় অথবা প্রকৃত জ্ঞানের আবরক। প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ হইতে কেন আত্মা, ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান জন্মিতে পারে না, তাহা এক্ষণকার দর্শন শাস্ত্রজ্ঞকে বলিয়া দিতে হইবে না। লক্ (Locke) প্রমুখ প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকগণকে যে পরিণামে জড়বাদে বা অজ্ঞেয়তাবাদে বা নাস্তিকতাবাদে উপনীত হইতে হয়, তাহা তাঁহারা জানেন। এই তত্ত্ব সম্প্রতি জর্ম্মান পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ক্যাণ্ট ও বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। এই জন্য আপ্ত প্রমাণ বা বিশ্বাস দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হয়, ইহা অনেক আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হন। কিন্তু বিশ্বাস বা অবিশ্বাস (শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা) আমাদের উল্লিখিত সংস্কার বা বাসনার অধীন। এই সত্য এস্থানে বিস্তারিত বুঝাইবার স্থান নাই। প্রসঙ্গ ক্রমে এসম্বন্ধে ইংরাজি চলিত কথা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল,—

"Convince a man against his will,
He's of the same opinion still."

সুতরাং আপ্তবাক্যে বা শাস্ত্রে বিশ্বাসবান হইতে হইলেও চিত্তের নির্ম্মলতা প্রয়োজন। অথবা সে জন্য সুসংস্কার অর্জ্জন করিতে হয়। এই জন্য চিত্তশুদ্ধির কারণ প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্ম ও ভক্তি সাধন প্রয়োজন। সুসংস্কার অর্জ্জিত হইলে তবে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে, নতুবা নহে। এই সুসংস্কার জন্মিলে—চিত্ত নির্ম্মল হইলে—বা রাগ দ্বেষ দ্বন্দজ্ঞানাদি হইতে মুক্ত হইলে, তবে বেদান্ত বাক্যে আমাদের আস্থা বা শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে, ও ক্রমে তাহা হইতে পরমাত্ম জ্ঞান লাভ হইতে পারে

কিন্তু এই জ্ঞান লাভই শেষ নহে। অজ্ঞানের উক্ত দ্বিতীয়রূপ আবরণ (ভাতোপ্যভানাপাদকং—মধু) অপরোক্ষানুভূতির দ্বারা দূর করিয়া বিজ্ঞান লাভ করিতে হয়। এই বিজ্ঞান লাভের জন্য যোগ বা সমাধির প্রয়োজন। এই সমাধি হইতেই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়—তখন জ্ঞান অজ্ঞানাবরণ হইতে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। সে সকল বিষয় এ স্থলে আলোচ্য নহে। এস্থলে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, আজি পর্য্যন্ত কোন ইউরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিত প্রকৃত জ্ঞান লাভের—এই এক মাত্র পন্থা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

এই অজ্ঞান সম্বন্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ বলিয়াছেন যে, সংসার দশায় কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান সঙ্কুচিত থাকে; মোক্ষ দশায় এই সঙ্কোচ দূর হইয়া জ্ঞানের বিকাশ হয়। প্রথম শ্লোকের টীকায় এই তত্ত্বের আভাষ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দুইরূপ শক্তি আছে—জ্ঞানশক্তি ও কর্ম্মশক্তি, অথবা নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি শক্তি। ইহাদের মধ্যে একটী আর একটীকে সঙ্কুচিত করে—জ্ঞান বৃদ্ধিতে কর্ম্ম বৃত্তির সঙ্কোচ হয়, আর কর্ম্ম প্রবৃত্তির বৃদ্ধিতে জ্ঞানের সঙ্কোচ হয়। এই কর্ম্ম শক্তির মূল অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত বাসনা। এই বাসনা হইতেই জীবের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। এই বাসনা হইতে আমরা সুখভোগের জন্য ও দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করি, ও সেই কারণ সুখজ বিষয় লাভ করিবার জন্য ও দুঃখজ বিষয় পরিহার জন্য আমরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। শুধু তাহাই নহে। এই প্রবৃত্তিই প্রথমতঃ জ্ঞান শক্তিকে নিয়মিত করে। অর্থাৎ কোন বস্তু আমাদের সুখজ বা দুঃখজ, কোনটী আমাদের ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানবৃত্তি প্রবৃত্তি-পরিচালিত হইয়া স্থির করিতে ব্যস্ত থাকে। তখন শুধু জ্ঞান লাভের জন্য বা বস্তুর স্বরূপ জানিবার জন্য—কোনরূপ আগ্রহ বা সংস্কার থাকে না।

অতএব কর্ম্ম প্রবৃত্তির মূল আমাদের অহঙ্কার (Personality বা Self-assertion)। এক কথায় বলা যায়, মানুষ সাধারণতঃ ইহ বা পরকালের স্বার্থ জন্য কর্ম্ম করে। এই জন্য যদি কর্ম্মের এই মূলোচ্ছেদ করা যায়, যদি স্বার্থ অহঙ্কার ত্যাগ করা যায়, যদি নিজের জন্য কোনরূপ কর্ম্মের প্রয়োজন নাই—এইরূপ সংস্কার উৎপন্ন করা যায়, তাহা হইলে সে অবস্থায় কেবল শরীর রক্ষার জন্য ও লোকসংগ্রহ বা পরহিত জন্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ম্ম করিলে, সেই প্রকৃত কর্ম্মসন্ন্যাস অবস্থায় সেরূপ কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানের সঙ্কোচ হয় না। এই নিষ্কাম কর্ম্মতত্ত্ব গীতায় বড় পরিষ্কার করিয়া বুঝান আছে। আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে জর্ম্মান পণ্ডিত সপেনহ এই তত্ত্ব যত বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন, তত পরিষ্কার করিয়া বোধ হয় আর কেহ বুঝান নাই। (তাহা বুঝিতে হইলে, তৎকৃত 'World as Will and Idea নামক পুস্তক আমাদের পাঠ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।) তিনি

তাহে বুদ্ধি, তাহে আত্মা, তাহে নিষ্ঠাযুত,
তাহে পরায়ণ যারা—জ্ঞানধৌতপাপ
হয়ে যায়—যেথা হতে নাহি আসা ফিরে।১৭

আমাদের বাসনা প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম প্রবৃত্তিকে Assertion of the will বলিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন যে, সমগ্র হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের এবং সার খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মূল সূত্র এই "Denial of the will" বা বাসনাদমন। বাসনাবীজ নষ্ট হইলে তবে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হয়, তবে মুক্তি হয়।

(১৭) তাহে—সেই পরমে (শঙ্কর)।

বুদ্ধি—সাধনা পরিপাকে বাহ্য সর্ব্ব বিষয় ত্যাগ করিয়া পরমাত্মার পর্য্যবসিত অন্তঃকরণ বৃত্তি। অর্থাৎ নির্বীজ সমাধি দ্বারা পরমাত্মা সাক্ষাৎকৃত বুদ্ধি (মধু)। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি (স্বামী)। সেইরূপ আত্মদর্শনে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি (রামানুজ)।

তাহে আত্মা—পরমাত্মায় বুদ্ধিযুক্ত হইলে ব্রহ্মতত্বই কেবল বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়—তখন বোদ্ধা বোদ্ধব্য থাকে না, দেহাদি অভিমান নিবৃত্তি হয়। জীবাত্মা পরমাত্মায় একীভূত হয় (মধু)। তাহে যত্নশীল (স্বামী), তাহে নিবিষ্ট মন (বলদেব, রামানুজ)।

তাহে নিষ্ঠা—তাহে অভিনিবেশ অর্থাৎ ব্রহ্মে সর্ব্ব কর্ম্ম অর্পণ করিয়া তাঁহাতেই অবস্থান (শঙ্কর)। সর্ব্ব কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ বিক্ষেপ নিবৃত্তি দ্বারা তাঁহাতে অবস্থান (মধু), সেই অভ্যাস নিরত (রামানুজ), তাঁহাতে তৎপর (স্বামী)।

তাহে পরায়ণ—তিনিই পরমগতি বা আশ্রয় যাহার (শঙ্কর, স্বামী)। তিনি একমাত্র প্রাপ্তব্য, সুতরাং কর্ম্মফলে অভিলাষ বিহীন (মধু)।

মধুসূদন বলিয়াছেন, 'তাহে বুদ্ধি' ইহা দ্বারা আত্ম সাক্ষাৎকার কথিত হইয়াছে। 'তাহে আত্মা' ইহা দ্বারা অনাত্ম বিষয়ে অভিমানরূপ বিপরীত ভাবনা নিবৃত্তির ফল নিদিধ্যাসন পরিপাক বুঝাইতেছে; 'তাহে নিষ্ঠা' ইহা দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস পূর্ব্বক বেদান্ত বিচার বুঝাইতেছে।

নাহি আসা ফিরে—(মূলে আছে 'অপুনরাবৃত্তি')। যাহাতে পুনর্ব্বার দেহ সম্বন্ধ না হয় (শঙ্কর মধু), মুক্তি (স্বামী, বলদেব)।

যেমন ব্রাহ্মণে—বিদ্যা বিনয় ভূষিত,
তেমনি গো হস্তী, আর কুক্কুর চণ্ডালে—
সর্ব্বত্রই সমদর্শী পণ্ডিত যাহারা। ১৮
হেথা তারা সর্গজয়ী—যাহাদের মন
এই সাম্যে রহে স্থির; ব্রহ্মই নির্দ্দোষ
সাম্যময়, তাই তারা ব্রহ্মে অবস্থিত। ১৯

পাপ—পাপাদি সংসার কারণ (শঙ্কর), পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্ম (মধু)।

(১৮) ব্রাহ্মণ...চণ্ডাল—'ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল' উল্লেখ দ্বারা কর্ম্ম বৈষম্য বুঝাইতেছে; এবং ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী এইরূপ উল্লেখ হইতে জাতি বৈষম্য বুঝাইতেছে, (স্বামী, বলদেব)। অথবা উত্তম সংস্কার যুক্ত সাত্বিক ব্রাহ্মণ, মধ্য সংস্কার যুক্ত রাজস গো, আর সংস্কারবিহীন তামস হস্তী প্রভৃতি...(শঙ্কর, মধু)।

চণ্ডাল—(মূলে আছে 'শ্বপাক')। ইহারা অত্যন্ত অস্পৃশ্য সংস্কারহীন নীচ জাতি। পূর্ব্বে ইহারা গ্রামের ভিতরে বাস করিতে পাইত না। (মনু ১০।১০১ দ্রষ্টব্য)।

সমদর্শী—এক অবিক্রিয় ব্রহ্মদর্শী। সম—অর্থাৎ ব্রহ্ম (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। অর্থ এই যে, আপাত দৃষ্টিতে সর্বত্র বৈষম্য দর্শন হইলেও যাঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত, তাঁহারা এই বৈষম্য মধ্যে কেবল একত্ব দর্শন করেন, সকলের মধ্যেই এক অখণ্ড অবিভক্ত ব্রহ্ম দর্শন করেন। তাঁহারা কেবল দেখেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

রামানুজ বলেন, বৈষম্য প্রকৃতির কার্য্য—আত্মার নহে। আত্মা সর্ব্বত্র সমান—জ্ঞানের একাকার হেতু সমান। সেই জন্য আত্মস্বরূপদর্শী পণ্ডিত আপাত প্রতীয়মান বৈষম্য মধ্যে সমত্ব বা বৈষম্যবিহীনত্ব দর্শন করেন।

গিরি বলেন, সাত্বিক রাজসিক বা তামসিক সংস্কারের দ্বারা ব্রহ্ম সংস্পৃষ্ট হন না: তিনি সর্ব্বভূতে অদ্বিতীয়, কূটস্থ, অসঙ্গ আছেন।

পণ্ডিত—জ্ঞান দ্বারা যাহার অজ্ঞান নাশিত হইয়াছে সেই পণ্ডিত (শঙ্কর)।

(১৯) সর্গজয়ী—সর্গ, অর্থাৎ জন্ম (শঙ্কর)। সংসার (স্বামী বলদেব, রামানুজ)।

প্রিয় লাভে নহে হৃষ্ট, অপ্রিয় লভিয়া

হেথা—সংসারে (বলদেব, রামানুজ)। জীবিত কালে (শঙ্কর, স্বামী)।

সাম্যে রহে স্থির—অবৈষম্য আখ্যাযুক্ত অর্থাৎ বৈষম্য বিহীন ব্রহ্ম ধর্ম্মে নিবিষ্ট (বলদেব)। প্রকৃতির সংসর্গ দোষ বিহীন হেতু "সম"। এই 'সম'ই আত্মবস্তু ব্রহ্ম। সেই আত্মসাম্যে স্থির থাকিতে পারিলে ব্রহ্মে স্থিত হওয়া যায়। এই ব্রহ্মে অবস্থান করিতে পারিলেই সংসার জয় হয় (রামানুজ)।

শঙ্কর প্রমুখ ভাষ্যকারগণ বলেন যে, সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক স্বভাবের প্রভেদ অনুসারে,প্রাণী-গণ মধ্যে যে বৈষম্য সংসারে সকল সময়েই দেখা যাই-তেছে,সেই বৈষম্য মধ্যে সমত্ব দর্শন করা ধর্ম্মশাস্ত্রে নি-ষিদ্ধ হইয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত এই যে,নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের নিকট চণ্ডাল বা কুকুর অস্পৃশ্য। গৌতম স্মৃতিতে আছে, "সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাত।" অর্থাৎ চতুর্ব্বেদ পারগ অত্যন্ত সদাচারীব্রাহ্মণকে যেরূপ বস্ত্র অন্নাদি দান পূর্ব্বক পূজা করিতে হয়, সেইরূপ সদাচারীকে তদপেক্ষা হীন পূজা করিলে, অথবা হীনাচারী বিদ্যা বিহীনকে যে পরিমাণে পূজা করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ লোককে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অথবা সদাচারী পণ্ডি-তের ন্যায় পূজা করিলে, সেরূপ পূজার অন্ন অভোজ্য হয়, ও সেরূপ পূজক ধর্ম্মবিহীন ও হেয় হয়। সুতরাং গীতার এই উপদেশ ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিবিরোধী ইহা আপাততঃ বোধ হয়। শঙ্করাচার্য্য এই বিরোধের মীমাংসা করিয়া বলেন যে, যাহারা মুক্ত হয় নাই, সংসার মধ্যে আছে, তাহারা বৈষম্য দর্শন না করিয়া থাকিতে পারে না, কেননা সংসারই বৈষম্যময়। এই সকল লোকে সেই বৈষম্য অনুসারে সংসারে প্রবৃত্ত হয়। ইহাদের জন্যই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি। কেননা এরূপ লোক যদি বাহিরে সাম্যভাব দেখাইয়া বা মুখে সাম্যের কথা বলিয়া অন্তরে বৈষম্য ভাব রাখে, তবে তাহাকে মিথ্যাচারী হইতে হয়। কিন্তু যিনি প্রকৃতই সর্ব্ব-ভূতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া, সাম্যের মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া,ব্রহ্মে অবস্থান করেন—তিনি জীবন্মুক্ত। সংসারে তাঁহার বৈষম্য দর্শন হয় না। তিনি সংসার অবস্থায় প্রয়োজ্য ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি অতিক্রম করিয়াছেন, পাপ পুণ্যের বাহিরে গিয়াছেন।

নাহি হয় বিষাদিত, ব্রহ্মবিদ্ যেই

স্থির বুদ্ধি মোহহীন—ব্রহ্মে তার স্থিতি। ২০

ব্রহ্মই নির্দ্দোষ সাম্যময়—নির্দ্দোষ, অর্থাৎ রাগ দ্বেষ শূন্য (বলদেব), অথবা প্রকৃতি সংসর্গ দোষ বর্জ্জিত (রামানুজ)। প্রকৃতির গুণভেদ হেতু পার্থক্য—নির্গুণ চৈতন্যে নাই। ব্রহ্ম সর্ব্ববিকার শূন্য, কূটস্থ, নিত্য, এক। শাস্ত্রে আছে পুরুষ অসঙ্গ। শ্রুতিতে আছে—

> "সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু
> র্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ।
> একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
> ন লিপ্যতে লোক দুঃখেন বাহ্যঃ।"

ব্রহ্ম ইচ্ছাদি ধর্ম্ম দ্বারা কলুষিত হন না, কেন না এ সকল অন্তঃকরণ ধর্ম্ম, চৈতন্যের নহে। ব্রহ্ম—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জীবে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও স্বয়ং নির্গুণ বলিয়া দেহ ও অন্তঃকরণ ধর্ম্মাদি দ্বারা গুণযুক্ত হন না। তিনি প্রতি শরীরেই সমভাবে অবস্থিত। (শঙ্কর, মধু)।

(২০) প্রিয়—ইষ্ট (শঙ্কর)। দেহমাত্রে আত্ম-দর্শী যাহারা, তাহারাই ইষ্ট লাভে আহ্লাদিত ও অনিষ্ট সম্পাতে বিষাদিত হয় (শঙ্কর)। যে প্রকারে অবস্থিত কর্ম্মযোগীর সমদর্শনরূপ জ্ঞানবিপাক হয়, তাহাই এই শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে (রামানুজ)। মধুসূদন বলিয়াছেন যে, যাহারা জীবন্মুক্ত তাঁহারা স্বভাবতই প্রিয় লাভে হৃষ্ট ও অপ্রিয় লাভে বিষাদিত হন না, কিন্তু যাঁহারা মোক্ষার্থী, তাঁহাদের যত্ন করিয়া এই অবস্থা লাভের জন্য অনুষ্ঠান বা সাধনা করিতে হয়।

স্থির বুদ্ধি—আত্মাতে যাহার বুদ্ধি স্থির থাকে, সেই স্থিরবুদ্ধি (বলদেব, রামানুজ)। আত্মা সর্ব্বত্র সম এইরূপ অটল বা নিশ্চিত বুদ্ধি যাহার (শঙ্কর)। সন্ন্যাস পূর্ব্বক বেদান্ত বাক্য বিচার পরিপাকে সর্ব্ব সংশয় শূন্য হেতু নিশ্চল বুদ্ধি (মধু, স্বামী)।

মোহহীন—অস্থায়ী শরীরের সহিত নিত্য আত্মার একীকরণ বা দেহাত্মজ্ঞানই মোহ (রামানুজ, বলদেব)। মধুসূদন বলেন, স্থিরবুদ্ধি হওয়া শ্রবণ মনননের ফল। আর মোহহীন হওয়া নিদিধ্যাসনের ফল।

বাহ্য বিষয়েতে যার অনাসক্ত-চিত,
আত্মাতেই যেবা সুখ জানে যেই জন,
সেই ব্রহ্মে যোগযুক্ত—ভুঞ্জে নিত্য সুখ। ২১
বিষয় সংস্রবজাত ভোগ যে সকল
দুঃখেরই কারণ তারা—আদি অন্তযুত;
হে কৌন্তেয়, বুধগণ নহে তাহে রত। ২২

নিদিধ্যাসন দ্বারা বিজাতীয় প্রত্যয় অন্তরিত হইয়া সজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ দৃঢ় হয়। বিপরীত ভাবনা দূর হয়। এই বিপরীত ভাবনাই সন্দেহ। তাহার পর সমাধি পরিপাকে ব্রহ্মে স্থিতি হয়, জীবন্মুক্তি হয়।

ব্রহ্মে তারস্থিতি—সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাসী হয় (শঙ্কর)। দেহাত্মভিমান দূর হইয়া স্থিররূপ আত্মাবলোকন লাভ হইলে, হর্ষ বিষাদের অতীত হইয়া ব্রহ্মে স্থিতি হয় (রামানুজ)।

(২১) বাহ্য বিষয়েতে—(মূলে আছে 'বাহ্যস্পর্শ') শব্দাদি বিষয়ে (শঙ্কর), বাহ্য ইন্দ্রিয় স্পৃষ্ট বিষয়ে (স্বামী-মধু), আত্মব্যতিরিক্ত বিষয়ে (রামানুজ)। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে আছে 'মাত্রাস্পর্শ'। উক্ত শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

সুখ—উপসমাত্মক সাত্ত্বিক সুখ (স্বামী), আনন্দ—তৃষ্ণাক্ষয় জনিত সুখ (মধু)। মহাভারতে আছে—

"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখং।
তৃষ্ণাক্ষয় সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাং॥"

মধু বলেন, তৎ ও ত্বং পদার্থের ঐক্যানুভবই পূর্ণ-সুখ। তৎ ও ত্বং পদার্থের অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ত্বং অর্থাৎ জীবে ও তৎ বা ব্রহ্মে ঐক্য অনুভবে—অহংঙ্কার নষ্ট হইয়া মুক্ত অবস্থা হয়। তখন আমাদের যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, এই অনুভব একেবারে লোপ হইয়া যায়।

ব্রহ্মে যোগযুক্ত—ব্রহ্মে সমাহিত বা সমাধিযুক্ত (শঙ্কর, স্বামী)।

নিত্য সুখ—বাহ্য বিষয় স্পর্শজাত সুখ অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এই ব্রহ্মাত্মানুভব সুখ অক্ষয় (মধু, শঙ্কর)।

(২২) বিষয় সংস্রবজাত—(মূলে আছে 'সংস্পর্শজা')। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ বা সম্বন্ধ হইতে জাত (শঙ্কর, মধু)।

ভোগ—সুখ (স্বামী, বলদেব)।

দুঃখেরই কারণ তারা—এইরূপ সুখ অবিদ্যাজাত বলিয়া ইহা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের কারণ। আর শুধু এই লোকে নহে—উভয় লোকেই দুঃখের কারণ—(শঙ্কর)। আধি, ব্যাধি, জরা মরণাদির সহিত সম্বন্ধ অনিবার্য্য বলিয়া, আর বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্ক হেতুও এই ভোগ অনিত্য বলিয়া, অর্থাৎ সমাগমনাদি ক্লেশভাগী বলিয়া—ইহা দুঃখ হেতু (গিরি)। ইহা রাগ-দ্বেষাদিযুক্ত বলিয়া দুঃখের কারণ (মধু)। বিষ্ণুপুরাণে আছে—

"যাবন্তঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোক শঙ্কবঃ॥"

আদিঅন্তযুত—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগই ভোগের আদি, আর তাহার বিয়োগেই ইহার অন্ত। অর্থাৎ এইরূপ সুখ অনিত্য, মধ্যক্ষণস্থায়ী-ক্ষণিক (শঙ্কর, মধু)। গৌড়পাদ তাঁহার অদ্বৈতদর্শনে বলিয়াছেন, "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপিতত্তথা।" (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৪ ও ১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

বুধগণ নহে তাহে রত—এই শ্লোকে যে তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। কেন না, এই তত্ত্বই সকল ধর্ম্মের ও নীতির মূল। মানুষে সাধারণতঃ সুখ লাভের জন্য, ও দুঃখ বা ক্লেশ দূর করিবার জন্য এসংসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। বিষয় সুখ ভোগ প্রবৃত্তিই আমাদের কর্ম্মের মূলসূত্র। এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, আমাদের সেই প্রবৃত্তি নষ্ট করিতে হইবে। কেন না বিষয় ভোগ আপাততঃ সুখের কারণ হইলেও উহা পরিণামে দুঃখকর ও উহা ক্ষণস্থায়ী। এই তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ইহাদের এক শ্রেণীর নাম Optimist বা সংসারানুরাগী, আর এক শ্রেণীর নাম Pessimist বা সংসার বিরাগী। একশ্রেণীর মতে—এ জগত সুখময়; এখানে মানুষের সুখের উপকরণ যথেষ্ট আছে। জগতের উন্নতির সহিত এই সুখের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে, দুঃখের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। কাজেই মানুষকে নিজের ও সমগ্র মানব জাতির সুখ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই মূল

ধর্ম্ম। এই মতের উপর বিলাতী Hedohison ও Utilitarianism প্রভৃতি নীতিশাস্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। আর যে দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতগণকে Pessimist বলে, ইহাদের মতে জগত দুঃখময়—সমস্ত মনুষ্যজীবনই দুঃখময়। মানুষের সুখলাভ চেষ্টা বৃথা, কেন না জগতে সুখের অপেক্ষা দুঃখের পরিমাণ অনেক অধিক। আর জগত বা সমাজ যতই উন্নত হউক, দুঃখের পরিমাণ চিরকালই অধিক থাকিবে। মানুষ সুখ লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া কেবল দুঃখই ভোগ করিবে। সুখ কথার কথা—মরীচিকা মাত্র। অতএব সুখলাভ চেষ্টা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য—তাহাই ধর্ম্ম। এই শ্রেণীর পণ্ডিতদের মধ্যে জর্ম্মান দার্শনিক খ্যাতনামা সপেণহরই শ্রেষ্ঠ। (সপেনহরের মতে—"Human life oscillates between pain and ennui, which two states are indeed the ultimate elements of life") তাঁহার কৃত World as Will and Idea নামক পুস্তকে এই তত্ত্ব বড় বিশদ করিয়া বুঝান আছে। এই জন্য বিলাতী ডেভিড প্রভৃতি লেখকগণ তাঁহার এই পুস্তককে ইউরোপীয় সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন। যাহা হউক, যে তত্ত্ব বুঝাইতে সপেনহরের ন্যায় পণ্ডিতকে একখানি সুবৃহৎ পুস্তক লিখিতে হইয়াছে, তাহা এস্থানে অল্পকথায় বুঝান যায় না। পণ্ডিতবর সপেনহর দেখাইয়াছেন যে, এই মতই সকল ধর্ম্মের মূল। তিনি বলিয়াছেন হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ও প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্ম সকলই এই সত্যের উপর সংস্থাপিত। সপেনহরের পূর্ব্বেও অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এই মত প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

আমাদের দেশে প্রায় সকল দার্শনিক পণ্ডিতই এই শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী। কেন না কেবল এই মতই আমাদের ধর্ম্ম সম্মত। ইহাই একমাত্র তত্ত্ব, ধর্ম্মের একমাত্র মূলভিত্তি। মানুষ যদি কেবল ইহকালের সুখলাভই পুরুষার্থ মনে করিয়া কর্ম্ম করিত, তবে ধর্ম্মের আর দাঁড়াইবার স্থান থাকিত না। আধুনিক ইউরোপ সাধারণতঃ এই ইহজীবনের সুখভোগকে সার করিয়াছে, তাই ইউরোপে ধর্ম্মের অবস্থা এখনং শোচনীয়। পরকালে বিশ্বাস করিয়া সেই পরজীবনে সুখভোগ আশায় ধর্ম্ম বিষয় কর্ত্তব্য ভাবিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাও ঠিক ধর্ম্ম নহে। গীতায় বলা আছে, তাহা নিকৃষ্ট ধর্ম্ম। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের মূল সূত্র।

আমাদের দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে এই তত্ত্ব বিস্তারিত বুঝান আছে। সাংখ্য দর্শনের প্রথম সূত্র এই "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।" সাংখ্যকার দেখাইয়াছেন যে, সুখ লাভের চেষ্টা দ্বারা এই দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। কেবল মোক্ষেই দুঃখনিবৃত্তি হয়। পাতঞ্জল দর্শনে এই তত্ত্ব অতি বিশদরূপে বুঝান আছে। টীকাকার মধুসূদন তদবলম্বনে এই শ্লোক যেরূপে বুঝাইয়াছেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

পাতঞ্জল দর্শনে আছে, ক্লেশ পাঁচ প্রকার যথা;—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ (২।৩)। ইহাদের মধ্যে অবিদ্যাই অন্য কয় প্রকার ক্লেশের কারণ। এই ক্লেশের আবার চারি প্রকার অবস্থা যথা—প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার। অর্থাৎ বীজাবস্থা হইতে পূর্ণ অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত অবস্থা ধরিয়া ক্লেশকে চারি স্তরে বিভাগ করা যায়। এই ক্লেশের মধ্যে রাগ ও দ্বেষ কি, তাহা এস্থলে বুঝিতে হইবে। সুখকর বিষয় লাভের জন্য যে অনুরাগ বা প্রবৃত্তি তাহাই রাগ, ও দুঃখকর বিষয় পরিহার জন্য চেষ্টার মূল দ্বেষ। উভয়ই ক্লেশকর।

দুঃখ কাহাকে বলে? ন্যায় দর্শনে বলা হইয়াছে, বাধনা লক্ষণই দুঃখ। আমাদের প্রবৃত্তির পথে যাহা বাধদেয় তাহাই দুঃখজনক। এই দুঃখের অভিব্যক্তি হইলে তাহাই ক্লেশ। আমাদিগের কর্ম্মাশয় এই ক্লেশ মূলক। কর্ম্মাশয়ই আমাদের সংস্কার বা এজন্ম ও পূর্ব জন্মের কৃত কর্ম্ম হইতে জাত ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ অদৃষ্ট শক্তি। এই কর্ম্মাশয় বা কর্ম্মশক্তির বিপাক হেতু (অর্থাৎ ইংরাজী বিজ্ঞানের কথায় ইহার Potential অবস্থা হইতে kinetic অবস্থায় আসা হেতু) আমাদের জাতি আয়ু ও ভোগ উৎপন্ন হয়। (পাতঞ্জল সূত্র ২।১৩)। এই কর্ম্মশক্তি আমাদের মধ্যে কখন বীজ রূপে কখন ব্যক্তরূপে থাকে, ইহা অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত। মধুসূদন বলিয়াছেন, ইহা ঘটি যন্ত্রবৎ(ঘড়ির মত) সর্ব্বদা আবর্ত্তিত হয়। এই কর্ম্মশক্তি আমাদের ক্লেশের মূল। পাতঞ্জল দর্শন মতে ইহাকে ধ্যানের দ্বারা অর্থাৎ যোগ রূপ উপায়ে নষ্ট করিতে হয়। (পাতঞ্জলদর্শনের দ্বিতীয় পাদের ২ হইতে ১৩ সূত্র দ্রষ্টব্য)। নির্ব্বীজ সমাধি দ্বারা ক্লেশের মূল অবিদ্যা দূর হয়। এই অবিদ্যা সাংখ্য

মতে পাঁচ প্রকার যথা তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র। যাহা হউক, এ বিষয় এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

উপরে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহা হইতে বুঝা গেল যে, পাতঞ্জলদর্শন মতে "রাগ" বা সুখ লাভের প্রবৃত্তিই মূলতঃ ক্লেশকর। পাতঞ্জলদর্শনে একথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। এই দর্শন মতে সুখ ও দুঃখকর। পাতঞ্জলদর্শনের দ্বিতীয় পাদের ১৫ শ্লোক এই :—

"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈ গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ।"

অর্থাৎ পরিণাম দুঃখ, বর্ত্তমানে বা ভোগকালে তাপ দুঃখ; আর ভবিষ্যতে সংস্কার দুঃখ—এই জন্য, এবং তিন গুণবৃত্তির পরস্পর বিরোধ জন্য বিবেকীর নিকট সকলই দুঃখ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কেবল এই কয়টী কথাই জর্ম্মান পণ্ডিত সপেনহর তাঁহার গ্রন্থে বুঝাইয়াছেন। আমরা এস্থলে টীকাকার মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়া সংক্ষেপে এই তত্ত্ব বুঝাইব।

মধুসূদন বলিয়াছেন দৃষ্ট ও অনুশ্রাবিক,বা এজন্মের ও পর জন্মের সকল প্রকার বিষয় সুখই প্রতিকুলবেদনীয়। এজন্য তাহা দুঃখ। ভোগ দুঃখের কারণ। কেন না ইহা—পরিণাম দুঃখ, তাপ দুঃখ ও সংস্কার দুঃখ দ্বারা অতীত বর্ত্তমান, ভবিষ্যত এই তিন কালেই ক্লেশের দ্বারা অনুবিদ্ধ। সুখের অনুভব মাত্রেই রাগ বা অনুরাগ-রঞ্জিত। প্রথমে রাগ বা অনুরাগ উৎপন্ন হয়, কোন বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ জন্মে। সেই আকর্ষণ অনুসারে সেই বিষয় লাভের চেষ্টা হয়। সেই বিষয় প্রাপ্ত হইলে তবে সুখ হয়। কিন্তু এই অনুরাগের তৃপ্তি নাই। ইহা প্রতিক্ষণে বৃদ্ধি হয়। আর যদি সেই অনুরাগের বিষয় না পাওয়া যায়, তবে ত দুঃখ অনিবার্য্য। ভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের উপশান্তি না হইলে সুখ হয় না। কিন্তু ভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের উপশান্তি ও বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপন্ন হয় না। এইজন্য উক্ত হইয়াছে :—

"ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন সাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভুয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

এই জন্য সুখের উপভোগ ও পরিণাম দুঃখ। আবার সুখ অনুভব কালে তাহার প্রতিকূল দুঃখসাধক বিষয়ের প্রতি দ্বেষ জন্মে। এই দ্বেষও দুঃখকর। তাহার পর যখন বর্ত্তমান সুখানুভব চলিয়া যায়, তখন তাহার সংস্কার মাত্র থাকে। সুখের স্মৃতি থাকে। তাহাতে অনুরাগও থাকিয়া যায়। ইহার দ্বারাই পরে আমাদের কায়মনোবাক্য দ্বারা কর্ম্ম চেষ্টা নিয়মিত হয়। তাহাই পাপ পুণ্যাদি কর্ম্মের মূল, এবং তাহাই জন্মাদির কারণ "সংস্কারের" মূল। সুতরাং ভোগকে সংস্কার দুঃখ বলা যায়।

তাহার পর গুণবৃত্তি বিরোধের কথা। সুখাত্মক সত্ত্বগুণ, দুঃখাত্মক রজঃগুণ আর মোহাত্মক তমোগুণ ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। অথচ ইহারা একত্র-সম্বন্ধ। লৌহে যেমন চুম্বক শক্তির বিকাশ হইলে তাহার উভয় প্রান্তে পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব দুইরূপ শক্তির স্ফূর্ত্তি হয়, অথচ ইহার একটী যেমন অন্যটীর অভাবে থাকিতে পারে না—ত্রিগুণেরও অবস্থা কতকটা সেইরূপ। তবে কিছু প্রভেদও আছে। ইহাদের মধ্যে এক গুণের আধিক্যে অন্যগুণের সংকোচ হয়। অর্থাৎ এক গুণ বা শক্তি বিকাশ অবস্থায় আসিলে অন্য দুই শক্তি বীজাবস্থা প্রাপ্ত হয়,কিন্তু তাহারা কখন ধ্বংশ হয় না। যাহার বিকাশ অবস্থা, তাহা বিলীন হইলে, অন্য গুণ তখন বীজাবস্থা হইতে বিকাশিত হয়। সুতরাং এই তিনগুণ একত্র সম্বন্ধ হইলেও একটি গুণ কেবল কার্য্যকারী হয় বা বিকাশাবস্থায় থাকে। সুখ উপভোগ রূপ প্রত্যয় বা মনের অবস্থা সত্ত্ব শক্তি বিকাশ কালে উদ্ভুত হয়। সেই সঙ্গে রজঃ ও তম শক্তি অনুদ্ভুত বা বীজাবস্থায় থাকে, তাহা নষ্ট হয় না। রজ ও তম দুঃখ মোহাত্মক। অতএব সুখ উপভোগ কালেও দুঃখ ও মোহ অন্তরে বীজাবস্থায় থাকিয়া যায়, সময় পাইলে তাহার বিকাশ হয় মাত্র। এই জন্য সুখ দুঃখাত্মক।

তাহার পর এইরূপ সুখ প্রবাহ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। কেন না গুণবৃত্তি চঞ্চল ও ক্ষিপ্র পরিণামী। সুখ প্রত্যয় উদ্ভুত অবস্থায় বা ব্যক্তাবস্থায়—দুঃখ প্রত্যয় অব্যক্ত থাকিলেও তাহা আবার ব্যক্ত হইতে চেষ্টা করে। অতএব সুখ ও দুঃখ পরস্পর সম্বন্ধ। যেন একটি নিত্য আবর্ত্তিত গোলকের একদিকে সুখ আর একদিকে দুঃখ আছে। কখন সুখাংশ উপরে আসে, কখন দুঃখাংশ প্রকাশিত হয়।

শরীর ত্যাগের আগে পারে হেথা যেই
কাম-ক্রোধ-জাত বেগ করিতে সংযত—
সেই হয় যোগযুক্ত, সেই সুখী নর। ২৩

যাহা হউক, এস্থলে যাহা উল্লিখিত হইল তাহা হইতে এই কথা বুঝা যাইবে যে, সংস্পর্শজ ভোগ দুঃখময় ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া তাহা প্রথমেই ত্যাগ করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। কেন না ইহাই ধর্ম্মের মূলসূত্র, ধর্ম্মের আর অন্য সাধনার প্রথমে তত প্রয়োজন নাই। এই ত্যাগশিক্ষা হইতে আত্মত্যাগ শিক্ষা হইবে, কেন না ইহা হইতে অন্যের প্রতি প্রীতি দয়া প্রভৃতি সদ্ভাবের বিকাশ হইবে, নিষ্কাম কর্ম্ম করা সহজ হইবে ও পরিণামে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইবে।

শরীর ত্যাগের আগে—অর্থাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবজ্জীবন (শঙ্কর)।

(২৩) হেথা—এ জীবনে (শঙ্কর); সাধন দশায় (রামানুজ)।

কাম ক্রোধ জাত বেগ—(তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৭ হইতে ৪১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ইন্দ্রিয়গোচর ইষ্ট বিষয়ে ও শ্রুত স্মৃত বা অনুভূত সুখকর বিষয়ে যে তৃষ্ণা তাহা কাম; আর নিজ প্রতিকূল দুঃখ হেতু, দৃষ্ট শ্রুত ও স্মৃত বস্তুতে যে দ্বেষ তাহা ক্রোধ; এই কাম উদয় হইলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়, চক্ষু বিস্ফারিত হয়, মুখ ও শরীরে এবং অন্তঃকরণে এক প্রকার ক্ষোভ বা চঞ্চলতা উপস্থিত হয়, ইহাই কামজাত বেগ; আর গাত্র কম্পন, স্বেদ নির্গমন, অধরোষ্ঠের কম্পন, নেত্রের রক্তবর্ণ ধারণ—ইত্যাদি ক্রোধের বেগ (শঙ্কর)। বর্ষাকালে নদীর বেগের ন্যায় এই বেগ (মধু)। কাম ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তিকে, আমাদের অধঃস্রোত বৃত্তি বলে। এই অধঃস্রোত বৃত্তি দমন করিতে শিক্ষা করিলে ঊর্দ্ধস্রোত বৃত্তি লাভ করা যায়, তবে নিবৃত্তি পথে যাওয়া যায়।

সংযত—বশীকার সংজ্ঞাযুক্ত বৈরাগ্যের দ্বারা সংযত (মধু)। "দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্" (পাতঞ্জলদর্শন ১।১৫)।

যোগযুক্ত—(মূলে আছে 'যুক্ত')। সমাহিত (স্বামী), যোগী (শঙ্কর, মধু)। আত্মানুভব করিবার উপযুক্ত (রামানুজ)।

যে জন অন্তরে সুখী, অন্তরে আরাম,
অন্তরেই জ্যোতি যার—হয় যোগী সেই
ব্রহ্মরূপ—পায় সেই ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ। ২৪
ক্ষীণপাপ জিতচিত্ত, দূরিত সংশয়,
সর্ব্বভূত হিতে রত, হেন ঋষি যারা—
তাহারাই করে লাভ ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ। ২৫

সুখী—আত্মানুভব আনন্দ যুক্ত (রামানুজ, বলদেব), ইহলোকে সুখী (শঙ্কর)।

নর—অর্থাৎ সেই প্রকৃত মানুষ, নতুবা যাহারা প্রবৃত্তির বশীভূত পশু ধর্ম্মযুক্ত তাহারা নরাকারে পশু (মধু)।

(২৪) অন্তরে—(মূলে আছে 'অন্তঃ') আত্মাতে (শঙ্কর, স্বামী, মধু, রামানুজ)।

আরাম—ক্রীড়া (শঙ্কর, মধু)।

অন্তরেই জ্যোতি যায়—জ্যোতি অর্থাৎ বিজ্ঞান বা প্রকাশ (শঙ্কর, মধু)। দৃষ্টি (বলদেব)।

ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ—মোক্ষ, জীবন্মুক্তি (শঙ্কর)। অবিদ্যাবরণ নিবৃত্তি হেতু—কল্পিত দ্বৈতজ্ঞান নষ্ট হওয়ায় পরমানন্দ রূপ নির্ব্বাণ (মধু) আত্মানুভব সুখ (রামানুজ)।

(২৫) ক্ষীণ পাপ—ক্ষীণকলুষ, (শঙ্কর, মধু) আত্মপ্রাপ্তি বিরোধী কলুষহীন (রামানুজ)। যাহার পাপরূপ সংস্কার সকল 'তনু' বা সূক্ষ্ম ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ক্ষীণপাপ। পাতঞ্জলদর্শনে আছে, "তে প্রতিপ্রসব হেয়াঃ সূক্ষ্মা।" অর্থাৎ ক্লেশ সকল সূক্ষ্ম হইলে, প্রতিলোম পরিণামের দ্বারা তাহাদিগকে দূর করিতে হয়। তপস্যাদির দ্বারা সংস্কারের মূলোৎপাটিত না হইলেও, তাহার স্থূল পরিণাম নষ্ট হইয়া গিয়া সূক্ষ্ম বা নির্ব্বীজ দশা প্রাপ্ত হয়—তাহার কার্য্যশক্তি থাকে না।

ক্ষীণ পাপ...সর্ব্বভূত হিতে রত—এস্থলে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে, যাঁহারা সর্ব্বভূত হিতে রত ঋষি তাঁহারাও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন—অর্থাৎ তাঁহারা আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নষ্ট করিয়া আপনাকে ব্রহ্মের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াও—লোক হিতে তরে কার্য্য করিয়া থাকেন। মধুসূদন বলিয়াছেন, এই শ্লোকের অর্থ এই যে, "প্রথম যজ্ঞাদির দ্বারা

কাম ক্রোধ হতে মুক্ত, সংযত অন্তর
আত্মবিদ্ যতি যারা, আছে তাহাদের
উভয় লোকেতে স্থির—ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ।২৬
বিষয় সংস্পর্শ করি দূর—রাখি স্থির
ভ্রূযুগ মাঝারে আঁখি, করিয়া সমান
নাশা মধ্যে সঞ্চারিত প্রাণাপাণ-বায়ু। ২৭

পাপ ক্ষীণ করিতে হয়; তাহার পর অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিতে হয়; তাহার পর শ্রবণ, মনন সাধনার দ্বারা সংশয় বা দ্বিধা দূর করিয়া বিশ্বাসী হইতে হয়; তাহার পর নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মাতে একাগ্রচিত্ত হইতে হয়। এইরূপ হইয়াও যতক্ষণ দ্বৈতদর্শন থাকে,ততক্ষণ সর্ব্বভূতহিতেরত বা হিংসাশূন্য থাকিতে হয়—তবে ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ হয়।" শ্রুতিতে আছে, "যস্মিন্ সর্ব্বানি ভূতানি আত্মৈবাভূৎ বিজানতঃ কোমোহস্তত্র কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ।"

ঋষি—সম্যগদর্শী সন্ন্যাসী (শঙ্কর)। আত্মদ্রষ্টা (রামানুজ)।

খণ্ডিত সংশয়—মূলে আছে 'দ্বিধা হীন'। রামানুজ ইহার অর্থ করেন—দ্বন্দ্ব হীন।

(২৬) আছে স্থির—এরূপ লোকের ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ হস্তগত (রামানুজ)। তাহারা এ জীবনে জীবন্মুক্ত হয়, ও মৃত্যুর পর নির্ব্বাণ লাভ করে।

(২৭, ২৮)—শঙ্করাচার্য্য বলেন, ভগবান প্রথমে সম্যগ্দর্শননিষ্ঠ সন্ন্যাসীর সদ্য মুক্তির কথা বলিয়াছেন; আর ঈশ্বরে অর্পিত বুদ্ধিতে ব্রহ্মে কর্ম্ম অর্পণ করিয়া কর্ম্মযোগ সাধনা দ্বারা প্রথম সত্বশুদ্ধি হয়,পরে জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়, ও শেষে সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস লাভ হইয়া পরিণামে মুক্তি হয়, ইহাও বলিয়াছেন। সম্প্রতি উক্ত সম্যগ্ দর্শনের যে অন্তরঙ্গ সাধন—ভগবান পতঞ্জলি-উক্ত যোগ, তাহারই বিষয় বলা হইতেছে (শঙ্কর)। প্রথম কর্ম্মযোগ উক্ত হইয়াছে; সম্প্রতি সকল যোগের সার যে ধ্যানযোগ তাহার বিষয় বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করা হইয়াছে (রামানুজ)।

দূর করি—অর্থাৎ বিষয়কে শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারে রাখিয়া, বিষয়ের কথা চিন্তা না করিয়া, বিষয়কে বুদ্ধিতে গ্রহণ না করিয়া; মন যদি আত্ম-ধ্যানে মগ্ন থাকে, তবে তখন তাহার বিষয় গ্রহণ

ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি সংযত যাহার,
ইচ্ছা ভয় ক্রোধহীন, মোক্ষপরায়ণ
মুনি যেই—সদা মুক্ত হয় হেন জন। ২৮

সম্ভব হয় না। একচিত্তে কোন বিষয় ভাবনা কালে আমরা চক্ষের উপরে যে বস্তু থাকে, তাহাও দেখিতে পাই না, তীব্র শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলেও তাহা শুনিতে পাই না। সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই এই কথা। যোগের মূল সূত্রই চিত্তবৃত্তি নিরোধ।

বেদান্ত মতে আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয় পথে বাহিরে গিয়া বিষয়ের আকার ধারণ করে। যোগে এই গতি-বন্ধ করিতে হয়। মধুসূদন বলেন, যোগ সিদ্ধির দুই উপায়—অভ্যাস ও বৈরাগ্য। প্রথমে যাহা বলা হইল, তাহা বৈরাগ্যের কথা। পরে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির করিবার কথা যেউক্ত হইয়াছে, উহাই অভ্যাসের কথা।

ভ্রূযুগ মাঝারে—যোগ শাস্ত্রমতে দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে দৃষ্টি স্থির করিয়া যোগাভ্যাস করিতে হয়। স্বামী বলিল, চক্ষু একেবারে মুদ্রিত করিলে নিদ্রা আইসে, আর উন্মিলিত রাখিলে বাহ্য বিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়া, তাহাতে চিত্ত আকর্ষিত হয়, চিত্তবিক্ষেপ হয়। এই জন্য ধ্যানকালে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিতে হয়। কেহ বলেন, এস্থলে আঁখি অর্থে দৃষ্টি শক্তিমাত্র। তন্ত্রমতে ভ্রূমধ্যে দ্বিদল পদ্ম ও তদুপরিস্থিত হরপার্ব্বতিকে ভাবনা করিতে হয়। যোগশাস্ত্রে আছে—

ভ্রুবো মধ্যে বর্ত্তুলঞ্চ ধ্যাত্বা জ্যোতিঃ প্রমুচ্যতে।

করিয়া সমান—(৪ অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) উচ্ছাস নিশ্বাসরূপ উর্দ্ধ ও অধঃশক্তি যুক্ত না-সিকা মধ্যে বিবরণকারী প্রাণাপান বায়ুকে কুম্ভক দ্বারা গতিরোধ করিয়া সমান করিতে হয়। (স্বামী)। এই নিশ্বাস প্রশ্বাস আমাদের একপ্রকার অন্তরায়। নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবল হইলে যে, তাহা আমাদের একমনে ভাবনার অন্তরায় হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। প্রাণায়মের এক অভিপ্রায় এই যে, যেন এই নিশ্বাস প্রশ্বাস এরূপ চিত্তবিক্ষেপের কারণ না হয়। এই জন্য স্বামী আরও বলিয়াছেন যে, যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস বেগ যুক্ত না হয়, অর্থাৎ যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস পড়িতেছে এরূপ বুঝা না যায়, এরূপ ভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে হয় যেন তাহা নাসিকার ভিতরেই বিচরণ করে। ইহারই নাম নিশ্বাস প্রশ্বাস সমান করা।

ভোক্তা আমি সমুদায় যজ্ঞ তপস্থার,
সর্ব্বলোক মহেশ্বর, সবার সুহৃদ্—
জানিয়া আমাকে শান্তি লভে সেই জন। ২৯

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

একাগ্রতা লাভের জন্য নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করা বা অতি মৃদু করা যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিবার অন্য প্রয়োজনও আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

মনের একাগ্রতা হইলে যে শ্বাস মৃদু হয়, তাহা আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন। তাহা এস্থলে বিস্তারিত উল্লেখের প্রয়োজন নাই। (Sully's Outlines of Psychology, p.83 দ্রষ্টব্য)

সংযুত—উক্তরূপ উপায়ে সংযম শিক্ষা হয় (মধু)

মোক্ষপরায়ণ—মোক্ষই পরম গতি যাহার(শঙ্কর), গতি—অর্থাৎ শেষ লক্ষ্য বা প্রাপ্য স্থান (স্বামী)। মোক্ষই একমাত্র প্রয়োজন যাহার (রামানুজ)।

সদা মুক্ত—মোক্ষের জন্য তাহার অন্য কর্ত্তব্য নাই (শঙ্কর)। জীবন্মুক্ত (স্বামী, মধু)। সাধ্য দশার ন্যায় সাধন দশায় ও মুক্ত (রামানুজ)।

(২৯) ভোক্তা—ভোগকর্ত্তা, পালক (স্বামী মধু)। আমি—অর্থাৎ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, সর্ব্বকর্ম্মফলাধ্যক্ষ সর্ব্ব প্রত্যয় সাক্ষী আমি নারায়ণ। (শঙ্কর,স্বামী মধু, রামানুজ)। এই স্থলে বুঝা যাইতেছে যে, ঈশ্বর প্রণিধান যোগ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মধুসূদন বলেন,(২৭—২৯) এই তিন শ্লোকে ধ্যান যোগের সূত্র মাত্র বলা হইয়াছে, এই যোগ ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। এই তিন শ্লোক মধ্যে প্রথম দুই শ্লোকে যোগ কাহাকে বলে বুঝান হইয়াছে, তৃতীয় শ্লোকে যোগ ফল পরমাত্মজ্ঞান যে বিবেক, তাহাই উক্ত হইয়াছে।

এস্থলে আপাততঃ বোধ হয় যে যিনি সদামুক্ত ও শান্তিলাভ করিয়াছেন,তিনি সগুণ পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন,ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই ধ্যান দ্বারা যে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞান লাভ হয়, তাহা উল্লিখিত হয় নাই। এজন্য রামানুজ এই শেষ শ্লোকের সহিত উপরের দুই শ্লোকের সম্বন্ধ থাকা স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, কর্ম্মযোগের যাহা সার বা মস্তিষ্ক তাহাই এখানে বলা হইয়াছে। রামানুজের মতে শেষ শ্লোকের অর্থ এই যে নারায়ণকে জানিয়া, তাঁহার আরাধনারূপ কর্ম্মযোগে সুখে প্রবৃত্ত হইলে শান্তিলাভ হয়।

শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন বলেন,এস্থলে নারায়ণ অর্থে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম—সগুণ ঈশ্বর নহে। কিন্তু ঐ অর্থ করিলেও এস্থলে উল্লিখিত জ্ঞান যে অদ্বৈত জ্ঞান, তাহা ঠিক বলা যায় না।

রামকৃষ্ণাবতার ও ব্রাহ্মসমাজ

বীর-পূজা মনুষ্যের স্বভাব। শুধু মনুষ্যের স্বভাব কেন ? জীব জগতের সর্ব্বত্রই শ্রেষ্ঠের সম্মান ও ক্ষমবানের পূজা দেখিতে পাওয়া যায় ; সিংহ পশুরাজ, মৌমাছির রাণী আছে, বানর পালেরও গোদা আছে। এ স্বভাব কিছুতেই দোষের নহে, বরং ইহার অভাবে অনেক স্থলে অনেক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে ; এবং যে জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বীর-পূজার ভাব একেবারেই নাই বা খুব কম, নিশ্চয় জানিতে হইবে, তাহারা সেই পরিমাণে নৈতিক জীবনে অবনত। তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ আমাদের দেশ, যেখানে লোকের নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা অতি বিরল। দশ জনের সমক্ষে প্রাণ ভরিয়া কাহারও প্রতিষ্ঠা করা আমাদের দেশ হইতে এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদি কোন ব্যক্তি সাহসে বুক বাঁধিয়া কোন মজলিসে কাহারও ষোল-আনা প্রশংসা করিতে দণ্ডায়মান হন, আর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বাস্তবিকই যদি সম্পূর্ণরূপে তাহার যোগ্য হন, তত্রাচ তাঁহার প্রশংসা শুনিলে অন্ততঃ দুই চারি

জন সেই প্রশংসাকে যথাসাধ্য খাটো করিবার জন্য তাহাতে বেশ গোছাল ভাবে "কিন্তু" লাগাইয়া তাঁহার দুই একটী সামান্য ক্রটীকে অতিরঞ্জিত করতঃ প্রতিষ্ঠাতাকে লজ্জা দিতে সমূহ চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারেন না। ছিদ্রানুসন্ধান রূপ অতি নীচবৃত্তি আমাদের মধ্যে এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, কাহারও ষোলআনা প্রশংসা আমরা সহ্য করিতে পারি না। প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির যদি দুই একটী সামান্য দোষও থাকে, তাহা উপেক্ষা করাই ধর্ম্ম, কিন্তু সে ধর্ম্ম হইতে আমরা বহু দিন বঞ্চিত হইয়াছি। ক্ষীরগ্রাহী মরালের ন্যায় দোষ ভাগের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল-অবশ্য-অনুকরণীয় গুণভাগের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করাই উচ্চ বৃত্তি। কেবল স্বজাতি মনুষ্য সম্বন্ধে আমাদের এই কোপ নহে, ক্রমে ঐ কুস্বভাব এতদূর ঘৃণিত অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে, কাহারও কোন ভাল জিনিস দেখিলেও তাহার প্রশংসা করা দূরে থাকুক, কোন প্রকারে তাহার একটু খুঁত বাহির না করিতে পারিলে যেন বড়ই ব্যথা পাই। এ বিষয়ে ইউরোপ বিশেষ ইংলণ্ড অতি উচ্চ, যাহা কিছু তুমি কাহাকেও দেখাইবে, হাতের লেখাই হউক, রচনাই হউক, শিল্প কার্য্যই হউক বা কোন জিনিসই হউক, তিনি অম্লান বদনে মুক্তকণ্ঠে "অতি উত্তম" "অতি উত্তম" দশ বার না বলিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। এমন কি, পরম শত্রুরও প্রশংসা শুনিলে অনায়াসে তাহাতে যোগ দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নন। আত্মীয় বোধে তোমার নিকট উৎসাহ পাইব আশা করিয়া, যেটা আমি আনন্দের সহিত তোমাকে দেখাইতেছি, সেটার উল্টা নিন্দা করা বা দোষ দেখান নিতান্তই হীন অর্ব্বাচীনের কাজ, সন্দেহ নাই।

এই খানে একটী ঘটনা মনে পড়িল, সেটী না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বিশেষ উদাহরণ দ্বারা আমার কথাটা পরিস্ফুট হইবে, সুতরাং বলা প্রয়োজন। খুব ভালবাসিয়া কোন বন্ধু আমাদিগকে দুইটী অতি সুন্দর কুকুর উপহার দেন। বিশেষ প্রণয় স্থল ব্যতীত ওরূপ জিনিস কেহ কাহাকে দিতে পারে না, এমনই সুন্দর দুটী কুকুর। উহারা আমাদের ঘরে আসার পর দিন দৈববশতঃ তিন জন ইংরেজ-মহিলা ও এক জন ইংরেজ পুরুষ ক্রমান্বয়ে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। প্রত্যেকেই কুকুর দুটীকে দেখিয়া "অতি সুন্দর" "অতি সুন্দর" "এরূপ সুন্দর কুকুর কম দেখা যায়" ইত্যাদি নানা প্রকার প্রশংসা করিয়া গেলেন। তাহার পর দিন মেমের পোষাক-পরা মাতৃ ভাষা-বিস্মৃতা ভালরূপ ইংরাজী ভাষা-শিক্ষিতা এক জন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি-খ্রীষ্টান রমণী আসিলেন। যেমন সাহেব মেমদিগকে দেখাইয়া উৎসাহ পাইয়াছেন, সেই ভাবে আনন্দের সহিত গৃহিণী ইঁহাকেও কুকুর দুটী দেখাইতে গেলেন। তিনি কোনই কথা কহিলেন না, দেখিয়া গিন্নি কিছু ক্ষুব্ধা হইয়া বলিলেন, "কল্য অমুক অমুক সাহেব মেম আসিয়া ইহাদিগকে দেখিয়া খুব প্রশংসা করিয়া গেলেন, আপনি কৈ কিছু বলিলেন না?" তদুত্তরে কি শুনিলেন, পাঠকগণ শুনুন—"আমারও খুব ভাল ভাল ইহাদের অপেক্ষা সুন্দর কুকুর ছিল। কুকুর পোষা বড় ঝঞ্ঝাট বলিয়া আমি আর কুকুর রাখি না।" শুনিলেন, কুকুরের কথা, তার পরের কথোপকথন শুনুন :—

আগন্তুক—আপনার ছেলে কেমন পড়া শুনা করিতেছে?

গৃহিণী—এবারকার পরীক্ষায় দ্বিতীয় হইয়াছে।

আ—ক্লাশে বুঝি চারি পাঁচ জন ছেলে?

গৃ—না চল্লিশ পঞ্চাশ জন।

তাহাতে বিশ্বাস হইল না, বালককে ডাকাইয়া ক্লাশে কত ছেলে জিজ্ঞাসা করিয়া তখন একটু দুঃখিত হইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

এই গল্প আমাকে শুনাইয়া গৃহিণী বলিলেন, "শুধু মেমের পোষাক পরিলেই হয় না, মেমের মত আক্কেল হইতে বাঙ্গালীর মেয়েদের অনেক দেরি।" তাই আমিও বলি, হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা আমাদের এরূপ ভাবে মজ্জাগত হইয়াছে যে, সহজে উহাদের হাত এড়ান কঠিন। এমন কি, বিলাতে বাল্যাবধি শিক্ষিত আজ কাল মহা-নামজাদা হোম্‌রা চোম্‌রা "ভারতোদ্ধার-কারী" "স্বজাতি-বৎসল" দুই এক ভায়াকে এ বিষয়ে ঐ খ্রীষ্টান রমণী অপেক্ষা বহু নিকৃষ্ট ভাবাপন্ন প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

এই ত গেল এক দিকের ভাব, এখন অপর দিকে দেখা যাউক। সব দিকেই বিজাতীয় বিট্‌কেল দৃশ্য।

যেমন বীর-পূজা বাস্তবিকই একটী সদ্‌গুণ, এবং শিক্ষিত জীবের পক্ষে একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য, তেমনি পূজার্হ বীরকে ঈশ্বরের আসনে বসাইয়া ঈশ্বরোচিত অর্চ্চনা প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য ও অশিক্ষিতের কার্য্য। এস্থলে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, খ্রীষ্টীয় জগতের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে ত এই দোষে দোষী, তবে কি তাঁহারাও অশিক্ষিত? ব্যক্তি বিশেষের মুখাপেক্ষা না করিয়া এরূপ প্রশ্নের এই উত্তর দিতে বাধ্য যে, তাঁহারা অন্যান্য বিষয়ে সমধিক পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও পুরুষপরম্পরাগত মত-বিশ্বাসে অন্ধ বিশ্বাসী হইয়া ঐ অংশটুকুতে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, সন্দেহ নাই। মহা পণ্ডিত বা জ্ঞানী বলিয়া তিনি যে সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ জীব, ইহা ত কথা নয়। অনেক পণ্ডিত অনেক বিষয়ে বিশেষ খাটো, তাহার বিস্তর উদাহরণ আছে; এ স্থলে একটী মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। ক্রমবিকাশের অবতার স্বরূপ জগদ্বিখ্যাত মহামতি দার্ব্বিণ অনেক বিষয়ে উজ্জ্বল প্রতিভাশালী হইয়াও গীত বাদ্য সম্বন্ধে একেবারে অর্ব্বাচীন ছিলেন। সঙ্গীতরসে তিনি এতদূর বঞ্চিত ছিলেন যে, কখন ঐ পবিত্র রসের কণামাত্রও আস্বাদন করিতে সক্ষম হন নাই; বরং যেখানে গীত বাদ্যের আলোচনা হইত, সেখানে থাকিতে তিনি অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতেন। এইরূপ ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্বন্ধেও অনেক প্রতিভাশালী জীবগণের মস্তিষ্ক কিছু মাত্র বিকশিত হয় নাই। যিনি যে বিষয়ে বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন, সেই বিষয়েই তাঁহার কথা গ্রাহ্য, এবং তাঁহার উপদেশ অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে, যে দিকে তাঁহার মতি বুদ্ধির বিকাশ হয় নাই, তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিলে তাঁহাকে কিছু মাত্র অবমাননা করা হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে যে বীর-পূজা ঈশ্বর পূজায় পরিণত হইয়াছে, তাহা যে ঐ ভাবে অধিক কাল চলিতে পারে, এমন বিশ্বাস কখনই করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও উচিত নহে। যে কয় দিন চলিতেছে, সেই কয়দিনে

যে ক্ষতির সম্ভাবনা, তাহার পথ অবরোধ করা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। এবং কেবল মাত্র সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা করিতে বাধ্য হইলাম। যদি ইহার দ্বারা কাহারও মনে কোনরূপ দুঃখ উৎপাদন করি, তিনি "লোকটা বুঝিতে পারে নাই'' বলিয়া অনায়াসে ক্ষমা করিতে পারেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে প্রতিভাত এই উজ্জ্বল সময়ে যদি কেহ সরল যুক্তি দ্বারা এসম্বন্ধে সংসারকে বুঝাইতে পারেন, তাহা হইলে কেবল বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র পৃথিবী আজ তাঁহার পদানত হইবে, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণরূপী ভগবানকে অনন্ত দেশ ও অসীম কালের স্রষ্টা, পাতা, পরিত্রাতা বলিয়া স্বীকার করিবে।

আবহমান কাল ভারতের প্রধান মাহাত্ম্য এই যে, এখানে মধ্যে মধ্যে বীর-পূজার ধূম এতদূর গড়ায় যে,অতি সহজেই দেশীয় মহাজীবগণ ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। এই ঘোর কলিকালেও অবতারবাদের ঢেউ ভারতে কমে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র চিরকাল উপন্যাস নবন্যাস লিখিয়া কল্পনার রাজ্যে দিন কাটাইলেন। শেষটা তাঁহার সহপাঠী মহাত্মা কেশবচন্দ্রকে ধর্ম্মরাজ্যে উন্নত পদ লাভ করিতে দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, ধর্ম্ম চর্চ্চায় মনোনিবেশ করতঃ কতকগুলি বালোচিত অসার যুক্তি দ্বারা নন্দঘোষের পালক পুত্র শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বেশ্বরত্ব সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিয়া গেলেন। যখন জ্যোতির্ব্বিদ্যায় সমধিক উন্নতি হয় নাই, বিশ্বজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষ যখন নিতান্ত খাটো ছিল, এই ক্ষুদ্র পৃথিবী যখন মানুষের নিকট বিশ্বের কেন্দ্র-স্বরূপ সর্ব্বস্ব ছিল, তখনই অবতারবাদের সৃষ্টি। হট্‌কথাতে ভগবানকে তাঁহার অমূল্যনিধি পৃথিবীর রক্ষার্থ এখানে না নামিয়া আসিলে সংসার চলিত না। তারপর যখন জানা গেল যে,আমাদের এই পৃথিবী একটা ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর জিনিস, বিশ্বেশ্বরের বিশাল-রাজ্য ইহা অপেক্ষা কোটী কোটীগুণ বড় অসংখ্য অগণ্য পৃথিবীপূর্ণ, তখন মানুষের অবতারবাদ সম্বন্ধে মোহনিদ্রা অনেকটা ভাঙ্গিল। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা এবিষয়ে একটু একটু বুঝিতে পারিয়া অবতারবাদ সম্বন্ধে "অবতারাহ্য সংখ্যেয়া" বলিয়া কথাটা বেশ লঘু করিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া অবতারবাদীরাও পূর্ণাবতার ও অংশাবতার দুই শ্রেণী স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইলেন। শেষে এই দাঁড়াইল যে, যে সম্প্রদায়ের যিনি অবতার, অন্য সম্প্রদায়ের লোকের নিকট তিনি অংশাবতার হইলেও নিজ সম্প্রদায়ের নিকট পূর্ণাবতারের এক কড়াও কম নন। এই প্রকারে দেশে অনেকগুলি পূর্ণ,অনেকগুলি অংশাবতার সৃষ্ট হইলেন।

উনবিংশ শতাব্দী যায় যায় হইয়াছে, তবু আমরা অবতারবাদের ঝোক ছাড়িতে পারিতেছি না। অশিক্ষিত লোকদের নিকট ত অবতার চিরকালই আছে ও চিরকালই থাকিবে, কিন্তু শিক্ষাভিমানী মহোদয়গণ যে এখনও বিশ্বরাজকে লইয়া ছ কড়া ন কড়া করিতে চান, ইহাই আশ্চর্য্য ও ক্ষোভের বিষয়। কয়েক বৎসর হইতে স্বর্গীয় মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসকে লইয়া যেরূপ মাতা মাতি আরম্ভ হইয়াছে, তাহা দেখিয়া হর্ষ বিষাদ উভয়ই হইবার কথা। হর্ষ এইজন্য যে, এই ঘোর নাস্তিকতার সময়, মাগমাছের-ঝোল ও কোম্পানির-কাগজের রাজ্যে

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বিলাসী বাবুগণ টাকা-কড়ি-ধন-দৌলত-স্ত্রীর অলঙ্কার রূপ ইষ্ট মন্ত্র ভুলিয়া গিয়া,উজান ঠেলিয়া,যে ভাবেই হউক,ফকির ধর্ম্মবীরের মর্য্যাদা করিতেছেন, ইহা যারপর নাই সুখের বিষয়, সন্দেহ নাই। বিষাদ এইজন্য যে, শ্রদ্ধাভাজন পরমহংস মহাশয় জীবিতাবস্থায় যাহাতে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও ক্রুদ্ধ হইতেন, তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে তাহাই করিয়া সং সাজাইতেছেন। সশরীরে জনৈক শিষ্য একদিন তাঁহাকে বলে "প্রভু, আপনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম"। তদুত্তরে তিনি বলেন "হাঁ তা ত বটেই। পূর্ণব্রহ্ম না হইলে ঘায়ে পচিয়া মরিব কেন"? তখন একটা ফোড়ায় তিনি কষ্ট পাইতেছিলেন।

এখন পরমহংস ত ঈশ্বর হইয়াছেন, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু কথা এই যে, আমাদের সাক্ষাতে যখন দুই ব্যক্তি ঈশ্বরের গদি পাইবার যোগ্য হইয়া প্রকট হইলেন, তখন পাছে কালে কোন প্রকার ভাগা ভাগি জন্মে, এই জন্য চেষ্টা যে জগদ্বিখ্যাত যিনি, তাঁহাকে খাটো করিয়া পরমহংসের তাবেদার করিতে হইবে, নচেৎ তাঁহাকে ঈশ্বরের সিংহাসনে নির্ব্বিরোধে বসান যায় না। অতএব কেশবচন্দ্রকে এই-বেলা পরমহংসের শিষ্য এবং ব্রাহ্মসমাজটা পরমহংসের উপদেশের ছায়াতে গঠিত, এই সকল স্থির না করিলে আর চলে না। ইহা-রই চেষ্টায় রামকৃষ্ণভক্তগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই চেষ্টা এই সময়ে করাতে বিশেষ শুভ ফলের সম্ভাবনা; এবং তাহা জানিয়াই বিধাতা তাঁহাদিগকে উপযুক্ত সময়ে এই মতি দিয়াছেন। কারণ এখনও দুইজনের সমকালিক বহু সংখ্যক লোক জীবিত আছে,মীমাংসা হইতে বড় দেরি হইবে না; নতুবা আর পঞ্চাশ বৎসর পরে একথা উঠিলে,কে হারে,কে জিতে,ঠিক হওয়া কঠিন ছিল।- এই বেলা একটা লেখা পড়া হইয়া শাদার উপর কালির আঁচড় থাকিয়া-গেলে ভবিষ্যতে আর কোন প্রকার দ্বন্দের সম্ভাবনা থাকিবে না। আমরা কি ভয়ানক লোক! এই সে দিন দুইজনে তনুত্যাগ করিলেন, ইহারই মধ্যে কথাবার্ত্তার ভিতরে খুটিনাটী ধরিয়া এককে উভয়ের তলপেটা করিতে যত্নবান হইয়াছি।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস যাঁহাদের জীবনে প্রতিভাত, তাঁহারা যখন আমাদের সমক্ষে রহিয়াছেন, তখন গোলের কথা কি? আমরা কেশবের সঙ্গেও ফিরিয়াছি, পরম-হংসের সংসর্গও করিয়াছি, দুজনকেই বিল-ক্ষণ জানি, আমাদিগকে ধাঁধায় ফেলা সহজ নয়। কিন্তু যাঁহারা দু জনের কিছুই জানেন না, বা কেবলমাত্র এক জনের যৎসামান্য জানেন, তাঁহারাই নিজে গোল করিতেছেন, ও অপরকে গোলে ফেলিবার চেষ্টায় আছেন। কোন রামকৃষ্ণ ভক্ত হঠাৎ তাঁহার সম্বন্ধে একখানি ইংরাজী পুঁথি আমার নিকট পাঠাইয়া মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতে অনু-রোধ করিয়াছেন। মতলব এই যে, তাহা হইলে আমি তাঁহার সঙ্গে রামকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া স্বীকার করিতে আর দ্বিধা করিব না। পুস্তিকাখানি কোন "মিত্রের" দ্বারা প্রকাশিত। ইহাতে প্রতাপ বাবু,গিরীশ বাবু, চিরঞ্জীব শর্ম্মা ও স্বয়ং কেশবের নানা-প্রকার লেখা পড়া ও কথাবার্ত্তা দ্বারা সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা পাওয়া হইয়াছে যে, নববিধান পরমহংসেরই সৃষ্টি; কেশব তাঁহারই নিকট উপদেশ পাইয়া এই অভিনব তত্ত্ব সংসারে প্রচার করিতে সক্ষম হন। আদালতের

মকদ্দমার মত, পরস্পরের কথার বা এক জনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কথার খেলাপ ধরিয়া, আপীল ডিক্রী করাইবার বিলক্ষণ প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক কিছু কাল পরে এই সব তর্ক উঠিলে,মহা গোলের ব্যাপার দাঁড়াইবার কথা। দুই জনের জীবন অনেকের সমক্ষে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, কাজেই ওরূপ ওকালতী ফন্দিতে কেহ পড়িবে না। এখন দেখা যাউক, মিত্র মহাশয়ের ওকালতী সওয়াল জবাব কতদূর ঐতিহাসিক সত্যের পরীক্ষায় দাঁড়ায়।

ঈশ্বরের মাতৃভাব ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়া নববিধানের সৃষ্টি; এবং সেই মাতৃভাব সম্বন্ধীয় জ্ঞান পরমহংসের নিকট হইতে প্রাপ্ত; এ বিষয়ে মিত্র মহাশয় অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। মোটামুটি দেখিতে গেলে, তাঁহার চক্চকে প্রমাণে চমক্ লাগে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি "মা যাদের আনন্দময়ী, তারা কিসে নিরানন্দ" গানটী যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রথম প্রথম গীত হয়, তখন রামকৃষ্ণ কোথায়? এগান বোধ হয় ১৮৬৬ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রচিত হয়; আর কেশবের সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ ৺ জয়গোপাল সেনের বাগানে ১৮৭৬ সালে। সেই সময় হইতেই বিশেষ যত্নে রামকৃষ্ণ দেশে সুপরিচিত হন। এই প্রকারে কোলাহলের মধ্যে আনিয়া ফেলার জন্য কেশব কতবার রাম কৃষ্ণের দ্বারা মিষ্টভাবে তিরস্কৃত হন। "নিরিবিলে বেশ ছিলাম। তুমিই ত টানিয়া বাহির করিয়া এ গোলমালের মধ্যে ফেলিলে ইত্যাদি।"

নব-বিধানের সার্ব্বভৌমিকতাও রামকৃষ্ণ হইতে গৃহীত, এরূপ যুক্তি তর্কও প্রদর্শিত হইয়াছে। আদিসমাজ হইতে বাহির হইয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক শ্লোক সংগ্রহ প্রকাশিত হয়, যাহাতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, চীন, শিখ প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রতি সমান শ্রদ্ধা প্রকাশ করতঃ উপদেশ ও সত্য সংগৃহীত হয়। তখন রামকৃষ্ণ কোথায়? সার্ব্বভৌমিকতা সম্বন্ধে এক কড়াও ব্রাহ্মসমাজ রামকৃষ্ণের নিকট ঋণী নন। তবে মাতৃভাব পরিস্ফুট হওয়া ও হিন্দু দেবদেবীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাদি যাহা কেশবের শেষ কালের কাজ, তাহা অনেকটা রামকৃষ্ণের সহবাসের ফল, বোধ হয় এ কথা স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি নাই।

পুস্তকখানিতে যাহার যে কথা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সব ঠিক, কোনটাতেই কোন প্রকার গোল নাই, তবে মিত্র মহাশয় যে নিজের মতলব মত অর্থ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহাই আপত্তিজনক। রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জীবনে ব্যবহার ও বক্তৃতাদিতে তাঁহার গুণগান করিয়া সারগ্রাহী কেশব নিজের মহত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। বিনয় তাঁহার জীবনের একটা বিশেষ গুণ ছিল; লর্ড নর্থব্রুক পর্য্যন্ত একথা প্রকাশ্যভাবে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বদা বিনয়াবনত কেশব রামকৃষ্ণকে সকল সময় সম্মান দিয়া গিয়াছেন, এ জন্য রামকৃষ্ণকে তাঁহার ঘাড়ের উপর বসাইতে চেষ্টা করা নিতান্ত পাগলামী।

যাহা হউক, অনেক দোষ ত্রুটি থাকিলেও রামকৃষ্ণ একজন ঈশ্বরের প্রিয় সাধু পুরুষ ছিলেন। আর দোষ ত্রুটি কাহার না আছে? মানুষ অসম্পূর্ণ জীব, তাহার সকলই দোষ। এই দোষের হাটের মধ্যে যিনি অতগুণে ভূষিত, তিনি নিশ্চয়ই মহাজীব।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

লুৎফ উন্নেসা।

সংসার-মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশিতে মানবজীবন অভিভূত হইয়া পড়িলে একমাত্র স্নেহময়ী রমণীর সজীব করুণাধারাই তাহাকে শীতল করিয়া তুলে। ফল্গুগঙ্গার ন্যায় সে ধারা এই ভীষণ মরুভূমির তলে তলে নীরবে প্রবাহিত হয়, কেহ তাহাকে সহজে দেখিতে পায় না। কিন্তু যখনই দুর্ভাগ্যের প্রবল ঝটিকা, দুঃখ ও নিরাশার অগ্নিময় ধূলিরাশি উড়াইয়া জীবনকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করিতে থাকে, তখনই সেই স্বর্গীয় ধারা শত মন্দাকিনীর ন্যায় ছুটিতে আরম্ভ করে, এবং অধঃপতিত মানব আত্মাকে কারুণ্য-সলিলে স্নিগ্ধ করিয়া শান্তির চির আবেশময় মোহন ক্রোড়ে ঘুম পাড়াইয়া রাখে। তাহার বিন্দুপাতে কত কত বিশুষ্ক জীবন সজীবতা লাভ করিয়াছে, কত শত ভগ্ন-হৃদয় তাপাগ্নির বিভীষিকাময়ী শিখা হইতে নিস্তার পাইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। যে স্থানে একবার সে ধারা বহিয়াছে, সেই স্থান কোমলতার পবিত্র বারিতে সিক্ত হইয়া গিয়াছে, এবং তথায় প্রীতির চির শ্যামল কুসুম-লতিকা অঙ্কুরিত হইয়া ত্রিদিব সৌরভ দিগন্ত আমোদিত করিয়াছে। যে স্থানে তাহার বিন্দু ক্ষরণ হয় নাই, সে স্থান চির মরুভূমি—চিরম্লান, শোক তাপ চিরদিনের জন্য তাহাকে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সংসারের ধূলিমাখা দগ্ধজীবনকে স্নিগ্ধ করিতে হইলে, এই মন্দাকিনী ধারায় অবগাহন ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

বাস্তবিক নারীহৃদয়ের স্নেহরাশিই ক্ষত বিক্ষত মানবজীবনের একমাত্র মহৌষধ। যখন মনুষ্য দুর্ভাগ্যের ভীষণ আবর্তে নিপতিত হইয়া ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত হইতে থাকে, তখন করুণাময়ী রমণীই বাহু বাড়াইয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লয়, এবং দুর্ভেদ্য কবচের ন্যায় আচ্ছাদন করিয়া নিজ বক্ষে সমস্ত আঘাত সহ্য করে। যেখানে ভূত বিপদ অভ্রভেদী পর্ব্বত হইতে শ্লথ পাষাণরাজির ন্যায় অবিরত বিচ্যুত হইতে আরম্ভ হয়, সেইখানে রমণী অগ্রসর হইয়া আপনার হৃদয় পাতিয়া দেয়, শিরীষ-কুসুম পেলব সে হৃদয় দলিত ও নিষ্পেষিত হইলেও তাহার বিন্দুমাত্র ক্লান্তির অনুভব হয় না। রমণীহৃদয়ের এইরূপ বিস্ময়করী দৃঢ়তা সংসারের অগ্নিপরীক্ষা ব্যতীত অন্য সময়ে বুঝা যায় না। যাহারা চিরদিন সৌভাগ্যের মোহিনী দোলায় অঙ্গ ঢালিয়া সুখের স্বপনে দিন কাটাইয়াছে, তাহারা রমণী হৃদয়ের গভীরতা বুঝিতে পারিবে না; কিন্তু যাহারা চির বিপদকে সহচর করিয়া জগতীতলে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহারাই ইহা বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে। যে হৃদয় সৌভাগ্য সময়ে নবনীত-কোমল বলিয়া বোধ হয়, এবং অত্যল্প উত্তাপেই দ্রবীভূত হইবার সম্ভাবনা, দুর্ভাগ্যের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় না জানি কি শক্তিবলে তাহা পাষাণ অপেক্ষাও দৃঢ় হইয়া উঠে, এবং তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায় উত্থিত বিপদরাশির অসহনীয় আঘাত প্রত্যাহত করিয়া দূর দূরান্তরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। যতবার কেন যে পরীক্ষা হউক না, প্রত্যেক পরীক্ষায় তাহার দৃঢ়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেই থাকে। নারী হৃদয়ের এরূপ রহস্য যে বিস্ময়কর, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, উভয়েরই উপকরণ লইয়া

নারী হৃদয় গঠিত। যাঁহারা তন্ন তন্ন রূপে নারীহৃদয় অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, নারীর অর্দ্ধেক হৃদয় সংসারের ক্ষণস্থায়ী মোহ ও চাঞ্চল্যে বিজড়িত, কিন্তু অপরার্দ্ধ ত্রিদিব-সুলভ অক্ষয় স্নেহ ও কারুণ্যে পরিপূর্ণ। তাহার একধারে পৃথিবীর ছায়াময়ী ছেলে খেলা শারদাকাশের চিত্র বিচিত্র মেঘচূর্ণের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়, অন্যধারে অপার্থিব আত্মত্যাগ ও সহিষ্ণুতা উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ আলোকে বিশ্বকে চিরপ্রভাময় করিয়া রাখে। নারীহৃদয়রূপ কুসুমিত কাননের একদিকে মল্লিকা কামিনী প্রভৃতি ফুলরাশি ফুটিতে না ফুটিতে ঝরিয়া পড়ে, অন্যদিকে চিরসুরভি পারিজাত অনন্তকাল ধরিয়া সমীর-প্রবাহের প্রত্যেক পরমাণু অধিবাসিত করিতে থাকে। এই দুই ভাবের সুন্দর সামঞ্জস্য টুকু বুঝিতে পারিলেই প্রকৃত রমণীহৃদয় বুঝা যায়। যুগপথ এই দুইভাবের বিকাশ কখন ঘটিয়া উঠে না। যে সময়ে মনুষ্য বিলাসলালসায় বিভোর হইয়া রমণীহৃদয় দেখিতে ইচ্ছা করে, সে সময়ে কেবল ইহার পার্থিব ভাবই দেখিতে পায়, কিন্তু ইহার স্বর্গীয় সৌরভের আঘ্রাণ করিতে হইলে দুঃখ ও নিরাশার মহাশূন্য পথে জীবনকে ছুটাইয়া দিতে হয়। তীরে বসিয়া কেবল সমুদ্রলহরীর লীলা-চাঞ্চল্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রত্ন সংগ্রহ করিতে হইলে, তাহার সুগভীর অন্তস্তলে প্রবেশ করাই কর্ত্তব্য। কষ্ট স্বীকার ব্যতীত কে কবে রত্নরাজি-বিকীর্ণ-স্নিগ্ধ-জ্যোতির্ম্ময়ী সাগরগভীরতা বুঝিতে পারিয়াছে?

নারী হৃদয়ের এই স্বর্গীয় ভাবে জগতের সর্ব্বজাতির সাহিত্য অলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে, কেবল সাহিত্য উপন্যাস নহে, ইতিহাসও ইহাকে সমাদরে নিজবক্ষে স্থান দিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই স্বর্গীয় ভাবের একটী ছায়া মাত্র প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ইহা কল্পনা-প্রসূত নহে, প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব। বঙ্গবাসীর মধ্যে সিরাজ-উদ্দৌলার নাম কাহারও অবিদিত নাই, আমরা যাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করিতে উপস্থিত, তিনি সেই নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার প্রিয়তমা মহিষী লুৎফ উন্নেসা।* লুৎফ উন্নেসা মানবী হইয়াও দেবী, তাঁহার সেই পবিত্র দেবভাবে হতভাগ্য সিরাজ আপনার তাপ-দগ্ধ জীবনে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন, লুৎফ উন্নেসা ছায়ার ন্যায় সিরাজের অনুবর্ত্তন করিতেন; কি সম্পদে কি বিপদে, লুৎফ উন্নেসা কখনও সিরাজকে পরিত্যাগ করেন নাই। যখন সিরাজ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার যুবরাজ হইয়া আমোদতরঙ্গে গা ঢালিয়া দিতেন, তখনও লুৎফউন্নেসা তাঁহার সহচরী, আবার যখন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তেজোহীন-আভাহীন-কক্ষ-চ্যুত গ্রহের ন্যায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তখনও লুৎফউন্নেসা তাহারই অনুবর্ত্তিনী। যখন, ষড়যন্ত্রকারিগণের ভীষণ চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া, সিরাজ পলাশীর রণক্ষেত্রে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া সাধের মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তখন তাঁহার আকুল আহ্বানে ও মর্ম্মভেদী অনুনয়ে কেহই অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করে নাই, কেবল সেই দেবহৃদয়া লুৎফউন্নেসা আপনার জীবনকে অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া, শত বিপদ মাথায় লইয়াও সিরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। নিদাঘের

* লুৎফ—ভালবাসা, নেসা—স্ত্রী। লুৎফউন্নেসা—প্রিয়তমা স্ত্রী।

প্রখর রৌদ্রে, বর্ষার দারুণ বর্ষণ, পদ্মার উত্তাল তরঙ্গমালা কিছুতেই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই। যাঁহার আদরে আদরিণী হইয়া লুৎফউন্নেসা মহিষী পদবাচ্যা হইয়াছিলেন, তাঁহারই জন্য তিনি আপনার জীবনকে উৎসর্গীকৃত করেন; যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার পবিত্র দেহ পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত স্বামীর কল্যাণ সম্পাদন ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে তিনি আপনাকে নিযুক্ত করেন নাই। স্বামীর দেহত্যাগের পরও তাঁহার জীবন তাঁহারই পরকালের কল্যাণোদ্দেশেই সমর্পিত হয়। মাতামহের স্নেহলালিত সুখস্বপ্নে বিভোর সিরাজ নিজ সৌভাগ্য সময়ে লুৎফউন্নেসার হৃদয়ের গভীরতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা, জানি না, কিন্তু শেষ জীবনে রাজ্যহারা, সিংহাসন-হারা হইয়া যখন ভিখারীর ন্যায় বিচরণ করিতে বাধ্য হন, তখন যে তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয়, লুৎফ উন্নেসার একটীও ধারাবাহিক চিত্র পাওয়া যায় না। আমরা তাঁহারা জীবনের দুই একটী ঘটনা সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেছি, ইহা হইতে তাঁহার চরিত্রের কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। সিরাজের জীবনের সহিত যাঁহার জীবন চির-বিজড়িত, তাঁহার কথঞ্চিৎ বিবরণ সকলের জানা আবশ্যক, এই জন্য আমরা এরূপ প্রয়াস পাইতেছি।

লুৎফ উন্নেসা কোন উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তিনি বাল্যকাল হইতে ক্রীতদাসীরূপে * নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সংসারে প্রবিষ্ট হন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁহার অপূর্ব্ব রূপের ছটা বিকীর্ণ হইতে লাগিল, তখন তিনি যুবরাজ সিরাজের হৃদয় রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। কেবল যে তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি সিরাজকে মুগ্ধ করিয়াছিল, এমন নহে, তাঁহার সুকোমল স্বভাবই সিরাজকে ভালবাসিতে শিখায়। যৌবনের উদ্দাম তরঙ্গে ভাসমান, বিলাসের ক্রীড়াপুত্তল সিরাজের মনে কখনও প্রণয়ের ছায়া মাত্র পড়িবে, ইহাও অনেকের নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকই সিরাজ লুৎফ উন্নেসার প্রতি যথার্থ ভালবাসা দেখাইয়াছিলেন। সিরাজকে সচরাচর ইতিহাসে যেরূপ চিত্রিত দেখিতে পাই, তাঁহার চরিত্র যে সেরূপ ভয়াবহ ছিল, তদ্বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যৌবনের প্রারম্ভে সাধারণতঃ ঐশ্বর্য্যশালী লোকের সন্তানগণ যেরূপ বিকৃত হয়, সিরাজেরও সেইরূপ বিকৃতি ঘটিয়াছিল, কিন্তু জানা আবশ্যক যে, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যাঁহারা সিরাজকে আলিবর্দ্দির "আলালের ঘরের দুলাল" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পান, তাঁহারা অনেক সময়ে ভ্রমে পতিত হন। আমরা স্থানান্তরে ইহার প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইব। একটা কথা বলিয়া রাখি, বাঙ্গলা ইতিহাসে, সিরাজকে সিংহাসন আরোহণ সময়েও যে ঘোরতর

* মুল সায়র মুতাক্ষরীণে লুৎফ উন্নেসাকে সিরাজের "জারিয়া" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (মুল মুতাক্ষরীণ, ৮২পৃ) জারিয়া শব্দে ক্রীতদাসী বুঝায়; কিন্তু জারিয়াগণ নিতান্ত হীনভাবের দাসী নহে। তাহারা যে সংসারে প্রবিষ্ট হয়, তাহার মধ্যে কেহ ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে পারেন। মুতাক্ষরীণের ইংরেজী অনুবাদক জারিয়াকে bond-maid বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, (Mutaqherin Eng. Trans. Vol I. P. 614.

মদ্যপায়ী বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহার কোনও মূল নাই। সিরাজ যৌবনারম্ভে মদ্যপান আরম্ভ করেন সত্য, কিন্তু আলিবর্দ্দি মৃত্যুশয্যায় সিরাজকে কোরাণ স্পর্শ করিয়া ভবিষ্যতে মদ্যপান না করিতে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন, এবং সিরাজ যতদিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, ততদিন মাতামহের সেই অমর অনুরোধ রক্ষা করিতে ক্রটি করেন নাই। * যাহা হউক, এ বিষয় লইয়া এক্ষণে অধিক আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। সিরাজ আলিবর্দ্দির বিশেষ দৃষ্টিসত্বেও যে যৌবন-লালসার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই, একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বিলাসের তরঙ্গ যখন তাঁহাকে ভাসাইতে আরম্ভ করে, সেই সময়ে তিনি লুৎফ উন্নেসার পবিত্র মূর্ত্তি নিজ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। লুৎফ উন্নেসাকে প্রণয়িনীরূপে স্বীকার করিয়া যখন তিনি তাঁহার অগাধ ভালবাসার আস্বাদ পাইতে লাগিলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন যে, রমণী বিলাসের সামগ্রী নহে, ভালবাসার সামগ্রী, তাই তাঁহার ভালবাসা স্রোতস্বিনী লুৎফ উন্নেসার দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে বিলাসমুগ্ধ হইয়া সিরাজ লুৎফ উন্নেসাকে বুঝিতে পারিতেন না, কিন্তু শেষ জীবনে যে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। লুৎফ উন্নেসার অগাধ স্নেহ ও পবিত্র স্বভাব অন্যান্য সকল বিষয় হইতে সিরাজের মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিল। লুৎফ উন্নেসার ভালবাসায় তিনি এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ক্ষণমাত্র ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। বিপদে সম্পদে, সকল সময়ে লুৎফউন্নেসাকে না পাইলে তাঁহার হৃদয় শান্ত হইত না। বাস্তবিক, রমণীর প্রকৃত ভালবাসা যদি কাহারও অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার হৃদয় যেরূপ হউক না কেন, তাহাও স্নেহপ্রবণ হইয়া উঠে।

লুৎফ উন্নেসার প্রতি সিরাজের অধিকতর ভালবাসার আর একটী কারণ ছিল। সিরাজ কোন একটী রমণীর সৌন্দর্য্যতরঙ্গে একবার আপনাকে ভাসাইয়াছিলেন। রূপে পাগল হইয়া যাহাকে তিনি হৃদয়ে স্থান দান করেন, সে কিন্তু ঘোর বিশ্বাসঘাতকতায় তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া দেয়। এই রমণীর নাম ফৈজী বা ফয়জান, * সিরাজের প্রিয় ও বিশ্বাসী সেনাপতি মোহনলালের ভগিনী। ফৈজী দিল্লীতি নর্ত্তকীর ব্যবসায়ে জীবনাতিবাহিত

* "I have before mentioned Surajah Dowla, as giving to hard-drinking; but Allyverde, in his last illness, foreseeing the ill consequences of his excess, obliged him to swear on the Koran, never more to touch any intoxicating liquor; which he ever after strictly observed." (An enquiry into our National conduct to other countries. Chap. II. P. 32. ১ ইহা একজন ইংরেজের কথা, দেশীয়ের নহে।

* অনেকে বলিয়া থাকেন যে, লুৎফ উন্নেসাই মোহনলালের ভগিনী। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের দেওয়ান ফজলে রব্বীও বাহাদুরেরও এইমত। বেভারিজ সাহেবও লিখিয়াছেন যে, তিনিও এইরূপ শুত হইয়াছেন, সম্ভবতঃ তিনিও মহাত্মা ফজলে রব্বীর নিকট শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু সায়র মুতাক্ষরীণের অনুবাদক মুস্তাফা সে গোলযোগ মিটাইয়া দিয়াছেন। তিনি মুতাক্ষরীণের ইংরেজী অনুবাদের প্রথম খণ্ডের ৬১৪ পৃষ্ঠায় লুৎফ উন্নেসার টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন:—

"This lady is now (1789) living at Moorshidabad. * * * * She must not be confounded with Faizy or Faizen, another favourite of Seradjeddowlah's &c.

তাহার পর তাহার কৃশাঙ্গ প্রভৃতির বিষয় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ৭১৭ পৃষ্ঠায় মোহনলালের টিপ্পনীতে তাঁহার ভগিনীর বর্ণনায় তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং উভয় স্থলেই তাহার জীবন্তে গৃহাবন্ধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

করিত। * তাহার অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। মুর্শিদাবাদে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, তৎকালে ফৈজীর ন্যায় সুন্দরী সমগ্র ভারতবর্ষে দৃষ্ট হইত না। তাহার উত্তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ, তরঙ্গ ও মন্থর-গমনে অনেককে মোহিত করিয়া ফেলিত, সর্ব্বাপেক্ষা তাহার কৃশাঙ্গিত্বের অধিক প্রশংসা ছিল। † ফৈজীর অপ্সরাবিনিন্দিত রূপরাশির কথা সিরাজের কর্ণগোচর হইলে, সিরাজ লক্ষ মুদ্রা সমর্পণ করিয়া বহু অনুনয় বিনয়ে তাহাকে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করেন। ‡ এবং নিজ অন্তঃপুরবাসিনীগণের অন্তর্ভূত করিয়া লন। ফৈজীর সেই উন্মাদয়িত্রী রূপসুধা পান করিয়া সিরাজ অধীর হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তাহাতে যে ভীষণ

* যাঁহারা মোহনলালকে বাঙ্গালী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনুমানে আস্থা স্থাপন করা যায় না। যখন ফৈজীকে মোহনলালের ভগিনী বলিয়া স্পষ্টই স্থির করা হইতেছে, তখন এ সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাঁহার ভগিনী বাঙ্গালী রমণী হইলে, নর্ত্তকীর ব্যবসায়ের জন্য দিল্লীতে গমন করা কেমন কেমন বোধ হয়। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের সময় যে সমস্ত বাঙ্গালী উচ্চ পদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বাসস্থানের ও তদ্বংশীয়গণের আজিও নির্দ্দেশ করা যায়, কিন্তু মোহনলাল সম্বন্ধে কিছুই পাওয়া যায় না। রিয়াজু সালাতীন নামক গ্রন্থে মোহনলালকে কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তজ্জন্যই বোধ হয় তাহাকে বাঙ্গালী অনুমান করা হয়।

† এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ফৈজী ওজনে ২২ সের মাত্র ছিল। মুতাক্ষরীণের ইংরেজী অনুবাদে এইরূপ লিখিত আছেঃ—

"When she ate *Paan*, you might have seen through her skin the colored liquor run down her throat: and she was so delicate, as to weight only twenty two seers. মুস্তাফা ইহার অনেকগুলি চিত্র বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। (Mutaqherin Eng. Trans. Vol. I, P. 717 also pp. 614-15.)"

‡ ইংরেজী ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মোহনলাল তাঁহার ভগিনীকে উপহার দিয়া সিরাজ-উদ্দৌলার অনুগ্রহভাজন হয়েন। কিন্তু সে কথা সঙ্গত নহে। মুস্তাফা মুতাক্ষরীণের ইংরেজী অনুবাদের ৭১৭ পৃষ্ঠার foot note এ লিখিয়াছেনঃ—

"This Mohanlal had made a present of his sister to Seradj-eddowlah."

ইহার উপর নির্ভর করিয়া বোধ হয় ঐতিহাসিকগণের উক্ত কথা বলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সে কথা ঠিক নহে, মোহনলাল তাঁহার ভগিনীকে সমর্পণ করেন নাই, সিরাজ তাহাকে বহু অনুনয় বিনয়ে দিল্লী হইতে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করেন। মুস্তাফা নিজেই আবার একথা লিখিয়াছেনঃ—

"This last (Faizy) had been a Kuechni at Delhi, that is, a dance-girl, from whence *her attendance had been supplicated* (and this was the expression used), at the Court of Moorshidabad, (her......attendance are in Italics). the request being accompanied by no less than a draught of one lac of rupees. (P. 614 Foot-note.)

সিরাজই ফৈজীর রূপের কথা শুনিয়া তাহাকে মুর্শিদাবাদে আনিয়াছিলেন। মোহনলাল স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিজ ভগিনীকে উপহার দিবার জন্য সিরাজের নিকট উপস্থিত হন নাই। তিনি সিরাজের প্রিয়পাত্র হইবার লোভে প্রাকৃত জনের ন্যায় আপনার ভগিনীকে সমর্পণ করেন নাই। তাঁহার ভগিনী নর্ত্তকীর ব্যবসায় করিত, এবং সেই সূত্রে সিরাজ তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হন। যদিও নিজের ভগিনীর জন্য সিরাজের সহিত মোহনলালের পরিচয় হওয়া সত্য, তথাপি মোহনলাল আপনার ক্ষমতা ও গুণপনার জন্য সিরাজের প্রিয় পাত্র হন, নিজ ভগিনীকে ডালি দিয়া নহে। ফৈজীর জীবন্তে গৃহাবদ্ধের পরও মোহনলাল সিরাজের অত্যন্ত বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। ভগিনীর সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘুচে নাই। মোহনলাল ভগিনীকে ডালি দিলে, ফৈজীর কুব্যবহারের পর সিরাজ যে মোহনলালকে অক্ষত রাখিতেন, বলিয়া বোধ হয় না। মুস্তাফার made a present শব্দে ডালি দেওয়া অর্থ না করাই ভাল। অথবা তিনিও সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই।

হলাহলের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা তিনি প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। যদিও সিরাজের অনুপম সৌন্দর্য্য অনেক রমণীর মনপ্রাণ হরণ করিতে পারিত, কিন্তু তাহাও ফৈজীর হৃদয়কে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ফৈজী সিরাজের ভগিনীপতি সৈয়দ মহম্মদ খাঁর প্রেমে পতিত হয়। সৈয়দ মহম্মদ খাঁ ইউরোপীয়দিগের ন্যায় সুন্দর ও বলিষ্ঠ-গঠন ছিলেন, ফৈজী গোপনভাবে তাঁহাকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া যায়। দুই দিবস পরে এই গুপ্ত প্রণয়ের কথা সিরাজের কর্ণগোচর হইলে, তাঁহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। দুঃখে ও ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া তিনি ফৈজীর নিকট উপস্থিত হইলেন, সিরাজের মূর্ত্তি দেখিয়া ফৈজী জীবনের আশা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। সিরাজ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন যে,"আমি দেখিতেছি,তুমি যথার্থই বারাঙ্গনা।" ফৈজী আপনার জীবনে হতাশ হইয়া উত্তর করিল, "জাঁহাপনা, আমার ব্যবসায় তাহাই, এইরূপ তিরস্কার আপনার জননীর প্রতি প্রয়োগ করিলে শোভা পাইত।"* জননীর প্রতি এইরূপ তিরস্কার শুনিয়া সিরাজ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, এবং তাহাকে একটী প্রকোষ্ঠে বদ্ধ করিয়া তাহার দ্বার ইষ্টক দ্বারা চিররুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। হতভাগিনী গৃহাবদ্ধ হইয়া মারমিয়নের কনষ্টান্টের ন্যায় আপনার জীবলীলার শেষ করিল। তিন মাস পরে সে দ্বার উন্মুক্ত হইলে দেখা গেল, তাহার কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ পড়িয়া রহিয়াছে, এবং তাহার অসাধারণ রূপলাস্থিত্বের জন্য সে কঙ্কাল দেখিয়া কাহারও মনে বীভৎস ভাবের উদয় হয় নাই। ফৈজীর বিশ্বাসঘাতকতায়, সিরাজের রমণীজাতির উপর আন্তরিক ঘৃণা উপস্থিত হয়। কিন্তু তিনি যখন লুৎফ উন্নেসার হৃদয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, তখন দেখিলেন যে, সে হৃদয় অটল, তাহার প্রবাহ কেবল একই দিকে প্রবাহিত হয়, সিরাজ ভিন্ন সে স্রোত অন্য দিকে বহে না। তিনি দেখিলেন যে, ফৈজীর হৃদয় যেরূপ পৈশাচিক, লুৎফ উন্নেসার হৃদয় ততোধিক পবিত্র। তাই লুৎফ উন্নেসার প্রতি তাঁহার অগাধ ভালবাসা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তিনিই তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী বলিয়া ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

প্রসঙ্গক্রমে একটী কথা বলিয়া রাখি, লুৎফ উন্নেসা অথবা ফৈজী কেহই সিরাজের বিবাহিতা স্ত্রী নহেন। সিরাজের বিবাহিতা স্ত্রীর নাম আমরা অবগত নহি। * তিনি

* সিরাজের মাতা ও মাতৃস্বসার সহিত হোসেন কুলিখাঁর অবৈধ প্রণয়ের কথা প্রচলিত থাকায়, ফৈজী সিরাজকে ঐরূপ মর্ম্মস্পর্শী উত্তর প্রদান করিয়াছিল। জননীর সহিত অবৈধ প্রণয়ের জন্য হোসেন কুলিখাঁর হত্যা সম্পাদন হয়। সিরাজ তাহাকে cold blood এ হত্যা করেন নাই। কিন্তু ইতিহাসে আমরা তাহাও দেখিতে পাই।

* সিরাজের কয় পত্নী ছিলেন, তাহা স্থির করা যায় না। কেবল তিন জনেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, (১) তাঁহার বিবাহিতা পত্নী (ইরাজ খাঁর কন্যা); (২) লুৎফ উন্নেসা ;(৩) ফৈজী (মোহনলালের ভগিনী)। বেভারিজ সাহেব বলেন যে, নিজামত Record এ তিনি ওমদাৎ উন্নেসা নামে সিরাজের এক পত্নীর উল্লেখ দেখিয়াছেন। বেভারিজের মতে লুৎফ উন্নেসাও ওমদাৎ উন্নেসা একই। নিজামত Record এ আছে, যে ওমদাৎ উন্নেসা ১৭৯১খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে গবর্ণমেণ্টের নিকট মাসহারা বৃদ্ধির প্রার্থনা করিয়া বলেন যে, তিনি প্রথমে মাসে ৫০০৲ টাকা পাইতেন, হেষ্টিংস

কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা, তাঁহার পিতার নাম মির্জ্জা ইরাজ খাঁ। প্রথমে, আলিবর্দ্দি খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহম্মদের দৌহিত্রী ও আতাউল্লা খাঁর কন্যার সহিত সিরাজের বিবাহ স্থিরীকৃত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কন্যাটী কাল কবলে পতিত হওয়ায়, আলিবর্দ্দি, মির্জ্জা ইরাজখাঁর কন্যার সহিত সিরাজের বিবাহ প্রদান করেন। এই বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়; মুতাক্ষরীণে ইহা বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা যেরূপ দেখিতে পাই, তাহাতে সিরাজ লুৎফ উন্নেসা ব্যতীত আর কাহাকেও যে অধিক ভালবাসিতেন, এরূপ বোধ হয় না, তাঁহার অন্যান্য ভার্য্যার সহিত তাঁহার যে বড় বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। যেখানে তাঁহার বেগমের উল্লেখ দেখিতে পাই, সেইখানে লুৎফ উন্নেসা ব্যতীত আর কাহারও নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ সুখে দুঃখে সকল সময়ে সিরাজ লুৎফ উন্নেসাকেই আপনার সহচরী করিতেন।

৪৫০৲ করিয়াছেন, এক্ষণে ৩২৫৲ হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, লুৎফ উন্নেসা ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার মাসহারা সম্বন্ধে আমরা অন্য বিবরণ জ্ঞাত হই। লুৎফ উন্নেসা মাসে ১০০০৲ টাকা পাইতেন, তদ্ব্যতীত আলিবর্দ্দি, সিরাজ প্রভৃতির সমাধিস্থল খোসবাগের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকায়, তিনি তাহার জন্য আরও ৩০৫৲ টাকা অধিক পাইতেন। (Capt. J. E. Gastrell's Statistical Account of Moorshidabad). হণ্টারও তাহাই বলেন। ওমদাৎ উন্নেসার ৫০০৲ প্রভৃতির সহিত লুৎফ উন্নেসার ১০০০৲ টাকার কোনও মিল নাই। ইহাতে লুৎফ উন্নেসা ও ওমদাৎ উন্নেসা এক কি না, সন্দেহের বিষয়। যদি ওমদাৎ উন্নেসা ও লুৎফ উন্নেসা এক না হন, তাহা হইলে বেভারিজের কথানুসারে আমরা সিরাজের আর এক স্ত্রীর নাম জানিতে পারিতেছি। ইনি সেই বিবাহিতা পত্নী কি অন্য কোনও স্ত্রী, তাহা জানিবার উপায় নাই। খোসবাগে সিরাজের দুই স্ত্রীর সমাধি আছে, একটী লুৎফ উন্নেসার, দ্বিতীয়টীর নাম কি জানা যায় না। মহাত্মা লেরবী বলেন যে, ওমদাৎ উন্নেসা নাম্নে সিরাজের দৌহিত্রীরও উল্লেখ আছে।

সিরাজ যে সকল সময়েই লুৎফ উন্নেসাকে নিজ সঙ্গিনী করিতেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এক সময়ের একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। সিরাজ বরাবরই অত্যন্ত চঞ্চল-চিত্ত ছিলেন; যে তাঁহাকে যে দিকে লওয়াইত, তিনি সেই দিকেই নত হইয়া পড়িতেন। আফগানগণ কর্ত্তৃক সিরাজের পিতা জৈনুদ্দীনের নৃশংস হত্যার পর, নবাব আলিবর্দ্দিখাঁ সিরাজকে পাটনার শাসন কর্ত্তার পদ দিয়া রাজা জানকীরামকে তাঁহার সহকারীরূপে নিযুক্ত করেন। কিন্তু সিরাজ অল্প-বয়স্ক ও আলিবর্দ্দির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র থাকায়, নবাব সিরাজকে আপনার নিকটেই রাখিতেন। কার্য্যতঃ রাজা জানকীরামই পাটনা শাসন করিতেন। মেহেদীনেসার খাঁ নামক জনৈক কর্ম্মচারী সিরাজকে এইরূপ বুঝাইয়া দেয় যে, নবাব, সিরাজকে মিথ্যা আশা দেখাইয়াছেন, নতুবা তিনি সিরাজকে প্রকৃত প্রস্তাবে পাটনা শাসন করিতে দিতেছেন না কেন? সিরাজ তাহাতেই বিশ্বাস করিয়া মেহেদীনেসারের সহিত, জানকীরামের নিকট হইতে পাটনা অধিকারের জন্য অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে তিনি সঙ্গে আর কাহাকেও লন নাই। কেবল মাত্র লুৎফ উন্নেসা ও তাঁহার মাতাকে নিজ যানে লইয়া পাটনা যাত্রা করেন। উক্ত যান দিনে ৩০।৪০ ক্রোশগামী দুইটী সুন্দর বলিবর্দ্দ দ্বারা চালিত

হইত। * সিরাজের এইরূপ ঔদ্ধত্যে মেহেদী-নেসার খাঁ হত হন; এবং আলিবর্দ্দির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র বলিয়া, যাহাতে সিরাজ অক্ষত-শরীর থাকেন, তজ্জন্য রাজা জানকী রামকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সিরাজ জানিতেন যে, এইরূপ চাপল্যে নানারূপ বিপদ হইবার সম্ভাবনা, তথাপি স্নেহবশে লুৎফ উন্নেসাকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন নাই। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সমস্ত ঘটনা সিরাজের সৌভাগ্য সময়ে সংঘটিত হয় বলিয়া, লুৎফ উন্নেসার চরিত্রের গভীরতা বুঝিতে পারা যায় না। নিম্নলিখিত দুই একটী ঘটনা হইতে তাঁহার সেই দেব-হৃদয়ের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যুর পর, সিরাজ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বিরুদ্ধে এক ভীষণ ষড়যন্ত্রের অভিনয় হইতেছিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সিরাজের বুদ্ধির তাদৃশ স্থিরতা ছিল না, এবং যদিও তিনি মাতামহের অনুরোধে মদ্যপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি পূর্ব্বের অভ্যাস-দোষ তাঁহার চঞ্চলচিত্তকে অধিকতর চঞ্চল করিয়াছিল। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া চারিদিকে হিংসা, বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের বিভীষিকাময় চিত্র দেখিতে লাগিলেন। কাহারও উপর তিনি সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না। যাহাকে তিনি বিশ্বাস করিতেন, সে-ই তাহার সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইত। দুই একজন ব্যতীত তাঁহার প্রধান প্রধান সেনাপতি ও কর্ম্মচারী সকলেই সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার হৃদয় কিরূপ অশান্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু, একজন মাত্র তাঁহার সেই দগ্ধ-হৃদয়ে শান্তিবারি প্রদান করিয়া তাঁহার চঞ্চল-চিত্তকে কথঞ্চিৎ স্থিরতর করিতে চেষ্টা পাইতেন। তিনিই লুৎফ উন্নেসা। লুৎফ উন্নেসা তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার মনে শান্তির ছায়া উদয় করিয়া দিতেন। ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস-ঘাতক ষড়যন্ত্রকারিগণের কৌশলে, যখন পলাশীর স্মরণীয় প্রান্তরে পরাজিত হইয়া, যুদ্ধস্থল হইতে পলায়নপর সিরাজ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সে চিত্র মনে হইলে, করুণ-রসে হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া উঠে। তিনি যাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, সে-ই তাঁহার প্রতি বিমুখ হয়। গভীর রাত্রি, চারিদিকে, কেমন একটা বিষাদের ছবি সিরাজের চক্ষের সমক্ষে নাচিয়া বেড়াইতেছে, পলাশী হইতে মুর্শিদাবাদের পথে, মীরজাফর ও ইংরেজ সৈন্যের সানন্দ কোলাহল, ও বিজয়-বাদ্য ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের প্রত্যেক আঘাতে সিরাজের মর্ম্মস্থল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সিরাজ কণ্ঠ-ছিন্ন কপোতের ন্যায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মস্তিষ্ক

* মস্তাফা সেই বলিবর্দ্দ দুইটী দেখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মীরজাফর মসনদে বসার পর, সে দুইটী কাশীম্বাজার কুটীর রেসিডেণ্ট ওয়াট্‌স্ সাহেবকে প্রদান করা হয়। মস্তাফা নিজ মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া তাহাদের ককুৎ স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। আরও আধ ফুটের আবশ্যক হইয়াছিল। গুজরাট দেশজাত এই বলিবর্দ্দ দুইটী দেখিতে তুষারশ্বেত ও অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতি ছিল। ১২০০৲ টাকায় তাহারা ক্রীত হয়। (Mataqherin, p. 615).

হইতে বিবেচনা শক্তি যেন চির-বিদায় লইয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কি করিবেন, কিছুরই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। কোনও কোনও বিশ্বাসী বন্ধুর কথায় সিরাজ একবার নগর রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন, আবার বিশ্বাস ঘাতকেরা পরামর্শ দিল,পলায়ন কর; নতুবা তোমার নিস্তার নাই। সিরাজ অনন্যোপায় হইয়া তাহার অনুগমন করিবার জন্য সকলের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। যাহারা তাঁহার চরণস্পর্শ করিবারও উপযোগী নহে, আজ সিরাজ তাহাদেরও কৃপাভিখারী। কিন্তু কেহই তাঁহার সেই কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিল না। এমন কি, তাঁহার শ্বশুর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত একপদ গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন না। যতই বিপক্ষগণের বিজয়-ধ্বনি অগ্রসর হয়, ততই সিরাজের প্রাণ কম্পিত হইতে থাকে। তখন তিনি স্বীয় প্রিয়তমা লুৎফ উন্নেসার নিকট ভগ্ন-হৃদয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করিলেন। লুৎফ উন্নেসা বাক্যব্যয় না করিয়া দুই এক জন দাসীর সহিত স্বামীর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন। সেই ভীষণ দ্বিপ্রহর রজনীতে বাঙ্গলা, বিহার,উড়িষ্যার অধিপতি ও অধীশ্বরী সামান্য যানে আরোহণ করিয়া রাজধানী ছাড়িয়া চলিলেন। নৈশান্ধকার তাঁহাদের মুখে আবরণ প্রদান করিল,মধ্যে মধ্যে শৃগাল ও পেচকের ভীষণ শব্দ তাঁহাদের মনে ভীতির সঞ্চার করিতেছে, নিকটে কোনও শব্দ শুনিলে,মীরজাফরের চর বলিয়া তাঁহারা চমকিত হইয়া উঠিতেছেন, এইরূপ অবস্থায় ক্রমশঃ তাঁহারা ভগবানগোলার দিকে অগ্রসর হইলেন। যতই গমন করেন, সিরাজ ততই চঞ্চল হইয়া উঠেন, বিশেষতঃ লুৎফ উন্নেসার জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই দেবহৃদয়া নিজে কিছুমাত্র ক্লান্তি অনুভব না করিয়া, প্রাণপণে স্বামীর কষ্ট নিবারণের জন্য যত্নবতী হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, নিদাঘের তপন আপনার প্রখর কিরণ ছড়াইতে ছড়াইতে দেখা দিলেন, ক্রমে রৌদ্রে ও রৌদ্রতপ্ত ধূলিতে সিরাজের কমনীয় মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল,স্বেদজলে ললাট ও গণ্ডস্থল অবিশ্রান্ত সিক্ত হইতে লাগিল, লুৎফ উন্নেসা ক্রমাগত রুমাল ব্যজন করিয়া স্বামীর সে কষ্ট দূর করিতে লাগিলেন। নিজের শরীর সূর্য্যোত্তাপে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে,ভ্রূক্ষেপ নাই,তিনি কিসে স্বামীর ক্লান্তি দূর করিবেন, তজ্জন্য অত্যন্ত চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন। এইরূপে তাঁহারা ভাগবানগোলায় উপস্থিত হইয়া, তথা হইতে নৌকারোহণে রাজমহালাভিমুখে যাত্রা করেন। পদ্মার উত্তাল তরঙ্গমালা দেখিয়া চিরসুখী সিরাজের প্রাণ কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু সেই দেব-হৃদয়া তাহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি নিজে স্বামীকে সঙ্গে লইয়া সেই ক্ষুদ্র তরণী আরোহণে গমন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে তরঙ্গের পশ্চাৎ তরঙ্গ আসিয়া সেই ক্ষীণকলেবরা তরণীকে রসাতলগামিনী করিবার উপক্রম করিত লাগিল, এবং সিরাজ জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া ভীত ও চকিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু লুৎফ উন্নেসা তাঁহাকে শান্ত করিয়া সলিলসিক্ত স্বামীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মুছাইতে আরম্ভ করিলেন। মধ্যে মধ্যে নিদাঘের বৃষ্টি সকলকে অস্থির করিয়া তুলিল, লুৎফ উন্নেসা সিরাজকে আচ্ছাদন করিয়া তাহা হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে যত্নবতী হইলেন। সঙ্গে একটী ৩।৪ বৎসরের বালিকা কন্যা, সিরাজ এক একবার তাহার দিকে তাকা-

ইয়া কাঁদিয়া আকুল হন, পাছে তাঁহার সর্ব্বস্ব ধন পদ্মার তরঙ্গে ভাসিয়া যায়, কিন্তু লুৎফ উন্নেসা তাহার প্রতিও তাদৃশ যত্ন না লইয়া, স্বামীর কষ্ট নিবারণের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন। এইরূপ তিনদিন তিনরাত্রি অনাহারে কাটাইয়া, তাঁহারা রাজমহলের নিকট উপস্থিত হন। এই সময়ে সিরাজ আপনাদিগের জন্য কিছু খিচুড়ী প্রস্তুতের ইচ্ছা করেন। দানাসাহ নামে একজন ফকীর * তাঁহাদের জন্য আহার প্রস্তুতের ভার লয়। কিন্তু সে গোপনভাবে মীরজাফরের জামাতা মীরকাসেম ও ভ্রাতা মীর দাউদকে সংবাদ দিলে, তাহারা সিরাজকে ধৃত করিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দেয়। ঐ সকল কর্ম্মচারী স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে যাবতীয় ধন-রত্নাদি অপহরণ করে। মীরকাসেম * লুৎফ উন্নেসার নিকট হইতে যাবতীয় সম্পত্তি লুটিয়া লইয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হওয়ার পর, হত-ভাগ্য সিরাজ মীরণের আদেশক্রমে মহম্মদী-বেগের তরবারির আঘাতে খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া খোসবাগের বৃক্ষ ছায়ায় চিরদিনের জন্য সমাহিত হইলেন। তাঁহার পরিবার-বর্গের দুর্দ্দশা শ্রবণ করিলে, হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া উঠে। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর বেগমকে তাঁহার কন্যাদ্বয় ঘেসিটী ও আয়মানার সহিত চিরনির্ব্বাসিতা করা হইল। সেই সঙ্গে স্বামী বিয়োগবিধুরা অভাগিনী লুৎফ উন্নেসাও স্বীয় চারি বৎসরের কন্যাটী লইয়া মুর্শি-দাবাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। প্রথমে তাঁহাদিগকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনার সহিত কারারুদ্ধ করিয়া, পরে নির্ব্বাসনের অনুমতি দেওয়া হয়। যে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর আদর্শ-শাসনে বঙ্গের প্রজাগণ বিঘ্নরাশির মধ্যেও শান্তিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাঁহার পরিবারবর্গের এরূপ দুর্দ্দশা যে অতীব কষ্টজনক, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহারা ঢাকায় নির্ব্বাসিতা হইয়া

* দানাসাহ প্রথমে সিরাজকে চিনিতে পারে নাই, কিন্তু তাঁহার বহুমূল্য পাদুকা দেখিয়া তাহার সন্দেহ হয়, পরে নৌকার মাঝিদিগকে জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা সমস্ত বলিয়া দেয়। অদ্ভুত প্রকৃতি ইংরেজ ঐতিহাসিক-গণ লিখিয়া থাকেন যে, সিরাজ নাকি তাঁহার সৌভাগ্য-সময়ে দানাসাহের কাণ কাটিয়াদিয়াছিলেন। (Ive's Voyage, p. 154. Also Orme's Hindustan, Vol. II p. 183.) কিন্তু মুতাক্ষরীণে যাহা লেখা আছে, তাহার ইংরেজী অনুবাদ দেখিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন। "This man (Shah Dana) whom probably he had either disobliged or oppressed in the days of his full power, rejoiced&c." মুতাক্ষরীণ কারের মতে দানাসাহর প্রতি সিরাজ অত্যাচার করিয়াছিলেন কি না, তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ লিখিলেন যে, একেবারে তাহার কাণ কাটিয়া দেওয়া হয়। ধন্য সত্যানুসন্ধিৎসু ইংরেজ-ঐতিহাসিকগণ!! রিয়াজু সালাতীন গ্রন্থে লিখিত আছে, সিরাজ ভগবানগোলা হইতে পদ্মা পার হইয়া মালদহ পর্য্যন্ত যান, পুরাতন মালদহের নিকট বড়াল নামক স্থানে দানাসাহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। হণ্টার বলেন যে, সিরাজকে ধৃত করার জন্য দানাসাহ মীরজাফরের নিকট হইতে জায়গীর পাইয়া-ছিল, কিন্তু বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল বলেন যে, দানা-সাহের বংশীয়েরা যে নিষ্কর ভূমি ভোগ করে, তাহা গৌড়ের প্রসিদ্ধ বাদসাহ হোসেনসার দত্ত। বটব্যাল মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—"যেস্থানে সিরাজ-উদ্দৌলা ধৃত হইলেন, ঐ স্থান কালিন্দী তীরবর্ত্তী; উহা তদবধি "সুবামার" নামে বিখ্যাত। স্থানীয় লোকে তাহাকে "শুওরমারা" নাম দিয়াছে। হায় বিধাতঃ, মূর্খের জিহ্বাতে তুমি সুবা সিরাজ-উদ্দৌলাকে শূকরে পরিণত করিয়াছ!!" (সাহিত্য ১৩০১ মাঘ "লক্ষ্মণাবতী" প্রবন্ধ পৃ ৬৫০।)

* এই মীরকাসেমই নবাব কাসিম আলি খাঁ।

অতি কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সেই রাক্ষস-প্রকৃতি মীরণ আলিবর্দ্দির কন্যাদ্বয়কে জলমগ্ন করিতে আদেশ প্রদান করে; তাহার সে আজ্ঞা প্রতিপালিত হইয়াছিল। *

কিছুকাল ঢাকায় বাসের পর লুৎফ উন্নেসা ইংরেজদিগের যত্নে মুর্শিবাবাদে পুনরানীত হইয়া, নবাব আলিবর্দ্দি ও সিরাজের সমাধি খোসবাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন। সেই সময়ে তাঁহার করুণোদ্দীপনী অবস্থার কথা স্মরণ করিলে, পাষাণেরও হৃদয় বিগলিত হয়। তাঁহার প্রিয়তম স্বামী এক্ষণে ধরণী-গর্ভে শায়িত; অন্যান্য আত্মীয় স্বজনও একে একে অনন্তপথে যাত্রা করিয়াছেন; তিনি এই বিশাল বিশ্বে একাকিনী, একটী মাত্র বালিকা কন্যা অবলম্বন। এইরূপ অবস্থায় তিনি প্রতিদিন স্বামীর সমাধি পূজা করিতে আসিতেন। রৌপ্য ও স্বর্ণময় ফুল-খচিত কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রদ্বারা সে সমাধি আচ্ছাদিত ছিল, তিনি তথায় প্রতিনিয়ত দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতেন, এবং উদ্যানের সুগন্ধি কুসুম সকল চয়ন করিয়া, অশ্রুজলসিক্ত সেই কুসুমরাশি প্রিয়পতির সমাধির উপর নিক্ষেপ করিতেন। সেই সময়ে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে তিনি ভূতল-শায়িনী হইয়া পড়িতেন, এবং অশেষ প্রকার করুণোদ্দীপক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া শোক-ভার লাঘব করিতে চেষ্টা পাইতেন। * এইরূপে স্বামীর সমাধি পূজা করিতে করিতে তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল, লুৎফ উন্নেসা স্বামীর চরণে মনোনিবেশ করিয়া, তাঁহারই পদতলে চিরদিনের জন্য সমাহিত হইলেন। আজিও খোসবাগে সিরাজের সমাধির পার্শ্বে তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। খোসবাগের বৃক্ষ-রাজির নিবিড় ছায়াতলে প্রকোষ্ঠমধ্যে তাঁহারা অনন্ত বিশ্রাম লাভ করিতেছেন; বিশ্বজননী বসুন্ধরার বিশাল অঙ্কের একদেশে তাঁহারা চিরনিদ্রায় অভিভূত। যাঁহারা জীবনে রাশি রাশি দুঃখ ও কষ্টে ক্ষত বিক্ষত-হৃদয় হইয়া এক্ষণে বিশ্রাম লাভ করিতেছেন,

* কেহ কেহ বলেন যে, লুৎফ উন্নেসা, তাঁহার কন্যা, ও সিরাজের কনিষ্ঠ এক্রাম-উদ্দৌলার পুত্র মোরাদ-উদ্দৌলাকেও নিহত করা হয়। (Holwell's India Tracts, p. 41-42; also Vansittart's Narratives. Vol. I. p. 152) Longও ইহাই লিখিয়াছেন, তিনি লুৎফ উন্নেসার স্থলে Suffen Nissa Begum লিখিয়াছেন, Long's Selections, P. 223). কিন্তু মুতাক্ষরীণে কেবল ঘেসিটী ও আয়মানারই জলমগ্ন হওয়ার কথা আছে। মীরণ তাঁহাদিগের প্রতি ষড়যন্ত্রের সন্দেহ করিয়া জলমগ্ন করিতে আদেশ দেয়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তাঁহারা মৃত্যুকালে মীরণকে বজ্রাঘাতে মরিবার জন্য অভিসম্পাত করিয়া যান, এবং মীরণেরও নাকি তাহাতেই মৃত্যু হয়। মীরণের মৃত্যু সন্দেহজনক বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। অনেকে অনুমান করেন যে, মীরণের মনে স্বাধীনতার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায়, পুণ্যশ্লোক (?) ইংরেজ প্রভুগণ নাকি কৌশলক্রমে তাহার জীবলীলার অবসান করিয়া দেন। (Mutaqherin English Trans. Vol. II. Translator's Note P. 132). লুৎফ উন্নেসা ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে পুনরানীত হন। মন্তাক্ষা তাঁহাকে ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিতে দেখিয়াছেন। খোসবাগে আজিও লুৎফ উন্নেসার সমাধি আছে। মোরাদ-উদ্দৌলাকেও মন্তাক্ষা মুর্শিদাবাদে দেখিয়াছেন। (Mutaqherin Vol. I p. 643.) লুৎফ উন্নেসার কন্যাবংশীয়েরা অনেক দিন পর্য্যন্ত পেন্সন পাইয়াছিলেন।

* লুৎফ উন্নেসার এইরূপ শোক প্রকাশের কথা ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দে Forster নামে একজন সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। (Hunter's Statistical Account of Murshidabad. p. 73.)

তাঁহাদের সে বিশ্রামে ব্যাঘাত করা তাদৃশ যুক্তিসঙ্গত নহে। অনন্ত বিশ্রামে তাঁহারা চিরশান্তি লাভ করুন।

উপরি লিখিত দুই একটী ঘটনা হইতে লুৎফ উন্নেসা চরিত্রের গভীরতা সাধারণে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন। ইতিহাসে তাঁহার কোনরূপ উজ্জ্বল চিত্র নাই। কিন্তু তাঁহার জীবনের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনা মিলিত করিলে, আমরা তাহারই মধ্য হইতে সে চিত্রের অনেকটা আভাস বুঝিতে পারি। প্রচলিত ইতিহাসে সিরাজ-উদ্দৌলার মহিষীর উজ্জ্বল চিত্র থাকা সম্ভবপর নহে, কাজেই আমাদের মনে তাহা সুন্দররূপে প্রতিভাত হইলেও, ঘটনাভাবে অধিকতর সুস্পষ্ট করা কঠিন।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

নীতিশিক্ষা। (৩)

নীতিশিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন

নীতিশিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের দ্বিতীয় সংখ্যায় আমরা সম্প্রতিকার ভারতবাসীদিগের মধ্যে নানাপ্রকার বিবাদ পরিহারের কথা ব্যক্ত করিয়াছি। তাহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবাদ বা মতান্তর-ঘটিত বাদানুবাদের অবসান বিষয়ে পরোক্ষ ভাবে কিছু বলা হইয়াছে, সাক্ষাত সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি নাই। কারণ, সে সর্ব্বমঙ্গলময় ঘটনার এখনো বিলম্ব আছে।

সর্ব্বধর্ম্মের মূল সাধন লইয়া যে ব্রাহ্মসমাজের পত্তন হয়, সে ব্রাহ্মসমাজেই যখন নানা প্রকার দলাদলি চলিতেছে, তখন এদেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন সম্মিলনের কথা এক্ষণে বক্তব্যই নয়। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের নেতাদিগের দোষ ধরা উচিত বোধ করি না। বিষয়গুণে এবং সময় গুণে এইরূপ হইতেছে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা রাজা রামমোহন রায় যে মূল বচন ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজের সার্ব্বভৌমিকত্ব অবতারণার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে বচনটী প্রাচীন—

"উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম বস্তুৎশব্দোপলক্ষিতং।
যতোবেতি যতোবাচ ইত্যাদি শ্রুতিসম্মতং
নাম রূপাদি নির্দ্দেশৈর্ব্বিভিন্নানামুপাসকাঃ।
পরস্পরং বিরুদ্ধন্তি ন তৈরেতৎ বিরুধ্যতে॥

যিনি জগতের কারণ তিনিই পরব্রহ্ম উপাস্য হয়েন, "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রমাণ হইতেছে। নাম রূপাদি বিশেষণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উপাসকেরা পরস্পর এক ব্যক্তি অন্যের সহিত বিরোধ করেন, কিন্তু তাঁহারা এ পরমেশ্বরের মতের বিরোধী নহেন।"

ব্রাহ্মসমাজের প্রথমদিনের ব্যাখ্যানে এই বচন ও তাহার এই তাৎপর্য্য পরিব্যক্ত হইয়াছিল। এইবচনের বা শ্লোকযুগ্মের প্রথমটী বিধিবোধক; দ্বিতীয়টী তাহার হেতু। নানাবিধ দার্শনিক তর্ক ও বৈদিক ক্রিয়াবিধি অতিক্রম করিয়া আচার্য্য গুরু শ্রীমৎ গৌড়পাদ এই তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করেন। ইহার পর সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইল। ইতিমধ্যে এই মূল ধরিয়া কোন কার্য্যানুষ্ঠান হয় নাই। সম্প্রতি তাহা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আরও কতকাল পরে ইহার প্রকৃত ফল দৃষ্টিগোচর হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

এই মহামন্ত্রের মধ্যে যে বিশ্বপ্রেমের উপদেশ নিহিত আছে,তাহা সকলে সাধন করিবেন কি, তাহার ভাবগ্রহ করাও কঠিন

হইল। ভিন্ন ২ প্রকার বোধ বা বিশ্বাসের বশে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহারা কতকদূর অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু মূল স্থান পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারিলেন না। অর্দ্ধ পথেই তাঁহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িলেন।

ব্রাহ্মসমাজ যে একতার মহামন্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা অবিনশ্বর। অতএব আশা করা যায় যে, শীঘ্র বা বিলম্বে এই মহামন্ত্র সকলেরই অবলম্বনীয় হইবে—নামে না হউক, কার্য্যে হইবে। আমরা সামান্য লোক, ধ্বজ-পতাকা-বিলম্বী নামের মহিমা অপেক্ষা কার্য্যের গুরুত্বকেই অধিক শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া থাকি। এক্ষণে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বা বিশ্ব-প্রেম সকলেরই বাঞ্ছনীয় বোধ হয়। এই প্রকৃত পরমার্থ বস্তুর জ্ঞান ক্রমশঃ পরিস্ফুট ও পরিমার্জ্জিত হইতেছে। অতএব অবশ্যই আশা হয় যে, অল্পে অল্পে বিশ্বসংসারের সর্ব্বত্র একত্বের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত দৃষ্ট হইবে। এবং সকল লোক দ্বন্দ্ব বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ধর্ম্মরাজের মহাসিংহাসনের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া সেই বিশ্বেশ্বরের সমীপে আত্মনিবেদন করিবে।

সংসারে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক, এই তাপত্রয় অতিশয় প্রবল। মনুষ্যের পাপ-প্রবণ চঞ্চল চিত্ত জানিয়া শুনিয়াও গন্তব্য পথ বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিচলিত হইয়া পড়ে। কর্ত্তব্য জ্ঞানের অভাব থাকিলে আরও বিপদ। এই কারণে মনুষ্য রোগ শোক মোহে সর্ব্বদা প্রপীড়িত হয়। এমন অবস্থায় ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হইলে মনুষ্যের রক্ষা কি? অনিত্য চঞ্চল সংসারে মনুষ্যের শান্তি কোথায়? সুতরাং সংসারাতীত পরম তত্ত্বের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই মর্ত্ত্য জীবনের সকল অর্থ অপেক্ষা পরমার্থ-পদার্থের পক্ষে লোক অধিকতর অনুরক্ত। যে নীতি সেই পরমার্থদায়িনী, তাহারই প্রতি শ্রেয়োর্থীদিগের শ্রদ্ধা জন্মে।

সাধারণ লোকের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, অথবা সভ্য ও অসভ্য, ইহাদের মধ্যে ভাষার পার্থক্য থাকিলেও আন্তরিক মূল ভাবের ঐক্য থাকে। অল্প জ্ঞানীরা অপরিষ্কৃত ভাষায়, এবং অপেক্ষাকৃত অধিক জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সুসংস্কৃত ভাষায়, ঈশ্বরের উদ্দেশে এই একই প্রার্থনা করিয়া থাকেন :—

> দয়া ঘন তোমা হেন কে হিতকারী।
> দুঃখ সুখে সমবন্ধু এমন কে, শোকতাপ ভয়হারী॥
> সঙ্কট-পুরিত ঘোর ভবার্ণব তারে কোন্ কাণ্ডারী।
> কার প্রসাদে দূর-পরাহত রিপুদল বিপ্লবকারী॥

বস্তুতঃ বিপ্লবকারী রিপুদলের উত্তেজনায় মনুষ্য নানা প্রকারে কষ্ট পায়। ধর্ম্ম শাসন-বিহীন হইলে মনুষ্য আত্মীয়, প্রতিবেশী, সকলের নিকট আঘাত পাইয়া থাকে। অথচ তাহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারাবৃত ; অতএব শোক এবং যন্ত্রণাই সার হয়। এমন অবস্থায় এক মাত্র ঈশ্বর তাহার শরণ্য হইয়া থাকেন। কেবল ভাবে ও ঈশ্বর দৃষ্টিতেই লোক শান্ত, দান্ত ও সমাহিত হইয়া "এই সঙ্কট-পুরিত ঘোর ভবার্ণবের" সকল অনর্থ অতিক্রম পূর্ব্বক কর্ত্তব্য পথে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকিতে পারে, এবং শান্তি লাভে সমর্থ হয়।

এই জন্য প্রথিত আছে, "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।" হিন্দুদিগের পক্ষে ধর্ম্ম কেবল মধু, এমন নয় ; উহা তাহাদের প্রাণ স্বরূপ। এমন সর্ব্ব-শান্তি-প্রদ মঙ্গলময় ধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক-শূন্য হইয়া ইংরাজ-রাজত্বে হিন্দুসন্তা-

নের শিক্ষা বিধান হইতেছে। সুতরাং উহাতে যে অভীষ্ট ফলের উৎপত্তি হইবে, এমন কি সম্ভাবনা আছে? ধর্ম্মানুরাগ-বিহীন হিন্দুজাতি কেবল নীতির অবলম্বনে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে, এই আশা কুসুমিত আকাশ দর্শনের আশা অপেক্ষা অধিক ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত বোধ হয়।

আমাদের বদান্য ও সদাশয় গবর্ণমেণ্ট ১৮১৩ অব্দ হইতে এ দেশীয়দিগের শিক্ষা বিধানার্থ মনোযোগী এবং মুক্ত-হস্ত হইয়াছেন। তদবধি জেলায় জেলায় এবং কিয়ৎ কাল পর অবধি গ্রামে গ্রামে স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হইতেছে। এই স্কুল সকলের তত্ত্বাবধানের জন্য কত কর্ম্মচারী ও তাহার জন্য কত আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু এত চেষ্টা, যত্ন ও অর্থ ব্যয়ের ফল কি হইল, তাহা বিচার-সাপেক্ষ। এ জন্য নানা ব্যক্তির দ্বারা রিপোর্ট সংগ্রহ করা হইয়াছিল। পুনঃপুনঃ তত্ত্বান্বেষণ, পুনঃপুনঃ রিপোর্ট, পুনঃপুনঃ ইংলণ্ডীয় মূল গবর্ণমেণ্টের ডিস্‌প্যাচ বা আদেশ পত্র, এই লেখা-লেখিতেই এক শতাব্দীর তিন ভাগ অতিক্রান্ত হইল। অবশেষে এডুকেশন কমিশন নামে এক বৃহৎ সমিতির অধিষ্ঠান হয়। তাহাতে এই শিক্ষা সংক্রান্ত তাবৎ বিষয় আমূল আলোচিত হইয়াছিল। ১৮৮২ অব্দে এই মহা সমিতির পত্তন এবং সেই বৎসরই ইহার কার্য্য সমাপ্ত হইয়া এক বৃহৎ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই সমিতির প্রস্তাবানুসারে শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে নূতন নূতন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

মহা সমারোহে এই সমিতির কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ইহাতে সভাপতি এক, ও সম্পাদক এক, এবং ২০ জন সভ্য ছিলেন। তাঁহারা অধিক মাত্রায় ইউরোপীয়। এ দেশীয় কয়েক ব্যক্তিও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁহারা ভারতের সকল প্রদেশ হইতে, শিক্ষা সংক্রান্ত তাবৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ ১৯৩ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া, উক্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। এই সমিতিতে সভ্যরূপে বা সাক্ষীরূপে অনেক উচ্চপদস্থ খ্রীষ্টীয় পাদরী ছিলেন। যাঁহারা এতদ্দেশীয় সভ্য বা সাক্ষী, তাঁহাদের মধ্যেও ধর্ম্মবিষয়ে আস্থাশূন্য বা বিচারাক্ষম কেহ ছিলেন না।

এই এডুকেশন কমিশন রিপোর্টে ছাত্রদিগের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা বিষয়ক অভাবের বহু সমালোচনা দেখা যায়। কমিশনারগণ সাক্ষীদিগের উক্তি ধরিয়া বলিয়াছেন,—

"On the one hand, it was argued that moral and religious instruction was the necessary complement to secular instruction; that to the people of India, so instinctively religious, such instruction would be thoroughly congenial; that the necessity of it had been forcibly pressed upon the Commission by a number of witnesses, and its absence been the subject of many complaints; that in spite of the principle of religious neutrality, or of the variety of religious belief among the various sections of the Indian community, there would be no difficulty in basing moral training upon the principles of natural religion, since in those principles all men are agreed."

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, ধর্ম্ম শিক্ষা ব্যতীত নীতি শিক্ষা এ দেশে সুফলপ্রদ হইবে না। আর এদেশে ধর্ম্ম বিষয়ে নানা মত থাকিলেও সাধারণ ধর্ম্ম শিক্ষার সহিত নীতিশিক্ষার উপায় করা যাইতে পারে।

এই সমিতি ধর্ম্ম-সহকৃত নীতি শিক্ষা বিষয়ে কয়েক প্রকার ব্যবস্থা করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তৎসম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত হইতে পারেন নাই। যাঁহাদের উদ্দেশে সেই উপদেশ প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহারাও তাহা সহজ বা সুসাধ্য জ্ঞান করিলেন না। সুতরাং তদনুসারে কোন কার্য্য হইতে পারে নাই।

এদিকে ইংরাজী-মুখরিত বিদ্যালয় সমূহে নীতি-বিহীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতা প্রবল ভাবে চলিতে লাগিল। তাহাতে রাজা প্রজা উভয়ের পক্ষে—বিশেষতঃ পিতৃ মাতৃ-গণের পক্ষে নানা প্রকারে উদ্বেগ ও অশান্তির কারণ সকল সমুপস্থিত হইল। ইহার বিবরণ আমরা প্রথম সংখ্যাতেই ব্যক্ত করিয়াছি। তদবস্থায় দেশীয় লোকদিগের ন্যায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর উপর প্রসন্ন হইতে পারেন নাই।

পূর্ব্বোক্ত শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে স্কুল কলেজাদির শিক্ষা ঘটিত উপরোক্ত বিষম ত্রুটির কথা সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত রূপে বিদিত হইল এবং তৎসংক্রান্ত আলোচনার বৃদ্ধি হইল। মহামহিমান্বিতা শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর ষ্টেট-সেক্রেটরী মহোদয় এবং অত্রত্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরও এই বিষয়ে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

উপরোক্ত কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার দুই বৎসর পরে ১৮৮৪ অব্দে ষ্টেট সেক্রেটরী মহোদয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন যে, স্বতঃপরতঃ যেরূপে হয়, স্কুলকলেজাদির প্রদত্ত শিক্ষার নীতিহীনতার কলঙ্ক দূর করিতেই হইবে। কিন্তু তৎকালীন গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপণ বাহাদুর এই উপদেশানুসারে কিছু কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তাহার তিন বৎসর পরে যখন নূতন নূতন ব্যক্তি উক্ত দুই মহিমান্বিত পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন ঐ অত্যাবশ্যক বিষয়ের কথা পুনশ্চ উত্থাপিত হইল। এবার গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর ষ্টেট সেক্রেটরী মহোদয়ের উপদেশ অনুসারে কিছু কার্য্য করিলেন। ষ্টেট সেক্রেটরী মহোদয়ের উক্ত-পত্র ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এক দীর্ঘ বিজ্ঞাপনীর সহিত সর্ব্ব সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশিত হইল। ১৮৮৭ অব্দের শেষ দিনে (৩১ ডিসেম্বর) এই বিজ্ঞাপনী লিপিবদ্ধ হয়। উক্ত বিষয়ে, বোধ হয়, ইহাই গবর্ণমেণ্টের শেষ কার্য্য।

এই বিজ্ঞাপনী ইংরাজী স্কুল ও কলেজের ছাত্রদিগের ধর্ম্ম ও নীতি জ্ঞানের অভাব বিষয়ে এক বৃহদায়তন পাকা দলিল। ইহা ইণ্ডিয়া গেজেটের দ্বাদশ পত্রে বিন্যস্ত হইয়াছে।* আমরা এই বিজ্ঞাপনী হইতে কয়েক পংক্তি প্রথম সংখ্যায় উদ্ধৃত করিয়াছি।

এই রূপে গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ ও নিম্ন-পদস্থ সকল ব্যক্তি ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা বিষয়ে মহা আড়ম্বর করিয়া তুলিলেন। কিন্তু উক্ত বিজ্ঞাপনীর প্রকৃত মর্ম্ম আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত উপায় সকল আদৌ কার্য্যোপযোগী নহে। কেবল একটী উপায় প্রধান। তাহা, যতদূর সম্ভব, কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ফলে 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং।' মূলচ্ছেদ হইলে শাখা পল্লবে কি করিতে পারে?

মহামান্য শ্রীলশ্রীযুক্ত ষ্টেট্ সেক্রেটরি বাহাদুর ১৮৮৭অব্দে অত্রত্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে কয়েকখানি ইংরাজী পুস্তকের আদর্শে এক নূতন পুস্তক রচনা করিবার পরামর্শই মুখ্য-কথা। গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর সেই পত্রের মূলে যে বিজ্ঞাপনী প্রচার করেন, তাহাতেও ঐ পুস্তক প্রচারের প্রস্তাব ব্যক্ত হইয়াছে। শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে উক্ত মহামান্য শাসন কর্ত্তৃগণের দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল যে, এক্ষণে সময়ের যে লক্ষণ দেখা যায়, তাহাতে স্বাভাবিক ও সার্ব্বভৌমিক

* supple Gazette of India, Jany. 7.1888.

ধর্ম্মের মূলে এমন এক পুস্তক রচিত হইতে পারে যে,সেই পুস্তকের দ্বারা স্কুল ও কলেজে ধর্ম্ম ও নীতির প্রবাহ চলিতে পারিবে। উক্ত কমিশন রিপোর্টে দেখা যায় যে, দুই খ্রীষ্টীয় বিশপ এই পুস্তক রচনার ভার লইতে প্রস্তুত ছিলেন। রিপোর্টের উক্তি এই :—

A letter from Dr. Meurin, R. C. Bishop of Bombay, offering to draw up a moral text book of this kind had already been received by the Commission, and it was also understood that Dr. V. French, Bishop of Lahore, contemplated the publication of a similar work.

পরে এমনও প্রস্তাব হইয়াছিল যে, কিছু দিনের জন্য ইংলণ্ড হইতে উপযুক্ত শিক্ষক আনীত হইবে। বড় উত্তম কথা। হিন্দু ও মুসলমান সন্তানদিগের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার নিমিত্ত খ্রীষ্টীয়ান পাদরী পুস্তক লিখিয়া দিবেন এবং বিলাতী শিক্ষক তাহার অধ্যাপনা করিবেন। পরন্তু এই প্রস্তাব অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পক্ষে যেমন হউক, ইহা হিন্দুদিগের পক্ষে একান্ত অগৌরবের বিষয় নহে। কারণ,ইহা তাঁহাদের উদারতার পরিচয়। হিন্দুশাস্ত্রেরই উপদেশ এই যে,—

"সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্কন্ধ, ৮ অধ্যায়।

অর্থাৎ ভৃঙ্গ যেমন সকল পুষ্প হইতে সার (মধু) সংগ্রহ করে, সেই রূপ সকল শাস্ত্র হইতে সার সংগ্রহ করিবে।

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি। মনু ২।২৩৮

অশ্রেষ্ঠ লোকদিগের নিকট হইতেও শুভ বিদ্যা গ্রহণ করিবে।

কিন্তু আশঙ্কা এই হয় যে, এই মহাত্মারা হিন্দুদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মের অতি অল্পই পরিজ্ঞাত আছেন। অতএব তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে কিছু না বলিলেও পরোক্ষ ভাবে যাহা বলিবেন, তাহা হয়তো কোন কার্য্যেই আসিবে না, অথবা শিক্ষার্থীদিগের উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করিবে।

ইংরাজেরা জানেন যে, হিন্দুগণ নানা মতাবলম্বী। এক্ষণে হিন্দু ধর্ম্মের শাস্ত্র সকল ইউরোপ ও আমেরিকায় বিস্তারিত হইয়াছে। তাহাতে প্রায় সকলেই আপনাদিগকে উক্ত ধর্ম্ম বিষয়ে, সর্ব্বজ্ঞ না হউক, অভিজ্ঞ মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহারা হিন্দুধর্ম্মের বহির্দ্বারে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাঁরা যে এই ধর্ম্মকে কেবল দ্বন্দ্বময়, বিবাদময় দেখিবেন, এবং আসন্ন-মৃত্যু বিবেচনা করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। হিন্দু ধর্ম্ম কত গভীর, এবং হিন্দুদিগের প্রাণের মধ্যে কি ধর্ম্ম পিপাসা জাগিতেছে, তাহা যদি ইহাঁরা জানিতেন ;— হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে কি বিশ্বপ্রেম, কি অনন্ত মঙ্গল ভাব নিহিত আছে, তাহা যদি ইহাঁরা অনুধাবন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ? —আর কি বলিব—এই মাত্র বলিতে পারি যে, তাহা হইলে ইহারা হিন্দুদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইতেন না।

হিন্দুদিগের ধর্ম্ম-বিষয়ক মত-ভেদের কথা ইউরোপীয়দিগের গোচরে যে রূপ ভঙ্গীতে উপনীত করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা ইহাদিগকে অতি কৃপা পাত্র বিবেচনা করিতে পারেন। আর তাঁহাদের এরূপ প্রত্যয়ও হইতে পারে যে, সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের মূলে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া এ দেশীয়দিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া যায়। মহামান্য ষ্টেট্ সেক্রেটরী মহোদয় তাঁহার পুর্ব্বোক্ত পত্রে এ বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"The difficulties attending the adoption by the Government of India of an authorized manual containing lessons on moral subjects, which shall not offend the feelings of the numerous races and creeds of the

peoples of India, are no doubt considerable; but I am of opinion that it is the duty of the Government to face this problem, and not to be content until a serious endeavour has been made to supply what can not fail to be regarded as a grave defect in the educational system of India."

Supple. Gazette of India, January, 1888.

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্ম-মত-ভেদ সত্বেও তাহাদের উপযোগী এক পুস্তক প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এবং তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহস অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

আমরা দেখিতেছি, গবর্ণমেণ্টের সাহসের অভাব নাই। কিন্তু সকল কর্ম্ম সাহসসাধ্য নহে। উপরোক্ত পত্রাংশে মহামান্য ষ্টেট্ সেক্রেটরী মহাশয় যাহাকে "difficulties" কঠিন ব্যাপার বলিয়াছেন, তাহার কঠিনতার যে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। কারণ, সম্যক্ উপলব্ধি হইলে তাঁহার দ্বারা এবং অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট দ্বারা তন্নিরাকরণের জন্য ঈদৃশ অযোগ্য উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব হইত না।

এক কথায় এই ব্যবস্থার অসঙ্গতি ব্যক্ত করা যাইতে পারে—প্রতিভূ দ্বারা প্রকৃতার্থের সাধনা করা কঠিন। ইংরাজ গ্রন্থকার বা ইংরাজ শিক্ষকের পক্ষে হিন্দুদিগের প্রাণস্পর্শ করিয়া কথা কহাই কঠিন। আর যাহা অন্তস্তল বা মর্ম্ম স্পর্শ না করে, এবং যাহা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর জ্ঞান না হয়, এমন কথায় নীতি শিক্ষা হইতে পারে না। ন ব্যাজেন চরেৎ ধর্ম্মং। ধর্ম্ম কর্ম্মে ছল কৌশল বা ইংরাজী পলিসি policy খাটিবে না। ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা ফাঁকে ফাঁকে চলে না। ইংরাজীতে যাহাকে half-heartedness বলে, তাহা দ্বারা কোন বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করা দুর্ঘট। সুতরাং ইউরোপীয় লেখকের গ্রন্থ বা শিক্ষকের উপদেশ দ্বারা এ দেশীয়দিগের ধর্ম্ম ও নীতির শিক্ষা বিধান সর্ব্বাংশেই কঠিন, তাহার সন্দেহ কি? ফলেও সেই কঠিনতা দুষ্পরিহার্য্য হইয়া রহিল। এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কোন প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত হইল না।

যাহা হউক, তথাপি গবর্ণমেণ্টের উৎসাহোদ্দীপক মধুর বাণী ব্যর্থ হইবার নহে। বিশেষতঃ দূরদর্শী গবর্ণমেণ্ট সমস্ত পৃথিবীর ভাব গতি বুঝিয়া আমাদের হিতার্থ যাহা বলেন, তাহা মহামূল্য বোধ হয়। গবর্ণমেণ্ট আমাদের অনুকূলে এক পদ অগ্রসর হইলে আমরা শত পদ অগ্রসর হইতে পারি।

আলোচামান বিষয়ে ইংরাজ-রাজ সুদূর ইংলণ্ড হইতে আমাদের শ্রেয়ঃ সাধনের জন্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা এদেশীয় লোকের অবশ্যই শিরোধার্য্য। এদেশীয়দিগের মধ্যে যাহারা স্কুল-পাঠ্য পুস্তক সকল প্রণয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া কতকগুলিন পুস্তক লিখিয়া ফেলিলেন। তদবধি স্কুল ও কলেজে "নীতি" নামধেয় বিস্তর পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। Religious and moral Training শব্দের বহু আলোচনায় উহা এক প্রকার পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ফলে সেই একাকার। "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।" মহামান্য ষ্টেট্ সেক্রেটরী মহোদয়ের কথিত "a grave defect in the educational system of India" পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

উত্তরা কি কমলমণি হইতে পারে?

যেমন ধর্ম্মতত্ত্বে নবীন বাবু বঙ্কিম বাবুর শিষ্য, তেমন চরিত্রাঙ্কনেও তিনি বঙ্কিম বাবুর পথগামী। তাঁহার উত্তরা বঙ্কিম বাবুর কমলমণি; তাঁহার শৈলজা বঙ্কিম বাবুর আয়েসা; তাঁহার মনসা বঙ্কিম বাবুর আসমানী, এবং তাঁহার দুর্ব্বাসা বঙ্কিম বাবুর গজপতি দিগ্‌গজের উপাদানে সৃষ্ট। মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইলেও দাসীবৃত্তিশালিনী কবিতা রাজরাণীর আসনে শোভা পায় না। আমরা অতি গভীর দুঃখের সহিত বলিতেছি, কুরুক্ষেত্রের কবিতা অনুকরণের উপর ফুটিতে গিয়া সেইরূপ দৃষ্টিকটু হইয়াছে।

অনুকরণে যে দোষ, কৃতীও তাহা হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পায় না। যেরূপ অন্তস্তলদর্শিনী চিন্তা হইতে, কার্য্যকারণের যেরূপ খাটি বিশ্লেষণ হইতে, সর্ব্বোপরি স্বভাবের যেরূপ অটুট ভিত্তির উপর প্রকৃত কবিতার সৃষ্টি, অনুকারী কবি তাহা কোথায় পাইবেন? ফলতঃ সেরূপ চিন্তা, বিশ্লেষণ ও স্বভাব জ্ঞান তাঁহার পক্ষে তত আবশ্যক নহে। কেননা, ভিতরে ভিতরে তিনি এক মহা কবির পথে চালিত—দোষগুণের জন্য তাঁহার চিন্তা হইবে কেন? এই শ্রেণীর কবিগণ এক ধর্ম্মে অনুবাদক মাত্র, আদর্শ স্থানীয় কবির কথা নিজের কথায় প্রকাশ করেন মাত্র। ৺ রাজকৃষ্ণ রায়ের ন্যায় ইঁহারা প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে অনবরত কবিতা লিখিতে পারেন বটে, কিন্তু যাহা প্রকৃত ও মৌলিক কাব্য, তাহাতে ইঁহাদের অধিকার জন্মে না। নবীন বাবুর কুরুক্ষেত্রে এতাদৃশী হীনা কবিতার প্রাচুর্য্য অধিক। ভূধর-সাগরোত্তেজিতা চট্টোবাসিনী কবিতাশক্তি কাঁটালপাড়ায় বিষবৃক্ষের সহিত জড়িত হইতে গিয়াই এই হতভাগ্য দেশকে এক মহারত্ন হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। উত্তরার চরিত্রে পাঠক ইহার এক নিদর্শন দেখিতে পাইবেন।

কুরুক্ষেত্রের দ্বিতীয় সর্গে উত্তরার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়। উত্তরার চরিত্র যেরূপ ভাবে আরব্ধ, যদি সেইরূপে স্ফুট ও সমাপ্ত হইত, না জানি উত্তরা কি চমৎকারিণী নায়িকা হইতেন। আমরা উত্তরাকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি, পাঠক দেখিবেন, এই বিকচ পঙ্কজিনী কর্দ্দমাক্ত হইয়া কি প্রকার হতশ্রী হইয়াছেন।

উত্তরার প্রথম উদয় "প্রীতিপূর্ণ শান্তির ত্রিদিবে।" সেই স্থান কবির অতুল্য বর্ণনা শক্তির প্রভাবে কিরূপ রমণীয় হইয়াছে, দেখুন:—

ঝটিকা বিক্ষুব্ধ, মত্ত, বিধূনিত
পারাবার গর্ভে মরকত পুর
শোভে বরুণের, শান্তির আধার—
বরুণ বারুণী—কি চিত্র মধুর!
রণ ঝটিকায় মত্ত বিক্ষোভিত
কুরুক্ষেত্র গর্ভে, শোভার আধার
শোভিছে শিবির—শান্তির ত্রিদিব
প্রীতিপূর্ণ—অভিমন্যু উত্তরার।

এই প্রীতিপূর্ণ শিবিরে—

প্রীতির স্বপন প্রতিমা যুগল,
সুখ শান্তিভরা জ্যোৎস্না মুখে,
প্রীতির স্বপন নয়নে তরল,
সুখ শান্তিভরা জ্যোৎস্না বুকে।
ক্ষুদ্র এক খণ্ড ফুল্ল নিরমল।
বৈশাখী জ্যোৎস্না অমৃতে ভরিয়া,
সৃজিলেন বিধি মূর্ত্তি উত্তরার,
অঙ্গে অঙ্গে রূপ তরঙ্গ তুলিয়া।

শত শরচ্চন্দ্র ও ইন্দ্রধনু সংগ্রহ করিয়াও ভারতচন্দ্র বিদ্যায় এরূপ রূপ ফলাইতে পারেন নাই।

কিন্তু এত গেল উত্তরার রূপ, তাঁহার হৃদয়?

আনন্দ নির্ঝর উছলে হৃদয়ে—
আনন্দ নির্ঝর নয়নে ভরা
আনন্দ নির্ঝর ক্ষুদ্র বক্তাধর
ঢালে অবিরাম আনন্দ ধারা।
সে হাসি আনন্দ আনন্দ সে ভাষা
কাঁদিতে ও হাসি অশ্রুতে ভাসে।
অভিমান ভরে থাকে যদি বালা
কোথা হাসি যেন লুকায়ে হাসে।
যথায় উত্তরা তথা উচ্চ হাসি
তরঙ্গে তরঙ্গে বাঁশরী ঝঙ্কার—
যথায় উত্তরা তথা উচ্চ ভাষা
কিশোরীর? না, না, স্বর্গীয় বীণার।

এই সদানন্দময়ী পবিত্র স্বর্গীয় বীণার বয়ঃক্রম কত, ইহা জিজ্ঞাস্য হইবে বিবেচনা করিয়া কবি উত্তর দিতেছেন;—

এই হাসি রাশি কুসুম কাননে
কৈশর যৌবন করিছে কি রণ,
কহিছে যৌবন "উত্তরা যুবতী"
কিশোর কহে "না, কিশোরী এখন।"

আর সমালোচক বলেন,

"না না,
উত্তরা এখন গর্ব্ভবতী হন।"

এই স্থান হইতে আমাদের দুর্ভাগ্যের আরম্ভ। যে বালিকা সে দিন গোগৃহ যুদ্ধের সময় পুতুলের বস্ত্রের জন্য লালায়িত, সে আজ গর্ব্ভবতী। বোধ হয় ছয় মাস কালও অতীত হয় নাই, সেই উত্তরা এক্ষণে গর্ব্ভবতী। ইহাতে নবীন বাবুর দোষ দিব কি? ইহা নৈমিষারণ্যের কীর্ত্তি ও হিন্দুর দুর্ভাগ্য!

যে সময় কুরুপাঞ্চাল যুদ্ধের আরম্ভ, তখন আর্জুনি অভিমন্যু পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সীমান্তে দণ্ডায়মান। আমরা গণেশ দেউস্কর নহি যে, উত্তরার বয়ঃক্রম পলানুপলে ঠিক করিয়া বলিতে পারিব। তবে বোধ হয়, তিনি সে সময় একাদশ কি দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করেন নাই। সৌভাগ্যের বিষয় সে সময় সহবাস-সম্মতি-আইন বিধিবদ্ধ ছিল না। তাহা হইলে, যুধিষ্ঠির যেরূপ খাটি ধার্ম্মিক ছিলেন, অভিমন্যুকে আর শান্তির ত্রিদিবে থাকিয়া গর্ব্ভবতী বালিকার পশ্চাৎ ছুটাছুটি করিতে হইত না; লৌহ-পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া জেলখানায় থাকিতে হইত।

এখানে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, যাহারা বঙ্কিম বাবুর কথানুসারে উত্তরা, অভিমন্যু, পরীক্ষিৎ ও জনমেজয়কে আদি মহাভারতের অন্তর্গত বিবেচনা করেন, কেননা তাহা না হইলে মহাভারতের পারস্পরিক ঘটনার সামঞ্জস্য হয় না, তাঁহাদিগকে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, বেদ-সংগ্রহকর্ত্তা কাবর মনে কি এতাদৃশ বালিকা গর্ব্ভবতার কথা উদয় হওয়ার সম্ভব? যে সময়ে হিন্দু জীবন চূড়ান্ত বলবিক্রমে, জ্ঞান বিজ্ঞানে সুশোভিত, সে সময়ের বৈদিক কবি কি ১১, ১২, ১৩ কি ১৪ বর্ষীয় বালিকাকে গর্ব্ভবতী করিয়া জনসমাজে উপস্থিত করিতে পারেন?

ফলে আদি মহাভারতের সহিত এই সকল চরিত্রের কোন সংশ্রব নাই। আদি মহাভারত আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারের পরে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদি চরিত্রে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এই সমুদায়ই নৈমিষারণ্যের ব্রাহ্মণ পুঙ্গবগণের কীর্ত্তি-ধ্বজা। নবীনচন্দ্র অজ্ঞাতসারে সেই ধ্বজাবাহক সাজিয়াছেন। নবীনচন্দ্র উত্তরার গর্ব্ভের বিষয় বিস্মৃত হন নাই।

"শৈ। তুমি কৌরবের লক্ষ্মী, আছে মা গর্ব্ভে তোমার
একই অঙ্কুর মাত্র কৌরবের ভরসার।
মানবের আশাতরু ধর্ম্মরাজ্যে ভিত্তিভূমি
হবে তব পুত্র, হবে ধর্ম্মরাজ্যে লক্ষ্মী তুমি।
১৭শ সর্গ, ৩৩৩ পৃ

যে উত্তরা কবির কল্পনায় গর্ব্ভবতী বলিয়া স্থিরীকৃত, সেই উত্তরার চরিত্র পাঠক আবার অনুসরণ করুন।

অভিমন্যু চিত্র আঁকিতে জানিতেন। পূর্ব্ববর্ণিত শিবিরে বসিয়া তিনি ভীষ্মের শরশয্যা চিত্রিত করিতেছিলেন। তাঁহার মুখ "আনত।" এমন সময়ে উত্তরা "চুপে চুপে" পশ্চাৎ আসিয়া কহিলেন ;—

"রণ ক্ষেত্র হতে দিলে পিটটান ?
জীব হত্যা রণে হল কি অপ্রীতি ?
কত শত আজ দিলে বলিদান ?"

অভিমন্যু ভীষ্ম-শরশয়নাঙ্কনে বিরত হই-লেন না। কিন্তু উত্তর করিলেন।

"যথার্থ উত্তরে! দিয়াছি পিটটান।
যুঝিতে যুঝিতে কি মনে পড়িল,
কার হাসিটুকু, কার মুখখান।"

তাহার পর সেই একাদশ কি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা "দেখি দেখি" বলিয়া স্বামীর আনতমুখ উন্নত করিলে,অভিমন্যু বলিলেন,

"এই মুখ বটে, এ হাসিটুকু।"

অতঃপরে কি হইল,—

অধরে অধর হইল মিলিত
অধরে অধর রহিল গাপা
অধরে অধর কি সুধা ঢালিল
নিমীলিত চারি নয়ন পাতা।

গর্ব্ভবতী উত্তরার মনে তখন কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে, দেখুন ;—

"নরহত্যা করি মিটেনি কি সাধ ?
নারীহত্যা কেন এরূপে আবার ?"

অভিমন্যু আবার উত্তরা হইতেও কিছু ফাজিল, কহিলেন,—

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে করে নরহত্যা
যেজন, একথা সাজে কি তার ?
তবে নরহত্যা মানি শ্রেষ্ঠ তব,
মারিয়া বাঁচাও দিনে শত বার।
ইচ্ছা, থাকি প্রেম অনন্ত স্বপনে
অই বুকে মরি, জাগিনা আর।

এই প্রকারে ত ভীষ্মশরশয্যার চিত্রকর অভিমন্যু ও গর্ব্ভবতী উত্তরার অতি পবিত্র মনোবৃত্তির বিনিময় হইল। কিন্তু ইহাতেও চিত্রকর স্বকার্য্য হইতে বিরত হন নাই। উত্তরা তখন চুপেচুপে তাহার তুলিটি লইয়া চম্পট। "চোর! চোর।" বলিয়া অভিমন্যু তাহার পশ্চাৎ ধাবিত লইলেন। উত্তরাও বনকুরঙ্গিনীর মত ঘুরিয়া ফিরিয়া এবং "হাসির ঝলকে শিবির আলা" করিয়া ধাবমানা হইলেন। অভিমন্যু তখন

ক্রীড়াবন ত বন কুরঙ্গের মত,
পশ্চাতে পশ্চাতে কিশোর ধায়,—
মুখভরা হাসি, প্রেমভরা আঁখি,
দুইটি বিদ্যুত খেলিয়া বেড়ায়।"

কুরঙ্গিনী অতঃপরে ধরা পড়িলেন ;—

"এ বার যুবক ধরিল সাপটি,
"হিহি" উচ্চ হাসি হাসিছে বালা,
কর হতে তুলি লইল কাড়িয়া
চাপিয়া হৃদয়ে কুসুম মালা।

মালা ত হৃদয়ে চাপিয়া গেল ; হাসি রাশির উপর ও অজস্র চুম্বন বর্ষণ হইতে লাগিল ;—

চুম্বিলা সে হাসি আবার আবার
হাসিতে সুন্দর মিসিল হাসি।
নিপীড়িত যুগ্ম কুসুম স্তবক
ঢালিল হৃদয়ে অমৃত রাশি।

এখন উত্তরা কি দয়ার পাত্র। তাঁহার বদন মুক্তকেশাবৃত হইয়া যুবকের বাম-প্রকোষ্ঠে শোভিতেছে,যুবকের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে তাহার ক্ষীণ কটিতট কুসুমদামের ন্যায় শোভা পাইতেছে। আর উত্তরা নিজে

জ্যোৎস্নার লতা উত্তরীয় মত
শোভিতেছে বক্ষে, মোহিত প্রাণ।

চুম্বিছে যুবক আবার আবার
ফুলে ফুলে সেই পুষ্পিতা লতা,
আবার আবার হাসির তরঙ্গ।
কি ভাষা হাসির! মরি কি কথা!

আমরাও ভাবিতেছি, মরি কি কথা! এ কথাটা বোধ হয় ভাগবতের রাধাকৃষ্ণের নিষ্কাম প্রেমের কথা হইবে।

যাহা হউক, রণ সাঙ্গ হইল;—

"সাঙ্গ হল রণ; আবার আসনে
বসিল যুবক আঁকিতে ছবি।
কহিল পাগলী দেখ লো চাহিয়া
জগতে অতুল বীরত্ব ছবি।"

আমরাও এই অবসরে বঙ্কিমচন্দ্রের অতুল কবিত্ব ছবি দেখিব ও দেখাইব।

পাঠকেরা অবশ্য অবগত আছেন যে, বিষবৃক্ষে "মহাসমর" নামে একটি অধ্যায় আছে। তাহাতে বাঙ্গালী কেরাণী বাবু শ্রীশচন্দ্র ও তদীয় সহধর্ম্মিণী কমলমণির মহাসমরের কথা আছে। আমরা তাহার খানিক অংশ নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

কমলমণি। শুধু কি তাই? সতীশের নিমন্ত্রণ আমার নিমন্ত্রণ আর তোমার নিমন্ত্রণ।

শ্রীশ। আমার নিমন্ত্রণ কেন?

ক। আমি বুঝি একা যাব? আমাদের সঙ্গে গাড়ু গামছা নিয়ে যাবে কে?

শ্রী। এ সূর্য্যমুখীর বড় অন্যায়। শুধু গাড়ু গামছা বহিবার জন্য যদি ঠাকুর জামাইকে দরকার হয়, তবে আমি দুদিনের জন্য একটা ঠাকুর জামাই দেখিয়ে দিতে পারি।

কমলমণির বড় রাগ হইল। সে ভ্রুকুটি করিল এবং শ্রীশচন্দ্র যে কাগজখানায় লিখিতেছিল, তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিল। শ্রীশ হাসিয়া বলিল "তাহা লাগ্‌তে আস কেন"? কমলমণি কৃত্রিম কোপ সহকারে কহিল "আমার খুসী আমি লাগ্‌বো।"

শ্রীশচন্দ্র কৃত্রিম কোপ সহকারে বলিলেন "আমার খুসী আমি বল্‌বো।" তখন কোপযুক্ত কমলমণি শ্রীশকে একটি কিল দেখাইল। রাগে শ্রীশচন্দ্র দ্রুতগতি ধাবমান হইয়া কমলমণির মুখচুম্বন করিলেন। রাগে কমলমণি অধীর হইয়া শ্রীশচন্দ্রের মুখচুম্বন করিল।

দেখিয়া সতীশচন্দ্রের বড় প্রীতি জন্মিল। তিনি জানিতেন যে, মুখচুম্বন তাহার ইজারা মহল। অতএব তাহার ছড়াছড়ি দেখিয়া রাজভোগ আদায়ের অভিলাষে মার জানু ধরিয়া দাড়াইয়া উঠিল এবং উভয়ের মুখপানে চাহিয়া হাসির লহর তুলিলেন। "সে হাসি কমলমণির কর্ণে কি মধুর বাজিল! কমলমণি তখন সতীশকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া ভূরি ভূরি মুখচুম্বন করিলেন। পরে শ্রীশচন্দ্র ও কমলের ক্রোড় হইতে তাহাকে লইলেন এবং ভূরি ভূরি মুখচুম্বন করিলেন।"

ইহার পর রসিক বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কালে ভগদত্ত ও অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ভগদত্ত অর্জ্জুনের প্রতি অনিবার্য্য বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করেন; অর্জ্জুনকে তন্নিবারণে অক্ষম জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বক্ষ পাতিয়া সেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার শমতা করেন। সেইরূপ কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্রের এই বিষম যুদ্ধে সতীশচন্দ্র মহাস্ত্র সকল আপন বদন মণ্ডলে গ্রহণ করায় যুদ্ধের শমতা হইল।"

আমরা অবগত নাই উত্তরার গর্ব্ভে থাকিয়া পরীক্ষিৎ উত্তরাভিমন্যুর এই মহাস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না? তবে আমরা দেখিতে পাই "রণ সাঙ্গ" হইয়াও সাঙ্গ হয় নাই। যুবা যে ছবি আঁকিতে বসিয়াছিলেন, সে ছবি আঁকা সাঙ্গ হইয়া-

ছিল বটে। কিন্তু "নায়কে শায়িত" ভীমমূর্ত্তি "কি নিষ্ঠুর দৃশ্য" বলিয়া উত্তরার তাহা ভাল লাগিল না। বরঞ্চ অভিমন্যুর তদ্বিধ আশা আকাঙ্ক্ষার আভাস পাইয়া তিনি ছবি লইয়া পলায়ন করিলেন এবং বলিলেন,

"এখনি উনলে করি সমর্পণ
এ সাধের ছবি করিব ছাই।
ফেলিয়া সে ছাই হিরণ্বতী জলে,
দিব করতালি, তাই তাই তাই।"

ইহার পরে উত্তরা কক্ষ গালিচায় শুইয়া পড়িলেন ;—

কুসুম কোমল কক্ষ গালিচায়
কুসুমিতা লতা ঢলিয়া পড়ি,
কাম-স্বপ্ন শয্যা পুষ্পিত উরসে
হাসিছে ছবিটি চাপিয়া ধরি।

* *

মুগ্ধপ্রাণ যুবা চাহিয়া চাহিয়া
ঈষদ্ ঈষদ্ করে পরশন,
বুবঙ্কিম গ্রীবা সুগোল সুন্দর
পার্শ্বব্রীড়ালয় মার্জ্জিত কাঞ্চন।
দিয়া গড়াগড়ি হাসিতেছে বালা
লহরে লহরে ছুটিছে হাসি,
বিকাশিছে মরি উন্মেষ যৌবন
লহরে লহরে কিরূপ রাশি।

উত্তরার "কামস্বপ্ন শয্যাপুষ্পিত উরসে" এক্ষণে কি প্রকার চিত্তবৃত্তি স্ফুরিত হইতেছে, তাহা আমরা সবিশেষ বলিতে পারিব না। তবে দেখা যায়, তাঁহার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে, হৃদয়ের অন্য বৃত্তি সকল নিবিয়া গিয়া অবশতার সহায়তা করিতেছে, হস্ত হইতে চিত্র স্খলিত হইতেছে।

দিয়া গড়াগড়ি হাসিতে হাসিতে
চিত্র হইতে চিত্র পড়িল খসিয়া।
এক চিত্রকরে অন্য চিত্র বক্ষে।
হাসিয়া যুবক লইল তুলিয়া।
প্রাণেশের করে ক্ষীণকটি খানি,
যেন ফুলধনু ঢুলিয়া পড়ি,
আলু থালু কেশ, আরক্ত বদনে
আয়ত নয়নে কি ক্রীড়া মরি!
অশ্রান্ত হাসির আবেশ নয়নে
পতিমুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া
বাড়াইছে কর ধরিতে সে ছবি—
খেলে দুই পদ্ম কি লীলা করিয়া!
কি লীলা করিয়া খেলে কর্ণফুল!
কি লীলা করিয়া খেলিছে বলয়!
দোলে মুক্তা হার কিবা লীলা করিয়া!
শিঞ্জিনী শিঞ্জন কিবা লীলাময়!

ইহার পর আবার সেই সহস্র চুম্বনের পুনরভিনয় হইল।

আবার আবার সহস্র চুম্বন,
চুম্বন সহস্র আবার আবার ;
হাসির লহরে সহস্র সহস্র
কুসুম বর্ষণ কিবা অনিবার!

কিন্তু ইহাতে উত্তরার মনে ক্রোধ জন্মিল ; তিনি বলিলেন,

"নাহি চাহি ভালবাসার ঢঙ্।
বড়ই আমার লেগেছে বিষম।"

যুবা হাসিয়া কহিলেন

"লেগেছে কোথায়—
শরীরে, মনে কি নাকের আগায় ?
দিতেছি ঔষধ "আয় কাছে আয়।"

উত্তরাও ছাড়িবার পাত্রী নন ;—

"আয় কাছে আয়"—মাথা হেলাইয়া
হাসি কান্না মুখে কহিল উঠি।"

যে উত্তরাভিমন্যুকে শান্তির ত্রিদিবে উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহারা এক্ষণে পরস্পরকে "আয় আয়" করিয়া গালিচায় শুইয়া পড়িয়া ডাকাডাকি করিতেছে। পাঠক ইহার পর আর কি দেখিতে চান ?

তবে উত্তরা একটুক বুদ্ধিমতী ছিলেন, ছবিটি লইয়া এক্ষণে পলাইয়া দাইমা সুলোচনার নিকট চলিয়া গেলেন। সেখানে অভিমন্যু উত্তরায় একটা মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইল। সুলোচনা দাসী চিফ্ জষ্টিস মহাশয়া।

"আমার উপরে কে সে বিচারক।"

বলিয়া কি রায় দিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ নাই।

আমরা দ্বিতীয় সর্গে উত্তরার চরিত্রের যে চিত্র পাইলাম, তাহা বিস্তারশঃ উদ্ধৃত করিলাম। বঙ্কিম বাবু শ্রীশ-কমলমণিতে যে চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, ইহা কি তদপেক্ষা অন্যতর? তদপেক্ষা ইহা বিপুল বটে, কিন্তু মূলে সেই একই চিত্র।

তবে বঙ্কিম বাবুর চিত্র নির্দ্দোষ। তিনি কোন গর্ব্ভবতী ললনাকে এরূপ অবস্থায় উপস্থিত করেন নাই। কোন হিন্দু কবিই গর্ব্ভবতী ললনার এরূপ নির্লজ্জ ব্যবহার অঙ্কিত করেন নাই। ইহা কতদূর স্বাভাবিক, সে বিষয়েও আমাদের গভীর সন্দেহ। স্বাভাবিকই হউক আর অস্বাভাবিক হউক, প্রতিভাশালীর কবির হস্তে ভারত-ললনাকে এরূপ অশ্লীলতার আকণ্ঠ মগ্ন কে ইচ্ছা করে সত্য বটে, বিদ্যার চরিত্রে অশ্লীলতা চূড়ান্ত স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কৈফিয়ৎ আছে, নবীনচন্দ্রের কৈফিয়ৎ নাই।

পাঠকেরা স্মরণ করুন, সীতা গর্ব্ভবতী অবস্থায় কিরূপ অঞ্চল পাতিয়া শুইয়া থাকিতেন। সুদক্ষিণা অজকে গর্ব্ভে ধারণ করিয়া প্রভাতকল্পা শশীযুক্তা শর্ব্বরীর ন্যায় কেমন পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন। আর তুলনা করুন,সেই পৌরাণিক সাহিত্য হইতে গর্ভবতী নায়িকা "আরক্ত বদনা" লইয়া নবীনচন্দ্র কামস্বপ্ন রাগরঞ্জিতা উত্তরার কি চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। তবে নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র' নাকি উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত; এই যা বলুন।

কেন উত্তরার চরিত্র এইরূপ হইল, কেন প্রথম শ্রেণীর বর্ণনা ও কবিত্ব আস্তে আস্তে আমাদিগকে স্বর্গ হইতে নামাইয়া আনিয়া নরকের উপান্তভূমে ফেলিয়া গেল, ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে, অনুকরণস্পৃহা ইহার মূল কারণ। কবির মনে তখন শ্রীশ-কমলমণির চিত্র জাগ্রত এবং তাহা হইতে তিনি রঙ্ লইয়া স্বীয় চিত্রে তুলিকা-পাত করিতেছেন। ভুল হইতেছে, উত্তরা কমলমণি নহে, শ্রীশ অভিমন্যু নহে; তথাচ কবি উঠিতে পারিতেছেন না। ভুল করিয়াও সেই অনুকৃত পথে ধাবিত হইতেছেন। আর উত্তরার চরিত্রাঙ্কন যদি তাঁহার নিজস্ব হইত, কৈশর যৌবনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মানা গর্ব্ভবতী হিন্দু ললনার কি এক লজ্জাশীল চিন্তান্বিত সঙ্কোচভাব—লজ্জাবতী লতার সঙ্কোচ ভাবের মত—কি এক অপূর্ব্ব চিত্র নবীনচন্দ্রের হস্ত হইতে চিত্রিত দেখিতাম, তাহার তুলনা নাই। আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ তাহা হইল না।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

নেপালের পুরাতত্ত্ব। (৮)

মল্লবংশ।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মল্লদেব ললিতপট্টনের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি অনন্ত বা আনন্দমল্লের পুত্র বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। পূর্ব্বপ্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে যে,অনন্ত মল্ল ১২২০—৪০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত নেপালে রাজত্ব করেন। বংশাবলীতে এই মল্লদেবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই মল্লদেবের দ্বারাই নেপালে মল্লবংশের অধি-

কার দূরীভূত হয়। পাঁচ পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া, নিম্নে মল্লবংশের আনুমানিক রাজত্ব সময় নির্দ্দিষ্ট হইল। কালক্রমে সমগ্র নেপালে মল্লবংশের আধিপত্য বিস্তারিত হয়। মল্ল দেবের অধস্তন অষ্টম পুরুষ জয়স্থিতিমল্লের আধিপত্য সম্ভবতঃ নেপালের সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়। জয়স্থিতিমল্লের প্রপিতামহ নাগেন্দ্র-মল্লের সময়ে ১২৪৬ শকাব্দে (১৩২৪খ্রীঃ) মিথিলার রাজা হরিসিংহ দেব নেপাল আক্রমণ করেন। চারি পুরুষ রাজত্বের পর, হরিসিংহ দেবের বংশ নেপাল হইতে বিলুপ্ত হয়। হরিসিংহ দেবের প্রপৌত্র শ্যামসিংহ দেবের মৃত্যুর পর, মল্লবংশের অপ্রতিহত প্রভুতা নেপালে সংস্থাপিত হয়। এই সময় হইতে বংশাবলীর প্রদত্ত নামমালা অধিক পরিমাণে সত্য ও সমূলক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। জয়স্থিতি মল্লের বংশধরদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে।

মল্লবংশ।

মল্লদেব (১২৪০—৬০খ্রীঃ)
জয়ভদ্রমল্ল (১২৬০—৮০)
নাগমল্ল (১২৮০—১৩০০)
জয়জগৎমল্ল (১৩০০—২০)
নাগেন্দ্র মল্ল (১৩২০—৪০)
উগ্রমল্ল (১৩৪০—৬০)
অশোকমল্ল (১৩৬০—৮০)
জয়স্থিতিমল্ল (১৩৮০—১৪০০খ্রীঃ)

সূর্য্যবংশ।

হরিসিংহ দেব (১৩২৪—৫০খ্রীঃ)
মতিসিংহ দেব (১৩৫০—৭০)
শক্তিসিংহ দেব (১৩৭০—৯০)
শ্যামসিংহ দেব (১৩৯০—১৪১০খ্রীঃ)

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হরিসিংহ দেব অযোধ্যায় প্রাদুর্ভূত হন। তিনি সূর্য্যবংশে ও ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। মুসলমান জাতির আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া তিনি নেপালের দক্ষিণাংশে সুবিস্তীর্ণ জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই বিস্তীর্ণ ও বনাকীর্ণ ভূভাগ"তরাই" নামে পরিচিত। কালক্রমে সিমরাউনগড়ে তাঁহার রাজধানী সংস্থাপিত হয়। রাজধানীতে তিনি কুলদেবতা তুলজা ভবানীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ভুজবীর্য্যে মিথিলায় আপনার প্রাধান্য স্থাপন করেন। মিথিলা তাঁহার শাসনদণ্ডের অধীন হওয়ার পরে,তিনি কুলদেবীর আদেশক্রমে নেপাল আক্রমণ করেন। নেপালের কিয়দংশ অধিকার করিয়া, তিনি ভাটগাঁয় আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। এইরূপে হরিসিংহ দেব মিথিলা ও নেপাল এক শাসনদণ্ডের অধীনে আনয়ন করেন। সিমরাউনগড় ও ভাটগাঁ হইতে তিনি এই উভয় রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মিথিলা স্বাধীনতা অবলম্বন করে। নেপালের বংশাবলীর মতে ৪৪৪ নেপালী সংবতে (১৩২৪ খ্রীঃ)হরিসিংহ দেব নেপালে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার প্রপৌত্র শ্যামসিংহ দেবের রাজত্ব কালে নেপালে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। তাহাতে অনেক প্রাণী বিনষ্ট ও বহুতর গৃহাদি ভূমিসাৎ হয়। ৫২৮ নেপালী সংবতের (১৪০৮খ্রীঃ) ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে এই ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। রাজা শ্যামসিংহের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয়। অনন্তর মল্লবংশের একাধিপত্য নেপালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মল্লবংশীয় জয়স্থিতিমল্ল সূর্য্যবংশের দৌহিত্র ছিলেন। শিলালিপির দ্বারাও এই সম্পর্কের বিষয় জানা যাইতেছে।

নেপালের দুইখানি শিলালিপিতে এই হরিসিংহ দেবের নাম পাওয়া যাইতেছে।

তন্মধ্যে প্রথম লিপি ৭৫৭ নেপালী সংবতের (১৬৩৭খ্রীঃ) ফাল্গুন মাসের বৃহস্পতিবারে ও শুক্লাদশমী তিথিতে খোদিত হয়। ললিত-পট্টনের মল্লবংশীয় রাজা সিদ্ধিনৃসিংহ মল্লের আদেশে ইহা উৎকীর্ণ হয়। এই লিপি উক্ত বৈষ্ণব রাজার প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, সিদ্ধিনৃসিংহ মল্লের পূর্ব্ব পুরুষ মহেন্দ্রমল্ল, হরিসিংহদেবের প্রতিষ্ঠিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহেন্দ্রমল্লের পুত্র শিবসিংহ দেব। শিবসিংহ দেবের পুত্র হরিহর সিংহ। হরিহর সিংহের পত্নী লালমতীর গর্ভে রাজা সিদ্ধিনৃসিংহ মল্লের জন্ম হয়। সিদ্ধিনৃসিংহ মল্লের গুরুর নাম বিশ্বনাথ উপাধ্যায়।

"প্রাবীণ্যপ্রথিতঃ প্রতাপমথিত-প্রত্যার্থিপৃথ্বীপতি-
প্রোদ্দামপ্রমদোঘলোচন-পয়ঃ-প্রারব্ধ-বারাং নিধিঃ।
জাতঃ শ্রীহরিসিংহ দেব নৃপতি দাঁতাবদাতান্বয়ে,
সংপ্রাপ্তঃ পৃথুনা নৃপেণ সমতাং যো বৃত্তিদাতা সতাং।"২।

নেপালের মহারাজ প্রতাপমল্ল নিজের বংশাবলী ত্রিশটী শ্লোকে রচনা করেন। তাঁহার আদেশে ৭৭৮ নেপালী সংবতে (১৬-৫৮ খ্রীঃ) এই রাজ বংশাবলী পশুপতিনাথের মন্দিরের অঙ্গনে এক শিলাখণ্ডে রাজার আদেশে উৎকীর্ণ হয়। অদ্যাপি এই শিলালিপি তথায় বর্ত্তমান আছে। ইহাতে সুকবি ও বিদ্যোৎসাহী মহারাজ প্রতাপমল্ল আপনাকে হরিসিংহদেবের বংশধর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে লিখিত রহিয়াছে যে, সূর্য্যবংশে বৈবস্বত মনু জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর এই বংশে যথাক্রমে দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ, রাম ও লব প্রাদুর্ভূত হন। হরিসিংহ দেব এই সূর্য্যবংশে প্রাদুর্ভূত হইয়া মিথিলায় রাজত্ব করেন। তাঁহার আদেশে মিথিলায় অসংখ্য জলাশয় ও সরোবর খনিত হয়। রাজা যক্ষমল্ল এই হরিসিংহদেবেরই বংশধর ছিলেন।

"জাতঃ শ্রীহরিসিংহদেব-নৃপতিঃ প্রৌঢ়প্রতাপোদয়ঃ।
তদ্বংশে বিমলে মহারিপুহরে গাম্ভীর্য্যরত্নাকরঃ॥
কর্ত্তা যঃ সরসামুপেত্য মিথিলাং সংলক্ষ্য লক্ষপ্রিয়ো।
নেপালে পুনরাঢ্য বৈভবযুতে স্থৈর্য্যং বিধত্তে চিরং॥১০॥
মাণিক্যপ্রতিম-প্রতাপপটলৈ-রাদীপ্তলোকত্রয়ো
মুক্তাপংক্তিসহস্রশোভনযশোবৃন্দেন সংশোভিতঃ।
পঙ্কত্যাকৃতিকর্ণ বারণ-গিরিগ্রামাবন-ব্যাকুলঃ।
পারাবারমিবেহ যঃ পরিহসত্যাধার চিন্তেহচ্যুতং॥১১

রাজা হরিসিংহদেবের নিকট মিথিলার ইতিহাস সবিশেষ ঋণী। তাঁহার আদেশে মিথিলার প্রামাণিক ইতিহাস "পাঞ্জী" লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। মৈথিল ব্রাহ্মণগণ তালপত্রে আপনাদের বংশাবলী লিখিতে আরম্ভ করিয়া, "পাঞ্জিয়ার" নামে পরিচিত হয়। মিথিলার পাঞ্জিয়ার বাঙ্গলার কুলজ্ঞ ঘটকের অনুরূপ। ১২৪৮ শকাব্দে (১৩২৬ খ্রীঃ) রাজা হরিসিংহ দেবের আদেশে মিথিলার " সঙ্কলিত হইতে আরম্ভ হয়।

"শাকে শ্রীহরিসিংহদেবনৃপতে র্ভূপার্কতুল্যে জনি।
তস্মাদন্তমিতেঽব্দকে দ্বিজগণৈঃ পাঞ্জী-প্রবন্ধঃ কৃতঃ।"
(বঙ্গদর্শন, ৪।৮৪ পৃষ্ঠা।)

মিথিলার রাজা হরিসিংহ দেবের সময়ে মিথিলায় সংস্কৃতের সবিশেষ চর্চ্চা আরম্ভ হয়। চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর তাঁহার অমাত্য-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি "রত্নাকর" নামে সাত খানি স্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি আপনাকে 'মহাসান্ধিবিগ্রাহিক' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। চণ্ডেশ্বরের পিতার নাম বীরেশ্বর ঠাকুর। "ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা" নামক পুস্তকে আমরা চণ্ডেশ্বরের সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে লিখিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। "বিবাদরত্নাকর" নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থের শেষভাগে চণ্ডেশ্বর লিখিয়াছেন যে,১২৩৬ শকাব্দে (১৩১৪খ্রীঃ) তিনি 'তুলাপুরুষ' নামে মহাদান ব্যাপার সম্পন্ন করেন। বাগ্‌বতী (বাঘমতী) নদীর তীরে তিনি অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষে এই দান কার্য্য সম্পাদন করেন। তিনি রাজা হরিসিংহদেবের নাম উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার কুলদেবী ভবানীর উল্লেখ করিয়াছেন। মহারাজ হরিসিংহ দেবের নেপাল বিজয়ের বিবরণ এই পুস্তকের আরম্ভে উল্লি-

খিত হইয়াছে। ১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পর এই বিবাদরত্নাকর রচিত হয়। এই বর্ষে মহারাজ হরিসিংহ দেব নেপালের কিয়দংশ অধিকার করিয়া, ভাটগাঁয় স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। জার্ম্মেন ওরিয়েণ্টেল সোসাইটীর পুস্তকালয়ের একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থের শেষভাগ দৃষ্টে হরিসিংহদেবের নেপালে প্রতিষ্ঠার কাল ১২৪৫ শকাব্দ (১৩২৩-২৪খ্রীঃ) বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ১৩১৪খ্রীঃ হরিসিংহদেব যে মিথিলার অন্তর্গত সিমরাউনগড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার অমাত্য চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের রচিত "বিবাদরত্নাকর" গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হইতেছে।

"সর্ব্বোপকারে সুরবাহিনীব,
সর্ব্বার্থসিদ্ধৌ কমলালয়েব।
সর্ব্বাশ্রয়া পাতু পবিত্রয়ন্তী
শ্রীমৎক্ষিতীশং মুদিতা ভবানী॥
"শ্রীচণ্ডেশ্বরমন্ত্রিণা মতিমতানেন প্রসন্নাত্মনা,
নেপালাখিল ভূমিপালজয়িনা পুণ্যাত্মনা কর্ম্মণা।
বাগ্বত্যাঃ সরিত স্তটে সুরধুনী সাম্যং দধত্যাঃ শুচৌ,
মার্গে মাসি যথোক্তপুণ্যসময়ে দত্ত স্তুলাপুরুষঃ॥
রস-গুণ-ভুজ-চন্দ্রৈঃ সম্মিতে শাকবর্ষে
সহসি ধবলপক্ষে বাগ্বতীসিন্ধুতীরে।
অদিত তুলিতমুচ্চৈ-রাত্মনা স্বর্ণরাশিং
নিধিরাখিলগুণানাং উত্তরঃ সোমনাথঃ॥"
(বিবাদরত্নাকর)

হরিসিংহদেবের প্রতিষ্ঠিত সূর্য্য বংশের সহিত নেপালের মল্লবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে, মল্লবংশ আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া শাসন-লিপিতে পরিচিত করিয়াছেন। মল্লবংশীয় মহারাজ জয়স্থিতি মল্ল সূর্য্যবংশের দৌহিত্র ছিলেন। নেপাল হইতে আনীত একখানি হস্তলিখিত পুস্তকের শেষভাগ দৃষ্টে, ১৩৮৫খ্রীঃ জয়স্থিতিমল্ল নেপালের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া, বেণ্ডল সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৫১২ নেপালী সংবতে খোদিত জয়স্থিতি মল্লের নামাঙ্কিত এক শিলালিপির বিষয় বংশাবলীতে উল্লিখিত হইয়াছে। বংশাবলীর মতে তাঁহার পিতা অশোকমল্ল বাগমতী, মানমতী ও রুদ্রমতী নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থলে কাশীপুর নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন।

জয়স্থিতিমল্লের পত্নীর নাম রাজল্লাদেবী। রাজমহিষী রাজল্লাদেবীর গর্ব্ভে ধর্ম্মমল্ল, জ্যোতিমল্ল ও কীর্ত্তিমল্ল নামে মহারাজ জয়স্থিতিমল্লের তিনটী পুত্র জন্মে। পিতার মৃত্যুর পর ধর্ম্মমল্ল ও জ্যোতিমল্ল যথাক্রমে পৈতৃক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ধর্ম্মমল্লের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতিমল্ল নেপালের রাজত্ব করেন। ধর্ম্মমল্ল ও জ্যোতিমল্লের নাম বংশাবলীতে উল্লিখিত হয় নাই। জ্যোতিমল্ল লক্ষাহুতি দিয়া এক মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তিনি দেবপট্টন নগরে পশুপতিনাথের মন্দিরের চূড়ায় এক স্বর্ণ কলস প্রতিষ্ঠিত করেন। ৫৩৩ নেপালী সংবতের (১৪১৩ খ্রীঃ) মাঘ মাসের শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে ও রবিবারে এই সুবর্ণ কলস স্থাপন করেন। নেওয়ারী অক্ষরে এই শিলালিপি রাজাদেশে উৎকীর্ণ হয়। পশুপতিনাথের মন্দিরের পশ্চিমদ্বারের বামপার্শ্বে এই লিপি খোদিত রহিয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, মহারাজ জ্যোতিমল্লের মহিষীর নাম সংসার দেবী। এই রাণীর গর্ব্ভে মহারাজের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। যুবরাজ যক্ষমল্ল ভাটগাঁ নগরের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, যুবরাজ অনেক প্রজার প্রাণরক্ষা করিয়া তাহাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। যক্ষমল্লের ভগিনী রাজকুমারী জীবরক্ষার সহিত রাজা ভৈরবের পরিণয় সম্পন্ন হয়। যক্ষমল্লের জ্যেষ্ঠপুত্র জয়ন্তরাজ ভাটগাঁর শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শিলালিপির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। বংশাবলীর মতে ১৪৫৩খ্রীঃ ভাটগাঁর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নির্ম্মিত হয়। যক্ষমল্লের মৃত্যুর পর নেপাল তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়।

শ্রীসূর্য্যবংশ প্রভবঃ প্রতাপঃ,
শ্রীপট্টবস্তঃ স্থিতিমল্লদেবঃ।
রাজল্লদেব্যাঃ পতিরিন্দুমূর্ত্তি,
তস্যাত্মজঃ শ্রীজয়ধর্ম্ম মল্লঃ॥২॥
তস্যানুজো গুণনিধিঃ সুকৃতৈকসিন্ধু,
ভ্রাতা তু মধ্যজবরো জয়জ্যোতিমল্লঃ।
তস্যানুজো মদনরূপসমানদেহঃ,
ভ্রাতা কনিষ্ঠো রুচিরো জয়কীর্ত্তিমল্লঃ॥৩॥
শ্রীজ্যোতিমল্ল-হৃদয়নন্দন-যক্ষমল্লঃ,
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরবপুরতিমঞ্জুবাণীঃ।

ভক্তাপুরীনগর বাসিতসৌখ্যকারী,
দুর্ভিক্ষদুঃখভয়হারণ দেবমূর্ত্তিঃ ॥৮॥
জয়লক্ষ্ম্যাঃ সুতঃ শ্রীমান্ সুনয়ঃ পুণ্যবৎসলঃ।
জয়ন্তরাজেতি বিখ্যাতো জয়লক্ষ্মীপতিঃ সুধীঃ॥৯
অনেন পুণ্যেন চ তস্য ভূয়াৎ,
সহস্র বর্ষায়ুরহার্য্য কীর্ত্তিঃ।
নরেশ্বরঃ শ্রীজয়জ্যোতিমল্লঃ,
সৎপুত্র পৌত্রৈঃ মহভৃত্যবর্গৈঃ ॥১০॥
সংবন্নেপালকাখ্যে ত্রিভুবনদহনে কামবাণে প্রযাতে,
মাঘে শুক্লে চ কামে তিথিবিদিতে,প্রীতিযোগে চ পুণ্যে।
বারে পুষ্যাভিধানে, মকররবিগতে যুগ্মরাশৌ শশাঙ্কে,
শম্ভোঃপ্রাসাদশৃঙ্গে কনকময়ধ্বজং তত্র
সংরোহণংস্যাৎ” ॥১১॥

মহারাজজ্যোতিমল্লের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ন্তরাজ ভাটগাঁয় ও কনিষ্ঠ রত্নমল্ল কাটমাণ্ডু নগরে স্ব স্ব রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া, পৈতৃক রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। শিলালিপির জয়ন্তরাজ বংশাবলীতে জয়রামমল্ল নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। এক্ষণে মল্লবংশের নামমালা ও আনুমানিক সময় নির্দ্দেশ করিয়া, পশ্চাৎ তাঁহাদের নামাঙ্কিত শিলালিপির উল্লেখ করিব।

(মল্লবংশীয় নৃপতিগণ।)

জয়স্থিতিমল্ল (১৩৮০-১৪০০ খ্রীঃ।

ধর্ম্মমল্ল (১৪০০-১০) — (১) জ্যোতিমল্ল (১৪১০-৪০) — কীর্ত্তিমল্ল

যক্ষমল্ল (১৪৪০-৬০) — জীবরক্ষা + ভৈরব

(১৪৬০-৮০) জয়ন্তরাজমল্ল (ভাটগাঁ)
(১৪৮০ ১৫০০) সুবর্ণমল্ল

রত্নমল্ল (কাটমাণ্ডু) (১৪৬০-৮০)
সূর্য্যমল্ল (১৪৮০-১৫০০)

(১৫০০-২০) প্রাণমল্ল
(১৫২০-৪০) বিশ্বমল্ল

অমরমল্ল (১৫০০-২০)

নরেন্দ্রমল্ল (১৫২০-৪০)
মহেন্দ্রমল্ল (১৫৪০-৬০)

(১৫৪০-৬০) ত্রৈলোক্যমল্ল
(১৫৬০-১৬০০)(২) জ্যোতিমল্ল

সদাশিবমল্ল (১৫৬০-৮০)

শিবসিংহমল্ল (১৫৮০-১৬০০)
হরিহরসিংহমল্ল (১৬০০-২০)

(১৬০০-৪০) নরেন্দ্রমল্ল (নরেশমল্ল)
(১৬৪০-৭০) জগৎপ্রকাশমল্ল
(১৬৭০-৯০) জিতামিত্র মল্ল
(১৬৯০-১৭৩০)ভূপালেন্দ্রমল্ল
(১৭৩০-৪০) রণজিৎমল্ল

লক্ষ্মীনৃসিংহমল্ল (১৬২০-৪০)
প্রতাপমল্ল (১৬৪০-৯০)

পার্থিবেন্দ্র মল্ল(১৬৯০-৯১) — নৃপেন্দ্রমল্ল — মহীন্দ্রমল্ল (১৬৯১-১৭০৮) — চক্রপতীন্দ্রমল্ল

মহীন্দ্রমল্ল → ভাস্করমল্ল (১৭০৮-২৮)
জগজ্জয়মল্ল(১৭২৮-৪৮)

সিদ্ধিনৃসিংহমল্ল (১৬২০-৬০)
শ্রীনিবাসমল্ল (১৬৬০-১৭০১)
যোগনরেন্দ্র মল্ল (১৭০১-২০)
যোগমতী

লোকপ্রকাশমল্ল (১৭২০-৩০) — যোগপ্রকাশ (১৭৩০-৪০) — বিষ্ণুপ্রকাশ

রাজেন্দ্রপ্রকাশ — জয়প্রকাশ (১৭৪৮-৬৮ খ্রীঃ) — রাজ্যপ্রকাশ — নরেন্দ্রপ্রকাশ — চন্দ্রপ্রকাশ — কন্যা

কন্যা → (১৭৪০-৫০)বিশ্বজিৎমল্ল
(১৭৫০-৬০) তেজনরসিংহমল্ল

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

ভক্তির জয়।

(১)

কৌমুদী-বসন পরি
চারুচন্দ্র শিরে ধরি
বসন্ত যামিনী,
ঝিল্লীর মধুর রবে
গায়িছে আনন্দে ওই
আনন্দ রূপিনী।
চৌদিকে সহস্র ফুল
মল্লিকা চামেলী যুঁই
রয়েছে ফুটিয়া,
মন্দ মন্দ গন্ধবহ
সুগন্ধ নিশ্বাস ছাড়ি
চলিছে বহিয়া।
অদূরে রজত গঙ্গা
সুধা প্রবাহিনী রূপে
মোহিয়া নয়ন,
তরল তরঙ্গে রঙ্গে
মৃদু কুলকুল স্বরে
করিছে গমন।
নিস্তব্ধ প্রাণীর কণ্ঠ
নিদ্রার কোমল অঙ্কে
সুপ্ত ধরাতল,
পড়িছে শিশির বিন্দু
নবদূর্ব্বাদলে যেন
মুকুতা উজল।
সম্মুখে জাহ্নবী ওই
পশ্চাতে কুটীর, ঊর্দ্ধে
অনন্ত আকাশ,
বিমল-চন্দ্রিকা স্নাত
যোগমগ্ন মহাযোগী
সাধু হরিদাস।
শুভ্রবেশ শুভ্রকেশ
শুভ্র শ্রীমুখের জ্যোতি
শুভ্র চন্দ্রিকায়,
নিস্পন্দ প্রকৃতি পরে
যেন রজতের গিরি
ওই দেখা যায়।

(২)

হেন কালে শুন ওই
মধুর শিঞ্জিত যেন
নূপুর-নিক্কন,
আসিছে কামিনী এক
অনঙ্গ মোহিনী রূপে
মোহিয়া নয়ন।
বিলাস বিলোল নেত্রা
মন্থর গামিনী ওই
গুরু নিতম্বিনী,
উছলি উছলি যেন
পড়িছে রূপের স্রোত
সুচারু হাসিনী।
বঙ্কিম কটাক্ষ ভঙ্গি
যৌবন মদিরা মাখা
বদন কমল,
উন্মত্ত কত লোক
পান করি হায় ওই
রূপের গরল।
সমাধি ভঙ্গের তরে
প্রেরিয়াছে দুষ্ট লোক
সাধুর সদন,
তাই ওই বিলাসিনী
বীণা-বিনিন্দিত স্বরে
বলিছে বচন।

"বলি ওগো সাধুবর
শুনিয়াছি তুমি নাকি
দয়ার সাগর ?
সকলেরই ইচ্ছা নাকি
পূর্ণকর তুমি, আমি
শুনি নিরন্তর !
তাই এই ভিক্ষামাগি
পূর্ণকর অভিলাষ
ওহে মহাজন,
নিতান্ত বাসনা মম
অদ্য তব সহ নিশা
করিব যাপন।"

(৩)

ভাঙ্গিল ধেয়ান, সাধু
মেলিল নয়ন, দেখি
বারবিলাসিনী,
একবিন্দু অশ্রু তাঁর
করুণ নয়ন হতে
ঝরিল অমনি।
একটি নিশ্বাস হায়
মিশিল নিশার কায়
মুহূর্ত্তের পরে,
হৃদয় সমুদ্র আজি
হইয়াছে উচ্ছ্বসিত
যেন কার তরে।
ধীরে ধীরে অতি ধীরে
অতি মৃদু মৃদু স্বরে
বলিল বচন,
"প্রতীক্ষা করগো শুভে!
ধ্যান সমাপিয়া আসি
করি সম্ভাষণ।"
বলিয়া মহান ধ্যানে
বসিলেন মহাযোগী
মগ্ন জ্যোছনায়
নিস্তব্ধ প্রকৃতি যেন
বিস্ময় বিহ্বল নেত্রে
অনিমেষ চায়।

(৪)

তৃতীয় প্রহর নিশা
সুদূর বিলম্বী ওই
পূর্ণ শশধর,
শব্দহীন বসুন্ধরা
শান্তির কোমল ক্রোড়ে
কেবা মনোহর !
ক্কচিৎ শ্বাপদ শব্দ
ক্কচিৎ পেচকরব
পক্ষ-বিধূনন,
স্তব্ধতার রাজ্যে যেন
বিদ্রোহী প্রজার দল
করে কুমন্ত্রণ।
সম্মুখে বসিয়া ওই
বিস্ময়ে হেরিছে সেই
বারবিলাসিনী,
দর দর অশ্রুরূপে
ছুটিছে যোগীর নেত্রে
প্রেমমন্দাকিনী।
এখনো ধেয়ান তার ভাঙ্গে
নাই,ভাঙ্গিবে কি ?
সে যে সেথা নাই,
প্রেমের অনন্ত রাজ্যে
পশিয়াছে, পুলকিত
দেহখানি তাই।
যথায় কালিন্দী তীরে
বাঁকা শিখিপাখা শিরে
রাধিকার মন,
মোহন মুরলী করে
বাজাইত মৃদু বেণু
মুরলী মোহন ;

শুনিয়া বাঁশীর রব
গাভী বৎস আদি সব
আসিত ছুটিয়া,
ময়ূর ময়ূরী সনে
নাচিত তমাল বনে
পুচ্ছ বিস্তারিয়া;
মিলি যত গোপবধূ
ছুটিত আকুল প্রাণে
মঞ্জু কুঞ্জবনে,
উছলি যমুনা জল
ছল ছল কল কল
ছুটিত উজানে;
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা
হইয়া আপনা হারা
অনিমেষ চায়,
হেরি প্রকৃতির পতি
আনন্দে প্রকৃতি সতী
পুলকিত কায়!

সেই মধু বৃন্দাবনে
বিরাজে ভকত চিত
বঁধুয়ার সনে,
পরাণে পরাণে বান্ধা
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা
নয়নে নয়নে!

তাই সর্ব্ব কলেবরে
রোমাঞ্চ উঠিছে তার
পুলক-বিহ্বল!
তাই বুঝি ঝরিতেছে
প্রেমমন্দাকিনীওই
নয়নের জল।

বিস্ময়ে চাহিয়া আছে
চিত্রার্পিত যেন ওই
বারবিলাসিনী,
হৃদয়ে কি বাজিয়াছে?
নয়নে কি লাগিয়াছে?
কি ভাবিছে ধনী?
ত্রিযামা বিগত প্রায়
চন্দ্র অস্তাচলে যায়
পশ্চিম গগনে,
উদিয়াছে শুক তারা
বিহঙ্গ কাকলী রব
ছুটিছে কাননে।
রক্তিম-কপোলা ঊষা
পূর্ব্বাসার দ্বার খুলি
নামিতেছে ধীরে,
বহিছে প্রভাতী বায়ু
ফুটিছে প্রভাতী ফুল
সরসীর নীরে।
মঙ্গল আরতি করি
বন্দি চরণারবিন্দ
বিহ্বল হৃদয়,
শ্যামাম্বরা বসুন্ধরা
চুম্বি রশ্মিদল, দেখে
সূর্য্যের উদয়।

দেখিতে দেখিতে ওই
দ্যুতিমান অংশুমালী
বিরাজে গগনে,
দেখিতে দেখিতে ছুটে
কিরণ সমুদ্র প্লাবি
সকল ভুবনে।

ধ্যানমগ্ন হরিদাস
সূর্য্যরশ্মি আলোকিত
প্রশান্ত বদন,
দেখিয়া গণিকা সেই
সহিতে না পারি উঠে
করিয়া ক্রন্দন।

উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে কাঁদে
দু নয়নে বহিতেছে
শ্রাবণের ধারা,
হৃদয়ের উৎস আজি
ছুটিয়া গিয়াছে, কাঁদে
পাগলিনী পারা।
যেন শত আশীবিষে
দংশে মর্ম্মস্থল তার,
তীব্র হলাহল,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে খেলিতেছে,
কাঁদিতেছে অভাগিনী
তাই অবিরল।

(৬)

দ্বিতীয় প্রহর বেলা
বসি সাধু হরিদাস
আপন কুটীরে,
সম্মুখে ভাসিছে এক
দীন হীনা অভাগিনী
নয়নের নীরে।

মুড়ায়েছে চারু কেশ
ছিঁড়িয়াছে চারু বেশ
পরিয়াছে চীর,
যৌবনে যোগিনী বালা
সাজিয়াছে ভিখারিণী
রহস্য গভীর!
ইঙ্গিতে, জাহ্নবী নীরে
স্নান করি প্রণমিল
সাধুর চরণে,
করুণায় আর্দ্র হয়ে
হরিনাম মন্ত্র সাধু
দিলেন তখনে।
ওই শুন স্বর্গ ধামে
বাজিছে দুন্দুভি, শত
দেব কণ্ঠে বয়,
"জয় জয় হরিদাস
ভক্ত চূড়ামণি, জয়
ভকতির জয়।"

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ সেন।

রাজা রামমোহন রায়। * (১)

রাজা রামমোহন রায়—ভারতের গৌরব-স্থল। পৃথিবীর মহাজনগণের তিনি অন্যতম। তাঁহার অসাধারণ গুণ। এ সকল চিরবিদিত, সর্ব্ববাদিসম্মত। তথাপি একটা কথা উঠিয়াছে, রাজা রামমোহন রায়, গ্রাম্য বিরোধে প্রলিপ্ত থাকিতেন কি না; তাঁহার কোনরূপ অত্যাচার বা অবিচার ছিল কি না; দলাদলিতে তাঁহার কত দূর অনুরাগ সম্ভব, এই সন্দর্ভে তাহাই আলোচ্য বিষয়। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের "সাহিত্যে" "রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যাল" প্রস্তাব লক্ষ্য করিয়াই আমাদিগকে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতে হইতেছে। তাঁহার ঐ প্রবন্ধ প্রচার জন্যই এই বিষয় উত্থাপিত

---

* যে কারণে এই প্রবন্ধ "সাহিত্যে" মুদ্রিত হইল না, এস্থলে তাহার নির্দ্দেশ আবশ্যক। চৈত্রে ক্রমশঃ-প্রকাশ্য প্রবন্ধ নিঃশেষ করা আবশ্যক, এই কারণে "সাহিত্য" পত্রে ইহা মুদ্রিত না হইবার প্রধান হেতু। দ্বিতীয় হেতু, প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘ হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়ের ইচ্ছা, উহা ক্ষুদ্রাবয়ব হইলেই প্রকাশোপযুক্ত হয়। তৃতীয় হেতু, বিলম্বে প্রবন্ধটি লিখিত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণের খণ্ডন করিবার প্রয়োজন নাই। প্রবন্ধটী যে ধরণের, তাহাতে উহা দীর্ঘ না হইলেই নয়। তৃতীয় কারণের উত্তর পাঠকগণ, প্রবন্ধ মধ্যেই পাইবেন।—প্রবন্ধলেখক।

হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে এ কথার কোন জল্পনা কল্পনাই ছিল না। আলোচনার সুবিধার্থে ও সুমীমাংসার নিমিত্তে অগ্রেই বটব্যাল মহাশয়ের বক্তব্য অংশের আদ্যোপান্ত প্রতিলিপি প্রদান করা কর্ত্তব্য; তৎপরে তৎসম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশিত হইলে, পাঠকগণ, প্রস্তাবিত বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

বটব্যাল বাবু লিখিয়াছেন,—

"মহাত্মা রামমোহন রায়কে বাড়াইতে গিয়া,তাঁহার জীবন-চরিত-লেখক শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়,অপর এক জন নিরপরাধী মৃত ব্যক্তির নামে কলঙ্ক দিয়াছেন। বোধ হয় অনবধানতা-বশতঃ, অথবা ভ্রান্তিমূলক কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করাতে, এইরূপ ঘটিয়াছে।

"উক্ত জীবনচরিতের দ্বিতীয় সংস্করণের ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছেঃ—

'কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রামনগর গ্রামে রামজয় বটব্যাল নামক এক ব্যক্তি চারি পাঁচ হাজার লোক লইয়া এক প্রধান দলপতি হয়, রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেন বলিয়া সে ব্যক্তি তাঁহাকে নানা প্রকার কষ্ট দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বটব্যালের লোক সকল অতি প্রত্যূষে আসিয়া রামমোহন রায়ের বাটীর নিকট ক্রমাগত কুক্কুট-ধ্বনি করিত; এবং সন্ধ্যার পর তাঁহার অন্তঃপুরে গো-হাড় প্রভৃতি পদার্থ নিক্ষেপ করিত। এই প্রকার অত্যাচার দ্বারা পরিবারগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু রামমোহন রায়ের অসাধারণ ধৈর্য্য কিছুতেই পরাভব মানিল না। কোন প্রকার প্রতিহিংসা করা দূরে থাকুক, তিনি সর্ব্বদাই সদ্ভাব দ্বারা অসদ্ভাবকে জয় করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার মিষ্ট কথায় ও সদুপদেশে তাহারা ভুলিবার লোক ছিল না। বরং তাঁহাকে একান্ত ধৈর্য্যশীল দেখিয়া উৎপাত আরো বৃদ্ধি করিয়াছিল। পরিশেষে আপনা আপনি সকলই থামিয়া গেল।'

"চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া উপরি উক্ত বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে স্থানীয় বৃদ্ধগণের মুখে যাহা শুনা যায়, তাহাতে উল্লিখিত চিত্রটি নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক বলিয়া বোধ হয়। রায়-বংশের সহিত বটব্যাল বংশের দলাদলির অনেক কথা। সে সমুদায় এখানে লেখা অনাবশ্যক। উভয় বংশই খানাকুল কৃষ্ণনগরের আদিম-নিবাসী নহেন। প্রথম; বটব্যাল বংশের আদি পুরুষ খানাকুলে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশধরগণ বর্দ্ধমান রাজ-সরকারে চাকুরি করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে ধনশালী হয়েন এবং সমাজে তৎকালোচিত সৎকার্য্যাদি দ্বারা প্রচুর মান সম্ভ্রম উপার্জ্জন করেন। ঐ সময়ে রায় বংশের আদিপুরুষ রাধানগরে আসিয়া বাস করেন। ক্রমে তাঁহারা বংশপরম্পরায় উন্নত হইয়া দেশে মান-সম্ভ্রম-স্থাপনের জন্য যত্নবান্ হয়েন এবং কৃষ্ণনগর অঞ্চলে একটি দলের সৃষ্টি করেন।

"রাজা রামমোহন রায়ের পিতা রামকান্ত রায়, বর্দ্ধমান রাজসংসারে ইজারা ইত্যাদিতে অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হয়েন। রামজয় বটব্যাল তৎকালে রাজসংসারে এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকায়, ঐ টাকা আদায়ের তদ্বিরের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। ঐ টাকা আদায়ের যত্ন করায়, এবং ইজারা হইতে অপসৃত করায়, রামজয়ের উপর রায়বংশের ক্রোধ জন্মে। এই সময়েই প্রথমে রায় ও বটব্যাল বংশের মধ্যে শত্রুতার সূত্রপাত হয়। বৃদ্ধগণের মুখে ইহাই প্রকৃত কথা বলিয়া শুনা যায়। রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বলিয়া দলাদলির সূত্রপাত হয় নাই।

"রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যালের মধ্যে কে কাহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, হুগলির বিচারাদালত সমূহের নথি অনুসন্ধান করিলে, তাহার কতক কতক নিদর্শন আজিও পাওয়া যাইবে। নিম্নে একটি ফয়শালার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,

"২৪১ নং। ৪৯ কানুন। জেলা হুগলির জজ শ্রীযুক্ত ওকিলী সাহেব। ১৮১৮।১৫ এপ্রেল। বাদী রামজয় বটব্যাল। প্রতিবাদী রামমোহনরায়, বাদীর আরজি এই যে,প্রতিবাদী রামমোহন রায় ১২২১ সালে লাট-মজকুর পত্তনী তালুক খরিদ করিয়া ১২২২ সালের ২০ এ অগ্রহায়ণ তারিখে তালুকদার রামমোহন রায় ও উহার নায়েব জগন্নাথ মজুমদার এক শতের অধিক লাঠিয়াল লোক লইয়া দলাদলির আক্রোশে দাঙ্গা হাঙ্গামা

জারায় রামনগর গ্রামের ৭৮/২৷০ বিঘার মধ্যে ৫১৮৷১০ ফসল ও মৌজে বিলক গ্রামে ১০/১ ও দাইনাল গ্রামে ৮৷৪ বাগানের আম্র ইত্যাদি ১৭৫ টা গাছ কাটিয়া ৭০৷ বিঘা জমি হইতে বেদখল ও আবাদী ধান্য ফসল লুটতরাজ করে। একারণ ২০৯২৲ টাকার দাবিতে নালীশ।"

"এই মোকদ্দমায় জজ আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে বাদী ডিক্রি পাইয়াছিলেন।*

"ইহার উপর টীকা টিপ্পনি করা আমরা অনাবশ্যক বোধ করি। কেননা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে খর্ব্ব করা আমার অভিপ্রায় নহে। তিনি যে সকল গ্রাম্য-কলহে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন,তাহা তাঁহার গ্রামের লোক এখনও বিস্মৃত হয় নাই, কিন্তু সে সকল কথা এক্ষণে প্রচার করায় কাহারও কোন ফল নাই। তাঁহার সৎকার্য্য ও সদভিপ্রায় সকলই আমাদের স্মরণীয় হওয়া উচিত। তাঁহার জীবন-চরিত-লেখক মহাশয় যদি অনর্থক ৺রামজয় বটব্যালের উপর কলঙ্ক দিয়া তাঁহাকে বাড়াইবার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে এই প্রতিবাদ আবশ্যক হইত না। গ্রন্থকার মহাশয় যদি রামজয়কে চিনিতেন, তাহা হইলে, যেরূপ অমর্য্যাদার সহিত তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঘটিত না। আর প্রকৃত পক্ষে রামজয়, রামমোহনের উপর উৎপাত করা দূরে থাকুক, রামমোহনই তাঁহার উপর উৎপাত করিয়াছিলেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।" (১)

"সাহিত্যে" ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণে এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। তাহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। কাশীপুরের এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় উমেশচন্দ্র বাবুর প্রযত্নে ঐ বৃত্তান্ত মুদ্রিত হয়। তৎপরে ইণ্ডিয়ান্ মিরারের সংবাদ স্থলেও উহা পরিগৃহীত হইয়াছিল। তাহার পর "ভারতীতে" (২) শ্রীমান্ বাবু মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম-এ উহার প্রতিবাদ করেন। তাহাতে সকল কথা খণ্ডনের চেষ্টা ছিল না। আমরা রামমোহনের সপক্ষে ও বিপক্ষে নানা কথা নানা পত্রিকায় লিখিতেছি, এই কারণেও অধিকাংশ লোকের অনুরোধে উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। কেবল অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়াই লেখনী ধারণ করি নাই। এ সম্পর্কে আমাদের কর্ত্তব্য বোধ হওয়াতেও এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার আবশ্যকতা হইল।

বটব্যাল মহাশয়, যে ভাবে যে ভাষায় রামমোহন রায়কে চিত্রিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত ও অনুপযুক্ত।

এই ক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রেই দুইটী কথা ব্যক্ত করা সঙ্গত মনে করি।

(১ম) কি বিদ্যা-বুদ্ধি,কি শাস্ত্রজ্ঞান,কি পদমর্য্যাদা, কি বিষয়-বিভব কিছুতেই রামমোহন ও রামজয়ের তুলনাই হয় না। (২য়) বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক, রামমোহন রায়ের দলভুক্ত ব্যক্তি,ইহা যেন কেহ মনে স্থান না দেন। তিনি তন্মতাশ্রয়ীও নহেন। অতএব এরূপ লোকের কথা এস্থলে গ্রহণীয় হইবার যোগ্য। কেবল তাহাই যথেষ্ট নয়। আমরা তদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছি।

১। এ বিষয়ে আমরাও উমেশচন্দ্র বাবুর ন্যায় বলি যে,"স্থানীয় প্রাচীন লোকের নিকট যাহা শুনা যায়, তাহাতে উল্লিখিত চিত্রটি (উমেশচন্দ্র বাবুর বর্ণনা) নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক।" যাঁহারা প্রাচীন বিষয়ের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা এখনও বলেন, রামজয় বড়ালই(৩)অত্যাচারী। তিনি একে তো বর্দ্ধ-

* "এই বিবরণ ও ফয়সালার নকল রামজয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ বটব্যাল আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

(১) সাহিত্য, ১৩০১ সাল, অগ্রহায়ণ।

(২) ভারতী, ১৩০১ সাল, পৌষ মাস।

(৩) এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, রামজয়ের উপাধি "বড়াল" ছিল—"বটব্যাল নয়। সুতরাং আরজিতে আমাদের সন্দেহ হয়। কেননা আরজিতে রামজয় "বটব্যাল" দেখিতেছি, রামজয় 'বড়াল' দেখিলে

মান-রাজগোষ্ঠীর কর্ম্মচারী, এ কথা উমেশচন্দ্র বাবুও স্বীকার করেন। সেই বর্দ্ধমান-রাজ-গোষ্ঠীর সহিত রামমোহনের পিতার (রামকান্ত রায়ের) সম্প্রীতি থাকা দূরে থাকুক, বরং অপ্রীতিই ছিল। রামজয় এই পরাক্রান্ত প্রভুর কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি সুতরাং দুর্দ্দান্ত ও উৎপীড়ক। তাহাতে আবার স্বপ্রদেশে রায়গোষ্ঠীর প্রাধান্যে ঈর্ষ্যান্বিত। অতএব উৎপীড়ন ও অত্যাচার, কাহার পক্ষে সম্ভব, তাহা সকলের জ্ঞান-গোচর হউক। তবে আমরা স্বীকার করি, রামমোহনের নায়েব জগন্নাথ মজুমদার অত্যাচারী ছিলেন। এই বটব্যাল বাবুর "সাহিত্যে" এই প্রস্তাব প্রচারের বহুপূর্ব্বে এই "সাহিত্য" পত্রেই(৪) তাহা স্বীকার করিয়াছি।

জমিদারী কার্য্যে জগন্নাথের অতুল ক্ষমতা ছিল। স্বয়ং রামমোহন রায় তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। ইহা অতি প্রসিদ্ধ কথা। কর্ম্মচারীকে প্রভু ভয় করেন, এটা অনেকেই অদ্ভুত কথা ভাবিবেন। জগন্নাথ, রামমোহনের পিতার আমলের কর্ম্মচারী; সেই হেতু তাঁহার প্রতি প্রভুর কতক সম্ভ্রম ছিল। একদা জগন্নাথ মজুমদারকে রামমোহন রায় ডাকাইয়া পাঠান। উহার দৌর্দ্দণ্ডপ্রতাপে লোকে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। বিব্রত লোকের প্রার্থনায় রাজা, তাঁহাকে তলব করিতে বাধ্য হন। রামমোহন কলিকাতায় অবস্থিত; আর সে ব্যক্তি খানাকুল কৃষ্ণনগরে থাকিত। সে ব্যক্তি শিবিকারোহণে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহার ভীমাকৃতি ও স্থির-মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। জগন্নাথের গম্ভীর প্রকৃতি বার বার তাঁহার মনে উদিত হওয়াতে, তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। জগন্নাথকে কিয়দ্দূরে দেখিতে পাইয়া সমীপস্থ লোকদিগকে বলিলেন—"বেটার চেহারা দেখ্‌ছ। বেটাকে দেখ্‌লেই ভয় হয়। কি বল্‌ব?" এই সকল কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই সে ব্যক্তি নিকটস্থ হইয়া কহিল, "কি জন্যে ডেকেছেন? আপনি বিদ্যে করেছেন, তাই ক'রে যান। যার তার কথা শুনবেন না, তাতে বিষয় বিভব রক্ষা হবে না"। রামমোহন কেবল বলিলেন, "তুমি অত্যাচার কর, শুনতে পাই"। ইহার উত্তরে তিনি শুনিতে পাইলেন, "অত্যাচার অতঃপর আর শুনিতে পাইবেন না।"

কিছুপরেই ইহার প্রসঙ্গ বলিতে হইবে।

২। "বটব্যাল বংশের আদিপুরুষ খানাকুলে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশধরগণ, বর্দ্ধমান-রাজসংসারে চাকুরি" করিতেন। লেখায় লোকে ভাবিতে পারেন, ঐ বংশীয়গণ যেন ক্রমান্বয়ে ঐ কর্ম্ম করিয়া আসিতেন। প্রকৃত কথা কিন্তু তাহা নয়। এস্থলে বলা উচিত মনে করিতেছি যে, বড়ালবংশের আদি পুরুষ কে, তাহা লিখিত হয় নাই। মৎসম্পাদিত "পুরোহিত" (৫) পত্রে আমরা খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজের ইতিবৃত্তের একাংশে ঐ বংশের যে বর্ণনা করিয়াছিলাম, তাহা হইতে চিত্রপ্রদর্শনবৎ তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, কে কে বর্দ্ধমান-রাজসংসারে কর্ম্ম করিতেন,—

কোন সংশয় হইত না। আমরা স্বচক্ষে ঐবংশের অনেক প্রাচীন দলিল দেখিয়াছি, তৎসমুদায়ে "বড়াল" লেখা আছে। ঐতিহাসিক তত্ত্বের জন্যই এ কথার অবতারণা।

(৪) সাহিত্য, ১২৯৮ সাল, ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত "রামমোহন রায় সম্বন্ধে কয়েকটী অজ্ঞাত বৃত্তান্ত" প্রস্তাব দেখ।

(৫) পুরোহিত, ১৩০১ সাল, বৈশাখ মাস, ২৫-৩১ পৃষ্ঠা দেখ।
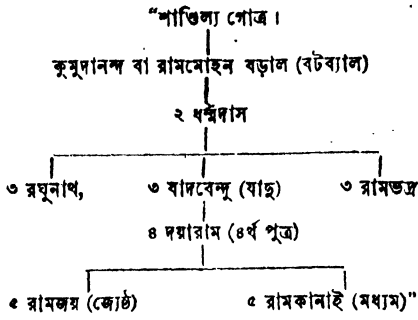
আদিপুরুষ কুমুদানন্দ বা রামমোহন বড়ালের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ যাদবেন্দু, চতুর্থ পুরুষ দয়ারাম, তদীয় তনয় রামজয়, যাদবেন্দুর ভ্রাতুষ্পুত্র সাহেবরাম, এই চারিজন বর্দ্ধমান-রাজ-সংসারে কর্ম্ম করিতেন। সুতরাং সকলেই দেখিলেন, রাজ-সংসারে তিন পুরুষ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। প্রথম দুই পুরুষ বর্দ্ধিষ্ণু ছিলেন না।

২। "মান সম্ভ্রম স্থাপন করিতে তাঁহাদিগকে (রায়-বংশকে) যত্নবান্" হইতে হয় নাই। তাঁহারা পূর্ব্বাবধিই মানী, জ্ঞানী; ধনী ছিলেন।

৩। যে সময় "রায়-বংশের আদিপুরুষ রাধানগরে আসিয়া বাস করেন" বলিয়া উমেশচন্দ্র বাবুর সংস্কার, তাহা ভুল। যদি পুরুষ ধরিয়া মিলান যায়, তাহাতেও উহা ঠিক্ হয় না। এক বংশের মধ্যেই ভ্রাতুষ্পুত্র, পিতৃব্য অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্রও, পিতামহ-পর্য্যায়ের লোক অপেক্ষা বয়সে বড়। সকল স্থলেই ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। অধিক কি, তাঁহাদের বংশেও, তাহাদের নিজ-শাখাটী যত বিস্তৃত, তিনি যে রামজয়ের কথা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের শাখা, তদপেক্ষা অল্প-প্রসর। তাঁহাদের বংশ তালিকা দেখিলেই, চক্ষু কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হইবে।

৪। রামজয়, রাজা রামমোহনের সমসাময়িক। কিন্তু তিনি রাজা রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ের সমসাময়িক নন। উমেশচন্দ্র বাবু এখনও ভাল করিয়া অনুসন্ধান করুন, আমাদের উক্তি সত্য কি না অবগত হইতে পারিবেন। পিতৃ-বর্ত্তমানে জমিদারীর কার্য্য-পরিদর্শন করিবার অধিকার; রামমোহনের হয় নাই। দেব-দেবীর অভক্ত হওয়ায়, প্রতিমা-পূজার প্রতিবাদ করায়, তিনি পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। রামমোহন ও তৎকর্ম্মচারী জগন্নাথ মজুমদার, রামজয় বটব্যালের সাময়িক লোক, তাহার নিদর্শন-জন্য আমরা বটব্যাল মহাশয়ের অবলম্বিত নথিই প্রমাণ-স্থলে গ্রহণ করিতেছি।

৫। রামজয়, রামমোহনকে "ইজারা হইতে অপসৃত" করেন নাই(৬)এবং তন্নিবন্ধন "রায়-বংশের ক্রোধ জন্মে" নাই। রায়বংশের যে শাখায় এই প্রবন্ধ-লেখক অন্তর্গত, তাঁহাদের স্বতন্ত্র দল। সেই দলের সহিত বটব্যালদের বরাবর সম্প্রীতিই ছিল, এখনও তাহাই রহিয়াছে। এ কথার তত্ত্ব তিনি এখনও বৃদ্ধদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমাদের উক্তির সপক্ষেই প্রমাণ পাইবেন।

৬। উমেশচন্দ্র বাবু মাজিষ্ট্রেট্। তিনি বিচারক হইয়া কি কেবল নথির উপর নির্ভর করিয়া ডিক্রী-ডিস্‌মিস্ করেন? রামজয়ের পক্ষে ডিক্রী দিয়া রামমোহনকে হারাইয়া দেওয়ায়, সঙ্গত কার্য্য হয় নাই। রায়-ফয়সালা উদ্ধৃত করিতে পারিলে, বরং উমেশচন্দ্র বাবুর কথা বিবেচ্য হইতে। তৎপরে ইহাই বিচার্য্য বিষয়ের অন্তর্গত হইত-যে, উহা গ্রহণীয় কি না—উহাতে প্রামা-

(৬) ইহার বিবরণ, পাঠক মহাশয় পশ্চাৎ দেখিতে পাইবেন।

ণিক ঘটনা আছে কি না। কেন না, প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা গিয়াছে, অসত্য মোকদ্দমারও বিচারালয়ে জয় হয়। আর, যখন এখানে রায়-ফয়শালারই অভাব, তখন তাঁহার কথা বিচারাধীন হওয়ারই অযোগ্য। অতএব উমেশ চন্দ্র বাবু সাধারণের নিকট রামমোহনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনিয়াছেন, তাহা অপ্রামাণিক বলিয়া অগ্রাহ্য হইল।

৭। "হুগলীর বিচারাদালত সমূহের নথি অনুসন্ধান" না করিয়াই কেবল মুখে বা লেখায় রাজা রামমোহনের অত্যাচার অথবা অন্যায্য ব্যবহারের উল্লেখ করাতে, লোকে ঐ প্রবন্ধ-লেখককেই হেয় জ্ঞান করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার কথায় ভাল ভাল লোকে আস্থা স্থাপন করিবেন কেন? তিনি রামমোহনকে যে ভাবে যে ভাষায় সাধারণ-সমীপে প্রদর্শিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বা তাঁহার মত শিক্ষা-প্রাপ্ত উপযুক্ত লোকের সমুচিত কার্য্য হয় নাই।

৮। "এই মোকদ্দমায় জজ্-আদালতে ও সদরদেওয়ানী-আদালতে বাদী, ডিক্রী পাইয়াছিলেন" এইটী লিখিয়াই মাজিষ্ট্রেট্ উমেশ-চন্দ্র বাবু সন্তুষ্ট! কি প্রকার ডিক্রী, তাহার কিছুমাত্র নির্দ্দেশ দেখিলাম না। রামজয় যদি ডিক্রীই পাইয়া থাকেন, তবে তাহা টাকারই ডিক্রী হইবে। কিন্তু আরজিতে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামের কথা দেখিতেছি, তজ্জন্য অবশ্যই ফৌজদারীতে অভিযোগ হইয়া থাকিতে পারে। লেখক মহাশয়, অবশ্যই জানেন—দেওয়ানী আদালতে ফৌজদারী কাণ্ডে উল্লেখ মাত্রই যথেষ্ট নয়। তাহার জন্য ফৌজদারিতে স্বতন্ত্র নালিশ করিতে হয়।

৯। উক্ত মোকদ্দমা যদি রীতিমত চলিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রামমোহন রায়ের পক্ষ হইতে কোন না কোন জবাব দাখিল হওয়ার কথা। দলাদলির নিমিত্ত রামমোহন, লুটতরাজ করিয়াছিলেন বলিয়া, আরজিতে যে উল্লেখ রহিয়াছে, বিচারপতি তাহার কোন 'ইস্যু' ধার্য্য করিয়াছিলেন কি না, ইহাও জানা আবশ্যক।

১০। আর এক কথা। যদি বাদী রামজয় ডিক্রীই পাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও, কি তাঁহার বর্ণিত প্রতি কথাই সত্য হইবে? অর্থাৎ আরজিতে যে "দলাদলি" উল্লিখিত, তাহার প্রত্যেক অক্ষর কি ঠিক্? যদি রামমোহন, ক্ষতি-পূরণের দায়ী হইয়া থাকেন, তবে প্রমাণিত হইবে,—"দলাদলির আথেজে কি লুটতরাজ" হইয়াছিল? এ সম্বন্ধে উমেশচন্দ্র বাবুর প্রমাণ নিতান্তই ক্ষীণ। তাঁহার পুঁজির মধ্যে রামজয় বটব্যাল মহাশয়ের পক্ষীয় আরজি। তাহাই তাঁহার অবলম্বন—তাহাই তাঁহার একমাত্র সম্বল। এই অতি-মাত্র অপ্রবল বস্তুর আশ্রয়ে এক মহতের অপবাদ করা, আর ভেলা লইয়া সাগর পার হওয়া, উভয়ই তুল্য বিষয়।

১১। "রাজা রামমোহন রায়, গ্রাম্য কলহে" কখনই স্বয়ং সংসৃষ্ট থাকিতেন না— কদাচ ঐরূপ ব্যাপারে তিনি লিপ্ত ছিলেন না। তবে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ বাবুর সহিত দেওয়ানী মকদ্দমা চলিয়াছিল। তাহাও তাঁহার কর্ম্মচারীর দোষেই ঘটিয়াছিল। এখানে একটা তর্ক উঠিতে পারে। রাজা রামমোহন কি কারণে সেই উৎপীড়ক কর্ম্মচারীকে অপসৃত করেন নাই? ইহার উত্তর উপস্থিত মত লিখিয়া দিলে, তাহা মনঃকল্পিত, যদি কাহারও এরূপ সন্দেহ হয়, তাই সকলেরই মনঃপূত করিবার উদ্দেশে আমরা এই উপস্থিত প্রতিবাদের

বর্ষাধিক কালের লিপি হইতে কতক কতক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"জগন্নাথ নামে তাঁহার এক উগ্রপ্রকৃতি নায়েব ছিল। সে প্রজাদের ও তাঁহার জ্ঞাতিদের সহিত সদ্ব্যবহারের পরিবর্ত্তে বিপরীতাচরণ করিতে ভালবাসিত। বিষয়-কর্ম্মে সে অতিশয় নিপুণ ছিল। বয়সে ও কার্য্যে তাহার প্রবীণতা জন্মিয়াছিল বলিয়া, তাহাকে সহসা কর্ম্মচ্যুত করা, তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক বোধ হইত না। তিনি স্বয়ং জমিদারির জটিল ব্যাপার বুঝিতেন না। তদ্ভিন্ন, জগন্নাথ অনেক দিনের কর্ম্মচারী ও বিশ্বস্ত ভৃত্য, ইত্যাদি বিবিধ হেতু বশতঃ তাহাকে কিছু দিন রাখিতে হইয়াছিল। লোকে তাহার বিরুদ্ধে যাহা যাহা বলিত, তৎসমস্ত সত্য কিনা, রাজা সন্দেহ করিতেন! কিছু কাল পরে এমন এক ঘটনা উপস্থিত হইল, যাহাতে রামমোহনের ভ্রম-ভঞ্জন হইল, তাঁহার চক্ষুঃকর্ণের বিবাদ মিটিল।

"ঐ কর্ম্মচারী জগন্নাথ, সুপ্রিম কোর্টে এক মোকদ্দমার আপীল করিয়াছিল। ঐ মোকদ্দমাটী যাদবচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে চলিতেছিল। যাদবচন্দ্রের পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। রাজা রামমোহন রায়, এই সময়ে মোকদ্দমা শুনিতে যাইতেন; প্রত্যেক বারে যাদবচন্দ্রকে ষোলটি টাকা দিতেন; আপন রুমালে তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিতেন। যাদবচন্দ্র এই মোকদ্দমায় জয়ী হন। রামমোহন রায় মহাশয় শেষে বলেন, "চাকর আর ছেলের মধ্যে বিবাদ চল্‌ছিল। চাকর পরাস্ত হ'ল। ছেলের জেদ্ বাহাল হ'ল, ভালই হ'ল।" কি সাধুতা! নিজের পরাভবকে চাকরের পরাভব মনে করা ও প্রতিপক্ষ জেতাকে ধন্যবাদ প্রদান ও অর্থ সাহায্য করা লোকাতীত ক্ষমতা কি না, এই বিচারের ভার, পাঠকগণের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তদুপলক্ষে যে ভূমি হস্তভ্রষ্ট হইল বা যে অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইল, তাহার ক্ষতিলাভ গণনা না করা কি সামান্য মনস্বিতার পরিচায়ক? জগন্নাথের ব্যবহার আমাদিগকে "চরিতাবলীর" একটি কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—"যাহারা রাজসংসারে চাকরি করে, তাহারা প্রায় দুশ্চরিত্র হয়।" (৭)

(৭) সাহিত্য, ১২৯৮ সাল, ফাল্গুন মাস, ৬৩৫ পৃষ্ঠা।

১৩। বটব্যাল বাবু কি প্রমাণ-বলে ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন যে, "জমিদারি হইতে রামমোহনকে অপসৃত" করা হইয়াছিল? কোন আদালতে ইহার কোন নজির আছে কি? রামমোহনের সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ঐ জমিদারি রামমোহনের পৌত্রদ্বয়ের অধিকারে রহিয়াছে। রামজয় বটব্যালকে খর্ব্ব না করিলে, কি রামমোহনের মহত্ত্ব কমিয়া যাইত—লেখকের এ কথায় হাস্য-সংবরণ করা অসম্ভব। রামজয় বটব্যাল নির্গুণ মানব ছিলেন না। তিনি বদান্য পুরুষ ছিলেন, ইহা স্বীকার করি—

"রামজয়ের মত অল্প অন্নদাতাই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! তিনি প্রত্যহ ১০।১২জন অতিরিক্ত লোক লইয়া ভোজনে বসিতেন। রামজয়, নিজকন্যা নিমুর অতি সমারোহে পরিণয়-ক্রিয়া সমাধা করেন।" (৮)

"তিনি একদা বর্দ্ধমান হইতে আসিতেছিলেন। পথে তাঁহার শিবিকাবাহকেরা তামাক খাইবার নিমিত্ত গৃহস্থ-বাটী হইতে প্রার্থনা করিয়া আগুন পায় নাই। পরে তাহারা বলে, আমরা "রামজয় বড়ালের বেহারা।" গৃহস্থেরা তাহাতেও কর্ণপাত করে না। গৃহস্থগণ বলিয়াছিল, "রামজয় বড়াল আবার কে?" এই কথা শুনিয়া তিনি বেহারাদিগকে নিজ-গ্রামাভিমুখে যাইতে নিষেধ করিলেন; তাহাদিগকে বর্দ্ধমানের পথে পুনর্যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। তথায় গিয়া উপনীত হইলেন, রাজবাটীর সকলে তটস্থ হইলেন। কারণানুসন্ধানে সকলে তাঁহার অবমাননার বিষয় জ্ঞাত হইলেন। তদুপরে তিনি বর্দ্ধমান হইতে খানাকুল-কৃষ্ণনগরে আসিবার পথের উভয়-পার্শ্বস্থ গ্রাম ইজারা লইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, নিজাধিকার ভিন্ন অপরের অধিকারে পদার্পণ করিব না। কেন না পরাধিকারে মান নাই।" (৯)

তিনি কেমন একগুঁয়ে ব্যক্তি ছিলেন, এখন তাহার পরিচয় পাইতে পাঠকের অব-

(৮) মৎ-সম্পাদিত পুরোহিত, ১৩০১ সাল, বৈশাখ।

(৯) পুরোহিত, ১৩০২ সাল, বৈশাখ মৎ-সম্পাদিত দেখ।

শিষ্ট নাই। ফলতঃ রামজয় বটব্যালের পক্ষীয় লোকদের রামমোহন-ভবনে গবাদির অস্থি (গোহাড়) নিক্ষেপ করা ও কুক্কুটধ্বনি করা যথার্থ ব্যাপার। ইহার বিষয় বহু বার ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট শ্রুত আছি। ইহার বিশেষ প্রমাণ আছে। রামজয় বটব্যাল, অন্য বিষয়ে গুণবান্ হইলেও অন্ততঃ এই বিষয়ে "নিরপরাধ" নন। বটব্যাল বাবুর স্মরণার্থে বলি, বটব্যালদের দল, দুর্দ্দান্ত-দুর্দ্ধর্ষ, ইহার সংবাদ প্রাচীনেরা এখনও রাখেন। এক প্রাণীরও মনে ইহা স্থান না পায় যে, আমরা রামমোহন রায়ের দোষ ও গুণ উভয়েরই সংবাদ রাখি। রামমোহন রায়ের দোষের প্রসঙ্গ দেখিয়া হয় তো কতিপয় লোক স্তম্ভিত হইবেন। একমাত্র জগৎপতি ভিন্ন মানব, যতই সগুণ হউন না কেন, তিনি কদাচ দোষ-সম্পর্করহিত—অপাপ-বিদ্ধ হইতে পারেন না। ফলে, আমরা তত্ত্ব-পদার্থের ক্রীত দাস, সত্যের অকপট ভৃত্য। আমরা লোকমাত্রেরই গুণ-পক্ষপাতী, সুতরাং দোষের বিষম বিপক্ষ। তজ্জন্যই সাধারণের গোচরে দুইটি মাত্র কথা বলিব।

(ক) "অনুসন্ধানে" রামমোহনের বেদে অনভিজ্ঞতা-বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। (১০)

(খ) আইন দ্বারা সামাজিক প্রথা রহিত করার তিনি ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, ইহাও প্রদর্শিত করিতে বাকী রাখি নাই। ইহাতে সতীদাহের ইতিবৃত্তে তাঁহার অনেক গুরুত্ব কমিয়াছে। (১১)

(গ) ইতিহাস লিখিতে গিয়া সতীদাহে তাঁহার কত কৃতিত্ব তছিল, তা "প্রকৃতিতে" (১২) "সতীদাহের আমূল ইতিবৃত্ত" "বামাবোধিনী পত্রিকায়" (১৩) "কে সতীদাহ নিবারণ করেন" সন্দর্ভে "হিন্দুমেগাজিন্" (১৪) ও "জন্মভূমিতে" (১৫) "সহমরণ" প্রবন্ধে দেখান গিয়াছে। উমেশচন্দ্র বাবু ও সাধারণ পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, আমরাই প্রথমে বটব্যালবংশের কীর্ত্তি-কলাপ, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে মৎসম্পাদিত "পুরোহিত" পত্রে সর্ব্ব-সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছি। সুতরাং একের প্রতি অত্যাচার, দ্বেষ, অপ্রীতি,—অন্যের প্রতি পক্ষপাত, অতি ভক্তি ইত্যাদি,—আমাদের উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না।

উমেশচন্দ্র বাবু অমূলক বিষয়ের অবতারণা না করিয়া যদি প্রমাণ-সহকারে সন্দর্ভ-রচনে অভিনিবিষ্ট থাকেন, সকলেই তাঁহার কথা গ্রহণ করিবে। নচেৎ তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধ, সাংখ্যদর্শন প্রস্তাব, রূপ-সনাতন ও শ্রীচৈতন্যদেব ইত্যাদি সন্দর্ভবৎ তাহা সর্ব্বানুমোদিত হইবে না।

এত দিন ইচ্ছা করিয়া এ প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিতে ক্ষান্ত ছিলাম। উমেশচন্দ্র বাবু শিক্ষিত ব্যক্তি। ইংরেজি শিক্ষিত হইয়াও বাঙ্গালায় তিনি প্রবন্ধ রচনা করেন, ইহা আহ্লাদের বিষয়। তদ্ভিন্ন তিনি আমাদের অঞ্চলীয় লোক—উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। আমরা তদ্বংশের ঐতিহাসিক। নানা-হেতু-বশতঃ প্রতিবাদে অপ্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু নির্ভীক,

(১০) অনুসন্ধান, ১২৯৯ সাল, ১৫ই আষাঢ়।
(১১) ঐ ঐ ১৫ই শ্রাবণ।

(১২) প্রকৃতি, ১২৯৮ সাল, ২৭ শে ভাদ্র।
" " " ৩ রা আশ্বিন।
" " " ১০ই "
(১৩) বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৯৮ সাল, মাঘ মাস।
(14) Hindu Magazine, October, 1891, Vol. I, No. I, "Suttee & Ram Mohan Roy.
(১৫) জন্মভূমি, ১৩০০ সাল, ফাল্গুন মাস।

স্বাধীনচেতা, তত্ত্বপ্রিয়, প্রকৃত ঐতিহাসিকের কার্য্য, নিরবচ্ছিন্ন গুণস্তুতি বা দোষ-ঘোষণা নয়। এ কারণ এই সকল কথা নিবদ্ধ করিতে হইল। অধিকতর অনুসন্ধান করিয়া যদি তিনি প্রবন্ধাদি রচনা করেন, বড়ই ভাল হয়। তদ্দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে তদীয় চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি থাকিয়া যাইবে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি। (১৭)

গো-বসন্তের চিকিৎসা।

পাস্তার্ অনুমোদিত টিকা-রস প্রস্তুত করণ প্রণালীর মূল,তীব্র রসকে ক্রমান্বয়ে ২০ ও ১২ দিবস ধরিয়া দিবারাত্রি ঠিক্ ৪২°।৪৩° সান্তি-গ্রাদ্ উত্তাপে রাখিয়া দেওয়া। গো-বসন্তের তীব্র-রস ২০ দিবস ৪২°।৪৩° উত্তাপে থাকিয়া এতাদৃশ হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয় যে,ইহা টিকা দিবার জন্য প্রথমতঃ ব্যবহৃত হইলে কোনই অনিষ্ট পাতের সম্ভাবনা থাকে না। "প্রথম টিকা-রসটী" (Premier Vaccine) ব্যবহৃত হইয়া গেলে,কয়েক দিবস পরে যদি "দ্বিতীয় টিকা-রসটী" (Denxieme Vaccine) ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে এই রসের ব্যবহার দ্বারাও কোন ক্ষতি হয় না। ১২ দিবস ধরিয়া তীব্র রস (Virulent Virus) ৪২°। ৪৩° উত্তাপে রাখিলে "দ্বিতীয় টিকা-রস" প্রস্তুত হয়। যদি ৪২°।৪৩° উত্তাপের পরিবর্ত্তে কোন দিবস কোন সময়ে ৪১° বা ৪৪° উত্তাপ হইয়া পড়ে তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। ১২ দিবসের স্থানে যদি ১১ বা ১৪ দিবস ধরিয়া তীব্র রসকে ৪২°।৪৩° উত্তাপে রাখা যায়, তাহা হইলেও তীব্রত্বের পরিমাণ প্রায় একই প্রকারে হ্রাস হইবে। টিকা-রস প্রস্তুতের কার-খানায় যতদূর সাধ্য সময় ও উত্তাপের মাত্রা ঠিক্ রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু মাত্রা যদি সামান্য পরিমাণে এদিক্ ওদিক্ হয়, তাহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। যেখানে সময় তিন ঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট, সেখানে দুই চারি মিনিট্ এদিক্ ওদিকে ক্ষতি হয় না, কিন্তু তিন ঘণ্টার স্থানে এক ঘণ্টা বা বার ঘণ্টা হইলে চলিবে না। সেই মত, যেখানে উত্তাপের মাত্রা ৪২° নির্দ্দিষ্ট আছে, সেখানে ৩২° বা ৫০° উত্তাপ হইলে ক্ষতি হইবে, কিন্তু ৪১° বা ৪৩° হইলে ক্ষতি হইবে না।

সময় নির্দ্দেশের জন্য এলার্ম্ ঘড়ি ব্যবহার করা যাইতে পারে। উত্তাপ ঠিক্ রাখিবার জন্য এতুভ পাস্তর্ (Etuve Pasteur) নামক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই যন্ত্রটী একটী আল্‌মারির আকারে নির্ম্মিত। ইহার মধ্যে গ্যাসের আলোক-শিখা ও গরম জলের নল (worm) এমন ভাবে সাজান আছে যে, শীতাধিক্য হইলে শিখাটী স্বতঃই অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া নলের মধ্যস্থিত জলকে উষ্ণতর করিয়া দেয়। আবার গ্রীষ্মাধিক্য হইলে, জল ফাঁপিয়া একটী সূক্ষ্ম কাচের নলের মধ্যে ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিতে দেখা যায়। জলের উচ্চতা নিবন্ধন জলের নিম্নতলে চাপ্ অধিক হয়। নলের নিম্নপ্রদেশে একটী রবারের পটাহ আছে। এই পটাহে যে পরিমাণ চাপ্ লাগে, ইহা সেই পরিমাণে স্ফীত হয় এবং পটাহের অপর পৃষ্ঠার স্থান সঙ্কীর্ণ

করিয়া দেয়। এই স্থানটী গ্যাস্ যাইবার প্রণালী। যন্ত্রটী এমন চমৎকারভাবে গঠিত যে, অতি সামান্য গ্রীষ্মাধিক্য হইলেই দীপশিখার হ্রাস ও অতি সামান্য শীতাধিক্য হইলেই দীপশিখার বৃদ্ধি হইয়া, আপনা হইতে আল্‌মারির মধ্যস্থ শীতোত্তাপ দিবারাত্রি ঠিক্ একই রূপ রাখিয়া দেয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুবিধার জন্য পাস্তার্ যে নানা প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, এতুভ্-পাস্তার্ তন্মধ্যে একটী। জল বিশুদ্ধ করিবার যত প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পাস্তার্-আবিষ্কৃত ফিল্‌টারের দ্বারা যত সহজে ও যত নির্দ্দোষভাবে জল পরিস্কৃত হয়, এরূপ অন্য কোন উপায়ে হয় না। পাস্তারের এই দুইটী 'আল্‌গা' আবিষ্কারের দ্বারা নানাবিধ উপকার দর্শিতেছে।

ইউরোপের অনেক স্থানেই এককালীন পাস্তারের কারখানা হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় টিকা-রস আম্‌দানী করার নিয়ম হইয়া গিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় টিকা-রস ব্যবহারের পরে সমস্ত জন্তু গো-বসন্ত রোগ হইতে রক্ষিত হইয়াছে কি না, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য, পালের কয়েকটী গরু বা ভেড়াকে 'তীব্র টিকা-রস' (Virulent Vaccine) দ্বারা টিকা দেওয়া হয়। তিন প্রকার টিকা-রস ৩ বারে ডাকযোগে পাঠান হয়। টিকারস আসিলেই উহা ব্যবহার করিয়া লইতে হয়। পাস্তারের কারখানা হইতে রওনা হইবার তিন চারি দিবসের মধ্যে টিকা-রস ব্যবহার করা আবশ্যক। টিকা-রসের মধ্যে কৈশিকাণু ও বীজাণু দুই প্রকার অণুই মিশ্রিত থাকে। কৈশিকাণু বায়বিক (Ærobic) অণু, অর্থাৎ বায়ু ব্যতীত এই অণু মরিয়া যায়। যে শিশির মধ্যে টিকা-রস ভরিয়া পাঠান হয়, ঐ শিশির মধ্যে কিছু বায়ু থাকে বলিয়া কৈশিকাণুগুলি ৩।৪ দিবস জীবিত থাকে। গো-বসন্তের বীজাণু বায়ু-বিহীন স্থানেও অনেক কাল জীবিত থাকে। কিন্তু বীজাণু দ্বারা টিকা দেওয়ায় সর্ব্বদা ফল দর্শে না। জীবিত কৈশিকাণু যেমন শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই শোণিতের মধ্যে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং এক দিবসের মধ্যেই অল্প বিস্তর রোগোৎপাদন করিয়া টিকা দেওয়ার কার্য্য সফল হইল বুঝাইয়া দেয়, বীজাণু শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাদৃশ সত্বর কার্য্য করে না। শোণিতের মধ্যে বীজাণু হইতে উদ্ভিজ্জমান কৈশিকাণু জন্মিতে না জন্মিতেই শোণিতস্থিত শ্বেত-কণিকা (White blood-corpuscles বা Phagocytes Pasteur) বীজ গুলিকে খাইয়া হজম করিয়া নষ্ট করিয়া দিতে পারে। এ কারণ বীজাণু মাত্র ব্যবহার দ্বারা টিকা দেওয়ার ফল হইতেও পারে, না হইতেও পারে। পাছে বায়ু অভাবে এক কালীন কৈশিকাণু সমস্ত মরিয়া যায়, একারণ পাস্তারের কারখানা হইতে টিকা-রস দূরদেশে পাঠাইতে হইলেই, বীজাণু অবস্থাগত টিকা-রস মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। এরূপ স্থলে টিকা দিবার ফল যথাযথ রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভারতবর্ষে যদি পাস্তারের কারখানা হইতে টিকা-রস আনিতে হয়, তাহা হইলে বায়ু অভাবে পথেই সমস্ত কৈশিকাণু মরিয়া যাইবে। যে রস আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহার মধ্যে কেবল বীজাণুর উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। বীজাণু হইতে টিকার ফল অনিশ্চিত। একারণ যদি পারিস নগর হইতে টিকা-রস আনিতেই হয়, তাহা হইলে

মিশ্রিত অবস্থায় না আনিয়া উহা বীজাণু অবস্থায় আনাই শ্রেয়ঃ। এখানে মাংসের ক্কাথে ঐ বীজাণু পাত করিয়া, কৈশিকাণু অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করিয়া পরে ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু বীজাণু অবস্থায় পারিস নগর হইতে ভারতবর্ষে গো-বসন্তের টিকা-রস আম্‌দানী করিবার পক্ষেও একটী বাধা আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ৪২°।৪৩° উত্তাপে ১২ দিবস থাকিয়া তীব্র বীজ অনেক হ্রস্বতা লাভ করে এবং এই উত্তাপে ২০ দিবস থাকিলে বীজ আরও অধিক হ্রস্বতা লাভ করে। লোহিত সাগর ও আরব সাগরে সময়ে সময়ে স্বভাবতঃই ৪০°।৪২° উত্তাপ হইয়া থাকে। এরূপ উত্তাপের মধ্যে ১২।১৪ দিবস ধরিয়া টিকা-রস থাকিলে, ইহার হ্রস্বতা এত অধিক হইয়া পড়িবে যে, ইহার ব্যবহারে কোনই উপকার পাওয়া যাইবে না। যদি টিকা-রস পাস্তারের কারখানা হইতে আনিতেই হয়, তাহা হইলেও এই রস যে নলের মধ্যে করিয়া আনা হইবে, তাহা বরাবর বরফের মধ্যে করিয়া আনিয়া ভারতবর্ষের কোন শীত প্রধান স্থানে রাখা আবশ্যক। এই সকল কারণেই গো-বসন্তের টিকা প্রস্তুতের কারখানা আল্‌মোড়া পাহাড়ের নিকট প্রস্তুত হইতেছে। ঐ স্থান হইতেও দেশময় টিকা-রস চালান করিতে হইলে শীতকালে করা আবশ্যক হইবে। শীতকালেই গো-বসন্ত আরম্ভ হয়। একারণ শীতকালেই টিকা দিবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আল্‌মোড়া হইতে ভারতবর্ষের সকল স্থানে ৩।৪ দিবসের মধ্যে টিকা-রস আম্‌দানী করিয়া ব্যবহার করিয়া লওয়া চলিতে পারে না। যদি ব্যবহৃত হয়, তবে বীজাণুর উপরই নির্ভর করিতে হইবে, এবং ফল অনিশ্চিত হইবে। যথাযথ ফল পাইতে হইলে প্রত্যেক প্রদেশে অন্ততঃ এক একটী করিয়া পাস্তার্-আলয়(Institute Pasteur) হওয়া আবশ্যক। পাস্তার্ আলয়ে কেবল গো-বসন্তের টিকা-রস প্রস্তুত হইবার কথা নহে। জলাতঙ্করোগ প্রভৃতি নানা সংক্রামক রোগের টিকা-রস প্রস্তুত হইলে পাস্তার আলয় গুলির দ্বারা মনুষ্য ও ইতর জন্তুর বহুধা উপকার হইতে পারিবে। পাস্তার-আলয় প্রস্তুতের জন্য এ যাবৎ বঙ্গদেশেই অধিক অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে, কিন্তু আরও অনেক অর্থ সংগৃহীত না হইলে কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে না। যে কয়েকজন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এই সাধু উদ্দেশ্যের বিপক্ষে বদ্ধপরিকর হইয়া এদেশীয় লোকদিগকে ইহার সাহায্যে যোগদিবার জন্য নিবারণ করিতেছেন, তাঁহারা আপনাদের হৃদয়গত ফরাশি-বিদ্বেষের পরিচয় মাত্র দিতেছেন। গো-বসন্তের টিকা-রস প্রস্তুত করিতে গো-মাংস অথবা কুক্কুট-মাংসের ক্কাথ ব্যবহার হইয়া থাকে বটে; কিন্তু যে কয়েকজন ইংরাজ নীতির ভাণ করিয়া পাস্তার্-আলয় স্থাপনের বিপক্ষে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহারা কি গো-মাংস অথবা কুক্কুট-মাংস ভক্ষণ করেন না? জৈন সম্প্রদায়ের লোকদিগের এ প্রস্তাবে সহায়তা করার আশা করা যায় না বটে, কিন্তু ইরাংজ, বাঙ্গালী প্রভৃতি জাতির গো-বসন্তে টিকা দিবার ব্যবস্থায় কিছুই আপত্তি হওয়া উচিত নহে। গো-বসন্ত রোগে টিকা দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে ভারতবর্ষে বৎসরে বৎসরে যে কত লক্ষ লক্ষ গরু বাঁচিয়া যাইবে, তাহা বলা যায় না। এ ব্যবহারের উদ্দেশ্য জীবহত্যা নহে, জীবরক্ষা। যে রোগের চিকিৎসা

প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই রোগের চিকিৎসা না করিয়া, জন্তুদিগকে কষ্ট পাইয়া মরিতে দেওয়ায় পাপ আছে।

পারিস নগর হইতে বীজাণু অবস্থাগত টিকা-রস আনিয়া এদেশে উহাকে কৈশিকা-বস্থায় পরিণত করিয়া ও পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া লওয়া অপেক্ষা পূর্ব্বাপর সমস্ত কার্য্যই এদেশে হওয়া উচিত। টিকা-রস ও ক্বাথ প্রস্তুতের ব্যবসায় এক্ষণে পারিস্ নগরে প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু টিকা-রস ও ক্বাথ ক্রয় করায় যেরূপ ব্যয় হইবে, তদপেক্ষা এ দেশে এ সকল প্রস্তুত করিয়া লইলে অনেক স্বল্প ব্যয়ে হইয়া যাইবে। টিকা-রস ফ্রান্স দেশ হইতে আমদানী করিতে হইলে যে ইহা পথে বিকার প্রাপ্ত হইয়া-অক্ষম হইয়া পড়িবে, এ বিষয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধেও প্রসঙ্গ করা গিয়াছে। একারণ প্রথম হইতে কি কি প্রণালী অবলম্বন দ্বারা টিকা-রস প্রস্তুত করা যায়, সমস্তই ক্রমশঃ বর্ণনা করা যাইবে।

পাস্তার্ অনুমোদিত উপায়ে গো-বসন্তের টিকা-রস সকল প্রস্তুত করিতে হইলে এই কয়েকটী সরঞ্জাম আবশ্যক।

(১) গ্যাসের ফুক্‌ণী নল (Blowpipe) ফুক্‌ণী নলের শিখায় কাচের নল গলাইয়া টিকা-রস প্রস্তুতাদি কার্য্যে ব্যবহারোপযোগী নানাবিধ কাচের নল, শিশি ইত্যাদি প্রস্তুত করা যায়। এই সকল সামগ্রী প্রস্তুত করিতে অভ্যাস আবশ্যক। পাস্তারের শিক্ষাগারে এই সকল সামগ্রী ছাত্রেরা প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করে। গ্যাসের ফুক্‌ণী-নলের সাহায্যে মাংসের ক্বাথের বোতল, টিকা-রস ঢালিবার 'বদ্‌নার' আকারের বোতল, বীজরক্ষা করি-বার নল, ইত্যাদি গলাইয়া বন্ধ করা যায়। টিকা-রস পাঠাইবার বোতল কিরূপে কাচের নল গলাইয়া প্রস্তুত করিতে হয়, টিকা-রসের বীজ মাংসের ক্বাথে বপন করিবার জন্য যে সূক্ষ্ম নল ব্যবহৃত হয়, তাহা কিরূপে নল গলা-ইয়া প্রস্তুত করিতে হয়, রোগে মৃত জন্তুর শরীর হইতে রক্ত শোষণ, অথবা এক আধার হইতে অন্য আধারে টিকা-রস শোষণ করিয়া স্থানান্তরিত করিবার জন্য যে পিপেট ব্যবহৃত হয়, তাহাই বা কাচের নল গলাইয়া কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, এসকল বিষয় লিখিয়া শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন আকারের কাচের নল পারিস নগরে ক্রয় করিতে পারা যায়। কিন্তু নল গলাইয়া যখন এসকল সামগ্রী প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তখন অধিক মূল্যে এসকল ক্রয় করিয়া অন্য দেশ হইতে আম্‌দানী করা নিষ্প্রয়োজন।

(২) একটী হিমাধার (Refrigerator)। এই আধারের মধ্যে টিকা-রসের বীজ সম্বৎসর কাল রক্ষিত হইতে পারে। প্রথম টিকা-রসের বীজ দুই বৎসর কাল ধরিয়া, এবং দ্বিতীয় টিকা-রসের বীজ এক বৎসর কাল ধরিয়া, শীতল স্থানে (১০°।১২° সাণ্টিগ্রাদ্ উত্তাপে) রক্ষা করা যাইতে পারে। এরূপ স্থানে থাকিয়া টিকা-রসের বীজ দুই বা এক বৎসর কাল হ্রস্বতা প্রাপ্ত, রূপান্তরিত বা মৃত হয় না। বীজ হইতে টিকা-রস প্রস্তুত করিয়া লইয়াও উহাকে শীতল স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। ইহার জন্য ২২°।২৩° সাণ্টিগ্রাদ্ উত্তাপ আবশ্যক। গ্রীষ্মপ্রধান স্থলে ২২°। ২৩° সাণ্টি-শৈত্য পাইতে হইলে হিমাধার আবশ্যক। টিকা-রস ২২°।২৩° সাণ্টি উত্তা-পের অধিক উত্তাপে থাকিলে শীঘ্রই বিকৃত হইয়া যায়। এ কারণ ভারতবর্ষের নিম্ন প্রদেশ সকলে পাহাড় হইতে টিকা-রস লইয়া আসিয়া ব্যবহার করিয়া লওয়া শীতকালেই চলিতে পারে। ২২°।২৩° উত্তাপে টিকা-রস সতেজ অবস্থায় থাকে, অথচ ইহাতে বীজাণু জন্মিয়া যায় না। এই উত্তাপে ইয়ুরোপে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে এবং এদেশে শীতকালে লাভ করা যাইতে পারে। অধিক উত্তাপে কার্য্য ক-রিতে হইলে, হিমাধার আবশ্যক। অধিক শীতে কার্য্য করিতে হইলে এতুভপাস্তার্ আবশ্যক।

(৩) অন্ততঃ দুইটী এতুভ-পাস্তার্ আব-শ্যক। একটী এতুভের উপরের দুই থাকে কৈশিকাণু অবস্থাগত প্রথম টিকা-রস, অপর টীর উপরের দুইটী থাকে কৈশিকাণু অবস্থা-গত দ্বিতীয় টিকা-রস রাখা উচিত। একটী এতুভের নিম্নের থাকে বীজাণু অবস্থাগত প্রথম টিকা-রস, এবং অপরটীর নিম্নের থাকে

উচিত। টিকার 'বীজ' মাংসের ক্বাথে বপন করিলে, প্রথম কয়েক দিবস কৈশিকাণু বা 'জটাবাঁধা' লক্ষিত হয়। দশ দিবস পর্য্যন্ত ক্বাথের মধ্যে অণু জন্মিয়া পুনরায় বীজ হইতে থাকে। ১০ দিবসের পরে টীকা-রসকে 'পুরাতন টিকা-রস' কহে। পুরাতন ও নূতন টিকা-রস এবং প্রথম ও দ্বিতীয় টিকা-রস পৃথক পৃথক্ স্থানে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। একটীর স্থলে অপরটী ভুলক্রমে প্রযুক্ত হইলে, হয় টিকা দেওয়া কার্য্য ব্যর্থ হয়, অথবা উহা হইতে অনিষ্টপাত হয়। এতুভের মধ্যে তিনটী থাক্ আছে। সর্ব্ব নিম্নের থাকের উত্তাপ যদি ৩৫° সাণ্টিগ্রাদ্ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, তদুপরিস্থিত থাকের উত্তাপ ৩২° ও সর্ব্বোপরিস্থ থাকের উত্তাপ ২৯° নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। মাংসের ক্বাথে বীজ বপন করিয়াই ২৯° উত্তাপে আধারগুলি রাখা কর্ত্তব্য। এক দিবস কাল ২৯° উত্তাপে রাখিবার পরে উক্ত আধার (flacons) গুলিকে আর এক দিবস কাল নিম্নের থাকে ৩২° বীজাণু অবস্থাগত দ্বিতীয় টিকা-রস রাখা উত্তাপে রাখা উচিত। তৃতীয় দিবসে আধার গুলির চারি ভাগের তিনভাগ এতুভ হইতে বাহির করিয়া লইয়া ২৩° উত্তাপের ন্যূন উত্তাপ যুক্ত কোন স্থানে রাখিতে হয়। ২৬°। ২৭° উত্তাপে থাকিলেও অতি শীঘ্র অণু বাড়িয়া গিয়া উহা বীজে পরিণত হইয়া যায়। বীজাণু অবস্থা রোধ করিবার জন্য টিকা-রসকে প্রথম দুই দিবস পরেই শীতল স্থানে রাখিতে হয়। যতগুলি আধারে টিকা-রস প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার এক-চতুর্থাংশ এতুভের সর্ব্ব নিম্ন থাকে রাখিয়া দিবার উদ্দেশ্য, উহাতে শীঘ্র শীঘ্র বীজাণু জন্মাইয়া লওয়া। টিকা-রসের এক-চতুর্থাংশ বীজাণু যুক্ত ও অপর তিন অংশ কৈশিকাণু যুক্ত হইলেই টিকার ফল ভাল হয়। একারণ একটী এতুভ "প্রথম টিকা-রস" ও অপরটী "দ্বিতীয় টিকা-রসের জন্য ব্যবহার করা উচিত, এবং এতু-ভের উপর দুইটী থাক্ "নূতন" এবং নিম্ন থাকটী "পুরাতন" টিকা-রস রাখিবার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

শ্রীনিত্য গোপাল মুখোপাধ্যায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

আমার দেবতা।

১

আমি বসায়েছি যারে, হৃদয়-আসনে,
বসন্তের ফুল-হাসি,
শারদ জোছনা-রাশি,
দারুণ বৈশাখী ঝড় বহিছে সঘনে;
উষার কোমল ছবি,
নিদাঘ-মধ্যাহ্ন-রবি,
সাঁঝের শ্যামল ছায়া গগন-প্রাঙ্গনে;
উজ্জ্বলে মধুরে মিশে তাহার আননে।

২

তার কি তুলনা মিলে এমর ধরায়?
আধ স্নেহ—আধ প্রেম;
আধ হীরা—আধ হেম;
আধ শক্তি, আধ ভক্তি, কিবা শোভা পায়!
আধ ছায়া—আধ কায়া;
আধ মোহ—আধ মায়া;
আধ লাজ, আধ ভয়, মিলিয়াছে তায়;
সে স্নেহের সে প্রেমের তুলনা কোথায়?

৩

বীরের হৃদয় তার, ধীর-স্থির মন;
সুখ স্বার্থ পরিহরি,
পরার্থে পরাণ ভরি,
শোণিত করিছে জল, পরের কারণ;
অজেয় সংসার-রণে
যুঝিছে সে প্রাণপণে,
কেবল পরেরি তরে আত্ম-বিসর্জ্জন;
ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা তার সবি অতুলন।

৪

কে বলে সে নিরমম পাষাণ সমান?
পাষাণ পাষাণ নয়;
পাষাণে নির্ঝর বয়;
অবিরাম স্নেহ-ধারা করিতেছে দান;

বাহিরে কঠোর যদি,
ভিতরে অমৃত-নদী ;
কলকল ঢল ঢল চির-বহমান ;
পীযূষে পূরিত মরি তাহার পরাণ।

বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সে যে এধরায় ;
সে ত দেবতার মত,
দেব-ভাবে অবিরত
শুষ্ক প্রাণে সুধা দানে পরাণ জুড়ায় ;
আমি তারে ভক্তি-ভরে,
পূজি গো হৃদয়-ঘরে,
মুগধ বিভল চিত তার গুণ গায় ;
"পুরুষ" তাহার নাম, নমি তার পায়।

নারী।

আরতি।

প্রেমময়ি !
বুঝিতে চাহিছ আজি প্রণয় যাহার,
লুকায়ে রেখেছ তারে অন্তরে তোমার !
গাহিতে জানি না গান,
পারি না বুঝাতে প্রাণ,
ধ্যান-মগ্ন রহি, শুধু তোমারে ভাবিয়া ;
উজ্জ্বল মানস পটে,
তোমারি যে ছবি উঠে,
আত্মহারা হ'য়ে থাকি বিস্ময়ে চাহিয়া !
এমন সৌন্দর্য্য ভরা,
এত শোভা মনোহরা,
প্রেমের এমন মূর্ত্তি দেখিব না আর ;
শান্তি প্রীতি পবিত্রতা,
কি লাবণ্য সরলতা,
একত্রে মিশিয়া আছে অঙ্গেতে তোমার !
মধুর আননে তব,
স্বর্গ শোভা নিত্য নব,
করুণা উঠিছে ফুটি নয়নের কোণে ;
মলয়া বহিছে শ্বাসে,
হাসিতে প্রকৃতি হাসে,
মন্দাকিনী বহে বুকে নিভৃতে নির্জ্জনে !
অঞ্চল ভূমেতে লুটে,
পারিজাত ফুটে উঠে,
ও রাঙ্গা চরণ তলে যাচিছে মরণ ;
অলকার যত শোভা
প্রাণারাম মনোলোভা,
চৌদিকে পড়িয়া আছে বেড়িয়া চরণ !
বিশুদ্ধ চিত্তের আগে,
ও মুরতি সদা জাগে,
যোগিজন শান্ত হৃদে আরাধ্য দেবতা !
চিত্ত ভরি উঠে প্রীতি,
ধ্যান করি নিতি নিতি,
ধেয়ানে জগত লুপ্ত বিলুপ্ত মত্ততা !
বুঝাতে পারি না প্রিয়ে,
তোমারে হৃদয় দিয়ে,
তোমারি মাঝারে হেরি নিখিল সংসার !
প্রেমের প্রদীপ জ্বলে,
আরতি করিব ব'লে,
দূরে রাখ' বিশ্বমূর্ত্তি অনন্ত অপার,
ধর' সে মোহিনী মূর্ত্তি সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার !

শ্রীবিপিন বিহারী রক্ষিত।

প্রেম-নৈরাশ।

(১)

প্রেম-পুষ্প অর্ঘ্য দিয়ে—চরণে ঢালিনু হিয়ে,
প্রাণের প্রতিমা—সে ত হ'ল না সদয় !
কাঁদিয়াছি কত দিন—তবু সে মমতা হীন—
আমার জীবনে সেই ক'রেছে প্রলয়।
সুখ সাধ গেছে ঘুচে, আকাঙ্ক্ষা গিয়াছে মুছে,
জীবন হ'য়েছে শুধু মহা মরুময় !
চাহিলে প্রাণের পানে আতঙ্ক উদয়।

(২)

চাঁদ সে হাসে না হাস—কুসুমে নাহিক বাস,
উষায় মাধুরী নাই—ধরণী কঙ্কর !
প্রিয় যে, আসিলে পাশে, নয়ন উথলি ভাসে,
আপনার দুখে থাকি আপনি কাতর।
পরতে পরতে জ্বলে হৃদয়ের অন্তস্তলে
যে বহ্নি, জ্বলিবে জানি, সে ত নিরন্তর—
কেন রমণীর প্রাণ কঠিন প্রস্তর ?

(৩)

মিছে তবে অর্চ্চনায় পূজিলাম দেবতায়—
স্নেহ-বিন্দু ছিল না কি হৃদয়ে তাহার !
কেন হেন নির্ম্মমতা, বুঝিতে ব্যথীর ব্যথা
নাহি এতটুকু তার লেশ করুণার ?
হৃদয়ের কক্ষে কক্ষে ভ্রমি সে দেখেছে চক্ষে
তার রূপ-প্রতিবিম্ব জাগে অনিবার ;
তবু সে পাষাণী কই হ'ল না আমার !

(৪)

তীব্র বাসনার সনে যুঝিয়াছি প্রাণপণে—
কই পারিয়াছি প্রেম করিতে দমন?
তবু তার—মূর্ত্তি, স্মৃতি পূরিয়া র'য়েছে ক্ষিতি
তাহারি লাবণ্যছটা উছলে গগন!
সেই ধর্ম্ম—সেই পুণ্য, সে বিনা সকলি শূন্য,
সে ব্যাপিয়া আছে মম সমস্ত জীবন!
সে ছাড়া ত আমি নই—তবু সে স্বপন!

(৫)

ঘৃণা, তিরস্কার তার সে মম অঙ্গের ভার,
তবু সে দেবতা সম আরাধ্য আমার!
তার মুখে স্বর্গ ভাসে, সুধা ক্ষরে তার হাসে,
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে—রূপ-পূর্ণিমার!
তাহার সুরভি-ঘ্রাণ ল'য়ে বায়ু বহমান—
নিশ্বাসে নিশ্বাসে স্পর্শ পাই সে তাহার!
ভিতরে বাহিরে মম তার অধিকার!

(৬)

ভাবিয়াছি কতবার, ভাবিব না তারে আর,
রুধিব মনের দ্বার—নিষ্ফল কামনা!
কিন্তু কি অবোধ মন—ধৈর্য্য নাহি এক ক্ষণ—
জীবন ত্যজিতে পারি—পারি না ভাবনা।
সে নিরেট—সে পাষাণ—হউক না নিরমাণ,
না বুঝুক্ অভাগার হৃদয়-বেদনা!
আমি কি ছাড়িতে পারি তাহার সাধনা?

(৭)

সব শূন্য—সব ফাকা, শুধু তার মূর্ত্তি আঁকা—
আকাশ, পৃথিবী সিন্ধু আমার হৃদয়!
মুদিলে নয়ন দুটী তার চিত্র উঠে ফুটি,
বিহ্বল হইয়া তারে দেখি বিশ্বময়!
তার ঘৃণা-হলাহল, করিয়াছি কণ্ঠতল,
উগারিতে নারি—হোক্ সদ্য মৃত্যুময়;
জানি সে রমণী বড় কঠিন—নির্দ্দয়!

(৮)

আমি এ হৃন্মেদ যাগে আহুতি দিয়েছি আগে—
"আমার আমার" কথা—ক্ষুদ্র অভিমান!
তবে কেন মরি খেদে মিছা-মিছি কেঁদে কেঁদে?
হউক্ না বিষভরা তার প্রতিদান!
আমি যে বেসেছি ভাল, বাসিব সে অন্তকাল,
থাকুক্ না মাঝখানে শত ব্যবধান;
হউক্ না রমণীর কঠিন পরাণ!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

উপহার।

১

কিবা দিব উপহার কি আছে আমার?
অসীম আকাশ খুঁজে, সাগরের তলা খুঁজে,
গহন নগর পল্লী পর্ব্বতের চূড়া খুঁজে,
পাইয়াছি শুধু এই দগধ-বিষাদ-ভার,
মরমের জ্বালা এতে জ্বলে অনিবার,
কিবা দিব উপহার কি আছে আমার?

২

গিয়েছিনু ফুল-বনে তুলেছিনু গ'ণে গ'ণে,
গোলাপ চামেলী বেলী বকুল চম্পক-সনে,
অশ্রু প'ড়ে বার বার হয়ে গেছে অশ্রুধার,
গেঁথেছিনু মন-সাধে সুচিকণ হার,
কিবা দিব উপহার কি আছে আমার?

৩

কনক ছুঁইলে হাতে কলঙ্ক জনমে তাতে,
মাটী হয়ে যায় হীরা অভাগা যে পরশিতে,
দংশয়ে ফণিনী হয়ে ছুঁইলে মুকুতা-হার,
আমি যে গো পাপময় বিষের পাথার,
কিবা দিব উপহার কি আছে আমার?

৪

আছে অশ্রু দুখময় হেরিলে না দয়া হয়,
ভিজাইতে উপাধান শুধু সে নিশীথে বয়,
ছিন্ন হিয়া, চিতানলে পু'ড়ে এবে ছার খার,
দানব পিশাচ তাহে করে হাহাকার,
কিবা দিব উপহার কি আছে আমার?

৫

স্বরগ মরত টানি মাখিয়া পরাণখানি,
ঢালিয়া চরণে দিব বড় সাধ মনে মানি,
প্রাণ যে আমার নাই আছে শুধু হাহাকার,
জ্বলে তথা শ্মশানের অগ্নি অনিবার,
কিবা দিব উপহার কি আছে আমার?

৬

সাধুতা মরিয়া গেছে, পুণ্য ধর্ম্ম উ'ড়ে গেছে,
ভকতি মুকতি নাই নরক পড়িয়া আছে,
ব্যর্থ এই অশ্রু দিয়া রচিয়াছি পারাবার,
ইচ্ছা হয় লহ পদে এ দুখের ভার,
কিবা দিব উপহার কি আছে আমার?

দিনামার হিন্দুরমণী জানকী বাই।

আজ ঠিক পাঁচ বৎসরের কথা বলিতেছি। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে এক দিন লণ্ডনের ব্রিটীশ মিউজিয়মে বুলাকীরাম শাস্ত্রী আমার নিকট রুশিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন তাঁহার বয়স ২৭।২৮ বৎসর হইবে। বুলাকীরাম জাতিতে ক্ষত্রিয়, নিবাস পঞ্জাব প্রদেশ, তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পরীক্ষার শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত। বুলাকীরাম সে সময় বারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন মাত্র, সনন্দ পান নাই; তাহা পাইতে ছয় মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং ঐ কাল মধ্যে ইউরোপের কিছু দেখিয়া শুনিয়া দেশে ফিরিবার সংকল্প করিয়াছেন। রুশিয়া দেখা বিশেষ মানস, কারণ পঞ্জাবে গেলে অনেকে তাঁহাকে রুশীয়দের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবে;—সে প্রদেশে রুশের কথার কিছু বেশী আলোচনা। আমিও এই সময়ে ছয় মাসের জন্য ইউরোপীয় মহাদেশ পর্য্যটনে বাহির হইবার উদ্যোগে ছিলাম। সুতরাং যে কয় দিন হয় এক সঙ্গে ভ্রমণ করিবার মত জানাইলাম; এবং তাঁহার মতানুযায়ী প্রথমে রুশিয়ার দিকে যাওয়া স্থির হইল। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট দিবসে নরওয়ে যাত্রা করা গেল।

নরওয়ের রাজধানী ক্রিষ্টিয়ানিয়া (Christiania) হইতে আমি উত্তরান্তরীপ (North Cape) যাত্রা করি; আমার প্রত্যাগমন অপেক্ষায় তিনি ক্রিষ্টিয়ানিয়াতেই থাকেন। পরে যথা সময়ে আর্কটিক প্রদেশ হইতে ফিরিয়া আসিলে আবার একত্রে ভ্রমণ আরম্ভ হয়। রুশিয়া ব্যতীত অন্যান্য স্থান দেখিবার জন্য তাঁহার তত আস্থা ছিল না। মূলকথা, রুশের মুলুক দেখা ভিন্ন পর্য্যটন তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। বিধাতার লীলাখেলা বিধাতাই বুঝেন, ক্ষুদ্র কীটাণুকীট মানুষ কি বুঝিবে? আমরা যতই কেন করি না, যে দিকে গেলে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালিত হইবে, তিনি ঘাড় ধরিয়া আমাদিগকে সেই দিকেই লইয়া যান। ইচ্ছা,প্রবৃত্তি থাকুক আর নাই থাকুক, অজ্ঞানুসারে কলের পুতুলের মত আমাদিগকে সেই দিকেই চালিত হইতে হয়। ক্রিষ্টিয়ানিয়া হইতে রুশিয়া যাইতে গেলে, অবশ্য সুইডেনের রাজধানী ষ্টক্‌হল্‌মে(Stockholm) গিয়া জাহাজে উঠিতে হয়। ওখান হইতে ষ্টক্‌হল্‌ম্ সোজা রেলপথ। কিন্তু লণ্ডন হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে বন্ধু বুলাকীরাম বলেন যে, গোথাখালের (Gotha canal) অনেক সুখ্যাতি শুনা হইয়াছে, সুতরাং ঐ পথেই যাওয়া পরামর্শ। পর্য্যটন-প্রিয়তা তাঁহার কিছু মাত্র না থাকিলেও অনেক ঘুরিয়া ঐ খাল দিয়াই তাঁহাকে যাইতে হইবে; কারণ সেখানে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে একটী বিশেষ ও আশ্চর্য্য ঘটনা ভগবান সংঘটিত করিবেন, তাঁহার ব্যবস্থায় লেখা আছে:—গোথা-খাল একটী জীবন্ত নবন্যাসের রঙ্গভূমি হইবে। বিশ্বরাজাধিরাজের হুকুম মানিতেই হইবে; কাজেই সকল সংক্ষেপ পথ ছাড়িয়া আমাদিগকে গটেনবর্গ (Gottenburgh) যাত্রা করিতে হইল। এখানে পঁহুছিবার পরদিন মধ্যাহ্নে 'পালাস' (S S "Pallas") নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া খালের যাত্রী হই। বাস্তবিকই এই খাল দিয়া গটেনবর্গ হইতে ষ্টক্‌হল্‌ম্ যাওয়া পৃথিবীর মধ্যে একটী মহা উপা-

দেয় বিহার। তিন দিন লাগে; ইহার মধ্যে কত প্রকার মনোরম দৃশ্য দেখা যায়, কত সুন্দর সুন্দর হ্রদ, দ্বীপ, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, বন উপবন, এবং অবশেষে সমুদ্র শাখা ও অসংখ্য দ্বীপ পুঞ্জের মধ্যদিয়া ষ্টক্‌হল্‌মে উপনীত হইতে হয়। খালের বিবরণ স্থানান্তরের বিষয়, এখানে সে বিষয়ে কিছু বলিবার দরকার নাই।

পালাস জাহাজে আমরা নানা দেশীয় নরনারী মিলিয়া ৩০।৩৫ জন আরোহী ছিলাম। খাওয়া দাওয়া, গল্প গুজব, আমোদ প্রমোদ ভিন্ন আমাদের আর কি কাজ ছিল? কেবল মধ্যে মধ্যে ব্যায়ামের জন্য কেহ কেহ লকের (Lock) নিকট জাহাজ হইতে নামিয়া কতক দূর খালের ধারে ধারে পদব্রজে চলিতেন। যাত্রীদের মধ্যে একটী দিনামার (Danish) পরিবার বুলাকীরাম ভায়ার বিশেষ আকর্ষণের সামগ্রী ছিলেন। কাপ্তেন আমাকে মধ্যে মধ্যে এ কথা বলিতেন। আমি বিশেষ লক্ষ্য করিতে পারি নাই; কারণ অবকাশ পাইলে আমি একটী বৃদ্ধা রুশ রমণীর সহিত কথোপকথন দ্বারা রুশিয়া সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহে নিযুক্ত থাকিতাম। ইনি অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় আড্‌মিরাল কোজাকর ভিশের (Admiral Kozakervitch) বিধবা পত্নী। আড্‌মিরাল মহাশয় বহুকাল মধ্য-আসিয়ার একজন শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আমুর নদীস্থ একটী দ্বীপ তাঁহার নামে অভিহিত। ইনি অতি সহৃদয়, আমাদের দেশের প্রাচীন গিন্নিবান্নির মত লোক; ইংরাজীভাষা সুন্দর জানিতেন। রুশিয়া ও মধ্য আসিয়া সম্বন্ধে তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছি, তাহাও স্থানান্তরের বিষয়। দিনামার ভদ্রলোকটী স্ত্রী ও দুইটী সুন্দরী যুবতি কন্যা সমভিব্যাহারে আমাদের ন্যায় খাল-বিহারে বাহির হইয়াছেন। প্রায় বৈকালে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের সঙ্গে খালের ধারে হাঁটিয়া ভ্রমণ করেন; মধ্যাহ্নে জাহাজের একপার্শ্বে বসিয়া দুইটী কন্যার সঙ্গে আলাপ দ্বারা সুখে কালাতিপাত করেন। লণ্ডনেও তিনি এইরূপ অনেক পরিবারের সঙ্গে মিশিতেন, সুতরাং এক্ষেত্রে উহাতে কোন নূতনত্ব আমার চক্ষে লাগে নাই। যাহা হউক, অতি সুখে কয়দিন কাটাইয়া যথা সময়ে ষ্টক্‌হল্‌ম্ পঁহুছিলাম। পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণান্তে সব ছাড়াছাড়ি হওয়া গেল; কে কোথায় গেলেন, কোন নির্দ্দেশ নাই। ইহার কয়েকদিন পরে আমরা রুশিয়া চলিয়া যাই, সুতরাং আর তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক থাকে না। রুশিয়া হইতে পুনরায় ষ্টক্‌হল্‌মে আসিলে, হঠাৎ এক দিন বুলাকীরামের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়; এবং তাঁহারা যে হোটেলে থাকিতেন, ভায়া সেই খানে নিমন্ত্রিত হন। আমার সহিত কিন্তু আর দেখা শুনা নাই।

সুইডেন হইতে আমরা জার্ম্মেণি (Germany) যাই। বার্লিনে (Berlin) কয়দিন থাকার পর বুলাকীরাম লণ্ডন ফিরিয়া যান। তার পর কয়মাস নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া যখন লণ্ডনে প্রত্যাগমন করি, তখন দুই এক দিন মাত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন; আমিও দুই মাস পরে অন্যদিক পর্য্যটনে বাহির হই। দেশে আসিবার পর তাঁহার খোজ খবর বড় একটা পাই নাই। কয়দিন হইল হঠাৎ তাঁহার এক পত্র দ্বারা যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাই পত্রস্থ করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

যদিও ঐ দিনামার পরিবারের সহিত

ষ্টক্‌হল্‌মেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়, কিন্তু নিশ্চয়ই বুলকীরাম তাঁহাদের ঠিকানা লইয়াছিলেন ও তাঁহারাও উঁহার ঠিকানা জানিতেন। চারি বৎসরকাল তাঁহাদের মধ্যে অবশ্য পত্রাদিও লেখালেখি হইয়াছিল। গত ১৮৯৫ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লণ্ডন নগরে ঐ কন্যাদ্বয়ের কনিষ্ঠাটীর সঙ্গে শিখধর্ম্ম প্রথানুসারে বুলাকীরামের বিবাহ হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার হিন্দু পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন ইহাতে বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়াছিলেন। এখন বিবাহের পর যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাই ভারতের পক্ষে অতীব অভিনব ব্যাপার। ইহাতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে কি লক্ষিত হয়, ভাবিয়া দেখা উচিত। ভাল মন্দ আমি কিছু বলি না, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির সে অধিকার কোথায়? উহার বিচার ভারতোদ্ধারকারী মহোদয়গণের হাতে। চিরাগত-প্রিয় রক্ষণশীল "আর্য্য" একদিকে চিন্তা করুন; আর পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী "অহিন্দু" ভায়ারা অপর দিকে নৃত্য করুন; আমরা উভয়ের মধ্যে নিবিষ্টচিত্তে দাঁড়াইয়া দেখি। অনেকে বলিতে পারেন, পঞ্জাবের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? তাহা হইলে "ভারতোদ্ধার" কথাটা মাটি হয়, কন্‌গ্রেস রসাতলে যায়; সুতরাং তাহা কি প্রকারে হইতে পারে? বাঙ্গালী পাশ্চাত্য শিক্ষায় উন্নত, পঞ্জাব অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে; অপর দিকে নিম্ন বঙ্গভূমে সমস্ত আর্য্য শোণিত আসিয়া দেশহিতৈষণার প্রবল স্রোত চালাইয়াছে, পঞ্জাবে অনার্য্য মুসলমানীভাব অনেক পরিমাণে বিদ্যমান;—একথা বলিলেও চলে না। যে দিক দিয়া যাওয়া যায়, আর্য্যপ্রভাব জাগাইবার ব্যাপারেই হউক, আর সমগ্র ভারত ইউরোপীয় ভাবে পুষ্ট করিবার উদ্যমেই হউক, পঞ্জাবকে বাদ দিয়া চলা যায় না। ভূতের ও বর্ত্তমানের পঞ্জাব-গৌরব খসাইয়া লইলে ভারত-গৌরব কতটুকু থাকে, বলা কঠিন।

বুলাকীরাম লিখিয়াছেন, তাঁহার দেশস্থ জাতীয় ও আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ নবদম্পতীকে সাদরে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করিয়াছেন।

("The most wonderful thing, perhaps, you will observe is that my wife has been taken into the Hindu society by the people of my province. My own family has received her with open arms and the leading Hindus with whom we have been guests have had no objection to dine with her. My servants are all Hindus—Brahmins and Khetryas).")

সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ বিনা আপত্তিতে তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহাদের সংসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় চাকর-বাকর রহিয়াছে—অর্থাৎ পাচকাদি মুসলমান বা খ্রীষ্টান নয়।

পঞ্জাবের সামাজিক মহারথীগণ যাহা করিতেছেন, তাহা ত শুনিলেন। এখন খ্রীষ্টান ইউরোপে লালিতা পালিতা দিনামার যুবতী লাঞ্ছিত ও শ্বেতাঙ্গ-পদ-দলিত ভারতীয় পরিবারের গৃহলক্ষ্মী হইয়া কি করিতেছেন, একবার শুনুন। এ সকল বিধাতার লীলা, কালের খেলা, উনবিংশ শতাব্দীর ভেল্কিবাজী। তিনি ভারতীয় পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া "জানকী বাই" নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

("My wife is now a thorough Hindu and rejoices in the name of Janaki Bai. She dresses like a Hindu lady and wears Hindu shoes.")

প্রায় ৪।৫ মাস অতীত হইল তাঁহাদের এক কন্যা হইয়াছে; তাহার নাম রাখা হইয়াছে "শকুন্তলা"। নামকরণোপলক্ষে বুলাকীরামের শাশুড়ী সুদূর ডেনমার্ক হইতে পঞ্জাবে আসিয়া ভোজকলারে নিয়মিত রূপে যোগ দিয়া লুচিমণ্ডা খাইয়া গিয়াছেন।

এখন ভাটপাড়ার কোন ভট্টাচার্য্যের টিকি-ধারী পুত্রের সহিত এই কন্যা শকুন্তলার বিবাহোপলক্ষে ফলার করিতে পারিলে আমরা পরম সুখ লাভ করি; এবং হিন্দু সমাজের মুখ উজ্জ্বল হয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

দুইখানি পুস্তক।

১। ৺ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জীবন-চরিত।—শ্রীয় রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর চিন্তাশীল সুলেখক। তাঁহার প্রণীত পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জীবন-চরিত সাধু হিন্দু জীবনের একখানি আদর্শ চিত্র। প্রথম সংস্করণের সমালোচনায় গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা উল্লেখ করিয়া আমি আক্ষেপ করিয়াছিলাম। গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্ণ চরিত্র উপহার দিয়া কেবল আমার আশা মিটান নাই—ভ্রাতৃ কর্ত্তব্য, অতিযত্নে, কোমলতা ও ভক্তির সহিত প্রতিপালন করিয়াছেন, এবং বাঙ্গালা ভাষা উপকৃত হইয়াছে। ৺ প্রেমচন্দ্রের অনেক শিষ্য অদ্যাপি জীবিত আছেন; তাঁহাদের নিকট হইতে পণ্ডিত মহাশয়ের আখ্যায়িকা অনেক সংগ্রহ করা যাইতে পারে। যতদূর পারা যায়, সংগ্রহ করিয়া একখানি বৃহত্তর গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য। শিষ্য সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। আর দশ পনর বৎসরে প্রায় সকলে অদৃশ্য হইবেন। তখন এমন সুযোগ আর ঘটিবে না।

তাই বলিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ নহে। প্রেমচন্দ্র পণ্ডিত ও সাধু। তাঁহার নিরীহ প্রকৃতি প্রকৃত হিন্দুর ন্যায় সংসারের অন্তরালে তাঁহার জীবন অতিবাহিত করাইয়াছিল। বিদ্যাসাগরের ন্যায় সমাজ-সমরে বীরের ন্যায় তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান হইতে তাঁহার প্রকৃতি সঙ্কুচিত হইত। তাই বলিয়া তিনি শুষ্ক সন্ন্যাসী ছিলেন না। বন্ধু বান্ধব শিষ্য লইয়া কাব্যশাস্ত্রের অমৃতরস আস্বাদনে তাঁহার দিনপাত হইত। তাঁহার দেহ সুন্দর, বেশ সুন্দর, ভোজন সুন্দর, বল সুন্দর, প্রকৃতি সুন্দর। কৃত্রিম ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে বসিয়া নীরবে তিনি স্বভাবের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতেন। এই সৌন্দর্য্য প্রিয়তা তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাসকেও সৌন্দর্য্যময় করিয়াছিল। তিনি সকল ধর্ম্মের যুক্তিমত্তায় বিশ্বাস করিতেন, কৃচ্ছ্র সাধনে উৎসাহ দিতেন না, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে ঘৃণা করিতেন না। চরিত্রের পবিত্রতা, হৃদয়ের কোমলতা ও প্রেমময়ের সাক্ষাৎ অনুভূতি, এই তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস। চরিত্রের মধুরতা ও কাব্যালোচনা তাঁহার ধর্ম্ম জীবনকে সৌন্দর্য্যময় করিয়াছিল। সত্যং শিব সুন্দরং তাঁহার উপাস্য। প্রেমচন্দ্র কাব্যরসের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন তাঁহার রসজ্ঞতার নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্যজ্ঞান এত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যে, আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি যে, সাধনা করিলে তিনি রাফেলের ন্যায় চিত্রকর হইতে পারিতেন। কাব্য-ব্যাখ্যার সময় তাঁহার চিত্রবিদ্যার পরিচয়ে বিস্মিত হইতে হইত। এমন সুন্দর জীবনের আখ্যায়িকায় হৃদয় আকৃষ্ট হয়—ঘটনার বৈচিত্র্যে, কথাগুলির মিষ্টতায় এবং রামা-

ক্ষয় বাবুর লেখার গুণে যত পড়ি, তৃপ্তি হয় না, আরো পাইতে ইচ্ছা হয়; তাই গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ না হইলেও আরো বৃহৎ দেখিতে বাসনা করি।

কাব্যরসে রসিক হইলেও দর্শনতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্বে প্রেমচন্দ্রের অভিনিবেশ ও অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। শিষ্যগণ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে বিনীত দৃঢ়তার সহিত তিনি যেরূপে ঐ সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন, কোন দার্শনিক বা সমাজতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত তাহা অপেক্ষা গুরুতর উপদেশ দিতে পারিতেন না।

একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘটনা-শূন্য নিরীহ জীবনে কি থাকিতে পারে যে, দুই শত পৃষ্ঠার একখানি বৃহদাকার গ্রন্থ হয়! যাদুকর দণ্ডমাত্র আন্দোলন করিয়া মরুভূমে রসালবৃক্ষ উৎপাদন করিয়া তাহাতে সুরস ফল উৎপাদন করিতে পারেন। রামাক্ষয় বাবু চিন্তাশীল দার্শনিকের ন্যায় তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবন যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। একটি কথার নিরর্থক ব্যবহার হয় নাই, একটী কথা হইতে আর একটী কথা আবশুক হইলে গ্রন্থকার চেষ্টা করিয়া লেখনী সংযত করিয়াছেন। তাঁহার ভয় হইয়াছে, পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে। প্রকৃত সুলেখকের ন্যায় তিনি আত্মসংযমের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তিনি এ সংযম না করিলে আমরা পরিতৃপ্ত হইতাম।

মাইকেল সাহেবী বাঙ্গালী, প্রেমচন্দ্র বাঙ্গালীর বাঙ্গালী, হিন্দুর হিন্দু। মাইকেলের জীবন-চরিত্রের সহিত প্রেমচন্দ্রের জীবন-চরিত্রের তুলনা করিতে বড়ই ইচ্ছা জন্মে। নানা কারণে আমরা সে ইচ্ছা দমন করিলাম। কেবল এই মাত্র বলিতে পারি, জীবন-চরিত্র রচনায় রামাক্ষয় বাবু অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নব্যভারতে অতিমানুষী বা আধিভৌতিক ঘটনা সম্বন্ধে আমি কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তর্কবাগীশের জীবন-চরিত্রে রামাক্ষয় বাবু কয়েকটী আধিভৌতিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। অতি বিশ্বস্ত লোকের নিকট হইতে এগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে, কোন কোনটী তাঁহার প্রত্যক্ষ। সুতরাং অবিশ্বাসের সম্ভাবনা নাই। আমরা তাহার কয়েকটী ঘটনা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। এই উপলক্ষে পাঠকগণ রামাক্ষয় বাবুর লিপি-চাতুরীর পরিচয় পাইবেন। সাত্ত্বিক জীবনের অধিকার কতদূর, তাহার আভাস পাইবেন এবং এরূপ ঘটনা সম্বন্ধে তখন আমরা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহার কিছু প্রমাণ পাইবেন।

মৃত্যুর তিন মাস পূর্ব্বে মধ্যম ভ্রাতার অনুনয় ও অনুরোধসূচক পত্র সকলের উত্তরে প্রেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, বিসূচিকারোগে তাঁহার জীবন শেষ হইবে। ইতিপূর্ব্বে যৌবনে দুইবার এই রোগ হইয়াছিল, পরিত্রাণও হইয়াছিল। আগামী বৈশাখের পূর্ব্বে যে এই রোগ ঘটিবে, তাহার পরিণাম দেখিয়া একবার বাটী যাইবার ইচ্ছা রহিল। প্রেমচন্দ্রের গণনার ফল অব্যর্থ।

সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পদ প্রাপ্তির কিছু দিন পরে একবার ফাল্গুন মাসে সূর্য্যগ্রহণ হয়, সর্ব্বগ্রাস হওয়ায় গ্রহণ কাল বিস্তীর্ণ ও মধ্যাহ্নকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। প্রেমচন্দ্র বড়বাজারের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে স্নান ও জপ সমাপন করিয়া লোকের দানাদি কার্য্য দেখিতেছিলেন এবং অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণের প্রতীক্ষা করিতে-

ছিলেন। তাঁহার অনতিদূরে এক বিষয়ী লোক বেগুণে রঙের একখান বস্ত্র দ্বারা আপন মস্তক ও দেহের অধিকাংশ আচ্ছাদিত করিয়া জপে বসিয়াছিলেন। এই সময়ে পাগলের মত এক ভিক্ষুক তথায় আসিল এবং আপন ছিন্ন-বস্ত্র-খণ্ড মেলিয়া ভিক্ষা-লব্ধ শশা, শাঁক আলু প্রভৃতি ফলমূল আহার করিতে লাগিল। শশায় কামড় দিবার তৃপ্তিকর আঘ্রাণ পাইয়া ঐ বাবুটি বিচলিতচিত্তে ক্রোধভরে "মলো ব্যাটা পাগ্‌লা,আর জায়গা পেলেনা, সম্মুখে এসে খেতে বস্‌লো, দূর হ" বলিয়া উঠিলেন। ইহা শুনিয়া ফলাহারী ভিক্ষুক আর একটা শশায় কামড় মারিয়া কচ্‌ কচ্‌ চিবাইতে চিবাইতে সমীপবর্ত্তী প্রেম চন্দ্র প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তির দিকে ভ্রূক্ষেপ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিল,—"আমি পাগল,বাবুটী জপে মগ্ন,কি জপ কচ্চেন জান? কাল কুঠী হ'তে ফিরে যাবার বেলায় জোড়াসাঁকোর বাজারে এক জোড়া জুতা কিনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, দরে বনে নাই, আর দুই আনা বেশী দিয়া ঐ জোড়াটী আজ লয়ে যাবেন, এই জপ কচ্চেন।" এই বলিতে বলিতে ভিক্ষুক আপন ছিন্নবস্ত্র-খণ্ডস্থিত ফলমূলগুলি বাঁধিতে বাঁধিতে উঠিয়া চলিল। বাবুটী অকস্মাৎ বেগুণে রঙের গাত্র-বস্ত্র খানি আসনে ফেলিয়া ভিক্ষুর পাছে পাছে দৌড়িলেন এবং তাহার পায়ে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুক এক একবার তাহাকে পদাঘাত করিতে করিতে দৌড়িতে লাগিল। মনের কথা টানিয়া বলিয়াছে, বাবুটীর প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে, আর কি তিনি স্থির থাকিতে পারেন? প্রেমচন্দ্র কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ভিক্ষুকের পার্শ্বে পার্শ্বে বেগে চলিলেন।

এক সাধু তিনবার প্রেমচন্দ্রের বাসায় আসিয়াছিলেন ও এক এক রাত্রি মাত্র অবস্থান করিয়াছিলেন। দিবাভাগে তিনি আতপ চাউল, মুগ, তরকারী, ঘৃত সৈন্ধবাদি সমস্ত দ্রব্যে একত্রে গঙ্গাজল সহ এক হাঁড়ীতে দিয়া পাক করিতেন। সিদ্ধ অন্ন লইয়া চুলার অগ্নিতে তিনবার আহুতি প্রদান করিতেন এবং অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিতেন। এক দিবস চুলাতে হাঁড়ী বসাইয়া সাধু আর খানিক গঙ্গাজল চাহিলেন। ভৃত্য জালা হইতে যে জল আনিয়া দিল, তাহা অতি ঘোলা ও অপবিত্র দেখিয়া সাধু তাহা গ্রহণ করিলেন না। আর জল ছিল না, ভারী জল আনিতে গিয়াছিল, আসিয়া পৌঁছে নাই, ভৃত্য সঙ্কেত করায় সাধু পিতলের একটা বড় কলস লইয়া দ্রুতপদে নীচের তলায় নামিয়া গেলেন। নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে জল আনিতে গেলেন বলিয়া ভৃত্য মনে করিল। প্রেমচন্দ্র তখন অন্যগৃহে পূজা করিতেছিলেন। পূজাশেষে উঠিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী দীঘীর ঘাটে লোক পাঠাইলেন, সাধুকে তথায় পাওয়া গেল না। এদিকে চুলীর অন্নে জলাভাব হইল। প্রেমচন্দ্রও বাসার অপর সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে সাধু এক কলস গঙ্গাজল সহ অকস্মাৎ উপস্থিত হইলেন। চাঁপাতলা হইতে নিকটবর্ত্তী গঙ্গার ঘাট যাতায়াতে এক ক্রোশের অধিক সন্দেহ নাই। গাড়ীতে যাতায়াত করিলেও তত অল্প সময়ের মধ্যে গঙ্গার ঘাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব। অন্যে এ বিষয়ের রহস্য বুঝিতে পারিলেন না। প্রেমচন্দ্র ঈষৎ হাস্য বদনে নীরব রহিলেন এবং সাধুর প্রতি সমধিক ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কলসে যে গঙ্গাজলই আনীত

হইয়াছিল, পুষ্করিণীর জল ছিল না, তাহা সকলের পরীক্ষায় সাব্যস্ত হইয়াছিল।

পুরীতে অবস্থান সময়ে এক নিশা শেষে উঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অকস্মাৎ জাগরিত ও চকিত হইয়া উঠিলেন এবং মস্তক প্রদেশে প্রেম চন্দ্রকে দেখিবেন ভাবিয়া নিদ্রাজড়-লোচন-যুগল সতৃষ্ণভাবে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গৃহে আলোক সত্ত্বেও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার শিরোভাগে তক্তপোষের উপরে দক্ষিণ পদ তুলিয়া এবং কতকখানি ফালি কাপড় ধরিয়া প্রেমচন্দ্র শক্তভাবে পুল্‌টিস বাঁধিয়া দিবার নিমিত্ত কনিষ্ঠ সহোদরকে সঙ্কেত করিতেছেন। ঐ রাত্রিতে আর তাঁহার নিদ্রা হইল না। পরদিন তিনি কাশীতে এক পত্র লিখিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন—আপনার কটিদেশের অধোভাগে কোন স্থানে ক্ষত হইয়াছে কি না, ও তাহাতে পুল্‌টিস লাগান হইতেছে কি না? কল্য রাত্রিতে স্বপ্নানুভূত একটী বিষয়ের যাথার্থ্য জানিবার নিমিত্ত এই জিজ্ঞাসা। এ প্রশ্নের অন্য উদ্দেশ্য নহে জানিবেন। ইহার উত্তরে প্রেমচন্দ্র কনিষ্ঠ সহোদরকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—দেখিতেছি, তোমার স্বপ্নটী অতি অদ্ভুত। সত্যই আমার দক্ষিণ উরুর অধোভাগে একটী বড় ফোড়া হইয়াছে। বড়বধূ ভালরূপে পুল্‌টিস বাঁধিতে পারেন না। বিশেষতঃ কথিত রাত্রিতে পুল্‌টিস্‌টী মনোমত ভাবে বাঁধা না হওয়ায় তাহা টিপিয়া ধরিয়া তাকিয়ার উপরে হেলিয়া পড়ি এবং মাতৃবিয়োগের পরে বাম উরুতে এইরূপে যে এক ফোড়া হইয়াছিল, তাহাতে পুলটিস্ আদি বাঁধিয়া তুমি যথোচিত শুশ্রূষা করিয়াছিলে, এক্ষণে নিকটে থাকিলে বিশেষ যত্ন করিতে, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হই। ইহাই তোমার স্বপ্নদর্শনের কারণ জানিবে।

২। জ্ঞানদাস (জীবনী ও টীকা সমেত) শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

রমণী বাবু কৃতবিদ্য ধনবান্ যুবা পুরুষ। অনাদৃত বৈষ্ণব-কাব্য সঙ্কলনে তাঁহার অভিরুচি হইয়াছে। আনন্দের কথা। দুঃখের বিষয়, ইতিপূর্ব্বে আমরা তাঁহার চণ্ডীদাসের সুখ্যাতি করিতে পারি নাই। এবার তাঁহার জ্ঞানদাসেরও সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না।

পরের ধন আপন বলিয়া পরিচয় দিবার রোগ ভদ্রজনোচিত নহে। রমণী বাবুর এই রোগটী বড় বেশী। শক্ত রোগের তীব্র চিকিৎসার প্রয়োজন। গ্রন্থের প্রারম্ভেই রমণী বাবু বলিতেছেন "প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলী কতক কতক প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের জীবনী আদৌ প্রকাশিত হয় নাই।" সেই জন্য, বোধ হয়, বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া রমণী বাবু জ্ঞানদাসের জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন। বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত এবং বিমস্ ও গ্রিয়ার্সন সাহেব বৈষ্ণব কবিদিগের জীবনী যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং বৈষ্ণব কবিদিগের জীবনী আদৌ প্রকাশিত হয় নাই,একথা সত্য নহে। হইতে পারে, রমণী বাবুর বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভের পূর্ব্বে ঐ সকল মহাত্মাগণের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, রমণী বাবু তাহাদিগের সংবাদ পান নাই। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি কয়েকটী বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবির জীবন-চরিত প্রকাশিত করি। এবং আমার অনুরোধ-

ক্রমে ভক্তিনিধি হারাধন দত্ত আমার ভ্রমগুলি দেখাইবার জন্য কয়েকটী মহাত্মার জীবন-চরিত লিখিয়া আমার নিকট প্রেরণ করেন। ভক্তিনিধির ও আমার রচিত বৈষ্ণব-কবি-চরিত নব্যভারত ও বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমার প্রবন্ধগুলি কেবল নব্যভারতে ও ভক্তিনিধির প্রবন্ধগুলি নব্যভারত ও বিষ্ণুপ্রিয়া উভয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অতঃপর এই সকল প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলন করিয়া গত বৎসর আমার বন্ধু বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য একখানি সুপাঠ্য বৈষ্ণব-কবিচরিত প্রকাশিত করেন। সুতরাং জ্ঞানদাসের জীবন-চরিত রচনা সম্বন্ধে রমণী বাবুর মৌলিকতার ভাণ সম্পূর্ণ ঘৃণার্হ। কেহ ভাবিতে পারেন যে, হয় ত সে প্রবন্ধ বা পুস্তক রমণী বাবু দেখেন নাই। এ জন্য আমারা ভক্তিনিধির প্রবন্ধ ও রমণী বাবু রচিত-জ্ঞানদাস জীবনী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিতেছি যে, রমণী বাবু-কেবল ঐ সকল প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন, এমন নহে, তাহার ভাষা পর্য্যন্ত তুলিয়াছেন।

ভক্তিনিধি

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে ব্যক্ত আছে, পীতাম্বর আচার্য্য, শ্রীদাস দামোদর, শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর এই ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণিক গ্রন্থের ভিতর জ্ঞানদাসের জীবনী নাই।

রমণীবাবু

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থে জ্ঞানদাসের জীবনী পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে জ্ঞানদাসের নাম ব্যক্ত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

পীতাম্বর আচার্য্য, শ্রীদাস, দামোদর, শঙ্কর, মুকুন্দ জ্ঞানদাস, মনোহর।

প্রভেদের মধ্যে এই ভক্তিনিধি চরিতামৃতকে প্রামাণিক গ্রন্থ ও রমণী বাবু ভক্তিরত্নাকরকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়াছেন।

ভক্তিনিধি

আমাদের এখান হইতে ৪ ক্রোশ ব্যবধান বাঁকুড়া জেলায় অন্তর্গত কোতলপুর নামক একটী গণ্ডগ্রামে যে কয়েক ঘর গোস্বামী বাস করেন, তাঁহারা মঙ্গল ঠাকুরের বংশ।

রমণীবাবু

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কোতলপুর নামক যে একটী গণ্ডগ্রাম আছে, সেখানে কয়েক ঘর গোস্বামী বাস করেন, তাঁহারা মঙ্গল ঠাকুরের বংশ।

ভক্তিনিধি

বীরভূম জেলার অধীন ইন্দ্রাণী নামে যে দেশ আছে, যে দেশে মহাভারত-রচয়িতা ৺ কাশীরাম দাস বাস করিতেন, যে স্থানের পূর্ব্ব ৪ ক্রোশ ব্যবধান একচক্রা নগর,অর্থাৎ যে নগরে শ্রীশ্রীহারাই পণ্ডিতের গৃহে শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,সে নগরের পশ্চিম দুই ক্রোশ ব্যবধান কাঁদড়া নামে যে পল্লী আছে, সেই কাঁদড়া পল্লীমধ্যে বহুগোষ্ঠী সম্পন্ন ব্রাহ্মণকুলে মঙ্গল বংশে শ্রীজ্ঞান দাসের জন্ম হয়। জ্ঞানদাস শ্রীজাহ্নবা দেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দারপরিগ্রহ করেন নাই; তদীয় দায়াদগণ শ্রীশ্রীজাহ্নবা দেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ গোস্বামীপদে অভিষিক্ত হন। এ পর্য্যন্ত সেই স্থানে শ্রীজ্ঞানদাসের মঠ আছে। প্রতিবৎসর পৌষ পূর্ণিমায় তত্র স্থানে জ্ঞানদাসের দিবসিক উপলক্ষে মহোৎসব এবং তিনি মেলা হয়।

রমণী বাবু

জেলা বীরভূমের অন্তর্গত ইন্দ্রাণী নামে যে দেশ আছে, যে দেশে মহাভারত-রচয়িতা মহাত্মা কাশীরাম দাস বাস করিতেন, যে স্থানে ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে একচক্রা নগরে যে খানে শ্রীশ্রীহারাই পণ্ডিতের আলয়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,সেই নগরের পশ্চিমে বিপ্রকুলে মঙ্গলবংশে জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্ঞানদাস শ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জ্ঞাতিবর্গও শ্রীজাহ্নবাদেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া গোস্বামী পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কাঁদড়ায় জ্ঞানদাসের মঠ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রতিবৎসর পৌষপূর্ণিমায় সেখানে জ্ঞানদাসের দিবসিক উপলক্ষে মহোৎসব হয় এবং তিন দিন মেলা হয়।

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। ভক্তিনিধির প্রবন্ধ হইতে রমণী বাবু ঘটনা ও ভাষা উভয়ই চুরী করিয়া আপনার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

জ্ঞানদাসের জীবনীর এক অংশে রমণী বাবু লিখিয়াছেন "শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় পদসমুদ্র বাছিয়া অপ্রকাশিত পদ সকল আমাকে দয়া করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারই কৃপায় আজ জ্ঞানদাস ঠাকুরের পদ সকল প্রকাশিত হইল। ভক্তিনিধি মহাশয়ের ঋণ এ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না।" তাই বলিয়া বুঝি জীবনীর ঋণ অস্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত বোধ হইয়া থাকিবে।

সাধারণতঃ জ্ঞানদাসের যতগুলি পদ গাওয়া যায়,তাহা অপেক্ষা রমণী বাবুর গ্রন্থে ৯৬ টি পদ অধিক আছে। চণ্ডীদাসের সমালোচনার সময় আমরা একটী সূচীপত্রের অভাব উল্লেখ করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়,জ্ঞানদাসের পদাবলীর সঙ্কলনেও রমণী বাবু এ অভাবটী পূর্ণ করেন নাই। পাঠককে আপন আপন সূচীপত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। এই ৯৬টী নূতন পদের মধ্যে ১৩টী পদে জ্ঞানদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয় না। কোন্ যুক্তি বলে রমণী বাবু এগুলিকে জ্ঞানদাসের পদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। হইতে পারে, ষোড়শ গোপালের রূপবর্ণন বিষয়ক পদাবলী বৈষ্ণব সমাজে জ্ঞানদাসকৃত বলিয়া চিরদিন পরিচিত হইয়াছে। সঙ্কলনে সে কথার উল্লেখ করা আবশ্যক ছিল। এবং সে প্রবাদ কত দূর যুক্তি-সঙ্গত,তাহারও বিচার করা প্রার্থনীয়। কয়েকটী পদ গ্রন্থ বিশ্লেষে চণ্ডীদাস, অনন্ত দাস বা যদুনন্দনের ভণিতা যুক্ত দৃষ্ট হয়। কি যুক্তিবলে গ্রন্থকার সে গুলিকে জ্ঞানদাস কৃত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা তাহারও কোন আভাস পাই না।

রমণী বাবুর সঙ্কলনের আভাস পাইয়া আমি পত্রিকা বিশেষে জ্ঞানদাসের অপ্রচলিত কয়েকটী পদ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। রমণীবাবুর গ্রন্থে সংগৃহীত হয় নাই, এমন পদ আমার নিকট আছে। তাহার কয়েকটী এখানে প্রকাশিত করিলাম।

(১)

কসিত কনক রুচির গৌর, অখিল ভুবন মরম চৌর,
করভ শুণ্ড বাহুদণ্ড সঘন গীম চালনী ;
প্রচুর পুলক শোভিত অঙ্গ, নটন লিল অধিক রঙ্গ,
বদন শরদ পুণিম ইন্দু সরস হাস ভাসনী।
আজু বলী গৌরচন্দ্র, তরুণীলাখ নয়ন ফন্দ,
উরহি দোলত কুসুমদাম ভালে তিলক লাবণী ;
গমন মত্ত মাতঙ্গ ছান্দ, নিয়ত মদন হৃদয় ফান্দ,
সহজ ললিত মধুর ভাতি জগত লোক বন্দনী ;
তরুণ বয়স গৌর দেহ, অন্তরে উয়ল গোকুল লেহ,
ভাবে ভরল মরম রতন চৌদিগ সঘন চাহনী ;
ধন্য ধরণী ধন্য কাল, ধন্য ধন্য পঁহু দয়াল,
করণ কীর্ত্তন তারল জীব জ্ঞানদাস গুণ গাওনী।

(২)

কাচা কাঞ্চন তনু চন্দন ভালে,
আজানুলম্বিত উরে মালতীর মালে।
পুলকের শোভা কিবা নবনীপ ফুলে,
কুন্তলে কুসুম কত শত অলিকুলে।
ভুবনমোহন রূপ মনমথ লীলা,
চান্দের অধিক মুখ শশি ষোলকলা।
হেম করিকর জিনি ভুজ যুগ শোভা,
গমন মাতঙ্গ জিনি জগমন লোভা।
আবেশে অবশ অঙ্গ বোলে হরি হরি,
কি লাগি ঝরয়ে আঁখি বুঝিতে না পারি।
গদাধর আদি যত সহচর সঙ্গে,
নিজ নিজ ভাবে সবে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে।
যাহাতে ধরণী ধন্যবিশেষ নদিয়া,
জ্ঞানদাস বড় দুঃখী তাহা না দেখিয়া।

(৩)

ভুবন সুন্দর গৌর কলেবর আজানু ভুজ যুগ লোল,
অরুণ নয়ানে বয়ানে বাহিয়া পড়ই প্রেম হিল্লোল,

গোরা রূপ হেরি জগমন কান্দে,
চান্দ জিনি মুখ অধিক ঝলমলি
কুমুদ পড়ি গেল ধান্দে।
ভাবে গর গর গৌর গভীর জগত বৈচিত্র চলে,
সজল নয়ানে চৌদিক হেরিয়া রহে গদাধর কোলে।
হাস গদ গদ বচন অমৃত সিঞ্চিত জীব জন্তু লত'
জ্ঞানদাস কহ গড়ল না ওরূপ সে পুন কেমন ধাতা।

(২)

কিরূপ দেখিনু সই কদম্বের তলে,
ঘর যাইতে না লয় মন পরাণ কেমন করে।
নয়ানে লাগল রূপ কি আর বলিব,
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব।
নিবারিতে নারি চিত ঝরে রাতি দিনে,
আকুল করিল মোরে কালার বরণে।
কালিয়া বরণ কিবে অমিয়ার সার,
জ্ঞান কহে না জানিয়ে যে পিয়ে একবার।

(৩)

চলিতে না চলে পা, কিবা সে হেলনি গো,
রাজ পথে নিতায়ের নাট।
সঙ্গের যতেক সঙ্গী, তা বড় তা বড় রঙ্গী,
অতি অপরূপ রসের হাট।
এ দেশে এমন না ছিল এতদিন, নিতাই চাঁদের হেন লীলা,
দিনে দিনে লোকের চিত, আঁখি উলসিত
কাল কলি রসে ভুলি গেলা।
শুনিয়া ভাই এর কথা, পুরুবে বারুণী পিতা,
সে সব আভাসে হাস মুখে;
না করে কাহারে ভিণ, এই যে প্রেমের চিন,
দিগ বিদিগ নাহি মুখে।
রাত্র দিনে আন নাই, কহিতে লোকের ঠাঁই,
আবেশে অবশ হৈয়া পড়ে;
জ্ঞানদাস এই কয়, জগভরি জয় জয়,
ভব ভয় সব গেলা দূরে।

টীকা ও পাঠান্তর সম্বন্ধে চণ্ডীদাসের সমালোচনার সময় আমি যাহা বলিয়াছিলাম, রমণী বাবুর জ্ঞানদাসের সমালোচনা করিতে তাহা অপেক্ষা নূতন কিছু বলিবার নাই। রমণী বাবু যেরূপ যত্নে পদাবলি সংগ্রহ করিয়াছেন, প্রকৃত পাঠ নিরূপণে বা অর্থ নির্দ্দেশে তাহার একাংশ ব্যয় করেন নাই।

অমৃতবাজার পত্রিকা যখন বাঙ্গলা ভাষায় লিখা হইত, তখন একজন শিক্ষকের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় পাঠ্য পুস্তকে "বৃষ" পাইলে তাহার অর্থ "ষাঁড়" জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেন এবং কেহ সে অর্থ লিখিয়া না লইলে তাহার দণ্ড দিতেন। কিন্তু মেঘনাদ পড়িতে পড়িতে ছাত্রগণ "নিক্ষোষিলা" শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে পণ্ডিত মহাশয় গল্প করিতে বসিতেন এবং পীড়াপীড়ি করিলে, ছাত্রগণ এমন সহজ কথার অর্থ জানেনা বলিয়া তাহাদিগকে তাড়না করিতেন। রমণী বাবুর টীকা সেইরূপ।

জারল অর্থ জর্জ্জরিত করিল, আনলে অর্থ অনলে ইত্যাদি অনেক টীকা আছে। কিন্তু এমন চরণ গুলির কোন টীকা দেখা যায় না।

"বরণ কাঞ্চন এদশ বাণ"
"জড়িত হৃদয়ে করত ভেদ"
"আচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে"
"চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদে ধান্দা"
"তার মাঝে হিয়ার পুতলি রহিল বান্ধা"
"আরতি রহল কহব পুন বেরি"
"বিহি উদগীম চাহি দিল ভঙ্গ"
"হেরইতে হরখে হরল যুগচারি"
"চান্দ চন্দন মলয়জ বাতে"
"অতি রসে বাদর নহে পর ভাতে"

পরথাব অর্থ কি প্রভাব না প্রস্তাব?

"আন দিনে শ্রবণে না দেই পরথাব"
"সজনি দূরে কর ও পরথাব"

পরথাব হইতেই "পরথাপলু" শব্দের উৎপত্তি

তোহারি মধুর গুণ কত পরথাপলু
সবহু আন করি মানে

পরথাপলু অর্থে প্রতিষ্ঠা করিলাম লিখা হইয়াছে।

"এ রস লালস সব সন্তাপনা
এ নাকি নহিলে জী"

সন্তাপনা শব্দে অর্থ কি "অনুগ্রহ?"

পরসাদে অর্থ প্রসন্ন লিখা হইয়াছে। নিছনি শব্দের অর্থ লইয়া ইতিপূর্ব্বে সাধ-

নায় কিছু তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। অর্থ স্থির হয় নাই। এ জন্য বোধ হয় রমণী বাবু এ শব্দটীর অর্থ নিরূপণে প্রয়াস করেন নাই।

আরতি ও শমতি শব্দের অর্থ কি?

রমণী বাবু লিখিয়াছেন, শমতি অর্থ শমতা এবং আরতি অর্থ আসক্তি।

জ্ঞানদাসের পদাবলী মধ্যে যে যে স্থানে এ দুইটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"শমতি না দেই দিন রজনী রোয়"
"ডাকিলে না শমতি দেয় আঁখি মেলি কান্দে"
"সজল নয়নে ধনী বন্ধু মুখ হেরি
আরতি রহল কহব পুন বেরি"
"পিরীতি আরতি দেখি হেন মনে লয় সখি
আমি তাহে চাহিলে সে জীয়ে।"
"গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক
বয়ানে রহু আরতি অনেক"
"প্রেম পরশ রস আরতি অমূল"
"মঙ্গল আরতি সখি করয়ে সেবন"
"রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাড়াই"
"আরতি গুরুয়া পিরীতি নহ থোর"
"আরতি অধিক নাহি কিছু লাভ"
"রাধা রসবতী অতিরসে আরতি"
"রাধা রাতি দিবস রস আরতি"
"রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।"
"ঘর নাহি ঘোর যেন জাগিয়ে স্বপন হেন
আরতি কহনে না যায়।"
"একে কুলবতী চিতের আরতি"
"একে দেখি অতি চিতের আরতি"
"সে সব পিরীতি আদর আরতি"
"পহিল বয়স একে আরে নব আরতি"
"পতির আরতি যেন জ্বলন্ত আগুণি"
"পরশে প্রেম পূরয়ে নাহি আরতি"
"বন্ধুর আরতি হিয়ার মালা"
"হিয়ার আরতি কহিতে নাহি দেশ"
"একে নব পিরীতি আরতি অতি দুরগম"
"পহি লহি কি কহব আরতি রাশী"
"বন্ধু এত বচনে তুয়া নাহি আরতি।"

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

বিদেশী বাঙ্গালী। [৩]

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। *

রাজনীতি-শাস্ত্র-বিশারদ সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক মেকিয়াভেলি বলেন ;—

"গুণবান বা ধনবানের পুত্রের পক্ষে গুণোপার্জ্জন বা ধনোপার্জ্জন করা কঠিন কথা নহে, কেননা, তাহা স্বাভাবিক ; কিন্তু গুণহীন বা ধনহীনের সন্তান যদি অতুলনীয় গুণের আধার বা মহাবিভবের অধিপতি অথবা কোনও কীর্ত্তি কলাপের কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে ইহা বড়ই গুণপনা ও প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবে। বহুযত্নে পালিত, সুচারু রূপে রক্ষিত, উর্ব্বর ক্ষেত্রে উৎপন্ন এবং যথানিয়মে বর্দ্ধিত মহীরুহের সুন্দর সুপক্ক এবং সুস্বাদু ফল হওয়া স্বাভাবিক ; কিন্তু অনুর্ব্বর ভূমিতে অযত্নে পতিত, শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড হইতে হঠাৎ যদি কেহ মনোহর তরু উৎপাদন করিয়া তাহাতে অনুপম ফল ফলাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি জগতে ধন্য এবং স্বনামধন্য পুরুষ মধ্যে গণ্য। বাস্তবিক যে দেশে দরিদ্র সমাজ হইতে নিঃসম্বল লোকেরা নিজের সাহসে ও ক্ষমতায় দেশহিতকর বা সমাজহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, সে দেশের উন্নতি অচিরকালেই সংঘটিত হইয়া থাকে এবং সে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা হীনতর হইলেও ভবিষ্যৎ ভরসা বড়ই প্রবল হইয়া উঠে।"

পণ্ডিতপ্রবর মেকিয়াভেলির এই অভিমত যদি যুক্তি-সঙ্গত ও বহুদর্শন-সিদ্ধ হয়,

* এই প্রবন্ধের কিয়দংশ মাত্র অতি সংক্ষেপে চৈত্র মাসের "সঞ্জীবনীতে প্রকাশ করিয়াছিলাম। নব্যভারতে ইহা বিস্তৃত রূপে ও পূর্ণাবয়বে প্রকাশিত হইল। (লেখক)

তাহা হইলে নানা কারণে আমাদের মাতৃভূমিকে—বঙ্গদেশকে—ধন্য বলিতে হইবে। নিঃসম্বলাবস্থা হইতে অল্পে অল্পে প্রোথিত হইয়া বঙ্গভূমির অনেক গুণবান সন্তান ভারতহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। যে সকল মহাত্মার নাম এই শ্রেণীভুক্ত, কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহাদের অন্যতম। সংসারত্যাগী হইয়া তিনি নিঃসম্বলাবস্থাতেও যে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিপুঞ্জ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য। মহতের জীবনী আলোচনার ফলও মহৎ হয় এবং মহত্বের বীজ মানবের হৃদয়-ক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইয়া যায়। কবিকুলরবি লংফেলো সত্য সত্যই বলিয়াছেন ;—

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime;
And, departing, leave behind us
Footprints on the sands of time;—
Footprints, that perhaps another,
Sailing o'er life's solemn main,
A forlorn and shipwrecked brother,
Seeing, shall take heart again.
Let us, then, be up and doing,
With a heart for any fate;
Still achieving, still pursuing,
Learn to labour and to wait."
(Longfellow)

কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রাচীন বঙ্গে যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, নবীন বঙ্গে তাহাদের স্থানাধিকার করিতে একটিকেও দেখিতেছি না। প্রাচীন বঙ্গ হইতে যে উন্নতির বীজ লইয়া গিয়া দূর দেশে বাঙ্গালী-মহাত্মারা কীর্ত্তিমহীরুহ উৎপন্ন করিয়াছিলেন, সে বীজ এখন কোথায় গেল ? এখন চারিদিকেই নিরাশার ঝড় বহিতেছে, বোধ হয়, বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র আশা-কুটীর পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। সমাজের এরূপ অধঃপতন, জাতির অধঃপতনের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়। গুণবান বাঙ্গালীর মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত নহি, কেননা মৃত্যু মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। "যাহার জন্ম, তাহার মৃত্যু" এ কথা নিশ্চয়, কিন্তু যে সকল বাঙ্গালীকুল-ধুরন্ধর ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের স্থানে তাঁহাদের তুল্য আর কাহাকেও দেখিতেছি না, ইহাই দুঃখের কথা।

কৃষ্ণানন্দ স্বামী অতি অল্পদিন হইল দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে তাঁহার অতীব বৃদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছি। তাঁহার গলিত দেহে, পলিত কেশে, জীর্ণমাংসে, দৃষ্টিশূন্যচক্ষে এবং ভগ্নকণ্ঠে যে তেজ, যে সাহস, যে উত্তেজনা, যে স্বজাতিবৎসলতা দেখিয়াছি, তাহা, ত্রিংশবর্ষ বয়স্ক কোনও বাঙ্গালী যুবকে দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ। কৃষ্ণানন্দ মরিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার যশ ও কীর্ত্তি এখনও তাঁহাকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। এই ব্রহ্মব্রতপরায়ণ মহাজন স্বর্গবাসী হইয়াছেন, কিন্তু ভূতলে তাঁহার যশঃরাশি "স্বর্গবাসী দূত"-দিগের অপেক্ষাও অধিকতর গৌরবান্বিত অবস্থায় এখনও বর্ত্তমান। সুগন্ধ গোলাপ শুকাইলেও কি তাহার সুগন্ধি যায় ?

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী জাতিতে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ এবং নৈকষ্য কুলীন। বোধ হয় "মুখোপাধ্যায়" তাঁহার উপাধি ছিল, তিনি "ফুলের (ফুলিয়া) মুখুটী" ছিলেন। দার পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বেই অতি তরুণ বয়সে তিনি বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করেন। তিনি ব্রহ্মচারী হইয়া কাশ্মীর, নেপাল, মহীসুর, ত্রিবাঙ্কুর, হয়দ্রাবাদ, বরোদা, রাজপুতানা প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেশীয় রাজ্য এবং সমগ্র বৃটিশাধিকৃত ভারত পর্য্যটন করেন। তদ্ভিন্ন সিংহল, বালাদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার দেশত্যাগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ঐকথা ঠিক যে, তিনি বিবাহ

করেন নাই, চিরকুমার ছিলেন। "কৃষ্ণানন্দ" তাঁহার পিতৃদত্ত নাম নহে, ইহা তাঁহার গুরুদত্ত নাম। ভারতের অনেক প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী বা পরমহংসের আদি নাম পাওয়া যায় না, ইঁহারা দীক্ষার পর গুরুদত্ত নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। নির্ভয়ানন্দ, জ্ঞানানন্দ, ত্রিগুণাতীত, বিবেকানন্দ, রামদাস, পুরাণপুরী, গিরিরাজ স্বামী প্রভৃতি নামে ইঁহারা কথিত হয়েন। শাস্ত্রের অনুজ্ঞা এই যে, সংসার ত্যাগ করিলেই সংসারের নিয়ম পরিত্যাগ করিতে হইবে, সাংসারিক উপবীত, সাংসারিক গায়ত্রী পর্য্যন্ত রাখিতে আদেশ নাই। যাঁহারা "স্বামী" বলিয়া পরিচয় দেন, অথচ সাংসারিক নামটী ব্যবহার করেন, তাঁহাদের প্রকৃত দীক্ষা হয় নাই, ইহাই সাধারণ মত। যাঁহারা দীক্ষার সময় নিজের নাম পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয়েন না, গুরু তাঁহাদিগকে দীক্ষা দেন না; বলেন "তোমার এখনও সাংসারিক স্বার্থ যায় নাই, সংসারের দিকে এখনও তোমার আকর্ষণ আছে, অতএব তুমি দীক্ষার অনুপযুক্ত।" দুঃখের বিষয়, আজি কালি কলিকাতা, নবদ্বীপ ও কাশীর অনেক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ ধর্ম্মপ্রচারক "স্বামী" "ব্রহ্মচারী" এবং "উদাসী" বলিয়া পরিচয় দেন, অথচ হিন্দুশাস্ত্রের অনুজ্ঞা রক্ষা করেন না। নিজের নামটা ব্যবহার করিয়া যশস্বী হইবেন, ইহাই তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। "হিন্দু" বলিলে হিন্দুশাস্ত্রটাকেও মানা চাই, যাঁহারা তাহা না করেন, তাঁহাদের হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের অধিকার আছে কিনা, অথবা "স্বামী" বলিবার অধিকার জন্মিয়াছে কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। "স্বামী" শব্দে পরমহংস বুঝায়; যাঁহাদের ষড়রিপু দমিত হইয়াছে, যাঁহারা স্বুবর্ণ ও মৃত্তিকাকে সমজ্ঞান করেন, যাঁহাদের নিঃস্বার্থ ব্রহ্মজ্ঞানই চরম ও একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহারাই পরমহংস। গীতায় লিখিত আছে।

"নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা
বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখ সংজ্ঞে র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥" (১৫ অধ্যায়। ৫ শ্লোক।)

পরমহংসের এই লক্ষণ। এখন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পরমহংস!! পাঠক মহাশয় বলুন দেখি, এই ভণ্ডদিগের কয়জন প্রকৃত পরমহংস বা স্বামী। এই জন্যই কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী বলিতেন "আজকাল পেটে যাহার অন্ন নাই, অথবা পেশাদারী (ব্যবসা) করা যাহার উদ্দেশ্য, সেই ব্যক্তিই পরমহংস ব্রত ধারণ করে।" বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় এই যে, কলিকাতার বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রের দুই একটী পেশাদার সম্পাদক, অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশে, "পরমহংস" ভাড়া করিয়া আনে এবং একটা অর্থশূন্য ধর্ম্মান্দোলন করাইয়া পুস্তক ও সম্বাদপত্র বিক্রয়ের উপায় করিয়া লয়।

মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী নিজে আপনার পরিচয় কাহাকেও দেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি হাবড়া জেলার অধিবাসী ছিলেন। ইংরাজী ১৮৭০ অব্দে তিনি কাশীধামের এক বন্ধুকে পত্র লেখেন, সেই পত্রের পরিশিষ্ট ভাগ পাঠ করিলে, তাঁহাকে হাবড়া জেলা নিবাসী বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায়। পত্রের পরিশিষ্ট ভাগ এইরূপ—

"উত্তরা খণ্ডে অর্থাৎ বদ্রীনারায়ণ ধামে আমার থাকিবার কথা সম্বন্ধে তুমি যাহা লিখিয়াছ, তাহা এখন যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমার জীবনের প্রথম অবস্থায় আমি তথায় থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু নানা কারণে সে ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যে সকল কারণে তখন এই ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছিলাম, এখনও সেই সকল কারণে ইচ্ছা ত্যাগ

করিতেছি। আমার জন্মস্থান হাবড়া জেলার এখন আমার যাইবার ইচ্ছা নাই। তথায় কে মরিয়াছে,কে জীবিত আছে, সে কথার এত বৎসর পরে প্রসঙ্গ করা তোমার পক্ষে ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচনা করি।"

কৃষ্ণানন্দ ইংরাজী জানিতেন না,বাঙ্গালা ভাষায় বেশ দক্ষ ছিলেন, হিন্দি ও উর্দ্দু এবং কিঞ্চিৎ সংস্কৃতও শিক্ষা করিয়াছিলেন। নিয়তঃ ভ্রমণ করিতেন বলিয়া তাঁহার লেখা পড়া শিখিবার ভাল অবসর মিলে নাই, কিন্তু সতত বাঙ্গালা গ্রন্থাদি ও সমাচার পত্র পাঠ করিয়া বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তরুণ বয়সে ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় তিনি অনেক দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং নানা দেশের আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া প্রভুতরূপে বহুদর্শী হইয়া উঠেন। মানবচরিত্র অতি সহজেই তিনি বুঝিতে পারিতেন। ইতিহাস ও ভূগোলে তাঁহার বিশেষ পারদর্শীতা ছিল। সময়ে সময়ে নিভৃত গিরিগুহায়, নদতটে, কুঞ্জের মধ্যে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। কামরূপ, নেপাল, জ্বালামুখী, হিংলাজ প্রভৃতি স্থানে অনেক দিন তিনি ব্রহ্মোপাসন করিয়াছিলেন। আরাবল্লী গিরির শিখরস্থ তাঁহার এক কুটীর অল্প দিন হইল প্রবল বায়ুতে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, এই স্থানে তিনি এক বৎসর কাল তপঃ সাধন করিয়াছিলেন। বারাণসী ধামে, গঙ্গাতটে, তাঁহার এক কুটীর এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, বিদেশে ভ্রমণ করিতে হইলে বিদেশের ভাষা শিক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যক। আরও দেখিলেন যে, বিদেশে বাঙ্গালীদিগের থাকিবার জন্য কোনও আশ্রয় স্থান নাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া, তীর্থ স্থান সমূহ পর্য্যটন করিয়া আসিয়া, আমি আমার জীবন স্বজাতির উন্নতি ও শুভকল্পে ব্যয় করিব।" এই ভাবিয়া তিনি ভ্রমণ সমাপ্ত করিবার অব্যবহিত কাল পরে এলাহাবাদে উপনীত হইলেন। স্থির করিলেন যে, "প্রথমতঃ আমাকে তিনটী প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে হইবে। অন্য শুভ কার্য্য করিতে পারি আর না পারি, অন্ততঃ এই তিনটী শুভকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া মরিতে পারিলে আমি আমার জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিব।" প্রথম কার্য্য, সংস্কৃত চর্চ্চায় উৎসাহ; দ্বিতীয় কার্য্য, বাঙ্গালীদিগের থাকিবার জন্য সাধারণ গৃহ-নির্ম্মাণ; তৃতীয় কার্য্য, বাঙ্গালী জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি। তিনি ভাবিলেন, গৃহ নির্ম্মাণ হইলেই তাহাতে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইবে এবং পরিব্রাজকদিগের আশ্রয়ের স্থানও হইবে। তৎসঙ্গে সঙ্গে যে সকল উপায়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে, তাহারও উপায় বিধান করা যাইবে। এই ভাবিয়া প্রথমেই গৃহ নির্ম্মাণের উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কি প্রকারের গৃহ নির্ম্মিত হইলে কামনা সিদ্ধ হইতে পারে, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে স্থির করিলেন যে,যদি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে অন্ততঃ একটী করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ মন্দিরে শাস্ত্রাদিরক্ষা,শাস্ত্রাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতে পারিবে; পরিব্রাজক বাঙ্গালীদিগের জন্য স্থানও হইবে এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার বন্দোবস্তও হইতে পারিবে। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মচারী মহাশয় "শাক্ত"অর্থাৎ দেবী উপাসক ছিলেন,সুতরাং কালীবাড়ী নির্ম্মাণ করাই স্থির করিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত কালীমন্দির সমূহ বিদেশে এখনও বাঙ্গালীর কালীবাড়ী বলিয়া বিখ্যাত।

নিঃসম্বলাবস্থায়, কপর্দ্দকশূন্য হস্তে, ব্রহ্মচারী মহাশয় প্রায় লক্ষাধিক টাকার কর্ম্ম হস্তে গ্রহণ করিলেন; মূর্খেরা বলিয়া উঠিল, "বামন হইয়া চাঁদকে ধরিতে যাইতেছে"। কিন্তু তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া,বিদেশী বঙ্গসমাজকে সচেতন করিয়া, বহু রাজা ও ধনবানের নিকটে গিয়া ভিক্ষা করিয়া,ঘোরতর আন্দোলন করিতে করিতে, খালিপায়ে, রুক্ষকেশে, পিপাসিত কণ্ঠে ও ক্ষুধিত দেহে, সফলতার বিঘ্ন সকল দেখিতে পাইলেন। বলিলেন "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।" যে কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে করিতে কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী এই মহৎ কর্ম্মে সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবে বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহার এক সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী বান্ধব তাঁহাকে এই সময় লিখিয়াছিলেন।

"আপনি চাতকের স্থায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, চক্রবাকের স্থায় ক্ষিপ্রহস্ত এবং পিপিলীকার স্থায় পরিশ্রমী। আপনার মত বারজন উৎসাহী লোক পাইলে আমি অলৌকিক কর্ম্ম সাধন করিতে পারি। আপনাতে বোধ হয় অমানুষিক তেজ আছে; এই তেজ আপনার শ্রেণীর লোকের পক্ষেই সম্ভব। বাঙ্গালীতে যাহা কিছু সম্ভব,হিন্দুস্থানীতে তাহা সম্ভব নয়; হিন্দুস্থানী কথনও বাঙ্গালীর গুণপনা অধিকার করিতে পারিবে না। বাঙ্গালী ভিন্ন এত মহৎ গুণ একাধারে আর কোথাও দেখি নাই।"

সেই নিঃসম্বল উদাসীন ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিঃস্বার্থ স্বজাতি-বৎসলতার ফলে,পশ্চিমোত্তর প্রদেশে, মধ্য-ভারতে এবং পঞ্জাবে এখনও তাঁহার নামকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত মন্দির গুলির অবস্থা এখনও সুন্দর এবং অতিসুন্দর ভাবে অনেক মন্দিরের কার্য্য এখনও চলিয়া আসিতেছে। নিম্নলিখিত নগরে তাঁহার কালীবাড়ী এখনও বর্ত্তমান। রাজপুতানায়—নশিরাবাদ, নিমচ, বরেরা এবং ভরোই। মধ্যভারতে—মোরার (গোয়ালিয়র) এবং উজ্জয়িনী। পঞ্জাবে—সিমলা, পেশোয়ার, লাহোর, জলন্দর, মৈণমীর, অম্বালা, রাউলপিণ্ডি, থানেশ্বর,কর্ণাল,মুলতান,দিল্লী,বুক্সা, নশীখাঁ এবং পূর্ণাপুর। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে—ফতেবাদ, মিরট, আগ্রা, আলাহাবাদ, বেনারস,জালগ্রাম এবং চিত্রকোট।* অযোধ্যায়—শ্রীপুর ও গুরগ্রাম। পার্ব্বত্য প্রদেশে—কাল্কা এবং ময়না। বেলুচিস্থানে—কোয়েটা। ব্রহ্মচারি মহাশয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "যদি জীবিত থাকি,তাহা হইলে অন্ততঃ একশতটি প্রধান প্রধান নগরে মন্দির স্থাপিত করিয়া যাইব। এই সকল মন্দিরে ভ্রমণকারী বাঙ্গালী থাকিতে পারিবে এবং দরিদ্র হইলে কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহাদের আহারেরও বন্দোবস্ত করা যাইবে। কিন্তু ৩২টি মন্দির সমাপ্ত না হইতে হইতেই জ্বর ও উদরাময় রোগে এলাহাবাদের কালীবাড়ীতে ইং ১৮৮২অব্দে,৯২বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার স্থাপিত মন্দির সমূহ "বাঙ্গালীর কালীবাড়ী" বলিয়া দেশ বিদেশে প্রসিদ্ধ। সরকারী ডাকখানায়,আদালতে, রেলওয়ে ষ্টেশনে,বাজারে, "বাঙ্গালীর কালীবাড়ী" এক পরিচিত স্থান। কোনও সময়ে বাঙ্গালী কালীবাড়ীর নামে সহরের লোক কাঁপিত, ব্রহ্মচারীর প্রতাপে "বাঘে ছাগে এক ঘাটে জল খাইত।"

সুবিখ্যাত উকীল (হাইকোর্টের) বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় এক সময়ে হিন্দু পেট্রিয়টে লিখিয়াছিলেন।

---

* ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অণুকরণে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়,এটোয়া নগরীতে একটী কালীবাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

"পূজ্যপাদ কৃষ্ণানন্দ স্বামী মহাশয়ের দুই একটা মন্দির আমি দেখিয়াছি। বিদেশে এই রূপ স্থান না থাকিলে, তীর্থযাত্রী বা ভ্রমণকারী বাঙ্গালীর যে কি কষ্ট হইত, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। এই সকল মন্দিরে শত শত কাঙ্গালী বাঙ্গালী বিদেশে আহার পাইতেছে এবং নানা রোগ ও বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে। কৃষ্ণানন্দ মহাত্মা আমাদের সকলেরই নমস্য।"

অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল, অম্বালা ও সিমলা শৈলের কালীবাড়ী দেখিয়া বলিয়াছিলেন।

"এরূপ মহাত্মার নাম স্মরণ করিলেও পাপক্ষয় হয়, এমন পুণ্যাত্মা বাঙ্গালী কুলে অতি কম।"

ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম গণ্য মান্য নেতা ভারত-বিখ্যাত বাবু নবীন চন্দ্র রায় মহাশয় অতি তরুণ বয়সে দীন হীন অবস্থায় পঞ্জাবে উত্তীর্ণ হয়েন। ইনি শেষে পঞ্জাবের দেশীয় সমাজের সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠেন এবং একজন দিগ্গজ পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন। সাধু নবীন বাবু স্বশক্তি বলে পঞ্জাবের অনরেরি মাজিষ্ট্রেট, জষ্টিস্ অব দি পিশ্, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, পরীক্ষক এবং ডেপুটী রেজিষ্ট্রার, লাহোর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং ডেপুটী একাউন্টাণ্ট জেনেরল পদে বরিত হইয়াছিলেন। অল্প দিন হইল নবীন বাবুর মৃত্যু হইয়াছে; তিনি তাঁহার স্বহস্তে লিখিত এক বাঙ্গালা রোজনামচায় লিখিয়াছেন,—

"চাকুরীর জন্য আমাকে অনেক স্থানে অনাথের ন্যায় ভ্রমণ করিতে হইয়াছে,আমি জীবনের অধিকাংশ কাল অতি দীন হীনের ন্যায় কাটাইয়াছি; একটি পয়সার অভাবে সমস্ত দিন অনাহারে গিয়াছে, এমন দিনও দেখিয়াছি। ভ্রমণের সময়ে যেখানে যেখানে মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ স্বামীর কালীবাড়ী পাইয়াছিলাম, সেইখানেই পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছি ও মনের সুখে নিদ্রা গিয়াছি। অনেক কষ্টে লাহোরে পৌছিলাম এবং প্রোক্ত মহাত্মার কালীবাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। স্বামী মহোদয়ের কালীবাড়ী না থাকিলে লাহোরে আমার থাকা হইত না; আমি এখন উচ্চপদস্থ ও সম্মানিত পুরুষ; ইহা কেবল সেই মহাত্মার চরণকৃপায়। তাঁহারই প্রাসাদে প্রসাদ পাইয়া আমি মানুষের মত হইতে পারিয়াছি, জীবনেও সেই পুণ্যবান মহাত্মার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। আমার ন্যায় কত শত হতভাগা, কৃষ্ণানন্দের কালীবাড়ীর কৃপায়, শ্রীমন্ত পুরুষ হইয়া উঠিয়াছে। ইচ্ছা হয়, এক বার সেই মহাত্মাকে জীবিত দেখিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া পূজা করি।"

লাহোরস্থ আমার এক ব্রাহ্মণ বন্ধু সার্দ্ধ দুই শত টাকা বেতনের চাকুরী করিতেন, সম্প্রতি পেন্সন লইয়াছেন। ইনি স্বামী কৃষ্ণানন্দ সম্বন্ধে আমাকে লিখিয়াছেন।

"মহাত্মা কৃষ্ণানন্দের নাম স্মরণ হইলেই আমার সমগ্র শরীর প্রেমে পুলকিত হয় এবং ভক্তিভরে তাঁহার চরণোদ্দেশে শিরনত হইয়া যায়। ইনি মনুষ্য ছিলেন, কি নরাকারে দেবতা ছিলেন, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই। আমরা ইঁহারই চরণে পেটের অন্ন সংস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছি, দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত ইঁহার অন্ন ও জলে দেহ রক্ষা করিয়াছি, সঙ্গে একটি পয়সা মাত্র ছিল না, ইঁহার কালীবাড়ী না থাকিলে আমাদের কি গতি হইত, তাহা বলিতে পারি না। ইহ জগতে কৃষ্ণানন্দ স্বামী ভিন্ন আর কোনও মনুষ্যকে অধিক ভক্তি বা মান্য করিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। ইঁহার কোন্ গ্রামে নিবাস ছিল, জানিনা, কিন্তু যে মহাপবিত্র গ্রামে ইঁহার নিবাস, সেই গ্রামের এক তোলা মৃত্তিকা, এক তোলা সোণা হইতেও আমার নিকট অধিকতর মূল্যবান। সেই অনুপম মহাত্মা মানবকুলের গৌরব; বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।"

কর্ণেল অল্কট্ সাহেব থিয়সফিষ্ট পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন,—

"নশিরাবাদ, অম্বালা, শিমলা ও রাওলপিণ্ডির কালীবাড়ী মহা ধূমধামে পরিচালিত হয়। দুই একটা কালী বাড়ী দেখিলে চক্ষু স্থির হইয়া যায়।"

একজন উদাসীন রিক্তহস্ত ব্রাহ্মণের

চেষ্টায় কতশত বাঙ্গালীর উপকার হইয়াছে, তাঁহাদের সুবিধার জন্য কেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও বিশাল উদ্যান এবং সুন্দর কূপ সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে, দেখিলে হর্ষে হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে। প্রতি কালী-বাড়ীতে পুরোহিত, পাঠক ও ভৃত্য থাকে। তাঁহাদের খরচ কালীবাড়ী হইতেই চলিয়া যায়। স্থানে ২ মন্দিরের কমিটি আছে। এই সকল মন্দির দেখিলে বাঙ্গালী জাতির মহত্ত্ব মনে পড়ে এবং কৃষ্ণানন্দের আত্মাকে দুই হাত তুলিয়া প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

নেপালের পুরাতত্ত্ব। (৯)

মহারাজ হরিসিংহদেবের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে মল্লবংশীয় মহারাজ প্রতাপ-মল্লের স্বরচিত বংশাবলীর উল্লেখ করা হই-য়াছে। ৭৭৮ নেপালী সংবতের (১৬৫৮ খ্রীঃ) মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে ও রবিবারে মহারাজ প্রতাপমল্ল মহাসমারোহের সহিত "তুলাপুরুষ"নামে দান ব্যাপার সম্পন্ন করেন। তিনি স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা ও প্রবালের সহিত মানযন্ত্রে তুলিত হন। তৎপর সেই সকল দ্রব্য ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থীদিগের মধ্যে বিত-রিত হয়। এই উপলক্ষে সুকবি রাজা প্রতাপ-মল্ল পূর্ব্বোক্ত বংশাবলী রচনা করেন।

"নেপালে সংবতেঽস্মিন্ হয়গিরি-মুনিভিঃ সংযুতে, মাঘমাসে,
সপ্তম্যাং শুক্লপক্ষে রবিদিনসহিতে রেবতী-ঋক্ষরাজে।
যোগে শ্রীসিদ্ধি-সংজ্ঞে রজতমণি-লসৎ স্বর্ণ-মুক্তাপ্রবালৈ-
রেকীকৃত্য প্রদত্তং হয়শতসহিতং যেন দানং তুলাখ্যং॥৩০।

এই বংশাবলীতে সূর্য্যবংশীয় হরিসিংহ দেব মহারাজের পূর্ব্বপুরুষ যক্ষমল্লের পিতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, যক্ষমল্ল হরিসিংহদেবের দৌহিত্র বংশে আবির্ভূত হন। প্রতাপমল্লের নামাঙ্কিত ৭৬৯ নেপালী সংবতের (১৬৪৯ খ্রীঃ) অপর একখানি শিলালিপিতে নান্যদেবের বংশধর কর্ণাটক-সূর্য্যবংশীয় হরসিংহদেব যক্ষমল্লের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে উক্ত উভয়বংশের সহিত মল্লবংশের ঘনিষ্ট বৈবাহিক সম্পর্ক সুস্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে। প্রাগুক্ত বংশাবলী হইতে রাজা-প্রতাপমল্লের পূর্ব্বতন যক্ষমল্ল, রত্নমল্ল, সূর্য্য-মল্ল, নরেন্দ্রমল্ল, মহীন্দ্রমল্ল, শিবসিংহ, হরিহর সিংহ ও লক্ষ্মীনরসিংহ মল্লের নাম জানা যাই-তেছে। কাটমাণ্ডুর অধিপতি লক্ষ্মীনৃসিংহ মল্লই মহারাজ প্রতাপমল্লের পিতা। প্রতাপ মল্ল সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। স্বরচিত বংশাবলীতে তিনি আপনাকে "শ্রীমহারাজা-ধিরাজ শ্রীশ্রীরাজরাজেন্দ্র-কবীন্দ্র-জয় প্রতাপ মল্ল দেব" নামে পরিচিত করিয়াছেন। এই শিলালিপির দশম ও একাদশতম শ্লোক ইতি-পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে মহারাজ প্রতাপমল্লের রচিত আরও কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে। ইহা হইতে "কবীন্দ্র" প্রতাপমল্লের রচনার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"শ্রীলক্ষ্মীনরসিংহ-ভূপতি-দিবপ্রস্থানকালোদ্যতে,
দেবৈঃ শঙ্খমৃদঙ্গভেরিপটহ-ধ্বানৈর্দিশঃ পূরিতাঃ।
প্রোঢ়াঃ শূরতরাঃ প্রদারিতরিপোর্ব্বাহুচণ্ডোল্লসন্
মার্গে্ণৈব বিনির্গতাঃ সুষমিতাঃ প্রাণা স্ত্রয়োঽস্যামলাঃ।২৫॥
তৎপুত্রোঽসৌ কবীন্দ্রঃ ক্ষিতিপতিতিলকঃ শ্রীপ্রতাপাভিধানঃ,
সংগ্রামে বৈরিবর্গপ্রবলতরল-সদ্দর্প-দাবানলাভঃ।
তর্কালঙ্কার-কোষাদিক-সকল মহাশাস্ত্রমার্গ প্রবীণো
নানা গদ্যানবদ্যা-সুললিতকবিতা-নর্ত্তকী-রঙ্গভূমিঃ॥২৬॥

শস্ত্রে শাস্ত্রবরে সদাসুখকরে সঙ্গীতবিদ্যাবরে,
সানন্দং কেলিকর্ম্মকুশলব্যাপার কণ্ঠীরবঃ।
স্বর্গে ভূমিতলে তথাদশদিশাং প্রান্তে গিরৌ কাননে,
কোপ্যস্তীতি নিগদ্যতে মম সমো রাজেন্দ্র-চূড়ামণিঃ॥২৯॥
মাধুর্য্যাদিবিচিত্রতাখিলপদন্যাসৈর্ম্মনোহারিণী,
সংক্ষিপ্তেন কবীন্দ্রভূমিপতিনা বংশাবলী নির্ম্মিতা।
প্রত্যেকং কিল কীর্ত্তিশৌর্য্যনিখিলপ্রৌঢ়প্রতাপাদিকং
ভূপালাং রচিতুং বিমৃশ্য নিপুণং শক্তো ন বা বাক্‌পতিঃ॥৩০

প্রতাপমল্ল মল্লবংশের সর্ব্বপ্রধান নরপতি ছিলেন। তাঁহার আধিপত্য নেপালের সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়। তিনি বর্ত্তমান গোরখারাজ বংশের আদিপুরুষ ডম্বর সাহকে সসৈন্যে যুদ্ধে পরাজিত করেন। পণ্ডিত ভগবান ইন্দ্রাজীর মতে ডম্বরসাহ ১৬৩৩ খ্রীঃ গোরখা জাতির আধিপত্য নেপালের প্রান্তভাগে বিস্তারিত করেন। সম্ভবত ১৬৪২ খ্রীঃ ডম্বর-সাহ মহারাজ প্রতাপমল্লের দ্বারা পরাজিত হন। প্রতাপমল্ল ভাটগাঁর রাজা নরেশমল্ল, (নরেন্দ্রমল্ল) হইতে কররূপে একটী হস্তী গ্রহণ করেন এবং ললিতপট্টনের রাজা সিদ্ধি নৃসিংহমল্লের অধিকৃত দুর্গাবলী বাহুবীর্য্যে গ্রহণ করেন। নরেশমল্ল ও সিদ্ধিনৃসিংহমল্ল উভয়েই প্রতাপমল্লের পিতৃব্য ছিলেন। তিব্বত ও ভোটান পর্য্যন্ত মহারাজ প্রতাপমল্লের অধিকার বিস্তারিত হয়। তিনি তিব্বতের অধিপতি এবাবদীকে রণে পরাজিত করিয়া, কৃতিথাসাকির নামক প্রদেশে স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা মহিষী রূপমতী কোঁচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী রাজমতী কর্ণাটরাজের দুহিতা ছিলেন।

মহারাজ প্রতাপমল্লের নামাঙ্কিত এক শিলালিপি হইতে প্রাগুক্ত বিবরণ সংগৃহীত হইল। ৭৬৯ নেপালী সংবতের (১৬৪৯ খ্রীঃ) ফাল্গুন মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে ও বৃহস্পতিবারে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়। পূর্ব্বোক্ত উভয় মহিষীর আবাসের জন্য এক অষ্টভুজ ত্রিতল প্রাসাদ সেই দিনে বিহিতবিধানে প্রতিষ্ঠিত হয়। কাটমাণ্ডুর বর্ত্তমান রাজ-প্রাসাদের অনতিদূরে এই প্রাসাদ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। উক্ত প্রাসাদ এক্ষণে বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত হইয়াছে। এই মন্দিরের দক্ষিণস্থ দ্বারের সমীপে উক্ত খোদিত প্রস্তর-লিপি বিদ্যমান থাকিয়া, অতীত ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্নের পরিচয় দিতেছে। মল্লবংশের পরিচয় সংক্ষেপে এই শিলালিপি হইতে জানা যাইতেছে। অতএব এই স্থলে সেই শিলা-লিপির শ্লোকগুলি স্থানে স্থানে সংশোধন পূর্ব্বক উদ্ধৃত হইল। ইহা নেওয়ারী অক্ষরে খোদিত রহিয়াছে।

"আসীৎ শ্রীসূর্য্যবংশে রঘুনৃপকুলজো রামচন্দ্রো নৃপেশঃ
তদ্বংশে নান্যদেবোঽবনিপতিরভবৎ,তৎসুতো গঙ্গদেবঃ।
তৎপুত্রোঽভূন্নৃসিংহো নরপতি-রক্তুন, স্তৎসুতো রাম-সিংহ,
স্তজ্জঃ শ্রীশক্তিসিংহো ধরণিপতিরতো ভূপ ভূপাল-সিংহ॥ ১॥
তস্মাৎ কর্ণাটচূড়ামণিরিব হরযুৎসিংহদেবোঽস্যবংশে
ভূপঃ শ্রীযক্ষমল্লো নরপতিরতুলো, রত্নমল্লোঽপ্যমুষ্মাৎ।
তস্মাৎ শ্রীসূর্য্যমল্লো হ্যবনিপতিরভূৎ, তত্তনুজোঽমরাখ্যো
মল্লোঽভূৎ, তস্য পুত্রো রিপুগণবিজয়ী শ্রীমহেন্দ্রাখ্য মল্লঃ॥ ২॥
তস্মাৎ শিবাসিংহোঽভূৎ, হরিহরসিংহ-সুত স্তস্মাৎ,
তস্মাৎ লক্ষ্মিন্‌সিংহো ভূপতি নরসিংহপরাক্রমঃ॥ ৩॥
তস্মাৎ শ্রীপ্রতাপো নরপতি-রভবৎ ভূপমালাবলীষু
স্যস্তৎ পাদারবিন্দদ্বয়-রসবিলসদ্‌ রেণুভি র্ভূষণানি।
যোঽকার্ষীৎকৃতিথাসাকিরমিতি স্ববশেভোট্টভূপস্তদেশাৎ
জগ্রাহৈবাবদীনং প্রতি দিনমপরং যংভজন্তে নরেশাঃ॥৪॥
ভক্তগ্রাম-নরেশমল্ল-ভূপতি র্দন্তেভমেনং ভিয়া
ভেজেঽসৌ বসুধাং জহারসুদৃঢ়ং সংধার্য্য দুর্গং পুনঃ।
শ্রীমদ্‌-ডম্বরসাহভূপতিবলং বিধ্বস্য হত্বা বলং
শ্রীমৎ-সিদ্ধিন্‌সিংহমল্লনৃপতে র্জগ্রাহ দুর্গাবলীং॥ ৫॥
আস্তে কাপ্যমরাবতীব বিলসদ্দন্তীন্দ্র-দিব্যাঙ্গনা-
যুক্তা স্বর্ণময়ী বিহারনগরী সা রাজধানী পরা।

শ্রীমৎ-শ্রীকমলাধিকা মধুপতে-স্বিন্দ্রেণতুল্যস্য চ,
প্রত্যর্থি-ব্রজনির্জ্জিতস্য নরযুন্নারায়ণ স্যাপি চ॥ ৬॥
লক্ষ্মীনারায়ণ স্তস্মাদ্, ধীরনারায়ণ স্তুতঃ।
পুত্রী রূপমতী তস্য, প্রাণনারায়ণঃ স্তুতঃ॥ ৭॥
সেয়ং রূপমতী সতী গুণবতী স্বর্ণদ্যুতিঃ সম্মতি
র্মাদ্যৎকুঞ্জরগামিনী প্রণয়িনী সাক্ষাৎ পরা রুক্মিণী।
আসীৎ সর্ব্বগুণা পিতুর্নরপতেঃ শ্রীমৎপ্রতাপস্য সা,
পত্নী প্রাণসমা যথা জলনিধেঃ পুত্রী জগৎপায়িনঃ॥ ৮॥
কর্ণাটী রঙ্গঘাটী কুচকনকঘটী কামলীলৈকবাটী,
স্বর্ণালঙ্কারকোটী হরিসদৃশকটী চারুদেহানুপাটী।
নাম্না রাজমতী মহারসবতী ভূপপ্রতাপস্য সা,
ভুক্তা ভোগাবধূটিকা কিল হরে র্ভীমেব জীবাধিকা॥৯॥
স্বর্গার্থঃ কৃতবান্ প্রতাপনৃপতিঃ সদ্‌যোষিতো—রেতয়োঃ
প্রাসাদং বসুপত্রপদ্মসদৃশং শৃঙ্গাষ্টকৈঃ শোভিতং।
নানাচিত্রবিরাজিতং সমমিদং সম্বেজয়ন্তেন বৈ,
হোমৈদ্যো-রকরোৎশ্রুতিস্মৃতিমতৈ রস্য প্রতিষ্ঠাবিধিম্॥১০
সংবৎ ৩৭৯, ফাল্গুনশুক্লষষ্ঠ্যাং তিথৌ, অনুরাধানক্ষত্রে,
হর্ষণযোগে, বৃহস্পতিবাসরে।'

মল্লবংশের পরিচয় ও সময় নিরূপণের জন্য এই শিলালিপি অতি অমূল্য পদার্থ। ইহাতে মহারাজ প্রতাপমল্লের সমসাময়িক রাজাদিগের নামমালা প্রদত্ত হইয়াছে। ডম্বরসাহ, ভোটের অধিপতি এবাবদী, ভাটগাঁর অধিপতি নরেন্দ্রমল্ল ও ললিতপট্টনের রাজা সিদ্ধিনৃসিংহমল্ল-প্রতাপমল্লের রাজত্বের আরম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। সিংহাসন আরোহণের কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রতাপমল্ল তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া,আপনার আধিপত্য বিস্তারিত করেন। প্রতাপমল্ল কোঁচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করেন। এই প্রাণনারায়ণের ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের নামও এই শাসনলিপি হইতে জানা যাইতেছে। ইহা হইতে কোঁচবিহারের নরপতিদিগের আদিপুরুষ মহারাজ নরনারায়ণের আবির্ভাব কাল ১৫৮০খ্রীঃ হইতে ১৬০০ খ্রীঃ বলিয়া নিরূপিত হইতেছে।

এই শাসনলিপি হইতে কর্ণাটকসূর্য্যবংশীয় নান্যদেব ও তাঁহার বংশধরদিগের নামমালা নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যাইতেছে। কেহ কেহ এই নেপালেশ্বর নান্যদেবকে বাঙ্গালার সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেনের সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই উক্তি একান্ত অমূলক বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন আমাদের মতে১০৩৬-৫৬খ্রীঃ পর্য্যন্ত বঙ্গ ও গৌড়দেশে রাজত্ব করেন। ১০৯৭খ্রীঃ নান্যদেব নেপালে সূর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময়ে বিজয়সেনের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ বল্লাল সেন রামপালের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। "ঢাকার পুরাতন-কাহিনী" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহা আমরা বিস্তারিতভাবে নব্যভারতের পাঠকবর্গকে প্রদর্শন করিয়াছি। ১৮৩৫খ্রীঃ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় সুপণ্ডিত হগ্‌সন সাহেব সিমরাউনগড়ের যে বিবরণ প্রকাশ করেন,তাহাতে তিনি নান্যদেব দ্বারা ১০৯৭ খ্রীঃ সিমরাউনগড় প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া সর্ব্ব প্রথমে নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার মতে নান্যদেবের পর তাঁহার বংশধর গঙ্গদেব, নরসিংহদেব, রামসিংহদেব, শক্তি সিংহদেব ও হরসিংহদেব সিমরাউনগড় হইতে মিথিলায় শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। ১৩২৩ খ্রীঃ দিল্লীশ্বর টোগলক সাহের দ্বারা সিমরাউনগড় বিধ্বস্ত হইলে, নান্যদেবের পঞ্চম বংশধর হরসিংহ দেব নেপালে পলায়ন পূর্ব্বক ভাটগাঁয় আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। ১০৯৭—১৩২৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ২২৭ বৎসর কাল নান্যদেব ও তাঁহার পর-বংশধরেরা মিথিলায় রাজত্ব করেন। সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ প্রিন্সেপ সাহেব স্বরচিত "useful tables" নামক পুস্তকে এই অমূলক ও ভ্রান্ত মত নিরা-

পত্তিতে গ্রহণ করেন। আমাদের অভিমত ইতিপূর্ব্বেই বিস্তারিত রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। হরসিংহদেব হইতে হরিসিংহ দেব সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি বলিয়া ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। নান্যদেব নেপালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন বলিয়া বংশাবলীতেও বর্ণিত হইয়াছে। ছয় পুরুষে ২২৭ বৎসর কাল রাজত্ব করা কোনও রাজবংশের ভাগ্যে ঘটে নাই। জয়দেব মল্লকে রাজ্যচ্যুত করিয়া হরসিংহ দেব ১৩২৩ খ্রীঃ নেপালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং ৮৮০ খ্রীঃ রাঘবদেব দ্বারা নেপালী সংবৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত শিরোমণি প্রিন্সেপ সাহেবের এই উভয় মতই ভ্রান্ত ও অমূলক। প্রিন্সেপ সাহেবের মতে ১৬০০ খ্রীঃ জয় এক্ষ (যক্ষঃ) মল্ল নেপালে রাজত্ব করেন। আমাদের মতে যক্ষমল্ল ১০৪০—৬০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত নেপালে রাজ্য শাসন করেন। প্রিন্সেপ সাহেবের প্রকাশিত মল্লবংশাবলী ও সময় নির্দ্দেশ একান্ত ভ্রান্ত বলিয়া শাসনলিপি হইতে প্রমাণিত হইতেছে। ৭৫৭ নেপালী সংবতে(১৬৩৭ খ্রীঃ) খোদিত ললিতপট্টনের রাজা সিদ্ধিনৃসিংহ মল্লের নামাঙ্কিত এক শিলালিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। ললিতপট্টনের প্রাচীন রাজপ্রাসাদের সন্নিহিত রাধাকৃষ্ণের মন্দির মধ্যে এই শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। সিদ্ধিনৃসিংহ ও তাঁহার বংশধরেরা পরম বৈষ্ণব ছিলেন। প্রতাপমল্লের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, ভগ্নহৃদয়ে সিদ্ধিনৃসিংহ গঙ্গাতীরে বাস করিতে থাকেন। ললিতপট্টন রাজ্যের শাসনভার তাঁহার পুত্র শ্রীনিবাস মল্লের হস্তে অর্পণ করিয়া, তিনি বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। শ্রীনিবাস মল্লের পুত্র যোগনরেন্দ্র মল্ল রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। দোলপর্ব্বতের শিখরস্থ বিষ্ণুমন্দিরে যোগনরেন্দ্র মল্লের মৃত্যু হয়। তাঁহার চিতায় যোগনরেন্দ্র মল্লের একবিংশতি পত্নী প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার তনয়া যোগমতী দেবী পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরূঢ়া হন। যোগমতীর জ্যেষ্ঠপুত্র লোকপ্রকাশের মৃত্যুর পর, পুত্রের স্বর্গকামনায় রাজ্ঞী রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। ৮৪৩ নেপালী সংবতের (১৭২৩ খ্রীঃ) ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ায় এই প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাপ্ত হয়। রাধাকৃষ্ণের মন্দিরস্থ রাজ্ঞী যোগমতীর নামাঙ্কিত অপর শিলালিপি হইতে ললিতপট্টনের রাজবংশের পূর্ব্বোক্ত বিবরণ জানা যাইতেছে।

রাজা যক্ষমল্লের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয় বলিয়া ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ জয়ন্তরাজ ভাটগাঁর ও কনিষ্ঠ রত্নমল্ল কাটমাণ্ডুর শাসনভার প্রাপ্ত হন। বংশাবলীর মতে রত্নমল্ল কান্তিপুর ও নবাকোট আপনার অধিকার ভুক্ত করেন। তিনি তিব্বতের রাজাকে রণে পরাজিত করেন, তাঁহার সময়ে মুসলমানেরা নেপাল সর্ব্ব প্রথম আক্রমণ করিয়া অকৃতকার্য্য হয়। সোমশেখরানন্দ নামে জনৈক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ পশুপতিনাথের মন্দিরের প্রধান পুরোহিত নিযুক্ত হয়। তুলজা দেবীর মন্দির সংস্কৃত হয়। রাজ্যমধ্যে যে নূতন তাম্রমুদ্রা প্রচলিত হয়, তাহার পৃষ্ঠভাগে সিংহমূর্ত্তি অঙ্কিত হয়। বংশাবলীতে সূর্য্যমল্লের পুত্র অমরমল্ল তাঁহার পিতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে!! মহেন্দ্রমল্লের সময়ে নেপালে রৌপ্যমুদ্রা প্রথমতঃ প্রচলিত হয়। মহেন্দ্রমল্ল ভাটগাঁর রাজা ত্রৈলোক্যমল্লের পরম সুহৃৎ ছিলেন। ৬৬৯ নেপালী সংবতে (১৫৪৯ খ্রীঃ) কাটমাণ্ডুনগরে তুলজা দেবীর এক মন্দির রাজা মহেন্দ্রমল্লের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের অনুমিত

সময়ের সহিত বংশাবলীর নির্দ্দিষ্ট এই সময়ের ঐক্য হইতেছে। সদাশিব মল্লের অত্যাচারে তাঁহার ভৃত্য ও প্রজাগণ বিদ্রোহী হয়। সদাশিব ভাটগাঁয় পলায়ন পূর্ব্বক তথায় কারারুদ্ধ হন। শিবসিংহমল্লের মহিষী গঙ্গা দেবী ৭০৫ নেপালী সংবতে (১৫৮৫ খ্রীঃ) চঙ্গুনারায়ণের মন্দির সংস্কৃত করেন। ৭১৪ নেপালী সংবতে (১৫৯৪ খ্রীঃ) রাজা শিবসিংহের আদেশে স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরের জীর্ণসংস্কার সাধিত হয়। ১৫৯৫ খ্রীঃ গোরখনাথের কাষ্ঠ মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের নাম কাটমাণ্ডু রাখা হয়। তদনুসারে কান্তিপুর নগরের নাম কাটমাণ্ডু হয়।

শিবসিংহমল্লের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হরিহরসিংহ মল্ল রাজাসনে উপবিষ্ট হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শাসিত রাজ্য তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়। জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মীনৃসিংহ কাটমাণ্ডু নগরে ও কনিষ্ঠ সিদ্ধিনৃসিংহ ললিতপট্টনে রাজত্ব করিতে থাকেন। বংশাবলী লক্ষ্মীনৃসিংহ মল্লকে হরিহরসিংহ মল্লের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে !!! লক্ষ্মীনৃসিংহ কালক্রমে উন্নত হইয়া উঠিলে,তাঁহার পুত্র প্রতাপমল্ল পিতাকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া পৈতৃক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। বংশাবলীর মতে ৭৫৯ নেপালী সংবতে (১৬৩৯ খ্রীঃ) প্রতাপমল্লের রাজত্ব আরম্ভ হয় এবং ১৬৮৯ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৬৪০ খ্রীঃ স্বম্ভুয়নাথের এবং ১৬৫৭খ্রীঃ বিশ্বরূপের মন্দির প্রতাপমল্লের দ্বারা সংস্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ৭৭০ নেপালী সংবতে স্বয়ম্ভুস্তোত্র এবং ৭৭৪ সংবতে কালিকাস্তোত্র ও গুহ্যেশ্বরস্তোত্র স্বয়ং রচনা করেন। প্রতাপ সুকবি ছিলেন। প্রতাপমল্লের রাজত্ব কাল সম্বন্ধে বংশাবলীর উক্তি সত্য বলিয়া শিলালিপি হইতে জানা যাইতেছে। বংশাবলীর মতে ৭৫৭ নেপালী সংবতে ললিতপট্টনের রাজা সিদ্ধিনৃসিংহমল্ল রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ৭৪০ নেপালী সংবতে (১৬২০ খ্রীঃ) তুলজা ভবানীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ৭৭৭ নেপালী সংবতে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। সিদ্ধিনৃসিংহের পুত্র শ্রীনিবাস মল্ল ৭৭৭-৮২১ নেপালী সংবৎ (১৬৫৭-১৭০১ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বংশাবলীর এই সকল উক্তি হইতে আমাদের অনুমিত সময় সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইতেছে। বংশাবলীতে সিদ্ধিনৃসিংহমল্লের যুদ্ধবিগ্রহের কোনও উল্লেখ নাই, কিন্তু শ্রীনিবাসমল্লের সহিত প্রতাপের সংগ্রাম উপস্থিত হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীনিবাসমল্লের পুত্র যোগনরেন্দ্র মল্ল পুত্র শোকে অধীর হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। তাঁহার রাজ্যত্যাগের পর প্রতাপমল্লের তৃতীয় পুত্র মহীন্দ্রমল্ল ললিতপট্টনের রাজাসনে উপবেশন করেন। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে,সিদ্ধিনৃসিংহমল্লের সময় হইতে ললিতপট্টন অল্পাধিক পরিমাণে কাটমাণ্ডুর অধীনতাপাশে আবদ্ধ থাকে। মল্লবংশের অবশিষ্ট ইতিহাস ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

ভারত, মিসর ও খ্রীষ্টধর্ম্ম। [৩]

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ভারতসংশ্রবে মিসর, আরব এবং গ্রীশদেশে পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। গ্রীশ ও মিসরের পণ্ডিতগণ সেই পৌরাণিক ধর্ম্মনিবিষ্ট নানাবিধ

ধর্ম্মতত্ত্বের বিলক্ষণ পর্য্যালোচনা করেন। এই পর্য্যালোচন কালে গ্রীশ এবং মিসরে নানা দার্শনিক সম্প্রদায় সমুত্থিত হয়। কারণ, ভারতীয় পৌরাণিক ধর্ম্মে অভিনিবেশ পূর্ব্বক প্রবেশ করিলে, তাহাতে সমস্ত বৈদিক সূক্ষ্ম তত্ত্বই নিহিত দেখা যায়। পৌরাণিক ধর্ম্ম সেই সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকলের স্থূল আবরণ মাত্র। যাহারা অত্যন্ত বিশ্বাসপ্রবণ নিম্নাধিকারী, তাহাদের শিক্ষার্থই পৌরাণিক ধর্ম্ম; তাহারা সে আবরণ ভেদ করিতে চাহে না; কারণ, তাহারা পুরাণের সমুদায় বিশ্বাস করিয়া তাহা হইতে উপদেশ গ্রহণে বিলক্ষণ সমর্থ। সূক্ষ্ম তত্ত্বদর্শিগণ এই আবরণ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে বেদার্থ দেখিতে পান। মহাভারতের সংকল্প দেখিলেই এ কথা সপ্রমাণ হয়। ব্যাস বলিয়া ছিলেন, আমি বেদ বেদাঙ্গ উপনিষৎ এই সকলেরসার সঙ্কলন পূর্ব্বক মহাভারত কাব্য রচনা করিয়াছি। সে যাহা হউক, মিসর এবং গ্রীশে যে সকল দার্শনিক সম্প্রদায় সমুত্থিত হয়, তাহাদের মতামত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ভারতীয় দর্শনের সহিত তাহাদের অনেকাংশে ঐক্য দেখা যায়। কারণ, তাহাদের মূল এক। একই বৈদিক ধর্ম্ম শতধা হইয়া শতরূপে শতস্থানে উদয় হইয়াছে।

অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণ সিরিয়া ও ব্যাবিলনে যেরূপ প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র পাইয়াছিলেন, গ্রীশ এবং মিসরে তদ্রূপ পান নাই। মিসর এবং গ্রীশ অনেক দার্শনিক পণ্ডিতগণে পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু সিরিয়া এবং ব্যাবিলন সেরূপ ছিল না। এজন্য, সিরিয়া এবং ব্যাবিলনে তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা পাইয়াছিলেন এবং সেই সুবিধা হেতু অনেকে তাঁহাদের মতামত গ্রহণ করিয়া এসিনিস নামে যে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে দলবদ্ধ হইয়াছিল, সেই এসিনিস সম্প্রদায় ক্রমে মিসরেও গিয়াছিল; কারণ, সিরিয়ার সহিত তখন পশ্চিমাঞ্চলীয় সর্ব্বদেশেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সিরিয়ায় তখন সর্ব্বদেশীয় লোক যাতায়াত করিত। সুতরাং মিসরের যশে আকৃষ্ট হইয়া এসিনিসগণ সে দেশেও গিয়াছিল। মিসরে গিয়া তাহারা থারাপিউট (Therapeuts) নামে প্রসিদ্ধ হয়। থারাপিউট এবং এসিনিসের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ একই; কেবল বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় তাহাদের নামকরণ বিভিন্ন হইয়াছিল।* মিসরে থারাপিউটগণ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মিসর এবং গ্রীশের দার্শনিক বিদ্যায় আমরা যে ভারতীয় দর্শনের নানাবিধ মতামত দেখিতে পাই, তাহার একটী কারণ এই থারাপিউটগণ। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকেরা ভারতীয় ধন সর্ব্বত্র মুক্ত হস্তে দান করিয়াছিলেন। মিসর এবং গ্রীশের ধর্ম্ম ও দার্শনিক বিদ্যা নানারূপে পরিপুষ্ট হইয়া জুডিয়া মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল।

ওসিরিস মিসরে যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাই উচ্চ এবং নিম্ন প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ক্রমে উচ্চ মিসরের ধর্ম্মই প্রাধান্য লাভ করে। প্রাচীন থিবস মিসর ধর্ম্ম ও রাজ্যের একদা স্তম্ভ স্বরূপ হইয়াছিল। থিবসের প্রধান পুরোহিত রাজছত্র ধারণ করিয়া এক স্বতন্ত্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই থিবসের ধর্ম্মতন্ত্র মধ্যে ঐশ্বরিক ত্রিবৃৎ তত্ত্বই প্রধান ধর্ম্মতত্ত্ব রূপে মিসরে প্রচারিত হয়।

একদা মিসর জ্ঞান, ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যে এত পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে, সেই লোভে আকৃষ্ট

* "The Therapeutœ of Philo are a branch of the Essenes. Their name appears to be but a Greek translation of the Essenes."—Renan.

হইয়া অনেক বিদেশীয় নৃপতিবর্গ মিসরে আসিয়া পড়েন। মিসরে আরবেরা আসিয়া প্রাচীন কালে রাখালরাজ নামে বিখ্যাত হয়েন। তৎপরে তথায় এসিরীয় এবং পারস্যরাজের জয়পতাকা উড্ডীন হয়। তদনন্তর ইজিপ্ট গ্রীকজাতির রাজ্যভুক্ত হয়। মিসরের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি এত প্রবলা ছিল যে, বিদেশীয় রাজ-গণও তাহার বিরুদ্ধে যাইতে সাহসী হইতেন না। ধর্ম্মের বিরোধ উপস্থিত হইলেই রাজ-বিদ্রোহ উপস্থিত হইত। এই ধর্ম্মবিরোধ হেতুই মিসর হইতে পারস্য প্রভুত্ব তিরোহিত হয়। কিন্তু রাজ্য যাইলে কি হইবে, পূর্ব্ব কালে আরবীয় ধর্ম্মের যেমন অনেক নিদর্শন মিসর ধর্ম্মে ছিল, পার্সীধর্ম্মের তেমনি অনেক মত ও তত্ত্ব মিসর ধর্ম্ম-তন্ত্র মধ্যে প্রবিষ্ট হই য়াছিল। পার্সী-ধর্ম্মের সাগ্নিক উপাসনা মন্ত্র মিসরে দেখা দিয়াছিল। পার্সী-ধর্ম্মের সহিত ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। প্রাচীন পারস্যদেশের সহিত যে ভারতের চিরদিন আলাপ পরিচয় ছিল, আর্য্যশাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। পারস্য অভ্যুদয়ের অনেককাল পূর্ব্ব হইতে ভারতীয় গৌরব-রবি প্রদীপ্ত হইয়াছিল; সেই গৌরবে যে পারস্য দেশ আলোকিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? সেই পারস্য দেশীয়, ধর্ম্মত-ন্ত্রের অনেক মতামত মিসর ধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করে। সুতরাং পরম্পরা-সম্বন্ধে মিসর আবার আর্য্যসম্পত্তি গ্রহণ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

মিসরে পরে গ্রীশের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। প্রাচীন গ্রীশে যে ধর্ম্মতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে ধর্ম্মতন্ত্র ভারতীয় সংশ্রবে সমুন্নত হয়, সেই ধর্ম্মের অনেক মতামত পরে মিসর ধর্ম্মের শরীর পরিপুষ্ট করে। সত্য বটে, একদা মিসর স্বদেশীয় দ্বারবদ্ধ করিয়া বহিঃসম্পর্ক রহিত করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু বহির্দ্দেশীয় রাজ্য-স্রোত আসিয়া সে অর্গল ভাসাইয়া দিয়াছিল। মিসরবাসিগণ অন্যদেশে না যাইলে কি হইবে, অন্যদেশীয় লোক যে মিসরের সহিত বাণিজ্য ব্যবসায় চালাইত। সুতরাং স্বদেশ মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও মিসরবাসিগণ একেবারে বহির্দ্দেশীয় সম্পর্ক-রহিত হইতে পারে নাই। তাহার ফল এই, মিসর শুধু যে ধনসম্পত্তিতে পরিপূরিত হইয়াছিল, এমত নহে, তাহার জ্ঞানক্ষেত্রও ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়াছিল। চিরদিন ঐ জ্ঞানক্ষেত্রে আর্য্যধর্ম্মের বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল। অবশেষে থিয়োডো-সিয়াস (Theodosius) ভূপতির আজ্ঞায় ৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে মিসর ধর্ম্ম একেবারে সমূলে নিপতিত হয়। নব বলে বলীয়ান খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত মিসর ধর্ম্মের ঘোর বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে, পুরাতন মিসর ধর্ম্মের নিপাত সাধন হয়। দার্শনিক তত্ত্বে পরাভূত হইয়া মিসর ধর্ম্ম পতিত হয় নাই, খ্রীষ্টীয় রাজবল সেই ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া অবশেষে তাহাকে নিহত করিয়া ফেলিল। নিহত করিয়া তাহার আর চিহ্ন মাত্র রাখিল না। তাহার সর্ব্ব-সম্পত্তি লইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মাঙ্গকে ভূষিত করিল। সেই ভূষণে ভূষিত হইয়া অভিনব খ্রীষ্টধর্ম্ম যেন নিজ সম্পত্তিতে ধনবান হইয়া দেখা দিল। কিন্তু সেরূপ নবীনবেশে দেখা দিলে কি হইবে? আজিও মিসর ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইতিহাস পৃথিবী হইতে তিরোহিত হয় নাই। এই দেখুন, লিডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক ধর্ম্মের ইতি-হাসবেত্তা মহোদয় টীল (C. P. Tiele) কি বলিতেছেন;—

"Conversely, however, the Egyptian religion exerts a preponderating influence on

the Canaanite races, though less upon the Hebrews than on the Phœnicians. First by their means, and then directly, it reached the Greeks, made its way finally through the whole Roman Empire, and even furnished to Roman Catholic Christendom the germs of the worship of the Virgin, the doctrine of Immaculate Conception, and the type of its theocracy".

"সে যাহা হউক, অন্যদিকে, সমস্ত ক্যানানবাসী জাতির উপর ইজিপ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাব অত্যন্ত প্রভূত বলিয়াই প্রতীয়মান হয়—ফিনিসীয়গণের উপর যতোধিক, হিব্রুগণের উপর তত নহে। সেই ধর্ম্ম গ্রীকদিগের অন্তরে প্রথমে সাক্ষাৎভাবে প্রবেশ লাভ করে; পরে, সমগ্র রোম সাম্রাজ্যে তাহা প্রচারিত হয়; এমত কি, রোমীয় ক্যাথলিক ধর্ম্মজগতের কুমারী মেরীর মাতৃপূজা, নিষ্পাপ কৌমার গর্ভ, বা খ্রীষ্টের সশরীরে অবতরণবাদ এবং ক্যাথলিক ধর্ম্মরাজ্যতন্ত্রের মূলে সেই ইজিপ্টীয় ধর্ম্ম বীজ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।"

গ্রীক রাজত্বকালে মিসর নাম একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল; তৎকালে ইজিপ্ট নামই আরও প্রবল হইয়া উঠিল। গ্রীকেরা মিসর অধিকার করিয়া স্বদেশীয় অনেক দেবদেবী এবং ধর্ম্মীয় মতামত মিসর ধর্ম্মান্তর্গত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই হেতু, পরম্পরা ক্রমে, অনেক আর্য্য ভাব ও মতামত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সেই জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোচনায় ইজিপ্ট অবশেষে সর্ব্বদেশকে পরাজিত করিয়াছিল। তাহার বিদ্যালয় ক্রমে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া উঠিয়াছিল। পণ্ডিতমণ্ডলীর গৌরবে ইজিপ্ট পরিপূর্ণ হইয়াছিল। প্লেটো সেই গৌরবে আকৃষ্ট হইয়া তথায় বৎসরাধিক কাল শিক্ষালাভ করিয়া স্বদেশে গুরু সক্রেটিসের প্রধান শিষ্যরূপে গণ্য হইলেন এবং আপন ধর্ম্ময় মতামত সকলকে এক নূতন পন্থার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিলেন। সক্রেটিস যে আন্তরিক ঐশ্বরিক নিষ্ঠা শিক্ষা দিয়াছিলেন, প্লেটো সেই নিষ্ঠাকে ভগবৎ প্রেমরসে সিক্ত করিলেন। সক্রেটিসের ঐশ্বরিক শরণাসক্তি আরও বলবতী হইয়া উঠিল। যে পবিত্র ঐশ্বরিক Platonic Love প্রেম প্লেটো শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা প্লেটোর নামেই প্রচারিত হইল। সক্রেটিস কুতর্কজাল হইতে ধর্ম্মকে উদ্ধার করিয়া মানবান্তরে তাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। প্লেটো পবিত্র প্রেমে সেই ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার পূজা করিয়াছিলেন। গ্রীশের মানবমন এখন ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিষ্কৃত পথ দেখিতে পাইল। কুতর্কের কুজ্ঝটিকা তিরোহিত হইয়া ধর্ম্মের জ্যোতিঃ দ্বিগুণ প্রভাবে বিকীর্ণ হইল। সক্রেটিস সর্ব্বমঙ্গলময়কে মানব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, প্লেটো প্রেমবারি দিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন। এই দেখুন প্লেটো যে ভগবৎ প্রেমের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা কি রূপ :—

"The bond which unites the human to the Divine is Love, and Love is the longing of the soul for Beauty; the inextinguishable desire which like feels for like, which the Divinity within us feels for the Divinity revealed to us in Beauty".—Lewes.

"প্রেমবন্ধনই মানবকে ভগবানের সহিত আবদ্ধ করে। সেই প্রেম কি? না, সুন্দরের জন্য আত্মার ঐকান্তিক অনুরাগ; সমানের সহিত সমান মিলিবার জন্য যে অদম্য অনুরাগে উত্তেজিত হয়, সেই প্রবলানুরাগের নাম প্রেম এবং সুন্দরে যে ভগবানের মূর্ত্তি প্রকাশিত, সেই ভগবানের প্রতি অন্তরাত্মাধিষ্ঠিত ভগবৎ সত্বার ঐকান্তিক অনুরাগের নামই প্রকৃত প্রেম।"

প্লেটো এই পবিত্র ভগবৎ প্রেম খ্রীষ্ট জন্মিবার চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্লেটো গ্রীকদর্শনে এক নবযুগ আনিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যুদয় কাল হইতে গ্রীক দর্শনে এক নূতন জীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল। তদ্‌পরবর্ত্তী কালের সুধীগণ অনেকেই প্লেটোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহারই মতামত প্রচার

করিয়াছিলেন। জুডিয়ায় গ্রীক দর্শনের প্রাদুর্ভাব কালে প্লেটোর পবিত্র ভগবৎ প্রেমের উপদেশ অবশ্য প্রচারিত হইয়াছিল।

ইহুদী ফাইলো এই প্লেটোর শিষ্য। গ্রীক দর্শনে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তিনি ইজিপ্টের দার্শনিক বিদ্যালোচনায় বিলক্ষণ পণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি যে মতামত প্রচার করেন, ইউরোপীয় দার্শনিক ইতিবৃত্তে তাহার নাম নবপ্লেটোবাদ Neo-Platonism এই নবপ্লেটোবাদ খ্রীষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে সমুদ্ভুত হইয়া তৎপরেও প্রায় তিনশত বৎসর বিদ্যমান ছিল। এই নবপ্লেটোবাদে ইজিপ্টীয় দর্শনের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। এই দার্শনিকবাদের অপরাপর পণ্ডিতগণ খ্রীষ্টশতাব্দীর পরে প্রাদুর্ভূত হন। কিন্তু কালের অগ্রপশ্চাতে কিছু আসিয়া যায় না; খ্রীষ্ট না জন্মিলে এবং তাহার মত প্রচার না হইলেও, এই নবপ্লেটোবাদের মতামত এক রূপই থাকিত। কারণ, তাহার বিকাশ পূর্ব্ব দার্শনিক বিদ্যালোচনার ফল। যে ইজিপ্টীয় দর্শন ফাইলোর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, ফাইলো এবং তদ্‌পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা তাহারই বিকাশ সাধন করিয়াছিলেন; তাহারা পুষ্পকে বিকসিত করিয়া দেখাইয়াছিলেন মাত্র। ফাইলোর উপদেশে যে যে ইজিপ্টীয় দার্শনিক তত্ত্ব খ্রীষ্ট ধর্ম্মমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এই নবপ্লেটোবাদের পণ্ডিতগণের কথায় তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে। Proclus দর্শনের অধিকার সম্বন্ধে যাহা বলেন, Lewes তাহা এই রূপ প্রকাশ করিয়াছেন :—

"Proclus placed Faith above Science. It was the only faculty by which The One could be apprehended. The Philosopher, said he, is not the priest of one Religion but of all Religions, that is to say, he is to reconcile all modes of belief by his interpretations. Reason is the Expositor of Faith."—*Lewes.*

"প্রোক্লস ভক্তিকে জড়বিজ্ঞানের উপরে স্থান দিয়াছেন। এই ভক্তি দ্বারাই কেবল ভগবান গ্রাহ্য। দার্শনিক পণ্ডিত একমাত্র ধর্ম্মের ব্যাখ্যাকার নহেন, তিনি তাহার ব্যাখ্যা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িক মতামতের সমন্বয় সাধন করেন। বুদ্ধি ধর্ম্মের কেবল ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ।"

ভারতেও দর্শনের অধিকার এই রূপ নিরূপিত হইয়াছিল। ভারতীয় দর্শন বলিয়াছেন, যাহা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব, তাহা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের গ্রাহ্য নহে। যিনি অচিন্ত্য, চিন্তা তাঁহাকে কিরূপে প্রাপ্ত হইবে? অচিন্ত্য বিষয়কে ধারণা করিতে হইলে তদুপযুক্ত শক্তি সম্পন্ন হওয়া যাই। সে শক্তি ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তির বহির্ভূত। সে শক্তি কি, নবপ্লেটোবাদের অন্য একজন দার্শনিক এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—

"If, said Plotinus, knowledge is the same as the thing known, the Finite, as Finite, never can know the Infinite; because, it can not be the Infinite. To attempt, therefore, to know the Infinite by reason is futile, it can only be known in immediate presence. The faculty by which the mind divests itself of its personality is ecstasy. In this ecstasy the soul becomes loosened from its material prison, separated from individual consciousness, and becomes absorbed in the Infinite Intelligence from which it emanated. In this ecstasy, it contemptates Real Existence ; it identifies itself with that which it contemplates".

"প্লোটাইনস বলেন, যদি পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও সেই জ্ঞানের বিষয় এক হয়, যদি যৌটক জ্ঞান ও যৌটক এক হয়, তবে যাহা পরিচ্ছিন্ন ও পরিমিত, তাহা সেই পরিচ্ছিন্ন ও পরিমিত রূপে কখন অপরিচ্ছিন্ন অনন্তকে ধারণা করিতে পারে না। অতএব, পরিমিত বুদ্ধি দ্বারা অনন্তকে জানিতে যাওয়া নিশ্চয় ব্যর্থপ্রয়াস, তাঁহাকে জানিতে হইলে, তাঁহার সাক্ষাৎকার আবশ্যক। যে শক্তি দ্বারা চিত্তের মোহাবরণ ঘুচিয়া যায়, তাহার নাম হ্লাদিনী শক্তি। এই শক্তি দ্বারা আত্মা শরীর রূপ ভৌতিক বন্ধন এবং স্বীয় জীবধর্ম্মাক্রান্ত অহংজ্ঞান হইতে বিমুক্ত হইয়া যে অনন্ত চিদ্রূপই তাহার প্রকৃত স্বরূপ এবং যাহা হইতে তাহার উৎপত্তি, সেই অনন্ত চেতনায় তাহা মিশিয়া যায়। এই

অবস্থায় তাহার প্রকৃত সত্যের অনুভব হয়; তখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হইয়া যায়।"

তবেই দেখা যাইতেছে, জীবের নিস্ত্রৈগুণ্য সাধিত না হইলে, জীব কখন নির্গুণকে জানিতে পারে না। সামান্য ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান বা বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বর-তত্ত্ব লব্ধ নহেন। ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে আত্মার জীবত্ব ঘুচিয়া যাওয়া চাই। যে মায়িক জ্ঞান দ্বারা আত্মা আচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেই মায়িক জ্ঞান অপসারিত হইলে, যখন চিত্তবৃত্তি বহির্বিষয় একবারে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখীন হইয়া ধ্যানস্থ হইবে, তখন তাহার দীপালোক প্রজ্বলিত হইবে, সেই দীপালোক ও পরমজ্ঞানে আত্মা পরমাত্মাকে দেখিতে ও লাভ করিতে পারিবেন। ফাইলো কি বলিতেছেন, দেখুন,—

"The senses may deceive: Reason may be powerless, but there is still a faculty in man—there is Faith. Real Science is the gift of God: its name is Faith; its origin is the Goodness of God: its cause is Piety."
—*Lewes.*

"ইন্দ্রিয়জ্ঞান মোহময় হইতে পারে, বুদ্ধি অতি দীন ও সামর্থ্যহীন হইতে পারে. তথাপি মানবের ভক্তিবৃত্তি অতি প্রবলা। যাহা প্রকৃত জ্ঞানের পন্থা ও বিজ্ঞান, তাহা ভগবৎ কৃপা মাত্র; তাহারই অন্যতর নাম ভক্তি। কৃপাসিন্ধুর কৃপাকণাই ভক্তি, তাহা শিবময়ের মঙ্গলকণা মাত্র, তাহাই প্রকৃত সাধনা পথ ও নিষ্ঠা।"

হিন্দুও বলেন—"ভক্তিতে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।" এই ভক্তিপথে গিয়া লোকে আনন্দধামে ও বৈকুণ্ঠে যায়। ভক্তিপথে সাধক যে অমৃত লাভ করে,তাহাই Ecstasy.

ফাইলো আরও বলেন ;—

"God being incomprehensible, inaccessible, an intermediate existence was necessary as an Interpeter between God and Man, and this Immediate Existence is called the Word. The Word is God's Thought, Thought is twofold—Thought as thought and Thought as realized: Thought become the World".—*Lewes.*

"ঈশ্বরতত্ত্ব সামান্য মানবের নিকট অজ্ঞেয় এবং বাক্যমনের অতীত। এজন্য, দেব মানবের মধ্যে কোন মধ্যবর্ত্তিতার আবশ্যক। সেই মধ্যবর্ত্তিতাই শব্দ; শব্দই ভগবৎ জ্ঞান। সেই জ্ঞান দ্বিবিধ—জ্ঞান, জ্ঞান অব্যক্ত (কারণ ব্রহ্ম); জ্ঞান কার্য্যরূপে ব্যক্ত (কার্য্য-ব্রহ্ম)—জ্ঞান ব্রহ্মাণ্ডরূপে মূর্ত্তিমান।"

বেদেও উক্ত হইয়াছে ;—

"বাচা বিরূপনিত্যয়া।"—ঋগ্বেদ ৮ নং ৬৪সূ ৬ ঋক্।

ফাইলো এস্থলে "শব্দ" ও বেদকে কেমন প্রতিপন্ন করিয়াছেন,দেখুন। সনাতন ধর্ম্মের সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মও এস্থলে আভাসিত হইয়াছে। তিনি আরও বলিতেছেন, এজগৎ ঈশ্বরের রূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এজগৎ সগুণ জ্ঞানস্বরূপেরই ব্যক্ত রূপ। সেই অব্যক্তের বিরাটমূর্ত্তি বা ব্যক্ত ভাবই জগৎ।

যে অমৃত (Ecstasy) লাভ করিলে ভগবানকে পাওয়া যায়,সেই অমৃতলাভের উপায় কি? সেই উপায় ব্রহ্মসাধনা; ব্রহ্মসাধনা সম্বন্ধে নবপ্লেটোবাদ কি বলেন? প্লোটাইনস বলিতেছেন :—

"Every thing which purifies the soul and makes it resemble its primal simplicity is capable of conducting it to ecstasy."—*Lewes.*

"চিত্তশুদ্ধি হইলে আত্মা যদ্দারা তাহার স্বাভাবিক নির্ম্মলতা ও সরলতায় আইসে, তদ্দারাই তাহা অমৃত তত্ত্ব লাভ করে।"

সকলের পক্ষেই কি এক রূপ সাধনাই বিধি? লোক সকল ত বিভিন্ন রুচি ও প্রকৃতি সম্পন্ন। তবে সকলের একরূপ সাধনায় প্রবৃত্তি হইবে কেন? বিভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত বিভিন্ন সাধনপথের একান্ত প্রয়োজন। বেদে এই অধিকার-তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। এজন্য, বিভিন্ন বেদাধিকারের সৃষ্টি। বেদে নিম্নস্তরের ভক্তিপথ হইতে উচ্চ জ্ঞান পথে যাইবার প্রশস্ত পন্থা নিরূপিত হইয়াছে। এই অধিকার-তত্ত্ব না বুঝিলে বিভিন্ন বেদবিধি বুঝা দুষ্কর। যখন অধিকারানুসারে সকল জ্ঞানই লব্ধ হয়, তখন বেদজ্ঞান বাকী থাকে

কেন? নিম্নাধিকারী ব্যক্তি উচ্চ বিষয় দিলে গ্রহণ করিবে কেন? যাহার তেরিজ জমা খরচ বোধ হয় নাই, সে কি হটাৎ বীজগণিত বুঝিতে পারে? আবার যাহার দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি হৃৎ প্রবৃত্তি সকল প্রবলা, বিচার শক্তি অতি ক্ষীণ, তাহার জন্য যে সাধনপথ আবশ্যক, এক জন বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল লোকের কি সে সাধনপথ উপযোগী হইতে পারে? বুদ্ধিমান সূক্ষ্মদর্শী বিভিন্ন পন্থা ধরিয়া তবে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবেন। প্লোটাইনস এই অধিকার তত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, দেখুন :—

"There are radical differences in men's natures. Some souls are ravished with Beauty: and these belong to the muses. Others are ravished with Unity and Proportion; and these are Philosophers. Others are more struck with moral perpections; and these are the pious and ardent souls who live only in religion. Thus then, the passage from simple sensation to ecstasy may be accomplished in three ways; by Music, by Dialectics and by Love or Prayer. The result is always the same—the victory of the Universal over the Individual".

—*Lewes.*

"বিভিন্ন প্রকৃতি লইয়া বিভিন্ন লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। কতকগুলি লোক সৌন্দর্য্য দেখিলে মোহিত হয়; কাব্যদেবী তাহাদের অবলম্বন। অপর লোকে বৈষম্যের মধ্যে সাম্য ও একতা এবং বিশৃঙ্খলতার মধ্যে শৃঙ্খলা দেখিলে মোহিত হয়, তাঁহারাই দার্শনিক। আর এক শ্রেণীর লোক ধর্ম্মনৈতিক উৎকর্ষ দেখিলে বড়ই প্রীতিলাভ করেন; তাঁহারাই অতি উৎসাহের সহিত ধর্ম্মের পুণ্যপথ আশ্রয় করেন। তবেই প্রতিপন্ন হইতেছে, সামান্য ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান হইতে অমৃতে যাইবার পন্থা ত্রিবিধ। এক পন্থা কাব্য-রসাত্মক প্রবৃত্তি পথ, (পৌরাণিক অনুষ্ঠান রীতি), অন্য পন্থা চিন্তাশীল জ্ঞানপথ (দার্শনিক পথ) এবং তৃতীয় সাধন-পথ, প্রেম বা উপাসনা (বৈষ্ণবী ভক্তি পথ)। ফল সকল পথেই সমান, সকলই একস্থানে উপনীত হয়। সকল পথেই জীব। বিশিষ্ট জীবত্ব হইতে মুক্ত হইয়া অবিশেষ পরমাত্বভাবে অধিষ্ঠিত হয়; বিশেষ জীবের উপর অবিশেষ পরমাত্মার জয়লাভ এই।"

প্রথমে প্লোটাইনস চিত্তশুদ্ধির কথা বলিলেন। কারণ, চিত্তশুদ্ধি নহিলে কোন ধর্ম্মপথেই অগ্রসর হইবার যো নাই। পাপ হইতে মুক্ত না হইতে পারিলে পুণ্যপথে বিচরণ করা অসম্ভব। তৎপরে অধিকার অনুসারে বিভিন্ন সাধন পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমাদের উদ্ধৃতাংশে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্লোটাইনস যাহাকে কাব্যরসাত্মক প্রেমপথ বলিয়াছেন, তাহা আমাদের ভক্তিমার্গ এবং যে পথে তিনি Dialectics দেখিয়াছেন, তাহা আমাদের জ্ঞানমার্গ। প্লেটো Dialectics শব্দ কি অর্থে ব্যবহার করিতেন, দেখুন:—

"How are we to escape from evil? Not by suicide, but by leading the life of Gods or in the eternal contemplation of truth or Idea. This is done by Dialectics.

"Plato uses the word Dialectics; because with him Thinking was a Silent discourse of the soul and differed from Speech only in being silent".

"তবে পাপের নিষ্কৃতি কিসে হয়? আত্মহত্যা করিয়া নয়; কিন্তু দেবোপম কার্য্য করিয়া দেবত্ব লাভ করিতে পারিলে, অথবা চিরদিন ধ্যানপরায়ণ হইয়া কেবল সত্য স্বরূপ এবং জ্ঞান-স্বরূপের ভাবনা করিতে পারিলে, তবে পাপ মলিনতা হইতে মুক্ত হওয়া যাইতে পারে।"

প্লেটো ভিন্নার্থে Dialectics শব্দ ব্যবহার করিতেন, যে অর্থে সক্রেটিস তাহা ব্যবহার করিতেন, সে অর্থে নয়। প্লেটোর Dialectics শব্দের অর্থ, এক প্রকার ধ্যান বিশেষ; কারণ, তাহার ধ্যানের অর্থ আত্মার নীরব চিন্তা, বাক্‌কথন হইতে সেই ধ্যানের এই মাত্র প্রভেদ যে, তাহা নীরব আত্মচিন্তা।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, দেবত্বলাভকেই প্লেটো মুক্তি বলিয়াছেন; জ্ঞানপথে আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন হইলে সেই দেবত্ব লব্ধ হয়। এই ধ্যান পথই আমাদের জ্ঞানমার্গ।

প্লোটাইনস প্রেমভক্তিপূর্ণ ভক্তিমার্গ

এবং ধ্যান-সম্পন্ন জ্ঞানপথের কথা সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, সকলকেই চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে হইবে। বিশুদ্ধ ও পাপ-মলিনতাহীন না হইতে পারিলে, কি ভক্তি, কি ধ্যান, কোন পথেই অগ্রসর হওয়া যায় না। এতদ্দ্বারা কি আমাদের কর্ম্মযোগ পথ ইঙ্গিত হয় নাই?

প্লোটাইনস একজন নবপ্লেটোবাদী পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং প্লেটো-নির্দ্দিষ্ট মুক্তিও তাঁহার গ্রাহ্য হইয়াছিল। প্লেটোর ধ্যান ও জ্ঞান পথের পরিণাম কি, দেখুনঃ—

"This region (Heaven) is the Seat of Existence itself—Real Existence, colourless figureless and intangible Existence which is visible to the mind only, the Charioteer of the Soul (horses being two) and which forms the subject of Real Knowledge. The minds of the Gods are fed by pure knowledge and all other thoroughly well-ordered minds, contemplate for a time, this Universe of Being *per see* and are delighted and nourished by the contemplation. They contemplate knowledge—not that knowledge which has a beginning not that which exists in a subject which is any of that which we term beings, but that *knowledge* which exists in Being in general ; in which Being really Is".—*Lewes*

"সৎ ও চিদাবস্থার নামই স্বর্গ—সেই সৎ অবর্ণ, অমূর্ত্ত, এবং অস্পর্শ্য সত্তা। এই সৎ কেবল মানসগোচর—তাহা সেই চিত্তগ্রাহ্য যাহা আত্মরথের রথী—যে রথে সামান্য ও পরম জ্ঞান নামে দুই অশ্ব যোজিত আছে। যে পরমজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান; সেই জ্ঞানের বিষয় এই সৎস্বরূপ পরমাত্মা। যাঁহারা দেবত্বলাভ করেন, অথবা যাঁহাদের চিত্ত সমাহিত, তাঁহাদের চিত্ত এই নির্ম্মল জ্ঞান সুধা ধ্যানযোগে পান করিতেছে, তাঁহারাই ধ্যানে সেই সৎস্বরূপ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষণে ক্ষণে বিচরণ করেন এবং সেই আনন্দ ধামে ধ্যানস্থ হইয়া বিমলানন্দ সম্ভোগ করেন। এই ধ্যানে তাঁহারা চৈতন্যময়কে দেখিতে পান—এ চৈতন্যময় সে জ্ঞান নহে, যাহার উৎপত্তি ও লয় আছে, যে জ্ঞান, আমরা যাহাকে জীব বলি, সেই জীবে সচরাচর বিদ্যমান দেখি, কিন্তু সেই জ্ঞান, যাহা অনন্ত সৎস্বরূপে চিদ্রূপে বর্ত্তমান এবং যাহা চিদ্রূপ সত্তেরই সত্তা।"

প্লেটোর স্বর্গ ও মুক্তাবস্থা এইরূপ। তাহা আনন্দময় পরমাত্ম-সম্ভোগাবস্থা। এই মুক্তি প্লেটোর শিষ্যগণও অবশ্য স্বীকার করিতেন। সুতরাং আত্ম-সাক্ষাৎকারই নবপ্লেটোবাদে মানবের সাধন-পথের চরম সীমা রূপেই নির্দ্দিষ্ট ছিল। সাধনার প্রারম্ভে চিত্তশুদ্ধি এবং পরিণামে ব্রহ্ম-দর্শন।

গ্রীক দর্শনের আলোচনার সহিত এই মত অবশ্য জুডিয়ায় প্রচারিত হইয়াছিল। প্লেটোর শিষ্যগণ ফাইলোর স্কুলে তাহাই শিক্ষা দিতেন। বৈদিক ধর্ম্মেও পরমেশ্বর সাক্ষাৎ জ্ঞান-লব্ধ বস্তু। যীশু এই মত গ্রহণ করিয়া উপদেশ ছলে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন:—

"Blessed are the pure in heart ; for they shall *see* God".

যীশু যদিও এই ব্রহ্মদর্শনের কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এই মত তিনি সমান্য লোকমণ্ডলীর নিকট সর্ব্বদা প্রচার করেন নাই। অন্তর বিশুদ্ধ হইলে তবে ত ব্রহ্মদর্শন ঘটিবে, তিনি সচরাচর লোককে সেই শুদ্ধিপথেরই কথা বলিতেন। কিরূপে পাপমলিনতা ক্ষালন করিয়া হৃদয় বিশুদ্ধ হইতে পারে, তিনি অন্তরের সেই সরলতালাভের কথাই সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। জেলে মালা এবং অশিক্ষিত লোক লইয়া তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার ছিল, মেরী এবং মার্থারের মত স্ত্রীলোকও তাঁহার প্রধান শিষ্য মধ্যে গণ্য ছিল, সুতরাং তিনি তাঁহাদিগকে উচ্চবিষয়ে শিক্ষা কিরূপে দিবেন? দিলেই বা তাহারা গ্রহণ করিবে কেন? যাহা তাহাদের গ্রহণীয়, সেই ভগবৎ প্রেম ও ভগবৎ ভক্তিই তিনি শিক্ষা দিতেন। এই জন্য আমি বলিয়াছি, তিনি ব্রহ্মদর্শনের কথা একদা কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই কথা একদিন বলিয়া ফেলাতেই প্রমাণ হইতেছে, তিনি ফাইলো এবং নবপ্লে-

টোবাদের মতামত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্মদর্শনের কথা অনুমান হয়, বৌদ্ধমতাবলম্বী এসিনিসগণও শিক্ষা দিতেন। ইজিপ্টে Therapeut নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায় কর্ত্তৃকও তাহা প্রচারিত হইয়া থাকিবে। তাহা বোধ হয়, জন এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণেরও বিদিত ছিল। কোন প্রকারে তাহা যীশুর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। যীশু কতদূর ব্রহ্মদর্শনের সাধনতত্ত্ব অবগত ছিলেন,তাহা বলা যায় না। কারণ, সে সাধনতত্ত্ব তিনি শিক্ষা দেন নাই। তবে চিত্তশুদ্ধির উপকারিতা ও ফল কত দূর যাইতে পারে, এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত,তিনি বোধ হয় "ব্রহ্মদর্শনের" কথা পর্য্যন্তও উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। তিনি যে সকল নিম্নাধিকারী জনগণের সমক্ষে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, তাহাদের উপযোগী শিক্ষাই দিতেন। সুতরাং অন্য অধিকারের কথা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হয় নাই। নিম্নাধিকারী জনগণ অধিকতর সরল-চিত্ত, তাহাদের হৃদয় অত্যন্ত প্রশস্ত,তাহাদের স্বাভাবিক স্নেহ মমতা, দয়াদাক্ষিণ্য, প্রেম ভক্তি প্রভৃতি প্রবৃত্তি নিচয়ই প্রবলা। তাহাদের বুদ্ধি তত তীক্ষ্ণ ও মার্জ্জিত নহে। তাহাদের জ্ঞানাধিকার অতি অল্পই। সেস্থলে যে সকল কথায় প্রেম ও ভক্তি আছে,তাহাই তাহাদের চিত্তহরণ করিতে সমর্থ। ভগবৎ মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি তাহাদের যতদূর মনোজ্ঞ হইবে, চৈতন্যশক্তি ততদূর হইবে না। যীশুর জীবনচরিত পর্য্যালোচনায় দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি নিজেও কিছু সুশিক্ষিত লোক ছিলেন না,তাঁহার জ্ঞানবিকার তত প্রশস্ত ছিল না। সুতরাং সরল প্রেম ও ভক্তিপথই তাঁহার অধিকতর চিত্তহরণ করিয়াছিল। সেই ভগবৎ প্রেমই তিনি লোককে উপদেশ দিয়াছিলেন।

কিন্তু ভগবৎ প্রেমে তিনি যে একান্ত প্রমত্ত ছিলেন,এমত অনুমিত হয় না। তিনি ভক্তি পথের কেবল প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। মুখে তাহার যতদূর ভগবৎ প্রেমের কথা প্রকাশ হইত, হৃদয়ে ততদূর ছিল কি না সন্দেহ। কারণ, ঈশ্বরানুরাগে ভোর হইয়া তিনি ত তাঁহার একান্ত শরণাপন্ন হন নাই। এণ্টিপসের বিপক্ষতাচরণে জনের যতদূর ঈশ্বরানুরাগ ও শরণাসক্তির পরিচয় হইয়াছিল এবং সেই জন্য জন নিজ প্রাণদান করিতেও কাতর হয়েন নাই; যীশুর ঈশ্বরানুরাগ ও শরণাসক্তি ততদূর কই? জনের ভগবৎ শরণাসক্তি যীশু দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু যীশু এণ্টিপসের ভয়ে ভীত হইয়া প্রায় চৌদ্দ বৎসর নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। ভগবানে ততদূর অনুরাগ,আত্ম-নিবেদন ও শরণাসক্তি থাকিলে, তিনি কখন চৌদ্দ বৎসর বনবাস স্বীকার করিতেন না। কিন্তু আমরা একথার আর অধিক আলোচনা করিতে চাহি না। আমাদের প্রসঙ্গ মধ্যে যাহা আসিতে পারে, আমরা সেই পর্য্যন্তই বলিয়াছি। যীশু নিজে ভক্তিপথের পথিক হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র এবং যে ঈশ্বরানুরাগের অমৃতময় উপদেশ তিনি জন প্রভৃতি সাধকের নিকট লাভ করিয়াছিলেন, যাহা গ্রীকদার্শনিকেরা শিক্ষা দিতেন, যাহা ফাইলোর স্কুলে উপদিষ্ট হইত, তিনিও তাহা শিষ্যগণের নিকট প্রচার করিতেন এবং নিজ জীবনে তাহার পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়া তাঁহাতেই একান্ত আত্মোৎসর্গ করা অনেক অভ্যাস ও সাধনার ফল; ততদূর সাধনায় সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই যীশুর প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল।

পরবারে আমরা ফাইলোর ত্রিবাদের সহিত যীশুর ত্রিবাদ তুলনা করিয়া দেখিব।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

নীতিশিক্ষা। (৪)

গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা বিফল হইবার কারণ কি ?

যাঁহারা মিসর, গ্রীস ও রোমের জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতির সাক্ষাৎ ফল-ভোক্তা এবং যাঁহারা ইউরোপ ও আমেরিকার নবাভ্যুদিত সভ্যতার আমূল-তত্ত্বদর্শী, এমন জ্ঞানবিজ্ঞান-সম্পন্ন সদ্গুণশালী মহিমান্বিত কৃতী পুরুষেরা ভারতে একত্রিত হইয়া ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে তৎপর হইয়াছেন। আর আমরাও তিব্বত, ব্রহ্ম, সিংহল ও পারসিকদিগের দেশ-সম্বলিত বিশাল ভারতের সর্ব্ব-প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নাবশেষ লইয়া বসিয়াছি। সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন শক্তিমান্ মহাপুরুষেরা আমাদের গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। * আর আমরা—অর্থাৎ প্রাচীন সভ্যতার রসগ্রাহী অথচ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় আমরা—শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছি। আমাদের যে নীতি ও ধর্ম্মের শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা, তাহা কৃত্রিম বা মৌখিক নহে। উহার অভাবে আমাদের জাতিত্ব ধ্বংস হইতেছে,—আমরা প্রাণে মারা যাইতে বসিয়াছি। অতএব শুষ্কতালু মৃগ যেমন জল অন্বেষণ করে, সেইরূপ আমরা নীতি ও ধর্ম্মের নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছি। শিক্ষার্থীত্ব বা শিষ্যত্বপক্ষে আরও একটী দ্রষ্টব্য এই যে, আমাদের উক্ত আগ্রহও কেবল নাম-মাত্র অথবা একান্ত চেষ্টাশূন্য নহে। আমরা এখনো অন্ন, বস্ত্র, তৈজস, গো, হিরণ্য প্রভৃতি লোকের সাক্ষাৎ হিতকর দ্রব্য দান পূর্ব্বক সজ্ঞানে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিতে করিতে মরিতে চাই ; এবং সন্তানদিগকে সেইরূপে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত গর্ভাষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম হইতে তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত করিয়া থাকি। এমন গুণান্বিত গুরু ও এমন লক্ষণযুক্ত শিষ্যের সংযোগেও ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা হইল না। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট এমন অনুকূল শিষ্যগণের গভীর অভাব বা ঐকান্তিক প্রার্থনা পূরণ করিতে কেন অক্ষম হইলেন ? কেন তাঁহাদের সর্ব্ববিষয়িণী অমোঘ চেষ্টা এই বিষয়ে বিফল হইল ? ইহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বের আলোচনাতেই যাহা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে উক্ত কারণ সংক্ষিপ্তরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। আমরা বলিয়াছি—(১) গবর্ণমেণ্ট অযোগ্য উপায় সকল অবলম্বন করিয়াছিলেন ; (২) গবর্ণমেণ্ট ও রাজকর্ম্মচারীগণ সর্ব্বান্তঃকরণে কিছু করিতে পারেন নাই ; (৩) তাঁহারা প্রতিভূ দ্বারা প্রকৃতার্থ সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিফলতার এই কারণগুলি বিবৃত করিয়া দেখাইতেছি।

গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশনগণের অভিপ্রায়ের সহিত আত্ম অভিপ্রায় সম্মিলিত করিয়া যে সকল উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা এই :—

---

* ইংরাজ রাজ-পুরুষেরা যখন আমাদের সংস্কৃত ভাষাকে অস্কৃত করিয়া ইংরাজী দ্বারা আমাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন সেই ইংরাজী ভাষার গঠনকারী ইংরাজেরা আমাদের সর্ব্ব শিক্ষার নিয়ন্তা হইবেন বৈ কি ? গবর্ণমেণ্টও বলিয়াছেন,—

"Western education, if persevered in, must in time bring with it, Western principles of discipline and self-control'."

—*Sup. Gazette India, January 7, 1888.*

(১) সকল স্কুল ও কলেজের মধ্যে নিয়মের সমতা রক্ষা।

(২) শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা।

(৩) নীতি ও চরিত্র যুক্ত উত্তম শিক্ষক প্রস্তুত করা।

(৪) নীতির বিরুদ্ধাচরণের দণ্ডবিধান।

(৫) ছাত্রগণের চরিত্রের দোষগুণ লিপিবদ্ধ করা।

(৬) হোষ্টেল ও বোর্ডিং স্থাপন।

(৭) মনিটর (monitor) নিয়োগ।

(৮) এক এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার উর্দ্ধতম বয়স নির্দ্ধারণ।

(৯) সাধারণ ধর্ম্মমূলে নীতিগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচলন করা।

(১০) স্কুলের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে ধর্ম্ম ও নীতির উপদেশ দান।

এই দশ উপায়-ব্যবস্থার তাৎপর্য্য ও ফলাফল আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথম ব্যবস্থার অভিপ্রায় এই যে, বিদ্যালয়ে শাসনের স্থিরতা থাকে। ছাত্রগণ নানা ছলে এক স্কুল হইতে অন্য স্কুলে যাইতে না পারে। এবং বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া সর্ব্ব স্কুলের ছাত্রদিগের সুশিক্ষা ও সুনীতিপালনের দিকে দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু ফলে এই মাত্র হইয়াছে যে,এক স্কুলের ছাত্রকে অন্য স্কুলে যাইতে হইলে পূর্ব্ব স্কুলের অধ্যক্ষের নিকট অনুমতি পত্র লইতে হয়। তাহাতে সেই স্কুলের প্রাপ্য বেতন আদায় হইয়া যায় এবং ছাত্রকে দ্বিতীয় স্কুলেও পূর্ব্ব স্কুলের সমান শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে হয়।

দ্বিতীয় ব্যবস্থায় ছাত্রগণ মুদ্গর বা অন্য ব্যায়াম-কাণ্ডে আপনাদের শারীরিক বল নিয়োগ করে; কিন্তু আত্মরক্ষা বা সাংসারিক কর্ম্মের পক্ষে তাহাদের কোন নৈপুণ্য বা অভ্যাস জন্মিতেছে, এমন চিহ্ন দেখাইতে পারে না। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" এই তত্ত্বের প্রতি আহাদের দৃক্‌পাতও হয় না।

তৃতীয় ব্যবস্থা অর্থাৎ উত্তম শিক্ষক নিয়োগ করার কথা নানা প্রকারে পরিব্যক্ত হইয়াছে। নীতিশিক্ষা পক্ষে মুখের উপদেশ অপেক্ষা চরিত্রের উদাহরণই অধিক কার্য্যকারী। অতএব উত্তম শিক্ষকের নিয়োগ নিমিত্ত বিবিধ প্ররোচনা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও বিবেচিত হইয়াছে যে, এদেশে উপযুক্ত শিক্ষক যদি না মিলে, তবে ইংলণ্ড হইতে শিক্ষক আনাইয়া তাহার আদর্শে এ দেশে শিক্ষক প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কারণ, English standard of discipline অর্থাৎ ইংরাজ আদর্শেই নীতি-চরিত্র শিক্ষা দেওয়া অভিপ্রেত।

চতুর্থ ব্যবস্থায় দণ্ডের বিধান এই হইয়াছে যে,এক এক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তত্রত্য অপরাপর শিক্ষকগণের সহিত প্রতি সপ্তাহে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া দণ্ডের নিয়ম অবধারণ করিবেন। অধ্যাপক (প্রোফেসর) দিগের হস্তে অল্পদণ্ড অর্থাৎ সস্‌পেণ্ড করার ক্ষমতা থাকিবে। প্রিন্সিপাল বা হেড মাষ্টার কোন ছাত্রকে অত্যধিক দোষী বা শাসনের বহির্ভূত বিবেচনা করিলে,তাহাকে একবারে স্কুল হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্ট এদেশের প্রাচীন কালের ছাত্র-শাসন প্রণালীর নিন্দা করিয়াছেন; অথচ বেত্রাঘাতাদি-বিরহিত কোন নূতন কার্য্যকারী বিধি প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই। অর্থদণ্ড করিলেও, ছাত্রের পরিবর্ত্তে তাহার পিতার দণ্ড করা হয়। এই সকল সঙ্কট দেখিয়া শেষে, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত,স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট নিরস্ত হইয়াছেন।

পঞ্চম ব্যবস্থার অভিপ্রায় এই যে, ছাত্রগণের চেষ্টা হইবে, যেন দাগী দুষ্ট না হইতে হয়। এই ব্যবস্থা অনুসারে এক্ষণে অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্রের পড়ার নম্বরের ন্যায় চরিত্রেরও নম্বর রাখা হইতেছে। তাহাতে দেখা যায়, ছাত্র ও শিক্ষকে ন্যায়ান্যায়ের বিচার ও নম্বর টানাটানি চলিয়া থাকে। বিদ্যালয় হইতে এই নম্বর বা উত্তম-মধ্যমাদির মার্ক্ণা না পাইলেও ছাত্রের পিতা তাঁহার পুত্রের অপর সপ্ত প্রহরের ব্যবহার দেখিয়া চরিত্র জানিতে না পারেন, এমন নহে।

ষষ্ঠ ব্যবস্থা মতে হোষ্টেল বা বোর্ডিং প্রকরণে পল্লী গ্রামের ছাত্রদিগকে আশ্রয় দিলে তাহারা নগরের সঙ্কট বা সংসর্গ-দোষ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। আর, তেমন স্থলে সুশাসন প্রচলিত রাখার সুবিধা হইবার সম্ভাবনা অনেক থাকে। কিন্তু সাধারণ লোক তজ্জন্য অর্থানুকূল্য না করিলে তাহা সংসাধিত হইতে পারে না। অতএব তাহার কোন অনুষ্ঠান হইতে পারিল না।

সপ্তম ব্যবস্থাটী বোধ হয় ইংলণ্ডীয় বা আয়র্লণ্ডীয়। আমরা ইহার ঠিক ভাব পাই না। অতএব এ ব্যবস্থার বিশেষ উপকারিতাও বুঝিতে পারি না। পরন্তু সহপাঠীগণের এক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে কেহ সর্দ্দার হইয়া শাসন প্রয়োগ করিবে, অথবা শিক্ষকের নিকট চর অর্থাৎ গোয়েন্দা হইয়া অপরের গুপ্ত দোষ প্রকাশ করিয়া দিবে, এই ব্যবস্থা থাকিলে ছাত্রগণের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃ ভাবের বিষম ব্যাঘাত হয়। ইহার উদাহরণ আমরা ছাত্রাবস্থায় কতক কতক দেখিয়াছি। ১৮১৮ অব্দে প্রাতঃস্মরণীয় হেয়ার সাহেব যখন নানা প্রকারের কতকগুলি বিদ্যালয়ের পত্তন করেন, তখন সেই সেই প্রকারের শিক্ষক প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু মনিটর নিয়োগের চেষ্টা হয় নাই। মিশনরিদিগের প্রতিষ্ঠিত বোর্ডিং সমন্বিত নানা প্রকারের বিদ্যালয়ের মধ্যে মনিটর নিয়োগ প্রথা কতক পরিমাণে ছিল। কিন্তু তাহা সুফলপ্রদ হয় নাই। *

অষ্টম ব্যবস্থার তাৎপর্য্য এই যে, উন্নতিশীল অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগের সহিত উন্নতিহীন অধিক বয়স্ক ছাত্র একত্রে না থাকে; অর্থাৎ জড়বুদ্ধি বা দুষ্টমতি বয়স্থ ছাত্রেরা এক শ্রেণীতে অধিক দিন থাকিয়া সেই শ্রেণীর নব-প্রবিষ্ট সুকুমারমতি উন্নতিশীল ছাত্রদিগকে সংসর্গদোষে নষ্ট না করে। এই অভিপ্রায়ে এই ব্যবস্থা হইয়াছে যে, উচ্চতর শ্রেণীতে উঠিবার অযোগ্য হইয়া এক ছাত্র এক শ্রেণীতে অধিক কাল থাকিতে পাইবে না।

নবম ব্যবস্থা অর্থাৎ নীতি-গ্রন্থ প্রণয়নের কথা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে সবিস্তারে সমালোচনা করিয়াছি। অতএব এ স্থলে তাহার পুনরুক্তি করিলাম না।

দশম ব্যবস্থার তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকার নিয়ম, দৃঢ় রূপে পালন করা হয়; অথচ ভিতরে ভিতরে ধর্ম্ম শিক্ষা চলিতে থাকে। স্কুলের কার্য্যে কঠিন পরিশ্রম করিয়া শিক্ষক স্কুলের পরে আবার ধর্ম্মোপদেশ দিবেন, এবং ক্লান্ত ছাত্রগণ তাহা নিবিষ্টচিত্তে শুনিয়া ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা করিবে,—ইহা কর্ত্তৃপক্ষের নিতান্ত গরজের কথা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কোন শিক্ষক একান্ত ধর্ম্মানুরাগী হইলে তিনি রবিবারে বা অন্য ছুটীর দিনে স্কুলে আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু ছাত্রগণ আবার

* The Pupil Teacher system.—I. Missionary Manual p. 434.

তেমনি ধর্ম্মানুরাগী না হইলে সে উপদেশ শুনিতে আসিবে না।

এই সকল ব্যবস্থার মর্ম্ম প্রণিধান করিয়া দেখিলে কি ইহা প্রতীতি হয় না যে, নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া যেরূপ গুরুতর কার্য্য, উক্ত ব্যবস্থাগুলি তাহার পক্ষে উপযুক্ত উপায় নহে? কোন কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে, অমুক অমুক দেশে উহা প্রবর্ত্তিত আছে। পরন্তু তাহা সম্যক্ ফলপ্রদ নয় বলিয়াই বঙ্গদেশে, কি শিক্ষক, কি ছাত্র, কেহই তৎপ্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয় নাই এবং এখনও হইল না।

উক্ত উপায়গুলির অযোগ্যতা বা অকিঞ্চিৎকরত্ব হেতু গবর্ণমেণ্ট স্কুল ও কলেজের হেড মাষ্টার, প্রিন্সিপাল ও ইন্‌স্পেক্টরদিগের যত্নের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর রাখিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের উক্তি এইঃ—

"The provision of good teachers is of the greatest importance to the well-being of the country, and the signal successes which in India have attended the instruction and training imparted by many devoted and accomplished teachers, whose names it is unnecessary to mention, prove that the school can be made a no less effectual nursery of morality than of mere literary knowledge."

অর্থাৎ উত্তম শিক্ষকের নিয়োগ দ্বারাই এ দেশের মঙ্গলোন্নতি হইবে। ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মনিষ্ঠ সুদক্ষ শিক্ষকগণ যে শিক্ষা ও সদুপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারা ফলিতার্থে এ দেশে জ্ঞানোন্নতির সহিত নীতিরও উন্নতি অল্প হয় নাই।

ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার প্রতি আগ্রহাতিশয় প্রযুক্ত গবর্ণমেণ্ট আরো বলিয়াছেনঃ—

"In the truest interests of education the cost of providing thoroughly good training Schools and Colleges for teachers of English as well as of vernacular schools should be regarded as a first charge in the educational grant; and that any province, which is now unprovided with institutions suitable for the effectual training of the various classes of teachers required, should take measures by retrenchment, if necessary, to establish the requisite training institutions."

অর্থাৎ স্কুল ও কলেজে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় সুশিক্ষিত নীতিমান্ সুনিপুণ শিক্ষক প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে অর্থ প্রয়োজন হয়, তৎপক্ষেই গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগ-নির্দ্দিষ্ট টাকা অগ্রে ব্যয় হওয়া উচিত। কারণ, শিক্ষা-বিভাগের কার্য্যের উহাই উৎকৃষ্ট ফল। আর, যে প্রদেশে তাদৃশ (ট্রেনিং) বিদ্যালয় নাই, তথাকার অন্যান্য ব্যয় কমাইয়া এই বিষয়ে সেই অর্থ নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বাপেক্ষা ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়দিগের উপর গবর্ণমেণ্টের দাবী অধিক। অভিপ্রায় এই যে, স্কুলের শিক্ষক বা কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিবর্গ প্রস্তাবিত বিষয়ে কিছু না করিলে ইন্‌স্পেক্টরদিগের দ্বারা সর্ব্বার্থ সাধন করিয়া লইবেন। শিক্ষা কমিশনগণের উক্তি ধরিয়া গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেনঃ—

"I am to observe that no duty should be performed by Inspecting officers with greater care and thoroughness than the duty of seeing that the teaching and discipline in the school is "calculated to exert a right influence on the manners, the conduct, and the character of the children."

ইহার তাৎপর্য্য এইঃ—যে শিক্ষা ও অভ্যাস ছাত্রগণের রীতি, নীতি ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন পক্ষে সাহায্যকারী হয়, বিদ্যালয়ে সেইরূপ শিক্ষা ও অভ্যাস হইতেছে কি না, ইন্‌স্পেক্টর এই বিষয় যেমন সর্ব্ব প্রযত্নে ও সর্ব্বাংশে মনোযোগ দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তদপেক্ষা তাঁহার অধিক যত্ন ও মনোযোগের কার্য্য আর নাই।

কিন্তু ইন্‌স্পেক্টরগণই বা কি করিবেন? তাঁহারা ছাত্রদিগের ধর্ম্ম সম্পর্কে একটী কথা

বলিতে পারিবেন না, এমনি ব্যবস্থা। অথচ ধর্ম্মের নাম না করিয়া, ঈশ্বরের নিকট দায়ীত্ব না দেখাইয়া, কে মনুষ্যকে কর্ত্তব্য-পথে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারে? তৎপক্ষে গবর্ণমেণ্ট আবার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর প্রতি দৃষ্টি করিলেন। শিক্ষা কমিশনের সহিত একবাক্যে গবর্ণমেণ্টও বলিলেন,—ধর্ম্ম শিক্ষা এবং এইরূপ আর যাহা যাহা স্থানীয় প্রয়োজন হয়, তাহার উপযোগী শিক্ষা দিবার জন্যই তো ডিষ্ট্রীকৃট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর হস্তে বিদ্যালয় সকল পৃথক্ রূপে স্থাপন করা হইয়াছে। অতএব ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার সুসাধনার নিমিত্ত ঐ দুই সভার যত্ন ও চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক।

"This is, I am to add, a phase of the educational question to which the attention of Local Boards and Municipal Committees, who are now entrusted with responsible functions in educational matters should be specially invited."

এইরূপে গবর্ণমেণ্ট নিজের ব্যবস্থায় এ দেশীয় ছাত্রবর্গের নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার উপায় ও তদনুযায়ী বিধি নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া, শেষে হেডমাষ্টার, প্রিন্সিপাল, ইন্স্পেক্টর ও ডিষ্ট্রীকৃট বোর্ড প্রভৃতি রাজকীয় মর্য্যাদাধারী কর্ম্মকর্ত্তাদিগের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিলেন। পরিশেষে তাহাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধির অসম্ভাবনা দেখিয়া দেশীয় ভদ্রলোকদিগকে ধরিয়া বলিলেনঃ—

"আমরা কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছি না, কেবল কতকগুলি উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব করিতেছি। যাহাতে এ দেশের বিদ্যালয় সমূহের কার্য্য প্রণালী ফলোপধায়ী হয়, সকলে বিবেচনা করিয়া সেইরূপ ব্যবস্থা করুন।"

"In any event we may hope that, by merely bringing this great educational difficulty to notice, the leaders of native society will realize how closely the interests of all that is best in that society are bound up with its younger representatives. They will, doubtless, bear in mind the saying that the future of a nation depends upon its young men, and will bring all their influence to bear to support the Government in the attempt to render school education a fitter and fuller training for public duties."

—*Sup. to the Gazette of India, Jay. 7, 1888.*

অর্থাৎ—"যেমনই হউক, আমাদের পরিব্যক্ত শিক্ষা সংক্রান্ত এই কঠিন সমস্যা গোচর করিলাম। দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিবেন, তাঁহাদের সমাজের সর্ব্ব শ্রেয়ঃ তাঁহাদের যুবা প্রতিনিধিগণের সহিত কেমন সংবদ্ধ রহিয়াছে। একএক জাতির ভাবী মঙ্গল সেই জাতির নব যুবকদিগের উপর নির্ভর করে। আমরা আশা করি, উপরোক্ত কারণে তাঁহারা তাঁহাদের সকল শক্তি-সমর্থ্যের সহিত গবর্ণমেণ্টের চেষ্টার এমন সাহায্য করিবেন, যেন স্কুলের ছাত্রগণ সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্যকর্ম্মে অধিকতর ও উৎকৃষ্টতর যোগ্যতা লাভ করিতে পারে।"

আমরা গবর্ণমেণ্টের বিফলপ্রযত্ন হইবার আর এক কারণ এই অনুধাবন করিয়াছি যে, গবর্ণমেণ্ট ও রাজকর্ম্মচারীগণ এ বিষয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করেন নাই।

গবর্ণমেণ্টের যে সকল কথা আমরা উপরে উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে প্রতীতি হইবে যে, এদেশে নীতি ও ধর্ম্মের শিক্ষা প্রচার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের যৎপরোনাস্তি আগ্রহ জন্মিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তন্মধ্যে অনিশ্চিত প্রত্যয় ও নিরাশার লক্ষণও উপলব্ধ হয়।

ইতিপূর্ব্বে শিক্ষা কমিশনগণ কিঞ্চিদূন দ্বিশত সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য বা তাঁহাদের কৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের উক্তি ধরিয়া আপনাদের যে বিভিন্ন মত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্টের তাহা বিশিষ্ট রূপ গোচর ছিল। আর স্কুল সকলের প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কগণের অভিপ্রায়ও তাঁহাদের সম্যক্ বিদিত ছিল।

উক্ত কর্ম্মচারীগণের সিদ্ধান্ত এই যে, বর্ত্তমান অবস্থায় এদেশে নীতি ও ধর্ম্মের শিক্ষা দুর্ঘট। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের চেষ্টাও "যথাসম্ভব" লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছিল।

শিক্ষা-কমিশন-সভায় যখন সাধারণ-ধর্ম্ম-মূলক নীতি-গ্রন্থ প্রণয়নের আলোচনা হয়, তখন তাঁহারা বলিয়া রাখিয়াছিলেন :—

"The argument in opposition were to the effect that moral teaching is out of place, and likely to fail in its purpose, at a time of life when the obligation of duty is thoroughly known, and when the chief requirement is not to inform the conscience but train the will."

অর্থাৎ—"পুস্তক ধরিয়া নীতিশিক্ষা দিবার বিরুদ্ধ-বাদীরা বলেন যে, এই চেষ্টা এদেশের যোগ্য নয় ; ইহ প্রায় বিফল হইবে। কারণ ভবিষ্যতে লোকের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ সময়ে কর্ত্তব্য জ্ঞানের অভাব হইবে না ; তখন বিবেক বুদ্ধি জাগরিত থাকিবে, কিন্তু ইচ্ছার বেগ ফিরাইবে কে ?"

উক্ত শিক্ষাকমিশন সভায় প্রস্তাব হয় যে, কলেজের প্রিন্সিপাল অথবা অন্য কোন অধ্যাপক প্রতিবৎসর কলেজের প্রত্যেক শ্রেণীতে "মনুষ্য সাধারণের এবং নগরবাসীর কর্ত্তব্য" এই বিষয়ে এক প্রস্থ উপদেশ (লেক্‌চর) দিবেন। এই প্রস্তাবে উক্ত সভার সকল সভ্যের সম্মতি হইল। কিন্তু—

"The fear was expressed that there would be a danger of such lectures being delivered in a perfunctory manner in case of those Professors who felt that they had no aptitude for the work." *

অর্থাৎ আশঙ্কা রহিল যে, যে অধ্যাপকের এই বিষয়ে স্বাভাবিক তৎপরতা নাই, তিনি ইহা অনিচ্ছা পূর্ব্বক কেবল দায়-উদ্ধার-বৎ নির্ব্বাহ করিবেন।

মিশনরি বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল বা কর্ত্তৃপক্ষীয় মিশনরিগণ উক্তরূপ উপদেশ দানে তৎপর ও নিপুণ বটেন। কিন্তু তাঁহাদের কিম্বা অপর খ্রীষ্টান রাজ-কর্ম্মচারীদিগের এবম্বিধ নীতি-উপদেশ যে সর্ব্বান্তঃকরণ-প্রসূত হইবে, তাহা কদাপি সম্ভব নহে। কারণ, তাঁহারা জানিতেছেন যে, খ্রীষ্ট-বিহীন ধর্ম্মকথা ধর্ম্ম-কথাই নহে ; আর এই অখ্রীষ্টানগণ অনন্ত নরকের দ্বারে বসিয়া আছে, কেবল নীতি পালন দ্বারা ইহাদের কি রক্ষা হইবে ?

বস্তুতঃ এই সকল কারণেই গবর্ণমেণ্টের এমন জ্বলন্ত উৎসাহ বাক্যে ও বিবিধ প্ররোচনাতেও কেহ প্রস্তাবিত গ্রন্থ প্রণয়ন বা বার্ষিক উপদেশ দান পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন না।

গবর্ণমেণ্ট শেষে বলিয়াছিলেন :—বিদ্যালয়ে নীতি ও ধর্ম্মের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা কঠিন বটে। কিন্তু সেই কাঠিন্য পরিহারের জন্য সমুচিত চেষ্টা হয় নাই।

"And until failure follows an earnest effort at imparting moral instruction in colleges, the Government of India is unwilling to admit that success may not be secured."

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত এ বিষয়ে ঐকান্তিক রূপে কৃপা যত্ন বিফল না হয়, সে পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন যে, এ দেশের বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার প্রচলন হইতে পারে না।

এই সকল উৎসাহ-প্রোজ্জ্বল উক্তির পরে গবর্ণমেণ্ট স্বীয় আন্তরিক সংশয় প্রযুক্ত নিজেই নিরস্ত হইয়া পড়িলেন। সুতরাং earnest effort এর পত্তনই হইল না।

আর একটী কথা বলিতে অবশিষ্ট আছে। নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের চেষ্টার বিফলতার তৃতীয় কারণ আমরা এই অনুধাবন করিয়াছি যে, প্রতিভূ দ্বারা প্রকৃতার্থের সাধন হয় না। ইহার মধ্যে অনেক কথা আছে। তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষাবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের

* Report of the Education Commission. --page 307.

প্রস্তাবিত যে দশ প্রকার উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এক উপায়, এক পাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন। দ্বিতীয়, বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ দ্বারা উক্ত গ্রন্থের অধ্যাপনা বা উপদেশ। এই দুইটী উপায় প্রধান। অপরগুলি অবান্তর মাত্র। এই দুইটী উপায়ের সাধক কে? পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, দুইজন খ্রীষ্টীয় পাদরি (বিশপ) গ্রন্থ প্রণয়নের ভার লইয়াছিলেন। আর, বিলাতের আদর্শ-শিক্ষক, বা সেই আদর্শে প্রস্তুত এখানকার দেশীয় শিক্ষক তাহার অধ্যাপনা করিবেন, এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহাকেই আমরা প্রতিভু দ্বারা প্রকৃতার্থ সাধনের চেষ্টা বলি।

মূল প্রস্তাব এই যে, সার্ব্বভৌমিক ও স্বাভাবিক ধর্ম্মের মূলে নীতি ও ধর্ম্মের শিক্ষা দেওয়া হইবে। এস্থলে প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, এ ধর্ম্মের শিক্ষক বা গ্রন্থ-প্রণেতা কে হইতে পারেন? যাঁহারা revealed religion অর্থাৎ দেবাদিষ্ট ধর্ম্মের ভক্ত, তাঁহারা কেমন করিয়া natural and universal religion অর্থাৎ স্বাভাবিক ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিবেন, তাহা বুঝা দুষ্কর।

দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা ঈশ্বর-প্রদত্ত একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা সে ধর্ম্মগ্রন্থকে পশ্চাতে রাখিয়া কাহার কথা ধরিয়া নূতন গ্রন্থ সঙ্কলন করিবেন? সে গ্রন্থের মর্য্যাদা কি হইবে? সে গ্রন্থ ধর্ম্ম বিবেক (conscience) জাগরিত রাখিতে পরে, কিন্তু প্রবৃত্তিকে (will) নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে কি? নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা পক্ষে উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক কার্য্যকারী, ইহা নানা প্রকারে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যে গ্রন্থে ঈশ্বর ও ঈশ্বর-পরায়ণ সাধুদিগের দৃষ্টান্ত সর্ব্বোপরি জাজ্জ্যমান, সেই গ্রন্থ এই বিষয়ে যথার্থ উপযোগী। তদনুযায়ী শিক্ষাই মনুষ্যকে সকল পার্থিব সঙ্কটের মধ্যে আজীবন কর্ত্তব্য পথে অটল রাখিতে পারে।

আমাদের প্রত্যয় এই যে, যাঁহারা যোগী ও তপস্বী, যাঁহারা ধ্যানচিন্তাপরায়ণ, যাঁহারা সংসারের দুর্গতি জানিয়া ঈশ্বরের নিকট দিনে নিশীথে একান্তমনে প্রার্থনা করিয়া লোকহিত জানিতে পারিয়াছেন, এবং নিঃস্বার্থে তদনুযায়ী উপদেশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার নিমিত্ত সেই যোগী ও তপস্বীদিগের বাক্য আবশ্যক; যে হেতু, সেই উপদেশের সঙ্গে উক্ত মহাপুরুষদিগের চরিতাদর্শ আমাদের সম্মুখে বিধৃত হইয়া থাকে। আর, যাঁহারা উক্ত ধর্ম্মবক্তাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তি করেন, এবং আপনাদিগকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সেই ধর্ম্মবক্তাদিগের কথাই কহিয়া থাকেন, তাঁহারাই উক্ত উপদেশ বাক্যের বক্তা, পাঠক, বা ব্যাখ্যাতা হইতে পারেন।

এস্থলে কেহ বলিবেন, তবে কি মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও বশিষ্ঠাদি ঋষির বাক্য ভিন্ন আর কিছুতে নীতি শিক্ষা হইতে পারে না? আমরা বলি, তাহা কেন? যীশুখ্রীষ্ট ও পৌল প্রভৃতির বাক্যও উত্তম নীতি-পথ-প্রদর্শক। আমরা শুনিতেছি, সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ডফ্ যখন বাইবেলোক্ত প্রথম করিন্থীয় পত্রের ত্রয়োদশ অধ্যায় পাঠ করেন, তাহা শুনিয়াই এক দল হিন্দু যুবা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে আস্থাবান্ হয়েন।

"প্রেম চিরসহিষ্ণু ও মধুর; প্রেম ঈর্ষা করে না, প্রেম আত্মশ্লাঘা করে না, গর্ব্বিত হয় না, অশিষ্টাচরণ করে না, স্বার্থ চেষ্টা করে না, আশু ক্রোধ করে না, অপকার গণনা করে না, অধার্ম্মিক তাতে আনন্দিত না হইয়া সত্যের সহিত আনন্দ করে; সকলই বহন,

করে, সকলই বিশ্বাস করে, সকলই প্রত্যাশা করে, সকলই ধৈর্য্য পূর্ব্বক সহ্য করে।"

আহা! এই যদি খ্রীষ্টধর্ম্ম হয়, তবে প্রার্থনা করি, অচিরাৎ সমস্ত ভারতবাসী খ্রীষ্টান হউন।

খ্রীষ্টীয় পাদরিগণ আপনাদিগকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ঐ উৎকৃষ্ট নীতি আদর্শ এবং তাহার বক্তা সাধু পৌলের চরিত্র আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ধারণ করুন, আমাদের হৃদয়ের সকল গ্রন্থি ভেদ করিয়া উক্ত ধর্ম্মাদর্শ তাহাতে প্রবিষ্ট হইবে।

হিন্দুদিগের মধ্যেও যাঁহারা ধর্ম্মনিষ্ঠ, জ্ঞানবান এবং আচার-পূত, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দান জন্য নিয়োগ করা হউক। তাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রোক্ত যোগী ও তপস্বীগণের সেবিত নীতি ও ধর্ম্মের উপদেশ দিলে মনুষ্যের অন্তঃকরণ তন্ময় হইয়া যাইবে।

ইতি পূর্ব্বে বঙ্গদেশের জ্ঞানবান স্বধর্ম্মনিরত হিন্দুগণ উক্ত প্রকারে, ফারসী ও সংস্কৃত, উভয় ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থ দ্বারা পুণ্যশীল মহাত্মাগণের সাধু চরিত্রের অনুধ্যান করিতেন। এক এক প্রকৃত হিন্দু বিদ্বান্ ব্যক্তির গৃহে ঐরূপ শত শত গ্রন্থ এখনো তাঁহার উদার ধর্ম্মভাবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এই সকল মূল গ্রন্থের অনুবাদিত, লোক পরম্পরায় প্রচলিত ও ব্যাখ্যাত এবং অনেক অংশে বিতথাভূত ভাব লইয়া যাঁহারা নূতন গ্রন্থ রচনা করিবেন,—আপনারা ক্ষুদ্র ও মলিন হইয়াও ধর্ম্মবক্তার পদারূঢ় হইবেন;—এবং ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া এক এক দেশের বা জাতির উদ্ধার সাধনের গৌরব করিবেন; তাঁহাদের প্রভাব-মুখরিত কথায় সদ্য মন পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা যাবজ্জীবনের নিমিত্ত ধ্রুবা নীতি ও নিত্য ধর্ম্ম সঞ্চিত হইবে না।

উক্তরূপ গ্রন্থ ও তাহার উক্তরূপ বৈষয়িক (secular) অধ্যাপককে প্রকৃত ধর্ম্ম গ্রন্থের ও ধর্ম্মোপদেষ্টার 'প্রতিভূ' বলি। তাঁহাদের দ্বারা নীতি ও ধর্ম্মোপদেশের সর্ব্বাঙ্গীন ফল লাভ হইতে পারে না।

শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশনগণও প্রস্তাবিত গ্রন্থ ও তাহার উপদেষ্টার সম্বন্ধে নানা সংশয়াবিষ্ট হইয়া ভগ্ন মনে কয়েকটী আপত্তি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। সেই 'প্রতিভূর' অবলম্বনে প্রকৃত কার্য্য সাধন না হওয়াতে, গবর্ণমেণ্টের জ্বলন্ত উৎসাহ এবং ঐকান্তিক আগ্রহ কাজেই ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িল।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

"বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে ?"

তোমরা কি কেহ বল্‌তে পার—ম'লে কি হয়? মনে করি কথাটা মনে আনিব না। এ বিভীষিকাময় কথাটা মনে এনে আর জ্বালার উপর বিষম জ্বালা দিয়া প্রাণটাকে জ্বালাইব না। একেত সারাটা জীবন কেবল দুঃখের ভরাই বহিতেছি। সংসার-পথে যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই কেবল যন্ত্রণার শিকল বাড়িয়াই যাইতেছে। তাহার উপর আবার ভবিষ্যতের দুঃখের বোঝা চাপাই কেন? যে ক দিন বেঁচে থাকা যায়, হেঁসে খেলে একরূপে কাটাইয়া দেওয়াই ভাল।

কিন্তু তা পারি কই? সময় নাই, অসময় নাই, কথাটা দুপ্ করিয়া অজ্ঞাতসারে কোথা হইতে আসিয়া মনের উপর আঘাত করে।

এই ত আমোদ আহ্লাদ করিতেছিলাম। দু পাঁচ জন বন্ধুতে মিলিয়া—দুঃখের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়া, হেসে খেলে সময় কাটাইতেছিলাম। এমন সময় কোথা হইতে মৃদু-সঞ্চারী পবন, পেচকের অমঙ্গল ধ্বনির ন্যায়, কি এক বিকট শব্দ বহিয়া আনিল—'হরিবোল'! এ ত সে হরিবোল নহে—যাহাতে ভক্তের তাপিত প্রাণ শীতল হয়, আর্ত্তের প্রাণে অমিয়া ঢালিয়া দেয়। ইহা ত ভাবময় নহে। এ যে দারুণ অভাবব্যঞ্জক। কে যেন ছিল, সে যেন নাই—কে যেন যাইতেছে, সে যেন আর আসিবে না—কে যেন যাইতে যাইতে আমায় অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া ডাকিতেছে। এ 'হরিবোল' বুঝি সেই ডাকের—সেই মহাকালের মহা আহ্বানের অনুসূচনা মাত্র। ইহা যেন বর্ত্তমানকে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া—অতীতের অনন্ত সাগরে ডুবাইয়া দিয়া—তাহার উপর ভবিষ্যতের দুর্ভেদ্য কুহেলিকা আরবণ বিছাইয়া দিতেছে। এ হরিবোল মহাকালের মহাতুর্য্য নিনাদ—কালের ভৈরব বিজয় হুঙ্কার।

তখন প্রাণের মধ্যে একরূপ বিকট নৈরাশ্যের বাতাস বহিয়া গেল। প্রেতিনীর বিষম হাঁসির তরঙ্গ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁপাইয়া, কাণের মধ্যদিয়া আমার মরমে পশিল। বুকটা দুড়্ দুড়্ করিয়া উঠিল। তখন আমার হাসির হিল্লোল কোথায় মিশিয়া গেল। আনন্দের উৎস শুকাইয়া গেল। মনটা সেই হরিধ্বনির পিছু পিছু উধাও হইয়া চলিল। তখন অজ্ঞাতসারে ভাবনা আসিল, যাহারা মরে—তাহারা কোথায় যায়? আমিও মরিব। কিন্তু মরিয়া কোথায় যাব? ঐরূপ হরিবোলের সহিত আমায় কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যে পাঠাইবে! একটু সামান্য অন্ধকারে ভয় পাই, আঁধার নিশিতে চারিদিকে বিভীষিকা বোধ হয়, বাহির হইতে ভয় হয়। আমি সে অনন্ত অন্ধকারে কোথায় যাব? কেমন করিয়া যাব? তাই ত মরণে এত ভয়! যদি মরিলে কি হয়, জানিতাম, তবে কি ভয় থাকিত? কতক্ষণ পরে, জানিনা—আমার সংজ্ঞা হইল। মনে করিলাম, কেন মিছে আর ভাবি। যাহার ভাবিয়া একটা মীমাংসা হয় না—এ পর্য্যন্ত যাহার কোন মীমাংসা করিতে পারিলাম না, তাহার জন্য আবার ভাবনা আসে কেন? আমি কতবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এ মরণের কথা—এ অমঙ্গলের কথা, আর ভাবিব না। তবু আবার এ ভাবনা আসে কেন? তখন "দূর হউক" বলিয়া, মনটার লাগাম বড় জোর করিয়া টনিয়া ফিরাইয়া আবার বন্ধুগণের আনন্দ উৎসবে যোগ দিলাম।

কিন্তু হায় সব বৃথা হইল। আবার এ কি শুনিলাম! এযে হৃদয়-বিদারক দারুণ ক্রন্দনের রোল। আহা, অভাগিনী জননী তাহার প্রাণের প্রাণ, জীবনের অবলম্বন, নয়নের আলোক, অন্তরের স্মৃতি, সংসার-সাগরের সুখ-তারা, তাহার সর্ব্বস্ব-ধন একমাত্র পুত্রকে অতি নিষ্ঠুর নির্দ্দয় সর্ব্বগ্রাসী ভয়ানক কালের দ্রংষ্ট্রাকরাল কালানলসন্নিভ বিশাল বদনে বিচূর্ণিত হইতে দেখিয়া, মহা আর্ত্তনাদে দিগন্তর প্রতিধ্বনিত করিতেছে; মহাশোকের গগনভেদী স্বরে আমাদের অন্তরের করুণার উৎস ছুটাইয়া দিতেছে—ঐ হৃদয়-বিদীর্ণকারী রব শুনিয়া কি স্থির থাকা যায় গা! উহাতে প্রাণ স্তম্ভিত হয়, আনন্দের কোলাহল নীরব হয়, সুখের ক্ষীণালোক নিবিয়া যায়, অন্তরে চিন্তার উৎস ফুটিয়া উঠে। তখন কল্পনা মনকে টানিয়া পরকালের দিকে, সুদৃঢ় ভবি-

ষ্যতের অজ্ঞাত রাজ্যের দিকে নিয়া যায়। মনের মধ্যে আবার ঐ চির-নূতন প্রশ্ন-উঠে— "বল দেখি ভাই কি হয় মলে?"

ক্রমে আমার পূর্ব্ব কথা মনে পড়িল। অতীতের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। এমন এক দিন গিয়াছে, যখন আমি এমনি শোক-সাগরে ডুবিয়াছিলাম। যখন প্রতি শিরায় শিরায় বৃশ্চিক দংশন করিয়াছিল, ধমনিতে শোণিত বুঝি জমিয়া গিয়াছিল। তখন জীবন ঘোর বিভীষিকাময় বোধ হইয়াছিল, বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়া যাইবার জন্য,অনন্ত শূন্যে আমার আমিত্বকে একেবারে মিশাইয়া দিবার জন্য নিরন্তর মৃত্যু কামনা করিয়াছিলাম। সে দিনের—সেত দিন নহে,যেন একটা মহা যুগের—কথা মনে পড়িল। যখন আমার মূর্ত্তিমতী স্নেহের পুতলি, প্রীতির আশ্রয়ভূমি, প্রাণের জুড়াইবার স্থান, আমার জীবন-মরুর ওয়েসিস্, আমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মহাকালের মহা উর্ম্মির কঠোর আঘাতে কোথায় ভাসিয়া গেল—সে দিনের কথা মনে পড়িল। যখন প্রতি দীর্ঘশ্বাসে প্রাণটা ছিঁড়িয়া যাইতেছিল, হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল—যখন আকুল প্রাণে শোকে অন্ধ হইয়া,আমার সেই হারাণ ধনের অনুসন্ধানে সারা সংসারটা ঘুরিয়া বেড়াইব মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহাকে পাইবার আশা জীবনের অবলম্বন করিয়াছিলাম, সে দিনের কথা মনে পড়িল। আবার যখন সে আশার বাসা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল,—যখন নবীন শোকের মোহ,কুহেলিকা ভেদ করিতে পারিলাম—যখন এ সংসারে আর তাহাকে পাইব না বুঝিলাম, তখন পরকালে তাহাকে পাইবার আশায় বুক বাঁধিয়াছিলাম, সে দিনের কথা মনে পড়িল। তখন ভাবিয়াছিলাম, বিধাতা কি এমনই নির্দ্দয় যে, তিনি আমার সর্ব্বস্ব-ধন কাড়িয়া নিয়া, আমার জীবন মরুভূমি করিয়া দিয়া, হিংস্রক রাক্ষসের ন্যায়—শোকের রাবণের চিতায় শোয়াইয়া আমাকে চিরকাল পোড়াইয়া মারিবেন? তাই তখন পরকালে বিশ্বাস হইয়াছিল। বুঝি আশাই আমাদের বিশ্বাসের মূল। তাই তখন পরকালে আমার সে হারাণ ধন পাইবার জন্য বুক বাঁধিয়া সংসার-মরুভূমের বাকী পথটুকু কোন রূপে চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। সে দিনের কথা মনে পড়িল।

কিন্তু হায়! সে আশাও যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তখন আমার আঁধারময় জীবন-সাগরে পরকালের আশাই যে একমাত্র ধ্রুবতারা ছিল! সেই আলো লক্ষ্য করিয়াই ত আমি এই অপার ভব-সাগরে আমার ক্ষুদ্র জীবন-ভেলা ভাসাইয়া দিয়াছিলাম। সেই-আশা-রজ্জুতে আমার লক্ষ্যহীন,কক্ষভ্রষ্ট,দিশাহারা মনটাকে কোন রূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। হায়,সে আলো যে নিবিয়া গিয়াছে! সে আশার বন্ধন যে ছিঁড়িয়া গিয়াছে! এমন এক দিন ছিল, যখন পরকালে বিশ্বাস বড় জ্বলন্ত ছিল। এ ধ্রুবতারার আলোক বড় উজ্জ্বল ছিল, সে বিশ্বাস বড় পরিষ্কার, বড় ফুটন্ত ছিল। হায়! সে আলো যে এখন আর দেখিতে পাই না। অবিশ্বাসের ঘোর কুহেলিকায়, সন্দেহের দারুণ কালমেঘে সে আলো যে নিবিয়া গিয়াছে। সে ধ্রুবতারা যে অদৃশ্য হইয়াছে! আমি দিশাহারা হইয়াছি। আমার এ ক্ষুদ্র জীবন-ভেলা কালের উত্তাল তরঙ্গে ডুবু ডুবু হইয়াছে। যে আশাকে কাণ্ডারী করিয়া আমার জীবনতরি সংসার-সাগরের তরঙ্গ ভঙ্গে ভাসাইয়া দিয়াছিলাম,সে আশাত আর 'দিল না পদ তরণির অঙ্গে'!. আমার ভক্তি-পাল ছিঁড়িয়াছে,শ্রদ্ধা-হাল ভাঙ্গিয়াছে—

বুঝি আমার এ জীর্ণ তনুর তরি ভবসাগরে বানচাল হইয়া ডুবিতেছে। প্রাণ আকুল হইয়াছে,আমার জীবনের সকল উদ্যম,সকল চেষ্টা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। প্রাণ নিরাশার ক্রোড়ে শুইয়া পড়িয়াছে,আর কেবলই বিকট বিভীষিকাময়ী স্বপ্ন দেখিয়া ডরাইয়া উঠিতেছে। কত দিন ধরিয়া বড় ব্যাকুল মনে আবার সেই আশা-ধ্রুবতারার অনুসন্ধান করিলাম। তখন মনে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়াছিল—"বল দেখি ভাই কি হয় মলে?" সে জিজ্ঞাসার আজিও উত্তর পাই নাই।

হায় হায় কেন বিশ্বাস হারাইলাম, কেন তর্ক যুক্তির উপর নির্ভর করিলাম। কেন শুক্তিতে মুক্তা ভ্রম করিলাম, কেন সোণা ফেলিয়া গিল্টীতে ভুলিলাম, আসল ফেলিয়া নকল লইলাম, মাণিকের পরিবর্ত্তে স্ফটিক লইলাম,মেকি খুঁটার আদর করিলাম। হায় বিধাতা! কেন আমাদের বুদ্ধি দিয়াছ। কেন বিশ্বাস ভিত্তিকাড়িয়া লইতেছ। কেন আমাদের চিন্তাস্রোতকে নানা দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়াছ। আমাদের দিশাহারা করিয়া দিয়াছ। তাই ত আমার বিশ্বাসের স্থানে অবিশ্বাস আসিয়াছে, শ্রদ্ধার স্থানে অশ্রদ্ধা আসিয়াছে, নিশ্চয় ধারণার স্থানে সন্দেহ আসিয়াছে,আপ্ত নির্ভর স্থানে জিজ্ঞাসা আসিয়াছে। তাই ত প্রশ্ন উঠিয়াছে—"বল দেখি ভাই কি হয় মলে।"

তা প্রশ্ন ত উঠিয়াছিল,কিন্তু ইহার একটা মীমাংসা হইল না কেন? আমার সে সন্দেহ-মেঘ উড়িয়া যাইল না কেন? আমি কি আর সে পরকালে বিশ্বাসরূপ ধ্রুবতারা দেখিতে পাইব না? যেদিন প্রাণের প্রাণ আলোড়িত করিয়া, হৃদয়-গ্রন্থী ছিন্ন করিয়া দিয়া, অন্তর-সাগর মথিত হইয়া এই প্রশ্ন-বিষ প্রথম উঠিয়াছিল, সে দিন—অনেক দিন হইল চলিয়া গিয়াছে। যে দিন হৃদয়ে বিশ্বাসের আসন প্রথম টলিয়াছিল, যে দিন প্রাণের ভিতর মহা ঝড় উঠিয়াছিল—মনটা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, যে দিন সকলই শূন্যময় বোধ হইয়াছিল, সে দিন—অনেক দিন হইল চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর হইতে—সময় নাই, অসময় নাই—মধ্যে মধ্যে আসিয়া এই প্রশ্ন আমার প্রাণের দ্বারে আঘাত করিয়া যায়। কখন বা বাহির হইতে উঁকি মারিয়া এক একবার ছায়াময়ী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া যায়। কখন বা অন্তরের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া প্রাণটাকে উলট্ পালট্ করিয়া দেয়। প্রশ্ন উঠে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ত তাহার কোন মীমাংসা খুঁজিয়া পাইলাম না। মীমাংসার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছি, কত দিগবিদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, কই তবু ত জিজ্ঞাসার শেষ হইল না। কত কাব্য ইতিহাস, সাহিত্য দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়াছি, মনের মত উত্তর ত খুঁজিয়া কোথাও পাইলাম না। এখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। এখন মনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। মনে করিয়াছি, আর এ কথা মনে আনিব না। কিন্তু তবু সময় নাই, অসময় নাই—কেন অন্তর-সাগর মথিত করিয়া, কথাটা মনে আসে? কেন ভাই এ প্রশ্ন উপস্থিত হয়—"বল দেখি ভাই কি হয় মলে?"

কি নিরর্থক প্রশ্ন! মানব জ্ঞানের এমন সাধ্য নাই যে ইহার মীমাংসা করে। ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ, প্রত্যক্ষের অধীন মানব জ্ঞান, কেমন করিয়া সে অসীম অনন্তের দ্বার উদ্ঘাটন করিবে। কেমন করিয়া সে অভেদ্য ভবিষ্যত কালের মহা আবরণ ভেদ করিবে? মানুষ ত এই অনন্ত সংসার-

সাগর-বেলায় বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রতম বালুকণা মাত্র। সে ত জ্ঞানকাণা। তার কি সাধ্য যে, সে অনন্ত জ্ঞান-সাগরের মধ্যে ডুব দিয়া সত্য-রত্ন উদ্ধার করিবে! তবু ত অবোধ মন বুঝে না। এ কথার উত্তর পাইবার জন্য কত খুঁজিয়াছি, কত ঘুরিয়াছি, কত দেখিয়াছি মনে পড়ে। এক দিন শুনিলাম, পৃথিবীর নাকি সকল ধর্ম্মযাজক মিলিয়া একটা মহা পার্লামেণ্ট না মহাকঙ্গ্রেস্ খুলিয়াছে। ভাবিলাম, দেখি একবার যদি ইহাদেরই কাছে একটা মীমাংসা পাই। হরি হরি! চেষ্টা সকলই বৃথা হইল। নানা ধর্ম্মের নানা মত। কেহ বলিল "তুমি মরিয়া অনন্ত নরকে যাইবে।' কেহ বলিল, 'আমার এই জল একটু মাথায় দাও, তোমায় অনন্ত স্বর্গে লইয়া যাইব।' কেহ বলিল, 'আমার কাছে আইস, আমি তোমায় অনন্ত কালের জন্য অপূর্ব্ব পরীস্থানে পাঠাইয়া দিব।' কেহ বলিল—'কর্ম্ম ফল—কর্ম্ম ফল—কেবলই কর্ম্মফল। যেমন বীজটী বুনিবে, তেমনি ফলটী পাইবে। যদি অন্তর জমী খানা ভাল করিয়া চাষ করিয়া ধর্ম্মবীজ রোপিয়া থাক, তবে স্বর্গে যাইবে। নতুবা তোমার জন্য মহারৌরবের পথ পরিষ্কার হইতেছে।' আরও কত লোকে কত কি বলিল, সকল কথা এখন মনে হয় না।

সে দিন একজন প্রশান্তমূর্ত্তি দীর্ঘকায় ঋষি সদৃশ পুরুষ আমায় বলিয়াছিলেন—

"তুমি ধর্ম্মের আশ্রয় জন্য কেন বৃথা চেষ্টা করিতেছ? ধর্ম্মের মূল যে বিশ্বাস! সে বিশ্বাস—সে শ্রদ্ধা যখন হারাইয়াছ, তখন ধর্ম্মের আশ্রয় পাইবে কিরূপে? তর্ক যুক্তি অস্ত্র লইয়া, ন্যায় শাস্ত্রের ফাঁকির ব্যূহ রচিয়া, বাদ বিতণ্ডা জল্পনা বলে কি ধর্ম্ম-রাজ্য জয় করা যায়! ন্যায়শাস্ত্র কি তোমার বিশ্বাস আনিয়া দিতে পারে? তর্ক যুক্তির কড়ি দিয়া কি বিশ্বাস কিনিতে পারা যায়?"

আমি বুঝিলাম, কথাটা ঠিক বটে! ছেলেবেলা যে শুনিয়াছিলাম "ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর!" সে কথাটা যে ঠিক, তাহা আমি তখন বুঝিতে পারিলাম। হায়! সত্য গুলি এইরূপ মনের মধ্যে যতক্ষণ আপনা আপনি না ফুটিয়া উঠে, ততক্ষণ তাহাদের ধরিতে পারা যায় না—ততক্ষণ তাহারা 'আপনার' হয় না। সেই যে ছেলেবেলা শুনিয়াছিলাম, "পরকে কটু কথা কহিও না"—কই সে কথাটা কখন ত মনে স্থান পায় নাই। প্রাণের কাছে কথাটা সেই হইতে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইত। কই কখন ত তাহাকে মনের ভিতর প্রবেশ করিতে দিই নাই। কত লোককে কত কটু বলিয়াছি—কত লোকের অন্তরে কটু বাক্যের বিষ ঢালিয়া দিয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়াছি, কই কখন ত ভাবি নাই—পরকে কটু কথা কহা দোষ। কিন্তু আহা সে দিন—আমার পক্ষে সেই এক মহাদিন—সে দিন ঐ কথাটার মর্ম্ম বুঝিয়াছিলাম। সে দিন অন্নাভাবে শীর্ণ, বসন অভাবে নগ্নপ্রায়, দীনহীন ভিখারীকে আমার দ্বার হইতে দুর্ব্বাক্য বলিয়া তাড়াইয়া দিতে গিয়াছিলাম—তখন তাহার আকুল করুণাপূর্ণ নয়ন নিস্তব্ধ ভাষায় কি যে কহিয়া গেল—সে কথাটা দড়াস্ করিয়া আমার প্রাণে আঘাত করিল। জীবনে বুঝি আমি তেমন আঘাত পাই নাই। সেই দিন—সে মহা দিনে আমি অমূল্য সত্য লাভ করিলাম—পরকে কটু কহিও না। তখন অন্তরের অন্ধকারময় গৃহ হঠাৎ আলোকিত হইয়া উঠিল। শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ স্রোত বহিয়া গেল। তখন বুঝিয়াছিলাম, প্রত্যেক সত্যকে এইরূপে লাভ করিতে হয়। তখন ভাবি-

য়াছিলাম, বুঝি এইরূপে আর্য্য ঋষিগণ সত্য লাভ করিতেন—তত্ত্বদর্শী হইতেন। তখন বুঝিয়াছিলাম—এইরূপে শাক্যমুনি মহা বোধীমূলে সনাতন ধর্ম্মের প্রাচীন সত্য লাভ করিয়া 'বুদ্ধ' হইয়াছিলেন। কিন্তু কি কথা বলিতে কি কথা বলিতেছিলাম!

সে দিন সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি পুরুষের কথার বৈদ্যুতিক শক্তিবলে প্রাণের সাগর মথিত হইয়া,মহা সত্য লাভ করিয়াছিলাম—বিশ্বাস ব্যতীত ধর্ম্মের অন্য মূল নাই। তখন ধর্ম্মের বাজারে বিশ্বাস কিনিতে বাহির হইলাম। কিন্তু মূল ধন লইলাম—সেই তর্ক যুক্তি, সেই ন্যায়শাস্ত্রের কচ্‌কচি,আবার সারা জগতের ধর্ম্মবাজার ঘুরিয়া আসিলাম। আবার সেই ধর্ম্মের মহা পার্লামেণ্টে বেড়াইলাম। ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার বুদ্ধির পায়ের শিরা ছিঁড়িয়া গেল; কত ধর্ম্মযাজকের দ্বারে দ্বারে গিয়া ডাকিলাম—"ওগো তোমরা কেহ আমায় বিশ্বাস মিলাইয়া দিবে গো।" তা কই কেহ ত আমায় বিশ্বাস দিতে পারিল না। অনেকে খদ্দের ডাকিল বটে। অনেক ধর্ম্মের দোকানদার ধর্ম্মের পশরা লইয়া ধর্ম্মহাটে ফিরি করিয়া বেড়াইতেছে। অনেকে ডাকিতেছে, তাহার মাল সরেস। তখন আশার একটু ক্ষীণ আলোক হৃদয়ের নিভৃত কোণে দেখা দিল। তাহাদের বলিলাম—তবে কি তোমরা কেহ আমার ধর্ম্ম বিক্রয় করিবে গো! আমি বাছা বাছা যুক্তিমোহর আনিয়াছি। তাহারা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল "পাগল, যুক্তি কড়িতে কি ধর্ম্মের বিনিময় হয়। ইহার একমাত্র মূল্য বিশ্বাস।" আমি বলিলাম,আমি ত তাই জানিয়াছি। আমি ত ঐ 'বিশ্বাস' 'শ্রদ্ধা' কিনিতেই আসিয়াছি। তাহারা বলিল, তাহাদের ধর্ম্মের বজরা মধ্যে 'বিশ্বাস' বিক্রয়ের জন্য থাকে না।

বড় নিরাশ হইয়া, ক্লান্ত মনে, শ্রান্ত দেহে ফিরিতেছিলাম। এমন সময় পশ্চাতে দেখিলাম, এক জটাজুটধারী গৈরিক-পরিহিত সন্ন্যাসী। যেন মূর্ত্তিমতী শান্তি দাঁড়াইয়া আছেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন—বুঝি ব্যঙ্গ করিলেন। তাহার পর আমায় বলিলেন—এ ধর্ম্মের বাজারে তুমি কি কেনা বেচা করিতে আসিয়াছিলে? আমি বলিলাম, "ঠাকুর সে কথায় আর কাজ কি? আমি ধর্ম্ম কিনিতে আসিয়াছিলাম, পরকাল কি—বুঝিব বলিয়া। তা জানিলাম, বিশ্বাস ব্যতীত ধর্ম্ম মিলে না। তখন বিশ্বাস কিনিতে গেলাম। কিন্তু বিশ্বাস ত কোথাও কিনিতে মিলিল না।" সন্ন্যাসী ঠাকুর আবার হাসিলেন, বলিলেন—

"পাগল, বিশ্বাস কি বাজারে মিলে? বিশ্বাস যে আমাদের নিজের সম্পত্তি। আপন মনের মধ্যে অনুসন্ধান কর—দেখ দেখি, তোমার হৃদয়ে বিশ্বাস আছে কি না? মা জগন্ময়ী জগদম্বা বিশ্বের আদ্যাশক্তি মহামায়া—তিনিই বিশ্বাসরূপে, শ্রদ্ধারূপে জীবের অন্তরে অবস্থিত: একবার আপন হৃদয় মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখ,—দেখ দেখি, মা তোমার হৃদয়ে বিশ্বাসরূপে আবির্ভূতা কি না? যদি না থাকেন, তবে তাঁহার আরাধনা কর—তাঁহাকে প্রসন্ন কর—তাঁহার সেবা কর। তিনিই তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া—শ্রদ্ধারূপে তোমার অন্তরে তাঁহার আসন স্থাপিত করিবেন, তুমি পবিত্র হইবে"।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর গাহিতে, গাহিতে চলিলেন:—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ—নমোনমঃ॥"

আমিও বুঝিলাম—বিশ্বাস বাহিরের জিনিস নহে, উহা বাজারে খরিদ বিক্রয় হয় না, উহা

তর্ক যুক্তি দ্বারা পাওয়া যায় না। আমাদের আপন প্রকৃতিতে—নিজ স্বভাবে যদি বিশ্বাস বীজ না থাকে—তবে বৃথা চেষ্টা! সন্ন্যাসী ঠাকুর ত বলিলেন—মা জগদম্বার সাধনা কর, বিশ্বাস মিলিবে। কিন্তু বিশ্বাস না থাকিলে সাধনায় প্রবৃত্তি আসিবে কোথা হইতে? বীজের মূল বৃক্ষ—আর বৃক্ষের মূল বীজ। বিশ্বাস হইতে সাধনা, আর সাধনা হইতে বিশ্বাস! কথা বড় মন্দ নহে। আমার সন্ন্যাসী ঠাকুরের উপর বড় শ্রদ্ধা রহিল না।

কিন্তু বড় দুঃখ হইল। হায়, সেকালে যে বিশ্বাস আমার ছিল, তাহা কোথায় গেল! কি পাপ করিয়াছিলাম যে বিশ্বাস আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! কেন আমি অবিশ্বাসের রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। আমার স্বভাবে ত বিশ্বাস-বীজ অঙ্কুরিত ছিল। এক দিন ত এমন ছিল, যে দিন আমাদের ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতাম, পরকালে বিশ্বাস করিতাম, এখন সে দিন কোথায় গেল! কেন আমি এ কালের লেখা পড়া শিখিলাম। কেন সভ্যতার অভিমানে বৃথা মত্ত হইলাম। কেন তর্ক যুক্তিকে সার করিলাম! তাইত আমার বিশ্বাস হারাইয়াছি। হায় যদি বিশ্বাস হারাইলাম—তবে মরিলাম না কেন! যদি বিশ্বাসরূপিনী জগন্মাতা অশুচী বলিয়া আমার এ দীন হৃদয়মন্দির ত্যাগ করিয়া গেলেন, তবে এ শূন্য মন্দির চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিই না কেন?

সাধে কি দুঃখ করিতেছি। বলিয়াছি ত—আমি মাণিক ফেলিয়া কাচ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। আমি ত নিজেই বিশ্বাসকে আমার হৃদয়-মন্দির হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলাম। আপনাকে বড় বুদ্ধিমান ভাবিয়া তর্ক ন্যায় যুক্তির শরণ লইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম—তাহাদের সহায়ে জ্ঞানোপার্জ্জন করিব—বড় একটা পণ্ডিত হইব। সেই দম্ভই ত আমার এই পতনের মূল। এখন আমার কি দুর্দশা হইয়াছে দেখ। যে কথাটা প্রথম সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হয়, সেই কথাটারই কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না। মরিয়া আমি কি হব—আগে এ কথাটার একটা মীমাংসা করিয়া না লইয়া ত আমাদের এক পদও যাইবার উপায় নাই। অনন্ত অজ্ঞেয় রাজ্যের এইটাই প্রথম ঘাঁটি। এ ঘাঁটি পার না হইলে, যাইব কোথায় বল? তা সারা জীবন অনুসন্ধান করিয়াও ত এ প্রশ্নের একটা মীমাংসা করিতে পারিলাম না। এক কাল গিয়াছে, যখন দর্শনশাস্ত্রের বাজারে গিয়া একটা মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু সে দুঃখের কথা আর বলিব কি। ধর্ম্মের বাজারে গিয়া যেমন হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি—এখানেও ততোধিক বিড়ম্বনা সহিয়াছি।

যখন প্রথম গিয়া দর্শনের বাজারে প্রবেশ করিলাম—তখন একজন পাণ্ডা আসিয়া বলিল 'এখানে প্রমাণ-কড়ি দিয়া সত্য কিনিতে হয়—তুমি কি প্রমাণ আনিয়াছ?' আমি বলিলাম, ভাই রাগ করিও না। আমি প্রমাণ সংগ্রহ করিতেই আসিয়াছি।" আগে প্রমাণ সংগ্রহ করি, তাহার পর দেখিব, তাহাতে কোন সত্য কিনিতে পারি কি না। সে বলিল "আইস আমি তোমায় এ বড়বাজারের প্রমাণ-পটিতে নিয়া যাইতেছি।" প্রমাণপটিতে গিয়া দেখি এক জন দোকানদার ডাকিতেছে—"আমার কাছে আইস। যদি খাঁটী মাল সস্তায় পাইতে চাও ত আর

কোথাও যাইও না"। আমি তাহার ডাক শুনিয়া গেলাম। তাহাকে বলিলাম "কই তোমার কি প্রমাণ আছে দেখাও।" সে বলিল "আমি বাজে জিনিস রাখি না। আমার কাছে খাঁটী মাল আছে। আমার এক প্রমাণ। আমি কেবল 'প্রত্যক্ষ' প্রমাণ বিক্রয় করিয়া থাকি"। সে আমায় আরও বলিল 'সাবধান, যেন বাজে দোকানদারের বাজে কথায় ভুলিও না। এই এক প্রমাণই আসল—আর সব মেকি—সব ঝুটা।"

আমি বলিলাম, "তাই হউক, তুমি এক্ষণ মরিলে কি হয়, তাহার প্রমাণগুলি বাছিয়া দাও ত, আমি দেখিয়া লই।" দোকানদার তখন একটা বিকট রকম হাসি হাসিয়া উনপঞ্চাশ রকমের মুখ ভঙ্গী করিয়া আমায় বুঝাইয়া দিল যে, পরকালের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। আমি বুঝিলাম, কথাটা ঠিক বটে। পরকাল হইতে কেহ ত কখন ফিরিয়া আসে নাই। কেহ ত সেই অজ্ঞাত দেশ হইতে আসিয়া আমাদের দেখা দেয় নাই। দোকানদার তখন বলিতে লাগিল"বাপুহে ম'লে আর কি হয়! ম'লে পরে মাটীর মানুষ মাটী হইয়া যায়। এ শরীরটা পাঁচ ভূতের সংসার—উহারাই দেহটা ভাগ যোগ করিয়া লয়।" আমি বলিলাম "ভাল, তাহাই হইল। আমার দেহটাই যেন মাটী হইল, আমিও কি তাহার সঙ্গে মাটী হইব! দেহছাড়া কি আমি কিছুই নই।" এবার দোকানদার বড় মর্ম্মভেদী বিকট হাসি হাসিল। তাহার পর কিছু গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল"কে বলিল, দেহ ছাড়া তুমি কিছু? দেখ নাই কি যে, মিষ্টকে গাঁজাইয়া চোঁয়াইয়া মদ্ প্রস্তুত করে। আর সেই মদ তোমাকে কিরূপ মাতাল করিয়া তুলে?" আমি বলিলাম, 'আমি ও রসে বঞ্চিত—তোমার এ উপমাত বুঝিলাম না।' দোকানদার বলিল, তা হউক—আমার কথাটা বুঝিয়া রাখ, পঞ্চভূতের সমবায় বিশেষের ফলেই তোমার চৈতন্য, ঐ আমিত্বের উৎপত্তি।

আমি বলিলাম "তোমার কথায় বড় অশ্রদ্ধা হইল। তুমি পরকালের প্রমাণ দিতে পার না, তাহা বুঝিয়াছি।" কিন্তু পরকাল যে নাই, বৃথা তাহার প্রমাণ দিতে আস কেন? তোমার এ অনধিকার চর্চ্চা কেন বাপু। তুমি আদার বেপারী, জাহাজের খবরে তোমার দরকার কি বাপু! আমি আর তোমার সঙ্গে তর্ক করিতে চাই না। ওই তর্কইত আমার কাল হইয়াছিল। দেখি একবার 'অনুমান' প্রমাণের দোকনে গিয়া। দেখি সেখানে আমার আশা পূরে কি না।

দোকানদার তখন নরম হইল। এবার আর তাহার সে বিকট উচ্চ রকমের গুরু গম্ভীর হাসির ছটা দেখিলাম না।

বেচারা একটু হতাশ হইল। দেখিল, খদ্দেরটা হাতছাড়া হইয়া যায়। বলিল "তা যাও, এখানে তোমার যে দশা, সেখানেও সেই দশা। অনুমান প্রমাণের গোড়া কি জান! সেও তোমার এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তুমি আজ দেখ্‌লে আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, কাল তুমি আগুন দেখিয়া অনুমান করিবে যে, ইহাতে হাত দিলেও পুড়িবে। ইহার উপর অনুমানে আর কিছু বেশী আছে কি?"

আমি।—বাপুহে তোমার সহিত তর্ক করিব না ত বলিয়াছি। তবে কেন জ্বালাতন কর। যাউক, তোমায় বলিয়া যাই—ঐ যে একবার আগুনে হাত পোড়ে দেখিয়া, পোড়ানই আগুনের ধর্ম্ম ঠিক করিলে, ওটা কি তোমার প্রত্যক্ষের ফল, না আমার মনের ধর্ম্ম? তুমি একটী প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রদীপ

জ্বালাইয়া দিয়া, কেবল আমার অন্ধকারময় জ্ঞানের গৃহ আলোকিত করিলে—আর কি করিলে বল ত।

তাহার পর অনুমান প্রমাণের দোকানদারের কাছে গেলাম। তাহার নূতন বিলাতী ধরণের দোকান, উপরে চাক্‌চিক্য বড় বেশী। যেন ভীম ময়রার দোকান ছাড়িয়া 'পেলিটীর' বাড়ী আসিলাম। অনুমানের দেশী দোকানে আর গেলাম না। আশৈশব সেই "পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ" শুনে শুনে আমার মাথা ধরিয়া গিয়াছিল। দোকানদারকে পূর্ব্ব মত জিজ্ঞাসা করিলাম,"ভাই হে,মরিলে কি হয়, তাহার প্রমাণ বাছিয়া দিতে পার ?"

দোকানদার।—অনেক প্রমাণছিল বটে, তা সে সব পুরাণ হইয়া পচিয়া গিয়াছিল। হেল্‌থ আফিসরের ভয়ে সে সব ফেলে দিতে হইয়াছে। এখন তাহার বড় বেশী প্রমাণ রাখি না। দুই একটা যা আছে, তাহা পছন্দ হয় লইতে পার। এই ধর খ্রীষ্টান দার্শনিকগণ প্রায় সকলেই বুঝাইতেছেন যে,খ্রীষ্টান ধর্ম্মের কথাটা ঠিক। জন্মের সহিত আত্মার জন্ম হয়, কিন্তু দেহ নাশে আত্মা মরে না। নিজকৃত সুকৃত বা দুষ্কৃতের পরিমাণ অনুসারে হয় অনন্ত স্বর্গ, না হয় অনন্ত নরক ভোগ করে।

আমি।—তোমার ও অনুমানের মূলে খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন আছে। উহাতে খাঁটী অনুমান প্রমাণ নাই। কোন খাঁটী জিনিষ দিতে পার কি ?

দোকানদার।—এ কালে কি আর কোন খাঁটী জিনিষ আছে! আজ এক শত বৎসর হইল এক কান্ত-বপু জর্ম্মান দার্শনিক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, পরকাল সম্বন্ধে * ঈশ্বর সম্বন্ধে,অনুমান প্রমাণের মূলোৎপাটন করিয়া দিয়াছেন। তোমাদের কপিল মুনির কথা আবার উঠিয়াছে—প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না। পরকালের কথাও ঠিক হয় না। মানুষ কি কখন প্রত্যক্ষ বা অনুমান বলে পরকালের ব্যাপার জানিতে পারে ? তাহা হইলে ভাবনা কি ?

আমি বুঝিলাম,আমি "যে তিমিরে আমি সেই তিমিরেই" রহিলাম। তথাপি দোকানদারকে বলিলাম,'ভাল আর কোন দোকানে কিছু পাওয়া যায় কি ?'' দোকানদার তখন একটু ব্যঙ্গ করিয়া—এক রকম ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিল, যাও, ঐ টিকিওয়ালা ঠাকুরের দোকানে যাও। দেখ যদি ওখানে কিছু মিলে ? আমি ভাল মাল ছাড়া কিছু রাখি না। আর কোন প্রমাণ আমরা গ্রাহ্যই করি না।

দোকানদারের বৃথা গর্ব্বে এটুক হাঁসি আসিল। সে স্থান ছাড়িয়া সেই টিকিওয়ালা ঠাকুরের দোকানে গিয়া তাহার পরকালের প্রমাণ দেখিতে চাহিলাম।

ঠাকুর বলিলেন "কেন পরকালে কি হয়—তুমি তা জান না কি! হিন্দুর ছেলে, তুমি কেন এর জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। শ্রীভগবানের সেই মহাবাক্য শুন নাই কি ?

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥"

শুন নাই কি ?—

"বাসংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

মানুষের জন্মান্তর আছে। সে এক জন্মে যেমন কর্ম্ম করে,জন্মান্তরে তাহার ফলভোগ হয়, সেই কর্ম্মানুযায়ী তাহার দেহ লাভ হয়। মানব জন্ম লাভ করিয়া যে সারা জীবন পশু

* জর্ম্মান পণ্ডিত ক্যাণ্ট।

প্রকৃতি রহিল—সে জন্মান্তরে পাশব যোনি লাভ করিবে। পুণ্য কর্ম্মে উৎকৃষ্ট যোনি লাভ হয়। আর কর্ম্মক্ষয়ে মুক্তি হয়। এসব কথা জান না কি?

আমি বলিলাম, ঠাকুর আমার দুর্দ্দশার কথা আর বলিব কি! আমি বিশ্বাস হারাইয়াছি। তাই দর্শনের বাজারে আসিয়া পর জন্মের প্রমাণ সন্ধান করিতেছি। যদি ভগবদ্‌বাক্যে আমার শ্রদ্ধা থাকিত—তাহা হইলে কি আর আমার কি এদুর্দ্দশা হইত? হায়! যাহা গিয়াছে, তাহা বুঝি আর ফিরাইয়া পাইব না। এখন তাহার পরিবর্ত্তে যে কিছু একটা পাইলে বাঁচি। আর যে সন্দেহের আঁধারে ঘুরিতে পারি না ঠাকুর!

তখন দোকানদার ঠাকুর বলিলেন, "পাগল, বিশ্বাস ছাড়া কি আর কিছু প্রমাণ আছে! দেখ প্রমাণের প্রধান প্রমাণ আপ্ত প্রমাণ। যে আপ্ত প্রমাণ মানিল না—যে ঋষিবাক্যে, ভগবদ্‌বাক্যে, শ্রুতিবাক্যে বিশ্বাস করিল না—তাহার ঈশ্বর নাই, পরকাল নাই, তাহার ইহকালও নাই। এই আপ্ত প্রমাণই দর্শনের মূলভিত্তি, এই আপ্ত-প্রমাণ-চাবি দিয়াই প্রকৃত দার্শনিক অনন্ত অজ্ঞেয় রাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। দার্শনিক যে জ্ঞান প্রমাণের উপর নির্ভর করেন, জ্ঞানার্থীর কাছে সেই জ্ঞানই আপ্ত প্রমাণ।

আমি।—ঠাকুর যদি বিশ্বাসই দর্শনের মূলভিত্তি হইল, তবে পৃথক্ দর্শনশাস্ত্রের আর প্রয়োজন কি? ধর্ম্ম শাস্ত্রের বাহিরে যাইবার আবশ্যক কি?

ঠাকুর।—প্রকৃত দর্শন কি কখন ধর্ম্ম ভিত্তি ছাড়া দাঁড়াইতে পারে?

আমি।—আমি ত তাহাকে প্রকৃত দর্শন বলিতে পারি না। প্রত্যক্ষ অনুমান প্রমাণের মসাল জ্বালিয়া, মানুষবুদ্ধি স্বাধীন ভাবে নিজে আবিষ্কার করিয়া যে পথে অগ্রসর হয়, সেই ত প্রকৃত দর্শনের পথ।

ঠাকুর।—সে পথে অজ্ঞেয় অনন্তের রাজ্যে যাওয়া যায় না। সে পথে কেবল কচ্‌কচি, কেবল বাদ বিতণ্ডা। কেবল মতের সংঘর্ষণ। কেবল সন্দেহ, অবিশ্বাস, আর নাস্তিকতা। সে অন্ধকার পথে অন্ধের হস্তি দর্শনের ন্যায় সকলই প্রমাদপূর্ণ। প্রকৃত দর্শন ধর্ম্মকে সহায় করে আশ্রয় করে, ধর্ম্মকে ধর্ম্মকে অতিক্রম করে না।

আমি।—ঠাকুর এ তোমার উনবিংশ শতাব্দীর মত কথা হইল না। এ যুক্তি তর্কের রাজ্যে, এই প্রত্যক্ষের বাজারে আপ্ত প্রমাণের স্থান কোথায়? এ বিজ্ঞানের যুগে কি বিশ্বাসের স্থান আছে? সকল কথাই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ-কষ্টিতে কষিয়া লইতে হইবে।

ঠাকুর।—বাপুহে বিজ্ঞানও মূল কথাগুলি বিশ্বাস করিয়া লয়—তাহার প্রমাণ দিতে পারে না। যাহা জ্ঞেয় রাজ্যের ব্যাপার, যাহা প্রত্যক্ষগম্য, তাহার প্রমাণ দেওয়া চলে। আর প্রমাণের দ্বারা সত্য আবিষ্কার হয় না। তোমাদের বৈজ্ঞানিকের অন্তরেও সত্যগুলি আপনি ফুটিয়া উঠে। পরে বৈজ্ঞানিক তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, সেই সত্যের ভিত্তি দৃঢ় করেন। যাহার হৃদয়ে যতটুকু জ্ঞান বিকাশিত হয়—সে ততটুকু সত্য লাভ করে। ঐ ক্ষুদ্র আতা ফলটী মাটীতে পড়িল দেখিয়া—এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মহা আকর্ষণ শক্তিতত্ব যে মহাপুরুষের জ্ঞানে প্রতিভাত হইয়াছিল—হঠাৎ যেন জ্ঞানের অন্ধকার গৃহে সূর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল—উহা কি তোমার বাহ্য প্রমাণের ফল!

আমি।—ঠাকুর, তুমি যাহা বলিলে, তাহা

কতকটা বুঝিলাম। কিন্তু উহা ত বিশ্বাসের কথা নহে।

ঠাকুর।—স্থির হইয়া কথাটা শুনিলে ভাল হয় না! আমি বলিতেছিলাম যে, সংসারে সেরূপ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের সংখ্যা বড় অল্প—যাঁহাদের নির্ম্মল অন্তরে জ্ঞান-সূর্য্য এইরূপে আপনিই উদয় হয়। এই যে তুমি পরকাল তত্ত্ব জানিবার জন্য লালাইত হইয়া বেড়াইতেছ, কই তুমি ত তাহার তত্ত্ব নিজে পাইলে না! সুতরাং নিজ জ্ঞানের উপর তোমার নির্ভর করিলে চলে কৈ ? পর-কালের তত্ত্ব বুঝিবার জন্য তোমাকে দর্শন শাস্ত্র,ধর্ম্ম শাস্ত্র খুঁজিয়া বেড়াইতে হইতেছে। সেই দর্শন বা ধর্ম্ম শাস্ত্রে, ঋষি বা মহাপুরুষ-গণ—নির্ম্মল হৃদয়ে অনন্ত জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, তত্ত্ব দর্শন করিয়া যে সত্য প্রকাশ করিয়াছেন—সেখানে তোমার যাইবার অধি-কার নাই। কাজেই তোমার তাহাতে বিশ্বাস ব্যতীত আর গতি নাই। তাই বলিতেছিলাম, আপ্ত প্রমাণ অবলম্বন কর—বিশ্বাস কর,শ্রদ্ধা কর, নহিলে আর উপায় নাই। তাই বলি-তেছি যে,মহাজন-প্রদর্শিত পথে চলিয়া যাও। তাঁহাদের প্রদর্শিত আলোক লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও। দেখিতেছ না বড় দুর্দ্দিন আসি-য়াছে। আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। বিদ্যুৎ আর চমকে না। অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন। এ দারুণ সময়ে তুমি একা। এই অপার দুর্গম প্রান্তরে পড়িয়া তুমি দিশাহারা হইয়াছ। ব্যাকুল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। কিন্তু পথ পাইতেছ না। তোমার শরীর মন অবসন্ন হইয়াছে। তখন দেখিলে সহসা দূরে আলোক ফুটিয়া উঠিল। তুমি সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিয়া যাও,আশ্রয় পাইবে। এই অন্ধকারময় মায়াচ্ছন্ন অজ্ঞানের প্রান্তরেও কেবল বিশ্বা-সের আলোক লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও। পথ পাইবে—দুর্দ্দিন ঘুচিবে—আশ্রয় পা-ইবে। কেন বৃথা দিশাহারা হইয়া অন্ধকারে ঘুরিতেছ!

আমি।—ঠাকুর, বড় মুরুব্বিয়ানা করি-তেছ। তর্ক উঠাইলে ত আমিও পেছপা নহি। আমিও কিছু কিছু ও বিদ্যা জানি। কিন্তু জানিয়াছি, যে তর্ক নিরর্থক। তর্কে অজ্ঞেয় রাজ্যের কথা পাওয়া যায় না, তাই তর্ক ছাড়িয়া দিয়াছি। তবু যদি তর্ক উঠাইলে, তবে বলি। বিশ্বাস ত জ্ঞানের মূল নহে। উহা কর্ম্মের মূল হইতে পারে। ধর্ম্মের মূল হইতে পারে। কিন্তু উহা ত জ্ঞানের মূল নহে। সন্দে-হই দর্শন রাজ্যে প্রবেশ করিবার সিংহদ্বার। যে সন্দেহ করিল না—কেবল বিশ্বাসই সম্বল করিল, সে ধার্ম্মিক হইতে পারে। কিন্তু সে অন্ধ—জ্ঞানকাণা।

ঠাকুর।—কি ভ্রম! এটা ঠিক মনে রেখ যে, জ্ঞান বিশ্বাস-ভিত্তির উপর স্থাপিত। বিশ্বাস আগে, শেষে জ্ঞান। বিশ্বাসবীজ ভাল পাট করা অন্তর-জমীতে অঙ্কুরিত হইলে প্রমাণ-বারিতে:তাহা বাড়িতে থাকে। তাহা হইতেই পরিণামে জ্ঞান ফল লাভ হয়। সন্দে-হকে যে দর্শনের ভিত্তি বলে,সে ভ্রান্ত। সন্দে-হের পরিণাম সন্দেহ। তাহার পরিণাম জড়-বাদ—অজ্ঞেয়তাবাদ। যদি বিশ্বাস আসিয়া উদ্ধার না করে—তবে সন্দেহের পরিণাম বড় বিষময়।

আমি।—ঠাকুর তাহাও যেন কিছু কিছু স্বীকার করিলাম। কিন্তু কোন্‌টা বিশ্বাস করিব বলত ? নানা লোকে যে নানা কথা কয়। তা ছাড়া দেখিতে পাই, সকলে আপন প্রবৃত্তির অনুরূপ বিশ্বাস করে। যে পাপিষ্ঠ

জীবন ভরিয়া কেবল পাপ কর্ম্মই করিয়াছে, সে বিশ্বাস করে পরকাল নাই—কর্ম্মফল নাই। কোন তর্ক যুক্তিতে তাহার সে বিশ্বাস নড়াইতে পার কি? যে সুখের কাঙ্গাল—এ সংসারে কেবল দুঃখের বোঝা বহিয়াই সারা হইল, সে যে পরকালে—স্বর্গে তাহার সুখের ঘরকন্না কল্পনা করে, তাহার বিশ্বাস কি কেহ তর্ক যুক্তিতে ভাঙ্গিতে পারে? আর যদি ভাঙ্গে, তবে সে আমার মত ব্যাকুল হইয়া ঘুরিয়া মরে।

ঠাকুর।—কথা ঠিক বটে। সকলে আপন প্রবৃত্তি মত বিশ্বাস করে। কিন্তু আমি তোমার সে অন্ধ বিশ্বাসের কথা বলিতেছি না। যে বিশ্বাসের কথা বলিতেছি, ইহা জ্ঞানমূলক, শ্রদ্ধামূলক। তবে অন্ধ-বিশ্বাসও পরিত্যজ্য নহে। যে জ্ঞান পথে যাইতে পারিবে না—যাহার সে শক্তি নাই, সে যদি সুপ্রবৃত্তি যুক্ত হয়—সৎপথে যদি তাহার মতি থাকে—তবে সে তাহার সেই প্রবৃত্তি অনুযায়ী বিশ্বাসের ডোর ধরিয়া অগ্রসর হউক। তাহাকে বাধা দিও না। তাহার স্বধর্ম্ম পালনের পথ রোধ করিয়া দিও না। আর তুমি জ্ঞানার্থী—তুমি দেখিতেছ ত যে তোমার অন্তরে এখনও জ্ঞান-সূর্য্য আপনিই প্রকাশিত হইতেছে না। তোমার অন্তর এখনও নির্ম্মল নহে। কাজেই যে আপ্ত ঋষি তত্ত্বদর্শী—যিনি নিজে সত্য দেখিয়াছেন, বলিয়াছি ত তাঁহাকেই বিশ্বাস কর। ভগবদ্‌বাক্য বিশ্বাস কর। প্রথমে তাহাতে শ্রদ্ধা করিতে শিখ। তাহার পর বিশ্বাস আসিবে। সেই বিশ্বাস-অগ্নি জ্বলিলে তোমার অন্তরের মলা ক্রমে দূর হইতে থাকিবে। তখন আপনিই সেই সত্যের আলোক দেখিতে পাইবে। তখন বুঝিতে পারিবে যে, যে তত্ত্ব আমাদের ক্ষুদ্র মলিন, সসীম মায়াবদ্ধ জ্ঞানে অজ্ঞেয়,তাহা মায়ামুক্ত অসীম জ্ঞানের কাছে পূর্ণ প্রকাশিত। যদি মায়ামুক্ত হইয়া অজ্ঞান দূর করিয়া সেই অনন্ত জ্ঞান রাজ্যে যাইতে পার, তবে আর কিছুই অজ্ঞেয় থাকিবে না।

আমি।—ঠাকুর, যাহা অজ্ঞেয় বলিয়া তর্ক যুক্তিতে আমার ধারণা হইয়াছে—তাহা যে কেহ সত্য সত্য জানিয়াছে, তাহা আমি কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? ভগবান যে অনুগ্রহ করিয়া সে রাজ্যের কথা নিজে আমাদের বলিয়া দিয়াছেন, তাহাই বা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? ঋষিগণ যে যোগ-বলে, বা সাধনা বলে সে রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, সেখানকার সমাচার অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বলিয়া দিয়াছেন,তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? এ বিশ্বাস না থাকিলে শ্রদ্ধা আসিবে কোথা হইতে?

ঠাকুর।—সন্দেহের রাজ্য হইতে—অবিশ্বাসের রাজ্য হইতে,বিশ্বাসের রাজ্যে ফিরিয়া আসিবার পথ আছে। সে পথ না থাকিলে মানুষের আর উপায় ছিল না। এক্ষণকার বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতগণও এইরূপ সন্দেহের রাজ্য হইতে বিশ্বাসের রাজ্যে ফিরিয়াছেন—তাহা বলিয়াছি। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, বিশ্বাস ছাড়া গতি নাই। * আমি গোঁড়ামী করিতেছি না। তুমি নিজে কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করিও। কেবল উনবিংশ শতাব্দীর দোহাই দিও না! যাহা উনবিংশ শতাব্দী বুঝে নাই, তাহা বিংশ কি একবিংশ শতাব্দী বুঝিবে, এমন আশা আছে। যাহা সত্যের আলোক, তাহা চিরকাল আঁধার

* এস্থলে প্রধানতঃ জর্ম্মান দার্শনিক ফিক্তে সেলিং প্রভৃতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

চাপা থাকে না। এ কথা ঠিক জানিও,বিশ্বাস ছাড়া পথ নাই।

আমি।—ঠাকুর অবিশ্বাসের রাজ্য হইতে বিশ্বাসের রাজ্যে যাইতে পারিলে পথ পাব, তাহা না হয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু অবিশ্বাসের রাজ্য হইতে বিশ্বাসের রাজ্যে যাইব কিরূপে ?

ঠাকুর।—অবিশ্বাসের রাজ্য হইতে বাছা বাছা প্রমাণ লইয়া আইস। তোমার প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা যত প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পার, সব লইয়া আইস। সেই প্রমাণ-কষ্টিতে ভাল করিয়া কষিয়া দেখ—যে আপ্ত বচন যে ভগবদ্‌বাক্য তোমায় বিশ্বাস করিতে বলিতেছি—তাহাই বিশ্বাস-যোগ্য কি না। দেখিয়া লও—তাহা অপেক্ষা বিশ্বাস-যোগ্য সম্ভবপর আর কিছু থাকিতে পারে কি না। দেখিয়া লও—সে গুলি মূল সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে, আর সকল জিজ্ঞাসার, সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাও কি না ? যদি পাও, তবে সে মহাবাক্য বিশ্বাস করিতে তোমার আপত্তি কি বল দেখি ? এই যে হিন্দুর আকাশতত্ত্ব, পরমাণুতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, বিবর্ত্তনতত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ধরিয়া লইয়া, তাহা দ্বারা বিজ্ঞানের অনেক প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতেছে,সেই মহাতত্ত্ব যাঁহারা প্রথমে লাভ করিয়াছেন—তাঁহাদের বাক্যে বিশ্বাস করিবে না কেন ? তুমি যে এই পরকালতত্ত্ব জানিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, —একবার হিন্দুর জন্মান্তরবাদটা ধরিয়া লইয়া দেখ দেখি—তোমার সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয় কি না ? দেখ দেখি প্রমাণের কষ্টি-পাথরে তাহা খাঁটী সোনা বলিয়া ঠিক হয় কি না ?

আমি।—ঠাকুর এখন পথে এস। তুমি যে প্রমাণের কথা বলিতেছিলে, সে গুলি একবার বাছিয়া বাহির কর দেখি। সে গুলা একবার নিজে বুঝিয়া লই। দেখি সে একবার গুলা একবার খাঁটী কষ্টি-পাথর কি না ? কেবল আপ্ত প্রমাণের দোহাই দিও না, দোহাই তোমার।

ঠাকুর।—আমি কেবল আপ্ত প্রমাণের দোহাই দিই নাই। কথাটা আরও একবার বলিতেছি, বুঝ। ঋষিবাক্যে, ভগবদ্‌বাক্যে তোমার বিশ্বাস নাই। ভাল তাই হোক, তাহাতে একেবারে অবিশ্বাস করিও না। সেই বাক্য সম্মুখে রাখিয়া, তাহার অনুকূল প্রতিকূল যুক্তিগুলি সংগ্রহ কর। বাহ্য ও আন্তর জগৎ হইতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ লইয়া দেখ—ঐ আপ্ত বাক্যে যে তত্ত্ব পাইয়াছ, তাহা ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্ব সম্ভব কি না। যদি না হয়, তবে সেই আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস করিতে তোমার আপত্তি থাকিবে কি ?

আমি।—ঠাকুর আর তর্ক যুক্তিতে কাজ নাই। আমি যে বিশ্বাস হারাইয়াছি, তাহা যদি তোমার দুটা কথায় মিলাইতে পারিতাম, তবে আর ভাবনা ছিল না। এখন তোমার কাছে যদি পরকাল সম্বন্ধে কোন প্রমাণ থাকে,তবে তাহা বাহির কর। আমি দেখিয়া চলিয়া যাই।

ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন,তা প্রমাণ আছে বৈ কি। যদি তর্ক যুক্তিতে কেহ পরকালের তত্ত্ব পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া থাকেন, তবে সে হিন্দু ঋষিগণ। হিন্দুর জন্মান্তরবাদ বড় পাকা ভিত্তির উপর স্থাপিত। হিন্দুর কর্ম্মতত্ত্ব শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-সম্মত। জন্মান্তর না মানিলে কৃতনাশ, অকৃতঅভ্যাগম প্রভৃতি দোষ আসিয়া পড়ে। আরও দেখ—

আমি।—অত কথায় কাজ কি ! আমি

তোমার বিদ্যা বুঝিয়াছি। যাহা অজ্ঞেয়,তাহা তোমাদের ঋষির কাছে জ্ঞেয় হইল। মানুষ অমানুষ হইল। আর ভগবান মানুষ হইলেন! সে কথা ছাড়িয়া এখন কাজের কথা কও।

ঠাকুর।—তোমার রোগ বড় কঠিন দেখিতেছি। তোমায় এখনও বলিতেছি—অবিশ্বাস প্রবৃত্তি সংযত করিতে শিখ। নহিলে তোমার উপায় নাই। হিন্দুদর্শনের, হিন্দু ধর্ম্মের পরকাল সম্বন্ধে প্রমাণের কথা বলিতেছ। সে মহা সমুদ্রে ডুব দিয়া তোমায় রত্ন উদ্ধার করিয়া দিই—আমার সে সামর্থ্য নাই। তোমার প্রবৃত্তি হয়,নিজে সে রত্ন উদ্ধার করিও। যত্ন নহিলে রত্ন মিলে না। তবে তোমায় পথ দেখাইয়া দিতেছি। এই "জন্মান্তর-রহস্য পুস্তক * পাঠ করিয়া দেখিও।

কথা বার্ত্তা শুনিয়া সেই টিকিওয়ালা ঠাকুরের উপর আমার কিঞ্চিৎ ভক্তি হইয়াছিল। আমি প্রণাম করিয়া সে পুস্তকখানি চলিয়া গেলাম। দর্শনের বাজারে আর বৃথা ঘুরিয়া বেড়ান নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম।

সেই দিন হইতে বুঝিয়াছি যে, বিশ্বাস ভিন্ন গতি নাই। ধর্ম্মে বিশ্বাস চাই। দর্শনেও বিশ্বাস প্রমাণ,শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। অপ্রত্যক্ষ, অজ্ঞেয় রাজ্যের কথা বিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুতেই আমার পাইবার উপায় নাই। যাহার যেমন বিশ্বাস,সে তেমনি বুঝে বটে। কিন্তু বিশ্বাসীর তাহাতে বড় ক্ষতি নাই। তাহার লক্ষ্য, তাহার গতি স্থির থাকে। সে ত আমার মত দিশাহারা হইয়া, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ঐ ধূমকেতুর ন্যায় চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় না। তাহার ত একটা বন্ধন থাকে। তাহার ত কর্ম্মপথ উন্মুক্ত, প্রশস্ত থাকে। সেই যথেষ্ট।

কিন্তু হায়, আমার সেই হারাণ বিশ্বাস কোথায় পাইব! কোন্ চোর আমার সে সর্ব্বস্বধন হরিয়া নিয়াছে রে! * * আমি এইরূপ ভাবনায় বিভোর হইয়া আছি, এমন সময় শুনিলাম, ভিখারী আমার দ্বারস্থ হইয়া গাহিতেছে,—

"বলদেখি ভাই কি হয় মলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেউ বলে ভূত পেরেত হবি,কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি
কেউ বলে সাযুজ্য পাবি, কেউ বলে সালোক্য মিলে॥
বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে,
* * *
যেমন জলবিম্ব জলে উদয় জল হয়ে সেই মিশায় জলে॥'

হায় হায় সর্ব্বত্রই কি এই জিজ্ঞাসা "বলদেখি ভাই কি হয় মলে? সর্ব্বত্রই কি নানা মুনির নানা মত" পাইয়া, হতাশ হইয়া এ প্রশ্নের মীমাংসা জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ভক্ত রামপ্রসাদ বুঝিয়াছিলেন, "যা ছিলি তুই তাই হবি রে মরণ কালে।" কিন্তু আমি সেরূপ একটা বুঝিলাম কই! যা ছিলাম,তাই যদি জানিতাম, তাহা হইলে ত যাহা হয়, তা বুঝিতে পারিতাম, কিন্তু আমি ছিলাম কি? আরো যেন বুঝিলাম যে, যাহা ছিলাম, তাই আছি,আর তাই হইব। কিন্তু এই যে আমি—এ কি? যে দিন এ কথার উত্তর পাইব, সে দিন সব গোল চুকিয়া যাইবে,তা জানি। কেন না বুঝিয়াছি, এই এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান

* "জন্মান্তর রহস্য" শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত কর্ত্তৃক অধ্যাত্ম গ্রন্থাবলী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৶০ আনা"—এস্থলে এই পুস্তকের উল্লেখ হইয়াছে। পুস্তকখানি আমি নিজে পড়িয়াছি। বড় সুন্দর হইয়াছে। তর্ক যুক্তিতে অতি সংক্ষেপে সরল অথচ ওজস্বিনী ভাষায় ইহাতে হিন্দুর জন্মান্তর-রহস্য বুঝান হইয়াছে। এখনকার অনেক বিলাতী পণ্ডিতও যে এ জন্মান্তর বিশ্বাস করেন, তাহা এই পুস্তক হইতে জানা যায়। প্রত্যেক তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও সাহিত্যানুরাগীর এ পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। এরূপ গ্রন্থ আমাদের দেশে যতই প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল। আমাদের চিন্তাস্রোত যতটুকু সুপথে প্রবাহিত হয়, ততটুকুই লাভ।

লাভ হয়। কিন্তু আমি কি? কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই। তাহাত জানি না। কোথা যাই, তাহাত বুঝি না। তাহার কূল কিনারা পাই না।

এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে এক দিন অন্য মনে এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়াছিলাম। সে ভীষণ অথচ আর্ত্তের জুড়াইবার স্থানের কথা আর বলিয়া কাজ নাই। এমন সময় পশ্চাতে সরল হাসির ধ্বনি শুনিলাম। ফিরিয়া দেখি—ধর্ম্মের মহাবাজারের সেই সন্ন্যাসীঠাকুর সে-খানে উপস্থিত। ঠাকুর আমায় চিনিয়াছিলেন, বলিলেন,আবার এ শ্মশানে কেন! আমি বলিলাম 'ঠাকুর বহুদিন ধরিয়া লোকালয়ে যে হারাণ ধনের সন্ধান করিয়া পাই নাই, এখন দেখিতেছি, যদি এই নির্জ্জন স্থানে সে ধন মিলে।' ঠাকুর বলিলেন,—

"উত্তম পরামর্শ করিয়াছ, তোমার ভাল হইবে। আমি আজ তোমার ঔষধ বলিয়া দিতেছি। আগে মনটাকে খাঁটী কর। তোমরা যেমন ব্যায়াম করিয়া শরীরকে নীরোগ ও সবল কর, সেইরূপ তোমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও নির্ম্মল করিবার জন্য প্রথমে চেষ্টা কর। সেটা যে কর্ত্তব্য, তাহা আর ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া কাহাকে বুঝাইয়া দিতে হয় না। কিরূপে সে অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিতে হয়, তাহা গুরুর নিকট উপদেশ নিও। আশা করি, তাহার জন্য প্রথম তোমার যতটুকু শ্রদ্ধার আবশ্যক, তাহা নষ্ট হয় নাই।"

"যখন আরশিতে মলা থাকে, তখন তাহাতে মুখ দেখা যায় না। আরশি পরিষ্কার হইলে, তবে ত মুখ দেখিবে। তুমি এই সংসার-গুহার মধ্যে রহিয়াছ। তোমার চারিদিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন রহিয়াছে। তোমার মুখত ঐ গুহার ভিতর দিকে ফিরান রহিয়াছে। তোমার কি পশ্চাতে মুখ ফিরাইতে সাধ্য আছে! তুমি কি গুহার বাহিরে কি আছে দেখিতে পাও? কেবল তাহার আব্ছায়া গুহার মধ্যে পড়ে। তাই তাহাদের বিষয় একটু ছায়া ছায়া ধোঁয়া ধোঁয়া রকমের জ্ঞান পাও। যদি সম্মুখে একখানা দর্পণ রাখিতে পার, তবে পশ্চাতের যাহা আছে, তাহার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে।"

"তোমার চিত্তই ঐ দর্পণ। ওখানা ভাল করিয়া সাফ কর, তাহা হইলে অনন্ত জ্ঞান-সূর্য্য তাহাতে প্রতিফলিত হইবে। তখন বুঝিবে তুমি কে? তখন বুঝিবে, মরিলে কি হয়। এখন তাহার জন্য সাধনা করিও না। যতই চিত্ত নির্ম্মল করিবার জন্য বাসনা করিবে, ততই বিশ্বাস আপনি ফুটিতে থাকিবে,ততই তোমার চিত্তদর্পণ পরিষ্কার হইবে।" তুমি সেই ভগবদ্বাক্য মনে রাখিও—

"যা নিসা সর্ব্বভূতানাম্ তস্মিন্ জাগর্ত্তি সংযমী।"

যাহা তোমার মলিন চিত্তে অন্ধকার ঢাকা, তাহা সংযমীর নিকট দিনের ন্যায় প্রকাশিত। আগে চিত্ত সংযম করিতে শিখ, তাহাতে চিত্ত নির্ম্মল হইবে, তবে ত তোমার বিশ্বাস আসিবে, সত্য দেখিতে পাইবে, কথাটা মনে রাখিও।

"তুমি গোড়া ধরিতে পার নাই,শেষ ধরিতে যাইতেছ কেন? অঙ্ক শাস্ত্রের যোগ শিখ নাই, গ্রহণ গণিতে যাও কেন! এখনও ভাল করিয়া জলে নামিতে পার না, সাঁতার কাটিতে যাও কেন? 'ক খ' শিখ নাই, কাব্যদর্শন পড়িবার চেষ্টা কর কেন?"

আমি বলিলাম, ঠাকুর সব ত বুঝিলাম, কিন্তু আসল কথাটা ত এখনও বুঝিলাম না। আমি চিত্ত নির্ম্মল করিব কি দিয়া? আমার যে বিশ্বাস নাই। সে দিন আপনি যে মহামায়ার সাধনার কথা বলিয়াছিলেন—তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হয় কৈ? বিশ্বাস হয় কৈ?

সন্ন্যাসী।—তোমার সে প্রবৃত্তি হয় নাই, তাহা বুঝিয়াছি। তাই আজ আর সে কথা বলি নাই। চিত্তশুদ্ধির আরও উপায় আছে। নিষ্কাম কর্ম্ম কর, কর্ত্তব্য পালন কর, পরহিতার্থ জীবন উৎসর্গ কর, জগতের কর্ম্মচক্রে আপনাকে বাঁধিয়া দাও। জগতের কর্ম্মরূপ সেই জগন্নাথের মহারথের ডোর ধরিয়া অগ্রসর হও। ক্রমে চিত্ত নির্ম্মল হইয়া আসিবে।

আমি বলিলাম, ঠাকুর কর্ম্মে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমি ক্ষীণ বাঙ্গালী। শুইতে পাইলে বসি না, বসিতে পাইলে দাঁড়াই না, আবার হিত করিতে গিয়া বিপরীত করিয়া বসি। এমন নিষ্কর্ম্মা লোকের কর্ম্ম-পথ নাই। আমার বিশ্বাসের পথ নাই। আর কি অন্য পথ নাই।

সন্ন্যাসী।—আছে! সে তোমার জন্য নহে। সে বড় কঠোর পথ। সে যোগের পথ। সে ত তুমি বুঝিবে না।

আমি বলিলাম, 'ঠাকুর আমি বুঝিতেও চাই না। এই উনবিংশ শতাব্দীতে আমি যোগ বিশ্বাস করিতে পারিব না। আমি বুঝিয়াছি, আমার উপায় নাই। তুমি যাও। আমার যখন ভক্তি-পথ নাই—কর্ম্মপথ বন্ধ—জ্ঞান-পথ রুদ্ধ, তখন আমার গতি নাই, বুঝিয়াছি। বুঝিলাম, আমার এ জন্মটা বৃথা গেল। আমার বৃথা আশা—বৃথা চেষ্টা। আমি সংসারে ডুব দিব, প্রবৃত্তির দাস হইব, ধর্ম্মকে দূর করিব। দেখি সে পথে একটু সুখ পাই কি না। যে কটা দিন বেঁচে থাকিব, কেবল সুখ খুঁজিব। প্রবৃত্তিকে আর সংযত করিতে চেষ্টা করিব না।

সন্ন্যাসী।—তুমি পাগল। ধর্ম্ম বিনা কি সুখ আছে! তুমি হতাশ হইও না। তুমি এখনও ভক্তি পথে যাইতে পারিবে। আমি আশা দিতেছি, চেষ্টা করিও। সদা সেই ভগবদ্বাক্য মনে রাখিও ;—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকংশরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

তোমার উপস্থিত রোগের এই মহৌষধ। প্রতিদিন এই মহাবাক্য স্মরণ করিও। যত বেশী বার স্মরণ করিতে পার, ততই মঙ্গল। ততই আশু ফল ফলিবে।

এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর চলিয়া গেলেন।

তাহার পর আমি কতক্ষণ শূন্য মনে সেই নির্জ্জন স্থানে বসিয়াছিলাম বলিতে পারি না। শৃগালের কোলাহল শুনিয়া চমক হইল। চাহিয়া দেখিলাম, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। অগত্যা গৃহে ফিরিলাম।

সেই হইতে অনেক দিন গিয়াছে। কিন্তু হায়! আমি কি করিয়াছি! আমি ত সেই দোকানদার ঠাকুর বা সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের উপদেশ শুনি নাই। তাঁহাদের বাক্যে আমার শ্রদ্ধা হইল কৈ? আমি এখন বুঝিয়াছি যে, এ জীবনে আর কিছু হইবে না। যদি জন্মান্তর থাকে, তবে পরে যদি কিছু হয়, দেখা যাইবে। ক্রমোন্নতি নিয়মে, প্রকৃতির নিত্য আপূরণ হইতেছে, বুঝিয়াছি। যদি মৃত্যুতে আমার জীবত্বের লোপ না হয়—তবে প্রকৃতিই ক্রমে তাহার আপূরণ করিয়া লইবেন। একজন্মে না হয়, দশ জন্মে আমার শক্তি হইবে। আবার বিশ্বাসকে পাইব, আবার সাধনা করিতে পারিব। এখন বৃথা হাঁকু মাকু করিয়া কি হইবে? আমি বুঝিয়াছি, এখনও আমি প্রকৃতির অধীন। আমার কোন পুরুষকার নাই, স্বাধীনতা নাই। এখনও আমার প্রকৃতির অধিকারের বাহিরে আসিবার জন্য চেষ্টা করিবার সামর্থ্য হয় নাই। আমার এখনও সাধনার সময় আসে নাই। যদি জন্মান্তর থাকে, তবে কখন না কখন তাহা আসিতে পারে। কিন্তু জন্মান্তর যে আছে, তাহা বুঝিলাম কই?

তদবধি জ্ঞানের পথ বল, কর্ম্ম পথ বল, ভক্তি পথ বল—সকলই বন্ধ হইয়াছে। এখন সংসার সমুদ্রে গা ঢালিয়া দিয়াছি। দেখি, কোথায় যাই। বাত্যাবিতাড়িত তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত সংসার সিন্ধুর উপর ভাসিয়া ভাসিয়া যাই-

তেছি, দেখি না কোথায় যাই। ডুবেছি, না ডুবতে আছি--দেখিব একবার পাতাল কতদূর। সেই হইতে বুঝিয়াছি,আর জ্ঞানের অভিমান করিব না—মূল অজ্ঞেয় তত্ত্ব জানিবার জন্য আর বৃথা চেষ্টা করিব না—আর কখন মনে আনিব না "বল্ দেখি ভাই কি হয় মলে?"

কিন্তু তা পারিলাম কই? সময় নাই,অসময় নাই কথাটা দুপ্ করিয়া অজ্ঞাতসারে কোথা হইতে আসিয়া মনের উপর আঘাত করে। বুকের কলিজা গুলাকে পিষিয়া দিয়া যায়। তাই আজ আমার এ দারুণ দুঃখের কথা তোমাদের কাছে খুলিয়া বলিলাম। তোমরা কি কেও বল্‌তে পার—"মলে কি হয়?"

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

মদনমোহন।

(কুচবিহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ দর্শনে।)

শান্তিময় ভাবময় মন্দির-মাঝারে
বিরাজিত মূর্ত্তিমান্ মদন-মোহন!
রজত-রচিত-ছত্র শোভে শিরোপরে
পদতলে বিস্তারিত সুচারু আসন।
মনোমদ কমকান্তি ভুবন-রঞ্জন
কনক-মুরলীধর বঙ্কিম-গঠন!

সুবর্ণের চারুচূড়া রতন-জড়িত
বিভাসিয়া চারিদিক কেমন উজলে!
পূত পীত পরিধেয় কিবা সুশোভিত,
হেরিলে ধড়ার শোভা মন যায় গ'লে।
এ মহা-মহিম-মূর্ত্তি রাজ-রাজেশ্বর
যে দেখেছে সেই জানে কেমন সুন্দর!

অনুপম বাল-কান্তি জলদ-বরণ
ভাবের অনন্ত জ্যোতিঃ স্ফুরিত বদনে!
বৃদ্ধ-শিশু-রমণীর মানস-মোহন
ধন্য দেব, একা তুমি জগতের মনে!
অই যে দক্ষিণ পদ রে'খেছ হেলা'য়ে
হেরিলে অসংখ্য চিত্ত যাইবে গলিয়ে।

ভক্ত-চূড়ামণি তব যে শিল্পী-প্রবর
রচিয়াছে তনু-কান্তি হেন ভাব-ময়,
পাইলে বারেক তাঁরে প্রসারিয়ে কর
জুড়াতেম আলিঙ্গনে তাপিত-হৃদয়।
উজ্জ্বল উরসে জ্বলে হীরকের হার!
সুবিমল নীলাকাশে নক্ষত্র কি ছার!

মধুর অধর শোভা!—বংশী-রন্ধ্র-পানে
অগ্রসরে সমাকুল হেন মনে লয়!
আবার কি মধুময় সঙ্গীতের তানে
মাতাবে জগতী-জনে ওহে দয়াময়!
কিবা ভাব দর্শনের সরল বঙ্কিম!
পাদ-পদ্ম পাণি-তল অলক্ত-রঙ্গিম!

যাঁর প্রতিমূর্ত্তি হেন মানস-রঞ্জন
যমুনা-পুলিন-চারী সে মোহন ছাঁদ
ত্রিভুবনে অনুপম—না জানি কেমন!
ধন্য সে গাণ্ডীবধর,—যাঁর ভুজবাঁধ
পরম যতন করি পরিতেন হরি
কৌস্তুভ-শোভিত চারু হার পরিহরি!

ধন্যরে দ্বাপরবাসী যাদব পৌরব!
যদুবংশ-সরোবর-সম্ভূত-কমল,
বিতরিয়া চারিদিক সৌরভ-বিভব
পুরাইলা তোমাদের কামনা সকল!
ধন্য তুমি রে যমুনে, দিনেশ-নন্দিনি,
পবিত্রিলা তব অঙ্গ শ্যাম গুণ-মণি!

ভূতলে বৈকুণ্ঠধাম তুমি বৃন্দাবন,
পালিত তোমার অঙ্কে নিখিল-পালক।
রাখালের বেশে সাজি রমা-বিনোদন
করিলা কতই কেলি নবীন নায়ক!
তব অঙ্গে কত কুঞ্জ নিকুঞ্জ কানন
এখনো বিরাজে, যাহে কলুষ নাশন!

হে ময়ূর, কটুস্বরে কি খেদ তোমার?
যাঁর পদাম্বুজ-রজঃ অমর-লোভন
তব পরিহৃত-পুচ্ছে শিরোশোভা,তাঁর
কতই আদরে তিনি করেন ধারণ!

তাইকি গগনে হেরি নব নীর-ধর
শ্যাম ভ্রমে হর্ষে পুচ্ছ বিস্তারিত কর!—

শব্দের অমৃত-নদ অয়ি বেণুবর,
কত জন্ম করেছিলে তীব্র আরাধনা,
মাধবের ফুল-দল-কোমল-দ্বিকর
অধর সহিত তাই তোমাতে যোজনা!
অচ্যুত-চুম্বন-সুধা করি তুমি পান
সুধাময় হ'য়ে সদা কর সুধাগান।

গাইলে তোমার স্বরে বন-ফুলমালী
উদ্ভ্রান্ত হইত ধরা শ্রবণ আশায়,
শিখাইলে কোকিলেরে ললিত কাকলী,
ঝঙ্কারে ভ্রমর—বুঝি শিখিবারে চায়।
কল্লোলিনী কলস্বন না পারি শিখিতে
বিদারে বিশাল বক্ষ তরঙ্গ-আঘাতে!

শ্যামাঙ্গের অঙ্গরাগ সৌরভ হরিয়া
মলয়-সমীর, তব গৌরব এমন!
পরিতুষ্ট জীব-কুল তোমারে পাইয়া
শান্তি-পূর্ণ মধুময় তব আলিঙ্গন!
দেব-কাম্য পুষ্পবাস চন্দন-বাসিত
বিতরণে মুগ্ধ কর ভব-জন-চিত!

বন-ফুল, সমতুল কি আছে তোমার?
কমলা-কান্তের তুমি সাধের ভূষণ!
বুঝিয়াছি ধন্য সৃষ্টি তোমা সবাকার,
ব্রজ-বিনোদের যত যতনের ধন!
হতভাগ্য অরে কলি পাপ-অবতার,
জন্মেছিস লয়ে শুধু পাতকের ভার!

দ্বাপরের অমৃতের অনন্ত-অর্ণব
শুকিয়ে গিয়াছে আজি তোর ভাগ্য-ফলে!
অবশেষে কণা-বিন্দু আছিল যে সব
তাও বুঝি যায় উড়ি নবীন-হিল্লোলে!
কেশব, এই যে তব প্রতিমা শোভন
এও কি লুকাবে কালে পতিত-পাবন?

দেখিয়া ভারত বাসী এ মধুর ঠাম
হৃদয় ঢালিয়া দিয়া যুগ-পদ-তলে,
পূরাবে না আর কি গো চির মনস্কাম?
ভাসিবে না আত্মোচ্ছ্বাসে নয়নের জলে?
মন্দির দুয়ারে নিত্য 'হরি' 'হরি' রবে
আর নাকি তব নামে গগন কাঁপাবে?

ভ্রান্ত আমি—জড়-মতি! তাই মোহ-বশে
প্রতিমূর্ত্তি বলি তোমা করেছি বিশ্বাস!
নিমগ্ন যে অনুদিন তব প্রেম-রসে
সে অতুল সুধাপানে যাঁহার অভ্যাস
সে জানে এদিব্য-মূর্ত্তি অমর অজর,
অসীম করুণা-রূপী তুমি পীতাম্বর!

তোমার বদন খানি বাৎসল্য-নিলয়!
স্নেহের প্রবাহ কারো ছুটি শত ধারে
অই নীল-সিন্ধু-জলে পরিণত হয়!
নিভৃত-হৃদয়-কক্ষে সোহাগ-আদরে
লুকাইয়া রাখে তোমা অতি সাবধানে!
সুস্বাদু ভোগের বস্তু দেয় চন্দ্রাননে!

তত্ত্ব-পথে চিত্ত কারো সতত ধাবিত,
সংজ্ঞাহারা—আত্মভোলা—মত্ত ভক্তি-মদে
তব পাদোৎপল-মধু-লোভে লালায়িত,
পূজে তোমা পরাৎপর সার গুরু বোধে!
সংযত পরম-নিষ্ঠ সেই ভাগ্যবান
অবিচারে পালে তব ন্যায়ের বিধান!

বিকার-বিহীন তব বিমল-মূরতি—
বারিদ-বিমুক্ত যথা উজ্জ্বল ভাস্কর—
হৃদি-শত-দলাসনে সন্তর্পণে অতি
স্থাপন করিয়া কেহ সংযোগ-তৎপর!
নিখিল মেদিনী যদি চূর্ণ হ'য়ে যায়
তথাপি নিশ্চল-মতি কটাক্ষে না চায়!

তাঁর চিদানন্দ-সরে উঠিয়া লহরী—
বিভোর করিয়া তাঁরে রাখে অনুক্ষণ!
ধরণী-আসনে বসি ধরা পরিহরি
অব্যয়-শাশ্বত ধামে করে বিচরণ!
উন্নত-শৈলেশ-শিরে বিহার যাঁহার
কূপ-মগ্ন-মায়া-কীটে কি করিবে তাঁর?

পিপাসা মিটায় কেহ পিতৃ-সম্বোধনে!
সংসারের শরে শরে হইয়া কাতর
আকুল-নয়নে যবে চাহে মুখ-পানে
ন্যস্ত করে আত্ম-ভার তোমার উপর!—
প্রসারি করুণা-ভুজ সুস্থ কর তারে
তনয়-বৎসল তুমি খ্যাত চরাচরে!

তুষ্ট কেহ দামোদর, প্রিয়-সম্ভাষণে,
প্রেম-ভরে দিতে চাহে গাঢ়-আলিঙ্গন!

পলকের ব্যবধানে যুগান্তর গণে
পরিশুদ্ধ-সখ্য-সুধা ভুঞ্জে অনুক্ষণ!
ভীষণ ঝটিকাকুল-ভব-পারাবারে
নির্ব্বিঘ্নে চালক তুমি চালাও তাহারে।

কোন নারী শুদ্ধ-শীলা করে প্রণিপাত
বাঁধে তোমা প্রাণেশ্বর প্রেমের বন্ধনে!
ভক্তি-মলয়জে মাখি আত্মা-পারিজাত
প্রদানে অঞ্জলি সুখে তোমার চরণে!
দূরীভূত মোহময়ী যতেক বাসনা
তব অনুরাগে মাত্র তাহার কামনা!

বাঞ্ছা-কল্প-তরু তুমি সদ্যঃ-ফল-দাতা,
প্রদানো অভীষ্ট বর পদাশ্রিত জনে
কাঁদে যবে ভক্তে বলি "কোথা দীন ত্রাতা
সমুদ্ধার কর প্রভো পাতক লাঞ্ছনে!"
নির্ব্বিকারে করুণার বিকার সঞ্চারে
আকুল হইয়া ধাও উদ্ধারিতে তারে।

নির্ব্বিকারে নিরাকারে পরিতৃপ্তি যাঁর
তোমায় অসীম-রূপে পূজে সেই জন!
আমি মূঢ় জড়-চেতা কি বুঝিব তার?
অসম্ভব দুরাশায় নাহি আকিঞ্চন!
দয়াময়, দয়া ক'রে কর আশীর্ব্বাদ
হেরিতে এ কান্তি তব থাকে যেন সাধ!

ভক্ত-চিত্ত-পুরী-সহ উজলি মন্দির
ঐ যে তুমি বিরাজিত বাঁকা শ্যামরায়
এমূর্ত্তি ঈক্ষণে অক্ষি থাকে যেন স্থির!
লক্ষ্য-হীন ভাবে যেন ভ্রান্তি না জন্মায়!
সাকারে সংযোগ করি অনন্ত মহিমা
ভুঞ্জি যেন চির দিন তার মধুরিমা!

তব পাদোদক-মধু আত্ম-শুদ্ধি-কর,
সুর পেয় সুধা যার সমতুল্য নয়
পান করি জুড়াইনু বিদগ্ধ অন্তর
এ সুধায় যেন নাথ চির সাধ রয়।
হৃদয় জ্বলিতেছিল না পেয়ে যে ধন
আজি সেই তৃপ্তি-মধু লভিনু এখন!

জুড়ালে লোচন আজি রাজীব-লোচন
প্রকাশি অতুল দয়া; কিন্তু দয়াময়,
দয়াময়ী কেন মোরে নিদয়া এমন?
জলদ দামিনী-শূন্য লাগে বড় ভয়!

যে দৃশ্যে প্রান্তরে পান্থ আতঙ্কে অধীর
আমারো হেরিয়া তাই হলো চক্ষুস্থির!

না না! ভয় কি আমার? এযে ভূভারতে
বৈকুণ্ঠ-বিহারী তুমি নহ ত এখন!
লৌকিকতা-রক্ষা তাই পারনি ভুলিতে!
জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃ-সহ এবে তব বিচরণ!
লাজ-ময়ী কমলিনী অন্তঃপুর মাঝে
বিরাজেন ফুল্ল-মনে ললনা-সমাজে!

ধন্য রঙ্গ লীলা-ময়, অগম্য চিন্তার
রসাতলে যায় বঙ্গ ঘোর স্বেচ্ছাচারে;
আদর করে না তাই এ মহা শিক্ষার,
পদ্ম-বাস পূতি-গন্ধে কলুষিত করে
মরি কি অদ্ভুত ভাব,—বিশ্বে নিরুপম!
নেত্র-ধর,হেরি নেত্রে নাশ মোহ-তমঃ!!

ধন্য হে অনন্ত দেব, ক্ষীরোদ ত্যজিয়া
ক্ষীরোদ-শায়ীর সঙ্গে তব অবতার!
দশাস্যের শক্তি-শেল হৃদয়ে ধরিয়া
ত্রেতায়, রাখিলে ভবে কীর্ত্তি চমৎকার!
ভ্রাতৃ-প্রেম কি যে ধন দেখালে ভুবনে!
সে মধুর যশোগানে মত্ত মহাজনে!

ভক্তি স্নেহে বিনিময় দ্বাপরে এখন,
অগ্রজ নাগেন্দ্র তুমি, অনুজ শ্রীবর!
ভ্রাতৃ-স্নেহে ঢল ঢল রেবতী রমণ,
দুইরূপে এক আত্মা কেমন সুন্দর!!
যেন নীলাচল শুভ্র তুষার রঞ্জিত!
সূর্য্যকান্তে নীল-কান্তে অথবা গ্রথিত!

পঞ্চমে বিনোদ ভাষী বংশীরব সনে,
সুগভীর শৃঙ্গনাদ মিশাও উল্লাসে!
মধুরে গভীরে মিশি পশিলে শ্রবণে
কার সাধ্য মত্ত-চিত্ত রাখিবে স্ববশে?
দেখাও ত্রিভঙ্গ-রূপে গলাগলি ধরি
চির-প্রেম পাশে বদ্ধ যুগল-মাধুরী!!

হে দেব, পুণ্ডরীকাক্ষ, আমি অভাজন
শক্তি-হীন ভক্তি-হীন বিঘ্ন-বিড়ম্বিত!
তোমার চরণে আসি লয়েছি শরণ,
মায়ের অঞ্চল এবে বহু দূরে স্থিত;
তুমি যদি মাতৃ রূপে স্নেহ না করিবে
অভাগা দুর্ব্বল তবে কেমনে বাঁচিবে?

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু।

উদ্বাহ-বিচার। (৪)

কৌলীন্যের কুফল।

তিব্বতবাসী ভিন্ন অন্য কোন জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের বহু বিবাহের কথা শুনা যায় না। পুরাণাখ্যাত কুন্তী এবং দ্রৌপদীর বহু বিবাহ বিশেষ ঘটনা মাত্র; এইরূপ ঘটনা বিশেষকে কোন সমাজের প্রথা বলা যাইতে পারে না। রমণীর বহু বিবাহ শুধু তিব্বতীয় সমাজেরই চিরন্তন প্রথা। সুতরাং তদ্বিষয় এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

এক ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করিলেই তাহাকে বহু বিবাহ বলা যাইতে পারে। এ হিসাবে হিন্দু রমণী ভিন্ন জগতের সমস্ত পুরুষ রমণীর মধ্যেই বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু পরিত্যাগ (divorce) কিম্বা মৃত্যু দ্বারা স্বামী বা স্ত্রীর বিয়োগ ঘটিলে, এক ব্যক্তি একাধিকবার বিবাহ করিলেও সমাজের বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় না। তবে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রী জাতির এবম্বিধ বহু বিবাহে নানা প্রকার সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে ভাবিয়া, হিন্দু সমাজ ইহা পোষণ করেন না। এই বিরোধে মতান্তর থাকিলেও, তাহা আমাদের সমালোচ্য নয়। স্বামী কিম্বা স্ত্রীর কোন প্রকার বৈধ অবিয়োগ সত্ত্বেও অপরের পাণি গ্রহণ করা যে নিতান্তই ঘৃণনীয় এবং অনিষ্টজনক, ইহা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যজাতি শত মুখে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য মত আমরা আলোচনা করিতে চাহি না। পুরুষের শেষোক্ত প্রকার বহুবিবাহে মুসলমানাদি বহু জাতির বিশেষ কোন আপত্তি আছে বলিয়া জানি না, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রকারেরা তদ্বিষয়েও একবারে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন;—

"ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্ব মারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।
পুনর্দ্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ॥"

মনুসংহিতা—৫ম অঃ, ১৬৮ শ্লোক।

"ভার্য্যা অগ্রে মরিলে, তাহার দাহাদি ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিবে এবং পুনরায় অগ্ন্যাধ্যান কার্য্য করিবে।"

মনু স্থানান্তরে বলিয়াছেন;—

"মদ্যপাঽসাধু বৃত্তা চ প্রতিকূলাচ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা ব্যাধিবেত্তব্যা হিংস্রাঽর্থঘ্নী চ সর্ব্বদা॥
বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃত প্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥
যা রোগিনী স্যাৎ তু হিতা সম্পন্না চৈব শীলতঃ।
সানুজ্ঞাপ্যাধিওব্যা নাবমান্যা চ কর্হিচিৎ॥"

মনুসংহিতা,—৯নঅঃ ৮০-৮২ শ্লোক।

"মদ্য পানাশক্তা দুশ্চরিত্রা, পতিবিদ্বেষিনী, অসাধ্য ব্যাধিগ্রস্তা, অপকার সাধনক্ষমা ও ধনক্ষয়কারিনী (অপব্যয় কারিনী) স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে আদ্য ঋতু হইতে অষ্টমবর্ষে, মৃত বৎসা হইলে দশম বর্ষেও কেবল কন্যা প্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে অধিবেদন করিবে; কিন্তু অপ্রিয়ভাষিনী হইলে, তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় বিবাহ করিবে। পীড়াগ্রস্ত অথচ পতিপ্রাণা সুশীলা স্ত্রীর অনুমতি লইয়া পতি অন্য বিবাহ করিবে; কদাচ তাঁহার অবমাননা করিবে না।"

এই সকল উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান থাকিলেই শাস্ত্রানুসারে একাধিক বিবাহ করা যাইতে পারে। কিন্তু অনেক নিম্নোদ্ধৃত শাস্ত্রীয় বচনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, স্বেচ্ছাকৃত বহুবিবাহেরও পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন।

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বাচ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥

মনুসংহিতা—৩য় অঃ, ১২।১৩ শ্লোক।

"দ্বিজাতিগণের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্ত।

স্বেচ্ছাকৃত পুনর্ব্বিবাহে বিভিন্ন বর্ণের নিম্নলিখিত স্ত্রীগণই পরস্পর শ্রেষ্ঠ হয়; শূদ্রাই কেবল শূদ্রের ভার্য্যা হইবে। শূদ্রাও বৈশ্যের বিবাহ যোগ্যা। শূদ্রা,বৈশ্যা এবং ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয় বর্ণের বিবাহ যোগ্যা এবং শূদ্রা,বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের বিবাহ যোগ্যা হইবে।"

"ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রকন্যাস্তু ন বিবাহ্যা দ্বিজাতি ভিঃ।
বিবাহ্যা ব্রাহ্মণী পশ্চাদ্বিবাহ্যাঃ ক্বচিদেব তু" ॥
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

দ্বিজাতিগণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির কন্যা বিবাহ করিবে না। তাহারা অগ্রে ব্রাহ্মণী (সবর্ণা কন্যা) বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ স্থল বিশেষে ক্ষত্রিয়াদি জাতীয় কন্যা বিবাহ করিতে পারে।

এই সকল শাস্ত্রীয় বচনের দোহাই দিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন,—"বহু বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য নহে।" কেবল উপরোদ্ধৃত বচনের প্রতি লক্ষ্য করিলে এ কথা বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্ত্রী বিদ্যমান থাকা সত্বে উপযুক্ত কারণ ব্যতীত যে বিবাহ, তাহা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কাম্য বিবাহ মাত্র। অপিচ,উপরিউক্ত বিধানানুসারে সবর্ণা বিবাহ ব্যবস্থেয় নহে; যাহারা এক স্ত্রী বর্ত্তমান সত্বেও স্বেচ্ছাক্রমে পুনর্ব্বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের পক্ষে বর্ণান্তরে বিবাহই উক্ত বচনানুসারে ব্যবস্থেয়। কলিযুগে অনুলোম বিবাহ (নীচবর্ণা কন্যা বিবাহ) নিষিদ্ধ,সুতরাং উক্ত বিধিমতে বর্ত্তমান কালে অসবর্ণা কন্যা বিবাহ করা যাইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বকথিত যুক্তি খণ্ডনার্থ আরও দুই একটী বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্ ॥"
মনুসংহিতা—৩য় অঃ, ১৫ শ্লোক।

"দ্বিজাতিগণ যদি মোহবশতঃ হীন জাতীয় স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পুত্র পৌত্রাদি সহ সবংশে শীঘ্রই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।"

এই বচনানুসারে ব্রাহ্মণগণের সবর্ণ ব্যতীত বর্ণান্তরে বিবাহ করিলেই পতিত হইতে হইবে। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে অনুলোম বিবাহ বিশেষ রূপে নিষিদ্ধ। স্বেচ্ছা-প্রণোদিত একাধিক বিবাহে সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করাও শাস্ত্রানুমোদিত নহে। তবেই দেখা যাইতেছে, শাস্ত্র-সম্মত কারণ ব্যতীত স্ত্রী বিদ্যমানে পুনর্ব্বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্রের ২য় প্রশ্নের ৫ম পটলস্থ ১২শ শ্লোকে বলা হইয়াছে;—"যে স্ত্রী দ্বারা ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্র লাভ হয়, তৎ বিদ্যমানে অন্য বিবাহ করিবে না।" এতদ্ভিন্ন একাধিক বিবাহ করিলে যে সবর্ণা এবং প্রথমা স্ত্রীই প্রকৃত স্ত্রী মধ্যে পরিগণিতা হন, ধর্ম্ম কার্য্যে স্বামীর সঙ্গিনী হন,গৃহকার্য্যে ও পতিপরিচর্য্যায় একমাত্র অধিকারিনী হন, অন্য কোনও স্ত্রীর যে সে অধিকার নাই, শাস্ত্রে একথার ভূরিভূরি প্রমাণ আছে। বিধান-পারিজাত-ধৃত কাত্যায়ণ বচনে, মৎস্য-সূক্তের ২১শ পটলে, মনুসংহিতার ৯ম অধ্যায়-স্থিত ৮৬ সংখ্যক শ্লোকে উহার বিশেষ প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে।

তবেই দেখা যাইতেছে, প্রথম পরিণিতা সবর্ণা স্ত্রীই ধর্ম্মপত্নী বলিয়া পরিগণিতা। অনুলোম বিবাহের অসবর্ণা স্ত্রী বা সবর্ণা জ্যেষ্ঠা ব্যতীত অন্য স্ত্রীগণ ধর্ম্মকার্য্যে, গৃহকার্য্যে বা স্বামীর পরিচর্য্যায় অধিকারিণী নহেন, সুতরাং তাঁহারা পত্নী মধ্যেই পরিগণিত হইতে পারেন না। বহু বিবাহ-প্রথা সমর্থনকারিগণ যে সকল বচনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, বহু বিবাহকে শাস্ত্র-সম্মত বলিয়া সাব্যস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, সেই সকল বচন যে নিতান্তই হেয় এবং কামুকের পক্ষে প্রযোজ্য, পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ দ্বারা তাহা সুন্দর রূপে বুঝা যাইতেছে। বস্তুত, শাস্ত্র-সঙ্গত

কারণ ভিন্ন অহেতুকি বহু বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত নহে। দেব-চরিত মুনিগণ কেনইবা এমন অসদ্বিষয় সমর্থন করিবেন ?

সাধারণ জ্ঞানেও বহু বিবাহের ভূরি ভূরি দোষ দৃষ্ট হয়। রাজা বাদসাহদিগের বহু বিবাহের ফলে যে কত রাজ্য ছারখার হইয়াছে, কত অমানুষিক লোমহর্ষণ ব্যাপার এবং রক্তপ্লাবী বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাহা রাজস্থান ও মুসলমান রাজ্যের ইতিহাস-পাঠকদিগকে বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। পৌরাণিক আখ্যান এবং মেয়েলী রূপ কথায়ও চিরকাল বহু বিবাহের কুফলময় দৃষ্টান্ত সমূহ অনুকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। সপত্নীকলহ বিদ্বেষে কত গৃহ যে অশান্তি এবং কুৎসিৎ ব্যাপারে প্রেতাবাস শ্মশানের ন্যায় বসবাসের অযোগ্য হইয়া থাকে, তাহা কৌলীন্য-প্রধান বঙ্গের অধিবাসীর নিকট বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না। দিন যেমন পড়িয়াছে, জীবিকা যেমন দুরূহ হইয়াছে, তাহাতে একটী স্ত্রী ও তদুৎপন্ন সন্তান সন্ততিগণের ভরণপোষণ এবং উপযুক্ত শিক্ষা বিধান করাই সাধ্যাতীত ব্যাপার। ধনী ইয়ুরোপ পর্য্যন্ত এ চিন্তায় ব্যাকুল। এইজন্য সে দেশে কত নরনারী অবিবাহিত অবস্থায় দিনপাত করিতেছে। ফরাশী দেশে বিবাহ-পরাঙ্মুখ যুবক যুবতীর সংখ্যাতিশয্য সমাজে বিপরীত কুফল সংঘটন করিয়াছে। হায়, দীন দরিদ্র বঙ্গ-বাসীর মনে অযথা পরিবার বৃদ্ধির বিষময় ফল-চিন্তা একবারও উদিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না !

হিন্দু শাস্ত্রমতে গৃহীর বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য। যায়া সহধর্ম্মিনী, যায়া-হীন ব্যক্তি যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে অনধিকারী। নিজের এবং বংশের উদ্ধার জন্য পুত্রোৎপাদনও বিবাহের ন্যায় হিন্দুগৃহীর অলঙ্ঘ্য কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য শিক্ষা, যুক্তিবলে এ বিধির অসারতা প্রমাণ করিতে পারে, কিন্তু নিষ্ঠাবান হিন্দুর বিশ্বাস তাহাতে চলিতেও না পারে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যুক্তি কয়জন বিশ্বাসী খ্রীষ্টানেরই বা বিশ্বাস টলাইতে পারিয়াছে ? শত সহস্র বিষয়ে বাইবেলের মত বিজ্ঞানের মতের বিরোধী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, অথচ বাইবেল ফেলিয়া "চার্চ্চে"কেহ বিজ্ঞান পাঠ করে না। যদিও দেখিতেছি, আধুনিক উচ্চ বংশজ হিন্দুগণের মধ্যে প্রায় পৌনে ষোল আনারও অধিক সংখ্যক ব্যক্তি জীবনের অধিকাংশ কার্য্যেই, শাস্ত্র বিধির প্রতি বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য রাখিয়া চলেন না, শাস্ত্রবিহিত হিন্দুজীবন এবং তাঁহাদের জীবন স্বতন্ত্র পদার্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; সকলই যেন সুবিধাবাদী, যেখানে আঁটাআঁটি ঠেকাঠেকি, স্বার্থের ও স্বেচ্ছাচারিতার বিঘ্ন বাধা উপস্থিত, শুধু সেই থানেই ঋষি ঋষি শব্দে চীৎকার, শাস্ত্রের দোহাই হাঙ্গামা ; নতুবা শাস্ত্রের কথা কেহ স্মরণও করেন কিনা সন্দেহ। কেহ কেহ বা রাজনীতির অনুরোধে, দেশোদ্ধারের জন্য হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান প্রয়াসী, বস্তুত, ধর্ম্ম-পিপাসায় উদ্দীপ্ত ধর্ম্মানুরাগীর দর্শন প্রাপ্তি দেশে অতি দুর্ল্লভ হইয়াছে। তথাপি নিজেদের কথায় উচ্চ আসন স্থাপন জন্য আমরা সমগ্র হিন্দুসমাজকে অনিষ্ঠাবান বলিতে প্রস্তুত নই, শাস্ত্রও অমান্য করিতে বলি না। কিন্তু শাস্ত্রের সারার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক দেশ, কাল ও অবস্থার অনুসরণ না করিয়া, বিধির সুবিধা লইয়া স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করাই বরং মহাপাপ। ধর্ম্মহানি নিবারণ এবং ধর্ম্মবৃদ্ধির অনুরোধে ভিন্ন, ধন-মান-বর্দ্ধন-কামনায় বহু-বিবাহের ব্যবসায় করিতে কোন্ মুনি, কোন্

ঋষি কোন্ শাস্ত্রে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা জানিনা। বঙ্গীয় রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণগণ যে শতাধিক পর্য্যন্ত বিবাহ করিয়া, বিবাহের ব্যবসায় করেন, তাহা কে না জানে? আমরা যথাস্থানে এইরূপ বহু বিবাহ-কারিগণের বিবাহের তালিকাদি প্রদান করিয়াছি। আশা করি, তদ্দ্বারা সকলেই এই কুৎসিৎ ব্যাপারের বিস্তৃতি কথঞ্চিৎ অনুধাবন করিতে পারিবেন। পবিত্র উদ্বাহ-ব্রত, দাম্পত্য প্রেম ও ধর্ম্ম, ব্যবসায়ীর নিষ্ঠুর হস্তে পড়িয়া কতই লাঞ্ছিত হইতেছে! হা দেশাচার, হা কুলাচার, তুমিই আজ সর্ব্বোপরি আসন পাইয়াছ! নিজের কুৎসা, নিজের গ্লানি রটনা করিতে কার হৃদয় সায় দেয়, কার না কণ্ঠ রুদ্ধ হয়? কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, এই নিদারুণ পাপ-ব্যবসায় দেশে ও পবিত্র সুস্থ সমাজে ঘোর ব্যভিচার-স্রোত প্রবহনেও বিশেষ সাহায্য করিতেছে।

দেশাচার ও কুলাচারের অনুরোধে শাস্ত্র বিধি কিরূপে দলিত হইতেছে, তাহা এই বহু বিবাহ ব্যবসায়ের আনুষঙ্গিক কুফলগুলি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইতে পারে। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা ঋতুমতি লইলে, শাস্ত্রমতে ভ্রূণহত্যাদির ন্যায় মহাপাতক হয়—এবং কন্যাদাতা পতিত হন। ভগবান ব্যাসদেব বলিয়াছেন;—

"যদিসা দাতৃবৈ কল্যাত্রজঃ পশ্যেৎ কুমারিকা।
ভ্রূণহত্যাশ্চ যাবতাঃ পতিতস্যাৎ তদপ্রদঃ" ॥

ব্যাসসংহিতা—২য় অঃ, ৭শ্লোক।

"যদ্যপি কন্যাদাতার অনবধানতা বশত অবিবাহিতাবস্থায় ঋতুমতী হয়, তবে ভ্রূণহত্যার পাতক হয়। ঋতুকালের পূর্ব্বে যে ব্যক্তি কন্যা দান না করে, সে পতিত হয়।

তপোধন বশিষ্ঠ দেবের নিম্নোদ্ধৃত বচন দ্বারাও উক্ত বাক্যের পোষকতা হইতেছে।

"পিতুঃ প্রদানাৎতু যদা হি পূর্ব্বং কন্যায়োষঃ সমতীত্য দীয়তে।
সাহন্তি দাতার পীক্ষমাণা কালাতিরিক্তা গুরুদক্ষিণে চ ॥
প্রযচ্ছেন্নগ্নিকাং কন্যামৃতুকাল ভয়াৎ পিতা।
ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠতাং দোষঃ পিতর মৃচ্ছতি ॥
যাবচ্চ কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি তুল্যৈঃ সকামাম ভিযাচ্যমানাম্।
ভ্রূণানি তাবন্তি হতানি তাভ্যাং মাতা পিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ ॥

বশিষ্ঠ-সংহিতা—১৭শ অধ্যায়।

"যদি পিতা দান করিবার অগ্রে কন্যাকাল অতীত হয় এবং তৎপরে কন্যা প্রদত্ত হয়, তবে সেই কন্যা গুরুর হিতরত উত্তম পাত্রে প্রদত্ত হইলেও দৃষ্টিপাতে দাতাকে অধঃপাতিত করে। পিতা ঋতুকাল ভয়ে শীঘ্র শীঘ্র না হইতেই কন্যাদান করিয়া থাকেন। অবিবাহিত অবস্থায় কন্যা ঋতুমতি হইলে দোষ হয়। অনুরূপ বর প্রার্থী আছে,—কন্যাও বিবাহ করিতে অভিলাষবতী, এমন অবস্থায় দান করা না হইলে, সেই কন্যা যত বার ঋতুমতী হইবে, পিতা মাতা ততবার ভ্রূণ হত্যার পাপী হইবে; ইহা ধর্ম্ম কথা।"

যমসংহিতার উক্ত হইয়াছে;—

"প্রাপ্তে দ্বাদশমে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্ ॥
মাতাচৈব পিতাচৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈবচ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্টা কন্যাং রজস্বলাম্" ॥

যম-সংহিতা—২২।২৩ শ্লোক।

"যে ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেছে দেখিয়াও কন্যা অর্পণ না করে, ঐ পিতা সেই কন্যার মাসে মাসে যে রজঃ হয়—সেই রক্তপান করিয়া থাকে; অর্থাৎ তৎতুল্য পাপী হয়।* মাতা পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কন্যা বা

* গর্ভ হইতে গণনা করিলে, দশম বর্ষের শেষ মাসে কন্যার বয়ঃক্রম ১০ বৎসর ১০ মাস হয়। আর দুই মাস অতীত হইলেই গর্ভ-দ্বাদশ-বর্ষ বয়ক্রম হইবে। অন্ততঃ এই সময়ে (দশম বর্ষের শেষ মাসে) দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেছে বিবেচনা করিয়া, কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত; ইহাই বচনের মর্ম্ম।

ভগিনীকে বিবাহ হইবার পূর্ব্বে রজস্বলা হইতে দেখিলে তাহারা তিন জনেই নরকে গমন করে।"

পরাশর-সংহিতার ৭ম অধ্যায়ে ৭।৮ শ্লোক দ্বারা উপরোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়,এবং সংবর্ত্ত সংহিতার ৬৭ শ্লোক দ্বারা উপরোদ্ধৃত ২৩শ শ্লোকটী অবিকল অনুকৃত হইয়াছে; সুতরাং ঐ সকল শ্লোক পুনরোদ্ধৃত করা অনাবশ্যক।

এই সকল বচনাদি দ্বারা পরিষ্কার রূপে প্রমাণিত হইতেছে, কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে ঋতুমতী হইলে, সেই কন্যার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ নিরয়গামী হইয়া থাকেন। এদভিন্ন এইরূপ কন্যার গ্রহীতাকেও পাপগ্রস্ত এবং হেয় হইতে হয়। যথাঃ—

"যাবন্নোস্তিদ্যোতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া অথ ঋতুমতী ভবতি দাতা প্রতিগ্রহীতা চ নরক মাপ্নোতি পিতৃ পিতামহ প্রপিতামহাশ্চ বিষ্ঠায়াং জায়ন্তে। তস্মাৎনগ্নিকা দাতব্যা" ॥ দায়ভাগ।

"স্তন প্রকাশের পূর্ব্বেই কন্যা দান করিবে। যদি কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে ঋতুমতী হয়, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে নরক গামী হয়। এবং পিতা, পিতামোহ, প্রপিতামহ বিষ্ঠায় জন্মগ্রহণ করে। অতএব ঋতু দর্শনের পূর্ব্বে কন্যা দান করিবে।"

"পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্য সংস্কৃতা।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা ॥
যস্তুতাং বরয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞান দুর্ব্বলঃ।
অশ্রাদ্ধেয়মপাংক্তেয়ং তং বিদ্যাদ্বৃষলী পতিম্ ॥"
উদ্বাহতত্ত্বধৃত।

"যে অবিবাহিতা কন্যা পিত্রালয়ে রজস্বলা হয়, তাহার পিতা ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হন। সেই কন্যাকে বৃষলী বলে। যে জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করে, সে অশ্রদ্ধেয় * অপাংক্তেয় † ও বৃষলী পতি।

ঋতুমতী কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে মহর্ষি পরাশর বলেন;—

"যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোঽজ্ঞান মোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যোহ্য পাঙক্তেয়ঃ সবিপ্রো বৃষলী পতিঃ ॥
পরাশর-সংহিতা, ৭ম অঃ ৯ম শ্লোক।

"যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞান মুগ্ধ হইয়া সেই কন্যাকে (ঋতুমতী কন্যাকে) বিবাহ করেন, তিনি শূদ্রপতি সদৃশ। তাহার সহিত কেহ এক পংক্তিতে ভোজন এবং সম্ভাষণও করিবে না।"

যমসংহিতার ২৪শ শ্লোকেও ঠিক উপরি-উক্ত বাক্যই বলা হইয়াছে। তাহাতে একার্থবোধক দুই একটী শব্দের বৈলক্ষণ্য দেখা যায় মাত্র।

ঋতুমতী কন্যার দাতা এবং গ্রহীতা উভয় পক্ষই যে পতিত এবং নিরয়গামী হইয়া থাকেন, পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় বচনগুলি দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব এ সম্বন্ধে অধিক বচন প্রমাণ খুঁজিতে যাইয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। তবে, একটী কথা এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক; মনুসংহিতার অষ্টম অঃ ২২৬ শ্লোকের মর্ম্মমতে অবিবাহিতা ঋতুমতী কন্যাগণ ধর্ম্ম কার্য্যে অনধিকারিণী, সুতরাং তাহারাও পতিতা মধ্যে পরিগণিতা।

বহুবিবাহ এবং ঋতুমতী কন্যার বিবাহ বিষয়ে ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এবম্বিধ নিষেধ থাকা সত্ত্বেও কুলীন ব্রাহ্মণগণ অকিঞ্চিৎকর কৌলীন্য মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত অহরহঃ অম্লানবদনে এই সকল শাস্ত্র-বিগর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হইতেছেন। তাঁহাদের এবম্বিধ অসঙ্গত ব্যবহারের দরুণ নিজেরাতো মজিতেছেনই—সমাজকেও মজাইতেছেন।

কুলীন সমাজের কুলাভিমানী ব্যক্তিগণের বিবাহ সংখ্যা এবং অবিবাহিতা কন্যাগণের বয়সের পরিমাণ ইত্যাদির সংবাদ বঙ্গীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের সকলেই অবগত আছেন। পরমারাধ্য স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়,১৯২৪ সংবতে (১২৭৪ সালে) হুগলী জিলায় বহু-

* যাহাকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলে শ্রাদ্ধ পণ্ড হয়।

† যাহার সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করিলে পাপ হয়।

বিবাহকারী ব্যক্তিগণের এক তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহাতে ১৩৩ জন কুলীনের নাম পাওয়া যায়, এবং মোট বিবাহ সংখ্যা ২,১৯৬টি প্রদত্ত হইয়াছে। আজকাল সকল বিষয়েরই একটা গড়পরতা হিসাব ধরিতে দেখা যায়,সেই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া, উক্ত তালিকা আলোচনা করিলে জন প্রতিগড়ে ১৬টী বিবাহ পড়িবে। তালিকার লিখিত বিবাহের উচ্চসংখ্যা ৮০টী এবং নিম্নসংখ্যা ৫টী বটে। এই তালিকার নিম্ন ভাগে বিদ্যা-সাগর মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

"সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে, আরও বহুবিবাহ-কারীর নাম পাওয়া যাইতে পারে। ৪,৩,২ বিবাহ করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি অনেক ; বাহুল্যভয়ে এস্থলে তাঁহাদের নাম নির্দ্দিষ্ট হইল না।"

বহুবিবাহবিচার—১মপুঃ, ৬৫ পৃঃ।

এতদ্ভিন্ন ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ২৩শে ফাল্গুন তারিখের সঞ্জীবনীতে যশোহর,খুলনা, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিসাল, এবং বর্দ্ধমান প্রভৃতি জিলার বহুবিবাহকারিগণের এক তালিকা বাহির হইয়াছিল। তাহাতে মাত্র ৯৬ জন লোকের নাম পাওয়া যায়। উক্ত তালিকার বিবাহের উচ্চসংখ্যা ৩৬টী এবং নিম্নসংখ্যা ২টী। বলা বাহুল্য যে, এই তালিকা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত ; অনেক নাম এই তালিকাভুক্ত হয় নাই এবং অনেক নামের বিবাহের প্রকৃত সংখ্যার অপেক্ষা তালিকায় কম লিখিত হইয়াছে। আর এক সংখ্যক সঞ্জীবনীতে অনেক নামের তালিকা বাহির হইয়াছিল।

পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া, বহুবিবাহ কারিগণের এক বৃহৎ তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার "নোটবুক" হইতে বাছিয়া বাছিয়া, পূর্ব্ববঙ্গের ৬৮টী ব্যক্তির নাম লইয়াছিলাম। তাহাতে দেখা যায়, উক্ত ৬৮জন লোকের মোট বিবাহ সংখ্যা ৯৬৭টী উর্দ্ধ সংখ্যা ১০৭ এবং নিম্নসংখ্যা ২টী। এস্থলে বলা আবশ্যক,এই তালিকা,আমাদের সমালোচিত সঞ্জীবনীর প্রকাশিত তালিকা হইতে সম্পূর্ণ নূতন। ইহা ভিন্ন আরও বিস্তর নাম আমাদের জানা আছে, যাহা ঐ সকল তালিকা ভুক্ত হয় নাই। আমাদের অজ্ঞাত কত নাম যে তালিকার উঠে নাই, তাহা ভগবানই জানেন।

কুলীন কন্যাগণের বিবাহ সাধারণতঃ যৌবন অতীতেই হইয়া থাকে ; অনেকের বৃদ্ধ বয়সেও বিবাহ হইয়াছে। এমনও দেখা গিয়াছে,অনেক কুলীন রমণী বৃদ্ধবয়সে মরিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জীবনে আর বিবাহ হইল না। অনেক স্থলে বৃদ্ধা রমণীর, অল্পবয়স্ক বালকের সঙ্গে, অথবা যুবতী কন্যার বর্ষীয়ান বৃদ্ধের সঙ্গেও বিবাহ হইতে দেখা গিয়াছে। এই সকল কথা সম্বন্ধে কুলীনকুল-গৌরব সমাজ-সংস্কারক শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে পুস্তক লিখিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা একবার পাঠ করেন, আমরা বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি। তিনি ভুক্তভোগী লোক, তাঁহার যুক্তিযুক্ত কথা অন্তর ভেদ করে। কৌলীন্যের অপকারিতা সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাপেক্ষা আমরা অধিক আর কি লিখিব। আমরা ভরসা করি, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, সমাজের বহু বিবাহ প্রথা সংশোধন করিয়া, সমাজকে ঘোরতর পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবেন। (সমাপ্ত)

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

সাধ্বী অঘোর কামিনী দেবী।*

মহা প্রস্থান।

"এসেছে আমার যাবার সময় ;
বাড়ী যাই, বাড়ী যাই ;
চ'খে জল নাই, ভবে মায়া নাই,
তবে আর দেরি নাই।
রহিল গো সত্য তোমাদের তরে,
নাহিক সম্বল আর ;
এ সত্য পালিও, না রবে জীবনে
ভয়-তাপ-পাপ-ভার"।
নিবে আসে দীপ, জ্ব'লে উঠে প্রাণ,
জ্বলন্ত অনল সম ;
নাহি দেহে বল, তবু কণ্ঠে গান,
"তুমি হে ভরসা মম"।
ভক্তদল মিলে, ভাসি অশ্রুজলে,
মার নাম-গুণ গায়,
ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, তবু মা মা বলে,
কর-তালী দেয় সায়।
অন্তিম নিশ্বাস বহিল তাঁহার
মায়ের মধুর নামে,
হেসে হেসে তাই, গেলেন চলিয়ে
মায়েব আনন্দ-ধামে।

আবাহন।

"হাসিয়ে হাসিয়ে, মা নাম গাহিয়ে,
কে আসে কে আসে ওই ?
কার পুণ্যালোকে এ অমর-লোকে
আলোকিত সবে হই ?
আসিছে বিজয়ী বীর সুর-নারী
বিজয়-মুকুট-প'রে,
চল যাই সবে ডেকে আনি তারে
জয়-জয় ধ্বনি ক'রে।"
খদিজা, মৈত্রেয়ী, গোপা, গার্গী, মেরী,
সুর-নারী যত আর ;
জয় জয় ব'লে আসেন সকলে
যথা পরলোক-দ্বার।
"এস গো ভগিনী অঘোর কামিনী,
এস এস সাধ্বী সতী,
সার্থক জীবন, আদর্শ রমণী,
ধন্য তুমি পুণ্যবতী!"
দিলেন সকলে মহাকুতূহলে
প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন ;
কি মহা উচ্ছ্বাস! কি মহা আনন্দ!
কি অপূর্ব্ব সম্মিলন ?

পরিচয়,—সাধন ও প্রচার।

"বহুদিন হ'তে সুনাম তোমার
আমাদের জপমালা ;
বহুদিন হ'তে, শুনি তব মুখে
মা নাম অমিয়া ঢালা।
যবে পতি-পাশে, গৃহ-দেবালয়ে,
বসিতে পূজিতে মায়,
তোমার পূজায় আমাদেরো পূজা,
কৃতার্থ হ'তাম তায়।
রোগীর শিয়রে, শোকার্ত্তের প্রাণে,
কে দিবে সান্ত্বনা আর,
তুমি বিনা দেবী শোন হাহাকার,
বাঁকিপুর অন্ধকার!
রাজ-গৃহ-পথে, রেলের শকটে,
প্রতিবাসী ঘরে ঘরে,—
কে আর মা ব'লে কাঁদিবে, কাঁদাবে,
তেমন প্রেমের ভরে ?
কি যে দুটী আঁখি, পেয়েছিলে তুমি!
এত অশ্রু কোথা ছিল ?
এত গো দরদ কোথা পেলে তুমি ?
কে তোমারে শিখাইল ?
বল বল শুনি তেমনি আবার,
তেমনি আবার বল,
"জয় মা, জয় মা" আঁখি-নীরে ভেসে,
ভাবে প্রেমে ঢল ঢল!

ব্রহ্মচর্য্য ও সেবা।

"বঙ্গ-কুলনারী চিরবিলাসিনী
জগতে জানিত সবে,
সধবা সে নারী ব্রহ্মচর্য্য লয়!
কে শুনেছে কোথা কবে ?
অধ্যাত্ম-বিবাহে, আত্মিক মিলনে,
পতি সেবা কর সতী!
এমন সধবা কয়টী ভারতে ?
কজন এমন সতী ?

* বাঁকিপুর নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশ চন্দ্র রায়ের পরলোকগতা পত্নী।

সার্থক তোমার সাধন ভজন,
সংযম, সেবা-ব্রত!
বৈরাগ্যে তোমার ঘুচিল বঙ্গের
বিলাস-কলঙ্ক যত।
সন্তান তোমার কাঁদিয়া অধীর;
প্রতিজ্ঞা অটুট তবু!
বঙ্গ-নারী-প্রাণে এতই বীরত্ব!
কে জানিত আগে কভু?
আপনার সুখ ভুলিলে গো তুমি,
পরকে করিতে সুখী;
পরের সেবায়, পরের ব্যথায়,
আপনি হইলে দুঃখী;
সেবার আগুন জ্বলিল তোমাতে,
থাকিতে পার কি ঘরে?
তাই কি ছুটিলে ব্রাহ্মণী যথায়
কাতরা সুতিকা-জ্বরে?
শিয়রে বসিয়ে কত সেবা দিয়ে,
হরিলে যাতনা তার;—
পূর্ণ হ'ল কাল, মানাম শুনালে,
আসিল সে ভব-পার।
কে কোথা কাতর কোন্ ছাত্রাবাসে,
খুঁজে খুঁজে ছুটে গেলে!
দারুণ বসন্ত, বিসূচিকা-ভয়,
কিছুতে না ভয় পেলে!
মা নাই নিকটে, তাই কি তাদের,
মায়ের দায়িত্ব নিলে?
আপন সন্তানে জল চিড়া দিয়ে,
মিষ্টান্ন এদের দিলে।
নাহিক পুস্তক, নাহিক বেতন,
সঙ্কটে সম্বল-হারা,—
কেন মার মত, তোমারি বা কাছে,
ছুটিয়া আসিল তারা?
কাঁদিল পরাণ ছুটিলে অমনি,
পুর-নারী-দ্বারে দ্বারে;
ভিক্ষা ক'রে এনে তুষিলে সন্তানে,
মা বিনে কে এত পারে?"

নারীর জন্ত দরদ।

"নারী অপমান দেখে দেশময়
কত না পাইলে ব্যথা!
"আজিও হয়নি নারীর সম্মান"
লিখে গেলে শেষ কথা।

বড় ব্যথা পেলে, যবে গো শুনিলে
আশান্সোল অত্যাচার;
আবেদন ক'রে লাট-পত্নী কাছে
চাহিলে গো প্রতিকার।
গয়া-যাত্রী নারী রেলের ষ্টেসনে
না পায় বিশ্রাম-স্থান;
জলে ঝড়ে রোদে কত কষ্ট পায়,
কাঁদিল তোমার প্রাণ।
সে দুঃখ দূরিতে, কত ব্যস্ত হ'য়ে,
করিলে গো আবেদন,
ফলিল সুফল তোমারি চেষ্টায়,
হইতেছে আয়োজন।
নারী কি একাই অজ্ঞান আঁধারে
চিরদিন প'ড়ে রবে?
তোমার কোমল নারীর পরাণ
কতদিন আর স'বে?
শাসন-পালন—সুশিক্ষা-প্রণালী
দেখিয়া শিখিবে ব'লে,
ছুটিলে গো লক্ষ্ণৌ জেনানা মিসনে,
নয় মাসে সিদ্ধ হ'লে।
করিলে স্থাপিত নারী-বিদ্যালয়,
নারীর উন্নতি-আশে
করিলে স্থাপিত ছাত্রী-সেবা তরে,
ছাত্রীবাস নিজবাসে।
কোথা সিন্ধু দেশ, কোথা বঙ্গ দেশ,
বেহারে চলিল ছাত্রী,
অজানিত টানে ছুটে এলো সবে,
মহাতীর্থে যেন যাত্রী!
বাড়ী বাড়ী গেলে দৃষ্টান্ত দেখালে,
কথায় হবে না জেনে,
ঘোর শত্রু যারা মিত্র হলো তারা,
মেয়ে দিল হার মেনে।
জ্ঞান-ধর্ম্ম-নীতি, সংসারের বিধি,
শিখালে কত কি আর;
জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে যথায়,
শিক্ষা নয় গুরু-ভার।
লাট-সহকারী বোল্টনের মুখে
সুখ্যাতি ধরে না তার,
দেখে বিদ্যালয় বলেন বিস্ময়ে,
"এমন দেখিনে আর।",
নাহি দিন রাতি, ছাত্রীবাসে তুমি
ছাত্রী তরে ব্যস্ত কত!

নিজ হাতে রেঁধে, নিজে বেঁটে দিয়ে,
সেবা কর মার মত।
এত ও পারিতে! কেমনে পারিতে
সে ক্ষীণ শরীর ল'য়ে?
এত সেবা-ভার নয় সাধ্য কার,
বাঙ্গালীর মেয়ে হ'য়ে?
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য বাঁকিপুর?
ধন্য সে ভারতভূমি!
আত্ম-জয়ী হয়ে দেশ-জয়ী হ'লে,
কাল-জয়ী নারী তুমি!
চল দেবী চল, ল'য়ে যাই সবে,
গাইয়ে মায়ের জয়;
ব্রহ্মানন্দ যথা চিদানন্দ রসে,
আনন্দে আনন্দময়!

ব্রহ্মানন্দ-দর্শন।

"এস দেবী এস," ব'লে ব্রহ্মানন্দ
ডেকে লন সমাদরে;
"ব্যাকুল আমরা এ অমর-পুরে
বহুদিন তোমা তরে।
হ'লে চিরজয়ী বীর-নারী তুমি,
সম্মুখ সমরে ঘোর;
সেবার নেশায় অঘোর-বিভোর;
ধন্য গো সাধ্বী অঘোর!
ছিল বড় সাধ তোমাদের ল'য়ে
রচি প্রেম-পরিবার;
পূরেছে সে সাধ গড়েছ জীবন;
কি সুখ আজি আমার!
এত কাল ধ'রে এত সেবা ক'রে,
তবু তিরপিত নও!—
এ আনন্দ ধামে দেব-সেবা ক'রে
চির-তিরপিত হও।
অনন্ত জীবন সম্মুখে তোমার
অনন্ত সাধন লও;
অনন্ত বন্ধনে অনন্ত মিলনে,
অনন্তে মগন হও।"

শ্রীকালী নাথ ঘোষ।

তীর্থদর্শন

২৭শে অক্টোবর (১৮৯৫) প্রাতে অগ্রবন অর্থাৎ আগ্রা ত্যাগ করিয়া ভোর ট্রেণে বৃন্দাবন যাত্রা করিলাম। যখন বেলা ১১টা, তখন আমরা মথুরা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। মথুরায় দেখিবার এমন কিছু নাই বলিয়া, সেস্থানে আর নামিলাম না। আগ্রায় যেমন মুসলমানের কীর্ত্তি, বৃন্দাবনেও তেমনি হিন্দুর কীর্ত্তি রহিয়াছে। বৃন্দা দূতী এই বনে বাস করিতেন বলিয়া ইহার নাম বৃন্দাবন হইয়াছে। পথেই পাণ্ডার দল আমাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিল। যাঁহারা তীর্থ স্থানে গিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তীর্থস্থানে পাণ্ডাদের হাতে কি ভোগই না ভুগিতে হয়! এই ভোগ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবং অপরিচিত স্থানে বাসা ইত্যাদির সুবিধার আশায়, আমরা যুগলকিশোরকে পাণ্ডা করিলাম। পাণ্ডাজি শিকার পাইয়া মহা উৎফুল্ল হৃদয়ে আমাদের গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন, তাঁহার সেই সস্মিত মুখ মণ্ডল এখনও যেন দেখিতেছি। ১২ টার সময়ে বৃন্দাবনে পৌঁছিলাম। পাণ্ডা গাড়ী ভাড়া করিল, এবং আমাদিগকে লইয়া ভগবান দাসের কুঞ্জে উপস্থিত হইল। এই কুঞ্জটী একটী চকমিলান দোতালা বাড়ী বিশেষ। কুঞ্জ বলিলেই মনে হইত যে, লতা পাতায় মণ্ডিত সুন্দর বাগান, সেই তপোবন ... বাগানের ভিতরে শান্তিময় কুটীর সকল বিরাজ করিতেছে। ভগবান দাসের কুঞ্জে আসিয়া সেই কাল্পনিক কুঞ্জ অন্তর্হিত হইল। এই কুঞ্জটী যমুনার নিকটে, বাড়ীর গেটটী বেশ বড়। এইরূপ

অনেক কুঞ্জ এখানে আছে। বড় বড় লোকে যাত্রী ও বৃন্দাবনবাসিগণের সুবিধার জন্য এই সব কুঞ্জ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, অল্পমূল্যে ভাড়া পাওয়া যায়। আমাদের কুঞ্জে ৩০ জন বিধবা বাস করেন, ইঁহারা অধিকাংশই বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়া। সকলেই কায়স্থ জাতীয়া, পাবনা জেলা বাসিনী। অধিকাংশের খরচই বাড়ী হইতে আসে। ইঁহারা যাবজ্জীবন বৃন্দাবনে বাস করিবেন বলিয়া এখানে আছেন। আমরা উপর তলায় একটী কামরা ভাড়া লইলাম। জনৈক বিধবা আমাদিগকে পাক করিয়া দিলেন। আমাদিগের পাণ্ডা আমাদিগের পরিচর্য্যার জন্য একটী বালক নিযুক্ত করিয়া দিল। আমরা যমুনার কেশীঘাটে স্নান করিলাম। কৃষ্ণ কেশী নামক দৈত্যকে এই ঘাটে বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহার নাম কেশীঘাট হইয়াছে। যমুনায় কচ্ছপের বড়ই প্রাদুর্ভাব। তীর্থস্থান বলিয়া ইহাদের উপর কেহ অত্যাচার করে না। ঘাটে যাওয়া মাত্র ১০।১২টী কচ্ছপ ভাসিতে ভাসিতে আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। আমরা ভয়ে জলে না নামিয়া ঘটিযোগে উপরেই স্নান করিলাম। কচ্ছপগুলিকে দেখিলে ঘৃণা ও ভয় উভয়ই উপস্থিত হয়। আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া একজন পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। বিদেশে বেড়াইতে আসিয়া এত বাঙ্গালী আর কোথাও দেখি নাই। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। কাশী যেমন শাক্তদিগের, বৃন্দাবন তেমনই বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ। সেইজন্য বৃন্দাবন বৈষ্ণব বৈষ্ণবীতে পরিপূর্ণ। অধিকাংশ মাথাই ওলের ন্যায় কামান এবং তরমুজের বোঁটার ন্যায় চৈতনযুক্ত। বৃন্দাবনের বানরও প্রসিদ্ধ। পথে, ঘাটে, গাছে, ছাদে সর্ব্বত্রই কেবল বানর। বাহিরে কিছু রাখিবার যো নাই, রাখিলেই খাবার লোভে তাহা লইয়া উচ্চস্থান আশ্রয় করে, কিছু খাবার জিনিস দিলে জিনিসটী ফেলিয়া দেয়, না দিলে নষ্ট করিয়া ফেলে। তীর্থস্থানে এবং পশ্চিমে বানর, হনুমানের বড়ই সম্মান, সেইজন্য মর্কটদিগের দৌরাত্ম্য বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে মথুরা হইতে দলে দলে রাজ-পুরুষেরা আসিয়া, এখানে বানর, হরিণ ও ময়ূর শিকার করিতেন। রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর দরখাস্ত করিয়া বানর মারা রহিত করিয়াছেন। আমরা এইরূপ নরবানরের মধ্য দিয়া প্রথমে নিকুঞ্জ বনে (বিহার-কুঞ্জ) আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা এবং সখীদিগের সহিত বিহার করিতেন। কুঞ্জটী বড়। প্রস্তর-নির্ম্মিত আঁকা বাঁকা সুন্দর রাস্তা কুঞ্জের নানা স্থানে লতার ন্যায় গিয়াছে। এই স্থানে অসংখ্য বানর। বানরদিগের জন্য কিছু খাবার আনা হইয়াছিল। বানরেরা আক্রমণ করিয়া আমাদিগের পাণ্ডার নিকট হইতে সমুদায় লুটিয়া লইল। যে স্থানে গোবিন্দ ষোড়শ সহস্র গোপিনী সহ ক্রীড়া করিতেন, সেই স্থান এখন বানর বানরীদিগের লীলানিকেতন হইয়াছে। একটী ক্ষুদ্র ঘরে রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে ফুলশয্যা করিয়া রাখা হয়। প্রাতে নাকি দেখা যায় যে, কেহ যেন শয়ন করিয়াছিল। কথিত আছে, এক চোবে দেখিবার জন্য এক রাত্রি এখানে বাস করিয়াছিল; প্রাতে দেখা গেল, সে বোবা হইয়া রহিয়াছে। শুনিলাম, বৃন্দাবনে কাক থাকে না। ব্রজবাসিগণের বিশ্বাস, রাধিকাদেবীর ঘুমের ব্যাঘাত হইবে আশঙ্কা করিয়া সন্ধ্যার সময়ে

তাহারা বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া যায়। ললিতা-কুণ্ড প্রভৃতি দেখিয়া, বস্ত্রহরণ বৃক্ষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাছের গোড়া ও ঘাট বান্ধান। কৃষ্ণ গোপিনীগণের বস্ত্রহরণ করিয়া এই গাছে উঠিতেন বলিয়া পাণ্ডারা বেশ দুই পয়সা রোজগার করিতেছে। অনেক-গুলি কাপড় গাছে ঝুলান আছে। কথিত আছে,এই ঘাটের নিকটস্থ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বকা-সুর নিহত হইয়াছিল। স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য মন্দ নয়। ইহার পর আমরা নিম্নলিখিত মন্দিরগুলি দেখিলাম।

(১) সাজির মন্দির।—আগ্রা ও দিল্লী মুসল-মানদিগের মসজিদে পরিপূর্ণ; আর বৃন্দাবন হিন্দুর মন্দিরে আচ্ছন্ন। এটী একটী উৎকৃষ্ট মন্দির। প্রায় সমুদায়ই শ্বেত পাথরের কাজ। নানারূপ ছবি ও মুর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। শ্বেতপাথর কাটিয়া ঢেউতোলা করিয়া নানা ভঙ্গিতে থাম-গুলি প্রস্তুত করা হইয়াছে। রক্ষক আমাদি-গের জন্য একটী সুসজ্জিত হল খুলিয়া দিল। হলটী ক্ষুদ্র বটে কিন্তু ঐশ্বর্য্য,সৌন্দর্য্য ও আড়-ম্বরের একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। আলো দিবার নানা প্রকার বন্দোবস্ত আছে, আলো দিলে না জানি কি সুন্দরই দেখায়। মন্দিরটীর গঠনপ্রণালী ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। নেপালের একজন ধনী বণিক বহু অর্থ ব্যয়ে এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। একস্থানে তাঁহার এবং তাঁহার স্ত্রী ও ভ্রাতার চিত্র চিত্রিত রহিয়াছে।

(২) গোবিন্দজীর মন্দির।—এইস্থানে গোবিন্দজী রাধা ও ললিতার সহিত বিরাজ করিতেছেন। ইনি দিবসের এক এক সময়ে এক এক বেশ ধারণ করেন। ইহা বৃন্দাব-নের সকল মন্দির হইতে উচ্চ। কথিত আছে, ইহার চূড়া দিল্লী হইতে দেখা যাইত বলিয়া হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী আরঙ্গজিব তাহা ভাঙ্গিয়া দেন। মূর্ত্তিগুলিও কোন কোন স্থানে ভাঙ্গা, বাদসাহ তাহাদের উপরও অত্যাচার করিতে ছাড়েন নাই। এখন বিগ্রহ নূতন মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। অম্বর-রাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক ১৫৯০ অব্দে গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহা এখন জয়পুরের মহা-রাজার তত্ত্বাবধানে আছে। মহারাজ সেবার জন্য বৃন্দাবনের আয়ের এক তৃতীয়াংশ দান করিয়াছেন। কৃষ্ণ যদু-বংশের পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া ইহাঁকে রাজপুতেরা অত্যন্ত ভক্তি করে। কৃষ্ণ মাখনভক্ত ছিলেন,এজন্য এখানে সেবার জন্য প্রচুর মাখন দেওয়া হয়। এই মন্দিরটী ভারতবর্ষের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ ও প্রধান মন্দির। পুরাতনটী দেখিতে বড়ই চমৎ-কার। ইহা হিন্দু শিল্পের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল।

(৩) শেঠের মন্দির।—মথুরাবাসী গোবিন্দ দাস ও রাজকৃষ্ণ দুই ভাই এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ১৮৪৫ অব্দে আরম্ভ হইয়া ছয় বৎ-সরে শেষ হয়। ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া-ছিল। ইহার আশি ফিট করিয়া উচ্চ গেট তিনটী বড়ই সুন্দর। এই মন্দিরটী যেন একটী দুর্গ বিশেষ। চারিদিকে শত শত কামরা-যুক্ত অট্টালিকা বিরাজ করিতেছে। মধ্য-স্থলে প্রকাণ্ড মন্দির। যে দেখিবে,সে-ই বিস্মিত ও সুখী হইবে। মন্দিরের সম্মুখে প্রসিদ্ধ সোণার তালের গাছ। ভূগর্ভে ইহার ১৬ এবং উপরে ৪০হাত আছে। ইহা একটী থাম। তাল গাছের সহিত বড় একটা সাদৃশ্য দেখিলাম না। থামটী সোণার পাতে কিংবা গিল্‌টী করা তামার পাতে জড়িত। দশ হাজার টাকা ব্যয় হই-য়াছে। এখানে সদাব্রতের বন্দোবস্ত আছে।

(৪) ব্রহ্মচারীর মন্দির।—গোয়ালিয়রের রাজার গুরুদেব এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া

দিয়াছেন। মধ্যে প্রকাণ্ড হল। শ্বেতপাথরের কাজ। দেখিলাম, সন্ধ্যার সময়ে কীর্ত্তন হইতেছে। দলে দলে লোক বিগ্রহ ও মন্দির দেখিয়া বেড়াইতেছে।

(৫) লালাবাবুর মন্দির।—পাইকপাড়ার রাজাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবু এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করেন। এটী একটী দেখিবার মত জিনিস। লালাবাবু ইহার জন্য ৪০ হাজার টাকা আয়ের বিষয় লিখিয়া দিয়াছেন। প্রত্যহ সেবার জন্য এক শত টাকা বরাদ্ধ আছে। প্রতিদিন এখানে পাঁচ শত লোক প্রসাদ পাইয়া থাকে। পোনের দিনের বেশী কেহ আহার পায় না। বৃন্দাবনে কাহাকেও উপবাসী থাকিতে হয় না। লালাবাবু স্বয়ং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন, তাহাই আহার করিতেন। ব্রজবাসিনীরা লালাবাবুর জন্য রুটি প্রস্তত করিয়া রাখিত। সেই হইতে লালাবাবুর নামে এক প্রকার রুটি প্রচলিত আছে। শেষ অবস্থায় লালাবাবু গোবর্দ্ধনে আসিয়া বাস করেন। এই স্থানেই হঠাৎ পতিত হওয়ায় তাঁহার অপমৃত্যু ঘটে। শাক্তেরা এই অপমৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ করে যে, "যখন তিনি বৈষ্ণব হইয়া নৌকাযোগে বৃন্দাবনে আসেন, তখন কাশী ঘাটে উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণব হইয়া শাক্তের তীর্থ দেখিবেন না বলিয়া নৌকার পর্দ্দা ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা দেন। এই পাপের জন্য তাঁহার অপমৃত্যু ঘটিয়াছে।"

এতদ্ভিন্ন মদনমোহন, গোপীনাথ, যুগলকিশোর প্রভৃতির মন্দির এবং গোকুল, গোবর্দ্ধন ইত্যাদি দেখিবার স্থান রহিয়াছে। পথ, ঘাট, বৃক্ষ ও মন্দির শ্রীকৃষ্ণের জীবন কাহিনী নীরব ভাষায় প্রচার করিতেছে। মথুরা ও বৃন্দাবন যেন জীবন্ত কৃষ্ণচরিত।

সুন্দর সুন্দর ভিক্ষার্থী বালকগণ কখন ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে, কখন যুগল মিলনে সম্মুখে আসিয়া গান করিতে করিতে নাচিতে লাগিল। কিছু না দিলে তাহারা 'দাদা একটা পয়সা দাও' বলিয়া আদরে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। তাহাদের সেই সুন্দর আব্দার ও মধুর ডাকে পরাস্ত হইয়া শেষে কিছু কিছু দিতে হইল। প্রায় দেব মন্দিরের সম্মুখেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

২৮শে অক্টোবর স্নান ও আহারান্তে বৃন্দাবন ত্যাগ করিলাম। যখন আমাদের গাড়ী মথুরা হইয়া যমুনার পুলের উপর আসিল, তখন যমুনা-বক্ষ হইতে মথুরাপুরীকে বড়ই সুন্দর দেখা যাইতে লাগিল। যমুনা-গর্ভ হইতে সৌধ সকল উঠিয়াছে। সুধা-ধবলিত, স্তরে স্তরে সজ্জিত, অট্টালিকা শ্রেণী,—যমুনা নদী ও তাহার পুলিন এবং অতীত স্মৃতি একত্র মিলিত হইয়া, অন্তর ও বাহির এক মধুর ভাবে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। যমুনা-বক্ষ হইতে সৌধ-কিরীটিনী মথুরার আলোক-চিত্র লইলে সুদৃশ্য চিত্র উঠিতে পারে।

দিল্লীর যাত্রীদিগকে হাতারশে ট্রেণ পরিবর্ত্তন করিতে হয়। আমরা হাতারশ-জংসনে নামিলাম। ইহা একটী প্রকাণ্ড ষ্টেশন। এখানে ৮ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইল। আহারান্তে রওনা হইয়া রাত্রি ৩টার সময়ে দিল্লীতে অবতরণ করিলাম; এবং নিকটবর্ত্তী একটী সরাইয়ে উপস্থিত হইয়া একটী কামরা ভাড়া করিয়া শয়ন করিলাম। প্রাতে ৮টার মধ্যে স্নান ও আহারাদি সমাপন করিয়া একখানি এক্কা করিয়া এগার মাইল দূরবর্ত্তী পৃথ্বীরাজের দিল্লী দেখিবার জন্ত যাত্রা করিলাম। এই দীর্ঘ পথটী বড়ই সুন্দর। দুই ধারে বৃক্ষ-

শ্রেণী, ইহারই মধ্য দিয়া আমাদের গাড়ী চলিতে লাগিল। পথের দুই পার্শ্বের স্থান কেবল ভগ্নাবশেষ অট্টালিকার ভগ্নস্তূপে পরিপূর্ণ। দেখিলেই প্রাচীন দিল্লীর ঐশ্বর্য্য ও বিস্তার দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। দিল্লী হিন্দুরাজ্যের মহাশ্মশান, মুসলমান-সাম্রাজ্যের মহাসমাধি এবং মহাকালের ভীষণ লীলা-ক্ষেত্র। প্রায় ৩০ মাইল ব্যাপিয়া প্রাচীন অট্টালিকার ইষ্টক ও ভগ্নস্তূপ ইন্দ্রপ্রস্থের সাক্ষী স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ বিশপ হিবর সাহেব এই ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া কহিয়াছিলেন, প্রকাণ্ড লণ্ডন নগর যদি কালে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার ধ্বংসাবশেষ ইন্দ্রপ্রস্থের তুল্য হইবে না। আমার প্রাণের ভিতরে অতীতের স্মৃতি ও মহাভারত জীবন্ত হইয়া উঠিল। সেই জীবন্ত মহাভারত পাঠ করিতে করিতে, দেখিতে দেখিতে এগার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া প্রসিদ্ধ কুতুব মিনারের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহা উচ্চে ২৩৮ ফিট, গোড়ার পরিধি প্রায় ১৪০ ফিট। উপরে উঠিবার জন্য ভিতরে ৩৭৫টী সিঁড়ি আছে। লালবর্ণ বেলে পাথর ও শ্বেত-পাথরের-যোগে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা পাঁচতালা অর্থাৎ থাকে বিভক্ত। ইহাদের উচ্চতা নিম্ন হইতে ক্রমে ৯৫, ৫১ ৪১, ২৬ ও ২৫ ফিট। কলিকাতার অক্টরলোনীর মনুমেণ্টের উচ্চতা ১৬৫ ফিট। কথিত আছে, ইহা পৃথ্বীরাজ নির্ম্মাণ করেন, পরে কুতুব ভাঙ্গিয়া পরিবর্ত্তিত আকারে গঠন করিয়াছেন। ইহারই অনুকরণে নিকটে আর একটী নির্ম্মিত হইতেছিল; অসম্পূর্ণাবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ কেইন সাহেব কুতুব মিনারের গঠন-প্রণালী, সৌন্দর্য্য, বর্ণ, ও বিচিত্রতা সন্দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, সমুদায় পৃথিবীর ভিতরে এক ফ্লরেন্স নগরের টাওয়ার ব্যতীত সর্ব্ব বিষয়ে ইহার তুল্য টাওয়ার আর দ্বিতীয় নাই। কুতুব ইহা আরম্ভ করেন, এবং আলতমাসের সময়ে তাহা শেষ হয়। আমরা প্রথমে লাল ফোর্টে গেলাম। ইহাতে পৃথ্বীরাজের বাড়ী ও দুর্গ ছিল। লালফোর্ট দ্বিতীয় অনঙ্গপাল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহারই পুত্র তৃতীয় অনঙ্গপাল মামুদের ভয়ে লালফোর্টে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার পরিধি প্রায় আড়াই মাইল, প্রাচীর প্রায় ৬০ ফিট উচ্চ এবং চতুর্দ্দিক পরিখা-বেষ্টিত। দক্ষিণ দিকের গড় বুজিয়া গিয়াছে। ইহার পর পৃথ্বীরাজের ভুতখানায় গেলাম। মন্দিরের গাত্রে ও থামে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। পদ্মনাভ নারায়ণ, ঐরাবত পৃষ্ঠে দেবরাজ, হংসপৃষ্ঠে পিতামহ ও ষাঁড়ের পৃষ্ঠে নন্দী সহ মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। অনেক মূর্ত্তিই মুসলমানদিগের অত্যাচারে ছিন্ননাসা, বিকৃত-কলেবর ও হস্তহীন হইয়াছে। অনঙ্গপালের দীঘি ১৬৯ ফিট লম্বা ও ১৫২ ফিট প্রস্থে। ইহারই নিকটে প্রসিদ্ধ জাহান পান্না। সাহজাহানের কন্যা জাহানারা পিতাকে সেবা করিবার জন্য সাহজাহানের সহিত কারাগারে গিয়াছিলেন। এই স্থানে তাঁহার কবর আছে। এই পিতৃভক্তিপরায়ণা কন্যার নাম দিল্লীতে বড়ই আদরণীয়। মুসলমানদিগের প্রথম বাদসাহ কুতুবের সুন্দর ও বৃহৎ কবর দেখিয়া আমরা কুতুব-মিনারে উঠিলাম। সিঁড়িগুলি বড়ই সুন্দর, তথাপি আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। অধিকাংশই উঠিয়াছিলাম। উঠিয়া চতুর্দ্দিকে কি মহা শ্মশানই না দেখিলাম! এক দুইজন নহে—হিন্দু, পাঠান ও মোগল এই স্থানে আপন আপন প্রেতকার্য্য

সম্পন্ন করিয়াছে। যে স্থানে দুই একজনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা হয়, সেই শ্মশানক্ষেত্র দেখিয়া যদি প্রাণে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়,তবে যে স্থানে বিধাতা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া তিনটী মহাবংশের শেষ দেহকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, সেই মহাশ্মশানক্ষেত্রে আসিয়া প্রাণে যে মহাভাব ও বৈরাগ্যের সঞ্চার হইতে পারে, তাহা বলা যায় না, দর্শক তাহা অনুভব করিয়াই বুঝিতে পারেন। অদূরে অতীত সাক্ষী যমুনা ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। যমুনা কত বংশের উত্থান পতনই দেখিল, কত বংশের অন্তর্জলিও না করিল! কত বংশের অন্তিম ভস্ম ভাসাইয়া শোকের গান গাইতে গাইতে কত লোককেই না কত মহা উপদেশ প্রদান করিল! চতুর্দ্দিকব্যাপী ভগ্নস্তূপাবলী অতীত বংশের স্তূপীকৃত কঙ্কালরাশির ন্যায় শোভা পাইতেছে। যাঁহারা শবসাধন করিতে ইচ্ছুক,তাঁহারা পিতৃপুরুষগণের এই মহাশ্মশানক্ষেত্রে আসিয়া এই অনন্ত কঙ্কাল রাশির মধ্যে আপনার সাধনআসন স্থাপন করুন।

ইন্দ্রপ্রস্থ, নূতন দিল্লী,সবই এখান হইতে দেখা যাইতেছে। এখান হইতে অষ্টাদশ-পর্ব্ব লক্ষ-শ্লোকাত্মক মহাভারতের জন্ম হইয়াছে, এই স্থান হইতেই ভারতের সর্ব্বনাশকারী ভ্রাতৃদ্রোহের জলন্ত-উদাহরণ-স্থল কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সূচনা হইয়াছে,এই স্থান হইতেই ভারতের বর্ত্তমান অবনতির বীজ উপ্ত হইয়াছে, এইস্থান হইতেই ভারত আপনার ধর্ম্মশাস্ত্র গীতা, পুরাণ ও ভাগবত, আপনার বল ও ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া জগৎকে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন। এস্থানের গৌরবে মৃত ভারত এখনও গৌরব করিতেছেন এবং সভ্য জগতের শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। নূতন দিল্লী দেখিবার বাসনা তত বলবতী ছিল না; পাণ্ডব, কৌরব ও চৌহান বংশের মহা-শ্মশান-ক্ষেত্র ইন্দ্রপ্রস্থ দেখিতে আসিয়াছিলাম—দেখিয়া জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিলাম। চারি দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। উঃ চতুর্দ্দিকে কি ভীষণ শ্মশান! কি মহাশ্মশান!! অগ্নিহীন ধূমশূন্য সহস্র সহস্র চিতা কুতুবমিনারের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া, উঃ কি লোমহর্ষণ ভাবেই জ্বলিতেছে!!!

কুতুবমিনার হইতে অবতরণ করিয়া দেবালয়ের প্রাঙ্গণস্থ প্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভটী দেখিতে গেলাম। ইহাকে লোকে ভীমের গদা বলে। পিলারটীর বহির্বেষ্টন ১৬ ফিট ৪ ইঞ্চি; ভূমি হইতে উচ্চতা ২২ ফিট। গোড়ার ২ফিট প্রস্তরে বান্ধান। এই স্তম্ভের অঙ্গে ছয় পংক্তি লিপি খোদিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহা পড়িয়া জানিয়াছেন যে, রাজা ধুর কর্ত্তৃক ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইনি বৌদ্ধ রাজা বলিয়া অনুমিত হয়েন। পিলারটী বিশুদ্ধ লোহায় নির্ম্মিত। একজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া লিখিয়াছেন যে, হিন্দুগণ এত পূর্ব্বে এরূপ বৃহৎকায় ও গুরুভারবিশিষ্ট লৌহদণ্ড নির্ম্মাণ ও উত্তোলন করিয়াছিলেন, যাহা এখনও ইউরোপীয়গণেরও বিস্ময়ের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। পৃথ্বীরাজ ও কুতুব উদ্দীনের দিল্লী দেখিয়া আমরা যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে যাত্রা করিলাম। ইহা নূতন দিল্লী হইতে দুই মাইল দক্ষিণে। আমাদের পথে হুমায়ুনের কবর পড়িল। ১৫৬০ অব্দে পিতা হুমায়ুনের স্মরণার্থ, মহাত্মা আকবর কর্ত্তৃক ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৬ বৎসর লাগিয়াছিল। উচ্চতা ৭০ ফিট,ব্যাস

৬০ ফিট। সমুদায় ভারতের মধ্যে ইহা একটী আশ্চর্য্য সমাধি-মন্দির। এই স্থানে আকবর-জননী হাসিদা বাবু এবং দারা, ফিরোজ সা, জাহান্দার সা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আলমগীর প্রভৃতিরও কবর আছে। ইহার চারিধারে সুন্দর বাগান শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বে বাগানের নানা স্থানে সজীব ফোয়ারা সকল জলক্রীড়া করিত; তাহার চিহ্ন এখনও আছে। ইহার পর আলাউদ্দীনের সুদৃশ্য কবর দেখিয়া মহাভারতের লীলাক্ষেত্র ইন্দ্রপ্রস্থের কেন্দ্রস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হুমায়ুন-জয়ী সের সা এইস্থানে আপনার রাজধানী স্থাপন ও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চ পাণ্ডবকে পাণিপত, সোনপত, ইন্দ্রপত, টিলপত ও ভাগপত নামক যে পাঁচ খণ্ড জমী দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে টিলপত ও ভাগপত এখনও বর্ত্তমান আছে, অপর তিনখানা যমুনার গর্ভে অদৃশ্য হইয়াছে। পুরাতন দুর্গ যে স্থানে ছিল, সেরসা তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া সেইস্থানে আপনার কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যে স্থানে মহাবীর অর্জ্জুনের দুর্গ ছিল, সেই স্থানে হুমায়ুনের মস্জিদ শোভা পাইতেছে। যে স্থানে পাণ্ডুপুত্রগণ নারায়ণ ও মহর্ষি ব্যাস কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিতেন, সেই স্থানে সেরসার রাজবাড়ী কালের ভীষণ পরিবর্ত্তনের কথা ঘোষণা করিতেছে। আর, যে স্থানে রাজসূয় মহাযজ্ঞ উপলক্ষে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গান্ধার প্রভৃতি দেশের রাজা মহারাজা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন,—যে স্থানে দর্পহারী মধুসূদন দর্পিত শিশুপালের দর্প হরণ করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যক্ষেত্র যজ্ঞ ক্ষেত্রের কোন চিহ্নই নাই,—সেইস্থানে সাহজাহান কর্ত্তৃক ১৬৩১ অব্দে নূতন দিল্লী নির্ম্মিত হইয়াছে। সেরসা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া তাহার নাম সেরগড় রাখেন; কিন্তু লোক এক্ষণে তাহাকে ইন্দ্রপথ বা পুরাতন কেল্লা বলিয়া থাকে। এখানে এখন দরিদ্রের কুটীর ও দোকান বিরাজ করিতেছে! সেরসার দুর্গের সুপ্রশস্ত ও সুদৃঢ় প্রাচীরোপরি উঠিলাম। যে স্থান ভীম অর্জ্জুনের পদভরে কম্পিত হইত, যে স্থান মহর্ষি ব্যাসের অমৃত নিস্যন্দিনী কবিতার মাধুর্য্যে পরিপ্লুত হইত, যে স্থানের আকাশ যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণের অমৃতময় জ্বলন্ত উপদেশে প্রতিধ্বনিত হইত, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম। বর্ত্তমান ভুলিয়া, আপনাকে বিস্মৃত হইয়া, যেন সেই দ্বাপর যুগে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। মহাভারতের ঘটনা সমুদায় যেন জীবন্ত হইয়া মানস নেত্রের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। দুর্গের উপর দাঁড়াইয়া প্রাচীন গৌরব ও বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিতে লাগিল। আকুল প্রাণকে আরও আকুলিত করিয়া এই নীরব ধ্বনি হইল;—

কত কাল পরে বল ভারত রে,
দুখ সাগরে সাঁতারে পার হবে।

শরীর রোমাঞ্চিত হইল!! বিধাতাই জানেন, সে দিন কত দূরে!

ইহার পর বাসার দিকে ফিরিলাম। দূর হইতে দিল্লীর জগদ্বিখ্যাত যুমা মস্জিদের চূড়া দেখা যাইতেছিল। ক্রমে আমাদের গাড়ী মস্জিদের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। হিন্দুদিগের বিনা পাশে প্রবেশ নিষেধ; আমরা অন্য স্থান হইতে পাশ আনিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সাহজাহান চতুর্থ বর্ষে আরম্ভ করিয়া দশম বর্ষে ইহা শেষ

করেন। এই মস্‌জিদ যে বেদির উপর উত্তোলিত হইয়াছে, তাহা অতি অদ্ভুত, না দেখিলে বুঝান যায় না। ৪০টী সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া বেদির উপরে উঠিলাম। মস্‌জিদটী মক্কারদিকে মুখ করিয়া আছে। ইহা দিল্লীর সমুদায় বাড়ী হইতে উচ্চ। ইহা দৈর্ঘ্যে ২৬০ ফিট ও প্রস্থে ১২০ ফিট। এক এক জনের জন্য এক এক খানি আসন নির্দিষ্ট আছে, ইহা লম্বা ৩ ফিট ও প্রস্থে ১½ ফিট। শ্বেত পাথরের আসনগুলি কাল পাথরের বর্ডারযুক্ত। প্রস্তর-নির্ম্মিত বহুসংখ্যক আসন আছে। শুক্রবারে প্রায় দশ হাজার লোক একত্র হইয়া থাকে। দেখিলাম, মন্দিরটীর জীর্ণসংস্কার হইতেছে। অজু করিবার জন্য মধ্যে একটী সুন্দর ও বৃহৎ জলপূর্ণ চৌবাচ্ছা আছে। যে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সুন্দর ও সুদৃশ্য আধারে কোরাণ রক্ষিত হইয়াছে, তাহা একখানি ক্ষুদ্র ঘর বিশেষ। বাহির হইতে দেখিলাম; হিন্দুর ভিতরে যাওয়া নিষেধ। নূতন দিল্লী সহরের নাম সাজেহানাবাদ। ইহার চারি ধারে প্রাচীর, ভিতরে যাইবার জন্য কাশ্মীর, কাবুল, লাহোর, আজমীর, দিল্লী, কলিকাতা প্রভৃতি নামে গেট আছে। কলিকাতা-গেটের ভিতর দিয়া রেলওয়ে গিয়াছে। আমরা চাঁদনী চক দিয়া বাসায় আসিলাম। চাঁদনী চক (রূপার রাস্তা) লম্বায় এক মাইল এবং প্রস্থে ৭০ ফিট। শাল, চাদর, কিংখাপ ও সোণা রূপার কাজ এখানে সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়। বাদসাহেরা রাস্তাকেও কেমন সুন্দর ও বিলাসপূর্ণ করিতেন, তাহা রূপার রাস্তাটী (চাঁদনী চক) দেখিলে বেশ বুঝা যায়।

সাহজাহানের কেল্লা দেখিতে আর তত ইচ্ছা হইল না। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাসায় আসিলাম। বিশ্রামান্তে কুইন্সগার্ডেনে বেড়াইতে গেলাম। ইহা আমাদের বাসার নিকটেই, ষ্টেশনের অপর পারে। আহারান্তে আমরা দুইজনে হরিদ্বারে যাত্রা করিলাম। পূর্ণিমার যোগ বলিয়া হাজারে হাজারে হরিদ্বারে যাত্রী যাইতেছে। আমরা মধ্যশ্রেণীর যাত্রী বলিয়া জনতা হইতে কতক রক্ষা পাইলাম।

ভোরে উঠিয়া দেখি, আমরা সাহরাণপুর আসিয়াছি। গিরিরাজ হিমালয় বিরাট দেহ বিস্তৃত করিয়া রাগে রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছেন। অদূরে তুষার-মণ্ডিত হৃষীকেশের শিখরদেশ প্রাতঃ-সূর্য্যের তরল কিরণে অনুরঞ্জিত হইয়া অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছে। মুগ্ধ প্রাণে এই মধুর দৃশ্য দেখিতে ২ লাকৃসার হইয়া বেলা ৯টার সময়ে হরিদ্বারে উপস্থিত হইলাম। আমাদের পাণ্ডা গোবর্দ্ধন তাঁহাদের বাসায় আমাদিগকে লইয়া গেলেন। বাসাটী অতি সুন্দর স্থানে, পর্ব্বতের গায়ে। বাসার নীচ দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছেন, গঙ্গার অপর পার হইতে পর্ব্বতশ্রেণী উঠিয়াছে। জল প্রস্তরে প্রতিহত হইয়া শ্রুতি-মধুর-কল্লোল-ধ্বনি উৎপন্ন করিতেছে। আমরা একটী ক্ষুদ্র কুটুরী দখল করিয়া বসিলাম। আমাদের কুটুরী হইতে নদী, পর্ব্বত সমুদয়ই সুন্দর দেখিতেছি। পূর্ণিমার যোগ বলিয়া হরিদ্বার যাত্রীতে পূর্ণ হইয়াছে। জয়পুরের মহারাজা দলবলে আসিয়াছেন। যাত্রী-নিবাস সকল যাত্রীতে পূর্ণ হইয়াছে। ২।১ টী বাঙ্গালীর সহিত কচিৎ দেখা হইল। অধিকাংশ লোকই বিহারী ও রাজপুত।

আমরা প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে গেলাম। ঘাট যাত্রীতে পরিপূর্ণ। ঘাট প্রস্তরে বান্ধান। গঙ্গার একটী খরস্রোত বক্রভাবে

এই স্থান দিয়া যাইতেছে। ছোট বড় কত শত মাছ বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। হাত হইতে খাবার খাইতেছে। কি সরলতা! কি স্বাভাবিক ভাব!! কিছুক্ষণ এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম। বাঙ্গালী মৎস্যপ্রিয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মাছের এইরূপ সরলতা, বিশ্বাস ও নিঃশঙ্কতাপূর্ণ ভাব দেখিয়া তাহাদের সহিত যে খাদ্য খাদকতা সম্বন্ধ আছে, সে ভাব আদৌ মনে আইসে নাই। জলচরে স্থলচরে এত আত্মীয়তা, খাদ্য খাদকের এমন সুহৃদ্ ভাব, ধর্ম্ম গ্রন্থে পড়িয়াছি, আর আজ তাহা জীবনে প্রত্যক্ষ করিলাম। লোকের জনতা ভেদ করিয়া যেমন ঘাটে নামিলাম, তেমনই মৎস্যের জনতা ভেদ করিয়া জলে নামিতে হইল। জল বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, কারণ পর্ব্বতস্থ বরফ সকল গলিয়া স্রোত রূপে বহিয়া যাইতেছে। জল অল্প, কিন্তু স্রোত বড়ই প্রখর। স্থির ভাবে দাঁড়ান মুস্কিল। সম্মুখে কাঠ ও লোহার একটী ক্ষুদ্র পুল আছে। বড় আরামে বরফ জলে স্নান করিলাম। খাদ্যখাদক সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া কিছু ক্ষণ ব্রহ্মকুণ্ডে মৎস্যের সহিত একত্র কোলাকুলি ভাবে স্নান করিলাম; তাহারা বিশ্বস্ত ভাবে আমাদের সহিত খেলা করিতে লাগিল। আহারাদি সমাপন করিয়া বিকালে কন্‌খলে গেলাম। বাসা হইতে ৪ মাইল দূরে। বৃন্দাবনের ন্যায় এখানে বানরের বড় প্রাদুর্ভাব। কন্‌খলে যাইবার পথে গঙ্গার প্রসিদ্ধ কেনালের উৎপত্তি স্থান দেখিলাম। এই সুদীর্ঘ কেনাল কাণপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। হরিদ্বারে গঙ্গায় এক সুদূর বাঁধ দিয়া ইহার অধিকাংশ জলকেই খাল পথে লইয়া যাওয়া হইতেছে। এই খালকে লোকে কটলীখাঁর খাল বলে। যখন খনন আরম্ভ হয়, হরিদ্বারের পাণ্ডারা কাটাখালে গঙ্গা যাবেন না বলিয়া দম্ভ করিয়াছিল। তাহাতে কটলী হাস্য পূর্ব্বক এই উত্তর দেন, ভগীরথ যাকে শঙ্খের শব্দে লইয়া গিয়াছিল, আমি তাহাকে চাবুকের জোরে অনায়াসেই লইয়া যাইতে পারিব। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এই অদ্ভুত খাল খনন করিয়া, স্থান বিশেষে নদীর উপর ও মধ্যদেশ দিয়া এমন ভাবে লইয়া গিয়াছেন যে, দেখিলে হতজ্ঞান হইতে হয়। সেতুর উপর দিয়া আমরা কন্‌খলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হরিদ্বারের দুই দিকে দুই পর্ব্বত-শ্রেণী, মধ্যে ত্রিধারা হইয়া গঙ্গা প্রবাহিত। এই তিন ধারা কন্‌খলে আসিয়া মিলিয়াছে। এইস্থানে বিদুর যোগ সাধন করেন, এবং এই স্থানেই বিদুর-মৈত্রেয়ী সংবাদ হয়।

হরিদ্বারে গঙ্গা যেন কিশোরী বালিকা। বাল্যের চঞ্চলতা, যৌবনের উদ্ভিন্ন শ্রী এবং লজ্জাশীলতা একত্র সমাবেশ হওয়ায়, কিশোরী গঙ্গার কি সৌন্দর্য্যই না বিকাশ পাইতেছে! কিশোরী বালিকা পর্ব্বতে জন্ম গ্রহণ করিয়া কূল ছাড়িয়া অকূলে প্রাণ সঁপিবার জন্য গুন্ গুন্ স্বরে অনন্ত পথের পথিক হইয়াছে। প্রতিরোধকারী পর্ব্বতের চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য কতই না মিনতি করিতেছে! রসিক পর্ব্বত প্রতিধ্বনি-চ্ছলে কত আমোদই করিতেছে। এই রসিকতা ও মিনতি একত্র মিলিত হইয়া কি এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতই রচিত হইতেছে। প্রকৃতির এই অস্ফুট গানে ভাবুকের ভাব, ভক্তের ভক্তি, প্রেমিকের প্রেম এবং বিশ্বাসীর বিশ্বাস উথলিয়া উঠে। প্রকৃতি নীরব আহ্বানে সকলকে অনন্তের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছে—এই জন্যই হরিদ্বার তীর্থক্ষেত্র এবং যোগী ঋষির আদরের স্থান। পর্ব্বত-দুহিতা আপনার প্রাণের আকুল ক্রন্দন পর্ব্বতের

চরণে অর্পণ করিতে করিতে আকুল প্রাণে আপনার জীবন-নাথের উদ্দেশে ছুটিয়াছে! কাহার সাধ্য এ গতিকে রোধ করে? তাই কূল ভাঙ্গিয়া, দেশ ডুবাইয়া, রাজ্য ভাসাইয়া কত প্রতিকূল অবস্থা ও ঘটনার সহিত সংগ্রাম করিয়া, যুবতী গঙ্গা, সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া, আপনার প্রাণ-সমুদ্রকে আলিঙ্গন করিতেছে। যেমন বুকভরা আশা, তেমনই হৃদয়-ভরা আলিঙ্গন। হরিদ্বার এই জন্য দাম্পত্য প্রণয়ের শিক্ষা-গুরু। সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি আর্য্য সতীগণ এই দাম্পত্য প্রণয়ের প্রতিকৃতি স্বরূপা। প্রকৃতি শব্দহীন ভাষায় এই দাম্পত্য-প্রণয় ভারতকে শিক্ষা দিতেছেন।

ভক্তিশিক্ষার্থীও হরিদ্বারে আসিয়া মহান শিক্ষালাভ করিতে পারেন। ভক্তিমন্দাকিনীর উৎস বিধাতা সকলের হৃদয়-কন্দরেই নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। যখন তাঁহার কৃপায় হৃদয়কন্দর ভেদ করিয়া সেই উৎস ভক্তবৎসল লীলাময় শ্রীহরিকে পাইবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হয়, তখন ভিতর ও বাহিরের পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা, শত শত লোকের প্রতিকূলতাচরণ, সকলই সেই স্রোতে ভাসিয়া যায়। রাগানুগা ভক্তি গঙ্গার ন্যায় নির্ম্মল ও স্বাভাবিক। পার্থিব পাপপঙ্কে, লোকের বিদ্রূপ আবর্জ্জনায় এই জলকে অপবিত্র করিতে পারে না। আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া, আপনার গানে আপনি উন্মত্ত হইয়া, আপনার সৌরভে আপনি বিমোহিত হইয়া, ভক্ত অহেতুকী ভক্তির স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে জীবনসমুদ্রে আপনাকে সমর্পণ করেন। সে মিলন কি সুন্দর! কি মধুর!! কি পবিত্র!!! রাধাকৃষ্ণের মিলন ইহারই প্রতিরূপ, মধুর ভাবের ইহাই পরিণতি। ভক্তিশিক্ষার্থী এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে হিমালয়ের পাদমূলে এই নব ভক্তিগীতোপনিষৎ পাঠ করিতে পারেন। প্রকৃতির এই মহাগ্রন্থ অভ্রান্ত, ইহা সকলেরই ধর্ম্ম-শাস্ত্র। বিশ্বাস-নেত্রে পাঠ করিলে, আত্মা কৃতার্থ, হৃদয় শীতল, প্রাণ তৃপ্ত এবং বাসনানল নির্ব্বাপিত হয়।

প্রকৃতির মহাগ্রন্থের এই সমুদায় পাঠ করিতে করিতে কন্‌খলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কন্‌খলে দেখিবার এমন বিশেষ কিছু নাই। মন্দির দেখিলাম। হিন্দুর নিকট কন্‌খল এক মহাতীর্থ ক্ষেত্র। প্রসিদ্ধ 'কুশাবর্ত্ত' দেখিয়া বাসায় আসিলাম।

বাসায় আসিয়া বিশ্রাম করিয়া, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে একখানি কম্বল গায়ে জড়াইয়া গঙ্গার ধারে ধারে ধীরে ধীরে বাঁধা ঘাটে বেড়াইতে লাগিলাম। আস্তে আস্তে ব্রহ্মকুণ্ডে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে আহা কি দৃশ্যই দেখিলাম! প্রকৃতির এমন মুক্ত আলয়ে এমন মনোমোহন দৃশ্য আর দেখি নাই। দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ প্রাণে ব্রহ্মকুণ্ডের সেতুর উপর আসিয়া দর্শকদিগের সহিত একত্র বসিলাম। আমার সম্মুখে জল-স্রোত পর্ব্বত শরীরে প্রতিহত হইয়া কুল কুল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার কূলে নিষ্ঠাবান ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী সোপানাবলীর উপর শত শত প্রদীপ জ্বালিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন, কত প্রদীপ জলে ভাসিতেছে, কত আলো তীর-ভূমি আলোকিত করিতেছে। সোপানাবলীর সহিত সংলগ্ন হইয়া মন্দির কয়েকটী উঠিয়াছে, তাহাতে মৃদুমধুর গান ও বাদ্য হইতেছে, ঘাটে লোক সকল দলে দলে ধর্ম্ম সঙ্গীত করিতেছে, দক্ষিণদিকে জয়পুরের মহারাণীর পট্টবাস হইতে গান ও বাদ্য শ্রুত হইতেছে, বামদিকে ও নিম্নদেশ দিয়া গঙ্গার প্রবাহ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। পশ্চাতে জলস্রোত, তার পর ক্ষুদ্র চড়ায় সন্ন্যাসীর দল, চড়ার অপরদিকে ক্ষুদ্র নদী, নদীর তীর হইতে পর্ব্বত শ্রেণী বিস্তৃত রহিয়াছে। মস্তকোপরি সুনীল আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ উদিত হইয়া আপনার সুধাময় কিরণ বর্ষণ করিয়া ধরাকে সুধাময়ী করিতেছেন, শত শত নক্ষত্র প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে ধরাতে দৃষ্টিপাত করিতেছে। প্রকৃতির এই মুক্ত অনন্ত প্রসারিত সৌন্দর্য্য, ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত মিলিত হইয়া, মর্ত্ত্যে এক অপরূপ স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছে। এই অপূর্ব্ব স্বর্গের সংস্পর্শে অন্তর বাহির মধুময় হইয়া গেল। মনে হইল, স্বর্গ হইতে দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহা ধর্ম্মক্ষেত্রে যেন

সমবেত হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য একাকার করিয়াছেন। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের এত ঘনিষ্ঠযোগ পূর্ব্বে কখন অনুভবও করি নাই। ক্ষণকালের জন্য মনে হইল, এই জগৎব্রহ্মাণ্ড এক লীলাময়ের লীলায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। একই শক্তি ঊর্দ্ধে, অধোতে, চতুর্দ্দিকে শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য ও সামঞ্জস্য বিস্তার করিতেছে। সেই শক্তির স্থূল ও সূক্ষ্ম বিকাশে এই গ্রহ তারকা পরিপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড এবং জ্ঞান-প্রেম-সমন্বিত অধ্যাত্ম জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহা কর্তৃক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। সেই শক্তি বহির্জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম এবং অন্তর্জগতে ধর্ম্মস্রোতরূপে কার্য্য করিতেছে। সেই শক্তি অন্তর ও বাহির ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে এবং শৃঙ্খলা,সৌন্দর্য্য ও সামঞ্জস্যে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। জড়, নর, চেতন, অচেতন সেই এক শক্তিতেই নাচিতেছে, হাসিতেছে ও কাঁদিতেছে। লীলাময় ব্রহ্মের লীলা-সমুদ্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিমগ্ন রহিয়াছে। আমি সেই লীলা-সমুদ্রের একটী ক্ষুদ্র নগণ্য বুদ্‌বুদ্। সেই শক্তির অনুগত হওয়াই আমার ধর্ম্ম; ইহার অনুগত হওয়ার জন্যই সাধনের প্রয়োজন। ধর্ম্ম বাহিরে নয়—হৃদয়ের হিরণ্ময় কোষে—যুক্তিতর্কের অতীত স্থানে। যুক্তি, তর্ক ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া যে ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় প্রভুর দ্বারে হত্যা দিতে পারিয়াছে, সে-ই ধন্য হইয়াছে।

অনেকক্ষণ এই ভাবে অতীত হইল। ধীরে ধীরে লোক সকল যাইতে লাগিল। এক দল সন্ন্যাসী আসিয়া সেই বরফ জলে স্নান করিয়া গেলেন। আরও কাহাকেও কাহাকেও স্নান করিতে দেখিলাম। যখন ব্রহ্মকুণ্ড নির্জ্জন-প্রায় হইল, তখন বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতে ব্রহ্মকুণ্ডে যাইয়া মাছদিগকে খই খাওয়াইলাম। ২৫০।৩০০ ছোট বড় মাছ ভাসিয়া ভাসমান খই সকল খাইতে লাগিল। সেই অপরূপ দৃশ্য এখনও যেন দেখিতেছি। আহারান্তে হরিদ্বার পরিত্যাগ করিয়া অমৃতসরে যাত্রা করিলাম। হরিদ্বারে পূর্ণিমার যোগ উপলক্ষে অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সহিত ধর্ম্মভাবের যে অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দেখিয়াছিলাম, তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ।

নিরাকারের সাকাররূপ। (১)

"নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।"

"তুমি চৈতন্যস্বরূপ, তুমি বিশ্বরূপাত্মক, তোমাকে নমস্কার।"—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

পরমেশ্বরকে বিশ্বরূপ বলিয়া সম্বোধন করা,অতি উচ্চতম অবস্থার কথা। অনন্তের অতি পরিস্ফুট অনুভূতি না হইলে, কেহ তাঁহার এই বিরাট-পুরুষ-রূপ দর্শন করিবার অধিকারী হয় না।

এই বিশ্বরূপ দর্শন অত্যুন্নত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রমাণ; ইহাই সার্ব্ব-ভৌমিক ধর্ম্মের প্রাণ; এই উদার ও উন্নত ভূমিতেই সাকার-নিরাকারের চিরন্তন বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি।

ঈশ্বরকে যাঁহারা সাকার বলেন, তাঁহারা অজ্ঞ; যাঁহারা নিরাকার ভাবেন,তাঁহারা অন্ধ। ঈশ্বরকে সাকার বলা মিথ্যা,নিরাকার বলাও মিথ্যা; সাকার না নিরাকার, এ প্রশ্ন করাও মিথ্যা। হয় বল,তিনি সাকারও নহেন,নিরাকারও নহেন, এক অর্থে তাহা সত্য হইবে; নয় বল, তিনি সাকারও নিরাকারও, আর এক অর্থে তাহাও সত্য হইবে; কিন্তু কোনও অর্থেই, ঈশ্বরকে কেবল সাকার বা কেবল নিরাকার বলা যাইতে পারে না।

কিন্তু সাকার বলিতে এ স্থলে, কেবল চক্ষুগ্রাহ্য জড়-আকৃতি-বিশিষ্ট পদার্থকে নির্দ্দেশ করিতেছি না। যাহার আকার আছে, তাহাই সাকার; এবং আকারের সাধারণ লক্ষণাই পার্থক্য নির্দ্দেশ,সীমা নির্দ্ধারণ। যতক্ষণ নদী জলধি হইতে স্বতন্ত্র থাকে, ততক্ষণ নদীর আকার এক, জলধির আকার এক। কিন্তু যখন "মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার" তখন নদী আকারবিহীন হইয়া যায়। আকা-

শকে আমরা নিরাকার বলি, কারণ আকাশ যাবতীয় বস্তুর সীমা নির্দ্ধারণ ও নির্দ্দেশ করে, কিন্তু আকাশের সীমা কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। তবে যখন নৈয়ায়িক অসীম ও অখণ্ড আকাশকে ঘটাকাশ, পটাকাশ বলিয়া, সসীম ও খণ্ড খণ্ড করেন, তখন নিরাকার আকাশ, এই কল্পিত বিভাগ নিবন্ধন, ঘটপটের আকার ধারণ করিয়া থাকে।

পার্থক্য নির্দ্দেশ বা সীমা নির্দ্ধারণই যদি আকারের মৌলিক লক্ষণ হয়, তাহা হইলে বাহ্য প্রকৃতির ন্যায়, মানসিক সৃষ্টি সমূহও সাকারের শ্রেণীভুক্ত হইয়া যায়। তাহা হইলে চন্দ্রসূর্য্য, গ্রহনক্ষত্র, নদীসরিৎ, পশুপক্ষী, বা নরনারীর ন্যায়, বেদ-বেদান্ত, রামায়ণ মহাভারত, কুমার-ভট্টি, সাংখ্য-পাতঞ্জল প্রভৃতির চিন্তা, ভাব এবং কল্পনাও সাকার পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হয়; এবং সে অবস্থায়, প্রস্তরেতে খোদিত, মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত বা চিত্রপটে অঙ্কিত দেবদেবীর ন্যায় মনের চিত্রফলকের উপরে, ভাষার তুলিকায়, ভাবের বর্ণে রঞ্জিত পরমেশ্বরও সাকার হইয়া যান।

সাকারের সত্য অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিয়া, একবার নিজের কথাই ভাব দেখি,—তুমি আপনি সাকার, না নিরাকার,—দেহ, না আত্মা? কেবল দেহ বলিলে অসত্য হইবে; আবার কেবল নিরাকার চৈতন্য বলিলেও মিথ্যা হইবে। কারণ, অনাত্ম বস্তুর তুলনায়, তাহার জ্ঞাতারূপেই তুমি তোমার আপনাকে জান; অর্থাৎ এই দেহের মধ্য দিয়া, ইন্দ্রিয় প্রপঞ্চের সাহায্যেই কেবল তোমার বিষয়ের অবরোধ ও আত্মার অনুভূতি জন্মিতেছে। নিরাকার, বিদেহী আত্মা যে কিরূপ, জানি না, বুঝি না, কল্পনাও করিতে পারি না। তবে, পরলোক সম্বন্ধে এই আশা ও এই বিশ্বাস আছে যে, মৃত্যুর পরেও আত্মা থাকিবে, কিন্তু কি অবস্থায় থাকিবে, কে জানে?

আর যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, কোনও না কোনও আকার ধারণ অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তিগত জীবনের অমরত্ব যদি সত্য হয়, তবে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানবাত্মার আকারান্তর ধারণ ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। কারণ, ব্যক্তিগত অমরত্বের অর্থই এই যে, ইহজগতে যেমন আমরা প্রত্যেকে এক এক জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি আছি, পরলোকেও সেইরূপ স্বতন্ত্র ব্যক্তি থাকিব, এবং তাহা হইলেই এই স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্যই একটা না একটা আকারের প্রয়োজন হইবেই হইবে। নিরাকার ব্যক্তিত্ব জ্ঞানে ধারণাই হয় না।

কেবল নিরাকার ব্যক্তিত্ব কেন, নিরাকার কোনও কিছুই জ্ঞানে ধারণা হয় না। শুদ্ধ নিরাকার কেবল একটা ভাব, একটা কল্পনা, একটা negative abstraction, একটা অভাবাত্মক শব্দ মাত্র। গুণবাচক বিশেষ্য মাত্রেই যেমন কেবল মাত্র একটা মানসিক সৃষ্টি, নিরাকারও সেইরূপ একটা মানসিক সৃষ্টি মাত্র। সাধুলোক হইতে স্বতন্ত্র সাধুতা, কৃষ্ণ বস্তু হইতে পৃথক্ কৃষ্ণত্ব কিম্বা সুন্দর ব্যক্তি বা বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্য যেমন কেবল একটা কথার কথা মাত্র,—এ সকলের অস্তিত্ব যেমন কল্পনার রাজ্যেই আছে, খাঁটি বিষয়-রাজ্যে কুত্রাপি নাই, সেইরূপ শুদ্ধ নিরাকারও কেবল কল্পনা মাত্র, খাঁটি বস্তু নহে। শুদ্ধ নিরাকার বলিলে ঈশ্বরকে একটা negative abstraction, অভাবাত্মক কল্পনারূপে দাঁড় করান হয়।

নিরাকার চৈতন্য বলিলেও বেশী কিছু এগোয় না; তাহাতেও ঈশ্বরের স্বরূপ সত্যরূপে ব্যক্ত হয় না। নিরাকার চৈতন্য অর্থশূন্য বাক্য। বিবর্ত্তন চৈতন্যের মৌলিক লক্ষণ। চৈতন্য মাত্রেই অভিব্যক্তি-পরায়ণ; আর অভিব্যক্তি বা Evolution অর্থই আকার পরিবর্ত্তন। চেতনের রাজ্যে সততই এক আকার বিনষ্ট হইয়া আকারান্তরের প্রকাশ হইতেছে। কোনও এক নির্দ্দিষ্ট আকারে আবদ্ধ থাকা যেমন চৈতন্যের পক্ষে অসাধ্য, সেইরূপ একেবারে নিরাকার হওয়াও তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

খাঁটি, যুক্তি-সঙ্গত নিরাকার-বাদ যদি কিছু থাকে, তাহার অপরিহার্য্য পরিণাম শূন্যবাদ। সেরূপ নিরাকারবাদে ঈশ্বরের অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত না হইলেও, অজ্ঞেয়-

তার সূচিভেদ্য অন্ধকারের দ্বারা, সে সত্য-জ্যোতিঃ একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

নিরাকার চৈতন্য যদি কিছু থাকে, তাহা অব্যক্ত চৈতন্য। তাহা পরব্রহ্ম, সে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিরুপাধি। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা নাই, উপাসনা হইতে পারে না। উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধের জ্ঞান উপাসনার ভিত্তিভূমি; এই সম্বন্ধ আবার উপাস্যের স্বরূপের ও উপাসকের প্রকৃতির জ্ঞানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কিন্তু নির্গুণের স্বরূপ জ্ঞান কি সম্ভব? জ্ঞান মাত্রেই গুণের বা সম্বন্ধের জ্ঞান। যাহার গুণ নাই বা গুণ ব্যক্ত হয় নাই, যাহার কোনও সম্বন্ধ নাই বা সম্বন্ধী সৃষ্ট হয় নাই, তাহার জ্ঞানলাভ কিরূপে সম্ভব? কেবল ব্যক্ত চৈতন্যই মানব-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে; অতএব কেবল ব্যক্ত চৈতন্যেরই উপাসনা সম্ভব। আর অব্যক্তের ব্যক্ত হওয়ার অর্থই নিরাকারের আকার ধারণ। নির্গুণ, নিরুপাধি নিরাকার অব্যক্ত চৈতন্য যখনই মানবজ্ঞানে ব্যক্ত হয়, তখনই তাহা সগুণ, সোপাধি ও সাকার হইয়া যায়।

কিন্তু এই সগুণ-নির্গুণ-ভেদ-জ্ঞান-ক্রিয়ার প্রণালী মাত্র। মূলত, বস্তুতঃ পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম, ব্যক্ত ব্রহ্ম ও অব্যক্ত ব্রহ্ম, একই সত্তা, দুই নহে। যাহা অব্যক্ত তাহাই ব্যক্ত; যাহা নির্গুণ ও নিরুপাধি, তাহাই আবার যুগপৎ সগুণ ও সোপাধিক। জ্ঞান কালাধীন। দেশ এবং কালের ছাঁচে না উঠিলে কোনও বিষয়ই জ্ঞান-ভূমিতে প্রকাশিত হইতে পারে না। এবং যাহা অব্যক্ত ছিল, তাহাই ব্যক্ত হইল; যাহা ব্যক্ত হইবে, তাহাই অব্যক্ত আছে; এই আকারে না ভাবিয়া ব্যক্ত এবং অব্যক্ত দুএর কিছুরই জ্ঞানলাভ হয় না।

কিন্তু এরূপ বিভাগ করিয়াও জ্ঞান কোনও ক্রমেই সেই মূল অদ্বিতীয় সত্তার একত্ব ধ্বংস করিতে পারে না, বরং এই বিভাগের দ্বারাই, এই বিভাগের মধ্যেই, ব্যক্তাব্যক্তের অখণ্ডনীয় একত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কারণ, ব্যক্তের, সগুণের, সোপাধিকের পশ্চাতে ইহার ভিত্তি ও অবলম্বন রূপে, মূল ও উপাদান কারণ রূপে, ইহার সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত ও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ থাকিয়া, ব্যক্তের সঙ্গে সঙ্গেই অব্যক্ত, নির্গুণ ও নিরুপাধিক সত্তা জ্ঞানে যুগপৎ প্রকাশিত হইতেছে। ব্যক্তকে ছাড়িয়া অব্যক্ত অবোধ্য, অব্যক্তকে ছাড়িয়া ব্যক্ত অবস্তু। ইহাদের যে বিভিন্নতা তাহা জ্ঞানের প্রণালী মাত্র, নতুবা সগুণ নির্গুণ, ব্যক্ত অব্যক্ত একই বস্তু।

যাহা কারণে নাই, তাহা কার্য্যে থাকিতে পারে না। না সতো সজ্জায়তে—অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয় না। যাহা বীজে নাই, তাহা অঙ্কুরে বা ফলেও থাকিতে পারে না। এই জন্য এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, কারণ ও কার্য্য, বীজ ও ফল একই বস্তু, ইহাদের মৌলিক একত্ব সত্য, নিত্য, অবিনাশী। কোনও কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই বলিয়াছেন যে, কারণ আর কিছুই নহে, কেবল অব্যক্ত কার্য্য মাত্র এবং কার্য্যও আর কিছুই নহে, ব্যক্ত কারণ মাত্র। কারণে যাহা অব্যক্ত, কার্য্যে কেবল তাহাই ব্যক্ত; বীজে যাহা লুক্কায়িত, ফলে কেবল তাহাই প্রকাশিত।

তুমি মাতৃগর্ভে যাহা ছিলে, আজও তাহাই রহিয়াছ, অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও তাহাই থাকিবে। ভ্রূণ অবস্থায় তোমার যাহা ছিল না, জীবনে তাহা তোমার কদাপি হয় নাই, হইবে না, হইতে পারে না। শিক্ষা এবং সাধনায় কেবল সেই অব্যক্তকেই ব্যক্ত করিতে পারে, কিন্তু বাহির হইতে তোমাকে কিছুই দান করিতে পারে না। জগতের কুত্রাপি, বিশেষতঃ চেতনের রাজ্যে, দানের স্থান নাই; বিকাশ বা অভিব্যক্তিই এ রাজ্যের মৌলিক ও সার্ব্বভৌমিক বিধান।

সূর্য্যের কীরণ, আকাশের বায়ু, পৃথিবীর রস, এসকল পুষ্পের বিকাশের সহায়। যে কোরকে অব্যক্তরূপ আছে, এ সকলের সহায়ে তাহার সেই রূপ ব্যক্ত ও প্রকটিত হয়, যে কোরকে লুক্কায়িত সৌরভ আছে, এ সকলে মিলিয়া তাহার সেই সুগন্ধই বিকাশ ও বিস্তার করে; কিন্তু সূর্য্যের কীরণ, আকাশের বায়ু

বা পৃথিবীর রসের এমন কোনও শক্তি নাই, যাহাতে ইহার কিংশুককে কদম্বরূপে বা অপরাজিতাকে চম্পকের আকারে ফুটাইয়া তুলিতে পারে। সহস্র পরিবর্ত্তনের মধ্যেও কাক কাকই এবং কোকিল কোকিলই থাকিয়া যায়। একদিক দিয়া দেখিলে কোনও অভিব্যক্তিপরায়ণ পদার্থেরই পরিবর্ত্তন হয় না, চিরদিনই তাহার একত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।

আবার, আর এক দিক দিয়া দেখিলে, ইহাই বোধ হয় যে, অভিব্যক্তিপরায়ণ পদার্থ মাত্রই কেবলই পরিবর্ত্তনশীল, ইহার একত্ব খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। ভ্রূণ হইতে শিশু, শিশু হইতে বালক, বালক হইতে বৃদ্ধ,কেবলই তো পরিবর্ত্তন। ডাক্তারেরা বলেন,প্রতি সাত বৎসরের মধ্যে মানব দেহের পরমাণুপুঞ্জের সমুদায় আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যে পরমাণুপুঞ্জকে সাত বৎসর পূর্ব্বে আমি আমার দেহ বলিয়া জানিতাম, তাহার একটীও আজ এই দেহে নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে পরমাণুপুঞ্জকে প্রিয়জনের প্রিয়দর্শন অঙ্গ বলিয়া প্রেমভরে নিরীক্ষণ করিতাম, তাহার একটীও আজ সে শরীরে বিদ্যমান নাই। ফলে যাহা আছে, ফুলে বা বীজে অনেক সময় তাহার চিহ্নও লক্ষিত হয় নাই। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে পত্র পল্লব শাখা প্রশাখা ফুল ফল, কেবলই বিভিন্নতা। এই দিক্ দিয়া দেখিলে তো অভিব্যক্ত পদার্থ মাত্রই এক অশ্রান্ত ও নিত্য পরিবর্ত্তনের ইতিহাস রূপে প্রতীয়মান হয়।

ইহার কোনটীই মিথ্যা নহে। অভিব্যক্তিপরায়ণ পদার্থ বস্তুতঃই নিত্য এক ও নিত্য বহু; নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ও নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়। ফলতঃ অভিব্যক্তি বলিতেই পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিত্যত্ব ও নিত্যত্বে পরিবর্ত্তন বুঝায়।

কথাটা কেমন কেমন শুনায়; আপাতত স্ববিরোধী বলিয়াই বোধ হয়; এবং কোনও শব্দজ্ঞ পণ্ডিত ইহাকে নিতান্ত অজ্ঞের উক্তি বলিয়াই উড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু এ আপত্তি খণ্ডনের উপায় নাই। অভিব্যক্তির প্রণালীকে মানবের ব্যবহারিক জ্ঞানের ভাষায় বিবৃত করিতে গেলেই, সেই ভাষার অপূর্ণতা ও অক্ষমতা নিবন্ধন, এই সকল আপাত অসঙ্গতি দোষ ঘটিবেই ঘটিবে। কিন্তু যাহারা চৈতন্যের বিকাশ বস্তুটা কি একটু ভাবিয়া দেখিবেন, তাঁহাদের নিকটে ভাষাগত এ অসঙ্গতি মারাত্মক মনে হইবে না। ভাষার এই অসঙ্গতির কারণও সহজেই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। অভিব্যক্তির ঘটনা সমূহকে শুদ্ধ নিত্যত্ব বা শুদ্ধ পরিবর্ত্তন, এইরূপ ভাষার ছাঁচে ফেলিতে গেলেই চৈতন্যের কার্য্য প্রণালীকে এমন সাংঘাতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করিতে হয় যে, তাহার পরে আর সে প্রণালীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না। কারণ অভিব্যক্তিতে কেবল পরিবর্ত্তনের মধ্যেই একত্ব প্রকাশিত হয়, এবং এই পরিবর্ত্তনের দ্বারাই একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে যুগপৎ বিভিন্নতা ও একাঙ্গতা প্রতিপাদনই অভিব্যক্তির প্রণালী। যে বিভিন্নতায় একাঙ্গতা বিনষ্ট হয় না, বরং যে একাঙ্গতা ও বিভিন্নতার প্রাকৃতিক বিরোধের মধ্যেও বিরোধের দ্বারাই মৌলিক একাঙ্গতা আরো সমধিক পরিস্ফুট ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই অভিব্যক্তির লক্ষণ। একত্ব হইতে বহুত্ব সম্পাদন, অথচ এই বহুত্বের মধ্যে মৌলিক একত্বেরই প্রতিষ্ঠা ও পরিস্ফূর্ত্তি, ইহাই অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তিই সৃষ্টি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

২। পদ্যকুসুম।—শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায় বি-এ, প্রণীত, মূল্য।০। এই সরল এবং সুমিষ্ট কবিতাপুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা যারপর নাই সুখী হইলাম। স্কুলের শিক্ষকগণ সুকুমারমতি বালকদিগের অভাব যেমন বুঝেন, এমন আর কেহ নহেন। নগেন্দ্রবাবু

সমস্তিপুর স্কুলের হেড্‌মাষ্টার। তিনি বালক বালিকাদিগের একান্ত উপযোগী করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। এখন শিক্ষবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই পুস্তক খানির প্রতি অনুকূল দৃষ্টি করিলে গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক হয়। উপযুক্ত ব্যক্তিগণের রচিত পুস্তক আদৃত না হইলে এদেশের ভবিষ্যতের মঙ্গল নাই।

৩। পরলোক ও মুক্তি।—মূল্য ৶০ শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। বিষম তর্ক যুক্তির কালে উন্নত অধ্যাত্মজীবনের স্বোপার্জ্জিত কথা কতদূর তৃপ্তিকর হওয়ার সম্ভব, এই পুস্তক তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ এই পুস্তক পাঠে যারপর নাই বিমল আনন্দ পাইবেন।

৪। দম্পতী সুহৃদ্।—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত,মূল্য ॥০,দ্বিতীয় সংস্করণ। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। প্রথম সংস্করণে আমরা ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলাম, সুতরাং এবার আর কিছু লেখার প্রয়োজন নাই।

৫। ফুল।—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত, মূল্য ।০, দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণে আমরা ফুলের অনেক প্রশংসা করিয়াছি। এই সংস্করণে কবির অনেকগুলি নুতন কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বাবু বিপিনবিহারী রক্ষিত মহাশয় রচিত "সঞ্জীবনী" প্রভৃতি কবিতাও ইহাতে আছে। পুস্তকখানি পড়িয়া সুখী হইলাম। ইহার মধ্যে যে যে কবিতা অন্য কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ থাকিলে ভাল হইত।

৬। হিতকথা।—শ্রীশশিভূষণ সেন প্রণীত, মূল্য ৶০। গ্রন্থকার নিবেদনে লিখিয়াছেন—"জগতের সাধু ও সুধী সমাজ,মানব সমাজের হিতোদ্দেশে যে সকল কল্যাণ কথা বলিয়াছেন ও বলিতেছেন,এ পুস্তিকায় তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র শুনাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে।" গ্রন্থকার মৌলিকতার কিছুই ভাণ করেন নাই। স্পেন্সার,ব্লাকি প্রভৃতি মহাত্মাগণের কথা অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিয়া দেশের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। সার সত্য কথার আলোচনা ভিন্ন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক কল্যাণের কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ বাল্যকাল হইতে মানুষ কি কি উপায় অবলম্বন করিলে মহত্ব লাভ করিতে পারে, এ পুস্তকখানি তাহার সুন্দর উপদেশে পূর্ণ। এই এক খানি পুস্তক মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অনেকের অনেক শিক্ষা লাভ হইতে পারে। শশিবাবুর ভাষার সামান্য ২ ক্রটী থাকিলেও,মোটের উপর ভাষা প্রাঞ্জল, মধুর এবং সংযত। শশিবাবু যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন,তাহা অতি সুন্দররূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে,আমাদের বিশ্বাস। পুস্তকখানি স্কুল-পাঠ্য-লিষ্টে ভুক্ত হইলে আমরা যারপর নাই সুখী হইব।

৭। হেমহার।—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত, মূল্য ॥০। এ পুস্তক অতি সুন্দর হইয়াছে। এইরূপ গল্পের অভাব আছে। অমানুষী, অতিমানুষী, অতিকল্পিত চরিত্রের চিত্রে সমাজের কি ক্ষতি হয়, নবেলের আকর ইয়ুরোপে এখন অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। জীবন্ত চরিত্রের চিত্রে আলো ও ছায়ার যথোপযুক্ত সমাবেশে কল্পনা পরাস্ত হয়, দক্ষ চিত্রকরেরা এখন তাহা বুঝিয়াছেন। আয়েসা, তিলোত্তমা, গিরিজায়া ও কপালকুণ্ডলা বঙ্গ সমাজের কি ক্ষতি করিয়াছে,বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রে তাহা বুঝিয়াছেন। বাঙ্গলার জোয়ারে ভাটা পড়িলে বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্ম ও সমাজ-হিতৈষণার পরীক্ষার প্রকৃত সময় হইবে।

৮। সেক্সপিয়র।—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত, মূল্য ১॥০। আটখানি নাটকের মর্ম্মানুবাদ ইহাতে আছে। যথা অথেলো, ভেনিস্ নগরের বণিক, রোমিও জুলিয়েট, পেরিক্লিস, ভ্রাতা ও ভগিনী, টাইমন, সিম্বেলিন, ও লিয়র। মূলগ্রন্থের ভাবের সুকুমারতা ভাষান্তরে রক্ষা করা যায় না। বিশেষতঃ রঙ্গমঞ্চে আরভিঙের ন্যায় নটের অভিনয় না দেখিলে,বিদেশী গ্রন্থ ও টীকা পড়িয়া সেক্সপিয়রের ভাব সমুদায় গ্রহণ করিতে

পারা যায় না। এই পুস্তকে নাটকগুলির গঠন-কৌশল দেখাইতে যত চেষ্টা করা হইয়াছে, ভাবের উৎকর্ষতা, সুকুমারতা ও জটিলতা দেখাইতে তত চেষ্টা করা হয় নাই, ইহা বড় সন্তোষের কথা। ইংরাজি-অনভিজ্ঞ লোকে সেক্সপিয়র সম্যক বুঝিতে পারিবেন, কখন আশা করা যায় না। অথচ আখ্যায়িকার গঠন-কৌশলে সেক্সপিয়র যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহা বালক বালিকা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারে। সেক্সপিয়রের এই দক্ষতা এই গ্রন্থে স্পষ্ট প্রকটিত হইয়াছে। ভাষা বিশদ ও কোমল, বুঝিতে কাহারও কোন কষ্ট হয় না। ল্যাম্ব সাহেব সেক্সপিয়রের আখ্যায়িকার ইংরাজি ভাষায় যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, এই গ্রন্থকারের কৃতিত্ব তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। এই গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় একটী অভাব মোচন করিয়াছে। ইংরাজি-নবিশেরাও আনন্দে এ গ্রন্থ পাঠ করিবেন। আশা করি, গৃহে গৃহে ইহা সমাদৃত হইবে। এই গ্রন্থ খানি সচিত্র। ইহাতে ২২ খানি ছবি আছে।

৯। রায়পরিবার।—(গার্হস্থ্য উপন্যাস) শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য১৷০। আজ কাল বাঙ্গালা ভাষায় উপন্যাস-লেখকের বড়ই প্রাদুর্ভাব। শস্তার বাজারে খাঁটি জিনিস বাছিয়া লওয়া অত্যন্ত দুরূহ হইলেও, ভাল জিনিসের আদর কমে না। "রায়পরিবার" একখানি প্রকৃত উপন্যাস। এ পুস্তকে গ্রন্থকার অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় একটী বঙ্গপরিবারের যথাযথ চিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র-নৈপুণ্য খুব প্রশংসনীয়। নীতি উচ্চ, রুচি মার্জ্জিত। গ্রন্থখানি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু একটী কথা বলিয়া আমাদের তৃপ্তি হইতেছে না। গ্রন্থের প্রধান চিত্র রায় মহাশয়, কৃপাময়ী, রামকমল, কৃষ্ণকমল, স্বর্ণকমল, দীনেশ চন্দ্র, মহামায়া, মুক্তকেশী, সুকুমারী ও গিরিবালা, সর্ব্বশেষে সুধীরচন্দ্র। সকল গুলি চিত্রই গ্রন্থকার সুন্দর নৈপুণ্যের সহিত আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বর্ণকমল, দীনেশচন্দ্র ও সুধীরচন্দ্রের চরিত্রে—বর্ত্তমানসুশিক্ষার ফল এবং সুকুমারী ও গিরিবালার চরিত্রে, সুকোমল রমণী-চরিত্র-সুশিক্ষার পথকে কত সুন্দর, কত মধুর করে, তাহাই দেখান হইয়াছে। মানুষ কুসংসর্গে কুশিক্ষায় কত হীন হইতে পারে—কত স্বার্থপর ও জঘন্য হইতে পারে—রামকমল, কৃষ্ণকমল, মহামায়া, মুক্তকেশী, নন্দগোপাল প্রভৃতির চরিত্র তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। গ্রন্থকার স্বর্ণকমল ও সুকুমারীর চরিত্র দুটীকেই অধিকতর উজ্জ্বল করিয়াছেন। সুকুমারীর চরিত্র আঁকিবার সময় গ্রন্থকার একটী দিকে একটু দৃষ্টি রাখিলে চিত্রটী আরো পূর্ণ হইত বলিয়া মনে হয়। সকলের প্রতিই সুকুমারীর দয়া দাক্ষিণ্য ও সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাহার পিতৃকুলের সম্বন্ধে যেন আমাদিগকে একটু আঁধারে রাখিয়াছেন। সে দিকটা একটু পরিষ্কার হইলে সুকুমারীর চরিত্র যেন আরো মধুর হইত। আর রাম কমলকে মানবদেহে দানব সাজাইতে যাইয়া গ্রন্থকার দুই একটা ঘটনা একটু অস্বাভাবিক করিয়া ফেলিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার পাশবিক ব্যবহারই সম্ভবপর, কিন্তু আপনার মাতা, ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে পোড়াইয়া মারিবার চেষ্টাটা যেন আমাদের কাছে একটু অধিক অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। জানি না, হিন্দুকুলে এমন কুলাঙ্গার আছে কি না। খাঁটি সোণা যেমন পোড়াইলে উজ্জ্বল হয়, স্বর্ণকমল, সর্ব্বোপরি সুকুমারীর চরিত্রও, বিপদের পর বিপদে, অত্যাচারের পর অত্যাচারে ফেলিয়া গ্রন্থকার উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়াছেন। আমরা দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে একবাক্যে বলিতেছি "এমন রমণী যদি বঙ্গে অধিক থাকিত, তবে বুঝি বাঙ্গালীর দুঃখ থাকিত না।" কিন্তু এই গ্রন্থখানির গল্পাংশ সম্পূর্ণ রূপ "স্বর্ণলতার" দ্বারা অনুপ্রাণিত।

১০। শ্রীমদ্গোপাল ভট্টগোস্বামীর জীবন-চরিত।—শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত মৈনা শ্রীহট্ট হইতে শ্রীঅনিরুদ্ধ চরণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা। জীবন-চরিত বলিলে যাহা বুঝা যায়, এইগ্রন্থে তাহা নাই। তবে গ্রন্থখানি পাঠ করিলে একটী ভক্ত জীবনের কতকগুলি ঘটনার আভাস পাওয়া যায় মাত্র। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্য

দেবের প্রচারেরও কিছু কিছু ঘটনা জ্ঞাত হওয়া যায়। ভক্ত জীবনের সকলই উপাদেয় ও জীবন্ত, সুতরাং এসম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, তাহাই আদরনীয়। গ্রন্থের ভাষা একেবারে নির্দ্দোষ না হইলেও সহজ হইয়াছে।

১১। নীতিকণা।—শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত।—এখানি ছেলেদের পাঠ্য নীতিগ্রন্থ; পদ্যে লিখিত। মূল্য ৵০। ছাপা খুব ভাল হইয়াছে। বর্ণাশুদ্ধি নাই। নীতি কথা গুলি ভালই। তবে ভাষাটা খুব সরল হয় নাই। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, এ তাঁহার প্রথম উদ্যম। তাঁহার এ উদ্যম প্রশংসনীয় বটে।

১২। সারনিত্যক্রিয়া।—অর্থাৎ-বেদের সারভাগ। ইহাতে পরমহংস শিব নারায়ণ স্বামীর কতকগুলি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ হিন্দিভাষায় লিখিত। "সাধারণ উপদেশ" 'ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণ' প্রভৃতি কতক গুলি উপদেশ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

১৩। জীবন-সন্দর্ভ।—(প্রথমভাগ) জনৈক নববিধান-ব্রাহ্মসমাজের সভ্য কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ।৵০। এ পুস্তক খানিতে চিন্তা, মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য, কর্ত্তব্যকর্ম্ম প্রভৃতি ২০টী চিন্তাশীল ও সারবান প্রবন্ধ আছে। ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তিগণ এ গ্রন্থ পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। গ্রন্থের ভাষা সুন্দর হইয়াছে।

১৪। প্রেম-পঞ্চক ও জীবন-সঙ্গীত। —শ্রীশ্রীশ গোবিন্দ সেন প্রণীত; সান্যাল এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।০। এখানি পদ্য গ্রন্থ। প্রেম-পঞ্চকে গ্রন্থকার দুটী প্রেমিকের ছবি আঁকিয়াছেন। এবং জীবনসঙ্গীতে মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও নিয়তি কি, বিশেষ ভাবে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের ভাব পবিত্র ও উচ্চ। ভাষা মিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু শিল্প-নৈপুণ্যের একটু অভাব দৃষ্ট হয়।

১৫। স্বভাব-নীতি।—শ্রীকৃষ্ণেন্দ্র রায় প্রণীত। জীব জন্তুর প্রকৃতি দেখিয়া আমরা কি নীতি শিক্ষা করিতে পারি, গ্রন্থকার তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ খুব ভাল হইয়াছে। ভাষা সরল ও সুপাঠ্য।

১৬। প্রেমাশ্রু।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস্, প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন;—

"কি করিয়া মানুষের প্রাণ শোকে তাপে আকুলিত হইয়া স্তবকে স্তবকে স্বর্গরাজ্যের দিকে ধাবমান হয়, তাহারই আভাস কতকটা ইহার ভিতরে আছে।"

তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে কি না, এ সম্বন্ধে তিনি একটু সন্দিহান হইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় এরূপ সন্দেহের কোন কারণ নাই। আমরা কবিতাগুলি পড়িয়া বড়ই তৃপ্ত হইয়াছি। সমস্ত কবিতাগুলিই আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। ভাব বিশুদ্ধ ও উচ্চ, ভাষা সুমধুর ও সরল হইয়াছে। আশা করি, আমাদিগকে মাঝে মাঝে এরূপ সুললিত ও সুন্দর কবিতা পাঠে গ্রন্থকার বঞ্চিত করিবেন না।

১৭। সঙ্গীত-প্রবাহ।—(প্রথম উচ্ছ্বাস) শ্রীগোপালচন্দ্র মৈত্রেয় বিরচিত ও প্রকাশিত—মূল্য ৶০, এ পুস্তক খানিতে কতকগুলি ধর্ম্মবিষয়ক সংগীত আছে। সঙ্গীতগুলি পুরাতন সাধক সঙ্গীতের অনুকরণে রচিত। কিন্তু ভাবের গভীরতায় কিম্বা ভাষার মধুরতায় কিছুতেই সেই পূর্ব্বতন সাধকসঙ্গীতের তুল্য নহে। তবে ধর্ম্ম-সঙ্গীত পড়িলেই উপকার হয়, এই যা কথা।

১৮। চিকিৎসক ও সমালোচক। —মাসিক পত্র, ডাক্তার শ্রীসত্যকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত। আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩০৩ পর্য্যন্ত পাইয়াছি। বার্ষিক মূল্য ২৲। এই পত্রিকাখানি সুসম্পাদিত হইতেছে। ইহাতে অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের মীমাংসা থাকে।

দুঃখ।

এ সংসারে দুঃখের বিষয়ে কত চিন্তা ও আন্দোলন হইয়া থাকে! সকলেই ভাবে, আমার এ সব অভাব কিসে দূর হইবে? স্ত্রীপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ হয় না, স্বীয় মান সম্ভ্রম বজায় রাখা যায় না, কন্যাবিবাহের ব্যবস্থা হয় না, শরীর নিরোগ হয় না—উপায় কি? বিধাতা কি শেষকালে চিন্তা চেষ্টা করিয়া এমনই সৃষ্টি রচনা করিলেন যে, দুঃখ ব্যতীত লোকই দেখা যায় না? ঐ যে ক্রোড়পতি অশ্বযুগল যোজনা করিয়া সুন্দর শকটে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন, অনুসন্ধান করিয়া দেখ, হয়ত পুত্রশোকে পুত্রশোকে তাঁহার হৃদয় চিরকালের জন্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বিধবা বালিকার দীর্ঘশ্বাসে তাহার ঐশ্বর্য্য ভস্ম হইতেছে। আর ঐ যে ত বৃদ্ধ দিনান্তে শাকান্ন সংগ্রহ করিতে না। ...ক, শীতে ঠক্ ঠক্ কাঁপিতেছে—বিধাত ...র কি এমনই ইচ্ছা, উহার যে একমাত্র শিশুকন্যাটী যষ্টি ধরিয়া দ্বারে দ্বারে লইয়া যাইত, এই কলেরা রোগে সে-ই মারা গেল, আর ঐ বুড়ো মরিল না? বিধাতাই যখন দুঃখ কষ্টকে সৃষ্টি মধ্যে যত্নে আশ্রয় প্রদান করিতেছেন, তখন আর নিবৃত্তিই বা কি প্রকারে হইবে? যে বায়ু না হইলে প্রাণ রক্ষা হয় না, যাহাকে প্রাণ বলে, দেখ দেখি, সেই বায়ুর আঘাতে কত ঘর বাড়ী, নৌকা জাহাজ, উদ্ভিদ্ প্রাণী ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে—লৌহময় অট্টালিকা পর্য্যন্ত ঘূর্ণিত হইতেছে। যে জল না হইলে জীবন রক্ষা হয় না, যাহাকে জীবন বলে, দেখ দেখি, সেই জল বন উপবন গ্রাম নগর দেশ মহাদেশ প্লাবিত করিয়া কত কষ্টই না প্রদান করে! যে অগ্নি শরীরে না থাকিলে জীবন সৃষ্টি হয় না, যাহার সাহায্যে সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন দ্বারা আমরা শরীর রক্ষা করিতেছি, যাহার আশ্রয়ে অমানিশার অন্ধকারে নির্ভয়ে বিচরণ করি, বিধাতার কি এমনই অভিপ্রায়, সেই আগুনে আমার ঘর বাড়ী ভস্মীভূত হইল, শশীর পুত্রটা পুড়িয়া মরিল, খিদিরপুরে অসংখ্য নরনারী নিরাশ্রয় হইল, কত জাহাজ, কত ট্রেন যাত্রীসহ দগ্ধ হইয়া গেল! কতই বা বলা যায়? বলিতে গেলে শেষ নাই। যে পদার্থটী ধরিবে, তাহাতেই দেখিবে যে, তাহা কত রকমে দুঃখদায়ক। পদার্থের মর্ম্মস্থানে, সৃষ্টির রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুঃখ ক্লেশ এমনই নিবিষ্ট রহিয়াছে যে, তাহার উচ্ছেদ সম্ভবপর নয়। তবে আর বলিব না কেন যে, বিধাতার অভিপ্রায়ই জীবকে কষ্ট দেওয়া? কথাটা কষ্টদায়ক বটে, অবিশ্বাসব্যঞ্জক বটে, ধর্ম্মাত্মার নিকট ঘৃণিত বটে—কিন্তু কি করি, সত্যইত প্রচার করিতে হইবে? আমাকে অধার্ম্মিক, অবিশ্বাসী, পাপী, নাস্তিক, নারকী বলিতে পার। কিন্তু এ কথা বলিতে ছাড়িব না যে, তুমি তোমার ধর্ম্মগ্রন্থে, আরাধনায়, প্রার্থনায়, সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনে বিশ্বস্রষ্টার যে নামই কেন দেও না, তিনি যখন দুঃখকে সৃষ্টির অঙ্গে অঙ্গে, শিরায় শিরায়, রন্ধ্রে রন্ধ্রে এরূপ অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রবিষ্ট করিয়াছেন, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, জীবকে কষ্ট দেওয়া তাঁহার অভিপ্রায়।

বিষম ভ্রমে পতিত হইয়া কেহ কেহ বলেন, দুঃখকে গ্রাহ্য করিতে হইবে না, দুঃখকে দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না, কষ্টে কষ্টবোধ করিতে হইবে না, অটল অচল ভাবে ভগবানের আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে। কিন্তু হা অদৃষ্ট! ভগবান কি সে পথ খোলা রাখিয়াছেন? দুঃখকে দুঃখ জ্ঞান করিব না, অমানিশার অন্ধকারে শারদীয় জ্যোৎস্না দেখিব, ব্যাধি-দারিদ্র্যের বৃশ্চিক-দংশনে স্বর্গীয় সঙ্গীত অনুভব করিব, এ শক্তি কি বিধাতা আমার হাতে রাখিয়াছেন? তাহলে যে তাঁর অভিপ্রায় বিফল হয়, আমাকে কষ্ট দিতে পারেন না। এ সংসারে অন্নবস্ত্রহীন দরিদ্র হইয়া আপনাকে সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট্ বলিও না, তাহলে তোমার কষ্ট আরো বাড়িবে, চারিদিক হইতে ইট পাথর যষ্টি মুদ্গর তোমার সম্ভাষণে প্রযুক্ত হইবে! এ জীবনে ত কত কষ্টই ভোগ, কই কখনত দুঃখকে সুখ বলিয়া অনুভব করিতে পারিলাম না?

দুঃখ কি আমাদিগকে এক রকমে বেদনা দেয়? বর্ত্তমান দুঃখ; তারপর আবার দুঃখের স্মৃতি, ভবিষ্যতের নৈরাশ্য। একেত দুঃখের যন্ত্রণায় অস্থির, তারপর আবার দুঃখের দুঃখ। দুঃখ কেন জগতে সৃষ্টি হইল? দুঃখের পরিণাম কি? এই সকল প্রশ্ন লইয়াই বা কত লোকে কষ্ট করিতেছেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, "দুঃখ কি বিধাতা দিতেছেন? তোমার দুঃখ তুমি আপনিই সৃষ্টি করিয়াছ, এ তোমারই অতীত অধর্ম্মের ফল। তুমি তোমার স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়াছ, তার ফল তোমার ভোগ করিতেই হইবে। ঈশ্বর তোমার দণ্ডবিধান করিতেছেন, সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ কর, তোমার চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে।" ভাল, তাই যদি হয়, তবে কেনইবা এ স্বাধীনতা দান, কেনইবা এ দণ্ডবিধান, আর কেনইবা এ চিত্তশুদ্ধি? আমাকে আদ্যন্ত শুদ্ধচিত্ত রাখিলেই ত হইত? আর সকল দুঃখত বাস্তবিক আমার একার পাপের ফল নয়। পূর্ব্বপুরুষ কোন্ কালে কি অজ্ঞাত অপরাধ করিয়াছেন, তার জন্য আমি ব্যাধিগ্রস্ত! নগরের এক প্রান্তে, লোকে স্বাস্থ্যের কি নিয়ম ভঙ্গ করিল, আর অমনই অপর প্রান্তে, দেশ দেশান্তে, সেই দণ্ড বিস্তৃত হইয়া পড়িল, জলের স্রোতে, বায়ুর প্রবাহে সেই দণ্ডবিধান বিস্তৃত হইতে লাগিল! বিচার করিয়া কে ইহার সিদ্ধান্ত করিবে? তাই বলে, বিধাতার লীলা, ভগবানের খেলা। কি আশ্চর্য্য! জীবের দুঃখ লইয়া খেলা! শিশুর ঢিলে একটী ভেকের পা ভাঙ্গিলে সে ঘৃণিত, আর এই কোটি কোটি জীবের হৃদয় ভাঙ্গিয়া বিধাতার খেলা! তাঁহার খেলার জন্য জীবসৃষ্টি, আর জীবকে কষ্ট প্রদান! এ লীলা মহিমা আমি বুঝি না। আমার কাছে দুঃখটাই প্রধান বলিয়া বোধ হয়। ঐ রূপ কল্পজল্পনায় আমার পরিতৃপ্তি হয় না। দুঃখের উৎপত্তি পরিণাম চিন্তা করিবার অবসর ও শক্তি আমার নাই। ঐ সব দর্শন মর্শন, বিজ্ঞান কুজ্ঞান আমি বুঝি না। আমি দুঃখেই জর্জ্জরিত, আমি বুঝি দুঃখ। দুঃখ দুঃখই—সুখ নহে। সৃষ্টির রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুঃখ, জীবের মজ্জায় মজ্জায় দুঃখ। স্রষ্টার যখন এই অভিপ্রায়, তখন আর উপায় কি? তিনি যখন কথায় কথায়, পদে পদে বলিতেছেন 'দুঃখ নেও দুঃখ নেও', দুঃখ তোমায় নিতেই হইবে, উপায় নাই। সন্তুষ্ট চিত্তে নেও—এ কথা বলি না। দুঃখের সহিত সন্তোষ মিশ্রিত

হয় না, দুঃখে উপেক্ষা ঔদাস্য সম্ভব নয়। বৃথা দুঃখের উৎপত্তি পরিণাম চিন্তা করিও না।

অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে যখন বোধ হয়, সম্মুখে ঘাসের ভিতর কি যেন আছে, তখন তুমি ঘাসের উৎপত্তি পরিণাম চিন্তা কর, না সেই ঘাসের দিকে তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি নিক্ষেপ কর? পান করিবার নিমিত্ত যখন নদীর জল উত্তোলন কর, তাহার ভিতর কিছু আছে কি না, দেখিবার জন্য নদীর উৎপত্তির অভিমুখে ছুটিতে থাক, না সেই পান পাত্রের ভিতর সূক্ষ্মতর দৃষ্টি নিক্ষেপ কর? সহচর বন্ধুর চক্ষুর ভিতর অকস্মাৎ কিছু প্রবেশ করিলে, সেই মলয় পবনের উৎপত্তি স্থানে উড়িয়া যাও, না বন্ধুর চক্ষু উন্মীলিত করিয়া তাহারই ভিতর সূক্ষ্মরূপে অন্বেষণ কর? তাই বলি, দর্শন বিজ্ঞানের ঐরূপ উৎপত্তি পরিণাম চিন্তা তোমার আমার পক্ষে আবশ্যক কি; দুঃখের সম্বন্ধে আমি দর্শন বিজ্ঞান বুঝি না, মায়াবাদ, অবিদ্যাবাদ, অদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্যবাদ, অনাত্মবাদ, কিছুই মানি না। সোজা কথায় এই বুঝি যে, আমি জীব ত বটে, যত দিন জীব থাকিব, যত কাল অপূর্ণ থাকিব—(কখনও কি পূর্ণ হইব?)—আমার অভাব থাকিবেই। আর অভাব থাকিলেই দুঃখ। দুঃখ জীবের সহচর, জীবাত্মার অবিচ্ছেদ্য উপকরণ।

সামান্য বুদ্ধিতে লৌকিক চক্ষে একবার দুঃখের দিকে তাকাও। দেখিবে, সব দুঃখ সমান নহে। পিপীলিকার কামড় হইতে মৌমাছির হুল শতগুণ কষ্টদায়ক, কার্ত্তিকের শীত অপেক্ষা মাঘের শীত সমধিক ক্লেশপ্রদ, পৌষের রৌদ্র অপেক্ষা ভাদ্রের উত্তাপ অধিকতর দুঃসহ। এক দিনের সর্দ্দির কাছে পিত্তশূল কি ভয়ানক! অপরিচিত প্রতিবেশী বিয়োগের তুলনায় পুত্রশোক অসহ্য। এইরূপ দুঃখের অবস্থার দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই, দুঃখের প্রাখর্য্য ভেদ আছে। আর প্রাখর্য্যভেদ না থাকিলে যে চলে না—সৃষ্টির অভিপ্রায় বিফল হইয়া পড়ে—দুঃখের লাঘব হয়, তাহা নহে, দুঃখের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়। সর্ব্বদা যে দুর্গন্ধ দুর্কার জনক স্থানে থাকে, তার কি শেষে আর বোধ থাকে? একই দুঃখ কিছু দিন থাকিলে তাহা সহ্য হইয়া যায়, ভুগিতে ভুগিতে অনুভব শক্তির বিলোপ হয়। তখন দুঃখদাতা দুঃখের প্রাখর্য্য একটু বাড়াইয়া দেন, আর জীব সজীব হয়, পুনরায় দুঃখ অনুভব করে। দুঃখের বোধ শক্তি তিরোহিত না হয়, তাই বিশ্বস্রষ্টার এত আয়োজন, দুঃখের এই অনন্ত প্রাখর্য্যভেদ, তাই তিনি অসংখ্য পিপীলিকা দ্বারা সর্ব্বদা জীবকে চিম্‌টি কাটিতেছেন, অনন্ত বিষদন্ত দ্বারা জীবকে সর্ব্বদা দংশন করিতেছেন। অবিশ্বাসী পাপী নারকীর উক্তি—কিন্তু সত্যের অপলাপ ত ধর্ম্ম হয় না? সত্য কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বিশ্ব যদি তাঁরই হয়, দুঃখ দাতাও তিনিই। তিনি কেবল সুখ শান্তি দেন, আর সয়তান দুঃখ দেয়? এই বিশ্বে তাঁরও যেমন অধিকার, সয়তানেরও তেমনি—তদপেক্ষা অধিকতর অধিকার? তা নয়, তিনিই দুঃখদাতা। সুখ বর্ণনা করিবার সময় যথাযথ বর্ণনা করিবে, অলঙ্কারের আশ্রয় লইবে, আর দুঃখ বর্ণনা করিবার সময় পাছে বিশ্বস্রষ্টার প্রতি দোষারোপ হয়, এই ভয়ে লেখনী সংযত করিবে, অলঙ্কার ছাড়িয়া দিবে, যেন প্রকৃত সত্য পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিতে না পারে। এ তোমার কেমন সত্য—কেমন ধর্ম্ম? সুখের বিষয়ে যদি বল

যে, তিনি সুখের অনন্ত আয়োজন করিয়া, সর্ব্বদা অন্তরালে থাকিয়া, সকল প্রকারে সুখবিধান করিতেছেন, দুঃখের বিষয়ে কেন বলিতে কুণ্ঠিত হইবে যে, তিনি অনন্ত দুঃখের আয়োজন করিয়া, সর্ব্বদা অন্তরালে থাকিয়া, সর্ব্বপ্রকারে দুঃখ দিতেছেন? সুখের বিষয়ে সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া সহস্র কণ্ঠ পরাভূত করিয়া, চিৎকার কর, আর দুঃখের কথা পাড়িলে কেন একধারে সরিয়া অদৃশ্য হও? নাস্তিক, তুমি না আমি? অসত্য অসরলতা তোমার, না আমার?

আমি তাঁর সৃষ্টি, সকল প্রকারে তাঁর আয়ত্তাধীন, তাইত তিনি আমাকে কষ্ট দেন। সুখ অনেকেই দিতে পারে, কিন্তু নিরুপায় অনাথ নিরাশ্রয় যদি সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন না হয়, তবে কি তাহাকে কষ্ট দেওয়া যায়? জীব তাঁহার সম্পূর্ণ করায়ত্ত, তাইত তিনি জীবকে কষ্ট দেন, নতুবা কি পারিতেন? কেবল কি দুঃখের প্রাথর্য্যভেদ করিয়া ক্ষান্ত, দুঃখের আবার আয়তন-ভেদ করিয়াছেন। একে গায়ে কাপড় নাই, তাতে আবার অন্নাভাব, আবার দেখ ছেলেটীর অসুখ হইয়া পড়িল, ঔষধই বা কোথায় পাই, আর পথ্যের পয়সাই বা কে দেয়? গৃহিণীর অসুখ, তাতে আবার ঝি আসে নাই, ব্রাহ্মণ পালাইয়াছে, আবার দশটায় আপিসে না যাইতে পরিলে সাহেবের ভ্রুকুটী! রোগ যখন আসে, তখন কি কেবল একটী যন্ত্রণা? কথাই আছে "ছিদ্রেশ্বনর্থা বহুলী ভবন্তি"। অভাবের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের আয়তন বৃদ্ধি। মানব এ সংসারে একা বিচরণ করে না। জীবনের সহিত জড় জগতের কি একটী পদার্থের সম্বন্ধ? জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কোন্ পদার্থের সহিত আমার সম্বন্ধ নাই? যার সঙ্গে সম্বন্ধ, সে-ই যেমন আমাকে সুখ দিতে পারে, তেমনি আবার দুঃখও দিতে পারে। দুঃখের আয়তন বৃদ্ধির সম্যক আয়োজনেই সংসার রচিত। এক বিষয়ে দুঃখ পাইতেছ, বিষয়ান্তর চিন্তা কর, আরও দুঃখ বাড়িবে। কোন্ পথে তুমি পলাইবে? চারিদিক আবদ্ধ।

তাই বলি, যতই চিন্তা কর, দুঃখ বাড়ে বই কমে না। ভূত ভবিষ্যৎ, উৎপত্তি পরিণাম চিন্তা করিয়া কূল কিনারা পাওয়া যায় না, কোন স্থির সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না। সিদ্ধান্ত করিলেও তাহাতে বর্ত্তমান দুঃখের কিছুই লাঘব হইবার নয়। আবার দেখিলে, দুঃখের স্বরূপ-চিন্তা করিলে বোঝা যায় যে, যাহাতে দুঃখ সজীব থাকে, জীবন বেদনাবিহীন না হয়, তাহার বিধিমত ব্যবস্থা রহিয়াছে। একথা বলিতে পারা যায় যে, জীব যেমন পঞ্চভূতে নির্ম্মিত, তদ্রূপ দুঃখও একটী ষষ্ঠ ভূত। দুঃখময় জীবন, জীবনময় দুঃখ।

জীবন যখন এড়াইতে পারিতেছ না, স্রষ্টার রাজ্য যখন পরিত্যাগ করিতে পার না, দুঃখদাতার শাসন অতিক্রম করিবার শক্তি যখন নাই; তখন কেন মিছে মারামারি, কেন মিছে অসরল অকৃতজ্ঞতা, কেন মিছে সত্যের অপলাপ? সর্ব্বান্তঃকরণে দুঃখদাতার বশীভূত হও, ভগবানের ইচ্ছা পালন কর। দুঃখদাতার অভিপ্রায় কখনও অন্যথা হইবে না। তিনি যখন দুঃখের এত আয়োজন করিয়াছেন, এত প্রাথর্য্যভেদ, আয়তনভেদ করিয়াছেন; তিনি যখন সর্ব্বদা বলিতেছেন, "দুঃখ নেও, দুঃখ নেও"; তখন দুঃখ নেওই না কেন? আর দুঃখ যখন তোমার জীবনের উপকরণ, তখন দুঃখের জন্য তোমার একটা অতৃপ্য পিপাসাও থাকিতে পারে! পঞ্চভূতের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা ত রহিয়াছে। জলের

জন্ত পিপাসা, অন্নের জন্ত ক্ষুধার্ত্ত নিশ্চয়ই আছে, তবে এই ষষ্ঠভূত দুঃখের জন্য একটা অনিবার্য্য আকাঙ্ক্ষা নাই কি? এ দার্শনিক কল্পনা নয়, কবির উপমা নয়। দুঃখ যখন জীবনের মজ্জাগত,তখন যুক্তিদ্বারাই পাওয়া যায় যে,দুঃখের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা আছে —চিত্তের বিকার হৃদয়ের প্রলাপ নয়,একটী স্বাভাবিক ক্ষুধা আছে। যখন স্রষ্টার অভিপ্রায়ে "দুঃখ নেও দুঃখ নেও" একটা ধ্বনি হইতেছে, তখন জীবের হৃদয়ে "দুঃখ দেও দুঃখ দেও" একটী আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই উত্থিত হইবে। এত যুক্তির কথা, কিন্তু তোমার হৃদয়ের দিকে তাকাও ত সত্য সত্যই উপলব্ধি করিবে যে,জীবনের মূলে দুঃখের ক্ষুধা বাস্তবিকই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

তবে আর ভূত ভাবিষ্যতের দিকে চাহিও না,উৎপত্তি পরিণাম চিন্তা করিও না,দুঃখেতে সুখের ভ্রম রাখিও না। দুঃখ বাড়াও,দুঃখকে প্রখর ও বিস্তৃত কর। এক বিষয়ে দুঃখ ভুগিতে ভুগিতে যদি অনুভব ম্লান হইয়া থাকে,বিষয়ান্তর অবলম্বন কর। আজীবন অন্নবস্ত্রের কষ্ট পাইতে পাইতে যদি তদ্বিষয়ে দুঃখবোধ বিরহিত হইয়া থাক, বিদ্যা বুদ্ধি শ্রদ্ধা চরিত্রের অভাবের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দুঃখকে জাগরুক কর। কেবল অভাবের সংখ্যা বাড়ান নয়, দুঃখকে প্রখর কর,ক্রমশঃ তাহা অসহ্য হউক। এই সব চিন্তা করিয়া যখন দুঃখ প্রখর হইল, তখন—আর কি করিবে? দুঃখ. আরো বাড়াও।

"স্বীয় পরিবারের অভাবের অভাব চিন্তা করিতে করিতে দুঃখ কষ্টে যখন শরীর অবসন্ন হইতেছে, হৃদয় জর্জ্জরিত হইতেছে, তখন যে আর দুঃখ সহ্য হয় না? আমি কেন এই পরিবারের প্রতিপালক হইলাম? আমি যে ইহার কোন অভাব দূর করিতে পারি না। স্ত্রীপুত্রকে সমুচিত আহার দিতে পারি না, তাহাদের শিক্ষা ও উন্নতির সহায়তা করিতে পারি না,দাসদাসীর উপযুক্ত বেতন দিতে পারি না,তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দতার দিকে তাকাইতে পারি না, অভাবে রোগে সাহায্য করিতে পারি না।—চিন্তা করিতে গেলে কষ্ট যে অসহ্য হইয়া পড়ে।"

এইরূপ যখন অবস্থা তখন?—আর কি বলিব? দুঃখ আরো বাড়াও। দুঃখদাতা তোমাকে দুঃখের উপকরণেই গঠন করিয়াছেন, দুঃখভারে জীবন কখনই ভাঙ্গিবে না। দুঃখের অভাবে জীবন বাঁচিবে না। দুঃখ বৃদ্ধিই করিতে থাক। বামে দক্ষিণে তাকাইও না, অগ্র পশ্চাৎ দেখিও না,পরিণাম চিন্তা করিও না, কেবল দুঃখ বাড়াও—প্রাখর্য্য বাড়াও, আয়তন বাড়াও। নিজের দুঃখ, পরিবারের দুঃখ যথেষ্ট হইতেছে না,দুঃখ আরো বাড়াইতে হইবে। দুঃখের মাত্রার শেষ নাই,যতই বাড়াও, ততই বাড়িবে। কোন্ প্রতিবেশী অনাহারে আছে, কাহার পুত্রকন্যা বস্ত্রহীন, কাহার ছেলের শিক্ষা হইতেছে না—এই সকল সূত্রে দুঃখকে বাড়াও। সে যেন তোমারই ঘরে অন্ন নাই,তোমারই পুত্রকন্যা বস্ত্রহীন,তোমারই শিশু অশিক্ষিত, এইরূপ উপলব্ধি কর— নতুবা তোমার দুঃখ বাড়িবে না। তোমার পাড়ায় পুকুর নাই, সকলের পিপাসার নিদারুণ কষ্ট তুমি সহ্য কর, সহস্র জিহ্বার জলাভাব তুমি অনুভব কর, সহস্র শুষ্ক কণ্ঠের অসহ্য যন্ত্রণা তুমি ভোগ কর। ম্যালেরিয়া জ্বরে তোমার দেশ উৎসন্ন হইতেছে, সকল জ্বররোগীর প্রদাহ, সকলের কষ্ট তোমার নিজের করিয়া লও। দুঃখ যত বাড়াইবে, ততই বাড়িবে। তোমার এই বঙ্গভূমির জেলায় জেলায় দুর্ভিক্ষ, অন্নাভাবে লোকে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধার যন্ত্রণা আরো

বাড়াইতেছে, অন্ন কষ্টের সহিত রোগ যন্ত্রণা যোগ করিতেছে। প্রেমময়ী পত্নী স্নেহের সন্তান পরিত্যাগ করিয়া উদ্বন্ধনে পলায়ন করিতেছে। এই কোটি কোটি প্রাণীর ক্ষুধার জ্বালা, রোগের যন্ত্রণা, পত্নীর পতিবিরহ, শিশুর পিতৃশোক, নিরুপায়ের নৈরাশ্য যদি তোমার হৃদয়ে একীভূত করিতে পার, তোমার দুঃখ কত বাড়িবে, তোমার যন্ত্রণা কত দুঃসহ হইবে। তার পর আরো বাড়াও। তোমার এই ভারতে অন্যায় অবিচার, অধর্ম্ম অত্যাচার ভীষণ যমদূতবেশে নগরে নগরে, সমাজে সমাজে, পাড়ায় পাড়ায় বিচরণ করিতেছে, লৌহময় মুদ্গরের প্রহারে নরনারীর মস্তক চূর্ণ করিতেছে, শাণিত তরবারির অবিরাম আঘাতে কত শত হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করিতেছে। এই সকল মুদ্গর তোমার মস্তকে পড়ুক, এই তরবারির আঘাতে তোমার হৃদয় সহস্রধা বিভক্ত হউক, তোমার দুঃখ কত বাড়িবে। দুঃখের আয়তন বাড়াও, প্রখরতা বাড়াও। দুঃখ প্রখর না হইলে, যন্ত্রণা তীক্ষ্ণ না হইলে, কিছুই হইল না। দুঃখ বাড়িল না। ভারতের সকল যন্ত্রণা যদি তোমাকে বিদ্ধ না করিল, নরনারীর সকল কষ্টে যদি তোমার হৃদয় ছিন্ন না হইল, তবে তোমার দুঃখ বাড়িল কই? মানবের হৃদয়ে যত শেলবিদ্ধ হইতেছে, তাহা তোমার হৃদয়কে বিদ্ধ করিবে, বিধাতার যত বিষদন্ত তোমাকে বিদ্ধ করিবে, জীবদুঃখের অসংখ্য ফণার অবিরত আঘাতে তোমার হৃদয় সহস্রধা বিচ্ছিন্ন হইয়া রক্তে প্লাবিত হইবে। তা হলে?—তা হলে আর কি? তা হলেও তোমার দুঃখ-পিপাসা মিটিবে না, দুঃখের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবে না। জীবনে যা কিছু সুখ থাকে, যতটুকু শান্তি থাকে, তাহাই অসহ্য হইয়া উঠিবে। ত্রিতলগৃহের সুশীতল সমীরণ ছাড়িয়া তুমি দুঃখের ভিখারী বেশে মাঠে মাঠে ছুটিবে। "দুঃখ দেও দুঃখ দেও" বলিয়া দ্বারে দ্বারে কান্দিয়া বেড়াইবে। তোমার দুঃখের আয়তন, প্রখরতা খুব বাড়িবে, তবু তোমার দুঃখ-ক্ষুধা তৃপ্ত হইবে না। এ "দুষ্ট ক্ষুধা" নয়, চিত্তের প্রলাপ নয়, হৃদয়ের বিকার নয়। জীবনের মজ্জাগত উপকরণের জন্য তোমার হৃদয় অস্থির হইবে। তখন? তখন, আর কি হইবে? তুমি অশ্রুধারে হৃদয় প্লাবিত করিয়া কান্দিবে,

"হায়! আমার দুঃখ কি এত কম! নর নারীর দুঃখ আমাকে বিদ্ধ করে না, জীব-যাতনার অসংখ্য ফণা কেন আমার হৃদয়কে সজোরে দংশন করে না? আমার হৃদয়ে যে এখনও শান্তি আছে, আমার চিত্তে যে এখনও সুখ আছে। শান্তির ছায়া, সুখের চিহ্ন কেন হৃদয় হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় না? কেন আমি জগৎপ্রাণ জগদ্ধৃদয় হইয়া জীব জগতের সকল যন্ত্রণা অসীম প্রখরতার সহিত অনুভব করিতে পারি না?"

দুঃখের কি অপার মহিমা! দুঃখদাতার কি অচিন্ত্য অভিপ্রায়! তাই বলি, দুঃখ ছাড়িতে পারিবে না, দুঃখ ছাড়িও না। দুঃখে সুখের ভ্রম করিও না, অগ্রপশ্চাৎ, উৎপত্তি পরিণাম চিন্তা করিও না। দুঃখ জীবের মজ্জাগত, দুঃখ জীবনের উপকরণ; দুঃখ বাড়াইয়া—জীবন বাড়াও। দুঃখই সত্য, দুঃখের প্রখরতাই প্রকৃত বিজ্ঞান, দুঃখের বিস্তারই দর্শনের সার, দুঃখের পরিবর্দ্ধনই প্রকৃষ্ট ধর্ম্মসাধন।

শ্রীশিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (২)

পূর্ব্ব-প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ন্যায় ও সাংখ্যদর্শনের মতে,ব্রহ্মই এই পরিদৃশ্যমান জগতের নিমিত্ত কারণ (Instrumental cause)। ইহাদের উভয়েরই মতে ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের আর একটী করিয়া উপাদান (Material cause) স্বীকৃত হইয়াছে। সেই উপাদান-কারণ ন্যায়মতে পরমাণু, এবং সাংখ্যমতে প্রকৃতি। আমরা পূর্ব্ব-প্রস্তাবে এই উভয় প্রকার মতেরই বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া আসিয়াছি। আরও দেখিয়াছি যে, বেদান্ত-দর্শন একটু বিভিন্ন-ভাবে সৃষ্টি-তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন; ইহার প্রণালী একটু স্বতন্ত্র। বেদান্তদর্শন একমাত্র ব্রহ্মকেই প্রকৃত প্রস্তাবে নিখিল-জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই মতেরই একটু বিশেষ বিবরণ ও দোষ গুণ বিচার করিয়া দেখিবার জন্য আমরা অগ্রসর হইতেছি। বেদান্ত পরিভাষায় লিখিত আছে:—

"নিখিল জগদুপাদানত্বং ব্রহ্মণো লক্ষণং।
উপাদানত্বঞ্চ জগদধ্যাসাধিষ্ঠানত্বং,
জগদাকারেণ পরিণমমান মায়াধিষ্ঠানত্বং বা"।

বেদান্তদর্শনের জগৎ-সৃষ্টি সম্বন্ধে কিরূপ মত, তাহা এই কারিকাটী বুঝিতে পারিলেই উত্তম পরিস্ফুট হইবে। ব্রহ্ম এই নিখিল জগতের উপাদান। উপাদান কাহাকে বলে? এই জগৎ রূপ আরোপ বা অধ্যাস যাহাতে আরোপিত হয়, তাহাই জগতের উপাদান। আধার না থাকিলে, আরোপ সম্ভবে না। সুতরাং যে আধারে এই জগৎ অধ্যস্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই উহার উপাদান। বেদান্তকার বলেন মায়াই * এই জগতের আধার; মায়াতেই এই জগৎ অধ্যস্ত আছে;—অর্থাৎ মায়াই পরিণত হইয়া নাম ও রূপে ব্যাকৃত বা প্রকাশিত হইয়া—এই জগদাকারে দেখা দিয়াছে। সুতরাং অনির্ব্বচনীয় মায়াই এই জগতের উপাদান। তাহা হইলেই এখন বুঝিতে হইবে যে,মায়াই যদি জগতের উপাদান-কারণ হইল, তবে আর ব্রহ্মকে কেমন করিয়া উপাদান-কারণ বলা যায়? কিন্তু এ-স্থলে একটী কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। মায়াই বাস্তবিক পক্ষে জগতের উপাদান; কিন্তু মায়া ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ হইলে পর নিবৃত্ত হয়, সুতরাং মায়াও মিথ্যা পদার্থ। সুতরাং মায়াও ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সেই জন্যই,মায়া জগতের উপাদান কারণ হইলেও ব্রহ্মই বাস্তবিকপক্ষে জগতের প্রকৃত উপাদান কারণ হইয়া পড়িতেছেন।

কিন্তু এস্থলে একটী বিষয় একটু বিশেষ মনেযোগ দিয়া বুঝিতে হইবে। আমরা

---

* বেদান্ত-মতে অজ্ঞানকেই মায়া বা অবিদ্যা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বেদান্তের মায়া এবং সাংখ্যের প্রকৃতি বা প্রধান একই কথা। এই অজ্ঞান সদসদাত্মক ও অনির্ব্বচনীয়। ইহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিবার কোন উপায় নাই। এই মায়াই জ্ঞানকে আবরণ করে। সাংখ্যে প্রকৃতির পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে,বেদান্তে মায়ার পৃথক্ অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয় নাই। মায়া ও ব্রহ্ম যে এক, তাহা বেদান্তে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। ব্রহ্ম চৈতন্যে মায়া আছে বলিয়া বা মায়া ব্রহ্মেরই স্বভাব বা অংশ বলিয়া এই জগৎ ব্রহ্ম-চৈতন্যেই প্রতিভাত।

দেখিয়া আসিলাম যে, ব্রহ্ম এবং তৎ-শক্তি মায়া উভয়ই জগতের উপাদান কারণ। কিন্তু উপাদানই জগৎরূপে প্রকাশিত হয় বা দেখা দেয়। উপাদান পরিণত হইয়াই কার্য্য জন্মিয়া থাকে। তাহা হইলেই ভাবিয়া দেখ যে, অপরিণাম-স্বভাব ব্রহ্মও "পরিণামী" হইয়া পড়িতেছেন;—কেননা, ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলা হইয়াছে। কিন্তু অপরিণামী ও অবিকারী পূর্ণ-ব্রহ্মের পরিণাম কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই জন্যই বেদান্ত-দর্শনে,পরিণাম ও বিবর্ত্ত,এই দুইভাগে কার্য্যোৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। উপাদান পরিণত হইয়া কার্য্যোৎপত্তি হয় এবং উপাদান বিবর্ত্তিত হইয়া কার্য্যোৎপত্তি হয়। আমরা দেখিয়াছি, মায়া ও ব্রহ্ম উভয়ই এ জগতের উপাদান। এখন বুঝিয়া দেখ, মায়াই পরিণত হইয়া এই জগদাকারে আবির্ভূত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মও বিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। অর্থাৎ মায়ারই পরিণাম হয়, কিন্তু তাহার বিবর্ত্ত হয় না। ব্রহ্মের পরিণাম হয় না, বিবর্ত্ত হয় মাত্র। মায়ারূপ উপাদানসম্বন্ধে জগতের পরিণতি এবং ব্রহ্মরূপ উপাদান-সম্বন্ধে জগতের বিবর্ত্তন স্বীকৃত হইয়াছে। একথাটী ভাল করিয়া না বুঝিলে, বেদান্তের প্রকৃত মত কি, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না;—সেইজন্য আমরা একটু বিশেষ ভাবে বলিতেছি। "পরিণামো নাম—বস্তুনঃ স্বস্বরূপং পরিত্যজ্য স্বরূপান্তরাপত্তিঃ" এবং "বিবর্ত্তোনাম—স্বস্বরূপাপরিত্যাগেন স্বরূপান্তরাপত্তিঃ"(বে,সার।—সুবোধিনী টীকা)। বস্তু স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া, অন্যরূপ ধারণ করিলে "পরিণাম" বলে। যেমন দুগ্ধ নিজের স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া দধ্যাকারে পরিণত হয়। পরিণত-কার্য্যে,কারণের স্বরূপের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। কিন্তু "বিবর্ত্ত" ইহা হইতে বিভিন্ন। স্বরূপ স্বত্বেও, যে বস্তু অন্য একটী মিথ্যা রূপ ধারণকরে, তাহাকে বিবর্ত্ত বলা যায়। যেমন মনে কর, তোমার সম্মুখবর্ত্তী রজ্জুতে হঠাৎ সর্প ভ্রম উপস্থিত হইল। হঠাৎ তুমি রজ্জুটীকে সর্প বলিয়া মনে করিলে। এস্থলে প্রকৃত-রজ্জুতে একটী মিথ্যা-সর্প-জ্ঞান হইতেছে। কিন্তু এ স্থলে রজ্জু নিজের স্বরূপ পরিত্যাগ করে নাই। রজ্জুর নিজের স্বরূপের বাস্তবিক কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না,কেবল উহাতে একটী মিথ্যাভূত বস্তুন্তরের প্রতীতি জন্মিল মাত্র। এখন জগৎ-সৃষ্টি-সম্বন্ধেও এই কথা। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, মায়াই পরিণত হইয়া জগৎরূপে প্রব্যক্ত হইয়াছে;—অর্থাৎ মায়া স্বরূপ পরিত্যাগ করতঃ অন্যরূপে অর্থাৎ সৃষ্ট-পদার্থ-সমূহরূপে দেখা দিয়াছে। আবার ব্রহ্মও বিবর্ত্তিত হইয়াছেন;—অর্থাৎ ব্রহ্মের নিজের স্বরূপ ভূত চৈতন্য ঠিকই আছে, কেবল সেই চৈতন্যে একটা মিথ্যা পদার্থের—এই জগৎটার—ভ্রম-প্রতীতি হইতেছে মাত্র। তাহা হইলেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিতা মায়াই জগদাকারে পরিণত হওয়াতে, চৈতন্যে এই জগতের অধ্যাস হয় মাত্র। অতএব এরূপে, ব্রহ্মে পরিণাম-দোষ আসিতে পারিল না। এখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ব্রহ্মই বাস্তবিক জগতের উপাদান কারণ। আবার সেই ব্রহ্মই, অবিদ্যা বা মায়াকে জগদাকারে পরিণত করাইবার "কর্ত্তা"। ব্রহ্মই, সেই উপাদানে ভূত মায়া বিষয়ক-প্রত্যক্ষ জ্ঞান, চিকীর্ষা ও যত্ন প্রভৃতি দ্বারা (এই প্রবন্ধের প্রথম সংখ্যা দেখ) এই জগতের কর্ত্তা হইয়া পড়িতেছেন। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাই-

তেছে যে, ব্রহ্মই এই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ উভয়ই।

আমরা দেখিয়াছি, ন্যায়-প্রণেতা ও সাংখ্য-কার উভয়ই ব্রহ্মকে জগতের কেবল অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্ত কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বেদান্তকার বলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" (বেদান্তদর্শন, ২।২।৩৭) নামক সূত্রের ভাষ্যে এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কতকগুলি দোষের অবতারণা করিয়াছেন। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ফলতঃ তিনি যুক্তিবলে দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মকে উপাদান কারণ বলিতেই হইবে।

আমরা উপরে যাহা দেখিয়া আসিলাম, তদ্দারা মীমাংসিত হইল যে, মৃত্তিকা সুবর্ণাদি যেরূপ ঘটকুণ্ডলাদির উৎপত্তির কারণ, ব্রহ্মও সেইরূপ এই জগতের উৎপত্তির কারণ। কিন্তু এরূপ মীমাংসার বিরুদ্ধেও অনেকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। এখন আমরা সেই আপত্তিগুলির আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি। প্রথমতঃ সেই প্রশ্ন বা আপত্তিগুলির পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করিয়া, তৎপরে তাহাদের খণ্ডনার্থ উত্তর প্রদান করা যাইবে। সেই আপত্তিগুলি এই :—

(ক) দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোকে কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। নিতান্ত মূঢ়-ব্যক্তিও বিনা প্রয়োজনে কোন কার্য্য করে না। কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, কি অভিপ্রায়ে ও কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কার্য্য করিতেছে, লোকে তাহার আবশ্যকতার অনুভব করিয়া থাকে। ব্রহ্ম যে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি তাঁহার কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এই জগৎ সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবেন? যাঁহার কোনও অভাব নাই, যিনি নিত্য-পরিতৃপ্ত, তাঁহার আবার প্রয়োজন কি? আর যদি বল যে, তিনি বিনা-উদ্দেশ্যে জগৎ-সৃষ্টি করিয়াছেন। তদুত্তরে আমি বলি যে, প্রয়োজন না থাকিলে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। উন্মত্ত ব্যক্তি বুদ্ধি-দোষে কখনও কখনও নিষ্প্রয়োজনে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বটে; কিন্তু ঈশ্বর ত উন্মত্ত নহেন। তাঁহার বুদ্ধি-দোষও থাকিতে পারে না, কেন না, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। সুতরাং ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না।

(খ) সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ বা অনন্ত সুখের ভাজন হইয়া জন্মিয়াছে। ইচ্ছামাত্র শত শত দাসদাসী সমস্ত অভাব পূরণে ব্যস্ত। আর কেহ বা মুষ্টি ভিক্ষার জন্য লালায়িত। ঈশ্বর যদি এরূপ বিষম-সৃষ্টির কারণ হন, তবে ত তিনি অতীব নির্দ্দয় ও পক্ষপাতী! কিন্তু নিত্য-শুদ্ধ নির্লিপ্ত পরমেশ্বর পক্ষপাত দোষদুষ্ট ও নির্ম্মম-নির্দ্দয় হইবেন কেমন করিয়া? সুতরাং ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না।

(গ) কুম্ভকার প্রভৃতি 'কর্ত্তা' নানাবিধ সাধন লইয়াই ঘট-পটাদির সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র, সূত্র প্রভৃতি অশেষ প্রকার সামগ্রী না থাকিলে, কুম্ভকারাদি কখনই ঘটাদি উৎপাদন করিতে পারে না। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে, ব্রহ্মের সেরূপ কোন সাধন সামগ্রী থাকা অসম্ভব। কিন্তু বিনাসাধনে কেমন করিয়া নির্ম্মাণ ক্রিয়া সাধিত হইতে পারে? অতএব ব্রহ্ম এ জগতের কারণ হইতে পারেন না।

(ঘ) ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম একমাত্র পদার্থ। সেই এক অদ্বিতীয় পদার্থ হইতে অনেকবিধ পদার্থ উৎপন্ন হইল কেমন করিয়া? বস্তুর পূর্ব্বাবস্থার নাশ হইলেও বরং উৎপত্তি হওয়া

সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপের নাশ হওয়া কদাচ সম্ভব নহে। তবে কেমন করিয়া স্বরূপের উপমর্দ্দব্যতিরেকেও, এক-মাত্র ব্রহ্ম হইতে এই নানাবিধ ভূতগ্রামবি-শিষ্ট জগৎ উৎপন্ন হইল? সুতরাং দেখা যাই-তেছে যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না।

(ঙ) ঈশ্বর সৃষ্টির পরই যাবতীয় পদার্থের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়া-ছেন। শ্রুতি বলিতেছে—"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ"। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, কে কোন্ দিন্ বুদ্ধি-পূর্ব্বক নিজেরই অহিত করে? কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজের বন্ধনাগার নিজেই সৃষ্টি করিয়া, নিজেই তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে? যিনি অতি নির্ম্মল,তিনি কেন এই মলিন ও জন্মজরারোগাদি বিবিধ অনর্থ-পূর্ণ বন্ধনাগারস্বরূপ শরীরে আবদ্ধ হইয়া থাকিবেন? অতএব ব্রহ্ম, সৃষ্টির কারণ হইতে পারেন না।

(চ) সংসারে দ্বিবিধ পদার্থ রহিয়াছে। কতকগুলি ভোগ্যপদার্থ,অপরগুলি ভোক্তা। ভোক্তা শারীরী চেতন এবং ভোগ্য শব্দাদি বিষয় সমূহ। যদি বল যে, ব্রহ্মই সমস্ত পদা-র্থের উপাদান,তবে ভাবিয়া দেখ যে,তোমার মতে ভোক্তা ও ভোগ্য বলিয়া বিভাগ থাকিতে পরিতেছে না। পরম-কারণ ব্রহ্ম হইতে যদি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ অভিন্ন হয়, তবে ভোক্তা ভোগ্য হইয়া পড়েন এবং ভোগ্য ভোক্তা হইয়া পড়ে। উভয়বিধ পদার্থের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না, কেন না সমস্তই ব্রহ্ম। সুতরাং সংসার হইতে এই প্রসিদ্ধ ভোক্তা ও ভোগ্য বিভাগ উঠিয়া যায়। অতএব ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিতে পার না।

(ছ) বেদান্ত সৎকার্য্যবাদী। এমতে,কার্য্য, উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ কার্য্যাকারে অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে, তাহার কারণেই গুপ্তভাবে অবস্থিত থাকে। তাহা হইলেই দেখ,যদি চেতন শুদ্ধ ও শব্দাদি নামরূপ হীন ব্রহ্ম,—এই অচেতন, অশুদ্ধ ও শব্দাদিবিশিষ্ট জগতের কারণ হন,তবে বেদান্ত অসৎ-কার্য্য-বাদী হইয়া পড়িলেন। আরো দেখ;—প্রলয়-কালে বা জগতের বিনাশ-সময়ে সমস্ত বস্তুই কারণে বিলীন হইবে। এই অশুদ্ধ, অচেতন জগৎ, উঁহার শুদ্ধ, চেতন কারণ স্বরূপ ব্রহ্মে বিলীন হইবে। তবেই দেখ, কার্য্যের দোষ, কারণে সংস্পৃষ্ট হইতেছে। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, বেদান্তমতেও, ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা যাইতে পারে না।

(জ) যে পদার্থ যাহার বিকার, সেই পদার্থে তাহার ধর্ম্ম বা গুণ থাকিবেই। দধিতে দুগ্ধের ধর্ম্ম থাকে। ঘটে মৃত্তিকার ধর্ম্ম থাকে।

তবেই দেখ, যদি ব্রহ্মকে জগতের উপা-দান বল, তবে জগতে চৈতন্য-ধর্ম্ম অবশ্যই থাকিত। প্রকৃতি হইতে বিকার বিসদৃশ বা বিলক্ষণ হইতে পারে না। বিকারে,উপাদানের সদৃশ-ধর্ম্ম থাকাই নিয়ম। সুতরাং বুঝা যাই-তেছে যে,যদি নিত্যশুদ্ধ চেতন ব্রহ্ম জগতের কারণ বা উপাদান হন, তবে এই জগৎরূপ বিকার অনিত্য অশুদ্ধ ও অচেতন হইল কেমন করিয়া? অতএব, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন না।

আমরা প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে,অতি সংক্ষেপে প্রধানতঃ এই আটটী আপত্তির উল্লেখ করি-লাম। বারান্তরে এই আপত্তি কয়েকটীর উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

নিরাকারের সাকার রূপ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

এই সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেকেরই অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে। অনেকে মনে করেন, সৃষ্টি একটা ঘটনা বিশেষ, কোনও বিশেষ সময়ে ঈশ্বর সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করেন, বা সম্পাদনে নিযুক্ত হন। তৎপূর্ব্বে কিছুই ছিল না, কেবল মাত্র ঈশ্বরই ছিলেন।

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ, সদেব-সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং।

সবা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমৃতোঽভয়ঃ।
স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্তা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে, হে সৌম্য, কেবল একই অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনি জন্ম বিহীন মহান্ আত্মা; তিনি অজর, অমর, নিত্য, ও অভয়। তিনি বিশ্ব সৃজন বিষয়ে আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন।

ব্যবহারিক ভাষায় বলিতে গেলে এক হইতে—অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ, অজ, অমর, নিত্য পরব্রহ্ম হইতে,—এই বহুর উৎপত্তি; সেই একেরই বিকাশে বা অভিব্যক্তিতে এই বিচিত্র জগতের জন্ম হইয়াছে, এই রূপই বলিতে হয়। কিন্তু এই ভাষায় সৃষ্টিকে যেরূপ একটা বিশেষ কালে সংঘটিত একটা বিশেষ ঘটনা রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সত্য বর্ণনা নহে। ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ—অগ্রে ছিল না পরে হইয়াছে,—ইহাতেই সৃষ্টি কার্য্যকে কালাধীন করা হইল। ইহাকে একটা ঘটনা বা একটা কার্য্য বলিয়া ধরা হইল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টি একটা ঘটনা বা কার্য্য নহে, কিন্তু একটা প্রণালী; একটা event in time নহে, কিন্তু a process through eternity. এই সৃষ্টির আদি নাই, অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, ইহার অন্তও নাই, অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিবে। স্রষ্টা যেমন অনাদি অনন্ত, সৃষ্টিও সেইরূপ অনাদি অনন্ত। সৃষ্ট বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ, সৃষ্ট জীবের জন্ম ও মৃত্যু আছে বটে;—কিন্তু সৃষ্টি বলিতে এস্থলে জীব বা বস্তু নহে, কিন্তু অব্যক্তের অভিব্যক্তিই বুঝাইতেছে। এই অভিব্যক্তি অনাদি অনন্ত। *

কারণ, এই অভিব্যক্তি চৈতন্যেরই মৌলিক লক্ষণ। অভিব্যক্তিতেই চৈতন্যের উৎপত্তি, অভিব্যক্তিতেই চৈতন্যের স্থিতি, অভিব্যক্তিতেই চৈতন্যের বিকাশ। অভিব্যক্তি চৈতন্যের সার্ব্বভৌমিক উপাধি। জ্ঞান মাত্রেই অভিব্যক্তিপরায়ণ। অভিব্যক্তি আত্মজ্ঞানের অপরিহার্য্য প্রণালী। অভিব্যক্তি বলিতেই জ্ঞান বুঝায়, আর জ্ঞান বলিতেই অভিব্যক্তি বুঝায়।

কথাটা একটু পরিষ্কার করা যাউক।

* ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ—ইত্যাদি শ্রুতির প্রকৃত উদ্দেশ্যও সৃষ্টিকে বিশেষ কালেতে আবদ্ধ করা নহে। ফলতঃ ইদং এস্থলে সৃষ্টিকে নহে, কেবল এই দৃশ্যমান জগৎকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। এবং এই দৃশ্যমান জগৎ পূর্ব্বে ছিল না, পরে হইয়াছে, ইহা অতি সত্য কথা। কিন্তু সাধারণ লোকে এই শ্রুতি সাধারণ সৃষ্টি তত্ত্ব, অর্থাৎ অনন্ত চৈতন্যের অভিব্যক্তিই বুঝাইতেছে, মনে করেন। এই ভ্রম নিরসনার্থেই এস্থলে উদ্ধৃত শ্রুতির প্রকৃত অর্থ না ধরিয়া লৌকিক অর্থ ধরা হইয়াছে।

জ্ঞান বলিতে দুটী বস্তু ও এই দুয়ের একটা সম্বন্ধ বুঝায়। আর এই সম্বন্ধ স্থাপনেই চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়। চৈতন্য আপনাকে আপনা হইতে পৃথক্ না করিয়া, কোনও ক্রমেই জ্ঞানের এই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না। আমি শ্যামকে জানিতেছি। এখানে আমি জ্ঞাতা, শ্যাম জ্ঞেয়। কিন্তু আমি যখনই শ্যামকে জানিতেছি, তখনই তার সঙ্গে সঙ্গে, আবার আমার আপনাকেও শ্যামের জ্ঞাতারূপে জানিতেছি। অর্থাৎ এই জ্ঞানক্রিয়ার মূলেই আমি আমার সার্ব্বভৌমিক আমিত্ব হইতে শ্যামের জ্ঞাতারূপ বিশেষ আমিত্বকে পৃথক্ করিতেছি। এই পৃথগকরণের দ্বারাই,আমার সার্ব্বভৌমিক আমিত্বের ভূমিতে, জ্ঞাতা আমি ও জ্ঞেয় শ্যামের যোগ স্থাপিত হইয়া,শ্যামকে জানারূপ জ্ঞানক্রিয়া সম্ভাবিত হইতেছে। আমার একত্বকে এইরূপে বিভিন্ন করিয়া, তাহার মৌলিক যোগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে, অর্থাৎ আমার আমিত্বের বা চৈতন্যের এইরূপ অভিব্যক্তি ব্যতীত, আমার পক্ষে শ্যামের জ্ঞান বা কোনও কিছুরই জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে। প্রত্যেক জ্ঞান ক্রিয়াতেই the Self separates itself from itself to return to itself to be itself ইহাই সৃষ্টিতত্ত্বের মূল সত্য।

অভিব্যক্তি জ্ঞানের নিত্যসঙ্গী, চৈতন্যের নিত্য উপাধি। জ্ঞানম্ ছিলেন,চৈতন্য ছিলেন, অথচ তাঁহার অভিব্যক্তি ছিল না, ইহা স্ববিরোধী কথা। ইহার অর্থ এই হয় যে, জ্ঞানময় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ছিল না; চৈতন্য ছিলেন, কিন্তু সে চৈতন্যের চেতনা হয় নাই। অতএব সৃষ্টি কালাধীন ঘটনা নহে—অগ্রে হয় নাই, পরে হইয়াছে, এরূপ নহে—কিন্তু ইহা জ্ঞানেরই প্রকৃতি। জ্ঞানম্ যেমন কালাতীত সত্য, সৃষ্টিও সেইরূপ কালাতীত প্রণালী। ইহা জ্ঞানের নিত্য ধর্ম্ম, অনাদি জ্ঞানের অনাদি সহচর। এই সৃষ্টি বা অভিব্যক্তিই, বোধ হয়, হিন্দুর অপর-ব্রহ্ম, এবং খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের বাণী—The Word. পরব্রহ্ম, অব্যক্ত, নির্গুণ, নিরূপাধিক ব্রহ্ম, যেমন অনাদি অনন্ত, এই অপর-ব্রহ্মও সেইরূপ অনাদি অনন্ত। অনাদি আদিতে পরব্রহ্মেরই সঙ্গে একাঙ্গ হইয়া অপর-ব্রহ্ম ছিলেন, অপরব্রহ্মই পরব্রহ্ম ;—In the beginning there was the Word,the Word was with God, the Word was God.

এই অভিব্যক্তি-তত্ত্বই অপর-ব্রহ্মকে পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়াও উভয়ের মৌলিক একত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে; এই অভিব্যক্তিতত্ত্বই সসীমকে অসীম হইতে ভিন্ন করিয়াও উভয়ের অবিচ্ছিন্নতা প্রতিষ্ঠা করে; এই অভিব্যক্তি-তত্ত্বই সৃষ্টিকে স্রষ্টা হইতে, বিশ্বকে বিশ্ব-বিধাতা হইতে স্বতন্ত্র করিয়াও আবার যুগপৎ উভয়ের যুগল মিলন সম্পাদন করিয়া দেয়; এই স্থানেই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য; ইহা হইতেই সাকারবাদ ও নিরাকারবাদের বিবাদ নিষ্পত্তি; এই অভিব্যক্তিতত্ত্বের উন্নত ভূমিতেই অমূর্ত্ত পুরুষ বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিশ্বরূপাত্মকরূপে মানবের পূজা গ্রহণ করেন।

আত্মোপলব্ধি বা আত্মজ্ঞানের জন্য অখণ্ড চৈতন্যের আত্মবিভাগের দ্বারা বিষয় বিষয়ীর সম্বন্ধ স্থাপনই সৃষ্টি; এবং তাহা হইলে এই বিশ্বকে অব্যক্ত চৈতন্যেরই ব্যক্তরূপ—নিরাকারের সাকার মূর্ত্তি—ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? প্রত্যেক জ্ঞান ক্রিয়াতেই সার্ব্বভৌমিকের সঙ্গে পরিচ্ছিন্ন বিষয়ের সম্বন্ধ ও যোগ স্থাপিত হয়। All knowledge,

all self-knowledge, is the realisation, by the Universal, of itself, through the particular. পরিচ্ছিন্ন সত্তাকে পরিহার করিয়া সার্ব্বভৌমিক সত্তার আত্মজ্ঞান জন্মে না, জন্মিতে পারে না; এবং এই পরিচ্ছিন্ন সত্তাও সার্ব্বভৌমিক সত্তারই অঙ্গ, সেই অখণ্ডনীয় সত্তারই খণ্ড, সেই সুদীপ্ত সর্ব্বব্যাপী পাবকেরই স্ফুলিঙ্গ। কারণ, যে পরিচ্ছিন্ন বিষয়ের মধ্য দিয়া সার্ব্বভৌমিক সত্তা আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তাহা যদি তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হয়, তাহা যদি তাঁহারই অঙ্গ, অংশ, তাঁহারই রূপান্তর, তাঁহারই আত্মবস্তু না হয়, তবে, যাহার মধ্য দিয়া তিনি আপনার সার্ব্বভৌমিকত্ব উপলব্ধি করিবেন, তাহারই দ্বারা সেই সার্ব্বভৌমিকত্ব ধ্বংস হইয়া যাইবে। বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মের আত্ম জ্ঞানের এই বিষয়ই অনাদি-সম্ভব, মায়া নামক জগদ্বীজ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তের আত্মজ্ঞান কেবল এক প্রণালীতেই সম্ভব। আত্মোপলব্ধির জন্য অনন্তের আপনাকে আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া, বিষয় রূপে—সান্তরূপে—আপনার নিকটে উপস্থিত হওয়া ভিন্ন আত্ম জ্ঞানের আর পন্থা নাই। অনন্ত আপনিই বিষয় সাজিয়া, আপনিই বিষয়ী হইয়া, আপনাকে আপনি জানিতেছেন। এইটী অস্বীকার করিলে হয় ঈশ্বরের অনন্ততা, না হয় তাঁহার চৈতন্য, দুয়ের একটী স্বরূপকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে। ব্রহ্মকে অনন্ত চৈতন্য বলিলেই ব্রহ্মাণ্ডকে সেই নিরাকারের সাকার মূর্ত্তিরূপে গ্রহণ করিতে হইবেই হইবে।

অতএব এই বিপুল বিশ্ব আর কিছুই নহে, কেবল সেই নিত্য-অব্যক্ত চৈতন্যেরই নিত্য ব্যক্ত আকার; কেবল সেই চিরবিদেহী পুরুষেরই চিরবিরাটমূর্ত্তি। যাহাকে জড় বলি এবং যাহাকে চেতন বলি, তাহা সকলই সেই অনন্ত চৈতন্যের প্রকাশে, সেই অনন্ত চৈতন্যেরই প্রয়োজনে, সেই অনন্ত চৈতন্য দ্বারা, সেই অনন্ত চৈতন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

> এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
> খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্যধারিণী॥

এই পুরুষ হইতেই প্রাণ, মন, সমুদায় ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, আলোক, জল, এবং সমুদায়ের আধারভূত পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।

> তদেতৎ সত্যম—
> যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
> সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
> তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
> প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥

ইহা সত্য যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নিরূপ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি হে সৌম্য, অক্ষয় পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই বিলীন হয়। জড় এবং চেতন;—চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র, বৃক্ষলতা, নদীসরিৎ, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, মনুষ্য,—সকলেই সেই অক্ষয় পুরুষের—সেই অনন্ত চৈতন্যেরই অভিব্যক্তি। এই বিপুল বিশ্ব অনন্ত নিরাকার চৈতন্যেরই সাকার মূর্ত্তি। এই বিশ্বরূপ—

> অনেক বক্তৃ নয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনং
> অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং॥
> দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং
> সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখং॥

এই অদ্ভুত আকৃতিতে অসংখ্য মুখ, অসংখ্য চক্ষু, অসংখ্য দিব্য আভরণ, অসংখ্য উদ্যত অস্ত্র শস্ত্র আছে; ইহা দিব্য মাল্য ও দিব্য বস্ত্র দ্বারা শোভিত, এবং দিব্য গন্ধ দ্রব্য দ্বারা অনুলিপ্ত; এই মূর্ত্তি সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, জ্যোতিঃপূর্ণ, অনন্ত,

এবং বিশ্বের মুখস্বরূপ। এই বিরাট মূর্ত্তি যেমন আপনার নিকটে জ্ঞেয় বিষয় রূপে বিদ্যমান, সেইরূপ, তোমার আমার নিকটস্থ বিষয় রূপে উপস্থিত রহিয়া, প্রতিনিয়ত সসীমের আত্মজ্ঞান ও তাহার ভিত্তি রূপে, অসীমের আত্ম চৈতন্য প্রকটিত করিতেছেন। জড়ে চেতনে ঈশ্বর আছেন, কেবল তাহা নহে; কিন্তু ঐ জড় ও এই চেতন—সকলই ঈশ্বর। তোমাতে এবং আমাতে ব্রহ্ম থাকেন নহে,—এই থাকেন, এ যে স্বাতন্ত্র্য বুঝায়, তাঁহার ও তোমার আমার মধ্যে সে স্বাতন্ত্র্য নাই। তিনি মহতো মহীয়ান্, আকাশ রূপে সকলকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন; তিনি আণোরণীয়ান্ ক্ষুদ্রতম পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম আকারে সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। জড় শক্তির প্রত্যেক কার্য্যে এক তিনিই ক্রিয়াশীল; প্রাণ শক্তির প্রত্যেক প্রাণনে এক তিনিই সঞ্জীবিত; চৈতন্যের প্রত্যেক জ্ঞানে এক তিনিই আপনাকে আপনি জানিতেছেন। আমাদিগের প্রত্যেক দৃষ্টিতে তিনিই দর্শন করেন; আমাদিগের প্রত্যেক শ্রুতিতে তিনিই শ্রবণ করেন; প্রত্যেক আঘ্রাণে তিনিই ঘ্রাণ প্রাপ্ত হন, এবং প্রত্যেক আস্বাদনে তিনিই রস গ্রহণ করেন। আমাদিগের এই দেহ যন্ত্রের দ্বারা তিনিই তাঁহার বিষয় বনে বিচরণ করেন; আমাদিগের মনের মধ্য দিয়া তিনিই তাঁহার চিন্তারাজ্যে ক্রীড়া করেন; আমাদিগের হৃদয়ের দ্বারা তিনিই তাঁহার ভাবনিকুঞ্জে বিহার করেন; আর এই সকল ব্যাপারের মধ্য দিয়া তাঁহারই আত্মক্রীড়া, আত্মরমণ, আত্মবিহার হইতে উৎপন্ন তাঁহারই আনন্দ রস উথলিত হইয়া তোমাকে আমাকে আসিয়া প্রতিনিয়ত আপ্লুত করিতেছে। পরমেশ্বর তোমার আমার দাঁড়াইবার জন্য ত্রিভুবনে তিলার্দ্ধ স্থানও রাখেন নাই। সকল কাল ও সকল দেশ তিনিই তাঁহার এই বিরাটমূর্ত্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। তোমার আমার আমিত্বের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করি, এই জন্য সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমিও তাঁহার এই বিপুল বিশ্বে তিনি তোমাকে বা আমাকে প্রদান করেন নাই। বিচিত্র এই বিশ্ব রঙ্গভূমিতে তিনিই একাকী রঙ্গ করিতেছেন।

"আপ্‌নি নাচেন, আপ্‌নি গায়েন, আপ্‌নি বাজান তালে তালে; মানুষ তো সাক্ষিগোপাল, কেবল আমার আমার বলে॥"

এই 'আমার "আমার"ও আবার তিনিই বলান। তিনি না বলাইলে কি আমি কখনও এই "আমার আমারই" বলিতে পারিতাম? আত্ম প্রকৃতিনিহিত যে অপরিহার্য্য প্রয়োজন অনুরোধে পরমাত্মার আত্মচৈতন্যের অভিব্যক্তিতে এই বিপুল বিশ্বের উৎপত্তি, সেই প্রয়োজন অনুরোধেই মানবের এই আমিত্ব বোধেরও সৃষ্টি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চৈতন্যের অভিব্যক্তির অর্থই এই যে, আত্মোপলব্ধির জন্য অনন্ত চৈতন্য আপনি আপনা হইতে পৃথক্ হইয়া পুনরায় আপনাতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কোনও বৃত্তাকার বিস্তৃত ক্ষেত্রে পরিধিস্থ কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে পরিধি অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করিলে যেমন যুগপৎ সেই নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে দূরে, ও তাহার নিকটেই যাওয়া হয়, সেইরূপ চৈতন্যের অভিব্যক্তিতেও সৃষ্টি যুগপৎ অনন্ত হইতে দূরে গমন করে ও অনন্তের নিকটবর্ত্তী হয়। এই অবিভাজ্য প্রণালীকে বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া মনে মনে ভাগ করিয়া লইলে, দুইটী স্রোতের সঙ্গে অতি সুন্দররূপে তুলনা

করিতে পারা যায়;—ইহার একটী স্রোতে চৈতন্যের অবতরণে জড়ের বিকাশ ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি; অপরটীতে চৈতন্যের অধিরোহণে জীবের উৎপত্তি এবং তত্ত্বজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, সৌন্দর্য্যচর্চ্চা প্রভৃতির স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। মানবে এই উভয় স্রোতের মিলন হইয়াছে। মানবেই অবতরণ স্রোতের শেষ ও অধিরোহণ স্রোতের পরিস্ফূর্ত্তি। আবার মানবেই চৈতন্য হইতে চৈতন্যের পরিচ্ছিন্নতা পূর্ণ হইয়াছে--the separaton of the self from itself is complete. এই জন্যই জীবের স্বাধীনতা, এই জন্যই জীবের এই আমিত্ব-বোধ, এই জন্যই জীবের এই দ্বৈতভাব। তবে ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল এই যে মানবে অনন্ত চৈতন্য, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া, সেই পৃথগ্‌করণের দ্বারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মোপলব্ধি লাভ করিতেছেন।

আমরা দেখিয়াছি, এই আত্মোপলব্ধিই সৃষ্টির নিগূঢ় প্রয়োজন,—আত্মোপলব্ধির জন্য পরমাত্মার আত্মবিভাগের দ্বারা বিষয়-বিষয়ীর সম্বন্ধ স্থাপনই সৃষ্টি। কিন্তু কেবল অনাত্মবিষয়ের বিষয়ীরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেই আত্মবস্তুর সম্যক্ ও সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধি হয় না, হইতে পারে না। অচেতন পদার্থের জ্ঞানে আমাদের যতটুকু আত্মজ্ঞান পরিস্ফুট হয়,চেতন পদার্থের জ্ঞানে তদপেক্ষা উজ্জ্বলতর আত্মজ্ঞান লাভ হয়। এই অসাড় জড় রাজ্যে যদি তুমি বা আমি কেবল একমাত্র প্রাণীই বিদ্যমান থাকিতাম, তবে ভাবিয়া দেখ দেখি, সে অবস্থায় আমাদিগের কতটুকুই বা জ্ঞানলাভ সম্ভব হইত? জড় এবং আত্মার যে বিশাল বিভিন্নতা, যে বিভিন্নতা দ্বারা, যে বিভিন্নতার পরিমাণ অনুসারে, আত্মজ্ঞানের উজ্জ্বলতার পরিমাপ হইয়া থাকে, সে অবস্থায়, সেই বিভিন্নতার জ্ঞানও পরিস্ফুট হইত কি না বিশেষ সন্দেহের কথা। তখন পশুর যতটুকু আত্মজ্ঞান আছে,তোমার বা আমারও সম্ভবতঃ ততটুকুই আত্মজ্ঞান থাকিত। অতএব কেবল জড়ের বিষয়ীরূপে আপনাকে জানিলে, চৈতন্যের যতটা আত্মোপলব্ধি হয়, জীবের বিষয়ীরূপে আপনাকে জানিলে, তদপেক্ষা অধিক আত্মোপলব্ধি হইয়া থাকে; আবার চৈতন্যের—আত্মার -- আপনারই বিষয়ীরূপে আপনাকে জানিলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মোপলব্ধি হয়। এই চৈতন্যের রাজ্যে মানব সমাজেও, অজ্ঞ, অসভ্য, পশুপ্রায় মানবের বিষয়ী বা জ্ঞাতা রূপে আমাদের যতটা আত্মোপলব্ধি হয়, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক মহাপুরুষদিগের জ্ঞানে—অর্থাৎ সাধুসঙ্গে—তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক আত্মোপলব্ধি হইয়া থাকে। কারণ এই উপায়েই আমরা আমাদিগের আত্মনিহিত অব্যক্ত চৈতন্যের ব্যক্ত আকার দেখিতে সমর্থ হই। বিষয়ের অভিব্যক্তির উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠতা দ্বারা বিষয়ী আত্মার আত্মোপলব্ধির গভীরতা ও শ্রেষ্ঠতা সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ বিষয়ের মধ্যে, বিষয়রূপে, চৈতন্য যতটা আত্ম প্রকাশ করেন, বিষয়ীরূপে তাঁহার তত আত্মোপলব্ধি হইয়া থাকে। অনন্ত চৈতন্যের যে আত্মোপলব্ধির সূচনার জন্য জড়ের উৎপত্তি, সেই আত্মোপলব্ধির প্রয়োজনানুরোধে, সেই আত্মোপলব্ধির পূর্ণতার জন্যই, আধ্যাত্মিক জীব, মানবের সৃষ্টি। দর্পণের উপরে আপনার প্রতিকৃতি নিক্ষেপ করিয়া যেমন মানুষ আপনার আকৃতির জ্ঞান লাভ করে, আপনার মুখচ্ছবি বা দেহগঠন উপলব্ধি করে,—সেইরূপ অনন্ত চৈতন্য মানব আত্মাতে আপ-

নাকে প্রতিফলিত করিয়া, আপনার প্রকৃতি সন্দর্শন করিয়া থাকেন। অথবা অভিব্যক্তির ভাষায় বলিতে গেলে, অনন্ত চৈতন্ত আপনাকে আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া, পরিচ্ছিন্ন চৈতন্ত মানবরূপে, আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া থাকেন। এই পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যের, এই মানবের মধ্যে সত্য সত্যই,

> স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার—
> অদ্ভুত, অনন্ত, পূর্ণ মোর মধুরিমা ;
> ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা।
> আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে ;
> এ দর্পণের আগে নব নব রূপ ভাসে।
> দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী ;
> আস্বাদিতে লোভ হয়, আস্বাদিতে নারি।
> বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায় ;
> রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়।

বৈষ্ণব কবিরএই উক্তিকে কাব্য বলিব, না দর্শন কহিব; সঙ্গীত বোধে সম্ভোগ করিব, না বিজ্ঞান জ্ঞানে বিচার করিব, ভাবিয়া পাই না। চৈতন্য-চরিতামৃতকার, এই কয়টী কথাতে অতি মধুর অথচ পরিষ্কার রূপে, চৈতন্যের অভিব্যক্তির মূল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন।

আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে—অনন্ত চৈতন্যের এই কথাই তো শোভা পায়! অনন্তের আবার বৃদ্ধি কি? কিন্তু বৃদ্ধি যে নাই, তাহা উপলব্ধি হইবে কি রূপে?—সৃষ্টিতে, অভিব্যক্তিতে, বা reproduction-এই কেবল এই উপলব্ধি সম্ভব। অনন্তের মধ্যে যে অনন্ত মাধুর্য্যের বিকাশের অবকাশ নাই, যখন সেই অনন্ত মাধুর্য্যই অভিব্যক্তির প্রণালী অনুযায়ী, প্রকৃতি অঙ্গে বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল; প্রকৃতিতে যখন সেই মাধুরী নব নব রূপে ভাসিতে আরম্ভ করিল, তখন প্রকৃতিরূপ দর্পণে আপনার এই নব নব মাধুরী দর্শন করিয়া, অনন্তের সান্ত হইয়া, জীব হইয়া, মানব হইয়া যে সে মাধুরী আস্বাদন করিতে সাধ যাইবে, ইহাই বা আর আশ্চর্য্য কি?

আর এই সাধ হইতেই চৈতন্যের অবতরণ বা অবতারের প্রয়োজন। এক অর্থে অনাদি সৃষ্টির আদি হইতেই অনন্ত চৈতন্যের অবতার হইতেছে। ইথরে, জড়ে, উদ্ভিদে, কীটাণুতে, পশুপক্ষীতে তিনিই অবতীর্ণ হইতেছেন;—এ সকলই সেই অনন্ত চৈতন্যের অবতার; সেই নিরাকারের সাকার মূর্ত্তি। কিন্তু যে অর্থে ইথর, জড় বা ইতর প্রাণীকে চৈতন্যের অবতার বলা যায়, তদপেক্ষা উন্নততর ও গভীরতর অর্থে মানবকে অনন্তের অবতার বলা হয়। ইথরে, জড়ে, ও ইতরপ্রাণীতে চৈতন্য যেন আত্মহারা, চৈতন্য যেন আত্মবিস্মৃত, আপনার প্রকৃত স্বরূপ—আপনার মূল প্রকৃতি—হইতে ভ্রষ্ট। মানবে কিন্তু সেই আত্মজ্ঞান স্ফূরিত, সেই পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরিত। মানবে, জীবে, ব্রহ্ম আপনাকে আপনি চিনিয়া আপনার রূপে মুগ্ধ হইয়াছেন; এবং আপনি আপনার সঙ্গে সম্মিলিত হইবার জন্য লালায়িত হইয়া নরলীলা বা প্রেমলীলাতে রত হইয়াছেন। সাধারণ ভাবে সমগ্র সৃষ্টি ব্রহ্মের অবতার হইলেও, জীব, মানব, বিশেষ ভাবে তাঁহার অবতার। আবার সেইরূপ সাধারণ ভাবে সমুদায় জীব, মানব মাত্রেই, ব্রহ্মের অবতার হইলেও বিশেষ বিশেষ মানব—বিশেষ বিশেষ সাধুসজ্জন—বিশেষ ভাবে ব্রহ্মের অবতার। জড়ে ও ইতর প্রাণীতে চৈতন্ত আত্মহারা ও আত্মবিস্মৃত; কিন্তু মানব মাত্রেই কি চৈতন্ত আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হয়, না হইয়াছে? এ জগতে কত কোটী কোটী নরনারী রহিয়াছে যাহারা পশুত্বের ভূমিতে এখ-

নও বিচরণ করিতেছে; যাহাদিগের মানবত্ব প্রধূমিত হইলেও, প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে নাই; যাহাদিগের মধ্যে চৈতন্যের স্বরূপ লক্ষণ প্রকাশিত হয় হয় করিয়াও এখনও প্রকাশিত হইবার অবসর পায় নাই। অপেক্ষাকৃত সভ্য,জ্ঞানী ধর্ম্মসাধনশীল লোকের মধ্যেই কি চৈতন্য আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? তোমার আমার মধ্যেই কি চৈতন্যের লক্ষণ সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে? সাধারণ মানবে—সকল জীবেই—চৈতন্যের অবতরণ আরম্ভ হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিশেষ বিশেষ মানবে, জগতের ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদিগের মধ্যে সে অবতরণ পরিস্ফুট ও পূর্ণতর বলিয়া ইহাদিগকে মানব ইতিহাস ও মানব ভাষা বিশেষ ভাবে ও বিশেষ অর্থে অনন্ত চৈতন্যের অবতাররূপে গ্রহণ ও বর্ণনা করিয়াছে। এই অবতারবাদকে অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিনা; আর চৈতন্যের শ্রেষ্ঠতর ও নিকৃষ্টতর অভিব্যক্তির প্রকৃত ভেদাভেদ অগ্রাহ্য করিয়া, তুমিও অবতার, আমিও অবতার বলিয়া, ইহার গুরুত্ব লাঘব করাও পাপ বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু এই উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টের তুলনা করিবার আমার অধিকার কি? সকলই যখন ব্রহ্ম—সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ—তখন আবার সৃষ্টি মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের ভেদ কোথায়? অদ্বৈতবাদে পুরীষ ও চন্দনে প্রভেদ নাই—প্রভেদ থাকিতে পারে না। এক প্রকারের প্রচলিত অদ্বৈতবাদে জগতে ভাল মন্দের ভেদাভেদ বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে অদ্বৈতবাদে অভিব্যক্তির জ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই; তাহা অভিব্যক্তির অদ্বৈতবাদ নহে। অভিব্যক্তির প্রাণই এই সকল ভেদাভেদ—ভেদাভেদকে স্বীকার করিয়া, ভেদাভেদকে সত্য বলিয়া জানিয়া,—ভেদাভেদের মধ্য দিয়া সে অক্ষয় অবিনাশী কিন্তু নিয়ত স্ফুটমান, একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়,—তাহাই অভিব্যক্তির অদ্বৈতবাদ। ফলতঃ ইহাকে অদ্বৈতবাদ না বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদই বলা বিধেয়। এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের ভেদ কদাপি নষ্ট হয় না। তাহাতে ব্রহ্ম সর্ব্বময় হইলেও তাঁহার মধ্যে স্বগত ভেদ স্বীকৃত হইয়া থাকে; কারণ, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট-বোধ চৈতন্যের আত্ম-জ্ঞানেরই চিরসহচর; চৈতন্যের স্ফুরণ যত হয়, ততই যুগপৎ জগতের মৌলিক ও সার্ব্বভৌমিক একত্বের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক বিষয়ের পরিচ্ছিন্নত্ব ও এই পরিচ্ছিন্নত্বের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের পরস্পরের শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট ভেদের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

আমরা যতদূর জানি,মানুষ যতটা আজি পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিয়াছে, তাহাতে মানবোপহিত চৈতন্যেই এই শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট জ্ঞানের প্রথম স্ফুরণ আরম্ভ হয়। ভাল ও মন্দ, এ জ্ঞান ইতর প্রাণীর আছে বলিয়া পণ্ডিতেরা প্রায়ই স্বীকার করেন না। তাহাদের সুখ দুঃখের অববোধ আছে সত্য, প্রিয় ও অপ্রিয়ের জ্ঞান আছে সত্য, কিন্তু শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে যে বিভেদ, তাহাদের জ্ঞান, নাই। অনন্ত চৈতন্যের অভিব্যক্তি সোপানে সর্ব্ব প্রথম মানবেই শ্রেয় এবং প্রেয়ের বিভিন্নতার বিশেষ জ্ঞান দৃষ্ট হয়। এই জ্ঞানের উৎপত্তির মৌলিক কারণ এবং প্রয়োজনও নির্দ্দেশ করা নিতান্ত কঠিন নহে। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে,জীবে বা মানবে চৈতন্য হইতে চৈতন্যের পরিচ্ছিন্নতা পূর্ণ হইয়াছে—the separation of the Self from itself is complete. কিন্তু এই পরিচ্ছিন্নতা ব্যবহারিক ভাষার, জড় জ্ঞানের, পরিচ্ছিন্নতা নহে;

কিন্তু অভিব্যক্তির বা তত্ত্বজ্ঞানের পরিচ্ছিন্নতা; ইহার মধ্যেই আবার একাঙ্গতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ইহার দ্বারাই সেই একাঙ্গতা যুগপৎ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কারণ যে বিভিন্নতায় একাঙ্গতা বিনষ্ট হয় না, বরং যে বিভিন্নতার সঙ্গে আত্ম প্রকৃতির মৌলিক একতার স্বাভাবিক বিরোধের মধ্যে এবং সেই বিরোধের দ্বারাই, সেই মৌলিক একতা সর্ব্বিক পরিস্ফুট, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং উপলব্ধ হয়, তাহাকেই অভিব্যক্তির মৌলিক লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। অতএব অভিব্যক্তির প্রণালীতে সর্ব্বদা পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানাধীন চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গেই আবার সার্ব্বভৌমিক চৈতন্যের প্রকাশিত ও স্ফুরিত হয়। পরিচ্ছিন্ন জীবোপহিত চৈতন্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই, তাহার মধ্যেই অনন্ত চৈতন্যও স্ফূর্ত্তি লাভ করে। জীবের এই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানই তাহার জীবন, তাহার ব্যক্তিত্ব,—তাহার reality; আর এই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের সঙ্গে যুগপৎ প্রকাশিত অনন্ত চৈতন্যই তাহার সার্ব্বভৌমিকত্ব, তাহার নীতি, তাহার ঈশ্বর—তাহার Ideality জীবের ব্যক্তিত্বই তাহার প্রেয়, তাহার সার্ব্বভৌমিকত্বই তাহার শ্রেয়; এবং শ্রেয়ের আলোকে প্রেয়কে, আদর্শের পরিমাপে-বাস্তব জীবনকে পরীক্ষা করিতে যাইয়াই মানব শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের, ভাল মন্দের, পাপ পুণ্যের ভেদ করিয়া থাকে। এ ভেদ মিথ্যা নহে, ইহা অজ্ঞানতা-প্রসূত নহে, অলীক মায়া নহে, কিন্তু সত্য। এই প্রভেদ অভিব্যক্তির প্রণালীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত। এই প্রভেদ মানব-কল্পিত নহে, কিন্তু বিধাতা-প্রতিষ্ঠিত। এই প্রভেদই নীতি বা morals —এই প্রভেদ অতিক্রম করিবার জন্য মানবাত্মাতে যে আন্তরিক আগ্রহ, তাহাই ধর্ম্ম; এবং এই প্রভেদকে অতিক্রম করিয়া শ্রেয়কে প্রেয়েতে পরিণত করিবার জন্য যে চেষ্টা, তাহারই নাম সাধন।

অতএব যে অভিব্যক্তির প্রয়োজন অনুরোধে অনন্ত চৈতন্যের পরিচ্ছিন্ন আকার ধারণ, সেই অভিব্যক্তির প্রয়োজনেই এই পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যের ব্যক্তিত্ব বা স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি, আবার সেই প্রয়োজনই মানবের এই ব্যক্তিত্বের মধ্যে আত্মজ্ঞানের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যুগপৎ তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশে শ্রেয়প্রেয়ের—Ideal এবং Real এর—প্রভেদ জ্ঞানের উৎপত্তিতে নীতি এবং ধর্ম্মের সৃষ্টি। মানবের জড় দেহ যেমন অভিব্যক্তির নিয়মে, চৈতন্যের আত্ম-প্রয়োজনে, চৈতন্যেরই দ্বারা তিলে তিলে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ব্যক্তিত্ব যেমন সেই নিয়মে, সেই প্রয়োজনে, সেই চৈতন্যেরই দ্বারা তিলে তিলে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ তাহার ধর্ম্মও সেই একই অলঙ্ঘ্য নিয়মে, এই একই অপরিহার্য্য প্রয়োজনে, সেই একই চৈতন্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানবীয় ধর্ম্ম মাত্রেই বিধাতা-প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু, তাই বলিয়া, ইহার অর্থ এই নহে যে, জগতের প্রচলিত ধর্ম্ম সমূহ সকলই সমান,—সকল ধর্ম্মই অভিব্যক্তি-সোপানের একই স্তরে, একই অবস্থায়, অবস্থিতি করিতেছে। বিভিন্নতা সম্পাদন, উচ্চ নীচের প্রভেদ উৎপাদন, অভিব্যক্তি প্রণালীরই মৌলিক লক্ষণ। ধর্ম্মের অভিব্যক্তিতে এ মৌলিক লক্ষণ লুপ্ত হইতে পারে না। নানা কারণে জগতের লোকে ধর্ম্মের মৌলিক একত্ব বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই সেই একত্বের কথা বারম্বার প্রচার করা প্রয়োজন হইয়াছে। প্রচলিত ধর্ম্মা-

বলম্বীগণ, অনেকেই, আপনাদের আচরিত ধর্ম্মকে একমাত্র পূর্ণ সত্য ধর্ম্মরূপে প্রচার করিতে যাইয়া। তত্ত্বজ্ঞানের মৌলিক, একত্ব কার্য্যতঃ অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করিতেছেন বলিয়াই জগতের সকল ধর্ম্মই সত্য, সকল ধর্ম্মই বিধাতা-প্রতিষ্ঠিত, এই মহা সত্য ঘোষণা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, নতুবা জন সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ভেদ বিনাশ করা এ ঘোষণার অর্থও নহে, উদ্দেশ্যও নহে। চৈতন্যের স্ফূর্ত্তির যে তারতম্য নিবন্ধন সৃষ্টির সর্ব্বত্র ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্ট বস্তুর শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট-ভেদ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই তারতম্য হইতেই ধর্ম্ম রাজ্যেও শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট ভেদ জন্মিয়াছে। যে যে ধর্ম্মে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি যত বেশী, সেই ধর্ম্ম তত শ্রেষ্ঠ। যে ধর্ম্মে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি যত অল্প, সেই ধর্ম্ম তত নিকৃষ্ট। অথবা আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে, যেখানে মানবের আত্মজ্ঞানের যত বেশী স্ফুরণ, সেই খানে তাহার ধর্ম্মও তত উন্নত, যেখানে আত্মজ্ঞানের যত অল্প স্ফুরণ, সেখানে তাহার ধর্ম্মও তত হীন। কারণ মানবের আত্মজ্ঞানের সমানুপাতে সর্ব্বত্রই তাহার ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। মানবের আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্রহ্মজ্ঞানের এইরূপ সমানুপাতিক পরিস্ফূর্ত্তির একটা নিগূঢ় কারণও আছে। তাহাও চৈতন্যেরই অভিব্যক্তির প্রণালীর অন্তর্গত। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মানবে, জীবে, ব্রহ্ম আপনাকে আপনি চিনিতে পারিয়া, আপনার রূপে আপনি মুগ্ধ হইয়া, আপনি আপনার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য লালায়িত হইয়া নরলীলা বা প্রেমলীলাতে রত হয়েন। ব্রহ্মের অনন্ত চৈতন্যের আত্মোপলব্ধিই এই লীলার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন হইতেই জীব এবং ব্রহ্মের সমুদায় সম্বন্ধের সৃষ্টি। কিন্তু প্রেমিক যুগলের পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে, পরস্পরের আত্মোপলব্ধিতে ও আত্ম সম্ভোগেই প্রেমলীলার সার্থকতা। প্রকৃত প্রেমে প্রেমিকগণ, পরস্পরের সাহায্যে, পরস্পরের আত্মার শ্রেষ্ঠতম উপলব্ধি লাভ, করিয়া থাকেন। ইহা প্রেমেরই ধর্ম্ম। এই প্রেম ধর্ম্মের বশীভূত হইয়াই, অনন্ত চৈতন্য যেমন মানবের মধ্যে, মানব রূপ দর্পণে আপনার মধুরিমা অবলোকন করিয়া, তাহা আস্বাদন করিবার জন্য লালায়িত হন, পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য মানবও, সেইরূপই, তাহার আত্মজ্ঞানে উদিত অনন্ত চৈতন্যের রূপে মুগ্ধ হইয়া, সেই রূপ আস্বাদন করিবার জন্য চঞ্চল হয়।

"অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্ব্ব তার বল ;
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল।
কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজয়ে লোভ ;
সম্যক আস্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ।"

ব্রহ্ম ও মানব এই প্রেমলীলাতে নিযুক্ত বলিয়াই মানবের মধ্যে অনন্ত চৈতন্য যে পরিমাণে আত্মোপলব্ধি করেন, মানবও সেই পরিমাণে আপনার অন্তরে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে। এই জন্যই মানবের আত্মজ্ঞানের সমানুপাতে তাহার ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয় ; এবং এই জন্য, এক অর্থে, আত্মাতে পরমাত্মার দর্শনকে ধর্ম্মের একটা সার্ব্বভৌমিক সংজ্ঞারূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারা যায়। কেন না, সত্য সত্যই এই বিশ্বের সর্ব্বত্র কেবল আত্মা দ্বারাই পরমাত্মাকে দর্শন করা যায়। মানবের আত্মজ্ঞান যখন যে আকার ধারণ করে, সত্য সত্যই তাহার ব্রহ্মজ্ঞানও তখন সেইরূপ আকারই ধারণ করিয়া থাকে। মানবের আত্মজ্ঞান যত বিকশিত হয়, তাহার ব্যক্তিত্ব যত পরিস্ফুট হয়, তত তাহার আত্ম-

জ্ঞানে প্রকাশিত অনন্ত চৈতন্যও পরিস্ফুট হইতে থাকে। বিজ্ঞান,দর্শন, শিল্পাদির উন্নতিতে মানব যত আপনার সর্ব্বতোমুখী সম্বন্ধ সমূহ আয়ত্ত ও উপলব্ধি করিতেছে, তাহার অন্তর্নিহিত চৈতন্যেরও ততই স্ফূর্ত্তি হইতেছে। তাহার জীবনের Realities যত বৃদ্ধি ও পরিপক্ক হইতেছে, তাহার পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে প্রকাশিত Idealityও তত বিকশিত এবং পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। এই Ideality'ই ব্রহ্ম ; এই Ideal এর অনুসরণই ধর্ম্ম।

আত্মজ্ঞানের শৈশব অবস্থায় যখন জীবের আত্মোপলব্ধি অল্প, তখন তাহার ঈশ্বরোপলব্ধিও সেইরূপ হয়। তাহার আত্মাকে তখন সে যে ভাবে দেখে, ঈশ্বরকেও সেইরূপই ভাবে। তখন তাহার আত্মানাত্ম জ্ঞান জন্মায় নাই, সে যে ঠিক তাহার দেহ নহে, এ জ্ঞান হয় নাই, তখন এই আত্মানাত্ম বিবেকের অভাবে সে আপনাকে জগতের যাবতীয় বস্তুরই ন্যায়, এবং জগতের যাবতীয় বস্তুকে আপনারই মত ভাবে। সুতরাং তখন তাহার ঈশ্বরও সেইরূপ জগতের অপরাপর বস্তুর ন্যায়, একটা বস্তু রূপেই as an object among other objects, প্রকাশিত হন। তাহার নবজাত আত্মাতে এতদপেক্ষা স্ফুটতর, উজ্জ্বলতর, বিশুদ্ধতর ব্রহ্মজ্ঞান তখন জন্মায় নাই, জন্মাইতে পারে না। ইহাকে ধর্ম্মের অভিব্যক্তি-সোপানের নিম্নতম স্তর বলা যাইতে পারে। ইহারই সাধারণ নাম জড়পূজা বা পরিমিতের উপাসনা। প্রকৃত সরল,জড়োপাসকদিগের প্রাণে জড়ের-জ্ঞানও পরিস্ফুট হয় নাই ; আত্মার জ্ঞানও পরিস্ফুট হয় নাই ; তখন জড়ই আত্মা, আত্মাই জড়, সুতরাং ঈশ্বরও জড় আকারে পূজিত হইবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি ? ইহার পরে আত্মানাত্ম বিবেকের বিকাশে যখন মানুষ আপনাকে জড়ের বিষয়ী ও জড়কে আপনার বিষয়রূপে জানিল ; তাহার জ্ঞানেতে জড় এবং আত্মার মধ্যে যখন এই অলঙ্ঘ্য প্রাচীর উত্থিত হইল, তখন তাহার ঈশ্বরও তাহার আপনার ন্যায় একজন বিষয়ী আত্মা, একজন অতিপ্রাকৃত মানব হইলেন। তাহার আপনার যেমন ক্রোধ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, মিত্রতা আছে, ঈশ্বরেরও তখন সেইরূপ রিপু সকল আরোপিত হইল। তিনি তখন নিরাকার, নির্ব্বিকার, শুদ্ধ চেতন্য হইয়াও ক্রোধাদির বশীভূত। ইহাই সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদীর একেশ্বরবাদ। তৎপরে, সর্ব্বশেষে মানব যখন ক্রমে তাহার আপনার আত্মজ্ঞানেতে জড় এবং আত্মার মিলন সংঘটন করিল ; জড়ের স্বাতন্ত্র্য নাই, জড় চৈতন্যেরই বিকাশ, চৈতন্যেরই অধীন, চৈতন্যেরই আকার, চৈতন্যেরই ঘনীভূত চিন্তা, এই জ্ঞান যখন প্রস্ফুটিত হইল, তাহার আপনার আত্মাতে যখন সে জড় এবং চেতনের বিরোধ ভঞ্জন করিতে পারিল, তখন তাহার ঈশ্বরও আর কেবল নিরাকার চৈতন্য, অথবা একজন অতি প্রাকৃত মনুষ্য রহিলেন না ; কিন্তু পরমাত্মারূপে অন্তরে ও বিশ্বরূপাত্মকরূপে বাহিরে প্রকাশিত হইলেন। মানব তখন তাঁহার সেই বিরাট পুরুষরূপ দেখিয়া, বিকম্পমান ও কৃতাঞ্জলী হইয়া ভীত ভীত ভাবে, গদগদ স্বরে, ধনঞ্জয়ের কথায়, তাঁহার স্তুতি করিল—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়াততং বিশ্বমনন্তরূপং।
বায়ুর্যমোগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেহস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমোনমস্তে॥
নমঃ পুরস্তদাথ পৃষ্ঠতস্তে নমোহস্তুতে সর্ব্বতএব সর্ব্ব!
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্তুং সর্ব্বং সমাপ্নোসি ততোহসি সর্ব্বঃ॥

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
নত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যোলোকত্রয়েহপ্যপ্রতিম প্রভাব॥
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বাহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব! সোঢ়ুম॥

তুমি আদিদেব, তুমি সেই পুরাতন পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয় স্বরূপ, তুমি দ্রষ্টা, তুমি সেই জ্ঞাতব্য পরম ধন, হে অনন্ত রূপ! তোমা দ্বারাই এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

তুমি বায়ু, তুমি যম, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ, তুমি শশাঙ্ক, তুমি প্রজাপতি, তুমি প্রপিতামহ, তোমাকে সহস্রবার নমস্কার, তোমাকে পুনর্নমস্কার, ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার।

হে প্রভো! তোমার অগ্রে নমস্কার, তোমার পৃষ্ঠ ভাগে নমস্কার, তোমার পশ্চাতে নমস্কার, হে সর্ব্ব-স্বরূপ! তোমার সকল দিকেই নমস্কার, হে অনন্ত বীর্য্য! তুমি অমিতক্রম, তুমি সমুদায় বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, তুমিই সর্ব্বস্ব।

হে অপ্রতিম প্রভাব! তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, তুমিই জগত গুরু, তুমিই পূজ্য, তুমিই শ্রেষ্ঠ, এই লোকত্রয়ে তোমার সমান মহিমাশালী কেহই নাই, অধিক তো সম্ভবেই না।

অতএব, আমি অবনত হইয়া, একমাত্র পূজ্য ঈশ্বর তুমি, তোমার প্রসন্নতা লাভের প্রার্থনা করিতেছি। পিতা যেরূপ পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করেন, সখা যেরূপ সখার অপরাধ ক্ষমা করেন, প্রিয় ব্যক্তি যেরূপ প্রণয়পাত্রের অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, তুমিও সেইরূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

—মানব তখন, আপনার তত্ত্বজ্ঞানের ভূমিতে, অভিব্যক্তির ভিত্তির উপরে, সাকার নিরাকারের অনন্ত মিলন সংঘটন করাইয়া ব্রহ্মের এই বিরাটপুরুষমূর্ত্তি সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দুসাধকের সঙ্গে করযোড়ে স্তুতি করে।

নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়!

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

সাহিত্য ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। (১)*

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "ডাক্তার" উপাধি ছিল। কিন্তু, আমরা তাঁহাকে সে উপাধিতে অভিহিত করিলাম না। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "ডক্টর অব লিটারেচর" উপাধির উপযুক্ত ছিলেন। অন্ততঃ লোকে বলে, কলিকাতা য়ুণিভার্সিটির উচিত ছিল, তাঁহাকে এ উপাধি দেওয়া।† উপাধি-লিপ্সা শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের না থাকিলেও, এ উপাধি সম্ভবতঃ তাঁহার অনাকাঙ্ক্ষণীয় ও অগ্রহণীয় ছিল না। কিন্তু, এ উপাধি, তাঁহাকে কখনও প্রদত্ত হয় নাই। তিনি যে প্রকৃতির "ডাক্তার" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার যোগ্য ছিল না; তিনিও তাহার যোগ্য ছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎস-শাস্ত্রশালা-প্রদত্ত ডাক্তার উপাধি এক জন আজীবন সাহিত্য-উপাসক ও সাহিত্য-ব্যবসায়ীর প্রাপ্য হইলেও শোভনীয় নহে।

স্বাভাবিক প্রবণতায়, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রবল সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। শিক্ষায় এবং অনুশীলনে, সেই সাহিত্যানুরাগ সাহিত্য প্রেমে পরিণত হইয়া, তাঁহার মন ও জীবন পূর্ণ করিয়াছিল। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রকৃত প্রস্তাবেই সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্য-জীবী

* শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়;—জীবনী, পত্রাবলী ও Mr. F. H. Skrine, C.S. প্রণীত।

† রেবারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলিকাতা য়ুনিভার্সিটী "ডক্টর" উপধি দিয়াছিলেন। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, এই য়ুনিভার্সিটী অগ্রাহ্য মুখোপাধ্যায়কে লিখেন;—"I accept as expression of kind friendship what you have written and with the greater self-satisfaction that it comes from one who is himself a *de facto* Doctor of Literature and a profound observer and judge of men and manners. A verdict from such a quarter is in itself of greater value than the certificate of a miscellaneous body however privileged by law."

ছিলেন। তাঁহার চিত্তের এবং চিন্তার অণু-পরমাণুটী পর্য্যন্ত, সাহিত্যানুরাগে, রঞ্জিত ও সাহিত্য-প্রীতিতে প্রভাবিত ছিল। তাহা সাহিত্যরসে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হইত। সাহিত্য-সৌন্দর্য্য-উপভোগশক্তি শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ পরিমাণে ছিল। তিনি সাহিত্যেই আরম্ভ করিয়া সাহিত্যেই জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন।

লিপি-চতুর ও লিপি-চালনায় সুনিপুণ শম্ভুচন্দ্র,যাহা কিছু লিখিতেন, যেন চিত্র করিতেন। পাঁচ লাইন একটী "প্যারা" লিখিতেও রচনা-লালিত্য ও শব্দ ও শৃঙ্খলা-সৌন্দর্য্যের প্রতি তাঁহার সবিশেষ লক্ষ্য থাকিত। চিত্রকরের বর্ণ-চিত্রবৎ শম্ভুচন্দ্রের রচনা বাক্যচিত্রে প্রতিভাত হইত।

রসোদ্ভাবনক্ষম ও রসিকতা চটুল শম্ভুচন্দ্রের লেখনী রচনা-লীলায় নৃত্য করিত। গভীর রচনায় প্রখর,—শ্লেষাত্মিকা রস-রচনায় শম্ভুচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বক্রোক্তি ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপের শক্তি, তাঁহার বার্দ্ধক্যেও, বিশিষ্ট রূপে বিদ্যমান ছিল।

আক্ষেপ,শম্ভুচন্দ্রের এই অসাধারণ লিপি-শক্তি ও সাহিত্যের সর্ব্বদিক-স্পর্শিনী প্রতিভা কেবল মাত্র সাময়িক পত্র ও সংবাদ পত্র সম্পাদকত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সাময়িক সংবাদপত্রের ক্ষণ স্থায়ী ও মুহূর্ত্তের প্রীতিপদ রচনা ভিন্ন তাঁহার আর এমন কিছুই নাই, আর এমন কিছুতেই তিনি শক্তি প্রয়োগ করিবার অবসর গ্রহণ করেন নাই, যাহাতে তাঁহার মূর্ত্তি,মনের গঠন ও লেখনীর সৌন্দর্য্য লোকে দেখিতে পাইবে!

তথাচ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালীর মধ্যে অসাধারণ ইংরেজী লেখক ছিলেন;—অনেক শিক্ষিত ইংরেজের মধ্যেও ছিলেন। ইংরেজ, মুখোপাধ্যায়ের রচনা আদর করিয়া উপভোগ করিতেন; উপভোগ করিয়া আপ্যায়িত হইতেন। মুখোপাধ্যায়ও ইংরেজের এই আদর মূল্যবান মনে করিতেন। এ সম্বন্ধে, তাঁহার স্বদেশীয়ের সুখ্যাতি বা অখ্যাতি আমলে আনিতেন না। বাঙ্গালীর ইংরেজী রচনা ইংরেজের নিকট আদৃত হইলেই অবশ্য তাহার গৌরব, বাঙ্গালীর বাঙ্গালা রচনায় ইংরেজের কোনও কথা গ্রাহ্যই হইতে পারে না। অতএব এ সম্বন্ধে, মুখোপাধ্যায় ইংরেজের মুখের দিকে তাকাইতেন, ইহা আশ্চর্য্যও নহে, অন্যায় বা অস্বাভাবিকও নহে।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংবাদপত্র-সম্পাদক ছিলেন। অতএব তিনি রাজনীতির অনুশীলন করিতেন; আলোচনা ও আন্দোলন করিতেন। কিন্তু, রাজনীতি তাঁহার মনের দ্বিতীয় উপলক্ষ্য ছিল; সাহিত্য ছিল প্রথম উপলক্ষ্য এবং উপাদান। সাহিত্যে তাঁহার স্বভাবের সর্ব্বাঙ্গীন গঠন বা সে গঠনের সম্প্রসারণ হইয়াছিল। সাহিত্যই ছিল তাঁহার স্বভাবের অনিবার্য্য অতি তীক্ষ্ণ আকাঙ্ক্ষা। তিনি সাহিত্যে সন্তরণ দিতেন, নিমজ্জিত হইতেন, কার্য্য ও ক্রীড়া করিতেন;—সাহিত্যের সহিত স্বকীয় অস্তিত্বের একীকরণ করিতেন; শম্ভুচন্দ্র সাহিত্যের সেবায় ও সাহচর্য্যেই জীবিত থাকিতেন। পক্ষান্তরে, সাহিত্যের সৃষ্টি করিবার জন্যও তিনি অসামান্য শক্তি লইয়া জন্মিয়াছিলেন; কিয়ৎ পরিমাণে তাহা করিয়াও ছিলেন।

কিন্তু, তথাচ, এই শক্তিশালী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ,—এই সাহিত্য-জীবী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,সাহিত্য ক্ষেত্রেই মহা পাপী ছিলেন। শক্তিশালী বাঙ্গালীর এবম্বিধ সাহিত্য-পাতক

বিরল নহে। কিন্তু, শম্ভুচন্দ্রের শক্তি অসাধারণ ছিল; তজ্জন্য তাঁহার পাপের পরিমাণ ও প্রবলতা অপেক্ষাকৃত অধিক।

লিপি-শক্তি সম্পন্ন, রচনা-নিপুণ বাঙ্গালীর আজীবন কেবল ইংরেজী লিখিয়া সে শক্তির ও সে নৈপুণ্যের ব্যয় বা অপব্যয় করিয়া যাওয়াকে আমরা মহা পাপ বলিয়া মনে করি। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের নিকট বাঙ্গালীর এই পাপ প্রায়শ্চিত্তের অতীত; এই প্রত্যবায়, আদৌ অমার্জ্জনীয়। বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যজ্ঞ শক্তিশালী লেখক-সংখ্যা এতই অল্প এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের অল্পাধিক উন্নতি সত্ত্বেও উহার অবস্থা অবয়ব অদ্যাবধি এতই অপরিপুষ্ট যে, সাহিত্যাধ্যায়ী লিপি-শক্তিসম্পন্ন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ছাড়িয়া, অবিমিশ্র ইংরেজীর সেবা ও ইংরেজী ভাষায় রচনা করিবার জন্য অবসর গ্রহণের অধিকার নাই। জোর করিয়া ও যদৃচ্ছাচার করিয়া যাঁহারা সে অধিকার গ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বজাতির পরম কল্যাণকামী হইলেও, মাতৃ-ভাষার ও পৈতৃক সাহিত্যের নিকট নিশ্চয়ই প্রত্যবায়-ভাগী।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বা হরিশ্চন্দ্র মুখোপধ্যায়, বা রাজেন্দ্র লাল মিত্র, বা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বা কবি রামশর্ম্মা, বা লালবিহারী দে, বা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বা নগেন্দ্র নাথ ঘোষ, বা আরও কত কত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, প্রবীণ ও নবীন ইংরেজী লেখক বাঙ্গালী ইংরেজীতে না লিখিলে, ইংরেজী ভাষার ও ইংরেজী সাহিত্যের, বোধ হয়, কিছুই আসিয়া যাইত না। মহা সমুদ্রে বারিবিম্বের উত্থান পতন, অতি তুচ্ছ নগণ্য ঘটনা। সাগর-গর্ভে কলস পরিমাপে সলিল-সম্পাত হাস্য-জনক ও বিদ্রূপকর ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কিন্তু, ঐ সকল ব্যক্তি বা ঐ সকল ব্যক্তির মত ব্যক্তি বাঙ্গালা ভাষায় না লেখাতে বা লিখিতে না পারাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে বৃহৎ ব্যাঘাত হইয়াছে। কথা হইতে পারে, এই সকল লোক বা ইঁহাদের কোন কোনও লোক ইংরেজী লেখাতে কি বঙ্গভূমির ও বাঙ্গালী জাতির কোন উপকার হয় নাই? উত্তর,—উপকার হইতে পারে,—হরিশ্চন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা কৃষ্ণদাস পাল বা কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতির ইংরেজী লেখায় কিছু উপকার হইয়াছিল; কিন্তু সে উপকারের তুলনাতেও অপকার অনেক অধিক হইয়াছে। তাহার আলোচনা কিছু পরে, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিজের কৈফিয়ৎ কালেই, করা যাইবে।

রামমোহন রায় হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত যে সকল বিশিষ্ট ও শক্তিশালী বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য অকাতরে ও স্বদেশীয়দিগের ঔদাসিন্য, অনুদারতা ও অকৃতজ্ঞতার অভ্যন্তরে, অবিরত শ্রম করিয়াছেন এবং সময়, সামর্থ্য, অর্থ ও মস্তিষ্ক ব্যয় করিয়া, ঐ সাহিত্যকে তাহার উপস্থিত অবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় কেহই, অন্ততঃ অনেকেই, ইংরেজী রচনায় অনিপুণ ছিলেন না ও অনভিজ্ঞ নহেন। এবং ইংরেজীতে লিখিলে কোনও ইংরেজী লেখক বাঙ্গালী অপেক্ষা নিশ্চয়ই ন্যূন হইতেন না। কে বলিবে, মধুসূদন দত্ত বা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র বা ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র বা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রনাথ বসু বা কালীপ্রসন্ন ঘোষ, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা নবীনচন্দ্র

সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার ইচ্ছা করিলে ইংরাজীতে, কেবল মাত্র ইংরেজীতেই স্বকীয় চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত করিতে পারিতেন না? এবং কে বলিবে যে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র, ইংরেজীতে লিখিয়াও কিছু খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হইতেন না? মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজীতেই ত আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু, ইংরেজীতেই যদি তাঁহারা শেষ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে বলুন দেখি, বাঙ্গালা সাহিত্য আজ কোন্ স্থানে থাকিত? আর তাঁরা নিজেই বা কোন্ স্থানে থাকিতেন?

উপরোক্ত ব্যক্তিদিগের কেহ কেহ, বিশেষতঃ রমেশচন্দ্র দত্ত, বাঙ্গালার ন্যায় ইংরেজীকেও তদীয় রচনা লীলার রঙ্গস্থল করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরেজী গ্রন্থেই তাঁহার খ্যাতি অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে; অতএব তিনি আদৌ বাঙ্গালা স্পর্শ না করিয়া কেবল ইংরেজী লইয়া থাকিলেও থাকিতে পারিতেন; থাকাই তাঁহার স্বার্থের ও সুখ্যাতির অধিকতর উপযোগী হইত। কিন্তু, তিনি অতুল সম্পদশালিনী ইংরেজীকে তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব না দিয়া, কাঙ্গালিনী বাঙ্গালাকেও তাহার যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিয়াছেন। ইহা উত্তম। কিন্তু, ইহাও প্রচুর বলা যায় না। তিনি ইংরেজীতে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাও বাঙ্গালার ভাগে পড়িলে বাঙ্গালার অধিকতর উপকার হইত। তাঁহার "হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস" ও "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালারই প্রাপ্য; ইংরেজীর তাহাতে অধিকারও ছিল না; তাদৃশ উপকারও হইবে না। বাঙ্গালী যতই ভাল ইংরেজী লিখুন, তাঁদের ইংরেজী ইংরেজের ইংরেজীর নিকট কিছুই নয়; যেমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালার নিকট বিদেশীয় অতি বড় পণ্ডিতেরও বাঙ্গালা বিদ্রুপই উত্তেজিত করে। বাঙ্গালীর ইংরেজী, যতই উৎকৃষ্ট হউক, তাহাকে কেহই "বাবু-ইংলিশ" বই বৃটিশ ইংলিশ বলিবে না।

ইংরেজী ভাষায় বই লিখিয়া, হিন্দু সভ্যতার বা বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব ঘোষণা করা মন্দ নহে, কিন্তু, তৎপূর্ব্বে আত্ম গৃহের গঠন করা অধিকতর আবশ্যক। "উড়িষ্যার প্রত্ন-তত্ত্ব" বাঙ্গালী, ইংরেজের ইংরেজীতে না লিখিয়া, বাঙ্গালীর বাঙ্গালাতে লিখিলেই কি অধিকতর স্বাভাবিক ও শোভনীয় হইত না? ইংরেজ ঐতিহাসিক সে তত্ত্ব কি ফরাসীতে লিখিয়াছেন, না, জর্ম্মণে লিখিয়াছেন?

বাঙ্গালীর বক্তৃতা শক্তিও ইংরেজীমার্গে দ্রুত ধাইয়াছে। আমাদের নব্য সময়ে কেশবচন্দ্র সেন অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। সেরূপ বাগ্-প্রতিভা ও উদ্দীপনা শক্তি, তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে কখনও কোন বাঙ্গালীর জন্মে নাই। কেশবচন্দ্র সেন ইংরেজীতে উৎকৃষ্ট উপস্থিত বক্তা ছিলেন। কিন্তু, বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করার অবসর থাকিলে তিনি কচিৎ ইংরেজীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। কেশবচন্দ্র সেনের পর বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা প্রথা প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। আমাদের এখনকার উৎকৃষ্ট বক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও লালমোহন ঘোষ ইংরেজীতে আগুন ছুটাইতে পারেন; কিন্তু, বাঙ্গালা ভাষায় মুখ খুলিতে পারেন না; প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও তাঁহার সাময়িক বক্তৃতায় একমাত্র ইংরেজীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তবে সাহেব ও ছাত্র সমাজেই তাঁর

বক্তৃতা ইদানীং হইয়া থাকে বটে প্রতাপ বাবু ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক বক্তা। সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি রাজনৈতিক বক্তা। রাজনীতি-বিষয়ক বক্তৃতায় ইংরেজীর অত্যাবশ্যকতা আছে; কিন্তু, বাঙ্গালারও কোন্ না আছে? বঙ্গীয় কৃষক সমাজে কংগ্রেসকে পরিচিত করিবার জন্য বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বৎসর একান্ত যত্নবান্ হইয়াছেন। যত্ন কতটা সফল হইবে, বলা যায় না। কিন্তু তিনি বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে সচেষ্ট ও সমর্থ হইলে, এই সুকঠিন কার্য্যটী কি কিঞ্চিৎ সহজ হইত না? সুরেন্দ্রনাথ বাবুর অন্তঃসার-শূন্য ও ইতর ধামাধরারা যাহাই বলুক, তাঁহার প্রকৃত গুণগ্রাহী মাত্রেই উহা স্বীকার করেন। বাঙ্গালী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজ-কৃষক-সভায় তিন ঘণ্টা-ব্যাপী বক্তৃতা করিতে সুসমর্থ; কিন্তু, বঙ্গীয় কৃষক মণ্ডলীর সম্মুখে কয়টী কথা একত্র করিয়া কহিতে সুপারগ! ইহা বিসদৃশ। ইহা বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য; ও বাঙ্গালীর কলঙ্ক। কিন্তু, কোন্‌টী অধিক? বঙ্গদেশ অপেক্ষা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কংগ্রেস-নীতি অধিকতর বিস্তার লাভ করিয়াছে, কিয়ৎ পরিমাণে কৃষক সমাজেরও অন্তর্ভেদ করিয়াছে, ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, পণ্ডিত অযোধ্যানাথের উর্দ্দু বক্তৃতা; এবং তাঁহার পর মদনমোহন মালব্য প্রভৃতির তৎপদচিহ্নের অনুসরণ। বঙ্গদেশে কংগ্রেসের বাঙ্গালাভাষী বক্তা নাই।

অন্য কথা কি? গৈরিক চীরাবৃত দণ্ড-কমণ্ডলুধারী বাঙ্গালা সন্ন্যাসীও আজ কাল ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়া স্বদেশীয়ের নিকট তাঁর সন্ন্যাস-ধর্ম্মের,—অদ্বৈত-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন! টিকি-তিলক-শোভিত বৈষ্ণব বাপাজীর বক্তৃতাতেও ইংরেজী বুলি! কিমাশ্চর্য্য মতঃপরং! জানিতাম, কবির হৃদয়োচ্ছ্বাস নিশ্বাসবৎ স্বভাবতঃই মাতৃ ভাষায় উত্থিত হয়। কিন্তু, বাঙ্গালী কবি ইংরেজীতেও কপচাইয়া থাকেন।

কথা হইতে পারে, ইংরেজী ভাষার শব্দ-সম্পদ ও ইংরেজী সাহিত্যের ভাব-ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অসম্পূর্ণ, অপরিপক্ক ও অঙ্গহীন বাঙ্গালার ব্যবহার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। এখনকার দিনের সূক্ষ্ম, সুতীক্ষ্ণ, ও খর মধুর ভাব-প্রবাহ; ঘন বৈজ্ঞানিক ও গাঢ় রাজনৈতিক চটুল, চিক্কণ চিন্তা রাশি বহন করিতে বাঙ্গালা আদপেই উপযোগী নয়। ইংরেজীতে যাহা এক মিনিটে ব্যক্ত করা যায়, সাত রাত্রি সাত দিন মাথা কুটিয়াও বাঙ্গালাতে তাহা বলা যায় না। অতএব ইংরেজীর আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন উপায় কি? ইংরেজী রচনা-লীলার যেমনতর "রঙ পরম্" চলে, তোমার বাপ পিতামহের বাঙ্গালাতে কি, বাপু, তেমনতরটী ঘটিয়া উঠিতে পারে?

সত্য হইতে পারে এ কথা। কিন্তু, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় শক্তিমান বাঙ্গালী-বর্গ যদি কখনও বাঙ্গালা ভাষার "ক" অক্ষরও স্পর্শ না করেন, তবে আপনা হইতেই কি উহা ধনে গৌরবে গঠিত হইয়া উঠিবে? ইংরেজীর ঐশ্বর্য্যরাশি কি স্বর্গ হইতে পড়িয়াছিল, অথবা শক্তিশালী ইংরেজ লেখকেরাই উহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন? ইংরেজী সাহিত্যের ক্রম-বিকাশ ও ইতিহাস এ সম্বন্ধে কি বলে?

পরন্তু, বাঙ্গালা ভাষার কি আজও এতই দুর্দ্দশা যে, তাহা আমাদের বাঙ্গালী ইংরেজী লেখকদের মস্তিষ্ক ভার বহন করিতে একবারেই পারে না। ব্যাকরণাভিমানী হস্তি-

মুর্খ উন্মাদের প্রলাপ ও ইন্দ্রনাথ বাবুর বিবিধ বিলাপ সত্বেও বাঙ্গালা বাঙ্গালাই আছে এবং তদ্দ্বারা একটী শম্ভুচন্দ্রের রসাল রচনার বা একটী নগেন্দ্রনাথ ঘোষের সমাজ সাহিত্যাদি আলোচনার সবিশেষ ব্যাঘাত হইত বা হয় বলিয়া বিবেচনা হয় না।

কিন্তু, বাঙ্গালা লিখিতে হইলে বাঙ্গালী হওয়াই প্রচুর নহে; ইংরেজী বা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাও প্রচুর নহে; ইংরেজী রচনা-নৈপুণ্যও প্রচুর নহে। বাঙ্গালা লিখিতে হইলে, বাঙ্গালা শিক্ষা, অভ্যাস ও আলোচনা আবশ্যক; বাঙ্গালা রচনা অনুশীলন করা আরও অধিক আবশ্যক। নতুবা বাঙ্গলী-গৃহে জন্মিলেই, আর ইংরেজী কালেজে পড়িলেই যে বাঙ্গালাটাতে রাতা রাতি অধিকার জন্মিবে, এমন মনে করাই বাতুলতা; এমন হইতে পারে না, এমন কখনও হয় নাই, হইবেও না। অতি সামান্য ও নগণ্য বিষয় আয়ত্ত করিতেও যখন তাহার শিক্ষা ও অনুশীলন আবশ্যক, তখন কেবল বাঙ্গালাটাই বিনা শিক্ষায়, বিনা অভ্যাসে ও অনুশীলনে উদরস্থ হইবে, এরূপ মনে করেন ও মনে করিতে পারেন, কেবল কলিকাতা য়ুনিভার্সিটীর মত অতি পাণ্ডিত্যা-মানী অজগর পদার্থ। ফলও হইয়াছে ও হইতেছে তদ্রূপ। তখনকার চৌপাড়ীর পণ্ডিতদের মত, এখনকার য়ুনিভার্সিটীর গ্রাজুয়েটেরাও বাঙ্গালা রচনায় একান্ত অপটু। তখনকার ইংরেজী নবিশদের বরং ইংরেজী রচনাটা আয়ত্ত হইত; এখনকার এঁদের, শুনিয়াছি নাকি সেটাও সুবিধামত হয় না; বাঙ্গালা ত হয়ই না।

বিনা শিক্ষায় বাঙ্গালার আয়ত্তই যদি হয়, তবে অধিকাংশ ইংরেজী-নবিশ বাঙ্গালী বাঙ্গালা লিখিতে অপারগ কেন? শতকরা দশ পনেরো জনেরও ত এবিষয়ে পারগ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, অপারগ;—ইচ্ছা সত্বেও অনেকে অপারগ। তথাচ আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় উচ্চতর অধ্যয়নে বাঙ্গালা শিক্ষার ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে অসম্মত! তাহাদের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতাই স্বীকার করিতে "খুন কবুল"। অতএব বঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় সবই আছে; নাই কেবল বাঙ্গালা!! অতি উপাদেয় ব্যবস্থাই বটে!

কথা হইয়া থাকে যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, বাঙ্গলা-বিহীনতা সত্বেও যখন বাঙ্গালা সাহিত্য বাড়িয়া চলিয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি উত্থিত হইয়াছে, তখন আর বাঙ্গালার জন্য এত ব্যস্ত হওয়া কেন? বিনা শিক্ষায় ও বিনা শ্রমেই বাঙ্গালা সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক মিলিবে। বাঙ্গালার জন্য বেশী কিছু করার আবশ্যকই নাই। ওটা বেওয়ারেশ বস্তু, আপনার পথ আপনিই দেখিবে।

তা বটে! কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার বিনা অভ্যাসে ও বিনা অনুশীলনেই কি ঐ সকল লোক বিখ্যাত লেখক হইয়াছেন? বঙ্কিম বাবু জীবিত নাই; হেম বাবু, চন্দ্র বাবু প্রভৃতিকে ত জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালাটা যথার্থই কি তাঁদের দৈব-বিদ্যা; অথবা উহা কিঞ্চিৎ শ্রম করিয়া শিখিতে হইয়াছিল? বাঙ্গালা না শিখিয়াই যদি বাঙ্গালা লেখা যায় ও লিখিয়া বিশিষ্টত্ব লাভ করা যায়, তবে রমেশ বাবু ও রবি বাবু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা চালাইবার জন্য এত মাথা-কোটা-কুটি করেন কেন? তাঁরা নিজেই ত না পড়িয়া পণ্ডিত, তবে, অন্যকে পড়াইতে

চাহেন কেন? পরন্তু, তাঁদের পুস্তক রাশির পাঠকেরও ত অভাব হয় নাই, তাঁদের ব্যাঙ্কারও ত দেউলিয়া হয় নাই, জমিদারিও বিক্রয় হয় নাই, বিভাগীয় কমিসনরিও যায় নাই যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বই বিক্রয় বৃত্তি অবলম্বনের জন্য সবিশেষ ব্যগ্র হইয়া বাঙ্গালার পোষকতা করিতেছেন!!

বাঙ্গালার বিরুদ্ধে আরও আপত্তি এই যে, বাঙ্গালায় উচ্চতর অধ্যয়নোপযোগী পুস্তকই নাই, পুস্তকই হয় নাই; অতএব "এফ, এ" "বি, এ" ক্লাসের বিদ্যালোকিত কক্ষে বাঙ্গালা প্রবেশ করিবে, কি লইয়া? অসার বাঙ্গালা ভাষায় এমন কি গ্রন্থ আছে, হইয়াছে বা হইতে পারে, যাহা গভীর জ্ঞানাধ্যায়ী গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার গাজুয়েটদিগের পাঠাপোযোগী হওয়ার সম্ভব? বা যাহা সেক্সপীয়র, শেলি, মিল্টন, মেকলে, বেকন, বার্ক, বায়রণ, টেনিসন প্রভৃতির "পাশাপাশি" পড়ান যাইতে পারে?

মহাশয়, ক্ষমা করিবেন। বাঙ্গালা সাহিত্য নেহাত নিস্বঃ, আমরা স্বীকারই করিয়াছি। কিন্তু, তথাচ, মনে করিবেন না যে, বাঙ্গলা ভাষায় এমন পুস্তক নাই, যাহা বি, এ, ক্লাস পর্য্যন্ত পঠিত না হইতে পারে। সেরূপ মনে করিলে বাঙ্গালা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদিগের প্রতি অন্যায় অশ্রদ্ধা ও এফ, এ, বি, এ, পরীক্ষার্থী ছাত্র সাধারণের মানসিক উৎকর্ষের পরিমাণ সম্বন্ধে অকারণ বড় বেশী বাড়াবাড়ি করা হয়। *

পরন্তু, ইংরেজী সাহিত্যের অতুল ঐশ্বর্য্য। বাঙ্গালার সম্বল, নানা কারণেই সীমাবদ্ধ, তথাচ, বায়রণ, শেলি, মিল্টন, টেনিসনের তুল্য কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ, তল্লাস করিলে; উহাতে কিছু কিছু পাওয়া যাইতে পারে। মিল, মেকলে, ম্যাথু আর্ণোল্ড বাঙ্গালা সাহিত্যে সশরীরে না জন্মিলেও এবং কার্লাইল, এমারসণ আদি তাহাতে কখনও আবির্ভূত না হইলেও, মৌলিক চিন্তা-চিহ্নিত, সারবান ও জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ গ্রন্থ, বাঙ্গালা ভাষায় কিছু কিছু না জন্মিয়াছে ও জন্মিতে না পারে, এমন নয়।

কিন্তু, আশা কোথায়! বিশ্ব-বিদ্যালয় স্বয়ং বাঙ্গালার বিপক্ষ; শিক্ষিত বাঙ্গালীর পোণে ষোল আনা অংশ বিপক্ষ; শক্তিবান বাঙ্গালী ইংরেজী-লেখক বিপক্ষ। তারপর আর এক শ্রেণীর ক্ষমতাপন্ন ও প্রতিভাশালী বাঙ্গালা-বিদ্বেষী বাঙ্গালী আছেন, যাঁরা বাঙ্গালী নামটী পর্য্যন্ত সটান বর্জ্জন করিবার জন্য ব্যস্ত। মাতৃ স্তন্যের সহিত ভ্রম বশতঃ, যতটুকু বাঙ্গালা তাঁদের উদরস্থ হইয়াছিল, সে টুকুও কোন ক্রমে ভুলিয়া যাওয়াকে তাঁরা পুরুষার্থ জ্ঞান করেন ও মনে থাকিলে লজ্জিত হন। অবস্থা এই। এ অবস্থায়,

* কয়েকমাস পূর্ব্বে য়ুনিভার্সিটী সিণ্ডিকেটের এক অধিবেসনে, এফ, এ, ক্লাসে, বাঙ্গালা প্রবর্ত্তিত করার জন্য বাবু রামচরণ মিত্র প্রস্তাব করেন। পোষকতার অভাবে প্রস্তাবটীর অপমৃত্যু ঘটে। পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বাঙ্গালার বন্ধু এমন একটী বাঙ্গালীও ছিলেন না, যিনি ঐ প্রস্তাবটীর পোষকতা করাও উচিত বোধ করিয়াছিলেন। কেমন করিয়া পোষকতা করিবেন? করিলে যে পাপ স্পর্শিবে! সাহিত্য-পরিষদ হইতে রমেশচন্দ্র দত্ত দুইটী প্রস্তাব প্রেরণ করেন, ঐ অধিবেশনে তাহার একটী মঞ্জুর, আর একটী না-মঞ্জুর হইয়াছে। এফ-এ, ও বি-এ, পরীক্ষায় বাঙ্গালা অনুবাদ ও রচনা বিষয়ক প্রশ্নের একখানা করিয়া কাগজ থাকিবে। বাঙ্গালার উপর এই অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু, চৌপাড়ীর বাঙ্গালার ন্যায়, বিশ্ব-বিদ্যালয়ী বাঙ্গালায় বাহিরের লোকের জ্বর আসে, ইহা আক্ষেপ।

এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালা লেখার অবসর যদি অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকে পাইয়া থাকে ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্র চালান যদি অনেক স্থলে জ্ঞানহীনের বৃত্তি বা মূর্খ গোঁয়াড়ের ব্যবসা হইয়া থাকে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাহা শিক্ষিতের অবহেলা ও অবজ্ঞারই ফল।

তা, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা লিখিতেন না বটে; বাঙ্গালা কখনও লিখেন নাই বটে; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বাঙ্গালার বিদ্বেষী ছিলেন না; প্রত্যুত তাহার আন্তরিক বন্ধুই ছিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ, বাঙ্গালা সাহিত্যকেও তদীয় প্রীতির বিষয়ীভূত করিয়াছিল। তিনি উহার গতি প্রকৃতি ও উন্নতি অবনতির প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য করিতেন ও সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। সম্পাদকীয় আসন হইতে উহার সযত্ন সমালোচনা করিতেন ও সমস্ত সংবাদ রাখিতেন। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে (আমাদের স্মরণ হইতেছে) মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটী "থিওরী' ছিল। তাহার মর্ম্ম কতকটা এইরূপ যে, আসল বাঙ্গালা, সরল, মধুর দেশজ খাঁটী বাঙ্গালা বিদ্যমান নাই; তাহা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া, তাহার স্থানে সংস্কৃত-প্রধান যে বাঙ্গালার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা খাঁটি বাঙ্গালা নয়। খাঁটি বাঙ্গালার অতি অল্পই এখন অবশিষ্ট আছে। দেশজ সরল বাঙ্গালার বিলোপ হেতু তিনি আক্ষেপ করিতেন। কিন্তু তাঁহার এই অভিমতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বা সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ আমরা কোথায়ও দেখি নাই। আলোচ্য জীবনী গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না।

বিলাতি "স্পেক্টেটর" পত্রের সম্পাদক একবার শম্ভু বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি এবং তাঁহার সহযোগীগণ, বাঙ্গালা না লিখিয়া, ইংরেজী লিখেন কেন? স্বদেশীয় ভাষায় একটী নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টি না করিয়া, পরন্তু ইংরেজীর উপাসনা ও ইংরেজীতে রচনা করেন কেন? শম্ভুচন্দ্র আত্ম পক্ষ সমর্থন কল্পে, বাঙ্গালার প্রতি বিশিষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বকই ইহার উত্তর দিয়াছিলেন।

স্পেক্টেটর পত্রের মেরিডিথ টাউন্সেণ্ড সাহেব শম্ভুচন্দ্র-সম্পাদিত "রাইচ ও রায়ত" পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া লণ্ডন হইতে তাঁহাকে লিখেন;—

"I do not quite understand, I confess, why men, so able as yourself should prefer to publish in a foreign tongue, instead of making a literature of your own."

শম্ভুচন্দ্র ইহার উত্তরে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন।

"পৃথিবীতে আমরা একটী সুন্দরতম সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারিতাম বটে; কিন্তু, তদ্বারা আমাদের চিত্তভাব আমাদের বৃটিশ শাসয়িতাদের শিবিরে আদৌ অঙ্কিত হইত না। সুতরাং আমাদের রাজনৈতিক অবস্থার, ও সামাজিক অবস্থারও বটে, উন্নতির সম্ভাবনা রহিত হইত। তা, আসল কথা এই যে, আমরা বাঙ্গালা সাহিত্য সংগঠন করিয়াছি, সে সাহিত্য এখন সম্যক্ সম্ভ্রান্ত সাহিত্যই বটে। আপনি এখানে, আপনার সময়ে, বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং দুই বৎসর কাল যাবৎ একটী বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু, আপনি এখনকার বাঙ্গালা ভাষা দেখিলে,—উহার শব্দ-সম্পদ ও সাহিত্য-ঐশ্বর্য্য দেখিলে বস্তুতই বিস্মিত হইবেন। তথাচ, বাঙ্গালা ভাষা উহার এতাধিক শ্রীবৃদ্ধি ও সাহিত্য-সম্পদ সত্বেও, আমাদিগকে এক বিন্দুও সহায়তা করে নাই,—অবনত অবস্থা হইতে, আমাদিগকে উদ্ধার করিতে উহা সমর্থ হয় নাই। এই কারণেই, আমরা বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে ও সংবাদ পত্র সম্পাদন করিতে এবং যদি সম্ভব হয়, ইংরেজীকে স্বদেশীয় দ্বিতীয় ভাষা করিয়া

তুলিতে বাধ্য হই। ইহাতে যে আমাদের কত অধিক ব্যক্তিগত আত্ম ত্যাগ করিতে হইয়াছে, তাহা আপনি জানেন না।"

"ইংরেজী রচনায় আমাদের ভবিষ্যত খ্যাতিও স্মৃতির আশা নাই। যাঁহারা বাঙ্গালায় লিখেন ও বাঙ্গালার অনুশীলন করেন, তাঁহারাই, ইহার পর স্বদেশীয়দিগের স্মৃতি-পথে থাকিবেন; এবং তাঁহাদের লেখা লোকে এখন অধিক পড়ে। কিন্তু, আমরা,—যাঁহারা ইংরেজীতে লিখি,—এই আত্মত্যাগ পিতৃ-ভূমির জন্যই করিয়াছি।"

নৈপুণ্য ও কারুণ্য, উভয়ই আমরা এ উত্তরে দেখিতে পাই। শম্ভুচন্দ্র, বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশিষ্টতায় বিশ্বাসবান; পরন্তু, উহা যে পৃথিবীর একটী সম্ভ্রান্ত ও অতি সুন্দর সাহিত্য হইতে পারে, ইহাও তাঁহার ধারণা। অপিচ, যাঁহারা বাঙ্গালা লেখক ও বাঙ্গালা সাহিত্যের স্রষ্টা, তাঁহারাই বাঙ্গালী জগতে জীবিত থাকিবেন, ইংরেজী লেখক বাঙ্গালীর. সে আশা আদৌ নাই, ইহাও শম্ভুচন্দ্র সম্যক রূপে অনুভব করিতেন। কিন্তু, তথাচ তিনি বাঙ্গালায় না লিখিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের বক্ষে আত্ম-শক্তি ও আত্ম ব্যক্তিত্ব চিরমুদ্রাঙ্কিত না করিয়া, পিতৃ ভূমির মঙ্গল কামনায়, ইংরেজী রচনায় আত্ম বিসর্জন করিয়াছিলেন। ইহা করুন। শ্রদ্ধাস্পদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বদেশ-হিত-বাসনা এবং তদর্থে ইংরেজীতে আত্ম-বিসর্জন অতীব পবিত্র পদার্থ বটে; কিন্তু, গঙ্গা-সাগরে সন্তান বিসর্জ্জনের ন্যায়, ইহার মধ্যে ভক্তি-মূলক করুণার ন্যায়, বিড়ম্বনাও বিশিষ্টরূপে বিদ্যমান। বাঙ্গালা সাহিত্য যতই সম্ভ্রান্ত ও সমুন্নত হউক, তদ্দারা বাঙ্গালী জাতির দুঃখ ঘুচিবে না, অভাব ও অবনতির মোচন হইবে না, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন বিদূরিত হইয়া জাতীয় উদ্ধার সাধন হইবে না,—এ অভিমত শম্ভুবাবুর হউক আর যাঁহারই হউক,—এক কথায়,—আদৌ অযৌক্তিক; অতএব অগ্রাহ্য। এই মত যদি সত্য হয়, সাহিত্যে ও শতরঞ্চ ক্রীড়ায় বড় বেশী প্রভেদ থাকে না; সাহিত্য মাত্রেরই প্রায় কোন সারযুক্ত প্রগাঢ় প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সাহিত্য কোন শক্তি মধ্যেই পরিগণিত হয় না। সাহিত্য যদি শক্তি না হয়, উহা কিছুই নয়। উহার

—"কবিত্ব কল্পনা
সৌন্দর্য্য সুরুচি রস সকলি জল্পনা
লিপ-বণিকের"

উহা "গ্রন্থ-কীট" দিগের "শব্দ মরীচিকা জাল" মাত্র,—

"আকাশের পরে
অকর্ম্ম আলস্য-বেশে ভুলিবার তরে
দীর্ঘ রাত্রি দিন!"

সাহিত্য-প্রেমিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিশ্চয়ই সাহিত্যকে, প্রকৃত প্রস্তাবে "অপদার্থ" স্বরূপ অবলোকন ও গ্রহণ করেন নাই। এবং অপদার্থের পত্র পুষ্প বিমর্দ্দিত করিয়া আলস্যের উপাদান স্বরূপ সাহিত্যের-সৌন্দর্য্য রস উপভোগ করিতেন না। সাহিত্য-সৌন্দর্য্য অপার্থিব, অপরিমেয় পদার্থ হইতে পারে; কিন্তু, সাহিত্যের আদৌ যদি কোন পার্থিব অর্থ ও আবশ্যকতা থাকে, তাহা উহার শক্তি, অকৃত্রিম, অবিমিশ্র ও অপরাজেয় শক্তি। যাহা শক্তি নহে, যাহাতে শক্তি নাই, তাহা সাহিত্যই নহে;—শব্দাড়ম্বরের "মরীচিকা জাল" মাত্র; সর্ব্ব শক্তির সার শক্তি, মানসিক ও অধ্যাত্মিক শক্তি হইতে সাহিত্য সম্ভূত ও সেই শক্তির সহিত জীবন্ত ও সদা জাগ্রত। প্রতীচ্য বলেন, জ্ঞানই, শক্তি; প্রাচ্য বলেন, জ্ঞানই মুক্তি। অতএব যে পথেই যাও, জ্ঞানই পথ-প্রদর্শক। মুক্তি শক্তি-

রই উচ্চতম পরিণতি ও প্রকার ভেদ। মুক্তির মূলেও শক্তি অর্থাৎ জ্ঞান। এখন, সাহিত্য আর কিছুই নয়, জ্ঞান, বিজ্ঞানেরই সমবায় ও সমষ্টি;—কাব্য, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যবহার-শাস্ত্র, জ্ঞানেরই নামান্তর;—অতএব শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখা। সর্ব্বাঙ্গীন ও সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন জাতীয় সাহিত্য, ঘনীভূত জাতীয় শক্তির মহা কেন্দ্রস্থল ও মূল প্রস্রবণ, অতএব জাতীয় সাহিত্যে যদি জাতীয় উদ্ধার সাধন না হয়, তবে, আর কিছুতেই হয় না; কিছুতেই হইবার নয়। স্বাধীন, শক্তিবান, অজেয় ইউরোপ;—ইউরোপের অতীত ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থা,তাহার প্রত্যক্ষ, পরিদৃষ্টমান সাক্ষী। উহার স্বাধীনতা ও সৈনিক শক্তি,উহার জাতীয় ঐশ্বর্য্য ও ডেমোক্রেসী, সবই জাতীয় সাহিত্যের অব্যবহিত ফল। উহার বাহুবল, বারুদ ও বন্দুকের বল, বাহুতেও নহে,—বারুদে ও বন্দুকেও নহে,—সাহিত্যে। রুষোর সাহিত্য সৃষ্টি না হইলে, রোবেসপীয়র জন্মিতেন না। ইংরেজী সাহিত্যের অন্তস্থল হইতে ওয়েলিঙ্গটন উদ্ভূত। ম্যাট্‌সিনী, গ্যারিবল্‌ডী, কসত, সকলেই স্ব স্ব জাতীয় সাহিত্য-সম্ভূত জীব। রণ-বীর ও রাজ্য-বীর "হিরো" ও "ষ্টেটস্‌ম্যান্‌" কবির ও দার্শনিকের নিভৃত কক্ষেই অগ্রে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। সর্ব্ববিধ শক্তিরই বীজ সাহিত্যাভ্যন্তরে নিহিত। বিসমার্ক বা ডিসরেলি, গ্লাডষ্টোন বা সালসবারী, সাহিত্যেরই স্বহস্ত-নির্ম্মিত সৃষ্টি। ছত্রপতি শিবজী ও পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ, রামায়ণ ও মহাভারতীয় সাহিত্য হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্য হইতে হন নাই; হইতে পারিতেন না। তাহা হইতে বরং রাজা শিব প্রসাদেরই অভ্যুত্থান হইয়াছিল।

বাঙ্গালীর যদি কখনও পরিত্রাণ হয়, (হওয়া খুব কঠিন বটে) তাহা বাঙ্গালা-সাহিত্য হইতেই হইবে;—আর কিছুতে হইবে না, ইহা নিশ্চয়। ইংরেজ শাসনে, যথা সর্ব্বস্ব দিয়াও বাঙ্গালী যদি স্বাস্থ্যকর ও শক্তিবান বাঙ্গালা সাহিত্য প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর লাভ আর কিছুতেই হইবে না। তাহাতেই, রাজনৈতিক একজাতিত্ব জন্মিবে, এবং তাহা হইতেই, কেবল তাহা হইতেই রাজনৈতিক অধিকারই বল, আর উদ্ধারই বল,—উৎপন্ন হইবে। ফল প্রত্যক্ষ ও কাল-সাপেক্ষ। সময় ও সহিষ্ণুতা ব্যতীত শক্তি জন্মে না; সাহিত্যও জন্মে না। বৃথা হট্টগোল বিড়ম্বনা মাত্র। শতাব্দের পর শতাব্দ যায়, তবে সাহিত্য সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন হইয়া শক্তি সঞ্চালন করে। একটা জাতির, জাতীয় সাহিত্য—যাহার অপর নাম জাতীয় জীবন,—সংগঠন কল্পে এক শতাব্দ বা দুই শতাব্দ কাল কিছুই নহে। অতএব আড়াই দিন মধ্যে, বাঙ্গালা সাহিত্য, তাহার এই অপরিপুষ্ট ও অভুক্ত অবস্থায় বাঙ্গালীকে বিশ্ব-বিজয়ী বীর করিয়া তুলিতে পারে নাই বলিয়া, ইংরেজীর এ, বি, সি,র সহিত একীভূত হইতে যাওয়া,অসহিষ্ণুতা ও আত্ম বিড়ম্বনা বই আর কি হইতে পারে? তবে, বাঙ্গালীর ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অনুশীলনের কি আবশ্যকতা ও উপযোগীতা নাই? নিশ্চয়ই আছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের সংগঠন কল্পে,জ্ঞান বিজ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য উহা যে পরিমাণে প্রয়োজন, সেই পরিমাণেই উহার অধিকতর ও শ্রেষ্ঠতর উপযোগিতা। সে হিসাবে, অন্যান্য য়ুরোপীয় সাহিত্য, বিশেষতঃ ফরাসী সাহিত্য ও জর্ম্মণ সাহিত্যানুশীলনের আবশ্যকতা আছে।

ফলতঃ জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি ব্যতীত জাতীয় শক্তি সৃষ্ট ও সঞ্চিত হইবে না। তাহা না হইলে জাতীয় উন্নতি আকাশ-কুসুম। পাঁচ রেজিমেণ্ট ফৌজ অপেক্ষা একটা জাতীয় সঙ্গীতের শক্তি শত গুণ অধিক। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, সাহিত্য পদার্থটী কিরূপ পরাক্রমশালী। যাঁহারা বলিবেন, নাটক, নবেল, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ন্যায় নীতির, পোলিটিকেল প্রিভিলেজের সহিত সম্বন্ধ কি, কংগ্রেস, কটন-টেক্স, ফ্যামিন রিলিফ্, বা লোকাল সেল্ফ গবর্ণমেণ্ট বা কাউন্সিল আক্টের সহিত সংশ্রব কি? তাঁহাদের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা। তাঁহারা কৃতী ব্যক্তি হইলেও কৃপার পাত্র। তবে, এস্থলে কেবল এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, অনবরত ইংরেজীতে চিৎকার করিলেই যে ইংরেজ আমাদিগকে ইংরেজোচিত রাজনৈতিক সত্বাধিকার বা বৃটিস্ সিটিজেন-সিপ, দিবেন, অথবা এদেশ ছাড়িয়া স্বদেশে চলিয়া যাইবেন; এরূপ মনে করাই বাতুলতা। শৈশব বাঙ্গালা সাহিত্য ত আমাদিগকে রাজদ্বারে সফলকাম করিতে পারে নাই। কিন্তু এত কাল ত ইংরেজী চীৎকার চলিয়া আসিতেছে, তাহাতেই বা কি তেমন সিদ্ধি লাভ হইয়াছে? অধিকারও বাড়ে নাই; অত্যাচরও যতটুকু হইবার, হইতেছে। তথাচ দেশের দুঃখ ইংরেজীতে লিখিয়া ইংরেজ শিবিরে পাঠইবার যথেষ্ঠ প্রয়োজন আছে, ইহা শতবার স্বীকার করি। কিন্তু, তজ্জন্য স্বজাতীয় মানসিক শক্তির সবটুকু বা অধিকটুকু ব্যয় করা, অপব্যয় ও অপচয় বলিয়াই বিবেচনা করি। উহা, শিকি পয়সার পুঁই শাকের প্রলোভনে, ইহকাল পরকাল নষ্ট করারই মত। উহাতে পুণ্য অপেক্ষা প্রত্যশয়ই অধিক। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা তৎতুল্য ব্যক্তি আজীবন ইংরেজী সংবাদ পত্র লেখাতে যতটা না পুণ্য, তাহার বেশীর ভাগ পাপ। তদ্দ্বারা বৃটিশ রাজনীতির নিশ্চয়ই কিছু "নড় চড়" হয় না। কিন্তু, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মত শক্তিশালী ও সাহিত্য-প্রেমিক লোক বাঙ্গালা সাহিত্যের সংগঠনে ব্রতী হইলে, সে সাহিত্য নিশ্চয়ই কিছু না কিছু অগ্রসর হয় এবং সেই পরিমাণে স্বদেশের ভবিষ্যত উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র বা শম্ভুচন্দ্র, নিত্য কোন জাতির মধ্যে জন্মেন না। শম্ভুচন্দ্রও যদি বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় বাঙ্গলা সাহিত্য-ব্রত গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে, কে বলিবে ঐ সাহিত্যের আজ আরও কিছু উন্নতি দেখা যাইত না? মুখোপাধ্যায়ের জীবনীকার, বেলজ্যাকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন, প্রতিভাশালী যতই হউন, সংবাদপত্র সম্পাদকের রচনা বালুকার উপরেই লিখিত হয়। হায়! শম্ভুচন্দ্র বালুকা-রাশির উপরেই তাঁহার সরস লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাও স্বদেশীয় বালুকা নহে, বিদেশীয় বালুকা।

পরন্তু, উপরোক্ত ইংরেজী-রাজনীতি ও বাঙ্গালা-সাহিত্য-প্রসঙ্গের আরও একটী অঙ্গ আছে। য়ুরোপীয় রাজনীতির অদ্যকার সর্ব্বোচ্চ শব্দ ও সর্ব্বময়ী-শক্তি ডেমোক্রেসী। রাজমুকুটও এখন তথায় ডেমোক্রেটিক উপাদানে নির্ম্মিত। পোলিটিক্যাল ডেমোক্রেসী ও সোস্যাল ডেমোক্রেসী উভয়ই এখন য়ুরোপের সাধনা; সাধনা শনৈঃ শনৈঃ সিদ্ধি-পথে ধাবিতা। কিন্তু, সোস্যাল ডেমোক্রেসী খাস য়ুরোপেই সচল নহে। উহা এদেশে আদৌ অসম্ভব। হিন্দুস্থান হিন্দু-বিবর্জ্জিত না হইলে, তথায় সামাজিক ডেমোক্রেসী কখনও টিকিবে

না। সে পরিণাম, হিন্দুজাতির বর্ণ-সঙ্করে ও জাতি-সঙ্করে অবনত হওয়ার পরিণাম, বোধ হয়, কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে। সোস্তাল রিফর্ম্মার মহাশয়দেরও নহে,—আশা করি। তবে,ইংরেজ শাসনে, পোলিটিক্যাল ডেমোক্রেসী কিয়ৎপরিমাণে কখনও সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এঙ্গলো "ইণ্ডিয়ান বুরোক্রেসী"—যত বড়ই প্রবল হউক,ইংরেজ সাশনের মৌলিক প্রবণতা প্রধানতঃ ডেমাক্রেসীরই দিকে। আমরা কংগ্রেস করিয়া ও সংবাদপত্র লিখিয়া বোধ হয়, চাহিতেছিও তাই। ফলতঃ আমরা রাজনৈতিক উচ্চতর উদ্ধার ও অধিকার স্বরূপ কেবল তাহাই ন্যায়ানুসারে চাহিতে পারি, এবং ইংরেজ শাসন তাহার সর্ব্বোচ্চ প্রসঙ্গ, তাহাই দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে তাহাই আমাদের political regeneration. কিন্তু সমগ্র দেশ বা দেশের অধিকাংশ লোক ডেমোক্রেসীর জন্য প্রস্তুত ও ডেমোক্রেসী গ্রহণের উপযুক্ত না হইলে,গবর্ণমেণ্ট তাহা দিবেন না; দিতে পারেনই না। আমরা এখন ডেমোক্রেসীর নাম করিয়া চাহিতেছি, বাবুক্রেসী। ইংরেজ ডেমোক্রেসী দিবেন। কিন্তু বাবুক্রেসী দিবেন না। কথাটা কড়া হইল। কিন্তু সত্যগোপনের চেষ্টা করা বৃথা।

এখন কথা এই যে, জাতীয় সাহিত্যের শক্তি ব্যতীত কোনও জাতি ডেমোক্রেসীর যোগ্য হইতে পারে না। অতএব এ হিসাবেও দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ক্ষেত্র প্রস্তুত ও বীজ বপন না করিয়া শস্য ছেদন করিতে যাওয়া যেমন, আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনও হইতেছে প্রায় তদনুরূপ! আমরা ভোগের অগ্রেই প্রসাদের আকাঙ্ক্ষী হইয়াছি। সুতরাং তাহা প্রাপ্ত হইতেছি না।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক মত সম্পূর্ণরূপে না হইলেও কিয়ৎপরিমাণে ঐরূপ ছিল। অন্ততঃ পরিণত বয়সে ও পরিপক্ক বুদ্ধিতে কতকটা ঐরূপ বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ডেমোক্রেসীর তাদৃশ পক্ষপাতী ছিলেন না।

সংবাদপত্র যে ভাষাতেই লিখিত হউক, জাতীয় জীবনের মূলে শক্তি সঞ্চিত না হইলে তাহার আন্দোলন আলোচনায় সবিশেষ ফল হয় না। এরূপ স্থলে ইংরেজী আওয়াজও ফাঁকা আওয়াজ, বাঙ্গালা আওয়াজও ফাঁকা আওয়াজ। কিন্তু সুগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-শক্তিতে জাতীয় জীবন জীবিত থাকিলে, সর্ব্বথা অন্য শক্তির আবশ্যক হয় না, ইংরেজী, ফারসীরও আবশ্যক হয় না, বাঙ্গালী নিরবচ্ছিন্ন বাঙ্গালা কথায় মনোভাব ব্যক্ত করিলেও ইংরেজ রাজা সাবধানে ও শ্রদ্ধা সহকারে তাহা শ্রবণ করিতে বাধ্য হন এবং আবশ্যক স্থলে বাঙ্গালাকে আপনারাই ইংরেজী করিয়া লন। তা, এখনও যদি একখানিও ইংরেজী পত্র আমাদের না থাকিত, সব পত্র গুলিই যদি বাঙ্গালা ভাষায় পরিচালিত হইত, তাহা হইলে কি মনে কর, আমাদের স্বর ইংরেজ-শিবিরে আদৌ পৌছিত না? বোধ হয়, একটু বেশী বলের সঙ্গেই পৌছিত। তা একবার পরীক্ষা করিয়াই দেখুন না, তাহাতে দেশ থাকে কিম্বা ডুবে। ইহা বোধ হয়,কাহারও অজ্ঞাত নহে যে, উপস্থিত ক্ষেত্রেও ইংরেজ রাজপুরুষ ইংরেজী অপেক্ষা ভার্ণকুলার পত্রের কথা অধিকতর সতর্কতার সহিত শ্রবণ করেন। কারণ এই যে, সে কথা জাতীয় তরুর জড় পর্য্যন্ত পৌছান সম্ভব। অতএব এদিক দিয়া দেখিলেও রাজনৈতিক আন্দোলন আলোচনায়, ইংরেজী অপেক্ষা আমাদের ভার্নাকুলারেরই

উপযোগীতা অধিক। ইংরেজ আমাদের ইংরেজী দেখিতে ও আমাদের কথা ইংরেজীতে বুঝিতে চাহেন না; বুঝিতে চাহেন, যাহা বহুদূরস্পর্শী দেশের দিক্‌দিগন্তস্পর্শী; বুঝিতে চাহেন প্রজার প্রাণ; তাই ভার্ণাকুলার ভাষায় তাহার নাড়ী টিপেন। ইহা ইংরেজ রাজনীতি তত্ত্বের আদ্য অক্ষর। আদ্য অক্ষরটীই আমরা অদ্যাবধি অনুধাবন করিলাম না; অথচ ইংরেজী লইয়া থাকিলাম; ইহা আরও আশ্চর্য্য।

শম্ভুচন্দ্র ইংরেজীকে বাঙ্গালীর "দ্বিতীয় ভার্ণাকুলারে" পরিণত করার কামনা করিতেন। বস্তুতই তিনি ইংরেজী সাহিত্য এমনি ভালবাসিতেন বটে। কোনও একটী বাঙ্গালা প্রবন্ধ উপলক্ষে উপস্থিত প্রবন্ধের ক্ষুদ্র লেখক এক সময়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কিঞ্চিৎ মনোযোগ আকর্ষণ করে; এবং কোনও অনুরুদ্ধ বন্ধু (৺ অঘোরনাথ কুমার) কর্ত্তৃক সম্পাদক-সিংহের সমীপে নীত হন। সে ঘটনা, সে কথোপকথন মনোজ্ঞ হইলেও এ স্থলে বর্ণনীয় নয়। অনেক কথার পর লেখককে আদর ও অনুগ্রহ করিয়া শম্ভু বাবু বলিলেন; "তুমি কেন ইংরাজীতে লেখ না? বেশ হইবে তোমার; আমি স্বয়ং তোমাকে সহায়তা করিব।"

শম্ভু বাবু একবার লর্ড ডাফারিণকে লিখিয়াছিলেন;—

"আমার বন্ধুরা মনে করেন, য়ুরোপীয় সাহিত্য আমাকে "মাটী" করিয়াছে, কেন না, আমি ইহাতে বড় বিশ্বাস করি। তা আমার বন্ধুবর্গ ও পরিজনবর্গ, এই আত্মত্যাগের জন্য যতই অভিযোগ করুন,—এজন্য জীবনে আমি যতই অকৃতকার্য্য বা অযশ-ভাজন হই, আমি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট আছি।"

ইহা অপেক্ষা আন্তরিকতা ও অনুরাগ কি হইতে পারে? ইহা সরল প্রাণের সাধু উক্তি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

কলাশ্রী

Fine Arts.

হে দেবি,

তোমার মধুর হাসে
তুচ্ছ ম্লান ছিন্ন বাসে
চকিতে জাগিয়া উঠে নিদ্রিতা অপ্সরী!
আলুথালু কেশরাশ,
মুখে হাসি, চোখে ত্রাস,
লাজে টানে বক্ষবাস আজীবন ধরি।—
সেই চাঁদ আধ চায়,
সেই ফুল ঝরে গায়,
আলোকে আঁধারে সেই দূরে জড়াজড়ি।

তোমার কোমল স্পর্শে
পাষাণ মুঞ্জরে হর্ষে,
সহস্র চোখের পরে দাঁড়ায় রূপসী!
কিবা কম্বুকণ্ঠ-ঠাম,
কিবা উরু অভিরাম,
কি থর নিতম্বদাম—পড়ে বাস খসি।—
কোথা ঊষা চিরোজ্জ্বল,
কল্পতরু-ছায়াতল,
কোথা মন্দাকিনী-কূল-সলিল-আরশী!

তোমার করুণ শ্বাসে
কাঁদে প্রাণ কি উচ্ছ্বাসে!
বাঁচে স্নেহ মরে দেহ শুনে সে বাঁশরী।
সুর পায় কিবা সুর,
আশা ভাষা শতচূর,

মুগ্ধপ্রাণ দেবাসুর সুধাপান করি।—
ধরণী মমতা শিখে,
তারকা হৃদয়ে লিখে,
রমণী ত্বরিতে ছুটে ভরিতে গাগরী।

তোমার নয়ন-রাগে
কি নব বসন্ত জাগে,
মুঞ্জরিয়া উঠে দেহ গুঞ্জরিয়া মন।
ক্ষুদ্র কথা তুচ্ছ মতি
লভে কি ত্বরিত গতি,
যেন মূলা পরাকৃতি বেড়ে ত্রিভুবন!
আপনি আপনে লিখে
চেয়ে থাকে অনিমিখে,
জগতে চেতনা দিয়ে নিজে অচেতন।

২

তোমার প্রণয়-ছায়
মানবে ব্রহ্মত্ব পায়!
রাধা কাঁদে উভরায় না হেরে আমায়।
শকুন্তলা নিত্য আসি
হেরে মম রূপরাশি;
রত্নাবলী লতাফাঁসী গলে দিতে যায়।
মহাশ্বেতা আমা তরে
চির ব্রহ্মচর্য্য করে
সাবিত্রী আমায় ধরে যমেরে তাড়ায়।

তোমারি বিরহে কাঁদি
মেঘে আমি কত সাধি,
খুঁজি কত পদ্মবন ডাকি দেবগণে।
চাঁদে ফিরে ফিরে চাই,
মলয়ে নিশ্বাস পাই,
বাহুভ্রমে ছুটে যাই লতা-আলিঙ্গনে।
শক্রধনু হেরি ক্রোধে
ধরি ধনু দৈত্যবোধে,
অন্ধবৎ শনিগ্রস্ত ভ্রমি বনে বনে।

মূর্চ্ছান্তে চমকি চাই—
বায়ু বলে নাই নাই,
পতিনিন্দা-শোকে সতী ত্যজেছে ভূতল!
স্কন্ধে ল'য়ে মৃতদেহে
বুকে ল'য়ে স্মৃতিস্নেহে
ভবেশ শ্মশানগেহে উন্মত্ত পাগল!
কালের কুটিল দিঠে
পড়ে অঙ্গ পীঠে পীঠে,
প্রিয়প্রেমে প্রিয়া তুমি দেবশীর্ষস্থল!

বিরচি সমাধিবাস—
সুধু অহেতুক আশ,
জীবন-সর্ব্বস্ব-তীর্থে স্বপন সম্বল!
শ্বাসে অশ্রুজলে ভরা,
স্মৃতি-কারুকার্য্য-করা—
তোমারি প্রীত্যর্থে গড়া 'মমতা-মহল!'
চারিদিক বেড়ি বেড়ি
ঘুরে তব ছায়া-চেড়ি,
জীবনে বিদ্রূপ করি মরণে উজ্জ্বল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সিরাজ ও ইংরাজ।

সিরাজের রক্তপাতে বাঙ্গালায় ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য স্থাপনের সূচনা হয়। ইংরাজগণ বলিয়া থাকেন যে, সিরাজের অত্যাচারে সমস্ত বাঙ্গালা রাজ্য জর্জ্জরিত হইয়াছিল, সেইজন্য তাঁহারা তাহার হস্ত হইতে বঙ্গরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিলনা। সিরাজ যদি বঙ্গদেশ হইতে ইংরেজ-ক্ষমতা নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা না করি-

তেন, তাহা হইলে ইংরেজগণের উক্ত সাধু উদ্দেশ্য সাধারণের কতদূর বোধগম্য হইত, তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস কিন্তু অন্যরূপ। আমরা জানি যে, ইংরাজ-বণিকের ক্ষমতা বৃদ্ধির ও রাজ্য-লালসার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মহা বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই রাজ্য-লালসা অনেক দিন হইতে তাঁহারা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে, যৎকালে সাহানসাহ আরঙ্গজেব বাদসাহ ভারতের একছত্র অধীশ্বর, সেই সময়ে ইংরাজেরা একবার বাঙ্গলারাজ্যের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। তখন হুগলীতে তাঁহাদের প্রধান আড্ডা ছিল; কলিকাতার স্থাপনাই হয় নাই। নবাব সায়েস্তাখাঁ তাঁহাদের ধৃষ্টতার কথা শুনিয়া ইংরাজ বণিকদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিদায় করিতে হুগলীর ফৌজদারের প্রতি আদেশ দেন। হুগলীর ইংরাজ অধ্যক্ষ জব চার্ণক পলাইয়া কোনরূপে প্রাণরক্ষা করেন। সুতরাং অনেক দিন হইতে তাঁহাদের হৃদয়ে যে রাজ্যলালসার উদয় হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নবাব আলিবর্দ্দিখাঁ তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে চিনিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি মৃত্যুকালে সিরাজকে উপদেশ দিয়া যান যে,—

"ইংরাজদিগের ক্ষমতার যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে তাহাদিগকে প্রথমে দমন করা কর্ত্তব্য। ইংরাজদিগকে দমন করিতে পারিলে অন্যান্য ইউরোপীয়দিগকে দমন করিতে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। তাহাদিগকে কুঠী নির্ম্মাণ করিতে বা সৈন্য রাখিতে দিবে না। এরূপ করিলে, তোমার রাজ্য থাকিবে না। ঈশ্বর আমাকে আরও কিছু দিন জীবিত রাখিলে, আমি তোমাকে নিরাপদ করিয়া যাইতাম, এক্ষণে সমস্তই তোমাকেই করিতে হইবে। ফলতঃ ইংরাজদিগকে দমন করিতে বিশেষ রূপ চেষ্টা করিবে। তাহাদের অভিসন্ধি দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, তোমার রাজ্যে বিশেষ অনর্থ উপস্থিত হইবে। সম্প্রতি তাহারা নানা রাজ্য অধিকার করিয়া অনেক ধন সম্পত্তি লাভ করিয়াছে, এবং তোমার রাজ্যেও তাহাই করিতে ইচ্ছা করিতেছে। তাহারা ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করে না, কিন্তু অর্থের জন্যই করিয়া থাকে, এবং তাহাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সমস্ত ইউরোপীয়েরা আপনাদিগকে বিপুল ধনের অধিকারী করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছে, এবং আপনাদিগের রাজাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ আছে, এই ছল করিয়া, ভারত সাম্রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক ভারতবাসিগণের অর্থ নিজেরাই বিভাগ করিয়া লইতেছে। রাজ্য ও অর্থ-লালসা খ্রীষ্টানদিগের অন্তরের সার পদার্থ, এবং তাহারা সমস্ত প্রাচ্যজগতে প্রকাশ করিতেছে যে, তাহারা ঈশ্বরের অনুশাসন আদৌ গ্রাহ্য করে না, প্রত্যাদেশ-জনিত অনন্ত জীবন ও আত্মার অমরত্বে তাহাদের বিশ্বাস নাই। তাহাদের সমস্ত কার্য্যই সাধু উদ্দেশ্যের বিপরীত। ইংরাজদিগকে দাসানুদাসের ন্যায় করিয়া রাখিবে, এবং কদাচ তাহাদিগকে কুঠী করিতে বা সৈন্য রাখিতে দিবে না। যদি তুমি তাহাদিগকে সেরূপ অনুমতি দেও, তাহা হইলে তোমার রাজ্য তাহাদেরই হইবে। যাহারা আপনাদিগের কথিত ঐশী নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিদিন কেবলই কূটনীতি ও ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে, তাহাদিগকে বল পূর্ব্বক দমন করাই কর্ত্তব্য।" *

আলিবর্দ্দির এইরূপ উপদেশ পাইয়াই সিরাজ ইংরেজদিগকে দমন করিতে কৃতসংকল্প

"* * * * Love of dominion, and gold, hath laid fast hold of the souls of the Christians, and their actions have proclaimed, over all the East, how little they regard the express precepts they have received from gold. They believe not that life and immortality which is brought to light by their revelation. They act in defiance of the good principles they would pretend to believe. My son, reduce the English to the condition of slaves, and suffer them not to have factories or soldiers; if you do, the country will be theirs, not yours. They who, we see, are every day using all their policy, and their power, against what they themselves say is law of the Most High, are only to be restrained by force." (An Enquiry into our National conduct to other countries.)

হন, এবং ইহাই তাঁহার ইংরাজ-বিদ্বেষের প্রধান কারণ। আলিবর্দ্দির উপদেশ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি ইংরাজদিগের রাজ্য-লালসা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কয়েকটী ঘটনা-লইয়া সিরাজের সহিত ইংরাজদিগের সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল। সিরাজের মাতৃস্বসা ও জ্যেষ্ঠতাত পত্নী ঘেসেটী বেগম বরাবরই সিরাজকে হিংসার চক্ষে দেখিতেন। সিরাজ যাহাতে সিংহাসনে বসিতে না পারেন, তজ্জন্য তিনি আলিবর্দ্দির মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের দ্বারা তিনি কাশীমবাজার-ইংরাজ-কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স সাহেবের সহিত পরামর্শ আঁটিতে থাকেন। সিরাজ আলিবর্দ্দিকে সে কথা জানান। আলিবর্দ্দি মৃত্যুর পূর্ব্বে কাশীমবাজার কুঠীর সার্জ্জন ফোর্থ সাহেবকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহা অস্বীকার করেন। কিন্তু সিরাজ তাহার প্রমাণসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। ইতিমধ্যে আলিবর্দ্দির মৃত্যু হইল। সিরাজ মসনদে বসিয়া প্রথমে মতিঝিলের প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া ঘেসেটী বেগমকে বন্দী করেন ইহার পূর্ব্বেই রাজা রাজবল্লভ-পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে সপরিবারে কলিকাতায় ইংরাজদের আশ্রয়ে পাঠাইয়া দেন। সিরাজ তাহাদিগকে প্রত্যর্পণের জন্য এক্ষণে নারায়ণসিংহ নামে আপনার হরকরাকে কলিকাতায় পাঠান, এবং ইংরাজদিগকে নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ ও পুরাতন দুর্গের সংস্কার করিতে নিষেধ করেন। নারায়ণসিংহ ছদ্মবেশে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া, ইংরাজেরা তাঁহার নিকট হইতে নবাবের পরওয়ানা গ্রহণ করেন নাই, ও তাঁহাকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলেন।*

ইংরাজদিগের এইরূপ ব্যবহারে সিরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি আলিবর্দ্দির উপদেশ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিলেন। তিনি একদল সৈন্যকে কাশীমবাজার অবরোধ করিতে পাঠাইলেন, ও ওয়াট্‌স প্রভৃতিকে বন্দী করিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। তাহার পর নিজে কলিকাতায় আসিয়া কলিকাতা অবরোধ করেন। তাঁহার কর্ম্মচারীগণের অনবধানতায় অন্ধকূপ হত্যার ভয়াবহ কাণ্ড সংঘটিত হইল। কিন্তু ইহাতে সিরাজের কিছুমাত্র দোষ ছিল না। তবে তিনি সেই কর্ম্মচারীদিগকে তজ্জন্য দণ্ডিত করেন নাই বলিয়া যদি দোষ করিয়া থাকেন, তাহা স্বতন্ত্র কথা। সভ্যজগতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যে সকল সিবিলিয়ান লোকের প্রতি অত্যাচার করে, তাহাদের পদোন্নতি ব্যতীত কখনও অবনতি দেখিতে পাইলাম না। কলিকাতা আক্রমণে গবর্ণর ড্রেক উর্দ্ধপুচ্ছে পলায়ন করিলেন। হলওয়েল অন্ধকূপ হইতে অতি কষ্টে নিষ্কৃতি পাইয়া বন্দীভাবে মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন। পথে সৈদাবাদ-ফরাসডাঙ্গার অধ্যক্ষ ল সাহেব ভদ্র ব্যবহারের সহিত তাঁহাদিগকে খাবার ও পোষাকাদি দিলেন। কিন্তু অবশেষে এই ল সাহেবকে বাঙ্গলা হইতে বিতাড়িত করিয়া ইংরেজেরা তাঁহার প্রতিও কৃতজ্ঞতা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। মুর্শিদাবাদে কয়েকদিন অবস্থান করার পর, সিরাজের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল, তাঁহারা সিরাজকে তাঁহাদের দুরবস্থার কথা জানাইলেন। সিরাজ তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার আদেশ প্রদান করেন, এবং তাঁহাদিগকে যথেচ্ছ গমন করিতেও অনুমতি দেন। হলওয়েল নিজেই একথা

* Holwell's India Tracts P. 185.

লিখিয়া গিয়াছেন। * কলিকাতা আক্রমণের সময় সিরাজ কৃষ্ণবল্লভকেও নাকি খেলাত প্রদান করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা কলিকাতা হইতে পলাইয়া ফল্‌তায় অবস্থিতি করিতে থাকেন, এবং নবাবের ক্রোধ শান্তির জন্য আমীন চাঁদের (উমিচাঁদ) দ্বারা জগৎ শেঠের নিকট পত্রাদি প্রেরণ করেন। ওলন্দাজ প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় কুঠীর অধ্যক্ষদিগের জামিনে কাশীমবাজারের ইংরাজদিগের অনেকে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

কলিকাতার দুরবস্থার কথা মান্দ্রাজে পৌছিলে কর্ণেল ক্লাইব ও আডমিরাল ওয়াটসন ইংরাজদিগের উদ্ধার সাধনে তথা হইতে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই ডিসেম্বর ফল্‌তায় আসিয়া পলায়িত ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হন। ফল্‌তা হইতে ওয়াটসন নবাবের সহিত পত্র চালাইতে লাগিলেন। প্রথম পত্র তিনি এই মর্ম্মে লিখিয়া পাঠাইলেন ;—

"ইংলণ্ডাধিপ, যাঁহাকে জগতের যাবতীয় ভূপতিবৃন্দ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন, আমাকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য ও সত্ত্বাধিকার রক্ষার জন্য এতদঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছেন। ইংরেজদিগের বাণিজ্য হইতে মোগল সাম্রাজ্যে কিরূপ সুবিধা হইয়াছে, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আপনি উক্ত কোম্পানীর কুঠীর বিরুদ্ধে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে বিতাড়িত ও অনেক ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছেন, এবং ইংলণ্ডাধিপের অনেক প্রজাকে নিহত করিতে ত্রুটি করেন নাই। আমি কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে তাহাদিগের আপনাপন কুঠীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বঙ্গরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। এবং আশা করি আপনি তাহাদিগের পূর্ব্ব সত্ত্ব ও স্বাধীনতা প্রদান করিতে অনিচ্ছুক হইবেন না। ইংরেজেরা বঙ্গদেশে অবস্থান করায় আপনার রাজ্যের কিরূপ উপকার হইতেছে, তাহা আপনি বিশেষরূপে অবগত আছেন। সুতরাং আপনার আক্রমণে তাহাদের যে ক্ষতি হইয়াছে, আশা করি, আপনি সে সমুদায়ের পূরণ করিয়া, সমস্ত গোলযোগের অবসান ও ইংলণ্ডাধিপের বন্ধুত্ব লাভ করিবেন। ইংলণ্ডেশ্বর শান্তির পক্ষপাতী। তিনি ন্যায়কার্য্যেই আনন্দ লাভ করেন। ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি বলিতে পারি।" *

* "When the Soubah came in sight, we made him the usual salam ; and when he came abreast of us, he ordered his litter to stop, and us to be called to him. We advanced ; and I addressed him in a short speech, setting forth our sufferings, and petitioned for our liberty. The wretched spectacle we made must, I think have made an impression on a breast the most brutal ; and, if he was capable of pity or contrition, his heart felt it then. I think it appeared, in spite of him, in his countenance. He gave me no reply, but ordered a sutapudar and chabdar immediately to see our irons cut off, and to conduct us wherever we chose to go,and to take care, we received no trouble nor insult ; and having repeated this order distinctly, directed his retinue to go on." (Hollwell's India Tracts.)

* "Admiral Charles Watson, the great commander of the fleet belonging to the puissant king of Great Britain, irresistible in battle, to Munserool Mulk Serajah Dowlah, Subahdar of the provinces of Bengal, Behar and Orissa.

The king my master (whose name is revered among the monarchs of the world) sent me to these parts with a great fleet to protect the East India company's trade, rights and privileges ; the advantages resulting to the Mogul's dominions from the extensive commerce carried on by my master's subjects, are too apparent to need enumerating : how great was my surprise therefore to hear that you had marched against the said company's factories with a large army, and forcibly expelled their servants, seized and plundered their effects, amounting to a large sum of money, and killed great numbers of the king my master's subjects.

I am come down to Bengal to re-establish the said company's servants in their former factories and houses, and hope to find you willing to restore to them their ancient rights and immunities. As you must be sensible of the benefit of having the English settled in your country, I

ক্লাইব সাহেবও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনিও এইরূপ লিখিয়া পাঠাইলেন যে,—

"আডমিরাল ওয়াটসন ও আমি বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়াছি। আমার দাক্ষিণাত্যের বিজয়বার্ত্তা বোধ করি আপনার কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। আপনি ইংরাজদিগের যে সমস্ত ক্ষতি করিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধের জন্য আমাদের এখানে উপস্থিতি। যদি আপনি ন্যায় প্রীতি দেখাইতে চান, তাহা হইলে ইংরাজদিগের ক্ষতির যথোপযুক্ত পূরণ করিয়া আপনার রাজ্যকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করা হইতে রক্ষা করিবেন।"

ইংরেজেরা বলেন যে, নবাব আডমিরালের প্রথম পত্রের উত্তর দেন নাই, নবাব বলেন যে, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ইংরেজেরা তাহা পান নাই। কিন্তু নবাবের পত্রের জন্য তাঁহারা অপেক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ওয়াটসনের পত্র পাঠাইবার ১০দিন পরে তাঁহারা ফল্‌তা হইতে কলিকাতাভিমুখে রওনা হন। ফল্‌তা হইতে মুর্শিদাবাদে সেকালে রাজনীতি সংক্রান্ত পত্র পঁহুছিয়া তাহার উত্তর আসার পক্ষে ১০ দিন যথেষ্ট সময় কিনা, তাহা সাধারণে বিবেচনা করিবেন। কলিকাতার দিকে যাত্রা করিয়া, পথিমধ্যে বজবজে নবাবের একটা দুর্গ ছিল, ইংরাজেরা তাহার উপর গোলাগুলি চালাইতে লাগিলেন। একটা গুলি নাকি মাণিকচাঁদের উষ্ণীষের নিকট দিয়া যাওয়ায় তিনি যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করেন, ও দুর্গ ইংরাজদিগের অধিকারে আইসে। কলিকাতার কিছুদূর হইতে ক্লাইব স্থলপথে ও ওয়াটসন জলপথে কেণ্ট ও টাইগার নামে দুইখানি জাহাজ লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২রা জানুয়ারি ২ঘণ্টা ক্রমাগত গোলাবর্ষণের পর কলিকাতা পুনরধিকৃত হইল। তাহার পর তাঁহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে থাকায় তাঁহারা হুগলী অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। ১০ই জানুয়ারি হুগলী অধিকৃত হয়। হুগলীর নিকট যে সমস্ত শস্যের গোলা ছিল, সে সকলে অগ্নি প্রদান করিয়া ইংরাজেরা উদারতার পরিচয় দেখাইলেন! ইহার পর নবাব ২৩এ জানুয়ারি আডমিরালকে এইরূপ সর্ত্তে এক পত্র লিখিলেন ঃ—

"আপনি লিখিয়াছেন যে, আপনার প্রভু ইংলণ্ডাধিপ কোম্পানীর বাণিজ্য ও সত্বাধিকারের জন্য আপনাকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছেন। আমি আপনার পত্র পাইবা মাত্র তাহার উত্তর দিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে বোধ হইতেছে, আপনি সে পত্র প্রাপ্ত হন নাই। সেই জন্য আমি পুনর্ব্বার লিখিতেছি। আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, কোম্পানীর বাঙ্গলার অধ্যক্ষ রজার ড্রেক আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ ও আমার ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে। রাজ্যের যে সমস্ত প্রজারা দরবারে উপস্থিত না হইয়া পলায়ন করিয়াছে, ড্রেক তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছে, এবং আমার নিষেধ গ্রাহ্য করে নাই। সেই জন্য আমি তাহাকে শাস্তি দিতে মনঃস্থ করিয়াছিলাম, ও আমার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছি। যদি কোম্পানী ড্রেক ভিন্ন আর কাহাকে অধ্যক্ষ স্বরূপ প্রেরণ করেন, তাহা হইলে আমি ইংরাজদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিতে পারি। এই সকল প্রদেশের অধিবাসিগণের মঙ্গলের জন্য আমি এই পত্র পাঠাইতেছি। যদি আপনারা কোম্পানীর বাণিজ্য পুনঃ প্রচলনের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অন্য একজন অধ্যক্ষ পাঠাইবেন, ও পূর্ব্বসর্ত্তানুযায়ী বাণিজ্য চালাইতে স্বীকৃত হইবেন।

---

doubt not you will consent to make them a reasonable satisfaction for the losses and injuries they have suffered, and by that means put an amicable end to the troubles, and secure the friendship of my king, who is a lover of peace, and delights in acts of equity. What can I say more?"

From on board his Britanic Majesty's ship-kent at Falta, the 17th Dec. 1756. (Ives's Voyage P. 98.)

যদি ইংরেজেরা বণিকের ন্যায় ব্যবহার করে ও আমার আদেশ প্রতিপালন করে, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় রক্ষা ও সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। যদি আপনারা মনে করেন, আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আমার রাজ্যে কোম্পানীর বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহা হইলে আপনাদিগের যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহা করিতে পারেন।" *

২৭শে জানুয়ারি ওয়াটসন এইরূপ উত্তর পাঠান যে, "অদ্য আপনার ২৩এ তারিখের পত্র পাইলাম। আপনি পূর্ব্বে পত্র লিখিয়াছিলেন শুনিয়া সুখী হইলাম, আমাদিগের পত্রের উত্তর না দিলে আমাদিগের এরূপ অপমান করা হইত যে, তাহাতে আমার প্রভু ইংলণ্ডাধিপের ক্রোধ হইতে পারিত। আপনি লিখিয়াছেন যে, রজার ড্রেকের জন্যই আপনি ইংরেজদিগকে বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন। কিন্তু নৃপতিগণ নিজের চক্ষে না দেখায় ও নিজের কর্ণে না শুনায়, বঞ্চক ও দুষ্ট লোকের দ্বারা অনেক সময়ে মিথ্যা সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। একজনের জন্য বহু সংখ্যক লোকের দুর্দ্দশা করা কি কোন ন্যায়পর ভূপতির কার্য্য? যাহারা বাদসাহের ফারমানানুযায়ী আপনাকে তাহাদিগের ও তাহাদিগের সম্পত্তির রক্ষক স্বরূপ বিবেচনা করিয়াছিল, সেই ইংরাজদিগের প্রতি এরূপ অত্যাচার করা কি ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে? এই সমস্ত কাণ্ড কতকগুলি হিংসাপর লোকের মতলব সিদ্ধির জন্য আপনি মিথ্যা রূপে জ্ঞাত হইয়া সংঘটিত করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি আপনি ন্যায়পর ভূপতির ন্যায় কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সেই সমস্ত দুষ্ট লোকদিগকে শাস্তি দিন ও কোম্পানীর ক্ষতিপূরণ করুন। ড্রেকের প্রতি যদি আপনার কোন বিদ্বেষের কারণ থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রভু কোম্পানীকে সে কথা লিখিয়া পাঠান।" ইত্যাদি

এই পত্রের লিখনভঙ্গিতে এবং হুগলী অধিকারে নবাব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ইংরাজদিগের অভিসন্ধি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন, ও ওয়াটসনকে এইরূপ লিখিয়া পাঠাইলেন ;—

"আপনারা হুগলী অধিকার ও লুণ্ঠন করিয়াছেন, এবং আমার প্রজাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন, ইহা কদাচ বণিকদিগের উপযুক্ত কার্য্য নহে। আমি সেই জন্য মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া হুগলীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; আমি সসৈন্যে নদী পার হইতে চেষ্টা করিতেছি, আমার সৈন্যের একাংশ আপনাদিগের শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। যদি আপনাদিগের পূর্ব্বের ন্যায় কোম্পানির বাণিজ্য প্রচলনের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, আপনাদিগের বিশ্বাসী কোন লোককে আপনাদিগের প্রস্তাব জ্ঞাত করাইয়া আমার নিকট পাঠাইবেন। আমি কোম্পানির কুঠি

* "You write me, that the king your master sent you into India to protect the company's settlements, trade, rights, and privileges: the instant I received that letter, I sent you an answer; but it appears to me that my reply never reached you, for which reason I write again. I must inform you that Roger Drake, the company's chief in Bengal, acted contrary to the orders I sent him, and encroached upon my authority. He gave protection to the king's subjects, who absented themselves from the inspection of the Durbar, which practice I did forbid; but to no purpose. On this account I was determined to punish him, and accordingly expelled him from my country. But it was my inclination to have given the English company permission to have carried of their trade as formerly, had another chief been sent here. For the good therefore of these provinces, and the inhabitants, I send you this letter; and if you are inclined to re-establish the company, only appoint a chief, and you may depend upon my giving currency to their commerce, upon the same terms they heretofore enjoyed: If the English behave themselves like merchants, and follow my orders, they may rest assured of my favour, protection and assistance. *If you imagine that by carrying on a war against me, you can establish a trade in these dominions, you may do as you think fit.* (শেষ প্যারাগ্রাফ নবাব নিজ হস্তে লিখিয়াছিলেন)।

The slave of Allam-gaeer, king of Industan, the mighty Conqueror, the Lamp of Riches, Shatkuly Khan, the most valiant among warriors."

সকলের পুনঃস্থাপনা. এবং তাহাদিগকে পুনর্ব্বার বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিতে ইতস্ততঃ করিব না। যদি ইংরেজেরা এদেশে অবস্থান করিয়া বণিকের ন্যায় ব্যবহার করে, আমার আদেশ মান্য করে ও আমাকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়, তাহা হইলে আমি, তাহাদিগের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে পারি। আপনারা জ্ঞাত আছেন যে, সৈন্যদিগকে লুণ্ঠন-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করা কষ্টকর। সেইজন্য আপনারা আপনাদিগের ক্ষতির কতকাংশ যদি পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমি সে বিষয়ে বিশেষরূপ চেষ্টা করিব। আমি আপনাদিগের সহিত বন্ধুত্ব করিতে ও ভবিষ্যতে সদ্ভাবে কাটাইতেই ইচ্ছা করি। আপনারা খ্রীষ্টান, আপনারা অবগত আছেন যে, বিবাদ প্রজ্বলিত রাখা অপেক্ষা নির্ব্বাপিত করাই মঙ্গল। তবে যদি আপনারা যুদ্ধের ইচ্ছা করিয়া কোম্পানীর সমস্ত সুবিধা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, ও অন্যান্য বণিকদিগের কল্যাণ নষ্ট করিতে চান, তাহা হইলে সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র দোষ নাই। আমি সেই সর্ব্ব ধ্বংসকর যুদ্ধের ভয়াবহ ফল নিবারণের জন্য এই পত্র লিখিতেছি।"

নবাবের সসৈন্যে আগমন শুনিয়া ইংরেজেরা প্রথমে ভীত হইয়াছিলেন। ক্লাইব সেই সময়ে কাশীপুরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করেন। ইংরাজেরা নবাবের পত্রানুসারে ওয়াল্‌শ ও স্ক্রাফটন সাহেবকে নবাবের নিকট পাঠাইলেন। তাঁহারা নবাবগঞ্জ নামক স্থানে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রেরিত হন। কিন্তু তাহারা তথায় পঁহুছিতে না পঁহুছিতে, নবাব সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া ৩রা ফেব্রুয়ারি কলিকাতার মার্হট্টা-খাদের নিকট আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তথায় নবাবের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে দেওয়ানের তাম্বুতে যাইতে বলেন। দেওয়ানের তাম্বুতে যাইবার সময় আমীনচাঁদ নাকি তাঁহাদিগকে বলিয়া দেয় যে, পলায়ন কর, নতুবা বন্দী হইবে। তাঁহারা সেই কথা শুনিয়াই প্রস্থান করিলেন। * কিন্তু একথার সত্যমিথ্যা কে বলিতে পারে? এই আমীনচাঁদকে ইংরেজেরা এককালে লাঞ্ছনার চূড়ান্ত করিয়াছিলেন, তিনি আবার তাঁহাদের পরমহিতৈষী হইয়া দাঁড়াইলেন, ও নবাবের সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইলেন। এইখান হইতে সিরাজের বিরুদ্ধের ষড়যন্ত্রের একরূপ সূত্রপাত হইল। ওয়ালশ্‌ ও স্ক্রাফটন পলায়ন করিলে, ক্লাইব সহসা নবাবের শিবির আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়া, রাত্রিযোগে সৈন্য লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে অত্যন্ত কুজ্ঝটিকা হওয়ায়, ক্লাইবকে কিছু কষ্ট পাইতে হয়, তিনি সেই কুজ্ঝটিকার মধ্যে সহসা নবাবের শিবির আক্রমণ করিয়া বসিলেন। নবাব এই অকস্মাৎ আক্রমণে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। নিকটে ষড়যন্ত্রকারীরা সুযোগ অন্বেষণ করিয়াছিল, অমনি তাঁহাকে আরও ভয় দেখাইয়া শেষে সন্ধি করিতে প্রবৃত্তি প্রদান করিল। ৯ই ফেব্রুয়ারি ইংরাজদিগের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি হইল :—

(১) দিল্লীর বাদসহ ইংরাজ কোম্পানীকে যে সমস্ত অধিকার দিয়াছেন, তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এবং তাঁহারা বাদসাহের ফার্ম্মানানুযায়ী যে সমস্ত গ্রাম পাইয়াছেন, তাহা তাঁহাদেরই রহিবে।

(২) ইংরাজদিগের দস্তক লইয়া বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার সর্ব্বত্র বিনা শুল্কে মালামাল যাতায়াত করিতে পারিবে।

(৩) নবাবের অধিকৃত কোম্পানীর কুঠী সকল ফেরত দিতে হইবে ও কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের যে সকল মালামাল বাজে-

* Orme's Industan. (Madras Reprint) vol II P. 131

প্রাপ্ত করা হইয়াছে, তাহাও ফেরত দিতে হইবে এবং তাহাদের লোকের যে সকল সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে, সে সমস্ত বিবেচনা মত দিতে হইবে।

(৪) দুর্গাদি নির্ম্মাণের দ্বারা কলিকাতা সুদৃঢ় করায়, নবাব কোনরূপ আপত্তি করিতে পারিবেন না।

(৫) মুর্শিদাবাদের টাঁকশালের মুদ্রার ন্যায় ইংরাজেরা কলিকাতায় মুদ্রা নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন, সেই সকল মুদ্রা প্রচলনের জন্য তাঁহাদিগকে কোন প্রকার বাটা দিতে হইবে না।

(৬) নবাব ঈশ্বর ও মহম্মদের নামে ইহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীদিগকেও করিতে হইবে।

(৭) আডমিরাল ওয়াটসন ও কর্ণেল ক্লাইব ইংরেজ জাতির ও কোম্পানীর পক্ষ হইয়া নবাবকে সমস্ত উৎপাত হইতে অব্যাহতি দিবেন, ও তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করিবেন।

কলিকাতার গবর্ণর ও কাউন্সিলও এক স্বীকারপত্রী লিখিয়া দিলেন, তাহাতে এইরূপ লিখিত হইল যে, তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবসায় চালাইবেন, নবাবকে বিরক্ত করিবেন না, তাঁহার বিরুদ্ধের কোন লোক বা চোর ডাকাতদিগকে স্থান দিবেন না ও সন্ধিপত্রানুযায়ী সমস্ত কার্য্য করিবেন।

১২ই ফেব্রুয়ারি ক্লাইব নিজেও এই মর্ম্মে এক স্বীকারপত্রী লিখিয়াছিলেন।

"আমি কর্ণেল ক্লাইব, সাবৎজঙ্গ বাহাদুর বাঙ্গালার ইংরেজ স্থল সৈন্যগণের অধ্যক্ষ, ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের সমক্ষে এইরূপ গুরু প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, নবাব সিরাজউদ্দোলা ও ইংরাজদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। নবাবের সহিত সন্ধির যে সমস্ত সর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইংরেজেরা তাহা অলঙ্ঘনীয়ভাবে প্রতিপালন করিবে। যতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ সন্ধির বন্দোবস্ত থাকিবে, ইংরেজেরা ততদিন নবাবের শত্রুদিগকে আপনাদিগের শত্রুর ন্যায় বিবেচনা করিবে, এবং যখনই আবশ্যক হইবে, তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিবে।"

এইরূপে সন্ধির বিষয়ে সমস্ত স্থিরীকৃত হইলে, নবাব আডমিরাল, গবর্ণর ও কর্ণেলকে এক একটী হস্তী, খেলাত ও শিরস্ত্রানের মণি প্রভৃতি উপহার পাঠাইলেন। ওয়াটসন ইংলণ্ডাধিপের প্রতিনিধি হওয়ায়, সে উপহার প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পর নবাব মুর্সিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হন।

নবাবের সহিত সন্ধি করিয়া নীরবে অবস্থিতি করিতে ক্লাইবের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তিনি নানা কারণে সিরাজউদ্দৌলার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে নবাবের সর্ব্বনাশ করিবার ইচ্ছা ছিল। এই সময়ে ভারতবর্ষে ইংরাজ ও ফরাসী উভয়ের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইতেছিল। উভয়েই ভারতীয় নৃপতিবর্গকে অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া আপনাদিগের রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা করিতেছিল। উভয়েই আবার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। ক্লাইব দাক্ষিণাত্যে অনেকবার ফরাসীদিগের উপর বিজয় লাভ করেন। তিনি অবগত হইলেন যে, ফরাসীগণ নবাবের কৃপার প্রার্থী হওয়ায়, নবাব তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন ও সময়ে সময়ে তাহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেইজন্য তিনি বাঙ্গালার ফরাসীদিগকে প্রথমে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইউরোপে উভয় জাতির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, এই ছল করিয়া তিনি চন্দননগর আক্রমণ করিতে উদ্যত হন। ইংরেজদিগের মনোভাব অবগত হইয়া ফরাসীরাও সতর্ক হইতে আরম্ভ করে এবং দাক্ষিণাত্য হইতে

তাঁহাদিগের সাহায্যের জন্য একদল সৈন্য যুদ্ধ-জাহাজে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হয়। আডমিরাল ওয়াটসন নবাবকে চতুরতা পূর্ব্বক লিখিলেন যে, বুসীর অধীন ফরাসী সৈন্যেরা আমাদিগকে কষ্ট দিবার জন্য এদেশে আসিতেছে, সুতরাং আমাদিগকে তাহার বাধা প্রদান করিতে হইবে! ক্রমে তাঁহারা চন্দননগর আক্রমণের আয়োজন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নবাবের রাজ্যেও উৎপাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নবাব তাঁহাদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আডমিরালকে লিখিয়া পাঠাইলেন।

"আমার রাজ্যের সমুদায় বিবাদ বিসম্বাদ নিবৃত্তির জন্য আমি আপনাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছি, আপনারা স্বাক্ষর ও মোহর সহিত স্বীকার-পত্রী লিখিয়া দিয়াছেন যে, আমার রাজ্যের শান্তি নষ্ট করিবেন না। কিন্তু এক্ষণে শুনিতেছি, আপনারা হুগলীর নিকটস্থ ফরাসী কুঠী আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আপনারা আমার রাজ্য মধ্যে যে পরস্পরে বিবাদ বিসম্বাদ করিবেন,ইহা নিয়ম ও আচার বিরুদ্ধ। তৈমুরের সময় হইতে মোগলসাম্রাজ্যে ইউরোপীয়গণের এক জাতি অপর জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই। যদি আপনারা ফরাসীদিগকে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে রাজ্যের শান্তি রক্ষার জন্য আমাকে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। আমি দেখিতেছি যে,আমাদিগের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপনা হইয়াছে, আপনারা তাহা ভঙ্গ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা অনেকবার বঙ্গরাজ্যে উৎপাত করে। কিন্তু তাহাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপনার পর তাহারা রাজ্যমধ্যে আর কোন রূপ গোলযোগ করে নাই। আমি ঈশ্বরাদেশে সন্ধি পত্রের সত্ব রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি, এবং আশা করি আপনারাও সে সমস্ত পালন করিতে ন্যায্য মনে করিবেন ও আমার রাজ্যমধ্যে কোন ইউরোপীয় জাতির সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিবেন না।"

ইংরাজেরা নবাবের কথায় তাদৃশ মনোযোগ করিলেন না। তাঁহারা নানারূপ চতুরতা করিতে লাগিলেন। ওয়াটসন লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ফরাসীরা যদি আমাদিগের সহিত কোনরূপ বিবাদ না করে ও স্থিরভাবে অবস্থান করিতে স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দেয় এবং আপনি বাঙ্গালার সুবেদার স্বরূপ জামিন হন, তাহা হইলে আমরা চন্দননগর আক্রমণে বিরত হইতে পারি। নবাব বারম্বার লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আপনারা আমার রাজ্য মধ্যে ফরাসীদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিবেন না, তাহা হইলে আমার রাজ্যের শান্তি নষ্ট হইবে এবং আমাদিগের সন্ধির সত্বও ভঙ্গ করা হইবে। কিন্তু ইংরাজেরা নবাবের নিষেধ সত্বেও চন্দন নগর অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। নবাব অগত্যা ফরাসীদিগের জন্য স্থানীয় ফৌজদার নন্দকুমারকে সসৈন্যে সাহায্য করিতে লিখিয়া পাঠাইলেন,এবং রায় দুর্লভকে একদল সৈন্যের সহিত হুগলীর দিকে প্রেরণ করিলেন। ইংরেজেরা আমীনচাঁদকে পাঠাইয়া নন্দকুমারকে হাত করিয়া ফেলিলেন। নন্দকুমার নিজের সৈন্যদিগকে ফিরাইয়া আনিলেন, এবং রায় দুর্লভকেও ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। নবাবকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ইংরেজেরা যেরূপ ভাবে আক্রমণ করিতে যাইতেছে, আমরা তাহাদিগের গতিরোধ করিতে পারিব না, অধিকন্তু আমাদিগকে অপমানিত হইতে হইবে। ইংরেজেরা অবাধে চন্দননগর অধিকার করিয়া বসিলেন। ২৩শে মার্চ্চ চন্দন নগর অধিকৃত হয়। ফরাসীদিগের মধ্যে অনেকে সৈদাবাদ-ফরাসডাঙ্গায় উপস্থিত হইল। এই সময়ে ল সাহেব নামে একজন কার্য্যাদক্ষ ফরাসী সৈদাবাদের ফরাসী কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বিতাড়িত ফরাসী-

দিগকে লইয়া সিরাজউদ্দৌলার অধীনে কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ইংরাজদিগের তাহাও সহ্য হইল না। তাঁহারা ল সাহেবকে কার্য্য হইতে অপসৃত করিবার জন্য বার-ম্বার লিখিয়া পাঠাইলেন। সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদিগের চন্দননগর আক্রমণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ভীত হইয়াছিলেন। আবার এই সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহার প্রধান প্রধান কর্ম্ম চারীগণ এক ষড়যন্ত্রের আয়োজন করিতে ছিলেন। তাহার মধ্যে জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ ও মীরজাফর প্রভৃতি প্রধান। নবাব একদিকে ইংরাজদিগের প্রবঞ্চনা ও অপর দিকে ষড়-যন্ত্রকারীদিগের মন্ত্রণা বুঝিতে পারিয়া, ইং-রাজদিগের কথানুসারে ল সাহেব ও তাঁহার ফরাসী অনুচরদিগকে মুর্শিদাবাদে দরবার হইতে বিদায় দিলেন। তাঁহারা ভাগলপুরে গমন করিলেন। ল সাহেব যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, নবাব আপনার সহিত এই আমার শেষ দেখা, আপনি আমার কথা মনে রাখিবেন। ইহার পর আমাদের পর-স্পরের সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব।* ল সাহেবকে বিদায় দিয়াই সিরাজের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, তাঁহার ন্যায় একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি যদি নবাব দরবারে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে সিরাজউদ্দৌলার দুর্দ্দশার এক-শেষ হইত না। চারিদিকে বিভিষীকা দেখিয়া সিরাজ এক প্রকার বুদ্ধিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা আপনাদিগের অভীষ্ট পূরণের জন্য ইংরাজদিগের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিল। ইংরাজেরাও আপনাদিগের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে-ছিল। একটী কারণে আবার নবাবের সহিত ইংরাজদিগের গোলযোগ উপস্থিত হইল। নন্দকুমারের কথায় রায় দুর্লভ হুগলী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, নবাব ইংরাজ-দিগের কুঅভিসন্ধি বুঝিয়া তাহাকে পলা-শিতে থকিতে অনুমতি দেন, ও মীরজা-ফরকে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে আদেশ প্রদান করেন। ইংরেজেরা তাহা লইয়া মহা আপত্তি তুলিলেন। বলিলেন যে, নবাব পলাশিতে সৈনা রাখিলে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইবে। নবাব লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ইংরেজেরা যদি সদ্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি পলাশী হইতে সৈন্য ফিরাইয়া আনিতে প্রস্তুত আছেন। ইতিমধ্যে ষড়যন্ত্রকারীরা ইংরাজদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল। প্রথমে ইয়ারলতিব খাঁ নামে নবা-বের একজন সেনাপতি সুবেদারী প্রাপ্তির আশায়, ইংরাজদিগের সাহায্য করিতে স্বীকৃত হয়। পরে মীরজাফরও সেইরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠান। ইংরেজেরা মীরজাফরকেই সুবেদারী দিতে স্বীকৃত হন, কিন্তু ইয়ার-লতিবকেও হস্তাচুত করেন নাই। ক্লাইব কপটতা পূর্ব্বক নবাবকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত গোলযোগের নিষ্পত্তি করিতে চাই, এইজন্য মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। নবাবের দরবার কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াটস সাহেব যে জামিনরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহাকেও মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করিবার সংবাদ দিলেন। ওয়াট্‌স প্রভৃতি পলায়ন করিলে নবাব পরিষ্কার রূপে ইংরাজদিগের মনোভাব বুঝিতে পারি-লেন। এবং নিজে সসৈন্যে পলাশী অভি-মুখে যাত্রা করিলেন। পলাশী যাত্রা করি-

* Seir Mutuqherin Trans. Vol I. P. 762.

বার পূর্ব্বে ওয়াটসনকে এইরূপ পত্র লিখিলেন :—

"আমার প্রতিজ্ঞানুসারে, ও পরস্পরের অঙ্গীকারমুযায়ী অতি সামান্যাংশ ব্যতীত আমি ওয়াট্‌সের সহিত সমস্ত দাবী দাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছি, এবং মানিকচাঁদের বিষয়ও একরূপ স্থির করা হইয়াছে। এই সকল সত্ত্বেও ওয়াট্‌স ও কাশীমবাজার কুঠীর অন্যান্য ইংরাজেরা বাগানে বায়ুসেবন ছলে রজনীযোগে এখান হইতে পলায়ন করিয়াছে। ইহাতে প্রবঞ্চনার স্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে এবং সন্ধি ভঙ্গের ইচ্ছাও বুঝা যাইতেছে। আমার বিশ্বাস হইতেছে, ইহা আপনাদিগের অজ্ঞাতে বা বিনা উপদেশে ঘটে নাই। আমি অনেকদিন হইতে এইরূপ কিছু মনে করিতেছিলাম। এক্ষণে বিশ্বাসঘাতকতার কোন কার্য্য হইবে বিবেচনা করিয়া, পলাশী হইতে আমার সৈন্যদিগকে পুনরাহ্বান করিতেছি না। আমি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, আমার দ্বারা সন্ধিভঙ্গ হয় নাই। ঈশ্বর ও মহম্মদ আমাদিগের সন্ধির বিষয় অবগত আছেন, এবং যাহারা প্রথমে সন্ধি ভঙ্গ করিবে, তাহারা তাহাদের কার্য্যানুযায়ী শাস্তি ভোগ করিবে। ২৫শে রমজান হিজরী ১১৭০।* ইহাই নবাবের শেষ পত্র।

নবাবের পলাশী অভিমুখে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, ক্লাইব মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই জুন চন্দননগর হইতে যাত্রা করিয়া ১৬ই পাটলীতে উপস্থিত হইলেন। ১৭ই ক্লাইব মেজর কুটের অধীন একদল সৈন্য দিয়া, কাটোয়া দুর্গ অধিকার করিতে পাঠাইলেন। কুট অনায়াসেই কাটোয়া হস্তগত করিলেন। তাহার পর ক্লাইব ও অন্যান্য ইংরেজ সৈন্য তথায় উপস্থিত হয়। ক্লাইব মীরজাফরের নিকট হইতে বরাবরই পত্রের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ১৭ই এক পত্র আইসে, তাহাতে মীরজাফর লেখেন যে, নবাবের সহিত তাঁহার এক বাহিক মিলন হইয়াছে, তাহাতে তিনি নবাবকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে ইংরাজদিগের মনে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাহার পর তাঁহারা মীরজাফরের নিকট হইতে আরও পত্র পান, তাহাতে তিনি কোথায় কিরূপ ভাবে অবস্থান করিবেন, এই সমস্ত লেখা থাকে, কিন্তু তিনি ইংরাজদিগকে কি ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য করিবেন; তাহার কোনই উল্লেখ ছিল না। ইংরেজেরা বিষম সন্দেহে পতিত হওয়ায়, ক্লাইব এক সমর-সভা আহ্বান করিলেন। তাহাতে এইরূপ কথা উঠিল যে, নবাবকে এক্ষণেই আক্রমণ করা উচিত, কি বর্ষাবসানে অন্য কোন স্থান হইতে সাহায্য পাইলে আক্রমণ করা যাইবে। ক্লাইব নবাবকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করার বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু শেষে স্থির হইল যে, না নবাবকে এক্ষণেই আক্রমণ করাই যুক্তিসঙ্গত। এইরূপ স্থির হইলে, ইংরেজ-সৈন্য ২২শে জুন প্রাতঃকালে কাটোয়া পরিত্যাগ করিয়া, বৈকালে পরপারে উপস্থিত হয়। রাত্রি

* "25th Ramazan (13th of June) 1757. According to my promises, and the agreement made between us, I have duly rendered every thing to Mr. Watts, except a every small remainder, and had almost settled Manichchand's affair: Notwithstanding all this, Mr. Watts and the rest of the council of the factory at Cassimbazar, under pretence of going to take the air in thei gardens, fled away in the night. This is an evident mark of deceit, and of an intention to break the treaty. I am convinced it could not have happened without your knowledge nor without your advice. I all along expected something of this kind, and for that reason I would not recall my forces from Plassey, expecting some treachery.

I praise God, that the breach of the treaty has not been on my part: God and his Prophet have been witnesses to the contract made between us, and whoever first deviates from it will bring upon themselves the punishment due to their actions."

প্রায় ১টার সময় তাহারা পলাশী আম্রকুঞ্জে সমবেত হইল। নবাব তাহার পূর্ব্বে পলাশীতে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। ২৩শে জুন প্রাতঃকালে নবাব-সৈন্য শিবির হইতে বহির্গত হইয়া আম্রকুঞ্জের দিকে ধাবিত হইল। ইংরাজেরা প্রথমে আম্রকুঞ্জ হইতে কতক পরিমাণে বহির্গত হইয়াছিল, ক্লাইব সাগর তরঙ্গবৎ নবাব-সৈন্য দেখিয়া ভীত হইলেন, ও ইংরাজ সৈন্যদিগকে পিছু হটিয়া আম্রকুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, নবাবকে রাত্রিযোগে সহসা আক্রমণ করিবেন। সৈন্যদিগকে আদেশ দিয়া ক্লাইব আম্রকুঞ্জস্থ নবাবের একটী শিকার মঞ্চে উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাগত হইয়া পড়িলেন। এদিকে ইংরাজ সৈন্যদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়া, নবাবের সেনাপতি মীরমদন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইংরেজদিগের একটী কামানের গোলা লাগিয়া মীরমদন আহত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পশ্চাতে মোহনলাল অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি অগ্রসর হইয়া পলায়নোন্মুখ নবাব সৈন্যগণকে লইয়া ইংরাজদিগের প্রতি ধাবিত হইলেন। ইংরেজেরা মহা বিপদ দেখিয়া ক্রমাগত কুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে মীরমদনের মৃত্যু শ্রবণে নবাব ভীত হইয়া মীরজাফরকে আহ্বান করায়, মীরজাফর তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। নবাব মোহনলালকে সে কথা বলিয়া পাঠান, মোহনলাল প্রথমে সে কথা শুনেন নাই। পরে মীরজাফরের পরামর্শ ক্রমে নবাবের পুনঃপুনঃ আদেশে প্রতিপালন করিতে বাধ্য হন। * মোহনলালকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া ইংরেজেরা আম্রকুঞ্জ হইতে পুনর্ব্বার বহির্গত হইলেন। এই সময়ে জনৈক ইংরাজ সৈন্য গিয়া ক্লাইবের নিদ্রাভঙ্গ করে। নবাবের সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল দেখিয়া ইংরাজেরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকেন। সিনফ্রে বা সেণ্ট ফ্রায়াস নামে নবাব পক্ষীয় একজন ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ ইংরাজদিগের গতিরোধ করিল, কিন্তু অবশেষে সেও ইংরেজ হস্তে পরাজিত হয়। পলাশী যুদ্ধ ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া, ইংরেজেরা দাদপুর নামক স্থানে ২৩শে রাত্রি আসিয়া শিবির গাড়িলেন। তথায় মীর জাফর তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, ক্লাইব তাঁহাকে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদার বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহারা মীরজাফরকে, আপনাদিগের যাইবার কিছু পূর্ব্বেই, মুর্শিদাবাদে পাঠাইলেন। এদিকে সিরাজউদ্দৌলা পলাশী প্রান্তর হইতে পলায়ন করিয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া নগর রক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারিগণের পরামর্শে, আপনার বেগম লুৎফ উন্নিসার সহিত কতক কতক ধন সম্পত্তি লইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে ভগবানগোলা ও পরে তথা হইতে রাজমহালাভিমুখে পলায়ন করেন। ইংরেজেরা মুর্শিদাবাদে আসিয়া মীরজাফরকে সিরাজউদ্দৌলার হীরাঝিল বা মনসুরগঞ্জের প্রাসাদে মসনদে বসাইলেন ও হীরাঝিলের প্রাসাদস্থিত ধনসম্পত্তি লুটিয়া লইলেন। কিছুদিন পরে সিরাজ-উদ্দৌলা রাজমহালের নিকট হইতে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আসিলেন, ও মীরণের আদেশে মহম্মদীবেগের তরবারি আঘাতে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। কোন দেশীয় গ্রন্থকার বলিয়া থাকেন যে, জগৎশেঠও ইংরাজ

* Seir Mutaqherin Trans. Vol I. P 769.

সর্দ্দার সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করিবার জন্য মীরজাফরকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন।* ইহার সত্য মিথ্যা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

এইরূপে সিরাজ উদ্দৌলার অবসান হইল। আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি যে, সিরাজ ইংরাজদিগের প্রতি বা কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং ইংরাজেরাই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার দেখাইয়াছেন। ইংরাজেরা তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াও তাঁহার অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন নাই। সিরাজের অত্যাচার হইতে বঙ্গরাজ্য উদ্ধার করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। আপনাদিগের রাজ্য-লালসা-বৃত্তি চরিতার্থ করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সিরাজ-উদ্দৌলা ইংরাজদিগের সহিত কোনরূপ প্রবঞ্চনা করেন নাই, বিশেষতঃ ৯ই ফেব্রুয়ারির সন্ধির পর হইতে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার ব্যবহার বরাবরই ভাল ছিল। কিন্তু ইংরাজেরা কপটতা পূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতকগণের সাহায্যে সিরাজের রাজ্য হস্তগত করিয়াছেন। একজন বর্ত্তমান ইংরাজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, সিরাজের যত কেন দোষ থাকুক না, তিনি স্বীয় প্রভুকে শত্রু হস্তে অর্পণ বা আপনার দেশ বিক্রয় করেন নাই। অধিকন্তু কোন নিরপেক্ষ ইংরাজ বিচার করিতে বসিয়া এ কথা অস্বীকার করিবেন না যে, ৯ই ফেব্রুয়ারি হইতে ২৩শে জুন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনায় ক্লাইবের নামাপেক্ষা সিরাজউদ্দৌলার নাম অধিকতর সম্মাননীয়। তিনি সেই বিয়োগান্ত অভিনয়ের একমাত্র অপ্রবঞ্চক অভিনেতা। আমরা তাঁহার উক্তির পুনরাবৃত্তি করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।ঃ—

"Whatever may have been his faults, Sirajuddaulah had neither betrayed his master nor sold his country. Nay more, no unbiassed Englishman, sitting in judgment on the events which passed in the interval between the 9th February and the 23rd June, can deny that the name of Sirajuddaulah stands higher in the scale of honour than does the name of Clive. He was the only one of the principal actors in that tragic drama who did not attempt to deceive." †

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

শ্রীভগবদ্‌গীতা

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধ্যানযোগ।

"চিত্তশুদ্ধেঽপি ন ধ্যানং বিনা সন্ন্যাস মাত্রতঃ।
মুক্তিঃ স্যাদিতি ষষ্ঠেঽস্মিন্ ধ্যানযোগো বিতন্যতে॥
আত্মযোগমবোচৎ যো ভক্তিযোগ শিরোমণিঃ।
তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং ভক্তসেবধিং॥"

শ্রীভগবান—
ত্যজিস্পৃহা কর্ম্মফলে, কর্ত্তব্য করম
করে যেই—সেই যোগী, সেই ত সন্ন্যাসী
নহে সে—যে অগ্নিহীন কিম্বা ক্রিয়াহীন।১

১ ত্যজিস্পৃহা—(মূলে আছে "অনাশ্রিত")কর্ম্ম ফলে অপেক্ষা বিরহিত বা স্পৃহা হীন হইয়া।

কর্ত্তব্য করম—(মূলে আছে কার্য্যং,কর্ম্মকর্ত্তব্য যেমন কর্ম্ম, অমুদিয় কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্র

* R.yazu-s-Salatin P. 373.

† Malleson.

বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম (শঙ্কর, মধু, বলদেব)। পরম পুরুষের আরাধনা রূপ কর্ম্ম (রামানুজ)।

সন্ন্যাসী—পরিত্যাগী (শঙ্কর, মধু)। জ্ঞাননিষ্ঠ (রামানুজ)।

যোগী—সমাহিতচিত্ত (শঙ্কর, মধু, বলদেব)। কর্ম্মযোগী (রামানুজ)।

অগ্নিহীন—অগ্নিসাধ্য ইষ্টাখ্য কর্ম্মত্যাগী(স্বামী)। বা শ্রৌত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মত্যাগী (মধু, বলদেব)। অগ্নি সাধনাবিহীন,—যাহা হইতে কর্ম্মাঙ্গভূত অগ্নি-নির্গত হইয়াছে (শঙ্কর)। অর্থাৎ গার্হপত্য, আহবনীয় অন্বহার্য্য ও পচন প্রভৃতি অগ্নি যে ত্যাগ করিয়াছে, (গিরি)। সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী (মধু)। শাস্ত্রমতে যাহারা সন্ন্যাসী তাহারই অগ্নিহীন।

ক্রিয়াহীন—পূর্ত্তাখ্য অগ্নিসাধ্য স্মার্ত্ত ক্রিয়া ত্যাগী (গিরি, মধু)। তপ দানাদি ক্রিয়াত্যাগী (শঙ্কর)। শারীরিক কর্ম্মত্যাগী (বলদেব),নিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তি (মধু)।

ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারগণ এই শ্লোকের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করেন। রামানুজ বলেন, আত্মাবলোকনরূপ ধ্যান যোগ, কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয় সাধ্য। তবে এ উভয় মধ্যে জ্ঞানাকার (নিষ্কাম) কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ, কেন না, তাহা জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ উভয় নিষ্ঠ। আর ক্রিয়াহীন ও অগ্নিহীন যে সন্ন্যাস, তাহা কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ। বলদেব বলেন, ধ্যানযোগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কর্ম্ম-যোগ তাহার উপায়। এই জন্য এই অধ্যায়ের প্রথম দুই শ্লোকে কর্ম্মযোগের প্রশংসা করা হইয়াছে। বল-দেব বলেন, সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই কেবল সন্ন্যাসী হয় না, আর শুধু চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত করিয়া বসি-লেই যোগী হয় না। কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যজ্য নহে। স্বামী বলেন, কেবল চিত্তশুদ্ধি হইলেই মুক্তি হয় না, কেবল সন্ন্যাসের দ্বারাও মুক্তি হয় না। মুক্তির জন্য ধ্যান যোগের প্রয়োজন। কর্ম্মযোগ হইতেই ধ্যানযোগ লাভ হয়। আর কর্ম্মযোগ সুকর বলিয়া তাহা সন্ন্যাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এজন্য এস্থলে প্রথমেই কর্ম্মযোগের প্রশংসা করা হইয়াছে। এই সকল দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব টীকাকারদিগের একই অভিপ্রায়। ইঁহাদের মতে কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ সন্ন্যাসী টীকাকারদের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন। শঙ্করাচার্য্য বলেন, ভগবান কথন সর্ব্ব-শাস্ত্র বিহিত চতুর্থ সন্ন্যাসাশ্রমের নিন্দা করেন নাই। তবে গৃহীর যাহা অনুষ্ঠেয়, কেবল তাহাই এই শ্লোকে উপদেশ করিয়াছেন। গৃহী ধ্যানযোগে আরোহণে অধিকারী হইবার জন্য, নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম প্রথমে আচরণ করিবে। তবে যাবজ্জীবন তাহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হইবে না। কেন না, এই অধ্যা-য়ের তৃতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যোগারূঢ় হইলে শম বা কর্ম্মসন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হইবে। আর যোগ সাধনার যে বহিরঙ্গ কর্ম্ম, তাহা এই অধ্যায় শেষে "কল্যাণকারী যোগ-ভ্রষ্টের সদ্গতির বিবরণ যাহা আছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

এই জন্য শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকের অর্থ করেন যে, নিরগ্নি ও নিষ্ক্রিয় যাহারা, কেবল তাহারাই যে সন্ন্যাসী বা যোগী, তাহা নহে। যিনি কর্ম্মযোগী, কর্ম্ম ফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান দ্বারা, পরিণামে সত্ত্ব শুদ্ধি হেতু সন্ন্যাসী বা যোগী হইতে পারেন। অর্থাৎ অগ্নি ও ক্রিয়াত্যাগী যেমন সন্ন্যাসী বা যোগী, নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যকর্ম্মকারীও সেইরূপ সন্ন্যাসী ও যোগী হইয়া, কর্ম্মত্যাগ না করিয়া সন্ন্যাসী বা যোগী। শঙ্করাচার্য্য আরও বলেন, সাত্ত্বিক নিষ্কাম কর্ম্মী ও নিরগ্নি সন্ন্যাসী, কর্ম্মফল সঙ্কল্পসন্ন্যাস হেতু উভয়ের সাদৃশ্য বা এই সাধর্ম্ম জন্য উভয়ের একত্ব। সেইরূপ নিষ্ক্রিয় যোগী ও সক্রিয় কর্ম্মযোগী উভয়ের চিত্ত বিক্ষেপের হেতু পরিত্যাগ জন্য উভয়ের সদৃশ্য বা একত্ব—এইরূপ বুঝিতে হইবে। মধুসূদনও প্রায় এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

[এ স্থলে উল্লেখ করা উচিত যে, কোন কোন বাঙ্গালা ব্যাখ্যাকার এই শ্লোকের মর্ম্ম করিয়াছেন— "নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা"নিরগ্নিক হউন অথবা নিষ্ক্রিয় হউন, তথাপি তিনি সন্ন্যাসী, তিনি যোগী"। বলা বাহুল্য এ অর্থ সঙ্গত নহে।)

যাহা হউক, উল্লিখিত বিভিন্ন অর্থের মধ্যে বৈষ্ণব টীকাকারদিগের অর্থ অধিক সঙ্গত মনে হয়। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্লোক এই শ্লোকের সহিত মিলাইয়া দেখিলে একথা প্রতিপন্ন হইবে। ইহা ব্যতীত অষ্টাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় হইতে একাদশ শ্লোক বুঝিয়া দেখিলেও এই কথা বুঝা যাইবে। ভগ-বান সর্ব্বত্রই কর্ম্মত্যাগীকে নিন্দা করিয়াছেন। তিনি

যাহাকে সন্ন্যাস কহে যোগও তাহাই
জানিও পাণ্ডব তুমি ; কভু নাহি হয়
যোগী সেই—সংকল্প যে নাহি করে ত্যাগ ।২

যোগে আরোহণ আশা করে যেই মুনি,
কর্ম্মই কারণ তার ; যোগারূঢ় যেই
নিবৃত্তি কারণ তার—কহে ইহা লোকে ।৩

সর্ব্বত্রই বলিয়াছেন, যিনি কর্ম্মফলত্যাগী কর্ত্তব্য কর্ম্মকারী—তিনিই সন্ন্যাসী।

এই শ্লোকের আরও একরূপ অর্থ হইতে পারে। "যিনি কর্ম্মফলে অভিলাষ না করিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আচরণ করেন—তিনিই যোগী, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনি অগ্নি সাধ্য কর্ম্ম ত্যাগ করেন না—তিনি নিষ্ক্রিয় থাকেন না।"—কিন্তু কোন ভাষ্য বা টীকাকার এই অর্থ করেন নাই।

(২) যাহাকে সন্ন্যাস কহে যোগও তাহাই—শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন বলেন, এস্থলে গৌণার্থে সন্ন্যাস ও যোগশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কেন না, মুখ্যভাবে দেখিলে, কর্ম্মযোগ প্রবৃত্তি লক্ষণযুক্ত, আর সন্ন্যাস নিবৃত্তি লক্ষণযুক্ত ; সুতরাং এই দুই বিপরীত লক্ষণযুক্ত সংজ্ঞার একত্ব ধারণা হয় না। এই শ্লোকেও এরূপ একত্ব বুঝান হয় নাই—গৌণ ভাবে উভয়ের সাদৃশ্য বুঝান হইয়াছে মাত্র। যাহা সন্ন্যাস, তাহার লক্ষণ—সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ ও সর্ব্ব কর্ম্মের ফলত্যাগ। সন্ন্যাসী সকল কর্ম্মত্যাগ দ্বারা, তাহার ফল বিষয়ে সংকল্পও ত্যাগ করেন। এই সঙ্কল্পই প্রবৃত্তি হেতু, চিত্ত বিক্ষেপ হেতু, কর্ত্তৃত্বাভিমানের মূল, কামনার কারণ। আর যিনি কর্ম্মযোগী তিনিও চিত্তবিক্ষেপ কারণ কর্ম্মফল-সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। এই জন্য যোগ ও সন্ন্যাস উভয়েই—কর্ম্মফল ত্যাগ হয়, ফল তৃষ্ণারূপ চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। এই অর্থে এই কর্ম্মফল ত্যাগ সম্বন্ধে সাদৃশ্য হেতু যোগ ও সন্ন্যাসকে গৌণভাবে এক, অথবা পরস্পর পরস্পরের সদৃশ বলা যায়।

মধুসূদন বলেন, পাঁচরূপ চিত্তবৃত্তি যে যোগশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তন্মধ্যে বিপর্য্যয় বৃত্তির একাংশকে রাগ বলে। ইহাই কর্ম্মফলে সংকল্পের হেতু। সুতরাং এই সংকল্পাত্মক রাগ ত্যাগে চিত্ত বৃত্তির একাংশ সংযত করা হয় মাত্র। ধ্যানযোগে সকল চিত্তবৃত্তিরই নিরোধ করিতে হয়।

শঙ্করাচার্য্য বলেন, কর্ম্মযোগের প্রশংসা জন্য, এস্থলে তাহাকে সন্ন্যাস বা সন্ন্যাস তুল্য বলা হইয়াছে। স্বামী বলেন, এস্থলে কর্ম্মযোগেরই সন্ন্যাসত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। রামানুজ বলেন, কর্ম্মযোগের ফল জ্ঞান বলিয়া—তাহার সন্ন্যাসিত্ব দেখান হইয়াছে।

বলদেব ভিন্ন অর্থ করেন। তিনি বলেন, যে কর্ম্মযোগকে প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুসারে সন্ন্যাস বা সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তি বিরতিরূপ জ্ঞান নিষ্ঠা বলা যায়, সেই কর্ম্মযোগকেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ রূপ অষ্টাঙ্গ যোগ বলিয়া জানিও।

সংকল্প-ত্যাগ—যে ফল বিষয়ে সংকল্প পরিত্যাগ করিতে পারে নাই—তাহার চিত্তবিক্ষেপ কারণ বর্ত্তমান থাকায়, সে যোগী হইতে পারে না। কেননা সংকল্পই কামনার কারণ ও চিত্তবিক্ষেপ হেতু (শঙ্কর)। যে ফল সংকল্প ত্যাগ করে নাই, সে কর্ম্ম নিষ্ঠ হউক, আর জ্ঞান নিষ্ঠ হউক—সে যোগী নহে (স্বামী)। অনাত্ম প্রকৃতিতে যে আত্ম সংকল্প পরিত্যাগ করে নাই, সে কখন কর্ম্মযোগী হইতে পারে না (রামানুজ)। (পরবর্ত্তী ২৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

(৩) যোগে—ধ্যানযোগে (শঙ্কর)। আত্মাবলোকন (রামানুজ)। জ্ঞানযোগে (স্বামী)। অন্তঃকরণ শুদ্ধিরূপ বৈরাগ্যে (মধু)।

মুনি—কর্ম্মফল সন্ন্যাসী (শঙ্কর, মধু)। যোগঅভ্যাসী (বলদেব)।

কর্ম্ম—নিষ্কাম কর্ম্মযোগ (শঙ্কর)।

কারণ—সাধন (শঙ্কর, মধু)।

নিবৃত্তি—(মূলে আছে 'শম') উপশম বা সর্ব্ব কর্ম্ম নিবৃত্তি বা সন্ন্যাস (শঙ্কর, রামানুজ)। বিক্ষেপক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি (স্বামী, বলদেব)। জ্ঞান পরিপাক সাধন জন্য সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস (মধু)। মুক্তিগত সুখাতিশয় লাভ জন্য সর্ব্ব কর্ম্মে নিবৃত্তি (রাঘবেন্দ্রযতি)।

এই তৃতীয় শ্লোক সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, ফল নিরপেক্ষ কর্ম্মযোগ ধ্যানযোগের বহিরঙ্গ সাধন, আর সেই কর্ম্মযোগ সন্ন্যাসের তুল্য, এই বলিয়া কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিয়া, পরে ধ্যানযোগের সাধক যে কর্ম্মযোগ, এ স্থলে তাহাই দেখান হইয়াছে। মূলের

ইন্দ্রিয় বিষয়ে—আর কর্ম্মেতে যখন
না থাকে আসক্তি, ত্যজে সংকল্প সকল,—
যোগারূঢ় হয় তবে আছয়ে কথিত ।৪

অর্থ এই যে, ধ্যানযোগ সাধনের পূর্ব্বে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। কর্ম্মযোগ দ্বারাই সেই চিত্তশুদ্ধি হয়। এজন্য ধ্যানযোগ সাধনা করিতে হইলে, প্রথমে কর্ম্মযোগ সাধনা কর্ত্তব্য। তাহার পর যে যে সময় কর্ম্ম হইতে উপরতি হয়—সেই সেই সময় চিত্ত সমাহিত হইতে পারে। ব্যাস বলিয়াছেন—

নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং
যথৈকতা সমতা সত্যতা চ
শীলং স্থিতি র্দণ্ডনিধান মার্জ্জবং
ততস্ততশ্চোপরম ক্রিয়াভ্যঃ ॥

রামানুজ বলেন—এই তৃতীয় শ্লোক অনুসারে—যাবৎ আত্মাবলোকন রূপ মোক্ষপ্রাপ্তি না হয়, তাবৎ কর্ম্মযোগ কর্ত্তব্য। স্বামী, মধুসূদন ও বলদেব বলেন কর্ম্ম যাবজ্জীবন অনুষ্ঠেয় নহে। ধ্যানযোগারূঢ় হইতে পারিলে আর কর্ম্মযোগের প্রয়োজন নাই। ইহাই এই শ্লোকে দেখান হইয়াছে।

ধ্যানযোগ যে একরূপ যজ্ঞ, তাহা চতুর্থ অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।

কোন কোন বিদেশী টীকাকার বলেন যে, এই শ্লোকে পাতঞ্জল ও সাংখ্যদর্শনের সামঞ্জস্য করা হইয়াছে। উভয় দর্শন মতেই "জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ"। সাংখ্য মতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিলে ও প্রকৃতির স্বরূপ জানিলে মুক্তি হয়। পাতঞ্জল মতে সেই জ্ঞান সমাধির দ্বারা লাভ করিতে হয়।

এই শ্লোকে কর্ম্ম অর্থে নিষ্কাম কর্ম্ম না করিয়া যোগশাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম,এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ধ্যানযোগ সাধন জন্য প্রাণায়াম প্রত্যাহার আদি যোগবিহিত কর্ম্ম করিতে হয়। পরে যোগ সিদ্ধ হইলে আর সে সকল কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তখনও (ব্যুৎথান কালে) নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে বাধা নাই। কেন না, তাহাতে চিত্তবিক্ষেপ হয় না। পর শ্লোকের সহিত এই অর্থ সঙ্গত হয়।

(৪) ইন্দ্রিয় বিষয়ে আর কর্ম্মেতে—শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিষয়ে ও নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য লৌকিক প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মে (শঙ্কর, মধু)। আত্মব্যতিরিক্ত প্রাকৃত বিষয়ে ও তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মে (রামানুজ)। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ও তৎসাধন কর্ম্মে (স্বামী, বলদেব)।

আসক্তি না থাকে—প্রয়োজন নাই—এইরূপ বুঝিয়া, কর্ম্মে ও বিষয়ে অনুষঙ্গ বা কর্ত্তব্যতা বুদ্ধি ত্যাগ করে (শঙ্কর)। কর্ম্ম ও বিষয় মিথ্যা, আত্মা অকর্ত্তা আনন্দস্বরূপ আত্মদর্শন লাভ করিলে সে সকল প্রয়োজন নাই, এইরূপ বুদ্ধিতে আসক্তি ত্যাগ করে (মধু)। সর্ব্ব সংকল্প সন্ন্যাসী বলিয়া এইরূপ আসক্তি ত্যাগ করে (স্বামী, বলদেব)।

ত্যজে সংকল্প সকল—শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন "যিনি সর্ব্বকামনা ও কামাত্মক সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তিনিই সর্ব্ব-সংকল্প-সন্ন্যাসী। কামনা সকল সংকল্প মূলক। সেই জন্য পরবর্ত্তী ২৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে 'সংকল্প প্রভবান্ কামান্।" স্মৃতিতে ;—

"সংকল্প মূলঃ কামোবৈ, যজ্ঞাঃ সংকল্প সম্ভবাঃ।
কামং জানামি তে মূলং সংকল্পাত্বং হি জায়সে॥
ন ত্বাং সংকল্পয়িস্যামি তেন মে ন ভবিষ্যসি।"

সর্ব্ব কামনা পরিত্যাগে সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস সিদ্ধ হয়। শ্রুতিতে আছে—

স যথাকামোভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি
তৎ কর্ম্ম কুরুতে।"

স্মৃতিতে আছে "যদ্যদ্ধি কুরুতে কর্ম্ম তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতং।'

মধুসূদন বলেন "ইহা আমার কর্ত্তব্য, এই ফল ভোক্তব্য—এইরূপ মনোবৃত্তি বিশেষ,ও তদ্বিষয়ক কাম বা কামনা, ও তৎসাধক কর্ম্ম—এই সকল যে ত্যাগশীল, সেই সর্ব্ব সংকল্প সন্ন্যাসী। সংকল্পই শব্দাদি বিষয়ে ও কর্ম্মে আসক্তির হেতু। এইজন্য সংকল্প যোগারোহণের প্রতিবন্ধক।

রামানুজ বলেন—কর্ম্মযোগ সাধনার দ্বারা, বিষয়ের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিবার অভ্যাস হয়। এই জন্য ধ্যানযোগ সাধনার পূর্ব্বে কর্ম্মযোগ সাধনার প্রয়োজন।

আত্মবলে আত্মাকেই করিও উদ্ধার,
নাহি কভু অবসন্ন করিও আত্মারে,
আত্মাই আত্মার বন্ধু—আত্মা আত্মরিপু।৫

(৫) আত্মবলে—বিবেকযুক্ত মন দ্বারা (স্বামী, মধু)। বিষয়াসক্তি রহিত মন দ্বারা (রামানুজ, বলদেব)

আত্মা তার আত্মবন্ধু—আত্মবলে যেই
করে আত্মজয়; নহে আত্মজয়ী যেই—
শক্রু সম আত্মা করে শক্রতা তাহার।৬

আত্মাকেই—সংসার সাগরে নিমগ্ন আপনাকে—জীবকে (শঙ্কর, মধু)।

করহ উদ্ধার—(উর্দ্ধে লইয়া যাও)। যোগারূঢ় হইলে সংসার-জাল হইতে আত্মার উদ্ধার হয়—অতএব ধ্যানযোগ দ্বারা আত্মার উদ্ধার কর (শঙ্কর)। বিষয়াশক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগারূঢ় হইয়া আত্মাকে সংসার প্রবাহের বাহিরে লইয়া যাও (মধু)।

অবসন্ন—অধোগতি করা (শঙ্কর, স্বামী)। সংসার মগ্ন করা (মধু, বলদেব)। যোগ প্রাপ্তির উপায় চেষ্টা না করিলে যোগাভাবে সংসার পরিত্যাগ অসম্ভব হইবে, ও তাহা হইলে আত্মার অধোগতি হইবে (গিরি)।

আত্মা—মন (স্বামী, বলদেব)।

বন্ধু—সংসার মুক্তির কারণ (শঙ্কর)। যাহাদের সচরাচর বন্ধু বলে, তাহারা মোক্ষের প্রতিকূল, স্নেহাদি বন্ধন কারণ—তাহারা প্রকৃত বন্ধু নহে (শঙ্কর)। হিতকারী, উপকারক (স্বামী, মধু)।

রিপু—অপকারী (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। বিষয় বন্ধন কারণ (মধু)। স্মৃতিতে আছে—

মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়া সঙ্গো মুক্তৈনির্বিষয়ং মনঃ॥ (পরাশর)

এই শ্লোক সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, যোগারূঢ় হইলেই আত্মার দ্বারা আত্মোদ্ধার হয়, নতুবা আত্মা অধোগামী হয়। অর্থাৎ সংসার মগ্ন হয়। স্বামী বলেন, বিষয়াসক্তি ত্যাগই মোক্ষ, আর আসক্তিই বন্ধন। এই এই জন্য আত্মোদ্ধার কারণ বুদ্ধি বলে—বিবেকযুক্ত হইয়া বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিতে হয়।

(৬) আত্মজয়ী—আত্মা অর্থাৎ কার্য্য কারণ সংঘাত শরীর (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। আত্মা = মন (বলদেব, রামানুজ)। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া (বা সংঘাতকে) বশ করিলে চিত্ত-বিক্ষেপ দূর হয়, তাহার ফলে চিত্ত সমাধির উপযুক্ত হয়। এরূপ লোকের আত্মা তাহার বন্ধু (গিরি)। রাঘবেন্দ্র যতি বলেন, যে জীব বুদ্ধিপূর্ব্বক বা বুদ্ধিকে (বিজ্ঞানাত্মাকে) আশ্রয় করিয়া মন বশীভূত করিয়াছে, সেই জীবের মন ভগবদারাধনার উপযোগী হওয়ায় বন্ধুর ন্যায় উপকারী।

যে প্রশান্ত আত্মজয়ী,—পরম আত্মায়
রহে সেই সমাহিত, শীত গ্রীষ্মে আর
সুখে দুঃখে, সেই রূপ মান অপমানে।৭
আত্মা যার তৃপ্ত—জ্ঞান বিজ্ঞান লভিয়া,

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রকৃতিজ কোষে বা শরীরে আত্মা আবদ্ধ। বিজ্ঞানাত্মা স্বশক্তি বলে স্থূল সূক্ষ্ম বা কারণ শরীরকে বশে আনিয়া যে চিত্তকে অন্তর্মুখী করিতে পারে, আত্মার নিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করে—তাহারই কার্য্যকারণ সংঘাত আত্মা আত্মার বন্ধু। নতুবা যাহার চিত্ত বহির্মুখী, সে বিক্ষেপ শক্তির বৃদ্ধি হেতু, বাহ্য বিষয়ে লিপ্ত, তাহার চিত্ত প্রকৃত পক্ষে তাহার শক্রু। কেননা, তাহা মুক্তি-পথের অন্তরায়। পূর্ব্ব শ্লোকে যে বলা হইয়াছে, আত্মা আত্মার বন্ধু ও আত্মা আত্মার শক্রু—এই শ্লোকে তাহার অর্থ বুঝান হইয়াছে।

(৭) প্রশান্ত—রাগাদি রহিত (স্বামী)। সর্ব্বত্র সম বুদ্ধি (মধু)।

পরম আত্মায়—সাক্ষাৎ আত্মভাবে (শঙ্কর), কেবল আত্মাতে (স্বামী, মধু), অথবা স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বভাব আত্মাতে (মধু)।

সমাহিত—সাক্ষাৎ আত্মভাবে স্থিত (শঙ্কর) সমাধি বিষয়ে যোগারূঢ় (মধু)।

এই শ্লোকে ও পরের দুই শ্লোকে যোগারম্ভযোগ্য অবস্থার কথা বলা হইয়াছে (বলদেব, রামানুজ)। আত্মজয়ীর আত্মা কিরূপে তাহার বন্ধু হয়, তাহাই এস্থলে বুঝান হইয়াছে (স্বামী, মধু)।

(৮) জ্ঞান—শাস্ত্রোক্ত বিষয় পরিজ্ঞান; বিজ্ঞান—শাস্ত্র হইতে যাহা জানা যায় তাহাই নিজে অনুভব করণ (শঙ্কর)। জ্ঞান = ঔপদেশিক; বিজ্ঞান = অপরোক্ষানুভূত (স্বামি)। জ্ঞান—পরোক্ষ, আর বিজ্ঞান—অপরোক্ষ (গিরি)। শাস্ত্রোক্ত তত্ত্বে ঔপদেশিক অর্থাৎ উপদেশ প্রভৃতিতে লব্ধ জ্ঞান অপ্রামাণ্য এইরূপ আশঙ্কা হইলে বিচার দ্বারা সেই আশঙ্কা নিরাকরণ করা, আর সেই সকল তত্ত্ব নিজে অনুভব দ্বারা অপরোক্ষ করাই বিজ্ঞান (মধু)। ধ্যানের দ্বারাই বিজ্ঞান লাভ হয় (রাঘবেন্দ্র যতি)। পূর্ব্বে ৩।৪১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

কূটস্থ—অপ্রকম্প (শঙ্কর), নির্ব্বিকার (স্বামী)

যে কূটস্থ জিতেন্দ্রিয়, সম যার শীলা
লোষ্ট্র বা কাঞ্চন—সেই যোগী যোগরত।৮
সুহৃদ কি মিত্র, কিম্বা অরি উদাসীন,
মধ্যস্থ অপ্রিয় বন্ধু—সাধু পাপকারী
সবা প্রতি সমবুদ্ধি হয় শ্রেষ্ঠ অতি।৯

যোগী সদা যোগরত, করিবে আত্মারে
একাকী নির্জ্জনে রহি করিয়া সংযত
চিত্ত আত্মা, করি ত্যাগ আশা পরিগ্রহ।১০

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

একস্বভাব হেতু সর্ব্বকালে স্থিত (বলদেব), দেবাদি অবস্থা যুক্ত সর্ব্ব জীবে বর্ত্তমান জ্ঞানের দ্বারা একাকার সর্ব্ব সাধারণ আত্মাতে অবস্থিত (রামানুজ)।

সম যার শীলা...মৃত্তিকা সুবর্ণ প্রভৃতি বস্তুতে হেয় বা উপাদেয় এইরূপ বুদ্ধিশূন্য (স্বামী, মধু)। প্রাকৃত লোষ্ট্রাদি বস্তুতে সর্ব্বত্র তুল্য দৃষ্টি (বলদেব)। প্রাকৃত বস্তুর স্বরূপ জানিয়া যে সকল বস্তুতে ভোগ্যভাব দূর হওয়া। সকলই যাহার নিকট সমান প্রয়োজন বোধ হয় (রামানুজ)।

সেই যোগী যোগরত—যে এইরূপে যোগরত বা সমাহিত, সেই যোগী (শঙ্কর)। সেই যোগীই অর্থাৎ সেই, অক্রিয়, আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন, পরাবৈরাগ্যযুক্ত হর্ষ, কাম, ক্রোধাদি বিরহিত যোগীই আত্মাবলোকনরূপ যোগাভ্যাসের উপযুক্ত (রামানুজ, বলদেব)।

(৯) সুহৃদ্—যে প্রত্যুপকার অপেক্ষা না করিয়াও উপকার করে (শঙ্কর)। পূর্ব্ব স্নেহ বা সম্বন্ধ বিনাও যে উপকার করে (মধু)। যে স্বভাবতঃই হিতকারী (স্বামী)।

মিত্র—স্নেহবান উপকারী।

উদাসীন—পরস্পর বিবাদকারীদের মধ্যে যে কোন পক্ষ অবলম্বন না করে (শঙ্কর, স্বামী)।

মধ্যস্থ—যে ঐরূপ উভয় পক্ষেরই হিতাকাঙ্ক্ষী।

অপ্রিয়—(মূলে আছে "দ্বেষ"—যে আপনার অপ্রিয়, (শঙ্কর) যে দ্বেষের বিষয় (স্বামী)। যে আপনার প্রতি কৃত অপকার অপেক্ষা না করিয়া, উপকার করে (মধু) অরি, পরোক্ষে অপকারক, আর প্রত্যক্ষে অপ্রিয়ই দ্বেষ্য (গিরি)।

সমবুদ্ধি—কে, কি কর্ম্ম ইহাতে—অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষে বা কার্য্য বিশেষে অব্যাপৃত বুদ্ধি (শঙ্কর)। জাতি গোত্রাদি বিষয়ে ও ব্যাপার বিষয়ে উক্তরূপে যে বুদ্ধি ব্যাপৃত নহে (গিরি)। রাগ দ্বেষ শূন্য বুদ্ধি (স্বামী)।

হয় শ্রেষ্ঠ অতি—মূলে আছে—"বিশিষ্যতে"। ইহার আর এক পাঠ আছে, "বিমুচ্যতে" বা মুক্ত হয় যোগারূঢ়দিগের মধ্যে এইরূপ সমত্ব বুদ্ধি যাহাদের—তাহারাই শ্রেষ্ঠ (শঙ্কর)।

(১০) এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ২৩টী শ্লোক ধ্যানযোগের অঙ্গ প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে।

যোগী—ধ্যানযোগী (শঙ্কর), যোগারূঢ় (স্বামী, মধু)। কর্ম্মযোগী (রামানুজ, বলদেব)।

সদা—দীর্ঘকাল (গিরি)। নিরন্তর (শঙ্কর, গিরি)।

আত্মারে—অন্তঃকরণকে চিত্তকে বা মনকে (শঙ্কর, স্বামী)।

যোগরত—চিত্তের ক্ষিপ্ত মূঢ় বিক্ষিপ্ত অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া চিত্তকে একাগ্র ও নিরোধ অবস্থায় সমাহিত করিবে। (মধু)।

নির্জ্জনে—একান্তে গিরিগুহাদি স্থানে (শঙ্কর)। যোগ প্রতিবন্ধক দুর্জ্জনাদি বর্জ্জিত স্থানে (মধু)। নিঃশব্দ দেশে (বলদেব, রামানুজ)।

পাতঞ্জল দর্শনে আছে,—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—যোগের এই অষ্ট অঙ্গ। ইহার মধ্যে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ, ইহাই 'যম'। শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান—ইহাই "নিয়ম।" গৃহে থাকিয়া যম নিয়ম অভ্যাস চলিতে পারে। তাহার পর, কর্ম্মযোগ দ্বারা শরীর ও মন নির্ম্মল হইলে, গৃহত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইয়া, যোগের অন্যান্য অঙ্গ অভ্যাস করিতে হয়।

আত্মা—দেহ (শঙ্কর, স্বামী, মধু), মন (রামানুজ)

আশা—তৃষ্ণা আকাঙ্ক্ষা (শঙ্কর, স্বামী)। অপেক্ষা (রামানুজ)।

পরিগ্রহ—(৪। ৪১ টীকা দ্রষ্টব্য)। ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "অপরিগ্রহ স্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ" (২। ২৯ সূত্র) অর্থাৎ অপরিগ্রহে স্থির হইলে জন্মান্তর বৃত্তান্ত জানা যায়।

অনাত্ম বিষয়ে মমতা রহিত (রামানুজ)।

বাঙ্গালা ভাষা।

(নানারূপ ও নানামূর্ত্তি।)

যে সুবিস্তৃত রাজ্য কলিকাতার ছোট লাট সাহেবের শাসন ও অধিকার ভুক্ত, তাহার যে অংশে বাঙ্গালা ভাষা "মাতৃভাষা" বলিয়া প্রচলিত, তাহারই নাম "খাস বাঙ্গালা দেশ" অথবা বেঙ্গল প্রপার (Bengal proper.) ইহাই প্রকৃত বাঙ্গালীর বাসস্থান। এই খাস বাঙ্গালায় প্রায় ২৫টি জেলা আছে। সমগ্র ভারতের তুলনায় ইহা অতি সামান্য স্থান; ৪০ কোটি অধিবাসী-পূর্ণা সুবিশালা ভারত-ভূমির সঙ্গে তুলনা করিলে ইহা নগণ্য বলিয়াই বিবেচিত হয়। ইংরাজী, উর্দ্দু, হিন্দী, পারস্য প্রভৃতি নানা স্থানে প্রচলিত, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের বাহিরে কোথাও অন্য জাতির মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিতা হয় নাই, কেননা বাঙ্গালী চিরকালই 'গোলামের জাতি।' আমাদের মাতৃভাষার উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু বিস্তৃতি হয় নাই। দুঃখের বিষয়, এই নগণ্য স্বল্প স্থানেও—এই খাস বাঙ্গালা দেশেও—সর্ব্বত্র বাঙ্গালা ভাষা এক মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান নাই। নানাস্থানে নানারূপ ও নানামূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালা ভাষা অবশেষে 'খিচ্‌ড়ি' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উচ্চদরের পুস্তক, সম্বাদ বা সাময়িক পত্রের ভাষা অথবা শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের বাঙ্গালা সর্ব্বথা এক বটে, কিন্তু পুস্তকী ভাষা ছাড়িয়া দিয়া যদি কথোপকথনের ভাষার দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে এক জেলার গ্রাম্য লোকের কথা অন্য জেলার গ্রাম্য বা শিক্ষিত লোকে বুঝিতে পারে কি না সন্দেহ। মণিপুরে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিতা, তথাকার মাতৃভাষা বাঙ্গালা ভাষা। তথাকার গ্রাম্য লোকে বলে—

"লায়ের কণে ফুক্ করে তা লইছ্‌লাম ডুটা"।

বলুন দেখি, নবদ্বীপের উচ্চ অঙ্গের শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুরা কথাটা বুঝিলেন কি না? কৃষ্ণনগরের বাঙ্গালা, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বলিয়া পরিচিতা, কিন্তু মণিপুরের বাঙ্গালার কৃষ্ণনগরকে হারি মানিতে হইবে। বাঁকুড়া জিলার কৃষক কবি গাহিতেছে—

"টুট্ কুটু সাঁজের বড়ে, উড়ে গেল পানী।
সোলা মেয়ে রুলে বলে, চশ্‌মে ভোলা ছানী॥"

কলিকাতার সাহিত্যবিশারদ বাবুদিগের ইহাতে বুদ্ধি প্রবেশ হয় কি? সাহিত্যচতুর দীনবন্ধু মিত্রও বোধ হয় ইহার অর্থ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন। বাখরগঞ্জের সেখ সমীরুদ্দীণ, পদ্মার নৌকা চড়িয়া তুফানে নাচিতে নাচিতে আরোহী যাত্রীকে বলিতেছে—

"কর্দ্দাজী! দরিয়ার পাঁচ পীর বদর্ বদর্। চিনহালাম, চেহলাম; তুপানে পাণী কদ্‌রাইচে। ডাহা জিলার রামরস্তো সাচু বেহানেছে, হালে পানি পালাম না। ফাল দিয়া ডঙ্গর লবো, ডর্ ক্যান্; তুপানে হজর কল্লাম; ফরিদপুরের তন্ সেরা বোলী, আঁশেতো পান্না হালোনা?"

কিছু বুঝিলেন কি? বলি, সমীরুদ্দীনের বক্তৃতা টা লাগ্‌লো কেমন?

এবারে আরও শুনুন। দীনবন্ধু বাবু "সুরধনী" কাব্যে লিখিয়াছেন—

"কাটোয়ার কাঠ ভাষা কণ্টকের ধার।
মেয়ে বলে বণিতায় ওকারে আকার॥"

সেই কাটোয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের স্ত্রীলোকদিগের ভাষা শুনাইয়া পাঠকের কৌতুহল বৃত্তি চরিতার্থ করিতেছি।

১। আঠে কাঠে পাঠ্য বাঁধা, ভোলার মেয়ে মাসী।
চাল বেগুণে চপোড় মারি, তিন স্তিলে খাসী॥
২। আগুণ বেগুণ, হাটে বাটে, হাঁড়ী কোণে লোই।
চপড়ু থুয়ে নপড়্ মাগি, সাপড়ো কঠে রোই॥
৩। গাঁও কোলো, মাও কল্লো, কড়ে রাঁড়ী আনা।
ভাতার সালে গোপড়্ বাঁচে, বরের নাহি জানা॥
ঘর জামায়ের তিনটা পা, শালার কাণে টুই।
শ্বশুর খাশুড়ী বিন্দে পেয়ে, ননদ ঝুঁই মুই॥
মাকড়ী লবঙ্গ বালা, পুঁটি, তাবিজ, বাজু কাণ।
মার্বো খাংগরা, চটজুতো, পড়বে খান খান॥
ইত্যাদি।

"গোবিন্দ সামন্ত" প্রণেতা, বেঙ্গল ম্যাগাজীন-সম্পাদক, সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজীলেখক মৃত রেভরেণ্ড লালবিহারী দে মহাশয়ের যেখানে জন্মভূমি ছিল, সেই গ্রামের কবিতা শুনাইতে ইচ্ছা করি।

(ক) "আয় রৌদ্র হেনে, ছাগল দিব চেনে,
বকরীর মা বুড়ী, কাঠ কুড়ুতে গেলি।" ইত্যাদি।

(খ) "কলাপাতা, কলাপাতা, করপ্পা।
অন্নী শোম্নী পেয়ে খেয়ে থেমে যা।" ইত্যাদি।

(গ) "আমার কথাটি ফুরুলো, নটে শাকটি মুড়ুলো,
ক্যানরে নটে মুড়ুশ ক্যাণে :" ইত্যাদি।

(ঘ) "উলু খুলো বাগ্না পাড়া, বরের ঘাণী রোগ্না।
কোণের ছায়া পাতে লাগি, খড়ের টেঁশো টোষণা॥
ছাঁদন তলে, লোড়া মুড়ে, জামাই শালা বোদে।
নাপিত এলো চেলীর রংগে, সাবল দিদি খোদে॥
রুণু ঝুণু, লাট্টু শট্টু, মাকড়ীর ঝিনে ঝি।
পান্তাভাতে বেগুণ পোড়া, গরম ভাতে ঘি॥ ইত্যাদি।

সুবিখ্যাত বঙ্কিম বাবু নৈহাটীর নিকটস্থ কাঁটালপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। অনেক দিন হইল একবার কাঁটালপাড়ায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। গ্রীষ্মকাল, জ্যৈষ্ঠ মাস। দুই জনে পথে বেড়াইতে বেড়াইতে একটী কুমারী কন্যাকে এক কলস জল লইয়া আসিতে দেখিলাম। বঙ্কিম বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'গোলাপী, কাল মধ্যাহ্নে আমাদের বাড়ীতে আহার করিতে এলে না কেন?" গোলাপী উত্তর করিল "পাটুখানা সকুতে বেদে গেল।" শুনিয়াই আমার চক্ষু স্থির হইল, ভাবিলাম বাঙ্গালাভাষার অপার মহিমা!! বঙ্কিম বাবু তাহা বুঝিতে পারিয়া আমাকে বলিলেন, "Our language needs a regular village slang dictionary" পাঠক মহাশয়! এখন বুঝিলেন কি, এক জেলার বাঙ্গালা অন্য জেলার বাঙ্গলা নহে। হুগলীর গ্রাম্য বাঙ্গালা ফরিদপুরের গ্রাম্য বাঙ্গালা হইতে স্বতন্ত্র; ময়মনসিংহের গ্রাম্য বাঙ্গালা চৈবাসা বা বীরভূমের গ্রাম্য বাঙ্গালা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শিক্ষিত সমাজেও উচ্চারণ দোষে উচ্চদরের বাঙ্গালাও বুঝা যায় না। ঢাকা জিলার শিক্ষিত বাবু যখন শীঘ্র শীঘ্র বাঙ্গালা বলেন, কলিকাতার বাবু তাহা বুঝিতে পারেন না; পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণপদ্ধতিও জঘন্য। ইহাঁরা কর্ত্তা স্থলে কর্দ্দা, ঢ় স্থলে ড়, ঠ স্থলে ট, গর্দ্দভ স্থলে গর্ধভ্, বদ্ধ স্থলে বদ্দ অথবা বধ্য উচ্চারণ করেন। দিনাজপুরের সংস্কৃতজ্ঞ অথচ শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের টুলো বিদ্যার্থী যুবার বাঙ্গালা ভাষার এক নমুনা দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতে করিতে, যুবা পণ্ডিত কহিতেছেন—(কথাগুলি অবিকল দেওয়া যাইতেছে।)

"সেই যে মুর্ত্তি হোয়েছে শ্যামবর্ণ আর ময়ূরের প্যাখম্ নক্ত হোয়েছে যে চূড়া (ষষ্ঠিতৎপুরুষ হোচ্ছে), এমন যে হোচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার পতি, অঙ্গুলীর উপরে ধোরে রাখ্তে সক্ষম হোলেন গিরি গোবর্দ্ধনকে এমন যে গিরিধারী (ষষ্ঠিতৎপুরুষ হোচ্চে) আর যমুনার তটে গোধন চরায়েও চরাতে চরাতে গোপিনীদিগের মন হরণ কর্তে পেরেছেন মোহন বাঁশীতে—আহা! সে বাঁশীর ধ্বনির কথা বোলতে নারি গো (সুর করিয়া)—অপ্সরা, গন্ধর্ব্বা, যক্ষ, রক্ষ,

নাগিনীও মোহন হোচ্ছেন—মানুষের কথাতো সামান্য সেই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান (সুর করিয়া) দ্বারকা হতে আস্‌তেছেন, আর রুণু ঝুণু বাজিতেছে নপুর পায়ে—সে পায় পায় কে? সেতো হোচ্ছে বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদযুগল। হেথা শ্রীমতী রুক্মিণীর কি দশা বল্‌বো, তাহাতো বল্‌তে নারি গো। একবার শুন্‌তে আজ্ঞা হয়। ভাল ভাল, সেই বর্ষার কাল মেঘের বরণ যে শ্যাম রূপ, তাঁহাই কৃষ্ণপ্রাপ্ত হোচ্ছেন ঘন ঘন তরে আর বেধে যাচ্চে তাঁহার মনরথ পানি শ্রীমতী রুক্মিণী সতীর প্রণয় জালে গো। অমনি বাজিয়া উঠিল দগড়া, দমামা, জয়ঢাক, নানা বাদ্য। নাচ্‌তে সুরু হোলো স্বর্গের কন্যারা, পুষ্পবৃষ্টি হোলো আকাশ হোতে আর কি বল্‌বো গো। সে শ্যামরূপের (সুর করিয়া) কেবা বর্ণন করিতে পারে গো।" ইত্যাদি।

পাঠক মহাশয়! বোধ হয় এতক্ষণে ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ক্ষমা করিবেন; যশোহর জিলার মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত কোনও গ্রামের এক ব্যক্তির একখানি পত্র আপনাকে শুনাইতে চাই—*

"আজ্ঞাকারি পত্তিপাল্য শ্রীভবনাথ গুঁই বহুৎ বহুৎ নমস্কার জানিবা। পরে ৺ কালীমাতার পদ কিরপায় এজনার ও ওজনার সমস্ত মঙ্গল হয় বিশেশ। পরে তোঁহার পৎখানি মানি কেটা লিখন কোরেছিল ও কেটা রশান কোরেছে, মালুম হোচ্চোনা। কাবাশ আর ধান তুঁই তুঁই হোতেছে, মেগের জল পেলে না। পুষ্কন্নীর জল করিব শুক্‌নো হোলো। খরচ পাঠানের তন্‌ বহুৎ বহুৎ লিখন করা গেছে, টাকা আইল না। করুনার দিদির টাকা হোধার বাকী আছে, দিক্‌ লাগাইয়াছে, সমাহ কেটে গেল।

কছু তামাকু পাঠাইবা। ভবাণীর মেয়ের মাণির শ্বেয়ে শুভম শীগর ইচ্ছা আছে জানিবা। ডাক টীকস কিছু পাঠাইবা। হরনারান দে আয়েন্দা মাহিনার শুরুতে যশোর তন্‌ আসবা, তুনার হাতে তামাকু দিবা, কিশম্‌ ভুল কর্ব্বা। রাজাদের খাজনা বাকী পড়লো, গোমস্তা আনাগোনো ও আরীন্দা আনা গোনো। দিগর মজুর যবোর যাইবেক, পরে লিখিব। হেথাকার এ বাটীর সমস্ত কুশল জানিবা, হোঁপাকার কুল খবর হামেশা পরণ কোত্তে গাফীল না হোবা মানী। ইতি তারীক ২৬ পৌশ। ১২০৯ সাল। ভবনাথ গুঁই।"

পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে পারস্য ও উর্দ্দু ভাষা আদালতের ভাষা ছিল। ইং ১৮৩৬ অব্দে যবন ভাষা উঠিয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালা দেশের আদালতের ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সময়ের পূর্ব্বেকার দুইখানি পত্র বঙ্গভাষার হিতৈষী মৃত মহাত্মা লং সাহেব সংগ্রহ করিয়া আপনার পুস্তকালয়ে রাখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, লেখকের হাতের অক্ষরগুলির প্রতিকৃতি দেখাইতে পারিলাম না। লিথোগ্রাফ না হইলে প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরের মূর্ত্তি দেখাইতে পারিব না। এই পত্র দ্বয়ের লেখক মুসলমান এবং আদালতের মোক্তার। উর্দ্দু, প্যারস্য এবং আরবা ভাষা যেমন দক্ষিণ হইতে বামে লেখা যায়, মোক্তার মহাশয় দ্বিতীয় পত্রখানি ঠিক তাহাই লিখিয়াছেন। পত্রখানি অবিকল এই—

(প্রথম পত্র)।

"হজুরে আলা॥ বাদ জনাব কো বহুৎ বহুৎ কোর্নীশহায় বন্দার এই আরজ্‌ হ্যায় কে বহুৎ রোজ হোতে বন্দা পুকারে আসছে, হজুরে আলার নেক নজর চাই সেঁওকে তবাহিমে বন্দার মোয়াকোল গীর্‌বো ২ হোয়ে উঠ্‌ছে। কেদার শন্নকার যে ওজর পেশ করিতেছে তাহা না কাবেল মন্নজুরকা হ্যায় হেতুবাদ উহা শহী আওর শালীমনাহি হোইতেছে আওর কানুনে খেলাপ হইতেছে॥ এ যাবৎ ওমদা হেতুবাদ পেশী না হইবার আরজবন্দ করনা না মাটে হকুম ফোরমানা বিবেষী না মনজুর ইহাই আইন বিধি জানিবেক। সেলাম শনে নীবেদন জানিবা।" (দস্তখত)।

(দ্বিতীয় পত্র।)

আঁ জনাবহায় দরপেশে ভকীল শন্নকারকা কেদার যেহেতু"

সাগীম মাকুল সহী মাটে হইবা না মজুদ

* পত্রখানির ব্যাকরণ শুদ্ধি প্রভৃতি যেমন ছিল তেমনি রাখিয়াছি। লেখক।

আসালোতান
অকারণ না হওনে পেশ কছুই ওজর
মকবুল আওর
এতাবৎ এই যে নীবেদন বন্দার পৌছি-
বার দের * "॥
ছে লায়েক হইবানে মিমাংসা এক-
তরফা মোকদ্দমা ॥

পাঠক দেখিলেন, উর্দ্দু, আরব্য ও পারস্য ভাষা অজস্রভাবে কেমনে বাঙ্গালা ভাষায় মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ১৮৮১ অব্দের সুপ্রসিদ্ধ কলিকাতা মহামেলার উপলক্ষে খ্যাতনামা রূপচাঁদ পক্ষী মহাশয় গাহিয়া ছিলেন—

"ক্যালকাটার একজিবিশন,
নো আড্‌মীশন,
টাকীট বিনে।
ফাটক কোরেছে আটক,
পুলীশ প্রহরী সাজনে॥"

এখানে সমুদয় শব্দগুলিই ইংরাজী ও উর্দ্দু। এইরূপে হিন্দী, উর্দ্দু, পারস্য, আরব্য, সংস্কৃত গ্রাম্য শব্দ, ইংরাজী, অধিক কি লাটীন, হিব্রু পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়া ভাষাটাকে যেন পঞ্জাবের মুসলমান সম্প্রদায়ের "ইদের খিঁচ্‌ড়ী" করিয়া তুলিয়াছে।

এখন বিশুদ্ধ মূল বাঙ্গালা শুনুন—

১। পূর্ব্বদিকে নানা রঙ্গে করিয়া রঞ্জিত।
উজ্জ্বল প্রভায় রবি হোয়েছে উদিত॥

ইহাতে 'করিয়া' এবং 'হোয়েছে' ব্যতীত সমগ্র শব্দ সংস্কৃত।

২। ঈশাক্ষের উশার্ব্বুদে মারা গেল মার॥
নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার॥

এখানেও 'মারা' 'গেল' 'নাকেতে' এবং 'করে' ভিন্ন সকল শব্দ মৌলিক সংস্কৃত। এবারে খাঁটি ও অকৃত্রিম বাঙ্গালার দৃষ্টান্ত দিতেছি—

১। "কি করি, কোথা যাই; গাছে কি চড়িব?
পীরিতের জ্বালায়, ভাই, মরমে কি মরিব?"

২। নীল বাঁদরে সোণার লংকা কোল্লে ছারখার।
অসময়ে হরিশ মোলো, লংএর হোলো কারাগার।
প্রজার আর প্রাণ বাঁচান ভার॥"

৩। "ওরাধে, কি সাধে, বালির বাঁধে, পীরিতি কৈলি।
কালিয়া বঁধুয়া সনে পীরিতি করিয়ে, সব খোয়াইলি।

৪। "পর্ব্বত দুয়ার হোতে যবে বাহিরায়
নদী, কে রোধিবে গতি তার?"

উপরিদ্ধৃত কবিতাগুলি খাঁটি বাঙ্গালা। ইহারই নাম পাকা ও খাঁটি বাঙ্গালা, ইহা বাঙ্গালীর নিজের ধন।

এ প্রবন্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে সকল উদাহরণ * দেওয়া হইয়াছে, পাঠক মহাশয় তাহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, বাঙ্গালা ভাষা নানা স্থানে ও নানা সময়ে নানা আকার ও নানা মূর্ত্তি এবং নানা ভাব ধারণ করিয়াছে। কে জানে আরও কত মূর্ত্তি ভবিষ্যতে ধারণ করিবে? কথকের মুখে, যাত্রার দলে, বক্তার বক্তৃতায়, কবির দলে, কথোপকথনে, ইয়ংবেঙ্গলের সম্প্রদায়ে, থিয়েটরে, নাটকে, সংবাদ ও সাময়িক পত্রে, উপন্যাসে, উচ্চ অঙ্গের পুস্তকাবলীতে, বটতলার গ্রন্থে, বাঙ্গালা ভাষার নানা মূর্ত্তি। গ্রাম্য সম্প্রদায়ে বাঙ্গালা ভাষা বিশেষ রূপান্তরিত হইয়াছে।

প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালার বর্ণমালা ও অক্ষর এক নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লিথোগ্রাফ না হইলে অক্ষরের রূপ ও মূর্ত্তি দেখাইতে পারিব না। ১২০৩ সালের অক্ষর দেখিলে আশ্চর্য্য হইবেন। তখন 'ল' ছিল না, যেমন ব অক্ষরের নীচে শূন্য দিলে র হয়, তেমনি ন অক্ষরের নীচে শূন্য দিয়া ল হইত। ক্ষ প্রায় ব্যবহৃত হইত না, ঙ অক্ষরের ব্যব-

* এই পত্র দক্ষিণ দিক হইতে বামদিকে পড়িতে হইবে।

* অবশ্য "Billingsgate Bengalee"র কথা বলা হইল না। তাহা যেমন বাঙ্গালায় আছে, অন্য ভাষায় আছে কি না সন্দেহ। নব্যভারতে তাহা প্রকাশ করা সুরুচি ও সুনীতির বিরুদ্ধ।—লেখক।

হার নাই ; ঢ, ঞ, ণ, উ, এ প্রভৃতির আকার এখনকার বর্ণমালা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দীর্ঘ উ অক্ষরের কোথাও ব্যবহার দেখি নাই। কোনও শব্দ দুইবার ব্যবহার হইলে, শব্দটী একবার লিখিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কযোগ হইত, যথা "কখনও কখনও" শব্দের পরিবর্ত্তে 'কখনো ২', তিনবার ব্যবহার হইলে ৩ দেওয়া হইত, যথা 'ভাল ভাল ভাল' স্থলে 'ভাল ৩' লেখা যাইত।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

রাজা রামমোহন রায়। (২)

রাজা রামমোহন রায়-সংক্রান্ত প্রথম প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল বিদ্যারত্ন এম-এ, সি-এস্ মহাশয়ের লিপির আলোচনা করিয়াছি ; সম্প্রতি যে যে বিষয়ের অবতারণা করিতেছি, পাঠকগণ তাহাতে ক্রমে ক্রমে অনেক সংবাদ জ্ঞাত হইবেন।

প্রথম বিষয়, রাজা রামমোহন রায়ের বংশ-তালিকাদি।—তিনি ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম পরিগ্রহ করেন, ইহা যাঁহারা অবগত, তাঁহারা, এই বিষয়ের সংবাদ রাখেন না যে, তিনি কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ রাঢ়ীয় শ্রেণী, কি বারেন্দ্র শ্রেণী, বৈদিক শ্রেণী, কি উৎকল শ্রেণী, কি মধ্যশ্রেণী ইত্যাদির মধ্যে তিনি কোন্ নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত, ইহা গোলযোগে পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে নানা কথা, নানা লোকে স্বেচ্ছামত কহিয়া থাকেন। এ পর্য্যন্ত রাজা রামমোহনের কোন জীবন-বৃত্তান্তেই তাঁহার সম্পূর্ণ বংশতালিকা মুদ্রিত হয় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের (রাধাপ্রসাদ বাবুর) কনিষ্ঠ দৌহিত্র বাবু নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়ও ভ্রান্তি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কেন না, তিনিও লিখিয়াছেন,—

"তাঁহার (রামমোহনের) পিতামহ ব্রজবিনোদ রায় বিষ্ণু-পরায়ণ।" (১)

"ব্রজবিনোদের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিবাস মুরসিদাবাদের অন্তঃপাতী শাঁকাসাগ্রাম।" (২)

এখানে দুই ভ্রম। প্রথম ভ্রম, কৃষ্ণচন্দ্রের "রায়" উপাধি না লেখা। কৃষ্ণচন্দ্রের উর্দ্ধতন দুই পুরুষ অর্থাৎ তদীয় পিতামহ পরশুরাম প্রথম "রায়" উপাধি পাইয়াছিলেন। নন্দ বাবু কৃষ্ণচন্দ্রকে "বন্দ্যোপাধ্যায়" বলিয়াছেন ; কিন্তু তৎপ্রদত্ত অসম্পূর্ণ বংশ-তালিকায় কৃষ্ণচন্দ্রের উপাধি "রায়"! অধিক কি, কৃষ্ণচন্দ্রের পিতারও সেই তালিকাতে "রায়" উপাধি! দ্বিতীয় ভ্রম, রাজার পূর্ব্ব পুরুষগণের শাঁকসায় বাস নয়। তাহার বিচার পরে হইবে।

বিস্তৃত অথচ বিশ্বাস্য বংশ-তালিকা দিয়া, ঐ ভ্রান্তির মীমাংসার চেষ্টা করিতে হইতেছে। বংশতালিকা মুদ্রিত করিবার আমাদের অপরাপর উদ্দেশ্যও আছে। এই সন্দর্ভে প্রসঙ্গ-বশতঃ তাঁহাদের বৃত্তান্ত উত্থাপিত হইবে, যাঁহাদের সহিত রাজা রামমোহনের কি সম্পর্ক, তাহার পরিজ্ঞান, নিতান্তই আবশ্যক। তদ্ভিন্ন এই প্রবন্ধ-লেখক, শাণিত ক্ষুরাঘাতে যে যে ভ্রম জঞ্জাল বিনাশ করিয়া যাইবেন, প্রবল যুক্তি, সুতীক্ষ্ণ বিচার, অখণ্ডনীয় প্রমাণ ব্যতিরেকে তাঁহার কি আভ্যন্তরিক এমন স্বত্ব বা সম্বন্ধ আছে, যদ্দ্বারা তিনি

(১) শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়" পুস্তক, ২য় সংস্করণ, ১ পৃষ্ঠা।

(২) "রাজা রামমোহন রায়" ১ পৃষ্ঠা।

উক্ত মত খণ্ডিত করিতে অধিকারী,পাঠকের তাহা বোধগম্য হইবার পক্ষেও বংশ-তালিকা যথেষ্ট আনুকূল্য করিবে।

রাজা রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহার পর কথা,—তিনি কাহার সন্তান? এতদুত্তরে এই মাত্র নির্দ্দেশ করাই পর্য্যাপ্ত যে, তিনি নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান। তিনি সুরাই মেলের কুলীন। এ বিষয়ে তাঁহার নামে যে এক গান প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার একাংশ এই,—"সুরাই মেলের কুল,

বাড়ী খানাকুল,
ওঁ তৎ সৎ ব'লে এক
বানিয়েছে ইস্কুল।
ও সে জেতের দফা
কুলের রফা" * * * ইত্যাদি।

এখানে বলিয়া রাখি—ব্রাহ্ম-সমাজের ইংরেজি-ইতিহাস-লেখক লিওনার্ড সাহেব(৩) ভ্রম-ক্রমে তাঁহাকে "নরোত্তম ঠাকুরের" সন্তান বলিয়া ফেলিয়াছেন! সাহেবের ভ্রান্তি হইবার কারণ বলিতেছি। নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নিত্যানন্দ গোস্বামী, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, কেহ কেহ মনে করিতেন। নিত্যানন্দ গোস্বামী, শ্রীচৈতন্যের সহচর। আর, নরোত্তম ঠাকুরও চৈতন্যদেবের অনুসহচর। এই ভ্রমমূলক সাদৃশ্য ধরিয়া সাহেব ভ্রমে নিপতিত। ফলতঃ নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিত্যানন্দ গোস্বামী দুই স্বতন্ত্র লোক। কেবল নাম-সাদৃশ্যে ভ্রান্ত হইয়া কেহ কেহ ঐরূপ করিয়া থাকেন। প্রকৃত বিষয় এই,—

"চৈতন্যের এক সহচর নিত্যানন্দও অত্যন্ত মহিমান্বিত ব্যক্তি। তিনিও ভট্টনারায়ণের অন্বয়ে উৎপন্ন; সুতরাং শাণ্ডিল্য-গোত্রীয়। তিনি অবধূত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত, জননীর নাম পদ্মাবতী। * * সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরি (বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁহার পিতামহ (৪)। আমাদের উক্তির স্বপক্ষে প্রমাণ এই—(ক) "ভট্টনারায়ণ-বংশ গুণে অনুপম।

রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈল নিত্যানন্দ-রাম॥
অবধূত, নাহি ছিল জাতির ভ্রূকুটী।
হরি ব'লে দেয় কোল এই পরিপাটী।" (৫)

(খ) "ঈশ্বর-আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্তধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈ'ল নিত্যানন্দ-রাম॥
মাঘ মাস শুক্ল ত্রয়োদশী দিনে।
পদ্মাবতী-গর্ভে একচাকা গ্রামে॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম, শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা, তাঁরে করি' ব্যাজ॥
রাঢ়দেশে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যথা অবতীর্ণ হৈল নিত্যানন্দ-রাম॥" (৬)

তাঁহার পিতৃপুরুষেরা কোন্ প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন, ইহা লইয়া অনেকে অতিমাত্র প্রবল পরাক্রান্ত নানা ভ্রান্ত মত চালাইতেছেন। রাজা রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ বাবুর কনিষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীযুক্ত বাবু নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়, রাজা রামমোহনের পূর্ব্ব পুরুষকে মুরসিদাবাদের অন্তর্গত শাঁকাশানিবাসী বলেন। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু তদ্বর্ণনার নিতান্তই অননুকূল। মুরসিদাবাদের অন্তর্গত 'বেণীপুরে' (৭) তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ বাস করিতেন; কিন্তু "শাঁকাশায়" নয়। বংশ-তালিকা দেখিলেই, বাসস্থান-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে।

রামমোহন রায়, শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় এবং ভট্টনারায়ণের অন্বয়ে সঞ্জাত। এই বংশীয়েরা কত বার বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন,তাহা যাঁহাদের অনুসন্ধানের লক্ষ্য নয়, তাঁহারাই ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। বাস-স্থান-পরিবর্ত্তনের তালিকা দেখুন।

(ক) ১ম, ভট্টনারায়ণ—কনোজ হইতে পূর্ব্ববাঙ্গালায় সমাগত। ১২বার পুরুষ একাদিক্রমে এখানে তদ্বংশীয়দের বসতি ছিল।

(খ) ১৩শ, সঙ্কেত—পূর্ব্ব বাঙ্গালার অন্তর্গত বৃহৎবাঙ্গালপাস-বাসী। এখানে ৫ পাঁচ পুরুষের বাস।

(গ) ১৮শ, গোবিন্দ—মুরসিদাবাদের অন্তর্গত বেণীপুর-নিবাসী।

(ঘ) ২৪শ, কৃষ্ণচন্দ্র—খানাকুল-কৃষ্ণনগর-মধ্যবর্ত্তী রাধানগর-নিবাসী।

প্রত্যেক নামের পূর্ব্বে যে যে অঙ্ক দেওয়া গেল, তাহাতে উঁহাদের পরস্পর কত পুরুষের ব্যবধান,তাহারই সূচনা করিয়া দিতেছে।

(3) "The ancestors of Ram Mohun Roy on the paternal side were descended from Narottama Thakur, a follower of Chaitanya.—G. S. Leonard's History of the Brahma Samaj, pp 8—9.

(৪) মৎ-সঙ্কলিত বংশাবলী, ৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(৫) কুলবিষয়ক পুস্তকের কারিকা।

(৬) চৈতন্য-ভাগবত।

(৭) এখনও বেণীপুরে রামমোহনের পূর্ব্বপুরুষ পরশুরামের পরিত্যক্ত 'ভিটা' অদৃশ্যমান হয় নাই।

৪ চারি জন,৪ চারি বার বাসভূমি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, জানা গেল।

পাঠকগণ এখন সম্পূর্ণ বংশ-তালিকা সন্দর্শন করিয়া মনঃপ্রাণ পরিতৃপ্ত করিয়া লউন। আমরা বহুদিনের শ্রমে ও যত্নে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি,পাঠকগণ তাহাতে নিমেষ-মাত্র দৃষ্টি সঞ্চারণ করিলেই, অতি সুগম উপায়ে অতি দুর্গম বিষয়, তাঁহাদের আয়ত্তীকৃত হইবে।

বংশ-তালিকা—শাণ্ডিল্য-গোত্র।

ক্ষিতীশ (ইঁহার ২ পুত্র)

১। ভট্টনারায়ণ (কনোজ হইতে বঙ্গে আনীত)

২। আদিবরাহ

৩। বৈনতেয়

৪। সুবুদ্ধি

৫। বিবুধেয় (৫ পুত্র)

৬। গুঁই (গুহ, গাঁউ [দ্বিতীয় পুত্র] ইঁহার ৭ পুত্র।

৭। গঙ্গাধর (ইনি সপ্তম পুত্র। ইঁহার ৭ পুত্র)

৮। পহশো, বহুশ, পশুপতি বা সুহাস (ইনি ১ম পুত্র। ইঁহার ৩ পুত্র)

৯। শকুনি (ইনি ১ম পুত্র)

জাহ্লন — ১০ মহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (কুলীন)

১১। মহাদেব (৩ পুত্র)

১২। দুর্ব্বলি (ইনি ৩য় পুত্র। ইঁহার ৫ পুত্র)

১৩। সঙ্কেত (বৃহৎ-বাঙ্গালপাশ)

১৪। উৎসাহ (১০ পুত্র) — বৎস

১৫। রঘু

১৬। নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭। বরদানন্দ (বরাই) (৫ পুত্র)

১৮। গোবিন্দ (২য় পুত্র) (সম্ভবতঃ বেণীপুর-নিবাসী)

১৯। কমল মিশ্র (৬ পুত্র)

২০। রামনাথ (১ম পুত্র) (৩ পুত্র)

২১। সুন্দরাচার্য্য (২য় পুত্র) (৩ পুত্র)

২২। পরশুরাম রায় (২য় পুত্র) (৮ পুত্র)

২৩। শ্রীবল্লভ (৬ষ্ঠ পুত্র) (৮ পুত্র)

২৪। কৃষ্ণচন্দ্র (৭ম পুত্র) (৩ পুত্র) (রামাকুল-কৃষ্ণনগরে আগত, তদন্তর্গত রাধানগর-নিবাসী)

২৫। ব্রজবিনোদ (৭ পুত্র)

২৫। ব্রজবিনোদ [৭ পুত্র]

২৬। নিমানন্দ (৬ পুত্র), ২৬। রামকিশোর (৫ পুত্র) ২৬। রামকান্ত

২৭। গুরুপ্রসাদ [৫ম, গৌরাঙ্গপুর] ২৭। নবকিশোর (২য় পুত্র) ২৭। জগমোহন (লাঙ্গুড়পাড়া) ২৭। রামমোহন (রঘুনাথপুর) ২৭। রামলোচন (রাধানগর)

২৮। ত্রিলোচন ২৮। যাদবচন্দ্র, ২৮। শ্রীনাথ ২৮। গোবিন্দপ্রসাদ

২৮ রাধাপ্রসাদ ২৮ রমাপ্রসাদ

২৯। গোপীনাথ চন্দ্রজ্যোতিঃ (কন্যা)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ (এই প্রবন্ধ-লেখক)

ললিতমোহন চট্ট কিশোরীমোহন নন্দমোহন চট্ট

দ্বিতীয় বিষয়।—নব্যভারতের পাঠকদিগকে রাজা রামমোহনের জন্মাব্দ, জন্ম-মাস-সম্বন্ধে অজ্ঞ বা অন্ধীভূত অবস্থায় রাখা অনুচিত। সুপ্রসিদ্ধ বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত সি-এস মহাশয়ের নব-প্রকাশিত ইংরেজী ভাষায় লিখিত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের দ্বিতীয় সংস্করণেও আমাদের প্রদর্শিত ভ্রম শোধিত হয় নাই (৮)। ইহা ক্ষোভের বিষয়। 'জন্মভূমি' পত্রে ইহার বিশেষ বিচার হইয়াছে। তিনটি মত, এতৎসম্পর্কে প্রচলিত ছিল,—

১। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ।

২। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ।

৩। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

১১৭৯ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তাঁহার উদ্ভব হয়। বিগত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা রমাপ্রসাদ বাবুর পত্নীর নিকট রামমোহন রায়ের কোষ্ঠীর অনুসন্ধান করি। যে বৎসর অশ্বিন মাসে তল্লাস করি, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ভাদ্র মাসে (৯) উহা গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

রাজার জন্মাব্দ-ঘটনা, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারির ইণ্ডিয়ান্ মিরারে পাদরি ডল্ সাহেব নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পাদরি ম্যাক্ডোনাল্ড সাহেব, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রচার করেন, ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল; অতএব বর্ত্তমান বর্ষে (১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে) রামমোহনের জন্মের শতাব্দী অতীত হইল। ডল্ সাহেব, এত কাল উহা প্রচার করিবার অবসর পান নাই। তিনি যে সুযোগ, অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সে সুযোগ, ম্যাক্ডোনাল্ডের ঐ লেখা।

তৃতীয় বিষয়—রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা হস্তাক্ষর। তাঁহার ইংরেজী হস্তাক্ষর সক-

(৮) পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবে", বাবু কালীময় ঘটক "চরিতাষ্টক" প্রথম ভাগে, বাবু দ্বারকনাথ বসুর সঙ্কলিত "জীবনীকোষ" প্রভৃতিতে রামমোহনের জন্মাব্দ ভুল হইয়াছে।

(৯) বাঙ্গালী পুরাতন কাগজে লিখিত দলিল-দস্তাবেজ, ভাদ্র মাসে রৌদ্রে দেওয়ার পদ্ধতি এ প্রদেশে রহিয়াছে। তদনুসারে দলিলের সঙ্গে ঐ কোষ্ঠীখানিও প্রতি বর্ষ সূর্য্যোত্তাপ লাগাইতে রৌদ্রে দেওয়া হইত। ঐ বৎসর ভাদ্রে রৌদ্রে দেওয়ার সময়েই উহা গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয়।

এই মর্ম্মবিদারণ ঘটনার পর অস্মৎ-প্রদেশীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের গৃহে রামমোহন রায়ের কোষ্ঠীর রাশি-চক্র অন্বেষণ করিয়াছিলাম। সেখানে উহার অস্তিত্ব ছিল। এই মাত্র সন্ধান পাইলাম যে, ঝটিকা বার বার হওয়ায় উহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। জন্মদিন-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে সুতরাং হতাশ হইলাম। এতদর্থে আমাদের অনুসন্ধিৎসার ও শ্রমের অগত্যা এই খানেই সমাপ্তি হইল।

লেই না হউন, অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। তাহা মুদ্রিতও হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার বাঙ্গালা হস্তাক্ষর প্রকাশ করিতে পারেন নাই। প্রকাশ করা তো দূরের কথা। অল্প লোকের ভাগ্যেই তাঁহার হস্তলিপি দেখা ঘটিয়াছে। "শ্রীসহী" এই অংশটুকু দেবনাগর অক্ষরে তিনি লিখিতেন। সুপ্রাচীন-সময়েও রামমোহন, সংস্কৃত বা হিন্দী ভাষার বর্ণমালার লিখনে অভ্যস্ত ছিলেন, তাহার সুব্যক্ত নিদর্শন আমরা দেখিতেছি। তাঁহার হস্তাক্ষর মুদ্রিত করিয়া দিলাম। একটী নয়, তাঁহার হস্তাক্ষর আমরা বহুক্লেশে ৬ ছয়টী সংগ্রহ করিয়াছি। তন্মধ্যে তিনটীর পরিচয় ও বৃত্তান্ত মাত্র এস্থলে পাঠকের নেত্র-পথের পথিক হইবে। ঐ সকলের ভাষার জন্য রামমোহনের কৃতিত্ব বা দায়িত্ব নাই। তাঁহার কর্ম্মচারীদের মূর্ত্তিমতী ভাষাদেবী এখানে সুশোভমানা। এই সূত্রে তৎকালে বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা—বিশেষতঃ জমিদারি-সেরেস্তার কেতা ও কায়দার পরিচয়, পাঠকগণ বিদিত হইয়া কৌতুক ও কৌতূহল যুগপৎ অনুভব করিতে থাকুন। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, তিনি সু-ভূম্যধিকারীই ছিলেন; কিন্তু উৎপীড়ন বা অত্যাচার যে তাঁহার ছিল না, তাহাও প্রমাণিত হইতেছে।

যে লিপিগুলি প্রদর্শিত হইতেছে, সেগুলি জরা-জীর্ণ—কীট দষ্ট। অতএব তাহাদের সাত্ত্বিকতায় কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। যদি কাহারও আমাদের উক্তিকে সংশয়াপন্ন জ্ঞান হয়, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক নব্যভারত-সম্পাদক মহাশয় অথবা আমাদের নিকট সমাগত হইয়া হইয়া মূল বস্তু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যেন তৃপ্তিলাভ করিতে কুণ্ঠিত না হন।

"শ্রীশ্রীহরি।

সন ১২০২।

১। "মৌজে সাহানপুরের কটকিনার মোকর্দ্দম কর্ম্মচারী সুচরিতয়ো লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে। রাধানগরের শ্রীনবকিশোর রায়ের জমাই জমী জে আছে ফষল আটক রাখিয়াছ জানাইলেন। খাজনা লইয়া ফষল ছাড়িয়া দিবে। ইতি। সন ১২০২ সাল তারিক ১২ চৈত্রী।"

"শ্রীশ্রীরাম।

সন ১২০৫।

সং ভুরসিটু।

শ্রীরামমোহন রায়।
"এ বিশয়ে তাঁহাকে
জানিবে" (১০)।

২। "সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীঅভয়চরণ দত্ত সুচরিতেষু।

লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে শ্রীযুত মধ্যম জেঠা মহাশয় এখান হইতে ফষলছাড়ি চিঠি লইয়া যাইতেছেন। মাফিক চিঠি ফষল ছাড়িয়া দিবে। ইহাতে কোন ওজর না আইসে। ইতি। সন ১২০৫ সাল তাং ১৯ ফাল্গুন।"

যে গ্রামের জমি খালাস দেওয়া হয়, পর পৃষ্ঠায় তাহার তালিকা এইরূপ আছে,—

"মহল জায়—

কাবিলপুরে	১
কেদারপুরে	১
ধামলা	১
চিঙ্গড়াদীং	১

৪ চারি মহল"।

(১০) এটুকু রাজা রামমোহনের হস্ত-লিখিত নয়। ইহার দুই কারণ। প্রথম কারণ "বিশয়ে" শব্দে বানান ভুল। দ্বিতীয় কারণ, নাম-স্বাক্ষরের লেখায় ও এই অংশের লেখায় বিলক্ষণ পার্থক্য।

"শ্রীশ্রীহরি।
সন ১২০৪।
পং ভুরস্থট।

৩। "মৌজে কাবিলপুরদিগরের কটকিনার মোকর্দ্দম ও কর্ম্মচারী সুচরিতয়ো। লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে। সাং রাধানগরের শ্রীরামকিশোর রায় ও শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র রায়দিগর ইহাদের শ্রীশ্রী৺ সেবার দেবত্তর ও ব্রহ্মত্তর জমি নিজ দরুণ ও শরিদকী দরুণ মৌজে হায়ে যে আছে বাজে জমির সরওয়া মতে হজুর ইস্তাহারের হুকুম মাফিক গুজস্তা পয়স্তা ভোগ প্রমাণ এ সকল জমির ফসল বৃত্তিভোগীর জিম্মা করিয়া দিবে। জলখরচাদিগর বেমামুল তলব না করিবে। ইতি তাং ১২ই ফাল্গুন।

জায় মৌজা

		জের—	১১	রায়বাড়	১
কাবিলপুর	১	খড়িগেড়া	১	আটঘরা	১
কেদারপুর	১	জুগীকুণ্ডু	১	সুদামচক	১
ধাওলা	১	সোলা	১	অযোধ্যা	১
শ্রীরামপুর	১	আগুা	১	কলাহার	১
কাট্যাদল	১				
চক ...	(*)	... ...	(*)		২৩
দীঘচক	১	রঞ্জিতবাটী		তেইশ মৌজা ইতি।"	
চকজয়রাম	১	জগীকুণ্ডু	১		
গৌরাঙ্গপুর	১	বাসুচক			
চিঙ্গড়া দীং	১	দং খরিদকি	১		
লাউসর	১	মড়াখালি	১		

এই ক্ষেত্রে একাধিক লিপি—তিন খানি জমিদারি ছাড়্ চিঠি উদ্ধৃত করিয়াছি। ১২০২ সাল, ১২০৪ সাল ও ১২০৫ সালের রামমোহন রায়ের হস্তাক্ষর উহাতে রহিয়াছে।

প্রথম খানিতে নবকিশোর রায়ের নাম আছে। তিনিই রামমোহন রায় মহোদয়ের জেঠতুতো ভাই। তিনি রামমোহনের বয়োজ্যেষ্ঠও বটেন। এই লিপি-খানির বয়ঃক্রম অধুনা শতাধিক বর্ষ। এখন ১৩০৩ সাল চলিতেছে। উহা ১২০২ সালের; সুতরাং উহার বয়স ১০২ বৎসর হইয়াছে।

তৃতীয় লিপিতে রামকিশোর ও কীর্ত্তিচন্দ্র রায় এই দুই জনের নাম ও প্রসঙ্গ বিদ্যমান।

(*) এ স্থলটী খণ্ডিত—পোকায় কাটিয়া দিয়াছে।

প্রথম ব্যক্তি, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত। দ্বিতীয় ব্যক্তি, এই জ্যেষ্ঠতাতেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই লিপিতে দেখা গেল, যে ২৩ তেইশ খানি গ্রামের ভূমি, রামমোহনের কর্ম্মচারীরা আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই ২৩ তেইশ খানি হইতেই আবেদন-কারি-দ্বয় অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, ইতি-পূর্ব্বোল্লিখিত নবকিশোর রায়, এই রামকিশোর রায়ের মধ্যম তনয়।

দ্বিতীয় লিপি খানি, জমিদার-সুলভ ভাষায় লিখিত নয়। কারণ, এখানে "মধ্যম জেঠা মহাশয়" বলিয়া নির্দ্দেশ দৃষ্ট হইতেছে। "মধ্যম জেঠা" রামকিশোর রায় মহাশয় কি না, পাঠকগণ, বংশ-তালিকা তজ্জন্য দেখুন। এ-খানিতে ৪ চারি খানি গ্রামের জমির কথা আছে। এখানে তাঁহার এক কর্ম্মচারীর নামও অবগত হওয়া গেল। তাঁহার নাম "শ্রীঅভয়চরণ দত্ত"।

এই সকল লিপিতে বর্ণাশুদ্ধি যথাবৎ রাখিয়া দেওয়া গিয়াছে।

আগামী বারে অন্যান্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও অলোচিত হইবে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

ভারত, মিসর ও খ্রীষ্টধর্ম্ম। (৪)

ইতিহাস-রসিক ইংরাজগণ ভারতে আসিয়া এখানকার প্রত্নতত্ত্ব সমুদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতের স্থানে স্থানে যে সকল বৌদ্ধ-কীর্ত্তি বিদ্যমান ছিল, তৎপ্রতি তাহাদের দৃষ্টি কাজেই আকৃষ্ট হইল। অশোকের শাসন সমুদায় একে একে সমুদ্ধৃত এবং তাহাদের অর্থ সংগৃহীত হইলে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় ইতিহাসে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা ইতিহাসে যে আলোকপাত হইয়াছে, সেই আলোকে এখন দেখা যাইতেছে যে, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারে খ্রীষ্টধর্ম্ম-অভ্যুদয়ের অনেকাংশে সহায়তা হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে ইউরোপে যখন ফাইলোর দার্শনিক মতামতের আলোচনা হইয়াছিল, তখন এক প্রকার স্থিরীকৃত হয় যে, ফাইলো-প্রচারিত ঐশ্বরিক ত্রিবৃৎতত্ত্ব হইতে যীশুর ত্রিবৃৎতত্ত্ব গৃহীত। এই সিদ্ধান্ত শুনিবা মাত্র যীশুর অবতারবাদী খ্রীষ্টানেরা একবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তাঁহারা রাগে বলিয়া উঠিলেন, কি, এলেকস্যাণ্ড্রিয়ান স্কুলই যীশুর ত্রিবাদ হইতে নিজ মত সংগ্রহ করিয়াছেন। কথাটা ফেরত দিয়া তাহারা নিরস্ত হইলেন। লুইস বলিতেছেন :—

"Some maintain that the Trinity of the Christians was but an imitation of that of the Alexandrians; others accuse the Alexandrians of being the imitators. The dispute has been angrily conducted on both sides".

এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্মালোচনায় জানা যাইতেছে যে, বৌদ্ধধর্ম্মেও তদ্রূপ ত্রিবৃৎতত্ত্ব বিদ্যমান আছে। সুতরাং থ্যারাপিউটগণ মিসরে যে এই মত প্রচার না করিয়াছে, এমত নহে। Arthut Lillie বৌদ্ধ ত্রিবাদের সহিত খ্রীষ্টীয় ত্রিবাদের সৌসাদৃশ্য দেখাইয়া স্বীকার করিলেন যে, খ্রীষ্টীয় ত্রিবাদ অবশ্য বৌদ্ধ ত্রিবাদ হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বে লোকে বলিয়াছিল, তাহা ফাইলো হইতে সংগৃহীত। বৌদ্ধমত তখন যদি জানা থাকিত এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকেরা যে মিসরেও গিয়া নিজ ধর্ম্মমত সকল প্রচার করিয়াছিলেন, একথাও যদি বিদিত থাকিত, তাহা হইলে

খ্রীষ্টানেরা এত নির্ভয়ে অপরাধটা ফিরাইয়া দিতে সাহসী হইতেন না। বৌদ্ধ ত্রিবাদ কি, তাহা আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে ব্যক্ত করিয়াছি, এক্ষণে ফাইলোর ত্রিবাদ লুইসের কথায় বলিতেছি :—

"There is first God the Father; secondly the Son of God, *i.e.* the Logos; thirdly the Son of the Logos, *i.e.* the World."

তবেই ফাইলো বলিতেছেন, পরমেশ্বরই সকলের আদি; তাঁহা হইতেই সমস্ত ভূত প্রসূত হইয়াছে। সুতরাং তিনি একমাত্র জগতের কারণ এবং সর্ব্বজীবের পিতৃস্বরূপ। পিতৃপ্রেমে সর্ব্বজীবের শুধু বিধাতা নহেন, তাহাদের পালনকর্ত্তাও তিনি। সর্ব্বজীব তাঁহার পিতৃ-অঙ্কে অবস্থিত। সেই এক মাত্র সৎ হইতে যাহা উৎপন্ন,—তাহা চিৎThought,--Word Logos—জ্ঞান, জ্ঞানময় শব্দ। এই জ্ঞানময় সৎ হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া তাহা সতেরই পুত্রস্বরূপ এবং ঐ শব্দই ব্রহ্ম-প্রকাশক আপ্তবাক্য। খ্রীষ্টানেরা বলেন, যীশু এই পুত্রস্বরূপ আপ্তবাক্য। ফাইলো বলেন, সেই সূক্ষ্ম চৈতন্য-স্বরূপের স্থূলদেহ এই অনন্ত প্রকৃতি—প্রধানা—বা, জগৎ। তাই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে :—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।—তৈঃ আঃ প্র ৮।অং ১ম।

প্রাচীন মিসর-ধর্ম্মালোচনায়ও জানা যায় যে, সেই ধর্ম্মেও ত্রিবাদ বিদ্যমান ছিল। উচ্চ মিসরীয় ধর্ম্মান্তর্গত থিবের ত্রিবাদ এই :—

First—Amun-Ra, the hidden Creator.
Second—His Consort Mat, the Mother.
Third—Chonsu, his Son.

"আমনরা" বা অব্যক্ত আদি কারণই এই জগতের পিতৃস্বরূপ। তাঁহারই জায়া জগৎ জননী "মাত"। এই পুরুষ প্রকৃতি হইতেই অনন্তদেব "চনসু" সমুৎপন্ন।

থিবের বিখ্যাত ত্রিবাদ এই। সিলসিলিস (Silsilis) নামক স্থানে এই ত্রিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রহ্মের এই পিতৃভাব, মাতৃভাব ও পুত্রত্ব শুধু যে উক্ত মিসর-ধর্ম্মান্তর্গত ছিল, এমত নহে, তাহা গ্রীক ত্রিবাদেও বিদ্যমান ছিল। গ্রীক ত্রিবাদ এই :—

"High above all the other Gods stands Zeus, whose power is unlimited, who is not bound by any recognised restraint, and is alone not subject to the will of the majority. * * * Most closely connected with him are Athena and Apollo, who constitute with him a supreme triad."—Dr. C. P. Tiele.

"গ্রীকদিগের সর্ব্ব প্রধান দেবতাই Zeus. অসীম তাঁহার শক্তি—যে শক্তি অবিরোধী ও অননুশাসনীয় এবং তিনিই কেবল অপরাপর দেবতার অধীন নহেন। তাঁহারই সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ Athena এবং Apollo দেবতা। এই ত্রিদেবই গ্রীকদিগের ত্রিবৃৎতত্ত্ব।

এথিনা এবং এপলো কে, তাহা মহোদয় টীল বুঝাইতেছেন :—

"Athena is the personified Metis, the "Reason" the wisdom of the Divine Father. Apollo, no less beloved of Zeus is his mouth, the revealer of his counsel, the Son, who, ever and in all things, is of one will with Him."

এথিনাই সাক্ষাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব (Metis) বা পরম পিতার চৈতন্য ও জ্ঞান-স্বরূপ; তদ্রূপ তদায় এপলো Zeus এর আত্মজ, তাঁহার মুখ এবং বাণী স্বরূপ।

ডেলফায়ের (Delphi) বিখ্যাত মন্দিরে এই এপলোর বাণী প্রচারিত হইত। এই বাণী শুনিবার জন্য কত লোক মন্দিরে আসিয়া হত্যা দিত। ফাইলোর ত্রিবৃৎতত্ত্বে যাহা পরম পিতার আত্মজ রূপে উক্ত হইয়া দ্বিতীয় তত্ত্ব হইয়াছে, সেই তত্ত্বের সহিত এপলোর সাদৃশ্য কেমন ঘনিষ্ট দেখুন। এই এপলো-দেব সম্বন্ধে টীল মহোদয় আর যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"Then it was that the knightly people of the Lycians, kinsmen of the Greeks,

and their fore-runners in civilisation, wrought out the noble figure of Apollo, the God of light, the son and prophet of the most high Zeus, Saviour, Purifier and Redeemer, whose cultus lifted high above all nature-worship, spread thence over all the lands of Greece, and exerted on the religious, moral and social life of their inhabitants so profound and salutary an influence.

"গ্রীকশোণিত যাহাদের শিরায় প্রবাহিত হইত, যাহারা গ্রীকদিগের শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত করেন, লিলিয়ার সেই বীরপুত্রগণও সেইকালে এপলোদেবের সৌম্য-মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন—যে এপলো জ্যোতিঃ স্বরূপ, দেব দেব পরমদেব জিয়সের আত্মজ ও বাণীস্বরূপ, যিনি মুক্তি শুদ্ধিদাতা, পতিত-পাবন এবং যাঁহার দেবশক্তি প্রাকৃতিক শক্তি অপেক্ষা প্রভূত প্রভাবশালিনীরূপে অনুভূত হইয়া গ্রীশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল; এমত কি, গ্রীশদেশবাসিগণের সামাজিক, নৈতিক ধর্ম্ম্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ অভ্যুদয়ে সেই শক্তির প্রভাব পরিদৃষ্ট হইয়াছিল।"

তবেই দেখা যাইতেছে যে, গ্রীকদিগের এই এপলো দেব শুদ্ধ যে দেবদেব পরমদেব জিয়সের আত্মজ ও বাণীস্বরূপ ছিলেন এমত নহে, তিনি মুক্তি, শুদ্ধিদাতা পতিত-পাবন ছিলেন। তাঁহার পূজা দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার পবিত্র দেবভাব কোথায় না অনুভূত হইত? সেই দেবভাব গ্রীশের সীমান্ত দেশে, ফিনিসিয়া, লিডিয়া, সমস্ত গ্রীকদ্বীপে এবং তাহারও অতীত অনেক দূরদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। গ্রীশ অতিক্রম করিয়া জুডিয়া এবং সিরিয়াতেও তাহা গিয়াছিল। কারণ, তৎকালে গ্রীশের সহিত অনেক দেশ বিদেশ বাণিজ্য এবং গ্রীকবিদ্যা-শিক্ষা সূত্রে আবদ্ধ ছিল। গ্রীশের বড় বড় পণ্ডিত ও কবিগণ, হিসিয়ড (Hesiod) শোলন"(Solon) পাইথাগোরস (Pythagorus) এবং পীণ্ডার (Pindar) ডেলফায়ের এপলো 'দেবের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এসকাইলস্, সফোক্লিশ এবং ফিডিয়াসের নাটকাবলীতেও সেই দেব-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে।

ত্যাগধর্ম্ম এবং বলিদানে সক্রেটিসের বড় আনন্দ ছিল। পিতৃধর্ম্ম এবং ডেলফায়ের দৈববাণীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি অনুভূত হইত। এপলোদেবের পূজার তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। যে দেববাণী এপলোর মন্দিরে তিনি শুনিতেন, সেই দেববাণী এক এক সময়ে তাঁহার নিজ অন্তর হইতে সমুত্থিত হইত। যে অন্তরাত্মা হইতে এইরূপ দৈববাণী সমুত্থিত হইত, সেই অন্তরাত্মা তাঁহার নিকট দেবতা ছিল—ভক্তির দেবতা। সেই সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো। প্লেটো ভক্তির সহিত প্রেম মিশাইয়া ভগবানের পূজায় অনুরক্ত হইলেন। প্লেটোর অন্তরে ভগবান এই ত্রিবিধ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিলেন—সত্যং, শিবং, সুন্দরং। প্লেটোর সুন্দর কি?

"Beauty is the most vivid image of Truth, it is Divinity in its perceptible form."--Lewes.

"সুন্দরই সত্যের উজ্জ্বল প্রতিমা—এইরূপে পরম পুরুষ মানবের জ্ঞানগোচর হন।"

তবেই প্লেটোর মতে সুন্দরই পুরুষোত্তমের বাহ্যরূপ ও বিভূতি।—তাই যদি হয়, তবে শিব কি?

"The Good is God. Truth, Beauty, Justice are all aspects of the Deity;—Goodness in his nature. The Good is therefore incapable of being perceived; it can only be known in Reflection".--*Lewes.*

"ব্রহ্মই—শিবম্। সত্যং, শিবং, সুন্দরং—এ সমস্তই এক ব্রহ্মেরই রূপ—সমস্তই শিবময় ভগবান। ভগবানের শিবময় রূপ সামান্য জ্ঞানগোচর নহে—তাহা কেবল ধ্যানে অনুভূত হয়।"

বাস্তবিক, বাহ্যসৌন্দর্য্যে আমরা ভগবানের মূর্ত্তি দেখিতে পাই, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বিষয় ত কেবল শিবময় নহে; সকল বিষয়ই কিয়দংশে শিবময় কিয়দংশে অশিবময়।

তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে ভগবানের মূর্ত্তি কই? প্লেটো বলিলেন, যদি ভগবানকে দেখিতে চাও, তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে অমঙ্গলকে অপসারিত কর। কিরূপে করিবে? ধ্যানে করিবে। কেবল সমাহিত চিত্তে তুমি ভগবানের অনুধ্যান করিলে তাঁহার মঙ্গলময় মূর্ত্তি অনুভব করিতে পারিবে। সেই মূর্ত্তিতে তিনি পরম পবিত্র স্বরূপ, অপাপবিদ্ধ, শিবময় মহাদেব। তবে প্লেটো ভগবানে এই ত্রিবৃৎতত্ত্ব দেখিতে পাইলেন।

"Truth, Beauty, Justice are all aspects of the Deity".

তিনি সত্যস্বরূপ আদিদেব; পরম পবিত্র শিবরূপ সত্যের সূক্ষ্ম প্রতিমা, এবং সুন্দর রূপ তাঁহার ধর্ম্মনৈতিক ও স্থূল জগৎ প্রতিমা।

প্লেটোর শিষ্য ফাইলো এ মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফাইলো এই খানেই থামেন নাই। লুইস বলেন:—

"There are two great facts in connection with the Alexandrian School: *First*, the union of Platonism with oriental Mysticism; *Second*, the entire new direction given to philosophy by uniting it once more with Religion."

"এলেক্‌জ্যাণ্ড্রিয়ান স্কুলের দুইটী বিশেষ ধর্ম্ম এই —প্রথমতঃ এই সম্প্রদায়েরা প্লেটোর দার্শনিক মতামতের সহিত প্রাচ্য যোগোপলব্ধ তত্ত্ব সকল মিশাইয়া এক নূতন সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ তাহারা দর্শনের সহিত ধর্ম্মের সম্মিলন সাধন করিয়াছিল।"

প্লেটোর যাহা দার্শনিক তত্ত্ব, ফাইলো তাহাতে যোগোপলব্ধ সামগ্রী দিয়া ধর্ম্মে পরিণত করিলেন।

প্লেটোর সত্যস্বরূপ আদিদেব আদিকারণ রূপে পিতৃস্বরূপ; শিবরূপ সত্যের সূক্ষ্ম প্রতিমা কেবল ধ্যানে অনুভূত বলিয়া ভগবানের সেই মূর্ত্তি জ্ঞান ও চৈতন্যস্বরূপ। সত্যস্বরূপের মূর্ত্তিভেদ রূপে চৈতন্যস্বরূপ পরম পিতৃদেবের পুত্র এবং এই চৈতন্যরূপে তিনি ধ্যানে ভগবানের মুখস্বরূপ ও বাণী। এই চৈতন্যরূপে তিনি মানবের বেদবাণী—আপ্তবাক্য। সক্রেটিস তাঁহার এই দেববাণী শুনিতেন—সমাহিত চিত্তে একাগ্রতার সহিত শুনিতে পাইতেন। এই চৈতন্য-রূপিণী পরমাসুন্দরী। ধর্ম্মনৈতিক জগতের সকল সৌন্দর্য্য জ্ঞানময়ে অনুভূত হয়। সেই সুন্দর জ্ঞানময় স্থূলরূপে বাহ্যজগতে পরিদৃশ্যমান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই চৈতন্যময়ী প্রকৃতি দেবীর রূপ। দার্শনিক সাংখ্যতত্ত্ব যেরূপে পৌরাণিকেরা পুষ্পোপকরণে গড়িয়া আনিয়াছেন, ফাইলো সেইরূপ গড়িয়া আনিলেন। সত্যস্বরূপ পুরুষ আদিকারণ পরম পিতা,—সূক্ষ্ম, চৈতন্যময়ী প্রকৃতি—যিনি কেবল ধ্যানে অনুভূত, সেই সূক্ষ্ম প্রকৃতি অনন্তরূপে মহৎ তত্ত্ব,বুদ্ধি ও প্রধানা প্রকৃতি। এই মহৎ তত্ত্ব, প্রধানা, অনন্তপ্রকৃতি অহঙ্কার-ভূষিত বিশেষ রূপ ধারণ করিয়া পরিদৃশ্যমান জগৎরূপে প্রতীয়মানা। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রহস্য এই সাংখ্যতত্ত্বে নিহিত।

ফাইলো আলেকজ্যাণ্ড্রিয়ায় গিয়া বৌদ্ধগণের নিকট এই সাংখ্যযোগতত্ত্ব লাভ করিলেন। প্লেটোর ত্রিবাদকে তদনুসারে গড়িয়া আনিলেন। তখন ফাইলোর ত্রিবাদ এইরূপে পরিণত হইল;—

"We can, however, have some knowledge of God in the Word which is the Interpreter between God and man. The word is God's thought. This thought is two-fold—Thought embracing all Ideas, and thought as thought, and it is the thought realized—thought become the world." —*Lewes.*

সত্যস্বরূপ অজ্ঞেয় হইলেও আপ্তবাক্য তাঁহার কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছে। • আপ্তবাক্যই একমাত্র পরমপুরুষকে মানবের নিকট প্রকাশ করে। বাস্তবিক এই বাক্য জ্ঞানময়। চৈতন্যস্বরূপ ভগবানের বাক্য সিদ্ধগণের

অন্তরে শ্রুত হয়। তাহাই মহাশব্দ, মহাবাক্য। সেই চৈতন্যস্বরূপ ভগবানের দুইরূপ। একরূপে তিনি কেবল সূক্ষ্ম চৈতন্যময়—ধ্যানে অনুভূত। প্লেটো এইরূপকে Idea বলিয়াছেন। তাঁহার অন্য চৈতন্যরূপ চিন্তাময়। চৈতন্যরূপ চিন্তামণি ব্যক্তরূপে পরিণত হন। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সেই চৈতন্যরূপের ব্যক্তরূপ—চিন্তামণি স্থূলরূপে ব্যক্ত।

সক্রেটিস যে এপলোদেবকে এত ভক্তি সহকারে দেখিতেন, বলা বাহুল্য, সেই পূজার্হ এপলোদেব আবার কাইলোর অন্তরে দেখা দিলেন। সেই এপলোদেব সত্যস্বরূপ পরম পুরুষের বাণী (Oracle) পুত্র। যিনি পরম পবিত্র হইয়া এপেলোদেবের নিকট যান, তিনিই কেবল এপলোর দৈববাণী শুনিতে পান। নহিলে পাপমলিন হৃদয়ে এপলোদেবের নিকটবর্ত্তীও হইবার যে ছিল না। কেবল শুদ্ধচিত্তই সমাহিত হইলে এপলোদেবের বাণী শ্রুত হয়। এইজন্য এপলোদেব পতিতপাবন, মুক্তি ও শুদ্ধিদাতা। ইতিহাসবেত্তা কি বলিতেছেন, দেখুনঃ—

"For him who approached with a pure heart, a single drop of the consecrated water of the well of Castalia sufficed; but he who came with an impure mind could not wash away with a whole ocean the pollution of his sin".—*Tiele.*

"যিনি শুদ্ধচিত্তে, নির্ম্মল ও নিষ্পাপ হৃদয়ে তাঁহাকে পূজা করিতে যাইতেন, তাঁহার পক্ষে পবিত্র ক্যাষ্টিলিয়া বাপীর এক ফোঁটা বারিই যথেষ্ট। কিন্তু যাহার হৃদয় অপবিত্রও পাপ মলিন, সমস্ত সমুদ্র বারির স্নানে তাহাকে পরিশুদ্ধ ও নিষ্পাপ করিতে পারে না।"

পাপমলিন হৃদয়ে এপলোর পূজা করিতে গেলে পরকালে তাঁহাকে দণ্ডার্হ হইতে হইত।

এ সকল স্থূল কথা; সূক্ষ্ম কথা আভ্যন্তরিক পবিত্রতা। এই স্থূলকথা আমাদের কাশীধামেও দৃষ্ট হয়। যিনি নিষ্পাপ, জ্ঞানবাপীর এক ফোঁটা জল তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি সেই শুদ্ধচিত্তে ও ভক্তিসহকারে যদি কাশীনাথকে দেখেন, তবে তিনি শিবময় ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। নহিলে সমস্ত গঙ্গাজলে পাপীকে পরিশুদ্ধ করিতে পারে না।

এপলোদেবের ভগিনী এথিনী (Athene) কে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। তিনি কেবল সূক্ষ্ম চৈতন্যময়ী অনন্ত প্রকৃতি।

ভগবানের এই পিতাপুত্র-সম্বন্ধ জ্ঞাপক ত্রিবৃৎতত্ত্ব নিম্ন মিসরে অতি প্রাচীন কালে প্রচারিত ছিল। সেই তত্ত্বে জগতের আদি কারণ পরম পিতা Osiris-Ra তাঁহার জ্ঞানময় চৈতন্যতত্ত্বই দ্বিতীয় তত্ত্ব—যিনি সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধির দেবতা ছিলেন—তাঁহার নাম Thut. এই দেবতা চৈতন্যরূপা বাণী স্বরূপ। তৃতীয় তত্ত্ব পুত্ররূপ Horos. এই পুত্ররূপে Osiris-Ra দেখা দিতেন এবং সেই আত্মজেই পরমাত্মা বিদ্যমান থাকিতেন। পিতা পুত্র একই বস্তু। এই দেখুন, এই ত্রিবৃৎতত্ত্ব নিম্ন মিসরের পৌরাণিক ধর্ম্মে কিরূপে দেখা দিয়াছিল;—

"The triumph of life over death is rather the subject of the myth of Osiris, the chief God of the Empire, specially worshipped in Thinis-Abydos. Osiris slain by his brother Set—lamented by his wife and sister Isis and Nephthys—endowed by Thut, the God of Science and Literature with the power of the Word—is avenged by his son Horos, and, while himself reigning in the kingdom of the Dead, lives again in him on earth."—*Tiele.*

নিম্ন মিসরের ধর্ম্ম যখন ক্রমে ক্রমে উচ্চ মিসরে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং যখন মিসরদ্বয়ের মিলন হইয়াছিল, তখন থিবে এই ত্রিবৃৎ তত্ত্ব কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। তবেই

দেখা যাইতেছে, যীশুর ত্রিত্বতত্ত্ব কিছু নূতন বস্তু নহে। পরমেশ্বরের ত্রিবিধ মূর্ত্তি বৈদিক কাল হইতে প্রচারিত আছে। পুরাতন মিসরে সেই জ্ঞান বিদ্যমান ছিল; দেবার্চ্চনরত প্রাচীন গ্রীশে তাহা বিলক্ষণ পরিচিত ছিল। নানাসূত্রে তাহা ফাইলোর জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। ফাইলো যীশুর পূর্ব্বে নিজ মত প্রচার করিয়াছিলেন। ফাইলোর মত জুডিয়ায় অপ্রচারিত ছিল না; তাহা সেই সূত্রে যীশুর কর্ণগোচর হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, ফাইলো হইতে যীশুর ত্রিবাদ সমুত্থিত হইয়াছে। এ বিষয় আর একরূপেও প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

যীশুর ত্রিবাদ তত্ত্ব খ্রীষ্টজগতে আর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ফাইলোর ত্রিবাদে যে জ্ঞান নিহিত ছিল, যাহা প্রাচীন কাল হইতে ধারাবাহিক ক্রমে এলেক্স্যাণ্ড্রিয়ান স্কুলে উদিত হইয়াছিল, তাহা এমত সজীব জ্ঞান তত্ত্ব ছিল যে, ক্রমশঃই তাহা আলোচিত হইয়া আরও অধিক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

"Plotinus said, that although Dialectics raises us to some conviction of the Existence of God, we can not speak of his nature otherwise than *negatively*. We are forced to admit his existence. To say that he is superior to Existence and Thought is not to define him; it is only to distinguish him from what he is not. What he is, we can not know; it would be ridiculous to endeavour to *comprehend* him. The unity which is absolute, immutable, infinite and self-sufficing, hence Perfect, is not the numerical unit, not the indivisible point. It is the absolute universal One in its perfect simplicity. It is the highest degree of Perfection, the ideal Beauty, the supreme Good. God, therefore, in his absolute state, in his first and highest hypostasis, is neither Existence nor Thought, neither moved nor mutable: He is simple unity or as Hegel would say the Absolute Nothing, the immanent Negative."—*Lewes.*

প্লোটাইনস বলিয়াছিলেন যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ জানা মনুষ্যের জ্ঞানাতীত। সসীম চিন্তা ও অনুধ্যানে তাঁহার কিয়দাভাস লাভ করা যায় বটে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইলে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে তিনি "নেতি"। তিনি ইহা নয়, উহা নয়, এ বস্তু নয় ও বস্তু নয়, নয় নয় শব্দ মাত্রে তাঁহাকে ব্যক্ত করা যায় মাত্র। তাঁহার সত্তা আমরা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। কারণ, অস্তিত্বের অস্বীকার ও তাঁহার অস্বীকার সমান হইয়া দাঁড়ায়। যখন তাঁহাকে অস্তিত্ব ও জ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিলে, তখন তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ দিলে না, তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিলে না; কেবল তিনি যাহা নহেন, সেই অবস্তু হইতে তাঁহাকে পৃথক করিয়া ব্যাখ্যা করিলে মাত্র। বাস্তবিক তিনি যে কি, তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। তাঁহাকে সম্যক্ বুঝিবার জন্য প্রয়াস করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যাহা সৎ অপরিচ্ছিন্ন সত্য, যাহা অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য, অনন্ত এবং সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন বলিয়া পূর্ণ স্বরূপ, তাহা গণিতের সামান্য একত্ব নহে, তাহা জ্যামিতির আনুমানিক অপরিচ্ছিন্ন বিন্দুও নহে, তাহা শুদ্ধমাত্র ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী একমেবাদ্বিতীয়ং। তিনি পূর্ণ হইতে সম্পূর্ণ, সুন্দর হইতে সর্ব্বসুন্দর; শিবময় হইতে সদাশিবময়।

অতএব, মানুষী চিন্তাকে যত বিস্তৃত কর না কেন, তাহার উপরে তিনি অবস্থিত। সেই চিন্তাতীত অপরিচ্ছিন্ন পরম তত্ত্ব অস্তিত্ব নহেন, জ্ঞানও নহেন। তিনি চৈতন্য ও সত্তা হইতেও পৃথক। তিনি কেবল একমাত্র সৎ অথবা যেমন হিগেল বলিয়াছেন, তিনি অচিন্তনীয় অভাব মাত্র, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্লীন "নেতি"।

এই স্কুলের আর একজন পণ্ডিত, প্রোক্লস এই চিন্তাকে আরও প্রসারিত করিয়া বলি-

য়াছেন যে, সত্তা ও অস্তিত্ব বলিলেও তাহা মানুষী চিন্তার্গত হইল; কিন্তু তিনি অচিন্ত্য, অস্তিত্ব; তিনি অস্তিত্ব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পদার্থ। তাঁহাকে কিছু নয় বলা ঠিক নহে, বরং তাঁহাকে অস্তিত্বাতীত পদার্থ বল।

"He is the unconditioned unconditional Something or that which Proclus calls the Non-being although it is not correct to call it Nothing."—Lewes.

প্রোক্লস ব্রহ্মতত্ত্বকে আরও সূক্ষ্ম করিয়া বুঝাইলেন। মানবের যে সত্তাজ্ঞান হয়, সেই সত্তাজ্ঞানও কিয়দংশে চিন্তাধীন; সুতরাং সেই সত্তাজ্ঞানে ত্রিগুণময় জড়জ্ঞান বর্ত্তমান কিন্তু পরম পুরুষ সেরূপ সত্তাজ্ঞানেরও অতীত অতএব, তিনি পরম পুরুষজ্ঞান হইতে সত্তাজ্ঞানকে বিভিন্ন করিয়া বলিলেন, সেই পুরুষ Non-Being.—অস্তিত্বজ্ঞানাতীত বস্তু। সুতরাং প্রোক্লসের Non-Being যাহা, সাংখ্যের নির্গুণ, উদাসীন পুরুষও তাহা। সাংখ্য সেই সত্তাজ্ঞান হইতে পরমপুরুষকে প্রভিন্ন করিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি নির্গুণ, উদাসীন, সেই পুরুষজ্ঞানে সত্তাজ্ঞানের ত্রিগুণময় জড়ভাব নাই। ত্রিগুণময় সত্তাজ্ঞান মূল প্রকৃতিজ্ঞান। এই মূল প্রকৃতি শুদ্ধ সত্যস্বরূপ ও চিতের অধ্যাস পাইয়া অনন্ত প্রকৃতিকে পরিণত। প্রোক্লস বৌদ্ধধর্ম্মোপদিষ্ট সাংখ্যজ্ঞান অবলম্বন করিয়া সাংখ্যের নির্গুণ, উদাসীন পুরুষকে Non-Being বলিয়াছেন। প্লোটাইনস ব্রহ্মতত্ত্বকে যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, প্রোক্লস তাঁহাকে আরও বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন মাত্র। কারণ, প্লোটাইনস "নেতি নেতি" বলিয়া সেই ব্রহ্মতত্ত্বকে সত্তাজ্ঞান হইতেও পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সত্তা নন; তবে যদি তাঁহাকে সত্তা বল, সে সত্তা চৈতন্যময়। তিনি সৎ চিৎ। তিনি চিদ্রূপ সত্তা স্বরূপ।

প্লোটাইনস যখন এই নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইলেন, তখন তিনি যে ত্রিবাদের খ্যাপন করিলেন, তাহা ফাইলোর ত্রিবাদ হইতেও সূক্ষ্মতর। প্লোটাইনসের ত্রিবাদ এই:—

"God is triple and at the same time one. His nature contains within it three distinct Hypostases (substances *i.e.*, persons) and these three make one Being. The first is the Unity, not the Being at all, but simple Unity: The second is the Intelligence which is identical with Being. The third is the Universal Soul, the Cause all activity and life.

First—The absolute Unity.
Second—The first Intelligence.
Third—The Soul of the world.

পরমতত্ত্ব পরমপুরুষ ত্রিবিধ অথচ এক। তাঁহার স্বরূপ ত্রিবিধ দেবসত্ত্ব, সেই ত্রিবিধ দেবসত্ত্বায় তাহার একত্ব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ তিনি এক,—যাহাকে সত্তা বলা যায়, সেই সত্তা হইতে পৃথক হইয়া তিনি এক। দ্বিতীয়তঃ তিনি চৈতন্য স্বরূপ; এই চৈতন্যরূপে তিনি অস্তিত্ব স্বরূপ। তৃতীয়তঃ তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরমতত্ত্ব, পরমাত্মা—যে পরমাত্মা সকল চেতনের চেতন, সকল জীবনের জীবন।

প্লোটাইনসের ত্রিবাদ এইরূপ। ব্রহ্মতত্ত্বকে তিনি অচিন্ত্য জ্ঞান করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে লাভ করিবার তিনি উপায়ও বলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি অচিন্ত্য বলিয়া কি একেবারে মানবের অলভ্য? তাহা নহে, ব্রহ্মকে লাভ করিতে হইলে নিজে ব্রহ্মত্বলাভ করিতে হয়। বাহিরের পরমাত্মতত্ত্বের সহিত ভিতরের আত্মতত্ত্বকে একীভূত করিতে হয় এইরূপ একীভূত পরমজ্ঞানে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটে। প্লোটাইনসের এই কথা তৃতীয় প্রস্তাবে আলোচিত হইয়াছে।

প্লাটাইনসের ত্রিবাদ পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, তন্মধ্যে সৃষ্টি প্রকরণ নিহিত। নির্গুণ হইতে সগুণের সম্ভব এবং

সূক্ষ্ম সগুণেরই স্থূল ব্যক্ত ভাব এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আরও প্রতীত হইবে যে, এই সৃষ্টি প্রকরণ সাংখ্যের পরিণামবাদ এবং বেদান্তীয় বিবর্ত্তবাদ মাত্র।

The doctrine of Emanation.

বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংশ্রবে আসিয়া ফাইলো এবং তদ্‌পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ কেমন বৈদিক ব্রহ্মতত্ত্ব এবং সৃষ্টি প্রকরণের খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা বিবৃত করিলাম।

উপরে আমরা দ্বিবিধ যুক্তি দ্বারা দেখাইলাম যে, যীশুর ত্রিবাদ কেমন ধার করা জিনিষ। প্রথম যুক্তি এই, হয় ফাইলো হইতে যীশু তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, না হয়, যীশু হইতে ফাইলো তাহা লইয়াছিলেন। এই বিকল্পের মধ্যে প্রথম পক্ষই সম্ভবতঃ সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়। কারণ,ফাইলোর ত্রিবাদ তত্ত্ব জানিবার অনেক পন্থা ছিল, পৌরাণিক গ্রীকধর্ম্মে তাহা বিদ্যমান ছিল, এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচার সঙ্গে তাহা মিসরের বিদ্যালয়ে প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন মিসরের ত্রিবৃৎ তত্ত্ব জ্ঞান যে সেই বিদ্যালয় মধ্যে প্রবেশ করে নাই, এমত ও সম্ভাবিত নহে। এইরূপ নানা দেশ হইতে ফাইলোর মত গঠিত হইয়া থাকিবে। যীশুর উদয় হইবার পূর্ব্বে ফাইলোর মত সকল জুডিয়া মধ্যে প্রচার হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং যীশু সম্ভবত ফাইলো হইতেই সেই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় যুক্তি এই—ফাইলোর মত যেমন পূর্ব্ব ধর্ম্ম-প্রচারের ফল, সেই চিন্তা-স্রোত তেমনি পর পর চহিয়া গিয়াছিল, সেই খানেই নিবৃত্ত হয় নাই। ফাইলো যে সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, সেই সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী পণ্ডিত প্লোটাইনস এবং প্রোক্লস সেই চিন্তাস্রোতকে আরও বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাহাদের দার্শনিক মত কত উচ্চশিখরে উঠিয়াছিল, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। কিন্তু যে দেশে সে চিন্তা মূলেই ছিল না, সেই খ্রীষ্ট জগতে যীশূপদিষ্ট ত্রিবাদ আর বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই।

ফাইলো হইতে যে যীশু তাহার ত্রিবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা আমরা বলি নাই, বহুকাল পূর্ব্বে অনেক উদারচিত্ত সত্যসন্ধ খ্রীষ্টানগণই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীশে যে ত্রিবাদ প্রচারিত ছিল, তন্মধ্যে এপেলোদের লোকের শুদ্ধি,বুদ্ধি ও মুক্তিদাতা ছিলেন। চিত্তের মলিনতা থাকিলে এপলোদেবের পূজাধিকারী হইবার যো ছিল না। যীশুও জীবের শুদ্ধি ও মুক্তিদাতা। পবিত্র আত্মা (Holy ghost) ভগবান এবং যীশুর সহিত জীবের মিলন করিয়া দেন। বৌদ্ধ ত্রিবাদেও এই কথা। সুতরাং বৌদ্ধ ও গ্রীক ত্রিবাদের সহিত যীশুর ত্রিবাদের আরও ঘনিষ্ট সাদৃশ্য। কি বৌদ্ধ, কি গ্রীক, উভয় ত্রিবাদই যীশু জন্মিবার পূর্ব্বে প্রচারিত ছিল, এবং তাহা যীশুর কর্ণকুহরে প্রবেশ লাভ করিবারও অনেক সুযোগ ছিল; কারণ, যীশুর সময়ে তাহার স্বদেশেই গ্রীক বিদ্যার সম্যক আলোচনা হইত এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকেরাও তখন সেই অঞ্চলে গিয়া বৌদ্ধ মত-সমস্ত প্রচার করিয়াছিলেন। সিরিয়া এবং ব্যাবিলনে যে বিশয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল, RenAn তাহা বলিয়াছেন এবং অশোকের শাসনেও প্রকাশ যে, তিনি সিরিয়া প্রভৃতি পঞ্চ যবনরাজ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। এই শাসনের ইংরেজী অনুবাদ দ্বারা সকল সংশয় দূর হইয়াছে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত

হওয়া যায়, তাহা আর লোককে বলিয়া দিতে হয় না। সিদ্ধান্ত এই, যীশুপদিষ্ট ত্রিবাদ তাঁহার নিজ সম্পত্তি নহে। এই ত্রিবাদ মধ্যে যে প্রেম-তত্ত্ব নিহিত আছে, আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখাইয়াছি, সে প্রেম-তত্ত্বও যীশুর নিজ সম্পত্তি নহে। তন্মধ্যে যীশুর নিজ সম্পত্তি কি ছিল, তাহা আমরা পর প্রস্তাবে প্রদর্শন করিব।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

সাধ্বী অঘোরকামিনী।

জেলা খুলনার অন্তর্গত শ্রীপুর (টাকী) গ্রামে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয়া অঘোর কামিনী দেবীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺বিপিন বিহারী বসু মহাশয় একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। সে সময়ে, এদেশে, বিশেষতঃ পল্লিগ্রামে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হয় নাই। বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃ গৃহে লেখা পড়া আদৌ শিক্ষা হয় নাই। দশ বৎসর বয়সে উক্ত গ্রামেই সাধু চরিত্র প্রকাশ চন্দ্র রায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। বিবাহের পরে শ্বশুরালয়ে আসিয়া সেকালে বালিকাদের বিদ্যা শিক্ষার কিরূপ সুবিধা হইত, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বালিকা অঘোর কামিনী শ্বশুরালয়ে আসিয়া স্বামীর সাহায্যে, অতিশয় গোপনে, পাঠাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। রন্ধন শালায় চুল্লীর আলোকে কিম্বা চন্দ্রালোকেই পড়িতে হইত; এবং অঙ্গারখণ্ড কিম্বা পুঁই ফলের রস ও কাঠি দ্বারা ধরা পৃষ্ঠে হস্তলিপি অভ্যাস করিতে হইত। ঈদৃশ প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও তিনি অল্প দিনের মধ্যেই বাঙ্গলা লিখিতে পড়িতে এবং হিসাব রাখিতে শিখিলেন। তাঁহার হস্তলিপি দেখিলে স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর বলিয়া মনে হইত না। বহুদিন পরে তিনি ইংরাজী ভাষা শিখিতে চেষ্টা করেন এবং তাহাতেও কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় এতাদৃশ ছিল যে, তিনি "পারিব না" একথা কখনও মুখে উচ্চারণ করিতেন না।

গৃহকার্য্যে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। বালিকা বধূ শ্বশুরালয়ের বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার মধ্যে রন্ধনাদি গৃহকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। আবার যখন অল্প দিন পরেই পুরাতন কুসংস্কার পরিত্যাগ করা অপরাধে স্বামীসহ শ্বশুর গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিতে হইল, তখনও সেই ক্ষুদ্র গৃহিনী স্বল্প আয়ের মধ্যে সুন্দররূপে সংসার চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী অপেক্ষাকৃত সামান্য কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ডেপুটি-মাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন; কিন্তু, কোন সময়েই তাঁহাদের দ্বার দুস্থ আত্মীয় কিম্বা বন্ধুগণের প্রতি বন্ধ হয় নাই। প্রত্যুত, তাঁহাদের গৃহে সকল সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ এবং ব্রাহ্মমাত্রেই সাদর অভ্যর্থনা পাইয়াছেন। এই নব দম্পতির ৩ পুত্র এবং ২ কন্যা জন্মে। তাহাদের সহিত সমান স্নেহে অনেক গুলি পিতৃ মাতৃ হীন বালক বালিকা ইঁহাদের গৃহে পালিত হইতেছিল। আজ তাহারা "দ্বিতীয়বার মাতৃহীন হইলাম" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে। যদিও দশমবর্ষে বিবাহ হয়, তথাপি শ্রীমতী অঘোর কামিনী বিবাহের দিন হইতেই স্বামীকে কিরূপে সুখী করিবেন, ইহাই তাঁহার জীবনের নিত্যব্রত করিয়াছিলেন এবং, সাধু স্বামীর পরিচালনায় সাধ্বী স্ত্রী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিজ্ঞার বল ছিল—সাধু ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া যাহা

কর্ত্তব্য মনে করিতেন, পর্ব্বতসম বাধা বিঘ্ন তাঁহাকে তাহা হইতে টলাইতে পারিত না। তত্রাচ স্বামীর ঈদৃশ আজ্ঞাকারিনী ছিলেন যে, বিবাহ-বাসর হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কখনও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। পবিত্র আধ্যাত্মিক মিলনের উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ইহারা দুটি আত্মাকে এক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এরূপ মিলনই মৃত্যুকে জয় করিতে পারে।

জনহিতৈষণায় দেবী অঘোর কামিনী এ দেশীয় মহিলাদের মধ্যে আদর্শ স্থানীয়া ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় এবং আশ্চর্য্য কার্য্যদক্ষতা, পরের দুঃখ, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির দুঃখ মোচনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বাঁকিপুরের বালিকা-বিদ্যালয়টী উত্তমরূপে তত্ত্বাবধান করিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে, ৩৬।৩৭ বৎসর বয়সে, কন্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে, লক্ষ্ণৌ নগরে গিয়া কুমারী থোবর্ণের ছাত্রীনিবাসে কিছুদিন থাকেন। সেখান হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি মহিলা মিসনরীদিগের ন্যায় অদম্য উৎসাহে উক্ত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা এবং শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। বিহার প্রদেশে এবং পশ্চিমাঞ্চলে বালিকাদের শিক্ষার সুবিধা ছিল না বলিয়া তিনি বাঁকিপুরে একটী ছাত্রীনিবাস স্থাপন করিবার সংকল্প করেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া নিজ গৃহেই অনেকগুলি বালিকাকে রাখিয়া তাহাদের শিক্ষার সহায়তা করিতেছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, স্ত্রীশিক্ষা এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যের সহায়তার জন্য একটী "নারী-সমিতি" সংস্থাপিত করেন। গৃহকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ এবং স্কুলের নিয়মিত কার্য্য করিয়াও তিনি যখনই কোন স্থানের দুরবস্থা, পীড়া, কিম্বা বিপদের সংবাদ পাইতেন, তৎক্ষণাৎ সেই স্থলে উপস্থিত হইতেন, এবং সেবা, সান্ত্বনা অথবা অন্য প্রকার সাহায্য দান করিতেন। অনেক সময়, নিজের শারীরিক অসুস্থতা অগ্রাহ্য করিয়া, রাত্রিকালে বিপন্ন বন্ধুর সাহায্য করিতে গিয়া স্বীয় স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেন। সূতিকাগারে রোগশয্যায় শায়িত বিপন্ন কত দরিদ্র নারীর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া, এই সহৃদয়া নারী, পূতিগন্ধময় গৃহ স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া চিকিৎসা এবং শুশ্রূষা দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন।

অল্প বয়সেই স্বামী কর্ত্তৃক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, স্বীয় স্বভাব-সুলভ বিশ্বাস ও ধর্ম্মোৎসাহের বলে সাধ্বী অঘোর কামিনী ব্রাহ্মসমাজের ভক্ত শ্রেণীর মধ্যে স্থান পাইয়াছিলেন। সামাজিক উপাসনায় ইঁহার প্রভূত উৎসাহ ছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন কলিকাতায় মাঘোৎসবে যোগ দিবার জন্য আসিয়াছিলেন, সে সময়ে প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠিয়া স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া ৩।৪ টী পুত্র কন্যাকে আহার করাইয়া, অন্যান্য অনেক মহিলার পূর্ব্বে উপাসনালয়ে উপস্থিত হইতেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব রজনীতে গৃহের সকলকে সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দিবার জন্য মন্দিরে যাইতে অনুরোধ করেন; বলিলেন "কেবল একজন থাকিলেই আমার চলিবে।" আচার্য্য কেশব চন্দ্র তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া একদিন বলিয়াছিলেন যে, "আমার জীবনের একটী প্রধান বাসনা এই যে, জগতের সমক্ষে স্ত্রীচরিত্রের একটী আদর্শ দেখাই। যদি আপনার মত একজন মহিলা পাই, তাহা হইলে সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে।" এই ঘটনার পর হইতে তাঁহার জীবনের প্রভূত উন্নতি হয়। ৩০।৩১ বৎসর বয়সে স্বামীসহ আধ্যাত্মিক উন্নত জীবন যাপন করিবার ব্রত গ্রহণ করেন; এবং কয়েক বৎসর পরে রমণীসুলভ

বসন-ভূষণপ্রিয়তা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। স্বামীর সম্পন্ন অবস্থা হইলেও তিনি দরিদ্রের মত থাকিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার গৃহে পরমেশ্বরের নাম সর্ব্বদাই ধ্বনিত হইত। যিনি একবার তাঁহার প্রার্থনা কিম্বা উপাসনাদিতে যোগ দিয়াছেন, তিনিই তাঁহার প্রেম ও ভক্তির গভীরতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের উদাহরণ স্বরূপ, শিশু দৌহিত্রের বিয়োগে-জনিত দারুণ শোক যখন তাঁহার করুণ হৃদয়ে প্রথম আঘাত করে, সেই সময়কার একদিনের প্রার্থনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"আমাদের শিক্ষার জন্য শিশুকে এখানে পাঠাইয়াছিলে, প্রভু! শিশু ক্ষুদ্র জীবনে যাহা দেখাইয়া গেল। তাহা যেন উত্তমরূপে শিখিতে পারি। শিশু যেরূপ অতি প্রত্যুষে উঠিয়া আলোক দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইত, আমি যেন তোমাকে দেখিবার জন্য সেইরূপ ব্যাকুল হই। সে যেমন উষার তরুণ সূর্য্য পানে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিত ও তাহার মধ্যে তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া সমস্ত দিন হাসিত, আমিও যেন প্রতিদিন প্রাতঃকালে তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া লই এবং সেইরূপ বিমল হাসি হাসিতে শিখি।"

নির্ম্মল শিশু জীবনকে আদর্শ করিয়া পাঁচ মাসের মধ্যেই পুণ্যবতী "পবিত্র শিশুদিগের রাজ্যে"র উপযুক্ত হইয়া পুণ্যধামে চলিয়া গেলেন!

নানা প্রকার পরিশ্রমে শরীর ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল বলিয়া তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানান্তরে যাইবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই জ্বর হইল। জ্বরের দ্বিতীয় দিনেও রাত্রি ৯টার সময় একটী পীড়িত বন্ধুকে দেখিয়া আইসেন। ক্রমে বাতের আক্রমণে রোগ বৃদ্ধি হইল। ভয়ঙ্কর রোগ-যন্ত্রণা ধীরভাবে বহন করিয়া, সকলের প্রতি মিষ্ট বাক্য ব্যবহার করিতেন। যন্ত্রণা যখন কিছুতেই উপশম হইতেছে না দেখিলেন, তখনও চিকিৎসা পরিবর্ত্তন অথবা অন্য কোন উপায়ে রোগ উপশম করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। রোগের সময়, তাঁহার ইচ্ছানুসারে দৈনিক উপাসনা তাঁহার শয্যা গৃহেই হইত এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতার মধ্যেও উপাসনার সময় উঠিয়া বসিতেন এবং নিজে একটু প্রার্থনা করিতেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আর বাঁচিবেন না এবং ভিন্ন স্থান হইতে আগত বন্ধুদের নিকট বিদায় লইয়াছিলেন। মৃত্যুর ৩৬ ঘণ্টা পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—

"সুবোধ, সাধুপথে চলিও, কখনও অসৎ পথে যাইও না, আমি আর কিছু রাখিয়া যাইতে পারিলাম না।" "তোমরা কাঁদিও না, দেখ, আমি কাঁদিতেছি না। সেদিন চখে জল আসিয়াছিল বলিয়া দুদিন দেরী হইল।"

১৫ই জুন সোমবার, রোগ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বিশ্বজননার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলেন। শান্তিদাতা তাঁহার আত্মাকে শান্তি বিধান করুন!

এক সময়ে, বাবু হরিগুরু রুদ্র, স্ত্রীবিয়োগজনিত শোকে কাতর হইয়া, এই পরিবারে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি কাটোয়া হইতে যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, সাধ্বী অঘোর কামিনীর জলন্ত বিশ্বাস, ভক্তি, এবং কর্ম্মযোগের তাহা এক অপূর্ব্ব ইতিহাস। তাঁহার পত্রের শেষাংশ এস্থলে তুলিয়া দিলাম।

"একণে দেবী অঘোর কামিনীর পারিবারিক দৈনিক জীবন যে ভাবে অতিবাহিত হইত তৎসম্বন্ধে দুই একটা বিষয় উল্লেখ করিব।

তিনি প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া সন্তানদিগকে লইয়া মাতৃস্তোত্র পাঠ করিতেন। পরে তাঁহার স্বামীর প্রাতঃকালীয় উপাসনার * জন্য উপাসনা-গৃহের বস্ত্র

* কখন কখন মধ্যাহ্নেও এই উপাসনা হইত।

সকল যথাস্থানে বিন্যাস করিয়া আমাদিগকে উপাসনালয়ে ডাকিতেন। উপাসনান্তে আমাদিগকে কিছু কিছু খাইতে দিতেন। ইহার পর আমরা স্ব স্ব কার্য্যে চলিয়া গেলে, গৃহের অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্তা হইতেন। বাড়ীর দাস দাসী হইতে গৃহিণীর কার্য্য সকলই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কখন কখন তিনি স্বহস্তে ঐ সকলের কার্য্য করিতেন। পরিবেশন কার্য্য নিজেই করিতেন এবং ইহাতে তাঁহার বড়ই সুখ হইত। আমরা সকলেই এক সঙ্গে খাইতে বসিতাম। পাছে লোকসান হয়, এজন্য একেবারে সমস্ত অন্ন পাতে না দিয়া অল্প অল্প দিতেন। তাঁহার ঐরূপ শৃঙ্খলা ও স্নেহমাখা পরিবেশনে মনে হইত, যেন নিজের জননীর নিকটেই আহার করিতেছি। বৈকালে কার্য্য হইতে বাড়ী আসিলে স্বয়ং আমাদের জলখাবার প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে খাওয়াইতেন। সন্ধ্যার সময় ছেলে কয়েকটাকে লইয়া উপাসনা-গৃহে বসিয়া ঈশ্বর-স্তোত্র পাঠ ও শ্লোক সংগ্রহ হইতে শ্লোক পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদিগকে শুনাইতেন। এই সময়ে গৃহের অন্যকাজ থাকিলে আপনার বড় কন্যার উপর ঐ কার্য্যের ভার দিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সংসারের কর্ত্তব্য পালনে এক দিনের জন্যও তাঁহাকে বিরক্তি প্রকাশ করিতে দেখি নাই। কি সুখজনক কি দুঃখজনক, সকল কার্য্যই তাঁহাকে প্রফুল্লচিত্তে করিতে দেখিয়াছি।

অনেক পরিবারে দেখিয়াছি, কার্য্য বশতঃ কোন লোক আসিয়া যদি কোন পরিবারে আশ্রয় লন, তাহা হইলে গৃহস্থ হয়ত দুই কি তিন দিবস তাঁহার সেবা শুশ্রূষা পরম সমাদরে করিতে থাকেন। কিন্তু ৪র্থ কি ৫ম দিবসে, প্রকাশ্যে না হউক, অপ্রকাশ্যেও তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ বিরক্তি দেখাইতে থাকেন। আমি যে পরিবারের কথা এতক্ষণ বলিলাম, তাহাতে এ সম্বন্ধে এক উদারভাব বরাবর দেখিয়াছি। এখানে যে কোন রূপ লোক যে কোন কার্য্যের জন্যই আসুন না কেন, এবং তিনি কার্য্য সমাপ্তির জন্য যত দিনই থাকুন না কেন, ইঁহারা অবিচলিত চিত্তে তাঁহার যত্ন করিয়াছেন। এ পরিবারে কোন বিষয়েই কখনও বাড়াবাড়ি দেখি নাই। সকলই পরিমিত, সকলই শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সকলই নিয়মিত। এজন্যই যতদিন এখানে ছিলাম, এক দিনের জন্যও সুখ শান্তির ব্যাঘাত হয় নাই বা চিত্ত কোন প্রকারে বিকৃত হইবার অবসর পায় নাই। ঋণ শত্রুকে এই পরিবারে প্রবেশ করিতে দেখি নাই। কোন কোন মাসের শেষে দৈনিক খরচের কিছু অনাটন হইলে, পরিবারস্থ সকলকেই নিতান্ত প্রয়োজনীয় আহারের জন্যও কষ্ট সহ্য করিতে দেখিয়াছি, তথাপি ঋণ করিতে অথবা কোনরূপে কর্ত্তব্যের পথ হইতে অবসৃত হইতে দেখি নাই। অনেকে মনে করিতে পারেন, যে পরিবারের আয় এত টাকা, সে পরিবারে কষ্টই বা কেন হইবে এবং তজ্জন্য বা ঋণ করার প্রয়োজন কি? যদি আজি কালিকার সুসভ্য নামধারী মহাপুরুষদিগের পরিবারের ন্যায় কেবল কর্ত্তা কর্ত্রী লইয়াই পরিবার হইত এবং কেবল মাত্র নীচ স্বার্থসুখ সংসাধন করাই পরিবার গঠনের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে এরূপ কথা একদিন সম্ভব হইত। কিন্তু আমি যে পরিবারের কথা বলিতেছি, তাহাত কেবল কর্ত্তা কর্ত্রী লইয়াই নহে। তাহা দুঃখী, তাপী, অভাবগ্রস্ত সকলের জন্য অবারিত। সে পরিবার জগৎ মাতা জগদ্ধাত্রীর ভাণ্ডার। এখানকার অভাব সদ্ভাবের আগমনী মর্ত্ত্যে স্বর্গের আগমন। এই পরিবারের অভাবগ্রস্ত লোকদিগের মুখে কি সুষমা! ইহাদের অশ্রুজলে সেই প্রেমময়ের মুখজ্যোতি পড়িয়া কি পবিত্র সৌন্দর্য্যেই সমুদায় গৃহ সুশোভিত হয়। ইহাই মহাত্মা বিশুর সংসারে স্বর্গের দৃশ্য!

বিষয় সম্ভোগে অনাসক্তি—আজ কয়েক বৎসর হইল বাঁকীপুরে অবস্থানকালে একদিন শীতকালে বাড়ীতে কতকগুলি লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাত্রিতে সকলেরই লেপের প্রয়োজন। আমি মনে করিতে লাগিলাম, এতগুলি লোক, কি করিয়া সকলের জন্য লেপের যোগাড় হইবে। বাড়ীতে যতগুলি লেপ ছিল, সমস্তই আনয়ন করা গেল। কোন রূপে আমাদের সকলেরই এক প্রকার অভাব পূর্ণ হইল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা রাত্রির পর আবার কয়েকজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারা কিরূপে রাত্রিযাপন করিবে ভাবিতেছি। সুবোধকে বলিলাম। সুবোধও ইতস্তত করিতে লাগিল। কিন্তু মা ইহার সংবাদ পাইয়াই, কোথা হইতে তাহাদের জন্যও শীত নিবারণ হইতে পারে, এরূপ কতকগুলি কাপড় আনিয়া দিলেন। উহাতেই আমাদের সকলের অভাব পূর্ণ হইল।

কিন্তু আমার মনে কে যেন বলিয়া দিল, অদ্য রাত্রিতে মাকে শীতে বড় কষ্ট পাইতে হইবে। পরদিন প্রাতে উঠিয়া, সুবোধকে জিজ্ঞাসা করিলাম সুবোধ, শেষের শীত নিবারণের জন্য যাহা আনিলে, তাহা কে দিল এবং কিরূপেই বা পাইলে? উত্তরে সুবোধ বলিল, মা নিজের গাত্র-বস্ত্র খুলিয়া দিয়া সমস্ত রাত্রি শীত ভোগ করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এত কষ্ট পাইয়াছেন কিন্তু তজ্জন্য আমাদিগকে কোন কথাই বলেন নাই। অলঙ্কার দ্বারা কিম্বা বেশভূষা দ্বারা আপন দেহকে সজ্জিত করিতে আমি তাঁহাকে কখনই দেখি নাই। দেহ রক্ষার জন্য যাহা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহাই পরিধান করিতেন। সন্তানাদির মনে যাহাতে কোন প্রকার বিলাসিতা না আসে, তাহার জন্য তিনি অনেক সময় অনেক উপায় অবলম্বন করিতেন। অকস্মাৎ গৃহস্থালীর কোন দ্রব্য নষ্ট হইলে তজ্জন্য বৃথা শোক করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না।

তাঁহার পতিব্রতা—সুখে দুখে, সম্পদে বিপদে, রোগে শোকে স্বামীর সেবা করিতে কখনই তিনি বিস্মৃত হন নাই। ঐরূপ আজীবন স্বামীর সেবায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্তা থাকিতে আমি অল্প মহিলাকেই দেখিয়াছি। সেবাধর্ম্ম তাঁহার জীবনের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। প্রকাশ বাবু অনেক দিন হইতে জীবনের নানা দুঃখ বিপত্তি পূর্ণ অবস্থার ভিতর দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছেন। জানিনা তিনি কতদিনে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতেন, যদি ঐরূপ সহধর্ম্মিনী তাঁর সঙ্গের সঙ্গিনী না হইতেন। ইঁহাদের উভয়ের জীবনের অনেক ব্যাপারে আমরা তাঁর পাতি-ব্রত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। বাহুল্যভয়ে তৎসমুদায় এস্থলে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

রাজগিরি। (১)

শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল সিংহ, বি-এল মহাশয় ১৩০২ সালের নব্যভারতের বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় "রাজগৃহ বা রাজগিরি" সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। আমি তখন মধুপুরে ছিলাম। তখন আমি ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রপীড়িত। ১৩০১ সালের শেষ এবং ১৩০২ সালের প্রথমাংশে সাড়ে চারি মাস মধুপুরে বাস করিয়াও এই জ্বর যায় নাই। বিগত ফাল্গুন মাসে আবার আমার শরীর পুনরায় খারাপ হয়। কলম্বো যাওয়ার একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানা প্রতিকূল ঘটনায় সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বিগত ফাল্গুন মাসে শরীর খারাপ হওয়ায় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কোথায় যাইব, ভাবিতেছিলাম এবং নানাস্থানের বন্ধুদিগকে পত্রাদি লিখিতেছিলাম। ১৩০১ সালে, পীড়িত হইয়া যখন আমি শয্যাগত ছিলাম, তখন আমার অকৃত্রিম বন্ধু, তদনীন্তন কালের কলিকাতা মেডিকেল কলেজের চক্ষু চিকিৎসার সহকারী ডাক্তার বাবু কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় বিহারে বদ্‌লি হন। তিনি যখন বিহারে যান, তখন আমাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বিহারে লইয়া যাইতে একান্ত জেদ করিয়াছিলেন। বিহারের নিকটে যে রাজগৃহ, তাহা তখন জানিতাম না। তৎপর নব্যভারতে রামলাল বাবুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ পাঠে রাজগৃহ দেখার ইচ্ছা আমার মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বিগত ফাল্গুন মাসে যখন কোথাও যাওয়ার কথা ভাবিতেছিলাম, তখন কালীপ্রসন্ন বাবু বিহারে যাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। তাঁহার ভালবাসার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, আমি বিহার যাইব, ধার্য্য করিলাম। বহুদিনের মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার সুবিধা হইল। কালীপ্রসন্ন বাবু এ সম্বন্ধে আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা জীবনে ভুলিব না।

রাজগৃহে আমি প্রায় একমাস ছিলাম।

যাহা দেখিয়াছি, তাহা যেন হৃদয়ে চিরদিনের জন্ত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। কাহাকেও সে সকল বুঝাইতে পারিব, সে আশা করি না। রাজগৃহে অবস্থান কালীন আমার অনুরোধে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় রাজগৃহের ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি সুন্দর পত্র লেখেন। তাহা জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যা নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক সমস্ত কথাই তাহাতে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। পুনঃ আবার রাজগৃহ সম্বন্ধে লেখার আবশ্যকতা কি, অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে একটী কথা এই, ক্ষীরোদ বাবু স্থানটী দেখেন নাই, রামলাল বাবু মাত্র ৩।৪ দিন রাজগৃহে ছিলেন। বিশেষতঃ বরগাঁয়ে নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্মৃতি-চিহ্ন আছে, তাহার বিবরণ রামলাল বাবু কিছুই দেন নাই। বরগাঁয়ে বৌদ্ধকীর্ত্তির যে ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে, তাহা দেখিলে দুঃখ, ক্ষোভ এবং বিস্ময়ে প্রাণ মন আকুল হয়। উৎকলের ভুবনেশ্বর মন্দিরের নিকটস্থ অসংখ্য মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে যে ভাবের উদয় হয়,ইহাতে তাহাপেক্ষা অধিকতর জমাট ভাব প্রাণে বদ্ধ হয়। বরগাঁয়ের কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, মহাত্মা ধর্ম্মপাল বৌদ্ধগয়ার মন্দির ঘটিত বিবাদে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া এই স্থানের ধ্বংসাবশেষ বজায় রাখিতে যদি চেষ্টা করিতেন,তবে তিনি দেশের প্রাচীন কীর্ত্তি-সংরক্ষণরূপ মহা কার্য্য করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইতে পারিতেন। রাজগৃহ হিন্দু,মুসলমান,জৈন এবং বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের তীর্থ। কত কত মহাজনদিগের পূত চরণ-রেণুতে এই স্থান পবিত্রীকৃত। এখানে নানকসাহীদিগের ধর্ম্মসঙ্গত এবং জৈনদিগের ধর্ম্মশালা আজও প্রাচীন কীর্ত্তির শেষ প্রদীপ হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এ স্থানের পাণ্ডাগণ নিতান্ত অশিক্ষিত। আনটীর বায়ু এবং জল অতি বিশুদ্ধ। এতগুলি উষ্ণপ্রস্রবণ আর কোথাও আছে কিনা, জানিনা। এই সকল সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়, একান্ত প্রার্থনীয়। এই সকল কারণে, আমরা রাজগৃহের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলাম। আশা করি, পাঠকগণের বিরক্তির কারণ হইবে না।

রাজগৃহের ম্যাপখানি এস্থানে তুলিয়া দিলাম। এই ম্যাপখানি বাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় দিয়াছিলেন। তিনি যে সকল স্থানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার নাম ম্যাপে প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা যে সকল স্থান সম্বন্ধে বিশেষরূপে উল্লেখ করিব, তাহা ১, ২, ৩, ও ক, খ, গ এইরূপে চিহ্নিত হইয়াছে।
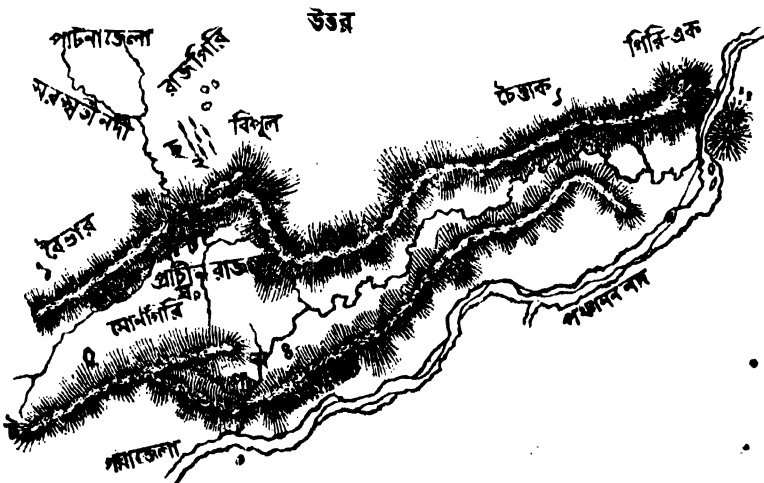
এই গুলির আধুনিক নাম।

১। বৈভার-গিরি। (২) বিপুলাচল (মহাভারতের চৈত্যক পর্ব্বত) (৩) রত্নগিরি। (৪) উদয়গিরি। (৫) সোণগিরি।

ক। এইখানে সোণভাণ্ডার, ইহাকে শতপর্ণী গুহা বলে। তির্ব্বত-গ্রন্থে ন্যগ্রোধ গুহা ইহার নাম।

খ। এইখানে দুটী প্রকাণ্ড গুহা আছে।

গ। বাণগঙ্গা। ঘ। নির্ম্মলকূপ।

ঙ। সরস্বতী নদী।

চ। সূর্য্যকুণ্ড ও অন্যান্য কুণ্ড।

ছ। আমবাগানের মধ্যে ইনস্পেকসন বাঙ্গালা। জ। জরাসন্ধের আখড়া।

ঝ। জরাসন্ধের রণভূমি।

ঞ। অগ্নিধারা প্রভৃতি কুণ্ড।

ট। তপোবনের কুণ্ড সমূহ।

চৈত্যক ১। দেবীনগর বা কল্যাণপুরের গোল্ড-মাইনিং কোম্পানির বাঙ্গালা।

০০—গিরিয়াক গ্রাম।

∵ এইখানে আধুনিক রাজগিরি গ্রাম।

আর আর যে সকল স্থান আছে, এই সকলের পরিচয়ে তাহার বিবরণ দেওয়া যাইবে।

আমি ৫ই চৈত্র (১৩০২) ১৭ই মার্চ্চ ১৮৯৬, মঙ্গলবার রাত্রিতে, একটী ভৃত্য সঙ্গে করিয়া, রেলগাড়ীতে কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম। রওয়ানা হওয়ার পূর্ব্বে একটু সর্দ্দির ভাব হইয়াছিল, মনে করিয়াছিলাম, পশ্চিমের হাওয়াতে শরীর সুস্থ হইবে। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে শরীর আরো খারাপ হইল। গভীর রাত্রে মধুপুরে যখন ট্রেন উপস্থিত হইল, তখন শীতে কাঁপিতে লাগিলাম, গরম কাপড় বাহিরে ছিলনা, সুতরাং রাত্রে যারপর নাই কষ্ট পাইতে হইল। পরদিন প্রায় ৩ ঘটিকার সময় বখতিয়ারপুর ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। রাত্রের শীতের পর দিবসের প্রখর রৌদ্র-দুই প্রতিকূল অবস্থায় শরীরকে বড়ই খারাপ করিল। অজ্ঞাত রাজ্যে ভগ্ন শরীর লইয়া উপস্থিত হইলাম। কালীপ্রসন্ন বাবু এক জন বন্ধুর নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন, ষ্টেসনে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, তিনি পীড়িত হইয়া বাসায় গিয়াছেন, ষ্টেসনে নাই। বখতিয়ারপুর ষ্টেসনের নিকটে গঙ্গা নদী প্রবাহিত। সমস্ত রাত্রি এবং দিনের কষ্টের পর, চৈত্র মাসের দারুণ তীব্র রৌদ্রদগ্ধ আমরা দুটী প্রাণী অপরিচিত স্থানে, সেই বন্ধুর সাক্ষাৎ না পাইয়া একটু বিপদে পড়িলাম, ষ্টেসনের পুল পার হইয়া অন্য পার্শ্বে গেলাম। একটী মুটে আমাদের জিনিস লইয়া এক মেইল-কার্টের আড্ডায় লইয়া গেল। আমাদিগের ক্লেশ দেখিয়া আর একজন মুটে বলিল, এ আড্ডার গাড়ী ছাড়িতে বিলম্ব আছে, সম্মুখের আড্ডায় যাও, সেখানে গাড়ী প্রস্তুত আছে, এখনই ছাড়িবে। এখান হইতে বিহার ১৮ মাইল, বেলীসরাই প্রায় ১০ মাইল পথ। বখতিয়ারপুর ষ্টেসনের চতুর্দ্দিকে ধূলির আড়ম্বর। বখতিয়ারপুরের ডাক বাঙ্গালাটী সুন্দর। ষ্টেসনের ধারেই মেলকার্ট ও একাগাড়ীর আড্ডা। এখানে কয়েকখানি দোকান ও ধর্ম্মশালা আছে। আর একটু দূরে, উত্তরে, নদীর নিকটে অনেক গুলি দোকান ঘর আছে। বলা বাহুল্য যে, দোকানগুলি সবই পশ্চিম দেশীয় লোকের। দেখিলাম, গাছ পালায় বসন্তের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে বটে, কিন্তু ধূলায় সকল সৌন্দর্য্য ঢাকিয়াছে! মেইল-কার্টের আড্ডাগুলি যেন মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিস্। আমরা যে আড্ডার গাড়ীতে বসিলাম, সে আড্ডায় একখানি বড় ঘরে অনেকগুলি খাটিয়া পাতা আছে।

পথিকগণ সেখানে বিনা ভাড়ায় যতক্ষণ ইচ্ছা থাকিতে পারে। সেখানে পায়খানা ইত্যাদি আছে। অন্যান্য সুবিধাও করিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমরা অপেক্ষা না করিয়া মেইল কার্টে উঠিলাম। বখতিয়ারপুরে এক্কা ও গরুর গাড়ীও পাওয়া যায়। মেল-কার্ট ২টী ঘোড়ায় টানে, আমাদের গাড়ীতে কোচম্যান ও দুই জন সইস সহ আমরা ১১ জন উঠিলাম। লগেজে গাড়ী পূর্ণ, তার উপর ঘোড়ার দানা ইত্যাদি তুলিয়া গাড়ীখানির তিলার্দ্ধ স্থান রাখিল না। উপরে কাম্বিসের ছাউনি। একগুলি লোক এবং বোঝা লইয়া, চৈত্র মাসের ধূলি উড়াইয়া, গাড়ী অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকার সময় ছাড়িল। আমাদিগকে ৮০ হিসাবে ১৷৷০ ভাড়া দিতে হইল। রাস্তা প্রস্তরময়, কিন্তু মেরামতের অভাবে, তখন বোর্ডের কার্য্যদক্ষতা বেশ ঘোষণা করিতেছিল। চৈত্রের রৌদ্র, গাড়ীর ঝাকুনি, ধূলির আক্রমণ আমাদিগকে অস্থির করিতে লাগিল। গাড়ীতে পাশ ফিরিবারও স্থান নাই। পাকা রাস্তার নিম্ন দিয়া গরুর গাড়ীর রাস্তা গিয়াছে। সে রাস্তা যেন ধূলির সাগর। রাস্তার দুইধারে বৃক্ষ আছে বটে, কিন্তু অনেক স্থলের বৃক্ষই আধুনিক, রৌদ্র-নিবারণের শক্তি তাহাদের এখনও জন্মায় নাই। ৩ স্থানে ঘোড়া বদল হইল। আমরা রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় বেলি-সরাই পৌঁছিলাম। বেলীসরাই ৺ বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চেষ্টায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন ইহার অর্দ্ধেকাংশ দাতব্য চিকিৎসালয় ও ডাক্তার বাবুর বাসা এবং অপর অংশে পথিকদিগের বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। আমাদের বন্ধু কালীপ্রসন্ন বাবু বিহারের ডাক্তার বেলি-সরাইর দক্ষিণ অংশে ছিলেন। আমাদের গাড়োয়ান, নিয়ম-বিরুদ্ধ হইলেও, ঐ পর্য্যন্ত আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিল। আমরা অবশ্য গাড়োয়ানকে কিছু বক্‌সিস্ দিয়াছিলাম। গাড়ীতে যাইবার সময় সর্ব্বপ্রথম একটী ঘটনায় আমার মন আকৃষ্ট হয়। কোচ্‌ম্যান ও অপর আরোহীগণ সকলেই মুসলমান। তাহাদের সকলের পরিধানের বস্ত্রই পরিপাটী, সকলেই সুসভ্য—সকলেই আদব কায়দা জানে। বিহার পাটনা জেলার একটী সবডিবিসন, পাটনা মুসলমান-প্রধান স্থান। বিহার যেন পাটনার একটী হোমিওপেথিক ডোজ। বিহারের মুসলমানগণ সম্ভ্রান্ত, সুসভ্য, মিষ্টভাষী এবং সংযত। মুসলমান সম্প্রদায় বিহারে বিশেষরূপ গণ্যমান্য। ইহাদের আচার ব্যবহার অতি মিষ্ট। হিন্দুগণের বাড়ীতে ইঁহারা সাদরে নিমন্ত্রিত ও গৃহীত হইয়া থাকেন, এবং ইঁহারাও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। গাড়ীতে চলিতে চলিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের সৌজন্যে, ভদ্রতায় আমরা বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। রাত্রে বেলি-সরাইতে যাইয়া শুনিলাম, কালীপ্রসন্ন বাবু বাসায় নাই, ডেপুটী বাবুর বাড়ীতে গিয়াছেন। আমরা নিজ বাড়ীর ন্যায় দ্রব্যাদি লইয়া ডাক্তার বাবুর বাসায় উঠিলাম। ডাক্তার বাবুর ভ্রাতা ও শ্যালক মহাশয় আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের যত্নে আমাদের সেবা শুশ্রূষার কোনই ত্রুটী হইল না। যদিও আমার শরীর বড়ই খারাপ হইয়াছিল, তবুও রাত্রে কিছু অন্নাহার করিলাম। ডাক্তার বাবুর শ্যালক আমাদিগকে বিহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন—তন্মধ্যে এই দুটী কথায় আমাদের মন খুব আকৃষ্ট হইয়াছিল, প্রথম কথা তিনি বলিয়া-

ছিলেন যে, বিহার মুসলমান-প্রধান স্থান; দ্বিতীয় কথা—এ প্রদেশ বৌদ্ধ এবং জৈন-দিগের রাজ্য। আমরা প্রথম কথার কতক পরিচয় গাড়ীতেই পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু দ্বিতীয় কথাটার মর্ম্ম তখন বুঝিলাম না—শেষে বেশ বুঝিয়াছিলাম।

আমাদের আহারের পর কালীপ্রসন্ন বাবু বাসায় আসিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ে অনেক সময় গেল। শেষে বিশ্রাম করিলাম। সর্দ্দির আক্রমণে সমস্ত রাত্রি আর ঘুম আসিল না। বড় কষ্টে রজনী কাটাইলাম।

পরদিন প্রাতে ডাক্তার বাবুর ভ্রাতার সহিত বিহার দেখিতে বাহির হইলাম। দেখিবার বড় কিছু নাই। বিহার যেন একটী প্রকাণ্ড তাল বাগান। বিহারের নিকটে একটী ছোট পাহাড় আছে, তাহার উপর উঠিলে বিহারকে তাল-জঙ্গল বই আর কিছুই বোধ হয় না। এত তালগাছ আমরা আর কোথাও দেখি নাই। বেলি-সরাই বিমলা বাবুর এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি বটে। সাধারণের চাঁদায় ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজগৃহ এবং বরগাঁও হইতে বিমলা বাবু অনেক প্রস্তরময় মূর্ত্তি আনিয়া ঘর পূর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল এখন কলিকাতা যাদুঘরকে শোভিত করিতেছে। বিমলা বাবুর এই কাজে আমরা যারপর নাই কষ্ট পাইলাম। সে খানের যে কীর্ত্তি, সে খানে তাহা রক্ষা করিলেই ভারতের কীর্ত্তির স্মৃতি জাগরুক থাকিবে, এইরূপ ভাবে মূর্ত্তি ইত্যাদি স্থানান্তরিত করিলে ভারতকে দুই দশ বৎসরে শ্মশানে পরিণত করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে বিহারের বর্ত্তমান সুযোগ্য ডেপুটী বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত আমাদিগের যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, যথাস্থানে তাহা লিপিবদ্ধ করিব।

বিহারে দেখিবার প্রধান জিনিস, দুকদুম সাহের দরগা। দুকদুম সাহ একজন মুসলমান যোগী। রাজগিরিতে ইঁহার নামে একটী কুণ্ড আছে। রাজগিরিতে এক সময়ে নাকি ৪০ দিন উপবাস থাকিয়া তিনি নমাজ করিয়াছিলেন। রাজগিরির কথা পরে ব্যক্ত হইবে। বিহারের দরগায় দুমদুম সাহের কবর আছে। এখানে সময়ে সময়ে মেলা হইয়া থাকে, হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর লোকই মেলায় আগমন করিয়া থাকে। এই দরগাকে সকল শ্রেণীর লোক সম্মান করিয়া থাকে; এবং কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা এখানে সিন্নি দিয়া উপকার পাইয়া থাকে। শুনিয়াছি, বহু সম্ভ্রান্ত লোক এই দরগার প্রতি আস্থাবান। দুকদুম সাহ ৭০০ বৎসরের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া সাধন বলে সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বিহারের দক্ষিণদিগের বালুকাময় একটী নদী পার হইয়া এই দরগায় যাইতে হয়। রাস্তায় ধূলি, নদীর বক্ষে ধূলি, চতুর্দ্দিকে যেন ধূলির সাগর। ধূলিতে জুতা ডুবিয়া যায়। এই দরগায় এই সময়ে একটী মেলার আয়োজন হইতেছিল। দরগাটী যে খুব প্রাচীন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। দরগায় অনেক সাধুর সমাধি আছে। তন্মধ্যে দুকদুম সাহের সমাধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহার উপর সুন্দর বস্ত্রের চাঁদোয়া টাঙ্গান আছে ও সমাধি উত্তম বস্ত্রাচ্ছাদিত। যারপর নাই যত্নে সমাধির পরিচর্য্যা হইয়া থাকে। প্রাঙ্গণের এক কোণে একটী বৃক্ষ আছে। লোকেরা বলিল যে, দুমদুম সাহ দন্তমার্জ্জন করিয়া কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। একটী ছোট ঘর দেখাইয়া বলিল যে, এই ঘরে সাহজি

নির্জ্জন সাধন করিতেন। বহুলোকের নমাজের স্থল আছে এবং মেলার সময় অনেক লোক থাকিতে পারে, এমন প্রাঙ্গণ ও গৃহাদি আছে। দরগার পশ্চিমে একটী প্রাচীন পুকুর। স্থানটী দেখিলে সাধু-মাহাত্ম্যের কথা প্রাণে জীবন্ত ভাবে উদিত হয়। অন্যান্য তীর্থের ন্যায়, এখানকার লোকেরাও পয়সা চায়। আমাদিগকেও কিছু দিতে হইয়াছিল।

বিহারের বেলি-সরাই দ্বিতীয় দৃশ্য বস্তু। লাট বেলী সাহেবের স্মরণার্থ সাধারণের চাঁদায় ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা একটী কীর্ত্তি বটে, কিন্তু যে স্থানে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা পছন্দ-সই নহে। চতুর্দ্দিকে দোকান, খোলার বাড়ী, ছোট ২ রাস্তা—যেন হাটের মধ্যে শয়ন-ঘর। হাসপাতলটী বিহারের মিউনিসিপালীটার গৌরব। বেলি-সরাইর ঘরগুলি ভাল—দুই দিকে বারাণ্ডা, বড় বড় থাম, মধ্যে অনেক ঘর। প্রাঙ্গণে অনেক স্থল আছে। কিন্তু পথিকদিগের জন্য যে অংশ রহিয়াছে, তাহা যেন শ্মশান—সবই খালি। ভদ্রলোকদিগের প্রতি ঘরের ভাড়া মাসে ৪॥০ দিলে একদিন থাকা যায়। এবং সাধারণ লোকদের ভাড়া প্রতিদিন ৴৫। প্রবেশদ্বারে যে টুক-টাওয়ার আছে, তাহা দেখিতে সুন্দর নহে। এক এক দিকে পাঁচটী করিয়া ঘর। বিমলা বাবুর নাম এই বাড়ীর সহিত সংমিশ্রিত। বিহারে জৈনদিগের একটী মন্দির, গবর্ণমেণ্ট স্কুল, কাছারী, জেল, সকল দেখিতে এক বেলাও লাগে না। স্কুলের নিকটে কতকটা স্থান খুব উচ্চ—প্রাচীনত্বের চিহ্ন এই স্থলে স্পষ্ট পাওয়া যায়। এই উচ্চভূমির দক্ষিণ দিকে প্রস্তরনির্ম্মিত একটী প্রকাণ্ড গেটের ভগ্নাংশ আছে। তাহার উপর বড় বড় বৃক্ষ উঠিয়াছে। এখানে পূর্ব্বের যে কিছু স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কতদিনের, নির্ণয় করার কোন উপায় নাই।

বিহার সহরের মধ্যেও অনেকস্থলে আফিংয়ের চাষ হইয়া থাকে। আর প্রধান চাষ তালবৃক্ষের। এত তাল বৃক্ষ কোথাও প্রায় দেখা যায়না, এত তাড়ীর কাট্তিও কোথাও শুনা যায় নাই। তাড়ীপানে কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক সকল বিভোর।

বিহারের বায়ু ভাল, লোকে বলে। জলও মধুপুরের ন্যায় মিষ্ট। কিন্তু রাজগৃহের উষ্ণ প্রস্রবণের জল ব্যবহার করিয়া আসিয়া শেষে বিহারের মিঠা কুয়ার জলও নিতান্ত বিস্বাদ লাগিয়াছিল। বিহারের রাস্তা সকল ধূলিময়। অনেক রাস্তাই মৃন্ময়, প্রস্তরময় রাস্তাও আছে, কিন্তু সংখ্যা অল্প। মৃন্ময় রাস্তাতে অবিরত ধূলি উড়িতেছে। হাটা যায় না পা ডুবিয়া যায়। বিহারে ধূলির খুব প্রাদুর্ভাব, পূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পত্রে জানিয়াছিলাম, কিন্তু এত ধূলি, পূর্ব্বে বুঝি নাই। দু প্রহরের সময় যখন লু (গরম বায়ু) বহিতে থাকে, তখন চতুর্দ্দিক ধূলিতে অন্ধকার হইয়া যায়। পশ্চিমের অনেক সহরেই গরুর গাড়ীর বহুল প্রচার, সুতরাং সর্ব্বত্রই ধূলির রাজত্ব।

শরীর খারাপ, তার উপর ধূলির আক্রমণ। রাস্তাগুলি ছোট ছোট। নিকটে কোথাও একটু খোলা স্থান নাই—নিশ্বাস ফেলিবার জায়গাও যেন নাই। এ স্থল আমাদিগের মোটেই ভাল লাগিল না। বৈকালে কালীপ্রসন্ন বাবু অনেক বন্ধুর একখানি উৎকৃষ্ট গাড়ী যোগাড় করিয়াছিলেন। সেই গাড়ীতে বৈকালে পাহাড় দেখিতে গেলাম। পাহাড়ের পশ্চিম-দক্ষিণ দিয়া একটী বালুকাময় নদী চলিয়া গিয়াছে। দরগায় এই নদীর উপর

দিয়াই যাইতে হয়। পাহাড়ের উপরে দুই স্থলে বসতি আছে। পাহাড়টী খুব উচ্চ নহে, খুব বড়ও নহে, পূর্ব্বে কিছু উচ্চ থাকিলেও, বখতিয়ারপুর রাস্তায়, বাড়ী ঘর নির্ম্মাণে অনেক পাথর নিঃশেষ করিয়াছে। লোকেরা বলে, ক্রমেই পাহাড়ের উচ্চতা কমিতেছে। পাহাড়ের উপরে অনেকগুলি প্রাচীনসমাধি ও মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ আছে। সে গুলি দেখিলে বাস্তবিকই মুসলমান রাজত্বের অনেক স্মৃতি অন্তরে জাগরিত হয়। ধর্ম্ম-চর্চ্চার জন্য মুসলমান সম্প্রদায় যত সমাধিস্তম্ভ ও মসজিদ এই ভারতবর্ষে নির্ম্মাণ করিয়াছে, হিন্দুসম্প্রদায় বুঝিবা তাহার এক আনাও করে নাই। মুর্শিদাবাদে দেখিয়াছি, প্রতি রাস্তায় ২টী ৩টী ৪টী করিয়া মস্‌জিদ আছে। ধর্ম্মের জন্য স্বার্থত্যাগে মুসলমান-সম্প্রদায় বড়, না হিন্দু সম্প্রদায় বড়, আমাদের সন্দেহ আছে। এই পাহাড়টী বিহারের অতি নিকটে। এই স্থানটী দেখিয়া আমরা যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। স্থানটী বড়ই মনোরম্য। অনেকক্ষণ থাকিতে ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পরের গাড়ী পাহাড়ের নীচে অপেক্ষা করিতেছে, তাতে শরীর খারাপ, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিতে হইল।

বিহারে অধিক বাঙ্গালী নাই। মৎস্য তত মিলে না—দ্রব্যাদি বড় সুবিধায় পাওয়া যায় না। তবে মুসলমানী সহর, পেয়াজ মাংসের বেশ বন্দোবস্ত আছে। মুসলমানী গান, বাজনা ও ব্যাঙের প্রাদুর্ভাব খুব। মুসলমানী সহর বটে, কিন্তু মুসলমানদিগের ব্যবহার বড় মধুর।

দিন গেল, শেষ রাত্রেই আমরা রাজগিরি যাত্রা করিলাম। যেখানে বসিতে হইবে, ঠিক হইয়া বসাই উচিত। কালীপ্রসন্ন বাবু পুলিস হইতে গিরাওর থানার লোকের নিকট একখানি পত্র আনিয়া দিলেন, এবং বাবু নন্দলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ইনস্পেকসন-বাঙ্গলার বন্দোবস্ত করিলেন। ইনস্পেকসন-বাঙ্গলাটা বোর্ডের অত্যাচারের যেন একটা মূর্ত্তিমান হাড়িকাঠ। শিথিল নিয়মরূপ রজ্জুতে বাঁধিয়া এখানে মাথা প্রবেশ করাইয়া, অনেকের সম্মান বলি দেওয়া হইয়াছে। বাবু রামলাল সিংহের প্রবন্ধে অত্যাচারের কথা একটু পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবু ইহার মধ্যে আছেন, ভয় থাকিলেও আমাদের প্রতি অত্যাচার নাও হইতে পারে, এইরূপ ভাবিয়া আমরা ইনস্পেকসন বাঙ্গালায় থাকার আয়োজন করিয়াই চলিলাম। এ সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন বাবুকে খুব সতর্ক করিয়াছিলাম। পরেও এ সম্বন্ধে অনেক লিখিয়াছিলাম, কিন্তু ঘটনা-চক্র কে প্রতিরোধ করিতে পারে? সে সকল অত্যাচারের কথা যথা স্থানে বর্ণিত হইবে। আমরা আশায় বুক বাঁধিয়া রওয়ানা হইলাম। কালীপ্রসন্ন বাবু বাগান হইতে কপি শালগম ইত্যাদি তুলিয়া দিলেন এবং কিছু চাউল, ডাইল, লবণ আলু দিলেন। যেন বনবাসের আয়োজন! রাজগৃহ এখন বনবাসের স্থান-বই কি? আমরা শেষ রাত্রে রাজগিরি যাত্রা করিলাম। রাস্তায় ধূলি উড়াইয়া, অসংখ্য তাল বৃক্ষের সারি অতিক্রম করিয়া আমাদের গাড়ী চলিল। বন্ধুহীন অজ্ঞাত বনবাসে চলিলাম! রাজগৃহ বিহার হইতে ১৫মাইল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। আর ২ কথা পরে লিখিব।

পবিত্র কোরাণের সত্যতা। (২)

হাজারাত ওসমানের খালিফা পদে অধিষ্ঠিত হইবার ৩।৪ বৎসর পরে মিসরবাসিগণ বিদ্রোহ করিয়া হাজারাত ওসমানকে নিহত করেন এবং ঐ হত্যার কারণে তাহারা হাজারাত ওসমানের প্রতি কোনও প্রকারের মিথ্যা অপবাদ দিতেও ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা কখনই এরূপ দোষারোপ বা অপবাদ দেন নাই যে, হাজারাত ওসমান কোরাণের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই সময় হইতে এসলাম ধর্ম্মে "সিয়া" ও "খারিজা'' সমাজের উৎপত্তি হয়। এই দুই সম্প্রদায় হাজারাত ওসমানের পরম শত্রু ছিলেন। এই দুই দল আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের নিকট যে কোরাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে,তাহার কোন কোরাণে কোনও প্রকারের বিভিন্নতা নাই, কিম্বা তাঁহারা হাজারাত ওসমানের প্রতি কোরাণ পরিবর্ত্তনের কোনরূপ দোষারোপ করেন নাই। অতএব ইহার দ্বারাও হাজারাত ওসমানের প্রতি সে প্রকারের দোষারোপ হইতে পারে না।

এস্থলে ইহা অবশ্যই জিজ্ঞাস্য যে, যদ্যপি কোরাণে কোন প্রকারের পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহা হইলে এখন পর্য্যন্ত এসলাম ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যবহারপদ্ধতিতে নানারূপ বিভিন্নতা থাকিবার কারণ কি? এই সকল বিভিন্নতার জন্য কোরাণ কোন প্রকারে দায়ী নহে; ঐরূপ বিভিন্নতা থাকিবার কারণ এই যে, প্রেরিতপুরুষকে যে কোন প্রকার বিধিপদ্ধতি অনুসরণ করিতে দেখিলেন,শিষ্যগণ সেই সকল পালন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে,বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনে নানা ধর্ম্মশাখায় বিভিন্নতা হইয়া কয়েক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। কিন্তু যদ্যপি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্যে এসলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ প্রেরিত পুরুষের আদেশের বিপরীতে খালিফাগণের আদেশের অনুগামী হইতেন এবং পূর্ব্ব পঠিত কোরাণকে ছাড়িয়া দিতেন, তাহা হইলে নামাজের মত উপাসনা, যাহা প্রতিদিন পাঁচ বেলা করিয়া পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের বিশেষ একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাতে কোন প্রকার বিভিন্নতা থাকিত না। কিন্তু এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মতের বিভিন্নতা পূর্ব্বেও ছিল এবং এখন পর্য্যন্তও রহিয়াছে। হাজারাত ওসমানের পরিবর্ত্তন করা কোরাণকে সকলে মান্য করিয়া, নিজেদের পূর্ব্ব সরল ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। অন্ততঃ পক্ষে ঐ সকল কোরাণে এইরূপ লিখিত থাকিত যে,পূর্ব্বে হাজারাত পয়গাম্বরের সময় কোরাণে এইরূপ লিখিত ছিল, পরে খালিফাগণ তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া এইরূপ লিখিয়া দিয়াছেন। কিম্বা এই সকল শব্দ পূর্ব্বে কোরাণে ছিল না,পরে খালিফাগণ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ কথা আজ পর্য্যন্ত কোন কোরাণে দেখা যায় নাই। অতএব এই সকলের দ্বারা ইহা প্রমাণ হইতেছে যে, যে কোরাণ আরবী পয়গাম্বরের সময়ে অবতীর্ণ ও সম্পূর্ণ হইয়াছিল, সেই কোরাণ আজ পর্য্যন্ত বিনা পরিবর্ত্তনে এসলাম সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে।

এক্ষণে ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারায় কোরাণের অলৌকিকতার দাবি সাব্যস্ত

করার আবশ্যক। পাঠকগণ ইহা অবগত থাকিবেন যে, আজকাল যেরূপ সপ্তাহে সপ্তাহে নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠিত হইয়া বিনা আপত্তিতে স্ব স্ব মতে ধর্ম্ম চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন, এসলাম আবিষ্কার কালে তদ্রূপ ছিল না। সে কালের ভয়াবহ প্রাচীন কাহিনী স্মরণ করিলে হৃদয়গ্রন্থিও শিথিল হইয়া যায়। সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত জাতি একপক্ষ হইয়া এই অসহায় এসলাম ধর্ম্মকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য কতই ভয়াবহ ঘটনা ঘটাইয়াছিলেন। প্রকাশ্যে ধর্ম্মচর্চ্চা করা দূরের কথা, গোপনে লুক্কায়িতভাবে ধর্ম্ম আলোচনা করাও কষ্টকর ছিল। এসলাম ধর্ম্ম আবিষ্কারকালে আরব দেশে বহুসংখ্যক খ্রীষ্টান ইহুদি বংশানুক্রমে বসতি করিয়া আসিতেছিলেন এবং অধিকাংশ আরববাসিগণ, যাহারা নিজ ধর্ম্ম ছাড়িয়া ইহুদি বা খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যেও অনেকেই শিক্ষিত ও বিদ্বান ছিলেন এবং তাঁহাদের ভাষাও আরবি ছিল। তাঁহারা এসলাম ধর্ম্মকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য অনর্থক যুদ্ধ করিয়া নানা প্রকারের কষ্ট ও যাতনা উপভোগ করিলেন, পরিশেষে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, ঈর্ষা ও বিদ্বেষের জন্য জন্মভূমি আরব দেশ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। এই প্রকারের কষ্ট স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না, কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে ইহাপেক্ষা জব্দ করার আরো উপায় ছিল। কোরাণের সদৃশ আরো একটী রচনা করিয়া আরবি পয়গম্বরকে দেখাইতে পারিতেন যে, আপনারা যে কোরাণকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া সম্মান করিতেছেন, আমরা নিজে ঐ প্রকার কোরাণ রচনা করিয়াছি। এইরূপ দেখাইতে পারিলে, আরবি পয়গাম্বর কোরাণের ঐ অলৌকিক দাবিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেন, কিম্বা পুনরায় ঐরূপ দাবী করিতে লজ্জিত হইতেন। কিন্তু এ প্রকার কোন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের দ্বারায় আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। কেহ মনে করিতে পারেন যে, ঐরূপ কোরাণ সেই সময়ে কেহ রচনা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু আরবি পয়গাম্বর তাঁহাদিগের নিকট হইতে ঐ কল্পিত কোরাণ বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া তাঁহাদিগকে আরব হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া থাকিবেন। যদি একথা সত্য হইত, তবে তাঁহাদের ইহা একান্ত উচিত ছিল যে, তাঁহারা দূর দেশে থাকিয়া আপনাদের রচিত কোরাণকে আপনাদের সত্য প্রমাণের জন্য নিকটে রাখিয়া এসলামের শত্রুগণকে দেখাইতেন ও তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিতেন। তাহা সেকালে কেহ করেন নাই। এস্থলে কেহ তর্ক উপস্থিত করিতে পারেন যে, সেকালে ঐ প্রকার অনেকগুলি মনুষ্য-রচিত কোরাণ প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু পরে যুদ্ধ বিগ্রহে ঐ সমস্ত কোরাণ একেবারে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহা আর প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই, যে খ্রীষ্টান ইহুদিগণ ঐ সময়ের এসলাম ইতিহাস অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিয়াছিলেন, তাহারা ঐ ইতিহাসে মনুষ্য-রচিত কোরাণের কতকাংশ অনায়াসেই লিখিয়া দিতে পারিতেন কিম্বা ইহা নিশ্চয়ই লিখিয়া দিতে পারিতেন যে, অমুক অমুক শিক্ষিত মহাশয়গণ যে কোরাণ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা মুসলমানগণের দ্বারায় নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহার আর কিছুমাত্র পাওয়া যায় নাই। কিন্তু কোন ইতিহাসের দ্বারায় এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইউরোপ-নিবাসী খ্রীষ্টানগণ, কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত, সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী শ্যাম দেশে আসিয়া আরব-নিবাসী

মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিলেন, অত্যন্ত অনুসন্ধানের সহিত এসলাম ধর্ম্মের ইতিহাস লিখিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহারা এ সংবাদ পাইলেন না যে, কোন খ্রীষ্টান বা ইহুদি কোরাণের ন্যায় কথনও কোন পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এসলাম ধর্ম্মে অপরাধ দিবার জন্য লিখিয়া দিতে পারিলেন যে, দ্বিতীয় খলিফা হাজারাত উমার; আলেক-জেন্দ্রিয়ার পুস্তকালয় পোড়াইয়া দিলেন, কিন্তু যাহা তাঁহাদের আবশ্যকীয় কার্য্য ছিল, অর্থাৎ কোরাণের আলৌকিকতার দাবী মিথ্যা প্রমাণ করাইয়া দেওয়া, তাহা করা-ইতে পারিলেন না। কোরাণ অবতীর্ণ কালে আরব দেশে অনেক গুলি লোক আরবি ভাষায় বিদ্বান ও পারদর্শিতা লাভ করিয়া আরবি ভাষার উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টিত ছিলেন। সে সময় কেহ কোন প্রকারে কোরাণের সমতুল্যতা করিতে পারিলেন না, কোরাণ সে কালের সহস্র সহস্র শত্রুগণের শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বিরাজ-মান থাকিলেন। এ সময়ে জগতের এমন কোন্ জাতি আছেন যে, এই পবিত্র কোরাণের সমতুল্যতা করেন, কি করিতে পারেন? তাহা একেবারে অসম্ভব ও কল্পনার অগম্য।

ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারায় এসলাম প্রমাণ করাইয়া দিয়াছেন যে, আজ পর্য্যন্ত কোরা-ণের ন্যায় রচনা কেহই করিতে পারেন নাই ও ভবিষ্যতে পারিবেন না। এক্ষণে জ্ঞান-সঙ্গত প্রমাণের দ্বারায় ইহা দেখান আবশ্যক যে, মনুষ্য কর্ত্তৃক কোরাণের অনুরূপ রচনা হওয়া সম্ভব কি অসম্ভব। যদি অসম্ভব হয়, তবে তাহার কারণ কি? এসলাম এই অসম্ভবতার অনেকগুলি কারণ দর্শাইয়াছেন। পবিত্র কোরাণে গোপনীয় ঈশ্বর ভাবের ব্যাখ্যা ও গত সময়ের প্রকৃত ঘটনা এবং ভবিষ্যতের বাণী (যাহা মানব জ্ঞানের অতীত এবং যাহার ক্রমশঃই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে) এরূপ উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে, যাহা মানব বুদ্ধিতে কদাচই হইতে পারে না। কোরাণে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথা সকল যে প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মানব রচনায় পাওয়া যায় নাই। কোরাণ সদৃশ ক্ষুদ্র পুস্তক যেরূপ সম্পূর্ণ আবশ্যকীয় ধর্ম্ম বিষয়ে পরিপূর্ণ রহি য়াছে, মনুষ্য-রচনায় তদ্রূপ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারেনা। মনুষ্য আপন সামান্য বুদ্ধিতে অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত যতই কেন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করুক না কেন, তত্রাচ তাহাদের বুদ্ধি ও বিদ্যা অসম্পূর্ণ থাকা প্রযুক্ত, তাহা-দের রচনায় অনেক স্থানে অনেক প্রকারের অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে, কিম্বা প্রকৃত ঘটনার অনেক বিপরীত ভাব পাওয়া যাইবে। পবিত্র কোরাণে সে দোষ আদৌ নাই। মানব স্বভাবে ক্রোধের সময় দয়া ও দয়ার সময় ক্রোধ কথনই উদিত হয় না, কিন্তু কোরাণের যে স্থানে ঈশ্বরের ক্রোধের বিষয় বর্ণনা হইয়াছে, সেই থানেই ঈশ্বরের দয়া ও দোষ মার্জ্জনার অঙ্গীকার ও পর-কালের সুখ সম্পদের বিষয় বর্ণনা করা হই-য়াছে। অনেক কবি ও গ্রন্থকর্ত্তাগণকে দেখা গিয়াছে, তাঁহারা বিশেষ কোন এক প্রকারের গ্রন্থ রচনা করার পারদর্শিতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ যুদ্ধের বর্ণনা বেশ লিখিতে পারেন, কেহ প্রেম-কবিতা রঞ্জিত করিতে পারেন, কেহ প্রকৃতির চিত্র বেশ অঙ্কিত করিতে সক্ষম, কিন্তু কোন ব্যক্তিই প্রত্যেক প্রকারের রচনা, সমতুল্য ভাবে করিতে পারেন না। কোরাণের অবস্থা ইহার ঠিক বিপরীত। ইহাতে প্রত্যেক প্রকারের রচনা

অতি উৎকৃষ্ট রূপে বর্ণিত রহিয়াছে। এই প্রকারের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রচনার বিদ্যমানতায় কোরাণ প্রমাণ করিতেছে যে, ইহা মনুষ্য রচিত নহে। এই সকল প্রমাণের মধ্যে চিন্তা করিলে এরূপ একটী অকাট্য প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়,যাহার আলোচনা করিলে আর তিল মাত্র সন্দেহ থাকে না, কোরাণ কখনই মনুষ্য-রচিত গ্রন্থ নহে, ইহা অবশ্যই ঈশ্বর-প্রেরিত।

জগতে আমরা যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, সে গুলি দুই ভাগে বিভক্ত। কতকগুলি ঈশ্বর-সৃজিত (natural) এবং আর কতকগুলি মনুষ্য নির্ম্মিত (artificial)। ঈশ্বর সৃজিত বস্তুর যে গুণাগুণ আমরা দেখিতে পাই, তাহা মনুষ্য-নির্ম্মিত বস্তুতে দেখিতে পাই না। ঈশ্বর-সৃজিত বস্তুতে যে গুণাগুণ পূর্ব্বে ছিল,এখনও তাহাই রহিয়াছে ও ভবিষ্যতেও তাহাই থাকিবে। উপযুক্ত দুই শ্রেণীর বস্তুর তথ্য বুঝিয়া লইবার জন্য জগদীশ্বর মানব-হৃদয়ে এরূপ একটী স্বাভাবিক জ্ঞান দিয়াছেন, যদ্দ্বারা মনুষ্য কোন একটী বস্তু দেখিলেই তাহা ঈশ্বর-সৃজিত বা মনুষ্য নির্ম্মিত, সহজে বুঝিতে পারেন। নানা জাতির এই জ্ঞানকেই প্রাকৃতিক জ্ঞান বলে। এই জ্ঞানে, সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, কোরাণ মনুষ্য-রচিত নহে, ঈশ্বর প্রেরিত।

শ্রীসৈয়দ আবদুল গফার।
(মেদিনীপুর)

সান্ত্বনা

শূন্য ঘরখানি প'ড়ে আছে ওই,
শূন্য খাঁচা গেছে ভেসে;
সোনার পাখীটি উড়িয়া উড়িয়া
গিয়াছে সোণার দেশে।
হেথায় যাহারা রয়েছে পড়িয়া,
ল'য়ে আছে অন্ধকার;
শূন্যময় বুক, শূন্যময় প্রাণ,
দুনয়নে শতধার।
গেছে মনোরমা, নাই সে প্রতিমা,
শিশুগুলি কেঁদে সারা;
কার মুখ চাবে? কার কাছে যাবে?
কোথা শান্তি পাবে তারা?
মা ছিল যখন, সকলি ত ছিল;
মা নাই, কেহই নাই;
একা মা বিহনে যেন তাহাদের
শূন্যময় সব ঠাঁই!
এক মা হারায়ে মা-হারা তাহারা
কত মা ফিরিয়া পেলে;
তবু কি অবোধ মানে সে প্রবোধ?
মাকে চায় মার ছেলে।
মা-ছাড়া যাহারা যায়নি—থাকেনি
একদিন কোন খানে;
মা-ছাড়া তারা যে থাকিতেও পারে,
স্বপনেও নাহি জানে।
কাছে আছে যারা, চিরদিন তারা,
রহিবে, যাবে না ফেলে;
এই যারা জানে, মৃত্যু কারে বলে—
কি বুঝে দুধের ছেলে?
যেখানেই যাক, আসিবে মা ফিরে;
তারা চায় ধ'রে আনে;
গেলে একবার, আসে না যে আর;
কে মানায়—কে বা মানে?
কিছুতেই তারা বুঝিতে চাহে না,
আসিবে না মা যে আর;
"নিশ্চয় আসিবে, আজ নয় ক'াল;"
বুঝেছে তাহারা সার।
"হয় ত বা ঘরে এসে এতক্ষণ
চুপ ক'রে ব'সে আছে;
চল্ যাই ভাই, দেখে আসি মাকে,
ছুটে যাই মার কাছে।"
বার বার তারা মা মা ব'লে তাই
মার ঘরে ছুটে যায়;
মা বুঝি লুকাল? আতি পাতি খোঁজে,
খুঁজে খুঁজে নাহি পায়।

এঘর ওঘর, খোঁজে সব ঘর,
বিরক্তি বিশ্রাম নাই;
বলাবলি করে, "একবার যদি—
একবার ধরা পাই!"
"বাড়ীতে ত নাই! কোথা গেল ভাই?
গেছে বুঝি গঙ্গাস্নানে?"
জানালার ধারে ব'সে থাকে তারা,
চেয়ে থাকে পথপানে।
বেলা হ'ল কত, তবু পথ চেয়ে,
আঁখি জলে বুক ভাসে;
"এল না কেন মা? কেন মা এল না?"
কেঁদে কেঁদে ফিরে আসে।
"তবে কি লুকায়ে বেড়াতে গেছে মা?
কারো বাড়ী ওপাড়ায়?"
এল না এবেলা, আসিবে ও বেলা;
ওবেলা এল না হায়!
এবেলা—ওবেলা, এল কত বেলা,
কত বেলা গেল—এল!
মার বেলা কই এল না ত আর?
মা যে গেল—সেই গেল!
"গেছে কি মা তবে মামার বাড়ীতে?"
শিশুরা সেখানে যায়;
সেখানেও কই, মাকে নাহি পায়;
"মা তবে গেল কোথায়?"
একবার যদি, দেখা পায় মাকে,
ধ'রে আনে গিয়ে ছুটে;
কত আবদার, কত তিরস্কার,—
করে মার কোলে উঠে।
সত্য কি মা ব'লে ডাকিলে তাহারা,
সেখানে মা সাড়া দেয়?
এত যে ক্রন্দন, শুনে কি মায়ের
সাধ হয় কোলে নেয়?
কে জানে কোথায় ফুরাবে তাদের
মা মা ব'লে অন্বেষণ!
কে জানে সে কবে ফিরে পাবে তারা
তাদের সর্ব্বস্ব-ধন!
চলে যায় দিন, ব'য়ে যায় মাস;
অতীত না ফিরে চায়;
ধীরে ধীরে তার বিস্মৃতি-বসন
টেনে দেয় সব গায়।
শেষে একদিন আপনারা তারা
বুঝিয়াছে—বুঝায়েছে;
"ধরাধরি, করে, ওরে ভাই, মাকে
পাঠশালে নিয়ে গেছে!"

শ্রীকালীনাথ ঘোষ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১৯। ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল প্রণীত, মূল্য ৸০। এই পুস্তকে মহাকবি ভবভূতি, শঙ্করাচার্য্য, কবিরাজ রাজশেখর, কবি ভর্ত্তৃহরি, চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর, রাজা ভোজদেব, জগদ্ধব ঠাকুর, এবং স্মার্ত্ত মিত্রমিশ্র প্রভৃতি প্রবন্ধ আছে। ত্রৈলোক্যনাথ নব্য-ভারতের পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার গবেষণা, তাঁহার সত্যানুসন্ধান-পিপাসা, তাঁহার গভীর জ্ঞানানুরাগ এখন সকলের হৃদয় মন আকর্ষণ করিয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস এবং কবি বিদ্যাপতি যাহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই একবাক্যে ত্রৈলোক্য বাবুর ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন। অসাধারণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত রাজেন্দ্র লালের স্বর্গারোহণের পর বঙ্গদেশে প্রত্নতত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক আলোচনা একরূপ নিবিয়া গিয়াছে। এই অন্ধকারময় বঙ্গগৃহে ঐতিহাসিক জ্ঞানের ক্ষীণ প্রদীপ হস্তে লইয়া বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সকলকে এই পথে আহ্বান করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, এত প্রশংসা সত্ত্বেও বড় কেহ তাঁহার পুস্তক কিনিয়া পড়ে না। বঙ্গদেশের ইহা একটা অমার্জ্জনীয় দোষ। বঙ্গদেশ যেন ঘোর তিমিরে, ঘোর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। এই পুস্তকে এই সকল মহাজনদিগের আবির্ভাব কাল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাঁহাদের জীবনের এবং লেখার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং প্রতিভা স্ফূর্ত্তির ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধ-

মালায় ত্রৈলোক্য বাবু যে গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছি। এ সকল প্রবন্ধ নবভারতে প্রকাশিত হয় নাই, হইলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেন, এই পুস্তক কত মনোহর হইয়াছে। ত্রৈলোক্য বাবু সংস্কৃতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তাঁহার ভাষাজ্ঞান অসাধারণ। তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যে অধিকার অপরিমেয়। ত্রৈলোক্য বাবু বাঙ্গালা ভাষায় এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে গৌরবান্বিত করিতেছেন। তাঁহার ন্যায় একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি, গবর্ণমেণ্টের চাকুরীতে থাকিয়াও, বাঙ্গালা সাহিত্য-পরিপুষ্টির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া শরীরের রক্ত জল ও কষ্টে উপার্জিত অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতেছেন, ইহা আমাদের ভাষার ও দেশের পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আমরা এমনই অপদার্থ, আমরা এরূপ পুস্তকের আদর করা দূরে থাকুক, তুচ্ছ এবং ঘৃণা করিয়া দূরে নিক্ষেপ করি! অথচ মুখে বলি—"বাঙ্গালায় ভাল বই হয় না!" হায়রে দুর্ভাগ্য! সংস্কৃত সাহিত্যের এরূপ বিস্তৃত আলোচনা এবং কবিদিগের সমালোচনা বাঙ্গলা ভাষায় আর প্রকাশিত হয় নাই। সকলের নিকট বিনীত নিবেদন, সকলে গ্রন্থকারের এক এক খানি পুস্তক ক্রয় করিয়া দেখুন। কি অপূর্ব্ব জিনিস হইয়াছে, বুঝিবেন। আমরাও শ্রীযুক্ত আর, সি, দত্ত মহোদয়ের সহিত একবাক্যে বলি,

"The attempt is the first of its kind in our language."

ভট্টোজীদীক্ষিত ১৩০২ সালের শ্রাবণ মাসের নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছে, সে প্রবন্ধটী ইহাতে নাই। এই প্রবন্ধের অনুরূপ সকল প্রবন্ধে এই পুস্তক পূর্ণ। ত্রৈলোক্য বাবুর আবির্ভাবে তাঁহার পিতার কুল উজ্জ্বল এবং বঙ্গভূমি ধন্য হইয়াছে।

২০। প্রবোধ-সঙ্গীত।—শ্রীবিহারিলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৷৷০। এখানি কবিতাপুস্তক। লেখক ভাব অপেক্ষা দুরুহ শব্দ প্রয়োগের পক্ষপাতী, সৌন্দর্য্য যেজ অপেক্ষা জটিলতা বিন্যস্তের অধিক প্রয়াসী; যথা—

"অরোরা কিরণে রাকা চিরদিন,
বিকীরে জোছনা রাশি।
তুষার মসৃণ শয়নে অরুণ
মাখে কোমলতা, রাশি।"

২১। শ্রীহরিদাস ঠাকুর।—শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৷৷০। প্রধানতঃ চৈতন্যচরিতামৃত এবং চৈতন্য-ভাগবত অবলম্বনে পরম সাধু হরিদাসের এই জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে। হরিদাস যবন কিনা, এ সম্বন্ধে অনেক বাদ প্রতিবাদ হইয়াছে, সম্যক মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থকার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তিনি যবন ছিলেন। হরিদাস একজন প্রকৃত হরিভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তি, যে কুলকেই তিনি পবিত্র করিয়া থাকুন, তিনি সকলের প্রণম্য। এই সাধুর জীবনচরিত সম্বন্ধে যত আলোচনা হয়, ততই ভাল। ভগবদ্ভক্ত ৺ জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় হরিদাস সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। বহুদিন পরে আমরা অঘোর বাবুর উদ্যম ও চেষ্টা দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। বিধাতা তাঁহার মঙ্গল করুন। তবে একটী কথা এই, গভীর বৈষ্ণবশাস্ত্র-সিন্ধুতে এখনও তাঁহার অবগাহন হয় নাই। এজন্য অনেক কথা ভাসা ভাসা বোধ হয়।

২২। গোধন-রক্ষক বা গোধন চিকিৎসা পুস্তক—শ্রীসচ্চিদানন্দগীতরত্ন গো-তীর্থ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৷৷০, সমর্থ পক্ষে ১৲। ১৩নং বিন্দুপালিতের লেনে (রামবাগানে) পাওয়া যায়। মনুষ্যের জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন গোকুল। গোকুল রক্ষার্থ যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের একান্ত ধন্যবাদের পাত্র। গো-চিকিৎসার বিবিধ কথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গো-বসন্ত প্রকরণে, আমাদের মনে হয়, নব্যভারতে বাবু নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত সারবান কথা সকলের চুম্বক সন্নিবিষ্ট করিলে অনেকটা ভাল হইত। এ সম্বন্ধে নিত্যগোপাল বাবু বিস্তৃত ভাবে তাহা লিখিয়াছেন, ইহাপেক্ষা বাঙ্গলা ভাষায় আর অধিক কথা লেখা হয় নাই। যাহা হউক, এই পুস্তক যাঁহারা প্রকাশ করি-

য়াছেন, এবং যাহারা এই পুস্তক প্রকাশ করিতে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এই পুস্তক প্রচার দ্বারা যে দেশের প্রভূত উপকার হইবে,সে বিষয়ে হিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

২৩। ছত্রপতি শিবাজী।—শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত,মূল্য ১৷৷০। শিবাজী হিন্দুকুল গৌরব অথবা ভারতের গৌরব। বাঙ্গালা ভাষায় এই মহাত্মার জীবনচরিত ছিল না বলিয়া আমাদের দুঃখের সীমা ছিল না। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহোদয়ের পিতৃদেব তাঁহাকে শিবাজীর জীবনী লিখিতে আদেশ করেন। তদনুসারে তিনি, দাক্ষিণাত্য দেশ ও কোকন প্রদেশের যে সকল স্থলে শিবজী জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত করিয়া, ছিলেন, তাহা পরিদর্শন করিয়া এই মহাত্মার জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মহারাষ্ট্রীয়,হিন্দী, সংস্কৃত ও ইংরাজি বহুবিধ গ্রন্থ-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া এই অপূর্ব্ব রত্ন তুলিয়া বঙ্গ ভাষার মস্তকে উপহার দিয়াছেন। তাঁহার পরিশ্রম, যত্ন, গবেষণা, অধ্যবসায়,অর্থ ব্যয়—সব সার্থক হইয়াছে,আমরা মনে করি। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল,মধুর, তেজস্বিনী। এই বীরের জীবনী লিখিতে ভাষায় যে যে গুণ থাকার প্রয়োজন, তাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখনীর প্রভূত আছে বলিয়া আমরা মনে করি। এই অধঃপতিত বাঙ্গালার ঘরে ঘরে পুণ্যশ্লোক, ক্ষণজন্মা, মাতৃভূমির গৌরব শিবাজীর এই জীবনকাহিনী অধিত,পঠিত এবং অনুকৃত হউক, আমাদের ইহাই একমাত্র কামনা এবং প্রার্থনা।

২৪। কাতন্ত্ররূপমালা ব্যাকরণম্। 'রৈক' লল্লুরামাত্মজ জীবরাম শাস্ত্রিনা সংশোধিতাম্। মুম্বই (বোম্বে) নির্ণয়সাগরাখ্যযন্ত্রালয়ে দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত ও হীরাচন্দ্র নেমিচন্দ্র শ্রেষ্ঠী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। ইহাতে সটীক কলাপ সূত্র দুইভাগে সম্পূর্ণ হইয়াছে। সূত্রগুলির ক্রমানুসার ও সমাবেশ বাঙ্গালার চলিত সাধারণ ব্যাকরণ হইতে অনেক স্থলে বিভিন্ন ও উল্টাপাল্টা। টীকা সংক্ষিপ্ত হইলেও সরল, সুন্দর এবং অর্থ-প্রকাশিকা। আমরা যতদূর দেখিয়াছি, ইহা বিশুদ্ধ সংস্করণ বলিয়া বোধ হইল। ছাপা ও কাগজ ভাল। সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে কলাপ সূত্রগুলি অতি সরল। পূর্ব্ব বঙ্গের কোন কোন স্থান ভিন্ন এদেশে কলাপের প্রচলন বিরল। এ গ্রন্থ দেবনাগরী অক্ষরে পরিচিত কলাপ অধ্যায়ী এবং অধ্যাপক উভয়ের নিকটই আদরনীয় হইবে।

২৫। কতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়া।—রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়াধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারেণ বিরচিতা। মূল্য ২ টাকা। পাণিনিব্যাকরণে দুইটী প্রক্রিয়া আছে। একটী লৌকিক, অন্যটীর নাম বৈদিক। রামায়ণ মহাভারত কাব্য নাটক আখ্যায়িকা,পুরাণ স্মৃতি জ্যোতিষ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যবহৃত পদ সমূহের নাম লৌকিক প্রয়োগ। উহারা লৌকিক প্রক্রিয়ার সূত্রের দ্বারা সাধিত হয়। আর বেদে যে সকল পদ ব্যবহৃত আছে, উহা বৈদিক প্রক্রিয়ার সূত্রের সাহায্যে নিষ্পন্ন করিতে হয়।

কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণের প্রণেতা সর্ব্ববর্ম্মা আখ্যাত পর্য্যন্ত রচনা করেন,অপর অংশ প্রসিদ্ধ বলিয়া উপেক্ষা করেন। কাত্যায়ন কৃদন্ত শব্দ সমূহসাধনের সূত্র রচনা করেন। দুর্গসিংহ সর্ব্ববর্ম্মকৃত সূত্র ও কাত্যায়ন সূত্র সহজবোধ্য করিবার নিমিত্ত বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই কয়টী লইয়া কলাপ ব্যাকরণ। ইহাতে এক প্রকার বৈদিক প্রক্রিয়া নাই বলিলেই চলে। কাত্যায়ন কদাচিৎ কৃদন্তের দুই চারিটী বৈদিক পদ সাধনের সূত্র রচনা করিয়াছেন।

আমাদের মহামহোপাধ্যায় তর্কালঙ্কার মহাশয় বৈদিকপ্রয়োগে বঞ্চিত, কলাপ ব্যাকরণ ব্যবসায়ীদের উপকারের নিমিত্ত কলাপব্যাকরণে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ গ্রহণ পূর্ব্বক কাতন্ত্রচ্ছন্দ প্রক্রিয়া রচনা করিয়াছেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহ রচনা দ্বারা যে যশোরাশি সঞ্চিত করিয়াছেন, এই গ্রন্থের দ্বারা তাহার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। সূত্র ও বৃত্তি গুলি বেশ সহজবোধ্য হইয়াছে। তবে

অন্যান্য বৈয়াকরণদের ন্যায় ইনিও সম্পূর্ণ পাণিনির পদানুসরণ করিয়াছেন। পারিভাষিক শব্দগুলি ব্যতীত আর সমস্তই পাণিনি সূত্রের রূপান্তর মাত্র। পাঠকদের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য আমরা নিম্নে পাণিনি সূত্র ও কাতন্ত্রচ্ছন্দ প্রক্রিয়ার সূত্র উদ্ধৃত করিলাম।

ষষ্ঠীযুক্তশ্ছন্দসিবা। পাণিনি ১।৪।৯

ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত পদের সহিত পতি শব্দের ঘিসংজ্ঞা হয় বিকল্পে বেদ বিষয়ে। উদাহরণ ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং।

ষষ্ঠীযুক্তঃ পতিরগ্নিষ্টাদৌবা।১।

কাতন্ত্রচ্ছন্দ প্রক্রিয়া ৫০ পৃষ্ঠা।

পাণিনিতে যাহাকে ঘি সংজ্ঞক করা হইয়াছে, কলাপ ব্যাকরণে উহাকে অগ্নি সংজ্ঞক বলা হইয়াছে। বিকল্পে ঘি অথবা অগ্নি সংজ্ঞক হইল সুতরাং ষষ্ঠ্যন্ত ক্ষেত্রস্য এই পদের সহিত যুক্ত পতি শব্দের তৃতীয়ার এক বচনে পত্যা না হইয়া পতিনা হইল। পাণিনি, ছন্দসি বেদবিষয়ে স্পষ্ট বলিয়াছেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় বারংবার ছন্দসি শব্দ ব্যবহার না করিয়া প্রথম সূত্রে ছন্দসি বলিয়া উহার অনুবৃত্তি টানিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু এখানে টাদৌ এই পদটী কেন ব্যবহার করিলেন, বলিতে পারি না। প্রসক্তি থাকিলে তাহার প্রতিষেধ করা উচিত, কিন্তু পতিশব্দের সু ঔ জস্ অম্ ঔট শস্ বিভক্তিতে অগ্নি সংজ্ঞা হইলেও যে পদ হইবে, না হইলেও সেই পদই হইবে। সে যাহা হউক, ভাগীরথীর উভয় তীরে যে প্রকার মুগ্ধবোধের বহুল প্রচার, পদ্মা নদীরও উভয় তীরেও সেই প্রকার কলাপ ব্যাকরণের বহুল প্রচার। আশাকরি, বিক্রমপুর প্রদেশস্থ বৈয়াকরণ মহাশয়েরা অভিনব কাতন্ত্রচ্ছন্দ প্রক্রিয়াখানি অঙ্গে আভরণ স্বরূপ লাভ করিয়া সুখী হইবেন।

২৬। সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্। শাঙ্করভাষ্যতদনুবাদসমেতম্ শ্রীকালীবরবেদান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ সম্পাদিতম্। শ্রীসারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়েন প্রকাশিতম্। মূল্য ৸৹। যেমন অর্জ্জুনের প্রশ্ন ও ভগবান্ কৃষ্ণের প্রদান প্রসঙ্গে "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" রচিত হইয়াছে, তদ্রূপ ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন ও ব্রহ্মার অন্যতম পুত্র সনৎসুজাত বা সনৎকুমারের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে এই সনৎসুজাত অধ্যাত্মশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত, আর এই অধ্যাত্মশাস্ত্র উদ্যোগ পর্ব্বান্তর্গত। উভয়েরই প্রতিপাদ্য বিষয় ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, তবে ভগবদ্গীতার ন্যায় উচ্চতম ভাবপূর্ণ না হউক, ইহা যে একখানি উচ্চশ্রেণীর অধ্যাত্মগ্রন্থ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা এই গ্রন্থ পাঠে প্রাণে শান্তি পাইবেন। এই গ্রন্থের ২।১টী শ্লোক উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল, স্থানাভাব প্রযুক্ত হইল না। এই গ্রন্থখানি বঙ্গদেশে প্রচারিত ছিল না। শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে নাসিক হইতে এই গ্রন্থখানির সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। বঙ্গের অন্যতম দার্শনিক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় ইহার সম্পাদন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন ও পূর্ব্বোক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রকাশ করিতেছেন। বঙ্গদেশে অমুদ্রিতপূর্ব্ব এই গ্রন্থপ্রচারের জন্য আমরা সম্পাদক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২৭। কল্লোলিনী।—শ্রীমতী মৃণালিনী প্রণীত, মূল্য ১৷৹। শ্রীযুক্ত তারাগতি ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত। মৃণালিনীর এইখানি তৃতীয় গ্রন্থ। পূর্ব্বগ্রন্থ দুখানির আমরা বিশেষ প্রশংসা করিয়াছি। এই পুস্তকে বিশেষ পরিচয়ের কিছুই নাই। আমাদের বিবেচনায় গ্রন্থকর্ত্রীর কবিতা নির্ব্বাচনে যথেষ্ট দোষ আছে। গ্রন্থকর্ত্রী লিখিতে অনেক পারেন, কিন্তু সকলই যে ছাপাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। এই পুস্তকের অনেক গুলি কবিতাই প্রকাশের অযোগ্য। অধিক গ্রন্থ প্রকাশ না করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী সর্ব্ববিষয়ে একটু সংযত হইয়া চলিলে ভাল হয়। "কল্লোলিনী" লেখিকার পূর্ব্বার্জ্জিত যশোরাশি কিছু বিধ্বস্ত করিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

গরিব-সেবা।

যত্র মন তত্র ধন।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে একটী ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন। তিনি নির্ধন, বান্ধবহীন ছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি গরিব-সেবাতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই পবিত্র কার্য্যে অদ্য কম করিয়া তিনি বাৎসরিক বিংশতি লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন। পৃথিবীর নানা দিগ্দেশস্থ অশীতি সহস্র দাতা এই টাকা দিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ এই পুণ্যকার্য্যে দুই ক্রোড় টাকার অধিক ব্যয় করিয়াছেন, এই ব্যক্তি কে, এবং কিরূপে এই অদ্ভুত কাণ্ড সম্পন্ন হইতেছে? এই আশ্চর্য্য কাহিনীর বর্ণনা করিতেছি।

এই মহাত্মার নাম বর্ণদ, ইনি আয়র্লণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জনক স্পেনীয়-বংশে জর্ম্মানীদেশে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার জননী জাতিতে ইংরাজ, কিন্তু আয়র্লণ্ডে ভূমিষ্ঠ হন। সুতরাং বর্ণদের শোণিতে জর্ম্মানী, স্পেন, ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের বিমিশ্রিত অংশ ছিল। তরুণ বয়সে তাঁহার বোধ হইল, তাঁহার জীবন পাপময়। তারুণ্যেই তিনি তাঁহার জীবন পাপ হইতে মুক্ত করিয়া পুণ্য কার্য্যে উৎসর্গ করিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন,—পাদ্রী হইয়া চীনদেশে যাইব, সেখানে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিব। এইরূপ স্থির করিয়া চিকিৎসা ও ধর্ম্মতত্ত্ব উভয়ই আলোচনা করিতে লাগিলেন। লণ্ডনের একটী হাঁসপাতালের ছাত্র হইলেন। এই সময়ে লণ্ডনে ভয়ানক বিসূচিকা মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইল। যেমন এক পক্ষে অনেকে ভয়ে পলায়ন করিল, তেমনি অপর পক্ষে অনেকে, বিনা বেতনে রোগী-সেবার জন্য আত্মসমর্পণ করিলেন। ডাক্তার বর্ণদও তাহাই করিলেন, বাড়ী বাড়ী যাইয়া গরিবদিগের সেবা করিতে লাগিলেন। এই সময় দীনজনের দুর্দ্দশা তাঁহার নয়নগোচর হইতে লাগিল। তিনি দিবসে হাঁসপাতালে ও শবচ্ছেদ-গৃহে কার্য্য করিতেন, রাত্রিতে প্রয়োজনীয় পাঠ করিতেন। আর প্রতি সপ্তাহে দ্বিরাত্রি এবং সমগ্র রবিবার একটী অনাথ পাঠাশালায় বিনা বেতনে শিক্ষা দিতেন। এই পাঠশালা তিনি নিজে স্থাপন করিয়াছিলেন। উপযুক্ত গৃহের অভাবে একটী গর্দ্দভের আস্তাবলে তাঁহাকে এই পাঠশালা বসাইতে হইয়াছিল। একদিন শীতকালে—রজনী প্রায় দুই প্রহর, বর্ণদ সে অনাথ পাঠশালায় আসীন। ছাত্রগণ চলিয়া গিয়াছে। যুবক সমুদায় দিবসের অবিরাম শ্রমে ও সেই রজনীর অধ্যাপনায় ক্লান্ত-কলেবর—কি ভাবিতেছেন? বুঝি, জীবনতরি সংসার-সাগরে কোন্ কোন্ পথ দিয়া চালাইয়া কোন্ কোন্ বন্দরে উঠিবেন, পরোপকারের বিপুল বাণিজ্য কিরূপে বিস্তৃত করিবেন, বিভুচরণে কিরূপে আত্মাকে এককালে উৎসর্গ করিয়া দিবেন—বুঝি, তাহাই ভাবিতেছেন। গৃহের প্রজ্জলিত পাবক শীত নিবারণ করিতেছে এবং তাহার আভা যুবকের বদনমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়াছে। এমন সময়ে সেই গৃহে এক মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। পাঠক যেন মনে না করেন যে, নির্ব্বাত দীপ-প্রদীপ্ত রঘুকুলমণিকক্ষে রাজলক্ষ্মীর ন্যায় কোন দেবী দয়া করিয়া আবির্ভূত হইলেন; অথবা অমরাবতীবাসী পার্থ-শয়ন-মন্দিরে

পুরন্দর-প্রেরিত অপ্সরাবৎ কোন সুন্দরী মহাত্মা বর্ণদকে প্রলোভিত করিতে আসিলেন। না, তাহা নহে। এ মূর্ত্তি মধ্যে কল্পনার মাধুরী বা কবিত্বের লহরী নাই, এই মূর্ত্তি নিতান্ত শুষ্ক, কঠিন, সদ্যবৎ। ইহা আর কিছু নহে, এক অনাথ অর্দ্ধনগ্ন শীতকম্পিত অস্থিসার ভিক্ষুক বালকের মূর্ত্তি। পৌরাণিক পাঠক হয়ত বলিবেন, ভিক্ষুক বালক হইলেই যে তাহার ভিতর কবিত্ব বা ধর্ম্মপ্রাণমর্ম্ম থাকিতে পারে না, এমন নহে। বিষ্ণু বামনদেবরূপে ভিক্ষুক সাজিয়া বলি রাজাকে ছলিয়াছিলেন। আর হিরণ্ময় রাজার উপাখ্যানে পড়িয়াছি, রাজাকে ছলিবার জন্য ভগবান্ স্বয়ং কুষ্ঠগ্রস্ত ভিক্ষুক সাজিয়া ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। তাই, ভাই, সাবধান। হয়ত ভিক্ষুকের বেশে ভগবান্ আমাদিগের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন। কন্থা স্কন্ধে ভিক্ষুকের সেই শীর্ণদেহের অভ্যন্তরে, নরদেহধারী সেই ভ্রাম্যমাণ মলিনমন্দিরে, স্বয়ং ভগবান্ অধিষ্ঠিত আছেন, জানিও। ভিক্ষুকের রসনা দ্বারা ভিক্ষুকের প্রসারিত হস্তের দ্বারা, ভগবান্ই তোমার নিকট সেবা চাহিতেছেন। যদি ভগবানের দয়ার আশা রাখিতে চাও, যদি নরকাগ্নির ভয় থাকে, তাহা হইলে দ্বারস্থ দীন ভিক্ষুককে তাড়াইও না। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, যিনি কেবল নিজের জন্য পাক করেন, তিনি পাপ ভক্ষণ করেন।

আমি বলিতেছিলাম, নগ্নপ্রায় শীতার্ত্ত এক ভিক্ষুক বালক, সেই রজনীতে, শেষে পাঠশালায় বা বর্ণদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই বালক যে ভগবানের দূত, তাহা বর্ণদ প্রথমে বুঝেন নাই, তিনি যে পথ খুজিতেছিলেন, দীনবন্ধুর কৃপায় এই বালক যে সেই পথ দেখাইয়া দিতে আসিয়াছে, সহসা তাঁহার সে উপলব্ধি হয় নাই। তাই বর্ণদ তাঁহাকে বলিলেন "এত রাত্রিতে এখানে কেন? বাড়ী যাও।" ভগবানের আদেশ পালন না করিয়া—বালক যাইবে কেন!

তাই সে বলিল "আমি কোন ক্ষতি করিব না। আমাকে আজি রাত্রি এখানে থাকিতে দিন্।" "কি আশ্চর্য্য, তুমি রাত্রিতে একা এই স্থলে থাকিবে?

তোমার মা কি ভাবিবেন?"

"মহাশয়, আমার মা নাই।"

"তোমার বাপ?"

"মহাশয় আমার বাপও নাই।"

"সে কি কথা, মিথ্যা বলিও না। মা নাই বাপ নাই, তবে থাক কোথা?"

"আমি কোথায়ও থাকি না।"

বর্ণদ মনে করিলেন, "ছোড়া বলে কি? এত অল্প বয়সেই এমন মিথ্যা কথায় পাকিয়া গিয়াছে।" তিনি তাহাকে জেরা করিতে লাগিলেন। বালক সহজে সত্য কথা বলিল। আরও বলিল, "কেবল আমি নহি, আমার মত গৃহহীন আরও অনেক বালক আছে।" তাহাদিগের মা বাপ বা অন্য কোন আশ্রয়দাতা নাই।"

এই কথা শুনিয়া বর্ণদের বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল, তিনি ভাবিলেন, "এমন অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার প্রত্যক্ষ দর্শন না করিলে প্রত্যয় করিতে পারি না।" ইত্যবসরে বালক শীতে কাঁপিতেছিল, বালককে অগ্নি তাপ দ্বারা শীতার্ত্ত দেহকে উষ্ণ করিতে বলিলেন, এবং উষ্ণ কাফি পান করিতে দিলেন। বালক কাফি সেবনে পরিতৃপ্ত হইল। পরে বর্ণদ নিরাশ্রয় অনাথ বালক বালিকা দর্শনে নির্গত হইলেন। বালক অগ্রে, পশ্চাতে বর্ণদ নিঃশব্দে চলিতেছেন। বর্ণদ তীর্থযাত্রী, অনাথ

বালক বালিকা দর্শন কৌতূহলী। বালক এই তীর্থযাত্রীর পাণ্ডা। রাজবর্ত্ম চতুর্দ্দিকে নিস্তব্ধ —কেবল মাত্র প্রহরীর পদবিক্ষেপ ধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইতেছে। বর্ণদ বলিলেন "কৈ? কোথাও বালক বালিকা দেখি না।"

বালক বলিল "এখনই দেখিবেন।" পাহারাওয়ালার ভয়ে সব বালক বালিকা লুকাইয়া আছে।" বর্ণদ দেখিলেন, সম্মুখে এক দৃঢ় প্রাচীর। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কৈ! তোমার বালক বালিকারা কোথায়?" সেই প্রাচীর শিরোবর্ত্তী সেই ছাদ দেখাইয়া বালক উত্তর করিল "ঐ, উপরে, মহাশয়!" বালক অনায়াসে তাহার উপরে উঠিল, উপর হইতে একটী যষ্টি ধরিল। তাহার সাহায্যে—বর্ণদ কোন মতে উপরে উঠিলেন। তিনি তথায় দেখিলেন, ১১ এগারটী বালক সেই ছাদের উপর শীতে জড়সড় হইয়া শুইয়া রহিয়াছে, তৎক্ষণই সহসা চন্দ্র মেঘবিনির্ম্মুক্ত হইল, এবং সেই নিদ্রিত বালকগণের মুখোপরি চন্দ্রালোক পতিত হইল। সেই নিমীলিতনেত্র বালকগণের শীত-ক্লিষ্ট মুখবৃন্দ হিমানিপীড়িত কুসুমবৎ প্রতীয়মান হইল।

বর্ণদ অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে সহসা যবনিকা উৎক্ষিপ্ত হইল। তিনি যেন দেখিতে পাইলেন, লণ্ডন নগরীর পরিত্যক্ত কুমারগণের দুঃখের অগাধ সাগর তাঁহার সম্মুখে তরঙ্গায়িত। তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, তাঁহার মনে হইল, "কি ভয়ানক অবস্থা। এই বালকগণ গৃহ হীন, কপর্দ্দক হীন, রক্ষক হীন। কেহ তাহাদিগকে সন্তান বলিয়া লয় না, কেহ তাহাদিগের প্রতি চায় না, "হা বিধাতঃ! তোমার লীলা কে বুঝিবে—হায়, ইহাদিগের কিছুই নাই কেন, আমার এবং অজস্র ব্যক্তির সমুদায় প্রয়োজনীয় বস্তু আছে কেন? হে বিভো, তোমার বিধান বুঝি না। যাহাই হউক, অন্ততঃ আমার আশ্রিত এই বালকটীকে উদ্ধার করিতে হইবে।" এদিকে বালক যাহা প্রত্যহ দেখে, তাহাই দেখিতেছিল। সুতরাং তাহার মনে কোন ভাবোচ্ছ্বাস হয় নাই। সে বলিল "ইহাদিগকে জাগাইব কি?"

"চুপ, ইহাদিগকে জাগাইও না," এই বলিয়া বর্ণদ সেই স্থান হইতে ত্বরা প্রস্থান করিলেন। বালক জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়, আর একটী আড্ডা দেখিতে চাহেন কি? এমন আরও অনেক আছে" বর্ণদ উত্তর দিলেন, "যথেষ্ট হইয়াছে" এইরূপে সেই ভিক্ষুক বালক অজ্ঞাতসারে ভগবানের দৌত্য-কার্য্য নির্ব্বাহ করিল।

দিন যায়, রাত্রি যায়, কেবল মাত্র এক চিন্তা বর্ণদের হৃদয়ে জাগরূক। সেই একাদশ বালকের শোচ্য ক্লিষ্টানন—যাহা ছাদের উপরে পাণ্ডুর চন্দ্রালোকে তাঁহার নিকট চিত্র-পটবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল। তিনি এইক্ষণ হইতে সেই অনাথ জনগণের সেবার্থ নীরবে নিরঞ্জনের নিকট আপনাকে উৎসর্গ করিলেন। স্থির করিলেন,—

"চীন দেশে যাইব না। সেই দেশে অন্য ধর্ম্মপ্রচারক যাইতে পারেন। আমার কার্য্যক্ষেত্র গৃহের সন্নিকটে"।

এই মনে করিয়া তিনি কিরূপে অনাথদিগের আশ্রয় দিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। নিজের টাকা নাই, কেমন করিয়া অনাথগণের আহার যোগাইবেন? কেমন করিয়া সেই নিরাশ্রয় বালক বালিকাগণের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন? গরিব সেবার কার্য্যে যে ধন চাই, তাহা কোথা হইতে আসিবে?

১। যত্র মন, তত্র ধন।

অর্থাৎ গরিব সেবায় মন থাকিলে ধনের অভাব হয় না। ভগবান্ তাহার উপায় করিয়া দেন। জেনেরাল বূথ, ব্রিষ্টল-নিবাসী মুলার, এবং বর্ণদ তাহার প্রমাণ। একদিন রাত্রিতে একটী বড়লোকের বাটীতে বর্ণদের নিমন্ত্রণ হইল, সেই খানে তিনি অনাথ শিশুগণের দুর্দ্দশা বর্ণনা করিলেন।

গৃহস্বামী ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ তাঁহার কথা সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বর্ণদকে বলিলেন—

"আপনি কি বলেন, এই তীক্ষ্ণ দুঃসহ শীতে এই লণ্ডন নগরীতে অনেক নিরাশ্রয় বালক বালিকা বাহিরে খোলা বারান্দায় শুইয়া আছে"! "হা মহাশয়,— আমি বাস্তবিকই তাহাই বলিতেছি"।

ভাড়াটিয়া গাড়ীতে ২০ জন ভদ্রলোক অনাথ-দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ দেখিবার জন্য নিষ্ক্রান্ত হইলেন। লণ্ডনের দরিদ্র পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে একটী বালকও দেখিতে পাইলেন না। একজন প্রহরী বলিল—

"একটী তাম্র মুদ্রা দিব বলুন, এখনি ভিক্ষুক বালক বালিকা যেখানে থাকুক না কেন, দেখা দিবে"।

প্রত্যেক ভিক্ষুককে একটী করিয়া পয়সা দেওয়া হইবে, প্রচার করা হইল। অমনি একটী প্রকাণ্ড ত্রিপলের নিম্ন হইতে পুরাতন "ক্রেট" বাক্স ও পিপের অভ্যন্তর হইতে পিল্-পিল্ করিয়া বালকের পর বালক নির্গত হইতে লাগিল। ৭৩ টী বালক রাজবর্ত্মদীপের নিম্নে সারি সারি দণ্ডায়মান হইল। শোচনীয় দৃশ্য! দর্শকগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ লর্ড সাফটেস্‌বরি এবং অন্য কয়েক জন পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন।

বর্ণদের জীবন ব্রত আরম্ভ হইল, একটী অনাথাশ্রম খুলিলেন; এবং সেই গৃহ সানন্দে স্বহস্তে সংস্কার করিলেন। লণ্ডনের দরিদ্র পল্লীর রাস্তায় দুই রাত্রি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ২৫টী বালক সংগ্রহ করিলেন।

যাহা পরিণামে একটী বিরাট ব্যাপারে পরিণত হইবে, এইরূপে তাহার সূত্রপাত হইল। যিনি প্রথমে ২৫ জন মাত্র বালককে আশ্রয় দিয়াছিলেন, অদ্য তিনি ৫০০০ পঞ্চ সহস্র বালক বালিকাকে আশ্রয় দিয়া লালন পালন করিতেছেন। আমাদিগের এক এক পরিবারের প্রায় ৫।৬ জন মাত্র লোক, তাহাতেই আমরা কত বিব্রত হই। কিন্তু বর্ণদের পরিবারে ৫০০০ পাঁচ সহস্র লোক। তথাপি তাঁহার স্নেহে, যত্নে ও সুনিয়মে এই বিরাট পরিবারের সমুদায় কার্য্য কেমন সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। একবার কল্পনা করুন, প্রতি দিন ৫০০০ পাঁচ হাজার লোকের ভোজ হইতেছে। কেবল ভোজন নহে। তাহার সঙ্গে আরও মনে করুন, ৫০০০ পাঁচ হাজার বালক বালিকার কত কাপড়, জুতা বিছানা, তাহাদিগের বাসের জন্য কতগুলি ঘর চাই,—সংক্ষেপে ৫০০০ পাঁচ হাজার বালক বালিকাকে লালন পালন করিতে হইলে যাহা যাহা চাই, পাঠক নিজে তাহা একবার কল্পনা করিয়া দেখুন। কি প্রকাণ্ড ব্যাপার! এই ৫০০০ পাঁচ হাজার ব্যক্তির কেবল খাদ্য যোগাইবার জন্য প্রতি দিন প্রায় ২০০০ দুই হাজার টাকার অধিক পড়ে, এত বেশী টাকা কেমন করিয়া সংগ্রহ হয়? কেবল দাতব্য! হাঁ। লালা বাবু যেমন বৃন্দাবনে ঠাকুর ও গরীব সেবার জন্য জমিদারীর আয় ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন, বিলাতের অনেক পরোপকারী ব্যক্তি সৎকার্য্যের জন্য নিজের জমিদারী অন্ত, করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বর্ণদের গরিব সেবার কার্য্যে সেইরূপ কোন

জমিদারীর আয় নির্দ্ধারিত নাই। চাঁদার টাকা আসিতে যদি বিলম্ব হয়, তাহা হইলে বর্ণদ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন,তাঁহার প্রার্থনা কথনও নিষ্ফল হয় নাই।

২। যথা ভক্তি তথা মুক্তি।

ভক্তের প্রার্থনা কথনও নিষ্ফল হয় না। পূর্ণ ভক্তির সহিত, পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত, নির্ম্মল অন্তঃকরণে, ঈশ্বরকে ডাক, ঈশ্বর উত্তর দিবেন, ঈশ্বর দর্শন দিবেন। সাধুজন এই কথা বলেন। আমার তোমার পক্ষে ইহা কল্পনা করা অসম্ভব হইতে পারে,কিন্তু ইহার ভিতর বাস্তবিক কিছুই অসম্ভব না থাকিতে পারে। আমি একটী মোহন্তকে দেখিয়াছি। লোকে বলে, ইঁহার ঘরে খাদ্য থাকুক আর না থাকুক, যতই অতিথি আসিয়াছে, ইনি তাহাদিগকে অনায়াসে ভোজন করাইয়াছেন, কথনও ফিরাইয়া দেন নাই। বৈজ্ঞানিক পাঠক হয় ত এই কথায় একটু হাসিবেন, বলিবেন, দ্রৌপদীর ব্রাহ্মণ ভোজন অথবা খ্রীষ্টের সেই অলৌকিক অনুচর ভোজন।

এসব আমরা এথন বিশ্বাস করিতে পারি না। মোহন্তকে আপনি প্রবঞ্চক মনে করিতে পারেন, দ্রৌপদীর ব্যাপার কাব্যালঙ্কার মাত্র ভাবিতে পারেন, ঈশার কর্ত্তৃক ভোজন মহাজন জীবন কাহিনীর অতি বর্দ্ধিত অত্যুক্তি মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু ডাক্তার বর্ণদ সাহেব যে সকল বিস্ময়জনক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তৎ সম্বন্ধে আপনি কি বলিবেন ?

প্রার্থনার উত্তর নগদ টাকা।

তৎ সম্বন্ধে কয়েকটী ঘটনা বলি। ১ম ঘটনা। একবার শীতের প্রাতঃকালে ইংলণ্ডে সহসা বড় অধিক শীতের প্রাদুর্ভাব হইল। বর্ণদের বালক বালিকাগণ শীতে রাত্রিতে খাটে কাঁপিতে লাগিল। তহবিলে পয়সা নাই। বর্ণদ কেমন করিয়া কম্বল ক্রয় করিবেন। তিনি বলেন—

"আমি আগ্রহ সহকারে ভাগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলাম"।

যিনি হিমানীবৎ এই তীব্র শীত প্রেরণ করিয়াছেন,তিনি অবশ্য আমাদিগের দরিদ্র বালক বালিকাগণকে শীতপীড়ন হইতে রক্ষা করিবেন। আমি প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। হে বিপদভঞ্জন বিভো! আমার পরিবারের পঞ্চ সহস্র বালক বালিকার জন্য কম্বল প্রেরণ করুন। কিন্তু সেই দিবস টাকা আসিল না। পর দিন বালক বালিকাগণ শীতে কাঁপিতেছে। তাহাদিগের দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিলাম না। কম্বলের দোকানে যাইয়া কম্বল দর করিলাম। মূল্য ১৫০০ দেড় হাজার টাকা হইল। কিন্তু টাকা নাই। কম্বল বাছান হইল, লওয়া হইল না। তাহার পর দিন ঈশ্বর সকাশে আমাদিগের আবেদন আবার উপস্থিত করিলাম—প্রভো! আর বিলম্ব সহেনা, অনাথ বালক বালিকাগণের প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি করুন। পর দিন প্রাতে বর্ণদ প্রথমেই যে পত্র খুলিলেন,তাহার মধ্যে ১ খানি ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকার চেক পাইলেন। পত্র প্রেরক ইংলণ্ডের ১ জন পাদ্রী। তিনি লিখিয়াছিলেন—"অতিরিক্ত শীত হেতু যে গরম কাপড় প্রয়োজন, তাহার মূল্যের জন্য এই ১৫০০ দেড় হাজার টাকা পাঠাইলাম।" এই সময় এই পাদ্রীকে এই টাকা পাঠাইবার প্রবৃত্তি কে দিলেন ?

২য় ঘটনা। আরও আশ্চর্য্যজনক। ডাক্তার বর্ণদের মনে হইল যে, ইংলণ্ডের একটী গ্রামে অনাথিনী বালিকাদিগের জন্য

একটী আশ্রম অত্যন্ত আবশ্যক। তিনি শীঘ্রই সেইস্থানে একটী অনাথাশ্রম সংস্থাপন করিবেন, এই বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। কিন্তু এইটী সংবাদপত্রে প্রকাশ করার পরই তাঁহার সন্দেহ হইল, হয় ত এই কার্য্যসাধক অর্থ সংগ্রহ হইবে না। হয়ত এই কার্য্য এক্ষণ আরম্ভ করা ভগবানের ইচ্ছা নহে। এক বন্ধুকে তিনি তাঁহার এই দ্বিধার কথা বলিলেন। সেই বন্ধু বলিলেন, ভাল, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা যাউক। এই কার্য্য যদি ভগবানের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, তিনি কোন লক্ষণ দ্বারা তাহা প্রকাশ করিবেন। এই বলিয়া দুই ভক্ত ঈশ্বরের আরাধনা করিতে বসিলেন, আরাধনা সমাপ্ত হইয়া যাইল। তাঁহারা অক্সফোর্ড নগরে পৌছিলেন। পর দিন প্রাতে ডাক্তার বর্ণদের ঘরে জনৈক অপরিচিত পুরুষ প্রবেশ করিলেন "আপনি কি ডাক্তার বর্ণদ?" 'হাঁ' "আপনি নিরাশ্রয় বালিকাদিগের জন্য কতকগুলি আশ্রম স্থাপন করিবেন মানস করিয়াছেন?"

বর্ণদ বলিলেন "হাঁ"। অভ্যাগত ব্যক্তি বলিলেন ভাল, প্রথম আশ্রমটীর জন্য ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা আমার নামে লিখুন" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। বর্ণদ তাঁহার পশ্চাৎ ছুটিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া, তাঁহার নিকট এই দানের হেতুবাদ জ্ঞাত হইলেন। ভদ্রলোকটীর একটী কন্যা বিয়োগ হইয়াছিল। সংবাদপত্রে বর্ণদের পত্র তিনি পড়িয়া মৃত-দুহিতা-স্মরণার্থে একটী বালিকাশ্রম নির্ম্মাণ করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। এই কথা তিনি কাহাকেও বলেন নাই। লণ্ডন যাইলে ডাক্তার বর্ণদকে বলিবেন মনে করিয়াছিলেন। ঘটনা বশতই হউক, বা ঈশ্বরের অচিন্তনীয় নিয়োগ অনুসারেই হউক, তিনি সেই সময় অক্সফোর্ড নগরে আসিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, বর্ণদ সোৎসাহে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এক্ষণে সেই গ্রামের ৪৯টী ক্ষুদ্র এবং পাঁচটী বৃহৎ অবলাশ্রমে ডাক্তার বর্ণদ ১০০০ এক হাজার বালিকা প্রতিপালন করিতেছেন।

৩য় ঘটনা। ১৮৯৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে ডাক্তার বর্ণদ দেখিলেন যে, তাহার পর দিন প্রায় ৬৭০০০ হাজার টাকা না পাইলে ঐ তারিখে প্রতিশ্রুত ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন না। কয় দিবস হইতে প্রার্থনা করিতেছিলেন, টাকাও কতক কতক আসিয়াছিল। ৩১শে তারিখে প্রায় ৭০০০০ হাজার টাকা আসিল। ভক্তগণের বিশ্বাস সেইদিন বর্ণদের অধিক টাকার দরকার, তাই দাতাদিগকে দীনবন্ধু সময়কালে টাকা পাঠাইতে প্রবর্ত্তনা দিয়াছিলেন।

৪র্থ ঘটনা। বর্ণদ বলেন যে, অনেক বৎসর পূর্ব্বে, একবার ২৪শে জুন তারিখের মধ্যে ৭০০০ সাত হাজার টাকা না দিতে পারিলে, একটী বন্ধকী সম্পত্তি হস্তান্তর হইয়া যাইবে, এই সর্ত্ত ছিল। আমার দুইজন ধনী বন্ধু আমাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যখনই আপনার বড় অর্থকষ্ট হইবে, তখনই আমাদিগকে জানাইবেন। আমি দুইজনকেই লিখিলাম। উত্তর আসিল—একজন সহরে নাই, আর একজন আসন্নমৃত্যু। ২০শে তারিখ আসিল, তথাপি টাকা আসে নাই, বরঞ্চ আরও ৭০০৲ সাতশত টাকা চাহি। ২১শে, ২২শে, ২৩শে তারিখ—আমদানী অতি কম। ২৪শে তারিখ কেবল মাত্র ১০৲ টাকা আসিল। তখন হতাশপ্রায় হইয়া উত্তমর্ণকে অনুনয় করিয়া যদি আরও কিছু মেয়াদ পাই, তাহার

চেষ্টা দেখিবার জন্য নির্গত হইলাম। পথে দেখিলাম, একজন সৈনিক পুরুষ আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমিও তাঁহার প্রতি চাহিলাম। আবার চলিতে লাগিলাম, পর ক্ষণেই, কে আমার স্কন্ধ স্পর্শ করিল। ফিরিয়া দেখিলাম, সেই সৈনিক পুরুষ। তিনি বলিলেন "কিছু মনে করিবেন না। আপনার নাম বোধ হয় "বর্ণদ"। আমি বলিলাম "হাঁ" কিন্তু মহাশয়ের নাম অবগত নহি। আপনি আমাকে চিনেন না। আমি আপনাকে চিনি, আমার উপর একটী ভার ন্যস্ত হইয়াছে। দুই মাস পূর্ব্বে আমি ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিয়াছি। আমার একটী বন্ধু কর্ণেল—আপনাকে দিবার জন্য আমাকে একটী পুলিন্দা দিয়াছেন। বোধ হয় তাহাতে টাকা আছে। কারণ আপনার সৎকার্য্যে তিনি অতি শ্রদ্ধাবান্। তাহার স্ত্রী একটী সখের বাজার বসাইয়াছিলেন। সেইখানে আপনার জন্য অনেক টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছিল। আমি এখানে অল্প দিন আসিয়াছি। এ পর্য্যন্ত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করার অবকাশ হয় নাই। অদ্য প্রাতে ভাবিতেছিলাম, আপনার সহিত শীঘ্র সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য। কেমন আশ্চর্য্য, অদ্যই আপনার সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ ঘটিয়া যাইল। আপনি যদি একটু অপেক্ষা করিতে পারেন,আমি সেই পুলিন্দাটী আনিয়া দিই ** তিনি আমাকে পুলিন্দা দিলেন। তাঁহার সম্মুখে তাহা খুলিলাম। তাহাতে ১০০০০, দশ হাজার টাকার ১ খানি চেক পাইলাম। আমি বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম। এই টাকা তিন মাস পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে যখন প্রেরিত হইয়াছিল,তখন আমি নিজেই জানিতাম না যে, ২৪শে জুন আমাকে এ টাকা শোধ দিতে হইবে। আমার নিঃসন্দেহ অনুভব হয় যে, ঐ নির্দ্ধারিত দিবসে আমার ঐ টাকা প্রয়োজন হইবে বলিয়াই, ঈশ্বর এতাবৎ কাল পত্রবাহকের নিকট তিন মাস ধরিয়া,ঐ টাকা রাখিয়াছিলেন * * যখন আমার টাকার দুঃসহ অভাব হইল, তখনই সর্ব্ব শক্তিমান ঈশ্বর তাঁহার দাসের সাহায্যার্থ তাহার শক্তিময় হস্ত প্রসারণ করিলেন।

এখন বলি, সাধু মোহন্তের কথা যদিও অবিশ্বাস করেন, হয়ত ডাক্তার বর্ণদের কথা অবিশ্বাস করিবেন না। অধিক আর কি লিখিব। সৎ কার্য্যে মতি থাকিলে গতির অভাব হয় না।

৩। যত্র মতি তত্র গতি।

পূর্ব্বে ভক্ত ঋষিদিগের আরাধনাও নিবেদন ঈশ্বর যেমন কাণ পাতিয়া শুনিতেন, এখনও তিনি ভক্তদিগের প্রার্থনা তেমনই শ্রবণ করেন, তেমনই সিদ্ধ করেন। পূর্ব্বে তিনি যেমন ঋষিদিগকে বর দিতেন, এখনও তেমনি রূপান্তরে বর দিতেছেন, প্রার্থিত বস্তু দান করিতেছেন। আমরা প্রার্থনা করিতে জানি না, তাই পাই না। আমাদিগের হৃদয় নির্ম্মল নহে, তাই প্রার্থনা করিতে জানি না। বিষয় ভোগ কামনায় নিয়ত মুগ্ধ, ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সতত তাড়িত ও ঘূর্ণিত, তাই হৃদয় নির্ম্মল নহে।

বর্ণদ এমন সাধু, তথাপি তাহার শত্রু আছে। তাহাতে ক্ষতি নাই।

সব ভাল কাযেরই শত্রু আছে, আবার শত্রুর ভিতরেও ভাল লোক আছে। যাঁহারা ভাল লোক, তাঁহারাও ভ্রমে পড়িয়া ভাল লোককে আক্রমণ করেন। সংসারে জুয়াচোর ও ভণ্ডের ভাগ এত অধিক যে, অনেক বুদ্ধিমান্ সংসারজ্ঞ ব্যক্তি, পরীক্ষা না করিয়া

কাহাকেও নিঃস্বার্থ পরোপকারী বলিয়া বিশ্বাস করেন না। জনসন বলিয়াছিলেন, দেশ হিতৈষিতা বা নিঃস্বার্থপরোপকারিতা প্রবঞ্চনার নামান্তর মাত্র। ইহার অর্থ এমন নহে যে, স্বদেশপ্রেমিক বা পরহিতে রত ব্যক্তি একবারে নাই। ইহার অর্থ, স্বদেশ-প্রেমিক ও পরোপকারী ব্যক্তি সংসারে অতি বিরল। এবং সাধুকে চিনিয়া লইবার জন্য পরীক্ষা আবশ্যক। তাই জেনারেল বুথের নানা প্রকার পরীক্ষা দিতে হইয়াছে। তাই ডাক্তার বর্ণদকে অনেকবার আদালতে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। কখন কখন বিচারাধিপতি আইনে বাধ্য হইয়া বর্ণদের বিরুদ্ধে ডিক্রি দিয়াছেন। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বর্ণদের কার্য্য মনে মনে অনুমোদন করিয়াছেন। একবার চীফ জষ্টিস্ কোলরিজ বর্ণদের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াই তাহাকে চাঁদা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত তাঁহার আশ্রমগুলির বিশেষ অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

৪। যত্র শত্রু তত্র মিত্র।

ভগবানের এমনি ইচ্ছা যে, মন্দের ভিতর হইতে ভাল বাহির হয়। সাধুগণ যখন শত্রু কর্ত্তৃক পীড়িত ও মথিত হন, তখন তাহাদিগের বিপুল হৃদয়জলধি ব্যথিত হয়! কিন্তু এই সাগর মন্থনে ধন্বন্তরী অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে করিয়া উত্থিত হন। সেই অমৃত পানে কত নরনারী অমর জীবন লাভ করেন। সেই মন্থনে লক্ষ্মীর উদ্ভব হয়, সাধুসেবা-নিকেতন স্বরূপ বৈকুণ্ঠধামে তাহার অধিষ্ঠান হয়, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে সেবার্থ অর্থাগম হয়। বর্ণদের জীবনে তাহাই দেখা যায়। সংবাদপত্রে যখন তাহার বিশেষ নিন্দাবাদ বাহির হইত, তখনি তাহার আয় বাড়িত। পূর্ব্বে যাহারা উদাসীন ছিলেন, এইরূপ অত্যাচারে তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উত্তেজিত হইয়া বন্ধুভাবে বর্ণদকে সাহায্য করিতেন। তাই বলিয়াছি, যত্র শত্রু তত্র মিত্র। একজন ব্যক্তি বর্ণদকে পূর্ব্বে এক পয়সাও দেন নাই। তিনি বর্ণদের অযথা নিন্দাপূর্ণ একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাহাকে ৭০০০৲ সাত হাজার টাকা পাঠাইয়াছিলেন। এক বৎসরে তাহার আয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা বাড়িয়া গিয়াছিল। তাই শত্রু কর্ত্তৃক সাগর-মন্থনে লক্ষ্মীর আবির্ভাবের কথা বলিয়াছি।

অনেক সময় শত্রু মিত্র অপেক্ষা উপকারী। লোকে অন্যের প্রশংসা শুনিতে চাহে না। কিন্তু নিন্দা কর, তাহা পরম কুতূহলী হইয়া লোকে শুনিবে। কেবল শুনিবে, তাহা নহে, দৌড়িয়া গিয়া পথে ঘাটে যাহাকে দেখিবে তাহাকে বলিবে। সুতরাং যেই সাধুর নিন্দা আরম্ভ হইল, সেই সাধুর নাম নিন্দার ছলে চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। তাঁহার কার্য্যাবলী লইয়া বাদানুবাদ হইতে লাগিল। এবং পরীক্ষার কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রকৃত সাধু বিশুদ্ধ স্বর্ণ, অগ্নি পরীক্ষাতে তাহার দেব-চরিত্র-কান্তি তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় আরও দীপ্তি পাইতে থাকে, পূর্ব্বাপেক্ষা জনগণকে অধিকতর আকর্ষণ করে, বর্ণদ যখনই পরীক্ষাতে পড়িয়াছেন, তখনই যে তিনি শুদ্ধ বর্ণ বা নির্ম্মল সুবর্ণ, তাহাই প্রমাণ হইয়াছে। নিন্দুকগণ সাধুগণের অহিতসাধনে তৎপর হইয়া ভগবানে বিচিত্র বিধান যন্ত্র কৌশলে, হিত সাধন করিয়া ফেলে।

তাই বলিয়াছি যত্র শত্রু তত্র মিত্র।

এখন আমরা বর্ণদের জীবনে দেখিলাম :—

যত্র মন তত্র ধন। যথা ভক্তি তথা মুক্তি।
যত্র মতি তত্র গতি। যত্র শত্রু তত্র মিত্র।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

এই প্রবন্ধ ১৮৯৬ সালের রিভিউ অব রিভিউ নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত Dr. Barnardo. বিষয়ক একটি প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া লিখিত"।

বাচস্পতি মিশ্র।

বাচস্পতি মিশ্র মিথিলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রণীত দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্রীয় বহুতর গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। এই সকল পুস্তক সংস্কৃত সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি ছিল। অনেক সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্রের রচিত গ্রন্থাবলীর টীকা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু অদ্যাপি এই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চূড়ামণির জীবনী সম্যকরূপে আলোচিত হয় নাই। আজ পর্য্যন্তও তাঁহার আবির্ভাব কাল নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নাই।

১৮৬৪ খ্রীঃ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ অধ্যাপক কাউয়েল, ইংরেজী অনুবাদসহ 'উদয়নাচার্য্যের' রচিত "কুসুমাঞ্জলির" মূল প্রকাশ করেন। তাহার ভূমিকায় তিনি বাচস্পতি মিশ্রকে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* অদ্য পর্য্যন্ত এই মতের বিরুদ্ধে কেহ লেখনী চালনা করিয়াছেন কি না জানিনা। ১৮৭৬ খ্রীঃ ডাক্তার মিত্র 'বিবাদচিন্তামণির পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁহাকে ৩৫০ বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ অধ্যাপক ওয়েবার স্বরচিত 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে' ডাক্তার মিত্রের মত অগ্রাহ্য করিয়া, কাউয়েল সাহেবের এই ভ্রান্ত ও অমূলক অভিমত প্রামাণিক বোধে গ্রহণ করিয়াছেন।

* Professor E. B. Cowell's Preface to his edition of "Kusmmanjali" (1864), and A. Weber's "History of Indian Literature (1878) p. 245.

† Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. (III.35.)

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাচস্পতিমিশ্র মিথিলাদেশে সেমৌলগ্রামে আবির্ভূত হন। তিনি কেশব মিশ্রের পুত্র। বাচস্পতির পুত্রের নাম লক্ষ্মী দাস। বাচস্পতিমিশ্র মার্ত্তণ্ডতিলক স্বামীর শিষ্য ছিলেন। ইনি মৈথিল স্মার্ত্তকার মার্ত্তণ্ডমিশ্র হইতে পৃথক ব্যক্তি। এই মার্ত্তণ্ড মিশ্রের রচিত প্রায়শ্চিত্তমার্ত্তণ্ড বিদ্যমান আছে *। তিনি সামবেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বাচস্পতিমিশ্রের পিতা কেশবমিশ্র অতি প্রসিদ্ধ দার্শনিক ছিলেন। তিনি ষড়্‌দর্শনেই সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। "ভাষারত্নে" তিনি বৈশেষিক, সাংখ্য ও ন্যায়দর্শনের সমালোচনা করিয়াছেন। ছাত্রদিগের সহজে ন্যায়দর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভের আশায়, তিনি ন্যায়দর্শন সম্পর্কে "তর্কপরিভাষা" রচনা করেন।

"শ্রীকৃষ্ণং সচ্চিদানন্দং প্রণম্যেশং জগদ্‌গুরুং।
শ্রীমৎ কেশবশর্ম্মাহং "ভাষারত্নং" বদাম্যদঃ॥" (ভাষারত্ন)

"বালোঽপি যো ন্যায়নয়ে প্রবেশং
অল্পেন বাঞ্ছত্যলমশ্রুতেন।
সংক্ষিপ্তযুক্ত্যন্বিত "তর্কভাষা"
প্রকাশ্যতে তস্য কৃতি ময়ৈষা॥" (তর্কপরিভাষা)

"দ্বৈতপরিশিষ্ট" নামে স্মৃতিগ্রন্থে কেশব মিশ্র ব্যবহার, বিবাদ, বিবাহ, দান, শ্রাদ্ধ ও অশৌচাদি স্মৃতিশাস্ত্রীয় বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই কয়েকখানি পুস্তক ভিন্ন

* মার্ত্তণ্ডমিশ্রের রচিত "প্রায়শ্চিত্তমার্ত্তণ্ডের" ১৫৪৪ শকাব্দের (১৬২২ খ্রীঃ) লিখিত একখানি পুস্তক বেতিয়ার সন্নিহিত ভাঁরোরা গ্রামে পাওয়া গিয়াছে।
"নত্বা সরস্বতীং দেবীং শঙ্খকুন্দেন্দুসুন্দরীং।
প্রায়শ্চিত্তস্য মার্ত্তণ্ডো মার্ত্তণ্ডেন বিরচ্যতে॥"
(Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. VII)

সামবেদী ব্রাহ্মণদিগের জন্য তিনি "ছন্দোগ-পরিশিষ্ট" এবং "প্রকাশ" নামে তাহার ভাষ্য রচনা করেন। মহামহোপাধ্যায় কেশব-মিশ্রের রচিত অন্য কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই *।"

* 'স্মৃতিসার' ও 'ন্যায়তরঙ্গিণী' নামে দুইখানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। অসম্পূর্ণ স্মৃতিসারে কোন্ তিথিতে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা নিরূপিত হইয়াছে। "প্রয়োগসারে" দর্শপৌর্ণমাসাদি বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চাননের রচিত ভাষা-পরিচ্ছেদের অনুকরণে "ন্যায়তরঙ্গিণী" রচিত হইয়াছে। ইহাতে সপ্তপদার্থের গুণলক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে। এই উভয় পুস্তক বঙ্গদেশীয় একজন কেশব শর্ম্মা দ্বারা প্রণীত হইয়াছে। 'প্রয়োগসার' ও 'হরিসাধন চন্দ্রিকা' কেশব স্বামীর রচিত। স্মৃতিসারও প্রয়োগসারের গ্রন্থকার একই ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়।

"জগতীহেতুং নত্বা শ্রীকেশবশর্ম্মণা লিখিতঞ্চতৎ।
"স্মৃতিসারং" মণিহারং কুরুতারং স্মৃতিসারং পারংযৎ॥
(স্মৃতিসার)

"শ্রিয়ঃ পতিং নমস্কৃত্য কণ্বঞ্চমুনিসত্তমং।
প্রয়োগসারং বক্ষ্যামি কেশবোঽহংযথামতি॥"
(প্রয়োগসার)

জ্ঞানাতীতং হরিং নত্বা তস্য ভক্তিপ্রসিদ্ধয়ে।
রচ্যতে কেশবেন্দ্রেণ হরিসাধন চন্দ্রিকা॥
(হরিসাধনচন্দ্রিকা)

কেশবভট্ট (প্রদীপ) নামে কতকগুলি স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার রচিত "কৃত্যপ্রদীপ", "শুদ্ধি প্রদীপ", "আচারপ্রদীপ", ও "প্রায়শ্চিত্ত প্রদীপ" পাওয়া গিয়াছে। তিনি লৌগাক্ষিভট্টের বংশধর। তাঁহার পিতামহের নাম কেশব এবং পিতার নাম অনন্তভট্ট। অনন্তভট্ট "সময় নির্ণয়" নামে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। ১৬০২ শকাব্দের লিখিত তাহার প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে। তিনি উমাপতির আদেশে "প্রহ্লাদচম্পূ" ও নৃসিংহচম্পূ" রচনা করেন। গোদাবরী নদীর তীরবর্ত্তী পুণ্যস্তম্ভ গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি মাধ্যান্দিনশাখাধ্যায়ী যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

'পরিমাণনিবন্ধ' নামক স্মৃতিগ্রন্থে, কেশব মিশ্র আপনাকে মিথিলারাজের প্রধান সভাসদ ও কবীন্দ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"তীরভুক্তি-মহীপাল-পরিষন্মুখ্য-সূরিণা।
শ্রীকেশবকবীন্দ্রেণ নিবন্ধোঽয়ং বিধীয়তে॥"

কেশবমিশ্রের রচিত "তর্কপরিভাষার' ভাষ্য অনেক নৈয়ায়িক পণ্ডিতের দ্বারা রচিত হয়। বলভদ্রমিশ্রের কৃত টীকার নাম 'তর্কভাষাপ্রকাশিকা'। মৈথিল নৈয়ায়িক বলভদ্র মিশ্রের পুত্র গোবর্দ্ধন 'তর্কানুভাষা' নামে ইহার আর একখানি টীকা রচনা করেন। বিশ্বনাথ ও পদ্মনাভ নামে গোবর্দ্ধনের যে দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন,তন্মধ্যে পদ্মনাভ তাঁহাকে তর্কশাস্ত্র অধ্যাপনা করান। তাঁহাদের মাতার নাম বিজয়শ্রী। বিশ্বনাথ

"শ্রীলৌগাক্ষিকুলারবিন্দতরণি র্মাধ্যান্দিনাম্নায়বিৎ
মীমাংসাযুগতন্ত্রতর্কচতুরঃ সাহিত্যরত্নাকরঃ।
কাব্যং শ্রীনৃহরেঃ করোতি সুকৃতী গোদা-তট-প্রোল্লসৎ
পুণ্যস্তম্ভ-নিবাসি-কেশবসুতানন্তাত্মজঃ কেশবঃ॥
"যচ্ছিষ্যৈ র্জগতীতলং পরিবৃত, য স্তর্কবিদ্যানিধিঃ,
শ্রীলৌগাক্ষিকুলারবিন্দতরণি র্মাধ্যন্দিনঃ কেশবঃ।
যং প্রাসূত সদা শিবাঙ্ঘ্রি কমলদ্বন্দ্বৈকনিষ্ঠংপরং
ভট্টানাংতমহং নমামি পিতরং সাম্বং কৃপাম্ভোনিধিং॥
কিং ভোজঃ কিমু বিক্রমঃ কিমপরঃ কর্ণাবতীর্ণঃ কলৌ
সন্দেহমিতি যত্র ধীর্ভবতি, সঃ ক্ষৌণীতলে নন্দতি।
শূরঃ শ্রীউমাপতি র্দলয়তি গোবিন্দভক্তিপ্রিয়ঃ,
শ্রীমৎ-কেশবপণ্ডিতো বিতনুতে চম্পূং তদীয়াজ্ঞয়া॥
প্রহ্লাদ চম্পূ।

পূর্ব্বোক্ত লৌগাক্ষিভাস্কর একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক। জানকীনাথ তর্কচূড়ামণির রচিত "ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীর" 'প্রকাশ' নামে ভাষ্য লৌগাক্ষির রচিত। তদ্ভিন্ন ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার প্রণীত "পদার্থমালাপ্রকাশ" রঘুনাথ শিরোমণির পদার্থখণ্ডনের ভাষ্যরূপে লিখিত হয়। (Dr. F. E. Hall's Contributions towards the Bibliography of Indian Philosophy.)

(নৃসিংহচম্পূ-কাব্য)

মেঘদূতের, 'মুক্তাবলী' নামে টীকা রচনা করেন।

বিজয়শ্রীতনুজন্মা গোবর্দ্ধন ইতি স্মৃতঃ
তর্কানুভাষাং তনুতে, বিবিচ্য গুরুনির্ম্মিতং ॥
শ্রীবিশ্বনাথানুজপদ্মনাভানুজো গরীয়ান্ বলভদ্রজন্মা।
তনোতি তর্কানাধিগত্য সর্ব্বান্, শ্রীপদ্মনাভাদ বিদুষো বিনোদান ॥"
(তর্কানুভাষা)

পদ্মনাভের অপর ভ্রাতা পদ্মনাথ (প্রদ্যোতন) মিশ্র 'প্রকাশ' নামে চন্দ্রালোক অলঙ্কারের টীকা ও ভাস্কর নামে উদয়ণআচার্য্যের গুণকিরণাবলীর ভাষ্য রচনা করেন। ভাস্কর ভট্টের কৃত ব্যাখ্যার নাম 'পরিভাষা দর্শন'। 'তর্কপরিভাষার' পূর্ব্বোক্ত তিনখানি টীকা ভিন্ন, আরও পাঁচখানি টীকা বিদ্যমান আছে বলিয়া ডাক্তর হল সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। কৌণ্ডিনাদীক্ষিত ও চেন্নু ভট্টের কৃত টীকা 'প্রকাশিকা', মাধবদেবের টীকা 'সারমঞ্জরী', গোপীনাথের টীকা 'ভাবপ্রকাশ' এবং গৌরীকান্ত সার্ব্বভৌমের ভাষ্য 'ভাবার্থদীপিকা' নামে পরিচিত।

বাচস্পতিমিশ্র স্বরচিত কোন গ্রন্থেই আপনার পিতার নাম স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি "কৃত্যমহার্ণব" ও "দ্বৈতনির্ণয়" নামক স্মৃতি গ্রন্থদ্বয়ের আরম্ভে কেশবের বন্দনা করিয়াছেন। এই 'কৃত্যমহার্ণবে' তিনি আপনার আশ্রয়দাতা হরিনারায়ণ দেবের বংশাবলী বর্ণনা পূর্ব্বক রাজা হরিনারায়ণের আদেশে ইহা রচিত হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আভীরদারকং উদঞ্চিতকিঙ্কিণীকং,
আতাম্রপাণিচরণং পুরুষং পুরাণং।
মঞ্জীরমঞ্জুমরুণাধরমম্বুজাক্ষং,
অদ্বৈতচিন্ময়-মনাদি-মনন্ত-মীড়ে ॥"

'কৃত্যমহার্ণবে' দ্বাদশ মাসের অনুষ্ঠেয় কার্য্য ও নানা ব্রতের বিষয় বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। মিথিলার রাজা হরিনারায়ণের আদেশে 'কৃতমহার্ণব' রচিত হয়। এই হরিনারায়ণ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ভবেশের প্রপৌত্র এবং হরিসিংহদেবের পৌত্র। তাঁহার পিতার নাম দর্পনারায়ণ।

"আসীন্মৈথিলমেদিনীশাতমথঃ প্রত্যর্থিসীমন্তিনী-
নিত্যোৎকীর্ত-ভুজপ্রতাপ-তপন-প্রোত্তপ্ত-সপ্তার্ণবঃ।
রাজৎ কীর্ত্তিকুমুদ্বতী-পরিমল-প্রাগ্ভাবি ভূমণ্ডলো,
রাজা শ্রোত্রিয়-বংশভূষণমণিঃ শ্রীমান্ ভবেশঃ কৃতী ॥

অস্যান্ববায়মমলং বিমলী করিষ্যন্,
কীর্ত্ত্যা দিশো দশ মুহু ধবলীকরিষ্যন্।
সংগ্রামসীমনি ভটাংস্ত্রিদশীকরিষ্যন্,
আবিরভূব তনয়ো হরিসিংহ-দেবঃ ॥

এতস্মাদ্দ্বিজবংশভূষণমণিঃ সর্ব্বার্থচিন্তামণিঃ
ষট্তর্কাসরণিঃ প্রতাপতপন-প্রারম্ভ-শুদ্ধারণিঃ।
প্রত্যর্থি ক্ষিতিপান্ধকারতরণিঃ শ্রীদর্প-নারায়ণো
রাজাসীদবনীভূষণমণিঃ ভূপালচূড়ামণিঃ ॥
আনন্দয়ন্ দ্বিজকুলং পিতৃকুলমুন্মীলয়ন্নাখিলং।
এতস্মাদজনি কৃতী শ্রীহরিনারায়ণো নৃপতিঃ ॥
শ্রীবাসুদেবভক্তঃ শ্রীসারদায়াঃ প্রসাদমাসাদ্য।
শ্রীমানয়ং নরেন্দ্রঃ শ্রীকৃত্যমহার্ণবং তনুতে ॥
মিথিলাবলয়বিভ্রাজঃ শ্রীহরিনারায়স্য কীর্ত্তিরযো।
তাবদ বিকশতু ভুবনে যাবদ বিষ্ণু বিরোচতু গগনে ॥
ইতি সপক্রিয়মহারাজাধিরাজ—শ্রীহরিনারায়ণ-নিদেশাৎ মহামহোপাধ্যায় সন্মিশ্র-শ্রীবাচস্পতিবিরচিতঃ কৃত্য মহার্ণব' সমাপ্তিমগাৎ।" (কৃত্যমহার্ণব)

দ্বৈত্যনির্ণয়ে বাচস্পতি মিশ্র স্নান, সুদগ্রহণ, দত্তকপুত্র, মলমাস এবং তীর্থস্থলে শিরোমুণ্ডনাদি সন্দিগ্ধ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়াছেন। 'কৃত্যমহার্ণবে' তিনি যেমন মিথিলার চারিজন নরপতির অনুচিত প্রশংসায় আপনার লেখনী কলঙ্কিত করিয়াছেন, সেইরূপ 'দ্বৈতনির্ণয়ে' তিনি পুরুষোত্তম দেবের পিতা রাজা ভৈরব

সিংহ এবং তাহার মাতাকে অতিরিক্ত প্রশংসা ও তোষামোদ বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। রাজা ভৈরবসিংহের মহিষীর আদেশে 'দ্বৈতনির্ণয়' রচিত হয়। রাজা ভৈরবসিংহ 'তুলাপুরুষ' নামে দান ব্যাপার সম্পাদন করেন।

"সর-স্খলিতসাগরং ব্যধিত যো নৃপগ্রামনণী,
ভূর্জাবিজিতকাঞ্চনৈ—রদিত ষ স্তুলাপুরুষান্।
স এব নৃপ-ভৈরবঃ, সমরসীম্নি পঞ্চাননো,
জয়ত্যরিবিদারকো জগতি রাজবৃন্দারকঃ॥
অয়ং ৰাপি নামানতীতঃ কবীনাং,
গুণৈ র্দোঃপ্রতাপানতীতো ভটানাং।
ত্রিলোকীপতিঃ, শ্রেয়সো বাসভূমিঃ,
পুনীতে জগন্মণ্ডলং রাজচন্দ্রঃ॥
সত্যভামেব কৃষ্ণস্য, গৌরীব মদনদ্বিষঃ।
সবিশেষা জয়ত্যেষা নৃপ ভৈরব-ভামিনী॥
শ্রীভৈরবেন্দ্রধরণীপতিধর্ম্মপত্নী,
রাজাধিরাজ-পুরুষোত্তম দেবমাতা।
বাচস্পতিং নিখিলশাস্ত্রবিদং নিযুজ্য,
দ্বৈতে বিনির্ণয়বিধিং বিধিবৎ তনোতি॥" (দ্বৈতনির্ণয়)

'কৃত্যমহার্ণবে' যিনি হরিনারায়ণ নামে বর্ণিত হইয়াছেন, তিনিই 'দ্বৈতনির্ণয়ে' ভৈরবেন্দ্র নামে পরিচিত হইয়াছেন। উদ্ধৃত অংশ পাঠে ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। মিথিলার রাজা ভৈরবেন্দ্র হরিনারায়ণের সভায় বাচস্পতিমিশ্র অবস্থিতি করিতেন। রাজা ও রাজমহিষী উভয়েই অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ভবেশ, হরিসিংহদেব, দর্পনারায়ণ, ভৈরবসিংহ দেব (হরিনারায়ণ) এবং পুরুষোত্তম দেব নামক মিথিলার পাঁচজন নরপতির নামও ইহা হইতে জানা যাইতেছে। বাচস্পতি মিশ্র 'পিতৃভক্তিতরঙ্গিণী' নামে আর একখানি গ্রন্থপ্রণয়ন করেন। ইহাতে পুত্রের কর্ত্তব্য পিতৃশ্রাদ্ধের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই পুস্তক তিনি মিথিলারাজ রামভদ্রদেবের আদেশে রচনা করেন। তিনি রাজা রামভদ্রের সভাসদ ছিলেন। রামভদ্র রূপনারায়ণ নামেও পরিচিত ছিলেন। রূপনারায়ণ রামভদ্রদেবের পিতা হরিনারায়ণ মিথিলায় রাজত্ব করিতেন।

"প্রণম্য বাসুদেবায় তনুতে স্বর্গরঙ্গিনী।
শ্রীবাচস্পতি-ধীরেণ পিতৃভক্তিতরঙ্গিনী॥"

ইতি শ্রীমহারাজাধিরাজ-শ্রীহরিনারায়ণাত্মজ-শ্রীরূপনারায়ণাপদবীমলঙ্কৃতমিথিলামণ্ডল—শ্রীরামভদ্র-চরণাদিষ্টেন পরিষদা শ্রীবাচস্পতিশর্ম্মণা বিরচিতোঽয়ং শ্রাদ্ধকল্পঃ পরিপূর্ণঃ।" (পিতৃভক্তিতরঙ্গিনী)

'দ্বৈতনির্ণয়ের উল্লিখিত পুরুষোত্তমদেবের প্রকৃত নাম রামভদ্র (রূপনারায়ণ), পিতৃভক্তিতরঙ্গিনীর শেষাংশ দৃষ্টে তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতীত হইতেছে। ইহা হইতে ইহাও জানা যাইতেছে যে বাচস্পতি মিশ্র মিথিলার রাজা ভৈরব সিংহ (হরিনারায়ণ) এবং তাঁহার পুত্র রামভদ্র (রূপনারায়ণ) দেবের সভাসদ ছিলেন।

ডাক্তর মিত্র মহোদয় এই তিন গ্রন্থ যে একই ব্যক্তির রচিত, তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই। তিনি রামভদ্রকে রূপনারায়ণের পুত্র এবং হরিনারায়ণের পৌত্র বলিয়া ভ্রমক্রমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। *

এক্ষণে রাজা ভৈরব সিংহ (হরিনারায়ণ) দেবের সময় নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। এই সময় নির্ণয় করিতে পারিলে বাচস্পতি মিশ্রের আবির্ভাব কাল নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হইবে।

বাচস্পতি মিশ্রের রচিত 'কৃত্য মহার্ণব' হইতে জানা যাইতেছে, রাজা ভৈরবসিংহ (হরিনারায়ণ) দেবের পিতার নাম দর্পনারায়ণ, এই রাজা দর্প নারায়ণের আদেশ

* 'The work was compiled by Vachaspati Sarma, a court pandit, under the orders of Rambhadra, son of Rupnarayan and grandson of Harinarayan of Mithila.' (Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. V. 90)

ক্রমে বিদ্যাপতি ঠাকুর দায়াধিকার সম্বন্ধে 'বিভাগসার' নামে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন।* বিদ্যাপতি ঠাকুরের রচিত 'দানবাক্যাবলী' হইতে জানা যাইতেছে যে, রাজা দর্পনারায়ণের প্রকৃত নাম নরসিংহ দেব। রাজা নরসিংহদেব রাজ পণ্ডিত কামেশ্বর ঠাকুরের বংশধর। রাজা নরসিংহের পত্নীর নাম ধীরমতী দেবী †। এই ধীরমতী দেবীর আদেশে বিদ্যাপতি 'দানবাক্যাবলী' রচনা করেন। ধীরমতী দেবীর গর্ভে রাজা নরসিংহদেবের দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ভৈরবসিংহ কনিষ্ঠ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ধীরসিংহ। রাজা ভৈরবসিংহের আদেশে বিদ্যাপতি ঠাকুর 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী' রচনা করেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বাচস্পতি মিশ্র ও বিদ্যাপতি ঠাকুর একই সময়ে মিথিলার রাজা ভৈরব সিংহের সভা অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। বিদ্যাপতি ঠাকুরের অসামান্য কবিত্ব ও বাচস্পতি মিশ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্য মিথিলাকে একই সময়ে গৌরবান্বিত করে।

বিদ্যাপতি ঠাকুর যখন বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হন, সেই সময়ে বাচস্পতি মিশ্র পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেন। বিদ্যাপতি ভবসিংহের পৌত্র ও দেবসিংহের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রাজা শিবসিংহের আদেশ ক্রমে 'পুরুষ পরীক্ষা' রচনা করেন। তিনি শিবসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পদ্মসিংহের পত্নী রাজ্ঞী বিশ্বাস দেবীর আদেশে 'গঙ্গাবাক্যাবলী' ও 'শৈব সর্ব্বস্বসার' প্রণয়ন করেন। বাচস্পতি মিশ্রের রচিত কোন গ্রন্থ শিবসিংহ,পদ্মসিংহ বিশ্বাসদেবী ও নরসিংহদেবের আদেশ ক্রমে রচিত হয় নাই। অতএব বিদ্যাপতি ঠাকুর যে বাচস্পতি মিশ্র অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

* আমরা "কবি বিদ্যাপতির জীবনী" নামক পুস্তকে বিদ্যাপতি ঠাকুরের পরিচয় প্রসঙ্গে মিথিলার রাজ বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছি। উক্ত পুস্তকের ১৪—৩১ পৃষ্ঠায় বিদ্যাপতির জীবনী এবং তাঁহার রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর বিবরণ লিখিত হইয়াছে। উহার ৯৭ পৃষ্ঠার টীকায় মিথিলার কতিপয় নৃপতির আনুমানিক রাজত্ব সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রবন্ধে স্থলে স্থলে উক্ত পুস্তক হইতে কোন কোন বিষয় গৃহীত হইল।

† ডাক্তর মিত্র মিথিলার রাজা নরসিংহদেবের মহিষীকে রাজ পণ্ডিত রামেশ্বরের দুহিতা বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে 'বিদ্যাপতির জীবনী' পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠায় আমরা ধীরমতীর সেইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছি। নরসিংহদেব রাজ পণ্ডিত রামেশ্বরের বংশধর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ডাক্তর মিত্র এই কামেশ্বরকে ধীরমতীর পিতা রামেশ্বর নামে পরিচিত করিয়া, মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমাদের ভ্রম এক্ষণে প্রত্যাহার করিতেছি।

(Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. V. 137.)

* বিদ্যাপতি ঠাকুরের রচিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একটী কবিতার অন্তে দেবসিংহের নাম উল্লিখিত দেখা যায়। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এই কবিতা রচনার সময় বিদ্যাপতি রাজা দেবসিংহের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। ১৩৮০—১৪৯০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন।

"সসন পরস খসু অম্বর রে
দেখল ধনী দেহ।
নব জলধরে তরে সঞ্চর রে
জনি বিজুরি রেহ॥
আজ দেখল ধনি জাইল রে
মোহি উপজগ রঙ্গ।
কনক লতা জনু সঞ্চর রে
মহী নিরঅবলম্ব॥
তা পুন অবরুব দেখল রে
কুচযুগ অরবিন্দ।
বিগসিত নহি কিউ কারণৈ রে
সোঝা মুখ চন্দ॥

বিদ্যাপতি ঠাকুর ও বাচস্পতি মিশ্রের বর্ণিত মিথিলার রাজবংশাবলী যে অভ্রান্ত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারা উভয়েই মিথিলার নৃপতিদিগের সভাসদ ও সমকালিক কবি ছিলেন। মিথিলার প্রামাণিক ইতিহাস ও বংশাবলী 'পাঞ্জী' নামে পরিচিত। পাঞ্জী ১২৪৮ শকাব্দ (১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে তালপত্রে লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। রাজা হরিসিংহদেবের আদেশ ক্রমে মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের বংশাবলী ইহাতে সঙ্কলিত হইতে থাকে। 'পাঞ্জী'র লেখকগণ 'পাঞ্জিয়ার *' নামে পরিচিত। এই 'পাঞ্জী' রীতিমত ৫৭০ বৎসর যাবৎ তালপত্রে লিখিত হইয়া প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে। পাঞ্জীর প্রদত্ত বংশপত্রিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে বিদ্যাপতি ঠাকুর ও বাচস্পতি মিশ্রের বর্ণিত সংক্ষিপ্ত রাজবংশাবলী পূর্ণাবয়বে পাঠকগণ অবগত হইতে পারিবেন।

"পুরুষ-পরীক্ষায়" যিনি বিদ্যাপতি কর্ত্তৃক ভবসিংহদেব নামে উল্লিখিত হইয়াছেন, বিদ্যাপতির "বিভাগসার" ও বাচস্পতি মিশ্রের 'কৃত্যমহার্ণবে' তিনিই ভবেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই ভবেশ বা ভবসিংহদেবের দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে দেবসিংহ জ্যেষ্ঠ ও হরিসিংহ কনিষ্ঠ। ভবসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দেবসিংহ মিথিলায় রাজত্ব করেন। দেবসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিবসিংহ মিথিলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। শিবসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পদ্মসিংহ মিথিলায় রাজত্ব করেন। তদনন্তর পদ্মসিংহের মহিষী বিশ্বাসদেবী রাজ্যশাসনের ভার প্রাপ্ত হন। তদনন্তর নরসিংহ (দর্পনারায়ণ), ধীরসিংহ, ভৈরবসিংহ (হরিনারায়ণ) এবং রামভদ্রসিংহ(রূপনারায়ণ)যথাক্রমে মিথিলার শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। রাজপণ্ডিত কামেশ্বর ঠাকুর দ্বারাই রাজবংশ মিথিলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাপতি ঠাকুর ও বাচস্পতি মিশ্রের প্রণীত কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে মিথিলার ব্রাহ্মণ রাজবংশের এই বিবরণ পাওয়া যাইতেছে।

বিদ্যাপতি কবি গাওল রে
বুঝহ রসবন্ত।
দেবসিংহ নৃপ নাগর রে
হাসিনি দেই কন্ত॥"

পূর্ব্বোক্ত কবিতা হইতে হাসিনি দেবী দেবসিংহের মহিষী বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এই কবিতা কতদূর প্রামাণিক তাহা বলিতে পারি না। অপর দুইটী কবিতার ভণিতায় রাজা রাঘবসিংহ ও তাঁহার পত্নী মোদবতীর উল্লেখ দেখা যায়। এই রাঘবসিংহ পদের লক্ষ্য রাজা রঘুসিংহ (বিজয়নারায়ণ) বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি রাজা নরসিংহ (দর্পনারায়ণ) দেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের অন্যতম।

"মোদবতী পতি, রাঘব সিংহ পতি,
কবি বিদ্যাপতি গাই॥"
"ভণহিঁ বিদ্যাপতি সুনু পরমান।
বুঝু নৃপ রাঘব নব পচোবান॥"

* মিথিলার পাঞ্জিয়ারগণ বঙ্গদেশের কুলজ্ঞ ঘটকদিগের সদৃশ। তাঁহারা প্রতি বৎসর মিথিলার গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন পূর্ব্বক তৎপূর্ব্ব বর্ষে যে সকল ব্রাহ্মণ বালক বালিকার জন্ম হয়, তাহাদের নাম সংগৃহীত করেন। পরে পাঞ্জীতে সেই সকল নবজাত ব্রাহ্মণ সন্ততির নাম রীতিমত লিখিত হয়। প্রত্যেক মৈথিল ব্রাহ্মণের জন্ম ও বিবাহের বিষয় পাঞ্জীতে উল্লিখিত থাকে। পাঞ্জীতে যে সকল বালক বালিকার উল্লেখ থাকে না, জাত্যাভিমানী কোনও ব্রাহ্মণ তাহাদের সহিত স্বীয় কন্যা কি পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হয় না। এই জন্য পাঞ্জী শুদ্ধরূপে লিখিত করিবার জন্য, সকল মৈথিল ব্রাহ্মণেরই সম্পূর্ণ দৃষ্টি ও মনোযোগ থাকে। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে সৌরাথ মহেশী ও অন্যান্য স্থানে বিবাহের লগ্ন উপস্থিতের পূর্ব্বে মেলা হয়। সেই মেলায় বিবাহ-যোগ্য সন্তানের পাত্রপাত্রীর অনুসন্ধানে সকল মৈথিল ব্রাহ্মণ সমবেত হয়। কুলজ্ঞ পাঞ্জিয়ারগণ পাঞ্জী দৃষ্টে বিভিন্নবংশজ ও বিভিন্ন স্থানবাসী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিবাহের বৈধাবৈধতা নির্ণয় করিয়া দেন। পাঞ্জিয়ারগণের প্রদত্ত ব্যবস্থা অবনত মস্তকে গৃহীত হয়। তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যবস্থা অনুসারে বিবাহের কথা বার্ত্তা নির্দ্দিষ্ট হয়। মধুবনীর ৭।৮ মাইল পশ্চিমস্থ সৌরাথ গ্রামের মেলার সময় লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ সমবেত হয়।

(মিথিলার রাজবংশ।*)

অধিরূপ ঠাকুর
|
বিশ্বরূপ ঠাকুর
|
গোবিন্দ ঠাকুর
|
লক্ষ্মণ ঠাকুর
|
রাজপণ্ডিত কামেশ্বর ঠাকুর (রাজা)
|

রাজা ভোগেশ্বর ঠাকুর   রাজা ভবেশ্বর ঠাকুর (ভবসিংহ দেব)

উদয় সিংহ   রাজা দেবসিংহ দেব   ত্রিপুর সিংহ   হরিসিংহ দেব

রাজা শিবসিংহ (=রূপনারায়ণ)   রাজা পদ্মসিংহ   সর্ব্বসিংহ   রাজা নরসিংহ (=দর্পনারায়ণ)   রত্নেশ্বর সিংহ (=জীবননারায়ণ)   নারায়ণবিজয়   রাজা রঘুসিংহ (হরিনারায়ণ)   ব্রহ্মসিংহ   ভানুসিংহ (বীরনারায়ণ)

রাজা ধীরসিংহ (=হৃদয়নারায়ণ)   রাজা ভৈরবসিংহ (=হরিনারায়ণ)   রাজা চন্দ্রসিংহ   দুর্লভ (=রণ) সিংহ

রাঘবসিংহ   জগন্নারায়ণ   রাজা রামভদ্র সিংহ (=রূপনারায়ণ)   গরুড়নারায়ণ   বিশ্বনাথ সিংহ (=নবনারায়ণ)

গদাধর সিংহ   রাজা লক্ষ্মীনাথ (=কংশনারায়ণ)   রাজা বলভদ্র   রতিনাথ (=ভুবননারায়ণ)   ভবনাথ   রাজা প্রতাপরুদ্র (=হৃদয়নারায়ণ)   রামচন্দ্র

মধুসূদন সিংহ   শ্রীনাথ   কীর্ত্তিনারায়ণ   রুদ্রনারায়ণ   বীরনারায়ণ   জগৎনারায়ণ   রত্নসিংহ

শতাধিক বৎসর অতীত হইল অযোধ্যা প্রসাদ নামে জনৈক মিথিলাবাসী কায়স্থ উর্দ্দু ভাষায় দ্বারবঙ্গ (দারভাঙ্গা) রাজবংশের এক ইতিহাস রচনা করেন। ইহাতে তিনি প্রচলিত কিম্বদন্তী অবলম্বনে মিথিলার প্রাচীন রাজবংশের দশ জন নরপতির নাম ও রাজত্ব কাল নির্দ্দেশ করেন। অযোধ্যা প্রসাদের প্রদত্ত নিম্নোদ্ধৃত নামমালা ও রাজত্ব সময় ১৮৭৮ খ্রীঃ সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র মহোদয় স্বসম্পাদিত "বিদ্যাপতি পদাবলী" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তকের ভূমিকায় প্রথমতঃ প্রকাশ করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ সুপণ্ডিত গ্রিয়ারসন সাহেব সারদা বাবুর গবেষণা-পূর্ণ ভূমিকার সারমর্ম্ম সঙ্কলন পূর্ব্বক 'বিদ্যাপতি' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করেন। আমরা 'কবি বিদ্যাপতি" পুস্তকে অযোধ্যা প্রসাদের উল্লিখিত নামমালা ও রাজত্বকাল নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিয়াছি।* ১৮৭৪ খ্রীঃ সুপণ্ডিত রাজকৃষ্ণ বাবু 'বিদ্যাপতি' শীর্ষক প্রবন্ধে অযোধ্যাপ্রসাদের নির্দ্দিষ্টকাল কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতভাবে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন। রাজকৃষ্ণ বাবু লিখিয়াছেন যে, পাঞ্জীর মতে

* এই বংশপত্রিকা মিথিলার প্রামাণিক ইতিহাস 'পাঞ্জী' হইতে সঙ্কলন করিয়া, ১৮৮৫ খ্রীঃ সুপণ্ডিত গ্রিয়ারসন সাহেব সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন। গ্রিয়ারসন সাহেবের প্রকাশিত বংশাবলী যথাসাধ্য সংশোধন পূর্ব্বক এস্থলে প্রদত্ত হইল (Indian Antiquary for 1885, XIV 19.)

* "কবি বিদ্যাপতি" (৯৭ পৃষ্ঠা) এবং "বঙ্গদর্শন চতুর্থখণ্ড (১২৮২) জ্যৈষ্ঠ" ৮৭ ও ৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। Indian Antiquary for 1885, XIV. 187.

দেবসিংহ ৬১, শিবসিংহ ৩॥, পদ্মাবতী ১॥, লখিমা ৯, বিশ্বাসদেবী ১২ এবং নরসিংহ ৬ বৎসর রাজত্ব করেন। শিবসিংহ ১৩৬৯-৭৩ এবং নরসিংহদেব ১৩৯৫-১৪০১শকাব্দ পর্য্যন্ত মিথিলায় রাজত্ব করেন।

(১) ভবসিংহ (ভবেশ্বরসিংহ) ১৩৪৮—৮৫খ্রীঃ = ৩৭বৎসর
(২) দেবসিংহ (দেবেশ্বরসিংহ) ১৩৮৫—১৪৪৬ = ৬১ ,,
(৩) শিবসিংহ ১৪৪৬—৪৯ = ৩ ,,
(৪) লখিমা দেবী ১৪৪৯—৫৮ = ৯ ,,
(৫) বিশ্বাস দেবী ১৪৫৮—৭০ = ১২ ,,
(৬) দ্রব্যনারায়ণ ১৪৭০—৭১ = ১ ,,
(৭) হৃদয়নারায়ণ ১৪৭১—১৫০৬ = ৩৫ ,,
(৮) হরিনারায়ণ ১৫০৬—২০ = ১৪ ,,
(৯) রূপনারায়ণ ১৫২০—৩২ = ১২ ,,
(১০) কংশনারায়ণ ১৫৩২—৪৯ = ১৭ ,,

পূর্ব্বোদ্ধৃত তালিকায় অযোধ্যাপ্রসাদ রাজা ভবসিংহকে মিথিলার রাজবংশের আদিপুরুষ ও প্রথম নৃপতি বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, ১৩৪৮—১৫৪৯খ্রীঃ পর্য্যন্ত ২০১ বৎসরে দশজন রাজার ধারাবাহিক রাজত্ব সময় প্রদান করিয়াছেন। গড়ে প্রত্যেক নরপতির রাজত্বকাল বিংশতি বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথম তিন জনের রাজত্ব কাল দ্বারা শত বৎসরেরও অধিক পূর্ণ করা হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী সাত জনের শাসন সময় ঠিক শত বৎসর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। অযোধ্যাপ্রসাদের মতে ভবসিংহ ও দেবসিংহ দুইজনে ৯৮ বৎসর রাজত্ব করেন। দুই পুরুষে এক শতাব্দী রাজত্ব করা ইতিহাসে প্রায় দেখা যায় না। পিতা পুত্রের পক্ষে এত দীর্ঘকাল রাজত্ব কোনও ক্রমে সম্ভবপর বোধ হয় না। অযোধ্যাপ্রসাদের মতে শিবসিংহ তিন বৎসর কাল মাত্র রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। রাজকৃষ্ণ বাবুর মতে তিনি সাড়ে তিন বৎসর রাজত্ব করেন। এই বংশীয় কোনও রাজা শিবসিংহের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। শিবসিংহের অসংখ্য কীর্ত্তিকলাপের চিহ্ন মিথিলায় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাঁহার খনিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সরোবর মিথিলার নানা স্থানে বর্ত্তমান আছে। লেহরাতে শিবসিংহের খনিত অতি বৃহৎ সরোবরের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। তথায় তাঁহার আদেশে নির্ম্মিত রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি প্রদর্শিত হইতেছে। লেহরা গ্রাম কমলা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। লেহরা গ্রামের অতি বৃহৎ সরোবর 'রজোখরি' নামে পরিচিত। এই সরোবর যেমন সকল জলাশয় হইতে বৃহত্তম, সেইরূপ শিবসিংহ সমুদয় মৈথিল নরপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তাঁহার নির্ম্মিত কীর্ত্তিকলাপের ন্যায় জনপ্রবাদ মুক্তকণ্ঠে শিবসিংহের সুদীর্ঘ রাজত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

"পোখরী রজোখরী, ঔর সভ পোখরা।
রাজা শিব সিংঘ,ঔর সভ ছোকড়া॥"

অযোধ্যাপ্রসাদের তালিকায় রাজ্ঞী পদ্মাবতীর নাম পর্য্যন্ত অনুল্লিখিত রহিয়াছে। রাজা কামেশ্বর, ভোগেশ্বর, পদ্মসিংহ, রঘুসিংহ (বিজয়নারায়ণ), চন্দ্রসিংহ, বলভদ্র ও প্রতাপরুদ্র দেবের নাম অযোধ্যা প্রসাদের তালিকায় দেখা যাইতেছে না, কিন্তু 'পাঞ্জী' গ্রন্থে তাঁহাদের সকলের নাম স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত রহিয়াছে। কায়স্থজাতীয় অযোধ্যা প্রসাদ ব্রাহ্মণজাতির লিখিত 'পাঞ্জী' গ্রন্থ দেখিতে পান নাই। 'পাঞ্জী' দৃষ্টে রাজবংশের নামমালা প্রস্তুত করিলে, অযোধ্যা প্রসাদ কখনও রাজা ভবসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী ও কংশনারায়ণের পরবর্ত্তী নরপতিগণকে অনুল্লিখিত রাখিতেন না। যিনি রাজবংশের নাম নির্দ্দেশে

এরূপ গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাঁহার সময় নির্দ্দেশ অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। অযোধ্যাপ্রসাদ রাজা দর্পনারায়ণকে দ্রব্যনারায়ণ নামে পরিচিত করিয়া, তাঁহার রাজত্ব কাল এক বৎসর মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অযোধ্যাপ্রসাদের মতে তিনি ১৪৭১ খ্রীঃ মিথিলার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রাজকৃষ্ণ বাবুর মতে তিনি ১৩৯৫ শকাব্দ (১৪৭৩ খ্রীঃ) হইতে ছয় বৎসর কাল মিথিলায় রাজত্ব করেন।

এই সকল কারণে আমরা অযোধ্যাপ্রসাদ ও রাজকৃষ্ণ বাবুর নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতি আস্থাবান হইতে পারিতেছি না। অযোধ্যা প্রসাদের নির্দ্দিষ্ট সময় নির্ণয়ের প্রতি সুপণ্ডিত জন্ বিম্‌স ও জর্জ গ্রিয়ারসন্ সাহেব সন্দিহান হইয়া 'বিদ্যাপতি' শীর্ষক প্রবন্ধে * তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের কেহই কোন বিশিষ্ট কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক মিথিলার রাজবংশের বিভিন্ন নরপতিদিগের সময় নিরূপণের কোনও চেষ্টা করেন নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তৎসম্বন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাহার মীমাংসা করিব।

'কবি বিদ্যাপতি' নামক পুস্তকের ২৮-২৯ পৃষ্ঠায় আমরা শিবসিংহের প্রদত্ত এক খানি তাম্রশাসনের মূল প্রকাশ করিয়াছি। বাগ্‌মতী (কমলা) নদীর তীরবর্ত্তী 'গজরথপুর' রাজধানী হইতে এই শাসনপত্র প্রকাশিত হয়। মহারাজাধিরাজ শিবসিংহ ইহা দ্বারা ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে আপনার সভাসদ সুকবি বিদ্যাপতি ঠাকুরকে বিসপী গ্রাম উপভোগার্থ প্রদান করেন। ইহা শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে বৃহস্পতি বারে লিখিত হয়। ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে বাঙ্গলা সন ৮০৭, ১৪৫৫ সংবতাব্দ এবং ১৩২১ শকাব্দ প্রচলিত ছিল বলিয়া এই শাসনপত্রের শেষে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে,১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাপতি বিসপী গ্রাম দানপ্রাপ্ত হন এবং ১১০৭ খ্রীঃ মিথিলায় লক্ষ্মণাব্দের প্রচলন আরম্ভ হয়। ইহা হইতে মিথিলার প্রাচীন রাজবংশ, বাঙ্গালার সেনবংশ, শিবসিংহ ও বিদ্যাপতি ঠাকুরের সময় নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যাইতেছে। শিব সিংহের প্রদত্ত এই শাসনপত্র মিথিলার প্রাচীন রাজবংশের সময় নির্ণয় সম্বন্ধে আমাদের প্রধান অবলম্বন।

পূর্ব্বোল্লিখিত শাসন পত্রের আরম্ভের দুইটী শ্লোক বাঙ্গলা অনুবাদসহ উদ্ধৃত করিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু ১৮৭৪ খ্রীঃ ইহার অস্তিত্বের বিষয় ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "বঙ্গদর্শনে" বঙ্গবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অবগত করান। এই তাম্রশাসন রাজা শিব সিংহের রাজত্বের ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পিতা দেবসিংহের রাজত্ব কালে লিখিত হয় বলিয়া সেই প্রবন্ধে তিনি নির্দ্দেশ করেন। মৈথিল পণ্ডিতদিগের অনুমান ও জনপ্রবাদ ভিন্ন তিনি 'পাঞ্জীকে' এই মতের প্রমাণস্থলে উপস্থিত করেন।* তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত রাজ-

* Indian Antiquary (II. 37, IV. 299 and XIV. 188)

অযোধ্যাপ্রসাদের নির্দ্দিষ্ট সময় নির্ণয়ের প্রতি সন্দিহান হইয়া জন্ বিমস্ সাহেব বিদ্যাপতির সুদীর্ঘ জীবন কালের প্রতিও সন্দিহান হইয়াছেন। বিদ্যাপতি ১৩৮০—১৪৯০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ১১০ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থ হইতেই সপ্রমাণিত হইতেছে।

* "পাঠকগণ দেখিবেন যে, রাজা শিবসিংহের দানপত্রে লক্ষ্মণসেনের অব্দ ব্যবহৃত। অনুসন্ধান দ্বারা পরে আমরা অবগত হইয়াছি যে,মৈথিল পণ্ডিতসমাজে অদ্যাপি মহারাজা লক্ষ্মণসেনের অব্দ চলিতেছে। উহার চিহ্ন 'লসং' মাঘমাসের প্রথম দিন হইতে উহার বৎসর

কৃষ্ণ বাবুর এই ভ্রান্ত মত নিরাপত্তিতে গৃহীত হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে কেহই কোন আপত্তি উত্থাপিত করিয়া এই মতের যথোচিত সমালোচনা করিতে প্রয়াস পান নাই। রাজকৃষ্ণ বাবু বোধ হয় মৈথিল 'পাঞ্জী' এবং তাম্রশাসনের মূল অথবা তাহার প্রতিলিপি দেখিতে পান নাই। কারণ তাহা হইলে তিনি সমগ্র শাসন পত্রের প্রতিলিপি অবশ্যই মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতেন। উক্ত প্রবন্ধের শেষভাগে রাজকৃষ্ণ বাবু বিদ্যাপতির জীবনী সংগ্রহে সাহায্য দানের নিমিত্ত দ্বারবঙ্গের রাজবংশজাত বাবু বংশীধারী সিংহ মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। বোধ হয়, এই বংশীধারী সিংহ তাঁহাকে শিবসিংহের নামাঙ্কিত শাসনপত্রের শ্লোক দুইটী প্রেরণ করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ "নানা-প্রবন্ধ" নামক পুস্তকে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত অন্যান্য চৌদ্দটী প্রবন্ধের সহিত 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধ অবিকল প্রকাশিত হয়। এই শাসন পত্রের শেষে ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দ ও ১৩২১ শকাব্দ স্পষ্টাক্ষরে লিখিত থাকা সত্বেও, রাজকৃষ্ণ বাবু ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দকে ১৩২৩ শকাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, তিনি শাসনপত্রের মূল অথবা তাহার প্রতিলিপি সংগ্রহে কখনও বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। এই শাসন পত্রের সমূল প্রতিলিপি সংগ্রহ ও প্রকাশের জন্য ভারতবাসী সুপণ্ডিত গ্রিয়ারসন সাহেবের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিবে।*

এই শাসনপত্রে শিবসিংহ 'মহারাজাধি-

পরিবর্ত্তন ঘটে। এক্ষণে ৭৬৭ লক্ষ্মণ সংবৎ চলিতেছে। এ সময়ে শকাব্দ ১৭৯৭ ও খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭৪ বর্ষ বহমান। সুতরাং শকাব্দ ১০৩০ ও খ্রীষ্টাব্দ ১১০৭ লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব কাল হইতেছে। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান দ্বারা ১১০০খ্রীঃ হইতে ১১২০ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব সময় ধরিয়াছেন। মিথিলায় প্রচলিত লক্ষ্মণাব্দ দ্বারা তাঁহার মতেরই সমর্থন হইতেছে।

১০৩০ শকাব্দে লক্ষ্মণাব্দের আরম্ভ। সুতরাং ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দ ১৩২৩ শকাব্দ হইতেছে। যদি শেষোক্ত বৎসর রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতি কবিকে ভূমি-দানপত্র দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ১৩৬৯ শকে শিবসিংহ রাজ্যাভিষিক্ত হন, মিথিলার পাঞ্জী গ্রন্থে এরূপ উক্তি কেন দেখা যায়? ইহাতে ত তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত হইবার ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে দান করিতে দেখা যাইতেছে। মৈথিল পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এই দানপত্র তাঁহার যৌবরাজ্য কালে প্রদত্ত। শিবসিহ অনেক আয়াসসাধ্য কার্য্য করিয়াছিলেন। এ প্রকার জনশ্রুতি আছে। কিন্তু অত্যল্প কাল অর্থাৎ সাড়ে তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। ইহাতে প্রতীত হয় যে, সেইকার্য্য সকল তদীয় যৌবরাজ্য কালেই সম্পন্ন হইয়াছিল। মিথিলায় এরূপ কিম্বদন্তীও আছে। পাঞ্জী প্রবন্ধানুসারে শিবসিংহের পিতা দেবসিংহের রাজত্বকাল ৬১ বৎসর। সুতরাং রাজা হইবার ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে শিবসিংহ যুবরাজ ছিলেন, ইহা কোন ক্রমেই বিস্ময়কর নহে।" (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ। ১২৮২, ৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা)

* "The following is the deed of endowment granting Bisapi to Vidyapati. It happened that for reasons, which need not be detailed here, I have been unable to get possession of the actual copper plate. I managed however, to get a carefully corrected copy. It has never, I believe, been published." (Dr. G. A. Grierson's article on "Vidyapati and his contemporaries" in 'Indian Antiquary' for 1885, XIV.190.)

গ্রিয়ারসন সাহেবের প্রকাশিত শাসনপত্রের এই প্রতিলিপিতে ২৯৩ স্থলে '২৮৩' লিখিত রহিয়াছে। রাজকৃষ্ণ বাবুর উদ্ধৃত শাসনপত্রের শ্লোক দুইটী সারদা বাবুর পুস্তকের ভূমিকায় অবিকল গৃহীত হয়। সারদা বাবুও তাহা সংগ্রহের কোন চেষ্টা করেন নাই। এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পর, দারভাঙ্গার কালেক্টর মৃত Tute সাহেবের সাহায্যে গ্রিয়ারসন সাহেব তাম্র শাসনের যে মূল ১৮৯৫খৃঃ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ২৯২ লক্ষ্মণাব্দ (লসং) লিখিত রহিয়াছে। (Proceedings of A. S. of Bengal for 1895. page 143)

রাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা দেবসিংহের জীবিতকালে এই শাসন-পত্র দ্বারা কবিচূড়ামণি বিদ্যাপতি ঠাকুরকে বিসপী গ্রাম প্রদান করা হয় নাই। পিতার জীবিত কালে এই শাসন পত্র উৎকীর্ণ ও প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, দানকর্ত্তা যুবরাজ শিবসিংহ ইহাতে কখনই 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় পিতৃদেবের নাম পর্য্যন্ত শাসন লিপিতে অনুল্লিখিত রাখিতেন না। পিতার আদেশে এই গ্রাম প্রদত্ত হইতেছে, ইহা অবশ্যই শাসনপত্রে উক্ত হইত। শাসন-পত্রের দ্বিতীয় শ্লোকে শিবসিংহদেব 'নৃপতি' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ষষ্ঠ শ্লোকে পিতা দেবসিংহের অনুষ্ঠিত 'তুলা পুরুষ' নামে দান ব্যাপার অতীত কালে সম্পাদিত হয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শাসনপত্রের সপ্তম শ্লোকে পিতার নাম ও বিষয় অতীত ঘটনার ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্লোকের সহিত 'পুরুষ পরীক্ষার' আরম্ভের প্রথম শ্লোক তুলিত হইতে পারে। শিবসিংহের রাজত্ব কালে 'পুরুষ পরীক্ষা' রচিত হয় বলিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় দেবসিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যুবরাজ শিবসিংহের শিক্ষাদানের জন্য ইহা রচিত হয়। এই নিমিত্তই তাহার পঞ্চম শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তিতে 'ভাতি যস্য জনকো' এবং প্রথম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে "শ্রীদেবসিংহ ক্ষিতিপাল" লিখিত রহিয়াছে*। 'পুরুষ পরীক্ষার' ন্যায় এই শাসন পত্রের আটটী শ্লোকও বিদ্যাপতির দ্বারা রচিত হয়। 'পুরুষ পরীক্ষা' রাজা শিবসিংহকে নীতি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত হয়। 'পুরুষপরীক্ষার' রচনা সমাপ্তির পর ১৪০০ খ্রীঃ এই শাসন-পত্র বিদ্যাপতির দ্বারা রচিত হয়। 'পুরুষ পরীক্ষার' প্রদত্ত উপদেশে অত্যন্ত উপকৃত হইয়া, নবীন রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতি ঠাকুরকে তাঁহার আবাস গ্রাম বিপসী প্রদান করিয়া থাকিবেন। আমাদের বিবেচনায় পিতৃবিয়োগের পরে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, মহারাজ শিবসিংহ এই দান পত্রের দ্বারা বিদ্যাপতিকে বিসপী গ্রাম প্রদান করেন। তাহার রাজত্ব প্রাপ্তির ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে এই শাসন-পত্র লিখিত হয় নাই। তাহার রাজত্বের আরম্ভ বৎসরে ১৪০০ খ্রীঃ এই দানপত্র লিখিত হয়। রাজ্যাভিষিক্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই রাজা শিবসিংহ আপনার প্রিয় সভাসদকে স্বাধীন ভাবে বিসপী গ্রাম প্রদান করেন।

সচরাচর পাঁচ পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করা হয়। ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ শিবসিংহের রাজত্ব আরম্ভ হয়। তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসন স্পষ্টাক্ষরে ইহা নির্দ্দেশ করিতেছে। এই তাম্রশাসনের উক্তি অনুমান ও জনপ্রবাদ অপেক্ষা অবশ্যই অনেক অধিক মূল্যবান্। 'পাঞ্জী' গ্রন্থে মিথিলার প্রাচীন রাজাদিগের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিলে, গ্রিয়ারসন্ স্বরচিত প্রবন্ধে অবশ্যই তাহার উল্লেখ করিয়া রাজবংশের নামমালার সহিত পাঞ্জীর বর্ণিত সময় নির্দ্দেশ করিতেন*। রাজা শিব-

* "কবি বিদ্যাপতি," ২০।২৮।২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* "This grant was translated by me in the Indian Antiquary, Vol XIV (1885) p.190...My attention has again been drawn to the matter by article of Dr. Eggling... In describing a mss. of the *Durga-bhakti-tarangini*, he discusses the whole question of Vidyapati's life and times. There is no doubt that the date of this grant gives rise to serious difficulties in regard to the chronology of Vidyapati's life, and it is desirable that the grant itself should be carefully examined. A reduced fac-simile of the plate is here published, so as to allow of its leisurely examination by experts in epigraphy." (Proceedings of A. S. B. for 1895. p. 143-44)

সিংহের প্রদত্ত ও তাঁহার সভাসদ কবি বিদ্যাপতির লিখিত তাম্রশাসন, অতি আধুনিক অযোধ্যা প্রসাদের উক্তি অপেক্ষা অবশ্যই অধিকতর প্রামাণিক ও বিশ্বাসযোগ্য। পশ্চাৎ আমরা মৈথিল রাজ বংশের সময় যথাসাধ্য নির্দ্দেশ করিলাম।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আরম্ভে অযোধ্যার অধিপতি সূর্য্যবংশীয় হরিসিংহদেব মুসলমান জাতির আক্রমণে সপরিবারে স্বদেশ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তিনি দুঃসময়ে কুলদেবী তুলজা ভবানীকে সঙ্গে লইয়া আগমন করেন। নেপালের দক্ষিণস্থ জঙ্গলাকীর্ণ 'তরাইর' অন্তর্গত সিমরাউনগড়ে তিনি আপনার আবাসস্থল মনোনীত করেন। ঠকুরী বংশীয় জয়জগৎমল্ল তখন নেপালে ও মিথিলায় রাজত্ব করিতেছিলেন। ৮৮০ খ্রীঃ ঠকুরীবংশীয় জয়দেব স্বীয় রাজ্যাভিষেকের কাল হইতে নেপালে নেওয়ারী সংবৎ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার ২১৭ বৎসর পর ১০১৯ শকাব্দে মল্লবংশ নান্যদেব দ্বারা নেপাল হইতে বিতাড়িত হইয়া, মিথিলায় পলায়ন ও আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা হরিসিংহদেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মিথিলায় মল্লবংশের আধিপত্য অব্যাহত থাকে। সিমরাউনগড়ে রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর হরিসিংহদেব মিথিলা আক্রমণ করেন। মল্লবংশীয় জয় জগৎমল্ল পরাক্রান্ত হরিসিংহদেবের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হন। মিথিলায় হরিসিংহদেবের আধিপত্য তদবধি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি মিথিলায় বহুসংখ্যক সরোবর খনিত করান। কুলদেবী তুলজা ভবানীর আদেশ ক্রমে তিনি নেপাল আক্রমণ ও অধিকার করেন। ভাটগাঁও নগরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪৪৪ নেপালী সংবতে (১৩২৪খৃঃ) নেপাল হরিসিংহের পদানত হয়। *

১৩২৪ খ্রীঃ হরিসিংহদেব নেপালে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত গ্রন্থকার চণ্ডেশ্বর ঠাকুর এই হরিসিংহদেবের মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১২৪৮ শকাব্দে (১৩২৬ খ্রীঃ) এই হরিসিংহদেবের আদেশে মিথিলার প্রামাণিক বংশাবলী "পাঞ্জ" লিখিত হইতে আরম্ভ হয়†। নেপালের প্রামাণিক বংশাবলীর মতে ২৮ বৎসর কাল হরিসিংহদেব নেপালে রাজত্ব করেন। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, ১৩২৪-৫২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজা হরিসিংহদেব নেপালের শাসন দণ্ড পরিচালন করেন।

মল্লবংশীয় নরপতিদিগের অধিকারকালে অধিরূপ ঠাকুর মিথিলায় উপনিবিষ্ট হন। বিদ্যাবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের প্রভাবে অধিরূপ ও তাঁহার অধস্তন পুরুষেরা মিথিলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অধিরূপের চতুর্থ-বংশধর কামেশ্বর ঠাকুর রাজা হরিসিংহদেবের সভায় রাজ পণ্ডিতের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাজ বল্লালসেনদেবের রচিত 'দানসাগর' নামক স্মৃতি গ্রন্থের অনুকরণে, রাজ পণ্ডিত কামেশ্বর ঠাকুর দ্বিতীয় এক 'দানসাগর' রচনা করেন। চণ্ডেশ্বর ও কামেশ্বর ঠাকুর সমসাময়িক ছিলেন।

১৩২৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত মহারাজ হরিসিংহদেবের আধিপত্য মিথিলায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময়ে তাঁহার আদেশে তালপত্রে মৈথিল

* Dr. G. Buhler's "Inscriptions from Nepal" (1885), p. 39.

† "শাকে শ্রীহরিসিংহদেব-নৃপতে ভূপার্কতুল্যোঽজনি।
তস্মাদ্দন্তমিতেঽব্দকে দ্বিজগণৈঃ পঞ্জী-প্রবন্ধঃ কৃতঃ"॥
(বঙ্গদর্শন, ৪।৮৪ পৃষ্ঠা)

ব্রাহ্মণদিগের বংশাবলী "পাঞ্জ" নামে সঙ্কলিত হইতে থাকে। নেপাল অধিকারের পর হইতে মহারাজা হরিসিংহ তথায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া, নেপাল ও মিথিলা শাসন করিতে থাকেন। তিনি আপনার বিশ্বস্ত অমাত্য ও রাজ পণ্ডিত কামেশ্বর ঠাকুরের হস্তে মিথিলার শাসনভার প্রদান করেন। অনুমান ১৩৩০ খ্রীঃ কামেশ্বর ঠাকুর হরিসিংহদেবের অধীনে বা স্বাধীন ভাবে মিথিলার শাসনভার প্রাপ্ত হন। এই কামেশ্বর ঠাকুরই মিথিলার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ রাজ বংশের প্রথম রাজা। ১৩৫২ খ্রীঃ মহারাজা হরিসিংহদেবের মৃত্যু হয়। তৎপর মিথিলা গৌড়ের নবাব সমসুদ্দিন হাজি ইলিয়াস সাহেবের পদানত হয়। এই হাজি ইলিয়াস দ্বারা হাজিপুর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্ব্বে ১৩২৩ খ্রীঃ দিল্লীশ্বর মহম্মদ টোগলক দ্বারা মিথিলা দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং হরিসিংহদেবের রাজধানী সিমরাউনগড় বিধ্বস্ত হয়।

মিথিলার এই রাজবংশের রাজত্ব ১৩৩০ খ্রীঃ আরম্ভ হয়। শিবসিংহ ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। এই দুইটী ঘটনা হইতে অনুমান বলে এই নৃপতিবংশের রাজত্বকাল অবধারিত হইল এবং প্রচলিত সময় নির্ণয় পূর্ব্বোল্লিখিত নানা কারণে ভ্রান্ত বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল। অযোধ্যা প্রসাদের প্রদত্ত তালিকায় মাত্র দশজন নরপতির নাম প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে আমরা অষ্টাদশ জন নরপতি ও রাজ্ঞীর নাম প্রদান করিলাম। পাঁচ পুরুষে এক শতাব্দী কাল গণনা করিয়া, এই সময় নির্দ্দিষ্ট হইল।

১। রাজা কামেশ্বর ঠাকুর (১৩৩০—৫০)
২। রাজা ভোগেশ্বর ঠাকুর (১৩৫০—৬০)
৩। রাজা ভবেশ্বর ঠাকুর (ভবসিংহ দেব) (১৩৬০—৮০)
৪। রাজা দেবেশ্বর ঠাকুর (দেব সিংহ দেব) (১৩৮০—১৪০০)
৫। রাজা শিবসিংহ দেব (রূপনারায়ণ) (১৪০০—২০)
৬। রাজ্ঞী পদ্মাবতী (১৪২০—২২)
৭। রাজ্ঞী লখিমা দেবী (১৪২২—৩০)
৮। রাজা পদ্মসিংহ (১৪৩০—৩৮)
৯। রাজ্ঞী বিশ্বাসদেবী (১৪৩৮—৫০)
১০। রাজা নরসিংহ দেব (দর্পনারায়ণ)(১৪৫০—৭০
১১। রাজা রঘুসিংহ দেব (বিজয় নারায়ণ) (১৭৪০—৭২)
১২। রাজা ধীরসিংহ দেব (হৃদয় নারায়ণ) (১৪৭২—৮০)
১৩। রাজা ভৈরবসিংহ দেব (হরিনারায়ণ) (১৪৮০—১৫০০)
১৪। রাজা চন্দ্রসিংহ দেব (১৫০০—১৫০৫)
১৫। রামভদ্র দেব (রূপ নারায়ণ) (১৫০৫-২৫)
১৬। রাজ লক্ষ্মীনাথ (কংশ নারায়ণ) (১৫২৫—৪০)
১৭। রাজা বলভদ্র দেব (১৫৪০—৪৫)
১৮। রাজা প্রতাপরুদ্র দেব (১৫৪৫—৫৫)

উপরি উদ্ধৃত রাজবংশের নামমালা হইতে দেখা যাইতেছে যে, রাজা ভৈরব সিংহ (হরিনারায়ণ) দেব ১৪৮০ খ্রীঃ হইতে ১৫০০ খৃঃ পর্য্যন্ত মিথিলায় রাজত্ব করেন। অযোধ্যা প্রসাদের মতে তিনি ১৫০৬-২০খ্রীঃ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। বাচস্পতি মিশ্র তাহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। অতএব তিনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিথিলায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৪৮০-১৫২৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তিনি মিথিলার অধিপতি রাজা ভৈরব সিংহ (হরি নারায়ণ) দেব ও রাজা রামভদ্র (রূপনারায়ণ) দেবের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। সুপণ্ডিত কাউয়েল সাহে-

বের অনুমান * যে একান্ত ভ্রান্ত ও অমূলক, তাহা ইহা হইতে নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণিত হইতেছে।

আমরা উপরে বাচস্পতি মিশ্রের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাঁহার রচিত কতিপয় গ্রন্থের হস্তলিখিত পুঁথি হইতে আমাদের অনুমানের সত্যতা ও অভ্রান্ততা প্রতিপাদিত হইতেছে। ১৪২৮ সংবতাব্দের (১৪৮৪ খ্রীঃ) লিখিত ও বাচস্পতি মিশ্রের রচিত "তত্ত্বসমীক্ষা" নামে বৈদান্তিক গ্রন্থ ডাক্তার হল সাহেব প্রাপ্ত হন। ৪২৫ লক্ষ্মণাব্দের (১৫৩২ খ্রীঃ) লিখিত "শূদ্রাচার চিন্তামণি" এবং ৪৩৩ লক্ষ্মণাব্দের (১৫৪০ খ্রীঃ) লিখিত "আচার চিন্তামণি" গ্রন্থের প্রতিলিপি ডাক্তর মিত্রের গবেষণায় মিথিলায় আবিষ্কৃত হয় †। এই "শূদ্রাচারচিন্তামণি" রাজা হরিনারায়ণের (ভৈরব সিংহ দেবের) আদেশে রচিত হয়।

আমরা চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের আবির্ভাব কাল খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী বলিয়া ইতিপূর্ব্বে স্বতন্ত্র প্রস্তাবে "ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালায়" নির্দ্দেশ করিয়াছি। বাচস্পতি মিশ্র এই চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের 'বিবাদ রত্নাকর', লক্ষ্মীধর ভট্টের 'কৃত্যকল্পদ্রুম' এবং বিশ্বেশ্বর ভট্টের 'মদনপারিজাত' প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে, "বিবাদচিন্তামণি" নামে পুস্তক রচনা করেন। ৬০ বৎসর গত হইল, ১৮৩৭ খ্রীঃ 'বিবাদচিন্তামণি' কলিকাতায় মুদ্রিত হয়। ১৮৬৩ খ্রীঃ সুবিখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দ্বারা ইহা ইংরেজীতে অনুবাদিত হয়।

"শ্রীকৃত্যকল্পদ্রুম-পারিজাত—
রত্নাকরাদীনবলোক্য যত্নাদ্।
বাচস্পতিঃ শ্রীপতি-নম্র-মৌলি
র্বিবাদচিন্তামণি মাত নোতি।" (বিবাদচিন্তামণি)

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, বাচস্পতি মিশ্র খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মিথিলায় আবির্ভূত হন। তিনি "নির্ণয়" ও "চিন্তামণি" নামে যে সকল স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে "দ্বৈতনির্ণয়", "তিথি নির্ণয়", শ্রাদ্ধচিন্তামণি", "আচারচিন্তামণি", শূদ্রাচারচিন্তামণি", "বিবাদচিন্তামণি" ও "ব্যবহারচিন্তামণি" পাওয়া গিয়াছে। "কৃত্যমহার্ণব" ও "পিতৃভক্তি-তরঙ্গিণী" নামে তাঁহার রচিত অপর দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থের ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৬৫০ সংবতাব্দের (১৫৯৪ খ্রীঃ লিখিত "পিতৃভক্তি-তরঙ্গিণী"র একখানি প্রতিলিপি মিথিলায় পাওয়া গিয়াছে। "শ্রাদ্ধ-

* কাউয়েল সাহেব কুসুমাঞ্জলির ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, বাচস্পতি মিশ্র শঙ্করাচার্য্যের রচিত বেদান্ত সূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন, তাহা "ভামতী" নামে পরিচিত। শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর লোক অতএব বাচস্পতি মিশ্র খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। 'কুসুমাঞ্জলির প্রণেতা উদয়ন আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রের কৃত 'ন্যায় বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকার' ভাষ্যরূপে 'ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি' রচনা করেন। অতএব উদয়নাচার্য্য খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন।

"শঙ্করদিগ্বিজয়" গ্রন্থের পঞ্চদশ সর্গে সুপ্রসিদ্ধ মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, উদয়নাচার্য্য ও শ্রীহর্ষ শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক দার্শনিক। উভয়েই শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক বিচারে পরাজিত হয়। 'শঙ্করদিগ্বিজয়ের-ত্রয়োদশ সর্গে লিখিতে আছে যে, স্বীয় শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"বাচস্পতিত্ব মধিগম্য ভবাৎ"
বিধাস্যসি ত্বং মমভাষ্য টীকাং॥ (১৩।৭৩)
(নানাপ্রবন্ধ) ১০১ পৃষ্ঠা।

† Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. (VI. 22)

* Dr. F. E. Hall's "Contribution towards an Index to the Bibliography of the Indian Philosopical Systems".
Dr. R. L. Mitra's "Notices of Sanskrit Mss." (VI. 22)

বিধি" নামে একখানি স্মৃতিগ্রন্থও এই বাচস্পতি মিশ্রেরই রচিত।

"আরাধ্য নন্দনন্দন-মম্বসন্ধায় প্রযত্নতো গ্রন্থান্।"
শ্রীবাচস্পতি-বিবুধো ব্যবহৃতিচিন্তামণিং তনুতে ॥
(ব্যবহারচিন্তামণি)

"প্রণম্য পরমং তেজো বিচার্য্যাচার্য্যসংহিতাঃ।
শ্রীবাচস্পতিধীরেণ শ্রাদ্ধস্য বিধিরুচ্যতে ॥"
(শ্রাদ্ধচিন্তামণি)

"প্রণম্য পরমাত্মানং নিবন্ধানবলোক্যচ।
শ্রীবাচস্পতিধীরেণ দ্বৈতনির্ণয়ো উচ্যতে ॥" (দ্বৈতনির্ণয়)

"তীক্ষ্ণভিষে নমস্কৃত্য শ্রীবাচস্পতিশর্ম্মণা।
ধর্ম্মশাস্ত্রংসমালোচ্য শূদ্রাচারো বিতন্যতে ॥"
(শূদ্রাচারচিন্তামণি)

বাচস্পতি মিশ্রের রচিত "দ্বৈতনির্ণয়" নামক স্মৃতিগ্রন্থের দুইখানি টীকা মিথিলায় পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে 'দ্বৈতনির্ণয়প্রকাশ' মধুসূদন মিশ্রের দ্বারা এবং 'দ্বৈতনির্ণয়জীর্ণোদ্ধার' মধুসূদন ঠক্কুর দ্বারা রচিত হয়। বাচস্পতি মিশ্রের রচিত স্মৃতিগ্রন্থগুলি মিথিলায় অদ্যাপি প্রামাণিক ও উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া সমাদৃত রহিয়াছে।

বাচস্পতিমিশ্র যেমন স্মৃতিশাস্ত্রীয় বহুতর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন, সেইরূপ ষড়দর্শন সম্বন্ধে বহু উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। অদ্য পর্য্যন্তও তাঁহার প্রতিপত্তি অব্যাহত রহিয়াছে। এক্ষণে তাঁহার প্রণীত দর্শনশাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করা আবশ্যক।

তিনি সুবিখ্যাত ঈশ্বরকৃষ্ণের রচিত 'সাংখ্যকারিকা'র যে উৎকৃষ্ট ভাষ্য রচনা করেন, তাহা "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী' নামে প্রসিদ্ধ। বাচস্পতিমিশ্রের প্রণীত এই গ্রন্থের যে সকল ভাষ্য ও ব্যাখ্যা বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে ভারতী যতীর "তত্ত্বকৌমুদী-ব্যাখ্যা"* রামচন্দ্র সরস্বতীর 'তত্ত্বার্ণব', নারায়ণ তীর্থযতীর 'তত্ত্বচন্দ্র' স্বপ্নেশ্বরের 'তত্ত্বকৌমুদীপ্রভা' এবং রঘুনাথ তর্কবাগীশের 'শাংখ্যতত্ত্ববিলাস' প্রসিদ্ধ। মহর্ষি পতঞ্জলির 'যোগসূত্রের' যে ভাষ্য বাচস্পতিমিশ্র রচনা করেন, তাহা "তত্ত্বসারদী" নামে পরিচিত। এই "তত্ত্বসারদী" অবলম্বনে নাগেশভট্ট উপাধ্যায়ের "ছায়া" এবং শ্রীধরানন্দ যতীর "পতঞ্জলরহস্য" প্রণীত হয়। বাচস্পতিমিশ্র বেদান্তসূত্রের' শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত ভাষ্যের "ভামতী" নামে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষ্য রচনা করেন। বারাণসীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বালশাস্ত্রী কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর সাহায্যে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। মহাভারতের বিখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ চতুর্দ্ধর, শঙ্কর, সুরেশ্বর (মণ্ডন) মিশ্র ও পদ্মপাদ আচার্য্য বিশেষ ভাবে "ভামতী'র সমালোচনা করেন। এই সুরেশ্বর ও পদ্মপাদ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য হইতে অবশ্যই পৃথক্ ব্যক্তি। অমলানন্দ ব্যাসাশ্রমের "বেদান্তকল্পতরু" ও অপ্যয় দীক্ষিতের 'বেদান্তকল্পপরিমল" এই "ভামতীর ভাষ্যরূপে লিখিত হয়। অপ্যয়দীক্ষিত ভারদ্বাজগোত্রজ রঙ্গরাজের পুত্র। তিনি 'ভামতীর' ভাষ্যের ভাষ্য রচনা করেন।

"ইত্থমিহাতিগভীরে কিয়দাশয়বর্ণনং ময়া ক্রিয়তে।
তুষ্যন্তি ততোঽপি কতিপয়রত্নগ্রহাদিরম্বুনিধেঃ ॥"

"তত্ত্বচিন্তামণি" নামক সুবিখ্যাত ন্যায়গ্রন্থের প্রণেতা গঙ্গেশ্বর উপাধ্যায়ের পুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায় উদ্যোতকর আচার্য্যের প্রণীত "ন্যায়বার্ত্তিক" গ্রন্থের 'ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য নামে যে উৎকৃষ্ট ভাষ্য রচনা করেন, বাচস্পতিমিশ্র তাহা অবলম্বনে 'ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকা' রচনা করেন। গঙ্গেশ্বর ও বর্দ্ধমান যে বাচস্পতি মিশ্রের পূর্ব্বে মিথিলায়

* ভারতীযতী বোধারণ্যপতির শিষ্য ছিলেন। তিনি বাচস্পতি মিশ্রকে 'আচার্য্য' উপাধিতে ভূষিত করিয়া, অতি বিনীত ভাবে গ্রন্থের শেষভাগে লিখিয়াছেন
"ক্ব বাচস্পতেঃ সূক্তিঃ, ক্ব মন্দস্য মে মতিঃ।
ক্বাপি সঙ্গতং তত্ত্বং, ইতি শোধ্যং মনীষিভিঃ ॥"

আবির্ভূত হন, ইহা হইতে তাহা প্রমাণিত হইতেছে। অধ্যাপক ওয়েবারের অনুমান মতে গঙ্গেশ্বর খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। উদয়ন আচার্য্য পূর্ব্বোক্ত বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের সমকালে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া চারি অধ্যায়ে 'ন্যায়-বার্ত্তিক তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি' রচনা পূর্ব্বক বর্দ্ধমানের মত সবিশেষ সমালোচনা করেন। অধ্যাপক কাউয়েল, ডাক্তার হল ও মিত্র উদয়নাচার্য্যের 'তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধিকে, বাচস্পতিমিশ্রের রচিত গ্রন্থের টীকা রূপে নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।* উদয়নাচার্য্যের জীবনীতে স্বতন্ত্র প্রস্তাবে তাহা সবিশেষ প্রদর্শন করিব।

এই সকল গ্রন্থ ভিন্ন বাচস্পতি মিশ্রের "তত্ত্বসমীক্ষা" ও "ব্রহ্মতত্ত্বসংহিতা" নামে দুইখানি বেদান্ত,"তত্ত্ববিন্দু" ও "ন্যায়কণিকা" নামে দুইখানি মীমাংসা, এবং "তত্ত্বকৌমুদী" নামে একখানি ন্যায়-দর্শন বিষয়ে পুস্তক বিদ্যমান আছে।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে "খণ্ডনোদ্ধার" নামক একখানি পুস্তক বিদ্যমান আছে। এই পুস্তক বাচস্পতি মিশ্রের রচিত। ইহাতে গ্রন্থকার শ্রীহর্ষের রচিত 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য'নামক দুরূহ দার্শনিক গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে বাচস্পতি মিশ্র শ্রীহর্ষের পরবর্ত্তী গ্রন্থকার। এই শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জের অধীশ্বর রাজা গোবিন্দচন্দ্র দেবের পুত্র বিজয়চন্দ্র দেবের আদেশে মহাভারতীয় নলোপাখ্যান অবলম্বনে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে "নৈষধ চরিত" মহাকাব্য দ্বাবিংশ সর্গে রচনা করেন। ১৩৪৮ খ্রীঃ জৈনাচার্য্য রাজশেখর স্বরচিত "প্রবন্ধ-কোষে" শ্রীহর্ষের এই বিবরণ লিখিয়াছেন।* এই "নৈষধচরিতের" ষষ্ঠ সর্গের শেষ শ্লোক দৃষ্টে, তিনি "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" রচনা করেন বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়।

১২৮১ সনের বৈশাখ মাসের "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় সুপণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'শ্রীহর্ষ'শীর্ষক প্রবন্ধে বাবু রামদাস সেনের রচিত প্রবন্ধের সমালোচনা করেন। এই প্রবন্ধের শেষভাগে প্রসঙ্গ ক্রমে কাউয়েল সাহেবের মতের সমালোচনা উপলক্ষে রাজকৃষ্ণ বাবু বাচস্পতি মিশ্রকে মাধবাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহার প্রমাণ স্থলে মাধবাচার্য্যের প্রণীত, শঙ্করদিগ্বিজয় হইতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী উপস্থিত করেন।

> "বাচস্পতিত্বমধিগম্য ভবাৎ
> বিধাস্যসি ত্বং মম ভাষ্যটীকাং" ॥ (১৩। ৭৩)

মাধবাচার্য্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। অতএব বাচস্পতি মিশ্র খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। মাধবাচার্য্যের পরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাচস্পতি মিশ্র মিথিলায় প্রাদুর্ভূত হন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ হইতে রাজকৃষ্ণ বাবুর মত যে ভ্রান্ত ও অমূলক, সেই সম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও সংশয় থাকিবে না। মাধবাচার্য্যের উপা-

---

* Dr. F. E. Hall's "Contributions" (27) and Dr. Mitra's "Notices of Sanskrit Mss." (VII. 128)

'শ্রীহর্ষ' নামক প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ বাবুও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। (নানাপ্রবন্ধ, ৯৯-১০০)

* ঐতিহাসিক রহস্য, প্রথমভাগ—৬৯ ও ৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যং।
ষষ্ঠঃ খণ্ডনখণ্ডতোঽপি সহজাৎ ক্ষোদক্ষমেতন্মহাকাব্যেঽয়ং ব্যগলন্নলস্য চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ॥"

খ্যানময় শঙ্করদিগ্বিজয়ে উক্ত কবিতা প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে।

বিবাদচিন্তামণির পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে পণ্ডিত শিরোমণি ডাক্তার মিত্র ১৮৭৬ খ্রীঃ মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্রকে সাড়ে তিন শত বৎসরের (১৪২৩ শকাব্দের) প্রাচীন গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন *। তিনি স্বীয় উক্তির পরিপোষক কোনও প্রমাণ উপস্থিত করিয়া প্রদর্শন করেন নাই। তিনি মাত্র কোলব্রুক সাহেবের মত নিরাপত্তিতে গ্রহণ করেন। আমরা নানা স্থলে ডাক্তার মিত্রের নানা বিষয়ক ভ্রান্ত মতের যথাসাধ্য প্রতিবাদ করিয়াছি। এই স্থলে তাঁহার মত সমর্থন করিতে পারিয়া আহ্লাদিত হইতেছি। সুবিখ্যাত কোলব্রুক ও ডাক্তার মিত্রের মতের সত্যতা ও অভ্রান্ততা নানা প্রমাণ উপস্থিত করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রদর্শন করিলাম। বাচস্পতি মিশ্র ও মিসরু মিশ্র একই সময়ে মিথিলার রাজ সভায় বিদ্যমান ছিলেন। মিসরু মিশ্র "বিবাদচন্দ্র" নামে স্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি রাজা চন্দ্রসিংহের সভাসদ ছিলেন। রাজা ভৈরবসিংহ (হরিনারায়ণ) দেবের মৃত্যুর পর, অতি অল্প কাল চন্দ্র সিংহ মিথিলায় রাজত্ব করেন। রাজা চন্দ্র সিংহের মহিষী লখিমা মহাদেবীর আদেশে এই স্মৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়া মিথিলা পতির নামে গ্রন্থের নামকরণ হয়। রাজা চন্দ্রসিংহ ও লখিমা মহাদেবী খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মিথিলায় আবির্ভূত হন। কোলব্রুক, ডাক্তার মিত্র ও জলি সাহেবের মতে লক্ষ্মী দেবী স্বয়ং এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন *। কিন্তু গ্রন্থের আরম্ভে ও শেষে ইহা মিশরু মিশ্রের রচিত বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ইহা হইতে তাঁহাদের উক্তির অসারতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

"শ্রীচন্দ্রসিংহ-নৃপতে র্দয়িতা লখিমা মহাদেবী।
রচয়তি বিবাদচন্দ্রং মিশরুমিশ্রোপদেশতঃ॥
বিবাদে ব্যবহারে চ ব্যবস্থা যস্য যাদৃশী।
নিবদ্ধৃভিঃ কৃতা, সাত্র লিখ্যতে সুরিণাং মুদে॥
"ইতি মহামহোপাধ্যায়-মিশরুমিশ্রকৃতো বিবাদচন্দ্রঃ সমাপ্ত।

ডাক্তার জলির মতে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লক্ষ্মীদেবী মিথিলায় আবির্ভূত হইয়া, বিবাদচন্দ্র রচনা করেন। এই মত ভ্রান্ত ও অমূলক। লক্ষ্মীদেবীর ভ্রাতষ্পুত্র সুপণ্ডিত মিশরুমিশ্র এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ কোলব্রুক সাহেবের মত অনুসারে, ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাচস্পতি মিশ্রকে ১৪২৩ শকাব্দের (১৫০১ খ্রীঃ) প্রাচীন গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১৭৯৮ খ্রীঃ কোলব্রুক সাহেব "বিবাদভঙ্গার্ণব" নামে স্মৃতি সংগ্রহ ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত করিয়া প্রকাশ করেন। এই স্মৃতিগ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক সার উইলিয়ম জোন্স

* "The author (Vachaspati Misra) was the son of Kesava, and lived about 350 years ago (Saka 1423). Unlike the generality of Pundits of his country, he devoted his attention both to law and philosophy at the same time, and acquired great distinction in both. He wrote several commentaries on standard works on the Nyaya, the yoga, and the Sankhya systems of philosophy, and a whole series of manuals on law under the title of Chintamani, besides several independant treaties. "All his works" says Colebrooke "are held in high and deserved estimation". His son Lakshmidasa, was also an author of some repute." (Dr. Mitra's "Notices of Sanskrit Mss. III. 35).

* Dr. J. Jolly's Tagore Law Lectures for 1883" (1885), page 27).
Dr. Mitra's "Notices of Sanskrit Mss." (V. 122) and Colebrooke's Miscellaneous Essays (1873). I. 47.

সাহেবের অনুরোধে সংগৃহীত হয়। ইহার ইংরেজী অনুবাদ আরম্ভ করিয়া, সুবিখ্যাত সংস্কৃতবিৎসার উইলিয়ম জোন্স কালগ্রাসে পতিত হন। ১৭৮৮ খ্রীঃ ১৯শে মার্চ্চ তারিখের গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের আদেশ ক্রমে এই প্রামাণিক স্মৃতি সংগ্রহ সঙ্কলিত হয়। জোন্স সাহেবের মৃত্যুর পর, গবর্ণর জেনারেল সার জন সোর এই গ্রন্থের অনুবাদের ভার সদর দেওয়ানী আদালতের বিখ্যাত বিচারপতি কোলব্রুক সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন। ১৭৯৬ খ্রীঃ কোলব্রুক সাহেব "বিবাদভঙ্গার্ণব" স্মৃতির অনুবাদ সমাপ্ত করিয়া, তাহার একটী নাতিদীর্ঘ ভূমিকা রচনা করেন। এই ভূমিকায় তিনি দুইটী বাক্যে বাচস্পতি মিশ্রের পরিচয় প্রদান করেন। "১০।১২ পুরুষ গত হইল ত্রিহুতের অন্তর্গত সেমৌল গ্রামে বাচস্পতি, মিশ্র আবির্ভূত হইয়া, বিবাদ চিন্তামণি ও ব্যবহার চিন্তামণি প্রভৃতি যে সকল স্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাও চণ্ডেশ্বরের বিবাদ-রত্নাকরের ন্যায় মৈথিল স্মার্ত্তসমাজে সমাদৃত রহিয়াছে *।" চারি পুরুষে এক শতাব্দী ধরিলে, কোলব্রুক সাহেবের মতে বাচস্পতি মিশ্র আড়াই কি তিন শত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থকার। ১৭৯৬ হইতে এই সময় বাদ দিলে, ১৪৯৬ কি ১৫৪৬ বাচস্পতি মিশ্রের আবির্ভাব কাল পাওয়া যাইতেছে। ডাক্তর মিত্র কোলব্রুক সাহেবের নির্দ্দিষ্ট সময় শকাব্দে পরিণত করিয়া, আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে এই প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে বাচস্পতি মিশ্র ও অন্যান্য কতিপয় মৈথিল গ্রন্থকারের সময় নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ মৈথিল নৈয়ায়িক গঙ্গেশ্বর উপাধ্যায় খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। এই দ্বাদশ শতাব্দীতে কনোজের রাজসভাসদ লক্ষ্মীধর ভট্ট "কৃত্যকল্পদ্রুম," লক্ষ্মীধরের পুত্র ভট্টোজী দীক্ষিত "সিদ্ধান্ত কৌমুদী," এবং সুকবি শ্রীহর্ষ "নৈষধচরিত" ও "খণ্ডনখণ্ড খাদ্য" রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গঙ্গেশ্বরের পুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায় ও "কুসুমাঞ্জলি"র প্রণেতা উদয়ন আচার্য্য মিথিলায় আবির্ভূত হন। এই শতাব্দীর শেষভাগে কাষ্ঠার রাজা মদনপালের সভাসদ বিশ্বেশ্বর ভট্ট "মদন পারিজাত" নামে স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আরম্ভে মহারাজ হরিসিংহ দেবের সভাসদ চণ্ডেশ্বর ঠাকুর ও কামেশ্বর ঠাকুর মিথিলায় আবির্ভূত হইয়া, যথাক্রমে "বিবাদ-রত্নাকর" ও "দানসাগর" নামে স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই কামেশ্বর ঠাকুর মিথিলায় যে অভিনব রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই ব্রাহ্মণ বংশীয় নরপতিগণের আশ্রয়ে মিথিলায় সংস্কৃতের চর্চ্চা সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। অনুমান ১৩৩০ খ্রীঃ হইতে ১৫৫৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত এই বংশ মিথিলায় রাজত্ব করেন। এই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কেশব মিশ্র ও বিদ্যাপতি ঠাকুর মিথিলার রাজসভা

* "The *Vivad-ratnakar*, a digest highly esteemed by the lawyers of Mithila or Tirbhukti, was compiled under the superintendence of Chandesvar, minister of Harasinhadeva of Mithila. Chandesvar is reputed author of other tracts. The *Vivada chintamani*, *Vyavahar-chintamani* and other works of Vachaspati Misra, are also in high repute among the lawyers of Mithila. No more than ten or twelve generations have passed since he flourished at Semaul in Tirhut. The *Vivada-chandra* and other works composed by Lakhhna devi are likewise much respected in the Mithila school." (*Colebrooke's Miscellaneous Essays* (1873), I. 471)

অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। বিদ্যাপতি ঠাকুর ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪৮০কি ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন *। এই সময়ে দেবসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মাবতী দেবী, লখিমা দেবী, পদ্ম সিংহ, বিশ্বাস দেবী, নরসিংহ, রঘুসিংহ, ধীরসিংহ ও ভৈরবসিংহ মিথিলায় শাসন দণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র এই ভৈরব সিংহের সভাসদ ছিলেন। রাজা ভৈরব সিংহের রাজত্বকালে বিদ্যাপতি ঠাকুরের মৃত্যু হয়। অনুমান ১৪৫৫ খ্রীঃ হইতে ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাচস্পতি মিশ্র জীবিত ছিলেন। বাচস্পতি মিশ্রের সমকালে মিশরু মিশ্র বিদ্যমান ছিলেন। রাজা চন্দ্রসিংহের সভাসদ ও আত্মীয় মিশরু মিশ্র "বিবাদচন্দ্র" নামে স্মৃতিগ্রন্থ, রাজমহিষী ও পিতৃস্বসা লক্ষ্মীদেবীর আদেশে রচনা করেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

* "কবি বিদ্যাপতি 'পুস্তকের সমালোচনা ১৩০২ সালের শ্রাবণ মাসের নব্যভারতের ২১পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। মাননীয় সমালোচক মহাশয় আমাকে বিদ্রূপপূর্ণ তীব্রভাষায় অন্যায়রূপে আক্রমণ করিয়া দুঃখিত ও বিস্মিত করেন। তাঁহার মতের সহিত আমার মতের বিশেষ পার্থক্য নাই। তাঁহার মতে বিদ্যাপতি ১৩৭৫-১৪৭৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। আমি ১৩৮২-১৫০৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির জীবিত কাল নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। স্বমতের পরিপোষক কোন প্রমাণ সমালোচক মহাশয় কখনও নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি পূর্ব্বমত আংশিকভাবে পরিবর্ত্তিত করিলাম। আমার মত পরিবর্ত্তনের কারণ মূল প্রবন্ধে যথাসাধ্য নির্দ্দেশ করিয়াছি। উক্ত সমালোচকের কথা অনুসারে "দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনী" কে বিদ্যাপতির রচিত গ্রন্থাবলী হইতে বিনা কারণে ও প্রমাণে খারিজ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইতেছি।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। (২)

(জীবনী ও পত্রাবলী)।

শম্ভুচন্দ্র ইংরেজী সাহিত্যের ভক্ত সেবক ছিলেন। তাঁহার এই আলোচ্য জীবনী-গ্রন্থ, সেই সাহিত্যেরই প্রত্যঙ্গ পুষ্টি করিয়াছে। ইংরেজী-অনুরাগীর জীবনী ইংরেজ ইংরেজীতে লিখিয়াছেন। যে সে ইংরেজেও নহে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই জীবনী ও পত্রাবলী খাস বৃটিশ-বরণ্ সিনিয়র সিবিলিয়ন ইংরেজ কর্ত্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত। সম্যক সহানুভূতি, প্রীতি, সম্মান ও ভক্তি সহকারেই লিখিত ও সম্পাদিত। অতএব, (এই জীবনী যতই অপূর্ণ বা অঙ্গহীন হউক্) এ সম্বন্ধে বাঙ্গালী শম্ভুচন্দ্রের নিশ্চয়ই শুভগ্রহ; এবং বাঙ্গালী সাধারণেরও কিছু গৌরবের বিষয় বটে। কিন্তু, আমাদের ইংরেজী-সম্পাদক সম্প্রদায়ের মধ্যে, এই জীবনী-গ্রন্থ আদৌ আদৃত হয় নাই; বরং নিন্দিতই হইয়াছে। কোথায়ও নীরবতার নিন্দা, কোথায়ও বা অভিমত বিশেষের নিন্দা, কোথায়ও বা এই গ্রন্থের অপূর্ণতার নিন্দা রটিত হইতে দেখিয়াছি; উহার সমালোচনা কিন্তু আমাদের ইংরেজী সংবাদ পত্রে আদৌ হয় নাই। যাঁহাদের মধ্যে এই গ্রন্থের অধিক আদর ও আলোচনা উল্লেখ হওয়া উচিত ছিল ও স্বাভাবিক ও শোভনীয় হইত,

তাঁহাদের মধ্যেই অবস্থা এই! * ইহা অবশ্যই আক্ষেপের বিষয়। ইহার অনেক কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু, দুইটী কারণ বড় ক্লেশকর। এক কারণ এই যে, নানা কারণে বা অকারণে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্বদেশীয় সম্পাদক সহযোগীদিগের অপ্রিয় ছিলেন। অপর কারণ, তাঁহার জীবনী লেখক মিঃ স্ক্রাইন নিজেও ঐ সম্পাদক সমাজের অপ্রিয়। কাজেই, এই গ্রন্থ "দ্বিপাদ দোষ" যুক্ত; অতএব উপযুক্ত ক্ষেত্রে আলোচিত হয় নাই! ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভাব সাহিত্যের সাধারণ স্বার্থকে সংস্পর্শ করা অতীব গর্হিত হইলেও, যখন করে, তখন সে সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। †

বাঙ্গালা পত্রের বক্ষে, বাঙ্গালা প্রবন্ধে এরূপ ইংরেজী গ্রন্থের আলোচনা, হয় ত কিছু বিসদৃশ বিবেচিত হইতে পারে! কিন্তু, আমরা সে বিবেচনা করিতেছি না। মুখোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক সঞ্চালিত চিন্তা-স্রোত ইংরেজীতে বা হিব্রুতেই প্রবাহিত হউক, তাহা বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীরই বস্তু। তদ্ভিন্ন সাহিত্যের সাধারণ তাত্ত্বিক রাজ্যে, ভাষা ভেদে, তাদৃশ অধিকার ভেদ হয় না। বাঙ্গালার আলোচনা ইংরেজীতে ও ইংরেজীর আলোচনা বাঙ্গালায় হইতে পারে। তবে, বিবেচনার বিষয় এই যে, আমরা এই আলোচনা কার্য্যের আদৌ উপযুক্ত কি না? জীবনী গ্রন্থের রচনার ন্যায় আলোচনাতেও জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সবিশেষ জানা থাকিলেই সুবিধা হয়। সে সুবিধা আমাদের আদৌ নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমাদের এক দিন মাত্র সাক্ষাৎ ও অল্পক্ষণ মাত্র আলাপ হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, এই জীবনী-লেখকের সহিতও আমাদের কখনও সাক্ষাৎ ও আলাপ নাই। অতএব বলা বাহুল্য, সাধারণ সমালোচনার অতি দূর স্থানে দাঁড়াইয়াই আমরা দুই এক কথা বলিতেছি। নতুবা, তথ্যজ্ঞতা বা রহস্যজ্ঞতা জনিত সবিশেষ জ্ঞান দ্বারা এই গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করিতে আমরা আদৌ সমর্থ নই।

গ্রন্থের পূর্ব্বে গ্রন্থকার সম্বন্ধে একটী কথা বলা যাইতে পারে। ন্যায়ানুরোধেই তাহা বলা। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তদীয় সজাতীয় সহযোগীবৃন্দের তাদৃশ প্রিয় ছিলেন না কেন, তাহা অনুসন্ধান ও আলোচনা করার প্রয়োজন নাই; তাহা বস্তুতঃই বড় অপ্রীতিকর। বিশেষতঃ মিঃ স্ক্রাইন এ সম্বন্ধে ইঙ্গিতে এমন কয়েকটী কথা কহিয়াছেন, যাহা হৃদয়-বিদারক। পক্ষান্তরে মিঃ স্ক্রাইন সিবিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট, এখন কমিসনর;—সিবিল সার্বিসের সাহেবের ন্যায় দোষ ত্রুটী তাঁহার থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু, তিনি যে বাঙ্গালী-বিদ্বেষী নহেন; প্রত্যুতঃ প্রাণের সহিত বাঙ্গালীকে ভালবাসিতে পারেন ও ভালবাসেন, তাহা তাঁহার প্রণীত এই গ্রন্থ দেখিয়াই বুঝা যায়; অন্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

* শুনিয়াছি, মুখোপাধ্যায়-পরিবারের সহায়তার জন্য এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হওয়াতে গ্রন্থকার উহা সম্পাদকদিগকে উপহার প্রেরণ করেন নাই। এরূপ হইলে নীরব সম্পাদকদিগকে নিন্দা করা যায় না। ফলতঃ যৎসামান্য অর্থ রক্ষার্থে সম্ভ্রান্ত সম্পাদকদিগকে সমালোচনার্থে পুস্তক না দেওয়া সমীচীনতা, সাহিত্য-রীতি ও সুবুদ্ধি, তিনেরই বিপরীত। লেখক—

† বলা উচিত "নেসন"-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ শম্ভুচন্দ্র সম্বন্ধে সবিশেষ সুবিচার ও সহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন।—লেখক

তথাচ তিনি এ গ্রন্থ না লিখিয়া শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অন্য কোন ইংরেজ বন্ধু উহা লিখিলেই শ্রেয় হইত। স্ক্রাইন সাহেব শম্ভুচন্দ্রের জীবনী লেখাতেই এক ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ের মধ্যে উহা আদৌ উপেক্ষিত হইয়াছে, এবং তাহাতে করিয়া শম্ভুচন্দ্রের কিছু ক্ষতি হইয়াছে, ইহা আমরা বলিতে বাধ্য। শম্ভু বাবু নিজে এরূপ স্থলে বড়ই সাবধান ছিলেন, তাঁহার একখানি পত্রে দেখা যায়। ষ্টেট্‌সম্যানের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সুবিখ্যাত রবার্ট নাইটের স্মৃতি সংস্থাপনার্থে অস্মদ্দেশীয় সমাজে কোনও উদ্যোগ আয়োজন না হওয়াতে, শম্ভু বাবু একান্ত বিষণ্ণ ও ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজে ইহার অগ্রণী হইয়া আলোচনা আন্দোলন করিলে, পাছে ঈর্ষা উত্তেজিত হয় ও আপনার লোক-প্রিয়তার অভাবে, উদ্দিষ্ট কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, এই শঙ্কায় ও সন্দেহে তিনি ইহাতে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। ঐ সম্বন্ধে তাঁহার কোন বন্ধুকে যে কয়টী কথা লিখিয়াছিলেন, তাহা এতই সরল ও শিক্ষাপ্রদ যে, একটু উদ্ধৃত করা অন্যায় হইবে না।

"I have many a time thought of communicating with Narendra nath Sen, the Ghose brothers and others or of issuing a circular, but the fear of spoiling the cause has restrained me. I wish to follow, not lead ; to do my duty quietly and obscurely without attracting notice. * * * I have not even published, as I intended his letters to me, lest I should prejudice my excellent countrymen against a good man for the one sin of loving me."

এই কয়টী ছত্রেই বুঝা যায়, শম্ভুচন্দ্রের অন্তঃপ্রকৃতি, প্রকৃত প্রস্তাবে, কতদূর উদার ও উন্নত ছিল। অন্য আলোচনা বা অনুবাদ অনাবশ্যক।

আলোচ্য গ্রন্থে শম্ভুচন্দ্রের জীবন-কাহিনী ও চরিতাখ্যায়িকা অতি সংক্ষেপেই লিখিত হইয়াছে। সে এত সংক্ষেপ যে, স্বকার্য্য সাধনেও সম্যক প্রচুর নহে। স্ক্রাইন সাহেব সংবাদ-পত্রে শম্ভুচন্দ্রের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছিলেন, তাহাই কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত ও মার্জ্জিত করিয়া এই গ্রন্থে পরিণত বা উহার অঙ্গীভূত করিয়াছেন। সুতরাং তাহাতে একদিকে শম্ভুচন্দ্রের জীবন ঘটনা যেমন সবিস্তারে বিবৃত হয় নাই; অপরদিকে তেমনি তদীয় প্রকৃতি ও প্রতিভার সম্যক পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই;—আমরা সমস্ত তথ্যজ্ঞ না হইয়াও, এ কথা বলিতে সঙ্কুচিত নহি। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সমগ্র স্বভাব এই জীবনীতে প্রতিবিম্বিত হয় নাই; বিশেষত তদীয় প্রকৃতির আভ্যন্তরীন তেজস্বিতা উহাতে অল্পই স্ফুরিত হইয়াছে। সাহিত্য-জীবী, বাস্তুভিটা-প্রিয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের জীবন-কাহিনী সাধারণতঃ ঘটনা-বহুল না হইলেও, অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা-স্রোতে শম্ভুচন্দ্রের সংকীর্ণ জীবন-তরণী সংসারে বহু দিকে চালিত হইয়াছিল, বহু দুর্যোগে ঠেকিয়াছিল ও বিবিধ পরীক্ষার প্রখর তরঙ্গে পড়িয়াছিল। জীবনীকার সুদীর্ঘ জীবন-কাহিনীর স্থূল অংশ স্পর্শ মাত্র করিয়া সে কাহিনী অতি অল্প কথায় শেষ করিয়াছেন। আমরা তাহার একটী কথাও কহিব না। উপস্থিত আলোচনার সে উদ্দেশ্যই নয়।

বৈচিত্র্য যতটুকুই থাকুক, শম্ভুচন্দ্রের জীবনবৃত্ত, সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীরই জীবনবৃত্ত। বৃত্তি-হীন ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম, কৃচ্ছ্র-সাধ্য শিক্ষা প্রাপ্তি ও সমাপ্তি। উহাদের সন্ধিস্থলে সহজ-সাধ্য বিবাহ। "অন্নচিন্তা চমৎকার"—চাকুরির নানা স্তর:—তাহার চেষ্টা ও চিন্তা; তাহা হওয়ার লাঞ্ছনা ও যাওয়ার যাতনা। অকালে স্বাস্থ্যভঙ্গ; যৌবনে বার্দ্ধক্য

রোগের ও রাজনীতির অনুশীলন, তাহাদের সহচর্য্য ও সেবা। সংবাদপত্রে ও শ্বাস কাশে পরমায়ু ক্ষয়। তারপর? তারপর যা হইয়া থাকে তাই! নিঃসম্বল সংসার ও পরিবার রাখিয়া অপরিণত বয়সেই মৃত্যু!! তোমার, আমার প্রায় সকলেরই যাহা; শম্ভুচন্দ্রে তাহার বড় ইতর বিশেষ হয় নাই। দরিদ্র আসিয়াছিলেন, দরিদ্রই গিয়াছেন। তবে তিনি মনোরাজ্যের বিপুল বিস্তার করিয়াছিলেন, এই জন্যই, তোমার আমার সহিত তাঁহার আকাশ পাতাল পার্থক্য। কিন্তু, সে রাজ্যেরও এক রসি ভূমি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই! উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার সংসার যেমন, তোমার সাহিত্যও তেমনি "শূন্য" ভাণ্ড পাইয়াছে!!

আলোচ্য গ্রন্থ প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠায় পূর্ণ; তাহার একপঞ্চমাংস জীবন-কাহিনী; অবশিষ্ট পত্রাবলী। জীবনী-অংশের অপ্রচুর্য্য পত্রাবলীতে কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ করিয়াছে। পত্রাংশেই শম্ভুচন্দ্রের প্রকৃতি ও প্রতিভা অল্পাধিক পরিমাণে প্রস্ফুট। এরূপ পত্র এবং এত পত্র আর কখনও কোনও বাঙ্গালী লেখকের প্রকাশিত হয় নাই। এবং এরূপ প্রকৃতির পত্র লেখার অভ্যাস এদেশীয় লেখক, সম্পাদক ও রাজনৈতিকদের মধ্যে আর কাহারও ছিল বা আছে কি না, জানি না। প্রবন্ধ ও অনুবন্ধের ন্যায় পত্র লিখিতেও শম্ভুচন্দ্র অতি নিপুণ ছিলেন। সমস্ত হৃদয় খানি খুলিয়া পত্রে, প্রকৃত প্রস্তাবেই, কথোপকথন করিতেন। তিনি নিজেও এ বিষয় একখানি পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।—

"I am irregular and forgetful; but when I do write, I pour out my mind, writing at length and conversing on paper."

অতি বৃহৎ হইতে অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তির সহিতও তাঁহার পত্র লেখালেখি ছিল। এ সম্বন্ধে, অজ্ঞাতনামা একান্ত অপরিচিত স্কুলের ছাত্র বা নিঃসম্বল নূতন লেখকটী পর্য্যন্তও তাঁহার সবিশেষ মনোযোগের বিষয়ীভূত হইত; এই পত্রাবলীতেই তাহার ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা কেবল উদারতা ও স্নেহশীলতা নয়, শতকর্ম্ম-নিরত, সময়াভাবে কাতর এক জন প্রবীণ সম্পাদকের পক্ষে ইহা একরূপ অসাধ্য সাধন। কিন্তু, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই "অসাধ্য সাধন" সাদরে সর্ব্বদাই করিতেন। বরং গণ্য মান্য, পদস্থ ও পণ্ডিত ব্যক্তি অপেক্ষা নগণ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তি এ বিষয়ে, তাঁহার অধিকতর মনোযোগ ও আদর আপ্যায়িত আকর্ষণ করিত। একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন;—

"But it is not the young or the obscure that are neglected in this office * * * just now I might be addressing more than one noble Lord both here and in England, but I prefer Mr. G. V. Syamala Row. *"

যাহাকেই পত্র লিখুন, প্রাণ খুলিয়া লিখিতেন। দুই তিন দিন ধরিয়া এক একখানি পত্র লিখিতেন। নূতন লেখকদিগকে উৎসাহিত করিতে ও উপদেশ দিতে বড় ভালবাসিতেন। সুদীর্ঘ পত্রে তাঁহাদের রচনার দোষ গুণ সমালোচনা ও সংশোধন করিতেন। বলিতেন "আমাদের মধ্যে সুলেখকের সংখ্যা এত কম যে, এরূপ না করিলে লেখক প্রস্তুত হইবে কেমন করিয়া।"

পক্ষান্তরে, লর্ড রোজবারি, লর্ড ষ্ট্যানলে, লর্ড ডাফারিণ, স্যর অকল্যাণ্ড কলভিন, স্যর

* এই মিঃ রাও একজন অপরিচিত নবীন লেখক।

চার্লস এলিয়ট, লর্ড ল্যান্সডাউন, স্যর ডোনাল্ড ম্যাকেঞ্জী, ওয়ালেস, কর্ণেল এড্রা প্রভৃতি অত্যুচ্চ পদস্থ রাজপুরুষ, পরন্তু প্রোফেসর ভ্যামবেরী, উইলসন, উডমেসন, ডাক্তার হাণ্টার, হল, মেরিডিথ টাউনসেণ্ড, রুটলে, স্যর হাওয়ার্ড রশেল, ডাক্তার উইলিয়ম রাটিগা হিউম, গ্রিফিন, বেল প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিত, লেখক ও রাজনৈতিক, পুনশ্চ এদেশীয় গণ্য মান্য ও পদস্থ বহুব্যক্তির সহিত তাঁহার পত্র চালাচালি হইত। উপরোক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনেকেরই সহিত শম্ভুচন্দ্র যে বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা সূত্রে বদ্ধ ছিলেন, তাহা উভয় পক্ষের চিঠি পত্র দেখিয়া বুঝা যায়।

লর্ড ডাফারিণ প্রভৃতি অত্যুচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে; রাজনৈতিক কারণে কতকগুলি অপ্রকাশ রাখিতে হইয়াছে। আশা করা যায়, উপযুক্ত সময়ে সে গুলিও সাধারণের চক্ষুগোচর হইবে।

এই পত্রাবলীতে সহযোগী রাজনীতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক আবশ্যকীয় ও মনোজ্ঞ কথা আছে। কিন্তু,আলোচনার স্থানাভাব। তথাচ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য মত ও ধর্ম্ম নীতি সম্বন্ধে দুই এক কথা উল্লেখ করিয়া উপসংহার করা যাউক।

মুখোপাধ্যায়ের কাব্য-প্রিয়তা অতীব প্রখর,—স্মৃতির আপাদমস্তক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ইংরেজী কবিতায় পূর্ণ ছিল। তিনি কবিতার উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। বায়রণ তাঁহার বড় ভাল লাগিত। অনেক সময় অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া চাইল্ড হ্যারোল্ড পড়িতে বসিতেন। তিনি সেক্সপীয়রকে কালিদাস অপেক্ষা এবং একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও পরে করিবেন, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতেন।

"উৎকৃষ্ট ও উচ্চ সাহিত্য,সর্ব্বত্রই,অতি অল্প লোকে বুঝে। কবিতা তাহা অপেক্ষাও কম লোকে বুঝে"—ইহা,(আরও অনেকের ন্যায়) শম্ভুচন্দ্রের অভিমত ছিল। তিনি অত্রস্থ সম্পাদকদিগের সাহিত্য-জ্ঞানে ও সমালোচনা-শক্তিতে আদৌ বিশ্বাসবান ছিলেন না।

ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ পদ যেমন কবি কালিদাসের কর্ণ যাতনা উৎপাদন করিত, রচনায় তেমনি কিঞ্চিন্মাত্রও অসংলগ্ন শব্দ-প্রয়োগ তেমনি শম্ভুচন্দ্রের কর্ণে বাজিত। তিনি, সুবিধা পাইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার উল্লেখ ও সংশোধন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যানুভূতি তাঁহাকে এসম্বন্ধে এমনি অসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় আভিজাত্যে উদাসীন ছিলেন না। "ব্রাহ্মণেরও ব্রাহ্মণ" বলিয়া তিনি সবংশের গৌরব করিতেন। তিনি বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু স্কোবল আইনের সম্যক সমর্থন করিয়া হিন্দু ও অ-হিন্দু বাবুদের বিষম বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ উভয় কার্য্যের একটীও অব্রাহ্মণোচিত নয়। তিনি সার্ব্বজাতিক জাহাজে আরোহী হইতে অসম্মত হইয়াছিলেন, ইহাও ব্রাহ্মণোচিত। কিন্তু তাঁহার কোনও পত্রাংশে দেখি;—

"His (রবার্ট নাইট) was the only European table at which I have sat with the Family as one of them. Friendship got better of my Brahmanic Prudence."

এস্থলে বন্ধুত্ব ব্রাহ্মণত্বকে জয় করিত; তাহা নিজেই বলিয়াছেন।

কিন্তু, য়ুরোপীয় সমাজে সর্ব্বদা মিশিতেও

মুখোপাধ্যায় পছন্দ করিতেন না। লর্ড ডফ্‌রিণের প্রাইভেট সেক্রেটারী সার ম্যাকেঞ্জি ওয়ালেসের বহু পত্রের একখানিতে দেখি ;—

"প্রিয় ডক্টর মুখার্জি, য়ুরোপীয়দের সঙ্গে মিশিতে আপনার ইতিপূর্ব্বের ঔদাসিন্যের বিষয় আমি বেশ বুঝি। কিন্তু,এখন, যখন আপনি খোশা-খোলের ভিতর হইতে কতকটা বাহির হইয়াছেন, তখন আমি আশা করি, পুনর্ব্বার তাহার মধ্যে গুটি গুটি গড়াইয়া গিয়া প্রবেশ করিবেন না। এদেশীয়দের সহিত যোগ-গ্রন্থি স্বরূপ, আপনার মত লোক আমাদের একান্তই আবশ্যক। আমি বিশ্বাস করি, আপনার প্রকৃত মনুষ্যোচিত স্বাধীনতা আপনার স্বদেশীয়দের উপর কার্য্যকরী হইতে কখনই নিস্ফল হইবে না। যেরূপই হউক, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে (আমি আধ অফিসিয়াল য়ুরোপীয় হইলেও) আপনার জনৈক বন্ধু স্বরূপ স্মরণ রাখিবেন।"

শম্ভু বাবুর উচ্চপদস্থ য়ুরোপীয় পত্র প্রেরকদিগের অনেকেরই পত্রের এইরূপ ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্ব-বিনম্র সুর। কোন কোন স্থলে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ঘনিষ্ঠ। যেমন স্যর অকল্যাণ্ড কলভিন প্রভৃতির পত্র। রুটলে, নাইট প্রভৃতির পত্র অভিন্নহৃদয় ভ্রাতৃবৎ। হিউমের পত্র সরলতা ও সম্মানে পূর্ণ। লর্ড ডফারিণের পত্রগুলি সুদীর্ঘ ও সৌহৃদ্যময়। শম্ভু বাবুর প্রতি এবম্বিধ ব্যক্তিদিগের শ্রদ্ধা ও সখ্যতা দেখিয়া প্রাণ পুলকিত হয়।

সনেট সম্বন্ধে শম্ভুবাবু লিখেন— "সনেট" রচনা কেবল কঠিন নয়, অতি কোমল কার্য্য। অনুবাদ সম্বন্ধে লিখেন ;—সাহিত্য এক ভাষা হইতে অপর ভাষায় উঠাইয়া লইয়া যাইবার পথেই তাহার সত্তা ও আধ্যাত্মিকতা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। আসল কথা এই যে, অনুবাদ আদৌ অসম্ভব। উহা সাহিত্যকে হত্যা করা।"

কোন একটী পত্রাংশে এইরূপ আত্ম প্রকাশ দেখা যায় ;—

"আমার পাঠ্যাবস্থায় এবং তাহার পর আরও কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত আমি সাম্যবাদী ও অত্যুন্নতশীল ডেমোক্রেটিক মতাবলম্বী ছিলাম। কিন্তু, পরে সে ভাবটা সারিয়া গিয়াছিল। আমার বোধ হয়, এখনি আমি প্রকৃতির অজ্ঞানানুমোদিত পার্থক্য প্রণিধান করিয়া সকল বিষয়ের অধিকতর যথার্থ মর্ম্ম নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু, তাই বলিয়া এমন মনে করিয়া পলায়ন করিবেন না যে,আমি আমার আভিজাত্যাদির জন্য অপরিমিত অহঙ্কারী বা অন্য জাতিকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখি। অনুদারতা কাহাকে বলে, আমি জানি না। আমি কখনও কিছুতেই অনুদার নহি। আমি সদাই সকল বিষয়ে সত্যানুসন্ধানে রত এবং ন্যায় ও সুবিচারের সমর্থক। উহারা আমার দেবতা স্বরূপ। আমি জানি,আমার ব্যবহৃত ভাষা বড় প্রবঞ্চনা করে। আমি ভৎসনা করি ও বিদ্রূপ করি। অত্যন্ত সজীব ও উদ্দীপ্ত কল্পনার ক্রিয়া রোধ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে আমি কখনও কাহাকেও অশ্রদ্ধা বা ঘৃণা করি না। আমি আমার বিবেক বুদ্ধির নিকট হইতে, অন্যের প্রতি সুবিচার ও ন্যায্য ব্যবহার অতি কঠিনরূপে নিষ্কাসন করি। আমি আমাকে শিক্ষিত করিয়াছি যে, কোন ব্যক্তিকে বা কোন বস্তুকেই কিছুতে অবজ্ঞা না করি। সকল পদার্থেরই উপযোগিতা দেখা আমার আসক্তি। আমার যুক্তি এইরূপ ;—যখন সর্ব্বশক্তিমান স্বয়ং প্রাণীর বা পদার্থ মাত্রের অস্তিত্ব আদেশ ও অনুমোদন করেন ; তখন, আমি একান্ত দুর্ব্বল প্রাণী কে যে, তাহা করিব না? অবশ্য এ যুক্তিতে এ বিষয়ের সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় না বটে ; কিন্তু,তথাচ অহঙ্কার ও আত্মাভিমান দমন করিয়া আমাদিগকে স্ব স্ব স্বরূপ অবস্থায় নত করিয়া আনিতে ও প্রত্যেক পদার্থের উপযুক্ততায় আমাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে উপরোক্ত চিন্তা অতীব উপকারী। ক্রোধের সহিত চিত্তের আভ্যন্তরিক সংঘর্ষকালে, ঐ চিন্তা আমার বিশিষ্ট উপকারে আসিয়াছে এবং যাঁহারা আমার পরামর্শ অন্বেষণ ও আন্তরিকতার সহিত তাহা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সকলকেই উহা গ্রহণ করিতে আমি অনুরোধ করি। হে, প্রিয় ব্রাহ্মণ যুবক, ইহা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান মন্ত্র, আমি ভরদ্বাজ সন্তান আর্য্যাবর্ত্তের এই ভাগীরথী তীর হইতে, তোমাকে প্রেরণ করিতে পারি না।"

ফলতঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বৃহৎ ক্ষুদ্র সকল বিষয়ই দার্শনিক ও দূর দৃষ্টিতে দেখিতেন। নৈকট্যের নীচ স্বার্থে অভিভূত হইতেন না।

দুই এক স্থল ব্যতীত পত্রাবলীর সম্পাদন উত্তম হইয়াছে। শম্ভুচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনা ও অবশিষ্ট পত্রাবলী প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

আত্ম বা নিগূঢ় বৈষ্ণব দর্শন।* (১)

অথবা অনাত্ম আত্ম ও পরমাত্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ।

১। আত্মা সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র ও অদ্বিতীয়। আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। এই প্রকট লীলাস্থলে এই আত্মা, স্বকীয় প্রতিবিম্বে ও স্বকীয় স্বরূপে দুই প্রকারে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে। প্রতিবিম্বে প্রবুদ্ধাবস্থাও ব্যষ্টিভূত ও সমষ্টিভূত ভেদে দ্বিবিধ। জীব ব্যষ্টিভূত, ও ঈশ্বর সমষ্টিভূত, প্রতিবিম্বে প্রবুদ্ধ। স্বরূপে প্রবুদ্ধাবস্থাও তাদৃশ ব্যষ্টিভূত ও সমষ্টিভূত ভেদে দ্বিবিধ। ব্যষ্টিভূত স্বরূপে প্রবুদ্ধকে আত্মতত্ত্ব-সম্পন্ন এবং সমষ্টিভূত স্বরূপে প্রবুদ্ধকে পরমাত্ম-তত্ত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তি বা সাধু অভিধান প্রদত্ত হইয়া থাকে। কি প্রকট কি অপ্রকট, সর্ব্বাবস্থায় এই আত্মা সবিষয় অর্থাৎ বিষয়বিজড়িত। নিত্যধামের অপ্রকট অবস্থায় আত্মার এই উভয়াঙ্গ অভিন্নাত্মক ও সমন্বয় প্রাপ্ত অর্থাৎ উভয়াঙ্গই তদেকাত্ম ও একাকার হইয়া অদ্বৈতভাবে সমাধিস্থ বা নিত্যলীলাভিভূত; কিন্তু লীলাস্থলের প্রকট অবস্থায় এই আত্মা ব্যবহারিকভাবে নানারূপে দ্বিরূপ ধারণ করিয়া কোথায় বা প্রতিবিম্বিত অধ্যাস-গত এবং কোথায় বা স্বরূপাবস্থিত হইয়া পরম নিরঞ্জন প্রেমলীলানুগত। আত্মা যখন নিত্যধামের অপ্রকট অবস্থায় অনির্ভিন্ন ও অদ্বৈতভাবে সমাধি-লীলাভিভূত, তখন তাঁহাকে পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা নামে অভিহিত করা হয়। অপ্রকট পরমাত্মলীলাই নিত্যলীলা বা নিত্যধামের সমাধি লীলা। আত্মা যখন এই প্রকট লীলাধামে ব্যক্তিপুঞ্জের সমষ্টিভূত প্রতিবিম্বে ব্যবহারিকভাবে প্রতিবোধিত ও আত্ম-বুদ্ধি-সমন্বিত হইয়া বিরাট লীলানুগত তখন তাঁহাকে 'ঈশ্বর' উপাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে এই সমষ্টিভূত সৃষ্টিলীলাই প্রকট ঐশ্বরিক লীলা। ব্যষ্টিভূত জৈবিকলীলা এই লীলার অন্তর্গত। আত্মা যখন এই প্রকট লীলাধামে পরমাত্মতত্ত্ব সম্পন্ন্য সচৈতন্য ব্যক্তিপুঞ্জের সমষ্টিভূত স্বরূপশায়ী হইয়া ব্যবহারিকভাবে পরম নিরঞ্জন মহাভাবময় প্রেমলীলানুগত, তখন তাহাকে 'প্রকট পরব্রহ্ম' বা পরম নিরঞ্জন পুরুষ' অভিধানে অভিহিত করা যাইতে পারে। পরমাত্মতত্ত্বসম্পন্ন সাধুর ব্যক্তিভূত নরলীলা এই লীলার অন্তর্গত বিকাশ।

২। একমাত্র এই প্রকট লীলাস্থলেই আত্মার অন্তর্নিহিত বিষয় ও বিষয়ীর স্বরূপগত ঐক্য লৌকিকভাবে ভঙ্গ হইয়া তাহাদের সাক্ষাৎ মিলন ঘটিয়া থাকে। এইরূপ ব্যব-

* এই প্রবন্ধ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার তত্ত্ববিদ্যা সভার অধিবেশনে পঠিত হয়। বহরমপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল শ্রদ্ধাস্পদ বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সভাপতির আসনে অধ্যাসীন ছিলেন।

হারিক মিলন সংঘটন ব্যতীত এই আত্মার কোন স্থলেই কোনরূপ জ্ঞানোৎপত্তির কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞেয় বিষয়ের অসদ্ভাবে, অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলে,জ্ঞাতা বিষয়ী কুত্রাপি কখনও স্বয়ং জ্ঞান সম্পন্ন বা স্বকীয় জ্ঞানে স্বতঃ প্রকাশ হইতে পারে না। জ্যোতিঃ পদার্থের অবলম্বন চাই এবং ধারণ ও বিকীর্ণ করিবার সামগ্রী চাই, নতুবা তাহা কুত্রাপি কখনও জ্যোতিঃ পদার্থরূপে অভি-ব্যক্তি-লাভে সমর্থ হয় না। আবার ইহাও প্রসিদ্ধ, সেই বিষয়গত নৈর্ম্মল্যের তারতম্যই সেই জ্যোতিঃ পদার্থের ঔজ্জ্বল্য-বিকাশের তারতম্যের কারণ হইয়া থাকে। সেইরূপ বিষয়ীভূত নৈর্ম্মল্যের তারতম্যানুসারে নিত্য-অব্যক্ত, নিত্য-নির্গুণ,নিত্য নির্ব্বিকার বিষ-য়ীকে রূপান্তরিত বা ভাবান্তরিত বলিয়া অনু-ভূত হয়। বস্তুতঃ বিষয়ীতে কোন প্রকার বিকার, বিকাশ, রূপান্তর বা ভাবান্তর নাই। আমরা এখন ব্যবহারিকভাবে, তাহাতে যে বিকার বিকাশ প্রভৃতি উপলব্ধি করি, তাহা আশ্রয়ীভূত ও অভিজ্ঞেয় বিষয়ানুগত—স্বরূপ-গত বিষয়ীগত নহে, বিষয়-সম্বন্ধ হেতু,বিষয়ী এখন প্রতিবিম্বে এবং স্থলবিশেষে স্বরূপে প্রবোধিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিষয়-সম্বন্ধ-বিমুক্ত বিষয়ী শুদ্ধ চিন্মাত্ররূপে কল্পিত হইয়া থাকে। অভিজ্ঞেয় বা জ্ঞানভূত বিষয়কে এখন আমরা শ্রেণীত্রয়ে বিভক্ত করিতে পারি। ১ম বহির্ব্বিষয়,২য় আত্মস্থ বিষয়,৩য় পরমাত্মস্থ বিষয়। জ্ঞানের উল্লেখ হইলেই সর্ব্বত্র এই ত্রিবিধ বিষয়-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের কোন একটী বিষয়ের জ্ঞান বুঝায়। জ্ঞানের উল্লেখ হইলেই আরও জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার, বিষয় ও বিষয়ীর, ইদং পদবাচ্য ও অহংপদবাচ্যের ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেখানে কোন জ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পিত হয়, সেখানে তাহার একদিকে বিষয় বা ইদং পদবাচ্য এবং তাহার অপর দিকে বিষয়ী বা অহংপদ বাচ্য আছে। প্রাগুক্ত ত্রিবিধ বিষয়ানুসারে জ্ঞানের তিনটী প্রকোষ্ঠ এখানে কল্পিত করিয়া লওয়া যাইতেছে। প্রথমটীকে অনাত্ম প্রকোষ্ঠ বলিলাম; জ্ঞানের এ প্রকোষ্ঠে অনাত্ম বা বহির্ব্বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়। দ্বিতীয়টী আত্ম প্রকোষ্ঠ বলিয়া অভি-হিত হইল; জ্ঞানের এ প্রকোষ্ঠে বিষয়ীর আত্ম স্বরূপের জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। তৃতীয়টীকে পরমাত্ম-প্রকোষ্ঠ অভিধানে উল্লি-খিত করা গেল; জ্ঞানের এ প্রকোষ্ঠে বিষয়ীর পরমাত্ম স্বরূপের জ্ঞান লাভ হয়। তুমি ঘোর অদ্বৈতবাদীই হও, আর ঘোর দ্বৈতবাদীই হও, আর দ্বৈতাদ্বৈত-বাদীই হও,—তোমার দার্শনিক মত যে কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকুক না, তাহাতে কিছু আসে যায় না। তুমি এই বিষয়কে বিষয়ীর সহিত অভিন্ন জ্ঞানে সেই বিয়য়ীর মধ্যে তাহাকে সংস্থাপিত কর,কিম্বা তাহাকে স্বতন্ত্র জ্ঞানে বিষয়ীর বহির্দ্দেশে তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেও, কিম্বা অপর যাহা কিছু নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা কর, তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না। তোমার জ্ঞানের অনাত্ম প্রকোষ্ঠেই হউক, আর আত্ম প্রকো-ষ্ঠেই হউক, আর পরমাত্ম প্রকোষ্ঠেই হউক, সর্ব্বত্রই এই জ্ঞানের এক দিকে বিষয় আছে, এবং তাহার অপরদিকে বিয়য়ী আছে, নচেৎ এই জ্ঞানের কোন অর্থই কুত্রাপি কখনও পাওয়া যায় না। নদী বলিলে যেমন সকলে ইহাই বুঝেন যে,তাহার দুই দিকে দুই তীর-ভূমি আছে এবং সেই দুই তীর-ভূমিকে স্পর্শ করিয়া একটী জলস্রোত প্রবাহিত;

'জ্ঞান' বলিলেই লোকে ঠিক এই ত্রিত্যবাদই বুঝিয়া থাকেন। 'জ্ঞান' কিন্তু এই অনাত্ম প্রকোষ্ঠে, সদা সর্ব্বদা জ্ঞাতা বিষয়ীকে তাদৃশ গ্রাহ্য মধ্যে গণনা করে না। সে অনুক্ষণ জ্ঞাতা বিষয়ীকে দূরস্থ রাখিয়া জ্ঞেয় বিষয়াকারগত হইয়া উদয় হইতে থাকে। অন্য ভাবে, অন্যরূপে তাহার প্রকাশ হয় না। এ প্রকোষ্ঠে তাহার স্বতন্ত্র স্বরূপ-গত প্রকাশ সম্ভাবিত নহে। এক্ষণে এই প্রকোষ্ঠত্রয়ে যে যে জাতীয় জ্ঞানের যেস্থলে যেরূপে স্ফূরণ হইয়া থাকে, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ হইতেছে।

৩। জ্ঞানের অনাত্ম প্রকোষ্ঠে, বহির্বিষয়ের সঙ্গে স্বকীয় প্রতিবিম্বে প্রবোধ-প্রবণ বিষয়ীর প্রথম সাক্ষাৎ মিলন ও তদাকার প্রাপ্তি হেতু প্রথম ব্যবহারিক প্রবোধ স্ফূর্ত্তি ও জ্ঞানোৎপত্তি হয়। এইরূপ বিবিধ জাগ্রত বা প্রতিবোধিত বিষয় সঙ্গ-হেতু ক্রমাগত জ্ঞানস্ফূর্ত্তি হইতে হইতে বিষয়ীর প্রতিবিম্বিত স্বরূপে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রামে বা দেহ মনাদি ইন্দ্রিয় রাজ্যে আত্ম-বুদ্ধি ও তদ্ভিন্ন যাবতীয় বহিঃপদার্থে অনাত্মবুদ্ধি, এবং বহির্বিষয়ের মধ্যে স্ত্রী-পুত্রাদি যে সকল পদার্থে তাহার সেই দেহ মনাদির সুখ, স্বচ্ছন্দ, প্রয়োজন বা তৃপ্তি অনুভব হয়, তাহাদের প্রতি আত্মীয় বুদ্ধি ও তদ্ভিন্ন যাবতীয় বিষয় ব্যাপারে পর বা অনাত্মীয় বুদ্ধির সংস্কার উদয় হইয়া থাকে। এখানে সেই অদ্বিতীয় পরমবস্তু প্রপঞ্চ দেহ মধ্যে প্রপঞ্চ বদ্ধ স্বকীয় ব্যষ্টি প্রতিবিম্বিত ইন্দ্রিয় গ্রামে বহির্বিষয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হেতু অনাত্ম ঈশ্বর অধ্যাসে দাঁড়াইয়া ব্যবহারিক ভাবে প্রথম প্রবুদ্ধ হইলেন। এইরূপ বিষয়কে আমরা ইংরাজি ভাষায় phenomenal object (প্রতিবিম্বিত বিষয়) নামে নাম-করণ করিয়া রাখিলাম। এই জাতীয় নামরূপ বিশিষ্ট বিষয়কেও তৎ-সংজাত প্রবোধ ও জ্ঞানের সারত্বানুসারে বহুতর শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত শ্রেণী বিভাগ বিবৃত করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

৪। জ্ঞানের আত্ম প্রকোষ্ঠে, আত্মতত্ত্ব-সম্পন্ন সদ্‌গুরু বা সাধুরূপ চতুর্বিংশতি তত্ত্বাতীত বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর দ্বিতীয় সাক্ষাৎ মিলন ও সময়ে তৎ-অন্তরঙ্গে পরিণতি বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্তি হেতু স্বরাট আত্ম স্বরূপে প্রবোধিত হইয়া তাহার এই অভিনব জ্ঞানোৎপত্তি সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই মিলন হইতে বিষয়ী পূর্ব্বকার প্রতিবিম্বিত অহং অধ্যাসে প্রবোধিত পূর্ব্বকার ইন্দ্রিয়-গ্রামে জাগরিত, পুরাতন অসৎ অসার ব্যবহারিক আত্ম বুদ্ধি সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া স্বকীয় স্বরাট সচ্চিদানন্দময় শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপে আত্মবুদ্ধি এবং সদ্‌গুরু সাধু সজ্জন ভগবজ্জন সমূহে আত্মীয় বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে ইন্দ্রিয় গ্রামে ও অহং অধ্যাসে বিষয়ীর অনাত্ম বুদ্ধি স্ফূরিত হয়, তাহার মোহ-বন্ধন,দেহ-বন্ধন,সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। তক্রমুক্ত নবনীর ন্যায়-সে দেহ মনাদি ইন্দ্রিয় রাজ্যে প্রমুক্ত ও স্বতন্ত্র ভাবে বিচরণ করে। সাংসারিক বিষয় ব্যাপারে তাহার ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধি তিরোহিত হয় এবং লৌকিক সম্বন্ধে শত্রু মিত্র বুদ্ধি থাকে না। এখানে সেই অদ্বিতীয় পরমাত্ম বস্তু প্রপঞ্চ দেহ মধ্যে থাকিয়াও আত্মতত্ত্ব-সম্পন্ন অভিনব জ্যোতিষ্মান বিষয়ের সাক্ষাৎকার ও তৎসহ সহজ আনুগত্য সম্বন্ধ হেতু তৎ-অন্তরঙ্গ স্বরূপে পরিণত হইয়া স্বকীয় প্রপঞ্চমুক্ত স্বরাট স্বরূপে প্রকৃত অন্তঃপ্রজ্ঞ বা অন্তশ্চেতা হইলেন।

জ্ঞানের আত্মপ্রকোষ্ঠের এই বিষয়কে আমরা ইংরাজীতে Noumenal object (আত্মবস্তু) নামে অভিহিত করিতে পারি।

৫। জ্ঞানের পরমাত্ম প্রকোষ্ঠে পরমাত্ম-তত্ত্ব-সম্পন্ন সদ্‌গুরু বা সাধুরূপ নিরঞ্জন বিষয়ের সঙ্গে, বিষয়ীর তৃতীয় সাক্ষাৎ মিলন ও যথা সময়ে তৎপারমাত্মিক স্বরূপে পরিণতি বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্তি-হেতু স্বকীয় অখণ্ড পারমাত্মিক বিরাট স্বরূপে প্রতিবোধিত হইয়া তাহার নবীনতর জ্ঞানোৎপত্তি সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই সুদুর্ল্লভ মিলন হইতে বিষয়ী স্বকীয় ব্যষ্টিপাশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বকীয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত চরাচরব্যাপ্ত পরিপূর্ণ বিরাট স্বরূপে তাহার পরমাত্ম বুদ্ধি এবং আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত যাবতীয় পরকীয় স্বরূপে পরমাত্মবুদ্ধির স্ফুরণ হইয়া থাকে। এখানে পরমাত্ম ও পরমাত্মীয় বুদ্ধি এক মহাভাবের মধ্যে মিশিয়া একাকার হইয়া গেল। এখানে সেই অখণ্ড অদ্বিতীয় পরমবস্তু প্রপঞ্চ দেহমধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও অভিনব পরমাত্ম-তত্ত্ব সম্পন্ন পরম নিরঞ্জন ও জ্যোতিষ্মান বিষয়ের সাক্ষাৎকার ও তৎসহ সহজ আনুগত্য সম্বন্ধ হেতু তদেকাত্ম হইয়া, অখণ্ড বিরাটভাবে প্রকৃত বহিঃপ্রজ্ঞ বা বহিশ্চেতা হইলেন এবং অভিনব নিরঞ্জন ইন্দ্রিয় দ্বারে বাহ্যজগৎকে স্বরূপে সন্দর্শন করিলেন। এখানে সেই সমাধি সমুদ্রশায়ী নিত্যবস্তু অন্তর্ব্বাহে প্রকৃত উভয়তঃ-প্রজ্ঞ,—জীবের জাগ্রত স্বপ্ন-সুষুপ্তি তিন অবস্থায় সচেতন হইলেন এবং মহাভাবময় পরম নিরঞ্জনলীলার সূত্রপাত করিলেন। জ্ঞানের পরমাত্ম-প্রকোষ্ঠের এই বিষয়কে আমরা ইংরাজিতে Transcendental বা Absolute object (পরমাত্মবস্তু) নামে উল্লেখ করিলাম। ইহা আমাদের মনঃকল্পিত নাম। কেহ যেন ইংরাজি বা জর্ম্মন দর্শনের কোন নামের সঙ্গে ইহাদিগকে মিলাইয়া ভিন্নার্থে উপনীত হইবেন না।

৬। বক্ষ্যমান বিষয়ী সর্ব্বত্রই একই। তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম আশ্রয়ীভূত বিষয় স্বরূপের অবস্থাভেদে, জ্ঞেয় বিষয় স্বরূপের প্রবোধগত তারতম্য বা সারত্বভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান প্রযুক্ত কোথাও প্রযোজ্য হইয়া থাকিলেও সে সমস্ত ভেদাত্মক ভাব মানুষের মনঃকল্পিত ব্যবহারিক সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে। বক্ষ্যমান বিষয়ীর ব্যক্তিগত পরিচয়ের (Personal identityর) অভিন্নতা সর্ব্বাবস্থায় অক্ষতভাবে স্মৃতিগত, সংস্কারগত ব্যবহারিক জ্ঞানগত থাকিয়া তাহার এই একত্বের প্রমাণ স্থল হইয়া আছে। ব্রহ্মাত্মা,ভগবতাত্মা সাধু সজ্জন সকল দৃষ্টান্ত স্বরূপে প্রদর্শিত হইতে পারে।

৭। এখানে এককথা স্মৃতি পথবর্ত্তী রাখা কর্ত্তব্য, যে বিষয়ী তৎস্বরূপগত বিষয়াংশের অপরিহার্য্য অভিব্যক্তি বা পরিণাম-প্রবণতাতে সেই বিষয়াংশ হইতে স্বতন্ত্র শুদ্ধ চিন্মাত্র বা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তপুরুষ মাত্র নিত্য নির্ব্বিকার, নিত্য অপ্রকট, নিত্য অব্যক্ত, নিত্য অপরিণামীরূপে কল্পিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে, বিষয়ীতে কোন পরিবর্ত্তন, স্ফূর্ত্তি, বিকার, পরিণাম, প্রকারান্তর বা অভিব্যক্তির কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই। আশ্রয়ীভূত অথবা অভিজ্ঞেয় বিষয়াংশের পরিবর্ত্তনাদি তাহাতে প্রতিফলিত, আরোপিত ও পরিকল্পিত হয় মাত্র। বক্ষ্যমান প্রস্তাবে যদি বিষয়ীর কোন বিকাশ বা স্ফূর্ত্তির কোন উল্লেখ থাকে, তাহা তাহার আশ্রয়ীভূত অথবা অভিজ্ঞেয় বিষয়ের স্বরূপগত, বিষয়ীগত নহে, ইহা বুঝিতে হইবে।

যাদৃশ "কাচ কাঞ্চন সংসর্গাৎ ধত্তে মারকত দ্যুতিং", সেইরূপ সবিষয় বলিয়া বিষয়ীতে বিষয়-সুলভ বিকাশাদির আরোপ হয় মাত্র।

৮। বক্ষ্যমান বিষয়ীর কোন বিষয় বিশেষের সঙ্গে তদাকারত্ব বা তদেকত্ব প্রাপ্তিকালে যে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তাহা শুষ্ক জ্ঞানাঙ্গে বা জ্ঞেয় বিষয়াঙ্গে অপরিণতভাবে বদ্ধ থাকে না। তৎক্ষণাৎ সেই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্ঞানভূত বা জ্ঞেয় বিষয়ের প্রতি তাহার অনুরাগ বা বিরাগ, প্রীতি বা অপ্রীতি, ভক্তি বা অভক্তি প্রভৃতি ভাবোদয় হইয়া তৎসঙ্গপ্রাপ্তীচ্ছা বা পরিহার-সংকল্প তাহার অন্তরে উদিত হয় এবং তাহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত করে। দৈবক্রমে বা সুকৃতি ফলে সেই জ্ঞেয় বিষয় যদি শুদ্ধসত্ব বা আত্মতত্ব বা পরমাত্ম তত্ব সম্পন্ন বিষয় হয় এবং বিষয়ীর পরম সৌভাগ্য বা সুকৃতি বশতঃ যদি তৎপ্রতি তাহার সহজ স্বতঃসিদ্ধ আসক্তি, অনুরাগ, ভক্তি প্রীতি ভাবের সঞ্চার হইয়া তাহার আনুগত্য যথাবিধানে অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে সময়ে তাহার অবলম্বনীয় অভিজ্ঞেয় বিষয়ের স্বরূপত্ব বা তদেকত্ব লাভ হইয়া তৎসংসর্গে শ্রেয়ঃ লাভ হইতে থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জ্ঞেয় বিষয় স্বরূপের সারত্ব সর্ব্বত্রই জ্ঞাতা বিষয়ীর জ্ঞান, প্রবোধ ও স্বরূপের সারত্ব ও ঔৎকর্ষ উৎপাদন করে। এ সংসারে এইরূপ তদাকারত্ব, তদেকত্ব বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্তিহেতু বিষয়ীর সর্ব্বদা সদসদ্গতি প্রতিলব্ধ হইতেছে। "সংসর্গ যা দোষা গুণা ভবন্তিঃ।" সংসর্গের দোষ গুণ চিরদিন বিষয়ীতে বর্ত্তিতেছে, এরূপ প্রবাদ চিরপ্রসিদ্ধ আছে।

৯। পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে যে, জ্ঞানের অনাত্ম-প্রকোষ্ঠে বহির্ব্বিষয়ের সঙ্গে তদেক হইয়া—তদাকারে আকারিত হইয়া বিষয়ীর সেই বিষয় জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। শুদ্ধ এই জ্ঞানোৎপত্তির জন্য এই বহির্ব্বিষয়ের নিকট বিষয়ী কেবল ঋণী নহে। তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তিও এই বিষয় রাজ্য হইতেই চিরদিন সম্পাদিত হইতেছে। নিত্যধামের অপরিণামী পরমাত্ম বিষয়ীর সমগ্র বিষয়াংশ, তৎসাহিত্য বশতঃ নিত্য পরিণাম-নিষ্ঠ। "ন পরিণম্য ক্ষণমধ্যপি তিষ্ঠতে।" এই অনতিক্রমণীয় পরিণাম নিষ্ঠতা দ্বিবিধরূপে স্ফূর্ত্তি পায়। সদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠ ও বিসদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠ। এই বিসদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠাংশ কি সৃষ্টি বিকাশের প্রাক্কালে কি তাহার প্রলয়াবসানে সদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠ বিষয়াঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া অভিন্নদেহে অব্যক্তরূপে নিহিত থাকে। তখন সমগ্র বিষয়াংশ, একাধারে—একাকারে সদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠ হইয়া বিষয়ীর অঙ্গে তদেকাত্ম ভাবে নিরুপাধি অব্যক্ত নিষ্ক্রিয় পরমাত্ম অবস্থাতে বিলীন থাকিয়া অনুক্ষণ স্বকেন্দ্রে স্বভাবে স্বরূপে স্বগতনিষ্ঠ আন্দোলনে আন্দোলিত হইতে থাকে। এই অবিশ্রান্ত বিমন্থন হেতু সেই নিখিল বিষয়াংশের অন্তর্নিহিত ও স্বরূপগত বিসদৃশ-পরিণাম-প্রবণাংশ সেই সদৃশ পরিণামী বিষয়াংশ সঙ্গে তদেকাঙ্গ বা অভিন্ন কলেবর হইয়া সেই মৌলিক সদৃশ পরিণামে নিত্যকাল সুস্থির ও প্রশান্ত ভাবে থাকিতে স্বতঃই অশক্ত হয়। যদি এই নিখিল বিষয়াংশ নিয়তকাল মৌলিক সদৃশ পরিণামে তন্নিষ্ঠ হইয়া স্বকেন্দ্রে স্বরূপে সর্ব্বাঙ্গে সুস্থির প্রশান্ত ও অচ্যুত থাকিতে পারিত, তাহা হইলে সৃষ্টি বা জৈবিক, ঐশ্বরিক বা পারমাত্মিক কোন প্রকার লীলা বিকাশের কিছুমাত্র সম্ভাবনাই থাকিত না। কিন্তু বিষয়ীর সাহিত্য

বশতঃ সেই বিসদৃশ-পরিণাম-প্রবণাংশে ভিন্ন জাতীয় অভিব্যক্তি-প্রবণ হইয়া যথা সময়ে কেন্দ্র-বিমুখ বিশদৃশ চাঞ্চল্যভাব প্রাপ্ত হইতে এবং বিজাতীয় মলিন সামগ্রীরূপে পরিণত হইতে আরম্ভ করে। মৌলিক বিষয়াঙ্গের নির্ম্মল দেহ হইতে এইরূপে মায়াংশ অগ্নি-সন্তপ্ত শর্করারসজাত মল নির্গমের ন্যায় স্বকীয় মালিন্য হেতু ব্যবহারিকভাবে ক্রমশঃ স্বতন্ত্রাকার ধারণ করিয়া দাঁড়াইল। সেই ত্রিগুণাতীত নির্ম্মল মৌলিক বিষয়াঙ্গ এইরূপে বিসদৃশ পরিণামপ্রাপ্ত বিকৃত অংশকে স্বদেহ হইতে বিবর্জ্জন না করিলে—অর্থাৎ এইরূপে বিজাতীয় সামগ্রীপ্রসূ না হইলে, এই মায়াংশে কল্পিত ছায়াদেহ বিশ্বসংসারে কোন প্রকার অভিব্যক্তি লাভ করিতে পারিত না। আমাদের জ্ঞানে,কোন পদার্থ সম্বন্ধে বিকাশ, বিকার, প্রকট, অভিব্যক্তি, স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি অভিধানের কোন অর্থোদয়ই হইতে পারে না, যদি তাহার মূলে বিদেহ, অব্যক্ত, নির্ব্বিকার, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরুপাধি বৈজিক অবস্থা তাহার অন্তরালবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত না থাকে। জগতের সৃষ্টির অভিব্যক্তি বলিলেই,সেই অভিব্যক্তির মূলদেশে বৈজিক অব্যক্ত প্রভৃতি ভাবের সদ্ভাব অপরিহার্য্যরূপে চিন্তনীয় থাকিবেই থাকিবে। এই বিষয়াংশ যখন সদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠ থাকিয়া তদেকাত্ম বিষয়ীর পরমাত্ম অঙ্গে প্রতিনিয়ত লীলা-বিহার করিতে ও স্বরূপে ও স্বকেন্দ্রে আলোড়িত হইতে থাকে, তখন সেই বিষয়াংশকে আনন্দাত্মিকা অব্যক্তা, মূলা বা পরা প্রকৃতি বলে এবং তদঙ্গশায়ী বিষয়ীকে চিদাত্মক অব্যক্ত পরাৎপর পুরুষ বলে। পূজ্যপাদ ভগবান কপিলদেব এই মূলা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জ্ঞানে চিদাত্মক পুরুষকে শুদ্ধ চিন্মাত্র বা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তাত্মারূপে এবং মূলা অব্যক্তা প্রকৃতিকে কেবল মাত্র সৃষ্টির মৌলিক উপাদান উপকরণ স্বরূপ চতুর্ব্বিংশতিতম স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে অবধারণ করিয়াছেন। তাঁহার ধারণায় প্রকৃতির সদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠ মৌলিক অংশের কোন এক বিশেষ দেশে নিত্যত্ব ও নির্ব্বিকারত্ব রক্ষা হয় নাই। তাঁহার ধারণায় প্রকৃতির সমগ্র সদৃশ পরিণামনিষ্ঠাংশ পুংসান্নিধ্য নিবন্ধন বিসদৃশ পরিণামনিষ্ঠ আকারে পরিণত হইয়া সৃষ্টির বৈজিক উপকরণে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়,এবং মূলাধারে মূলা প্রকৃতির স্থান হয় শূন্য পড়িয়া থাকে, নতুবা সৃষ্টির সেই বৈজিক উপকরণে পরিপূর্ণ হয়। প্রকৃতির যে অংশ নিত্য সদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠ থাকিয়া সৃষ্টির নিত্য অতীত রহিল—যে অংশ সৃষ্টির মূলাধারে অব্যক্ত বিদেহ বীজরূপে পরমাত্ম-অঙ্গে তদেকাত্ম হইয়া সমাধিস্থ থাকিয়া ক্রমোন্মুখ পুষ্টিবীজের অন্তর্ভূত প্রাণরূপে অব্যাহত ও অধিকৃত রহিল, পূজ্যপাদ মহর্ষির ধ্যানক্ষেত্রে এই "সূক্ষ্মাতীত নিরতিশয় সূক্ষ্মতত্ত্ব" উদয় হয় নাই। মূলাধারের অন্যথা করিয়া সৃষ্টির ক্রমবিকাশের অনুসরণ করাতে তিনি নিত্য সমাধিস্থ পরব্রহ্ম সত্তার স্থল দেখিতে পান নাই, অবিভাজ্য আত্মাকে অসংখ্য অনন্ত খণ্ডে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহার সাংখ্যসূত্রানুসারে সৃষ্টির মূল উপকরণ স্বরূপ এই প্রকৃতি সঙ্গ হইতে নির্লিপ্ত হইয়া, শুদ্ধ চিন্মাত্ররূপে অবস্থানই পুরুষের অসঙ্গ মুক্তিলাভ। তাঁহার মতে প্রকৃতি সান্নিধ্যই আত্মার সমস্ত বদ্ধতার নিদান। প্রকৃতি যে তাহার সারাংশে সদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠ অবস্থায় তদেকাত্মভাবে পুরুষের নিত্য সাহিত্য অভঙ্গ রাখিয়া জগৎ-ব্যাপারের মূলাধারে তন্নিষ্ঠ থাকিল, ইহা তাঁ-

হার সূত্র মধ্যে পরিস্ফূর্ত্ত হইবার সুযোগ পায় নাই। যাহা হউক, বিসদৃশ-পরিণাম-নিষ্ঠ মায়িক বিকার হইতে যে বিষয়ীকে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইবে, ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। মহর্ষিও এই মতের প্রতিবাদী নহেন।

১০। যেখানে বিষয় ও বিষয়ী, প্রকৃতি ও পুরুষ অপরিচ্ছিন্নভাবে সমন্বয় প্রাপ্ত, সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরব্রহ্ম সদৃশ পরিণামিনী প্রকৃতি সঙ্গে অভিন্ন একাত্ম স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া অপ্রকট নিত্যলীলাভিভূত। স্বকীয়া অব্যক্তা আনন্দাত্মিকা প্রকৃতির বরাঙ্গে স্বকীয় অব্যক্ত চিদাত্মক স্বরূপের বরাঙ্গ অপরূপ মিশ্রণে মিশাইয়া, অদ্বৈত তদেকাত্মভাবে সমাধিগত। এখানে বিষয় ও বিষয়ীর প্রকৃতি ও পুরুষের স্বাতন্ত্র্য নাই। এখানে বিষয় প্রতিনিয়ত বিষয়ীগত এবং বিষয়ী প্রতিনিয়ত বিষয়গত। ছায়াময়ী সৃষ্টি-বিকাশের সূচনা হইতেই—প্রকৃতির মূলদেহ হইতে মায়াংশের বিরূপ, বিসদৃশ, বিজাতীয় আকার পরিগ্রহ হইতেই দ্বৈতভাব, স্বাতন্ত্র্য ভাবের সূক্ষ্ম বীজ সমুদ্ভূত হইল। এখানে তাহার সদ্ভাব ও স্ফূর্ত্তি নাই। এখানে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির মূলদেহে অব্যক্তরূপে নিহিত। পরব্রহ্মের অব্যক্ত আত্মরতি এখানে নিরবচ্ছিন্ন সমাধিভাবে নিত্যলীলাভিভূত। এই অভিন্নাত্মক সমাধি-গত অদ্বৈত অব্যক্ত আনন্দ চৈতন্যই ছায়ারূপিণী সৃষ্টিব্যাপারের মূলাধার সৎস্বরূপ। এই ক্রিয়াত্মিকা ছায়াময়ীর কারণাত্মক স্বরূপ ও স্বত্বা এই থানেই নিদানভূত হইয়াছে। এই অব্যক্তা আনন্দাত্মিকা প্রকৃতির ও অব্যক্ত চিদাত্মক পুরুষের অভেদ চিদানন্দ ঘন একাত্মক অদ্বৈত পরমাত্ম অবস্থাই সমাধির অবস্থা। ইহাই পরা প্রকৃতির বা তদঙ্গশায়ী পরম পুরুষের নিত্যধামের—তুরীয় ধামের অপ্রকট অব্যক্ত নিত্য লীলার স্বতঃসিদ্ধ অবস্থা। এই নিত্য সমাধির অবস্থাই নিখিল লীলা প্রবাহের নিত-প্রস্রবণ স্বরূপ সমস্ত গণনার ও সমগ্র দেশ কালের আরম্ভ স্থল,—সমস্ত সত্বার মূলভিত্তি, সমগ্র কার্য্য-কারণ-প্রবাহে আদি স্থান, কর্ম্মাকর্ম্মের গতি—স্থিতির এবং কালাকালের সন্ধিস্থল। ইহাই বিষয়ী ও বিষয়ের পুরুষ ও প্রকৃতির চিৎ ও আনন্দের আমি ও তুমির নিরাকার সাকারের একাকার। ইহাই তদাকার বৃত্তির প্রজ্ঞাপ্রজ্ঞের ও জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতার পরম আকরস্থল প্রযুক্ত ব্যবহারিক বা পারমাত্মিক প্রতিবিম্বিত বা স্বরূপগত নিখিল জ্ঞানভাণ্ডারের ভিত্তিভূমি হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। ইহাই ত্রিগুণ তরঙ্গের উৎপত্তি স্থল। প্রকৃতির অঙ্গশায়ী এই পরব্রহ্মের অবস্থা অবিশ্রান্ত চিদানন্দঘন—নিরবচ্ছিন্ন সমাধিসমুদ্র-শায়ী। মাণ্ডুক্যোপনিষদে পরব্রহ্মের অবস্থা এইরূপে চিত্রিত হইয়াছে।—"নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞান ঘনং ন প্রজ্ঞং না প্রজ্ঞং।" ইহাই মূলাধারস্থিত পারমাত্মিক সমাধির অবস্থার যথাযথ অবিকল চিত্র। নিত্যধামের এই সমাধির অবস্থা—এই অব্যক্ত আত্মরতির অবস্থাই ভজন, সেবা ও প্রেমতরুর অব্যক্ত ঘনীভূত বিদেহ বৈজিক অবস্থা। ইহাই মহাভাবময় পারমাত্মিক প্রকট প্রেমলীলার মূলাধার পত্তন-ভূমি। সৃষ্টিলীলার বীজও এই অজস্র শাশ্বত বীজের বিদেহ-অঙ্গে অব্যক্ত সূক্ষ্মাতীত সূক্ষ্মরূপে নিহিত। এই সমাধি সমুদ্রস্থ বিষয়াংশের বা ত্রিগুণাতীতা অব্যক্তা প্রকৃতির পরমাত্মদেহ স্বতঃই অনুক্ষণ মন্থিত হইয়া অভিব্যক্তির প্রয়োজনে দেহমল পরিবর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই দেহমল বিসদৃশ স্বাতন্ত্র্য-

ভাব লাভ করিয়া ত্রিগুণাত্মিকা, শক্তি-দেহা, সত্ত্ব-প্রধানা, জগৎ-সৃষ্টির বীজ স্বরূপা মায়া প্রকৃতির উৎপত্তি হইল। এই মায়া প্রকৃতি উৎপত্তি লাভ করিবার পূর্ব্বে পরা প্রকৃতির নির্ম্মলাঙ্গে সৃষ্টির অব্যক্ত সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বিদেহ বীজরূপে অন্তর্নিহিত ও সমাধিগত ছিল। তখনও সেই বীজগর্ভে সৃষ্টির অপরাপর ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের স্বরূপও সূক্ষ্মাতীত অব্যক্তরূপে নিহিত ছিল। প্রকৃতির সমাধিস্থল হইতে মায়াংশের উৎপত্তি হইলে, তাহাতে নিত্যধামস্থ পরাৎপর সত্ত্বা সত্বঃই তাহার অন্তরাত্মারূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মায়াঙ্গে প্রতিবিম্বিত হইল। ইহাতেই সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্ত্বা, পরম সাত্ত্বিকতা, অনন্ত শক্তি, শান্তি ও তৃপ্তির অব্যক্ত বীজস্বরূপ অপরাশক্তির নিকেতন অভিব্যক্ত হইল। ইহাই বিশুদ্ধা সাত্ত্বিকী কামনার অব্যক্ত বৈজিক অবস্থা ও সৃষ্টি লীলার প্রতিবিম্বিত পত্তন ভূমি। এইরূপে এখানে দ্বৈতভাবের বীজ প্রকৃতি গর্ভ হইতে অতি সূক্ষ্মাকারে আবির্ভূত হইল। এই নবাভির্ভূত সৃষ্টি বীজের নাম মহত্তত্ব। সমাধি সমুদ্রে এই দ্বিতীয় স্বরূপের—এই দ্বৈতভাবের বীজ অনভিব্যক্ত ও অস্ফূর্ত্ত ছিল।

১১। এই মহত্তত্ত্বের অবস্থা প্রজ্ঞানঘন। তাহা না সমাধি না প্রসুপ্তি, এ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী অস্ফূর্ত্ত প্রশান্তি ঘন, পরিতৃপ্তি ঘন অবস্থা। এই প্রশান্তি সমুদ্রশায়ী ঘনপ্রজ্ঞ মহত্তত্ত্বের মধ্যে সৃষ্টির অপরাপর দ্বাবিংশতি তত্ত্বের স্বরূপ অপরিব্যক্ত ধ্যান স্তিমিতাবস্থায় নিমগ্ন। বেদান্তে এই মায়াংশে প্রতিবিম্বিত স্বরূপকে 'ঈশ্বর' এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে ইঁহাকে 'বাসুদেব' নামে অবিধেয় করা হইয়াছে। ইহাই বিষয়ীর বিষয়াংশের বিসদৃশ বিজাতীয় প্রতিবিম্বে প্রবোধিত ছায়াময় বিরাট অভিব্যক্তি। এখানে এই সূক্ষ্ম বীজাবস্থায় অভিমান (Consciousness) আপাততঃ কোন স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিল না। নিম্নে এই অভিমান স্ফূর্ত্তির ক্রমবিকাশ বেদান্তাদি শাস্ত্রের বিবৃতি অবলম্বনে প্রদর্শিত হইতেছে।

১২। এই ঘন-প্রজ্ঞ মহত্তত্ত্বের অপরাশক্তি-দেহ বা প্রশান্তি-সমুদ্রও বিষয়ীর পূর্ব্বানুরূপে আন্দোলিত ও বিমন্থিত হইয়া সেই মন্থন মল হইতে সেই মহতাধারে ব্যষ্টিপুঞ্জের এবং অপরদিকে সেই ব্যষ্টিপুঞ্জের সমষ্টিভূত স্বরূপের যুগপৎ অভ্যুত্থান হইল। শাস্ত্রাদিতে এই ব্যষ্টিকে 'প্রাজ্ঞ' এবং সমষ্টিভূত স্বরূপকে সঙ্কর্ষণ বলে। এই ব্যষ্টিভূত ও সমষ্টিভূত স্বরূপ মহত্তত্ব দেহের অন্তর্গত কারণ দেহে আশ্রিত। কারণ দেহ মায়ার পরিত্যক্ত দেহমল বা বিজাতীয় বিকৃতি হইতে পূর্ব্বানুরূপে উৎপন্ন। এই বিজাতীয় দেহ বিকৃতির নাম অবিদ্যা, প্রকৃতি বা অহংকার। প্রাজ্ঞগণের ও তাহাদের সমষ্টিভূত স্বরূপের অবস্থা সুষুপ্তাবস্থা বা 'নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহি প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং' অবস্থা। (Neither internally nor externally nor both internally and externally Conscious state) বেদান্তে এই সমষ্টিভূত অবিদ্যাধিষ্ঠিত স্বরূপকে 'ঈশ্বর' এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে ইঁহাকে কারণাব্ধিশায়ী ভগবান বা সঙ্কর্ষণ বলা হইয়া থাকে। এই অবিদ্যাংশের বা অহংকার স্বরূপের সুষুপ্তদেহও পূর্ব্বানুরূপে আন্দোলিত ও মন্থিত হইয়া, সেই মন্থন মলজাত সূক্ষ্ম প্রপঞ্চে সান্তঃকরণ সূক্ষ্মদেহের উৎপত্তি হইল। এই সান্তঃকরণ সূক্ষ্মদেহের উপাদান অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম পঞ্চভূত বা তন্মাত্রা। ব্যষ্টিভূত 'তৈজস' ও সমষ্টিভূত হিরণ্যগর্ভ

এই সূক্ষ্ম দেহাধিষ্ঠিত। ইঁহাদের অবস্থা—স্বপ্ন বা তন্দ্রা বা অন্তঃ প্রজ্ঞাবস্থা। (Internally Conscious state) হিরণ্যগর্ভ নামটী বৈদান্তিক নাম। পুরাণাদি শাস্ত্রে এই হিরণ্যগর্ভকে গর্ভোদকশায়ী ভগবান্ বা প্রদ্যুম্ন নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই সূক্ষ্ম দেহভূত সূক্ষ্ম পঞ্চের পঞ্চীকরণে স্থূল প্রপঞ্চ স্থূলদেহের উৎপত্তি। ব্যষ্টিভূত বিশ্ব ও সমষ্টিভূত বৈশ্বানর এই স্থূল দেহাধিষ্ঠিত। ইহাদের অবস্থাই জাগ্রত বা বহিঃ প্রজ্ঞাবস্থা। (Externally consciousness state) বৈশ্বানরের অপর বৈদান্তিক নাম বিরাট পুরুষ। পুরাণাদি শাস্ত্রে ইঁহাকে ক্ষীরোদক-শায়ী ভগবান বা অনিরুদ্ধ বলিয়া থাকে। এখানে আসিয়া ব্যষ্টিভূত জীব ও সমষ্টিভূত ঈশ্বর অন্তঃকরণাদি ইন্দ্রিয়গ্রামে (phenomenal sensoriumএ) বিভূষিত হইয়া জাগ্রত জীব ও জাগ্রত ঈশ্বররূপে অধ্যাস বিশিষ্ট হইলেন। মাণ্ডুক্যাদি কোন কোন উপনিষদে মায়াধিষ্ঠিত ও অবিদ্যাধিষ্ঠিত ঈশ্বরের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য স্বীকৃত হয় নাই।

১২। কিন্তু এই জাগ্রতাবস্থা প্রকৃত স্বরূপগত নহে ; ইহা সেই স্বরূপগত প্রবুদ্ধাবস্থার প্রতিবিম্বিত ছায়া মাত্র। ব্যষ্টিভূত জীব এবং জীবপুঞ্জের সমষ্টিভূত ঈশ্বর দেশ, কাল ও অবস্থানুগত হইয়া স্থূলাদি দেহত্রয়ে বিহার করিয়া থাকেন। স্থূলদেহের অপর নাম অন্নময় কোষ। জীবপুঞ্জ যখন স্থূলদেহে বা অন্নময় কোষে অবস্থান করেন, তখন তাঁহাদের ও তাঁহাদের সমষ্টিভূত ঈশ্বর-স্বরূপের এইরূপ বহিঃপ্রজ্ঞি জাগ্রতাবস্থা। যখন তাঁহারা এই স্থূলদেহ বা অন্নময় কোষ পরিত্যাগ করিয়া, সূক্ষ্মদেহ বা প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষত্রয় আশ্রয় করেন, তখন তাহাদের ও তাহাদের সমষ্টিভূত ঈশ্বর-স্বরূপের তন্দ্রা বা স্বপ্ন বা অন্তঃপ্রজ্ঞাবস্থা। যখন তাহারা স্থূল বা সূক্ষ্মদেহ বা অন্নময়াদি কোষচতুষ্টয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কারণদেহ বা আনন্দময় কোষগত হন, তখন তাহাদের ও তাহাদের সমষ্টিভূত ঈশ্বর স্বরূপের সুষুপ্তাবস্থা অর্থাৎ "নান্তঃ প্রজ্ঞং, ন বহিঃ প্রজ্ঞং, নোভয়তঃ প্রজ্ঞং" অবস্থা।

১৩। বিশ্বগণ ও তাহাদের সমষ্টিভূত স্বরূপ-বৈশ্বানর স্থূলদেহের বা অন্নময়কোষের এবং বহিঃপ্রজ্ঞ জাগ্রতাবস্থার অভিমানী। বিশ্বগণ স্বতঃই পরস্পরের সঙ্গে অথবা বৈশ্বানরের সঙ্গে তদেকাত্মভাবে প্রবুদ্ধ ও অভিমানী নহেন। বৈশ্বানরের সেই তদেকাত্ম ভাবে সম্পূর্ণ প্রবোধ ও অভিমানের স্বতঃসিদ্ধতা হেতু, তাহার কায়ব্যূহের অন্তর্গত সমগ্র বিশ্বগণের গতির নিয়ামক ও বিধায়ক হইয়াছেন। বৈশ্বানর এই জন্য অন্নময় কোষানুগত যাবতীয় জাগ্রত জীবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং শুভাশুভ ফলাফলের বিধাতা। জীবের তন্দ্রাবস্থায় এবং মৃত্যু বা প্রলয়কালে বৈশ্বানর জাগ্রতাবস্থাপন্ন জীবগণকে ক্রোড়ে লইয়া তদীয় কারণাত্মক সূক্ষ্মদেহশায়ী হিরণ্যগর্ভ স্বরূপে বিলীন হইয়া থাকেন। বিশ্বগণ সহজ-সাধ্য মহৎ-সঙ্গ বা সাধনাদি দ্বারা যে পরিমাণে পরস্পরের সঙ্গে অথবা বৈশ্বানরের সঙ্গে তদেকাত্মভাবসমন্বিত হন, সেই পরিমাণে তাঁহারা উন্নত শক্তিসাধ্য সম্পন্ন ও বহিঃপ্রজ্ঞ হইয়া বৈশ্বানরের বা ঈশ্বরের স্বরূপত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

১৪। তৈজসগণ ও তাহাদের সমষ্টীভূত স্বরূপ হিরণ্যগর্ভ সূক্ষ্ম দেহের বা প্রাণাদি কোষত্রয়ের এবং অন্তঃপ্রজ্ঞ তন্দ্রা বা স্বপ্না-

বস্থার অভিমানী। তৈজসগণ স্বতঃই পরস্পরের সঙ্গে অথবা হিরণ্যগর্ব্ভের সঙ্গে তদেকাত্মভাবে প্রবুদ্ধ ও অভিমানী নহেন। হিরণ্যগর্ব্ভের এই তদেকাত্মভাবে সম্পূর্ণ প্রবোধ ও অভিমানের স্বতঃসিদ্ধতা হেতু তাঁহার কার্য্যব্যূহের অন্তর্গত সমগ্র তৈজসগণের গতির নিয়ামক ও বিধায়ক হইয়াছেন। হিরণ্যগর্ব্ভ এইজন্য প্রাণাদি কোষত্রয়াশ্রিত যাবতীয় স্বপ্নাবস্থিত জীবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও শুভাশুভ ফলাফলের বিধাতা। জীবের সুষুপ্ত্যাবস্থায় এবং প্রলয়কালে এই হিরণ্যগর্ব্ভ তন্দ্রাবস্থাপন্ন জীবগণকে ক্রোড়ে লইয়া তদীয় কারণাত্মক কারণদেহ-শায়ী ঈশ্বর বা সঙ্কর্ষণ স্বরূপে বিলীন হইয়া থাকেন। তৈজসগণ সহজ-সাধ্য, মহৎ-সঙ্গ বা সাধনাদি দ্বারা যে পরিমাণে পরস্পরের সঙ্গে অথবা হিরণ্যগর্ব্ভের সঙ্গে তদেকাত্মভাব সমন্বিত হন, সেই পরিমাণে তাঁহারা উন্নত শক্তিসাধ্য সম্পন্ন ও অন্তঃপ্রজ্ঞ হইয়া হিরণ্যগর্ব্ভের বা ঈশ্বরের স্বরূপত্ব লাভ করিয়া থাকেন। এই সূক্ষ্মদেহভূত প্রাণাদি কোষত্রয়কে লিঙ্গশরীর বলা হয়। এই সূক্ষ্মদেহকে সংস্কারদেহও বলা হইয়া থাকে; যেহেতু জীবের জাগ্রতাবস্থার যাবতীয় অর্জ্জিত, জ্ঞাত ও অনুষ্ঠিত কার্য্য কলাপাদি এই দেহে সংস্কারগত হইয়া থাকে এবং তাহার সাত্ত্বিক ও রাজসিক অন্তরঙ্গ বা ভাগবতীতনু এই সংস্কার দেহাবলম্বনে গঠিত হয়। নৈতিক আনুগত্য ও বাধ্যতা (moral obligation or conscience) এই সংস্কার দেহেই নিদানভূত থাকিয়া জীবনে প্রস্ফুটিত হয়। ইহাকে প্রারব্ধ দেহও বলা হয়, কেননা প্রারব্ধের যাবতীয় কর্ম্মফল অভ্যাস, সাধনা, শক্তি ও প্রতিভা এখানে সঞ্চিত থাকে। এই সমস্ত সঞ্চিত ও অভ্যস্ত শক্তি, সংস্কারাদি জীবকে তদীয় জাগ্রতাবস্থার নিয়মিত ও পরিচালিত করিয়া থাকে। তৈজস জীবের স্বপ্ন কখনও বদ্ধমূল সংস্কার ও অভ্যাস পুঞ্জকে অতিক্রম পূর্ব্বক উদয় হইতে দেখা যায় না। সেইজন্য সংস্কারদেহের স্বপ্নাবস্থায় জীবের বিশ্বাস, বৈরাগ্য শ্রদ্ধা-ভক্তি, নীতি-চরিত্র, সাহসিকতা, নির্ভীকতা ও জীতেন্দ্রিয়তার প্রকৃত গঠন হইয়াছে কি না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা হইয়া থাকে। অবশ্যই এ পরীক্ষা আত্ম সমক্ষেই সম্পাদিত হয়—সাধারণ জনগণের সমক্ষে নহে।

১৫। প্রাজ্ঞগণ ও তাহাদের সমষ্টিভূত স্বরূপ ঈশ্বর বা সঙ্কর্ষণ কারণদেহের বা আনন্দময় কোষের, এবং নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং সুষুপ্ত্যাবস্থার অভিমানী। প্রাজ্ঞগণ স্বতঃই পরস্পরের সঙ্গে অথবা তৎসমষ্টিভূত স্বরূপ সঙ্কর্ষণের সঙ্গে একাত্মভাবে প্রবুদ্ধ ও অভিমানী নহেন। সঙ্কর্ষণের এই তদেকাত্মভাবে সম্পূর্ণ প্রবোধ ও অভিমানের স্বতঃসিদ্ধতা হেতু তাঁহার কার্য্যব্যূহের অন্তর্গত সমগ্র প্রাজ্ঞগণের গতির নিয়ামক ও বিধায়ক হইয়াছেন। সঙ্কর্ষণ এইজন্য আনন্দময় কোষাশ্রিত যাবতীয় সুষুপ্ত জীবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং তাহাদের যাবতীয় শুভাশুভ ফলাফল বিধাতা। প্রাজ্ঞগণ সহজসাধ্য মহৎ সঙ্গ বা সাধনাদি দ্বারা যে পরিমাণে সাত্ত্বিকগতি এবং বৈরাগ্য ও ঔদাস্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যভাব আয়ত্ত করিয়া পরস্পরের সঙ্গে অথবা সঙ্কর্ষণের সঙ্গে তদেকাত্মভাব সমন্বিত, সেই পরিমাণে তাঁহারা শুদ্ধ সত্ত্ব ও উন্নত শক্তিসাধ্য সম্পন্ন হইয়া সঙ্কর্ষণের বা ঈশ্বরের স্বরূপত্ব লাভ করিয়া থাকেন। কোন কোন উপনিষদে এই কারণ দেহকে, নিরতিশয় বহনশীল-হেতু আতিবাহিক দেহ বলা

হইয়াছে। সূক্ষ্মদেহের সমস্ত গঠন এখানে প্রোথিতমূল হইয়া বৈজিকভাবে অবস্থাপিত। প্রাজ্ঞগণের এই ব্যষ্টিভূত কারণদেহ এক্ষণে প্রসুপ্ত মনবুদ্ধির বিশ্রামাগার—সমস্ত প্রসুপ্ত চিন্তা, ভাব ও কামনার সুগুপ্ত নিবাস ভূমি—সমস্ত সুষুপ্ত স্মৃতি, শিক্ষা, অভ্যাস, জ্ঞান, সংস্কার, শক্তি ও প্রতিভা এখানে পুঞ্জীকৃত ও ভাণ্ডারজাত হইয়া থাকে, এবং প্রয়োজনানুসারে সূক্ষ্ম বা স্থূল দেহগত হইয়া জীবনে উদিত হয়। সঙ্কর্ষণের এই কারণ দেহে যাবতীয় ব্যষ্টি স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে সৃষ্টির ক্রমবিকাশ কালে অব্যক্ত বীজাবস্থায় অবস্থিত থাকে এবং প্রলয়কালে তিনি যাবতীয় সূক্ষ্মদেহ তাঁহার কারণ দেহে অঙ্গীভূত করিয়া তদীয় কারণাত্মক উপাদান ঘনপ্রজ্ঞ মহত্তত্ত্বের প্রশান্তি বা পরিতৃপ্তি সমুদ্রে বিলীন হইয়া থাকেন।

১৬। এই অবিদ্যা কল্পিত কারণ দেহ, সূক্ষ্মদেহের আবরণের অভ্যন্তরে এবং সূক্ষ্ম দেহ স্থূলদেহের আবরণের অভ্যন্তরে ওতঃপ্রোতভাবে এবং প্রাণরূপে অবস্থাপিত। মহতাধারগত বা মায়াধিষ্ঠিত ঈশ্বর এইরূপে যাবতীয় স্থূলাদি দেহে এবং তন্মধ্যে কোথায় বা ব্যক্ত কোথায় বা অর্দ্ধব্যক্ত এবং কোথায় বা অব্যক্ত ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-সংস্থান বিশিষ্ট এবং জাগ্রতাদি ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন অসংখ্য অনন্ত জীবাভিমানের ব্যষ্টিভূত ও সমষ্টিভূত স্বরূপে একাত্মভাবে সমন্বিত ও সম্পূর্ণ প্রবুদ্ধ হইয়া ত্রিগুণাত্মক সর্ব্বগত মহান্ ও বর্দ্ধনশীল অভিব্যক্তি লাভ করিলেন এবং যাবতীয় জীবের যাবতীয় সংসারের নিয়ামক ও বিধায়ক হইয়া পরাৎপর শুদ্ধসত্ব যাবতীয় জ্ঞান ও শক্তির ছায়াময় আধাররূপে ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট হইলেন। এইরূপে এই ছায়াময় জগৎরূপ অধ্যাসে (phenomenal Universe এ) কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইয়া ছায়াময় জগতের ঈশ্বর সমষ্টিভূত ইন্দ্রিয়গ্রাম (phenomenal sensorim) সম্পন্ন প্রতিবিম্বে প্রতিবোধিত ও আত্মবুদ্ধি সমন্বিত হইয়া ছায়াময়ী স্ফূর্ত্তি লাভ করিলেন। ঈশ্বরের এই ঐশ্বরিক সত্বা, পরব্রহ্ম সত্বার প্রতিবিম্বিত অধ্যাসে প্রবুদ্ধ (phenomenal) সত্বা মাত্র। এই প্রতিবিম্বিত সত্বার উপরে সৃষ্টি পরিকল্পিত। মূলাধার সত্বার প্রতিবিম্বই সৃষ্টির কারণ ও সত্বা। সুতরাং মূলাধারস্থিত চিদানন্দঘন সমাধি-সমুদ্রশায়ী পরমাত্ম-সত্বাই সমস্ত সত্বার সত্বা, সমস্ত কারণের কারণ—"সর্ব্ব কারণঃ কারণং তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্।"

ক্রমশঃ

শ্রীকালীনাথ দত্ত।

শ্রীভগবদ্গীতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শুদ্ধ স্থানে আপনারে করি প্রতিষ্ঠিত
স্থিরাসনে—নহে অতি উচ্চ কিম্বা নীচ,
যাহা বস্ত্র চর্ম্ম কুশ—ক্রমেতে রচিত। ১১

(১১) শুদ্ধ স্থানে—স্বভাবতঃ বা সংস্কার জন্য শুদ্ধ, (শঙ্কর, মধু)। অশুচি ব্যক্তি বা বস্তু দ্বারা অস্পৃষ্ট—পবিত্র (রামানুজ)। জনহীন ভয়হীন গঙ্গাতট বা গিরি গুহাদি স্থানে (মধু)। বেদান্তসূত্রে আছে "যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ (৪।১।১১) যে স্থান চিত্তের একাগ্রতা জন্মাইবার উপযোগী, তাহাই যোগের উপযুক্ত স্থান—তাহাই শুদ্ধ স্থান।

শুদ্ধস্থান সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে এইরূপ নিয়ম আছে:—
শুভ দেশস্ততোগত্বা ফলমূলোদকান্বিতং।
তত্রস্থে চ শুচৌ দেশে নদ্যাং বা কাননেঽপিবা॥

সুশোভনং মঠং কৃত্বা সর্ব্বরক্ষাসমন্বিতঃ।
ত্রিকাল স্নান-সংযুক্ত সুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ॥
বাশিষ্টসংহিতা।

দূর দেশে তথারণ্যে রাজধান্যৌ জনান্তিকে।
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ সিদ্ধিহা ভবেৎ॥
অবিশ্বাসং দূরদেশে অরণ্যে ভক্ষ্যবর্জিতং।
লোকারণ্যে প্রকাশশ্চ তস্মাৎ ত্রীণি বিবর্জ্জয়েৎ॥
সুদেশে ধার্ম্মিকে রাজ্যে সুভিক্ষে নিরূপদ্রবে।
তত্রৈকং কুটীরং কৃত্বা প্রাচীরং পরিবেষ্টয়েৎ॥
নাত্যুচ্চং নাতি হ্রস্বঞ্চ কুটীরং কীটবর্জ্জিতং।
সম্যক্ গোময় লিপ্তঞ্চ কুড্যরন্ধ্র বিবর্জ্জিতং॥
এবং স্থানেষু গুপ্তেষু যোগাভ্যাসং সমাচরেৎ॥
ঘেরণ্ড সংহিতা।

স্থির—নিশ্চল।

আসন—যোগশাস্ত্রমতে "স্থিরসুখাসনং (পাতঞ্জল দর্শন ২।৪৬ সূত্র, ও সাংখ্যপ্রবচন ৩।৩৪ সূত্র) যোগ অভ্যাস কালে এরূপ ভাবে উপবেশন প্রয়োজন, যে তাহাতে কোনরূপ ক্লেশ না হয়, ও স্থির হইয়া বসিয়া থাকা যায়। উপবেশনকালে কর চরণাদি অঙ্গ বিন্যাস নানা ভাবে হইতে পারে। এজন্য আসনও নানারূপ। আসন ৮৪ প্রকার। তন্মধ্যে চারি প্রকার শ্রেষ্ঠ। আর সিদ্ধাসন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

চতুরশীত্যাসনানি শিবেন কথিতানি চ।
তেভ্য চতুষ্কমাদায় সারভূতং ব্রবীম্যহং॥
সিদ্ধং পদ্মং তথা সিংহং ভদ্রঞ্চেতি চতুষ্টয়ং।
হঠযোগ প্রদীপিকা।

যোগশাস্ত্রমতে এই আসন অভ্যাস দ্বারা শরীরের আরোগ্য, দৃঢ়তা, স্থিরতা ও সমাধির সাহায্য হয়।

বস্ত্র চর্ম্ম কুশ—কুশের উপরে চর্ম্ম, তাহার উপরে বস্ত্র বিছাইতে হইবে (স্বামী, শঙ্কর)। যোগ সংহিতায় আছে "মৃদ্বাসনোপরি কুশান্ সমাস্তীর্য্য অথবা অজিনং"। কিন্তু যোগ চিন্তামনিমতে গীতার অনুযায়ী—অগ্রে—কোমল কুশ তদুপরি মৃগ চর্ম্ম ও তাহার উপরে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া আসন প্রস্তুত করিতে হয়। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ২।১০ দ্রষ্টব্য)।

উচ্চ কিম্বা নীচ—পতন ভয়পরিহারার্থ আসন উচ্চ করিবে না। আর ভূতল পাষানাদির সংস্পর্শে বাতশ্লেষ্ম অগ্নি মান্দ্যাদি সম্ভব জন্য নিম্ন স্থানে আসন করিবে না। (গিরি)

বসি সে আসনে, মন একাগ্র করিয়া,
ইন্দ্রিয় চিত্তের ক্রিয়া করিয়া সংযত,—
আত্ম-শুদ্ধি তরে যোগ হইবে করিতে। ১২

(১২) একাগ্র করিয়া—সর্ব্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া (শঙ্কর)। বিক্ষেপ রহিত করিয়া (স্বামী)। অব্যাকুল হইয়া (রামানুজ)। রাজস্ তামস ও ব্যুত্থান নামক অবস্থাত্রয় পরিত্যাগ করিয়া, মনে ধারাবাহিক রূপে এক বিষয়ের ভাবনা অভ্যাস করিলে মন একাগ্র হয়। (মধু)।

যোগ—সমাধি অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অভ্যাস (মধু)।

আত্ম শুদ্ধি তরে—অন্তঃকরণের শুদ্ধি জন্য (শঙ্কর)। অন্তঃকরণ সর্ব্ব বিক্ষেপ শূন্য হইলে ও নির্ম্মল হইলে তবে অতি সূক্ষ্ম ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যোগ্য হয় (মধু, বলদেব)। শ্রুতিতে আছে—

"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্মযা সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥"

পাতঞ্জল দর্শনে আছে "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" এই চিত্তবৃত্তি যখন নিরোধ হয়, তখন আত্ম স্বরূপে অবস্থান হয়, "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং।" যোগ শাস্ত্র মতে আমাদের চিত্তবৃত্তি পাঁচরূপ—প্রমাণ, বিকল্প, বিপর্য্যয়, নিদ্রা, স্মৃতি। যোগ অনুষ্ঠান কালে এই সকল বৃত্তিরই নিরোধ করিতে হয়। ইহাই চিত্তের ক্রিয়া সংযত করা। তাহার পর মনকে কোন এক বিশেষ ধ্যেয় বিষয়ে ধারাবাহিক রূপে নিবিষ্ট করিতে হয়। আত্মশক্তি এইরূপে কেন্দ্রীভূত হইলে তবে প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হয়—(তজ্জায়তে প্রজ্ঞালোকঃ) তাহার কারণ যোগশাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে। যথা—

যথার্করশ্মি সংযোগাৎ অর্ককান্তো হুতাশনম্।
আবিষ্করোতি নৈকঃ সন্ দৃষ্টান্তঃ সতু যোগিনাম্।

অর্থাৎ সূর্য্য রশ্মিসকল যেমন Lense বা সূর্য্যকান্ত মনি দ্বারা কেন্দ্রীভূত হইয়া অগ্নিকে প্রকাশ করে—যোগের দ্বারা আমাদের সমুদয় শক্তি সেইরূপে একীভূত হইয়া আত্মাকে প্রকাশ করে।

যোগ চারি প্রকার—মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ ও হঠযোগ। ইহার মধ্যে রাজযোগ শ্রেষ্ঠ। অন্য যোগ ইহারই অন্তর্গত।

যোগ সাধনা ফলে মুক্তি হয়, অথবা বিভূতি লাভ

ধরিয়া সমান ভাবে কায় গ্রীবা শির,

অচল সুস্থির হয়ে, নাসাগ্রে আপন
রাখি দৃষ্টি, না নেহারি কোন দিক্ পানে, ১৩
শান্তচিত্ত—ভয়হীন—সংযত অন্তর,
ধরি ব্রহ্মচর্য্যব্রত, হবে যোগরত
হয়ে আমাগত চিত্ত—আমা পরায়ণ। ১৪

হয়। যোগের দ্বারা নির্ম্মল প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। কিন্তু গীতার এই স্থলে বলা হইয়াছে যোগের দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়। অর্থাৎ তাহার দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়—তখন সেই নির্ম্মল চিত্তে জ্ঞানসূর্য্য আপনিই প্রকাশিত হয়—প্রজ্ঞা লাভ হয়।

যোগের আট অঙ্গ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার. ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

অহিংসা, সত্য,অস্তেয়, আর্জ্জব, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য, মিতাহার ও দয়া—ইহাই যম।

জপ, তপ, দান,বেদান্ত শ্রবণ,আস্তিকভাব,ব্রত,ঈশ্বর পূজা,যথালাভে সন্তোষ,সুমতি ও লজ্জা—এই দশ নিয়ম।

এই যম নিয়ম অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। ইহা গীতায় বারবার উল্লিখিত হইয়াছে।

যম নিয়ম অভ্যাসের পর আসন আয়ত্ব করিতে হয়। 'ততোদ্বন্দানভিঘাতঃ—অর্থাৎ তাহা হইতে শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দবোধ দূর হয়। তাহা হইলেই পূর্ণ চিত্ত শুদ্ধি আয়ত্ব হয়।

ইন্দ্রিয় ক্রিয়া সংযত করা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করা। "স্ব স্ব বিষয় সম্প্রযোগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইতি ইন্দ্রিয়ানাং প্রত্যাহারঃ।" "ততঃ পরম বশ্যতে ইন্দ্রিয়ানাং"। (পাতঞ্জল-যোগ সূত্র)।

আসনের পর যে প্রাণায়াম সাধনা করিতে হয়—তাহা এস্থলে আর উল্লিখিত হয় নাই। চতুর্থ অধ্যায় ২৭, ২৮,২৯ শ্লোকে তাহার বিবরণ আছে। ঐ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

বেদান্তমতে যাহা নিদিধ্যাসন তাহাই যোগ। ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তি প্রবাহই নিদিধ্যাসন (মধু)। শাস্ত্রে আছে—

"ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তি প্রবাহো২হঙ্কৃতিং বিনা।
সংপ্রজ্ঞাত সমাধি স্যাদ্ধ্যানাভ্যাস প্রকর্ষতঃ॥"

এই ধ্যান সম্বন্ধেই গীতায় 'যোগী যুঞ্জীত সততং' "যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে" "যুক্ত আসীত মৎপর" প্রভৃতি বারবার বলা হইয়াছে (মধু)।

(১৩) সমান ভাবে কায় গ্রীবাশির—কায়-দেহ মধ্যভাগ; কায় গ্রীবাশির অর্থাৎ মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া মূর্দ্ধ পর্য্যন্ত। ইহা ঋজু ভাবে ও নির্ম্মল ভাবে স্থির ও দৃঢ় রাখিতে হইবে। (স্বামী, মধু)

যোগশাস্ত্র মতে আসনে উপবেশনের নিয়ম এইরূপ:—সমকায়, ও সমাসন হইয়া, চরণ দ্বয় সংহৃত করিয়া, মুখ-বিবর সংবৃত করিয়া, লিঙ্গ ও মুখ স্পর্শ না করিয়া, যোগরত ও স্থির হইয়া, মস্তক কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া, দন্তে দন্তে স্পর্শ না করিয়া, কোন দিক না দেখিয়া, স্বীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া, পৃষ্ঠবংশ উড্ডীয়ান করিয়া পদ্মাসনে কি সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইবে।"

অচল—অকম্প (মধু) কার্য্য কারণের বিষয় পরবশ শূন্য (গিরি)।

নাসাগ্রে রখি দৃষ্টি—অর্থাৎ দৃষ্টি এরূপ ভাবে রাখিতে হইবে, যেন নিজ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির হইয়া আছে। বাস্তবিক নাসিকা দেখিতে হইবে না। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে—না নেহারি অন্য দিক পানে। (শঙ্কর)। অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্র হইতে হইবে (স্বামী, মধু)।

(১৪) শান্ত চিত্ত—রাগাদি দোষ রহিত অন্তঃকরণ (মধু)।

ভয়হীন—শাস্ত্রে নিশ্চয় জ্ঞান বা পূর্ণ বিশ্বাস জন্য সকল সন্দেহবিহীন বুদ্ধি (মধু)। অথবা সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগ দ্বারা আত্মা যোগযুক্ত হওয়ায়—সিদ্ধি সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হওয়ায় ভয়হীন (মধু)।

সংযত অন্তর—মানসবৃত্তি উপসংহৃত (শঙ্কর)। সব বিষয়াকারাবৃত্তি শূন্য (মধু)।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত—গুরুশুশ্রূষা ভিক্ষা ভোজনাদি ব্রহ্মচারীর ব্রত (শঙ্কর; মধু), ইহা 'যমের এক অঙ্গ। পাতঞ্জল দর্শনে আছে "ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ"। এই ব্রহ্মচর্য্য কি, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

"কর্ম্মনা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বথা।
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষ্যতে॥

অথবা কায় মন বাক্যে মৈথুন বা স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগই ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান অঙ্গ। ইহার জন্য

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সঙ্কল্পো২ধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তিরেব চ॥'

এই রূপে সদা আত্মা করি যোগরত
সংযত অন্তর হয়ে—যোগী করে লাভ
আমাতে সংস্থিতি—শান্তি পরম নির্ব্বাণ।১৫

মৈথুনের এই অষ্ট অঙ্গই ত্যাগ করিতে হয়। ব্রহ্মচারীর পক্ষে স্ত্রীলোকের চিন্তাও পরিত্যাজ্য।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে আছে, যাহাকে যজ্ঞ বলে, ইষ্ট বলে,সত্রায়ণ বলে, মৌন বলে, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য।

হয়ে আমাগত চিত্ত—পরমেশ্বরগতচিত্ত (শঙ্কর)। সগুণ বা নির্গুণ আত্মাতে চিত্ত সমাহিত—অথবা আত্মা বিষয়ক ধারাবাহিক চিত্তবৃত্তিযুক্ত (মধু)।

আমা পরায়ণ—আমিই পরম পুরুষার্থ যাহার (স্বামী)। শ্রুতিতে আছে "স্ত্রী পুত্র ধন প্রভৃতি সকলের অপেক্ষা যিনি প্রিয়, যিনি সকলের অপেক্ষা অন্তরতম তিনিই আত্মা।"

(১৫) সংযত অন্তর—(মূলে আছে"নিয়ত মানসঃ) নিরুদ্ধ অন্তর (স্বামী, মধু), আত্মার স্পর্শ দ্বারা শুদ্ধি হেতু নিশ্চল চিত্ত (বলদেব)।

আমাতে সংস্থিতি—শান্তি পরম নির্ব্বাণ—যে শান্তি বা উপরতিতে মোক্ষই পরম নিষ্ঠা, তাহা আমার অধীনস্থ (শঙ্কর)। অর্থাৎ তাহা আমার স্বরূপ (গিরি)।

শান্তি বা উপরতি=সর্ব্ব সংসার নিবৃত্তি। আর আমাতে সংস্থিতি=ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান (গিরি)।

আমাতে সংস্থিতি, অর্থাৎ আমার স্বরূপে অবস্থিতি (স্বামী)। সর্ব্ববৃত্তি উপরতিরূপ প্রশান্তবাহী, তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইতে উৎপন্ন, অবিদ্যা নিবৃত্তি হেতু পরম মুক্তি পরিণাম, পরমাত্ম স্বরূপ পরমানন্দরূপ শান্তি তাহাই প্রাপ্ত হয়। নতুবা সংসারিক ঐশ্বর্য্য, যাহা অনাত্ম বিষয়ে সমাধি হেতু উৎপন্ন তাহা প্রাপ্ত হয় না, কেন না সে সকল উপসর্গ-মুক্তি পথের অন্তরায় (মধু)।

পাতঞ্জল দর্শনে আছে,যোগ লাভ হইলে বা সমাধি হইলে দ্রষ্টা স্বরূপে বা আত্ম স্বরূপে অবস্থিতি হয়। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

এই সমাধির লক্ষণ যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।—

"সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মা পরমাত্মনোঃ।
নিস্তরঙ্গ পদপ্রাপ্তিঃ পরমানন্দরূপিনী॥

কিন্তু অতিভোজী যেই, কিম্বা নিরাহারী,
অতি নিদ্রাশীল, কিম্বা সদা জাগরিত,—
হে অর্জ্জুন, ইহাদের নাহি হয় যোগ। ১৬

নিশ্বাসোচ্ছ্বাস মুক্তো বা নিস্পন্দোঽচললোচনঃ।
শিবধ্যায়ী সুনীলশ্চ স সমাধিস্থ উচ্যতে॥
ন শৃনোতি যথা কিঞ্চিৎ ন পশ্যতি ন জীঘ্রতি।
ন চ স্পর্শং বিজানাতি স সমাধিস্থ উচ্যতে॥"

এই শ্লোকোক্ত সমাধিকে মধুসূদন সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলিয়াছেন। সমাধি দুইরূপ। সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ ও অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বীজ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বিচার বিতর্ক আনন্দ ও অস্মিতাতে চিত্তের অভিনিবেশ হয়। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সকল চিন্তার বিরাম হয়, মনোবৃত্তির লয় হয়। 'অহং ইদং' এক হইয়া যায়। তখনই সর্ব্ব নিরোধ হইয়া যায়। সমাধিকে আবার সবিচার নির্ব্বিচার, সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক এইরূপেও বিভক্ত করা হয়। সমাধি সিদ্ধিও নানারূপে হয়। পাতঞ্জল দর্শনে আছে—জন্ম, ওষধি মন্ত্র তপঃ সমাধিজা সিদ্ধয়ঃ।" ইহার মধ্যে সমাধিজ সিদ্ধিই শ্রেষ্ঠ। যাহা হউক এস্থলে তাহার বিস্তারিত উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

(১৬) অতিভোজী নিরাহারী—যাহা ভুক্ত হইলে জীর্ণ হয় ও শরীরে কার্য্যক্ষমতা সম্পাদন করে, তাহাই আত্মসম্মিত অন্নের পরিমাণ(মধু)। গিরি বলেন, ইহা অষ্ট গ্রাস। ইহার অধিক বা অল্প আহার করা দোষ। শতপথব্রাহ্মণে আছে—

"যদু হ বা আত্ম সংমিতমন্নং তদবতি তন্নহিনস্তি।
যদ্ভুয়োহিনস্তি তদ্ যৎ কনীয়ো ন তদবতি॥"

মধুসূদন বলেন—অধিক আহারে অজীর্ণ দোষ হেতু ব্যাধি পীড়া উৎপন্ন হয়। আর অল্প আহারে শরীরের উপযুক্ত পোষণ অভাবে তাহা অক্ষম হইয়া পড়ে। যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে—

দ্বৌভাগৌ পুরয়েদন্নৈস্তোয়েনৈকং প্রপুরয়েৎ।
বায়োঃ সঞ্চারনার্থায় চতুর্থ মবশেষয়েৎ॥"

(৪ অধ্যায়ের ৩০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

নাহি হয় যোগ—মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে—

"নাধ্মাতঃ ক্ষুধিতঃ শ্রান্তোনচ ব্যাকুলচেতসঃ।
যুঞ্জীত যোগং রাজেন্দ্র যোগী সিদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ।
নাতিশীতে ন চৈবোষ্ণে ন দ্বন্দ্বে নানিলান্বিতে।
কালেষ্বেতেষু যুঞ্জীত ন যোগংধ্যানতৎপরঃ।"

নিয়মিত হয় যার আহার বিহার,
নিয়মিত কর্ম্ম চেষ্টা, স্বপ্ন জাগরণ
নিয়মিত—যোগ তার হয় দুঃখহারী। ১৭
যখন সংযত চিত্ত,—হয় অবস্থিতি
আত্মাতে কেবল,—হয়ে সর্ব্বকাম হতে
স্পৃহাহীন—সেই কালে কহে যোগরত।১৮
দীপ নহে বিকম্পিত বায়ুহীন দেশে,—
উপযুক্ত এ উপমা যোগীজন প্রতি
যিনি চিত্তজয়ী আত্মযোগেতে নিরত। ১৯
যাহে চিত্ত উপরত—নিরুদ্ধ হইয়া
যোগের সেবায়; যাহে শুধু আত্মবলে
আত্মাকে হেরিয়া রহে সন্তুষ্ট আত্মাতে; ২০

যোগ সম্বন্ধে অন্য নিয়ম যোগশাস্ত্রে এইরূপ আছে;—

পুষ্টং সুমধুরং স্নিগ্ধং গব্যং ধাতু প্রপোষণং।
মনোঽভিলাষিতং যোগ্যং যোগী ভোজন মাচরেৎ॥
ত্যজেৎ কটূম্ল লবনং ক্ষীরভোজী সদাভবেৎ॥
* * *
"অম্লং রূক্ষং তথা তীক্ষ্ণং লবণং সর্ষপং কটু।
বাহুল্যং ভ্রমণং প্রাতস্নানং তৈলং বিদাহকং॥
কাঠিন্যং দুষিতঞ্চৈব মুক্তং পর্য্যুষিতং তথা।
অতি শীতোষ্ণাতিচোগ্রং ভক্ষং যোগী বিবর্জ্জয়েৎ॥
প্রাতঃ স্নানোপবাসাদি কায়ক্লেশবিধং তথা।
একাহারং নিরাহারং প্রাণান্তেঽপি ন কারয়েৎ॥

(১৭) নিয়মিত আহার—পরিমিত আহার। পরিমিত আহার কি তাহা উপরের উল্লিখিত হইয়াছে।

বিহার—গতি, পাদক্ষেপ (শঙ্কর, স্বামী)। বিহারস্তু নিয়তত্বং যোজনান্ন পরং গচ্ছেৎ (গিরি, মধু)। অর্থাৎ এক যোজন বা চারি ক্রোশের অধিক এক কালে যাইবে না।

কর্ম্ম চেষ্টা—প্রণব যপ, উপনিষৎ আবর্ত্তনাদি কর্ম্ম (মধু)। লৌকিক পারমার্থিক কর্ম্মে বাক্য প্রভৃতি ব্যাপার পরিমিত (বলদেব)।

স্বপ্ন জাগরণ নিয়মিত—রাত্রিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম ও শেষ ভাগ জাগরণ করিতে হয়, আর মধ্যে নিদ্রা যাইতে হয়। ইহাই যোগ শাস্ত্রের নিয়ম (মধু)। প্রথমতঃ দশ ঘটিকা পরিমিত কাল জাগরণ,মধ্যে দশঘটিকা বা দশ দণ্ডকাল নিদ্রা, পুনর্ব্বার দশ ঘটিকা পরিমিতকাল জাগরণ ইহাই নিয়ম (গিরি)।

দুঃখহারী—সর্ব্বসংসার দুঃখ ক্ষয়কারী (শঙ্কর) আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখহারী (গিরি) সর্ব্বদুঃখ কারণ অবিদ্যার উন্মুলনের হেতু (মধু)।

এই স্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, যোগ অভ্যাস জন্য কঠোর সাধনার প্রয়োজন নাই। তাহার জন্য আহার বিহার নিদ্রা প্রভৃতি ত্যাগ বা অত্যন্ত অল্প কবিবার আবশ্যক নাই। সাধারণ বিশ্বাস আছে যে, যোগ অভ্যাস জন্য হিন্দুদের কঠোর সাধনার নিয়ম ছিল। বুদ্ধদের সেই নিয়মে ছয় বৎসর সাধনা করিয়া শরীর মন নিস্তেজ ও অবসন্ন করেন। তাহার পর সেইরূপ কঠোর সাধনা ত্যাগ করেন। গীতার এই শ্লোক হইতে সেই বিশ্বাস দুর হইতে পারিবে।

(১৮) সংযত চিত্ত—চিত্ত একাগ্রতা প্রাপ্ত (শঙ্কর)। নিরুদ্ধ (স্বামী)। মধুসূদন বলেন, চিত্তের একাগ্রতা অবস্থায় যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়—পূর্ব্বে তাহার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি চিত্ত একেবারে নিরুদ্ধ হইলে যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়—এস্থলে তাহার বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

যখন পরা বৈরাগ্য বশতঃ চিত্তকে বিশেষ রূপে নিয়মিত বা সর্ব্ববৃত্তি শূন্য করা যায়, যখন চিত্তের রজস্তম মলা দুর হওয়ায় অন্তঃকরণ স্বচ্ছ হয়—সর্ব্ব বিষয়াকার গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, সর্ব্বতোভাবে নিরুদ্ধবৃত্তি হইয়া আত্মাতেই চিত্ত স্থির হয়, বিষয়ের প্রতি আর অনুরক্তি থাকে না তখন সংযতচিত্ত হওয়া যায় (মধু)।

সর্ব্বকাম হতে—সর্ব্ব দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয় হইতে স্পৃহা বা তৃষ্ণা বিরহিত (শঙ্কর, মধু)।

সেই কালে—সেই সর্ব্ববৃত্তি নিরোধ কালে (মধু)।

(১৯) উপযুক্ত এ উপমা—যেমন বাতাস বন্ধ হইলে দীপ স্থির হয়, তেমনি চিত্ত সংযত হইলে তাহার চাঞ্চল্য দুর হয় (স্বামী)।

চিত্তজয়ী আত্মযোগেতে নিরত—যে যোগী সম্প্রজ্ঞাত সমাধিযুক্ত হইয়া অভ্যাস বলে চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিয়াছেন, তিনি ক্রমে সর্ব্ব চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক অসম্প্রজ্ঞাত সামাধি রূপ যোগ অনুষ্ঠান করেন। তিনি চিত্তের একাগ্রতা অবস্থা হইতে নিরোধের অবস্থা লাভ করেন। (মধু)।

(২০) যোগের সেবায়—যোগ অনুষ্ঠান দ্বারা (শঙ্কর), যোগ অভ্যাস দ্বারা (মধু, স্বামী)।

নিরুদ্ধ—একবৃত্তিপ্রবাহ রূপ একাগ্রতা প্রাপ্ত(মধু)।

যাহে—(মূলে আছে "যত্র") যেই কালে (শঙ্কর) যেই যোগে (রামানুজ) যে অবস্থা বিশেষে (স্বামী, মধু)। যেই সমাধি কালে(গিরি)। মধুসূদন বলিয়াছেন, এ স্থলে "যেই কালে" ব্যাখ্যা অসাধু। তিনি শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যকে প্রায়ই সর্ব্বত্র অনুগমন করিয়াছেন। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন "আমার সহিত কি ভাষ্যকারের তুলনা হয়? এক তুলাদণ্ডে স্বর্ণ ও কুচ পরিমিত হইলেও কি তাহারা তুল্য? (৬।১৪ শ্লোকের মধুসূদন কৃত টীকা দ্রষ্টব্য।) কিন্তু এস্থলে মধুসূদন ভাষ্যকারের অনুবর্ত্তী হইতে পারেন নাই।

উপরত—সর্ব্ব বৃত্তিনিরোধরূপ—পরিণতি (মধু)।

আত্মবলে—সমাধি পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণে (শঙ্কর, স্বামী বলদেব)।

বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সুখ অত্যধিক
যাহে হয় অনুভূত ; যাহে স্থির হলে,
তত্ত্ব হ'তে আর নাহি হয় বিচলিত ; ২১
যাহে লভি জ্ঞান হয়, নাহি ইহা হতে
অন্য লাভ গুরুতর ; যাহে স্থির হলে,
দারুণ দুঃখেও নাহি হয় বিচলিত ;—২২

জান' তাহে কহে যোগ,—দুঃখের সংযোগ
নাহি তাহে : হেন যোগ নিশ্চয় হইয়া,
নির্ব্বেদ-বিহীন-চিত্তে হইবে করিতে। ২৩

ক্রমশঃ

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

আত্মাকে হেরিয়া—সর্ব্বত্র জ্যোতিস্বরূপ পরা-চৈতন্যকে হেরিয়া (শঙ্কর), সচ্চিদানন্দঘন, অনন্ত, অদ্বিতীয়, চৈতন্যময় পরমাত্মাকে বেদান্ত প্রমাণজ বৃত্তি দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া (মধু)।

এই শ্লোক হইতে ২৩ শ্লোক পর্য্যন্ত একত্র গ্রহণ করিতে হইবে। স্বামী বলেন, পূর্ব্বে কর্ম্ম প্রভৃতিকে যোগ বলা হইয়াছে—সে গৌণার্থে, এস্থলে মুখ্য যোগ যে সমাধি, তাহাই বিবৃত হইতেছে।

মধুসূদন বলেন, পূর্ব্বে সামান্য বা সাধারণ ভাবে সমাধির কথা বলিয়া এস্থলে নিরোধ (অসম্প্রজ্ঞাত) সমাধির বিষয় বিস্তারিত বলা হইয়াছে। গিরিও বলেন, পূর্ব্বে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা উক্ত হইয়াছিল, এই স্থলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

(২১) বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়—যাহা ইন্দ্রিয়-গোচর নহে, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা কেবল বুদ্ধির দ্বারাই উপভোগ করা যায় (শঙ্কর)। যাহা বিষয় সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের অতীত। কেবল আত্মাকার বুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্য (স্বামী বলদেব)। যাহা রজস্তম মলা রহিত সত্ত্বমাত্র বাহিনী বুদ্ধি দ্বারা জানা যায়। সুষুপ্তিতে চিত্ত বুদ্ধিতত্ত্বে লীন হয়। সেই সময় যে সুখ অনুভব হয়, সেইরূপ (মধু)।

সুখ অত্যধিক—পূর্ব্ব শ্লোকে যে আত্মাতে সন্তুষ্ট থাকিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহাই এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে (মধু)। অনন্ত সুখ (শঙ্কর)। নিত্য সুখ (স্বামী) নিরতিশয় ব্রহ্মরূপ অনন্ত সুখ (মধু)। এখানে সুখ অর্থে আনন্দ বোধ হয়। ব্রহ্ম আনন্দময়। ব্রহ্মে অবস্থান করিতে পারিলে এই অসীম আনন্দ অনুভব হয়। শ্রুতিতে আছে—

"সমাধি নির্ধৌতমলস্য চেতসো
নিবেশিতস্যাত্মনি যৎসুখং ভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা
যদেতদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥"

সর্ব্ববৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই এই সুখ লাভ হয়।

তত্ত্ব হতে—তত্ত্ব বা আত্মস্বরূপ হইতে (শঙ্কর)।

(২২) দুঃখ—শস্ত্র নিপাতাদি লক্ষণ যুক্ত মহৎ দুঃখ (শঙ্কর, মধু)। শীতোষ্ণাদি দুঃখ (স্বামী)। সাংখ্য-মতে দুঃখ ত্রিবিধ, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

(২৩) যোগ—চিত্তবৃত্তি নিরোধাত্মক যোগ (শঙ্কর), দুঃখের সংস্রব—দুঃখ অর্থে এস্থলে বৈষয়িক দুঃখ মিশ্রিত সুখকেও বুঝাইতেছে (স্বামী)। দুঃখের সংস্পর্শমাত্র বিরহিত (স্বামী)। যে অবস্থায় দুঃখের সংযোগ ধ্বংশ হইয়াছে (বলদেব)। সাংখ্যদর্শন মতে ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। যোগ সিদ্ধি হইলে সেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

নিশ্চয় হইয়া—অধ্যবসায় দ্বারা(শঙ্কর)। শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ জনিত নিশ্চয় বুদ্ধিতে (মধু, স্বামী)।

নির্ব্বেদ বিহীন চিত্তে—(মূলে আছে, ('অনির্ব্বিণ্ন চেতসা')। যোগ সাধনার ন্যায় কষ্টকর কিছু নাই, একদিন সাধনায়ও সিদ্ধ হইল না—এইরূপ অনুতাপকে নির্ব্বেদ বলে (মধু)। মনে করিতে হইবে যে সাধনায় এ জন্মে সিদ্ধ না হয় ক্ষতি নাই, জন্মান্তরে সিদ্ধ হইতে পারে (মধু)। গৌড়পাদ বলিয়াছেন—

"উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রে নৈকবিন্দুনা।
মনসা নিগ্রহস্তদ্বৎ ভবেৎ অপরিবেদতঃ॥"

মধুসূদন এস্থলে পক্ষী কর্ত্তৃক অণ্ডাপহারী সমুদ্রের শোষণ বিষয়ে পৌরাণিক গল্প উল্লেখ করিয়া এই কথা বুঝাইয়াছেন।

অধিকারীভেদে যোগ সাধনার নিয়মের প্রভেদ আছে। সাধনার কালেরও প্রভেদ আছে। কেহ যত্ন করিয়া অল্প কাল মধ্যে যোগসিদ্ধ হইতে পারেন। কাহারও অধিক কাল লাগে। কাহার একজন্মে সিদ্ধই হয় না। যোগসূত্রে আছে, 'তীব্রসংযোগানাম্ আসন্নঃ।" অমৃতসিদ্ধি গ্রন্থে আছে—যোগের কোন একটী অবস্থা লাভ করিতে কাহার ১২ বৎসর, কাহার ৮ বৎসর, কাহার বা ৬ বৎসর লাগে; কাহার তিন বৎসর মধ্যেই সিদ্ধি হয়। আর যাহারা

'ব্যাধিতা দুর্ব্বলা বৃদ্ধা নিঃসত্ত্বা গৃহবাসিনঃ।
মন্দোৎসাহা মন্দবীর্য্যা জ্ঞাতব্যা মৃদবো নরাঃ॥

এরূপ লোকে সহজে যোগ সাধনা করিতে পারে না। কিন্তু কোন অবস্থাতেই বিরক্ত হইয়া যোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে (মধু)।

পারস্য ভাষা এবং ফার্দ্দোশী।

বাঙ্গালীর অনেক দোষের মধ্যে একটী প্রধান দোষ এই যে, প্রাচীন সাহিত্যের (classics) আলোচনায় বাঙ্গালী বড়ই অমনোযোগী। বাঙ্গালাদেশে বর্ত্তমান সময়ে বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত (Linguist) নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কেবল বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিখিয়াই বাঙ্গালী সন্তুষ্ট থাকেন, পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্যের সৌন্দর্য্যে তিনি অন্ধ। ইহা বড়ই বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় বলিতে হইবে। ঔদাস্য বা অপটুতা ইহার কারণ। অপটুতা শব্দটা ব্যবহার করিলে বোধ হয় অন্যায় ও অসত্য কথা বলা হয়; যে দেশে সপ্তদশ বর্ষীয়া বালিকা ফরাসী ভাষায় অতুল পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া ফ্রেঞ্চ ভাষায় কাব্য লিখিতে পারেন, যে দেশে অষ্টাদশ বর্ষীয় ব্রাহ্মণ বালক ৬২ পৃষ্ঠা পূর্ণ এক সংস্কৃত কবিতা গ্রন্থ অনর্গল লিখিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছে, যে দেশে তের বৎসরের বালিকা পারস্য ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে শিখিয়াছে, যে দেশের পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা হিন্দী মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকার কার্য্য করিতে সক্ষমা হইয়াছে, সে দেশের লোককে প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় বা প্রাচীন ভাষার শিক্ষায় "অপটু" বলিলে বোধ হয় অসত্য ও অন্যায় কথা বলা হয়। বাঙ্গালীর আলস্য ও অমনোযোগীতাই প্রাচীন সাহিত্যের অনালোচনার মুখ্য কারণ। স্পেন্‌সার বলেন,—

"যে দেশে মাতৃভাষার সহিত পুরাতন ও প্রয়োজনীয় ভাষা সমূহের আলোচনা হয় এবং দেশের লোকেরা পরকীয় ভাষার অধিকার লাভের জন্য আগ্রহ প্রদর্শন করে, সে দেশের নানা কারণে অল্পকাল মধ্যে উন্নতি হইয়া থাকে। বহু ভাষায় পণ্ডিত হইলে বহুল জাতির চরিত্র ও সমাজ বুঝিতে পারা যায় এবং আপনার ভাষা, সাহিত্য, দেশ, সমাজ ও ধর্ম্মকে পরিশুদ্ধ ও প্রোন্নত অবস্থায় রাখিতে সক্ষম হওয়া যায়।"

রাজনীতিশাস্ত্র-বিশারদ মেকিয়াভেলিরও ইহাই মত ছিল। সার উইলিয়ম হণ্টার লিখিয়াছেন "বিদেশীয় ভাষার মধ্যে ইংরাজী ভিন্ন আর কোনও ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করার জন্য বাঙ্গালী বিখ্যাত হয় নাই।" হণ্টার সাহেবের মন্তব্য সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়। রেভরেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা পাদ্রী গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভিন্ন কতকগুলি ভাষায় অধিকার লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বঙ্গ সমাজে অতি বিরল। বাঙ্গালীর মধ্যে গুজরাটী, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গী, মালায়ালম (মালাবার উপকূলের) ভাষায় একজনও পারদর্শী দেখি নাই। অধিক কি, উর্দ্দু ভাষা— যাহা এক্ষণে সমগ্র ভারতের 'সাধারণ ভাষা' (জবান্-এ-আম্ অর্থাৎ Lingua Franca) বলিয়া পরিগণিত—তাহাতেও বাঙ্গালীর বিশেষ মনোযোগ দেখি নাই। বাঙ্গালা দেশে ইংরাজী এবং বঙ্গভাষা ও তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ সংস্কৃতের আলোচনা ব্যতীত অন্য ভাষার চর্চ্চা একেবারেই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালীর প্রত্নতত্ত্ব ইংরাজী গ্রন্থের সীমায় নিবিষ্ট। বাঙ্গালা দেশে তের সহস্র লোকের মধ্যে একজনও হিন্দী বা উর্দ্দু জানে না, ২৬ সহস্রের মধ্যে একজনমাত্র অতি অবিশুদ্ধ ও জঘন্য হিন্দী বলিতে পারে। ৪০ সহস্রের মধ্যে একজন বিশুদ্ধ হিন্দী জানে এবং ৫৬ সহস্রের মধ্যে একজন

ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা করিয়া উর্দ্দু বলিতে পারে। সাত লক্ষের মধ্যে একজনও পারস্ত ভাষায় পারদর্শী নহে। ৩৫ লক্ষের মধ্যে এক জনও আরব্য জানেনা। উপরে যে হিসাব দেওয়া গেল, ইহা বঙ্গদেশের সীমান্তবর্ত্তী বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানের একত্র সমষ্টিতে প্রয়োজিত হয়। বাঙ্গালা দেশের বাহিরে যাঁহারা বাস করেন (যথা অযোধ্যা, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্যভারত, প্রভৃতি) তাঁহাদের হিসাব স্বতন্ত্র, কিন্তু তাঁহাদের অবস্থাও অতীব লজ্জাজনক। বাঙ্গালা দেশের সীমাভ্যন্তরে বাঙ্গালী হিন্দু আদৌ উর্দ্দু বলিতে পারেনা; হিন্দীতে যাহা কিছু বলে, তাহা অবিশুদ্ধ এবং অর্দ্ধ হিন্দী ও অর্দ্ধ বাঙ্গালা, ইহাকে "দরোয়ানী হিন্দী" বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালা দেশের বাহিরে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের শতকরা এক জন বিশুদ্ধ উর্দ্দু এবং শতকরা দুইজন বিশুদ্ধ হিন্দী বলিতে সক্ষম হয়। সংখ্যায় এত কম হইবার কারণ এই যে, বাঙ্গালী (ইংরাজী ভিন্ন) পরকীয় ভাষায় মনোযোগী নহে। তিন চারি পুরুষ হইতে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বাস করিতেছে, অথচ শুদ্ধ উর্দ্দু বলিতে পারে না, এমন শত সহস্র বাঙ্গালীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইহা বড়ই লজ্জার কথা। পশ্চিমে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের ৫শতের মধ্যে একজনও পারস্ত শিখিয়াছেন কি না সন্দেহ। এখনকার বিদেশী বঙ্গযুবারা কলেজে উর্দ্দু ও পারস্ত শিখিতেছে বটে, কিন্তু কথোপকথনে এখনও বিশেষ পটু হয় নাই। যাহারা কথোপকথনে পটু, তাহাদের অনেকে আবার উর্দ্দু বা পারস্তভাষা লিখিতে পটু নহে। স্কুল কলেজ ভিন্ন লেখার অভ্যাস বড়ই কম থাকে। বাঙ্গালী যুবাকে ইংরাজী ও বাঙ্গালায় প্রায় সকল কাজই করিতে হয়, সুতরাং লেখায় অভ্যাস কিরূপে থাকিতে পারে?

এক সময়ে পারস্ত ও উর্দ্দু বাঙ্গালা দেশে বিশেষ প্রচার ছিল। সে সময়ের লোক এখন প্রায়ই নাই। তখনকার বাঙ্গালীরা কথায় কথায় গোলেস্তা ও দেওয়ান হাফেজের কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দৃষ্টান্ত দিতেন। ইংরাজী ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালা দেশে পারস্ত ও উর্দ্দুর চর্চ্চা বন্ধ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে উর্দ্দু ও পারস্ত, বাঙ্গালা দেশের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের "ভাষা" (Court language) ছিল। এখন বাঙ্গালায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষা আদালতে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যবন ভাষার চর্চ্চা বন্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালার মুসলমান সমাজের মাতৃভাষা এখন বাঙ্গালা, ইহাঁদের সহস্রের মধ্যে, বোধ হয়, দশজনও আরব্য ভাষায় কোরাণ বুঝেন না। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা মাদ্রাশায় পড়িয়াছেন, অথবা সহরে বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে অবশ্য অনেকে ভাল উর্দ্দু বলিতে পারেন এবং 'মৌলবী' সম্প্রদায়ের লোক ভিন্ন পারস্ত ভাষার চর্চ্চা বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যেও নাই। ইহা বড়ই লজ্জার কথা বলিতে হইবে। পারস্ত ভাষার চর্চ্চা নানা কারণে আমাদের পক্ষে হিতকারিণী। মুসলমানের সহিত হিন্দুর এত দৃঢ় সম্বন্ধ যে, মুসলমানের ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্র, সামাজিক চরিত্র, সাহিত্য ও ইতিহাস না বুঝিলে আমরা আমাদের নিজের অনেক কথা বুঝিতে পারি না। মুসলমানেরা এ দেশে প্রায় এক সহস্র বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, আমাদের সমাজের অস্থিতে অস্থিতে মুসলমান সমাজের ছায়া এখনও লাগিয়া রহিয়াছে। মুসলমানের সাহিত্য না বুঝিলে, মুসলমানের সাহিত্য না পড়িলে,

"মুসলমান"কে আমরা বুঝিতে পারি না। মুসলমানের সাহিত্য পারস্য ভাষায় লিখিত, এই ভাষা প্রাচীনা, মধুময়ী এবং নানা বিপুল ও বিশিষ্ট গ্রন্থের ভাণ্ডার। এই সুবিশাল সাহিত্যকে বুঝিলে মুসলমানকে বুঝা যায়। এই ভাষার আলোচনায় আমরা জগতের অনেক প্রাচীন ইতিহাসতত্ত্ব প্রাপ্ত হই; এই ভাষার আলোচনায় আমরা প্রত্নতত্ত্বের বিশেষ সহায়তা লাভ করিতে পারি। পারস্য, আরব্য, তুর্ক, তাতার, মিশর, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, সোয়াট, কুর্দ্দীস্থান, জাঞ্জীবার, আফ্রীপার, বোগদাদ প্রভৃতি জগতের সভ্য জনপদ সমূহের ঐতিহাসিক বিবরণী এবং এই বীরপ্রসবিনী ভূমি সমূহের ভৌগলিক বৃত্তান্ত জানিতে হইলে, বিশেষতঃ অগ্নি উপাসক "ফার্শী"দিগের ইতিহাসে অধিকার লাভ করিতে হইলে, মধ্য আসিয়ার (জগতের মানবজাতির উৎপত্তি স্থানের) অতি প্রাচীন তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে হইলে, পারস্য ভাষার চর্চ্চা ভিন্ন অন্য কোনও উপায় আছে বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্য বলিতেছি, পারস্য সাহিত্যের আলোচনা বাঙ্গালীর পক্ষে বড়ই শ্রেয়স্কর। এই পারস্য ভাষা আরব্য ভাষা হইতে সমুৎপন্না; পারস্য বহুল ভাষার প্রসূতি। তুর্কী, তাতারী, উর্দ্দু, পস্তু, কাফিরিস্থানী, কুর্দ্দী, দাদ্রী, পশিয়ারী, বেলুচী, বিরায়ী, প্রভৃতি নানা প্রকারের ভাষা পারস্য ভাষাতরুর শাখা মাত্র। এইরূপে দেখান যাইতে পারে, পারস্য ভাষায় অধিকার লাভ করিলে বহুভাষায় অধিকার জন্মিয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, বঙ্গ সমাজে এই ভাষার চর্চ্চা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া পারস্য সাহিত্যের উপকারিতা ও সৌন্দর্য্য তাঁহাদিগকে সহজে এখন বুঝাইয়া উঠা কঠিন। বলা বাহুল্য, পারস্য ভাষা কঠিন নহে, শিখিতে সহজেই প্রবৃত্তি জন্মে; কিঞ্চিৎ উর্দ্দু—অন্ততঃ কিঞ্চিৎ হিন্দী—শিখিয়া পার্শী শিখিলে সহজেই পারস্যভাষা আয়ত্ত হইয়া উঠে।

পারস্যভাষায় অনেক ভাল ভাল লেখক আছেন। ইহার সাহিত্য অতি বিশাল এবং প্রাচীন। ফার্শী সাহিত্যে কবি ফার্দ্দোশী মহা প্রসিদ্ধ। ফার্দ্দোশীর গ্রন্থাবলী আদ্যন্ত পদ্যে রচিত। পারস্য সাহিত্যাকাশে ফার্দ্দোশী মধ্যাহ্ন সূর্য্য। আমরা এই প্রস্তাবে কবিবর মোলানা সেখ ফার্দ্দোশীর জীবন চরিত্র এবং অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। *

ফার্দ্দোশীর কাব্যের আকার লইয়া বিচার করিলে, তাঁহাকে ইরাণের হোমর বলা যাইতে পারে। মামুদ গজনির সভায় তিনি যেরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিলেন, সেই ব্যবহারের বিষয় বিবেচনা করিলে তাঁহাকে স্পেন্সার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কুইন আলিজাবেথের সভায় লর্ড শিশিলের প্ররোচনায় স্পেন্সার যেরূপে ব্যবহৃত হয়েন, হোসেন মেমি-

* সেখ সাদির ও ফার্দ্দোশীর গ্রন্থাবলী নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষাতেও তাঁহাদের কয়েকখানি গ্রন্থ অনুবাদিত দেখা যায়। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডফরিণ পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন "ফার্দ্দোশীর কাব্যের কোনও কোনও অংশ মিলটনের সমতুল্য। কোনও কোনও চরিত্রের বর্ণনা সেক্‌স্‌পিয়রের বর্ণনাপেক্ষা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী ও স্বাভাবিক।" আগ্রার মুন্সী আবদুল করিমের নিকট মহারাণী শ্রীশ্রীমতী ভিক্‌টোরিয়া সেখ সাদির 'গোলেস্তা' ও 'বোস্তা' পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন "যে দেশে এরূপ গ্রন্থাবলী আছে, সে দেশের সমাজ ও সাহিত্যকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন বলা যাইতে পারে।"

দির প্ররোচনায় ফার্দ্দোশী গজনি সভায় ঠিক সেইরূপে ব্যবহৃত হয়েন। গজনি সভা হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি যে অবস্থায় পতিত হন, তাহা ঠিক ইটালীর ডাণ্টে কবির জীবনের সহিত মিলে। আদিরসে তিনি বিদ্যাপতি, বিরহ বর্ণনায় তিনি ভারতচন্দ্র এবং করুণ রসে তিনি বাল্মিকী। ফর্ব্বিশ সাহেব লিখিয়াছেন "নানা ভাষায় অধিকার থাকায় ফার্দ্দোশীর গ্রন্থে নানা দেশের নানা ভাব আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক জ্ঞানে তিনি বড়ই পণ্ডিত ছিলেন।" হামিলটন বলেন "অত্যুক্তি বর্ণনার দোষ বাদ দিলে ফার্দ্দোশী অতি উচ্চশ্রেণীর কবি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।" মশুর বোর্ডো বলেন কবিতাদেবী ফার্দ্দোশীর মিত্র ছিল।" ফার্দ্দোশী শব্দের অর্থ "স্বর্গজ"*। ইহাঁর অন্য নাম তুশী †। ইনি খ্রীষ্টীয় ৯৩৯ অব্দে কিয়ানিয়ান বংশে খোরাসান প্রদেশের তুশ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়ক্রম হইতে আরব্য ও পেল্‌বী ভাষায় তাঁহার পিতা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ২৬ বৎসর পর্য্যন্ত এই দুই ভাষা তিনি শিক্ষা করিয়া অতুল পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি তাঁহার জগদ্বিখ্যাত "সাহনামা" কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমাগত ৩৫ বৎসর কাল চিন্তা ও পরিশ্রম করিয়া ৭১ বৎসর বয়সে ফার্শী মৌল মাসের ২৫ তারিখে (খ্রীষ্টীয় ১০১০ অব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে) সাহানামা সমাপ্ত করেন। গ্রন্থের প্রথমে তিনি জোহাক ও ফরিদোণ নামক দুই ব্যক্তির বর্ণনা লিখিয়াছেন, এই গ্রন্থ হইতেই সার ওয়ালটর স্কট সাহেব তাঁহার বিখ্যাত "টালিশ্‌মান" পুস্তকে উহাঁদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী গ্রহণ করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্যের সভার কালিদাসের ন্যায় মামুদের সভায় ফার্দ্দোশী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন। ফার্দ্দোশীর ৫৮ বৎসর বয়ঃক্রমে সম্রাট মামুদের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। মামুদের উৎসাহে তিনি সাহনামা সমাপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গ্রন্থের কবিতার সংখ্যা ৬০ সহস্র। গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে সম্রাট, রাজকবিকে (ফার্দ্দোশীকে Poet Laureate) ৬০ সহস্র আয়্‌কাল্‌ দিনার (স্বর্ণ মোহর) অর্থাৎ এখনকার প্রায় ৭॥০ লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবার অনুমতি দেন, কিন্তু মন্দবুদ্ধি মন্ত্রী হোসেন মেমেন্দির পরামর্শে ফার্দ্দোশীর ভাগ্যে কেবল ৩ লক্ষ টাকা মিলিয়াছিল। কবিবর স্পেন্‌সারের ভাগ্যেও তাহাই ঘটে। একদিন কুইন আলিজাবেথ স্পেন্‌সারের কবিতা শ্রবণ করিয়া সন্তোষ সহকারে তাঁহাকে একশত পৌণ্ড পুরস্কারের আদেশ দেন, লাট শিশিল হিংসাপরবশ হইয়া তাহা দিতে দেন নাই। প্রথিত আছে, স্পেন্‌সার এক সপ্তাহ কাল পরে রাজ্ঞী আলিজাবেথের নিকটে গিয়া কবিতায় বলেন—

I was promis'd on a time
To have reason for my rhyme
From that time unto this reason
I received nor rhyme nor reason".

আলিজাবেথ ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হয়েন

*"The Muses were, so to speak, his own bosom friends, to whom he opened all his heart. With them he conversed perpetually on the various events of his life into their ears he poured forth constantly the tale of his joys and sorrows of his hopes, his fears, his distresses."

† "He was called Firdusi, *i.e.* heavenly, from the fact that King Mahmud, who was much pleased with his poetical compositions, once observed that the poet had turned his court into a paradise. He was also called Tusi from the fact of his being born in that country." অন্যত্রে—

"Many titles were given to Firdusi by the King and his courtiers, but he is most popularly called under the title Firdusi which means divine and indeed the people believed that he was a divine poet".

এবং শিশিলকে ধমকাইয়া দেন। স্পেন্সারের হস্তে প্রতিশ্রুত অর্থ আসিয়া পৌছে। মেমেদি যখন ৩ লক্ষ টাকা ফার্দ্দোশীর নিকট পাঠাইয়া দেন, তখন ফার্দ্দোশী জিজ্ঞাসা করেন "বাকী টাকা কোথায়?" মেমেদি উত্তর না দেওয়ায় তিনি ৩ লক্ষ টাকা তিন জন ভৃত্যকে দান করিয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত হয়েন; সম্রাটের সাক্ষাৎ না পাইয়া গজনি পরিত্যাগ করেন। যাইবার সময় মামুদের বিরুদ্ধে কয়েকটী তীব্র ব্যঙ্গোক্তিব্যঞ্জক কবিতা লিখিয়া যান। কবি ডান্টের এই অবস্থা হইয়াছিল। ডান্টে যখন পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে বনে, গ্রামে গ্রামে, ঘুরিতে ছিলেন পোলেণ্টা (Guide de Polenta) যেমন তখন তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন, তাবিরস্তানের যুবরাজ ফার্দ্দোশীর তেমনি সহায় ছিলেন। ইটালীর লোকেরা ডান্টের মহাকাব্য (Divine comedy) পাঠ করিয়াও তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে সম্মানিত করেন নাই, এইজন্য বাইরণ লিখিয়াছেন—

> "Ungrateful Florence! Dante sleeps afar
> Like Scipio buried by the upbraiding shore". *

এই কথা পড়িয়া ফ্লোরেন্সের লোকেরা ডান্টের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন। † ফার্দ্দোশী জীবিতাবস্থায় দুই একজন নরপতির সাহায্য ভিন্ন সাধারণের নিকটে সাহায্য বা সম্মান প্রাপ্ত হয়েন নাই। গজনি হইতে পলাইয়া তিনি খালিফের রাজসভায় পৌছেন এবং "ইয়ুক জোলেখাঁ" কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। ইউরোপে প্রাচীন কালে পোপকে যেমন সমুদয় রাজাগণ মান্য ও ভয় করিত, ফার্দ্দোশীর সময়ে মামুদকে মধ্য আসিয়ার সমগ্র নরপতিগণ সেইরূপ ভয় ও মান্য করিত, সুতরাং খালিফের সভায় আর গুপ্ত ভাবে থাকা সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। তিনি খালিফের রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তাবিরস্তানের পাদসাহ মামুদ গজনি সমীপে ফার্দ্দোশীর সুপারিশ করিয়া পাঠান; মামুদ মেমেদিকে তিরস্কার করেন এবং ফার্দ্দোশীর নিকটে ৭॥০ লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দিবার হুকুম দেন। যে দিন ফার্দ্দোশীর মৃত্যু হয়, ঠিক সেইদিন মামুদের নিকট হইতে টাকা লইয়া সম্রাটের লোকেরা পৌছে এবং যে সময়ে কবিবরের মৃতদেহ কবরস্থানের অভিমুখে বাহকেরা লইয়া যাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে ৭॥০ লক্ষ টাকা আসিয়া উপস্থিত হয়। সাড়ে সাত লক্ষ টাকা কবির নামে জমা হইল বটে, কিন্তু একটী কড়িও সঙ্গে গেল না!

"সাহনামা" অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ, মুদ্রিত পুস্তক ৪০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ*। ইহার আদ্যন্ত প্রাচীন, পরিশুদ্ধ, মৌলিক অথচ কঠিন পারস্যে বিরচিত। ইহাতে আরব্য, পেলভী প্রভৃতি নানা ভাষার শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'সাহনামায়' ২৩৭ 'বাব' (অংশ বা অধ্যায়) আছে। সমগ্র গ্রন্থে পারস্যের ইতিহাস প্রাচীন পাদসাহদিগের জীবনচরিত, সমগ্রদেশের সংক্ষিপ্ত ভৌগলিক বিবরণ, সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির সমালোচনা, পারস্য ভাষার মাহাত্ম্য বর্ণন, নানা যুদ্ধের বিবরণী, নানা দেশের বিবৃতি, নানা বীরের বর্ণনা ইত্যাদি অতি সুন্দর ভাষায় বিরচিত হইয়াছে। সাহ-

* Childe Harold. 3rd. Canto.

† "It was only after what Byron wrote as a reprimand that Florence gave Dante a monument".—Gibb's History of Italy. p. 621.

* বাজারে সম্পূর্ণ সাহনামা কম পাওয়া যায়। অন্য ভাষায় সম্পূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ প্রায়ই নাই।

নানা কাব্যে নানা প্রকারের ছন্দ ও নানা প্রকারের অলঙ্কার সন্নিবিষ্ট। পারস্য ভাষানভিজ্ঞের কাছে সে সৌন্দর্য্যের বিবৃতি দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

ফর্দ্দোশীর সাহনামায় রুস্তম পালোয়ানের জীবনচরিত, যুদ্ধের বিবরণ, বীরত্বের ইতিহাস ইত্যাদি অতীব মনোমোহক ও কৌতুকোদ্দীপক। এই বর্ণনায় অবশ্য অতিরঞ্জন আছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা জগতের প্রধান প্রধান কবিতাময়ী বর্ণনার সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ। সাহনামা পৃথিবীর সভ্য জাতির সাহিত্যে এক অত্যুৎকৃষ্ট অলঙ্কার। যতদিন কাব্যের আদর থাকিবে, যতদিন পারস্য ভাষা জীবিতা থাকিবে, ততদিন 'সাহনামা'' আমরা ভুলিতে পারিব না।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

পরিচয়।

সৃষ্টির পূর্ব্বাহ্ন কালে ফুটিল নলিনী
ধাতার মানস-সরোবরে ;
রঞ্জিত সহস্র দল কাঁপিল অমনি
আপনারি সৌরভের ভরে।
প্রফুল্ল কমলদলে সুরভির শ্বাসে
জনমিলা প্রণয়ী যুগল,
সাবিত্রী গায়ত্রী দেবী প্রজাপতি পাশে
যেন দুটী নবীন উৎপল।
পদ্মের চুম্বনে পদ্ম ফোটে চারি ভিতে
সরোবর উথলে উল্লাসে,
সেই আদি প্রেমরাগ ফুটিল মহীতে
সেই আদি প্রণয় বিলাসে।
প্রণয়ের শুভ্র হাসে লয়ে শুভ্রদল
ফোটে চারু নলিনী সুন্দরী,
প্রেমের সঙ্গমে ফোটে রমণী-উৎপল
শুভ্ররূপা দেবী বাণীশ্বরী।
শ্বেত পদ্মসনে দেবী লইলা আসন
গীতিস্বর বাজিয়া উঠিল,
নীরব নিষ্পন্দ বিশ্বে জাগিল জীবন
জগতের জড়তা ঘুচিল।
সেই দেবী গীতিস্বরে লভিলা জনম
দুটীপুত্র কুলের তিলক,
তাঁদের যশের গীতি সাগর জঙ্গম
নিত্য গায় বাড়ায়ে পুলক।
বল্মীকের স্তুপতলে শ্যামচ্ছায় বনে
একজন ছিলেন শায়িত,
তিনিই জনক মম ; একেলা গহনে
তাঁরি কোলে হইনু পালিত।
সরিৎ পুলিনে পড়ি ছিল আর জন
ধীবর পালিল তাঁরে ঘরে ;
পিতৃহীনা অনাথিনী বালিকা যখন
বাড়িলাম তাঁহারি আদরে।
অপরূপ রূপে আর অনন্ত যৌবনে
বিধাতা করিলা মোরে ধনী।
কারে দিব বরমাল্য ? ভাবিলাম মনে
স্বয়ম্বরে করিব বাছনি।
হইল বিরাট সভা, পুরুষ সুজন
কত আসি সভা উজলিল ;
ভজিয়া কাহারে আমি জুড়াব জীবন
এই চিন্তা মনেতে উদিল।
রাজনীতি বিশারদ পণ্ডিত প্রবর
যাচিলেন প্রণয় আমার,
আততায়ী জানি তাঁরে হইনু অন্তর
সসঙ্কোচে করি নমস্কার।

তর্কে পটু দার্শনিক মীমাংসা তৎপর
হইলেন প্রেমপ্রার্থী আসি,
হেরি শুষ্ক মুখ তাঁর রুক্ষ কলেবর
দূরে গেনু সভয়ে নিঃশ্বাসি।
"শাস্ত্র পারদর্শী আমি ধর্ম্মতত্ত্বে পটু,
কর মোর জীবন সফল ;"
বলিয়া কহিল এক ব্রাহ্মণের বটু,
হৃদিশূন্য মস্তিষ্ক সম্বল।
সভয়ে নমিয়া তাঁয় হনু অগ্রসর,
ভাবিলাম, কি হবে আমার ;
বুঝি মিলিল না আর অনুরূপ বর,
বৃথারূপ যৌবন অসার।
চতুর্থ সুজন এক হেরিনু সম্মুখে
নাম তাঁর কুবের পণ্ডিত ;
নানাছন্দে রচি ঘর বিরাজেন সুখে
শব্দরাশি ভাণ্ডারে সঞ্চিত।
ভুলাতে রমণী চিত্ত কত অলঙ্কার
এনেছিল গাঁথিয়া যতনে,
কহিলা সম্ভাষি মোরে "লও উপহার,
সাজ ধনী নব আভরণে।
"চল মোর ছন্দগৃহে রচিত কৌশলে
দুজনা করিব সুখে ঘর।"
বুঝিলাম ধনী মোরে বাঁধিয়া—শৃঙ্খলে
লতে চায় ; উপজিল ডর।
জনম নলিনীকূলে বাড়িনু কাননে
পুলিনে প্রান্তরে সুখ পাই ;
শব্দ-ছন্দ-করা গৃহে পশিব কেমনে
স্বাধীনতা যথা মোর নাই ?
ধাতব এ অলঙ্কারে ভোলে নাকো মন
তৃপ্তি সুধু পুষ্প আভরণে।
কহিলাম, ক্ষমা কর পণ্ডিত সুজন,
যেতে নারি তোমার ভবনে।

হেরিলাম তার পর যুবা একজন
ধন রত্ন কিছু নাই তার ;
দারিদ্র্য সম্বল ; তবু সুধু অনুক্ষণ
বনে আর পর্ব্বতে বিহার।
মানবের সুখ দুঃখ হরষ যাতনা
প্রাণমাঝে করে অনুভব,
তাই লয়ে করে সদা সঙ্গীত রচনা
তাই তার সমগ্র বিভব।
সুধাময় হৃদয়ের প্রেম অনুরাগ
নয়নের জ্যোতিতে বিম্বিত,
প্রশান্ত ললাটে চারু কল্পনার দাগ
পরিস্ফুট রয়েছে চিত্রিত।
স্থিরনেত্রে মোর পানে রহিল চাহিয়া—
মুখে নাহি সরিল বচন ;
সে দৃষ্টিতে প্রাণ মোর গেল বিগলিয়া—
তাহাকেই করিনু বরণ।
পরশিয়া কর মোর অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরে
কহিল, "জান কি তুমি রাণী
"চিরদিন ভ্রমিয়াছে পর্ব্বতে প্রান্তরে
কার তরে আমার পরাণী ?
"একেলা কল্পনা সাথী ছিল সাথে সাথে,
লহ তারে তোমার সেবায় ;
"চল মোরা ভ্রমি বিশ্ব ধরি হাতে হাতে
অন্য সুখ কি আছে ধরায় ?
"দরিদ্র দম্পতি মোরা তাহে দুঃখ নাই
ধন রত্ন লয়ে কি করিব ?
"যথায় সৌন্দর্য্য ফোটে বসি সেই ঠাঁই ?
দুজনায় সঙ্গীত গাহিব।"

৩রা কার্ত্তিক, ১৯৫৩। } শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

জড়বাদ।

জড় আপনার অন্তর্নিহিত আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তির প্রভাবে ক্রমে উন্নত হইয়া উদ্ভিদ্ ও জীবে পরিণত হইয়াছে, এবং যাহাকে আত্মা বা চৈতন্য বলা যায়, তাহা মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া মাত্র। প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের কোন না কোন পেশী বিকম্পিত হয়; ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহাকে মানসিক ক্রিয়া বলা যায়, তাহা ঐ কম্পনেরই ফল মাত্র; অতএব আত্মা বলিয়া জড়াতীত কোন বস্তু নাই।

১। জড় কাহাকে বলে? আমরা জড়কে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের সমষ্টি বলিয়াই জানি। চক্ষুর সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, তাহাই রূপ; রসনার সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, তাহাই রস; নাসিকার সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, তাহাই গন্ধ; ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, তাহাই স্পর্শ; আর কর্ণের সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, তাহাই শব্দ। একটুকু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা আমাদেরই জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং জড়ের জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভব নহে। যাহা জ্ঞানেরই বিষয়, তাহা জ্ঞানকে ছাড়িয়া থাকে কি প্রকারে? অতএব, জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হওয়া ত দূরে থাকুক, পক্ষান্তরে জড়ের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে চৈতন্যময় আত্মা বস্তুর উপর নির্ভর করিতেছে।

বিজ্ঞান নিসংশয়িতরূপে প্রমাণ করিয়াছে যে, অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য স্পর্শে-ন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে; আলোক-রশ্মি চক্ষুর সংস্পর্শে না আসিলে রূপের জ্ঞান হয় না; কোন পদার্থ রসনার সংস্পর্শে না আসিলে রসের জ্ঞান হয় না; বস্তুর পরমাণু নাসিকার সংস্পর্শে না আসিলে তাহার গন্ধ পাওয়া যায় না; বায়ু-তরঙ্গ কর্ণকে স্পর্শ না করিলে স্পর্শ জ্ঞান হয় না। কিন্তু স্পর্শে-ন্দ্রিয়ের জ্ঞান কি? কোন বস্তু স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপর কার্য্য করিতেছে, ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহা ক্রিয়াশীল, তাহা কি জড়? সাধারণ লোকে যাহাকে জড় বলে, তাহার একটা গুণ নিষ্ক্রিয়তা; সুতরাং যাহা ক্রিয়াশীল, তাহা আবার জড় অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হইবে কি প্রকারে? অতএব যাহাকে জড় বলিতেছ, তাহা চৈতন্য বস্তুতেই নানা রূপে অবস্থিতি করিতেছে, এবং সেই বস্তুই তাহার বিবিধ রূপ আমাদের আত্মাতে প্রকাশ করিয়া, অন্তরে বিচিত্র লীলা করিতে-ছে, ইহাই যথার্থ তত্ত্ব। জ্ঞাননিরপেক্ষ জড় বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা মাত্র। যাহা জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা অবশ্য জ্ঞানেতেই আছে, নতুবা তাহা কখনই আমাদের জ্ঞান-গোচর হইতে পারিত না; কারণ যাহা জ্ঞানেতে নাই, তাহার জ্ঞানেতে থাকিবার সম্ভাবনাই নাই, সুতরাং তাহা কখনই জ্ঞেয় হইতে পারে না।

২। শুদ্ধ জড় শক্তি দ্বারাই কি জগতের উৎপত্তি ও বিকাশের ব্যাখ্যা হইতে পারে? পরমাণু সকল পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হই-তেছে—এই আকর্ষণী শক্তিই জড়ের মূল শক্তি। যোগাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, চুম্বকার্ষণ প্রভৃতি অন্যান্য সব শক্তিই এই এক মূল শক্তির রূপান্তর মাত্র। এই মহতী শক্তির প্রভাবেই পরমাণুপুঞ্জ কখনও পর্ব্বত, কখনও

নদী, কখনও বায়ু, কখনও বাষ্প প্রভৃতি বহুবিধ আকার ধারণ করিতেছে। ইহারা সকলই পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগের ফল মাত্র; এবং সংযোগ ও বিয়োগ ব্যতীত জড়-শক্তির অন্য কোন ক্রিয়া লক্ষিত হয় না।

নির্জীব জড়রাজ্য অতিক্রম করিয়া যখন উদ্ভিদ্ ও প্রাণিরাজ্যে প্রবেশ করি, তখন সংযোগ বিয়োগ ব্যতীত অন্যান্য বহুবিধ ক্রিয়া দেখি, যাহা কখনই কেবল সংযোগ-বিয়োগাত্মিকা জড়-শক্তির ক্রিয়া হইতে পারে না। এখানে এক অত্যাশ্চর্য্য একত্ব ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, তাহার অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম সূত্রবৎ পদার্থ সকল, ও কোষ নিচয়, প্রত্যেকেই স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, অথচ সকলের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলে বৃক্ষ-জীবন রক্ষিত হইতেছে, সকলে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কার্য্য করিতেছে। ইহারা সকলে মিলিয়া এক, কাহাকেও ছাড়িয়া কেহ এক অথবা পূর্ণ নহে। প্রাণী সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। এই অভিনব ও অত্যাশ্চর্য্য একত্ব, স্বাধীনতা ও সামঞ্জস্য নিশ্চয়ই কোন জড়াতীত শক্তির ক্রিয়ার ফল; কারণ যাহা জড়ে নাই, তাহা জড় কি প্রকারে প্রদান করিবে? রাসায়নিক শক্তিতে দুই বা তদধিক বস্তু মিলিত হইয়া এক হইয়া যায় বটে, কিন্তু যে যে বস্তু মিলিত হইয়া অপর কোন বস্তুর আকার ধারণ করে, তাহাদের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশাইলে এক প্রকার লোহিত বর্ণ পদার্থ উৎপাদিত হয়; কিন্তু এই মিশ্রণে পদার্থ-দ্বয়ের কোন চিহ্নই থাকে না, তাহারা সম্পূর্ণরূপে অভিনব লোহিত বর্ণ পদার্থে বিলীন হইয়া যায়। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সম্বন্ধে কদাপি এরূপ ঘটে না। এই বিস্ময়কর রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন বহু অংশ স্বীয় স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াও সকলে মিলিয়া এক হইয়াছে। সুতরাং এই অত্যদ্ভুত একত্ব ও সামঞ্জস্য কখনও রাসায়নিক শক্তির ফল হইতে পারে না।

অতঃপর যখন জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করি, ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর ও অধিকতর বিস্ময়কর একত্ব ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাই; এখানে দেখি, বিষয় ও বিষয়ী মিলিয়া এক হইয়াছে, পার্থক্যের লেশমাত্র নাই। নির্জীব জড়রাজ্যে কোন বস্তুকে বহু অংশে বিভক্ত করিলেও প্রত্যেক অংশই এক পূর্ণ পদার্থ; কোন কাষ্ঠ খণ্ডকে কাটিয়া অসংখ্য অংশে বিভক্ত করিলেও প্রত্যেক অংশই পূর্ণ; কারণ তাহারা পরস্পরের বাহিরে, একের সঙ্গে অন্যের কোন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই। উদ্ভিদ্ ও জীবদেহেরও ভিন্ন ভিন্ন অংশকে চিন্তাতে ভিন্ন বলিয়া ধারণা করা যায়; আমার হস্তকে আমি শরীর হইতে পৃথক করিয়া ভাবিতে পারি। কিন্তু আত্মজ্ঞানে, বিষয় বিষয়ীর মিলনে এরূপ চিন্তাও অসম্ভব; আপনাকে জানিতে হইলে অবশ্যম্ভাবিরূপে বিষয়কেও জানিতে হয়। জড় অপরিহার্য্য কারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া বহু আকার ধারণ করিতেছে; আত্মা স্বাধীন ভাবে বহুরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে —আত্মা কখনও জ্ঞানী, কখনও প্রেমী, কখনও কর্ম্মী এবং এসকলই তাহার আত্ম শক্তির প্রকাশ। ঈদৃশী মহতী প্রকৃতি সম্পন্ন আত্মা কি কখনও কেবল সংযোগবিয়োগাত্মিকা জড়-শক্তি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে? বস্তুতঃ কোন অনন্ত জ্ঞানে অবস্থিত এক পরম সুন্দর পূর্ণাদর্শ যে ক্রমে ক্রমে সৃষ্টিরূপে ফুটিয়া উটিতেছে, ইহা স্বীকার না করিলে

জগতের কোন বস্তুর সহিত অপর কোন যোগ থাকে না, এবং এরূপ কোন আদর্শ আছে বলিয়াই জগতে এত শোভা, এত সৌন্দর্য্য ও এত শৃঙ্খলা। জ্ঞানেতেই সকলের যোগ, জ্ঞান ব্যতিরেকে সকলই অসংলগ্ন ও বিশৃঙ্খল। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। এক দোকানে ইষ্টক আছে, আর এক দোকানে সুরকি আছে, আর এক দোকানে কড়ি আছে। ইহারা সকলেই বিক্ষিপ্ত ও অসম্বন্ধ। কিন্তু যখনই অট্টালিকার আদর্শ মনে উপস্থিত, তখনই ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইল,এবং আদর্শের সহিত যুক্ত হইল বলিয়াই ইষ্টক-কাষ্ঠ-সমন্বিত সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়া চক্ষুর তৃপ্তি সম্পাদন করিল। জ্ঞানে যুক্ত না হইলে কি ইহা সম্ভব হইত?

৩। প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের পেশী কম্পিত হয় বলিয়া মানসিক ক্রিয়া মস্তিষ্কের ক্রিয়ারই ফল, এ কথা প্রামাণ্য নহে। দুইটী ঘটনা এক সময়ে হয় বলিয়াই কি একটী অসম্ভাবিরূপে অপরটীর কারণ? কখনই নহে। যখনই কাকটী আসিয়া তাল বৃক্ষে বসিল, তখনই ফলটী পড়িল। ইহাতেই কি প্রমাণ হইল যে,কাকের উপবেশনই ফল পতনের কারণ? ইহা কি হইতে পারে না যে, ফল স্বাভাবিক নিয়মে সেই সময়েই পড়িত,ঘটনা ক্রমে ঠিক পতনের সময়েই কাক আসিয়া বসিল? বিশেষতঃ মস্তিষ্কের পেশীর কম্পনের সহিত মানসিক ক্রিয়ার যখন বিন্দু মাত্রও সাদৃশ্য নাই,তখন মানসিক ক্রিয়া যে মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফল, তাহা প্রামাণ্য নহে। এতদ্ব্যতীত জড়ের অস্তিত্ব যখন জ্ঞানসাপেক্ষ, তখন জ্ঞানময় আত্মা কখনও জড় মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফল হইতে পারে না। জড় স্বীকার করিলেই, তাহার আধারস্বরূপ আত্মাকে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হয়। যে ক্রমোন্নতির নিয়মে মস্তিষ্কের উদয় হইয়াছে, জ্ঞানেতেই তাহার সম্ভাবনা এবং ইহার সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিল; সুতরাং জ্ঞানবস্তু আত্মা কখনও মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফল হইতে পারে না।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (৩)

পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, বেদান্তদর্শন ব্রহ্মকেই এই জগতের উপাদান কারণ বা Material cause বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইরূপ সিদ্ধান্তই যে অপেক্ষাকৃত উত্তম, তাহা আমাদের এই প্রবন্ধের বিগত দুই সংখ্যা যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন। এইরূপে সুন্দর সুন্দর মীমাংসা আছে বলিয়াই বেদান্তের এত প্রশংসা। এই জন্যই বেদান্তদর্শন এক সময়ে এত popularity লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। যাহা হউক, বিগত সংখ্যায় আমরা দেখাইয়াছি যে, বেদান্তের ঐরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। সেই আপত্তিগুলির মধ্যে আমরা প্রধান প্রধান আটটী আপত্তির উল্লেখ ও মর্ম্ম প্রদান করিয়াছি। আজ সেই আপত্তিগুলির কোন সঙ্গত উত্তর আছে কি না, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, সৃষ্টি সম্বন্ধে আর দুই চারিটী কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। হিন্দুদর্শন বড় বিস্তৃত।

এরূপ প্রবন্ধে সেই সমস্ত দুরূহ দার্শনিক-তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করা একরূপ অসম্ভব। সুতরাং সংক্ষেপেই সমস্ত কথা উল্লেখ করিয়া যাইতেছি। যাহাতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের বিদেশীয় ও ভারতীয় স্থূল স্থূল মত সমূহ প্রচারিত হয়, আমাদের এ সমস্ত প্রবন্ধ অবতারণা করিবার ইহাই উদ্দেশ্য। সে অভিপ্রায় কতদূর সিদ্ধ হইতেছে, বলিতে পারি না। দর্শনশাস্ত্র বড় কঠিন; বিশেষতঃ বঙ্গভাষায় দার্শনিক শব্দের পরিভাষা নাই বলিয়া, এই তত্ত্বগুলি বিশদরূপে বুঝাইতে অনেক সময়ে বড়ই বিব্রত হইতে হয়;—এ কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। যাহা হউক, এখন আমরা প্রকৃত কার্য্যে অগ্রসর হইতেছি।

পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রবন্ধে যে আটটী আপত্তির উল্লেখ করা গিয়াছে,এখন সেই আপত্তি গুলির উত্তর প্রদান করিতে আমরা অগ্রসর হইতেছি। প্রশ্নগুলির সংখ্যানুসারে, শ্রেণীবদ্ধ ক্রমে, উত্তরগুলি প্রদত্ত হইতেছে :—

(১) কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলেই যে, তাহার প্রত্যেকের এক একটী করিয়া প্রয়োজন থাকিতে হইবে, এরূপ কিছু নিয়ম নাই। যেমন কোন রাজা বা রাজামাত্যের কোনরূপ প্রয়োজনানুসন্ধান ব্যতিরেকেও ক্রীড়াবিহারাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসাদি কার্য্য,বাহ্যিক কোনরূপ প্রয়োজনান্তর অনুসন্ধান করিয়া প্রবৃত্ত হয় না,—উহা স্বভাবতঃই হইয়া থাকে, —সেইরূপ ঈশ্বরেরও, কোন প্রয়োজনসিদ্ধির অপেক্ষা না থাকিলেও, স্বভাবতঃ 'লীলা' রূপ প্রবৃত্তি হইবে,ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই জগৎ রচনা আমাদের নিকটে অতীব গুরুতর ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু অপরিমিত শক্তিমান্ পরমেশ্বরের নিকটে ইহার গুরুত্ব কিছুই নাই। ইহা তাঁহার স্বাভাবিক লীলা মাত্র। আর যদি সাংসারিক কার্য্যে লীলাদিতেও কোনরূপ সূক্ষ্ম প্রয়োজন থাকে; তথাপি ঈশ্বরে সেরূপ কোন প্রয়োজন থাকা অসম্ভব, কেন না তিনি পূর্ণকাম। অতএব এরূপ আপত্তি অসঙ্গত।

(২) সুখ দুঃখাদি বৈষম্য সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কোনরূপ দোষ আসিতে পারে না। মঙ্গলময় বিধাতা কেন তোমাকে অনর্থক দুঃখ প্রদান করিয়া সংসারে প্রেরণ করিবেন? এবং নির্লিপ্ত পরমেশ্বর কেনই বা আর একজনকে সমস্ত সুখের ভাজন করিয়া পাঠাইবেন? এরূপ বৈষম্যের কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রাণীর "অদৃষ্ট"*। অতএব এ আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর।

(৩) বাহ্যিকসাধন না থাকিলেও, পদার্থ সৃষ্ট হইতে পারে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুগ্ধ ও জল, বাহ্যিক কোন সাধনের অপেক্ষা না করিয়াই, স্বভাবতঃই দধি ও হিমভাবে পরিণত হয়। যদি বল জলাদি, হিমাদিভাবে পরিণত হইতে, বাহ্যিক শীতলাদি সাধন বা কারণের অপেক্ষা করে; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তাহাতেও কোন দোষ হইতে পারে না। শীতলাদি সহায় মাত্র; শীতলাদি দ্বারা, জলাদি শীঘ্র শীঘ্র হিমাদিভাবে পরিণত হয়, এই মাত্র। যদি দুগ্ধাদির, দধ্যাদিভাবে পরিণত হইবার স্বাভাবিক আন্তরিকশক্তি না থাকিত, তবে শীতলাদি সংযোগেও বলপ্রযুক্ত

* যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা চৈত্র ও বৈশাখ সংখ্যার নব্যভারতের আমাদের লিখিত "সুখদুঃখ" নামক প্রবন্ধ দেখুন্—প্রবন্ধলেখক।

কদাপি দধ্যাদিভাবে পরিণত হইতে পারিত না। সাধন-শক্তি দ্বারা, স্বাভাবিক শক্তির পূর্ণতা সম্পাদিত হয় মাত্র। কিন্তু ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তির পূর্ণতার জন্য বাহ্যসাধনের আবশ্যকতা নাই। কেননা তিনি সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ-শক্তিমান্। সুতরাং এ আপত্তিও টিকিতেছে না।

(৪) এরূপ আপত্তিও উত্থাপিত হইতে পারে না। যেহেতু, স্বপ্ন-দর্শন সময়ে, একই আত্মাতে নানাবিধ বিচিত্র বস্তুজাতের সৃষ্টি বা আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে সময়েও, সেই আত্মার পূর্ব্ববিনাশ বা উপমর্দ্দ হয় না। পূর্ব্বেই দেখা হইয়াছে যে, স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া বস্বন্তরের উৎপত্তির নাম "বিবর্ত্ত'। সুতরাং এক অদ্বিতীয় চৈতন্যে জাগতিক নানাবিধ বস্বন্তরের উৎপত্তি কদাচ অসঙ্গত বা অসম্ভব নহে। আরও দেখ, এক-মাত্র অন্ন-রস হইতে রক্ত, কেশ, লোমাদি বিবিধ পদার্থ জন্মিতেছে এবং একমাত্র পৃথিবী হইতেই মহার্হ বৈদূর্য্যাদি মণি, মধ্যমার্হ সূর্য্যকান্তাদি ও হীনতম ও হীনমূল্য পাষা-ণাদি জন্মিতেছে। সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্ম হইতে বিবিধ বস্তু জন্মিবে ও বৈচিত্র্য হইবে, আশ্চর্য্য কি!

(৫) বেদান্তমতে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্ম। জীবাত্মা জগৎস্রষ্টা নহে। ব্রহ্মের হিতকর বা অহিতকর কোন কার্য্য কর্ত্তব্য বা পরিহর্ত্তব্য নাই। কেননা,তিনি নিত্যমুক্ত। কিন্তু শরীরী জীবাত্মা সেরূপ নহে। বরং জীবাত্মাকে জগৎ স্রষ্টা বলিলে ঐরূপ আপত্তি প্রয়োজ্য হইতে পারে। আকাশ ও ঘটাকাশের ন্যায়, ব্রহ্ম ও জীবের অভেদ কল্পিত হয় মাত্র; কিন্তু জীব, বাস্তবিক ব্রহ্ম নহে। হিতাহিতাদি ভ্রান্তি মাত্র,উহা পারমার্থিক নহে। সুতরাং "ব্রহ্ম নিজের অহিত কেন করিবেন"—এরূপ উক্তিও ভ্রান্তিপূর্ণ।

(৬) এই যে 'ভোগ্য ভোক্তা' বিভাগ, ইহা ব্যবহারিক মাত্র। পরমার্থতঃ উহাদের কোনও বিভাগ নাই। সুতরাং পরমার্থতঃ অভিন্ন হইলেও, ব্যবহারিক অবস্থায়,ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ নষ্ট হইবে কেন? সমুদ্রের জল, ফেণ-তরঙ্গ-বুদ্বুদ-বীচী প্রভৃতি হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে। তথাপি লোকে ঐরূপ পৃথক্ ভাবেই উহাদের "ব্যবহার" করিয়া থাকে। সুতরাং এই বিভাগ উপা-ধিজন্য মাত্র। অতএব অভিন্ন হইলেও ব্যবহারিক দশায় ভোক্তা ও ভোগ্য বিভাগ নষ্ট হইবে কেন? সুতরাং তোমার ঐ আপত্তি নিতান্ত অসঙ্গত।

(৭) কার্য্য, সৃষ্টির পূর্ব্বেও যেমন কারণের সহিত একান্ত সম্পৃক্ত ছিল;—সৃষ্টির পরেও কার্য্য, সেইরূপ কারণের সহিত লগ্নই রহিয়াছে। কারণ ব্যতিরেকে, কার্য্যের পৃথক্ অস্তিত্ব সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলনা এবং সৃষ্টির পরেও থাকে না। সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য "অসৎ"হইবে কেমন করিয়া* ? সত্য বটে, শব্দাদিহীন ব্রহ্ম, এই জগতের কারণ। কিন্তু তাই বলিয়া এই শব্দাদি বিশিষ্ট জগৎ, উহার কারণছাড়া হইয়া, কথ-নও ছিল না এবং এখনও বর্ত্তমান নাই। কেননা, কার্য্য ও কারণ সর্ব্বদাই এক ও অভিন্ন। আবার দেখ, কার্য্য কারণে মিশি-লেই, কার্য্যের গুণ বা ধর্ম্ম কারণে লগ্ন হইবে কেন? কার্য্য, কারণে বিলীন হইলেও, স্বকীয়-ধর্ম্মদ্বারা কারণের দোষ উৎপাদন

* এ সমস্ত কথা আমরা "কার্য্য-কারণ বাদ" নামক অন্য এক প্রবন্ধে আরো বিশদরূপে বলিব, ইচ্ছা রহিল।

করায় না। ঘটশরাবাদি কার্য্য, উৎপত্তির পর উচ্চনিম্নাদিভেদে অবস্থিত থাকে; কিন্তু উহারা ভাঙ্গিয়া—ধ্বংশ হইয়া—যখন মৃত্তিকায় মিশিয়া যায়, কৈ তখন ত উহারা, উহাদের কারণীভূত মৃত্তিকায় কোন দোষ উৎপাদিত করে না। সুতরাং এই দ্বিবিধ আপত্তিই অকিঞ্চিৎকর।

(৮) এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণধর্ম্ম বিশিষ্ট। অর্থাৎ ব্রহ্ম শুদ্ধ ও চেতন এবং জগৎ অশুদ্ধ ও অচেতন। সুতরাং তুমি আপত্তি করিতেছ যে, ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইতে পারেন না; কেন না বিকারে প্রকৃতির ধর্ম্ম থাকা আবশ্যক। কিন্তু এরূপ নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। এ নিয়ম সর্ব্বত্র খাটে না। চেতনপুরুষ হইতে তদ্বিলক্ষণ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট কেশ নখাদির উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; অচেতন গোময়াদি হইতে তদ্বিলক্ষণ বৃশ্চিকাদি জন্মিয়া থাকে। তুমি বলিতেছ যে, উপাদান ও তাহার বিকার—এ উভয়ে সাদৃশ্য থাকা আবশ্যক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ সাদৃশ্য কিরূপ? যদি আত্যন্তিক সাদৃশ্য বল, তবে প্রকৃতি-জ্ঞানবিকার, এই দুই কথাই থাকে না। কেন না, দুইই যদি অত্যন্ত সদৃশ হয়, তবে কে কাহার বিকার এবং কে কাহার উপাদান, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। আর যদি বল যে, বিকারে উপাদানের অত্যন্ত সাদৃশ্য না থাকুক, কিন্তু উভয়ে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকা চাই;—অর্থাৎ জগতে ব্রহ্মের কোন না কোন গুণ বা ধর্ম্মের সত্বা থাকা আবশ্যক। আমি বলি, তা ত আছেই।—এই দেখ, আকাশাদিতে ব্রহ্মের সত্বারূপ ধর্ম্ম রহিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ঐরূপ আপত্তি আপাতমধুর মাত্র।

অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, পূর্ব্বোত্থাপিত আপত্তি কয়েকটীর কোন মূল নাই। উহারা একান্ত অসঙ্গত। অতএব স্থিরীকৃত হইল যে, ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ।

এতদূরে আমরা জগৎ-সৃষ্টির "কারণ" সম্বন্ধে ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্ত, এই দর্শন-ত্রয়ের মতগত ঐক্য ও পার্থক্য দেখিয়া আসিলাম। এখন এই ত্রিবিধ দর্শনের মতে সৃষ্টির "প্রণালী" সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা অতি সংক্ষেপে বলিয়া, অদ্য এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। এই প্রবন্ধের প্রথম সংখ্যায় সৃষ্টি সম্বন্ধে ন্যায়দর্শনের যেরূপ মত-বিশ্লেষ করা হইয়াছে, তাহা হইতেই ন্যায়ের "প্রণালী" বুঝা যাইবে। এখন সাংখ্য ও বেদান্তের প্রণালী দেখা যাউক্।

সাংখ্যমতে সৃষ্টির প্রণালী এইরূপ;—

প্রকৃতি।
|
মহত্তত্ব (বুদ্ধি)।
|
অহঙ্কার।

একাদশ ইন্দ্রিয়।   পঞ্চ-তন্মাত্র (সূক্ষ্ম)।
|
পঞ্চ মহাভূত (স্থূল)।

"সাংখ্যকার মূল প্রকৃতি হইতে পুরুষ-সান্নিধ্যে কিরূপে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে প্রকৃতি হইতে প্রথমে মহান্ (বুদ্ধিতত্ত্ব) উৎ-

পন্ন হয়। তৎপরেই এই মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উদ্ভূত হয়। এই অহঙ্কারের ষোড়শ পরিণাম হয়; তন্মধ্যে পঞ্চতন্মাত্র হইতে ৫ স্থূলভূত সৃষ্ট হইয়াছে। এই অহঙ্কার অভিমানাত্মক। ইহা হইতে দুইরূপ সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহার রাজসিক অংশে ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন। সর্ব্বশেষে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চতন্মাত্র তামস ও রাজসিক উভয়বিধ অহঙ্কার হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—ইহারাই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, আর বাক্, পাণি, পায়ু, পাশ, উপস্থ—ইহারা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন, জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়াত্মক। এই বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও ১০টী ইন্দ্রিয়—এই ১৩টীকে "করণ" বলে। প্রাণাদি ৫ বায়ু এই ত্রয়োদশ করণের সাধারণ ধর্ম্ম।"

বেদান্তকারমতে সৃষ্টি প্রণালী এইরূপ;—

ব্রহ্ম
|
পঞ্চতন্মাত্র (ক্রমশঃ)।

(ক)। ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়।	(ক)। ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়।	স্থূলভূত
(খ)। অন্তঃকরণ।	(খ)। ৫ বায়ু।	

বেদান্তকারমতে মায়াশক্তিসহকৃত ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি পঞ্চতন্মাত্র (সূক্ষ্ম) উৎপন্ন হয়। যথা,—প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে পৃথিবী। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টীর কি কি গুণ, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা গেল :—

তন্মাত্র	গুণ।
আকাশ	শব্দ।
বায়ু	শব্দ স্পর্শ।
অগ্নি	শব্দ স্পর্শ রূপ।
জল	শব্দ স্পর্শ রূপ রস।
পৃথিবী	শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ।

এই ভূত সকল ত্রিগুণময়ীর মায়ার পরিণাম বলিয়া ইহারাও ত্রিগুণময়। ইহারা যখন সত্ত্বগুণোপেত হয়, তখন ইহাদের হইতেই "পৃথক পৃথকভাবে" যথাক্রমে চক্ষুরাদি ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় জন্মে। আবার ইহাদেরই সত্ত্বগুণাধিক্যে এই ৫ তন্মাত্রে "একত্র মিলিত" হইয়া মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত জন্মে। ইহাদিগকেই সমষ্টি ভাবে অন্তঃকরণ বলে। আবার রজোগুণ আধিক্য হইলেই এই ৫ সূক্ষ্ম ভূ হইতেই পৃথকভাবে বাক্‌পণি প্রভৃতি ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও একত্রমিলিতভাবে, সেই রজোগুণাধিক্যেই, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান নামক ৫ বায়ু উৎপন্ন হয়। আবার তমোগুণের আধিক্যে ঐ ৫ সূক্ষ্মভূত হইতেই "পঞ্চীকৃত" ও স্থূলভূত জন্মে। পঞ্চতন্মাত্র (সূক্ষ্ম) হইতে এইরূপে পঞ্চীকৃত ৫ স্থূলভূত জন্মে, যথা :—

স্থূল আকাশ = ½ সূক্ষ্ম আকাশ + ⅛ সূক্ষ্মবায়ু + ⅛ সূক্ষ্মতেজ + ⅛ সূক্ষ্মজল + ⅛ সূক্ষ্ম পৃথিবী।

এইরূপ নিয়মে স্থূল বায়ু প্রভৃতির সৃষ্টিও বুঝিতে হইবে (পঞ্চদশী, ২।২৬—২৭ শ্লোক দেখ)।

অতি সংক্ষেপে আমরা জগৎসৃষ্টির দার্শনিক "কারণ" ও "প্রণালী" দেখিয়া আসিলাম। প্রাচীনকালে ভারতীয় দর্শনকারগণ এইরূপেই ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ বুঝিয়াছিলেন।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব, দরিদ্র-বন্ধু মনোমোহন।

বিজয়ার মহা উৎসবময় অথবা মহাবিষাদময় দিন বঙ্গভূমিকে পরিত্যাগ করিতে না করিতে, বঙ্গে এই নিদারুণ হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে যে,বঙ্গের সুসন্তান মনোমোহন আর ইহজগতে নাই! ঘরে ঘরে হাহাকার এবং ক্রন্দনের রোল, দেশময় শোকের উচ্ছ্বাস! বিনা মেঘে বঙ্গে বজ্রাঘাত হইয়াছে!!

আজ এই দুর্দ্দিনে আমাদের ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা স্মরণ হইতেছে। তখন আমরা ভবানীপুর পড়িতাম এবং চেতলায় থাকিতাম। ভবানীপুর, চেতলা এবং কালীঘাট মক্কেলদিগের প্রধান আড্ডা। তখন হাইকোর্ট কলিকাতার বর্ত্তমান নূতন বাটীতে আইসে নাই, গড়ের মাঠের দক্ষিণ ধারে ছিল। এই সময়ে আমরা বালক। সেই বাল্যকালে, আমাদের সেই যৌবন-উষায় একজন মহামহিমান্বিত বাঙ্গালীর কথা সর্ব্বদা দরিদ্র,অসহায়, বিপন্ন মক্কেলদিগের মুখে প্রাতে ও সন্ধ্যায় শুনিতে পাইতাম। সেই মহাত্মা আমাদের পূজ্য,প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা মনোমোহন ঘোষ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও মহাত্মা কেশবচন্দ্রের কথা তারপর এবং তারও পর পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরের কথা শুনিয়াছিলাম। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র পাপী তাপীর কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিতে, এবং বিদ্যাসাগর বিধবার অশ্রু মুছাইতে এই বঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর মহাত্মা মনোমোহন যেন ন্যায়ের রাজ্য সংস্থাপন করিতে,প্রভাত-কালীয় নবীন সূর্য্যের ন্যায়,প্রতিভা-বিস্ফারিত,প্রীতি-প্রফুল্ল নেত্রে দরিদ্রের দুঃখ-কাহিনীর সহানুভূতি-অঞ্জন লেপন করিয়া এই বঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এদেশে ব্যারিষ্টার হইয়া অনেকে বড় লোক হইয়াছেন, ভবিষ্যতে আরো হইতে পারেন। কিন্তু এ পথের প্রথম প্রদর্শক, আমাদের মনোমোহন। উকীল ব্যারিষ্টারের কাজ অতি সম্মানিত। দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে ধনীদিগের ভীষণ অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে এবং বিচার-বিভ্রাটের তীব্র কশাঘাত হইতে উদ্ধার করিতে উকীল এবং ব্যারিষ্টার ভিন্ন আর কেহ নাই। মৃত্যুর করাল গ্রাস এবং দুর্ব্বিসহ রোগ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিয়া চিকিৎসক যদি পূজা পাইবার যোগ্য,তবে অন্যায় বিচারের নিপীড়ন হইতে, মিথ্যা মকদ্দমার তীব্র আঘাত হইতে লোকদিগকে মুক্ত করিয়া,আইন-ব্যবসায়ীগণ কেন পূজ্য হইবেন না, বুঝি না। এই এক শ্রেণীর প্রতি সর্ব্বদা অযথা নিন্দা বর্ষিত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই নিন্দুক-শ্রেণীও দায়ে ঠেকিলে আবার আইন-ব্যবসায়ীদিগের দ্বারস্থ হন। যত দিন দেশ রাজার অধীন, সমাজের অধীন, ততদিনই আইন, নিয়ম ও শাসন বিদ্যমান থাকিবে। যতদিন মানুষ হিংসাবিদ্বেষ ও কাম ক্রোধের অধীন, ততদিনই অত্যাচার উৎপীড়ন থাকিবে। যতদিন ন্যায়ের রাজ্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ না হইবে,ততদিনই আইন-ব্যবসায়ী থাকিবেন। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যই আইন-ব্যবসায়ীর আবির্ভাব। জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া,মনোমোহন সাগরপারে যাইয়া, ব্যারিষ্টার হইয়া প্রথম এদেশে কাজ আরম্ভ করেন। একটী সুন্দর মহত্বের পথ খুলিয়া দিয়া মনোমোহন এদেশের যে উপকার করিয়াছেন, বিধাতাই তাহা জানেন।

বিলাতে ব্যারিষ্টারি পদ অতি সম্মানের পদ। ইটালীতে এক সময়ে নব্য উকীলকে দরিদ্র মক্কেলদিগের জন্য টাকা না লইয়া খাটিতে হইত। মহাত্মা ম্যাটসিনিকেও এক সময়ে এই কাজ করিতে হইয়াছিল।* বুঝিবা স্বাধীনতা এবং ন্যায়ের সম্মান অপ্রতিহত প্রভাবে বজায় রাখিতে ব্যারিষ্টার ভিন্ন আর কেহ নাই! ভারতে আইন-ব্যবসায়ীগণই স্বাধীনতার গৌরব রাখিতেছেন। ভারতের কংগ্রেসের মূল আইন-ব্যবসায়ীগণ। কেবল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তহবিল পূর্ণ করার জন্য এই সম্মানিত ব্যবসায় নহে। দরিদ্রকে রক্ষা করা এবং বিপন্নকে উদ্ধার করার জন্যই ব্যারিষ্টারের সৃষ্টি। মনোমোহনের পদানুসরণ করিয়া পরে এদেশে অনেক ব্যারিষ্টার হইয়াছেন, তাঁহারা বিপুল ধন উপার্জ্জন করিয়া, জাতীয় ভাষা এবং ধর্ম্ম ভুলিয়া মহানন্দে দিগ্বিজয়ী গৌরবে প্রমত্ত হইয়াছেন, কিন্তু পরদুঃখমোচন, পরের উদ্ধার সাধনকে তাঁহারা ঘৃণা করেন—তাঁহারা মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করেন, কেবল অসার অর্থের খাতিরে। যে ব্যক্তি পরের উদ্ধার-সাধন-ব্রতে-ব্রতী হইয়াও তাহা করিল না, তাঁহার ন্যায় কৃপার পাত্র আর কে? এদেশের আইন-ব্যবসায়ীদিগের অনেকেই অর্থের গোলাম; সাধারণ কথা—"টাকা ঢালো, বিচার পাইবে, দরিদ্র হও, জেলে যাও, ঐ ফাশি-কাষ্ঠ তোমাদের জন্য!!" হায়, দরিদ্রদিগের উদ্ধার সাধন যে ব্যবসায়ের মূল মন্ত্র, তাহা এখন স্বার্থ-সাধনের অমোঘ অস্ত্র! মনোমোহন, বুঝি বা, দুঃখী, দরিদ্র এবং বিপন্নদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যই এই সম্মানিত আইন-ব্যবসা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি লিন্‌কন্-ইনে ব্যারিষ্টাররূপে বরিত হন। তৎপর দেশে প্রত্যাগমন করেন। আমরা ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা স্মরণ করিতেছি। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই মনোমোহনের নাম বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে ছুটিয়াছে! নিপীড়িত ব্যক্তিগণ শুনিয়াছে, এই বঙ্গে এক ন্যায়ের অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন। চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইয়াছে—দরিদ্রদিগকে, অত্যাচার এবং অবিচারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে এক মহাত্মা অভ্যুদিত হইয়াছেন। দলে দলে পল্লী হইতে দরিদ্র মক্কেল আসিতেছে—দলে দলে লোক মনোমোহনের বাড়ীতে ছুটিতেছে। সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। দেনা পাওনার কোন কথা নাই, মনোমোহন দরিদ্রদিগের জন্য অক্লান্ত অন্তরে পরিশ্রম করিয়া কত জনকে উদ্ধার করিতেছেন। মৃত্যু ও নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত কত পিতা-পুত্র, ভাই বন্ধু যে তাঁহার দয়ায় উদ্ধার পাইয়াছে, তাহার ইতিহাস কে লিখিতে পারে? পত্রিকায় দুটী চারিটী মকদ্দমার কথা উল্লিখিত হইতেছে বটে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস,—শত শত মকদ্দমার কথা অলিখিত এবং অকথিত রহিয়াছে। দরিদ্র পল্লীর মৃণ্ময়, পত্রময় প্রাচীর মধ্যে অসংখ্য নরনারীর হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা-অক্ষরে তাহা লিখিত রহিয়াছে। মনোমোহন নাম, দরিদ্রের গৃহে, সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এইরূপে মনোমোহনের নাম শুনিয়া আমরা যেন সুপ্তোত্থিত হইয়াছিলাম।

* "The first two years of a young advocate's life in Italy, in those days, were spent in the Ufficio dei Poveri, where they pleaded gratis the causes of the poor. During the short time that Mazzini performed that office, he distinguished himself by the patient attention he gave to the often wearisome details of his duty; the zeal with which he entered into the cases of his poor clients, his logical accuracy, quick and ready wit, and extraordinary facility of language and illustration."

দরিদ্রের জন্য খাটে, দরিদ্রের জন্য ভাবে—দরিদ্রকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হয়, এমন লোকও এ দেশে আছে? আমাদের মনে, যৌবন-উদয়ে,এই প্রশ্ন সমুদিত হইল। মনোমোহনের গুণ স্মরণ করিয়া, কি এক আশ্চর্য্য শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যেন আমরা জীবন-পথে অগ্রসর হইলাম। আর আজ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ অংশে সেই মহাত্মার গুণ স্মরণ করিয়া অশ্রুতে ভাসিতেছি। এই ২৭ বৎসর আমরা মনোমোহনের অকথিত এবং অলিখিত গুণ স্মরণ করিয়া আসিতেছি। এ দেশের অনেক মহৎলোকের সহবাস লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা,দেবেন্দ্র নাথের গভীর বিশ্বাস, কেশবচন্দ্রের ভক্তি, বিদ্যাসাগরের দয়া, এ সকলের পবিত্র সহবাস-লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি—নিন্দা অল্পাধিক সকলেরই শুনিয়াছি,কিন্তু মনোমোহনের তেমন নিন্দা শুনি নাই। সদা প্রফুল্ল,মাতৃভক্ত,ভ্রাতৃবৎসল মনোমোহন বুদ্ধি এবং প্রতিভার রাজা, জাতীয় মহাসমিতির অন্যতর নেতা, দরিদ্রের পরম বন্ধু। মনোমোহন বঙ্গের সকলেরই যেন প্রিয়। এমন সুকৃতি যে জননীর সন্তানের, সে জননী ধন্যা!

মনোমোহন কাহার ছিলেন,এবং কাহার ছিলেন না? তিনি কি কেবল দরিদ্র মক্কেলদিগের আশ্রয় ছিলেন? না—তাহা নহে। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বেথুন বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন; স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য আজীবন ভাবিয়াছেন এবং খাটিয়াছেন। জাতীয় মহাসমিতি এবার কলিকাতায় বসিবে; মনোমোহনের অভাব সকলের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিবে! গতবার যখন কলিকাতায় বসিয়াছিল, তখন তিনি সাদর-সম্ভাষণ কমিটীর সভাপতি হইয়া সকল প্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা করিয়া বঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এবার তাঁহাকে হারাইয়া,জাতীয় মহাসমিতি বঙ্গের অযোধ্যানাথ-হারা হইলেন। জাতীয় মহাসমিতিতে তাঁহার ন্যায় স্বদেশপ্রিয়,মিষ্টপ্রকৃতি, বাঙ্গালী নেতা আর কে রহিলেন? ব্যারিষ্টার বন্দ্যোপাধ্যায় মাতৃদেবী—ইংরাজিতে বলেন, ইংরাজি মতে আহার করেন,ইংলণ্ডে তাঁহার বিহার। তিনি বাঙ্গালা ভাষার বিদ্বেষ্টা,বাঙ্গালা আচার ব্যবহারের ঘোরশত্রু,তাঁহাকে যদি মহাসমিতির বাঙ্গালী-নেতা বল,আমরা তাহাতে সায় দিই না। পাঁচ কোটী দরিদ্র বাঙ্গালীর দুঃখের কথা যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না, তাঁহাকে বাঙ্গালার নেতা বলিতে পারি না। মনোমোহন ধনে ও গুণে,দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় এবং অধ্যবসায়ে,মিষ্ট ব্যবহারে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন, দয়ায়, মমতায় ও সহানুভূতিতে সকলের বন্ধু ছিলেন। বাহিরে সাহেবী পোষাক,অন্তরে কিন্তু খাটী বাঙ্গালী। তিনি যখন যে কাজে হাত দিয়াছেন, ফিলিপের অত্যাচার বা মণিপুরের বিচার-বিভ্রাটনিবারণ চেষ্টা,সে সকল কাজের জন্যই প্রাণপণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রয়ে সকল শ্রেণীর পত্রিকা সমাদর পাইয়াছে। যে পত্রিকা তাঁহার নিকট পৌছিয়াছে,তিনি তাহা যত্নে রক্ষা করিয়াছেন। বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালীর এমন বন্ধু কি আর আছে? এমন বন্ধু কি আর মিলে? পাওনিয়ার হইতে কাশীপুর-নিবাসী পর্য্যন্ত * তাঁহার টেবেলে শোভা পাইত! তিনি সম্পাদক এবং বন্ধুবর্গকে সাহায্য করা জীবনের মহাব্রত মনে করিতেন। মাইকেলের সন্তানদিগের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি

* Indian Mirror, 20th Oct. 1896

কি কেবল মক্কেলদিগের ছিলেন? না—তাহা নহে। তিনি সকলের। তিনি পরিবারের, পিতামাতার, ভাই ভগ্নীর, পুত্র কন্যার যেমন—তিনি আমাদের সকলের তেমনি। তিনি মাতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল, এবং বন্ধুর অনুরক্ত। বঙ্গের দরিদ্র মক্কেলের তিনি, বঙ্গের মহিলাগণের তিনি, জাতীয় মহাসমিতির তিনি। সংবাদপত্রের অকৃত্রিম বন্ধু তিনি। যাঁহারা বিলাত প্রত্যাগত হইয়াছেন, মনোমোহনের গৃহ তাঁহাদিগের নিজ গৃহ। তিনি বঙ্গের গৌরব—তিনি পূর্ব্ব-বঙ্গের উজ্জ্বল নক্ষত্র।

দেশের প্রকৃত মহৎ ব্যক্তি কে? যাঁহারা জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান, এবং যাঁহারা তাঁহাদিগের রক্ষক, আমাদের মতে তাঁহারাই প্রকৃত মহৎ ব্যক্তি। বহুবার আমরা লিখিয়াছি যে, জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন, ভিন্ন এই ধরায় কোন জাতির উন্নতি হয় নাই। আমাদের দীনা বাঙ্গালা-ভাষার উন্নতির জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, সেই মহিমান্বিত, সাধারণের উপেক্ষিত, দেশের নগণ্য ব্যক্তিগণ আমাদের প্রণম্য এবং যাঁহারা তাঁহাদিগকে ঘোর দরিদ্রতার হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারাও প্রণম্য। মনোমোহন জাতীয় ভাষার সেবা করেন নাই—কিন্তু গ্রন্থকারদিগকে, সম্পাদকদিগকে সাহায্য করিয়া প্রকারান্তরে জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি আমাদের দেশের প্রকৃত বন্ধু।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া তিনি বন্ধুবর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত মহর্ষির ভবনে একত্রে থাকিতেন, একত্রে বিহার করিতেন। এই সময়ে (১৮৬১ খ্রীঃ) তিনি পাক্ষিক মিরার বাহির করেন। * তারপর দুই বন্ধু একত্রে বিলাত গমন করেন (১৮৬২ খ্রীঃ)। এই সময়েই বুঝিবা, দেশ-সংস্কার ব্রতে তিনি ব্রতী হন। বাল্য বিবাহ যাহাতে বঙ্গ হইতে উঠিয়া যায়, তজ্জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন এবং নিজ পরিবার সেই ভাবে গঠন করিয়াছেন। জাত্যভিমান ডুবাইয়া নিজে বিলাত গিয়াছেন, ভ্রাতাকে পাঠাইয়াছেন, এবং এ দেশের কত ব্যক্তিকে বিলাত-গমনে উৎসাহিত ও সাহায্য করিয়াছেন। তিনি একজন প্রধান সমাজ-সংস্কারক।

মহাজনের জীবনী বিশ্লেষ করিলে কি পাওয়া যায়? এখানে মহাসমরের বিবরণ নাই, রাজ্যাভিষেকের উজ্জ্বল বর্ণনা নাই, আছে কি? থাকে কি? কেবল চরিত্র, দয়া, দাক্ষিণ্য-পূর্ণ অশেষ কার্য্যরাশি-সম্বলিত মহা জীবন। তাহার বর্ণনা কোথায় পাওয়া যায়? কেবল লোকের জীবনে—যাঁহারা তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, কেবল তাঁহাদের চরিত্রে। ম্যাট্‌সিনি অমর—কোন দুই চারিটী ঘটনায় নহে, পার্কার অমর কোন যুদ্ধে নহে;—তাঁহারা কেবল অসংখ্য সৎকাজের দ্বারা লোকের জীবনে জীবিত। বংশ পরম্পরায় যতদিন মানবদেহে রক্তবিন্দু চলিতে থাকিবে, তাঁহারা ততদিন অমর। লোক পরম্পরায়, বংশপরম্পরায় পার্কার, ম্যাট্‌সিনি যেরূপ অমর, আমাদের বংশ পরম্পরায়, সেইরূপ,—এই হতভাগ্য বঙ্গে—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, ও রামগোপালের পার্শ্বে, তেমনই, চিরদিন, মনোমোহন অমর হইয়া থাকিবেন। তাঁহার বিচার এবং শাসন বিভাগ পৃথক করা সম্বন্ধীয় যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ এবং মণিপুর সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট পুস্তিকার জন্য নহে—কিন্তু পরদুঃখ-মোচনের গভীর সহানুভূতির জন্য তিনি

* Unity and the Minister, 25th oct. 1896.

এদেশে অমর হইয়া থাকিবেন। পরদুঃখ-কাতর, ধীর, স্থির, সংযত, প্রফুল্ল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অবিচলিত-চিত্ত এবং প্রতিভা-মণ্ডিত মনোমোহনমূর্ত্তি বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে অক্ষয় ও অচল কৃতজ্ঞতার-সিংহাসনে চিরপ্রতিষ্ঠিত।

তিনি ত অমর হইলেন, আর হতভাগ্য বঙ্গদেশ? বঙ্গের উপায়? এই হতভাগ্য বঙ্গ কেবল কাঁদিতেই জন্মেছে। অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্র, কৃষ্ণদাস, বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের শোক নির্ব্বাপিত হইতে না হইতে,—তাঁহাদের চিতার আগুন নিবিতে না নিবিতে, আবার নবদ্বীপ, প্রজ্বলিত চিতার মহা অগ্নি এই বঙ্গে প্রজ্বলিত করিলেন!!

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ তারিখে যে মহাত্মা, ঢাকার অধীন বয়রাগাদিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিগত ২রা কার্ত্তিক, ১৭ই অক্টোবর, শনিবার, সেই মহাত্মার চিতা প্রজ্বলিত করিয়া নবদ্বীপ বঙ্গে নিদারুণ শোক-কালিমা লেপন করিলেন! হা বঙ্গদেশ, তোমার এই গভীর দুঃখ কে বুঝিবে? তুমি অতি কষ্টে, বহু তপস্যায় যে মহা রত্ন লাভ করিয়াছিলে, তাহার সমতুল্য রত্ন আর কি পাইবে? যাহা গিয়াছে, বুঝি বা এ বঙ্গে তাহা আর মিলিবে না। বিধাতা শোক-সন্তপ্ত পরিবারে শান্তি বর্ষণ করুন। তাঁহার মহান ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

ভারতের দারিদ্র্য। (১)*

ভারতের দিন দিন অবনতি হইতেছে। এই অবনতির প্রধান কারণ দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যের কারণ কি, ইহার প্রতিবিধানের কোন উপায় আছে কি না, তাহা আমাদের সকলেরই বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কয়জন সে কথা বুঝিতে পারেন, অথবা বুঝিতে চেষ্টা করেন?

যাঁহারা ভারতের হিতৈষী, যাঁহারা ভারতের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করেন, অথবা ভারতের উন্নতির উপায় চিন্তা করেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, এই ভীষণ দারিদ্র্যের প্রতিবিধান ব্যতীত ভারতের উন্নতির উপায় নাই। দাদাভাই নাওরোজী-প্রমুখ কয়েকজন ভারতের সুসন্তান এই কথা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু যে কারণে ভারত দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, যে কারণে ভারত-সন্তান অন্নাভাবে শীর্ণ, সংক্রামক পীড়ায় জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, যে কারণে ভারত দুর্ভিক্ষের লীলাভূমি হইয়া ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে—তাহার প্রতিবিধান করা মানুষের সাধ্যের অতীত হইয়া পড়িয়াছে। বুঝি, বিধাতার বিশেষ বিধান ব্যতীত সে দারুণ দারিদ্র্য দূর হইবার উপায় নাই।

যাহা হউক, যাঁহারা ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের এই ভীষণ দারিদ্র্যের প্রতিবিধান-কল্পে কোন উপায় আছে কিনা, তাহা চিন্তা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আর সেই জন্য এই দারিদ্র্যের কারণ কি, তাহাও বিশেষরূপে জানিতে চেষ্টা করাও তাঁহাদের কর্ত্তব্য। পৃথ্বীশ বাবু ভারতের সুসন্তান। তিনি ভারতের দারিদ্র্য সম্বন্ধে যে গবেষণাপূর্ণ উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই সকল বিষয়ের বিশিষ্ট আলোচনা করিয়া-

* The Poverty Problem in India by Prithwis Chandra Roy; Thacker, Spink & Co.

ছেন। তাঁহাকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা বড়ই উপকৃত হইয়াছি।

দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই পুস্তক ইংরাজী ভাষায় লিখিত। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা এই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে বঞ্চিত হইবেন। এজন্য আমাদের ইচ্ছা ছিল, তাঁহার পুস্তকের সারাংশ লইয়া ভারতের দারিদ্র্য বিষয়ক সমস্যার আলোচনা করিব। কিন্তু, সংক্ষেপে সে আলোচনা সম্ভব নহে। বিষয় বড়ই গুরুতর। যাহা হউক, সংক্ষেপে আমরা সে সম্বন্ধে দুই এক কথা এস্থলে উল্লেখ করিব মাত্র। এবং তাহা বুঝিবার জন্য প্রথমে অর্থ শাস্ত্রের দুই একটী মূল সত্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

মানুষের তিনটী মূল বৃত্তি আছে ;—জ্ঞান-বৃত্তি, কর্ম্মবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তি। এই তিনের উপযুক্ত অনুশীলন ও উন্নতির দ্বারা মানুষের উন্নতি হয়। অতএব মানুষের উন্নতির জন্য জ্ঞানের উন্নতি করিতে হয়, কর্ম্মবৃত্তি বিশেষ স্ফূর্ত্তি ও বৃদ্ধি করিতে হয়, আর দুঃখের পরিমাণ হ্রাস করিয়া সুখের বা আনন্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয়। মানুষের সমষ্টিতেই জাতি সংগঠিত। অতএব কোন জাতি বা সমাজের উন্নতি করিতে হইলে, সেই জাতীয় মানব সমষ্টির জ্ঞানের অনুশীলন ও উন্নতি করিতে হয়, কর্ম্মবৃত্তির অনুশীলন ও উন্নতি করিতে হয়, আর চিত্তবৃত্তির অনুশীলন ও উন্নতি করিতে হয়।

জ্ঞানের উন্নতিতে ধর্ম্ম ও দর্শন এবং বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। কর্ম্মবৃত্তির উন্নতিতে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও জাতির রক্ষার উপায়ের উন্নতি হয়। আর প্রধানতঃ সুকুমার বিদ্যার উন্নতিতে জাতীয় সুখস্বচ্ছন্দের বৃদ্ধি হয়। যে জাতি পূর্ণরূপে উন্নত, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম, দর্শন, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি, জাতি রক্ষার উপায় বা রাজনীতি এবং সুকুমার বিদ্যা, এ সকলই বিশেষরূপে অনুশীলিত ও পরিণত। দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত কোন জাতি এতদূর উন্নত হয় নাই—যাহাদের এই সকল গুলিই পূর্ণরূপে অনুশীলিত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে। প্রাচীন আর্য্যজাতি কতক পরিমাণে এই আদর্শে উন্নত জাতি ছিল, ইহা বলিতে পারা যায়। সাধারণতঃ কোন এক বিশেষ বিষয় অবলম্বন করিয়াই জাতি বিশেষের উন্নতি হইয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীসে দর্শন শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। প্রাচীন রোমে রাজনীতির বিশেষ উন্নতি ছিল। আধুনিক ইতালীতে শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। ইংলণ্ড বাণিজ্যবলে উন্নত।

যেমন কোন বিশেষ জাতি—কোন বিশেষ বিষয় অবলম্বন করিয়া উন্নত হইয়া থাকে, তেমনি যুগবিশেষে, ইহার কোন বিশেষ বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করে। বর্ত্তমান যুগ বাণিজ্য-প্রধান। যে জাতি বাণিজ্যে বড়, সেই জাতি এখন সর্ব্ব প্রথম হইয়াছে। অতএব এই যুগে জাতীয় উন্নতির জন্য বাণিজ্যের উন্নতির প্রয়োজন। কিন্তু এস্থলে সে কথার বিশেষ উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা অন্যদিক হইতে এই জাতীয় উন্নতির মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিব।

মানুষ, শক্তিকেন্দ্র। সেই শক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ইচ্ছা শক্তিরূপে অভিব্যক্ত। সেই শক্তি যদি কেবল মানুষের নিজের বৃদ্ধি ও পোষণ জন্য ব্যয়িত হয়, তবে তাহার দ্বারা সেই মানুষের নিজের উন্নতি মাত্র হইতে পারে। কিন্তু যদি নিজের উন্নতি করিয়াও,

আরও শক্তি অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই শক্তি সঞ্চয় দ্বারা ক্রমে মানুষ আরও উন্নত হয়—অন্যকে উন্নত করে। যে মানুষের শক্তি যত অধিক, সেই পরিমাণে তাহার মনুষ্যত্ব তাহার মহত্ব। তবে শক্তির অপব্যয় করিলে অন্য কথা। এ স্থলে আমরা কেবল কর্ম্ম শক্তির কথাই আলোচনা করিব।

এই কর্ম্ম-শক্তি বলে মানুষ কর্ম্ম করিতে পারে। এই কর্ম্মশক্তি আমাদের জ্ঞান ও ইচ্ছা-শক্তি চালিত। এই কর্ম্মশক্তি বলে মানুষ আপনার রক্ষণ ও পোষণ জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম্ম করে। বলিয়াছিত, সেই কর্ম্ম কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, আত্মরক্ষা ইত্যাদি। আমরা এস্থলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বিষয়ই উল্লেখ করিব।

মানুষের জীবন রক্ষার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। মানুষ অসভ্য অবস্থা হইতে, সভ্যতর অবস্থায় আসিলে কৃষি গোরক্ষণাদি দ্বারা সেই খাদ্য সংগ্রহ করে। খাদ্য ব্যতীত মানুষের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য বস্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ বস্তুর প্রয়োজন হয়। মানুষ তাহা শিল্প দ্বারা প্রস্তুত করিয়া লয়। সুতরাং জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ-চেষ্টা হইতে মানুষের কর্ম্মশক্তির বিকাশ হয়। মানুষ যদি সমাজবদ্ধ না হইয়া একাকী থাকিত, তবে তাহাকে একাই পরিশ্রম দ্বারা তাহার জীবনযাত্রা উপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইত। মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া তাহাদের মধ্যে কার্য্য বিভাগ হইয়াছে। কেহ কৃষিকার্য্য দ্বারা শস্য উৎপাদন করে। কেহ বস্ত্র বয়ন করে। যে কৃষিকার্য্য উৎপাদন করে, সে শস্যের বিনিময়ে অন্যের নিকট বস্ত্র গ্রহণ করে। এইরূপে সমাজে বিনিময় প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিনিময়ের সুবিধার জন্য টাকার প্রয়োজন। যে শস্য উৎপাদন করে, তাহার বস্ত্রের প্রয়োজন, কিন্তু যে বস্ত্র প্রস্তুত করে, তাহার শস্যের প্রয়োজন নাই। সে অবস্থায় বিনিময় চলে না। কিন্তু যদি শস্য বা বস্ত্রের মূল্য নির্দ্ধারিত থাকে, তবে শস্য উৎপাদনকারী কৃষক মূল্য দিয়া বস্ত্র কিনিয়া লয়। আর সেই মূল্য দিয়া পরে আবশ্যক মতে বস্ত্র-প্রস্তুতকারী তন্তুবায় শস্য কিনিতে পারে। এইরূপে সমাজমধ্যে টাকা দিয়া দ্রব্যাদির খরিদ-বিক্রয়-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এখন মনে করা যাউক, আমার যতটুকু কর্ম্ম শক্তি আছে, তাহার দ্বারা কৃষি বা কোনরূপ শিল্পকর্ম্ম করিয়া আমি যথা শক্তি শস্য বা বস্ত্রাদি উৎপাদন করিলাম। আমার প্রয়োজন মত শস্য বা বস্ত্র রাখিয়া বাকী শস্য বা বস্ত্র বিক্রয় করিলাম। বিক্রয় করিয়া আমার যে টাকা আয় হয়, সেই টাকা দিয়া আমার জীবনযাত্রার উপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া কিছু টাকা অবশিষ্ট রহিল। সেই টাকা আমার সঞ্চয় হইল। আমি যদি পীড়া বা অন্য কোন কারণে কোন সময় পরিশ্রম করিতে না পারি, তবে সেই সঞ্চিত অর্থ হইতে সেই সময় আমি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব। আবার অর্থ সঞ্চিত হইলে আবার কতকগুলি সখের জিনিস প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সেই সঞ্চিত অর্থ হইতে তখন আমি সেই সকল সখের জিনিস সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইব।

অতএব কর্ম্ম শক্তি পরিচালনা করিয়া আমরা জীবনযাত্রার উপযোগী খাদ্যাদি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লই। আর কর্ম্মশক্তির সমধিক স্ফূর্ত্তি হইলে সেই শক্তি পরিচালনা দ্বারা, আমরা সেই সকল দ্রব্য সংগ্রহ অপেক্ষা

অধিক পরিমাণে কর্ম্ম করিতে পারি। যে কর্ম্ম অধিক করি, তাহাই সঞ্চিত হয়। যদি এরূপ অধিক কর্ম্ম না করি, তবে কেবল মাত্র জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি। আর তাহারও উপযুক্ত পরিমাণে কর্ম্ম না করিতে পারিলে, আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই কঠিন হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কর্ম্মশক্তি পরিচালনা দ্বারা আমি যাহা উৎপাদন করি, তাহার মধ্যে আমার প্রয়োজন মত সেই উৎপন্ন দ্রব্য রাখিয়া বাকী সমুদায় বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করি। সেই অর্থ দ্বারা আমার অন্য প্রয়োজন মত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করি ও যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সঞ্চয় করিতে পারি। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে, অর্থ এইরূপে আমাদের কর্ম্মশক্তির পরিমাপক। আমরা নিজের জন্য বা নিজ প্রয়োজন সাধন জন্য যে পরিমাণে পরিশ্রম বা কর্ম্মশক্তির ব্যয় করি, তাহা অপেক্ষা অধিক কর্ম্ম শক্তি ব্যয় করিলে বা পরিশ্রম করিলে, সেই পরিশ্রম অর্থ রূপে আবার সঞ্চিত হইতে থাকে। পরিশ্রম যত অধিক হয়, ততই সঞ্চয় অধিক হয়।

মানুষ বিশেষের যে নিয়ম—জাতি সম্বন্ধেও সেই, নিয়ম—কেননা, মানুষের সমষ্টি লইয়াই জাতি সংগঠিত। যে জাতি যত অধিক পরিশ্রমী হয়, সেই জাতি তত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে। যে জাতির সেই সঞ্চিত পরিশ্রমের দ্বারা জাতীয় অর্থের বৃদ্ধি হয়, সে জাতির উন্নতি হয়। যে জাতি অল্প পরিশ্রমী, সে জাতির অবনতি হয়, সে জাতি ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়ে।

ভারত-সন্তান সাধারণতঃ ক্রমে অলস হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান ভারত এখন তামস-ভাবাপন্ন। নিদ্রা, আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা প্রভৃতি তামস প্রকৃতিযুক্ত লোকের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম। আমরা এক্ষণে তামসিক প্রকৃতি যুক্ত হইয়া পড়িতেছি বলিয়া আমরা অলস হইয়া যাইতেছি। ইহাই আমাদের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ।

দ্বিতীয় কথা, আমার আহার্য্য প্রভৃতি সংগ্রহ জন্য পরিশ্রম যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ ভূমিরও প্রয়োজন। আমাদের প্রধান খাদ্য ভূমিজ। আমরা যে মাংস ভক্ষণ করি, তাহাও এক হিসাবে ভূমিজ—কেননা, সে সকল জীব ভূমিজ খাদ্য ভক্ষণেই বর্দ্ধিত হয়। আমাদের সেইজন্য ভূমির প্রয়োজন। কৃষকের ক্ষেত্র প্রয়োজন। পশুরক্ষা ও পশুপালন জন্য ভূমির প্রয়োজন। আবার যাহারা শিল্পী—তাহাদের ভূমির প্রয়োজন। কেননা, ভূমিজ উপকরণ দ্বারাই শিল্প সম্ভব। ক্ষেত্র হইতে কার্পাস উৎপাদন না করিলে বস্ত্র বয়ন চলে না। সকল শিল্প সম্বন্ধেই এই কথা।

অতএব আগে ভূমি না পাইয়া আমাদের পরিশ্রম করিবারও উপায় নাই। ভূমি পাইতে হইলে যদি কর দিতে হয়, তবে সেই অর্থ আমাদের পরিশ্রমের ফলে সঞ্চিত বলিয়া, পরিশ্রম দ্বারাই আমাদের ভূমি সংগ্রহ করিতে হয়, ইহা বলা যাইতে পারে। অতএব ভূমি পাইতে হইলে কতক পরিমাণে সঞ্চিত শক্তি ক্ষয় করিতে হয়। যেখানে ভূমির কর অধিক, সেই জন্য, সেখানে দারিদ্র্যের কারণ বর্ত্তমান থাকে। যে সকল কৃষকের পরিশ্রম শক্তি অধিক নহে, তাহারা ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না। তাহাদের উপযুক্ত রূপে আহার সংগ্রহ হয় না।

তাহার পর অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে অন্য কথা

বুঝিতে হইবে। মনে করা যাউক, আমি পরিশ্রম করিয়া—কর্ম্ম-শক্তি ব্যয় করিয়া শস্য উৎপাদন করিতেছি, তুমি বস্ত্র বয়ন করিতেছ। আমাদের শস্য-বিনিময় দ্বারা পরস্পরের অভাব পূরণ হইতে পারে। কিন্তু যদি আমরা উভয়েই বস্ত্র বয়ন করি বা উভয়েই কেবল শস্য উৎপাদন করি, তবে আমরা উভয়েই অভাব যুক্ত হইব। হয় বস্ত্রের অভাব হইবে, না হয় শস্যের অভাব হইবে। অতএব সমাজ মধ্যে উৎপাদন এরূপ ভাবে নিয়মিত হওয়া আবশ্যক যে, এরূপ গোলযোগ না হয়। উপযুক্ত কর্ম্ম বিভাগ ও বর্ণ বা জাতি বিভাগ দ্বারা সে গোলযোগ দূর হইতে পারে। এই কর্ম্ম ও বর্ণ বিভাগ রাজার দ্বারা,সমাজের দ্বারা বা ধর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে। অথবা অবাধ প্রতিযোগিতা দ্বারা তাহা ক্রমে ক্রমে নিয়মিত হয়। কিন্তু এই বিভাগ ধর্ম্মভিত্তির উপর স্থাপিত হইলেই ভাল হয়। অবাধ প্রতিযোগিতার ফল কখন শুভ হয় না। সে বিষয় এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

ভারতে অবাধ প্রতিযোগিতা অধিক নাই। সুতরাং সেই কারণে ভারতের দরিদ্রতা বৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু ভারতবাসীদের মধ্যে যে তামসিক শক্তি বিকাশের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার স্থলে স্বার্থ-সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। তাহা আমাদের অবনতির এক কারণ।

কিন্তু ভারতের দরিদ্রতার যাহা মূল কারণ, তাহা স্বতন্ত্র। সে কারণ—ভারতের অধীনতা। বিদেশীয় রাজার অধীনতায় ভারত দিন দিন অবনত হইতেছে। তাহারই ফলে ভারতের দরিদ্রতা বৃদ্ধি হইতেছে। যে ভারতবর্ষ স্বর্ণপ্রসূ বলিয়া বিখ্যাত, তাহা এখন দারিদ্র্যের ক্রীড়াভূমি। বিদেশীয় রাজনীতি, বিদেশীয় অর্থনীতির ফলে ভারতের দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য।

বিলাতী মূলমন্ত্র স্বার্থ। বিলাতী পণ্ডিতগণের অর্থশাস্ত্র এই স্বার্থের উপর সংগঠিত। কুক্ষণে ডারউইন সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, প্রতিযোগিতাই উন্নতির মূল সূত্র, তিনি কুক্ষণে বুঝাইয়াছিলেন, "in the struggle for existence the fittest only survives." তিনি স্বার্থকেই কর্ম্মচেষ্টার মূলসূত্র "struggle for self existence" প্রতিপন্ন করিয়া যে মহা অনিষ্ট করিয়াছেন, তাহা কত দিনে নিবারণ হইবে, কে বলিতে পারে? জগতে বাস্তবিক কর্ম্মের মূলসূত্র দুইটী, struggle for self-existence এবং struggle for existence for others. স্বার্থ ও পরার্থ বৃত্তি চালিত হইয়াই জীব কর্ম্ম চেষ্টা করে। জীব নিজের আহার অন্বেষণ জন্য স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু জীব অন্যদিকে আবার জাতিরক্ষণ জন্য বংশরক্ষা জন্য আত্মত্যাগ করে। নিজ বংশরক্ষা জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া পরার্থ কর্ম্ম করে। এইজন্য, এই পরার্থ বৃত্তিকে এক অর্থে মাতৃশক্তি বলা হয়।

মানুষে এই পরার্থ বৃত্তি বিশেষ পরিস্ফুট। আর এই পরার্থ বৃত্তির প্রাধান্য জন্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই জন্য যে প্রকৃত মানুষ, সে স্বার্থ অপেক্ষায় পরার্থ-বৃত্তি চালিত হইয়াই কর্ম্ম করে। যে বলবান সে দুর্ব্বলকে ধ্বংস করে না, সে দুর্ব্বলকে রক্ষা করে। দুর্ব্বল শিশুকে পিতা মাতা যেমন নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াও রক্ষা করে,তেমনই দুর্ব্বল প্রতিবেশীকে বলবান নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া রক্ষা করে।

যে জাতির মধ্যে এই পরার্থবৃত্তির অধিক স্ফূর্ত্তি হয়, সেই জাতিই উন্নত হয়। কিন্তু এস্থলে সে কথা আলোচ্য নহে।

বিলাতী পণ্ডিতেরা এই পরার্থবৃত্তি স্বীকার করেন না। বিলাতী অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিত প্রতিযোগিতাকেই মূলমন্ত্র মনে করেন। তাঁহারা এই পৃথিবীকে মহাসমরক্ষেত্র মনে করেন। তাঁহাদের মতে—সবলের সহিত সর্ব্বদাই দুর্ব্বলের সংগ্রাম চলিতেছে। সবল দুর্ব্বলকে পরাস্ত করিয়া শেষে ধ্বংস করিতেছে। যিনি বিলাতী অর্থশাস্ত্র পড়িয়াছেন, তিনি জানেন যে, তাহার অক্ষরে অক্ষরে এই মূল মন্ত্র নিহিত রহিয়াছে।

এই মূলমন্ত্র অনুসারেই ইংলণ্ড তাহার অধীনস্থ দেশকে শাসন করেন। সুধু ইংলণ্ড কেন, সমস্ত ইউরোপ মহাদেশেই এই কথা। ইংরাজ এখন প্রবল জাতি। ইংরাজের কর্ম্মশক্তি বিশেষ পরিস্ফুট। ইংরাজের মত কর্ম্মবীর এখন কে আছে? এই কর্ম্মশক্তির অনুশীলন দ্বারা ইংলণ্ড ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। এবং তাহার ফলে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে। সেই সঞ্চিত অর্থকে ইংলণ্ড আবার কর্ম্মশক্তিতে পরিণত করিতেছে। সেই অর্থবলে কত কলকৌশল সৃষ্টি হইয়াছে। এই অর্থ বলেই ষ্টীম এঞ্জিন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। একটী ষ্টীম এঞ্জিন কত লোকের বল ধরে? এইরূপ কত ষ্টীম এঞ্জিন কত কারখানায় ব্যবহৃত হইতেছে। সুতরাং ইংলণ্ডের কর্ম্মশক্তি এক্ষণে কত যে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই ইংলণ্ডের সহিত প্রতিযোগিতায় কয়টী জাতি সমর্থ হইতে পারে? কাজেই ইংলণ্ড এখন সর্ব্বগ্রাসী হইয়া বসিয়াছে। ইংলণ্ড আমাদের শিল্প গ্রাস করিয়াছে—বাণিজ্য গ্রাস করিয়াছে। ভারতবর্ষই শিল্পের জন্মভূমি। ভারতে সকল প্রকার শিল্পের উন্নতি ও বিস্তার হইয়াছিল। ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য সর্ব্বদেশে গৃহীত হইত। ভারতের মস্‌লিন, কিংখব, শাল প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য অন্যত্র আদৃত হইত। সে শিল্প এখন কোথায়? ভারতের তন্তুবায় সম্প্রদায় কোথায় তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। আজ সামান্য বস্ত্র খণ্ডের জন্য ভারত ম্যান্‌চেষ্টারের মুখাপক্ষী! এই শিল্পের বিনাশের কারণ কি? সেই সর্ব্বগ্রাসী প্রতিযোগিতা। ইংলণ্ড কর্ম্ম শক্তিতে সিংহাবতার। ভারত ক্ষুদ্র মেষ-শাবক। সিংহ আসিয়া আজ মেষকে বলিতেছে, আইস তোমার সহিত সমকক্ষতা করিব—দেখি, প্রতিযোগিতার সংগ্রামে কে পরাস্ত হয়। কে এমন আছে যে, সেই অস্বাভাবিক অসঙ্গত সংগ্রাম বন্ধ করিতে পারে? কাজেই সিংহ মেষকে গ্রাস করিয়াছে। কাজেই ভারতের শিল্পের লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

বিলাতী অর্থ শাস্ত্রের এই প্রতিযোগিতা নীতির আর এক কুফল-অবাধ বাণিজ্য। আমরা এই কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। মনে করা যাউক, আমি, তুমি ও আর একজন এই তিনজনে এক সমাজবদ্ধ। আমি সামান্য শক্তি সম্পন্ন, আমি কেবল শস্য উৎপাদন করিতে পারি। তুমি আমা অপেক্ষা শক্তি সম্পন্ন, তুমি বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পার। যে তৃতীয় ব্যক্তির কথা বলিয়াছি, তাহার শস্যের প্রয়োজন হইলে, সে আমার কাছে শস্য লইবে। তাহার বস্ত্রের প্রয়োজন হইলে তোমার কাছে বস্ত্র লইবে। মনে কর, তুমি বস্ত্র বিক্রয়ের দ্বারা অধিক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছ। তুমি যদি তখন মনে কর যে, তুমি

অধিক শক্তিশালী বলিয়া ও সঞ্চিত অর্থ শক্তি বলে তুমি বস্ত্র ও শস্য উভয়ই অনায়াসে প্রস্তুত করিতে পার। এবং তদনুসারে তুমি বস্ত্র ও শস্য উভয় প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে। আমার অপেক্ষা তোমার অধিক সুবিধা, সুতরাং তুমি অন্য অপেক্ষা সুলভে হয়ত শস্য বিক্রয় করিতে পারিলে। তাহা হইলে, সেই তৃতীয় ব্যক্তি আমার শস্য ত্যাগ করিয়া তোমারই নিকট শস্য ক্রয় করিল। সুতরাং আমার শস্য বিক্রয় হইল না। তখন আমার উপায় কি? তুমি যদি তোমার অধিক লাভের আশা ত্যাগ করিয়া আমায় না রক্ষা কর, তবে আমার উপায় কি? হয়ত আমাকে রাজা বা সমাজ রক্ষা করিবেন। না হয় ত তুমি সমাজের প্রচারিত বর্ণ ধর্ম্ম পালন করিয়া—নিজের স্বার্থ সংযত করিয়া আমায় আপনিই রক্ষা করিবে। অথবা যদি তোমার জ্ঞান ও পরার্থ বৃত্তির অধিক বিকাশ হইয়া থাকে, তবে এরূপ বর্ণের বন্ধন ও কর্ম্ম-বিভাগ না থাকিলেও, তুমি আমার রক্ষার জন্য অধিক লাভের আশা ত্যাগ করিতে পার। কিন্তু সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ যাহার প্রকৃতি বাণিজ্য দ্বারা অর্থ-লাভ-চেষ্টা-নিরত, সে এরূপ পরার্থবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে না। আমি, তুমি ও তৃতীয় ব্যক্তি যদি এক সমাজভুক্ত হই, তবে রাজার, সমাজের বা ধর্ম্মের শাসনে আমরা নিয়মিত হইতে পারি। অথবা পূর্ব্বে যে অবাধ প্রতিযোগিতার কথা বলিয়াছি, তাহা প্রবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে আমার ধ্বংস হইয়া যাইবে। হয়ত অবশেষে সমাজ তোমার মত কয়েকটী মাত্র কর্ম্মশক্তি-সম্পন্ন লোক দ্বারা ক্রমে সংগঠিত হইবে।

কিন্তু মনে কর, আমরা তিনজন তিন বিভিন্ন সমাজের লোক। তুমি ইংরাজ-শিল্পকার, আর আমি ক্ষীণবল ভারতীয় শিল্পকার। তৃতীয় ব্যক্তির বস্ত্র প্রয়োজন হইয়াছে, তুমি ও আমি উভয়ে তাহার নিকট বস্ত্র বিক্রয়ার্থ লইয়া আসিয়াছি। তোমার সুবিধা অধিক, তুমি আমা অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করিতে পারিলে। সুতরাং যে খরিদদার তৃতীয় ব্যক্তি, সে তোমারই নিকট বস্ত্র ক্রয় করিবে। সুতরাং আমার বস্ত্র আর বিক্রয় হইবে না। আমার এমন শক্তি নাই যে, আমি বস্ত্র ছাড়িয়া অন্য দ্রব্য প্রস্তুত করিব। যদি করি, তবে তুমি তাহাতে এইরূপে প্রতিযোগী হইলে। এ অবস্থায় আমাকে কে রক্ষা করিবে? যদি কেহ রক্ষা না করে, তবেত আমি বিনাশের মুখে অগ্রসর হইব। তুমি নিজে প্রতিযোগিতা মন্ত্রে দীক্ষিত। তুমি দুর্ব্বল বলিয়া আমাকে রক্ষা করিবে না। তবে আমার উপায় কি? আমার উপায় একমাত্র রাজা। রাজা তখন আমায় রক্ষা করিতে পারেন। রাজা দেখিলেন, আমি যে বস্ত্র পাঁচ সিকায় বিক্রয় করিতে পারি, তুমি তাহা এক টাকায় বিক্রয় করিতে পার। রাজা তখন তোমার নিকট ঐ বাকী চারি আনা কর স্বরূপ চাহিলেন। (ইহাই Tariff duty)। কাজেই তোমাকেও আমার সহিত একদরে ঐ কাপড় বিক্রয় করিতে হইল। অবশ্য খরিদদার তৃতীয় ব্যক্তি এক টাকায় ঐ কাপড় পাইল না বলিয়া তাহার আপত্য হইতে পারে। কিন্তু সে ত আমার সমাজভুক্ত। সেও ত তোমার সহিত প্রতিযোগিতায় ঐরূপে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং সে আত্মরক্ষার জন্য ঐ অধিক মূল্যেই কাপড় নিতে আপত্য করিবে না—অন্ততঃ তাহার সেরূপ আপত্য করা কর্ত্তব্য নহে।

কিন্তু বিদেশীয় রাজা আমায় সেরূপ রক্ষা করিবেন না। তিনি প্রতিযোগিতা-নীতির অনুবর্ত্তী। তিনি আমায় বলিবেন, তুমি কাপড় প্রস্তুত করিতে পারিতেছ না, অথবা প্রতিযোগিতা জন্য তুমি সস্তায় কাপড় বিক্রয় করিতে পরিতেছ না—তাহাতে ক্ষতি কি? তুমি কৃষি অবলম্বন কর। অথবা অন্য যে দ্রব্য তুমি সস্তায় প্রস্তুত করিতে পার, তাহাই কর। সুতরাং আমি ছিলাম তন্তুবায়, আমায় হইতে হইল কৃষক। এই রূপে ভারতে কৃষকের দল দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাতে যে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইয়াছে, তাহা নহে। সকলেই জানেন, ভারতে কৃষকের অবস্থা বড় শোচনীয়। ভারতে কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি—ও শিল্পীগণের কৃষক হওয়াই প্রধান কারণ। কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু সেই পরিমাণে কর্ষণোপযোগী ভূমির ত বৃদ্ধি হয় নাই। এইস্থানে প্রতিযোগিতা আসিয়া পড়িয়াছে। ভূমির কর বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু কৃষকের অবস্থা ভাল হয় নাই। কেবল কৃষকের মধ্যে বর্ণশঙ্কর হইয়াছে মাত্র।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

রাজ-গৃহ। (২)

ধূলি উড়াইয়া আমাদের গাড়ী চলিল, গতবারে লিখিয়াছি। প্রাতে উঠিয়া দেখি, আমরা যেন ধূলির মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছি। বিছানা, পরিধেয় বস্ত্র ও মস্তক, সব ধূলিতে আবৃত। এরূপ ধূলির অত্যাচারে আমরা আর কখনও পড়ি নাই। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, সূর্য্যের নবীন তেজে মাতিয়া বায়ু তীব্রভাবে বহিতে লাগিল—তাহাতে ধূলি উড়াইয়া সময়ে সময়ে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় করিতে লাগিল। এক এক বার বায়ুর প্রকোপ থামে, আর আমরা বিছানা ঝাড়ি, আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে বিছানার উপর দুই আঙ্গুল স্তর হইয়া ধূলি পড়ে। কার্ত্তিক মাসে পদ্মার জল থিতাইয়া দেখিয়াছি, এক অঙ্গুলি পরিমাণ মাটী পাত্রের নীচে জন্মিয়াছে। আজ রাজগৃহের রাস্তায় বায়ু-থিতান ধূলি-রাশি দেখিলাম। একে রৌদ্রের আক্রমণ, গাড়ীর তেমন ছাউনি নাই, অর্দ্ধেক তাল-পত্রে আবৃত, অর্দ্ধেক খালি,তার উপর ধূলির প্রবল তরঙ্গাভিঘাত। আমার অসুস্থ শরীর ক্রমেই বিকৃত হইতে লাগিল। আমি যেন আর আমাতে নাই, মরণের কোলে যেন ঢলিয়া পড়িয়াছি। সে জীবন-মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা করিতে পারি, আমার সে সাধ্য নাই।

বেলা প্রায় ১০ টার সময় গাড়ী শিলাও গ্রামে পৌছিল। এখানে একটী বড় বাজার আছে, ডাকঘর আছে, থানা আছে। অনেক দোকান,অনেক বাড়ী;—অনেক ঘরেই খোলার ছাউনি, মাটীর দেয়াল। পাকা বাড়ীও আছে। এই স্থানে উৎকৃষ্ট খাজা, খুব সরু চিড়া পাওয়া যায়। কিন্তু কে বা কেনে, কে বা খায়? ধূলিতে আবৃত হইয়া আমরা

গতবারে ম্যাপে স্থান চিহ্নিতকরণে যে দুটী ভুল হইয়াছে, তাহা এই। সরস্বতী নদীর নাম স্পষ্ট লেখা আছে। (ঙ) চিহ্নিত স্থানে সপ্তঋষিকুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড; (চ) এই স্থানে জরাদেবীর (জরা-রাক্ষসীর) প্রাচীন মন্দির। গতবারে মুদ্রাকরের দোষে মুকদুম সাহের নাম দুমদুম হইয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি।

আহার নিদ্রা ভুলিয়াছি। ভৃত্যের দ্বারা থানার পত্র পাঠান হইল। থানার লোক রাজগৃহ গ্রামের কনেষ্টবলকে আমাদের পত্র দেখাইতে বলিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। পোষ্ট-মাষ্টার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে কালীপ্রসন্ন বাবু অনুরোধ করিয়াছিলেন, লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তিনি ডাক-ঘরে নাই। শিলাও গ্রাম দেখিয়া এই স্থানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ থাকে না। খুব বৰ্দ্ধিষ্ঠ গ্রাম। এখান হইতে আর চারি মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে রাজগৃহ। বিহার হইতে রাজগৃহের দুটী পথ—একটী পথ গিরিয়াক হইয়া গিয়াছে, সে পথে রাজগৃহ আঠার মাইল, শিলাওর পথ ১৫ মাইল। বিহারের পশ্চিম দক্ষিণ দিয়া পঞ্চানন নদ চলিয়া গিয়াছে। তাহার বক্ষ শুষ্ক—বালুকা-ময়। আমরা প্রায় ১২টার সময় রাজ-গিরি-গ্রামে পৌছিলাম। রাজ-গিরি গ্রামে পৌছিলেই লোকনাথ পাণ্ডা আমাদিগকে সাদর-সম্ভাষণ করিলেন। পুলিসের লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। প্রায় ½ মাইল দূরে ইনস্পেকসন-বাঙ্গালায় গাড়ী পৌছিবার পূৰ্ব্বেই, সোজা পথে যাইয়া, লোকনাথ বাঙ্গালার চাপরাশি রামলালকে সংবাদ দিয়াছেন। রামলাল এবং লোকনাথ আমা-দিগকে সাদরে গ্রহণ করিল। উত্তপ্ত দেহে আমরা বৃক্ষতলায় গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বাঙ্গালার আশ্রয় লইলাম। মধ্যাহ্নে আমাদের আহারের সুবিধা হইল না, প্রখর রৌদ্রে ক্লান্ত,শ্রান্ত, অবসন্ন দেহ, কে আর কি প্রস্তুত করিবে? আমরা অতি কষ্টে যাইয়া সপ্তধারা ও ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিলাম। স্নানান্তে যেন জীবন পাইলাম। এই মরু-ভূমির মধ্যে ক্রমাগত উষ্ণ জল উঠিতেছে এবং পড়িতেছে। এক আশ্চর্য্য দৃশ্য! আমা-দের সকল শ্রান্তি এবং ক্লান্তি যেন দূর হইল। স্নানের পরেই যেন নব জীবন পাইলাম। এরূপ বিমল সুখ জীবনে অতি অল্পই পাইয়াছি।

আমবাগানের মধ্যে ছোট ইনস্পেকসন বাঙ্গা-লা—দুটী ঘর, দুটী বাথরুম এবং দুটী বারাণ্ডা। আমবৃক্ষের মধ্যে মধ্যে মোহুয়া গাছও আছে। সাহেবেরা আসিয়া এখানে থাকেন। রাম লাল এক খানি পুস্তক দেখাইল। তাহাতে দেখিলাম, আমাদের বাঙ্গলার গৌরব শ্রীযুক্ত বি, এল, গুপ্ত এবং বরিশালের উকীল বাবু দ্বারকানাথ দত্ত মহাশয়গণ আমাদের পৌছার দুইমাস পূৰ্ব্বে রাজগিরি পরিদর্শনে আসিয়াছি-লেন। নব্যভারতে রামলাল বাবুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর ইঁহারা যে রাজগৃহে আসিয়াছিলেন,তাহাতে সন্দেহ নাই। ঘর দুটীতে প্রয়োজনীয় চেয়ার টেবিল সমস্তই আছে। একটু দূরে একখানি রান্নাঘর আছে। দৈনিক ভাড়া ॥০। শুনিলাম, ছোট লাট চার্লস্ ইলিয়ট এখানে আসিয়াছিলেন।

রাজগৃহ সম্বন্ধে অনেক কথাই পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন। এই স্থানে যাহা যাহা দেখিয়াছি, পরে বিবৃত করিব। এই স্থান সম্বন্ধে মহাভারতে কি পাওয়া যায়, তাহার কিছু উল্লেখ করিতেছি—

"যুধিষ্ঠির কহিলেন,হে কৃষ্ণ, জরাসন্ধ কে? তাহার বলবীর্য্যই বা কত? শলভ-সদৃশ জরাসন্ধ অগ্নিতুল্য তোমাকে স্পর্শ করিয়া কেনই বা দগ্ধ হয় নাই।"

এই কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ মগধদেশের বৃহদ্রথ নামক নরপতির বিস্তৃত পরিচয় দিয়া চণ্ডকৌশিক মুনির ফলপ্রদানের কথা বিবৃত করেন। সেই ফল বৃহদ্রথ পত্নীদ্বয়কে প্রদান করেন। ঐ ফল ভক্ষণে রাণীদ্বয়ের গর্ভ সঞ্চার হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে—

"হে মহাপ্রাজ্ঞ মহীপতে! অনন্তর দশমাস পূর্ণ

হইলে ঐ দুই রাজমহিষী দুইখণ্ড শরীর প্রসব করিলেন এবং উহাদের প্রত্যেকের এক চক্ষু, একবাহু, এক চরণ, অর্দ্ধমুখ, অর্দ্ধ উদর ও অর্দ্ধ চিবুক অবলোকন করিয়া উভয়ে ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। অবলা ভগ্নীদ্বয় তখন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর পরামর্শ পূর্ব্বক ঐ জীবিত খণ্ডদ্বয় অতিদুঃখে পরিত্যাগ করিলেন। উঁহাদের দুই জন ধাত্রী ঐ খণ্ডিত গর্ভদ্বয় সুন্দররূপে আবৃত করত অন্তঃপুর হইতে নির্গমন পূর্ব্বক কোন চতুষ্পথে লইয়া গিয়া নিক্ষেপ করিয়া আসিলেন। হে নরবর! মাংস শোণিত-ভোজিনী জরা নাম্নী কোন রাক্ষসী ঐ প্রক্ষিপ্ত দেহ খণ্ডদ্বয় গ্রহণ করিল। ঐ রাক্ষসী তখন বিধিবল-প্রেরিতা হইয়া সহজে বহন করিবার আশয়ে সেই উভয় শরীর খণ্ড একত্র করিল। হে পুরুষর্ষভ! ঐ অর্দ্ধ কলেবর যুগল দেহ পরস্পর সংযোজিত হইবামাত্র মূর্ত্তিধারী এক বীরকুমার হইল।"

এই সন্তানকে জরা রাক্ষসী বৃহদ্রথ রাজাকে উপহার দিয়া বলিল—

"হে ধার্ম্মিক, অদ্য তোমার পুত্রের খণ্ডিত শরীরদ্বয় অবলোকন করিয়া দৈবযোগে যেমন একত্রিত করিলাম, অমনি উহা একটী কুমার হইয়া উঠিল। মহারাজ, তোমার ভাগ্যক্রমেই এরূপ হইয়াছে, আমি কেবল ইহাতে উপলক্ষ মাত্র। আমি সুমেরুকেও ভক্ষণ করিতে পারি, তোমার এই বালকের ত কথাই নাই, কেবল তোমার গৃহে সর্ব্বদা পূজিত হই বলিয়াই সন্তোষ প্রযুক্ত ইহাকে তোমাকে প্রত্যর্পণ করিলাম।"

"শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, রাক্ষসী এই সকল কথা কহিয়া ঐ স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইল। রাজা বৃহদ্রথ স্বীয় কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার জাতকর্ম্ম সকল করাইলেন এবং সমস্ত মগধ রাজ্যে রাক্ষসী উদ্দেশে মহোৎসব করিতে আজ্ঞা দিলেন। অপিচ, ব্রহ্মার তুল্য ঐ নরপতি "জরারাক্ষসী ইহাকে সন্ধিত অর্থাৎ সংযোজিত করিয়াছে, অতএব ইহার নাম জরাসন্ধ হইল" এইরূপ স্থির করিয়া সেই বালকের নামকরণ করিলেন।" মহাভারত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, সভাপর্ব্ব, ২২৭ পৃষ্ঠা।

জরারাক্ষসীর পূজা এই রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। জরারাক্ষসীর মন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে। শুনিয়াছি, প্রাচীন প্রস্তরময় জরাদেবীর মূর্ত্তি অপহৃত হইয়াছে, এখন যে প্রস্তরময় মূর্ত্তি আছে, তাহা পরে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটী খুব প্রাচীন সন্দেহ নাই। এখানে রীতিমত পূজা হইয়া থাকে। কখন কখন ছাগ মহিষও বলি-প্রদান হইয়া থাকে।

রাজসূয় যজ্ঞের সময়ে জরাসন্ধকে পরাজয় করিতে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দিয়া বলেন যে, জরাসন্ধ পরাজিত না হইলে রাজসূয় যজ্ঞ হইবে না। যুধিষ্ঠিরের অনুমতি হইলে—

"বিপুলতেজস্বী কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন, তিন ভ্রাতায় সুহৃদগণের রুচির বাক্য দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া বর্চ্চস্বী স্নাতক ব্রাহ্মণগণের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক মগধরাজের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। * * * ঐ কৃষ্ণার্জ্জুন ও ভীমসেন কুরুদেশ হইতে প্রস্থান করত কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া রমণীয় পদ্ম সরোবরে গমন করিলেন, পরে কালকূট অতিক্রম করিয়া গণ্ডকী, সদানীরা, শর্করাবর্ত্ত এবং এক পর্ব্বতকন্দরস্থ নদী সমুদায় ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া চলিলেন। অনন্তর তাঁহারা মনোরমা সরযূ অতিক্রম পূর্ব্বক পূর্ব্ব-কোশলদেশ সমুদায় দর্শন করিয়া মিথিলা এবং মালা ও চর্ম্মন্বতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া প্রস্থিত হইলেন। তৎপরে গঙ্গা ও শোণ পার হইয়া সেই অক্ষয় উৎসাহসম্পন্ন বীরত্রয় তখন পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করতঃ কুশাম্ব দেশের বক্ষঃস্থল স্বরূপ মগধ রাজ্যের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সলিল-সমাকীর্ণ গোধনপূর্ণ ও মনোহর বৃক্ষবিশিষ্ট গোরথ-নামক পর্ব্বতে উত্তীর্ণ হইয়া মগধরাজ্যের পুরী দর্শন করিলেন। * * * উহা বিলক্ষণ পশুসম্পন্ন, নিয়ত জলযুক্ত, উপদ্রব শূন্য, এবং সুন্দর গৃহ সমূহে সুশোভিত। উচ্চ শৃঙ্গান্বিত, শীতলদ্রুম-বিশিষ্ট, পরস্পর সংযুক্ত বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক, এই পঞ্চশৈল যেন একযোগ গিরিব্রজ নগরকে রক্ষা করিতেছে। * * * পরে তাঁহারা হৃষ্টপুষ্ট জনাকীর্ণ, সর্ব্বদা উৎসাহান্বিত, অন্যের অধৃষ্য, চাতুর্ব্বর্ণ পরিপূরিত গিরিব্রজ নগরে উপস্থিত হইলেন এবং পুরদ্বারের নিকটস্থ না হইয়া বৃহদ্রথ রাজের পরিজন ও নাগরিক প্রজাবর্গের পূজিত, মাগধদিগের সুরুচির, সমুন্নত চৈত্যকশৃঙ্গ ভেদ করিলেন।" ঐ ঐ সভাপর্ব্ব, ২২৯ পৃষ্ঠা।

মহাভারতের কথা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম। রামায়ণেও গিরিব্রজের কথা উল্লিখিত আছে। বায়ুপুরাণেও রাজগৃহের বর্ণনা আছে। * এস্থান, কত প্রাচীন পাঠকগণ বুঝিতেছেন। যে হিসাবেই ধরা যাউক, প্রায় ৩৫০০ সহস্র বৎসরের এই স্মৃতি-চিহ্ন। ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। এমন জীবন্ত কীর্ত্তি ভারতের আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়?

ফাহিয়ান অনুমান ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। † তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে রাজগৃহের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

"Fahian then visited Raja-griha, the new town built by Ajatasatru, as well as the old town of Bimbisara."
Ancient India, p. 510.

হুয়েনসাঙ ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন পরিত্যাগ করিয়া ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন। এবং বহুবর্ষ ভারতে থাকিয়া ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃ চীনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি রাজগৃহ পরিদর্শন করেন। ‡

যাঁহারা মহাত্মা বুদ্ধদেবের জীবনচরিত বিশেষরূপ অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন, রাজগৃহ এই মহাত্মার পূত চরণরেণুতে পবিত্র হইয়াছে। তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং শেষে রাজগৃহে উপস্থিত হন।

"রাজগৃহ তখন মগধ রাজ্যের রাজধানী। বিম্বসার রাজগৃহের প্রতাপান্বিত নরপতি। বিন্ধ্যাচলের পাঁচটী শাখা-শৈল এই নগরকে পরিবেষ্টন করিয়া ইহার স্বাভাবিক রমণীয়তা আরো বৃদ্ধি করিয়াছে। এই সকল শৈলের নিভৃত কন্দরে কন্দরে তপস্বীগণ জনকোলাহলের অতীত থাকিয়া অপর নাগরিক সর্ব্বপ্রকার সুবিধা সম্ভোগ করিয়া চিন্ময় পরমেশ্বরের ধ্যানধারণায় জীবন অতিক্রম করিতেন। সিদ্ধার্থ নগরের পার্শ্বস্থিত পাণ্ডব-শৈলের* এই নির্জ্জন গুহায় আবাসস্থান নিরূপিত করিলেন।" কৃষ্ণকুমার বাবুর বুদ্ধদেব চরিত, ৬২পৃষ্ঠা।

মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন, খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধের প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছিল। গঙ্গার দক্ষিণে রাজগৃহে বিম্বসারের রাজধানী সংস্থাপিত ছিল।† গৌতম সংসার ত্যাগ করিয়া এইস্থানে প্রথম সাধন করিয়াছিলেন। যাঁহারা সিদ্ধার্থের জীবন-বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন, বিম্বসারের সহিত বুদ্ধের কি সম্বন্ধ এবং কত দিন কতবার এই পঞ্চ পাহাড়ে তিনি বিহার করিয়াছিলেন। রাজগৃহের বনে বনে আজও তাঁহার অসংখ্য প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে। সে সকল এখন জৈনদিগের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু মূর্ত্তি সকলের আকৃতি দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, সকলই বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। অজাতশত্রুর পিতা মহাত্মা বিম্বসার বৌদ্ধ ধর্ম্মে যখন বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইলেন, সেই সময় হইতে এই সকল মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইয়া থাকিবে। সে আজ কত দিনের কথা, ভাবিলেও বিস্মিত হইতে

---

* নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩, ৭১ পৃষ্ঠা।

† Ancient India, by R. C. Dutta, p. 506.

‡ "Houen Tsang came to Rajagriha, the old Capital of Magadha at the time of Ajatasatru and Bimbisara. The outer walls of the city had been destroyed, the inner walls still remained in a ruined state, and were 5 miles round." *Ancient India, p. 527.*

* কনিংহাম সাহেব বলেন, অধুনা যাহাকে রত্নগিরি বলে, পূর্ব্বে তাহারই নাম পাণ্ডবশৈল ছিল।

† Rajagriha, as we have stated before, was the capital of Bimbisara, King of the Magadhas, and was situated in a valley surrounded by 5 hills. Some Brahman ascetics lived in the caves of these hills, sufficiently far from the town for studies and contemplation, and yet sufficiently near to obtain supplies. Goutama attached himself first to one Alara, and then to another Udraka, and learnt from them all that Hindu philosophy had to teach."
Ancient India, p. 358.

হয়। প্রবাদ আছে যে, বিম্বসারের মহামায়ার মন্দিরে একদা লক্ষ ছাগবলি হওয়ার কথা ছিল। সেই দিন বুদ্ধদেব উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আশ্চর্য্য রূপে পরিবর্ত্তিত করেন।* ষষ্ঠবর্ষে তাঁহার পত্নীকে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের দীক্ষা প্রদান করেন। † বুদ্ধদেবের জীবনের মহত্ব পূর্ণ অংশ রাজ-গৃহে অতিবাহিত হইয়াছিল, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কুশাগ্রপুর মগধের রাজধানী, পঞ্চপাহাড় বেষ্টিত বলিয়া ইহার নাম গিরিব্রজ হইয়াছে। বহুকাল মগধের রাজধানী থাকা প্রযুক্ত ইহার নাম রাজগৃহ হইয়াছে। বায়ুপুরাণের এই শ্লোকটী রাজগিরির পাণ্ডাগণ সর্ব্বদাই উচ্চারণ করিয়া থাকে।

"বৈভারো বিপুলশ্চৈব রত্নকুটো গিরিব্রজঃ।
রত্নাচল ইতিখ্যাতা পঞ্চইতি পবনা নগা।
পঞ্চানাং শৈল মুখ্যানং মধ্যেমালেব রাজতে
সরস্বতী পুণ্যতোয়া পুণ্যারণ্যাদ্বিনিংসৃতা।"

গিরিব্রজ রামায়ণ এবং মহাভারতে জরাসন্ধের রাজধানী বলিয়া উক্ত। ‡

ফাহিয়ান বলেন, এই নগর নূতন রাজগৃহের ½ মাইল দক্ষিণে পঞ্চ পাহাড় বেষ্টিত। *

হুয়েনসাঙও এই কথা বলেন। ফাহিয়ান বলেন, পঞ্চপাহাড় যেন এই নগরের প্রাচীর। লঙ্কার পালি ইতিবৃত্তে এই পঞ্চপাহাড়ের নাম পৃথক। † মহাভারতে পঞ্চপহাড়ের নাম বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি এবং চৈত্যক। বর্ত্তমান সময় ইহাদের নাম (১) বৈভারগিরি, (২) বিপুলাচল গিরি (৩) রত্নগিরি ৪। উদয়গিরি, (৫) সোণগিরি। ইহা আমরা ম্যাপে প্রদর্শন করিয়াছি।

প্রাচীন রাজগৃহই যে এই, তাহার প্রমাণ কি, অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কনিংহাম প্রভৃতি মহাজনেরা এই স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্থানীয় প্রবাদ এবং ভৌগলিক বিবরণ মিলিয়া প্রমাণ করিয়াছে যে, এই রাজগিরিই প্রাচীন রাজগৃহ। রাজগৃহ হইতে গয়া ৩২ মাইল ব্যবধান। বুদ্ধগয়ার নিকটবর্ত্তী সমস্ত স্থানই সিদ্ধার্থের বিহার ক্ষেত্র। বুদ্ধগয়ার নিকটে এইরূপ পঞ্চসহাড়-বেষ্টিত স্থান আর নাই। বিশেষতঃ যে সকল স্মৃতি চিহ্ন রহিয়াছে, তাহা অকাট্য রূপে প্রমাণ করিতেছে যে, এই রাজগৃহই প্রাচীন রাজগিরি। সকল বিবরণ পাঠ করিলে পাঠকগণ মোহিত হইবেন।

* "The king was struck and pleased and with his numerous attendants, declared himself an adherent of Gautama and invited him to take his meal with him the next day."
Ancient India, p. 363.

† In the sixth year after spending the rains at Kosambi, Gautama returned to Rajagriha and Kshema, the Queen of Bimbisara, was admitted to the order.
Ancient India, p. 368.

‡ Lassen. Ind. p. 604.

* Beal's Fahian C. XXVIII. p. 112.

† Journ. A. S. Bengal, 1838, p. 996.

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

কবির হর্ষ।*

চিরস্নিগ্ধ মনোমদ মল্লি প্রতিভার
সুরভি হিল্লোলে যার কম্পিত পবন!
অলিনী গুঞ্জরি করে মধুর ঝঙ্কার
পঞ্চম আলাপি পিক করে কুহুস্বন—
সেই ঘ্রাণ তরপণ, অমৃতের সার,
জ্ঞানপুরী শ্বেতদ্বীপ, ক'রেছে মোহিত,
সুধী জনোচিত বুদ্ধি করিয়া বিস্তার,
বঙ্গের গৌরব জ্যোতি করিয়া বর্দ্ধিত।

হরষে শারদ নিশি ঢালে সুধারাশি
পুলকে কণ্টক কায়া—মর্ত্ত্য মন্দাকিনী,
বিহগ মঙ্গল তান করে আলাপন
হারিত সিচয়া বঙ্গ উঠিয়াছে হাসি,
এসো কৃতি! সঙ্গে ল'য়ে প্রতিভাদামিনী
তোমারে দেখিতে বঙ্গ বিচলিত মন।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

* শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বাঙ্গালী নামের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাই এই কবিতাটী লিখিত হইল। ইনি শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ চট্টোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি স্বর্গীয় হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। অতুলচন্দ্রের স্মরণ শক্তি ও দুরূহ বিষয় বিশ্লেষণ ক্ষমতা অদ্ভুত। দশম বর্ষের অতুলচন্দ্র স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে এক সময় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এই সভায় বাগ্মীবর সুরেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন, তিনি বালকের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হন ও পরিশেষে সভার মধ্যেই অতুলচন্দ্রকে আলিঙ্গন করেন। অতুলের বাল্যকালের অতুল ক্ষমতা যৌবনে পরিবর্দ্ধমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিজয়ার আলিঙ্গন।

অবনী মাঝারে ঊষা কিরণ বহিয়া
জানায় ভারত গৃহে আজিকে বিজয়া
কমনীয় অধরের লাবণ্য ছটায়,
ভারতের ম্লান মুখ বিশদ হাসায়।

স্নিগ্ধ আকাশ আর তত নীল নয়,
হেমন্ত-নীহারে সিক্ত প্রকৃতি-বলয়।
নব্যভারতের গৃহে কাঁদিতেছে ঊষা—
দেও দেও আলিঙ্গন—বিজয়ার ভূষা।

ভাবিয়াছ প্রাণময়ী বিশ্ব এ ক'দিন,
আজ কেন কর তায় আঁধার, মলিন?
মায়া সনে মহামায়া বেঁধেছে তোমায়,
মায়ায় রজনী আজ পূবেতে পোহায়।

নববেশে সাজিয়াছ, নবীন উৎসাহে,
পূজিয়াছ বিশ্বমাতা আপনার গৃহে,
ভারতে জননী-পূজা ঢালিয়া জীবন
দেখায় বিজয়া, করি স্নেহ আলিঙ্গন।

সেই স্নেহে নবীনতা মাখিয়ে যতনে
মিশে যাও ভায়ে ভায়ে—দু'জনে দু'জনে;
দেখিবে ভারত নব্য ভূষায় ভূষিত,
নব্যভারতও তায় হ'বে আলোকিত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার।

কোথায়?

১

লোকে বলে তুমি আর
নাহি এ জগত' পরে
আমি দেখি তুমি আছ
বিরাজিত চরাচরে।

বিশাল অচল-শিরে,
ক্ষুদ্র ধুলি-কণা-মাঝে,
ওই যে মুরতি তব
অপূর্ব্ব শোভায় সাজে।

সুনীল জলধি-জলে
ছোট বড় উর্ম্মি-মেলা,
তুমি ত সেথায় বসি'
করিতেছ জল-খেলা।

৪

নগন গগন-ভালে
শোভে যে পূর্ণিমা-ইন্দু,
তাহাতে উছলে তব
নিরুপম রূপ-সিন্ধু।

৫

নিশ্বাস তোমার সেত
বসন্তের সমীরণ,
প্রেম-হাসি নব উষা
এ জগতে অতুলন।

৬

বিকচ কুসুমে তব
শ্রীঅঙ্গ-সৌরভ ঢালা,
বরণ তরুণারুণ
ভুবন করেছে আলা।

৭

নিবিড় নীরদ-মালা
তোমার অলকাবলী,
সমীর পরশে মরি
আবেশে পড়িছে ঢলি'।

নদীবুকে কলগান,
কোকিলার' কণ্ঠস্বর,
সে তোমারি কলকণ্ঠ
মধুর মধুরতর।

৯

তবে তুমি কোথা নাই ?
মিছা খুঁজিবনা আর ;
এই যে রয়েছ তুমি
সাকারেতে নিরাকার।

শ্রীনগেন্দ্রবালা ঘোষ

বিকৃতি।

সে শ্রী স্নিগ্ধ সুশ্যামল নাহিক হেথায় ;
অকূল—অপার—ধূধূ—শ্মশান কেবল !
অমানিশা ঘনঘোর সন্তর্পণে হায়
বিরচিছে কি মরণ আতঙ্ক প্রবল !
বিকৃত হৃদয়-তন্ত্রী পিশাচের রোলে ;
স্পষ্ট নাহি বুঝা যায় কি বাজিছে তায় ;
যামিনীর সুনীরব প্রশান্ত বিরলে
নেত্র মুদি তথাপিও ধরা নাহি যায় !
জাগিয়া কি ঘুমাইয়া—মুগ্ধ কি মায়ায়,
মরি-বাঁচি করি সদা কাটিছে জীবন !
আবাল্য পোষিত আশা সংসার-বন্যায়
মিলায়ে গিয়াছে কোথা ; পড়িয়া এখন
কাদামাখা ভাঙ্গা-কূল নগণ্য জীবন !
অসীমে অসীম ভাব—স্বপ্ন সে এখন।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্থানাভাবে এবার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা গেলনা, আগামীবারে যাইবে। গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।

ভারত, মিসর ও খ্রীষ্টধর্ম্ম। (৫)

আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাব যিনি পড়িয়াছেন, কুসংস্কার-বর্জ্জিত হইলে তাঁহার নিকট প্রতিপন্ন হইয়া থাকিবে, যীশুর খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম যে ধর্ম্মজগতের ফল, সেই ধর্ম্মজগৎ পুরাতন ইহুদী ধর্ম্ম বা মোসেস এবং প্রফেট্‌গণের ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারিত Essenism এসিনিস্‌ম, গ্রীকদর্শনাদির মতামত এবং পরিশেষে ফাইলোর মিসরীয় ধর্ম্মমতে গঠিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের জন্মবৃত্তান্ত ও অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ শুনিয়া যীশুর শিষ্যগণ সম্ভবতঃ যীশুকেও তদ্রূপ বৃত্তান্ত ও ক্রিয়াকলাপে ভূষিত করিয়া থাকিবেন। পাপমলিনতা পরিহার করা যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের পরিশুদ্ধির উপায়, খ্রীষ্টধর্ম্মেও তাহা Doctrine of atonement। এমত কি, যীশুর শিষ্যগণ বৌদ্ধমঠের নিয়মাদি দেখিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের Church system বা খ্রীষ্টীয় আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম-প্রণালী সংগঠন করিয়া থাকিবেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলর (Max Muller) বলিতেছেন :—

"ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই অরণ্যবাসকে মনুষ্য জীবনের সম্বন্ধে একটী নূতন কল্পনা বলিয়া মনে করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসিদের জীবনের সহিত এই আরণ্য জীবনের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রভেদ এই, খ্রীষ্টীয় পর্ব্বত গুহা প্রভৃতি আশ্রয় স্থান অপেক্ষা ভারতের আশ্রম গুলি অধিকতর জ্ঞানোন্নত ও অধিকতর স্বাস্থ্য-সম্পন্ন ছিল। সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যবাস স্বীকারের বিষয় খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীরা বৌদ্ধগণ হইতে শিখিয়াছিলেন কি না, বৌদ্ধ ও রোমাণ ক্যাথলিকদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মানুগত ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে যে অসাধারণ সাদৃশ্য দেখা যায়, (যেমন মঠ, বিহার, অক্ষমালা, পুরোহিতের ক্রিয়া কলাপ) তাহা এক সময়ে ঘটিয়াছে কি না, এ সকল প্রশ্নের আজ পর্য্যন্ত কোন সুন্দর মীমাংসা হয় নাই।"

ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতি সম্বন্ধে হিবার্ট বক্তৃতা।

খ্রীষ্টানজাতি মধ্যে যাঁহারা উদারচেতা, সত্যসন্ধ পণ্ডিত তাঁহারাই বৌদ্ধগণ হইতে যে খ্রীষ্টানগণ সেই সমস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন; কিন্তু অবতারবাদী খ্রীষ্টানগণের পক্ষে সে মীমাংসা স্বীকার করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার।

বৌদ্ধ অশোকের শাসনে * প্রকাশিত যে, তিনি পঞ্চযবনরাজ্যে বৌদ্ধ প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। প্রাচীন কালে গ্রীকদিগকেই যে যবন বলিত, ঐতিহাসিক Bishop Corrie ও তাহা বলিয়াছেনঃ—

"Javan (Yunaan) the son of Japheth, and grandson of Noah, was certainly the father of all those nations that went under the general denomination of Greeks. Javan had four sons, Elishah, Tarshish, Chittim and Dodanim, whose names may still be traced in ancient historians as the heads and founders of the chief tribes of that nation, whilst numerous accessions were made to the Greeks, from time to time, by colonies from Egypt and Phœnicia and other countries, who mixed themselves with the ancient inhabitants."

"যে সকল জাতি গ্রীক নামে প্রসিদ্ধ তাহারা নিশ্চয় নোয়ার পৌত্র এবং জ্যাফেতের পুত্র যবনের (যুনান) বংশধর। যবনের চারি পুত্র ইলাইশা, টার্শিশ, চিট্টিন এবং ডডোনা। নানা গ্রীক জাতি বিভাগের স্থাপয়িতা এবং পতি রূপে গ্রীশের প্রাচীন ইতিবৃত্তে আজিও এই যবন পুত্রগণের নামোল্লেখ দেখা যায়।

* এই শাসনের অনুবাদ দেখিতে অনেকদূর যাইতে হইবে না; তাহা দত্তজ মহাশয়ের সংগ্রহ-গ্রন্থেই দৃষ্ট হইবে। তাঁহার Ancient India র দ্বিতীয় Volume দেখ।

আরও দৃষ্ট হয়, ইজিপ্ট, ফিনিসীয় এবং অপরাপর দেশ হইতে সময়ে সময়ে নানা উপনিবেশ আসিয়া প্রাচীন গ্রীশবাসিগণের সংখ্যা পরিবর্দ্ধন পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল।"

কোন্ কোন্ যবনরাজ্যে এই বৌদ্ধ-প্রচারকগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন, শাসনে তাহাদিগের নামাঙ্কিত আছে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে অণুমাত্রও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না।

বিশপ আরও বলিয়াছেন, এই যবন জাতি সমূহ এক প্রকার মিশ্রিত জাতি ছিল এবং প্রাচীন মিসর ও ফিনিসীয়বাসিগণ গ্রীশে উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক যবনদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। শুদ্ধ যে মিশিয়া গিয়াছিলেন, এমত নহে, তাহাদের পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রাচীন গ্রীশে বিলক্ষণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই যবনগণ ভারতবাসিগণের সঙ্গে কেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে মিশিয়াছিলেন, মহাভারতে তাহা দৃষ্ট হয়। সুতরাং ভারতীয় পৌরাণিক ধর্ম্ম যে প্রাচীন গ্রীশে সমুত্থিত হইবে,তাহার আর বিচিত্রতা কি?

গ্রীশে যে দর্শনের আবির্ভাব হয়, তৎসম্বন্ধে Sir William Jones কি বলিতেছেন, দেখুন :—

"It is imposible to read the Vedanta, or the many fine compositions in illustration of it, without believing that Pythagoras and Plato derived their sublime theories from the same fountain with the Sages of India."

"বেদান্ত এবং বেদান্তের নানাবিধ সুন্দর ভাষ্য ও টীকা পড়িলে নিশ্চয় প্রতীতি হয় যে, ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণের এবং পাইথোগোরস ও প্লেটোর দর্শনাদি শাস্ত্র একই উৎস হইতে উৎসারিত হইয়াছে।"

জোন্সের এই কথায় একটু দোষ ধরিয়া মোক্ষমুলর বলিয়াছেন, জোন্স ত পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই যে, গ্রীক দার্শনিকগণ ভারতীয় দর্শন হইতে নিজ নিজ মত সংগ্রহ করিয়াছেন; জোন্স এই মাত্র বলিয়াছেন যে, গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি-স্থান একই। মানুষ যত কেন বিশদ ভাষায় ব্যবহার করুন না, তবু সকল ভাষারই দোষ ধরা যায়। সে যাহা হউক, মোক্ষমূলর কি জানেন না যে, বেদই ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি-স্থান? তবে কি তিনি বলিতে চান যে, প্লেটো প্রভৃতি দার্শনিকগণের মতামতও বেদ হইতে সংগৃহীত? একথা বলিতে মোক্ষমূলর, বোধ হয়, আরও সঙ্কুচিত হইবেন। "অন্তরের প্রত্যাদেশ" যদি মোক্ষমূলরের লক্ষ্য হয়, জোন্স সম্বন্ধে সে কথা একেবারেই খাটে না। কারণ, জোন্স নিশ্চয় জানিতেন, শ্রুতিই বেদান্ত দর্শনের মূল ও প্রতিপাদ্য। সুতরাং জোন্সের অর্থ অতি বিশদ। সরল অন্তরে তাহার অন্য অর্থ উদ্ভাবিত হইতে পারে না।

বেদান্ত বলেন, এই স্থূল পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে তাহা সূক্ষ্ম শক্তিময় জগতে বিদ্যমান ছিল; সেই সূক্ষ্ম শক্তিময় জগৎই—নাম রূপ*। এই নাম-রূপই প্লেটো

* আর্য্য শাস্ত্রের সৃষ্টি-প্রকরণে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে; তাহা বুঝাইতে হইলে একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাবের অবতারণা করিতে হয়। এ স্থলে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা মাত্র বলা যাইতে পারে। "মনুষ্য" এই শব্দ মাত্র উচ্চারিত হইলে রাম, শ্যাম প্রভৃতি কোন ব্যক্তি বিশেষ বুঝাইল না। গো, অশ্ব, সর্প প্রভৃতি নাম ও তদ্রূপ। প্রতি নামই তজ্জাতি বিশেষকে বুঝায়। জাতি বিশেষের যে নাম, তাহা সেই জাতীয় ধর্ম্ম বা শক্তিবিশেষেরই পরিচায়ক। মনুষ্যত্ব, অশ্বত্ব, গোত্ব, সর্পত্ব প্রভৃতি সমুদায়ই বিভিন্ন সৃষ্টি-কল্পনা। আবার, এ সমুদায়ই এক সামান্য জীব নামের অন্তর্গত। উদ্ভিজ্জ ও জঙ্গম জীব তদ্রূপ প্রাণী নামের অন্তর্গত। প্রাণী জগৎ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল,

এবং ষ্টোয়িক (Stoic) দর্শনের Idea এবং Logos। বৌদ্ধ ধর্ম্মে তাহা সঙ্ঘ ধর্ম্ম। যে সূক্ষ্ম জগৎ হইতে স্থূল জগতের উৎপত্তি, তাহাই খৃষ্টধর্ম্মের পিতা পুত্র। এই দেখুন, মোক্ষমূলর তৎসম্বন্ধে কি বলিতেছেন।

"It was the same Logos that was called by Philo and others long before St. John, the only begotten Son of God, in the sense of the first Ideal Creation or Manifestation of the Godhead."

"এই লোগস (শব্দ) সেই অর্থেই ব্যবহৃত, যাহা বলিলে সেণ্টজনের বহুকাল পূর্ব্বে ফাইলো এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ একমাত্র ভগবজ্জাত পুত্রমাত্র বুঝিতেন— সেই পুত্র কি? না, এই বিশ্বের আদি নামরূপ সৃষ্টি, বা ভগবানই সেই রূপে পরিব্যক্ত।"

সেণ্ট জন এবং অপরাপর খ্রীষ্ট শিষ্যগণ এই "পিতাপুত্রের" কথা কোথা হইতে পাইলেন মোক্ষমূলের তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন:—

"We can have no doubt that the idea of the Logos reached the Jews like Philo and the early christians like St. John from the Greek Schools at Alexandria."

"ফাইলো প্রভৃতি ইহুদীগণ এবং সেণ্ট জনের মত আদি খ্রীষ্টানগণ এলেকজ্যাণ্ড্রিয়াস্থ গ্রীক স্কুল হইতেই যে লোগসের এইরূপ অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

অন্যত্র মোক্ষমূলর বলিয়াছেন :—

"By the Word alone is the Non-Word revealed." Moitryana, Up. VI. 22.

জড় জগৎ সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। অগ্রে মনুষ্যত্বের সৃষ্টি না হইলে প্রতি ব্যক্তির সৃষ্টি সম্ভবে না। কিন্তু মনুষ্যত্বের সৃষ্টি কেবল ধর্ম্ম বা শক্তিময়ী সৃষ্টি। শক্তিময় জগৎ সুতরাং সূক্ষ্ম নাম-রূপ এবং নিত্যকাল বর্ত্তমান; কারণ, প্রকৃতি পুরুষ অনাদি। এই জাতি ও নামের সৃষ্টিই শব্দব্রহ্মময়। ব্রহ্ম শব্দময় ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত। শব্দময় ব্রহ্ম সুতরাং জ্ঞানময় জগৎ। এই শব্দ ও জ্ঞানময় ব্রহ্মা হইতে বেদ সমুত্থিত। ব্রহ্মার সৃষ্টির পর প্রজাপতির সৃষ্টি। দর্শনে এই সৃষ্টির নাম নাম-রূপ। তাহাই প্লেটো এবং ষ্টোয়িক দর্শনের Idea এবং Logos. বিলাতী দর্শনে Nominalist এবং Realist রা এ কথার আলোচনা করিয়াছেন। স্যায়দর্শনেও এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

"Here we have again the exact counterpart of the Logos of the Alexandrian Schools. There is, according to the Alexandrian Philosopher, the Divine Essence which is revealed by the Word, and the Word which alone reveals it. In its unrevealed state, it is unknown, and was by some Christian philosophers called the Father; in its revealed state, it was the Divine Logos or the Son."

"সেই অশব্দস্পর্শ কেবল শব্দ দ্বারাই ব্যক্ত।" মৈ, উ, ষষ্ঠ ২২।

"এই উপনিষদ্ বাক্যে আমরা এলেকজ্যাণ্ড্রিয়ন স্কুলের লোগসেরই প্রতিবাক্য প্রাপ্ত হই। সেই স্কুলের দার্শনিক মতে "শব্দই" ভগবানকে প্রকাশ করে এবং ভগবান "শব্দ" রূপেই ব্যক্ত। অব্যক্ত কূটস্থ সামান্য জ্ঞানের অতীত। সেই অব্যক্তকেই কতিপয় খ্রীষ্টীয় দার্শনিকেরা পিতৃরূপে অভিহিত করিয়াছেন, সেই কূটস্থ অব্যক্ত পিতার বিকাশাবস্থাই ভগবৎ পুত্র বা লোগস শব্দ।"

তবেই মোক্ষমূলর স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এলেক্জ্যাণ্ড্রিয়ার গ্রীক দর্শনের তত্ত্ব হইতেই খৃষ্টধর্ম্মের পিতা পুত্রের তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছিল। এই পিতা পুত্রের তত্ত্ব হইতেই খ্রীষ্টীয় ত্রিবৃৎ তত্ত্বের উৎপত্তি। এই সকল কথার উৎপত্তি-স্থান এবং ভারতীয় ঋষিগণের বেদান্ততত্ত্বের উৎপত্তি-স্থান যে একই, জোন্স তাহা বিশদ ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন।

খ্রীষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে অধ্যাপক টীল (Tiele) কি বলিতেছেন, দেখুন :—

"The Jewish mind took into itself new elements, which worked and fermented in silence till they produced a nobler thought. Before the gaze of Israel opened a world hitherto unknown. It came into contact with the Indo-Germans, first with the Greeks, and lastly with the Romans. Parsism † attracted them by its ethical tendency. * * * Greek humanism and Greek philosophy made their way unobserved even among them. * * * Out of the mutual co-operation of these fac-

† On the debts of Judaism to Parsism, see Kuenan's *Religion of Israel*, Vol. iii pp 1-44.

tors, the union of Israelite piety with Persian morality, Greek humanism and a Universalism vying with that of Rome—in other words, out of the Semetic with the Indo-Germanic mind—arose the mighty universal religion which reconciles them both."

"ইহুদীগণের অন্তরে যে সমস্ত ধর্ম্মমতের উপকরণ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাই মনাগুণ রূপে নিভৃতে গুমিয়া গুমিয়া এক পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইস্রেনগণের চক্ষে এক অভূতপূর্ব্ব নূতন বিশ্ব বিকাশিত হইল। জার্ম্মান আর্য্যগণের সহিত তাহারা সংস্পর্শে আসিলেন—প্রথমে পারস্য, তৎপরে গ্রীক এবং সর্ব্বশেষে রোমানদিগের সহিত তাহাদের সংস্রব ঘটিল। পার্শী ধর্ম্মের নৈতিক সৌন্দর্য্য তাহাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। * * * গ্রীক মানবীয় ভাব এবং দর্শন অজ্ঞাতসারে তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল। পার্শী নীতি, গ্রীক মানবীয় ভাব এবং সেই সার্ব্বভৌমিকতা, যাহা রোমানদিগের সার্ব্বভৌমিকতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসিয়াছিল, এই সমস্ত উপকরণ রোমানদিগের ভক্তিভাবের সহিত মিলিত হইলে, অথবা সংক্ষেপে বলিতে গেলে, জার্ম্মান আর্য্য এবং সেমীয় মানবসৃষ্টির একত্র সংমিলন হইলে সেই মহাপ্রভাবশালী সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সমুদ্ভব হইয়াছিল, যাহা সে সমস্ত উপকরণকেই সমঞ্জসীভূত করিয়া লইয়াছিল।"

অধ্যাপক টীল খ্রীষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি এই রূপ নির্ণয় করিয়াছেন। আমরাও এই রূপ নিরপেক্ষ ইতিহাসবেত্তা এবং সমালোচকগণের মতামত দেখিয়া সেই উৎপত্তি সম্বন্ধে এত কথা বলিয়াছি। এই মতামত জন্য সেই ঐতিহাসিক এবং সমালোচকগণই দায়ী।

ফাইলো হইতে যে যীশু তাঁহার ত্রিবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথাও আমরা বলি নাই; লুইস তাহা বলিয়াছেন। আমরা সেই লুইসের কথা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। এই ত্রিবাদ যীশুর নিজ সম্পত্তি না হইলেও যীশু তন্মধ্যে এক নূতন জীবন সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন।

কি রূপে তিনি সেই ত্রিবাদ মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন? যে কারণে গৌরাঙ্গদেবের প্রেমতত্ত্ব বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র নব উৎসাহ সহকারে ও নবভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, সেই কারণে যীশুর মত এক নবীন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। গৌরাঙ্গের প্রেমতত্ত্ব কিছু ভারতে নূতন কথা নহে। ব্যাস, নারদ, গর্গ, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ভক্তিবাদিগণ তাহা উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা গীতায় প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। তথাপি গৌরাঙ্গদেব পুরাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মকে বঙ্গদেশে সঞ্জীবিত করিলেন কি রূপে? যে রূপে ইহুদীদেশে ফাইলোর উপর যীশু জয়লাভ করিয়াছিলেন। যীশু আত্ম-জীবনে ও কার্য্যে সেই প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তই মহাগুরু। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই রহস্য শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন ঃ—

"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

৩ অ—২০। ২১।

"জনকাদি মহাজনগণ কর্ম্ম দ্বারাই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; লোক সকলের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া তোমার কর্ম্ম করা উচিত। কেন না, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন, অন্যান্য লোকও তাহা তাহা করিয়া থাকে; তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করেন, লোকেও তাহারই অনুবর্ত্তন করে।"

যীশু এবং চৈতন্যদেব কার্য্যে প্রেমিক ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের প্রেমতত্ত্ব জগতে প্রচারিত হইয়াছিল।

বৈদিক ক্রিয়াকলাপ এবং সংসারাসক্তি পরিহার পূর্ব্বক বৌদ্ধ ধর্ম্ম কেবল মানসশুদ্ধি পথ অবলম্বন করিয়াছিল। সেই শুদ্ধি-

পথ ও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম এসিনিস্‌ম মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। জন (John) তাহাই যীশুকে বিশেষ রূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন। যীশু সেই শিক্ষালাভ করিয়া ইহুদী ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বর-পূর্ণ ক্রিয়াকলাপের পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক কেবল আন্তরিক শুদ্ধি সাধনেরই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য খ্রীষ্টোপদিষ্ট ধর্ম্ম প্রথমে কেবল এসিনিস্‌ম মাত্রে পরিদৃশ্যমান হইয়াছিল। এই পর্য্যন্ত খ্রীষ্টধর্ম্মে বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়াপাত হইয়াছে। কিন্তু এসিনিসমের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মের এক বিষয়ে বিলক্ষণ পার্থক্য ছিল।

যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ছায়ায় এসিনিস্‌মের সমুদ্ভব, সেই বৌদ্ধ ধর্ম্মে প্রধানতঃ সাংখ্যের জ্ঞান-পথই প্রশস্ত। কাপিল সাংখ্যে নির্গুণ ব্রহ্মের যোগতত্ত্ব এবং তদুপযোগী সাধনপথই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধদেব তাহারই অনুগামী ছিলেন। সেই সাধনপথে সগুণ ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তত্ত্বজ্ঞানই তাহাতে মোক্ষের কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সাংখ্য সাধন-পথে বিষয় বাসনার পরিহার ও বিষয় হইতে বিমুক্ত হইবার নানাবিধ উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে। সাংখ্যমতে ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কোন প্রয়োজন না থাকাতে তাহাতে সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা পদ্ধতি নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মেও এই ভক্তি-পথ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। কিন্তু যীশু জনোপদিষ্ট বৈরাগ্য ও চিত্তশুদ্ধিপথ গ্রহণ করিয়া তাহাতে পুরাতন ইহুদী ধর্ম্মের ভগবদ্ভক্তি মিশাইয়াছিলেন। এসিনিস্‌মের সহিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের এই খানে প্রভেদ।

প্রাচীন ইহুদীধর্ম্মে বরাবর ভক্তিপথ ও দেবোপাসনা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত ছিল। মোসেস এই ভক্তিপথ মিসর ধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করিয়া স্বদেশে আসিয়া স্বদেশের ভক্তিপথকে আরও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইতিহাসবেত্তা বলিতেছেন :—

"The culminating point of the religion of the Northern Semites was reached in that of Israel. During the thirteenth century before Christ a considerable portion of Canaan was gradually conquered by this small nation. They entered the country on different sides, possessing a religion of extreme simplicity though not monotheistic. It did not differ in character from the Arabian, and approached most nearly it would seem, to that of the Qenites. Their ancient national God bore the name of El-Shaddai, but it is not without reason that their great leader Moses is supposed to have established in its place before this period the worship of Yahveh."

"ইস্রেল ধর্ম্ম উত্তরদেশীয় ধর্ম্মেরই চরমোৎকর্ষ। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কেনানের অধিকাংশ স্থান ক্রমে ক্রমে এই সামান্য জাতি কর্ত্তৃক জয়লব্ধ হইয়াছিল। নানা দিগ্‌দেশ হইতে তাহারা কেনানে প্রবিষ্ট হইয়া যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত, তাহা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা প্রণালী না হইলেও অতি সরল ধর্ম্মপদ্ধতি ছিল। আরবীয় ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত তাহার অধিক পার্থক্য ছিল না, এবং কুইনাইটগণের ধর্ম্মের সহিত তাহার সাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক। তাহারা সেই পুরাতন এল'সাদাই নামক স্বজাতীয় দেবতারই পূজা করিত। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাহাদের অধিনায়ক মোসেস বোধ হয়, সেই দেবপূজার স্থানে যে জিহোবার পূজা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এমত অনুমানও নিতান্ত অযুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয় না।"

Kuenen তাঁহার *Religion of Isrel* নামক গ্রন্থে ইহুদী ধর্ম্মের যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতীত হইবে, সেই ধর্ম্মে ভক্তিপথ কেমন প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। তাহাতে অগ্রে দেবদেবীর পূজা বিলক্ষণ বিদ্যমান ছিল। তৎপরে প্রফেটগণ তাহাকে একমাত্র যীভার পূজায় পরিণত করেন। যীভার পূজা প্রতি-

ষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত প্রফেটগণ কি করিয়াছেন, অধ্যাপক টীল তাহা বলিতেছেন :—

'To attain this end, they contended not only against the cruel worship of the God of Fire, called by the Israelites briefly 'the Molek', to whom in the Assyrian period, following probably the example of their neighbours, they sacrificed children and men, but even against the Sun, purely national worship dedicated to the Moon and Stars, to which not a few of the Israelites remained faithfull. Some kings, such as Hezekiah and Josiah, devoted themselves to carrying out their doctrine; other princes, however, supported by the majority of the people, maintained the old and the new Nature-Gods. It was not till the establishment of a priestly state by the small section of the nation who returned to the Fatherland after the captivity that Yahveh was recognised as the only God, and there was no further mention of any Baal or Molek."

"একমাত্র যীভার পূজা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রফেটগণ শুধু যে মোলকের পূজা উঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমত নহে, স্বদেশীয় বাল এবং স্বজাতীয় সূর্য্য, সোম ও নক্ষত্রাদির পূজাও রহিত করিতে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এসিরীয় প্রভুত্বকালে, ইস্রেলগণ প্রতিবাসী জাতির দেখাদেখি করাল অগ্নিদেব মোলকের সমক্ষে পুত্র কন্যাকে পর্য্যন্ত নরবলি দিতেন। হেজিকায়া এবং জোশিয়া প্রভৃতি কতিপয় ভূপতি প্রফেটগণের অনুসরণ করিয়া যীভার পূজা প্রবর্ত্তনে যত্নবান হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অপরাপর প্রজানুকূল নৃপগণ পুরাতন ও নূতন দেবদেবীর পূজায় প্রবৃত্ত ছিলেন। কারাবাস হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যতদিনে সামান্য একদল ইস্রেল ধর্ম্মযাজকগণের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে না পারিয়াছিলেন, ততদিনে আর যীভামাত্রের পূজা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রতিষ্ঠিত হইলে, আর অন্য দেবদেবীর নাম মাত্রও ছিল না।"

তবেই দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বে ইস্রেল জাতি মধ্যে দেবদেবীর পূজা বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। যে সলোমন এত আগ্রহের সহিত নিজ রাজধানী মধ্যে যীভার মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনিও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির নির্ম্মাণে তত হানি নাই বিবেচনা করিতেন; এমন কি, সল এবং ডেবিড পর্য্যন্ত দেবদেবীর নামে পুত্রগণের নাম রাখিয়াছিলেন। একাডিয়ানদের (Akkadians) হইতে তাহারা বিশ্রাম দিন* "স্যাবাথের" নিয়ম প্রভৃতি অনেক রীতি নীতি এবং (Flood) জলপ্লাবনের বৃত্তান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। টীল বলেন, বাইবেলোক্ত "প্যারাডাইসের" (Paradise) এবং সৃষ্টির বিবরণও তদ্রূপ একাডীয় ধর্ম্মোক্ত বিষয়। সে যাহা হউক, ক্যালডিয়া (Chaldea) এবং এবং মেসোপোটেমিয়া হইতে দেবদেবীর পূজা গ্রহণ করিয়া ইস্রেলগণ যে প্রথমে ভক্তিপথে প্রবৃদ্ধ হইতেছিলেন, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রফেটগণ নানা দেবদেবীর স্থানে একমাত্র যীভার পূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, ইহুদী ধর্ম্মের ভক্তিস্রোত আরও প্রবল উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হইবে। কিন্তু দুরন্ত কালের প্রভাব এমনি, সেই ইহুদীধর্ম্মানুষ্ঠানে সাধারণ জনগণের ভক্তিরস ক্রমে কমিয়া যাইতে লাগিল। তাই যীশু জন্মিবার পূর্ব্বে সেই ধর্ম্মের বাহ্য ক্রিয়া কলাপ ও অনুষ্ঠানে অনেকাংশে রাজসিক ভাব প্রতীয়মান হইয়াছিল। সাত্ত্বিক লোকের সংখ্যা সকল সমাজেই কম; সাত্ত্বিক লোকেরা কখন জানাইয়া বেড়ায় না যে, লোকে দেখ গো আমরা কেমন ধার্ম্মিক, তাঁহাদের ধর্ম্মভাব অন্তরেই থাকে। রাজসিক লোকেরাই ধর্ম্মধ্বজী হইয়া আড়ম্বর ও ধুম-

* That the Sabbath, the Rest-day or the seventh day of the week, passed to the Semites from the Akkadians, was conjectured by Oppert and Schrader, and has now been proved from the texts by Sayce.—Tiele.

ধাম পূর্ব্বক লোকদেখান পূজানুষ্ঠান করিয়া থাকে। প্রতি সমাজেরই এইরূপ নিয়ম। তবে কখন কখন সাত্ত্বিক লোকের সংখ্যাপেক্ষা, রাজসিক লোকের সংখ্যা বাড়িয়া থাকে। যীশুর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সেইরূপ রাজসিক বিষয়ী লোকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছিল। তাই যীশু ধর্ম্মের নীরস ক্রিয়াকলাপের পরিবর্ত্তে আন্তরিক চিত্তশুদ্ধির উপদেশ দিয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের যাহা আভ্যন্তরিক ভগবৎশ্রদ্ধা ও পূজা, যীশুর ধর্ম্মে তাহা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম সেই শ্রদ্ধাপথের চরমসীমায় গিয়া যে ভগবদ্ভক্তিতে পরিণত হয়, তাহা খ্রীষ্টধর্ম্মে নাই। বৈষ্ণবধর্ম্মের আভ্যন্তরিক সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা ও গৌণীভক্তি তাহাতে কথঞ্চিৎ পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু গীতোপদিষ্ট ভক্তিযোগের তাহাতে সম্পূর্ণ অভাব। বৈষ্ণবধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠান ও মূর্ত্তিপূজা তাহাতে নাই বটে, কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম মানসিক মূর্ত্তিপূজাতে বিলক্ষণ আছে। কারণ সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাপদ্ধতি মাত্রই সাকার উপাসনা। খ্রীষ্টধর্ম্ম সগুণ ঈশ্বরেরই পূজাপদ্ধতি।

আর্য্য ঋষিগণ নিম্নাধিকারী অজ্ঞ জনগণের নিমিত্ত যে উপাসনাপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্মে তাহারই এক প্রকার সূক্ষ্ম সাকার উপাসনা প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। যীশু পুরাতন ইহুদী ধর্ম্মে ভগবৎ প্রেমের এক নবস্রোত দিয়া তাহার সংস্কার সাধন পূর্ব্বক তাহাকে স্বদেশ ও স্বজাতির উপযোগী করিয়া লইলেন। ইহুদী সূত্রধর যাহার উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা মৎস্যজীবিগণের উপযুক্ত হইয়াছিল। তাহা দেশ, কাল ও পাত্র উপযোগী ধর্ম্ম-সাধন মাত্র। তাহাতে উচ্চ অঙ্গের ভক্তি এবং জ্ঞানপথের কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। তত্ত্বদর্শিগণের উপযোগী নির্গুণ ঈশ্বরের তত্ত্ব ও সাধন পথের কিছুই তাহাতে নাই। কারণ, বৌদ্ধধর্ম্মের জ্ঞানপথ যীশুর পূর্ব্বে সাধারণ্যে বড় প্রচারিত হইতে পারে নাই। এ জন্য এই খ্রীষ্টধর্ম্ম সর্ব্বজাতি ও সমাজের সর্ব্ব শ্রেণীস্থ জনগণের উপযুক্ত কি না, তাহা এক স্বতন্ত্র কথা। খ্রীষ্ট ইউরোপ সে কথায় কি মীমাংসা করিয়াছে? খ্রীষ্টসমাজ কি সেই ধর্ম্ম দ্বারা কিছু পরিশুদ্ধ হইয়াছে? সূক্ষ্ম সাকার উপাসনায় সামান্য জনগণের মন ভেজে নাই; শ্রদ্ধার উচ্চ অঙ্গ ভক্তিপথের অভাব থাকাতে নিষ্ঠ খ্রীষ্টানগণ সেই ধর্ম্ম-অবলম্বনে "প্রণিধান" সহকারে আর্য্যভক্তগণের ন্যায় ভগবানে তদ্গত জীবন লাভ করিতে পারেন না। আর্য্য ভক্তিপথে যাহা ঈশ্বরের সামীপ্য, সালোক্য ও সারূপ্য, খ্রীষ্টধর্ম্মে তাহা অলীক কথা। চৈতন্যদেব আজীবন এই সামীপ্য শুদ্ধ উপদেশ দিয়াছিলেন, এমত নহে, তজ্জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, বাস্তবিক মানব সেই দেবত্বলাভে সমর্থ। ভক্তিপথের "সাযুজ্যের" কথা দূরে থাক, সামীপ্য লাভার্থ ভগবানে যে ঐকান্তিকতা আবশ্যক, সেই ঐকান্তিকতা লাভের সোপানাবলি কি খ্রীষ্টধর্ম্মে উপদিষ্ট হইয়াছে? বিষয়-বাসনা ও ভোগ-সুখ পরিহারের কথা খ্রীষ্ট সমাজে কি পরিদৃষ্ট হয়? ঘোর ভোগসুখে খ্রীষ্ট ইয়োরোপ নিমজ্জিত। "ইন্দ্রিয়নিগ্রহের" সম্পর্ক মাত্র তাহাতে পরিদৃষ্ট হয় না। যীশু যে শ্রদ্ধার কথা উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আর্য্য-ভক্তিপথের উচ্চতায় উঠে নাই। সমুদায় হৃদয়-মন ভগবানে সমর্পণ করিবার কথা যীশুর উপদেশ মধ্যে আছে বটে, কিন্তু কি রূপ অনুষ্ঠানে ভগব-

ভক্তির ঐকান্তিকতা লাভ করা যায়, তাহার কোন কথা তন্মধ্যে নাই। সুতরাং তাহা শব্দ মাত্রে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। 'বিষয়' ও 'ঈশ্বর' এই উভয়েরই সেবা করা একদা অসম্ভব, যীশু এই কথা বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কি রূপে বিষয় ভোগে লিপ্ত থাকিয়াও হৃদয়-মনের প্রত্যাহার সাধন করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ের সবিশেষ উপদেশ তিনি দিয়া যান নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি হইতে গুরূপদেশক্রমে তিনি ত্যাগীর নীতি লাভ করিয়া আত্মজীবনে তাঁহার স্বার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে যখন প্রবৃত্ত,এমত সময়ে ইহুদীগণের কুচক্রে পড়িয়া তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। সুতরাং,আত্ম-জীবনে সম্যক্ পরীক্ষালব্ধ স্বার্থকতা বিরহে সেই অনুষ্ঠান সকলও প্রতিপন্ন করিয়া উপদেশ দিতে সমর্থ হইলেন না। আর্য্য সনাতন ধর্ম্মে সংসারী ঘোর, ভোগক্ষেত্রে পরিবৃত থাকিয়া প্রেমের পরিপুষ্টি সাধন করিয়া ভক্তিযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে বিষয়াসক্তি পরিহার করিয়া সেই প্রেমকে কেমন ভগবানে সমর্পণ করেন, * সমর্পণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আবার কেমন ঐকান্তিকী নিষ্ঠা লাভ করেন, এরূপ উপদেশ ও দৃষ্টান্ত যদি খ্রীষ্টধর্ম্মে থাকিত,তবে আজ খ্রীষ্ট ইউরোপ এত বিষয়াসক্ত ঘোর ভোগপথের শেষ সীমায় আসিত না। বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাংখ্যযোগে যে নিবৃত্তিপথ ও নিষ্কামধর্ম্ম পরিদৃষ্ট হয়,তাহা জ্ঞানযোগেরই সোপান। বৌদ্ধধর্ম্মের সেই জ্ঞানযোগ যদি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিত,তবে এক দিন ত্যাগী যীশুর বৈরাগ্যোপদেশের কথঞ্চিৎ ফললাভের আশা করা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা ত ঘটে নাই; সুতরাং, বৌদ্ধ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অঙ্গ খ্রীষ্টধর্ম্মে না থাকাতে,তাহা বাস্তবিক সংসার-ক্ষেত্রের জন-সমাজে তেমন ফললাভ করিতে পারে নাই। খ্রীষ্ট সমাজের সকল শ্রেণীস্থ লোকের ধর্ম্ম-পিপাসাও তাহাতে পরিতৃপ্ত হয় না। সম্পূর্ণাবয়ব না হওয়াতে তদ্দারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানিগণের ধর্ম্মতৃষ্ণা অতৃপ্ত থাকে। সংসারী, অসংসারী, ভোগী, যোগী, বৈরাগী, ত্যাগী, নর, নারী, রাগী, বিরাগী, মূর্খ, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান,জ্ঞানী, প্রেমিক,অপ্রেমিক, হৃদয়বান, নির্ম্মম,পাষণ্ড, ভক্ত, প্রভৃতি সকলের জন্য ধর্ম্মের উপযোগিতা চাই। সকলকেই ধর্ম্মোন্নত করিয়া আনিতে পারিলে তবে ধর্ম্মের সার্থকতা হয়। সমুদায় জনসমাজে ভক্তিরসের সঞ্চার করিয়া দিতে পারিলে তবে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সমুদায় জনসমাজকে (humanize) করাই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য হওয়া চাই। জনসমাজের একভাগের জন্য ধর্ম্ম নহে। যে ধর্ম্ম সমাজের সর্ব্ববিভাগের উপযোগী, তাহাই সম্পূর্ণ ধর্ম্ম প্রণালী। সেই সম্পূর্ণ ধর্ম্মতন্ত্র আর্য্যঋষিগণের বৈদিক সনাতন ধর্ম্ম। ব্যাস ও শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রেম-ভক্তি ও জ্ঞানতত্ত্বের বিশদ উপদেশ দিয়াছেন। সেই সনাতন ধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের আশ্রয় ও মূল। অপরাপর ধর্ম্মপ্রণালী তাহারই শাখাপ্রশাখা মাত্র।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

* আমার নব প্রকাশিত "সাহিত্য-চিন্তা" নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের কথঞ্চিৎ আলোচনা পরিদৃষ্ট হইবে।

ভারতের দারিদ্র্য। (২)

এখন বন্দোবস্ত এইরূপ হইয়াছে। তুমি ইংরাজ বলিতেছ, "আমি শিল্পকাজ সকলই করিব, ভারতবাসীকে আর শিল্প কর্ম্ম করিতে হইবে না। ভারতবাসী কেবল কৃষি-কর্ম্ম করুক। আমরা ভারতবাসীর নিকট শস্য গ্রহণ করিব—শিল্পকার্য্যের উপকরণ মাত্র গ্রহণ করিব, আর তাহার বিনিময়ে আমরা ভারতবাসীকে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করিব।" এ ব্যবস্থা আপাত-দৃষ্টিতে মন্দ নহে। কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক কথা আছে।

ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ কাফ্রিদের সামান্য খেল্না দিয়া ভুলাইয়া কেমন করিয়া তাহার নাম মাত্র বিনিময়ে মূল্যবান হাতির দাঁত, স্বর্ণ, প্রবাল প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য লইয়া আইসে, তাহা অনেকেই জানেন। বন্য অসভ্যলোক পর্ব্বতে বেড়াইয়া রত্ন সংগ্রহ করে, কিন্তু তাহারা রত্ন চিনে না, রত্নের মূল্য জানে না। চতুর জহুরি তাহাদের সামান্য খেল্না বা খাদ্য দ্রব্য দিয়া সেই মূল্যবান মণি সকল সংগ্রহ করিয়া অল্পেই লক্ষপতি হইয়া বসে। ইংরাজের শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত আমাদের খাদ্যদ্রব্য ও শিল্পের উপ-করণ বিনিময় কতকটা সেইরূপ।

আমাদের দেশ হইতে প্রায় শতকোটী টাকার শস্যাদি আবশ্যকীয় দ্রব্যের রপ্তানি হয়, আর সত্তর কোটী টাকার জিনিষ আম-দানি হয়। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে কাপড় ও ছিট্ প্রায় ত্রিশকোটী টাকার। ছাতা গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি প্রায় দশকোটী টাকার। ইহা ব্যতীত রেশমী ও অন্যান্য কাপড়, কল-কবজা লৌহ ও পিতলের সামগ্রী অনেক টাকার আমদানি হয়। আর গবর্ণমেণ্টের ষ্টোর, রেলওয়ের দ্রব্যাদি, মদ, এ সবও অনেক টাকার আইসে। সুতরাং সে সকল দ্রব্য আমদানি হয়,তাহার মধ্যে কাপড় বাদে, বাকী দ্রব্য হয় আমাদের সখের জিনিস, না হয় গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। সুতরাং আমদানিতে আমাদের বিশেষ লাভ নাই।

অন্য দিকে আবার আমরা শত কোটী টাকার দ্রব্য রপ্তানি করিয়া কেবল সত্তর কোটী টাকার দ্রব্য আমদানি করি মাত্র। বাকী যে ত্রিশকোটী টাকা আমাদের পাওনা, তাহাও পাই না। ভারত-সেক্রেটরীর নানা ভাবে প্রাপ্য দাওয়াতেই সে টাকা কাটান যায়। সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর ত্রিশকোটী টাকা বা সেই মূল্যের পরিমাণ শস্যাদি আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড গ্রহণ করে বলিয়া সেই পরিমাণ আমরা দরিদ্র হইয়া পড়ি।

আর সুধু কি এই টাকা আমাদের প্রতি বৎসর ক্ষতি করিতে হয়? এই যে এদেশে ইংরাজগণ বাণিজ্য করেন, চা, নীল, কাফি প্রভৃতি উৎপাদন করেন, দেশ শাসনের জন্য কত ইংরাজ কর্ম্মচারী এদেশে বাস করেন, ইহারা প্রতি বৎসর যে টাকা দেশে লাভ স্বরূপ পাঠাইয়া দেন, সে টাকাও এদেশ হইতে বাহির হইয়া যায়। সেও বড় কম নহে। প্রায় পনের হইতে বিশকোটী টাকা হইবে। এইরূপে প্রায় পঞ্চাশ কোটী টাকা দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। সেই

পরিমাণে আমাদের সঞ্চিত অর্থ ক্ষয় হইতেছে। সেই পরিমাণে আমাদের কর্ম্মশক্তিও ক্ষয় হইয়া যাইতেছে।

আবার অন্য দিকে গবর্ণমেণ্ট যে কর আদায় করেন, তাহার কথা ভাবিতে হয়। সে কর বড় কম নহে। প্রত্যেক ব্যক্তি তিন টাকার বেশী কর দিয়া থাকে। আর গবর্ণমেণ্ট যে কর আদায় করেন, তাহার মধ্যে কয় টাকা আমরা ফিরাইয়া পাই? এই যে দেশ শাসন জন্য সেনা রক্ষা করিতে হয়, তাহার জন্য প্রায় পঁচিশ কোটী টাকা ব্যয় হয়। তাহার মধ্যে কয় টাকার সুব্যবহার হয়? গবর্ণমেণ্ট এইরূপে নানা কাজে যে সকল টাকা ব্যয় করেন, তাহার দ্বারা আমাদের উপকার হয় না।

যাহা হউক, আমরা অনুমান করিয়া বলিতে পারি যে, নানারূপে আমাদের দেশ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় শত কোটী টাকা নষ্ট হয়। তাহার মধ্যে অধিকাংশ বিদেশে যায়, সে প্রায় সত্তর আশি কোটী টাকা হইবে। আর বাকী টাকা অপব্যবহৃত হয়। বৃটিশ-শাসিত ভারতের লোক সংখ্যা প্রায় বিশকোটী। অতএব গড়ে প্রতি লোকের প্রতি বৎসর ৪৲কি ৫৲টাকা নষ্ট হয়। আর ভারতে প্রতি লোকের খরচই বা কত? তাহা প্রতি বৎসর বিশ পঁচিশ টাকার অধিক হইবে না, ইহা দাদাভাই নাওরোজী-প্রমুখ অর্থশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অতএব আমরা প্রত্যেকে গড়ে বিশ টাকা মাত্র আয় করি, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রায় পাঁচ টাকা আমাদের ক্ষতি হয়। আমাদের কর্ম্মশক্তির সিকি বা পঞ্চমাংশ এইরূপে বৃথা ব্যয় হয়।

তাহার পর ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ঐ বিশ টাকা বা এই ক্ষতি বাদে পনের টাকা যে আয় হয়, তাহা কত অল্প। বিলাতের এক একটা লোক প্রায় তিনশত টাকা আয় করে। আর আমাদের প্রতি লোকের আয় কুড়ি টাকা মাত্র। বিলাতের লোকের কর্ম্মশক্তি আমাদের অপেক্ষা প্রায় পনের গুণ অধিক! ইহাতে বিলাত বড় হইবে না কেন? আমাদের প্রত্যেকের যে বার্ষিক মোট পনের কুড়ি টাকা আয় হয়, তাহা মাস হিসাবে ধরিলে পাঁচসিকা বা দেড় টাকার অধিক নহে। বল দেখি, এই পাঁচ সিকায় কি একটা লোকের খরচ কুলায়? কাজেই আমরা পেটে খাইতে পাইনা—দিনান্তে এক বেলা আধপেটা খাইয়া—বা না খাইয়া জীবন ধারণ করি।

আবার যে গড় আয়ের কথা ধরা হইল, ইহার মধ্যে যাহাদের আয় অধিক, যাহারা আয়-কর দেয়, তাহাদের কথা যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে অবস্থা কত শোচনীয়, তাহা আরও বুঝা যায়। যাহারা আয়-কর দেয়, তাহাদের সংখ্যা কয় লক্ষ মাত্র। তাহাদের বাদ দিয়া ধরিয়া বুঝা যায় যে, সাধারণ ভারতবাসীর আয় বৎসরে ৮।৯ টাকা হইতে পারে। এই আয়ে কি কেহ জীবননির্ব্বাহ করিতে পারে? অতএব ভারত কেন দরিদ্র হইতেছে—কেন ভারতে এত দুর্ভিক্ষ হয়—কেন লোক অন্নাভাবে মারা যায়—সংক্রামক পীড়ায় জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এ কথা ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করেন যে, ভারতের কৃষকের মধ্যে অধিকাংশই অভুক্ত বা অর্দ্ধভুক্ত থাকে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর ইলিয়ট্ সাহেবই বলিয়াছিলেন ;—

"I do not hesitate to say that half of our agricultural population never know, from year's end to year's end, what it is to have their hunger fully satisfied."

ভারতের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী, ভারতের লোক সংখ্যা মধ্যে শতকরা নব্বই জন কৃষক। পূর্ব্বে এত ছিল না। এখন প্রায় সকল শিল্পকারগণই অন্নাভাবে কৃষক হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ভারতের কত লোক অর্দ্ধভুক্ত বা প্রায় অভুক্ত থাকে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

কৃষকের অবস্থা এত শোচনীয় কেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রথম ত কৃষকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ভারতের লোক সংখ্যা বড় অধিক। সেই লোকসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার পর ভূমি-কর অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। যেখানে চির-স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত—সেখানে জমীদার খাজানা বৃদ্ধি করিতেছেন—আর যেখানে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, সেখানে গবর্ণমেণ্ট নিয়তই খাজানা বৃদ্ধি করিয়াছেন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের কৃষকগণকে বড় অধিক কর দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট ভূমি-কর হইতে বৎসর পঁচিশ কোটী টাকার অধিক আয় করিয়া থাকেন।

তাহার পর কৃষকগণ অশিক্ষিত। তাহারা নিয়ত কর্ষণ করিয়া ক্ষেত্রের অবস্থা ক্রমে অবনত করিতেছে। তাহারা উপযুক্ত সার দিয়া ক্ষেত্রের উন্নতি করিতে পারে না। সুতরাং ভারতের ভূমির অবস্থাও দিন দিন অবনত হইতেছে—তাহার শস্য উৎপাদন শক্তির হ্রাস হইতেছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, অর্থাগমের প্রধান উপায় আমাদের কর্ম্মশক্তি। আমা-দের কর্ম্মশক্তি যদি অধিক থাকিত—তবে আমাদের এই দুরবস্থা হইত না। আমরা প্রতি জনে গড়ে বৎসরে কুড়ি টাকা আয় করি—এ জন্য বিদেশীয় রাজার ভ্রান্ত অর্থ-নীতির ফলে আমাদের চারি পাঁচ টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় বলিয়া আমরা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ি। কিন্তু যদি আমা-দের এ রূপ কর্ম্মশক্তি থাকিত যে, আমরা প্রত্যেকে বৎসরে দুই তিন শত টাকা আয় করিতে পারিতাম, তবে এই সামান্য চারি পাঁচ টাকার জন্য কি আমাদের কোন অসুবিধা হইত?

আমরা তাহার পর বলিয়াছি যে, অর্থা-গমের দ্বিতীয় উপকরণ ভূমি। সেই ভূমি সংগ্রহ করিতে অধিক কর দিতে হই-তেছে—ভূমি ক্রমে উৎপাদিকা-শক্তি হীন হইতেছে—ইহাতেও আমাদের ধনাগমের অন্তরায় হইয়াছে। এই কর্ম্মশক্তি ও ভূমি ব্যতীত আর এক উপকরণ আছে—তাহা পূর্ব্বে আভাষ দিয়াছি—সেই উপকরণ আমাদের পূর্ব্ব-সঞ্চিত কর্ম্মশক্তি বা সঞ্চিত অর্থ Capital। এই মূল ধন থাকিলে তাহা ব্যয় করিয়া আমরা শক্তি সংগ্রহ করিতে পারিতাম। কল কারখানা, ষ্টীম এঞ্জিন প্রভৃ-তির সহায়ে অনেক দিক হইতে অর্থাগমের উপায় করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহার উপায় নাই। একে সঞ্চিত অর্থ নাই—তাহা-তে যে অর্থ আছে—তাহা আমাদের লোকে এইরূপ কর্ম্মশক্তিতে রক্ষিত করিতে জানে না। আমরা কৃষিকার্য্যে বা শিল্পে কল্ ব্যবহার করিতে জানি না।

তাহার পর আমরা সমবেত হইয়া কাজ করিতে জানি না। "সংহতি কার্য্যসাধিকা" এই কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা সকলে স্বার্থচালিত, সমবেত হইয়া কার্য্য করিতে হইলে সেই স্বার্থ সংযত করিতে হয়।

তাহা আমরা করি না। কাজেই সঞ্চিত অর্থ আমরা ব্যয় করিবার সুবিধা পাই না।

অতএব অর্থাগমের যে সকল উপায় আছে, সে সকল উপায় এইরূপ বদ্ধ হইয়াছে। কাজেই আমরা দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি। আমরা এস্থলে এই দারিদ্র্যের মূল কারণগুলি উল্লেখ করিলাম। বিশেষ কথা ও আনুষঙ্গিক কথা কিছুই বলিতে পারিলাম না। একস্‌চেঞ্জ প্রভৃতি আরও নানা কারণে আমাদের নানাদিকে অসুবিধা হইতেছে। তাহা এস্থলে উল্লেখ করিবার উপায় নাই।

ভারতের দারিদ্র্যের যেটী মূল কারণ বলিলাম—তাহা এস্থলে সংক্ষেপে আবার উল্লেখ করিয়া এই আলোচনা শেষ করিব। ভারতের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ,আমাদের নিজের অক্ষমতা। আমরা তেমন শ্রমশীল নহি। আমরা বড় অলস। আমাদের কর্ম্মশক্তি বড় সংকীর্ণ। তাহার পর যে টুকু কর্ম্মশক্তি আছে, তাহাও স্বার্থ-চালিত। সেই শক্তি আমরা নিজের জীবনযাত্রা কোনরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য ব্যয় করি মাত্র। কিন্তু তবু বুঝি না যে, আমরা ভগবানের যন্ত্র মাত্র। আমাদের কর্ম্মশক্তি যাহা আছে, তাহা যদি আমাদের নিজের জন্যই ব্যয় হইল, তবে তাহা বৃথা অপব্যয় হইল মাত্র। কেবল খাইবার জন্য বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। একটী ষ্টীম এঞ্জিনের কথা মনে কর। এঞ্জিনে যে পরিমাণে কয়লা দেওয়া হয় ও তাহা হইতে যে পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহা যদি সমুদায় গতি শক্তিতে পরিণত হয়—তবেই তাহা আদর্শ শ্রেষ্ঠ এঞ্জিন। কিন্তু যদি এই তাপের অধিকাংশ এঞ্জিনকে উত্তপ্ত করে,তবে তাহার অপব্যয় হয় মাত্র। সেরূপ এঞ্জিন কাজের নহে। এঞ্জিনের ভাল মন্দ পরিমাণ করিতে হইলে, যেমন দেখিতে হয়, তাহার কত তাপ অপব্যবহৃত হইতেছে, তেমনি মানুষ ভগবানের কেমন যন্ত্র, তাহা বুঝিতে হইলেও দেখিতে হইবে—আমরা আত্ম শক্তির কতদূর অপব্যবহার করিতেছি, কতদূর স্বার্থ জন্য আত্মসাৎ করিতেছি।

আমাদের যদি অধিক কর্ম্মশক্তি থাকিত, তবে আত্মরক্ষা করিয়াও সে অধিক শক্তি কর্ম্মরূপে পরিণত হইত—তাহাই আবার সঞ্চিত হইয়া আমাদের সমাজকে ক্রমে উন্নত করিত। কিন্তু আমাদের তত অধিক শক্তি নাই। অথবা শক্তি থাকিলেও আমরা তাহা সুনিয়মিত করিতে পারি না। কাজেই আমাদের দুরবস্থা হইতেছে। সুতরাং আমরা আর যাহাকেই দোষ দিই না কেন, এই দারিদ্র্যের—এই অবনতির মূল কারণ যে আমরা নিজেই—তাহা আমাদের প্রথমতঃ বুঝা কর্ত্তব্য। আমরা গবর্ণমেণ্টকে দোষ দিই, অদৃষ্টকে দোষ দিই—আর বসিয়া থাকি, আমরা যদি নিজে আমাদের এই দুরবস্থার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা না করি, যদি আমারা অধিক শ্রমশীল না হই—যদি আমরা আমাদের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সমবেত হইয়া কার্য্য করিতে না শিখি, তবে আমরা ক্রমে ক্রমে দ্রুততর বেগে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইব। কেহই সে গতি রোধ করিতে পারিবেন না।

অতএব যাঁহারা দেশহিতৈষী, তাঁহাদের এই দরিদ্রতা নিরারণের চেষ্টা করা প্রথম কর্ত্তব্য। সাধারণ লোকদিগকে আলস্য ত্যাগ করিয়া যথা রীতি কর্ম্ম করিতে শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। আর আমরাও বৃথা বক্তৃতা বা বাগাড়ম্বর না করিয়া যাহাতে

প্রকৃত কর্ম্ম করিতে শিখি, নিজের কর্ম্ম শক্তি বৃদ্ধি করিয়া তাহাকে সুনিয়মিত করিতে শিখি—তাহার জন্ম চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের কর্ম্মশক্তি পরিচালনের পথ চারিদিকেই বন্ধ হইয়া আসিতেছে। সুতরাং আমাদের কর্ম্মপথ রুদ্ধ হওয়ায় আমরা ক্রমে কর্ম্ম শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছি—অতএব এই দুরবস্থার জন্য আমরা নিজে দায়ী নহি। যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহাদের ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বেগবতী নদীর গতি কেহ রোধ করিতে পারে না। কর্ম্ম শক্তি কেহ রোধ করিতে পারে না। তবে তাহাকে নিয়মিত করিতে হয়। এক পথ বন্ধ হইলে আর এক পথ আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়।

যাহারা জ্ঞানশক্তি সম্পন্ন, তাহারাই লোকের প্রকৃত কর্ম্মপথ নিয়মিত করিয়া দেয়। আমাদের মধ্যে যাহারা দেশ-হিতৈষী, তাহাদের এই কর্ম্মশক্তি নিয়মিত করিবার উপায় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। কেন না, কেবল তাহার দ্বারাই ভারতের দারিদ্র্য দূর হইতে পারে। পৃথ্বীশ বাবু ভারতের দারিদ্র্যের কারণ ও তাহার প্রতিবিধানের উপায় স্থির করিতে চেষ্টা করিয়া আমাদের বিশিষ্ট উপকার করিয়াছেন। আমরা পৃথ্বীশ বাবুকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। আশা করি, প্রত্যেক ভারতহিতৈষী তাঁহার পুস্তক বিশেষ যত্নের সহিত পাঠ করিবেন ও ভারতের দারিদ্র্যের বিষয় বিশেষ চিন্তা করিবেন। পৃথ্বীশ বাবুর পুস্তক সম্বন্ধে সার রমেশচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন।

"It (the Poverty Problem in India) would indeed be a very interesting and useful contribution to the literature on the subject. It is interesting because in the range of Indian Politics there is no subject which is of more vital importance than this. * * * It is extremely useful because on a practical solution of this Problem our political advancement chiefly depends."

আমাদেরও এই কথা। এই জন্য আমরা প্রত্যেক শিক্ষিত ভারত-সন্তানকে এই বিশেষ আবশ্যকীয় পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছি।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

পঞ্চবটী

"পঞ্চবটী" অথবা "দণ্ডকারণ্য" শ্রবণ করিলে, দশরথ-তনয় রঘুকুল-তিলক নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম রাজা রামচন্দ্রের পিতৃ বৎসলতা, গুরুভক্তি, পত্নী-পরায়ণতা, ভ্রাতৃপ্রেম, স্বদেশ-প্রেম, স্বধর্ম্মানুরাগ, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন প্রভৃতি মহাগুণ সমূহ আমাদের স্মৃতিপথে উদয় হয়। পঞ্চবটী-তল-বাহিনী "গোদাবরী" মহানদীর কথা শুনিলেই বোধ হয় যেন, তাল তমালাদি মহাদ্রুমে পরিপূর্ণ মহারণ্যের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গোদাবরীর তরঙ্গে তরঙ্গে সহস্র দল কমলকুলকে নাচিতে ও ভাসিতে দেখিতেছি; যেন মধ্যাহ্ন সূর্য্যকিরণে অনুরঞ্জিত সেই সুবর্ণাভ তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে চক্রবাক, চক্রবাকী, চকোর, চকোরী প্রভৃতি বিচিত্র বিহঙ্গবর্গকে নাচিতে ও খেলিতে দেখিতে পাইতেছি; যেন মধুপানে মত্ত মক্ষিকা সমূহের মনমোহক গুঞ্জন, নানাবিধ প্রস্ফুটিত প্রসূনের সুগন্ধ এবং গোদাবরী তটে তপঃ-প্রভাবশালী পূজনীয় ব্রহ্মদর্শী মহাত্মাদিগের হোমকুণ্ডের

নীলবর্ণ ধূম্ররাশিকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। দণ্ডকারণ্য স্মরণ হইলে, বিপুলবপু রাক্ষস, মায়ামৃগ, লক্ষণের কোপ, রাবণের ছদ্মবেশ, সীতার হরণ, জটায়ুর পরোপকার, সূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন, রামের বিলাপ, ভয়ানক শ্বাপদবর্গের চীৎকার, শাখা মৃগের সন্ধি প্রভৃতি অপূর্ব্ব ঘটনা সমূহ সহসা স্মৃতিপথে উদয় হয়। রত্নাকর বাল্মিকীর বর লাভ হইতে ভবভূতি-বর্ণিত সীতার জীবনমুক্তি বা অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত সমগ্র রামায়ণ যেন পঞ্চবটী ভূমির সম্মুখে প্রতিনিয়ত পঠিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। এই পঞ্চবটী অতি পবিত্র ও প্রাচীন স্থান; ভারতের ইতিহাসে, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে, পৃথিবীর সাহিত্যে পঞ্চবটী এক অপূর্ব্ব স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মহাভূমিতে আমি, আমার জীবনে, দুইবার উপস্থিত হইয়াছিলাম; এই প্রস্তাব দণ্ডকারণ্যের মধ্যে বসিয়া লিখিয়াছি; দণ্ডকারণ্যের বর্ত্তমান অবস্থা অলোচনা করিবার যোগ্য; হিন্দুর ও ইংরাজের পঞ্চবটী এতদুভয়ে কত প্রভেদ, তাহা এই প্রস্তাবে পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন। এই প্রস্তাব রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক; ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা ইহাতে অল্পই যোজনা করা গিয়াছে।

কলিকাতা হইতে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে লাইন অনুসরণ করিয়া বোম্বে যাইতে হইলে, পথিমধ্যে নাসিকরোড্ ষ্টেশন দেখিতে পাওয়া যায়। জব্বলপুর হইতে এই ষ্টেশন ৫০০ মাইল এবং বোম্বে হইতে প্রায় ৬০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। রাজপুতানার আবুরোড্ অথবা হিন্ডন্ রোড্ ষ্টেশন হইতে আবু এবং হিন্ডন্ নগর যেরূপ রেলওয়ে প্লাটফরম হইতে দূরবর্ত্তী, নাসিকরোডষ্টেশন হইতে নাসিক নগর সেইরূপ দূরে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে নাসিক নগর প্রায় তিন ক্রোশ; এই নাসিকের অপর নাম পঞ্চবটী বা দণ্ডকারণ্য। সিংহল দ্বীপ যেমন সংস্কৃত রামায়ণে লঙ্কা বলিয়া প্রসিদ্ধ, নাসিক নগর বাল্মিকী রামায়ণে পঞ্চবটী বা দণ্ডকারণ্য বলিয়া পরিচিত। লঙ্কার ইংরাজি ঐতিহাসিক নাম সিলোন বা সিংহল, পঞ্চবটীর ইংরাজী নাম নাসিক। সিংহল শব্দ যেমন পালিভাষার অভিধানের অন্যতম শব্দ, মহারাষ্ট্র ভাষায় নাসিক শব্দও তেমনি অন্যতম মারাঠী শব্দ। মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র যখন দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছিলেন, তখন এখানে মনুষ্যাবাস ছিল না; চিত্রকূট হইতে পঞ্চবটী পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান মহারণ্যে সমাবৃত ছিল। শতযোজনব্যাপী এই মহাবনে কেবল হিংস্র শ্বাপদকুল নিরন্তর চীৎকার করিত এবং স্থানে স্থানে ধ্যাননিরত যোগীবৃন্দের কুটীর-নিঃসৃত ধূমরাশি গগন পথে দেখা যাইত। রামের বনবাস কাল সমাপ্ত হইলে, রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ঘটনা শেষ হইলে, অযোধ্যার বীরেরা মহারণ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, পঞ্চবটী যখন পবিত্র তীর্থ স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ও পরিগণিত হয়, তখন নানাস্থান হইতে দলে দলে হিন্দু গৃহস্থ আসিয়া গোদাবরী তটে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে এই স্থান জনপদে পরিণত হইলে, ইহার নাসিক নাম হয়। নাসিক শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন, সূর্পনখার এখানে নাসিকা ছেদন হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাসিক নাম হইয়াছে; কেহ বলেন, খান্দেশী ভাষায় নাসিক শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ বা পবিত্র; কোন কোন মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত লিখিয়াছেন, ডেকান (Deccan)

এবং কঙ্কান (Concan) এতদুভয়ের মধ্যে নাসিক অবস্থিত বলিয়া, মহারাষ্ট্র ভাষায় ইহার নাসিক নাম হইয়াছে। যাহা হউক, গোদাবরী নদীতটস্থ এই নাসিক নগর পঞ্চবটী বা দণ্ডকারণ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। কলিকাতা-তলবাহিনী গঙ্গার এক দিকে যেমন হাবড়া, অপর দিকে কলিকাতা, গোদাবরীর একদিকের তটে তেমনি নাসিক, অপর দিকের তটে দণ্ডকারণ্য; মধ্যে নদীর সামান্য ব্যবধান। নদীর উভয় কূল মন্দির মালায় পরিপূর্ণ; এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যপ্রদ এবং ভূমি উর্ব্বরা। তিন ক্রোশ দূরে (গঙ্গাপুরে) নয়টি পুরাতন মন্দির এবং একটি সুন্দর জলপ্রপাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। নাসিক হইতে দশ ক্রোশ দূরে সুবিখ্যাত ত্রিম্বক নগর ও ত্রিম্বক শৈল, এই শৈল হইতে গোদাবরী নিঃসৃতা হইয়াছে, পর্ব্বতের এই অংশের নাম গোমুখী, গোমুখী স্বর্ণে আচ্ছাদিত। নাসিক, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগর। বাঙ্গালার হুগলী জেলা যত বড়, নাসিক তত বড়। সার্দ্ধ দুই ক্রোশে সুবিখ্যাত লোণা গুহা, বৌদ্ধ শ্রাবকদিগের তপস্যা স্থানের চিহ্ন রূপে এখনও বর্ত্তমান। প্রায় দুই মাইল দূরে সারণপুর নামে একখানি গ্রাম আছে, ইহা জনৈক জর্ম্মণ ভ্রমণকারী কর্ত্তৃক স্থাপিত। অরণ্য ও পাহাড় কাটিয়া তিনি এই গ্রাম বসাইয়াছেন, এই গ্রামে হিন্দু নাই, বহু সংখ্যক দেশীয় খ্রীষ্টানের বসতি। এই গ্রামের পার্শ্বে দাত্রীকুলাগ্রগণ্যা অহল্যা বাইয়ের কূপ এবং মন্দির এখনও বর্ত্তমান। সারণপুরে, নাসিকের সমুদয় ইউরোপীয় রাজকর্ম্মচারী বাস করেন। এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ এবং প্রাকৃতিক শোভা অত্যন্ত মনোহারিণী। গ্রামটি সহরের মিউনিসিপালিটীর অন্তর্ভুক্ত নহে বটে, কিন্তু দেশীয় ও ইউরোপীয় খ্রীষ্টানের পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা দেখিলে নগরের মিউনিসিপালিটীকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। নাসিকে নানাপ্রকার অতি উৎকৃষ্ট মৎস্য, ফল, ফুল, মূল এবং শাক সবজী পাওয়া যায়। অনেক দিন পূর্ব্বে বোম্বায়ের তদানীন্তন গবর্ণর সারজর্জ্জ কাম্বেল সাহেব লিখিয়াছিলেন* "যদি কখনও কলিকাতা বা সিমলা হইতে ভারতের রাজধানী উঠাইবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে নাসিকে গবর্ণর জেনেরলের বাসস্থান হইতে পারে।" নাসিকের আঙ্গুর বড় প্রসিদ্ধ। নগরটি সমুদ্রতট হইতে প্রায় দুই সহস্র ফিট উচ্চ। নাসিকের মাতৃভাষা মহারাষ্ট্র; নগরে ব্রাহ্মণের বাস প্রায় ছয় হাজার। অধিকাংশ যজুর্ব্বেদী।

ইংরাজী ১৮৮৮ অব্দে, বর্ষাঋতুতে, বাষ্পীয় শকটযোগে, আমি মধ্যপ্রদেশ (Central Provinces) হইতে বোম্বাই হইয়া কন্যাকুমারী (Cape Comorin) এবং সিংহল যাইতে যাইতে পথিমধ্যে নাসিকে এক সপ্তাহ কাল অবস্থান করিয়াছিলাম। তখন পঞ্চবটীর যে বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছিলাম, মান্দ্রাজের কোনও তামিলবন্ধুর বাটীতে তাহা নষ্ট হইয়া

* "Sir George Campbell, in considering the most desirable seat for the Vice-regal Government, in the event of Calcutta and Simla being abandoned, suggested Nasik as offering the greatest advantages in point of position, military and political, climate, &c. Its average rainfall is 35 inches. Height above sea level 1,900 feet. It has been said that Nasik derives its temperate climate from its proximity to the sea, being only about 60 miles from Bulsar, the fresh breezes from which find their way through the Peiet gorges. "The climate of Nasik", Sir George remarked, "is very healthy and delightful." The district is noted for an extensive trade in copper and brass wares. You will find excellent grapes in the district all round the year."

যায়, সুতরাং এবারের এবিবরণ নূতন। পাঠক মহাশয়দিগের বোধ হয় জানা আছে, বার বৎসরে হিন্দুর একবার "কুম্ভ" হয়; দ্বাদশ রাশি ঘুরিতে ঘুরিতে বৎসরে একবার মাত্র একটি রাশির প্রভাব বিস্তৃত হইয়া থাকে; এইরূপে রাশিচক্রের ঘূর্ণনানুসারে বৃশ্চিক, মিথুন, মীন, সিংহ, কন্যা, তুলা, কর্কট, কুম্ভ ইত্যাদির ক্রমান্বয়িক ধারামতে যখন কুম্ভ "পালা" (Turn) আইসে, তখন "কুম্ভযোগ" হয়। এই কুম্ভযোগ কখনও আলাহাবাদ(প্রয়াগ) কখনও হরিদ্বারে হইয়া থাকে। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর লোকেরা কুম্ভ অপেক্ষা সিংহ রাশিকে অধিকতর পবিত্র ও মর্য্যাদা সম্পন্ন জ্ঞান করে, সেইজন্য রাশিচক্রের ঘূর্ণনে সিংহ রাশির যখন Turn (পালা) হয়, তখন বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে মহাধূমধামের পর্ব্ব পড়িয়া যায়, এই পর্ব্ব বার বৎসরে একবার হয়, ইহার নাম "সিংহমস্তা"; ইহা কখনও নাসিকের গোদাবরীতে, কখনও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা বা কাবেরীতে হইয়া থাকে। ১৮৯৬ অব্দের ১৩ই আগষ্ট তারিখে (শ্রাবণ শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে) নাসিকে এই সিংহমস্তা হইয়াছিল; বর্ষাঋতুতে না হইলে বোধ হয় দশ বার লক্ষ লোক একত্র হইত, এবারে কেবল দুই লক্ষ যাত্রী একত্র হইয়াছিল, নগরে স্থান ছিল না। আমিও হায়দ্রাবাদ যাইতে যাইতে নাসিকে নামিলাম, সিংহমস্তার যাত্রী হইলাম। এই বিবরণ সিংহমস্তা পর্ব্বের সময়ে লিখিয়াছি।

নাসিকে আসিবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি আরঙ্গাবাদ হইয়া জগদ্বিখ্যাত ইল্লোরা (Ellara caves) গুহা দেখিতে গিয়াছিলাম, সুতরাং নাসিকে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল। প্রায় দিবা একটার সময় রেলগাড়ী হইতে নামিলাম, তখন মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বর্ষার বিবরণ, দ্বিতীয় কালিদাস না হইলে, ঠিক পাওয়া দুষ্কর। এরূপ লক্ষ্মীছাড়া বর্ষা জগতে বোধ হয় আর কোথাও নাই। নাসিক ষ্টেসনে নামিয়া বিদেশীকে ভাবিতে হয় না 'কোথায় থাকিব?' রেলগাড়ী হইতে নামিতে না নামিতেই, তোমার চারিদিকে অপরিচিত ব্রাহ্মণকুল আসিয়া তোমাকে ঘেরিয়া ফেলিবে, তোমার সাধ্য কি যে তুমি তাহাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া একপদ অগ্রসর হও? নরাকারের কোনও প্রাণী রেলগাড়ী হইতে নামিলেই, বহুদর্শী ব্রাহ্মণকুল ঠিক করিয়া লয়, এব্যক্তি বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, মান্দ্রাজী অথবা অন্য কোনও স্থানের লোক। নিশ্চয় হইলেই তোমার দেশের ভাষায় জিজ্ঞাসা করিবে 'কোথা হইতে আসিতেছ? বাটী কোথায়? পিতার নাম কি? কোন্ জাতি? তোমার পাণ্ডা কে? তোমার জিলা ও থানা কোথায়? তোমার গ্রামের নাম কি?" ইত্যাদি,ইত্যাদি। এই সকল প্রশ্ন আমাকেও অবশ্য জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, যে সকল মহাপ্রভু এই বিরক্তিকর প্রশ্নমালা জিজ্ঞাসা করে, তাহারা 'পাণ্ডা' নামে খ্যাত। হিন্দুর তীর্থক্ষেত্রে পাণ্ডার বড়ই অধিকার। পাণ্ডাচরিত্র লিখিতে গেলে একখানি বড় পুস্তক লিখিতে হয়, সে সময় আমার নাই। এ প্রবন্ধে কোন এই অদ্ভুত চরিত্রের কিঞ্চিৎ নমুনা দিয়াছি। যদি কেহ নরদেহে পশুর স্বভাব,ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রভাব, মুখে কোমলতা হৃদয়ে কঠিন ভাব এবং মনুষ্যে মনুষ্যত্বের অভাব একাধারে দেখিতে চাহ, তাহা হইলে তীর্থের পাণ্ডা প্রভুকে দেখ। হিন্দুধর্ম্মে ভক্তের ভক্তি হ্রাসের অন্যতম কারণ—পাণ্ডার পশুত্ব। সে কথা পরে বলিব।

আমি রেলগাড়ী হইতে প্লাটফরমে অবতরণ করিলাম। অবতরণ করিয়া দেখি, কুলির আবশ্যক নাই, অযাচিত হইয়া কোথা হইতে অপরিচিত ব্রাহ্মণেরা আসিয়া আমার দ্রব্যাদি নামাইয়া লইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কে? উত্তর হইল 'গম্‌থাও, গম্‌থাও, তোম্‌চা পাণ্ডা আহে।' আর এক জন তাহার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল 'ক্যা ঝালা?' বালক উত্তর দিল 'চাংগ্‌লে আহে।' আমি মহারাষ্ট্রী ভাষা বুঝিতে পারি, সুতরাং অর্থ বুঝিলাম। পাণ্ডাজী 'বরে' বলিয়া, আমার জিনিসপত্র লইয়া, এক কোণে দাঁড়াইল। ক্রমে টিকিট দেখাইয়া রেলযাত্রীরা প্লাটফরমের বাহিরে আসিলে আমিও যথাসময়ে বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি, নানা মূর্ত্তির নানাপ্রকারের পাণ্ডা আসিয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমাকে প্রশ্ন করিতেছে, আমি বিরক্ত হইয়া নিরুত্তর হইলাম। এমন সময়ে একজন পাণ্ডা একটা খুব বড় খাতা লইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল এবং খাতা খুলিয়া বলিল "আমিই তোমার পাণ্ডা, তোমার পিতা ও পিতামহ পঞ্চবটীতে আসিয়া আমার বাটীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন।" আমি বলিলাম "আমার পিতার নাম কি?" সে উত্তর দিল "পাণ্ডুরং" এই নাম দক্ষিণাবর্ত্তের লোকের, বাঙ্গালীর হইতে পারে না। আমি শুনিয়া অবাক্ হইলাম, ভাবিলাম "তীর্থ স্থানে পিতামাতার বেশ শ্রাদ্ধ হয়!" আর এক জন পাণ্ডা খাতা খুলিয়া বলিল "শুনুন, আপনার ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের নাম বলিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া, যাঁ'র তা'র নাম আওড়াইতে লাগিল। একজন পাণ্ডা বলিয়া উঠিল, "ইহাঁর পিতামহ আমাদের বাটীতে ছিলেন, নামটী ঠিক স্মরণ নাই, খাতা দেখিলে বলিতে পারি; বোধ হয় ভব—ভব—ভবগুণ"!! হাস্য আর সম্বরণ করা যায় না, হাসিয়া ফেলিলাম। এক জন পাণ্ডা বলিল, "আপনি আর কখনও নাসিকে আসিয়াছিলেন কি?" আমি বলিলাম, "হাঁ"। তোমার পাণ্ডা কে? ইহার উত্তরে বলিলাম, সেবারে যাহার বাটীতে ছিলাম, তাহার নাম স্মরণ নাই, পাড়ার নামও মনে নাই। লোকটা বলিল, সে পাণ্ডা মরিয়া গিয়াছে, আমি তাহার দাহ সময়ে উপস্থিত ছিলাম, তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমিই তোমার পাণ্ডা হইলাম। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে এক পাণ্ডা বলিল, চিনিয়াছি, তুমিই (অনেক দিন হইল) আমার বাটীতে আসিয়াছিলে, ঠিক এই চেহারাই বটে, ঐ রকম দাড়ী, এই রকম কাপড় চোপড়, ইংরাজী জানে, মুসলমানের ভাষা খুব বলিতে পারে, খুব তামাক খায়, ইত্যাদি। আর এক পাণ্ডা উহাঁকে বলিয়া উঠিল, না, না, আমারই ইনি যজমান, আমার এখনও স্মরণ আছে, ইনি অধিক ভাত খাইতে পারেন না, কলাপাতায় আমার বাটীতে ভাত খাইতে ভাল বাসিতেন, দুই বেলায় সাতগণ্ডা মাত্র রুটি আর কিছু কম দেড়সের চাউলের ভাত খান!! আমি ভাবিলাম, পরিচয়টা উত্তম হইতেছে!! এইরূপে কাহারও চালাকী যখন খাটিল না, তখন পাণ্ডারা পরস্পরে এই বলিয়া বিবাদ করিতে লাগিল যে, "আমিই ইহাঁকে প্রথমে ডাকিয়াছি ও দেখিয়াছি, সুতরাং ইনিই আমার যজমান হইবেন।" কেহ কেহ আবার খাতা খুলিল, নাম পাইল না, অবশেষে বিবাদটা মল্লযুদ্ধে পরিণত হইল। আমি, ষ্টেশন মাষ্টার ও রেলওয়ে পুলীশের

সাহায্য প্রার্থনা করিলাম, তাঁহারা পাণ্ডাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া বলিল "যে ব্রাহ্মণ প্রথমে লইয়া আসিয়াছে, সেই ব্যক্তিই ইঁহার পাণ্ডা"। যে ব্রাহ্মণ "বরে" বলিয়া এক কোণে আমার দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছিল, আমি তাহারই সঙ্গে চলিলাম। ষ্টেশন হইতে নাসিক নগর পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে আছে, কিন্তু সে সময়ে ট্রামগাড়ী ছিলনা, আমি টংগা গাড়ী ভাড়া করিয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাহার বাটীতে চলিলাম; ভাড়া পাঁচ আনা। টংগা অশ্বে বহন করে, ইহা ফেটনের ন্যায় একপ্রকার ঘোড়ার গাড়ী। পথিমধ্যে মাসুলের ঘর আছে, তথায় প্রত্যেক যাত্রীকে চারি আনা মাশুল দিতে হয়, এই মাশুলের টাকা মিউনিসিপালিটি গ্রহণ করেন। এই ঘরের নাম চুঙ্গীঘর অথবা Octroi post. গাড়ীতে আসিতে আসিতে অগণ্য পাণ্ডার অগণ্য প্রশ্ন শুনিতে হইয়াছিল, কেহ কেহ বা "আম্‌চা যাত্রী আহে" "মাজা যাত্রী আহে" বলিয়া আমাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া তাহার ঘরে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আমার ব্রাহ্মণ পাণ্ডা কাহারও কথা শুনিল না। বেলা ৫ টার সময় ব্রাহ্মণের বাটীতে নামিলাম। নামিয়া দেখি, ব্রাহ্মণের সমুদয় বাটীটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ঐ ভাঙ্গাবাটীর মেরামত হইতেছে, থাকিবার একটি মাত্র ঘর, তাহাতেও ছাদ হইতে ঘরের মধ্যে জল পড়ে, চতুর্দ্দিকে মূত্র ও পুরীষের দুর্গন্ধ, যে দিকে তাকাও সেই দিকেই নরকের দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। কেবল তাহাই নহে, ভগ্ন বাটীর এক কোণে দুইটি কুটীর আছে, তাহাতে তিনজন "সিণ্ডাল" বাস করে। এই রূপবতী ষোড়শী যুবতীরা পাণ্ডার কন্যা বা আত্মীয় নহে, যাত্রীর সর্ব্বনাশ সাধন জন্য "সিণ্ডাল'দিগকে রাখা হয়। সে সকল কথা আর তুলিব না, "নব্যভারতের" শিক্ষিত পাঠকবৃন্দের নিকটে অকারণে অপরাধী হইতে ইচ্ছা করি না; কেবল এই টুকু বলিতে চাহি, হিন্দুধর্ম্মের আজি কালিকার ধর্ম্মধ্বজী প্রচারকেরা দেখিয়া যাউন, ব্রাহ্মণ-চরিত্র কি অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। অনেক দিন পূর্ব্বে, প্রথম আগমন কালে, যে পাণ্ডার বাটীতে ছিলাম, এক দিন পরে তাহার নিকট কে বলিয়া দিয়াছিল যে, আমি আবার নাসিকে আসিয়াছি। সেই ব্রাহ্মণ, এই ব্রাহ্মণের বাটীতে আসিয়া খাতা খুলিয়া দেখাইল, আমি ইহার যাত্রী নহি। নাসিকের পাণ্ডাদের মধ্যে এই নিয়ম আছে যে, যে যাহার পাণ্ডা, সে আপনার যাত্রীকে অবাধে লইয়া যাইতে পারিবে, অন্য কেহ প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না, প্রতিবন্ধকতা করিলে পাণ্ডার পঞ্চায়তী সভা কর্ত্তৃক সে ব্যক্তি দণ্ডিত এবং পাণ্ডাগিরীতে অনধিকারী হইবে। সুতরাং এই ব্রাহ্মণ কিছুই বলিতে সক্ষম হইল না, তবুও একবার খাতা খুলিয়া দেখিল, আমাদের কেহ তাহাদের বাটীতে কখনও আসিয়াছিল কি না। যখন সন্তুষ্ট হইল, তখন আমাকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু আমাকে এ কথাও বলিয়া দিল "যদিও অপর পাণ্ডার যাত্রীকে কোনও পাণ্ডা তাহার অসম্মতিতে রাখিতে পারেনা, কিন্তু যাত্রী আপনার পাণ্ডার বাটীতে যাইতে অসম্মত হইলে আমরা রাখিতে পারি।" আমি এই নিয়মে সন্তুষ্ট হইলাম না, আমার পাণ্ডার সঙ্গে চলিলাম। যাইবার সময় ব্রাহ্মণকে অবশ্য কিছু দিয়া গেলাম। পুরাতন পাণ্ডা তাহার বাড়ীতে আমাকে লইয়া চলিল, তাহার মাথায়, ঘাড়ে, কাঁধে ও পিটে অবশ্য আমার দ্রব্যাদি রহিল।

ক্রমে এই পাণ্ডার বাড়ীতে পৌঁছিলাম, এখানেও সেই দুর্গন্ধ, সেই সকল অমানুষিক অশ্লীল ব্যাপার; ঘরে ঘরে এই রূপ, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আবার বলিতেছি, লেখনী কলঙ্কিত করিতে চাহি না, নাসিকে আসিয়া হিন্দুগুরু ব্রাহ্মণের চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করুন। নাসিকে ছয় হাজার ব্রাহ্মণের বসতি, ইহাদের কৃষিকার্য্য নাই, দোকান নাই, সওদাগরী নাই, চাকুরী নাই, কেবল যাত্রীর মাথায় হাত বুলাইয়া পেট ভরায়; মিথ্যা কথা, ছলনা, শঠতা, অশ্লীলতা, যাত্রীর চরিত্রনাশ প্রভৃতি দ্বারা গৃহস্থ পালন করে। বোম্বায়ের সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু-সমাজ-সংস্কারক সত্য সত্যই নাসিক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন "Can ideal of priestcraft and blackmail go further?" আর একজন লিখিয়াছেন,—

"The Demon is personified: They are more wicked than the wickedness itself. Anything good or great, noble or laudable, sacred or sublime is unknown to the Brahmans of Nasik—once the sacred abode of the holy Rama. In the name of the Hindu religion, they do all sorts of things and no vice has a name which is not known to them. The Banias of Gujerat and the Vatiahs of Cutch commit lot of rascality in their trades by which they earn money, and then they come to Panchabaty to satisfy their conscience by worshiping Godavery which is the only Public Scavenger of the Nasik Municipality and by offering silver and gold to the Brahmans who are more notorious scoundrels and blackguards than the Gujeratee Baniahs and Cutchee Vatiahs." ‡

আমি একদিন গোদাবরীতে স্নান করিতে গেলাম। সেই কল-কল-বাহিনী শ্যাম-সলিলা গোদাবরী তটে গিয়া আমার রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল। নদী কূলস্থিত প্রাচীন মন্দিরমালার মধ্যে রাম-স্তুতিগান, ঘাটের উপরে স্থিত সন্ন্যাসীবৃন্দের বেদপাঠ, ধর্ম্মশালার ব্রহ্মচারীদিগের বম্ বম্ ধ্বনি এবং ব্রহ্মকুণ্ডের কুটীর হইতে রামায়ণাবৃত্তি শুনিয়া রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল। সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধা, যোগীজনপ্রিয়া, সীতা-সখী গোদাবরীর প্রস্তরময় তটে দাঁড়াইয়া প্রাবৃটের অনন্ত আকাশের দিকে তাকাইলাম; আকাশের সেই মূর্ত্তি এখনও স্মরণ আছে। তটে দাঁড়াইয়া পঞ্চবটীকে সম্মুখে দেখিলাম; শ্রীরামচন্দ্রের নব দূর্ব্বাদল-ঘন-শ্যাম মূর্ত্তি মনে পড়িল, লক্ষ্মণের জ্যোতির্ম্ময় মুখ খানি মনশ্চক্ষুতে দেখিলাম; আজানুবাহু অঙ্গদের পরাক্রম, ভরতের ভ্রাতৃভক্তি, গোদাবরী তটে সীতার চিত্রাঙ্কণ, এ সকল সহসা মনে উদয় হইল; যোগীবর বশিষ্ঠের যোগোপদেশ, বাল্মীকির ধর্ম্মরক্ষা, গোদাবরী তটে ব্রহ্মদর্শী তপঃপ্রভাবশালী আর্য্য ঋষিদিগের তপস্যার কথা মনে পড়িল; কোকনদ, কহ্লার, কমল, কুমুদ, পারিজাত, মন্দার ইত্যাদির সুগন্ধি যেন চতুর্দ্দিক আমোদিত করিল; চকোর চকোরী, চক্রবাক, চক্রবাকী, রাজহংস, কুসুমাকর-সখা, ময়ূর, ময়ূরী প্রভৃতির কেকাধ্বনি যেন শুনিতেছি বোধ হইল; ঋতুরাজ বসন্তের পূর্ণ শোভায়, গোদাবরী শ্যাম সলিলের উপরে, অনন্ত নীলাকাশের নীচে, সুন্দর মেঘের কোলে, সতী সীতার পার্শ্বে, যেন নব দূর্ব্বাদল-শ্যাম রঘুনাথকে প্রত্যক্ষ দেখিলাম; যেন সেই প্রাবৃটের বিজলীভরা মেঘের নিম্নে, পরোপকারের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য, তীর ধনু লইয়া, জরাগ্রস্ত জটায়ুকে আনন্দ চিত্তে আত্মোৎসর্গ করিতে দেখিতে পাইলাম। রোমাঞ্চ না হইবে কেন? হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক বলে গদগদ হইলাম, রো-

‡ Extract from a letter received from a Mahratta friend from Munmad station on the G. I. P. Railway. (20th July, 1896.)

স্নান না হইবে কেন? পবিত্রা পুণ্যময়ী গোদাবরী গাথা হিন্দুর ভগ্ন হৃদয়ের মহা ভরসা; এই ভরসা হইতে চতুর্দ্দশ কোটি হিন্দু সন্তানকে কি স্বতন্ত্র করিতে চাও? গোদাবরি! গোদাবরি! তুমি ঈশ্বরী না হইলেও, তোমার তটে দাঁড়াইয়া কোন্ হিন্দু মস্তকাবনত না করিয়া থাকিতে পারে? অনন্তের কোলে, কুল কুল স্বরে, নাসিকের নীচে তুমি নিরাপদে নাচিতে থাক, আমি তোমার পবিত্রতার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিব না।

পবিত্রতার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিব না সত্য, কিন্তু পাণ্ডারা তোমার পবিত্রতা কতদিন পর্য্যন্ত রাখিবে? গোদাবরি! তোমার তটে প্রতিনিয়ত এখন যাহা ঘটিতেছে, তাহা কি কলির রামায়ণ? কলঙ্কের ভয়ে আর সে কথা তুলিব না। স্নান করিতে গিয়া যাহা দেখিয়াছি, তাহারই কিছু বলিতেছি। অনেকবার বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম, গোপীবালকেরা গাইয়াছিল--

"রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন।
মধুর মধুর বংশী বাজে এইত বৃন্দাবন!"

গোদাবরীতটে ব্রাহ্মণ বালকেরা গাহিল—

নাসিক নগরী গঙ্গাতীরী*
দেবাচা আহে স্থান।
ইত্যাদি।

ঘাটের নীচে জলে পা দিয়া দেখি, নিমিষের মধ্যে কোথা হইতে দলে দলে ব্রাহ্মণ-পাণ্ডারা আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল; উদ্দেশ্য এই যে, স্নান করিলেই পয়সা, টাকা ইত্যাদি লইবে। বলা বাহুল্য, আমার নিজের পাণ্ডা প্রভু সঙ্গে ছিল না; পাণ্ডাদের দৌরাত্ম্যে সে ঘাটে আমার স্নান হইল না, কিন্তু আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। এই সময়ে একহিন্দু জলে নামিয়া স্নান করিল, স্নান করিয়া উঠিতে না উঠিতে ব্রাহ্মণেরা পরস্পরে বিবাদে প্রবৃত্ত হইল, বিবাদের কারণ এই যে, সকলেই বলিল 'আমি ইহার শ্রাদ্ধ করিব;' বাস্তবিক 'ইহার' (এই মনুষ্যের) শ্রাদ্ধই বটে!! অবশেষে এক বলবান পাণ্ডা জয়লাভ করিল। সে বলিল, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, গো, রৌপ্য ও স্বুবর্ণ দান কর। হিন্দু বলিল—কেন? পাণ্ডা—তোমার পিতার শ্রাদ্ধ কর। হিন্দু—আমার পিতা জীবিত। পাণ্ডা—তবে তোমার মাতার? হিন্দু—মাতাও জীবিতা। পাণ্ডা—কি সর্ব্বনাশ! পিতামহের শ্রাদ্ধ কেন না কর? হিন্দু বলিল, পরমেশ্বরের কৃপায় মোটা রুটি খাইয়া ও মোটা কাপড় পরিয়া ৯৬ বর্ষ বয়সে আমার পিতামহ এখনও জীবিত। পাণ্ডা—কি সর্ব্বনাশ! এ লোকটার ঘরে যমরাজ কি দৃষ্টিপাত কত্তে ভুলে গেছে না কি? আচ্ছা বাপু, তোমার প্রপিতামহের শ্রাদ্ধ কত্তে হবে। হিন্দু বলিল, ব্রাহ্মণ দেবতা, আমার প্রপিতামহ বৃদ্ধাবস্থায় সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সেই অবধি তাঁহার সম্বাদ নাই, জানি না, মৃত কি জীবিত। পাণ্ডা প্রভু অমনি বলিয়া উঠিল, তাহার নাম কি বল দেখি? হিন্দু—মিহিলাল। পাণ্ডা—হাঁ হাঁ মিহিলালকে আমি

* নাসিকে গোদাবরীকে গঙ্গা কহে; মধ্যভারতে নর্ম্মদাও গঙ্গা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বুর্হানপুরে তাপ্তীনদী, আমেদাবাদে গোমতী, মান্দ্রাজের ত্রিপতি নগরীস্থ বড় বড় পুষ্করিণী সমূহ গঙ্গা নামে পরিচিতা। গঙ্গার নামে ব্রাহ্মণের পেট ভরুক ক্ষতি নাই, কিন্তু মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করিয়া কয় দিন চলিবে? পাণ্ডারা গোদাবরীকে গঙ্গা অপেক্ষা অধিকতর মাহাত্ম্য-পূর্ণা বলে; উদ্দেশ্য এই যে, যাহা কিছু খরচ করিতে হয় তাহা গোদাবরী তটেই কর।

জানি,সে ব্যক্তি হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে অনেক দিন হইল মরিয়াছে, আমি তাঁহার মৃত দেহকে পুড়িতে দেখিয়াছি। তুমি তাহারই শ্রাদ্ধ কর। হিন্দু—আপনার সম্বাদ সংশয়-ব্যঞ্জক, না জানিয়া শ্রাদ্ধ হয় না। পাণ্ডা—তবে কি কেহই তোমার মরে নাই? কি সর্ব্বনেশে লোক তুমি!! হিন্দু—মরিবে না কেন? জগতে অমর কে? আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্প্রতি মরিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত পুত্র আছে। পাণ্ডা বলিল, 'কনিষ্ঠভ্রাতা পুত্রবৎ; আইস, তাহারই শ্রাদ্ধ করাইব।' অবশেষে কাহার শ্রাদ্ধ হইল,জানি না, হিন্দুকে ৯৶৹ দিতে হইল। তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পাণ্ডা বলিল, গো দান কর। এই শূদ্র হিন্দুকে ব্রাহ্মণ আপনার বৃদ্ধা গাভীকে ৮ টাকায় বিক্রয় করিল, শূদ্র ঐ গাভী এই ব্রাহ্মণকে দান করিল। সর্ব্বসমেৎ ১৭৷৶৹ লইয়া পাণ্ডা ঐ হিন্দুকে ছাড়িয়া দিল। ঘাটের আর এক স্থানে এক ব্যক্তি স্নান করিতে আসিয়াছে দেখিলাম। একটা ষণ্ডামার্কবৎ পাণ্ডা তাহার হাত ধরিয়া রাখিল এবং নাপিতকে ডাকিয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাথার চুল, দাড়ী, গোপ কামাইয়া দিল। পাণ্ডা বলিল, "এইবারে স্নান কর্, তোর মোক্ষ হবে। গোদাবরী তোর প্রতি প্রসন্না, তুই পিতৃ ও মাতৃকুলের চন্দ্রবৎ।" লোকটার হাত ছাড়িয়া দিলে, সে স্নান করিল। মধ্য প্রদেশের সেই ক্ষীণকায় ভীরু হিন্দু কাঁপিতে কাঁপিতে স্নান করিয়া উঠিলে, পাণ্ডা বলিল "শ্রাদ্ধ কর।" নবমীর বলির পাঁটার ন্যায় অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে এদিক ওদিক দেখিয়া, হিন্দু বলিল, "কাহার শ্রাদ্ধ?" আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলাম, মৃদু হাস্য হাসিয়া বলিলাম, "তোমার শ্রাদ্ধ!" লোকটা আমার দিকে চক্ষু খুলিয়া দেখিল, দেখিয়া বলিল "নমস্কার!! আপনি এখানে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা জানিতাম না।" পাণ্ডা তাহা বুঝিল, আমার দিকে তাকাইয়া বলিল "ইঙ্গ্রীরী (অর্থাৎ ইংরেজী) যদি কখনও বন্ধ হয়, তবেই মঙ্গল।" লোকটা সাহস পাইয়া পাণ্ডার হাত ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল।

পাঠক মহাশয়! প্রস্তাব দীর্ঘ হইতেছে। পাণ্ডা-চরিত্রের একটু নমুনা দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। এইবারে পঞ্চবটী। আমি প্রথম যখন নাসিকে গিয়াছিলাম, তখন গোদাবরী পার হইয়া বর্ষাকালে অপর পারে যাওয়া বড়ই কষ্টকর ছিল, এবারে দেখিলাম, এক খানা নৌকা হইয়াছে এবং একটা বড় পুল (সেতু) বাঁধা হইতেছে। পঞ্চবটীতে আর সে মহারণ্য নাই, এখানে রামচন্দ্রের,সীতার, হনুমানের, লক্ষ্মণ প্রভৃতির মূর্ত্তি ও মন্দির আছে। রামকুণ্ড, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি কুণ্ড আছে, অনেক তপোবন ও আশ্রম আছে। মাটীর নীচে একটা পাতাল ঘরে কয়েকটি মূর্ত্তি আছে, ইত্যাদি। নাসিক নগরে ভদ্রকালীর মন্দির ও মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ৫২ পীঠের মধ্যে একটি পীঠ। শিবাপমানে অপমানিতা দক্ষকন্যা যখন দেহত্যাগ করেন, তখন তাঁহার নাসিকা আসিয়া যে স্থানে পতিত হয়, তাহা (বাঙ্গালা দেশের প্রবাদ মতে) "নাসিকা" নামে খ্যাত। যাহা হউক, নাসিকের অনেক গোঁসাই সম্বন্ধে, কবি ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায়, বলা যাইতে পারে——

"অনেক কসাই ভাল গোঁসাইয়ের চেয়ে।"

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

গল্প।

প্রথম।

এক যে আছিল মেয়ে, সে খেলিত বনে যেয়ে,
সাজিত সে বনরাণী ফুলে ফুলে ফুলে,
তুলিয়া চামেলী বেলী, তমালের গাছে হেলি,
গাঁথিত ফুলের মালা ফুলের আঙ্গুলে!

এক যে আছিল ছেলে,এক দিন সেথা এলে,
দেখিয়া সে ফুলমালা বালিকার হাতে,
হাসি মুখে হাত মেলে,আনন্দে চাহিল ছেলে,
দিল না বালিকা, মুখ ফিরা'ল পশ্চাতে!

তার পর সেই মেয়ে, তেমনি বাগানে যেয়ে,
রোজ মালা গাঁথে, কিন্তু পরে না গলায়,
জড়াইয়া পাকে পাকে, তমালের ডালে রাখে,
এইরূপে কত মালা শুকাইয়া যায়!

১

এক যে আছিল বালা, চরণে উষার আলা,
আলয় আঙ্গিনা রূপে করিত উজ্জ্বল,
কমল-কুন্নিতে জমা, গোলাপী বরফ সমা,
শরত জ্যোৎস্না আর সুরা, পরিমল!

এক যে যুবক ছিল, এক দিন সে আসিল,
তৃষিত নয়নে বালা তার দিকে চায়,
সে দীনদৃষ্টির আগে, কত কৃপাভিক্ষা জাগে,
আপনি মাতিল বালা আপন নেশায়!

যুবক দেখিয়া তারে, দেখিল না একেবারে,
সে যেন জনম অন্ধ, চেয়ে মাটি মুখে,
এক পায় দুই পায়, শশী যেন অস্ত যায়,
ঢালিয়া সে অমাবস্যা পূর্ণিমার বুকে!

২

এক যে আছিল নারী, বিশাল পদ্মার পাড়ী,
চেয়ে চেয়ে সে রূপের না হইত সীমা,
তরঙ্গে সে ভাঙ্গি চুরি, আঠার উনিশ কুড়ি,
সাগর গ্রাসিতে চায়, ভীষণ ভঙ্গিমা!

এক যে পুরুষ ছিল, নীলাকাশ সে হইল,
রবিশশী হাসে বুকে সোণা রূপা দিয়া,
সৌদামিনী রত্নহার, কণ্ঠেতে পরায় তার,
কাদম্বিনী সমাদরে গাঁথিয়া গাঁথিয়া!

সে ত দূরে উর্দ্ধে অতি, বহু নীচে পদ্মাবতী,
দু'জনার বুকে তবু দু'জনার ছায়া,
দু'জনার হিংসা লোভে,দোহে মরে রোষেক্ষোভে
সে আজ পুরুষ পর, সে ত পরজায়া!

দ্বিতীয়।

এক যে আছিল দেশ, কিবা তার শ্যামবেশ,
কিবা শোভা বনে বনে তার,
কি শোভা নদীর ঘাটে,সন্ধ্যার সোণার হাটে,
বসিয়াছে মণির বাজার!
চতুর পাপিয়া পিক, নীলাম ডাকিছে ঠিক,
মরমে আঘাত মারে তায়,
ক্রেতা ও বিক্রেতা যারা,গৃহেতে ফিরিয়া তারা,
দু'জনেই করে হায় হায়!
হরিণী হরিণ গায়, কি জানি চাটিয়া খায়,
কিবা সুধা চুয়াইয়া পড়ে,
"প্রতি রোম কূপে কূপে,প্রেম কি অমৃত রূপে
রহিয়াছে পশু-কলেবরে?"
চঞ্চল শশক ধায়, মাঝে মাঝে ফিরে চায়,
সামান্য পাতায় পড়ে ঢাকা,
"প্রেম কি অমনি তর,দেহে ছোট, লাফে বড়,
তাই বুঝি চখে চখে রাখা!"
অনন্ত ভেদিয়া হায়, আকাশে বিহঙ্গ যায়,
কোথা হ'তে কোথা করে গতি,
"প্রেমের কোথায়বাসা,কোথা করে যাওয়াআসা
কেবা জানে তাহার বসতি!"
গগনে সোণার হল, ছায়াময় লোহমল
হইতেছে ধীরে ধীরে ধীরে,

"প্রেম যে হিরণ্ময়, সেও নাকি লোহা হয়,
দু'দিন না যাইতে অচিরে।"

১

এক যে আছিল যুবা, বেহদ্দ বাঙ্গাল পুবা,
অসভ্য সে অশিক্ষিত অতি,
কাননের যথা তথা, দেখিছে সে এই কথা,
ভাবিছে এ প্রেম-পরিণতি!
নির্জন নির্ঝর তীর, নাহি নড়ে তরুশির,
নাহি নড়ে ঘাস লতা পাতা,
বসিয়া 'গজার' তলে, পা রাখিয়া নীল জলে,
করতলে অবসন্ন মাথা,—
কে যেন আসিবে হায়, আছে কার প্রতীক্ষায়
দিন যায় সে ত নাহি আসে,
না পেয়ে তাহার লাগ, খোজে তার পা'র দাগ
চেয়ে ঘাটে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে!
সে গেছে ছ'মাস আগে, তার পরে কত বাঘে,
মহিষে ভল্লুকে জল খায়,
সে চিহ্ন গিয়াছে মুছে', সে দাগ গিয়াছে ঘুচে',
সে তীক্ষ্ণ নখর ক্ষুরে হায়!
উদ্ভ্রান্ত বিশ্বাসে খালি, সে বোঝে গিয়াছে কালি,
আজো বা আসিয়া গেছে ফিরে,
না পেয়ে তাহার দেখা, খুজে গেছে একা একা
কলসী ভরিয়া নদীনীরে!
তাই সে চমকি উঠি, ঘাটে যায় দ্রুত ছুটি,
অঞ্জলি ভরিয়া তুলি জল,
ধুইছে বাঘের পারা, মহিষের শিং-মারা,
কোথা চিহ্ন চরণ-কমল?
আবার উন্মত্তবৎ, খোজে গিয়া বনপথ,
কোথাও পড়েছে কি না ফুল,
ভাবি নব মেঘভার, যদি বনবায়ু তার,
উড়াইয়া থাকে নীল চুল!
সেই যে পথের কাছে, দু'টি গোদা জাম'গাছে,
বনযুই করেছে আঁধার,
যেন বনদেবালয়ে, দিবসে জোনাকি চয়ে,
মাণিক-প্রদীপ জলে তায়!

সেই লতাকুঞ্জঘরে, কত দিন দু'পহরে,
বসেছিল তারা দুই জন,
সেখানের ধূলা বালি, মাটী মাখা আছে খালি
তপ্ত অশ্রু তপ্ত আলিঙ্গন!
সেখানে খুজিতে গিয়া, ধরিল সে জড়াইয়া,
ক্ষিপ্ত যুবা অধীর আকুল,—
শিলাসম বনমাটী, দাপটে উঠিল ফাটি,
গর্জ্জনে ঝরিল যুই ফুল!
অদূরে আছিল তারি, ক'টী গৃহস্থের বাড়ী,
সে বিশাল কানন মাঝারে,
তারা করে হৈ হৈ, মেয়ে কই—বউ কই?
কুকুর ডাকিছে বারে বারে!

২

পর দিন ভোরে উঠি, সকলে আসিল ছুটি,
সে বিজন নিঝরের পার,
সাবধানে সবে যায়, ডান্ বাঁয় ফিরে চায়,
পথে দেখে কয় খানি হাড়!
আরো কিছু আগে যেয়ে, ডান্ দিকে দেখে চেয়ে
সেই লতা ঘরের দুয়ারে,
অর্দ্ধ ভুক্ত নরদেহ, পড়িয়া রয়েছে কেহ,
চিনিতে না পারা যায় তারে!
হাত নাই, পা আছে, ছিন্ন মুণ্ড তারি কাছে,
মুখে তার নাহি মাংস লেশ,
নাহি গাল গ্রীবা ঠোঁট, দাঁত গুলি আছে মোট,
বিকট সে রাহুর বিশেষ!
বক্ষ ও উদর ছিন্ন, নাহিক মাংসের চিহ্ন,
নাড়ীভুঁড়ি পড়ে আছে পাশে,
মাথা বিষ্ঠা ছিন্ন আঁতে, মক্ষিকা উড়িছে তাতে,
প্রভাতের বনের বাতাসে!
যত ছিল স্থূল পেশী, তাহাই খেয়েছে বেশী,
নিতম্ব উরুর আছে হাড়,
নাহিক রক্তাক্ত মাটী, সমস্ত খেয়েছে চাটি,
মোছা দাগ রয়েছে তাহার!

৩

দূরে ম্লান ছিন্ন বাসে, কি যে বান্ধা একপাশে,
মেদমজ্জারুধিরে আপ্লুত,
খুলিয়া একটী নারী, চিনিল সে লেখা তারি,
ছিঁড়িয়া ফেলিল তাহা দ্রুত!
চাহিল সে ঘৃণা ভরে, মৃতের মুখের পরে,
ছিন্নভুরু চিনিল সহসা,
আমো যেন অবজ্ঞায়, ঠেলিল সে বাম পায়,
চরণে লাগিল রক্ত বসা!
সে পদ চুম্বনে তুণ্ড, কৃতার্থ হইল মুণ্ড,
মরিয়া পূরিল মনস্কাম,
অরুণে পাতার ফাকে, স্বর্গগামী আত্মা তাকে,
রক্তাক্ত সহস্র করে করিল প্রণাম!

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (৪)

জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে ভারতীয় দার্শনিকগণ কিরূপ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা এই প্রবন্ধের বিগত তিন সংখ্যায় প্রদর্শন করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, ন্যায়কার এবং সাংখ্যকার উভয়েই ব্রহ্মকে জগতের কর্ত্তা বা নিমিত্ত কারণ বলিয়াছেন; কিন্তু ন্যায়মতে পরমাণু ও সাংখ্যমতে প্রকৃতি এজগতের উপাদান-স্বরূপ স্বীকৃত হইয়াছে। পরমাণুরূপ উপদান লইয়া তাহাদেরই সংযোগবিয়োগবলে ব্রহ্ম এই জগৎ রচনা করিয়াছেন—ইহাই ন্যায়মত। সাংখ্যমতে, সত্ত্ব,রজ ও তমঃ, এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে পরিণত করিয়া, পুরুষ বা ব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। বেদান্ত, ইহাঁদের ন্যায়, এজগতের আর ভিন্নরূপ কোন উপাদান স্বীকার করেন নাই;—মায়া-সহকৃত স্বয়ং ব্রহ্মই এই জগতের উপাদান। বেদান্ত কিরূপে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় যথা শক্তি বিবৃত করিয়াছি। সৃষ্টির কারণ এবং এবং প্রণালী সম্বন্ধে, ভারতীয় সুপ্রসিদ্ধ দর্শনত্রয়ের সিদ্ধান্ত আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আজ আমরা আর কয়েকটী কথা বলিবার জন্য পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছি। পাঠক দেখিয়াছেন,—ন্যায় এবং সাংখ্য উভয়েই যে যথাক্রমে পরমাণু ও প্রকৃতিকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়াছেন,—একথা বেদান্ত স্বীকার করেন না। বেদান্ত বলেন, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত এজগতের অন্য কোন রূপ উপাদান স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। ন্যায়ের পরামাণুবাদ ও সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ, এ উভয় মতই বেদান্ত কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়াছে। এখন আমরা সেই খণ্ডন-প্রণালীর কথাই বলিব। বর্ত্তমান সংখ্যায়, কিরূপে ও কি যুক্তিবলে বেদান্ত দর্শন ন্যায়ের সেই সুদৃঢ়স্থাপিত পরমাণু-তত্ত্বের মূলোচ্ছেদ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পাইব।

আমরা বলিয়াছি, পৃথিবী জল বায়ু ও তেজের অতীব সূক্ষ্মতম এবং অবিভাজ্য চরম অবয়বকে "পরমাণু" বলিয়া ন্যায়দর্শন স্বীকার করিয়াছেন। পরমাণু নিত্য, উঁহাদের বিনাশ নাই। এই চতুর্ব্বিধ সূক্ষ্মতম নিরবয়ব নিত্য পরমাণুই এই বিশাল জগতের মূলকারণ (এই প্রবন্ধের প্রথম সংখ্যা দেখুন)। সৃষ্টিকালে এই পরমাণুতে ক্রিয়া

উৎপন্ন হয়। উৎপাদ্যমান ভূতজাতের অদৃষ্টই সেই ক্রিয়ার কারণ বা প্রবর্ত্তক। এই ক্রিয়া নিবন্ধন একটী পরমাণু অন্য একটী পরমাণুতে সংযুক্ত হইয়া মিলিত হয়। এবং মিলনাদি হইতেই দ্ব্যণুকাদি ক্রমে পরিদৃশ্যমান জল, পৃথিবী, গিরি, সমুদ্রাদি যাবতীয় ভূতজাত সৃষ্ট হয়। পরমাণু-গত রূপাদিও, সৃষ্টজগতে অনুস্যূত বা অভিজাত হইয়া পড়ে। ইহাই ন্যায়মত।

বেদান্ত, ন্যায়-প্রবর্ত্তিত এই পরমাণুবাদের যথাযথ খণ্ডন করিয়া স্বমত প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। বেদান্তের যুক্তি সমূহ প্রধানতঃ নিম্নে বিবৃত হইল।

১। সৃষ্টিকালে, একটী পরমাণু অপর একটী পরমাণুর সহিত মিলিত হয়। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, পরমাণুতে সৃষ্টি কালে 'ক্রিয়া' উৎপন্ন হয়। ক্রিয়া হইলেই তাহার একটী 'কারণ' আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু, বিনা কারণে কার্য্য উৎপাদিত হইতে পারে না। আবার, কার্য্য উৎপাদিত না হইলে একটী পরমাণুও অন্য অণুতে মিলিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতেও পারে না। সুতরাং সৃষ্টির প্রাক্কালে পরমাণুতে যে পরস্পর মিলনরূপ ক্রিয়া উপস্থিত হইল, তাহার অবশ্যই একটী কারণ স্বীকার করিতেই হইবে। এখন, সেই কারণটী কি? কে তখন পরমাণুতে এই ক্রিয়া উৎপাদন করিল? ইহার দুইটী উত্তর হইতে পারে। প্রথম উত্তর এই যে, প্রযত্ন বা অভিঘাতে এইরূপ কোন দৃষ্ট কারণ স্বীকার করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, যদি কোন দৃষ্ট কারণ স্বীকার না করা যায়, তবে অদৃষ্টকেই কারণ বলিতে হইবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, প্রযত্ন বা অভিঘাতাদি দৃষ্ট কোনরূপ কারণেই পরমাণুতে মিলন-ক্রিয়া উৎপাদিত করিতে পারে না। কেননা, "প্রযত্ন" আত্মার একটী গুণবিশেষ। কিন্তু সৃষ্টির প্রাক্কালে যখন শরীর সৃষ্ট হয় নাই, তখন প্রযত্ন থাকাও সম্ভব নহে। শরীর থাকিলে, তবে ত মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইয়া প্রযত্ন হইতে পারে। শরীর না থাকিলে প্রযত্ন আসিবে কোথা হইতে? আবার, বায়ুাদির অভিঘাতে যেরূপ বৃক্ষাদির চলন হয়, সেইরূপ "অভিঘাতকেও" কারণ বলা যায় না। অভিঘাত বেগ-জনিত সংযোগ বিশেষ মাত্র। কিন্তু সৃষ্টির প্রাক্কালে বেগাদিরও ত অভাব ছিল। সুতরাং অভিঘাতই বা আসিবে কোথা হইতে? অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রযত্ন বা অভিঘাতাদি কোনরূপ দৃষ্ট কারণই পরমাণুর সংযোগের কারণ হইতে পারিতেছে না। আবার দেখ, "অদৃষ্ট" ও কারণ হইতে পারে না। কেননা, এ অদৃষ্ট কাহার? কাহার অদৃষ্ট-বলে একটী পরমাণু অন্য পরমাণুতে সংযুক্ত হইয়া জগৎ-সৃষ্ট হইল? এ অদৃষ্ট কি উৎপৎস্যমান আত্মার, অথবা ঐ পরমাণুর? কিন্তু বুঝিয়া দেখ, অদৃষ্ট অচেতন। অদৃষ্ট যাহারই হউক, উহা যখন নিজে অচেতন, তখন অচেতন পদার্থ চৈতন্য দ্বারা অধিষ্ঠিত বা চালিত না হইলে কখনই কোনও ক্রিয়া উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। আবার জনিষ্যমান আত্মার (জীবাত্মা) সহিত অদৃষ্টের তখনও কোন সম্বন্ধ হয় নাই বলিয়া, অদৃষ্ট কারণ হইতে পারে না। আর যদি এরূপ বলা যায় যে, আত্মা সর্ব্বব্যাপী, অতএব সর্ব্বব্যাপী আত্মার সহিত অদৃষ্টের সম্বন্ধ নিয়তই বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, যদি

অদৃষ্টের সহিত আত্মার নিয়ত সম্বন্ধই রহিয়াছে স্বীকার করা যায়, তবে নিয়তই জগৎ-সৃষ্টি হউক্ না কেন? নিত্য-সম্বন্ধ থাকিলে, নিত্যই সৃষ্টি হইবে। সুতরাং পরমাণুবাদ নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ।

২। একটী পরমাণু অন্য একটী পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগৎ সৃষ্ট হয়। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, একটী পরমাণুর যে অন্যটীর সহিত সংযোগ হয়, ইহা কিরূপ "সংযোগ"? ইহা কি সর্ব্বাত্ম-সংযোগ, অথবা প্রাদেশিক-সংযোগ? একটী অণু অন্যটীর সহিত সংযুক্ত হইয়া একেবারে মিলিয়া এক হইয়া যায়, না একটী অণুর একদেশে বা পার্শ্বে অপর একটী অণু আসিয়া সংযুক্ত হয়? যদি সর্ব্বাত্ম-সংযোগ বল, তবে দ্ব্যণুকাদিও পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম এবং অদৃশ্য থাকিয়া যায়। যেহেতু, দুইটী মিলিয়া এক হইয়া গেলে, আর স্থূল বা বড় হইতে পারিল না। সুতরাং দ্ব্যণুকাদি সমস্ত পদার্থই সেই পরমাণুবৎ অস্থূল ও নিরবয়ব হইল। আর যদি প্রাদেশিক সংযোগ বল, তবে পরমাণুকে সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কেন না, বস্তু সাবয়ব (Extented) না হইলে, তাহার একদেশ বা পার্শ্ব থাকা সম্ভব হয় না। অতএব এ কিরূপ সংযোগ, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং সৃষ্টির প্রাক্কালে পরমাণুদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ হয়, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না।

৩। স্বভাব (Tendency) লইয়া ধরিতে গেলেও, পরমাণুবাদ স্থাপন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। পরমাণুর একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা স্বভাব স্বীকার করিতেই হইবে। যদি বলা যায় যে, পরমাণু সর্ব্বদাই প্রবৃত্তি-স্বভাব-বিশিষ্ট, অর্থাৎ কার্য্য-ব্যগ্র বা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুখ, তাহা হইলেও, প্রবৃত্তির নিত্য-বর্ত্তমানতা বিধায় প্রলয় অসম্ভব হইয়া উঠে। আবার যদি পরমাণুকে নিত্য-নিবৃত্তি-স্বভাব বিশিষ্ট বলা যায়, তবে আর সৃষ্টি হইতে পারে না। আবার একাধারে পরস্পর বিপরীত ধর্ম্ম-বিশিষ্ট দুইটী স্বভাবও থাকিতে পারে না। আর যদি পরমাণুর কোনও রূপ স্বভাব থাকা স্বীকার না কর, তবে যখন যেরূপ নিমিত্ত কারণের বশীভূত থাকিবে, পরমাণুও সেইরূপ কার্য্য করিবে, ইহা অবশ্যই বলিতে হয়। কিন্তু কাল ও অদৃষ্টাদি নিমিত্ত কারণের সর্ব্বদা সদ্ভাব হেতু, সর্ব্বদাই সৃষ্টি হইত। আর যদি কোন নিমিত্ত কারণের সদ্ভাব স্বীকার না কর, তবে নিমিত্ত কারণের অভাব-বশতঃ এবং নিজেরও প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরূপ কোনও স্বভাব না থাকা হেতু, কখনই সৃষ্টি হইবে না, ইহাও স্বীকার করিতে হয়।

৪। ন্যায়-মতে, পরমাণু রূপাদি-বিশিষ্ট। ন্যায় বলেন, এই যে রূপ গুণাদিবিশিষ্ট অশেষবিধ সৃষ্ট পদার্থরাশি দেখিতেছ, উহারা সেই চতুর্ব্বিধ রূপাদি-বিশিষ্ট নিত্য পরমাণু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ন্যায়ের এরূপ উক্তিও যুক্তিশূন্য। যদি পরমাণুকে রূপাদিবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পরমাণু স্থূল ও অনিত্য হইয়া পড়ে। কেননা, যাহারই রূপাদি আছে, তাহাই তাহার কারণাপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। যেমন বস্ত্র তন্তু হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু বস্ত্র, তন্তু অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। আবার ঐরূপে, তন্তু ও উহার কারণ স্বরূপ অংশু অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। সুতরাং এই নিয়মানুসারে, ন্যায়দর্শনের রূপাদিবিশিষ্ট

পরমাণুও, উহার স্বকারণাপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ন্যায়-মতে পরমাণুর কোনও কারণান্তর নাই, এবং উহা নিত্য এবং সূক্ষ্ম। সুতরাং ন্যায়-মত তত সমীচীন নহে।

৫। একটী পদার্থ, যদি অপর একটী পদার্থ অপেক্ষা সমধিকগুণ বিশিষ্ট হয়, তবে সেই পদার্থ, অপর পদার্থটী অপেক্ষা নিশ্চয়ই স্থূল হইয়া পড়িবে, ইহাই সার্ব্বভৌম-নিয়ম। কোথাও এ নিয়মের ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখিতে পাওয়া যায় যে, পার্থিব পরমাণু অপেক্ষাকৃত অধিক-গুণ বিশিষ্ট এবং জলাদির তদপেক্ষা এক একটী গুণ কম। যেমন পৃথিবীর গুণ—গন্ধ রস, রূপ ও স্পর্শ; জলের গুণ রূপ, রস ও স্পর্শ; তেজের গুণ—রূপ ও স্পর্শ; এবং বায়ুর গুণ কেবল মাত্র স্পর্শ। অতএব এই চতুর্ব্বিধ ভূতের মূল পরমাণুও এইরূপ ন্যূনাধিক গুণ বিশিষ্ট বলিতে হইবে। কিন্তু পরমাণুর এইরূপ ন্যূনাধিগুণ কল্পনায় দোষ হয়। কেননা, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যদপেক্ষা যাহার গুণ অধিক, সে তদপেক্ষা স্থূল। সুতরাং পরমাণুও স্থূল হইয়া পড়ে। বায়বীয় পরমাণু অপেক্ষা তৈজস পরমাণু এবং তৈজস পরমাণু অপেক্ষা জলীয় পরমাণু অধিক স্থূল হইয়া পড়ে। এই গুরুতর দোষ নিবারণের জন্য যদি, এক একটী পরমাণু এক একটী মাত্র গুণের আধার, এইরূপ স্বীকার করা যায়, তাহাতেও প্রবল দোষ আইসে। কেননা, সেরূপ স্বীকার করিলে, অর্থাৎ এক একটীতে এক একটী মাত্র গুণ থাকিলে, তেজে কখনও স্পর্শের উপলব্ধি হইত না। অথবা জলাদিতেও রূপ স্পর্শাদির উপলব্ধি হইত না। আর যদি বলা যায় যে, চতুর্ব্বিধ পরমাণুর প্রত্যেকটীতেই চারিটী করিয়া গুণ আছে, তাহা হইলে জলেতেও গন্ধের উপলব্ধি হইত। এবং তদ্রূপ তেজে গন্ধ ও রসের এবং বায়ুতে গন্ধরূপ ও রসের উপলব্ধি হইত। কিন্তু সেরূপ হইতে ত কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায়, ন্যায়দর্শনের পরমাণুবাদ যুক্তিবলে খণ্ডনীয় হইয়া পড়ে।

বেদান্ত এইরূপে পরমাণুবাদ খণ্ডিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বারান্তরে আমরা প্রকৃতি পুরুষবাদ সম্বন্ধে বেদান্তের খণ্ডন আলোচনা করিব। ক্রমশঃ।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

আত্ম বা নিগূঢ় বৈষ্ণব দর্শন। (২)

১৮। বস্তুতঃ মহত্তত্ত্বরূপ বীজকোষের ব্যবহারোপযোগী সর্ব্বাঙ্গীন অভিব্যক্তি হইয়া সৃষ্টির গঠন এক প্রকার সুসম্পন্ন না হইলে এই ঈশ্বরাভিমান সমষ্টীভূত ইন্দ্রিয় গ্রাম (universal sensorium) সমন্বিত হইয়া, ব্যবহারোপযোগী পূর্ণস্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। এই জন্য এই অব্যক্তা অপরা শক্তির অব্যক্ত অভ্রান্ত বীজ স্বরূপ মহত্তত্ত্বে ভগবান কপিল দেব তখন ঈশ্বরাভিমানের স্ফূর্ত্তি বা স্ফূর্ত্তিসম্ভাবনা, অনুসন্ধানে না পাইয়া 'ঈশ্বরাসিদ্ধে' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিবেন। কি ব্যষ্টীভূত কি সমষ্টীভূত স্বরূপে

দেহাদি ইন্দ্রিয়গ্রামের ব্যবহারোপযোগী পূর্ণ অভিব্যক্তি ব্যতীত অভিমান বা আত্ম-বুদ্ধির ব্যবহারোপযোগী পূর্ণ ব্যক্তিত্ব কুত্রাপি কখনও সম্ভাবিত নহে। সৃষ্টির ক্রম বিকাশ-প্রাপ্তি কালে যখনই মহত্তত্ত্বাধারে সমষ্টীভূত অভিমান ও আত্মবুদ্ধি বা ঈশ্বর বুদ্ধি সংজাত হইল, তখনই তাহাতে ঈশ্বর সত্তা সংসিদ্ধ হইল। তৎপূর্ব্বে এই মহত্তত্ত্বাধারে ঈশ্বর-সত্তা অভিব্যক্তিতে অবশ্যই অসিদ্ধ ছিল, বলিয়া, সিদ্ধান্ত হইবার স্থল থাকে। পূজ্য-পাদ মহর্ষি ব্যষ্টীভূত অহংতত্ত্ব স্বরূপেতেই অভিমান ও আত্মবুদ্ধিকে প্রথম স্থাপনা করিলেন; কেননা, তিনি ধ্যানযোগে অনু-ভব করিয়াছিলেন যে, এই অভিমানের অব্যক্ত বীজ ক্রমে স্থূলদেহ বা অন্নময় কোষ-গত হইয়া পরিস্ফুট ও প্রবুদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু নিখিল অহংতত্ত্ব স্বরূপের সমষ্টি, যে আধার অবলম্বনে অঙ্কুরিত ও তদেকাত্ম হইয়া অব-স্থিত; সেই ঘনপ্রজ্ঞ বৈজিক মহত্তত্ত্ব-স্বরূপে কোন ঈশ্বরাভিমান বা সমষ্টীভূত আত্মবুদ্ধি-স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা ও সূচনা, ভগবান্ মহর্ষির অনুভূতি গোচর হয় নাই; ইহা অবশ্যই আশ্চর্য্য বলিয়া মানিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে ব্যষ্টিজীব যখন সমষ্টীভূত বৈজিক মহত্তত্ত্ব-স্বরূ-পের কায়ব্যূহের অন্তর্গত, তখন ব্যষ্টীভূত অভিমান ও আত্মবুদ্ধি স্ফুরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মহত্তত্ত্বের সেই বিরাট দেহাভ্যন্তরে যে, এই সমস্ত স্ফূর্ত্তি সঞ্চিত ও সমুদ্ভূত হইয়া এক বিরাট ইন্দ্রিয় গ্রামের অভিব্যক্তি সম্পা-দিত হইতে থাকিবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী ও ও অপরিহার্য্য ব্যাপার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই ঈশ্বরস্বরূপ নিখিল ব্যক্তাব্যক্ত-ইন্দ্রিয় গ্রামে তদেকাত্মভাব সমন্বিত হেতু স্বভাবতঃই নিখিল সংসারের ও যাবতীয় ইন্দ্রিয় গ্রামের গতির নিয়ামক ও বিধায়ক রূপে জীবের শ্রদ্ধাভক্তির স্থল ও উপাস্য হইয়াছেন। সর্ব্বত্রই অভিমান হইতে শক্তির স্ফূর্ত্তি হয়। ঈশ্বরের ঐশী শক্তির স্ফূর্ত্তিও তাঁহার ঐশ্বরিক অভিমান সম্ভূত। এই ক্রমাভিব্যক্ত ক্রিয়াত্মক শক্তিধাম বা তদীয় মূলাধারস্থিত কারণাত্মক পরম অব্যক্ত নিত্যধাম, সর্ব্বকালই যেমন সৃষ্টির প্রয়ো-জনে সর্ব্বত্র উপযুক্ত স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া সেই প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিয়া থাকেন, তেমনি ভক্তের সাময়িক প্রয়োজন, অভাব ও মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ ও পূর্ণ করিবার জন্য— প্রার্থীর সাময়িক সঙ্কল্প ও প্রার্থনা পূর্ণ করি-বার জন্য, প্রয়োজনস্থলে, সাময়িক বিশেষ ব্যবস্থারও বিধান করিয়া থাকেন। এই সাময়িক বিশেষ বিধান সাধারণ ব্যবস্থা দ্বারা পূর্ণ হইবার স্থলাভাব হইলে স্বতঃই অভ্যুত্থিত হইয়া থাকে। এই বিশেষ বিধান ভক্তের প্রয়োজন হইতেই অভিব্যক্ত হইয়া প্রকট লীলারূপ ধারণ করিয়া থাকে।

১৯। এই অব্যক্ত প্রজ্ঞান ঘন প্রশান্তি সমুদ্রে বা মায়াধিষ্ঠিত ঈশ্বরে অনাদি অতী-তের ও বর্ত্তমানের সমস্ত চেতনাচেতন পদার্থ ও ঘটনাপুঞ্জ প্রতিফলিত এবং অনন্ত ভবিষ্যতের অভিব্যক্তব্য যাবতীয় চেতনা-চেতন পদার্থ বৈজিক বা ঘনীভূত ভাবে অবস্থাপিত এবং ভবিতব্যের ঘটনাপুঞ্জ আনু-পূর্ব্বিক ভাবে সুচিত্রিত। তাহার মূলাধারে সমাধি সমুদ্র শায়ী ত্রিগুণাতীত পরম সত্তা সেই মহত্তত্ত্বের অন্তর্ভূত অন্তরাত্মা রূপে বিরা-জিত। ভক্তের ত্রিগুণাত্মক বা ত্রিগুণাতীত সাময়িক প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, কোন উপযুক্ত দেহ সেই অব্যক্ত প্রশান্তি বা সমাধি সমুদ্র-গর্ভ হইতে প্রয়োজনানুরূপ

সাময়িক ব্যক্তিত্ব পরিগ্রহণান্তর পিপাসু ভক্তের দীক্ষা ও লালন পালনাদির কারণ হইয়া সমুদ্ভূত হন। পরে সেই অনুগৃহীত ভক্ত-দেহ অবলম্বনানন্তর ভগবান গুরু-লীলা প্রবাহ প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। এবং সেই সাময়িক অভিব্যক্ত মূর্ত্তি যথা-ক্ষেত্রে, যথাকালে, যথাকার্য্য সমাপনানন্তর স্বকীয় অব্যক্ত সমুদ্র গর্ভে জলবুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া যান, অথবা স্বস্থানে প্রস্থান করেন। পরে পুনরায় কাল-স্রোতের বিচিত্র গতিতে সেই অব্যক্ত বীজ সৃষ্টিলীলা স্রোতে ভাসমান হইয়া যথা সময়ে যথাক্ষেত্রে স্বাভা-বিক ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া,দেশ কাল ও অব-স্থার উপযোগী যথাকার্য্য সম্পাদন করতঃ স্বাভাবিক ক্রমে লীলা সম্বরণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বাভাবিক লীলাদেহ অবলম্বন করিবার বহুকালকল্প পূর্ব্বে এই অব্যক্ত সাগর গর্ভ হইতে জলবুদ্বুদের ন্যায় সাময়িক ব্যক্তিত্বে ভূষিত হইয়া অব্যয় যোগতত্ত্ব বিবস্বান্‌কে উপদেশ করেন। বিবস্বান্ সেই তত্ত্বে স্বীয় পুত্র মনুকে এবং মনু স্বীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুকে দীক্ষিত করেন। পরে নিমি প্রভৃতি রাজর্ষিগণ এই গুরু পরম্পরাগত যোগতত্ত্ব অবগত হন। পরে এই শ্রীকৃষ্ণ যথাসময়ে স্বাভাবিক দেহে অভ্যুত্থিত হইয়া অন্যান্য কার্য্যানুষ্ঠান সঙ্গে সেই তত্ত্ব অর্জ্জুনকে উপদেশ করেন। (ভগবদ্গীতার ৪র্থ অধ্যায়) তলবকার উপনিষদে দৃষ্ট হয়, যে দেবরাজ ইন্দ্রকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন করিবার জন্য ব্রহ্ম-বিদ্যা স্বরূপিনী উমাদেবীর সাময়িক উৎ-পত্তিও এইরূপে সম্পাদিত হয়। পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে, আত্মতত্ত্ব সম্পন্ন এক শবদেহ এইরূপে সাময়িক ব্যক্তিত্ব অঙ্গীকার করতঃ কারণ সমুদ্রাশ্রিত শিবকে আত্মজ্ঞান সম্পন্ন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত পুরাণাদি হইতে প্রদর্শিত হইতে পারে। এইরূপে গুরুলীলা প্রবাহের প্রস্রবণ স্বরূপ ভগবান স্বকীয় বীজপুঞ্জের গর্ভকোষ হইতে অব্যক্ত বীজ বিশেষকে, অথবা কোন পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মকল্প বা সৃষ্টি প্রস্ফুটিত সদেহ বা বিদেহ সাধু বিশেষকে প্রয়োজন স্থলে সাম-য়িক উপযুক্ত ব্যক্তিত্বে ভূষিত করিয়া, আদি-গুরুরূপে সপ্রকাশ হইয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা গুরুলীলার স্রোত প্রবহমান করেন। প্রকৃ-তির অক্ষয় ভাণ্ডার স্বতঃই এইরূপে ভক্তের প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিয়া থাকেন।

২০। আমরা বীজাবস্থার অব্যক্ত অস্ফূর্ত্ত ঘন-প্রজ্ঞ মহত্তত্ত্বকে অভ্রান্ত শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া উপরে অভিহিত করিয়াছি। তাহার হেতু এই যে, সেই সৃষ্টিবীজের বিকাশ সম্ভ-বতঃ তদীয় জ্ঞাতসারে না হইলেও, তাহা অভ্রান্ত পথেই পরিচালিত হইয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। শুদ্ধ ঘন-প্রজ্ঞ মহত্তত্ত্ব কেন? সমস্ত অব্যক্ত বীজই সদেহই হউক, আর বিদেহই হউক,—উপযুক্ত দেশ কাল ও অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত হইলে, অভ্রান্ত পথে পদচারণা করিয়া অঙ্কুরিত, পল্লবিত,পরি-বর্দ্ধিত এবং অবশেষে পূর্ণাবয়ব লাভ করিয়া ফুলে ফলে পরিশোভিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ জাতীয় যাবতীয় সজীব লতা,ঘোরতর অন্ধকার পূর্ণ গুহার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেও, অভিজ্ঞের ন্যায় অভ্রান্ত পথে আলোকাভিমুখে সংক্রান্ত হইতে কদাপি কোন ক্রটী প্রদর্শন করে না। পর্ব্বতোপরিস্থ বৃক্ষরাজির মূল-দেশ ও উপমূল সকল অভিজ্ঞের ন্যায়,অভ্রান্ত পথে শতমুখে বিনা দিগ্‌ভুলে প্রধাবিত হইয়া সেই পর্ব্বত গাত্রের ছিদ্র দেশ সমূহ প্রাপ্ত হয় এবং সেই সমস্ত ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট

হইয়া আপনাদিগকে তন্মধ্যে গভীর প্রোথিত করিয়া, সেই বৃক্ষসমূহকে প্রবল বাত্যাতেও স্থির ও অটল থাকিবার উপায় বিধান করে। ভূগর্ভস্থ বৃক্ষেরও মূল ও উপমূল সকল অভিজ্ঞের ন্যায় সর্ব্বত্র স্বতঃই সন্নিহিত জলাশয়াভিমুখে প্রসারিত হইতে থাকে। সর্ব্বত্রই অব্যক্ত অভিব্যক্ত হইবার জন্য অভ্রান্ত ভাবে যথা পথই অনুসরণ করিয়া যথাগতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। নিশাগ্রস্ত রোগীকারণ-দেহগত প্রসুপ্ত্যাবস্থাতেও বিপদসঙ্কুল দুর্গম পথেও নির্ভীক ও অভ্রান্ত ভাবেই বিচরণ করিয়া থাকে। কেন না, এই সমস্ত অস্ফূর্ত্ত বা সুষুপ্তসংজ্ঞ অভিব্যক্তি নিচয়ের অব্যক্ত মূলাধারে সমাধি-সংজ্ঞ অভ্রান্ত পুরুষ বিদ্যমান।

২১। এই সৃষ্টি কার্য্যের ক্রমবিকাশ কালে সমাধি-সমাহিত পরম সত্তা সৃষ্টির অতীত থাকিয়াও স্বকীয় পরমাত্ম স্বরূপের অপরিহার্য্য সর্ব্বব্যাপিত্ব হেতু সৃষ্টির স্থাবরাস্থাবর সমগ্র ব্যষ্টির অঙ্গে স্বতঃই অনুপ্রবিষ্ট হইলেন এবং অব্যক্ত স্বরাট্ পুরুষ বা স্বরূপাত্মা—অন্তরাত্মারূপে তন্মধ্যে স্বভাবসিদ্ধ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন এবং তৎপ্রতিবিম্বিত জ্যোতির দ্বারা যাবতীয় ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে, যাবতীয় ব্যক্তাব্যক্ত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে চৈতন্যপ্রবণ করিয়া, ইন্দ্রিয় গ্রাম সম্পন্ন ব্যষ্টিকে জীবাত্মা বিশিষ্ট জীবাভিমানী এবং সমগ্র জীবাত্মা পুঞ্জের সমষ্টীভূত স্বরূপকে সর্ব্বগত সর্ব্বময় সর্ব্বেসর্ব্বা ঈশ্বরাভিমানে অভিমানী করিলেন। মূলাধারে এই সমাধি নিহিত পরম বস্তুর পারমাত্মিক সংস্থান ব্যতীত কি ব্যষ্টিতে, কি ব্যষ্টিপুঞ্জের সমষ্টিভূত স্বরূপে জ্ঞান ও অভিমান স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনার স্থল কুত্রাপি কখনও উপস্থিত হইত না। এই ঐশ্বরিকী সৃষ্টি-লীলার ক্রমবিকাশ বিবৃত করা আমার বর্ত্তমান প্রস্তাবের বিষয় নহে। ইন্দ্রিয় গ্রাম সম্পন্ন ব্যষ্টিমাত্রের জীবাভিমান বৃত্তির অন্তরালে ও মূলাধারে ভগবানের পরমাত্ম স্বরূপের, স্বরাট্ পুরুষ বা আত্মারূপে, অব্যক্ত নির্লিপ্ত অথচ ওতঃপ্রোতভাবে অবশ্যম্ভাবী অপরিহার্য্য অবস্থান সংসিদ্ধিই আমার বক্ষ্যমান প্রস্তাবটীর অভিব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট।

২২। এই মায়িক সৃষ্টির আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য ভগবানের সত্ত্ব-রজ তমগুণান্বিত শক্তিলীলার বিস্তার সাধন, কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁহার নিজ প্রয়োজন, অপরূপ মহাভাবময়ী প্রেমলীলার অবতারণ ও উদ্‌যাপন—অভিনব পরমাত্মলীলার নিত্য স্রোত প্রকটন ও প্রবর্ত্তন। এই সৃষ্টির জীব-লীলার অভিব্যক্তির স্রোত যে নিম্নগ পথ অবলম্বন করতঃ প্রবহমান হইয়া আসিয়াছে, সুপ্রকট প্রেমময়ী পরমাত্ম-লীলার স্রোত তাহার বিপরীত পথে—উজান পথে,—অপরূপ অভিনব প্রলয় পথে—সাত্ত্বিক পরিণাম প্রাপ্ত জীবদেহের অভ্যন্তর-গত সুষুম্না নাড়ীর মূলাধার চক্র হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া, চক্রখণ্ডাকারে সুমেরু বেষ্টন পূর্ব্বক সৃষ্টি-স্রোতের সমান্তরাল পথে উর্দ্ধমুখে লীলার উপযোগী অপরিহার্য্য, নিরঞ্জন, অভিব্যক্তি লাভানন্তর এবং মেরুদণ্ড সন্নিবেশিত চক্র পরম্পরা অতিক্রমানন্তর সহস্রার পদ্ম স্থিত "চক্রাতীত চক্রবর্ত্তী" পরমাত্ম-স্বরূপে সমাবৃত্ত হইয়াছে। এই জন্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আছে "একদিকে ব্রহ্মার সৃষ্টি, আর দিকে প্রেম।" সৃষ্টি-লীলার স্রোত সমাধি-সমুদ্র হইতে চিদ্বিমুখ—স্বধাম বিমুখ হইয়া-নিম্নাভিমুখে ঈড়াপিঙ্গলার পথে প্রবাহিত, প্রেমলীলার স্রোত চিদভিমুখে, স্বধামাভিমুখে অভিনব প্রলয় পথে সৃষ্টি প্রবাহের

বিপরীত পথে,—সুষুম্নার পথে ঊর্দ্ধমুখে প্রবাহিত। সৃষ্টিলীলার জৈবিক বিকাশ ব্যক্তিগত পূর্ণতা, শুদ্ধা সাত্ত্বিকী পরিপূর্ত্তি লাভ না করিলে, প্রেম-লীলার সূচনা সম্ভাবিত নহে। ব্যষ্টীভূতা জৈবিকী লীলার এই ব্যক্তিগত পূর্ণতা হইতেই প্রেম-লীলার সূত্রপাত সচরাচর সংঘটিত হইয়া থাকে। সমষ্টীভূতা ঐশ্বরিকী লীলার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। তাহা, তাহার এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকে। সৃষ্টিলীলার জৈবিক বিকাশ যে পথ অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, ঠিক সেই পথে উপাদান কারণ পরম্পরায় ক্রমান্বয়ে বিলীন হইতে হইতে বৈজিক মূলাধারে প্রত্যাবৃত্ত হওয়াই প্রলয়ের পথ—নির্ব্বাণের পথ—স্বকীয় বিদেহ বৈজিক অবস্থায় পুনরাবর্ত্তনের পথ। প্রলয় কালে এই পথ অনুসরণ করিয়া সৃষ্টিলীলার অপ্রকট অবস্থা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সাধকেরা এই পথে সংক্রমণ করিলে তাঁহাদের আত্মনির্ব্বাণ লাভ হইয়া বৈজিক মূলাধার স্বরূপে উপনীত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু সুপরিণত জীববৃক্ষের বিদেহ বীজে, "পুনর্ম্মূষিকোভব" হইতে পরিলে, তাহাতে তাহার কোন বিশেষ লাভ নাই, বরঞ্চ তাহাতে তাহার পুনরঙ্কুরিত ও পুনরাবর্ত্তিত হইবার এবং অবশেষে জীবাকারে পুনঃপরিণত হইবার আশঙ্কা ও সম্ভাবনার উচ্ছেদ হইতেছে না। সাধকেরা এই প্রলয় পথের অনুযাত্রী হইয়া, সমাধি-নিহিত পরমাত্মস্বরূপে বিলীন হইতে সক্ষম হইলেও, তবু তাঁহাদিগকে সেই বিলীন অবস্থায় তন্মধ্যে সূক্ষ্ম বিদেহ বীজরূপে সমাহিত হইয়া থাকিতেই হইবে। তাহাতে তাঁহাদের পুনরাবর্ত্তনের ও 'পুনর্জ্জীবোদ্ভব' হইবার আশঙ্কা ও সম্ভাবনা ঘুচিল কোথায়? লাভের মধ্যে বহু কাল কল্পের পরিশ্রম ও পরিণতি পণ্ড হইল এবং কার্য্য বিষম বাড়িয়া গেল। অনেকেই এই সন্দেহাত্মক নির্ব্বাণের পথ প্রাপ্ত হইবার জন্য যোগাদিযোগে বৃথা সচেষ্ট হইয়া কর্ম্মভোগ বাড়াইয়া থাকেন।

২৩। এই প্রেমলীলার নিজ প্রয়োজনে এই সমাধি-সমুদ্র-শায়ী নিত্যবস্তু স্বভাবতঃই অসংখ্য অনন্ত, ব্যষ্টিপুঞ্জের মধ্যে অব্যক্ত বা সমাধিস্থ স্বরাট্ অধিষ্ঠান লাভ করিলেন; পরে সৃষ্টি-স্রোতে ভাসমান হইয়া, প্রথম অভিব্যক্তির অনুরূপ স্থূলাদি দেহ সংগঠনার্থ, স্বকীয় প্রতিবিম্বিত স্বরূপ অহং অধ্যাসের আশ্রয়ে আসিয়া, সেই সমাধির অবস্থায় প্রপঞ্চ বিষয় রাজ্যের দ্বারস্থ হইলেন। বিষয়ী এই প্রপঞ্চ বিষয়েরই সাহায্যে, সেই অবস্থায় স্থূলাদি দেহ ও মনাদি ইন্দ্রিয়ের গঠনোপযোগী সমস্ত উপকরণ সমগ্রী অভ্রান্তভাবে আহরণ ও আত্মসাৎ করিয়া, দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনোবুদ্ধির উৎপত্তি সম্পাদন করিলেন; পরে অহং অধ্যাসরূপ স্বকীয় প্রতিবিম্বকে যথা নিয়মে জ্ঞান ও অভিমান প্রবণ করিয়া, ইন্দ্রিয়গণকে বহির্ব্বিষয়ের সান্নিধ্যে আনিয়া ব্যবহারিক ভাবে প্রতিবোধিত করিলেন। এইরূপে ব্যষ্টিদেহে প্রতিবিম্বিত অহং অধ্যাসে প্রবোধিত হইয়া জীবাত্মার উৎপত্তি হইল। জীবাত্মার এই জৈবিকী সত্তা প্রতিবিম্বিত (phenomenal) সত্তা মাত্র এই ব্যষ্টীভূতা প্রতিবিম্বিত সত্তার উপরে জীবাভিমান পরিকল্পিত। মূলাধারস্থ পরমাত্ম সত্তার ইন্দ্রিয়গ্রামগত প্রতিবিম্বই ব্যষ্টিজীবের কারণ ও সত্তা। সুতরাং মূলাধারস্থ সমাধি-সমাহিত পরম সত্তাই জীব সত্তার মূল সত্তা—এই প্রতিবিম্বিত কারণের মূল কারণ। এই মূলা-

যার সত্তা সমাধি-গত না থাকিয়া যদি প্রকৃত ভাবে জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ থাকিতেন, তাহা হইলে এই ব্যষ্টীভূত বা তাহাদের সমষ্টীভূত অভিমান, জৈবিক বা ঐশ্বরিক অধ্যাসে ব্যবহারিক ভাবেও প্রবুদ্ধ ও সংশ্রুত হইবার স্থল পাইত না। এই প্রতিবিম্বিত সত্তাদ্বয়ের মূল কারণের সমাধিগত নিরভিমান অবস্থা হেতু, প্রতিবিম্বিত স্বরূপদ্বয়ে কর্তৃত্বাভিমান স্ফূর্ত্তির স্থল সম্ভাবিত হইয়াছে। কর্ত্তা নিরভিমানী, নিরুপাধি ও নিষ্ক্রিয় হইলে অকর্ত্তারা সর্ব্বত্রই ব্যবহারিক ভাবে কর্তৃত্বাভিমানী হইয়া থাকে। এই ব্যবহারিক কর্তৃত্বাভিমান স্ফূর্ত্তি হেতু ভগবানের জৈবিকী ও ঐশ্বরিকী লীলা সুচারুরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সমষ্টীভূত ঐশ্বরিকী, লীলার ন্যায় ব্যষ্টীভূতা জৈবিকী লীলাও প্রতিবিম্বে প্রবুদ্ধ স্বরূপের লীলা এবং ইহা সমষ্টীভূতা ঐশ্বরিকী লীলার অন্তর্ভূত। কিন্তু এই ব্যষ্টীভূতা জৈবিকী লীলাই মহাভাবময়ী পারমাত্মিকী প্রেমলীলার অভিব্যক্তির নিদানভূত—চিদভিমুখী স্বরূপাভিমুখী-স্বধামাভিমুখী যাত্রার আরম্ভস্থল। এই প্রেমলীলা ঈশ্বরের বিরাট্ দেহকে—"ব্রহ্মার সৃষ্টিকে" অস্পৃষ্ট রাখিয়া ঈশ্বর ও সৃষ্টির অন্তর্দ্দেশ দিয়া—অন্তরঙ্গ দিয়া সংগোপনে পরমাত্মাভিমুখে প্রবহমানা হইয়াছে।

২৪। এই পারমাত্মিকী প্রেম-লীলার স্রোত যেরূপ শুদ্ধা সাত্বিকী প্রকৃতি হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া পারমাত্মিকী সত্তাভিমুখে স্তম্ভাকার পথে, উজান স্রোতে প্রবহমান, সেইরূপ প্রতিবিম্বিতা ত্রিগুণময়ী জৈবিকী লীলার স্রোত সর্ব্বাধস্তলবর্ত্তী তামসিক কেন্দ্র হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া, রাজসিকী ও সাত্বিকী লীলার যথানুক্রমে উদ্‌যাপনান্তর ঈশ্বরের প্রতিবিম্বিত ত্রিগুণাত্মক সত্তার অভিমুখে, পূর্ব্বানুরূপ স্তম্ভাকার বা দণ্ডাকার পথে প্রধাবিত। এই লীলার প্রকৃত আরম্ভস্থল সর্ব্বাধস্তলবর্ত্তী জড়রাজ্য। তমোগুণে সমাচ্ছন্ন জড়রাজ্য হইতে এই লীলা-স্রোতের সূত্রপাত হয়। পরে উদ্ভিদ ও পাশব রাজ্য অতিক্রমানন্তর এই পৃথিবীর জীবপ্রধান মনুষ্য রাজ্যে আসিয়া উপনীত হয়। এ লীলা ব্যাপারেও, যে পথে সৃষ্টি-লীলা স্রোত প্রবহমান হইয়া আসিয়াছে, যোগাদি দ্বারা ঠিক সেই পথে সমাবর্ত্তন সম্পন্ন হইলে তাহাতে বিশেষ কোন লাভ নাই। তাহা বিশেষ কোন রূপ সুফলপ্রসূ হইতে পারে না। তদ্বারা কেবল মাত্র সত্বপ্রধান মহত্তত্বের বীজকোষে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হইলেও হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে পুনরাবর্ত্তনের আশঙ্কা তিরোহিত হইতেছে না এবং এত কালের সাধনশ্রম ও পরিণতি পণ্ড হইয়া, কার্য্য বরং সর্ব্বতোভাবে বাড়িতেছে। জৈবিকী তামসিকী লীলা স্বতঃই স্বাভিমুখী—স্বতঃই স্বকেন্দ্র সংক্রমণ-নিরতা অথবা অন্নব্রহ্ম বা ভোগ্যবিষয় মুখী—প্রকৃত ঈশ্বরাভিমুখী নহে। কিন্তু ইহা প্রকৃত ঈশ্বরের প্রতিবিম্বিত সত্তাভিমুখী যাত্রার আরম্ভ স্থল। তামসিকী লীলাতে জীবের সত্ব ও রজোগুণ অভিভূত ও আচ্ছন্ন থাকে, ক্রমে তাহাতে রজোগুণ পরিস্ফুট হইয়া সেই তমোগুণের রূপান্তর ও ভাবান্তর শনৈঃ শনৈঃ সম্পাদন করিতে থাকে। তমোগুণ স্বভাবতঃই বিষয়জনিত ক্ষতি লাভের দ্বারা পরিচালিত এবং বিষয় লোভ বা শাসন ভয় দ্বারা প্রতিনিয়ত সমাকৃষ্ট বা বিপ্রকৃষ্ট। তজ্জন্য তাহার ন্যায়ান্যায় সঙ্গতি দেখিবার চক্ষু নাই, তজ্জন্য অন্তকে কঠিন পীড়াদি প্রদান

ও নিষ্ঠুরভাবে নিহত পর্য্যন্ত করিতেও সঙ্কোচ নাই। মোহ বশতঃ তাহার আপনার প্রকৃত শক্তিসাধ্য অবধারণ করিবারও সামর্থ্য নাই। সেই মোহান্ধতা হেতু সে জড়-পিণ্ডের ন্যায় এমন সকল বিষয়ব্যাপারে গিয়া গড়াইয়া পড়ে, যাহা হইতে প্রাণান্ত ভিন্ন অন্য উপায়ে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই। কোন অভীপ্সিত বা উপভোগ্য বস্তু লাভার্থে বা কামাদি দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করণার্থে, পরভোগ্য সামগ্রী ও পরভোগ্যা স্ত্রী প্রভৃতি আত্মসাৎ করণার্থে, বলপ্রয়োগ, প্রলোভন প্রদর্শন অথবা গোপনে অপহরণাদি কার্য্যে সে কিছুতেই—কোন ক্রমেই পরাঙ্মুখ হয় না। ক্রমে এইরূপ বলপ্রয়োগাদি করিতে করিতে রজোগুণের স্ফূর্ত্তি সম্পাদন ও তৎসঙ্গে শক্তি, বীরত্ব, বিক্রম, বীরাভিমান প্রভৃতি ক্ষত্রভাবের শনৈঃ শনৈঃ সঞ্চার হইতে থাকে এবং আত্যন্তিক নীচ ও মলিন ভাব সকল, ক্রমশঃ সেই তমোগুণের অঙ্গ হইতে অপসারিত হইয়া রাজসিক ভাবপুঞ্জের স্থান সংস্থান করিতে থাকে। এই নূতন স্ফূর্ত্তি তখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ স্বার্থানুগত। পরার্থে, সমাজার্থে, স্বদেশার্থে, স্বপরিবারার্থে, ঐশ্বরিক বা শাস্ত্রবিধির অনুগত হইয়া, যথাকর্ত্তব্য পালনার্থে, তামসিক বা তমঃপ্রধান রাজসিক জীবের কার্য্যকলাপ উদ্দিষ্ট হয় না। সে দিকে কোন লক্ষ্য থাকে না। শাসন-ভয়দ্বারা সংযত না হইলে স্বেচ্ছাচারই এই তামসিক জীবের জীবন-রাজ্যে পূর্ণমাত্রায় ক্রীড়া করিতে থাকে। সে কেবল মাত্র স্বকীয় ক্ষুদ্র বিন্দুর সুখ দুঃখাদিতে জাগ্রত এবং সেই বিন্দুর চারিদিকে ভ্রাম্যমান। সে সেই ক্ষুদ্র বিন্দুতে পারিবারিক বা সামাজিক সমস্ত বিষয় ব্যাপারের লয় ও নির্ব্বাণ কামনা করে। সে অবশ্যই অন্যের সুখ দুঃখাদির প্রতি কাজে কাজেই, ঘোর নিদ্রাতে অভিভূত। তামসিক জনের ঈশ্বর বুদ্ধি স্থূল প্রতিমা বিশেষে অথবা ভূত প্রেত প্রভৃতি উপদেবতাদিতে আবদ্ধ। "প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনা" এই ভূত প্রেত প্রভৃতি হীন জাতীয় উপাস্যগণের পূজারাধনা, ভয়েই বা স্বার্থোদ্দেশেই, সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই উপদেবতাদিও তাহার দুর্দ্দান্ত স্বার্থ-সিদ্ধির উপায় মাত্র রূপেই অর্চ্চিত হইয়া থাকে। এই স্বার্থাভিমুখ-ভাব যাহাদের আদর্শ, তাহারা আসুরিক বল বিক্রম ও সাহস সম্পন্ন পুরুষদিগের স্বতঃই অনুগত হইয়া থাকে। তাহাদের কেহ কেহ স্বর্গলোভে বা নরক ভয়ে গুরু, শাস্ত্র বা ধর্ম্ম বিশেষের অনুগত হইয়া সামাজিক নীতি-পালন ও স্বার্থ-প্রমুখ-ধর্ম্ম যজন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহাদের হিতাহিত জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি নাই; ইহাদের কর্ম্ম সকল অনবধানে অনুষ্ঠিত হয়; সাধুদের সাধুতাতে ইহাদের কিছুমাত্র বিশ্বাস হয় না; তাঁহাদের প্রতি উপহাস বুদ্ধি ভিন্ন অন্য ভাব নাই; তাঁহাদের প্রতি সম্মান বোধ ইহাদের চিত্তমধ্যে কখনও স্থান পায় না। অন্যের সুখ ও অভ্যুদয় দর্শনে ইহারা স্বতঃই শোকাকুলিত হয় এবং অন্যের গুণ গৌরব নিয়ত আবরণ বা অস্বীকার করিয়া ইহারা আত্মমর্য্যাদা বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করে। স্বকীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে ইহারা স্বতঃই আলস্য ভাব প্রদর্শন করে এবং স্বভাবতঃ চার্ব্বাক বা আসুরিক শাস্ত্র-নীতি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের আত্মবুদ্ধি স্থূল দেহগত, এবং ঈশ্বরবুদ্ধি কখনও বা খণ্ডিত স্থূল শরীরগত এবং কখনও বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর উপ-

দেবতা গত। এই সমস্তই তমঃ প্রধান রাজসিক প্রকৃতিতে সময়ে সময়ে প্রকাশ পায়; এই সমস্তই তমোগুণের নিত্য সঙ্গী।

২৫। রাজসিকী লীলাতে কোথায় বা তমোগুণ এবং কোথায় বা সত্ত্বগুণ তৎসঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবে অবস্থিতি করে। এই লীলাতে রজোগুণের প্রভাবে সত্ত্ব ও তমোগুণ অভিভূত ও আচ্ছন্ন থাকে। প্রথম স্ফূর্ত্তিতে সেই প্রভাবে সত্ত্বগুণ অভিভূত থাকে এবং তৎসঙ্গে তমোগুণ সংলিপ্ত ও ও সংশ্রুত হইয়া প্রকাশ পায়; পরে তমোগুণের ক্রমশ হ্রাস হইয়া সেই স্থানে সত্ত্বগুণের সংস্থান সম্পাদিত হয়। এই লীলাতে শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দাতৃত্ব ঈশিত্ব, স্বর্গলাভার্থ-প্রযত্ন প্রভৃতি ক্ষত্রভাব ও ক্ষত্র-নীতি সকল ক্রমে জাগ্রত হইতে থাকে। পরিজন-হিতব্রত, পরহিতব্রত, দেশহিত-ব্রত, সমাজ-সেবাব্রত, রাজসেবানুরাগ, শরণাগতরক্ষানুরাগ, স্ত্রীজাতির পক্ষ সানুরাগে অবলম্বন প্রভৃতি ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া শনৈঃ শনৈঃ যশঃস্পৃহা ও স্বার্থের বিস্তার হইতে থাকে। রজোগুণ উদ্যম ও কর্ম্মাত্মক এবং লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও স্পৃহার উত্তেজক এবং শোক দুঃখই ইহার পরিণামফল এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ইহার কর্ম্ম-প্রবৃত্তির প্রধান প্রবর্ত্তক। রজোগুণ স্বভাবতঃই অসমদর্শী বা ভেদদর্শী, দ্বৈতবাদী, গর্ব্বাত্মক ও রাগাত্মক। ইহা সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থলে শাক্তধর্ম্মী বা শক্তির উপাসক। ইহাদের প্রাণের টান ও সমবেদনা যতটা রাক্ষসরাজ রাবণের প্রতি, ততটা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি নহে—যতটা যক্ষ-রক্ষের প্রতি, ততটা সাত্ত্বিক ভাবাত্মক দেবচরিত্রের প্রতি নহে। ইহাদের সম্বন্ধে এই জন্যে উক্ত হইয়াছে, "যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষ রক্ষাংসি রাজসাঃ। এই শাক্তধর্ম্ম সত্ত্বগুণের সঙ্গে মিলিত হইলে, বিশুদ্ধ ক্ষত্রতেজ, সৎসাহসিকতা, নির্ভীকতা, কর্ত্তব্যপালনার্থে প্রাণোৎসর্গতা প্রভৃতি বীরভাব সকলের এবং তমোগুণের সমভিব্যাহারী হইলে, নিদারুণ সংস্কার-প্রিয়তা, চঞ্চল পরিবর্ত্তনপরতা, দুরন্ত ভঙ্গ-প্রিয়তা প্রভৃতি মারাত্মক পৌরুষ ভাব সকলের স্ফূর্ত্তিদাতা হইয়া থাকে। এই রাজসিক ক্ষত্রভাব এদেশে গুরু-আনুগত্য-যোগে তন্ময়ত্ব ও তদাকারত্ব প্রাপ্তি হেতু সংস্কারদেহে অপরূপ অটল অন্তরঙ্গবিকাশ লাভ করিয়া, এক সময়ে জাগ্রত এবং বহুল কীর্ত্তির আস্পদ হইয়াছিল। এই প্রকৃতির লোকে যেমন এ দেশে, তেমনি অন্যান্যদেশে চিত্তবৃত্তির অনুরূপ আদর্শ বীর প্রকৃতির, বীরমূর্ত্তির স্বভাবসিদ্ধ অনুধ্যানে বা আনুগত্যে তদাকারে আকারিত হইয়া, তদনুরূপ বীরচরিত্রে ও ও ক্ষত্রতেজে ভূষিত হইয়া প্রাণার্পণ পর্য্যন্ত ত্যাগস্বীকারে সক্ষম হইয়া থাকে। রজোগুণ প্রধান তমোগুণে মানুষ মনোমদ পরদ্রব্য বা পরস্ত্রীতে প্রলুব্ধ হয়, সেই লোভ বিষয় প্রাপ্তির ইচ্ছাতেও পরিণত হয়, কিন্তু সেই ইচ্ছা সে কার্য্যে পরিণত করিতে তাদৃশ আগ্রহান্বিত হয় না, তাহার সুযোগ ও তাদৃশ সানুরাগে অন্বেষণ করে না। স্বকীয় কলুষিত-চিত্ত মধ্যে সেই দূষিত ইচ্ছা ও বিষয় সম্ভোগ অবরুদ্ধ থাকে। রজোগুণ প্রধান সত্ত্বগুণে লোকের মনোগ্রাহী পরদ্রব্যে বা পরস্ত্রীতে লোভ চাঞ্চল্য জন্মে, কিন্তু সেই লোভ-চাঞ্চল্য অন্যায় আসক্তি বা দুরন্ত কার্য্যে সচরাচর পরিণত হয় না। চিত্তমধ্যে ধর্ম্মভয়, লোকলজ্জা ও দণ্ডভয় প্রভৃতি প্রতিবন্ধক সমূহ অভ্যুত্থিত হইয়া মানুষের প্রবৃত্তিকে সংযত রাখে।

রজোগুণ প্রতিনিয়ত ফলবাদী(utilitarian); ফল শাস্ত্রবিধি (utilitarianism) অবলম্বন পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, এবং সেই শাস্ত্রীয় নীতির অনুসরণ করে। রজোগুণের আত্মবুদ্ধি সূক্ষ্মদেহে বা প্রাণাদি কোষত্রয়ে বা মনাদি ইন্দ্রিয়গ্রামে এবং ইহার ঈশ্বর বা ব্রহ্ম-বুদ্ধি খণ্ডিত সূক্ষ্মদেহশায়ী হিরণ্যগর্ভে সচরাচর সংস্থাপিত। এইরূপ সূক্ষ্ম দেহেই ইহার নিরাকারবুদ্ধি। এইজন্য রজোগুণ সাধু সজ্জনদিগকে পরমাত্মে অভেদ বুদ্ধির ধারণায় অসমর্থ হইয়া, ভেদবুদ্ধিতে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়-গ্রামসম্পন্ন জ্ঞানে, বিচারদৃষ্টিতে তাঁহাদের দোষগুণের তারতম্যানুসারে তাঁহাদিগকে উচ্চ নীচপদে অভিষিক্ত করিতে থাকে। রাজসিকী প্রকৃতি হিরণ্যগর্ভের রুদ্রতেজে, বীরাভিমানে বা বীরত্ব গৌরবরূপ ক্ষত্র স্বর্গে আত্মলয় বা আত্ম নির্ব্বাণ কামনা করে ও প্রাপ্ত হয়।

২৬। সাত্ত্বিকী লীলাতে শম দম তপ শৌচ ক্ষান্তি ঋজুতা জ্ঞান বিজ্ঞান আস্তিক্য, আনুগত্য, বিনয় ও নম্রতা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও নীতি প্রাদুর্ভূত হয় এবং বৈরাগ্য-নত ঔদাস্য, অদ্বৈতভাব, অভেদ বুদ্ধি, সম-দৃষ্টি প্রভৃতি প্রস্ফুটিত হয়। এই সাত্ত্বিকী প্রকৃতি গুরু আনুগত্যাদি যোগে অন্তরঙ্গ দেহ-বিশিষ্ট হইয়া সংস্কার দেহে পরিস্ফুট হয়! এই সাত্ত্বিক বা ব্রাহ্মণ্য অন্তরঙ্গ, নিষ্কামভাব, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা, বিনয়, নম্রতা, শিষ্টাচার, দয়া ও দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ ও সদ্ভাব সমূহের আধার হইয়া সংস্কার দেহে সাত্ত্বিকী ভাগবতী তনু গঠন করত স্বয়ং অদৃশ্য থাকিয়াও কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া সৌরভ বিস্তার করে। এই সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণকে অভিভূত, স্থানচ্যুত ও আয়ত্ত করিয়া আত্ম-পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। যে পরিমাণে সত্ত্বগুণের কলেবর পুষ্টি সেই পরিমাণে রজস্তমোগুণ ক্ষীণ-দেহ ও হীনপ্রভ হইতে থাকে। শুদ্ধা সাত্ত্বিকী ব্রাহ্মণ্যবুদ্ধিতে সর্ব্বভূতে পরিব্যাপ্ত এক অখণ্ড পরমাত্মতত্ত্ব আত্ম প্রত্যয় সিদ্ধ বিশ্বাসগত হইয়া প্রকাশ পায় এবং সাধু শান্তদিগকে পরমাত্মে অভেদ অনুভূত হইয়া তাঁহাদের গুণ দোষাদির সমালোচনা বা তাঁহাদের পরস্পরের সঙ্গে তুলনা-প্রসূত তারতম্যের ধারণা স্বতঃই পরিবর্জ্জিত হইয়া থাকে। অনাসক্ত নিষ্কাম নিরপেক্ষ ধর্ম্ম ও নীতি, সাধুভক্তি, সাধু-সেবা, সাধুসঙ্গ ও নৈষ্ঠিক আতিথ্য ও জন হিতৈষণা সত্ত্বগুণের স্বতঃই নিত্য অবলম্বন হইয়া থাকে। সাত্ত্বিকী প্রকৃতি, আশক্তি শূন্য ও কর্ম্মফল কামনা বিরহিত হইয়া শুদ্ধ কর্ত্তব্য জ্ঞানে, কর্ম্মে নিত্য প্রবৃত্ত থাকিয়া ও কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য নিষ্ক্রিয় ও নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিতি করে। কামেন্দ্রিয়াদির বশীভূত হইয়া সে প্রকৃতি কদাপি বৈধ পত্নীতেও উপরত হয় না পরন্তু শিষ্টাচার শাস্ত্র বিহিত নির্দেশানুসারে ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে তদুপরত হইয়া থাকে! সাত্ত্বিকী প্রকৃতি ঈশ্বরেতে বা জন সাধারণ্যে আত্মলয় বা আত্ম নির্ব্বাণ প্রার্থনা করে ও প্রাপ্ত হয়।

২৭। এই শুদ্ধ সত্ত্ব ব্রাহ্মণ্য সদ্ভাব সকল শুদ্ধ সত্ত্ব গুরু আনুগত্য যোগে যেমন সত্বর ও সহজে ভাগবতী তনুস্ফূর্ত্তি লাভ করে, তেমন আর কিছুতেই নহে। তদাকারে আকারিত হইয়া তন্ময়ত্ব—ক্ষত্র ব্রাহ্মণ্যাদি অন্তরঙ্গ তনুলাভের পক্ষে গুরু আনুগত্যের ন্যায় পরম উপাদেয় মুষ্টিযোগ আর নাই। প্রত্যেক বীর পুরুষ স্বীয় অন্তরের সিংহাসনে কোন আদর্শ মনোমদ বীর পুরুষের তেজ-পুঞ্জ বীর মূর্ত্তিকে স্বতঃই মহাসমাদরে প্রতিষ্ঠিত

রাখিয়া মানসে পূজারাধনা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক প্রাণ বিসর্জ্জন-ক্ষম ধর্ম্মবীর তদীয় হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে কোন ধর্ম্মার্থে নিহত ত্যাগশীল ধর্ম্মবীরের বীরমূর্ত্তি স্বতঃই অনুক্ষণ প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধ্যান ধারণায় নিরত হইয়া থাকেন। প্রত্যেক সাধু সজ্জনের অন্তরে অন্য কোন এক মনোমদ সাধু সজ্জনের সৌম্য মূর্ত্তি স্বভাবতঃই অনুক্ষণ আরাধিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক সদ্গুরুর অন্তরঙ্গে অন্য কোন মনোমদ সদ্গুরু সাধুর প্রশান্ত আনন্দ ও ভক্তি রঞ্জিত বিগ্রহ স্বভাবে মিশিয়া নিহিত থাকে। বীরকুলতিলক মার্সেল নে বীরেন্দ্র কেশরী নেপোলেঁয়ার বীরমূর্ত্তি স্বতঃই এরূপ অন্তর্নিহিত করিয়া হৃদয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন যে, রাজাজ্ঞায় তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনিবার প্রতিজ্ঞায় যুদ্ধে নির্গত হইয়াও যখনই তাহার দৃষ্টি পথবর্ত্তী হইলেন, অমনি আত্মবিস্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া, অজ্ঞাতসারে সসৈন্যে তাহার পক্ষভুক্ত হইয়া, রাজবিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। (তাঁহার বিচার-কালীন আত্ম বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া দেখ) এই মার্সেল তাঁহার আদর্শ বীর মূর্ত্তির স্বভাব-সিদ্ধ অনুধ্যানে তদাকারে আকারিত হইয়া, তাঁহার সঙ্গে অন্তরঙ্গে অভেদ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মার্সেল নের পক্ষে নেপোলেয়ঁার বিরুদ্ধাচারী হওয়া, আর আত্ম-বিরুদ্ধাচারী হওয়া, তখন একই কথা। বাহিরের রাজাজ্ঞা কি নের অন্তরের আরাধিত বস্তুর বিপক্ষ করিয়া তুলিতে পারে? এই মার্সেল বীর পুরুষ তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্য মূর্ত্তিকে অন্তরে রাখিয়া সহস্র সহস্র বিপদ সাগর গোষ্পদের ন্যায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পঞ্চাশৎ সহস্র রুশীয় সৈন্য দ্বারা পরিবৃত হইয়াও তাঁহাদের দুর্জ্জয় দুর্ভেদ্য ব্যূহ পঞ্চশত ভগ্ন পাইক সহযোগে, তৃণব্যূহের ন্যায় ভেদ করিয়া, নিরাপদে স্বকীয় গম্য-পন্থায় সংক্রান্ত হইয়াছিলেন। নের অন্তরে আদর্শ বীর মূর্ত্তির স্বতঃসিদ্ধ প্রতিষ্ঠা না থাকিলে, এইরূপ দুষ্কর কার্য্য কলাপ তাঁহা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারিত কি? মার্সেল নের উপরি উক্ত আত্ম-বিস্মৃতি-প্রাপ্তি সম্বন্ধীয় ঘটনার কারণ স্থলে, কেহ কেহ নেপোলেয়ঁার অলোকসামান্য বশীকরণ শক্তি উল্লেখ করিতে পারেন। কিন্তু সেই বশীকরণ শক্তি, ইহা বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য, বীর ওয়েলিংটন বা অন্যান্য বিপক্ষ বীরবৃন্দ সম্বন্ধে খাটে নাই। তাহা কি এজন্য নহে যে, সেই অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি কেবল তন্ময়ত্ব-প্রাপ্ত পাত্র সম্বন্ধেই সম্পূর্ণ খাটিয়া থাকে, অন্যত্রে তাহা তাদৃশ বল প্রয়োগ করিতে ও ফলোপদায়ী হইতে পারে না।

২৮। এই রাজসিক ও সাত্বিক ঔৎকর্ষের,—আত্মতত্ত্ব লাভের সাক্ষাৎ কারণ হইবার কোন সম্ভাবনা ও অধিকার নাই। কিন্তু ইহাই জীবের পরমগতি ও চরমাদর্শ বলিয়া সচরাচর গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু তদপেক্ষা যে উচ্চতর বা উৎকৃষ্টতর গতি আছে, ইহা লোকের সচরাচর অনুমানগম্য হয় না।

২৯। স্বরূপগত বিষয়কে ব্যবহারিক ভাবে দূরস্থাপিত করিয়া তৎসঙ্গে সম্যক পরিচয় ব্যতীত বিষয়ী যেমন কোন অবস্থায় কোন প্রকার ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিমান সম্পন্ন হইতে পারে না, তেমনি এই স্বরূপগত বিষয়ের নিত্যব্যবহারিক আনুকূল্য ব্যতীত কোন প্রকারে সদেহ ও ইন্দ্রিয় গ্রাম সম্পন্ন হইতেও থাকিতে পারেনা। এই বিষয় রাজ্য যেরূপে বিষয়ীর আশ্রয়ীভূত ব্যষ্টি বিষয়াদিকে

ইন্দ্রিয় গ্রাম সম্পন্ন করিয়া থাকে, তাহার কথঞ্চিৎ বিবৃতির এখানে প্রয়োজন হইতেছে। বেদান্তে তাহার এইরূপ বিবৃতি দৃষ্টিগোচর হয়।

৩০। বেদান্তমতে অপঞ্চীকৃত বা অবিমিশ্রিত সূক্ষ্ম আকাশ বা শব্দ তন্মাত্রার সত্বাংশ হইতে বিষয়ীর শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি ও পুষ্টি; এতাদৃশ সূক্ষ্ম বায়ু বা স্পর্শ তন্মাত্রার সত্বাংশ হইতে তাহার স্পর্শেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি ও পুষ্টি; এতাদৃশ সূক্ষ্ম তেজঃ পদার্থ বা রূপ-তন্মাত্রার সত্বাংশ হইতে তাহার দর্শনেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি ও পুষ্টি; এইরূপে এতাদৃশ সূক্ষ্ম অপ্ ও ক্ষিতি পদার্থ বা রস ও গন্ধতন্মাত্রার স্ব স্ব সত্বাংশ হইতে তাহার রসনেন্দ্রিয়ের ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের যথাক্রমে উৎপত্তি ও পুষ্টি প্রতিনিয়ত সম্পাদিত হইতে থাকে, পরে তাহার শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ জ্ঞানের যথাযথ কারণ হইয়া প্রকাশ পায়। উপরি উক্ত পঞ্চ তন্মাত্রার রজঃ ভাগ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও বিকাশ সম্পন্ন হইয়াছে। এই জ্ঞানেন্দ্রিয়-পুঞ্জের সত্বাংশ হইতে মনোবুদ্ধি বা অন্তঃকরণের উৎপত্তি।

৩১। ইউরোপের আধুনিক বিজ্ঞানও এইক্ষণে এই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য প্রাচীন ইন্দ্রিয়োৎপত্তির দার্শনিক তত্ব কিয়ৎ পরিমাণে স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানমতে বিষয়ীর শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারে যাহা এখন শব্দ বলিয়া অভিব্যক্ত হইতেছে, তাহা বহুকালকল্প সেই শব্দায়ত্ব কতকগুলি পরমাণুপুঞ্জের উপর সংঘাত করিতে করিতে, এবং তাহার স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারে যাহা এখন শীতোষ্ণাদিরূপে অনুভূত হইতেছে, তাহা সেইরূপ তদায়ত্ব কতকগুলি পরমাণুপুঞ্জের উপর দিয়া প্রবহমান হইতে হইতে, এবং তাহার দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারে যাহা এখন রূপ বা আকৃতি, বিস্তৃতি ও বর্ণ বলিয়া পরিদৃশ্যমান হইতেছে, তাহা সেইরূপ সূর্য্যাদির আলোক-সম্পাত নিবন্ধন সেই রূপায়ত্ব কতকগুলি পরমাণুপুঞ্জের উপর উপরত হইতে হইতে, এবং এইরূপ তাহার রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারে যাহা এখন রসাস্বাদনে ও গন্ধাঘ্রাণে পরিণত হইতেছে, তাহা সেইরূপ সেই রস ও গন্ধায়ত্ব কতকগুলি পরমাণুপুঞ্জের উপর যথাক্রমে সমাহিত হইতে হইতে, তাহাদের মধ্যে যথানুক্রমে আমূল পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ সংসাধন করিয়া, তাহাদিগকে এরূপ এক এক জাতীয় অপূর্ব্ব অব্যক্ত চিৎশক্তি সম্পন্ন অণুকণাপুঞ্জ (molecules) প্রস্তুত করিয়া তুলে, পরিণামে যাহারা বিষয়ীর দেহাভ্যন্তরে যথাযথ স্থানে যথানুক্রমে অধিষ্ঠান লাভ করিয়া, তাহার শব্দ স্পর্শরূপ রস ও গন্ধগ্রাহী ইন্দ্রিয়বর্গের যথা ক্রমে সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে।

৩২। উপরি উক্ত বৈজ্ঞানিক মত যে কেবল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের স্বকোপলকল্পিত মত বা অনুমান মাত্র, তাহা নহে। এইরূপ অবগত হওয়া গিয়াছে যে, মার্কিণ দেশের ম্যাম্থ নামক সুগভীর অন্ধকার-গহ্বরে বা তদ্রূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্যান্য গুহাভ্যন্তরে, যেখানে সূর্য্যালোক বা অন্য প্রকার আলোকের গতি বিধি না থাকাতে আলোকানুভাত দ্রব্যাদির আকৃতি বিস্তৃতি ও বর্ণ কোন পদার্থে প্রতিভাত হইয়া তদন্তর্গত পরমাণুপুঞ্জকে রূপান্তরিত করিতে পারে না এবং তজ্জন্য তথাকার সেই পরমাণুপুঞ্জ দর্শনেন্দ্রিয় সৃজনোপযোগী সত্বগুণাত্মক অণুকণাপুঞ্জ (molecules) সংগঠন করিতে স্বতঃই অসমর্থ হয়, সেই সেই গাঢ়

অন্ধকারাবৃত গহ্বরে বা গুহাভ্যন্তরে মৎস্যাদি জন্তুপুঞ্জ কোন ক্রমেই চক্ষুষ্মান ও দৃষ্টিক্ষম হইয়া উঠিতে পারে না—এমন কি,তাহাদের চক্ষুর গঠন পর্য্যন্তও সম্পন্ন হয় না। তাহারা আজীবন অগঠিত চক্ষু ও অস্ফূর্ত্ত-দৃষ্টি থাকিয়া যায়।

৩৩। উপরি উক্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত এখন অবশ্যই অসম্পূর্ণ। কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রের মনাদি ইন্দ্রিয়োৎপত্তির মত বহুকাল পূর্ব্ব হইতে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন আকারে কালের পরিবর্ত্তনোৎপাদক কটাক্ষ ও ভ্রুকুটির প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিয়া সুস্থির ভাবে দণ্ডায়মান আছে। এ সম্বন্ধে যে কোন সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানানুমোদিত হইয়া ভবিষ্যতে প্রচারিত হউক না কেন, তাহা অবশ্যই বৈদান্তিক সিদ্ধান্তের অনুকূল দিকেই অগ্রবর্ত্তী হইতে থাকিবে, কিন্তু কদাপি তাহাকে অতিক্রম করিয়া উঠিবে, এরূপ বোধ হয় না। উপরি উক্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে ইহা বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য যে, এ বিষয়ে বৈদান্তিক মতের সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতের অপূর্ব্ব মিলন চেষ্টা অজ্ঞাতসারে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে।

৩৪। উপরে যে জ্ঞানোৎপত্তির ও জ্ঞানেন্দ্রিয় স্ফূর্ত্তির নিয়ম প্রদর্শিত হইল, তাহা যেমন জ্ঞানের অনাত্ম-প্রকোষ্ঠে বহির্ব্বিষয় ও প্রতিবিম্বে প্রবুদ্ধ বিষয়ীর সম্বন্ধে খাটিতেছে, তদ্রূপ জ্ঞানের আত্মপ্রকোষ্ঠে আত্মস্থ বিষয় ও বিষয়ীর সম্বন্ধেও খাটিয়া থাকে। এখানেও—এই আত্ম প্রকোষ্ঠেও,এই আত্মস্থ বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর সাক্ষাৎ ব্যবহারিক মিলন ভিন্ন বিষয়ীর যথাকালে তদাকারে—তৎ-অন্তরঙ্গে পরিণত না হইয়া, কোন স্থলেই আত্মতত্ত্ব লাভের—স্বরূপগত আত্মজ্ঞানস্ফূর্ত্তির কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই। এখানেও—এই আত্ম-প্রকোষ্ঠেও, এই জাতীয় বিষয়ও, বিষয়ীর আত্মস্বরূপ বিকাশোপযোগী ভাবদেহ—নিত্য নিরঞ্জন দেহ গঠন করিয়া—তাহাকে তদাকারে আকারিত করিয়া তাহার ভাবময় অন্তরিন্দ্রিয়ের স্ফুরণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। এখানেও—এই অন্তরঙ্গেও, বিষয়ী এই জাতীয় বিষয়ের সৎসঙ্গ ও আনুকূল্য ব্যতীত না ভাবময় নিত্য নিরঞ্জন দেহ সম্পন্ন হইয়া ভাবময় অন্তরিন্দ্রিয় উন্মীলন করিতে পারে, না সেই বিষয়-রত্নের অন্তরঙ্গ বা অন্তরাকার লাভ করিয়া আত্ম-স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিতে পারে।

শ্রীকালীনাথ দত্ত।

শিশির বাবুর গীতি-গ্রন্থ।

(প্রথম আলোচনা)

বাঙ্গালাসাহিত্য অধুনাতন ও পূর্ব্বতন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের শিরায় শিরায়,ইদানীং বিলাতী সাহিত্যের সতেজ শোণিত সিঞ্চিত সঞ্চালিত দেখিতে পাই। বিলাতী রক্তে, বাঙ্গালা ভাষা,এক নূতন রূপ—এক অভিনব অবয়ব ধারণ করিয়াছে সেরূপকে কুরূপ বলি না ;—সে অবয়বে লাবণ্য কান্তি নিশ্চয়ই আছে। নিপুণ শিল্পীর হস্তে,তদ্রূপ রচনা—বিলাতী ভাব-বিভূষিতা, বিলাতি ভঙ্গিমা-সমন্বিতা বাঙ্গালা ভাষা,সর্ব্বথা শ্রী

* কালাচাঁদ-গীতা, শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক প্রণীত, শ্রীমতিলাল ঘোষ কর্তৃক ভূমিকা ও টীকা সহ প্রকাশিত। কলিকাতা, বাগবাজার ২নং আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেন। ১৩০২ সন। মূল্য ৩।০

এবং সৌন্দর্য্য শালিনী হয়; পরন্তু, তাহাতে স্বাভাবিকতারও তাদৃশ অভাব থাকে না। কিন্তু লিপি-অকুশল লেখক, কবি বা ঔপন্যাসিক বা অন্য যে কোনও শ্রেণীর রচয়িতা—তাঁহাদেরই সংখ্যা অবশ্য অনেক অধিক,—বিলাতী ছাঁচে এবং ছন্দে যে বাঙ্গালা ভাষা গঠন করেন, সে ভাষা সর্ব্বত্র বিভীষিকা বিশেষ না হইলেও যে এক বিসদৃশ, বিদ্রুপকর ও অবোধ্য মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হয়,ইহাও নিশ্চয়; এবং সে মূর্ত্তি, নিত্যই, আজ কাল, নয়নগোচর হইয়া থাকে। বিলাতী পরিচ্ছদ পরিধানে অনভ্যস্থ,অনভিজ্ঞ ও অক্ষম বাঙ্গালীর অঙ্গে, অথবা কেবল বিলাতী বহির্ভাব অনুকরণ-উদ্গার-লোলুপ লঘুচেতা ব্যক্তির অঙ্গে, সে পরিচ্ছদ অপ্রয়োজনে অকস্মাৎ উপস্থাপিত হইলে যেমন কোনও শ্রী, শক্তি ও সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক না হইয়া, কেবল মাত্র এক অস্বাভাবিক উপসর্গ ও শঙের সাজে পরিণত হয় এবং শঙটীকে সমূহ উপহাসাস্পদ করে;—বাঙ্গালা ভাষাও তেমনি বাঙ্গালীর ন্যায়,—অনর্থক বিলাতী পরিচ্ছদ-প্রিয় অন্তঃসার-শূন্য বাঙ্গালীর ন্যায় বাঙ্গালা ভাষাও যদি বিলাতী বিলাসবাঞ্ছা বক্ষে করিয়া অনাবশ্যক স্থলে ও অযোগ্যহস্তে, অশোধিত বিলাতী ভাব আত্ম অঙ্গীভূত করিতে যায়—অভঞ্জিত বিলাতী ভঙ্গিমার ভজনা করিতে তৎপর হয়, তাহা হইলে কেবল মাত্র প্রবঞ্চিতা হয়; বিলাতী সাহিত্যের কোন শক্তিশ্রী বা সম্পদের অধিকারিণী না হইয়া কেবল কুরূপা কুৎসিতা ও কুলকলঙ্কিনী হইয়া দাঁড়ায়। এক ভাষার সহিত অপর সাহিত্যের উদ্বাহ, আমি, অসম্ভব ও অস্বাভাবিক বিবেচনা করি না; কিন্তু উপরোক্তরূপ স্থলে, পবিত্র বৈবাহিক বিশুদ্ধির পরিবর্ত্তে,ব্যভিচারবিকার-জনিত কলঙ্ক জারজতার চিহ্নই অঙ্কিত দেখা যায়।

বাঙ্গালা ভাষা বিলাতী সাহিত্য-শোণিতের সংস্পর্শে ও সংমিশ্রণে এক দিকে যেমন জীবনময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী হইতেছে, অপর দিকে তেমনি জারজতা প্রাপ্তও হইতেছে। কিন্তু উভয়ই একরূপ অনিবার্য্য; আলোকের ক্রোড়ে অন্ধকার,উন্নতি ঐশ্বর্য্যের অব্যবহিত পার্শ্বেই অখ্যাতি যেন থাকিতেই হয়! বিলাতীর মিশ্রণে বাঙ্গালায় যেমন এক প্রকৃতির মৌলিকতা উৎপন্ন হইতেছে; পক্ষান্তরে তেমনি ঐ মিশ্রণে, বাঙ্গালার নিজস্ব আত্ম মৌলিকতার মর্ম্মান্তিক ধ্বংসও হইতেছে;—ইহা,উহার অধঃগতির কথা একেবারেই ত্যাগ করিয়া, কেবল মাত্র উন্নতির কথা গ্রহণ করিলেও, অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

উপরোক্ত অভিনব বাঙ্গালার অভ্যুদয়ে পূর্ব্বতন বাঙ্গালা, বাঙ্গালীর নিজস্ব মৌলিক বাঙ্গালা সহজ, সরল, সর্ব্বজন সুবোধ্য খাঁটি বাঙ্গালা, সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে এখন প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। সে বাঙ্গালার মূর্ত্তি কিরূপ, এখানে দেখাইতে চাই না; তাহা আমাদের আলোচ্য গ্রন্থেই দেখা যাইবে। কারণ এই গ্রন্থ বাঙ্গালীর সেই বিলুপ্ত-প্রায় ও বিস্মৃত-প্রায় পুরাতন ও বিনীত বাঙ্গালা ভাষাতেই গ্রন্থিত, কিন্তু এসময়ে, ইহা হয়ত,অনেকেরই নিকট, বিলক্ষণ আশ্চর্য্য বলিয়াই বোধ হইবে! কেননা উচ্চতর সাহিত্যের ও ইংরেজী শিক্ষিতের সাহিত্যের সর্ব্বত্রই এখন অভিনব বিলাতী বাঙ্গালার ব্যবহার ও আধিপত্য; তাহাতে বাঙ্গালীর নিজস্ব মৌলিক বাঙ্গালার প্রায় আর ব্যবহার নাই, প্রচলন নাই; সে বাঙ্গালা কেহ আর স্পর্শ করেন না, স্পর্শ করিতে কেহ হয়ত, সাহসই করেন

না। 'বটতলায়' বিক্রীত পুরাতন পুস্তক ব্যতীত সে বাঙ্গালা এখন আর কোথায়ও বিদ্যমান দেখিনা; এমন কি বটতলাতেও এখন অভিনব বিলাতী ছন্দের বাবু বাঙ্গালা প্রবেশ করিয়াছে এবং প্রবল প্রতাপ বিস্তার করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদিগের পবিত্র পদাঙ্কচিহ্নিত সেই পুরাতন সাহিত্য-স্থানকে শাসন করিতেছে! এরূপ অবস্থায়, এবং এরূপ সময়ে, শিশিরকুমার ঘোষ যে সাহস করিয়া, বিলাতি বার্ণিস-বিহীন ও সংস্কৃত শব্দাড়ম্বর-বিহীন বাঙ্গালীর-গৃহ-জাত সহজ ও স্বাভাবিক বাঙ্গালায় তদীয় এই গীতি-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্য বই কি?

অভিনব অঙ্গের ও আকৃতি অবয়বের বাঙ্গালা রচনা, উহার অবিকৃত ও উপযুক্ত অবস্থায়, নানা গুণশালিনী, তাহাতে সন্দেহ নাই। উহার সবিশেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ এই, যে, উহা সামর্থ্যে সম্পূর্ণ রূপে এখনকার সময়োপোযোগিনী। উহার যদি অন্য কোন গুণও না থাকিত, তাহা হইলেও কেবল এই উপযোগিতার জন্যও অন্ততঃ, উহা উপেক্ষনীয় হইত না। ফলতঃ ইদানীন্তন কালের ভাব জ্ঞাপন ও ভাবোদ্দীপনের সামর্থ্য সংক্ষিপ্ততা এবং ওজস্বিতাদি স্বরূপে বর্ত্তমান কালের অধিকতর কার্য্যোপযোগিনী, প্রধানতঃ এই কারণেই, ঐ রূপ রচনা আবির্ভূত হইয়া তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিয়াছে; অনুসৃত ও অনুকৃত হইতেছে। নতুবা উহার সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের সংমিশ্রণ ও সমন্বয় এবং উহার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সহায়তা ও পুষ্টি সাধন কিছু মাত্র হইতে পারিত কি না সন্দেহ। কারণ, লালিত্য, কোমলতা, লাবণ্য, করুণা ও মাধুর্য্যাদি গুণে ও গৌরবে এখনকার গঠিত অভিনব বাঙ্গালা, পূর্ব্বতন বাঙ্গালার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আত্ম-আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে কখনও পারিত না ও কখনও, বোধ হয়, পারিবে না। তথাচ, লালিত্য ও মাধুর্য্যাদি সুকুমার স্বরূপও যে এখনকার গঠিত অভিনব রচনায় বিদ্যমান থাকে, তাহার কারণ পূর্ব্বতনের সহিত অধুনা তনের অথবা মৌলিকের সহিত মিশ্রিতের গণ-মিলন ও ধাতু সংমিশ্রণ। এই 'গণ-মিলন' ও 'ধাতু-মিশ্রণ' কার্য্য যে সকল লেখক যে পরিমাণে সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন, পারেন ও পারিবেন, তাঁহাদেরই গঠিত নব প্রণালীর রচনা, বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বভাবের সহিত সেই পরিমাণে মিশিতে ও মানাইতে পারিয়াছে, পারে ও পারিবে। নহিলে, যে সকল স্থলে 'গণ-মিল' হয় নাই ও হয় না, সে সকল স্থলে সাহিত্য শরীরে ভাষার কেবল বিকার ব্যভিচার ও বর্ণসঙ্করত্ব মাত্রই ঘটে।

নূতন রীত্যনুসারিনী রচনার প্রধান দোষ, তাহার দুর্ব্বোধ্যতা। শিক্ষিত ভিন্ন অন্যে তাহা বুঝিতে পারে না। কোন কোন সময়ে শিক্ষিতেরও তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। সে দিন কোন ইংরেজী রচনা-নিপুণ সম্পাদক-বন্ধু বলিতেছিলেন "তোমাদের এখনকার এ আধ সংস্কৃত ও আধ বিলাতী "বিভীষিকে" আমার বোঝা ভার। বাঙ্গালা পোড়তে বড় ভালবাসতুম, কিন্তু এখনকার এ বিষম বাঙ্গালার ভয়ে তা গিয়েছে।"

সম্পাদকের সম্মুখে টেবিলের উপর কয়েক খানা বাঙ্গালা পুস্তক পড়িয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে এক খানা পুস্তক যদৃচ্ছা টানিয়া লইয়া কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া সহাস্যে পুনঃ বলিলেন,—"এ সব বই অবশ্য For Kind notice" কিন্তু দেখ, এ পোড়তেই ত প্রথম প্রাণ-অন্ত পরিচ্ছেদ,—এক মহা গলদ্‌ ঘর্ম

পর্ব্বঃ—যথার্থই আমি এ কটমট, কায়দার ভিতর আন্‌তে পারিনে ;—তার পর এ বুঝতে শব্দ-কল্পদ্রুমেও কুলয় কি না, তোমরাই জান।”

উত্তরে আমি কিছু বলিতে উদ্যোগ করিতেছিলাম, কিন্তু বন্ধু আমার আরম্ভের পূর্ব্বেই পুনঃ বলিলেন ;—“ঐ ত গেল এক রকম ; ও গুলোকে কি বোল্‌বে ? দাঁতভাঙ্গা দুরন্ত বাঙ্গালা, না বিদ্যারত্ন পুরুত ঠাকুরের বিলিতি বাঙ্গালা ? কেন না, টিকি, ফোটা, নামাবলী ও নস্যদানি ত আছেই, তাহার উপর ওয়েষ্টকোট, অ্যালবার্ট সিঁতি, গোঁফ, গালপাটা, নেক্‌টাই ও ন্যাপকিনও দেখতে পাই! মাথায় হ্যাট্‌ ও কপালে হাড়িকাট্‌,—এখনকার বাঙ্গালা ভাষার। তাতেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু সেনটেন্স গুলো নামতার মত লম্বা, আর সোয়াএ আড়ায়ের মত শক্ত। দেখ্‌লেই ভয় পাই! কিসের ভয় তা জান ? সে কালের পাঠশালার সেই বেতের ভয়, আর বিছুটির ভয়! আবার, আর এক রকমের বাঙ্গালা বই পেয়ে থাকি, তাও হয় ত এখানেই আছে ; সে গুলো পাঠশালা নয় বটে ; কিন্তু হাটখোলা। হেয়ালী গুলো দেখে হাত পা পেটে যায়, কিন্তু, ঝুমুরওয়ালী গুলকে ঝাঁটা-পেটা না করে থাকা যায় না।”

আমি হাসিয়া বলিলাম ;—“কেন ? তা আর তত মন্দ কি ? এ অবস্থাটাতে ত মোটের উপর বেশ “তউল” ঠিক রাখ্‌ছে।”

সম্পাদক।—“হাঁ তা বটে! কিন্তু যাই বল, এখনকার বাঙ্গালা ভাষা ইংরেজী ইডিয়মের নকল লিখ্‌তে-যেয়ে, ইংরেজী অপেক্ষাও অধিক ইংরেজী হ'য়ে উঠ্‌ছে ; যেমন বাঙ্গালী সাহেব সাজতে যেয়ে, সাহেবদের চৌদ্দও ছাড়িয়ে যেতে চালে। আর এই যে আছোলা সংস্কৃত শব্দ গুলাতে বর্ত্তমান বাঙ্গালার গাল গলা ফোলা আর কুঁচ্‌কি কণ্ঠ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ—পীড়িত, ও গুলা যথার্থই “প্লেগ”—আসল বিউবনিক প্লেগ ; ডাক্তার সিমসনের কল্পিত কলিকাতার মিউনিসিপাল প্লেগ নয়।”

পরিহাস রসিকতায় অতিরঞ্জিত হইলেও, উপরোক্ত মন্তব্যের স্থানে স্থানে অল্পাধিক পরিমাণে সত্য উক্তি আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ? ফলতঃ এখনকার রচনা, গদ্য বা পদ্যই হউক, কিছু দুর্ব্বোধ্য বটে ; অন্ততঃ লোকে ঐ দুর্নাম রটায়। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাঠকের বোধ শক্তির ও শিক্ষার পরিমাণ ও লিখিত বিষয়ের গুরুত্ব ও লঘুতার উপরেও দুর্ব্বোধ্যতা ও সহজ-বোধ্যতা নির্ভর করে। আমার যাহা অবোধ্য, যদি তোমার তাহা বোধ্য হয়, তাহা হইলে রচনাকে অবোধ্য না বলিয়া আমাকেই অবোধ বলা উচিত। তথাচ দুর্ব্বোধ্য ও সহজ বোধ্য বলিয়া বস্তু আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন রচনা এত হালকা, পাতলা, সরল ও তরল যে, তাহা নিমেষ মধ্যে মিছরির শরবৎবৎ বোধ-শক্তির তলদেশে যাইয়া পৌছে। পক্ষান্তরে এমনও রচনা থাকে, না থাকিলে চলে না, যাহা চিন্তা করিয়া চিবাইয়া বুঝিতে হয়। এখনকার গম্ভীর প্রকৃতির রচনার প্রতি এই শ্রেণীর দুর্ব্বোধ্যতা প্রযুক্ত হইতে পারে। এই প্রকৃতির রচনা অশিক্ষিতের একরূপ অবোধ্য এবং শিক্ষিতদিগের অল্পাধিক পরিমাণে দুর্ব্বোধ্য, কেননা চিন্তা করিয়া ও চিবাইয়া তাহা বুঝিতে হয়। কিন্তু এরূপ রচনার সর্ব্বথা প্রয়োজন আছে ; বিশেষতঃ বাঙ্গালা বুঝা যায় বলিয়া যখন বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে

শিক্ষার্থীর সাহিত্য হইতে বেদখল করিয়া দিয়াছেন, তখন বাঙ্গালারও উচিত, কিঞ্চিৎ কঠোরতা অবলম্বন করিয়া দুর্ব্বোধ্য হওয়া। নহিলে সংক্ষুব্ধ সম্ভ্রম সজীব হওয়ার সম্ভাবনা নাই। নেহাত নির্ব্বোধকেও বুঝিতে দেওয়ার ক্ষতি ষোল আনা রকমই হইয়াছে। হইয়াছে এই যে, বাঙ্গালা এখন বেওয়ারেশ বস্তু, অতি অযোগ্য অপদার্থেরাও অপবিত্র হস্তে উহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া অপমান করে। ফলতঃ যাহা চিন্তা সহকারে লিখিত, তাহা আয়ত্ত করিতে কিঞ্চিৎ চিন্তার প্রয়োজন হইয়াই থাকে; তজ্জন্য বিচলিত হইতে পার না। তথাচ রচনা যে প্রকৃতিরই হউক, বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা ও বিবৃতির বৈচিত্র্য ভেদে, গুরু বা লঘু হউক, কঠিন বা কোমল হউক, শুষ্ক বা সুললিত হউক, প্রাঞ্জলতা সকল অবস্থাতেই প্রার্থনীয়। কেবল প্রার্থনীয় নয়, অনিবার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়। যাহা অপ্রাঞ্জল ও অস্পষ্ট, তাহা অল্লাধিক পরিমাণে অবোধ্য। অবোধ্য রচনা নিষ্ফল বৃথা বাক্য যোজনা মাত্র। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ রচনা আছে, প্রচুর পরিমাণে জন্মিতেছে, ইহাই অনুশোচনীয় এবং সমালোচকের কটাক্ষেরও আবশ্যকস্থলে কষাঘাতেরও উপেক্ষনীয় নয়। যাহাদের বুঝিবার কথা, তাহাদের বোধগম্য না হইলে নিশ্চয়ই সে রচনা অবোধগম্য ও সেভাব কষ্ট-কল্পিত বলিতে হয়। তবে অবোধ্য সাহিত্যের বা শ্লোকের একবর্ণও না বুঝিয়া "আহা মরি" বলিয়া মাথা নাড়ে, এমন অন্তঃসারশূন্য লোকেরও অভাব নাই। কিন্তু তাহারা কৃপার পাত্র।

বাঙ্গালা-সাহিত্যে যাহা ছিল না, অথবা নাই, তাহার নূতন সৃষ্টি করিতে অগত্যা এবং ইষ্টের অনুরোধে, সংস্কৃতের এবং বিলাতীর অনুসরণ, অনুকরণ করা হয়, আশ্রয় ও সহায়তা লওয়া হয়; অতএব তাহা কেবল অনিন্দনীয় নয়,—প্রশংসনীয়ও হইতে পারে। তবে, তাহা বাঙ্গালার ধাতুগত গতি প্রকৃতির সহিত সমন্বয় করিয়া লওয়া চাই, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গুরু বিষয়ক, গদ্য সম্বন্ধীয় সন্দর্ভ-সমালোচন, সাহিত্য, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, জটিল ও কঠিন বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণ-প্রবন্ধ প্রভৃতি যাহা কেবল শিক্ষিত সমাজের উদ্দেশে ও শিক্ষিতদিগকেই সম্বোধন করিয়া লেখা হয়, তাহার আকাঙ্ক্ষা ও আবশ্যকতানুরূপ শব্দের জন্য, সংক্ষিপ্ততার জন্য, ও শিল্প-শৃঙ্খলার জন্য, সংস্কৃত শব্দ-সাগর মন্থন, ইংরেজী ইডিয়ামের বা বাক্য-বিন্যাস প্রণালীর সু-মানান অনুকরণ বা অনন্যতন্ত্র আর কোন পথ অবলম্বন করাতে রচনা যে অশিক্ষিত বা ইতর সাধারণের অবোধ্য হয় বা শিক্ষিত সাধারণের শ্রমবোধ্য হয়, তাহাতে উপায় নাই। এ সকল স্থলে, এক মাত্র প্রাঞ্জলতার প্রতি দৃষ্টি থাকিলে, অন্ততঃ এই সংগঠন কালে, আর কোন কথা বলা চলে না। একবার কতক গঠিত হইয়া গেলে পর, তখন সাহিত্যের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে কাটছাট পড়িয়া অসমর্থ সমর্থকে রাখিয়া স্বস্থানচ্যুত হইবে।

কিন্তু বাঙ্গালা কবিতা বা কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে, বোধ হয়, কথা কিছু স্বতন্ত্র। বাঙ্গালা-সাহিত্যের অদ্যকার অনেকানেক উপকরণ নূতন হইলেও, কাব্য কবিতা নূতন নয়। ফলতঃ কেবল কাব্য কবিতাই পূর্ব্বতন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা সাহিত্য ছিল। পূর্ব্বে কেবল কাব্য কবিতাই সুমহৎ সাহিত্য নামে অভিহিত হইত। এবং তাহা বাঙ্গালী মাত্রেই বুঝিত এবং বুঝে, বর্ণজ্ঞের ন্যায় বর্ণহীনেও বুঝে। কিন্তু, এখনকার বাঙ্গালা কবিতা

তাহারা বুঝে না। সে কবিতা বুঝা শিক্ষিতেরও কৃচ্ছ্র সাধ্য, কতক স্থলে আদৌ অসাধ্য। কিন্তু তাহা অন্যান্যাংশে হয় ত উচ্চ এবং উৎকৃষ্ট।

এখনকার নানা রূপিনী কবিতার আদর্শ মূর্ত্তি অঙ্কিত বা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেই কাজটা কিছু সোজা হইত, কিন্তু স্থান হইবে না; সে মূর্ত্তি কি রূপ, এখনকার পদ্য গ্রন্থের পাঠক মাত্রেই জানেন; অতএব তাহাই পর্য্যাপ্ত। ভবিষ্য আলঙ্কারিক সম্প্রদায় এখনকার কবিতার সাধারণ লক্ষণ নির্ণয় কল্পে কি লিখিবেন, বলা যায় না, কিন্তু এখন মোটের উপর দেখিলে, প্রায় ইহাই অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় যে, উহা সংস্কৃত শব্দ-বহুল, বিলাতী বাঙ্গালা ও অবাঙ্গালা ইডিয়ম-প্রভাবিত পংক্তি-মালা। লৌহবৎ কঠিন, বা নবনীতবৎ কোমল, পরমাণুবৎ ক্ষুদ্র,—সূক্ষ্ম বা দেউলবৎ দীর্ঘ,—স্থূল শব্দ;—অত্যন্ত অতিরিক্ত সাধু-ভাষা এবং ইতরাদপি ইতর শব্দ; অমর-কোষ হইতে কৃচ্ছ্র-সংগৃহীত অশ্রুতপূর্ব্ব সংস্কৃত শব্দ এবং কোথাও বা প্রাদেশিক অপ্রচলিত গ্রাম্য শব্দ;—একত্রে, অভেদে, একাধারে সংযোজিত; চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত-ব্যবহৃত নিরবচ্ছিন্ন নির্জ্জলা সংস্কৃত, রন্ধন-শালার বা নাট্য-কক্ষের নারীজন-ব্যবহৃত অপভ্রংশ বাক্যের সহিত একত্রে মিলিত :— যদৃচ্ছ ছন্দে ছন্দ-বর্জ্জিত বা ছন্দ-বিহীন; কোথায়ও অতীব কঠোর, কোথায়ও তাদৃশ কোমল, কোথায়ও উভয়ে সংমিশ্রিত, কোথাও উজ্জ্বল, কোথায়ও অস্পষ্ট, কোথায়ও সুবোধ্য, কোথায়ও দুর্ব্বোধ্য, কোথায়ও বা অতীব শ্রুতিমধুর একান্ত অবোধ্য পদার্থ। আধুনিক উচ্চতর আখ্যান কাব্যের ও গীতি কবিতার ইহা বাহ্যাবয়ব বা শারীরিক গঠন। এবম্বিধ আকার-শালিনী কবিতাকে কেহ বলেন "সান্ধ্যগগনের মুর্ম্মর দহন" কেহ বা হয় ত বলিবেন "ফুৎকারোৎফুল্ল উষবুধাঙ্গে নির্জ্জরানঙ্গ চুম্বন।" কিন্তু এ উক্তি বিদ্রূপ রসিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে; আর কিছুই হইতে পারে না। কোন কোন স্থলে আধুনিক বা এই আকৃতির কবিতা নিন্দা ও ব্যঙ্গের বিষয় হইলেও, সে নিন্দা ও সে ব্যঙ্গ সবিশেষ অর্থযুক্ত ও ন্যায্য নিশ্চয়ই নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। নিন্দার কথা কিছুই নাই, প্রত্যুত প্রশংসার কথা বিস্তর আছে। শব্দ-নির্ব্বাচনের ও শব্দ-সংযোজনার প্রণালী সম্বন্ধে সাধারণতঃ কিঞ্চিৎমাত্রায় এবং সময়ে সময়ে অপেক্ষাকৃত অতিরিক্ত মাত্রায় যথেচ্ছাচার বা উচ্ছৃঙ্খলতা দৃষ্ট হইলেও ইহা স্থির যে, বর্ণের ও শব্দের জন্য শিল্পী, চিত্রকর বা কবি, সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিতে ও সর্ব্বত্র হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে অধিকারী। তাহাতে ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট নাই। ইষ্টানিষ্ট যাহা কিছু, তাহা শব্দের বা বর্ণের বিন্যাস-বৈচিত্র্য-নিপুণতার তারতম্যেই ঘটে, কিন্তু সে বিচার আমি এখানে করিতেছি না; করার প্রয়োজন নাই; এবং এ প্রকার সাধারণ ও বিস্তৃত ক্ষেত্রে সে বিচার সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ ভাবে করাও যায় না। আমি, আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে, কেবল এই বলিতেছি যে, বাঙ্গালী সাধারণের তাহা দুর্ব্বোধ্য এবং অবোধ্য। বাহ্যাবয়বে যেমন, অন্তঃস্বরূপেও সেই রূপ। আধুনিক কবি-কল্পনা ও ভাব, উচ্চতায় বা বৈচিত্র্যে বা কাব্যোপযোগী সত্বায়, কোন ক্রমেই নিকৃষ্ট নহে, অনেক স্থলেই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তথাচ তাহা অল্পাধিক পরিমাণে বাঙ্গালীর ভাব নহে;—বাঙ্গালী-চিত্তের চিরন্তন, চিরাভ্যস্ত

এবং চিরামর বাঙ্গালা সংস্কার নহে। তাহা হইতে উহা দূর,—প্রায়ই বাঙ্গালী হৃদয়ের নিকট হইতে উহা প্রচুর দূর। কাজেই ইংরেজী-যুগের বাঙ্গালা কবিতা বাঙ্গালী সাধারণে বুঝে না।

সাধারণ মানব-স্বভাবই সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বকালিক এবং তাহারই অনুসরণ, উদ্ঘাটন ও বর্ণন, কবি ও কাব্যকে অমর করে ও জাতীয় সাহিত্যকে উন্নত করে, ইহা স্থির। কিন্তু যে জাতির জন্য, যে জাতীয় ভাষায় ও যে জাতিকে সম্বোধন করিয়া কাব্য ও কবিতা লিখিত হয়,—কাব্য কবিতা-বর্ণিত সার্ব্বভৌমিক সাধারণ মানব-স্বভাব, দেব-স্বভাব বা পশু-স্বভাব, সেই জাতির হৃদয়-গত সংস্কারের বা স্বভাবের নিকটবর্ত্তী না হইলে, নিকটবর্ত্তী না করিয়া দিলে, সে জাতির তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না; সুতরাং সে জাতির পক্ষে,—সকল জাতির পক্ষেই তাহা প্রায় নিষ্ফল হয়। কেননা, সবিশেষ ভাবে যে জাতির জন্য তোমার কাব্য কবিতার সৃষ্টি, সেই জাতির সর্ব্ব সধারণের যদি তাহা বোধগম্য না হইল, তবে আর কোন জাতিরই বা হওয়া সম্ভব? সেক্সপীয়র বা অন্য কোন অমর ইংরেজ কবি যে সকল স্থলে সাধারণ ও সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বকালিক মানব-প্রকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন, সে সকল স্থলে সে প্রকৃতি ইংরাজ প্রকৃতির স্বজাতীয় সংস্কারের সহজ-পরিচেয় ও নিকটবর্ত্তী করিয়া অঙ্কিত করেন নাই, কে বলিবে? কিন্তু এপক্ষে আধুনিক বাঙ্গালা, কাব্য ও কবিতা-প্রণেতাগণ (কথাটা অবশ্যই অত্যন্ত বিস্তৃত ও সাধারণ ভাবেই বলিতেছি;—ইহার ব্যতিক্রম স্থলও বিস্তর আছে) বিলক্ষণ উদাসীন। এখনকার বাঙ্গালা কবিতা, বরং এপক্ষে, বিলাতী, মিসরী, মাদ্রাজী, পঞ্জাবী, রাজপুতনা ভূমির বাবু-বঙ্গের বা বিবি-বঙ্গের, বা অন্য কোন থানের, কিন্তু প্রায়ই সাধারণ বাঙ্গালার ও সর্ব্ব সাধারণ বাঙ্গালীর ভাব ও স্বভাব-সুগম্য নহে। আবার হয় ত, কোথাও সে কাব্য-ভাব এত গাঢ়, এত ঘন, এত অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট, এত অস্পষ্ট যে সংস্কৃত "সূত্র" অপেক্ষাও সংযত ও সূক্ষ্ম। সুতরাং অবোধ্য, অকর্ম্মণ্য। সর্ব্ব সাধারণের নিকট ত তাহা পৌঁছেই না। শিক্ষিত সাধারণেরও সাহিত্য-স্বার্থের বিষয়ীভূত হয় না, অথবা অতি অল্পই হয়।

ইদানীং এদেশীয় লোকের (বিদ্যা, বহু বিদ্যালয়, বহু পুস্তক ও বহু পুস্তকালয় সত্ত্বেও) সাহিত্য-প্রীতি প্রবলা নয়। বিশেষতঃ বাঙ্গালা-সাহিত্য প্রীতি অতীব অল্প, কাব্য-সাহিত্য-প্রীতি ততোধিক অল্প। এরূপ অবস্থায় কাব্য-গত রসানুভূতির কিঞ্চিন্মাত্র কাঠিন্যও সে প্রবৃত্তির প্রতিকূল হইয়া ক্রমে সে প্রবৃত্তিটী পর্য্যন্ত একান্ত পরিম্লান ও অকর্ম্মণ্য করিতে পারে। যৎকালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাধিক কাব্য ও কবিতা পুস্তক ছিল না, তৎকালে কিন্তু বাঙ্গালীর কাব্য-প্রীতি, কাব্যামোদ প্রচুর ছিল, এখন অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল, ইহা আমি জানি, অনেকেই জানেন। এ কালে কাব্য-প্রীতি কমিবার নানা কারণ উৎপন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু, সে সকল কারণের মধ্যে উপরোক্ত কাব্য-রসানুভব-কাঠিন্যও একটী কারণ নয়, কে বলিবে? রসাস্বাদ-পথ দুর্গম হইলে বা যে কারণেই হউক, ক্রমাগত রসাস্বাদে বঞ্চিত হইলে, সরস দ্রব্যেও লোকে বীতস্পৃহ হয়—বিরক্ত হয়। কাব্য-রস দুর্জ্ঞেয় হইলে, সাধারণ লোকে কাব্য মাত্রেই বিরক্ত হয় এবং স্বাভাবিক

রস-তৃষ্ণা অন্ত অকিঞ্চিৎকর উপায়ে পরিতৃপ্ত করিতে যাইয়া কোমল প্রবৃত্তি, হীন, মলিন, কলুষিত করে, ইহা তত আশ্চর্য্য নয়; বিশেষতঃ এখনকার বাঙ্গালী-প্রকৃতি প্রায়শঃ যেমন অসার, অসহিষ্ণু ও চঞ্চল, তাহাতে ইহা যার-পর নাই সহজ ও সুবিধাকর। পরন্তু, অন্নাভাব, অপরিমিত শ্রম, অতিরিক্ত অর্থ-লিপ্সা, জড়বাদ, বিলাস-পরায়ণতা, বাঙ্গালীকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে; এ সকল কাব্য-প্রীতি পীড়িত করিবার প্রচুর ও প্রবল কারণ, সন্দেহ নাই; কিন্তু, পক্ষান্তরে কাব্য-প্রীতি পরিরক্ষণক্ষম পদার্থও এখন প্রচুর বিদ্যমান। সৌন্দর্য্যানুভব-শক্তি-উদ্দীপক স্বভাবিক দৃশ্য ও শিল্প দ্রব্য এখন পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ-প্রাপ্য ও সুলভ হইয়াছে; সাধারণ শিক্ষার অধিকতর বিস্তার এবং সর্ব্বোপরি নূতন নূতন উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থের প্রচার হইতেছে;—এ সকলই কাব্য-প্রীতি ও কাব্য-রসাস্বাদস্পৃহা পরিবর্দ্ধনকর পদার্থ। অথচ দেখিতেছি, সে প্রীতি—সে স্পৃহা পরিবর্দ্ধিত হয় নাই, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক কমিয়াছে। এই কারণেই বলিতেছিলাম, এখনকার কাব্যের দুর্জ্ঞেয়তা ও দুর্ব্বোধ্যতাও হয় ত, উহার একটী অন্তরায়। ফলতঃ ইহা সকলেই জানেন যে, কাব্য গ্রন্থের নাম শুনিতেই লোকে এখন শিহরিয়া উঠে, শিক্ষিত বাবুরা পর্য্যন্ত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কুপিত হন; নাচ ও নক্সা, তাস বা তাদৃশ কোন তামাসা তল্লাস করেন; রঙ্গাভিনয়ের অভাবে বরং শতরঞ্চ ক্রীড়ায় বসেন;—বড় জোর একটা থিয়েটারী নাটক বা নোংরা নবেল টানিয়া লন। শেষোক্ত কার্য্যটাই এখন কাব্য-প্রীতির চরম-সীমা; সাহিত্যানুরাগের সুবৃহৎ লক্ষণ!!

কাব্যানুশীলন সম্বন্ধে সাধারণতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালীর অধিকাংশের এখন অবস্থা এই। অশিক্ষিত সাধারণের অবস্থা ইহা অপেক্ষা অধিক হেয় না হইলেও, ইদানীং তাহাদের কাব্য রসাস্বাদ পরিবর্দ্ধনের দ্বার-রুদ্ধ। কারণ এখনকার কাব্য তাহারা বুঝে না। বোধ হয়, এখনকার কাব্য কবিতা তাহাদের জন্য, তাহাদের উদ্দেশে লিখিতও নয়। যাহাদের জন্য তাহা লিখিত, তাহাদের অধিকাংশের মধ্যেও কিন্তু তাহার আদর নাই, অগ্রেই বলিয়াছি। অতএব এখনকার কাব্য-সাহিত্য স্বকার্য্য সাধনে একদিকে আদৌ নিষ্ফল, আর এক দিকে সম্পূর্ণ রূপে সফল নহে। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে।

কিন্তু, অশিক্ষিত ইতর সাধারণের তুলনায় শিক্ষিতের সংখ্যা সর্ব্বত্র এবং সকল সময়েই মুষ্টিমেয়। ইতর সাধারণের মধ্যে কাব্য-জ্যোতি বিকীরণ ও তাহাদের কর্তৃক কাব্য-রসাস্বাদনই প্রকৃত উন্নতি; তাহাই জাতীয় সাহিত্যের সারবান প্রসার এবং জাতীয় জীবনের যথার্থ স্ফূর্ত্তি। জ্ঞান প্রাণ মন এবং অন্তঃকরণ ইতর সাধারণের মধ্যে সঞ্চার করে, কাব্য সাহিত্যই প্রধান কল্পে। অন্ততঃ এদেশে করিয়াছিল; তজ্জন্যই অদ্যাবধি এদেশে সে সমাজের অসীম মহাসাগর অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ সলিলময় রহিয়াছে।

বলা বাহুল্য, কাব্যপ্রীতির এই খর্ব্বতা—কাব্যালোচনা ও কাব্যামোদের এই ঔদাসিন্য, মহানিষ্টপ্রদ এবং ক্রমে ক্রমে পাশবিকতা-প্রসূ। কাব্য-প্রীতিও কাব্যামোদে মুহূর্ত্ত মধ্যে মানুষের অব্যবহিত অভাব, অন্ন-ব্যঞ্জন, টাকা পয়সার উপায় করে না বটে; কিন্তু, যাহা উৎপন্ন করে ও আনিয়া দেয়, তাহা অর্থ ও অন্ন ব্যঞ্জনেরই মত অত্যন্ত

আবশ্যকীয় পদার্থ। অথচ তাহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক উচ্চ ও উপাদেয়। তাহা, আধ্যাত্মিকতা। মানুষের মনুষ্যত্ব উন্নত করিবার ও পশুত্ব প্রশমিত রাখিবার একমাত্র উপায়। কাব্য-সাহিত্য যেরূপ অতি সহজে ও অজ্ঞাতে, জনসমাজে আধ্যাত্মিকতা বিস্তার করে—এতাবৎকাল করিয়াছে, সেরূপ আর কিছুতেই করিতে পারেনা। অপিচ, কাব্য-সাহিত্যের এই স্বরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচনা করি। অতএব জীবজগতে, সলিল সমীরণ সূর্য্যকিরণাদির ন্যায় মনুষ্য-সমাজে কাব্য-সাহিত্য ও কাব্যরসাস্বাদ সহজ, সুপ্রাপ্য, স্বচ্ছন্দ ও সাধারণ হওয়া অভিলষিত। কেবল অভিলষিত নয়, তাহা স্বাভাবিক, এবং তাহা সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি ও সভ্যতার প্রকৃত পরিচায়ক বলিয়াই আমার মনে হয়।

কাব্য-কবিতা তাহার এই স্বভাব-চ্যুত হইয়া শিল্প কাঠিন্য-পূর্ণ হইলে স্বকার্য্যসাধনে, অন্ততঃ তাহার শ্রেষ্ঠতম কার্য্যসাধনে, সমর্থ হয় না। মহা কাব্যোপাধিক অমর কাব্য কবিতার গঠন, কাব্য সাহিত্যের এই সুমহৎ স্বাভাবিক স্বরূপের পরিচয় স্থল। প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতা শিল্পাংশে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্টই হউক, সর্ব্বজন-সুবোধ্য। কিন্তু আমাদের আধুনিক উচ্চতর কাব্য-কবিতা, তাহাদের শতবিধ শিল্প-চাতুরী, ও সৌন্দর্য্য-প্রবণতা সত্ত্বেও, এ পক্ষে অনুপযোগী; সুতরাং বহুকালাবধি বাঙ্গালী সাধারণের মধ্যে কাব্য কবিতার অভিনব জ্যোতি-বিকীর্ণ হয় নাই। বিগত পঞ্চাশ বৎসর কাল মধ্যে বাঙ্গালা কাব্য-কবিতার যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু এই নব যুগের কোন কবিই,—অত্যুৎকৃষ্ট কবিও খাঁটী বাঙ্গালীর হৃদয়ে আঘাত করিতে সমর্থ হন নাই। বস্তুতই ইহা বড় আক্ষেপ। আক্ষেপ কেবল বঙ্গীয় কবির পক্ষে নহে, বঙ্গ সমাজের পক্ষেও বটে যে, এ যুগের কাব্য রসাস্বাদে তাহারা বঞ্চিত। হায়! সুমহৎ সরস ফল এত উচ্চে,—এতদূরে যে, তাহা নিম্নস্থ জনের জীবনে, আদৌ অপ্রাপ্য, অনাস্বাদ্য!!

শিশিরকুমার ঘোষের এই গীতি-গ্রন্থের অন্য কোন পরিচয় দিবার পূর্ব্বে, আমি প্রথমতঃ কেবল এই কথাটী বলিতে চাই, এবং এই কথাটী বলিবার জন্য এতক্ষণ এতাধিক কথা উত্থাপন করিয়া, সাহিত্যের বিশেষতঃ কাব্য সাহিত্যের উপস্থিত অবস্থা বিবৃত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি যে, যে অংশে এখনকার উচ্চ শ্রেণীর উপাদেয় কাব্য গ্রন্থ অসমর্থ ও অনুপযোগী, ইহা নিজে উচ্চ অঙ্গের উপাদেয় ও অতি স্বাস্থ্যকর কাব্য হইয়াও, সে অংশে সম্পূর্ণ রূপে সমর্থ ও উপযোগী; অর্থাৎ ইহা বাঙ্গালী মাত্রেরই বোধগম্য, সহজ ও অনায়াস-বোধগম্য। নিরক্ষর কৃষাণ কৃষাণী ও বাক্য-শ্রবণ-ক্ষম বালক বালিকাও ইহা শুনিয়া বুঝিতে পারে, ইহার সৌন্দর্য্যানুভব ও কিয়ৎপরিমাণে রসাস্বাদ করিতে পারে; অথচ মনুষ্য জীবনের সর্ব্বোচ্চ সমস্যা এই গ্রন্থের বিষয়ীভূত; অতএব অতি বড় বৈজ্ঞানিক ও তত্ত্ববিদ্ দার্শনিক পণ্ডিতেরও ইহা বিবেচনার বিষয়। কিন্তু, এই গ্রন্থের এই গীতির গঠন যদি আমাদের বর্ত্তমান কাব্যযুগের কবিতার গঠন হইত এবং ইহার কল্পনা, কারুকার্য্য ও সমাহিত সত্তার নিচুর বাঙ্গালীর বাঙ্গালা সংস্কার ও স্বভাব হইতে সুদূরে ও অত্যুন্নত উচ্চে সংরক্ষিত করা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শিশির বাবুর,

তাঁহার এই কাব্য গ্রন্থের সহজ-বোধ্যতা সম্বন্ধে কখনই সফল হইতে পারিতেন না। যুগপ্রচলিত সাহিত্য-রীতির উল্লঙ্ঘন করিতে সকলে পারেন না, শিশির বাবুর মত ব্যক্তিই পারেন; কিন্তু সে বিষয়, ভাষার গঠন, ছন্দের মিলন, শিল্পের সৌন্দর্য্য, সৌন্দর্য্যের শৃঙ্খলাদি সম্বন্ধীয় কোনও বিষয় শিশির বাবুর বিবেচনায় ও চিন্তায় আদৌ স্থান পায় নাই; তাহা এই পুস্তক দেখিয়াই বুঝা যায়। এখন কোন্ রীতি প্রচলিত বা অপ্রচলিত, তৎপ্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য না করিয়া, যাহার বিষয় আমরা এত আড়ম্বরের সহিত আলোচনা করিতেছি, সেই ভাষা ও ভাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, যেমন আসিয়াছে, ঠিক তেমনি ভাবে শিশির কুমার আত্ম-হৃদয় উন্মুক্ত ও অভিব্যক্ত করিয়াছেন;—তাহার চিহ্ন এই গীতির অঙ্গে অঙ্গে অঙ্কিত। ফলতঃ ভাষা, ভাব বা শিল্প-চাতুরী এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় নহে, উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় অন্য রূপ, তাহা পরে বলিব। কিন্তু ভাষা, ভাব, শিল্প-সৌন্দর্য্য ও কাব্য রসাদি লক্ষ্য না হইলেও, ভাবে, ভাষায় শিল্প-লাবণ্যে ও রসোচ্ছ্বাসে, কল্পনায় ও চিত্র-কৌশলে, কার্য্যতঃ ইহা অতি উপাদেয় ও অভিনব কাব্য। অগ্রেই বলিয়াছি, বাঙ্গালীর গৃহ-পালিত সরল ও সহজ বাঙ্গালা শিশির বাবুর ভাষা; তাহা অধুনাতন অপেক্ষা বরং পূর্ব্বতন, কিন্তু সঠিক তাহাও নহে; রচনা বিষয়ে তিনি আদৌ অনন্য-তন্ত্র। ভাষা আছে, অথচ তাহার ভাণ নাই, শিশির বাবু সম্পূর্ণরূপে শব্দাড়ম্বর-শূন্য। শিল্প-কৌশলে অবশ্য এরূপ শব্দ-সারল্য হইতে পারে; কিন্তু, এ স্থলে তাহাও নহে, লেখকের লেখার স্বভাবই সেই রূপ, ইহা সূক্ষ্মদর্শী পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। নহিলে, সহজ ও সরল রচনা, কি আর এত অসাধ্য সাধন? কে তাহা না পারে? আমি নিজেই পারি। ইচ্ছা করিলে, শিশির বাবু অপেক্ষা শত গুণ সরল ও সহজ বাঙ্গালা প্রস্তুত করিতে পারি। কিন্তু তাহা আমার স্বভাব নহে, তাহা হইলে আমার শিল্প-কারিগরী আর লিপি-বাহাদুরি! জোর করিয়া, চেষ্টা করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া তাহা লিখিতে হইবে। ভাষা যেরূপ স্বচ্ছন্দ, শিশির বাবুর ভাব-বৈভব, কবিত্ব ও চিত্র-সৌন্দর্য্যও তদ্রূপ স্বাগত। উদ্বেগ নাই, অবতরণিকা নাই, চিন্তা নাই, চমৎকারিত্বের ও লিপি-চাতুর্য্যের চেষ্টা মাত্র নাই; অথচ, সুন্দরের পরে আরও সুন্দর, মধুরের পর আরও মধুর, চিক্কণের পর আরও চিক্কণ, ভাব, চিন্তা, চিত্র ও দৃশ্য, শিশির বাবুর এই কোমল-করুণ-কাব্যে, প্রভাত কুসুমবৎ স্তরে স্তরে প্রস্ফুটিত।

কিন্তু, শিশির বাবু, কবি বলিয়া, কখনও আত্ম পরিচয় দেন নাই। বাঙ্গালা লেখক রূপেও তিনি, অপেক্ষাকৃত, অল্প লোকের নিকট পরিচিত। শিশির বাবু চির রাজনৈতিক, প্রায় আজীবন ইংরেজী লেখক এবং এই উভয় স্বরূপেই অতিশয় প্রখর, ইহাই লোকে জানিত ও জানে এবং আমিও এ বিষয় একবার, এই নব্যভারতে, তদীয় ভক্তি-স্বরূপ সমালোচনা কালে, সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছিলাম। শিশির বাবু সাহিত্য-জীবনের বরং শেষাংশেই সেই গৌরাঙ্গ-গৌরব প্রচারার্থে, পুনঃ বাঙ্গালা লেখনী ধারণ করিয়া বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। বোধ হয়, দুই বৎসর পূর্ব্বে, আমরা তাঁহার "অমিয়-নিমাই-চরিত" প্রথম খণ্ডের আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহার পর ঐ গ্রন্থের আর

তিন বৃহৎখণ্ড ও অত্যুৎকৃষ্টাংশ প্রকাশিত হইয়াছে, এই আলোচ্য গীতি-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে "প্রবোধানন্দ ও গোপালভট্ট" প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহার পূর্ব্বে নরোত্তম-চরিত প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রধান প্রাত্যহিক পত্র পরিচালনার প্রধানত্ব ও দুর্ব্বহ দায়িত্ব যাঁহার স্কন্ধে, ভারতীয় প্রজানীতির নিরতিশয় শঙ্কা উদ্বেগে যাঁহার বক্ষ নিয়ত বিলোড়িত, তাঁহারই লেখনী, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে, এত দ্রুত চালিত, ইহাও এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। সম্প্রতি শুনিলাম, শিশির বাবু, ইউরোপে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারার্থে ইংরেজীতে চৈতন্য-চরিত-গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। ইহা তদীয় বাঙ্গালা গ্রন্থের অনুবাদ বা অনুকৃতি হইবে না; বৈষ্ণব-তত্ত্ব ইউরোপায় স্বভাব-সংস্কারের যাহাতে সহজ বোধগম্য হইতে পারে, তদনুরূপ এক মৌলিক গ্রন্থ হইবে। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে শক্তি-বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। নানাদিক-প্রসারিণী প্রতিভার ইতিবৃত্ত কিন্তু ইউরোপেই অধিক। বৃদ্ধ মিঃ গ্লাডষ্টোনের শক্তি-বৈচিত্র্য-গৌরব অদ্ভুত। পরিশ্রমের ন্যায় তদীয় পাণ্ডিত্যের প্রসারও অদ্ভুত। কিন্তু, উপরোক্ত অবস্থাপন্ন জনৈক কৃষকায়, রুগ্ন বাঙ্গালীর পক্ষে, উপরোক্ত প্রকৃতির অবিচলিত অধ্যবসায় ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দিকে শক্তি-শ্রম-সঞ্চালনের দৃষ্টান্ত বস্তুতঃই বিরল। স্বদেশ-প্রাণ শিশির বাবু বাঙ্গালীর মানসিক শক্তির সবিশেষ গৌরব করিয়া থাকেন, এবং প্রায় প্রতি দিনই স্বদেশীয়দিগের সে শক্তির দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া থাকেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজ শক্তির দৃষ্টান্তটী বড় কম দৃষ্টান্ত নহে। তজ্জন্যই এস্থলে প্রসঙ্গতঃ তাহার উল্লেখ মাত্র করিলাম।

কেহ তত জানেনা, কিন্তু ইংরেজী পত্রের সম্পাদকতা সত্বেও শিশিরবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রের অতি পুরাতন হস্ত। "পত্রিকার" প্রথম যুগের কথা প্রবীণ পাঠক স্মরণ করুন, তৎকালে যুবক শিশির কুমারের সরস সাহিত্য চিত্রগুলি, শ্লেষচ্ছটায় ও রসিকতা-কৌশলে চিরস্মরণীয় ও অতুলনীয়। সুনিয়মিত, সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বিভাসিত ও নির্দ্দোষ হাস্যরসের এক একটী উৎস, সে গুলি শিশির বাবুর "রাজনৈতিক জ্যামিতি" (Political Geometry) বঙ্কিম বাবুর "দম্পতী-দণ্ড-বিধি আইনের" (Matrimonial Penal Code) জ্যেষ্ঠ সহোদর। আক্ষেপ, সেই সরস হীরক খণ্ডগুলি আজও পুস্তকাকারে পুনঃ প্রকাশিত হইয়া নব্যদিগের নয়নাকর্ষণ করে নাই। পরন্তু, আমার অনুমান যদি নেহাত ভ্রান্ত না হয়, তাহা হইলে সেই অদ্বিতীয় সামাজিক নাটক "নয় শ' রোপেয়া" শিশির বাবুর নামের সহিত সংযুক্ত করা যাইতে পারে। সে নাটক বা তাহার অভিনয় যে কেহ দেখিয়াছিলেন, তিনি তাহা আজও ভুলেন নাই, ইহা নিশ্চয়। কারণ যে সব দ্রব্য একবার দেখিলে কখনও ভুলা যায় না, 'নয় শ' রোপেয়া" নাটক তাহারই মধ্যের একটী।

তথাচ, বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিক লেখক ও পাঠক সম্প্রদায়ের নিকট বাঙ্গালা-রচয়িতা রূপে শিশির বাবু সবিশেষ পরিচিত বলিয়া আমার বোধ হয় না। কারণ, সে দিকে তাকাইয়া দেখিবার ও তল্লাস লইবার তাঁহার তত অবসর হয় নাই। পরন্তু, মধ্যে কতক কাল তাঁহার বাঙ্গালা রচনা বড় কিছু প্রকাশিতও হয় নাই; সুতরাং বর্ত্তমান নব্য সম্প্রদায় তাঁহাকে জানিতে পারেন।

পুনশ্চ, গত কয়েক বৎসর হইতে যে তাঁহার পুস্তকের পর পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, তাহাও বোধ হয়, এখনকার অনেক সাহিত্য-সেবীর নয়নাকর্ষণ করিতেছে না। তাহার কারণ এই যে, সেই সকল পুস্তকের সাহিত্য-গুণ-গৌরব সত্ত্বেও তাহারা প্রধানতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক। এখন শিক্ষিতদের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মের ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের নেহাত দুঃসময় না হইলেও, তাঁহারা সাধারণতঃ ঐ ধর্ম্মদ্বয়ের বা যে কোন বিষয়েরই হউক, হুজুগ ও কলহ-প্রফুল্ল দলাদলি ভিন্ন আসল ও সার তত্ত্বে বড় বেশী মনোযোগ প্রদান করেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। পক্ষান্তরে অনেক সাহিত্যানুরাগী নব্য পাঠক ও লেখক, যে কোনও ধর্ম্মই হউক,—ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক স্পর্শই করেন না। তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা-বা অনুমান এই যে, ধর্ম্ম কথা যাহার সহিত সংযুক্ত, তাহা উৎকৃষ্ট ও উৎসাহ-আমোদ-প্রদ সাহিত্য নয়, হইতেই পারে না। তবে ধর্ম্ম? সে বিষয়, যদি একান্তই আবশ্যক হয়, পরে পশ্চাতে দেখা যাইবে, আপাততঃ তাহার কোন পার্থিব প্রয়োজনাভাব। তবে, বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্মালোচনা যে কিয়ৎ পরিমাণে এই শ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহার দুই কারণ। প্রথমতঃ সে আলোচনা, আরম্ভে, সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ অনেকে হয় ত মনে করিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মালোচনাতেও যদি বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস-রসের কিছু ভগ্নাংশ পাওয়া যায়। এই প্রলোভনে, এবং তাৎকালিক ধর্ম্ম-কলহান্দোলনে প্রথমতঃ তাহার পাঠক জুটিয়াছিল, কিন্তু পরে বড় জুটে নাই।

এরূপ অবস্থায়, শিশির বাবুর উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় রচনাবলী যে বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে ও শিক্ষিত সমাজে সাদরে, সোৎসাহে গৃহীত, পঠিত ও আলোচিত হইতেছে না, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। তদ্ভিন্ন, আমি ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, যে কারণে বা কারণ পরম্পরার সমবায়ে হউক, সাহিত্য-সংসারের এটী পরম ঔদাসিন্যের ও উপেক্ষার সময়। ইহার মাহাত্ম্যে বরং অপকৃষ্টেরই আদর হয়, কিন্তু, উৎকৃষ্টের সহিত কেহ আলাপও করে না। উৎকৃষ্টের প্রতি ঔদাসিন্য ও উপেক্ষাই এখন প্রচলিত। পক্ষান্তরে, শিশির বাবুর সাহিত্য অধুনাতন ইংরেজী প্রণালীর নহে, তাহা অনন্য-তন্ত্র, বরং পূর্ব্বতন। ইহাও এক অন্তরায়। "পূর্ব্বতন প্রণালী" শুনিতেই সাত পুরুষ ইংরেজী-অনভিজ্ঞও এখন শিহরিয়া উঠে; কোণের কুলবধূ পর্য্যন্ত ইংরেজী ফ্যাসনের পক্ষপাতিনী; টিকিধারী ভট্টাচার্য্য ঠাকুর পর্য্যন্ত "পূর্ব্বতন প্রথায়" টিকিটী রাখিতে নারাজ; ইংরেজী ফ্যাসনে, তাহার কাটছাটি চান! ইহা এক প্রহেলিকা। কিন্তু 'পূর্ব্বতন' পদার্থটী কি, তাহা কেহ বড় দেখে না, বুঝে না। অগ্রেই আতঙ্কে মরে!

কিন্তু, যাহা অধুনাতন, তাহা এত অধিক পরিমাণে এখন প্রচলিত এবং পথে ঘাটে ছড়াছড়ি যে, তাহা আর অভিনব নয়। যদি অভিনবেই তোমার এত অভিলাষ হয়, বরং যাহা পূর্ব্বতন, তাহাই এখন অভিনব, কারণ, তাহা আর এখন কোথায়ও দেখি না। অতএব, আর কিছুমাত্র গুণগৌরব বিবেচনাধীনে গ্রহণ না করিলেও, কেবল অনন্য-তান্ত্রিকতা বা পূর্ব্বতনতা-জনিত অভিনবত্বের জন্য শিশির বাবুর রচনা আমাদের দেখিতে হয়। শিশির বাবু আধুনিক যুগোৎপন্ন বাঙ্গালার শ্রদ্ধাবান বা বীতশ্রদ্ধ, ঠিক জানি

না ; তবে তিনি এখনকার বাঙ্গালা বড় বেশী পড়েন নাই,—এমন কি, বঙ্কিমবাবুরও কোনও পুস্তক তিনি পড়েন নাই ; ইহা শুনিয়াছি। এমন অবস্থায়, এরূপ একটী অধুনাতন রীতি অমিশ্রিত, খাঁটী ও বিশিষ্ট বাঙ্গালী কিরূপ বাঙ্গালা লিখেন, শিশির বাবুর বাঙ্গালা-সাহিত্যের অন্য সব কথা বাদে, ইহাও দেখিবার বিষয় বটে। শিশির বাবু বাঙ্গালীর গৃহজাত বাঙ্গালা ব্যবহার করেন, অথচ শিশির বাবু বিশিষ্ট ইংরেজী-নবিশ বাঙ্গালী। ইহাও একটু রহস্য। যৎকালে ইংরেজী ও ইউরোপীয় ভাষা মাত্র অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীর বাঙ্গালাতেও বিলাতী ভঙ্গিমা, সেই মুহূর্ত্তেই একজন আজীবন ইংরেজী লেখকের বাঙ্গালা বিলাতি ভাঁজ বিরহিত খাঁটী বাঙ্গালা, ইহা কিঞ্চিৎ চিন্তার বিষয় নয় কি ? শিশির বাবুর বাঙ্গালা ত ইংরেজী ভাবাপন্ন নহে, বরং তাঁহার ইংরেজী, আমার বোধ হয়, ঈষৎ বাঙ্গালা ভাবাপন্ন। রাজাকে দেশের ও দশের অবস্থা বুঝাইতে হয় বলিয়াই, শিশির বাবু ইংরেজীতে অগত্যা লিখেন। নহিলে, বোধ হয়, তাহা স্পর্শও করিতেন না ; এমনি বদ্ধ-মূল বাঙ্গালী তিনি। অথচ উদারতায়, অত্যুচ্চ উদার মতের পরিপন্থীও তাঁহার নিকট পরাস্ত, তাহা তল্লিখিত সাহিত্যেই দেখিতেছি। কিন্তু, নেহাত বাঙ্গালী হওয়া হয় ত, এখন নিন্দনীয় হইবে ; তথাচ যাহা সত্য, তাহা গোপনের প্রয়োজন কি ? কারণ শিশির কুমার ঘোষ প্রকৃত প্রস্তাবে কি প্রকৃতির পুরুষ এবং তাঁহার প্রতিভা কি প্রকৃতির, তাহাই দেখা আমাদের আবশ্যক। তাঁহার নিন্দা বা প্রশংসার সহিত আমাদের সম্বন্ধ নাই।

আমি, এই প্রবন্ধ, কেবল মাত্র আনুষঙ্গিক কথায় সমাপ্ত করিলাম। অতঃপর পরপ্রবন্ধে যাহা বলিব, তাহা কেবল এই আলোচ্য কাব্য গ্রন্থ সম্বন্ধেই বলিব। শিশির বাবুর এই গীতি-গ্রন্থ, স্বকীয় সরল স্বভাবে আদৌ কোন বিশ্লেষণ ব্যাখ্যার আকাঙ্ক্ষা করে না। তাহার সৌন্দর্য্য এত সুস্পষ্ট-দৃষ্ট যে দেখাইয়া দিতে হয় না। তথাচ উপরোক্ত নানা কারণে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। বিশেষতঃ এরূপ একটী উচ্চ কাব্য গ্রন্থে আলোচনা না হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনার সবিশেষ কলঙ্কও বটে।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

কবি বলরাম দাস।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ১১শ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে—

"বলরাম দাস কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ নামে হয় অত্যন্ত উন্মাদী॥"

শ্রীবলরাম দাস নিত্যানন্দের ভক্ত ও তৎপরিকর ছিলেন ; বৈষ্ণব-বন্দনা-গ্রন্থে লিখিত আছে—

"সঙ্গীত-কারক বন্দো বলরাম দাস।
নিত্যানন্দ চন্দ্রে যার অত্যন্ত বিশ্বাস॥"

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত এই বলরাম এক ব্যক্তি, উভয়ই নিত্যানন্দ-ভক্ত। বৈষ্ণব-বন্দনায় তিন প্রভুর (মহাপ্রভুর, নিত্যানন্দ, এবং অদ্বৈত) ভক্তগণের নাম পাওয়া যায়। বলরাম দাসের নামের পরেই নিত্যানন্দ শিষ্য মধ্যে মহেশ পণ্ডিত (জগদীশের ভ্রাতা), চৈতন্য-ভাগবত-কর্ত্তা বৃন্দাবন দাস, ও কৃষ্ণদাস প্রভৃতির নাম লিখিত হইয়াছে। বৈষ্ণব

বন্দনার "সঙ্গীত-কারক" বলিয়া বলরামের উল্লেখ আছে; অতএব ইনিই যে স্বনাম-প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বলরাম দাস, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব পদকর্ত্তা বলরাম দাস নিত্যানন্দের "গণ।" বলরামও স্বীয় পদে আপন প্রভুর রূপ গুণ প্রকৃষ্ট রূপেই বর্ণন করিয়াছেন, দুই একটি পদ এখানে দিলে বোধ হয় অপ্রীতিকর হইবে না। বলরামের পদ—

"অনুক্ষণ অরুণ নয়ান ঘন ঘুরত,
চরকত লোর বিথার।
কিয়ে ঘন অরুণ, বরুণালয়ে সঞ্চরু,
অমিয়া বরিখে অনিবার॥
নাচতরে নিতাইবর চাঁদ।
সিঞ্চই প্রেম, সুধারস জগজনে,
অদ্ভুত নটন সুছাঁদ॥
পদতল তাল, খলিত মণিমঞ্জির,
চলতহি টলমল গঙ্গ।
মেরু শিখরে কিরে, তনু অনুপামরে,
ঝল মল ভাব তরঙ্গ॥
সতত রোয়তই, গতি অতি মন্থর,
হরি বলি মুরছি বিভোর।
খেনে খেনে গৌর, গৌর বলি ধাবই,
আনন্দ গরজত মোর॥
পামর পঙ্গু, অধম জড় আতুর,
দীন অবধি নাহি নাম।
অবিরত দুর্ল্লভ, প্রেম রতন ধন,
যাচি জগতে করু দান॥
অতি চলনোগ্র, প্রেমধন বিতরণে,
নিখিল তাপ দুরে গেল।
দীন হীন সবহু, মনমথ পূরল,
অবলা উনমত ভেল॥
ঐ ছন করুণ, নয়ান অবলোকনে,
কাহু না রহু দুরদিন।
বলরাম দাস, কাহে ভেল বঞ্চিত,
দারুণ হৃদয় কঠিন॥

আর একটি পদ এখানে দিতেছি, বলরাম নিত্যানন্দকে কি ভাবে দর্শন করিতেন, এই পদে তাহা বলিয়াছেন। কেবল বলরাম নহেন, সমস্ত বৈষ্ণব সমাজই তাঁহাকে ঐ ভাবে দেখিয়া থাকেন। বলরামের দ্বিতীয় পদঃ—

"গজেন্দ্র গমনে যায়, সকরুণ দিঠে চায়,
পদভরে মহী টলমল।
মত্ত সিংহ গতি জিনি, কম্পমান মেদিনী,
পাষণ্ডীগণ শুনিয়া বিকল॥
আয়ত অবধূত করুণার সিন্ধু।
প্রেমে গর গর মন, করে হরি সঙ্কীর্ত্তন,
পতিত পাবন দীনবন্ধু।
হুঙ্কার করিয়া চলে, অচল সচল নড়ে,
প্রেমে ভাসে অমর সমাজে।
সহচরগণ সঙ্গে, বিবিধ খেলন রঙ্গে,
অলক্ষিতে করে সব কাজে॥
শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ, অবতরি নারায়ণ,
যার অংশ কলায় গমন।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা, জগতের হিতকর্ত্তা
সেই রাম রোহিনী নন্দন॥
যার লীলা লাবণ্য ধাম, আগমে নিগমে গান
যার রূপ মদনমোহন।
এবে অকিঞ্চন বেশে, ফিরে পহু দেশে দেশে,
উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন॥
ব্রজের বৈদগ্ধ সার, যত যত লীলা আর,
পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম দাসে কয়, মনোরথ সিদ্ধি হয়,
ভজ ভজ শ্রীপাদ চরণ॥"

নিত্যানন্দের গণ ব্যতীত, অপরের লিখিত এরূপ পদ অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পদকল্পতরুর ২২৫১ সংখ্যক পদটিও এখানে উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু এ সকল পদ অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। বলরাম নিত্যানন্দের "গণ"—নিত্যানন্দ পরিবার, তাঁহার নিজের কথাতেই তাহা প্রমাণিত হইবে। পূর্ব্বোদ্ধৃত পদাদি একথারই পোষক মাত্র, বলরামের রচনার পারিপাট্য বা তাহার কবিত্ব প্রদর্শনের জন্য উহা উদ্ধৃত হয় নাই, পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা স্মরণ রাখিবেন। বলরামের কবিত্বের পরিচয় দিতে এখানে প্রয়াস পাইব না, কেন না, বঙ্গীয় পাঠক এই প্রাচীন কবির কবিতার সহিত বিলক্ষণ পরিচিত।

প্রেম-বিলাস একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। ১৫২৯ শকে কর্ণানন্দ রচিত হয়, কর্ণানন্দে প্রেম বিলাসের উল্লেখ আছে। প্রেম-বিলাস প্রায় তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হয়। প্রেম-বিলাসের রচয়িতার নাম বলরাম দাস। গ্রন্থ শেষে নিম্ন লিখিত রূপে তিনি আত্ম পরিচয় দিয়াছেন :—

"মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস।
অম্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস॥
আমি এক পুত্র মোরে রাখিয়া বালক।
পিতা মাতা দোঁহে চলি গেলা পরলোক॥

অনাথ হইয়া আমি ভাবি অনিবার।
রাত্রিতে স্বপন এক দেখিল চমৎকার॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী কহে কোন চিন্তা নাই।
খড়দহে গিয়া মন্ত্র লহ মোর ঠাঁই॥
স্বপ্ন দেখি খড়দহে কৈনু আগমন।
ঈশ্বরী করিলা মোরে কৃপার ভাজন॥
বলরাম দাস নাম পূর্ব্বে মোর ছিলা।
এবে নিত্যানন্দ দাস শ্রীমুখে রাখিলা॥
নিজ পরিচয় আমি করিনু প্রচার।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব পদে করি নমস্কার॥"
(প্রেমবিলাস)।

ইহাতে জানা যাইতেছে যে, বলরামের মাতার নাম সৌদামিনী এবং পিতার নাম আত্মারাম দাস। বলরাম জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, এবং বাড়ী শ্রীখণ্ডে ছিল। বলরামের গুরুদত্ত নাম নিত্যানন্দ দাস, ইহাও জানা যাইতেছে। এক্ষণে সাধারণত "ভেকধারী" বৈরাগীগণ গুরুদত্ত নামেই পরিচয় দেন, তদ্ভিন্ন বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থের গুরুদত্ত নাম কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখা যায় যে, পূর্ব্বে বৈষ্ণব সাধারণের প্রায়ই দুইটি নাম থাকিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইজনের কথা বলিতেছি। ১—রাজা বীরহাম্বির বনবিষ্ণুপুরের অধিপতি ছিলেন, তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার নূতন একটি নাম হয়, সে নাম চৈতন্য দাস। বীরহাম্বিরের গুরু শ্রীনিবাসাচার্য্য।

"বিষ্ণুপুরে আচার্য্য রহিলা দুইমাস।
* * *
দেখিয়া রাজার ভক্তি গ্রন্থে অধিকার।
* * *
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিলা হর্ষ হৈয়া॥
* * *
দেখিয়া রাজার চেষ্টা কহে বারে বারে।
* * *
শ্রীচৈতন্যদাস নাম থুইলাম তোমার।
শুনিয়া রাজার নেত্রে বহে অশ্রুধার॥"
(ভক্তি-রত্নাকর)

ভক্তি-রত্নাকরের নবম তরঙ্গে রাজার বীরহাম্বির ভণিতা-যুক্ত দুইটি পদ উদ্ধৃত আছে; এবং পদকল্পতরুর ২৩৩০ সংখ্যক পদ বীরহাম্বির ভণিতা-যুক্ত। তিনি চৈতন্য দাস ভণিতা দিয়াও বহুতর পদ রচনা করিয়াছিলেন, পদকল্পতরুতে সে সকল পদ সংগৃহীত হইয়াছে। বহুতর ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হয় নাই। যথা—

"চৈতন্য দাস নামে যে গীত বর্ণিল।
বিস্তারের ডরে তাহা নাহি জানাইল॥"
(ভক্তিরত্নাকর)।

২—কবি প্রেমদাসেরও ঐরূপ আর একটী নাম ছিল। সেইটি তাহার পিতৃমাতৃপ্রদত্ত প্রকৃত নাম। প্রেমদাস তাঁহার গুরুদত্ত নাম। প্রেমদাস নামে তিনি অধিকাংশ পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া, ঐ নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত। তবে তাঁহার পুরুষোত্তম নামযুক্ত পদ যে নাই, তাহা নহে; পদকল্পতরুতে পুরুষোত্তম ভণিতা যুক্ত ১২টি পদ দৃষ্ট হয়। এখানে সংখ্যার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। প্রেমদাস তাঁহার পিতার কনিষ্ঠ পুত্র, তিনি আত্ম-বিবরণে লিখিয়াছেন :—

"কনিষ্ঠ আমার নাম, মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম
গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস।
সিদ্ধান্তবাগীশ বলি, নাম দিলা বিজ্ঞ বলি
কৃষ্ণদাস্যে মোর অভিলাষ॥
(বংশীশিক্ষা)।

ভক্তি-রত্নাকর-রচয়িতার নামও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, তাঁহারও দুইটি নাম ছিল, একটি ঘনশ্যাম দাস; অপরটি নরহরি দাস। উভয় নামের ভণিতাযুক্ত তাঁহার বহুতর পদ আছে।

প্রাচীন মহাজন ও পদকর্ত্তাগণের মধ্যে এরূপ প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব কবি বলরামেরও আর একটি নাম নিত্যানন্দ দাস ছিল।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দুই স্ত্রী—বসুদা ও জাহ্নবা। জাহ্নবা দেবী শিষ্যাদি করিতেন। উপযুক্তা স্ত্রীলোক পুরুষকেও শিষ্য করিতে পারেন, ইহা গুরু পরিবারে সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। কবি বলরাম জাহ্নবাদেবীরই শিষ্য। অতএব তিনি নিত্যানন্দ "পরিবার।" এই জন্যই চরিতামৃতে নিত্যানন্দ শাখা-বর্ণন পরিচ্ছেদে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। পদকর্ত্তা জ্ঞান দাস ও * ঐরূপই

* বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষ অভিধানে মৎপ্রেরিত "জ্ঞানদাস" শব্দ দ্রষ্টব্য।

জাহ্নবা শিষ্য ছিলেন, ইঁহার নামও চরিতামৃতে আছে। বলরাম জাহ্নবা-শিষ্য, প্রেমবিলাসে তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন, যথা :—

"মোর দীক্ষাগুরু হয় জাহ্নবা ঈশ্বরী।
যে কৃপা করিলা মোরে কহিতে না পারি।"
(প্রেমবিলাস)।

তিন প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরই খেতরীতে শ্রীমৎ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ বিগ্রহ স্থাপনোৎসব হয়। এই উৎসবে অনেক পার্শ্বদ ভক্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই উৎসবে জাহ্নবা দেবীর সহিত, নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত যে যে ভক্ত গমন করেন, তাহাদের নামের সহিত বলরাম দাসের নামও পাওয়া যায়। যথা—

মুরারী, চৈতন্য, জ্ঞানদাস মহীধর।
* * * *
শ্রীপরমেশ্বর দাস, বলরাম বিজ্ঞবর।
শ্রীমুকুন্দ, দাস বৃন্দাবন আদি করি॥
(ভক্তিরত্নাকর)।

জাহ্নবা শিষ্য,—জাহ্নবার অনুগামী এই "বিজ্ঞবর" বলরামই আমাদের প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। প্রেমবিলাসেও (১৯ বিঃ) খেতরীর উৎসব বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার জাহ্নবাসহ ঐ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন, এই জন্য অন্যান্য অনুগামী ভক্তগণের নামের সহ নিজ নাম লিখেন নাই, তবে তিনি ("আমি") উপস্থিত ছিলেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব চরিতামৃতের "কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদী" নিত্যানন্দ ভক্ত, বৈষ্ণব বন্দনায় লিখিত "সঙ্গীতকারক" আর, ভক্তি রত্নাকরেব এই "বিজ্ঞবর" বলরাম দাসই প্রেমবিলাসরচয়িতা ও প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। নতুবা উৎসবোপস্থিত জাহ্নবা দেবীর অন্যান্য ভক্তগণের ন্যায়, প্রেমবিলাসে তাঁহারও নাম থাকিত। এই প্রসিদ্ধ কবির রচিত প্রেমবিলাস ব্যতীত "বীরচন্দ্র চরিত" নামে আর একখানি গ্রন্থ আছে, কিন্তু উহা আমরা অদ্যাপি দেখি নাই, প্রেমবিলাসে উল্লেখ মাত্র পাইয়াছি।

বলরামের বিবরণ অতি অল্পই অবগত হওয়া যায়, যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, কথিত হইল। বলরাম দাস বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। পদকল্পতরুর ২৯৩১ সংখ্যক পদে বলরাম লিখিয়াছেন—

"তৃতীয় সময় কালে, বন্ধন সে হাতে গলে,
পুত্র কলত্র গৃহবাস।
আশা বাড়ে দিনে দিনে, ত্যাগ নাহি হয় মনে,
হরিপদে না করিনু আশ॥"

এই সকল কথা যদি সাধারণ ভাবে না লইয়া, তাঁহার আত্ম পক্ষে গ্রহণ করা যায়, তবে বলিতে হইবে যে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং পুত্র কন্যাদিও হইয়াছিল। সাধারণতং বৈষ্ণব-গ্রন্থকর্ত্তাদিগকে, পরকে উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা নিজ মনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কথা বলার রীতি দৃষ্ট হয়, সেরূপ হিসাবে উপরোক্ত কথা গুলি কবির আত্ম পক্ষেই কথিত বলা যাইতে পারে। বলরামের বৃদ্ধকালের আর একটি পদ কেমন হৃদয়স্পর্শী, দেখুন—

"বুঢ়া কি আর গরব ধর।
এ ভব সংসার, সাগর তরিতে,
হরিনাম সার কর॥
পাকিল কুন্তল, গায়ে নাহি বল,
কাঁকালি হইয়াছে বাঁকা।
হাতে নড়ি করি, যাও গুড়ি গুড়ি,
হুড়ি পড়ি বারে শঙ্কা।
সন্ধ্যায় শয়ন, কাশ ঘন ঘন,
সঘনে ডাকিছে গলা।
মুদিত নয়ান, ঘুচাইয়া দেখ,
উদিত হইয়াছে বেলা॥
শ্বাস যে রোদন, লজ্বি ঘনে ঘন
সঘনে পিবহি পানী।
অভয়ে বদন, ভরি বল হরি,
দাস বলরাম বাণী॥"

এখানে বলরামের কবিত্ব বিশ্লেষণের প্রয়াস বৃথা, তাঁহার দুই একটী ভিন্ন রকমের পদ উদ্ধৃত করিয়া সে চেষ্টা করা যাইতে পারিত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, বলরাম অপরিচিত হইলেও, বলরাম দাসের পদ বঙ্গীয় পাঠকবর্গের অপরিচিত নহে ; সুতরাং সে চেষ্টা করা গেল না।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

প্রমীলা।

(কবি-ভগিনী প্রমীলা নাগের অকাল মৃত্যুতে।)

বঙ্গ কবি-কুঞ্জে তুমি আছিলা বর্ষার
প্রভাতের পিক যেন ; ঝঙ্কারে কেবল
ঝরিত কি আকুলতা বিষাদ ব্যথার,
করিয়া হৃদয় মন উদাস-বিহ্বল।
বাঙ্গালার দগ্ধভাগ্য—খেদে ফাটে প্রাণ!
অকালে নীরব হলো সে ঝঙ্কার হায়!
দু'একটী পথহারা করুণ সে তান
"প্রমীলা" "তটিনী" রূপে রহিল ধরায়!
যে ক'দিন ছিলে হেথা শুধুই কাঁদিলে
বিষাদ-অশ্রুতে রচি' ক্ষুদ্র "এ তটিনী"!
কিন্তু এই "তটিনীর" বিষাদ-সলিলে
কে বলিবে, কত জনে জুড়াবে পরাণী।
যে সুখ শান্তিরে খুঁজে পরিশ্রান্ত হেথা,
অমর সে কবি-কুঞ্জে এবে পাবে সদা।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কে তুমি গাইয়ে গেলে ?

১

কে তুমি গাহিয়ে গেলে গভীর নিশীথে,
চমকে ভাঙ্গিয়া মোর সুখের স্বপন,
ঝঙ্কারি হৃদয়-বীণা কঠিন আঘাতে,
জাগাইয়া জড়প্রাণ ঘুমে অচেতন ?

২

আঁধারের আবরণে কে তুমি নিঠুর
দূর দূরান্তরে থাকি,
আপনা লুকায়ে রাখি
ঢালিলে গো সুধাকণ্ঠে রব সুমধুর ?
চমকে জাগিল প্রাণ,
সেই সুর সেই তান,
হৃদয়ে রহিল মিশি না পারি ভুলিতে ;
কে তুমি গাইয়ে গেলে গভীর নিশীথে ?

৩

কে তুমি গাইয়ে গেলে
কেন মোরে জাগাইলে ?
বিস্মৃতি স্বপন মাঝে ছিনু যে ডুবিয়া!
অচেতন মাঝে হায়!
ছিনু অচেতন প্রায়,
চেতনা, কর্ত্তব্য, জ্ঞান, সকল ভুলিয়া ;
কেন এ মধুর তানে,
পুন জাগাইলে প্রাণে,
সেই সব সুপ্ত স্মৃতি, উৎকণ্ঠা, আকুলি ?
কেন মরু হৃদয়েতে
বহাইলে নব স্রোতে
আশার তটিনী পুন আবেগে উথলি ?
অনন্তের বেলা ভূমে
পড়েছিল ঘোর ঘুমে
কল্পনার শিশুগুলি হারায়ে চেতনা ;
উঠিল জাগিয়া তারা
হইয়া আপন হারা
শ্যামের বাঁশরী-রবে যথা ব্রজাঙ্গনা ;
বসন্তের আগমনে
ফুল যথা কুঞ্জবনে
ব্যাকুলিত জাগে শুনি ভ্রমর-গুঞ্জন ;
সেইরূপ হৃদে মোর
ভাঙ্গিয়া ঘুমের ঘোর
জাগিল নবীন আশা নব আন্দোলন ;
কর্ত্তব্য, কল্পনা, প্রেম, সকলি নূতন!

৪

কে তুমি নিশীথ কালে
সুধা বীণা ঝঙ্কারিলে
পরাণ পাগল করি ভাঙ্গিলে স্বপন ?
ছুটে হৃদি তোমা পানে
প্রেমিক গিরীক গানে
আকুলিত যথা জীব তরুলতাগণ!
কিন্তু না নেহারে পথ অন্ধ যে নয়ন!

৫

কে তুমি জাগায়ে হেন
রহিলে নীরব পুন ?
দেখিতে যাতনা কিগো উদ্দেশ্য কেবল ?
রয়েছি শ্রবণ পাতি
শুনিতে সে সুধাগীতি
শুনাও ;—আকুল প্রাণ করগো শীতল ;
দেখা দাও একবার,
নয়নের অন্ধকার,
ঘুচাও,—পূরাও মম হৃদয় বাসনা ;
জাগাও অতীত স্মৃতি
উৎকণ্ঠা, আকুলি, শান্তি
করগো করগো যদি দিয়েছ চেতনা ;
নীরবে নিঠুর হয়ে দিওনা যাতনা।

শ্রীবিহারীলাল গুহ রায়।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

২৮। বেদান্ত-দর্শন।—মহর্ষি-বেদব্যাস কৃত উত্তর মীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র। সটীক—শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত শ্রীমদ্ গোবিন্দ ভাষ্য এবং শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি কৃত বঙ্গানুবাদ ও গোবিন্দভাষ্য-বিবৃতি সমেত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত সম্পাদিত। বেদান্ত-দর্শন সকল দর্শনের শিরোমণি। বেদান্ত-দর্শনের রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য, এই চারি সম্প্রদায়ের চারিখানি এবং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের একখানি, এই পাঁচখানি ভাষ্যই প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণব সমাজে বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত গোবিন্দ-ভাষ্যই বিশেষ সমাদৃত ও প্রচলিত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত-সম্পাদিত এই গ্রন্থে বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্যেরই প্রাধান্য। বৈষ্ণব সমাজের দিক্ হইতে বেদান্তের যে মীমাংসা হওয়া সম্ভব, তাহা অতি বিশদভাবে, অতি পরিস্ফুট ও উজ্জ্বলরূপে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় এই কাজে ব্রতী হইয়া দেশের মহদুপকার করিয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদৃত হইলে আমরা নিতান্ত সুখী হইব। এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে গভীর গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা সম্পাদক মহাশয়ের নিকট এই উপাদেয় গ্রন্থ উপহার-প্রাপ্তি জন্য বিশেষ বাধিত রহিলাম।

২৯। কবিতামালা।—৺গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত, মূল্য ১৲, গুরুদাস বাবুর দোকান, সংস্কৃত ডিপজিটারি প্রভৃতিতে প্রাপ্তব্য। গোপাল বাবু একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুন্সেফের কাজ করিতেন। এই পুস্তকের অধিকাংশ কবিতা তাঁহার পাঠ্যাবস্থায়, ২১ হইতে ২৩ বৎসর বয়সের লেখা। কবিতাগুলি স্বদেশ-হিতৈষণায় এবং প্রেম-মাদকতায় পূর্ণ। কিন্তু সে সকল কথা বলিবার পূর্ব্বে সংগ্রাহক মহাশয় সম্বন্ধে দুই একটী কথা এখানে বলা আবশ্যক।

গোপালবাবু এখন স্বর্গে, তাঁহার বন্ধু, অকৃত্রিম সুহৃৎ দেবেন্দ্রবিজয় বাবু তাঁহার সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যতিব্যস্ত। ১২৬২ সালের ৩রা চৈত্র, গোপাল বাবুর জন্ম এবং বিগত ২৫শে আষাঢ়, ১৩০৩, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেবেন্দ্র বাবু, গোপাল বাবুর কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। এরূপ নিঃস্বার্থ ভালবাসা এই মর্ত্ত্যধামে বড়ই বিরল। বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেলের প্রতি তদীয় বন্ধুগণের অবহেলা এবং দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর আদর স্মরণ করিলে, যুগপৎ ঘৃণা ও শ্রদ্ধার উদয় হয়। দেবেন্দ্রবিজয় বাবু সখ্য-প্রেমের যে উজ্জ্বল, মনোমুগ্ধকর চিত্র দেখাইলেন, তাহা এ দেশে অক্ষয় হউক। গোপাল বাবুর সম্ভ্রান্ত পরিবারের আত্মীয়বর্গ যাহা পারিলেন না—করিলেন না, দেবেন্দ্র বাবু নিজ অর্থ ব্যয়ে তাহা করিলেন; এ কথা স্মরণ করিলেও আনন্দ পাই। দেবেন্দ্র বাবু গোপাল বাবুর জীবন সম্বন্ধে যে কয়েকটী অমূল্য কথা এই গ্রন্থের প্রথমে লিখিয়াছেন, তাহার প্রতি কথা গভীর সখ্য-প্রেমের পরিচয় দেয়—তাহা যেন উষ্ণ শোণিতের তরল ধারায় লিখিত, তাহা যেন হৃদয়-দ্রাবকে অঙ্কিত, তাহা যেন প্রেম-অমিয়ায় সুচিত্রিত। পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, চক্ষু হইতে অলক্ষিতে জল-ধারা প্রবাহিত হয়, হৃদয় মনটা যেন কোন্ অদৃশ্য রাজ্যে চলিয়া যায়। আমরা গোপাল বাবুকে কখনও দেখি নাই—তবুও তাঁহার জন্য আজ আমাদের প্রাণ আকুল। ধন্য দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর লেখনী।

সংগ্রাহক, গোপাল বাবু কবিতাগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, প্রথম খণ্ড—মধুর ভাবময়ী কবিতা, দ্বিতীয়খণ্ড জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা দিন দিনই বঙ্গে দুর্লভ এবং দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। জাতির অভ্যুত্থানের পক্ষে জাতীয় সঙ্গীত এবং কবিতার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এখনকার কবিগণ সে সকল কথার কোন ধার ধারেন না; ইন্দ্রিয়জ প্রেম-প্রণয়ের গাথা,

অথবা ফুল বা জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য্য বা রমণীর রূপ-পিপাসাতেই বিভোর। হেম বাবুর ভারত-সঙ্গীত, বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরং, গোবিন্দ রায়ের যমুনা-লহরীর তুল্য কবিতার উচ্ছ্বাস এখন থামিয়াছে, এখন ফুল-জ্যোৎস্নার প্রবল বন্যা বহিতেছে। এ জাতি ডুবিতেছে, না উঠিতেছে, কে বলিতে পারে? কবিতামালার কবি বলিতেছেন—

"ভারতের পরিণাম—কি ছিল কি হলো।
কাজ কি সে পূর্ব্ব স্মৃতি—আহা ভুলে যাই।
ঘটেছে যা ঘটিবার,
কি কাজ ভাবিয়া আর,
ভুলে যাই তাহা—যদি ভুলে সুখ পাই।
হতাশ-তিমিরে আজি আচ্ছন্ন জীবন।
আর্য্যসুত আমি—আহা হই বিস্মরণ!!"

আবার—

"দ্বিধা হও ধরণিগো! লুকাও ভিতরে,
ভারত কলঙ্কীমুখ ও সুঅঙ্কে তব।
কি কাজ জীবনে যদি এত বিড়ম্বনা,
ডুবুক ভারত সহ ভারতের জন
অনন্ত সাগর গর্ভে! অনন্ত সলিলে,
ডুবে থাক্ আর্য্য নাম। ভারতের যশ
ভুলে যাও স্মৃতি—আর করো না স্মরণ,
চিরদাসী ভারতের সৌভাগ্যের দিন।"

এই সকল কবিতা পড়িতে পড়িতে কবির গভীর স্বদেশানুরাগের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ, স্তম্ভিত এবং আত্মহারা হই। এরূপ স্বদেশ-হিতৈষীর বীণা কেন অসময়ে নীরব হইল, ভাবিয়া শোকে আচ্ছন্ন হই।

কবির ভারত-বিলাপের প্রতি কথায় যে স্বদেশানুরাগ, যে খোলা হৃদয়-আবেগ চিত্রিত হইয়াছে, তাহা এদেশে দুর্লভ। ইচ্ছা হয়, সমস্ত কবিতা উদ্ধৃত করি। কিন্তু স্থান কোথায়? তাহাতে লাভই বা কি? এই কবি যে দেশের দুঃখের কথা ভাবিয়া ২ অনন্ত ধামে চলিয়া গিয়াছেন, সে দেশে এই কবির কি আদর হইবে না? এই কবিতামালা পুষ্পমালার ন্যায় এ দেশের নরনারী সাদরে গ্রহণ করিয়া গোপাল-ভক্তির পরিচয় কি দিবে না? আমরা আশা-হত নই। আশা আছে, ঘরে ঘরে মাতৃভক্ত গোপালের এই কবিতামালা শোভা পাইবে,—আশা আছে, সকলের সাদর আলিঙ্গন পাইবে।

৩০। রসলীলা।—প্রকৃতি গায়িকা। শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায় বি-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। এ পুস্তক খানির বিস্তৃত সমালোচনা করিতে একান্ত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু স্থানাভাবে তাহা হইল না। প্রেম-বিহ্বল সাধু ভক্তের ভক্তির মাদকতায় এই গ্রন্থ পূর্ণ। নমুনা দেখাইতে হইলে পুস্তক-খানি সমস্ত তুলিয়া দিতে হয়। তাহা অসাধ্য সাধন। পরিচয়ের জন্য দুই চারিটী স্থান হইতে কিছু কিছু তুলিলাম,—

১। "পথপানে চেয়ে জীবন গোঁয়ানু;
বঁধু আমার কেন এল না?
আশা-প্রপাতে হৃদয় ক্ষরিল,
এ আশা কেন গেল না?"

২। "পাখী তুই ডাকিস্‌নে ডাকিস্‌নারে ডাকিসনে,
সে যে পড়ে মনে।
লুকায়ে অগ্নি করে, সেত ছ'লে গেল মোরে,
সে হ'তে মরি মরম আগুনে।"

পাগলিনী নাথ তুমি, পাগলিনী আমি তব,
তোমারই সোহাগে, নাথ, ফুটে ফুল নব নব।
গাঁথি বন ফুলমালা, সাজায়ে বরণ ডালা,
এসেছি তোমার কাছে কেন কেন কি তা কব!"

"আমায় দংশেছে কি কাল ফণী গো,
আমার অঙ্গ হইছে ভারী, আমি নাড়িতে যে নারি।"

৫। "ন আলোক ন আঁধার নাহি কিছু পারাবার।
জ্ঞানময়ী মহাস্মৃতি ধরে শক্তি মূলাধার,
জীবন মরণময়, পায় বিশ্ব স্থিতিলয়
নেহারিব মহাযোগে জাগরণে"

এই পুস্তকের প্রায় সমস্ত কবিতাই তাল মানে গেয়। সমস্ত গুলি গানে শুনি নাই, কিন্তু মনে হয় যেন, গায়ক-লেখকের মুখে, দুটী একটী শুনিয়াছি। যিনি ভক্তিতে পাগল, প্রেমেতে অধীর, সেবায় কাঙ্গাল, তিনি কাহার না ভক্তির পাত্র? এই ভক্তি-বিরহ-মাখা গাথায়, এই পাষাণ সদৃশ আমরা, ক্ষণকালের জন্যও, মোহময় সংসারের অতীত হই, নিত্যানন্দময় ধামের যাত্রীক হই। সুতরাং গায়কের এই গাথা সার্থক হইয়াছে।

নেপালের পুরাতত্ত্ব। (১০)

ললিতপট্টনের রাজা সিদ্ধিনৃসিংহমল্ল ও তাঁহার বংশধরদিগের নামাঙ্কিত দুই খানি শিলালিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে; তাহা হইতে রাজা সিদ্ধিনৃসিংহের উর্দ্ধতন ও অধস্তন তিন পুরুষের নাম পাওয়া যাইতেছে। অনুমান ১৬২০ খ্রীঃ সিদ্ধিনৃসিংহ ললিতপট্টনে রাজপাঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা লক্ষ্মীনৃসিংহ-মল্ল কাটমাণ্ডুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, পৈতৃক রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ৭৫৭ নেপালী সংবতে (১৬৩৭খ্রীঃ) রাজা সিদ্ধিনৃসিংহের আদেশে ললিতপট্টনের রাধাকৃষ্ণ-মন্দিরস্থ শিলালিপি খোদিত হয়। আমাদের অনুমান মতে সিদ্ধিনৃসিংহমল্ল ১৬২০-৬০খ্রীঃ পর্য্যন্ত চল্লিশ বৎসর কাল ললিতপট্টনে রাজত্ব করেন। পণ্ডিত চূড়ামণি প্রিন্সেপ সাহেবের মতে ১৬৫৪ খ্রীঃ রাজা সিদ্ধিনৃসিংহ ললিত-পট্টনের রাজাসনে উপবিষ্ট হন। তিনি সিদ্ধি-নৃসিংহের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও নাম উল্লেখ করিতে পারেন নাই। তিনি ললিতপট্টনের রাজবংশের যে নাম-মালা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শাসনলিপি কি বংশাবলীর সহিত মিলিতেছেনা। ইহা হইতে তাঁহার প্রকাশিত নেপালের রাজবংশাবলীর অমূলকতা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে। নামমালার ন্যায় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সময়ও একান্ত ভ্রান্ত বলিয়া শাসনলিপি হইতে নিঃসন্দিগ্ধ-রূপে জানা যাইতেছে। ১৮৩৫খ্রীঃ তিনি নেপালের নরপতিদিগের যে কাল্পনিক নাম-মালা প্রকাশ করেন, তাহা কোন মতে ইতিহাসের নিকট গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। তাঁহার ভ্রমপ্রমাদ অনিবার্য্য। কারণ সেই সময়ে নেপালী শিলালিপির অস্তিত্বের বিষয়ও কেহ অবগত ছিল না। ডাক্তার ব্র্যামলির সংগৃহীত নেপালী মুদ্রা হইতে তিনি ললিতপট্টনের রাজবংশের সময় নিরূপণের যে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে।

নিম্নে ললিতপট্টনের নৃপতিদিগের নাম-মালা শিলালিপি হইতে গৃহীত হইয়া, প্রিন্সেপ সাহেবের প্রকাশিত নামমালার সহিত তুলিত হইল। আমাদের অনুমিত সময়ের সহিত প্রিন্সেপ সাহেবের নির্দ্দিষ্ট সময় তুলনা করিলেই, পাঠকবর্গ তাঁহার ভ্রম প্রমাদ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন

ললিতপট্টনের বংশাবলী।

(শিলালিপি এবং বংশাবলী।)	(প্রিন্সেপ সাহেবের নির্দ্দিষ্ট নামমালা)
মহেন্দ্রমল্ল (১৫৪০-৬০খ্রীঃ)	জয়ব্রহ্মমল্ল (১৬০০ ?)
শিবসিংহমল্ল (১৫৮০-১৬০০)	কন্যা
হরিহর সিংহমল্ল (১৬০০-২০)	সিদ্ধিনরসিংহ (১৬৫৪-৮৫খ্রীঃ)
সিদ্ধিনৃসিংহমল্ল (১৬২০-৬০)	নির্ম্মণ ইন্দ্রমল্ল (১৬৮৫-৮৯)
শ্রীনিবাসমল্ল (১৬৬০-১৭০০)	যোগনরেন্দ্রমল্ল (১৬৮৯-৯৫)
যোগনরেন্দ্রমল্ল (১৭০০-২০)	মহীপতীন্দ্রমল্ল (১৬৯৫-৯৬)
যোগমতী	জয়বীর মহেন্দ্র (১৬৯৬-১৭০৬)
যোগপ্রকাশ (১৭২০-৩০)	জয়ইন্দ্রমল্ল (১৭০৬-১৫)
বিষ্ণুপ্রকাশ (১৭৩০-৪০)	হৃদয়নরসিংহ (১৭১৫-১৬)
বিশ্বজিৎমল্ল (১৭৪০-৫০)	কিষিনির্ম্মলদেব (১৭১৬-২২)
তেজনরসিংহমল্ল (১৭৫০-৬০)	জয়যোগীযোগমল্ল দেব (১৭২২-২৯)
	জয়বিষ্ণুমল্ল (১৭২৯-৩১)
	জয়যোগপ্রকাশ মল্লদেব (১৭৪২-৪৯)
	জয়বিষ্ণুমল্ল আগনি (১৭৪৯-৫৫)

আমরা উপরে শিলালিপি হইতে সাতটী নাম গ্রহণ করিয়াছি। নিম্নতর চারিটী নাম বংশাবলী হইতে গ্রহণ করিয়াছি। কাটমাণ্ডু নগরের চারি মাইল দক্ষিণে বঙ্গমতী নামে যে বৃহৎ গ্রাম বর্ত্তমান আছে, তথায় অবলোকিতেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই মন্দিরের তোরণদ্বারে লোকেশ্বরের তিনটী কাংস্যনির্ম্মিত প্রতিকৃতি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সিদ্ধিনৃসিংহমল্লের পুত্র শ্রীনিবাসমল্লের আদেশে ও অর্থব্যয়ে দ্বারদেশ ও তোরণ স্বর্ণমণ্ডিত করা হয়। ৭৯২ নেপালী সংবতের (১৬৭২খ্রীঃ) মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। নেওয়ারী অক্ষরে ও সংস্কৃতভাষায় এই লিপি খোদিত ও রচিত হয়। বংশাবলীর মতে তিনি ১৬৫৭-১৭০১ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময়ের অভ্রান্ততা এই ক্ষুদ্র শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হইতেছে।

"নেপালাব্দে লোচন-ছিদ্র-সপ্তে,
শ্রীপঞ্চম্যাং শ্রীনিবাসেন রাজ্ঞা।
স্বর্ণদ্বারং স্থাপিতং তোরণেন,
সার্দ্ধং শ্রীমল্লোকনাথস্য গেহে॥"

শ্রীনিবাসমল্লের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র যোগনরেন্দ্রমল্ল পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করেন। দোলপর্ব্বতস্থ বিষ্ণুমন্দিরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার একবিংশতি পত্নী তাঁহার চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। যোগনরেন্দ্র পুত্রশোকে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন বলিয়া বংশাবলীতে বর্ণিত আছে। অনন্তর কাটমাণ্ডুর মহারাজা প্রতাপমল্লের তৃতীয় পুত্র মহীন্দ্রমল্ল ললিতপট্টনের সিংহাসন অধিকার করেন। বংশাবলীর এই উক্তি কতদূর সত্য, তাহা বলা যায় না। ইহা হইতে এই সত্য পাওয়া যাইতেছে যে, রাজা সিদ্ধিনৃসিংহমল্লের সময় হইতেই ললিতপট্টন অল্পাধিক পরিমাণে কাটমাণ্ডুর পদানত থাকে।

শিলালিপি হইতে জানা যাইতেছে যে, রাজা যোগনরেন্দ্রমল্লের সিংহাসন পরিত্যাগের পর তাঁহার কন্যা যোগমতী ললিতপট্টনের রাজাসনে অধিষ্ঠিতা হন। এই যোগমতী দেবী ৮৪৩ নেপালী সংবতের (১৭২৩খ্রীঃ) মাঘী শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে সোমবারে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন।

"অব্দে রামপ্রজেশ্বরাস্য বসুভির্মাঘেসিতে পক্ষকে,
মূলে চোত্তরফাল্গুনে শশধরে বারে দ্বিতীয়া তিথৌ।
পুত্রার্থং কুরুতে সুধাংশুবদনা পাষাণ দেবালয়ং।
কৃষ্ণংরাধিকয়া সহায় দ্বিতীয়ং কৃত্বা প্রতিষ্ঠানকরোৎ॥"

জ্যেষ্ঠপুত্র লোকপ্রকাশ মাতা যোগমতীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করেন। এই লোকপ্রকাশের স্বর্গকামনায় রাজ্ঞী যোগমতী ললিতপট্টনে এক পাষাণময় দেবালয় নির্ম্মিত করাইয়া তন্মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করেন। লোকপ্রকাশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যোগপ্রকাশের রাজত্বকালে উক্ত শিলালিপি খোদিত হয়। যে পর্য্যন্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক যোগপ্রকাশ রাজ্যশাসনে অক্ষম ছিলেন, ততদিন তাঁহার মাতা যোগমতীদেবীর দ্বারাই রাজকার্য্য পরিচালিত হইত বলিয়া অনুমিত হয়। যোগপ্রকাশের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুপ্রকাশমল্ল ললিতপট্টনে রাজত্ব করেন। আমরা উভয় ভ্রাতার রাজত্বকাল ১৭২০-৪০খ্রীঃ পর্য্যন্ত বিংশতিবর্ষকাল অনুমান করিতেছি। বিষ্ণুমল্ল ১৮৫৭ নেপালী সংবতে মূলচকে এক ঘণ্টা স্থাপিত করেন বলিয়া বংশাবলীতে বর্ণিত আছে।

বংশাবলী হইতে জানা যাইতেছে যে,

বিষ্ণুমল্লের পর কাটমাণ্ডুর রাজকুমার রাজ্যপ্রকাশ এক বৎসর রাজত্ব করেন। রাজ্যপ্রকাশ কাটমাণ্ডুর রাজা জগজ্জয়মল্লের তৃতীয় পুত্র। বিষ্ণুমল্ল সম্ভবতঃ তাঁহাকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করিয়া, রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। তাঁহার উৎপীড়নে প্রজাকুল ও অমাত্যবর্গ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে অবশেষে রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করিয়া রাজ্যপ্রকাশকে পদচ্যুত করে। রাজ্যপ্রকাশের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা জয়প্রকাশ দুই বৎসরকাল ললিতপট্টনে রাজত্ব করিয়া, প্রধানদিগের দ্বারা বিতাড়িত হয়। জয়প্রকাশকে বিদূরিত করিয়া, প্রধানেরা বিষ্ণুমল্লের দৌহিত্র বিশ্বজিৎমল্লের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন। চারি বৎসর পর বিশ্বজিৎমল্ল বিদ্রোহী প্রধানদিগের হস্তে নিহত হয়। অনন্তর প্রধানেরা নবকোটের রাজা দলমর্দ্দন সাহকে ললিতপট্টনের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে। চারি বৎসর রাজত্বের পর দলমর্দ্দনসাহ রাজ্যচ্যুত হয় এবং বিশ্বজিৎমল্লের পুত্র বা ভ্রাতষ্পুত্র তেজনরসিংহমল্ল রাজপদ প্রাপ্ত হয়। তেজ নরসিংহমল্ল তিন বৎসর মাত্র রাজ্যশাসন করেন। অনন্তর ললিতপট্টন নবকোটের রাজা পৃথ্বীনারায়ণের পদানত হয়।

শিলালিপির অভাবে বংশাবলী হইতে এই বিবরণ গৃহীত হইল। বংশাবলীর এই সকল উক্তি কত দূর প্রামাণিক, তাহা অবধারণের কোনও উপায় নাই। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, বিষ্ণুমল্লের মৃত্যুর পর রাজ্য মধ্যে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হয়। আমাদের অনুমান মতে যোগনরেন্দ্রমল্লের মৃত্যুর পরেই নবাকোটও কাটমাণ্ডুর নরপতিগণের মধ্যে, ললিতপট্টনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়। সময় সময় কাটমাণ্ডু ও সময় সময় নবকোট ললিতপট্টনে স্বীয় প্রাধান্য সংস্থাপিত করে।

নবকোট নগরে গোরখাবংশের আধিপত্য খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারা মেওয়ারের সূর্য্যবংশীয় নরপতিদিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। গোরখাবংশ প্রথমতঃ কুমায়ুনে ও পরে নবকোটে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ছয় শত পুরুষ রাজত্বের পর সমগ্র নেপালে তাঁহাদের অধিকার বিস্তারিত হয়। ক্রমে ক্রমে ললিতপট্টন, ভাটগাঁ ও কাটমাণ্ডুর মল্লবংশীয় নৃপতিগণ গোরখাবংশের পদানত হয়। নেপালে গোরখাবংশের আধিপত্য অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে অব্যাহত রহিয়াছে। নেপালের বর্ত্তমান মহারাজ ও অমাত্যবর্গ এই গোরখাবংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। কাটমাণ্ডুর মহারাজ প্রতাপমল্লের শাসন সময়ের আরম্ভে গোরখাবংশীয় ডম্বরসাহ নবকোটে রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রতাপমল্লের দ্বারা ডম্বরসাহ পরাজিত হইলে, গোরখাবংশের উদীয়মান প্রভুতা কিছুকালের জন্য পর্য্যুদস্ত থাকে। ভাটগাঁর রাজা মহেন্দ্রমল্ল এবং ললিতপট্টনের সিদ্ধিনৃসিংহমল্ল এই ডম্বরসাহের সমসাময়িক। ডম্বর সাহের বংশধর দলমর্দ্দন সাহের আধিপত্য ললিতপট্টনে কিছু কালের জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। দলমর্দ্দন সাহের পুত্র নরনারায়ণ সাহ অনুমান ১৭৪০ খ্রীঃ ভাটগাঁ আক্রমণ করিয়া তথায় স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। নরনারায়ণের পুত্র পৃথ্বীনারায়ণসাহ ৮৮৮ নেপালী সংবতে (১৭৬৮খ্রীঃ) কাটমাণ্ডুর শেষ মল্লরাজ জয়প্রকাশকে পরাজিত করিয়া, সমগ্র নেপাল আপনার পদানত করেন। মহারাজ প্রতাপমল্লের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও

তৃতীয় পুত্র যথাক্রমে কাটমাণ্ডুর সিংহাসন অধিকার করেন। মহীন্দ্রমল্লের পর তাঁহার পুত্র ভাস্করমল্ল রাজপদ প্রাপ্ত হন। অপুত্রক অবস্থায় সংক্রামক রোগে ভাস্করমল্লের মৃত্যু হইলে, তাঁহার বিধবা পত্নীগণের সাহায্যে মল্ল-বংশীয় জগজ্জয়মল্ল রাজ্যলাভ করেন। কাটমাণ্ডুর শেষ রাজা জয়প্রকাশমল্ল এই জগতজ্জয়মল্লেরই দ্বিতীয় পুত্র।

প্রতাপমল্লের পরবর্ত্তী কাটমাণ্ডুর কোনও নরপতির নামাঙ্কিত শিলালিপি পণ্ডিত-বর ভগবানলাল ইন্দ্রাজীর গবেষণায় আবিষ্কৃত হয় নাই। রাজ্ঞী যোগমতী দেবীর অধস্তন ললিতপট্টনের কোন রাজার নামাঙ্কিত প্রস্তরলিপি পাওয়া যায় নাই। ভাটগাঁর অধিপতিদিগের নামাঙ্কিত এক-খানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমাদের অনুমিত সময়ের সত্যতা তাহা দ্বারা দৃঢ়ীভূত হইতেছে। রাজা ভূপালেন্দ্র মল্লের মাতা রাজ্ঞী ঋদ্ধিলক্ষ্মী ৮১০ নেপালী সংবতে (১৬৯০খ্রীঃ) কাটমাণ্ডুর রাজপ্রাসা-দের অনতিদূরে এক শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত বৎসরের কার্ত্তিকী কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া তিথিযুক্ত রবিবারে সেই মন্দিরে এক শিবলিঙ্গ স্থাপিত হয়। রাজা ভূপালেন্দ্রমল্ল ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে এক স্তোত্র রচনা করেন। এই স্তোত্রের শেষভাগে তিনি আপনাকে "রঘুবংশাবতার" "হনুমদ্ধ্বজ" ও "মহারাজাধিরাজ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই শিলালিপির দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"নেপালাঙ্কিতিপালভালতিলকো বিদ্বন্‌গুণালঙ্কৃতো,
দানোদ্রেককৃতাতিরেকমহিমঃ প্রৌঢ়প্রতাপোন্নতঃ।
দেবো যত্তনয়ো নয়োদয়-লসৎকীর্ত্তিপ্রচারঃ,
শ্রিয়া ভূপালেন্দ্র ইতি প্রথামুপাগতো ভূপো বরীবর্ত্ততে।২
নেপালাব্দে গগন-ধরণী-নাগযুক্তে, কিলোর্জ্জে
মাসে, পক্ষে বিধুবিরহিতে, সুদ্বিতীয়াতিথৌসা।
কৃত্বা দেবালয়মপি রবৌ ঋদ্ধিলক্ষ্মী প্রসন্না
চক্রে দেবী সুবিধিবিদিতাং শঙ্করস্য প্রতিষ্ঠাং "॥৩॥

বংশাবলীর মতে কাটমাণ্ডুর রাজা জগজ্জয়মল্ল ৮৫২ নেপালী সংবতে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু এই জগজ্জয় (মহীপতীন্দ্র)মল্লের নামাঙ্কিত ৮৬৮ নেপালী সংবতের একটী মুদ্রা আসামের অন্তর্গত বরপেটায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে বংশাবলীর নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভ্রান্তি ও অমূলকতা স্পষ্টাক্ষরে জানা যাইতেছে। ভাটগাঁর রাজা ভূপালেন্দ্র (ভূপতীন্দ্র) মল্লের নামাঙ্কিত আর একটী মুদ্রা বরপেটায় পাওয়া গিয়াছে। তাহা ৮১৯ নেপালী সংবতে নির্দ্দিষ্ট হয়।* এই দুই মুদ্রালিপি হইতে জানা যাই-তেছে যে, ১৬৯৯ খ্রীঃ ভূপালেন্দ্রমল্ল ভাটগাঁয় এবং ১৭৪৮খ্রীঃ জগজ্জয়মল্ল কাটমাণ্ডু নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। শিলালিপির অভাবে মুদ্রালিপি আমাদের অনুমিত সময়ের সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছে।

ত্রয়োবিংশতি থানি শিলালিপি হইতে নেপালের প্রামাণিক ইতিহাস যথাসাধ্য সং-গৃহীত করিয়া প্রদর্শিত হইল। অতি প্রাচীন সময় হইতে গোরথাবংশের অধিকারকালের আরম্ভ পর্য্যন্ত নেপালের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এক্ষণে নেপালের বর্ত্তমান অধিপতির গোরখা বংশের বিবরণ সংক্ষেপে লিখিয়া বর্ত্তমান সুদীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধ পরিবর্দ্ধিত ও পরি-বর্ত্তিত করিয়া শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

* Proceedings of A. Society of Bengal for 1893. p. 146.

আত্মা ও বাইওপ্ল্যাজম।

জনন-মরণজয়ী ব্রহ্মভূত শঙ্করাচার্য্য একদিন কোন নৃশংস কাপালিকের ক্রূর কামনা পূরণার্থ স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় গ্রীবা যূপ-কাষ্ঠে বিন্যস্ত করিয়া সহাস্য বদনে বলিয়া-ছিলেন, "কাপালিক! তোমার অসি যতই শাণিত হউক না কেন, আমার তিলাংশও ছেদন করিতে সক্ষম নহে; আমি জড় রাজ্যের সম্পূর্ণ অতীত, মদীয় জড়নির্ম্মোক মাত্রই তোমার করবালের ছেদনীয়।"

প্রতীচ্য ভূখণ্ডের অপর একজন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষও (সক্রেটীশ) একবার ঠিক ঐরূপ একটি অপূর্ব্ব কথা শুনাইয়াছিলেন। তিনি হলাহল পান করিয়া যখন মৃত্যুর মধুময় আলিঙ্গনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন তদীয় শিষ্য-বর্গ বড়ই অধীর হইয়া পড়ে। তাঁহাদিগের শোক মোহ অপনয়নের নিমিত্ত সক্রেটীশ বলিয়াছিলেন "তোমারা অমূলক শোকা-বেশে কেন ধৈর্য্য হারা হইতেছ? আমি যাহা আছি, তাহাই থাকিব। আমার কস্মিন কালেও ধ্বংস নাই। তোমরা এই স্থূল মাংস পিণ্ডকে "সক্রেটিস" বলিয়া কখনও মনে স্থান দিও না।"

শঙ্কর ও সক্রেটীশোক্ত কথার সত্যতা বর্ত্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞানালোকে কতদূর প্রতিপন্ন হয়, তাহাই আমাদের আলোচ্য।

বিশ্ব-রহস্যভেদক বিজ্ঞান জীব-জগতের তত্ত্ব সম্বন্ধে যতদূর সন্ধান পাইয়াছে, তাহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, "Life proceeds from life" অর্থাৎ "প্রাণ প্রাণ হইতে প্রসূত।" এ পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির রাজ্যে এমন একটী নিদর্শন বা প্রমাণ দেখিতে পান নাই যে, জড় পদার্থ হইতে অজড় বা চৈতন্যের উদ্ভব হইয়াছে। ক্লিন্ন বা গলিত পদার্থ হইতে কীটপুঞ্জের আকস্মিক আবির্ভাব দেখিয়া স্থূলদর্শী বৈজ্ঞা-নিকগণ একদিন সদর্পে বলিত, "ঐ দেখ নির্জ্জীব জড় পদার্থ হইতে সজীব প্রাণীর উৎ-পত্তি, তবে আর জড়াতীত চৈতন্য পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ কি?" যে দৃষ্টি লইয়া "জড়োদ্ভূত চৈতন্য"বাদী এই কথা বলিতে সাহস করিত, এখন আণুবীক্ষণিক দৃষ্টি প্রভাবে নগ্ন চক্ষুর সেই দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া সে স্বীকার করিতে প্রস্তুত।

প্রকৃতি-প্রদত্ত সীমাবদ্ধ দর্শনশক্তি দ্বারা সূক্ষ্ম পদার্থের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা, এখন উপহাসের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অণু-বীক্ষণ-বিযুক্ত হইয়া যে চক্ষু গলিত পদার্থ হইতে কীটোৎপত্তি দেখিয়া উহাকে তৎ-পদার্থের বিকার বলিয়া ভাবিয়াছিল, এখন দৃষ্টি-প্রদীপক অণুবীক্ষণের সহায়তায় সেই চক্ষু দেখিতেছে যে, "ক্লিন্ন পদার্থে বায়ুমণ্ডলস্থ কীটাণু বা উদ্ভিজ্জাণু সমূহ পরিপুষ্ট এবং পরি-বর্দ্ধিত হয় মাত্র। উহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং উক্ত পদার্থ হইতে অনুদ্ভূত।" যে অবধি এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদবধি প্রাচীন পণ্ডিতগণের পরিপোষিত" Spontaneous generation" বা স্বতঃজননবাদ ভ্রান্তিমূলক ও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত পাস্তর অণুবীক্ষণের পরীক্ষা ব্যতীত অতি সহজ উপায়ে অবি-সম্বাদিতরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, স্বতঃ জনন সম্পূর্ণ অসম্ভব। তিনি পদার্থের স্বাভাবিক পচন বা বিগলন প্রক্রিয়ার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া চক্ষুর অদৃশ্য

কীটাণু সমূহকেই উহার কারণ বলিয়া নির্ণয় করেন।

"He claimed if all germs could be excluded, fermentation would be impossible. Again he was met with ridicule and old cry of spontaneous generation.

To prove this he carried out experiments in pure mountain air, and he shewed conclusively that at that altitude of mountain where the air was free from germs, no fermentation did or could occur, and therefore "spontaneous generation" was as he had all along contended, a myth."

SCIENTIFIC AMERICAN.
October 12th, 1895.

অর্থাৎ—"কোন পদার্থ বীজাণু সমূহ হইতে বিমুক্ত বা অসংলগ্ন রাখিতে পারিলে উহার বিগলন অসম্ভব। পাস্তরের এই ঘোষণায় তাঁহার বিরুদ্ধে প্রাচীন স্বতঃজননবাদ-পোষক প্রতিবাদ ও উপহাসের ধ্বনি চারিদিকে উত্থিত হয়। নিজ মতের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবার জন্য তিনি বিশুদ্ধ বায়ুতে পচন ক্রিয়ার পরীক্ষা করেন এবং অবশেষে প্রমাণিত করেন যে, পর্ব্বতের সমুচ্চ প্রদেশস্থ বায়ু বীজাণু-বিহীন বলিয়া তথায় কোন ক্রমেই কোন দ্রব্য পচিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার চিরপ্রতিবাদিত স্বতঃজননবাদ একটা অলীক উপকথা মাত্র।"

এইরূপ সন্তোষজনক প্রমাণ প্রাপ্তির পর কোন বৈজ্ঞানিকই আজকাল "স্বতঃজনন-বাদ" স্বীকার করেন না। ব্রিটিশ বিশ্বকোষ Encyclopœdia Britanica গ্রন্থের "জীবন-বিজ্ঞান" প্রবন্ধে আচার্য্য হক্‌সলি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন,—

"At the present moment there is not a shadow of trust-worthy direct evidence that abiogenesis (or spontaneous generation) does take place or has taken place within the period during which the existence of the globe is recorded." (P. 689)

তাৎপর্য্য এই,—বর্ত্তমান সময়ে এরূপ কোন বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের আভাস পাওয়া যায় নাই যে, পৃথিবীর উৎপত্তি অবধি কথনও "স্বতঃজনন" সংঘটিত হইয়াছে বা হয়।

যদি তাহাই হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, চৈতন্য জড়পদার্থনিষ্ঠ গুণ নহে, ইহা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ বিভিন্নশক্তি। কিন্তু অনাত্মবাদী তাহা মানে কই? সে স্পর্দ্ধা-সহকারে বলিবে যে, জড়পদার্থ ব্যতীত জগতে পদার্থান্তরের অস্তিত্ব নাই। বিস্ময়ের বিষয় এই, জড়বাদী নির্জ্জীব পদার্থ হইতে সজীব পদার্থের উদ্ভূতি বিষয়ক প্রমাণ নাই, ইহা স্বীকার করিয়াও দেহাতিরিক্ত চৈতন্য শক্তিতে অবিশ্বাসী। সে স্বীয় মত সমর্থনের জন্য বলিবে, "যদিও সজীব পদার্থ হইতেই সজীব পদার্থের উৎপত্তি ব্যতীত নির্জ্জীব পদার্থ হইতে সজীবের উদ্ভব বর্ত্তমান জগতে দেখা যায় না, তথাপি ইহা অনুমেয় যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে হয়ত পরমাণুপুঞ্জের অবিজ্ঞাত রাসায়নিক সংশ্লেষণে সজীব পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছিল, এখন তাহা হইতেই প্রবাহরূপে প্রাণীব্যূহ উদ্ভূত হইয়া থাকে।" এই স্থলে অবিজ্ঞাত রাসায়নিক সংশ্লেষণ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কোন রসায়ন-বিজ্ঞান-বিশারদ পণ্ডিতই আজ পর্য্যন্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সজীব পদার্থ উৎপাদন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তবু বিশ্বাস ও ভরসা, সেই অজ্ঞাত রাসায়নিক সংশ্লেষণ-তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে, অনাত্মবাদী জড় পদার্থ হইতেই চৈতন্যের উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবেন। কি দুরাকাঙ্ক্ষা!

জড়বাদী যাহাই বলুক, স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, জড়পদার্থের কোন প্রকার সংমিশ্রণ বিমিশ্রণেই তাহা হইতে ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব হইতে পারে না। জড়শক্তি চিরদিনই অন্ধ এবং আগন্তুক শক্তির নিয়ম্য। উহা স্বতঃ পরিচালিত হইতে অসমর্থ এবং

পরতঃ চালিত হইলে স্থগিত হইতে অক্ষম। প্রাণীজগৎ যদি জড় জগতের রূপান্তর হইত, তবে তাহাতে জড়োচিত গুণ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতাম না। প্রাণীজগতের প্রকৃতি, ধর্ম্ম, গুণ ও নিয়ম একবার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক।

স্থাবর উদ্ভিজ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যাদি শ্রেষ্ঠ প্রাণী পর্য্যন্ত সমস্তের ভিতরই প্রাণের সঞ্চরণ বর্ত্তমান। যাহাতে প্রাণন ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রাণীজগতের অন্তর্গত, এবং যাহাতে তাহা লক্ষিত হয় না, তাহাই সাধারণতঃ জড়জগতের অন্তর্নিবিষ্ট। এখন দেখিতে হইবে, প্রাণ কাহাকে বলে। জীবন-বিজ্ঞান বলেন—"যে শক্তি দ্বারা বাইওপ্ল্যাজম্ (Bioplasm) বা জৈবনিক বীজাণুর কার্য্যক্রম সংসাধিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রাণ।" বাইওপ্ল্যাজম্ তবে কিম্বিধ পদার্থ? এতদুত্তরে বিজ্ঞানের যাহা বক্তব্য, তাহা বিবৃত হইতেছে।

কি স্থাবর কি জঙ্গম, যাবতীয় সজীব প্রাণীর দেহেই ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—

১। Germinal matter বা বীজভূত পদার্থ।

২। Nutrient matter বা পোষণসাধক পদার্থ।

৩। Formed matter বা গঠিত পদার্থ।

দেহের সর্ব্বাংশ কোন প্রাণীরই চৈতন্য শক্তি দ্বারা আবিষ্ট নহে। সমুদ্র গর্ত্ত হইতে একটী জীবিত শঙ্খ উত্তোলন করিয়া, উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা কর, চেতন ও অচেতন অংশ সহজেই দেখিতে পাইবে। উহার কঠিন বহিরাবরণ অভ্যন্তরস্থ চেতন শরীরাংশের সহিত সংলগ্ন থাকিলেও সংপূর্ণ রূপে চৈতন্যের আবেশ-বর্জ্জিত। শঙ্খের বহিরঙ্গ পরিণত অবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সজীব অন্তরঙ্গের পোষণ ক্রিয়ার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তবু উহা মৃত জড়পিণ্ড মাত্র। মানব শরীরে শঙ্খের ন্যায় অচেতন কঠিনাবরণ নাই সত্য, কিন্তু হস্ত-পদের নখর ঠিক সেইরূপ পদার্থ। এই প্রকার সমস্ত প্রাণীশরীরেরই চারি ভাগ অচেতনাত্মক এবং এক ভাগ মাত্র চেতনাত্মক।

জীবদেহ অতি সূক্ষ্ম চক্ষুর অগ্রাহ্য কোষসমূহে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক কোষের অভ্যন্তরে পরিপোষক পদার্থের স্রোত নিয়ত প্রবাহিত। এই সকল পদার্থ অম্লজানাদি বাষ্প এবং ভুক্ত অন্নরস ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোষাভ্যন্তরে পোষক উপাদান সমূহ প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ সজীবতা প্রাপ্ত হয়, পরে গঠিত পদার্থ রূপে পরিণত হইয়া বহির্গত হয়। প্রতি কোষেই এইরূপ দুইটী অন্তর্মুখী পোষক পদার্থ লইয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, অপরটী বহির্মুখী গঠিত পদার্থের বহির্নিঃসারক। পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নের অবোধ্য ও অননুকৃত্য এক প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া প্রভাবে কোষাভ্যন্তরে অচেতন পদার্থ সচেতনাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তাহাই আবার বহির্ভাগে পেশী, স্নায়ু, ধমনী প্রভৃতি রূপ ধারণ করে।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জীবন-বিদ্যা-বিৎ পণ্ডিতগণ শরীরের কোষ ব্যূহই জীবনের নিদান বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, আনুবীক্ষণিক দর্শনের উন্নতির সহিত সেই মত পরিত্যক্ত হইয়া ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ কোষগর্ভস্থ বাইওপ্ল্যাজম্ই জীবনের বীজভূত বলিয়া নিরূপিত হয়।

অত্যন্ত দৃষ্টি-দীপক অনুবীক্ষণ সহ জীব

দেহের অন্তর্দ্দেশ নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে, দেহ যন্ত্রের যাবতীয় সংবিদ্‌শীল অংশেই বাইওপ্ল্যাজম্ ব্যাপ্ত। এক বর্গ ইঞ্চির পাঁচশত ভাগের এক ভাগেও একটী বাইওপ্ল্যাজমের অভাব নাই। এই জৈবনিক বীজাণু প্রতি অঙ্গেই অনুস্যূত রহিয়াছে।

১। বাইওপ্ল্যাজমই এক মাত্র চৈতন্যের আবাসক্ষেত্র।

২। শরীরের প্রত্যেক অংশই বাইওপ্ল্যাজম্ প্রভাবে সংবিদ্‌শীল এবং যান্ত্রিক বিধান যুক্ত বা Organized অর্থাৎ কোষময় হইয়া থাকে।

যান্ত্রিক বিধান-বিহীন পদার্থের সহিত যান্ত্রিক বিধান যুক্ত পদার্থের সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্য বর্ত্তমান। চৈতন্যের ক্রিয়া প্রভাবে পদার্থে যান্ত্রিক বিধান-যুক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। যে পদার্থে চৈতন্যের সঞ্চরণ বর্ত্তমান আছে, অথবা ছিল, তাহা তদিতর পদার্থ হইতে এই লক্ষণ দ্বারাই প্রভিন্ন হইয়া থাকে। শম্বুকে কিম্বা শঙ্খের বহিরাবরণ যদিও সংবিদশীল নহে, কিন্তু উহা কৌষিক অর্থাৎ যান্ত্রিক বিধান যুক্ত, যে হেতুক একদিন বাইও প্ল্যাজম্ রূপে সংবিদ্‌শীল ছিল। এক খণ্ড প্রস্তর অথবা লৌহ এবং শঙ্খের বহিরাবরণ, ইহাদের সকলই চৈতন্য সঞ্চার-হীন, তথাপি পার্থক্য এই যে, প্রস্তর ও লৌহখণ্ডে যান্ত্রিক বিধানের চিহ্ন মাত্রও নাই, কিন্তু শঙ্খাবরণ সম্পূর্ণ যন্ত্রবিধান সমন্বিত। এক খণ্ড কাষ্ঠের সহিতও লৌহ পাষাণের সেই প্রভেদ। কাষ্ঠ খণ্ড কোন দিন, সজীব ছিল, কিন্তু লৌহ ও পাষাণ কস্মিন কালে চৈতন্যের ক্রিয়া-পরতন্ত্র হয় নাই।

তোমার শরীরের মাংস, পেশী, শিরা, স্নায়ু এবং অস্থি প্রভৃতির প্রতি পরমাণুই বাইওপ্ল্যাজমের বিকার। তজ্জন্য সর্ব্বাঙ্গই যান্ত্রিক বিধান যুক্ত।

১। কৌষিক বিধানের প্রতি কেন্দ্রেই বাইওপ্ল্যাজম্ অবস্থিত।

২। বাইওপ্ল্যাজমের পরিপোষক পদার্থ অকৌষিক (Inorganic)।

৩। এই অকৌষিক এবং নির্জ্জীব পদার্থ, বাইওপ্ল্যাজম্ কর্ত্তৃক মুহূর্ত্ত মধ্যেই চেতনাত্মক রূপে পরিণত হয়। চৈতন্যাভাস বর্জ্জিত অন্নরসের স্রোত কোষ গর্ত্তে প্রবেশ করিল, আর জীবন পাইল। কি অলৌকিক ব্যাপার অনুবীক্ষণ সংলগ্ন নেত্রে পাঠক! একবার চাহিয়া দেখ, অতি ক্ষুদ্র, স্বচ্ছ, পিচ্ছিল, অবয়ব-হীন ঐ জীবনাণু কেমন সঞ্চরণশীল! পোষক উপাদান আত্মসাৎ করিয়া ক্রমশঃই উহা বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিতেছ না? বৃদ্ধি পাইতে পাইতে নিমেষ মধ্যেই আবার দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িল! সেই খণ্ডীভূত বাইওপ্ল্যাজম্ পুনরায় অন্নরসে পরিপুষ্ট হইয়া আবার খণ্ডিত হইল!

৪। প্রত্যেক বাইওপ্ল্যাজমই পূর্ব্ববর্ত্তী বাইওপ্ল্যাজম্ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৫। একটী বাইওপ্ল্যাজম্ হইতে এরূপে অসংখ্য বাইওপ্ল্যাজমের উৎপত্তি হয়।

৬। প্রত্যেক বাইওপ্ল্যাজমই মৌলিক বাইওপ্ল্যাজমের ন্যায় শক্তি সম্পন্ন।

৭। একবার মৃত হইলে বাইওপ্ল্যাজম্ আর পুনরুজ্জীবিত হয় না।

জড় পদার্থ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চৈতন্যের উৎপত্তি যাঁহারা সমর্থন করেন, তাঁহারা মনে রাখিবেন যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দুইটী বাষ্প (অক্সিজেন ও হাইড্রজেন) সংশ্লিষ্ট করিয়া জল উৎপন্ন করা যায় এবং

বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় পুনর্ব্বার বাষ্প পৃথক্‌ভূত করা যায়। এই রূপ বিশ্লেষণ সংশ্লেষণে যতবার ইচ্ছা জলের বাষ্পীকরণ এবং বাষ্পদ্বয়ের জলীকরণ সংসাধিত হইতে পারে, কিন্তু একটী বাইওপ্ল্যাজম্ একবার বিনষ্ট হইলে কখনও কোন কৌশলে উহাকে উজ্জীবিত করা যায় না।

অনুবীক্ষণ তোমাকে অভ্রান্ত রূপে দেখাইয়া দিতেছে যে, বাইওপ্ল্যাজম্ স্পন্দন, সঞ্চরণ, স্ব সদৃশ জীবনাণুর উৎপাদন এবং স্নায়ু পেশী ধমনী শিরা ও অস্থি প্রভৃতির গঠন অদ্ভুত দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে সমর্থ।

তন্তুবায়ের বয়ন-প্রণালীর ন্যায় ঐ দেখ শরীরস্থ বাইওপ্ল্যাজমপুঞ্জ আশ্চর্য্য কৌশলে কোথাও পেশী, কোথাও স্নায়ু, কোথাও শিরা, কোথাও কঙ্কাল বিচিত্র শৃঙ্খলার সহিত নির্ম্মাণ করিয়া সতত ক্ষয় শীল দেহের ক্ষতিপূরণ করিতেছে!

বাইওপ্ল্যাজমের এই সকল কার্য্যে অভ্রান্ত জ্ঞানশক্তি দেদীপ্যমান। জীবনিবহের মাতৃজরায়ু, ডিম্ব এবং বীজকোষ হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত বাইওপ্ল্যাজমের প্রতি কার্য্য অলৌকিক জ্ঞান ও ভবিতব্যভেদিনী দৃষ্টির সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। চিত্র বা প্রতিমূর্ত্তি যেরূপ চিত্রকর ও কুলালের পূর্ব্বকল্পিত মানসচিত্রের আদর্শে চিত্রিত ও সংগঠিত হইয়া থাকে, প্রাণীপুঞ্জের দেহ গঠনেও বাইওপ্ল্যাজম সেইরূপ এক অলক্ষিত মহামনীষী চিত্রকরের মানসচিত্রানুরূপ কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। বাইওপ্ল্যাজমের রচনা চিন্তা করিতে গেলে বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া যায়।

কোন পক্ষীর অচির-প্রসূত একটী ডিম্ব ভগ্ন করিয়া দেখ, কতকগুলি আকৃতিহীন পদার্থ মাত্র দেখিতে পাইবে। চারি পাঁচ দিবস পর সেই পাখীর একই সময়ে প্রসূত আর একটী ডিম্ব ভাঙ্গিয়া দেখ কত পরিবর্ত্তন!! সেই পিচ্ছিল পদার্থগুলি ঘনীভূত হইয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, চক্ষু, পক্ষ, পদ, প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন বিহঙ্গরূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনও অবয়বের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় নাই।

জড়বাদিন্! বলিতে পার ঐ পক্ষীশাবক কাহার গঠিত? তুমি বলিবে জড়শক্তির। কিন্তু একটী কথা তোমার নিকট জিজ্ঞাস্য, যে সকল ইন্দ্রিয়গ্রামে সমন্বিত হইয়া বিহগ-প্রণ গঠিত হইতেছিল, তাহার ব্যবহার বা কার্য্য কি ডিম্বগর্ভে চলিতেছিল? নিশ্চয়ই না। তবে কি উহার ভবিষ্য প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত চক্ষু কর্ণাদি অভিব্যক্ত হইতেছিল? বোধ হয়, তাহাই তোমার স্বীকার্য্য। তোমার জড়শক্তি কি ভবিষ্যতের প্রয়োজন বুঝিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম? জানি না, ইহার উত্তর তুমি কি দিবে। কিন্তু নিশ্চিতই জানিও, মননজ্ঞানাত্মিকা পরিণামদর্শী চৈতন্যশক্তির কার্য্য ভিন্ন জড় পদার্থের ইচ্ছা জ্ঞানহীনা অন্ধশক্তি দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। বাইওপ্ল্যাজমের অন্তর্গর্ভে লুক্কায়িত থাকিয়া সেই জ্ঞানশক্তিই এই সমস্ত রঙ্গাভিনয় করিয়া থাকেন।

আর একটী বিস্ময়জনক কথা শ্রবণ কর। রাসায়নিক পরীক্ষায় ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণীত হইয়াছে যে, সকশেরুক, অকশেরুকাদি সমস্ত প্রাণীর এবং দ্বিখণ্ডবীজী, অখণ্ডবীজী প্রভৃতি সমুদয় উদ্ভিজ্জের বাইওপ্ল্যাজমই ঠিক এক উপাদানে নির্ম্মিত। সদৃশ গুণযুক্ত পদার্থের ক্রিয়া সর্ব্বত্রই সদৃশরূপ। কিন্তু বলিতে পার, একটী চটক পক্ষীর বাইওপ্ল্যাজম হইতে একটী গৃধ্র উৎপন্ন হয় না

কেন? যদি জড়পদার্থ-নিষ্ঠ গুণেই জীবদেহ গঠিত হইত, তবে এক ঔপাদানিক পদার্থ হইতে অসংখ্যজাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি হইত না। তাহা যখন হয়,তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে,স্বাধীন ইচ্ছাবৃত্তিসম্পন্ন এক অজড়শক্তির হস্তে, কুলালের হস্তে একই মৃত্তিকায় বিচিত্র বিচিত্র প্রতিরূপ বিনির্ম্মিত হওয়ার ন্যায়;—বাইওপ্লাজম দ্বারা অসংখ্য আকৃতি প্রকৃতির জীবদেহ গঠিত হইতেছে। শিখণ্ডী, পেচক, সারমেয়, সিংহ, পতঙ্গ, ভুজঙ্গ, ভিন্তিড়ি তমালাদি বিচিত্র এবং বিসদৃশ প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ সেই একই হস্তের কারুকার্য্য। সেই অলক্ষিত শক্তির নিয়মেই বাইওপ্লাজম পরিচালিত এবং তদ্বিকার শরীর বিনাশশীল,কিন্তু সেই শাশ্বতী শক্তি অথবা আত্মা অক্ষয়, অব্যয়, অছেদ্য, অভেদ্য, অশোষ্য এবং অপরিবর্ত্তনীয়। ইহার ক্রিয়া যত দিন বাইওপ্লাজমে বর্ত্তমান থাকে, ততদিনই জীবন ইহার এক মাত্র Animating principle. এখানে অবশ্যই বলা উচিত যে, কেবল মাত্র আত্মার শক্তিতে বাইওপ্লাজামের-কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সাধিত হয় না। বাইওপ্লাজমের কার্য্য কিয়ৎপরিমাণে ভৌতিক পদার্থের উপরও নির্ভরশীল। নাবিক যেরূপ বহিত্র চালনায় কর্ণ, অনুকূল স্রোত ও বাতাসের সহায়তার উপর নির্ভর করে, আত্মাও তদ্রূপ বাইওপ্লাজমের কার্য্য সাধনে ভূত পঞ্চকের মুখাপেক্ষী। আত্মা নাবিক স্থানীয়।

কোন কোন সজীব পদার্থের প্রাণনক্রিয়া অবস্থা বিশেষে কিছু কালের জন্য অব্যক্ত ও স্থগিত থাকিতে দেখা যায়। জৈবনিক ক্রিয়ার অনুকূলতাসাধক এবং সন্দীপক কারণ অভাবেই ঐ রূপ ঘটিয়া থাকে। অনেক উদ্ভিজ্জের বীজ চৈতন্যের ক্রিয়া শক্তি প্রভাবে শত শত বৎসর সজীব থাকিতে পারে; কিন্তু ভৌতিক পদার্থের সাহায্য অভাবে অর্থাৎ মৃত্তিকা জলাদির বিহীনতায় ব্যক্ত বা উদ্ভিন্ন হইতে পারেনা এবং প্রাণনক্রিয়াও যথাবিধানে চলে না। মণ্ডুকাদি প্রাণীও, ভৌতিক শক্তির অনুকূলতা অভাবে সজীব অথচ জৈবনিক ক্রিয়া রহিত হইয়া নিশ্চেষ্ট অবস্থায় বাস করে। এ সকল স্থলে একাকী আত্মার শক্তিতে বাইওপ্লাজমের কার্য্য চলিতে পারে না। চৈতন্য—শক্তির সহিত ভৌতিক শক্তির পরিণয় হইলেই জৈবনিক ক্রিয়া চলিয়া থাকে।

আত্মার জ্ঞান শক্তি ভৌতিক শক্তি নিরপেক্ষ; কিন্তু জড় জগতের কার্য্য সাধন করিতে হইলে উহাকে জড় পদার্থের সহিত উদ্বাহ সূত্রে বদ্ধ হইতে হয়। জড় পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও অর্থাৎ দেহাবসানেও আত্মার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু জড় জগতের উপর প্রভাব থাকে না।

মনস্তত্ব সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই। মন আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; সুতরাং তাহার আলোচনা অন্য প্রবন্ধের বিষয়ীভূত।

শ্রীগুরুপ্রসন্ন সোম।

আত্ম বা নিগূঢ় বৈষ্ণব দর্শন। (৩)

৩৫। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মস্থ বা স্বরূপস্থ হইবার পূর্ব্বে, বিষয়ীর অন্তরে বৈরাগ্যজাত প্রকৃত আত্ম-চিন্তার—আত্ম-প্রশ্নের কোন না কোনরূপ স্ফুরণ হইতে থাকে। এই চিন্তা

গাঢ় পরিপাক প্রাপ্ত হইলে নিম্ন-প্রদর্শিত কোনরূপ আকারে বিকশিত হইয়া থাকে,—এইত আমি যখন যে বিষয়ের সঙ্গে মনাদি ইন্দ্রিয়যোগে মিলিত হইতেছি, তখনই আমি তদাকারে পরিণত হইয়া—সেই ইন্দ্রিয়যুক্ত বিষয়াকারে আকারিত হইয়া,—আত্ম দৃষ্টি-বিমুখ অবস্থায় বিষয়স্রোতে নীয়মান হইয়া ক্রমাগত বিষয়ান্তরের প্রতি ধাবিত হইতেছি এবং নানা ভাব ও প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্ররূপ-রঙ্গভূমিতে কত প্রকার অভিনয় প্রদর্শন করিতেছি। সেই বিষয়পুঞ্জ আমাকে আমার কোন পরিচয় প্রদান করিল না, আমার কোন স্বরূপ দেখিতে দিল না; অথচ তাহারা সর্ব্বদাই আমাকে আত্মসাৎ করিয়া লইতেছে। তাহারা যেন চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা আমার জ্ঞানানুরাগাদি যথা সর্ব্বস্ব সবলে অধিকার করিয়া লইতেছে। আমি ঠিক যেন তাহাদের ক্রীড়নক সামগ্রী—তাহাদের ক্রীত বস্তু—তাহারা যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে কখনও কাহার নিকট বিক্রয় করিতেছে, কখনও কাহারও নিকট হইতে ক্রয় করিতেছে—আমি নিজের কেহই নই। ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলে, আমার নিজের অস্তিত্ব, আমি প্রকারান্তরে বুঝিতে পারি। আমি এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি যে, আমি একজন আছি; নতুবা এই জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছাদি কাহার? শব্দ স্পর্শাদি, রূপ, রস, গন্ধাদির অনুভূতি হয় কার? কিন্তু আমি কোন ক্রমে আমার নিজেকে আমার নিজের বিজ্ঞেয় বা জ্ঞান দৃষ্টির বিষয়ীভূত করিতে পারিতেছি না। আমি কি কেহই নই, কেবল মাত্র চতুর্দ্দিকস্থ বিষয়পুঞ্জের থেলিবার খেলানা? আমার অন্তরে স্বাধীনতার অভিমান আছে, কিন্তু সে স্বাধীনতা কি কলুর ঘানিযন্ত্রযুক্ত বলীবর্দ্দের স্বাধীনতার অনুরূপ নয়? আমি যদি আমার আত্ম-স্বরূপকে আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার জ্ঞানের অভিমানের মূল্য কি? তাহা কি অন্তঃসারশূন্য বৃথা অভিমান নহে? আত্মদর্শনাভাবে আমি নিজে কে, আমি নিজে কার, আর কেই বা আমার, এ সকল স্পষ্ট কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! আমি যখন আমার আত্ম স্বরূপকে জ্ঞানগম্য করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে আমার ঈশ্বরকে—আমার পরমাত্মাকে আমি কেমন করিয়া আমার জ্ঞান দৃষ্টির বিষয়ীভূত করিব? ওটী না হইলে এটী ত কখনই সম্ভাবিত হইতে পারে না। আমার মানব-জন্ম বুঝি বৃথাই হইল? যাহারা সর্ব্বদাই আমাকে আত্ম-সাৎ করিতেছে, তাহাদের নিকট আমার মনের ভাব, আমার আত্ম প্রশ্ন প্রকাশ করিলে—আমার প্রকৃত পরিচয় চাহিলে, তাহারা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া প্রস্থান করে। স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধবাদি যাহারা সর্ব্বদাই আমার প্রীতি বা মোহ উৎপাদন করিতেছে, তাহারাও আমার আত্ম প্রশ্ন শুনিলে, "ও আবার কি কথা," বলিয়া বিস্ময়াপন্ন হয় এবং আমাকে মতিচ্ছন্ন মনে করে। আমি যে কথা বলি, তাহারা আমার সে ভাষাও ভাব কিছুই বুঝিতে পারে না। এবং তজ্জন্য তাহাকে 'উন্মাদ-প্রলাপ' বলিয়া মনে করে। এই সংসারে আমি অনুক্ষণ তুমি হইয়া আত্ম বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়া যাইতেছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন তুমিও স্বচ্ছ দর্পণ হইয়া আমাকে আত্ম-সাক্ষাৎকার স্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইল না। এই আদ্যন্ত-বিহীন বিষয়-রাজ্যের মধ্যে এমন কি কোন নির্ম্মল বিষয় নাই, যাহার সঙ্গে মিলিলে

যাহার স্বরূপাকারে পরিণত হইলে, আমার স্বকীয় স্বরূপ আমার দৃষ্টি পথের অতিথি হইবে? আমি ইষ্টজ্ঞানে এতদিন যে ঈশ্বরকে উপাসনাদি করিতেছি, তাঁহাকে অনুমান ভিন্ন প্রকৃত জ্ঞানের অভিজ্ঞেয় বিষয় করিতে পারি কৈ? জ্ঞানের বিষয় করিবা মাত্র, আমি ঈশ্বরের স্বরূপাকারে নিশ্চয়ইত পরিণত ও আকারিত হইব—নিশ্চয়ইত মহান্ বিরাট্ পুরুষ, ও শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত হইয়া দাঁড়াইব। ঈশ্বর দর্শনের পূর্ব্বেত মানুষকে তদাকারে পরিণত হইতে হইবে, নচেৎ ঈশ্বর দর্শনের কোন অর্থই ত হয় না। কোন মানুষ কি এরূপ হইতে পারিয়াছে?—কোন মানুষ কি ঈশ্বরাকারে পরিণত হইয়া ঈশ্বরস্বরূপ দর্শন করিয়াছে? কিন্তু ঈশ্বরাকারে পরিণত হইয়া ঈশ্বর দর্শন করিবে কে? তাহা অবশ্যই আমাদের মনবুদ্ধি বা অন্তঃকরণ নহে। বোধ হয়, আত্মাই ঈশ্বরকে—পরমাত্মাকে দর্শন করে; তবে আত্ম-স্বরূপ অগ্রেই প্রস্ফুটিত হওয়া চাই। সাধুরা বলেন,—শাস্ত্রে বলে আত্ম-তত্ত্বের পর পরমাত্মাতত্ত্ব। এ কথা অসত্য বা অগ্রাহ্য নহে। আমাদের ধারণার অসাধ্যতা-হেতু পরমাত্ম-তত্ত্ব নিশ্চয়ই একেবারে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না; একেবারে বিষয়ীকে তদাকারে পরিণত করিয়া, তাহার নিকট পরমাত্ম স্বরূপ উদিত হইতে পারে না। অগ্রে আত্মতত্ত্বের স্ফুরণ হওয়া তজ্জন্য আবশ্যক। নচেৎ যিনি ইন্দ্রিয়াদি মনোবুদ্ধির অপ্রাপ্য ও অবিষয়ীভূত, সেই ইন্দ্রিয়াদি মনোবুদ্ধি কিরূপে—কোন স্থানে তাঁহাকে ধারণ করিয়া, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবে? ইন্দ্রিয়গ্রামের মধ্যে সে স্বচ্ছ নির্ম্মল দর্পণ কোথা; যেখানে তাহার প্রতিস্বরূপ অঙ্কিত হইলে—যেখানে তাঁহার ফটো উঠিলে তিনি আমাদিগকে একেবারে স্বকীয় পরমাত্ম স্বরূপে পরিণত করিয়া, আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবেন? আপাততঃ সেরূপ নির্ম্মল দর্পণ ত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির রাজ্য-মধ্যে কোথাও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। কিন্তু আবার সাধু সজ্জনেরা একবাক্যে ঈশ্বর দর্শনের সম্ভাবনার কথা বলেন। বুঝিতে পারি না, যিনি নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ, তিনি কিরূপে মানুষকে তাঁহার অতীন্দ্রিয় স্বরূপের জ্ঞানে তাহাকে সমর্থ করেন? যেমন মানুষের ইন্দ্রিয় বৃত্তির স্ফূর্ত্তি সম্পাদিত হইয়া, তাহার বহির্বিষয়ের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তেমনি কি কোন অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির উৎপত্তি হইয়া, সেই ইন্দ্রিয়াতীত পরমবস্তু সেই নবজাতীয় ইন্দ্রিয়-গ্রামের স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া, আমাদের জ্ঞানের অধিগম্য হন? এইরূপে কি আত্মস্বরূপ ও পরমাত্ম-স্বরূপ মানুষের দৃষ্টিপথগম্য হইয়া থাকে? কোন বিশেষ পন্থানুসারী হইয়া সাধন ভজনাদি দ্বারা এরূপ অভিনব অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়গ্রাম স্ফূর্ত্তি হওয়া, নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। কোন বিষয়ের সঙ্গে একজাতীয় বা সমশ্রেণীস্থ না হইলে তাহার স্বরূপোপলব্ধি হয় না, এ কথা প্রসিদ্ধ। এইজন্যই বুঝি, বহির্ব্বিষয় বিনির্ম্মিত অনাত্ম ইন্দ্রিয়গ্রামে আমরা শুদ্ধ তজ্জাতীয় বহির্ব্বিষয়ই উপলব্ধি করি। তজ্জন্যই বোধ হয় অতীন্দ্রিয় মনাতীত বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্য অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়গ্রাম স্ফূর্ত্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। এইজন্যই বুঝি শাস্ত্রে বলে, নবজীবন লাভ না হইলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। পুরাতন জীবনে পুরাতন ইন্দ্রিয়-

গ্রামে ঈশ্বরের লাভ অসম্ভব। জ্ঞাল যাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন বলেন, তাঁহাদের নব ইন্দ্রিয়গ্রাম স্ফূর্ত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুভব হয় না, তাঁহাদের বাহ্য ব্যবহার দেখিলে ঈশ্বরের সঙ্গে তন্ময়ত্ব লাভ হইয়া, আত্ম ও পরমাত্ম দর্শন হইয়াছে, তাহা ত কোন ক্রমেই অনুমানসিদ্ধ হয় না। জগতের সামান্য সুন্দর মনোজ্ঞ বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ হইলে মানুষ অনেক সময় এমন আসক্ত ও অনুরক্ত হইয়া পড়ে, তাহার যে মোহশৃঙ্খল হইতে কোন ক্রমেই সহজে আপনাকে স্বতন্ত্র করিতে শক্ত হয় না; সুতরাং যিনি সকল সৌন্দর্য্যের নিদান—পরম উপাদেয়, পরম নিরঞ্জন ও পরম সারাৎসার পদার্থ, তাঁহাকে দৃষ্টিপথের বিষয়ীভূতরূপে প্রাপ্ত হইলে, মানুষের অবশ্যই এমন ঐকান্তিক আসক্তি জন্মিবে, যে, তাহাতে বিষয়মোহের স্থান থাকিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। যখন জগতের সামান্য বিষয়ও কখনও কখনও এমন গাঢ়রূপে আমাদের অন্তরে অঙ্কিত হইয়া যায় যে, সহজে তাহার মোচন হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে,তখন সেই সারাৎসার নিত্যবস্তু,জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইলে, তাহা যে অবশ্যই তাহাতে সহস্র সহস্রগুণে গাঁথিয়া, বিঁধিয়া, লাগিয়া, জ্ঞানাঙ্গে নিত্যধন হইয়া থাকিবে, তাহাতে আর সংশয় কি? ঈশ্বরদর্শীর পক্ষে বিষয়ান্তরের মোহে ও প্রলোভনে পতিত হওয়া এই জন্য নিতান্ত অসম্ভব। যে সমস্ত সাধুভক্ত, তাঁহার প্রেমে আত্মহারা হইয়াছেন,তাঁহাদের ঈশ্বরদর্শন ঘটনা, অবশ্য কখনই মিথ্যা কথা নহে। যদি বর্ত্তমান জ্ঞান-সহায় ইন্দ্রিয়গ্রামে, আত্ম ও পরমাত্ম দর্শনের কোন সম্ভাবনা না থাকে, তবে সাধুশাস্ত্রেরা অবশ্যই অন্য কোন উপায়ে অতীন্দ্রিয় কোন প্রকার নূতন ইন্দ্রিয়গ্রাম সম্পন্ন হইয়া আপনাদের আত্মস্বরূপ ও পরমাত্ম স্বরূপ দর্শনে কৃতার্থ হইয়া থাকেন সে উপায়টী কি? তাহার সন্ধান কে আমাদিগকে বলিয়া দিবে? এজন্য আর বৃথা চিন্তা করি কেন? সেই ঈশ্বরদর্শী সাধুরাই নিশ্চয়ই তাহার সন্ধান জানেন। উপায়জ্ঞ মাত্রেই অবশ্যই উপায় প্রদর্শনক্ষম হইবেন, সন্দেহ নাই। তবে, বোধ হয়, অবশ্যই তাঁহাদের সাক্ষাৎ কৃপা ও অনুগ্রহ লাভের অপেক্ষা করে। যাঁহারা কোন উপায় অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর স্বরূপের সঙ্গে তন্ময় হইয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও সঙ্গে তন্ময় হইতে পারিলে তাঁহার দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। এতদিন এ দিক সেদিক্—স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল "পর্ব্বত পাথর ব্যোমে" যে সুনির্ম্মল স্বচ্ছ দর্পণ অন্বেষণ করিতেছি, তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত সাধু সজ্জন ভিন্ন সেই দর্পণ আর কেহই হইতে পারে না। তাইত সেই অবাঙ্মনস গোচর ঈশ্বরকে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিষয়ীভূত করিবার বৃথা চেষ্টা অপেক্ষা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত বা স্বরূপদর্শী সাধু শান্তদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া তদাকারে আকারিত হইয়া তাঁহাদের অন্তরঙ্গ অঙ্গীকার-করিয়া স্বরূপদর্শন চেষ্টা একমাত্র সুসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। অথবা উভয়বিধ পন্থার তুলনায় এই শেষোক্ত পন্থাকে অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য মনে হইলেও তাহাকে কেমন করিয়াই বা নিতান্ত সুসাধ্য বলিব? কোন সাধু বিশেষের সঙ্গে অন্তরে ঐক্য হইয়া তন্ময়ত্বজাত দিব্যচক্ষু লাভ কখনই নিতান্ত অনায়াস-সাধ্য নহে। নিতান্ত অনায়াস সাধ্য না হইলেও তজ্জন্য আমাকে ত নিতান্তই চেষ্টা পাইতে হইবে, নতুবা আমার অন্তরে এ দুর্নিবার আত্ম প্রশ্নের উদয় কেন?—আত্ম ও পরমাত্মতত্ত্ব লাভের

জন্য এ দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা কেন? কি জন্ম অন্তরে এই দুর্নিবার অনুরাগের উদ্দীপনা। এতাদৃশ অনুরাগ কি দরিদ্রের ধনাকাঙ্ক্ষার ন্যায় ব্যর্থ হইবার জন্য জন্মিয়াছে? 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' এইভাবে সৎসঙ্গে মিলিয়া পরমধন উপার্জ্জন করিতে হইবে। চিরকালইত সাধু সজ্জন, সাধু সজ্জনের অনুগত হইয়া অভীষ্টসিদ্ধ হইয়াছেন। ইহাত বেদান্তেরই উপদেশ যে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত,—সদ্গুরুসঙ্গ লাভ করিয়া প্রবোধিত হইবে।"নান্যঃপন্থা বিদ্যতে-অয়নায়।" যাহাদের অন্তরে,নিজ নিজ পরম সৌভাগ্য ও সুকৃতি বশতঃ কোন না কোন প্রকার বৈরাগ্যজাত আত্ম প্রশ্ন উদয় হয়, তাঁহারা যথা সময়ে এইরূপ কোন সৎসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, সদ্গুরু অন্বেষণে অনুরাগী হইয়া থাকেন।

৩৬। বিষয়ী এইরূপে আত্ম প্রশ্নের কোন প্রকার মীমাংসা করিয়া, আত্ম ও পরমাত্ম-তত্ত্ব লাভার্থী হয় এবং যথা কালে সদ্গুরুরূপ বিষয়াশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া, কৃতার্থোন্মুখ হইয়া থাকে। এই জন্য জ্ঞানের অনাত্ম প্রকোষ্ঠে ও অপর প্রকোষ্ঠদ্বয়ে এই উভয়-বিধ স্থলেই জ্ঞানোৎপত্তির নিয়ম প্রণালী সম্বন্ধে অনেক প্রভেদ আছে। জ্ঞানের অনাত্ম প্রকোষ্ঠে এই জ্ঞানের উদয় স্বভাবের ক্রমেই—সতঃই শুদ্ধ বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ও তদাকার প্রাপ্তি হইতেই—সহজেই—বিনা আত্ম প্রশ্নে—বিনা প্রযত্নে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে তজ্জন্য বিষয়ীর বিবেক ও বৈরাগ্য, বিষয় সন্নিধানে শিষ্যত্ব ও আনুগত্য স্বীকার, তৎ-সন্নিধানে কৃপাভিক্ষা ও তাহার আনুকূল্য প্রাপ্তি, এ সকল পৌর্ব্বাহ্লিক কোন আয়োজনের কিছুই প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ এই অনাত্ম প্রকোষ্ঠে বিষয়ীর এই জ্ঞান, কোন আয়োজন সাধন ও সাক্ষাৎ বিষয় কৃপাসাপেক্ষ নহে। এই অনাত্ম জাতীয় বিষয় জ্ঞান, বিনা আয়াসেই—বিনা প্রযত্নেই, বিষয় পুঞ্জের বহিরঙ্গে, ইন্দ্রিয় সংযোগ মাত্রই, ব্যবহারিক ভাবে বিষয়ীর তদাকারে পরিণতি-হেতু তন্মধ্যে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানের আত্ম বা পরমাত্ম-প্রকোষ্ঠে বিষয়ীর আত্ম বা পরমাত্ম জ্ঞান লাভ পূর্ব্বানুরূপ স্বভাবের ক্রমেই—স্বতঃই সম্পন্ন হইলেও, বিনা আয়াসে, বিনা আনুগত্যে, বিনা দেহ মনঃ প্রাণার্পণে, বিনা সাক্ষাৎ কৃপানুকূল্যে, সহজে সম্পন্ন হইবার নহে। এখানে বিষয়ীকে পূর্ব্বের প্রতিবিম্বে জাগরিত অহং অধ্যাস বা অহং ভ্রান্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া,—সেই প্রতিবিম্বিত সত্তার—জীব সত্তার জীবত্ব সমাধি গর্ভে সমাহিত করিয়া, আত্ম ও পরমাত্ম-তত্ত্ব যথানুক্রমে সম্পন্ন হইতে হইবে। এখানে যথাতত্ত্ব-সম্পন্ন বিষয়ের বাহ্যমূর্ত্তির প্রতি চাহিবা মাত্র তৎ বহিরঙ্গে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া, যথা-কার্য্য সিদ্ধি লভনীয় নহে। এখানে বিষয়ীকে যথা-কার্য্য-সিদ্ধির উদ্দেশে বিষয়ের অন্তরতম অন্তরঙ্গের সঙ্গে—তাহার পরা-প্রকৃতি-গত রাগ-ভাব ঘন, প্রেম-ঘন নিত্য নিরঞ্জন দেহের সঙ্গে মিলিত হইয়া—তন্ময় হইয়া তদাকারে পরিণত হইতে ও যথাকার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে; তবেই যথাযথতত্ত্ব-সম্পন্ন হইতে সাধ্য হইবে। তাহা তাদৃশ সহজ সাধ্য ও অনায়াস লভ্য নহে।

৩৭। এখানে দুইটী সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপারের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। বিষয়ীকে প্রথমতঃ পূর্ব্বকার সুসজ্জিত ঘর

ও সুপ্রতিষ্ঠিত সংসার নির্ম্মম ভাবে ভঙ্গ করিতে হইবে। পূর্ব্বকার অহং অধ্যাসে প্রবুদ্ধ জীবোপাধি জীবাত্মারূপ প্রতিবিম্বকে নিহত, নির্জ্জীব বা নিঃসত্ব করিয়া, তদঙ্গভাসিত মনোময়, অনাত্মময়, স্বকল্পিত সৃষ্টির তদবস্থাপন্ন অন্তঃ প্রলয় সম্পাদন পুরঃসর বিষয়ীকে প্রকৃত প্রস্থাবে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, ভজনে মরিয়া মরণান্তে নব জীবন লাভ করিতে হইবে। জ্ঞানের অনাত্ম প্রকোষ্ঠে এতাদৃশ কোন প্রকার ব্যাপারের প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। এইজন্য এখন এখানে ইহা সম্পূর্ণ একটী নূতন ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ এখানে বিষয়ীকে এখন যথাযথতত্ব সম্পন্ন হইবার উপযোগী সরাগ ভাব ঘন প্রেমঘন নিত্য নিরঞ্জন দেহ নির্ম্মাণ করিবার উপযুক্ত ভুরীয়-ঘন প্রকট উপকরণ সামগ্রীর আয়োজন করিতে হইবে, এবং যথাকালে সেই নিরঞ্জন দেহ, স্থূলাদি দেহাভ্যন্তরে, সুনির্ম্মিত হইলে, তাহাতে যথাযথ নিরঞ্জন ইন্দ্রিয়াদি সংস্থান সম্পাদন করিতে হইবে। ইহাই সদ্‌গুরু সাধুর সরূপত্ব বা তন্ময়ত্ব লাভ। ইহাই তাঁহার অন্তরতম নিরঞ্জন স্বরূপটী, তদাকারে পরিণতি হেতু নিজ দেহাভ্যন্তরে সংস্থান করা। ইহাই নিজের দেহমধ্যে ভাব ঘন নিত্য নিরঞ্জন দেবমন্দির বা দিব্য দেহের প্রতিষ্ঠাগম। জীবের ত্রিতাপক্লিষ্ট জ্বালাময় পাপময় জরায়ুজ দেহে নিরতিশয় সুকোমল পরম নিরঞ্জন ভগবৎ-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবার স্থলাভাব। সেখানে সেই তুরীয় পুষ্পের নিরঞ্জন পরানন্দঘন প্রকটাঙ্গ, কোন ক্রমেই তিষ্ঠিবার—দাঁড়াইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য ভগবানের প্রকট লীলাবিগ্রহ স্থাপনার্থে, এই মায়িক দেহত্রয় মধ্যে, নিত্য নিরঞ্জন দেব মন্দির পূর্ব্বাঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক ও অপরিহার্য্য। এই ভগবৎ-মন্দির বা ভগবদ্দেহ প্রতিষ্ঠাকে আমরা একটী নূতন ব্যাপার বলিয়া প্রতিপন্ন করিলাম। এটীকে নূতন ব্যাপার বলিবার কারণ এই যে, পূর্ব্বকার প্রতিবিম্বে প্রবোধিত জীবোপাধি বিষয়ীকে, যদিও বহু আয়োজনের পর, স্বকীয় আবাস্য স্থূলাদি দেহ, যথা বিধানে নির্ম্মাণ করিতে ও তাহাকে মনাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম সম্পন্ন করিতে হইয়াছে; কিন্তু তজ্জন্য যে তাহাকে ব্যাপক কাল অসংখ্য দক্ষযজ্ঞের সম্যক্ আয়োজন করিতে হইয়াছে, তাহা বিষয়ীর সাক্ষাৎ জ্ঞাতসারে সম্পাদিত না হওয়াতে তাহার "না প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞং" সমাধির অবস্থায় তাহা সংসিদ্ধ হওয়াতে; এক্ষণে তাহার ব্যবহারিক স্মরণ পথে উপস্থিত নাই। এজন্য এখনকার সরাগ ভাবময় নিত্য নিরঞ্জন দেহ গঠন কার্য্য, দেহাভ্যন্তরে দিব্য মন্দির-প্রতিষ্ঠা কার্য্য,—বিষয়ীর পক্ষে সম্পূর্ণ একটী নূতন ব্যাপার বলিয়া, স্বীকার ও অবধারণা করিতেই হইবে। কেননা এখন বিষয়ীকে এক প্রকার সজ্ঞানে ও সাক্ষাৎ জ্ঞাতসারে, এক প্রকার স্বচেষ্টায় এত আয়োজনের যোজনা করিয়া, স্বকীয় মৃত্যু ফাঁস স্বহস্তে গলদেশে টানিয়া দিয়া, স্বকৃত প্রতিবিম্বিত স্বরূপের স্বযত্নকৃত বিয়োগ সম্পাদন করিয়া, তবে তাহাকে আত্ম ও পরমাত্ম তত্ব সম্পন্ন হইতে হইবে।

৩৮। তাই এখন এই স্বরূপজ্ঞান-ভ্রষ্ট ভ্রান্ত সংস্কার দিশাহারা প্রতিবিম্বাভিমানী বিষয়ীর অন্তরে প্রকৃত আত্ম-প্রশ্নের স্ফূর্ত্তি হওয়া চাই, প্রকৃত বিবেক ও বৈরাগ্যের উদয় হওয়া চাই, আত্ম ও পরমাত্ম তত্ব লাভের প্রকৃত পথ পাইবার জন্য ঐকান্তিকী

ব্যাকুলতার উদ্বোধন হওয়া চাই, ঐহিকের বিষয় বিভব মান সম্ভ্রম, সুখৈশ্বর্য্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মে ঔদাস্য বুদ্ধির উদ্গম হওয়া চাই; প্রকৃত তত্ত্বদর্শী সদ্‌গুরুর প্রয়োজনীয়তা প্রকৃত প্রস্তাবে উপলব্ধি হওয়া চাই; গুরু অন্বেষণে ঐকান্তিকতা চাই; সুকৃতি ও সৌভাগ্য চাই; তবেই চৈত্যকৃপাপথবর্ত্তী সদ্‌গুরুর সঙ্গে শুভ সম্মিলন হইবে। তবেই অন্তরের অন্তরতম অন্তরঙ্গ নিরঞ্জন বিষয়রত্ন তাঁহার অজস্র কৃপাগুণে, তাহার বাহিরে ব্যবহারিক প্রকট ও মূর্ত্তিমান ভাবে তাহাকে সাক্ষাৎ দর্শন ও আশ্রয় দিবেন। তদনন্তর সেই মঙ্গলময় আশ্রয় প্রাপ্তির পর, বিষয়ীর আবার প্রকৃত প্রস্তাবে শিষ্যত্ব ও আনুগত্যের স্থিরতা চাই, অবলম্বিত গুরুদেহের উপর ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ভক্তি ও আস্থা চাই; তাহার নিদেশ মত নিয়ম ও প্রক্রিয়া, সাধন ও ভজনের অনুবর্ত্তী হওয়া চাই; "পরমার্থ সাধন ও ঐহিক ব্যবহার" (ক) যাবতীয় সম্বন্ধে তাঁহার আজ্ঞা অকুণ্ঠিত ও অকুঞ্চিত চিত্তে শিরোধার্য্য করা চাই; মনোমুখিন্ ও বহির্ম্মুখিন ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অহরহঃ অন্তর্ম্মুখী ও গুরুমুখী হইয়া থাকা চাই; গুরুদেহের উপর ঐকান্তিকী তদেকানুভূতি ও প্রীতি চাই, তাহার সৎ-সংসর্গবাসী ও অহরহঃ তাঁহার স্নেহময়ী দৃষ্টির পথবর্ত্তী ও বিষয়ীভূত হইয়া থাকা চাই, গুরুর সেবা ও শুশ্রূষায় প্রবল অনুরাগ চাই, একান্তদীন ও অধম (Negative) ভাবে গুরুর শক্তি ও প্রভাবের নিতান্ত অধীন হওয়া চাই; সেই বাহ্যদৃষ্টিভূত অন্তরের ধনকে বাহিরে—দূরে না রাখিয়া ভক্তি ভরে অহরহঃ অন্তরে সংস্থান রাখা চাই; অন্তরে লয় করা চাই; সাধু সঙ্গ, সাধু অনুরাগ, সাধুভক্তি ও সাধু-সেবা চাই; সদ্‌গুরু সাধু মহাজনের অজস্র সহজ কৃপা-স্রোত-পথে অহরহঃ অবস্থিত থাকা চাই; সর্ব্বদা নানা উপায়ে গুরু-কৃষ্ণ বৈষ্ণবের সন্তোষজাত সহজ আশীর্ব্বাদ লাভ করা চাই; তবেই জীয়ন্তে মরিয়া, এবং মরিয়া, ভজিয়া, সেই সগুদ্রু বা ব্রহ্মাত্মা সাধুরূপ নিরঞ্জন বিষয়-দর্পণে, বিষয়ী প্রকৃত আত্ম ও পরমাত্ম স্বরূপের যথানুক্রমে প্রকৃত দর্শন লাভ করিয়া থাকে। এইরূপে বিষয়ী স্বকীয় ব্যষ্টীভূত স্বরাট্ স্বরূপকে প্রথমে তাহার অভিনব, নিরঞ্জন, অন্তরিন্দ্রিয়ের, এবং তদনন্তর তাহার সমষ্টিভূত বিরাট অখণ্ড পরমাত্মা স্বরূপকে, সর্ব্বত্রে অভিনব, নিরঞ্জন, বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিয়া, পূর্ণকাম ও সিদ্ধার্থ হইয়া থাকে।

৩৯। জ্ঞানের প্রকোষ্ঠে যে আত্ম-স্বরূপ দর্শন হয়, সেখানে আত্ম-তত্ত্ব-লাভার্থী শিষ্যই বিষয়ী এবং আত্ম বা পরমাত্ম তত্ত্ব-সম্পন্ন সদ্‌গুরু বা সাধুই বিষয়। আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ—আত্মা সৃষ্টির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের পর পারে, ছায়াগম অনাত্ম জাতীয় ব্যবহারিক জগতের (Phenomenal universe এর) পরপারে সংস্থাপিত। এই আত্মাকে, এই ব্যবহারিক জগতের ক্ষেত্র হইতে, তাহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ দেখাইবার, সেই স্বরূপে তাহাকে উপনীত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার, প্রকট বিষয়ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের পরপারস্থ—আত্মস্থ হওয়া চাই। সৃষ্টির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্ব্বর্ত্তী অনাত্ম জাতীয় বিষয়, প্রতিবিম্বে আশ্রয়ীভূত, জীবাত্মার

(ক) পরমেষ্টি গুরুর আজ্ঞাবলম্বন করিয়া পরমার্থ সাধন ও ঐহিক ব্যবহার অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পথ্য প্রদান গ্রন্থের শেষাংশ দেখ।

জ্ঞানোৎপত্তির কারণ স্থূল হইতে পারে, কিন্তু সেই অনাত্ম জাতীয় বিষয়ের সঙ্গে, তদাকারত্ব প্রাপ্তি হেতু, সেই জাতীয় বিষয়ের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত ব্যষ্টি বা স্বরাট স্বরূপের আত্ম বা স্বরূপ-সাক্ষাৎকার করাইবার, কোন ক্ষমতা ও অধিকার নাই। যে নিরঞ্জন ভাবঘন দেহে,—যে অবিনশ্বর ব্রহ্ম-মন্দিরে সেই ব্রহ্মের স্বরাট্ আত্ম-স্বরূপ অনুভাত হইয়া থাকে, সৃষ্টির এই অনাত্ম জাতীয় অসার, নশ্বর বিষয় রাজ্যে, সেই ভাবঘন মন্দির বা দেহ নির্ম্মাণের, অবিনশ্বর প্রকট উপকরণ সামগ্রীর সম্ভাব বা সংস্থান নাই। বহির্জ্জগতের এই অনাত্ম বিষয় রাজ্যের, ইন্দ্রিয় গ্রামাভিমানী জীব রাজ্যের কুত্রাপি সেই নিরঞ্জন প্রকট উপকরণ সামগ্রীর আগম বা উৎপত্তি নাই। সেই অভিনব উপকরণ সামগ্রী তদতিরিক্ত স্থলে অন্বেষণ করিতে ও প্রাপ্ত হইতে হইবে। তাহা অবশ্যই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত বিষয় হইয়াও কায়স্থ থাকিবার প্রয়োজন, অতীন্দ্রিয় বিষয় হইয়াও ইন্দ্রিয় গ্রামস্থ থাকিবার প্রয়োজন,পারমার্থিক বিষয় হইয়াও ব্যাবহারিক ক্ষেত্রস্থ থাকিবার প্রয়োজন। এমন বিষয় ব্রহ্মাত্মা, ভগবদাত্মা, সদ্গুরু বা সাধু ভিন্ন আর কোন্ বিষয় হইতে পারে? বিষয়ীর আত্ম-স্বরূপ বিকাশোপযোগী মন্দির নির্ম্মাণের নিরঞ্জন উপকরণ সামগ্রী (আনন্দঘন চিৎ-ঘন অনুকণাপুঞ্জে) তদ্ভিন্ন আর কোন্ দেশে উৎপন্ন হইতে পারে? তদ্ভিন্ন আর কোন্ দেশ হইতে তাহার আগম নির্ব্বাহ সম্ভাবিতে পারে? যে বিষয় রত্নের সঙ্গে তদাকারত্ব হেতু বিষয়ীর স্বকীয় আত্ম-স্বরূপ, আত্ম-সমক্ষে স্ফূর্ত্তি লাভ করে; সে বিষয়রত্ন অবশ্যই সৃষ্টির মধ্যে ব্যাবহারিক-ভাবে থাকিয়াও সৃষ্টির অতীত প্রদেশে, পরা প্রকৃতির বরাঙ্গে, বিসদৃশ ও অপ্রকট উভয়বিধ পরিণামের নিত্য-অতীত ভাবঘন প্রেমঘন নিত্য নিরঞ্জন দেব মন্দিরে নিত্য নিরঞ্জন বিগ্রহ হইয়া অচ্যুত পদে বিরাজমান।

৪০। সাধু সজ্জনের অন্তরঙ্গ—ভাবাঙ্গ—যে নিত্য নিরঞ্জন উপাদানে নির্ম্মিত হয়, এখানে তাহা বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব। এক কথায়, জাগ্রত বা প্রকট পরাপ্রকৃতি বা পরাশক্তি বিবিধ প্রকারে ঘনীভূত ও পরিপাক্ প্রাপ্ত হইয়া,সেই অপরূপ উপাদান উৎপাদন করে। সদৃশ পরিণামিনী প্রকৃতির বরাঙ্গ জাগ্রত পুরুষ প্রভাবে, ওতঃপ্রোত ভাবে—অভিনব ভাবে, জীব-দেহাভ্যন্তরে বিবিধ প্রকার পরিপাক ও প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া, তৎসঙ্গে ও তদঙ্গে সেই উপাদান একাত্মক ভাবে পরিণত। সেই নিরঞ্জন দেহ "অন্তঃ-কৃষ্ণ বহিঃগৌর"—তাহার অন্তর চিদ্‌ঘন, বাহির আনন্দঘন। সেই দেহ, একাধারে একাকারে অপরূপ সমন্বয়ে, যুগল-তত্ত্ব, এক অদ্বৈত তত্ত্বে ঘন পরিপাক্-প্রাপ্ত ও সুবিমিশ্রিত। সমাধি-সমুদ্র হইতে ব্যাবহারিক ভাবে উত্থিত, জাগরিত এবং "প্রাপ্তবরাণ্" নিবোধিত অথবা জাগ্রৎ-কুণ্ডলিনীক প্রকট পুরুষের অঙ্গ-স্পর্শ প্রাপ্ত না হইলে, এই পরাপ্রকৃতি কুত্রাপি কখনও জাগ্রত হন না। পুরাণে বর্ণিত আছে, যত দিন শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শ প্রাপ্ত না হইয়াছিলেন, ততদিন তিনি চক্ষুরুন্মীলন করেন নাই, নয়নযুগল বিস্ফারিত করিয়া চান নাই, ততদিন আর কিছুই দেখেন নাই। এই পৌরাণিক আখ্যায়িকা পরাপ্রকৃতির জাগ্রতাবস্থা প্রাপ্তির উপমা বা উদাহরণ-

হইয়া, সেই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। সমাধি-মগ্ন অব্যক্ত অপ্রকট পুরুষের সংস্পর্শে মূল পরমা প্রকৃতি তদবস্থাপন্ন সমাধি সমন্বিত ও তদেকাত্ম হইয়া যায়। ইহাই অন্তরাত্মা-রূপে প্রতি জনের, প্রতি ব্যষ্টির এবং ব্যষ্টি-পুঞ্জের সমষ্টিভূত স্বরূপের স্বতঃই অন্তরস্থ আছেন। এখানে—এই সমাধির অবস্থায় তদীয় পুরুষ সংসর্গে প্রকৃতি যদিও তদেকাত্ম হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার জাগ্রত প্রকট অবস্থায় উপনীত হইবার স্বাভাবিক কোন উপায় ও সম্ভাবনায় সম্ভাব নাই। বরঞ্চ সেই অপ্রকট সংস্পর্শে ব্যাপক কাল সংশ্রুত থাকিলে, সে প্রকৃতিতে যে-কিছু যদি-কিছু,বিসদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠ অংশ সংলিপ্ত থাকে, তাহা প্রকৃতির মূল দেহ হইতে মল-রূপে নির্ভিন্ন হইয়া সৃষ্টি সাধন ত্রিগুণাত্মক মলিন উপাদানে পরিণত হয়; কিন্তু তদ্দ্বারা কোনক্রমেই তাহা জাগ্রত ভাব লাভ করিতে সক্ষম হয় না। সদৃশ পরিণামিণী প্রকৃতির প্রকট বা জাগ্রতভাব প্রাপ্ত হইবার যন্ত্রই প্রস্ফুটিত জীব-দেহ। এরূপ দেহ যন্ত্র ভিন্ন অন্যত্র এই প্রকট বা জাগ্রতভাব স্ফুরিত হইতে কুত্রাপি কখনও সম্ভাবিত ও পরিদৃষ্ট হয় না। এই দেহ যন্ত্রাভ্যন্তরে এই প্রকট পুরুষের অঙ্গনিঃসৃত প্রকট প্রকৃতির অংশ বিশেষ মন্ত্রশক্তি প্রভাবে জীব-দেহের মূলা-ধারস্থ অপান-বায়ুযুক্ত হইলে, তাহা প্রকট জাগ্রত পুরুষ বা তদীয় দৃষ্টি বা মন্ত্র-শক্তি প্রভাবে অজপাযুক্ত ও সহজ অবিরাম অজস্র প্রণব-স্রোতে ও ঘন-নাদে পরিণত হইয়া, বিশেষ ভাবে ব্যাপক কাল বিমন্থিত, সঞ্চা-লিত এবং বিবিধ প্রকারে পরিপাক ও প্রগা-ঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে তাহা ভাব-দেহ গঠনোপযোগী সরাগ, পরানন্দ-ঘন, নিরঞ্জন উপকরণে পরিণত হয় এবং তাহা সুষুম্নাদি পথে জীব-দেহের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন ভাবাঙ্গ গঠন ও তাহাকে অভিনব ইন্দ্রিয়গ্রাম সম্পন্ন করে। এতা-দৃশ ঘনীভূত নিরঞ্জন উপকরণে ব্রহ্মাত্মা সাধু সজ্জনগণের ভাবাঙ্গ বিনির্ম্মিত হইয়া থাকে। সমধি সত্তা, সশর্করা সুমিষ্ট দুগ্ধ, ভাবাঙ্গের নিরঞ্জন উপকরণ সশর্করা সুমিষ্ট ঘনক্ষীর। তরল দুগ্ধে কোন গঠন কার্য্য হয় না, কিন্তু ক্ষীরের ঘনতা প্রযুক্ত খাদ্য সামগ্রীর গঠন হইয়া থাকে। এই নিরঞ্জন উপকরণের স্বরূপ-গত স্বভাব-সিদ্ধ প্রগাঢ়তা হেতু পুরাতন অ-প্রকট অব্যক্ত সমাধি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হই-বার বা কোন প্রকার বিসদৃশ বিজাতীয় পরিণাম প্রাপ্ত হইবার দুই দিকের দুইপথ নিত্যকালের জন্য অবরুদ্ধ। দুগ্ধ যেরূপ অগ্নিপাকে যথোচিত ঘনীভূত ও প্রগাঢ় হইয়া ক্ষীরত্বে পরিণত হইলে, তাহা পুনরায় দুগ্ধা-কারে প্রত্যাবৃত্ত এবং দধি তক্রাদিতে বিকৃতি প্রাপ্ত হইবার দুইপথ বন্ধ হয়, ইহা তদ্রূপ। ইহাই সাধু সজ্জনগণের ভাবঘন চিন্ময় অন্তরঙ্গ ;—এই অন্তরঙ্গেই তাহাদের অন্তরস্থ নিত্য প্রকটলীলা বিগ্রহ সংস্থাপিত। এই বিগ্রহ হইতে নিত্য অব্যয়,নিত্য অক্ষয়, নিত্য অচ্যুত, নব নব লীলা বিগ্রহ জৈবিক দেহাভ্যন্তরে চিরদিন স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে। এই এক একটী স্পর্শমণি হইতে যথাকালে তাদৃশ বহুসংখ্যক স্পর্শমণি সমুৎ-পন্ন হইবার কোন বাধা নাই। যেরূপ সূর্য্য-দেব উত্তমর্ণ বা মহাজনের স্বপ্নাভিষিক্ত (Standing in positive relation) হইয়া, অধমর্ণ বা খাতক ভাবাপন্ন (Standing in negative relation) অনুগত গ্রহগণকে উষ্ণ ও আলোকময় কিরণদানে স্বতঃই অনু-

ক্ষণ প্রতিপালন করিয়া থাকেন; সেইরূপ, এই সমস্ত স্পর্শমণির প্রত্যেকটী এক একটী সূর্য্যের ন্যায় সেই ভাবে অনুগত ভক্তবৃন্দকে, স্ব স্ব ভাবময় নিরঞ্জনদেহ নিঃসৃত ভাবঘন চিন্ময় কিরণজাল দ্বারা সস্নেহে সযত্নে অনুক্ষণ লালনপালনাদি করিয়া, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। তজ্জনিত সেই সময়ে, সেই সেই ভাবময় দেহে, যে ব্যয় ও ক্ষয় হয়, তাহা মূল পরা প্রকৃতির অক্ষয়, নিত্য, অনন্ত, পরিপূর্ণ ভাণ্ডার হইতে অবিলম্বে অননুভূতরূপে স্বতঃই পরিপূরিত হইতে থাকে। "দানে নৈব ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্ন মহাধনম্।' এ কথা অন্যত্রে প্রয়োগ হইয়া থাকিলেও,এখানে ইহার প্রয়োজ্যতার অবধি নাই,—কোন দিকে কোন অসম্পূর্ণতা নাই।

৪১। উত্তমর্ণ বা মহাজনের স্থলাভিষিক্ত এই আত্মস্থ বিষয়ের সঙ্গে অধমর্ণ বা খাতক ভাবাপন্ন বিষয়ীর পূর্ব্ব-প্রদর্শিত গুরু শিষ্য সম্বন্ধ নিবন্ধন তদাকারত্ব, তদেকত্ব, তৎ-অন্তরঙ্গত্ব-প্রাপ্তি হইতেই এই ব্যষ্টি স্বরাট আত্ম-তত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে। এই স্বরাট আত্ম জ্ঞানের এক দিকে যথাকাল-প্রাপ্ত স্বস্থান প্রাপ্তীচ্ছু ভাবাঙ্গ-সম্পন্ন বিষয়ী ও অপর দিকে নিরঞ্জন ভাবাঙ্গ-বিহারী সদ্‌গুরু বা সাধুসজ্জন রূপ স্বস্থান প্রত্যাগত বিষয়। এই দুই তীর ভূমিকে আলিঙ্গন করিয়া,প্রকৃত আত্ম-জ্ঞান স্রোত প্রবাহিত। এই উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎকারে শিষ্যরূপ বিষয়ী, জ্ঞানের অনাত্ম প্রকোষ্ঠে স্বকীয় প্রতিবিম্বিত অহং অধ্যাসে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া, সম্পূর্ণরূপে দিশাহারা। সেই অবস্থায় তাহাকে গুরু আশ্রয় অবলম্বন করিতে হয়। যেরূপ জলন্ত অগ্নি-সন্নিধান প্রাপ্ত হইলে, জল-সিক্ত কাষ্ঠ-খণ্ড ক্রমে বিশুষ্ক ও আর্দ্রতা বিমুক্ত হইয়া, জলন্ত অবস্থা লাভ করিবার দিকে অন্তর্পথে যাত্রারম্ভ করে, ভ্রম প্রমাদ-বিশিষ্ট বিষয়ী, আত্ম বা পরমাত্ম তত্ত্ব সম্পন্ন বিষয়ের সন্নিধান ও আনুগত্য প্রাপ্ত হইলে, সে স্বতঃই সর্ব্বারম্ভে স্বকীয় স্বরাট আত্ম-তত্ত্বাভিমুখে স্বরূপাভিমুখে মহা-প্রস্থান করিতে অভিসার করিতে আরম্ভ করে। সময়ে সেই জলসিক্ত কাষ্ঠ খণ্ড, সেই অগ্নি-দগ্ধ কাষ্ঠ সংসর্গে যেমন তদাকারে আকারিত হইয়া, জলন্ত অবস্থা লাভ করে,ভ্রান্ত সংস্কার বিষয়ী, সেই রূপ স্বরূপ ও স্বধাম প্রাপ্ত বিষয়ের সাহায্যে,আনুগত্যে ও সান্নিধ্যে,তদাকারে,অনুরূপ আকারিত হইয়া আত্ম-স্থান ও আত্মধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে,আত্ম-তত্ত্ব-রূপ স্বরূপাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। লৌহখণ্ড এইরূপে চুম্বক-সন্নিধান প্রাপ্ত হইলে, চুম্বক প্রকৃতি লাভ করিয়া থাকে। অথবা আম্রাদির ক্ষুদ্র বৃক্ষ যেরূপ দেশ কাল ও অবস্থার অধীন হইয়া স্ব স্ব জাতীয় উৎকৃষ্টতর বৃক্ষান্তরের সঙ্গে যথা বিধানে মিলিত হইলে, সময়ে স্বজাতীয় কুলধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক, সেই উৎকৃষ্টতর বৃক্ষান্তরের কুলধর্ম্মে ও স্বরূপত্বে তদাকারিত হইয়া তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যিনি শিষ্য হইবেন, প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের অনুমত জন্মসংস্কারলব্ধ স্বভাব পরিত্যাগ করিতে—আমিত্ব,ব্যক্তিত্ব,জাতিত্ব, গোত্রত্ব প্রভৃতি যথাসর্ব্বস্ব বিলোপ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া, তাহাকে গুরু আনুগত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীকালীনাথ দত্ত।

বরাবর পাহাড় ও সাত ঘর।

গয়া হইতে ১৮মাইল উত্তরে এবং বেলা নামক রেলওয়ে ষ্টেসনের ৬।৭মাইল উত্তর পূর্ব্বে কতকগুলি গ্রেনাইট প্রস্তরময় পাহাড় অবস্থিত আছে। এই সকল পাহাড় কাওয়া-ডোল বা কাকদোল, বরাবর ও নগর-যোনি নামে খ্যাত। এই সকল পাহাড়ে প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ ও মহারাজ অশোকের শিলালিপি ও তৎসময়ের নির্ম্মিত গুহা সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

কিছুদিন হইল, আমরা কয়েকটী বন্ধু একত্র হইয়া এই সকল পাহাড় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, তথায় একটী গুহার মধ্যে অল্প-বয়স্ক একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি পালী ভাষা কতক জানেন। তাঁহার নিকট আমরা শিলালিপি বিষয়ে অনেক কথা অবগত হইলাম।

কাওয়াডোল বা কাকদোল।—এই পাহাড় বেলা ষ্টেসন হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। রেলগাড়ি হইতেই এই পাহাড় সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, এই পাহা-ড়ের শৃঙ্গদেশে এক খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর এরূপ ভাবে অবস্থিত ছিল যে, একটী কাক উহার উপর বসিলেই উহা দোলায়মান হইত; এজন্য ইহার নাম কাওয়াডোল বা কাক-দোল। ইহার চতুর্দ্দিকে অনেক বৌদ্ধ ও হিন্দু কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের উত্তর ভাগে অনেক হিন্দু দেবমূর্ত্তি খোদিত আছে। পূর্ব্বদিকে একটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে, তাহাতে একটী প্রকাণ্ড ধ্যান-নিমগ্ন বৌদ্ধ মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

সাতঘর।—কাকদোল পাহাড়ের ৩ মাইল উত্তর পূর্ব্বে বরাবর নামক পাহাড় অবস্থিত। ইহার সংস্কৃত নাম প্রবর গিরি। এই পাহা-ড়ের মধ্যে ৪ টী গুহা খোদিত আছে। আর অনতিদূরে নগরযোনি পাহাড়ে তিনটী গুহা আছে। এই ৭টি গুহা আছে বলিয়া গুহাগুলি সাত-ঘর নামে খ্যাত। এই সকল গুহা বৌদ্ধ যোগীদিগের অবস্থান জন্য খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মহারাজ অশোক ও তাঁহার পৌত্র দশরথের সময় খোদিত হয়। তৎপরে খ্রীষ্টের তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে শার্দ্দূলবর্ম্মা ও অনন্ত বর্ম্মা নামক হিন্দু নৃপতিগণ ইহাতে কাত্যায়নী মূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। হোয়েন-সাঙের সময় এই সকল গুহা হিন্দুদিগের অধিকৃত ছিল এবং ইহাতে হিন্দুমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, এজন্য তিনি ইহাদের উল্লেখ করেন নাই। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভয়ঙ্কর নাথ নামক কোন পর্য্যটক ইহা পরিদর্শন করিয়া তাঁহার নাম খোদিত করিয়া যান। তৎপরে ইহা মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়। গুহাগুলির নির্ম্মাণ-কার্য্য দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

(১) কর্ণবোপরগুহা—বরাবর পাহাড়ের উত্তরাংশে এই গুহা অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৪ ফিট, প্রস্থে ১৪ফিট। এই গুহার পশ্চিমের কোণের দিকে একটী বেদী আছে। বোধ হয়, এখানে কোন মূর্ত্তি অবস্থিত ছিল। প্রবেশদ্বারের পশ্চিম দিকে প্রাচীন পালী অক্ষরে ৫ ছত্র শিলালিপি আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, অশোক রাজার উনবিংশ বৎসরে (২৪৫ খ্রীঃ পূঃ) এই গুহা খোদিত ও উৎ-

সর্গীকৃত হয়। প্রবেশদ্বারের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে পালী অক্ষরে বোধিমূলম, দরিদ্র কান্তার, কর্ম্মচণ্ডাল, মহীত্রাণসার, বিকট-তুঙ্গশিব, এই কয়েকটী নাম খোদিত আছে।

(২) সুদাম গুহা—পূর্ব্বোক্ত গুহার দক্ষিণ দিকে এই গুহা অবস্থিত। বরাবরের সমস্ত গুহার মধ্যে এই গুহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রবেশ দ্বারের দক্ষিণ বা পূর্ব্বপার্শ্বে প্রাচীন পালী অক্ষরে লিখিত আছে "এজনা-পিয় দশিনা দুবারিস বসাভা—(অশোক রাজার দ্বাদশ-বর্ষে)—আর বাকী কতকটা উঠিয়া গিয়াছে, এজন্য আমাদের পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী তাহা পড়িতে পারিলেন না। ইহার সংলগ্ন পশ্চিম দিকে আরও একটী ক্ষুদ্র গোলাকার গুহা আছে। বোধ হয়, ইহা যোগাভ্যাসের ছিল। ইহার প্রাচীর ও ছাদের গাত্র অসমান দেখিয়া বোধ হয় ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই।

(৩) লোমশ ঋষি গুহা—পূর্ব্বোক্ত সুদাম গুহার ন্যায় ইহাতেও একটী ক্ষুদ্র গোলাকার গুহা সংলগ্ন আছে। ইহাও অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে পালী অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত শ্লোক আছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, দুইটী যজ্ঞবর্ম্মার পৌত্র অনন্ত বর্ম্মা এই স্থানে কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপন করেন।

(৪) বিশ্বামিত্র গুহা—এই গুহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইহাতে অশোক রাজার সময়ের একটী লিপি আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, অশোক রাজার দ্বাদশবর্ষে এই গুহা খোদিত ও উৎসর্গীকৃত হয়।

(৫) নগর যোনি গুহা—বরাবর পাহাড়ের অনতিদূরে উত্তর পূর্ব্বদিকে অনতিউচ্চ একটী পাহাড়ে এই গুহা অবস্থিত, এজন্য এই পাহাড় যোনি নামে খ্যাত। এই গুহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রায় ৪৭ ফিট দীর্ঘ ও ১৯ ফিট প্রস্থ এবং ইহাদের মধ্য ভাগ ১০॥ ফিট উচ্চ। ইহার গাত্র অতিশয় পরিষ্কৃত ও মসৃণ। ইহা অশোক রাজার পৌত্র রাজা দশরথের সময়ে বৌদ্ধ যোগীদিগের বাসের জন্য খোদিত হয় বলিয়া প্রবেশ দ্বারের উপরিভাগে পালী অক্ষরে লিখিত আছে। ইহার প্রাচীন নাম গোপিকা-কুভা বা গোপিগুহা। প্রবেশ দ্বারের পূর্ব্বদিকে সংস্কৃত ভাষায় একটী শ্লোক আধুনিক পালী অক্ষরে লিখিত আছে। উহার মর্ম্ম এই যে, অনন্তবর্ম্মা এই স্থানে কাত্যায়নী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা এক্ষণে মুসলমানদিগের দর্গায় পরিণত হইয়াছে। ইহার এক পার্শ্বে একটী আধুনিক ইষ্টক নির্ম্মিত বেদী আছে। কথিত আছে যে, এই বেদী এক মুসলমান পীরের বসিবার স্থান ছিল।

(৬) বাপিয়া কা কুভা বা বাপিয়া গুহা—নগর-যোনি পাহাড়ের উত্তরদিকে অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমির উপর এই ক্ষুদ্র গুহা অবস্থিত। ইহার নিকট একটী কূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, বোধ হয় এই জন্যই ইহার নাম বাপিয়া গুহা। ইহাতে রাজা দশরথের সময়ের খোদিত একটী লিপি আছে। তাহার শেষাংশ নগর-যোনি গুহার শিলালিপির অবিকল অনুরূপ। প্রবেশ দ্বারের পার্শ্বে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলালিপি আছে। তন্মধ্যে একটী এই যে—"আচার্য্য শ্রীযোগানন্দ প্রণমতি সিদ্ধেশ্বরং।"

(৭) বদাতি কা কুভা - পূর্ব্বোক্ত গুহার নিকটেই এই ক্ষুদ্র গুহা অবস্থিত। এই গুহাও রাজা দশরথের সময় খোদিত হয়। অনন্ত বর্ম্মা এই গুহায় এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন।

সিদ্ধেশ্বর মন্দির—বরাবর পাহাড়ের

শিখরদেশে এই মন্দির অবস্থিত। বাপিয়া গুহার শিলালিপি দেখিয়া বোধ হয়, এই মন্দির খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ কি ৭ম শতাব্দীতে আচার্য্য যোগানন্দের পূজার জন্য অনন্তবর্ম্মার সময়ে নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুহা আছে। বোধ হয় যোগীদিগের তপস্যার জন্য এই গুহা গুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

দার্শনিক

সকলেই জানেন, হিন্দুদর্শনশাস্ত্রে নানা মতভেদ আছে। বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃতি যাঁহারা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এই মতভেদের প্রকৃত কারণ বুঝিয়া সেই ধর্ম্মের প্রকৃতির সহিত নানা মতভেদের বিলক্ষণ সঙ্গতি দেখিতে পাইয়াছেন। দর্শনে যে নানা মতভেদ হইবে, তাহা বিচিত্র নহে; মতভেদ না হইলেই আশ্চর্য্য জ্ঞান হইত। মতভেদ হইবে কেন, তাহা বুঝা যায়; না হইবে কেন, তাহা বুঝা যায় না। একথা সকলের নিকট যুক্তি-সিদ্ধ নহে। এ কথার বিরোধিনী যুক্তি এই:—

বেদ বল, দর্শন বল, সকলই ঋষিবাক্য। ঋষিবাক্য বলিয়া আপ্তবাক্য। আপ্তগণ অভ্রান্ত। অভ্রান্ত ঋষিপ্রোক্ত আপ্ত বাক্য মধ্যে মতভেদ কেন হইবে? শাস্ত্রে আপ্ত লক্ষণ এই:—

"আপ্তোনামানুভবেন বস্তুতত্ত্বস্য কাৎস্ন্যেন নিশ্চয়বান্, রাগাদিবশাদপি নান্যথাবাদী যঃ স ইতি চরকে পতঞ্জলিঃ॥

মঞ্জুষা।

"যিনি অনুভব* দ্বারা সর্ব্ব পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সুতরাং সমুদায় বস্তুতত্ত্বেই যাঁহার অভ্রান্ত জ্ঞান জন্মিয়াছে, রাগাদির বশীভূত হইয়াও যিনি অন্যথাবাদী নহেন, সুতরাং সর্ব্বাবস্থাতেই যিনি প্রকৃত কথা বলেন, তিনিই আপ্ত নামে অভিহিত।"

ভগবান্ পতঞ্জলি যেরূপ আপ্তলক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে আপ্তঋষিপ্রোক্ত শাস্ত্রে মতভেদ কিরূপে সম্ভবে? আপ্তগণের মধ্যে যদি নানা মতভেদ হইল, তবে তাঁহাদের সহিত সামান্য লোকের প্রভেদ কি? সামান্য জনগণেরই মতভেদ হইয়া থাকে। এই বিরোধিনী যুক্তি ক্রমে ক্রমে খণ্ডিত হইতেছে

যাঁহারা আমার "হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য"* নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সেই প্রবন্ধ বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত প্রশ্নের উত্তর পাইয়া থাকিবেন। তথাপি সাধারণের বোধগম্য জন্য সেই উত্তর আরও বিশদ করিয়া লেখা যাইতেছে।

সেই প্রবন্ধেই দৃষ্ট হইবে, আমাদের ঋষিগণ কেহই স্বাধীন বা স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ মতের প্রণেতা ছিলেন না; তাঁহারা সকলেই বেদেরই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। বেদ মধ্যেই যে সমস্ত মত ও সাধনতত্ত্ব বিভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত নিবিষ্ট আছে, তাঁহারা এক এক জন সেই সকল কথা গ্রহণ পূর্ব্বক বিশদরূপে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

"ব্রহ্মাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মারকা নতু কারকা।"

শাস্ত্র বলেন, ব্রহ্ম হইতে সমস্ত ঋষিগণ পর্য্যন্ত সকলেই বেদস্মারক ছিলেন, কেহই কারক ছিলেন না।

ভগবান ব্যাস বলিয়াছেন, ঋষিগণ অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা ছিলেন; তাঁহারা তপস্যাবলে সমস্ত

* "গীতার প্রামাণ্য" নামক প্রস্তাবে এই অনুভব শব্দের অর্থ বিশেষ রূপে বিবৃত হইয়াছে।

* ১৩০১ সালের কার্ত্তিক মাসের "নব্যভারত" দেখ।

বস্তুতত্ত্ব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। এজন্য তাঁহারা "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা" ছিলেন। সেই "মন্ত্রদ্রষ্টা" ঋষিগণ যেরূপে যিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি সেইরূপ সাধনপথ সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।*

ভর্ত্তৃহরিও বলিতেছেন,—

"ঋষীণামপি যজ্জ্ঞানং তদপ্যাগমহেতুকম্।"

"ঋষিদিগের সমস্ত জ্ঞানই বেদমূলক।"

সকল জ্ঞানই যদি বেদমূলক, তবে এক বেদ হইতে এত মতভেদ হয় কিরূপে? বেদে যখন সেই ভিন্নতার কারণ রহিয়াছে, তখন সে ভিন্নতা না হইবেই বা কেন? এই ভিন্নতার কারণ বিভিন্ন অধিকার। বেদ নানা অধিকারীর নিমিত্ত নানা পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরি সেই মতভেদের কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

"তস্যার্থবাদরূপাণি নিশ্রিত্য স্ববিকল্পজাঃ।
একত্বিনাং দ্বৈতিনাং চ প্রবাদা বহুধা মতাঃ।।" বাক্যপদীয়

বেদের "অর্থবাদ" হইতেই কি দ্বৈতবাদ, কি অদ্বৈতবাদ উভয়ই প্রসূত হইয়াছে। যাঁহারা অদ্বৈত ভাবের অধিকার লাভ করিবার যোগ্য হয়েন নাই, তাঁহারা নিশ্চয় দ্বৈতবাদী। তাঁহাদের সকল জ্ঞানই ঐন্দ্রিয়িক। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান মাত্রই সমল ও সাপেক্ষ (Relative) ভেদজ্ঞান মাত্র। যতদিন লোক নির্ম্মল (Absolute) জ্ঞানে উপনীত না হয়েন, ততদিন তাহার জ্ঞান দ্বৈতভাব সম্পন্ন। তিনি কোন বস্তুর প্রকৃততত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না। তাঁহার বুদ্ধি ও মন এই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানেরই পরতন্ত্র। এইরূপ বুদ্ধি বিশিষ্ট লোকদিগের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া নানাবিধ উপদেশ আবশ্যক হইয়াছে। এইরূপ প্রয়োজনানুসারে যে সকল উপদেশের আবশ্যকতা হইয়াছে, তাহাই বেদের "অর্থবাদ" *। "অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি"তে এই কথা আরও বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। "আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ" কার সেই গ্রন্থোক্তবিষয়ের এইরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—

"শাস্ত্র প্রকাশক মুনিগণ যে ভ্রান্ত নহেন, তাঁহাদের মত সকল আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইলেও কোন ঋষি যে তাপর্য্যতঃ অন্য ঋষির বিরোধী নহেন, 'অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি' তাহাই বুঝাইয়াছেন।

অদ্বৈতবাদই যদি সত্যবাদ হয়, তাহা হইলে দ্বৈত প্রতিপাদনপর ন্যায় বৈশেষিকাদি ভ্রান্তমত-স্থাপক শাস্ত্র সমূহ দ্বারা তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কি ইষ্টাপত্তি হইবে? না, তাহা নয়, দ্বৈতপ্রতিপাদনপর প্রস্থান সকল নিষ্প্রয়োজনীয় নহে। ন্যায় বৈশেষিকাদি দ্বৈতবাদসংস্থাপক পুরুষেরাও ঋষি ছিলেন, সুতরাং, তাঁহাদের ভ্রম হইতে পারে না। ঋষিদিগেরও ভ্রম হয় বলিলে, অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না; কোন ঋষিই বস্তুতঃ ভ্রান্ত নহেন। মহর্ষিদিগের অভিপ্রায় কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতেই লোকের মনে নানাবিধ সন্দেহ উদিত হইয়া থাকে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, উপলব্ধি হইবে, দ্বৈত-প্রতিপাদনপর মহর্ষিদিগের আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধরূপে উপলভ্যমান মত সকল বিবর্ত্তবাদেই পর্য্যবসিত হইতেছে। দ্বৈতপ্রতিপাদনপরশাস্ত্রকারেরা তাৎপর্য্যতঃ অদ্বৈতবাদকেই যে আদর করিতেন, এই মতকেই যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ মত মনে করিতেন, তাহার যথেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়। তর্ককেশরী উদয়নাচার্য্য তাঁহার 'আত্মতত্ত্ববিবেক বৌদ্ধাধিকারে' বলিয়াছেন, বিবর্ত্তবাদই যে সত্য, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু আদার ব্যাপারির জাহাজের খবর দরকার কি।"

উদয়নাচার্য্যের অর্থ এই যে, আমি দ্বৈতবাদিদের জন্যই যে কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছি, সে কার্য্যে অদ্বৈতবাদের কথা অনাবশ্যক।

* নিরুক্ত, দৈবতকাণ্ড।

* প্রয়োজন-সিদ্ধি উদ্দেশ করিয়া যাহা বলা যায়, তাহাই অর্থবাদ—(কথিত) "অর্থায় প্রয়োজন সিদ্ধয়ে বাদঃ কথনম্।" ন্যায়দর্শনে চতুর্ব্বিধ অর্থবাদ কথিত হইয়াছে।

এক্ষণে বোধ হয়, অনেক দূর প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমাদের দার্শনিক মতভেদ ঋষিদিগের অজ্ঞতা, বুদ্ধিবিকৃতি বা ভ্রান্তি বশতঃ নহে; অজ্ঞজনগণকে জ্ঞানপথে আনিবার নিমিত্ত তাঁহারা বেদার্থ বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন। তাই, আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপকার বলেন, সামান্য পণ্ডিতগণের মতভেদ অজ্ঞতানিবন্ধন, দার্শনিক ঋষিগণের মতভেদ অজ্ঞজনগণকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত। দর্শনের উৎপত্তি কি, তদ্বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে এ বিষয় আরও পরিস্কৃত হইয়া যাইবে।

বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যের প্রবচনভাষ্যের যে বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রাঞ্জলরূপে দর্শনসমূহের বিরোধভঞ্জন করিয়া দিয়া গিয়াছেন। প্রথমে তিনি দর্শনের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিতেছেন যে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে :—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রতব্যো, মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য "—ইত্যাদি।

"শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা সর্ব্বদা আত্ম-সাক্ষাৎকার করিবে।"

আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিবার নিমিত্ত এই ত্রিবিধ উপায় শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন। অগ্রে গুরূপদেশ-ক্রমে সমগ্র বেদ শ্রবণ, অধ্যয়ন ও অভ্যস্ত করিবে। সমস্ত বেদ হইতে এইরূপ আত্মতত্ত্বের শ্রবণ করিয়া তৎপরে তৎসম্বন্ধে চিন্তার প্রয়োজন। চিন্তা ও যুক্তি সহকারে বেদার্থের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিলে বেদ-পাঠই বৃথা। বিবিধ প্রমাণ দ্বারা পরমাত্মার অনবরত চিন্তা করাই "মনন"। মননদ্বারা সমস্ত বিষয়ের তাৎপর্য্য-গ্রহ হইলে তবে যোগ পথে পদার্পণ করা আবশ্যক। মননদ্বারা পরমাত্মতত্ত্বের ধারণার পর অবিশ্রামে ও অনন্যচিত্তে প্রগাঢ় ধ্যান পরায়ণ হওয়ার নাম "নিদিধ্যাসন"।

বেদোক্ত সাধন পথ এই। এইরূপ সাধন-পথ অবলম্বন করিলে তবে আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভাবিত হয়। এই পথ যতদিন অবলম্বিত হইয়াছে, ততদিনই দর্শনশাস্ত্র বিদ্যমান। যতদিন "মননের" অনুষ্ঠান হইতেছে,ততদিন বৈদিক "অর্থবাদ" আছে। ততদিন বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ জন্য নানা প্রমাণপথের চিন্তা ও উপদেশ বিদ্যমান ছিল। দার্শনিকেরা সেই সমস্ত উপদেশ সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন; এবং তাহাই এক এক দার্শনিক প্রস্থানে পরিণত হইয়াছে। প্রস্থান সমূহের প্রমাণপদ্ধতিও এজন্য স্বতন্ত্র হইয়াছে। যে প্রস্থানের যেরূপ অধিকার, তাহার প্রমাণ-পদ্ধতিও সেই রূপ হইয়াছে।

বিজ্ঞানাচার্য্য বলেন, কাপিল সাংখ্যের অধিকার আত্মতত্ত্বজ্ঞান; সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞান কেবল বিবেকোদয়ে সম্ভব,পরমপুরুষার্থসাধন দ্বারা বিবেকোদয় হয়। এই পুরুষার্থসাধন-পথ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, ভগবান্ কপিল, শ্রুতির সার সঙ্কলন করিয়া পরমাত্মজ্ঞান বিষয়ে শ্রুতির অবিরোধিনী নানা উপপত্তির উপদেশ করিয়াছেন। শ্রবণ দ্বারা সাংখ্য যে শ্রুতিবাক্য লইয়াছেন, সেই শ্রুতি সাংখ্যের নিকট আপ্তবাক্য। নানা উপপত্তি বা অনুমানমূলক যুক্তি দ্বারা সেই আপ্তবাক্যকে স্থাপন করিবার নিমিত্ত সাংখ্য সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দ্বিবিধ যুক্তি-পথ অবলম্বন করিয়াছেন। সাংখ্য এজন্য ত্রিবিধ প্রমাণে স্বীকার করেন—শব্দ (আপ্তবাক্য), অনুমান ও প্রত্যক্ষ।

সাংখ্যের প্রতিপাদ্য নির্গুণ ব্রহ্ম; ন্যায় ও বৈশেষিকের প্রতিপাদ্য সগুণ ব্রহ্ম। এজন্য ন্যায়দার্শনিকেরা আর এক অতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণ করিলেন। সামান্য বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানের উপমা দিয়া নৈয়ায়িকেরা সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।* নির্গুণ ব্রহ্ম বিদ্যায় সামান্য বস্তুতত্ত্বের তত উপযোগিতা নাই বলিয়া কাপিলসাংখ্যে তাহা গৃহীত হয় নাই। কিন্তু সগুণ ব্রহ্মবিদ্যায় উপমান অত্যন্ত উপযোগী।

বেদান্ত আরও কতিপয় প্রমাণ স্বীকার করেন; যেহেতু, তাহার অধিকার সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই। ব্রহ্মমীমাংসাকার পূর্ণপ্রজ্ঞ, মাধ্বাচার্য্য, বল্লভ ও রামানুজ সগুণ দ্বৈত-বাদী, শঙ্কর নির্গুণ অদ্বৈতবাদী। সৌগত ও জৈনেরা আপ্তবাক্য শব্দকে অস্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষ এবং অনুমান গ্রহণ করি-লেন। চার্ব্বাকেরা কেবল প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর কিছুই স্বীকার করিতে চাহেন না। তাই আপ্তবাক্য-বিরোধী নাস্তিক দর্শন ষড়বিধ হইল—চার্ব্বাক, চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ এবং জৈন বা আর্হত। আপ্তবাক্যের অবিরোধী আস্তিক দর্শনও ছয় প্রকার—ন্যায়বৈশেষিক ভেদে দ্বিবিধ ন্যায়, সাংখ্যপাতঞ্জল ভেদে দ্বিবিধ সাংখ্য এবং পূর্ব্ব উত্তরভেদে দ্বিবিধ মীমাংসা দর্শন।

সগুণ ঈশ্বর কেবল কাপিল সাংখ্যে এবং জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসায় প্রতিষিদ্ধ। কপিল ঘোর জ্ঞানবাদী, জৈমিনি ঘোর কর্ম্মবাদী। একজন জ্ঞান; অন্যজন কর্ম্ম দ্বারা মুক্তি প্রয়াসী। সগুণ ঈশ্বর নাই মানুন, আস্তিক দর্শনকারগণ নিত্যবস্তু নির্গুণসত্তা পরমাত্মার স্বীকার করিয়াছেন। শুদ্ধ উপাসনার নিমিত্ত সগুণ ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা। আস্তিক দর্শনের বিরোধভঞ্জনাত্মক বিজ্ঞানাচার্য্যের প্রসঙ্গ এক্ষণে অনায়াসে উত্থাপিত হইতে পারে।

দর্শনে জ্ঞানের একটি সীমা নির্দ্দিষ্ট হই-য়াছে; সেই সীমা ইন্দ্রিয় এবং অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে স্থাপিত। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান বাহ্যবিষয়ের দ্বার স্বরূপ। মন ও বুদ্ধি এই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া যতদূর যাইতে পারে, সেই স্থলে এই সীমা স্থাপিত। এই জ্ঞান-সাপেক্ষ (Relative) দ্বৈতজ্ঞান। সেই নিমিত্ত প্রকৃত বস্তুতত্ত্বাবধারণে অসমর্থ। প্রকৃত বস্তুতত্ত্ব কি, তাহা এই জ্ঞানের পর-পারে। যোগীগণ বলেন, এই পরপারে যাই-বার একমাত্র উপায়—নিরোধ। পাতঞ্জল যোগসূত্র বলেন, এই নিরোধ কেবল চিত্তময় করিয়া সংসিদ্ধ হয়। চিত্তে সমুদায় ঐন্দ্রি-য়িক দ্বৈত জ্ঞানের সংস্কার একেবারে বিলীন হইলে এই নিরোধ উপস্থিত হয়। তখন নির্ম্মল ও অখণ্ড (absolute) জ্ঞানের বিকাশ হয়। নির্ম্মল জ্ঞানের বিকাশ হইলে সমুদায় বস্তুতত্ত্ব জানা যায়; তখন একমাত্র ব্রহ্মই প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। এজন্য এই জ্ঞানের নাম কেবল বা অদ্বৈতজ্ঞান। এই জ্ঞানই সাক্ষাৎ মুক্তি-সাধক। এই জ্ঞানে উপনীত হইলে জীব সর্ব্ববিৎ হয়, সুতরাং কিছু জানিবার বাকী ও অপেক্ষা থাকে না। যোগশাস্ত্রে এই জ্ঞান-লাভের সাধনপথ নির্দ্দিষ্ট হইয়া হইয়াছে। সাংখ্যে ঈশ্বর-নিরবলম্বযোগ, পাতঞ্জলে ঈশ্বরা-

* কাপিল সাংখ্যে নিত্য ঐশ্বর্য্যের নিরাকরণ জন্য যে সগুণ ঈশ্বরের প্রতিষেধ আছে, কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য্য এই প্রমাণ বলে সেই ঈশ্বরের স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সং-গ্রহে সেই যুক্তির সারসঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। বৈশে-ষিকে শব্দ ও উপমান গৃহীত হইয়া অনুমানান্তর্গত হইয়াছে।

বলম্বিত যোগ। শ্রুতিতেও তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দার্শনিকেরা সেই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া বলেন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই সেই প্রশস্ত সাধনপথ। এই প্রশস্ত সাধনপথেই কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রবণ ও মনন পর্য্যন্ত সামান্য মানসজ্ঞানের সীমা; নিদিধ্যাসন অবলম্বন করিয়া আমরা যোগপথে অগ্রসর হই। মনকে ধ্যানে নিযুক্ত ও নিমগ্ন করাই নিদিধ্যাসন; সেই ধ্যেয়কে শ্রবণ, অবধারণ, নির্ণয়, প্রতিপন্ন ও অনুচিন্তাদি দ্বারা ধারণ করাই শ্রবণ মননের বিষয়। এই ধ্যেয় দ্বিবিধ, সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে এবং সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতমে যাওয়াই মনন ও দর্শনের বিষয়। এই সূক্ষ্মতত্ত্বের এক সীমা আছে, যেখানে নির্গুণ তত্ত্বের আভাস ও অধ্যাস লাভ করা যায়। সেই সীমায় আসিয়া যোগিরা নির্গুণের ধ্যানে অধিষ্ঠিত হয়েন; সম্প্রজ্ঞাত বা সামান্য ও সম্যক প্রকার সবিকল্পক জ্ঞানরাজ্য হইতে অসম্প্রজ্ঞাত বা সজ্ঞাহীন নির্ব্বিকল্প জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ লাভ করেন।

সম্প্রজ্ঞাত হইতে অসম্প্রজ্ঞাত যোগরাজ্যে আসিবার অবস্থায় যোগিদিগের একযোগবল বা ঐশ্বর্য্যলাভ হয়। যোগশাস্ত্রে সেই যোগবল ও ঐশ্বর্য্যের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কোন কোন যোগী এই যোগবলে এত মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, আর নির্গুণধ্যানে প্রবৃত্ত হয়েন না। পাছে সেই ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়, তাই কাপিলসাংখ্যে সেই ঐশ্বর্য্যের প্রতিষেধার্থ সগুণ ঈশ্বরের অসিদ্ধতা সপ্রমাণ করা হইয়াছে; অন্য কারণে নহে! বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন:—

"এই শাস্ত্রে (সাংখ্যদর্শনে) ঐশ্বর্য্য বৈরাগ্যের নিমিত্তই ঈশ্বরবাদের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। যদি বৌদ্ধমতানুসারে নিত্য ঐশ্বর্য্য প্রতিষেধ না কর, তাহা হইলে পরিপূর্ণ, নিত্য, নির্দ্দোষ ঐশ্বর্য্য দর্শনে তাহাতে চিত্তের অভিনিবেশ হইয়া বিবেকাভ্যাসের প্রতিবন্ধক হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যাচার্য্যের অভিপ্রায়।" *

অন্যত্র:—

"ঈশ্বর দুজ্ঞেয়, এই নিমিত্তই নিরীশ্বরবাদ ব্যবহারসিদ্ধ হইয়াছে এবং তাহা হইলেই ঐশ্বর্য্য-বৈরাগ্য সম্ভাবিত। যদি ঈশ্বর স্বীকার কর, তাহা হইলেই নিত্য ঐশ্বর্য্যও স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং ঐশ্বর্য্য-বৈরাগ্য সম্ভবে না।"

এই কারণে সাংখ্যে ঈশ্বর (সগুণ) অসিদ্ধ। যে তত্ত্বজ্ঞান ও নির্গুণতত্ত্ব সাংখ্যের প্রতিপাদ্য, পাছে সাংখ্যযোগির সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভে ব্যাঘাত জন্মে, তাই যোগসিদ্ধি পক্ষে ঈশ্বরবাদ অসিদ্ধ। বিজ্ঞানাচার্য্য আবার বলিতেছেন:—

"বিশেষতঃ ব্রহ্মমীমাংসা গ্রন্থে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত ঈশ্বরই প্রতিপন্ন হইয়াছেন। সেই শাস্ত্রের ঈশ্বর-প্রতিপাদনই মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার সেই অংশের বাধ হইলে শাস্ত্রেরই অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। যে শব্দের যে উদ্দেশ্য, তাহাই সেই শব্দের অর্থ। ব্রহ্মমীমাংসাতে কেবল ঈশ্বর প্রতিপাদনই শাস্ত্র-কর্ত্তার অভিপ্রেত। সাংখ্য শাস্ত্রে কেবল পুরুষার্থসাধন আত্মসাক্ষাৎকারের উপায় স্বরূপ প্রকৃতিপুরুষে বিবেচনাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত সাংখ্যশাস্ত্রের ঈশ্বর প্রতিষেধাংশের বাধ হইলে তাহার অপ্রামাণ্য হয় না। যে হেতু, প্রকৃতি পুরুষ বিচারেই তত্ত্বজ্ঞান ও বিবেক লাভের উদ্দেশ্যসাধন সুনিশ্চিত। যাহার যে উদ্দেশ্য, তাহার সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই সেই বাক্যের প্রামাণ্য থাকে। অতএব, সাংখ্যশাস্ত্র অপ্রমাণ না হইয়া ঈশ্বর প্রতিষেধাংশে অন্যান্য শাস্ত্রাপেক্ষা অবশ্য দুর্ব্বল বলিতে হইবে।"

তবেই দেখা যাইতেছে, যে দর্শনকার যে অধিকারে আছেন, সেই অধিকারের যাহা

* । প্রস্তাব-বাহুল্যভয়ে আমরা বিজ্ঞানাচার্য্যের মূলের কেবল অনুবাদ দিতেছি।

প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত তাহার যুক্তিপথ অবধারিত হইয়াছে। সগুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদনে যাঁহারা নিযুক্ত, তাঁহারা একেবারে নিষ্প্রয়োজন নহেন; মোক্ষপথে তাঁহাদেরও গৌণভাবে প্রয়োজন। বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মতে, কেবল সাংখ্যাপেক্ষাই তাঁহাদিগের অপকর্ষ। সাংখ্যজ্ঞান দ্বারাই পরম বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, সুতরাং এই জ্ঞানই সাক্ষাৎ মোক্ষসাধন। যে জ্ঞানের প্রতিপাদন করা তাঁহাদিগের প্রয়োজন, সে জ্ঞান পরম্পরা রূপে মোক্ষসাধন। সাংখ্যশাস্ত্র মতে এই সেশ্বরবাদ ব্যবহারিক এবং ঐশ্বর্য্য-বৈরাগ্য-সাধক নিরীশ্বরবাদ পারমার্থিক; কিন্তু সেশ্বর দর্শনশাস্ত্রে সগুণব্রহ্মমীমাংসাই পারমার্থিক,—গৌণভাবে পারমার্থিক। সুতরাং ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বিচারে কি সেশ্বরবাদ কি নিরীশ্বরবাদ, উভয়ই প্রয়োজন সিদ্ধির উপযোগী বলিয়া দর্শনে তাহারা স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। শুদ্ধ প্রয়োজনানুসারে পরস্পর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেশ্বর-বাদ কপিল সাংখ্যের বিরোধী এবং নিরীশ্বর-বাদ সেশ্বর দার্শনিকগণের বিরোধী। এই জন্য বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলিতেছেন:—

"ব্রহ্মমীমাংসা ও যোগসূত্রকার নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন। সাংখ্য মতে ঈশ্বর স্বীকৃত নহে এবং এমতও স্বীকার করা যায় না যে, ব্যবহারিক পারমার্থিক ভেদে সেশ্বর নিরীশ্বরবাদ অবিরুদ্ধ।"

দার্শনিক প্রস্থানের প্রয়োজন অনুসারে এই সগুণ ও নির্গুণবাদ পরস্পর বিরোধী হইলেও মোক্ষার্থ তাহারা উভয়ই প্রয়োজনীয়।

যে দর্শনকার সেশ্বরবাদ প্রতিপাদনে নিযুক্ত, তিনি সেই বাদেরই পক্ষ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। পাছে নিরীশ্বরবাদ দ্বারা তাহার প্রয়োজন ব্যর্থ হয়, তজ্জন্য নিরীশ্বর-বাদের প্রতি তিনি কটাক্ষপাত করিয়া অজ্ঞ-জনগণের প্রবোধনার্থ নানা জল্পনার সৃষ্টি করিয়াছেন। নিরীশ্বরবাদেও তদ্রূপ ঘটিয়াছে। নিজ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত দার্শনিকগণ যে সকল জল্পনার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে অনেক বেদবিরুদ্ধ বৃথা কথারও আবশ্যকতা হইয়াছে। সেই জন্য বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলিয়াছেন:—

"পাপীদিগের জ্ঞানপ্রতিরোধের নিমিত্ত আস্তিক দর্শনেও অংশত শ্রুতিবিরুদ্ধ অর্থ ব্যবস্থাপিত আছে এবং সেই সেই অংশের অপ্রামাণ্যও হইয়া থাকে। যে অংশ শ্রুতিস্মৃতির অবিরুদ্ধ, তাহাই প্রামাণ্যরূপে মুখ্য বিষয় বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে। শাস্ত্র মাত্রেই বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ অর্থ বিন্যস্ত থাকে; তন্মধ্যে যে অংশ শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধ, তাহা অপ্রমাণ্যজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া যে অংশ শ্রুতিস্মৃতির অবিরোধী, তাহার প্রামাণ্য জানিয়া গ্রহণ করা যায়।"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

শিশির বাবুর গীতিগ্রন্থ।

(শেষ আলোচনা।)

মানব-স্বভাবের যে অনন্ত মহা গীতি স্বাগত,—স্বতঃ প্রবাহিত,—জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে হৃদয়ে হৃদয়ে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত; যে মহা গীতির বিশ্ব-বিমোহন, ব্রহ্মাণ্ড-পরিপ্লাবী বিপুল বিরাট উচ্ছ্বাস মানব জাতির ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-শাস্ত্রে পরিণত; মনুষ্য-জীবনের যে মহা গীতি বেদে, পুরাণে, বাইবেলে, কোরাণে, এবং আরও কত কত, স্বতন্ত্র

স্বতন্ত্র ধর্ম্মগ্রন্থে গীত, বিবৃত এবং বর্ণিত; যে গীতি সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বকালিক,—যাহা যুগ-প্রলয়ে, মহাপ্রলয়ে এবং প্রলয়ান্তে প্রবাহ রূপে নিত্য, অক্ষয় এবং অবিনষ্ট;—যাহা ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে মনুষ্য-হৃদয়ের অত্যুচ্চ, অবিনশ্বর, অনিবার্য্য এবং অতৃপ্ত আকাঙ্খার বা অনুরাগের উত্তেজনা বা উচ্ছ্বাস;—যেগীতি, মানব জাতির শৈশব, কৈশোর ও যৌবনাদি কাল, ও কমল, কঠোর করুণ, উগ্র বা মধুরাদি বৃত্তি ভেদে,—শ্রুতি স্মৃতি পুরাবৃত্তাদির পূর্ব্বাপর স্তর ভেদে, ভিন্ন ভিন্ন রাগে ও রাগিণীতে উত্থিত—গীত, কভু অস্ফুট, কভু সরল, সহজ, শিল্প-চাতুরী-হীন শৈশবে-সুন্দর; কভু, উজ্জ্বল, উন্নত, অভ্রভেদী, প্রদীপ্ত, উগ্র, গভীর, সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য-ময়;—কভু বা মোলায়েম, মধুর, স্নিগ্ধ; করুণ; কভু ঔদাস্য বা দাস্য ভাবোদ্ভাসিত, কভু বাৎসল্যসখ্য-ময়,-কভু কেবল অবিমিশ্র মাধুর্য্য-ময়;—যে গীতি কখন প্রখর জ্ঞানোদ্দীপ্ত, কখন ললিত হৃদ্‌বৃত্তি-বিভাসিত, কখন উন্মত্ত মহা সাগরের উত্তাল তরঙ্গ লহরী, কখন সম্ভ্রম-সঙ্কুচিত প্রেমিক প্রেমিকার সংগোপন মিলন সঙ্কেতের সুমিষ্ট নিভৃত নিক্কন; কখন নৈশ সৌরভ-পুলোকিত প্রসূন-নিশ্বাস; আবার কখন প্রশান্ত, প্রফুল্ল, পবিত্র, দিগন্ত-ব্যাপী, তপবন-তরঙ্গিত, সুমহান সাম-সংগীত;—পুনশ্চ, যে গীতি, কখনও ভৈরব, কখনও মালব, কখনও হিন্দোল, কখনও বা দীপক, যুগে যুগে নবীন নিঃস্বনে, নবজীবনে জাগরিত; যুগে যুগে জীব উদ্ধারার্থে যুগাবতার কর্ত্তৃক অভিনব উচ্ছ্বাসে অবতারিত;—ঋষি প্রফেট, সিগার পেয়গম্বর ও কবি কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত—মৌলিক রাগে বা মিশ্র রাগিণীতে গীত; যে গীতি প্রভাবে সলিলোপরি শিলা ভাসিয়াছিল, অরণ্যবাসী দুরন্ত পশু-সমাজ প্রেমাকৃষ্ট হইয়াছিল, পরস্পর-বিরোধী বর্ব্বর-জাতি একপ্রাণে একতা-বদ্ধ হইয়া সত্যের সমর্থন ও দুষ্কৃতের দমন করিয়াছিল; পরন্তু, যে গীতির ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণে সঞ্চালিত, সম্মোহিত হইয়া,—আত্ম-বিস্মৃতা ব্রজ-রমণী অসূর্য্যম্পস্যা কুল-কামিনী, উন্মাদিনীবৎ, বনে বনে ছুটিয়াছিলেন, সংসার-সম্ভ্রম-সতীত্ব পতি-সন্ততি-যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, গায়কের অনুসন্ধানে গৃহ-বাসিনী, বন-চারিণী হইয়াছিলেন; লজ্জা-রূপিনীগণ বিবসনা উলঙ্গিনী হইয়াও আত্ম সম্বরণে,—প্রেম গীতির গুঞ্জরণ সম্বরণে, সমর্থা হন নাই;—"হা! নাথ" "হা! নাথ!" রবে নিদারুণ করুণ ক্রন্দনে, বিরহ-বিধুরা ব্রজ-বালিকা কালিন্দী-সৈকত অশ্রু-সিক্ত করিয়াছিলেন; পরমেশ-প্রেম-পাগলিনীগণ কালিন্দি গর্ভে দেহ ভার বিসর্জ্জনে উদ্যতা হইয়াছিলেন; আর আত্মার যে গভীর গীতি উত্তেজনায় শাক্য রাজকুমার যুবরাজ অমিতাভ রাজ-মুকুট, রাজ সিংহাসন, সংসার সুখ, সম্পদ রাশি তুচ্ছ তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া, স্নেহ-পারাবার পিতা মাতাকে শোক-পারাবারে ভাসাইয়া, প্রেমময়ী পত্নী, নব-প্রসূত অমিয়াধার পুত্র নিদ্রাবস্থায় পর্য্যঙ্ক-পরে পরিবর্জ্জন করিয়া, নিশীথ প্রহরে পলায়ন ও মায়া-বন্ধন সমূলে ছেদন করিয়া কন্থা কৌপিন-ক্লিষ্ট কঠোর সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন; পুনঃ, যে প্রকাণ্ড গীতির পূর্ব্ব-রাগে, পরম পণ্ডিত-মণ্ডলী, দিগ্‌দেশ হইতে, ধাবিত হইয়া বৈৎলেহমের গো-গৃহে-স্থিত সদ্য-প্রসূত সূত্রধর-শিশুকে রাজ-উপহারে, ও দেবোপচারে পূজা ও প্রণাম করিয়াছিলেন; এবং যে গীতির পূর্ণ উচ্ছ্বাসে সেই শিশু-সন্ন্যাসী সুমধুর যৌ-

বনে স্বকীয় উত্তপ্ত পবিত্র শোণিত দ্বারা সমগ্র-পৃথিবীর পাপতাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন; অপিচ,যে মহাগীতির মধুর মূর্চ্ছনায় একদিন নবদ্বীপ নবীন বৃন্দাবনে পরিণত হইয়াছিল; 'দারু পাষাণ গলিয়াছিল, বঙ্গ বিহার, আসাম, উৎকল গৌরাঙ্গ গানে মাতিয়াছিল এবং সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথ প্রেম-হুঙ্কারে প্রকম্পিত হইয়াছিল; যে গীতিতে সাধক, সন্ন্যাসী তাপসাদির ন্যায় সংসারী বিষয়ীও আকৃষ্ট, যাহাতে পণ্ডিত মূর্খ,পুণ্যাত্মা পাপী, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেরই, জীবমাত্রেরই অধিকার,—যাহা জীব মাত্রেরই গতি; যাহাতে কেহ সালোক্য, কেহ বা সাযুজ্য কামনা করে,কেহ ষড়ৈশ্বর্য্য, কেহ অষ্টসিদ্ধি আশীর্ব্বাদ চায়, কেহ বা দৈনিক এক মুষ্টি অন্ন প্রার্থনা করে; কেহ বা কেবল সেই প্রাণেশ্বরের প্রেম ভিক্ষা চায়;—যে গীতি অবিচলিত আস্তিকতার ন্যায় নিরতিশয় নাস্তিকতার দ্বারাও গীত,—সরস ভক্তি প্রীতির ন্যায়, শুষ্ক জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারাও প্রচারিত; যাহা, যে ভাবেই হউক, জীবের জীবনোপায় এবং জগতের মূল অবলম্বন-যষ্টি;—সেই বিপুল, বিরাট, ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী-সঙ্গীতের—সেই অসীম,অনন্ত, অনাদি, অবিনশ্বর মহা গীতের একটী ক্ষুদ্র, ক্ষীণ, মৃদু মধুর তরঙ্গ,—শিশির কুমার ঘোষের এই গীতিগ্রন্থ। ইহা সুস্নিগ্ধ শিশির বিন্দুবৎ শীতল ও সুন্দর। ইহা ভগবানের সর্ব্ব-শক্তিমত্তার, অসীম ও অতুল ঐশ্বর্য্যের সংগীত নহে,—ইহা তাঁহার নির্ম্মল কমনীয়তার নিরবচ্ছিন্ন মাধুর্য্যময়ী গীতি।

কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, জ্ঞাতি-বধ-বিমুখ অর্জ্জুনকে, তত্ত্ব জ্ঞানের উপদেশ প্রদান কল্পে, স্বকীয় ভগবচ্ছক্তি, ঐশী-ঐশ্বর্য্য ও বিপুল বিস্ময়কর বিরাট বিভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই অনুপম, অক্ষয় উপদেশ-গীতি, মহা কবি মহর্ষি ব্যাস দেব বিরচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। বোধ হয়, কেবল একমাত্র, বেদশাস্ত্র ব্যতীত, সমগ্র শাস্ত্রে ও সাহিত্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। উহা দার্শনিক কাব্য বা কাব্যাকারে দর্শন। উহার অত্যুচ্চ "ফিলজফির" ন্যায় কাব্যাংশও উচ্চ। উহা পণ্ডিত, জ্ঞানী, দার্শনিক, ভাবুক, ও চিন্তকগণেরই জ্ঞানগম্য ও চিন্তার বিষয়; অতএব তাঁহাদিগেরই জ্ঞানপ্রদ, শিক্ষনীয়, উপভোগ্য ও আলোচনীয়। উহার নিগূঢ় তত্ত্ব, প্রগাঢ় রস,অত্যুচ্চভাব এবং অতি গভীর আধ্যাত্মিক গবেষণা সামান্যের সহজ বুদ্ধি হইতে, সংসারী বিষয়ীজনের সংকীর্ণ জ্ঞান হইতে—দূর,অতি দূর। পরন্তু শ্রীমদ্ভগদ্গীতায় শ্রীভগবানের অত্যৈশ্বর্য্যের ও অত্যৌর্জ্জল্যের গীতি; সে অনন্ত ঐশ্বর্য্য, সে অসীম নয়নান্ধকর ঔজ্জ্বল্য, স্বল্পবুদ্ধি ক্ষীণশক্তি সাধারণ লোকে ধারণ ও অনুধাবন করিতে পারে না। তদ্দ্বারা ভীত, বিস্মিত, চমকিত, আতঙ্কিত হয়; বিবশ বিধ্বস্ত হইয়া, তাহা হইতে যেন পলায়ন করিতে চায়। অপিচ, গীতোক্ত অনুপম উপদেশাবলী বিষ্ণু-অবতার মানব-রূপী শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ-বিনিস্থত হইলেও গীতোক্ত ঈশ্বর পূর্ণব্রহ্ম, উপনিষদের অখণ্ড, অব্যয়, অচিন্ত্য অপার পরমেশ্বর, মহান্ মহিমান্বিত, নিরাকার কূটস্থ চৈতন্য; পরন্তু গীতা-বিবৃতি-কালে অর্জ্জুন-সম্মুখে তদীয় দিব্য দৃষ্টিতে, ভগবানের যে মূর্ত্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার অপরিমেয়, দুর্নিরীক্ষ্য, বিপুল, বিশ্বব্যাপী, মার্ত্তণ্ড,বিরাটমূর্ত্তি। সে উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ত্রিলোক প্রব্যথিত হইয়াছিল; স্বয়ং অর্জ্জুন,—বিশ্ববিজয়ী বীর অর্জ্জুন, অত্যন্ত

আতঙ্কিত ও দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন! অতএব অন্যের আর কথা কি? ভীতির সহিত ভক্তির,—শঙ্কার সহিত শ্রদ্ধার উদ্রেক অসম্ভব না হইলেও, আতঙ্ক ও বিস্ময়, বোধ হয়, মনুষ্যপ্রেম আকর্ষণ করিতে পারে না। অতএব ভগবানের বিরাটরূপ ও স্বরূপ, যদি মনুষ্যহৃদয় আদৌ ধারণ করিতে পারে, তাহাতে কেবল বিস্ময়াবিষ্ট ও ভীত হয়, তাহা সম্ভবতঃ ভালবাসিতে পারে না।

অনাদিমধ্যান্তমনন্ত বীর্য্য
মনন্তবাহুং শশি সূর্য্য নেত্রং।
* * *
রূপং মহত্তে বহুবক্ত্র নেত্রং
মহাবাহো বহুবাহুরুপাদং।
বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং।
* * *
নভঃস্পৃশংদীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্ত বিশাল নেত্রং।
* * *
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্টৈব কালানল সন্নিভানি।
* * *

ইহা ভয়ানকের ভয়ানক! ভগবানের গীতোক্ত এই বিশ্বরূপ। পক্ষান্তরে, ভগবানের যে অবতার-মূর্ত্তি হইতে ঐ বিশ্বমূর্ত্তি অর্জ্জুন সমক্ষে অভিব্যক্ত, তাহাও চতুর্ভূজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী, কিরীট-কুণ্ডলধারী ঐশী মূর্ত্তি। ইহাও সামান্য প্রাণীর সম্ভবতঃ শঙ্কাপ্রদ। এ মূর্ত্তি পবিত্রতা ও পূজা উদ্দীপন করিতে পারেন; প্রেম উদ্দীপন করিতে সর্ব্বত্র ও সামান্যতঃ পারেন কি না, বলা কঠিন। গীতোক্ত ঐশী রূপ ও ঐশী স্বরূপ ও ঐশী শক্তিও আধ্যাত্মিক সাধন উপদেশ, অত্যুচ্চ অত্যুগ্র এবং অত্যৈশ্বর্য্য-সমন্বিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বক্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—মহাভারতোক্ত রাজনৈতিক শ্রীকৃষ্ণ—কুরুক্ষেত্রকর্ত্তা এক-ছত্র ভারত-সাম্রাজ্য-সংস্থাপক শ্রীকৃষ্ণ।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ "গীতা" নামে অভিহিত হইয়াছে। উপরোক্তের অনুসরণেই হইয়াছে। এ "গীতা"রও বক্তা এবং উপদেষ্টা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বরূপে এবং রূপে। এ গীতায় ভগবানের ভয়বিস্ময়প্রদ ঐশী শক্তি ও ঐশী ঐশ্বর্য্যের গান নহে, দুরাবগাহ্য গম্ভীর জ্ঞানাত্মক উপদেশ নহে;—ইহাতে শ্রীভগবানের সুন্দর, মধুর, সুস্নিগ্ধ, কমনীয়, কান্ত রূপের ও কমল শীতল, রসাল শান্ত স্বরূপের সংগীত;—পরন্তু ইহাতে পরমেশ্বরের অবিমিশ্র মাধুর্য্যময় প্রেমাত্মক উপদেশ। এ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মোহন, সুন্দর, প্রেমিক, রসিক, কবি, শিল্পী, সুনিপুণ চিত্রকর, চিত্তচোর চটুল নায়ক; মোহনচূড়া ও মধুর মুরলীধারী সুচিক্কণ শ্যামচাঁদ; রমণীয় রভস-রাস-বিহারী, কুটিল কটাক্ষে প্রেমিক প্রেমিকার মন-প্রাণ পরিমন্থনকারী সেই বিনোদ বৃন্দাবনচন্দ্র;—এ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ, সেই চিরস্মরণীয় প্রেমলীলা-ভূমি কালিন্দীকূলস্থিত চিরবসন্ত-বিভাসিত, মধুগুঞ্জিত, কোকিল কূজিত নিভৃত নিকুঞ্জ-কুটীরের কালাচাঁদ। এই অর্থে ইহা "কালাচাঁদ গীতা।" বৃহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা নহে; তাহা বিদ্রূপকর তাহা "বে-আদবী।" কিন্তু বৃহতের আদর্শ লইয়া ক্ষুদ্র চিরকালই আত্মোন্নতির বা আত্মাভিব্যক্তির আত্মোপযোগী পথ প্রস্তুত বা পরিষ্কার করে। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনকে নিগূঢ় যোগ-তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন; কালাচাঁদ-গীতায় তিনি পঙ্কপ্রেমাসক্ত সখীকে নিগূঢ় প্রেম-রহস্যের উপদেশ দিয়াছেন;—সেই উপদেশ শীতল, সরল সান্ত্বনাপ্রদ, কাম-গন্ধ-বিরহিত; অথচ কামুক অপেক্ষা অধিকতর উদ্দীপ্ত আবেগ অনুরাগযুক্ত, পারমার্থিক প্রেম-সাধনা; তাহা বৈষ্ণব ধর্ম্ম-মূলক, উপা-

দেয়, উচ্চ ও অতি মূল্যবান তত্ত্ব। শ্রী ভগবদ্গীতার সহিত এই কালাচাঁদ-গীতার কেবল নামকরণে ও উপদেশ কর্ত্তার একত্বে, যে কিছু ঈষদ্ সাদৃশ্য; নহিলে শেষোক্ত প্রথমোক্ত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে পরিকীর্ত্তিত। কিন্তু, ইহাও বলা আবশ্যক যে, বাঙ্গালী বাবু-বিরচিত এই গীতা-মহর্ষি বেদব্যাস-বিরচিত গীতার বা সনাতন ও সমুন্নত গীতা-মতের ও গীতা-মহিমার অনুমাত্র অতিক্রম করে নাই; তাহার সহিত সামঞ্জস্যের স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য রাখিয়া তাহারই ভক্তি-প্রীতি পারাবারে একটী বিমল বৈষ্ণব তরঙ্গ,—একটী অভিনব প্রেমানুরাগ-উচ্ছ্বাস উত্থিত করিয়াছে।

কালাচাঁদ গীতার আরাধ্য ঈশ্বর, অগ্রেই একরূপ বলিয়াছি, প্রেমিক চূড়ামণি; বহিঃমূর্ত্তি ও অন্তঃস্বরূপে, সুকুমার, সুললিত ও সুমধুর লাবণ্যাধার। এবং সর্ব্বোপরি তিনি,—গ্রন্থকারের নিজের কথায়—"রসিকশেখর।" তিনি রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ-গ্রাহ্য অমিয় শব্দসম্ভার-সমন্বিত শরীরী-সত্ত্বা-সৌন্দর্য্য-শেখর-মাধুরীর অতুল নিধি,---কবিতার ও কমনীয়তার অবিশ্রান্ত উৎস, এক কথায় মনুষ্যের কান্ত প্রবৃত্তির অতীব প্রলোভনীয় পদার্থ; অতীব প্রিয়দর্শন ও প্রীতিভাজন পুরুষ; যাঁহাকে দেখিবা মাত্র ও ভাবিবা মাত্র ভালবাসিতেই হইবে; নিপট কঠিন প্রাণীও ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবে না। পুনঃ এ ঈশ্বর প্রতি মুহূর্ত্তের অতি প্রত্যক্ষ, পারিবারিক ঈশ্বর, সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বন্ধু, প্রাণেশ্বর, পতি, জীবনবল্লভ, হৃদয়ের রমণীয় নিধি—বুক জুড়াইবার বিনোদ বস্তু। এ ঈশ্বর, ঈশ্বরাবতার অপেক্ষাও একমাত্র অতিরিক্ত মনুষ্য।

পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা তোমারে ভুঞ্জিব।
তবে দয়াময় তোমারে বলিব॥
বদন হেরিব বচন শুনিব।
অঙ্গ-ঘ্রাণ স্পর্শ আস্বাদন লব॥

পুনশ্চ

পিরীতি করিব কেমনে তোমায়।
যদি তুমি তার না"কর"সহায়?
মানুষের সঙ্গে পিরীতি করিতে।
মানুষ তোমার হইবে হইতে॥

* * *

রূপে গুণে প্রাণ কাড়িয়া লইয়া।
শীতল চরণে লও আকর্ষিয়া॥
তবেত কান্দিব চরণে পড়িয়ে।
যেন নারী কান্দে পতি মুখ চেয়ে॥
চরণ ধোয়াব আঁখি-বারি দিয়া।
প্রাণ জুড়াইব চরণ সেবিয়া॥

ইহা ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠা, সন্দেহ নাই, এবং ইহা ভগবৎসেবার সহজ সাধনও হইতে পারে। কিন্তু, আমার শঙ্কা হয়, ইহা ঐশী স্বরূপের কিঞ্চিদধিক "মানবীকরণ" বলিয়া প্রতীত হইবে। তবে, অল্লাধিক পরিমাণে মানবীকরণ ব্যতীত মনুষ্যের বিশেষতঃ সাধারণ মনুষ্যের উপাস্য ঈশ্বর এক রূপ অসম্ভব, ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না। মূর্ত্তির মানবীকরণ বা গুণের মানবীকরণ, যে দিক দিয়াই হউক, মানবীকরণ আছেই; সাকার উপাসকের ন্যায়, নিরাকার উপাসকেরও আছে। তাহা যাউক। এ সম্বন্ধে, গ্রন্থকারের যুক্তি ও বিশ্বাস এইরূপ যে, ভগবানে মনুষ্য স্বরূপ এবং মনুষ্যাতীত স্বরূপ সমস্তই বিদ্যমান। কিন্তু মনুষ্য কেবল সেই সকল ঐশী স্বরূপের অনুসরণ ও উপাসনা করিতে পারে, যাহা মনুষ্যের নিজ মনুষ্যত্বে বিদ্যমান। পরন্তু, তাহার অধিক, অতিরিক্ত ও অতীত যাহা, তাহা আদৌ মনুষ্য জ্ঞানের অনায়ত্ত। যাহা হউক, এই

বহু বিতর্কিত বিষয়ে পুনঃ তর্কে প্রবেশ করার আমার প্রয়োজন নাই। অতঃপর গ্রন্থের উপাখ্যান ও উপকরণাদির অনুসরণ করা যাইতেছে।

ভগবানের সৌন্দর্য্যানুরক্তি ও রস কৌতুক-প্রিয়তার সুতীক্ষ্ণানুভূতি হইতে এই গ্রন্থের উৎপত্তি; পরন্তু উহার অভিব্যক্তি ও উপসংহারও ঐ দুই মধুর উপকরণে। নিভৃত গিরি-শেখরে নীল বর্ণ-রঞ্জিত এক অরণ্য-কুসুম ফুটিয়াছে। সদ্য প্রস্ফুটিত অদৃষ্টপূর্ব্ব অরণ্য-কুসুম অকস্মাৎ গ্রন্থকারের নয়নপথে পতিত; কুসুমের নীলিমা-লাবণ্যে; তাহার সুরভি-সম্পদে, তাহার কমনীয় কান্তির চিত্র-চাতুর্য্যে গ্রন্থকার সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ। এ সৌন্দর্য্যের, এ সুষমার—এ সুললিত নীলিমার নির্ম্মাতা কে? এই বিচিত্র চিত্র বৈচিত্র্যের বিধাতৃ কে? কে এই দুর্গম স্থানে—এই সুকঠিন গিরি-শরীরে এত সুন্দর এমন কান্ত, এই অমূল্য কুসুম রত্ন, এমন বিমল বর্ণ-বৈভবে বিভাসিত করিয়া লুকাইয়া রাখিলেন! বর্ণরাগ জীবন্ত, তুলিকা-রেখা অত্যন্ত সজীব! এ অতুল ফুল যে এখনি কে আঁকিয়া অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন! তিনি কে? তিনি কেমন? আ! তিনি যিনিই হউন, বড়ই সুনিপুণ শিল্পী—বড়ই সৌন্দর্য্যানুরাগী চিত্রকর, বড়ই রসিক কবি, আর মধুর কারিকর!

আপনি আঁকিয়া দেখিছে বসিয়া
নয়নে বহিছে ধারা।
* * *
তুলিতে সুগন্ধ যতনে মাখিয়া
ফুলেতে দিতেছে ছিটে;
* * *
মনে হয় যেন ফুলে রঙ দিয়া
এই মাত্র পলায়েছে।

এইভাব—সৃষ্টি-কার্য্য দেখিয়া স্রষ্টাকে অনুভব ও অনুসন্ধানের "আইডিয়া" অভিনব নয়; প্রত্যুত উহা মনুষ্য-স্বভাব-বৎ বা হিমালয় পর্ব্বতবৎ পুরাতন; ঈশ্বরের অস্তিত্ব সমর্থনার্থে উহা একটি প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু, উপস্থিত স্থলে ইহা অভিনব ভাবে ও সবিশেষ ব্যক্তিগত ভাবে অত্যন্তানুভূত। এবং সেই ঐকান্তিক ও আন্তরিক অনুভূতিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থের উৎপত্তির সর্ব্ব প্রধান উপলক্ষ; এই জন্য উহার উল্লেখ। জড়-বিজ্ঞানাধ্যায়ী ব্যক্তি গিরি-'পরে নীল বর্ণের নূতন কুসুম দেখিয়া,তাহার জাতি জ্ঞাতি নির্ণয় বা নির্ব্বাচন-কল্পে যাহাই করুন, তদ্বারা কবি মাত্রেই অল্লাধিক পরিমাণে বিমোহিত হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ একজন ভগবদ্ভক্ত ভাবুক যে তাহাতে ভগবৎ-সৌন্দর্য্য প্রীতি সুতীক্ষ্ণভাবে অনুভব করিয়াছিলেন, ইহা স্বাভাবিক। পরন্তু,এই গ্রন্থের আর একটী উপলক্ষ ঘটিয়াছিল; সেটীও সহৃদয় প্রকাশক বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। সেটী গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ভগবানের কৌতুক-প্রিয়তার অনুভূতি। যে ঘটনা হইতে উহা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ ঘটনা, একটা অকিঞ্চিৎকর তামাসা। কিন্তু, দেখিতেছি, যাহা অতি তুচ্ছ, যাহা কেবল হাস্যাস্পদ তামাসা মধ্যে পরিগণিত, তাহারও মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত থাকে। পেচক জাতি অন্ধকার-প্রিয় ও অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। জগতের যাতনাবাদী ও যাতনাবাদ-বিজ্ঞাপক ইংরাজী "পেসিমিষ্ট" (Pessimist) ও "পেসিমিজম" (Pessimism) প্রভৃতি শব্দ, হয়ত পেচক-প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যান্ধকার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পেচক অন্ধকার-

প্রবণ, প্রবীণ ও গম্ভীর। কিন্তু, পেচক-পেচকীর পারিবারিক কলহে অতি গম্ভীরেরও গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়, পাঠক অবশ্য জানেন। পেচক-দম্পতীর কলহ, প্রেমের কি অপ্রেমের পরীক্ষা করার অবসর পাই নাই; কিন্তু, তাহা দেখিলে, বেদীস্থ আচার্য্য, যজ্ঞাহুতি-হস্ত-হোতা এবং এজলাসস্থ হাকিম, তিনের কেহই হাস্য-সম্বরণ করিতে সমর্থ হন না, ইহা বলিতে পারি। একদিন আমাদের এই গীতাকারও ঐ দর্শনীয় দৃশ্য দেখিয়া হাস্য-তরঙ্গহিল্লোলে হত-গাম্ভীর্য্য হইয়াছিলেন। পক্ষী-তত্ত্বাধ্যায়ী দারবিন-দৌহিত্র এই পেচক ব্যাপারে বিবর্ত্তবাদের যে স্তরই আবিষ্কার করুন,আমাদের গ্রন্থকার উহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার কৌতুকপ্রিয়তা আস্বাদ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত দুই ঘটনায়, শিশির বাবুর মনের উপর মোটের উপর ফল হইয়াছিল এই যে,—তিনি হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায়, বুঝিয়াছিলেন ও বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে পরমেশ্বর পরম সুন্দর ও সৌন্দর্য্য-প্রিয় পরম রসিক ও হাস্য কৌতুকপ্রবণ। নির্ভয়ে তাঁহার নিকট যাওয়া যাইতে পারে; তজ্জন্য সবিশেষ জ্ঞান গাম্ভীর্য্যের ও উৎকট সন্ন্যাস-সাধনার প্রয়োজন হয় না। আন্তরিক প্রীতি লইয়া সরল প্রাণে একটু চেষ্টা করিলেই তাঁহাকে ধরা যাইতে পারে।

ইহা অতি সরল বিশ্বাস, সন্দেহ নাই; কিন্তু ধর্ম্ম-বিশ্বাস মাত্রই সরল,—অন্ততঃ সরল হওয়া উচিত ও আবশ্যক, আমার বোধ হয়। যাহা হউক, ঐ বিশ্বাসের উপরেই প্রধানতঃ এই গ্রন্থের আপাদ-মস্তক গ্রন্থিত। এবং ঐ বিশ্বাস ভিত্তিভূমি করিয়া ও প্রত্যক্ষ জড় জগতের ঘটনাবলীকে সাক্ষ্য মান্য করিয়া, সৃষ্টিতত্ত্ব, সংসার-তত্ত্ব, পরলোক-তত্ত্ব ও সাধন-তত্ত্ব প্রভৃতি এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। আলোচনা এত সাদা কথায় ও সরল গাথায় করা হইয়াছে যে, তাহা সরবতবৎ সুখ-সেব্য ও শীতল।

ইদানীং আমাদের সহযোগী সাহিত্যে আখ্যান-কাব্যের অত্যন্তাভাব এবং খণ্ড কাব্যের অতি প্রাদুর্ভাব। শিশির বাবুর এই গ্রন্থ গীতি কবিতাকারে লিখিত আখ্যান-কাব্য। কালাচাঁদ-গীতা একটী সুসংবদ্ধ স্বপ্ন-উপাখ্যান। উপাখ্যানে কল্পনা-নৈপুণ্য-কবিত্ব-সৌন্দর্য্য ও সংগঠন কৌশল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

উপাখ্যানের আরম্ভ কোমল, করুণ,—হৃদয়স্পর্শী। এক তরুণ যুবক গৃহ-সংসার ত্যাগ করিয়া গহন-অরণ্যে তপস্যা নিরত। প্রণয়িনী পত্নী, নবজাত পুত্র,--যুবকের সংসার বড় সুখেরই সংসার ছিল। তথাচ তাহার স্নেহ-বন্ধন ছেদন করিয়া যুবক অরণ্যবাসী, অনসনাদি দ্বারা অতি কৃচ্ছ্র-সাধ্য তপ-ব্রতে ব্রতী। পতি-প্রাণা পত্নী পতির অন্বেষণে অরণ্যে উপস্থিত; যোগাসনোপবিষ্ট সন্ন্যাসী স্বামীর নিকটে শিশু-ক্রোড়ে করিয়া দণ্ডায়মানা, গ্রন্থের আরম্ভেই এই করুণ দৃশ্য পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত। লিপি-চিত্রের সাহায্যার্থে এই দৃশ্যের একটি তুলিকালেখ্যও পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। উভয় চিত্রই সুন্দর ফুটিয়াছে।

যুবতী পত্নী, যুবক পতিকে, গৃহে লইয়া যাইবার জন্য—পুনঃ গৃহবাসী করিবার জন্য-প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন; যুবক তাহাতে সম্পূর্ণ অসম্মত;—

"গৃহে যাহ তুমি আমি না যাইব"

পত্নী শিশু সন্তানটিকে স্বামী-সম্মুখে ধরিয়া প্রীতি ভরে আদরে ও কাতরে বলিতেছেন;—

"এই দেখ শিশু আনিয়াছি কোলে
"চাহিছে তোমারে শুন কিবা বলে।"

মাতৃ ক্রোড়স্থ এক বৎসর বয়স্ক বালক তখনি অমিয় পূর্ণ আধ স্বরে "বাআ" বলিয়া ডাকিয়া স্বর্গীয় সুধা বিন্দুবৎ সুমধুর শৈশব হাসিটী ফুটাইল। মায়ার এ মোহন আকর্ষণের ফল ঐন্দ্রজালিক। সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর শুষ্ক হৃদয় তখন স্নেহ-দ্রবীভূত। সন্ন্যাসী চমকিত হইয়া চিত্রপুত্তলীবৎ হস্ত প্রসারণ করিলেন, অজ্ঞাত আগ্রহে পুত্র ক্রোড়ে লইয়া বার বার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ ভাব অধিকক্ষণ রহিল না, অবিলম্বেই আত্মস্থ হইয়া যুবক যুবতীকে বলিলেন "কেন তুমি এ মায়াজাল বিস্তার করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছ, আমি যদি কখনও তোমার কিছু প্রিয়কার্য্য করিয়া থাকি, তুমি আজ তাহা স্মরণ করিয়া এ নিষ্ঠুরতা হইতে নিবৃত্ত হও।"

এ চিত্রে স্বামী স্ত্রীর করুণ কথোপকথন স্ত্রীর স্বামী সেবা ও তদ্বারা প্রীতি তত্ত্বের আভাস উপাদেয়। বর্ণনা অত্যন্ত সরল, শিল্প-কৌশলের লেশ মাত্র নাই। কেবল স্বভাবিকতার সৌন্দর্য্যেই ইহা সুন্দর।

পতিপ্রাণা পত্নী পতি-হৃদয়ের গতি অনুভবে সমর্থা হইয়া, প্রকৃত প্রেমের—প্রেমের পরাকাষ্ঠারই পরিচয় দিলেন, পতির ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রতিবন্ধক হইলেন না। পতির আদেশানুসারে গৃহে প্রত্যাগমনে প্রস্তুত হইলেন।

"হেন কালে শিশু "বাআ বাআ" বলে।
ঢাকিল শিশুর বদন অঞ্চলে॥"
"চুপকর বাপ্ বিরক্ত ক'রনা।
"ধ্যান-ভঙ্গ হবে ও বলে ডেক না।
গলায় বসন প্রণাম করিল।
শিশু কোলে করি আশ্রমে আইল॥"

সন্ন্যাসী ধ্যান নিমগ্ন—যুগপৎ স্বপ্ন-নিমগ্ন; স্বপ্ন সরস, সুমধুর, সুদীর্ঘ। এই স্বপ্ন কাহিনী কবির স্বকপোল-কল্পিত, ইহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বোপদেশের সহিত কাব্যরস ও কাব্যামোদ আছে। ইহাকে বৈষ্ণব সাধন প্রণালীর একটি রূপক বলিলেও বলা যাইতে পারে; কিন্তু দৃষ্টতঃ ইহাকে রূপক বলিয়া বোধ হইবে না, এবং রূপক স্বরূপ ব্যাখ্যা না করিলেও চলে। সুদূর জ্ঞাতিত্বে এ উপাখ্যান কিয়ৎ পরিমাণে "পিলগ্রিমস প্রগ্রেস" ও ঈষন্মাত্রায় "প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ের" শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে।

সাধু স্বপ্ন দেখিলেন "পঞ্চসখী সভা।" সখী সভার সংগঠন এই রূপ;—

"ভুবন মোহিনী রূপরস খনি
শৈশব যৌবন মেলা।
মাধবী তলায় কুসুম শয্যায়
অচেতন নববালা॥
বসিয়া নিকটে করিছে বীজন
রূপবতী একজন।
বালার বদনে তরঙ্গ খেলিছে
করিছে তা নিরীক্ষণ॥
আর তিন নারী ক্রমে তথি এল
কোথা হতে নাহি জানি।
দেখিছে চাহিয়া বসি চারিভিতে
মুখে কারু নাহি বাণী॥
রমণীর মেলা দৈবে মিলিয়াছে
কেহ কারে নাহি চিনে।
অচেতন বালা দেখে সবে চাহি
সেবা করে এক মনে॥"

স্ব স্ব প্রাণেশ্বরের বিচ্ছেদে, পরস্পরে অপরিচিতা পঞ্চ সখী পাঁচ দিক্ হইতে এক স্থানে আসিয়া, ঘটনাক্রমে মিলিত হইয়াছেন। এবং একে একে আপন আপন জীবন কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। উপাখ্যানের এ গঠনটুকু কিয়ৎ পরিমাণে পারস্য "চাহার দরবেসের" মত বলা যাইতে পারে।

এই "পঞ্চসখী" বৈষ্ণব সাধন প্রণালীর

রস পঞ্চের সাধিকা। প্রথমাসখী,—"রসরঙ্গিনী" দ্বিতীয়া,—"কাঙ্গালিনী" তৃতীয়া,—"কুলকামিনী" চতুর্থা,—"প্রেম-তরঙ্গিনী" পঞ্চমা—"সজল নয়না"। ইহাঁদের স্ব স্ব জীবন কাহিনীর বিবৃতি তাঁহাদের সাধন প্রণালীরই প্রতিকৃতি। "সাধন প্রণালী" শুনিয়াই কেহ শঙ্কায় শিহরিবেন না। এই সাধন প্রণালীর প্রতিকৃতিতে কল্পনার এমনি সুকুমার ক্রীড়া ও কাব্য রসের এমনি মধুর তরঙ্গ যে, উহা নবন্যাসের মত চিত্তাকর্ষণে সমর্থ। শিশির বাবু যে কিরূপ রসিক লোক, তাহা এ গ্রন্থ পাঠেও বিলক্ষণ বুঝা যায়। তা, এত গুলি, বড় কম নয় পাঁচ পাঁচটি যুবতী, রূপ রসবতী নায়িকার মধ্যস্থলে যখন আরও একটী অনুপমা মহানায়িকা কেন্দ্রীভূতা, আর যখন সর্ব্ববিধ নায়কের অধিনায়ক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইহার মহানায়ক, তখন তুচ্ছ নবন্যাসের তরল রসের সহিত ইহার প্রগাঢ় নির্ম্মল রসের তুলনা করাও তত সঙ্গত নহে।

আমি, সখী সভার কথা কহিতেছিলাম। সখীদের মধ্যে "সুস্নিগ্ধ" চোখ চাওয়াচাহি হইয়া ক্রমে সখ্যভাব উপস্থিত হইল। অচেতন বালা" চেতন হইলে—

"পুছে এক সখি" "কেন অচেতন
কিবা নাম কোথা ঘর।
কাহার হৃদয় শীতল করহ
কোথা তব প্রাণেশ্বর?
এ ঘোর বিপিনে আইলে কেমনে
কেন হলে অচেতন
বদন কমল প্রফুল্ল নেহারি
পেয়েছ কি প্রাণধন?"

কিন্তু, এ সখীটি সাতিশয় লজ্জা-শীলা। ইনি প্রেমতরঙ্গিনী, প্রেমাবেশে, ও হৃদয়োচ্ছ্বাসে অহরহই অবসন্ন। অতএব তজ্জন্যই বোধ হয়, এত বড় গুরুতর প্রশ্নটার কোন প্রীতিকর উত্তর দিয়া উঠিতে পারিলেন না, দিতে সাহসীই হইলেন না। প্রশ্নের উত্তরে "ধীরে ধীরে" পুনঃ প্রশ্ন করিলেন।

"তোরা কেগো ধনি ভুবন মোহিনী
পরিচয় দে গো মোরে।"

বড়ই মুস্কিল উপস্থিত হইল। কে আগে আপন কাহিনী কহিবে! সকলেই ত প্রায় সমাবস্থাপন্না! রসরঙ্গিনী সর্ব্বাগ্রে আপন কথা আরম্ভ করিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তিনি কিঞ্চিৎ অধিক শক্তিশালিনী বটে।

রসরঙ্গিনী সৌন্দর্য্যাভিলাষিনী, রূপ-বিমুগ্ধা শান্তরস; ফুলটী ফুটিয়া, পাপড়ীটী উঠিয়া, রঙটী হাসিয়া তাহার চিত্ত মন আকর্ষণ করে; সর্ব্বত্রই প্রকৃতির প্রফুল্ল প্রশান্ত সৌন্দর্য্যে তিনি মোহিত হন এবং সে সৌন্দর্য্যের শিল্পকরকে খুঁজেন। খুঁজিতে খুঁজিতে এক দিন সেই শিল্পীকে সহজেই পুষ্পবাটিকায় উপবিষ্ট ধৃত করিলেন এবং শিল্পীর সহিত শোভামুগ্ধার এক সুস্নিগ্ধ শান্ত সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল। তাৎপর্য্য—শান্তরস জড় জগতের শান্তি সৌন্দর্য্যে প্রথমতঃ আকৃষ্ট হইয়া শেষে জগতপতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংবদ্ধ হয়। রঙ্গিনীর কাহিনীতে সুখশোক, যোগ-বিয়োগ, ইহকাল, পরকাল, কামনা ও সাধনা প্রভৃতি মানব জীবনের ও মানবধর্ম্মের বহুজটিল সমস্যায় সামঞ্জস্যের চেষ্টা আছে, তাহা শিক্ষা-সান্ত্বনা-প্রদ। কিন্তু তাহার কিছুই এস্থলে স্পর্শ করিবার স্থান ও সময় আমার নাই।

সৌন্দর্য্য-শোভাময় বিপিনে রসরঙ্গিনীর নিকট "রসিক-শেখর" আসেন, আলাপ করেন, উপদেশ দেন; আর রঙ্গিনী তথায় থাকিয়া,—

"প্রতি পদে দেখি তার করিগিরি।
সুখেতে বিভোর ঘুরে ঘুরে মরি।"

দ্বিতীয়া সখী ;—কাঙ্গালিনী, দাস্য রসের সাধিকা,

"তাঁর যোগ্য হব তাঁর কাছে রব
বসিব পালঙ্কতলে।
ছুটী রাঙ্গা পদ হৃদয়ে ধরিয়া
দুঃখভার দিব ফেলে॥"

কিন্তু, কাঙ্গালিনী আপনার কুরূপের জন্য কুণ্ঠিতা। এ কুরূপের অর্থ,—হৃদয় মনের মলিনতা।

"সুবেশ করিতে আরসী আগেতে
বসিনু গৌরব করি।
আরসী চাহিতে ভয় হল চিতে
আপন বদন হেরি॥
এত কুরূপিনী কভু নাহি জানি
হৃদয় শুকায়ে গেল।
অথবা দর্পণ মলিন হয়েছে
তাহে মুখ হেন হল॥"

না, দর্পণ মলিন হয় নাই। কাঙ্গালিনী যতই যত্নে দর্পণ মার্জ্জিত করেন, কুরূপ ততই অধিকতর কদর্য্য হইয়া উঠে! ব্রণ বসন্তাদি আহা কতই ক্ষত! ষড়রিপুর সহস্র ক্ষত চিহ্ন অঙ্গে, বদনে বিভাসিত! এরূপ কুরূপ লইয়া কিরূপে কাঙ্গালিনী সেই পরম সুন্দরের নিকট যাইবেন! কাঙ্গালিনী কত ব্রত নিয়ম উপবাস কঠোরতা করিলেন ; কিন্তু কিছুতেই মনের মালিন্যরূপ কুৎসিৎ মূর্ত্তি ঘুচিল না।

"হলুদ মাখিয়া রোদে বসে রই।
তাহাতে বরণ আর মন্দ হয়।
বেশম মাখিয়া পণ্ডশ্রম হয়।
মলিন বরণ কিছুতে না যায়॥
বাঁকা অঙ্গ ঋজু করি জোর করি।
পূর্ব্ব নত হয় যেই দেই ছাড়ি।"

তাহার পর ভক্তি-রূপিনী যমুনার নির্ম্মল জলে নিয়মিত অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া কুরূপা কাঙ্গালিনী সুরূপা সুন্দরী হইলেন। তখন 'সুন্দর' স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সুন্দরী সেবায় নিরত।

"ফুল শয্যা যতনে বিছাই।
নিদ্রা যান সুখে হরি, পদ সেবি মুখ হেরি,
হৃদে রাখি অবশে ঘুমাই।
পঁহু সিংহাসনে বসে রাঙ্গা পা মুছাই কেশে,
সেই ধূলা অঙ্গের চন্দন।"

শান্ত-জ্ঞানী ভক্তির বড় পক্ষপাতী নহেন। অতএব কাঙ্গালিনীর এই স্বামী সেবা-কাহিনী রস-রঙ্গিনীর কাণে কিছু কঠিন বাজিল। সৌন্দর্য্য-সোহাগ-বিলাসিনী রস-রঙ্গিনী, বোধ হয়, এক মাত্রা এখনকার স্বাধীনতা সত্বাধিকারবাদিনী New woman, অতএব কাঙ্গালিনীর দারুণ দাসীত্বের সংবাদে তিনি শিহরিয়া বলিলেন,—"ছিছি সে কেমন লো! তোর কথা শুনে যে হেসে মরি! এক দিকে এমনতর "ঠাকুরাণী" আর এক দিকে এমনতর দাসীত্বের কথা শুনে যে বাঁচিনে! ছিছি কপালখানা! কর্ত্তৃত্ব প্রিয় আর দাসীত্ব দাতা

"এমন প্রভুর মুখেতে আগুন
যারে এত কর ভয়।"

"তা, ভাই, কি করে তুই তোর হাবুটীর এতটা হাকিমি-গিরি হজম করিস একবার বল না? উত্তরে কাঙ্গালিনী কহিতেছেন—

"ও তার বুক হতে শ্রীচরণ মধু।
সেত বুক দিয়াছিল, আমি পদ মাগি নিনু,
তাহাতে দুঃখিত আমার বঁধু॥
ও তার পদতলে করি আমি বাস।
বুকে যদি সখি যাই, পড়ি পড়ি হয় ভয়,
চরণে নাহিক সেই ত্রাস॥
ও তার হিয়া মাঝে প্রেমাগুন জ্বলে।
মোর বুকে প্রেম নাই বন্ধুর প্রেমে দুঃখ পাই
তাই যাই স্নিগ্ধ পদতলে॥"

পুনশ্চ, কাঙ্গালিনী কহিতেছেন ;—

কেশে পদ মুছাইতে যাই।
পঁহু মোর ধরে হাতে আমি বলি এই কেশ
কিবা অপরাধী তুয়া পায়॥
একবার মুছায়ে দেখ সখি।

তুমি ত মুছাও নি সখি, আমি মুছাইয়া থাকি
দেখ দেখি কেবা বড় সুখী।"

উপসংহারে

"সবে যেতে চায় তার বুকে।
আমি যদি বুকে যাই পদ সেবা নাহি হয়,
পদ-সেবা ভার দিব কা'কে॥"

বিরহ ব্যতীত প্রেমে তরঙ্গ উঠে না; প্রেম প্রখর, প্রগাঢ় ও পবিত্র হয় না। পরন্তু, প্রেম ব্যতীত পরমেশ্বরের সহিত সহবাস সুখও কখন সুখদ নয়। বৈষ্ণব ধর্ম্ম-মতানুসারে দাসত্বব্রতী ভক্তের নিকট ভগবান নিয়ত উপস্থিত থাকেন। কিন্তু, বিরহ-অবিচ্ছিন্ন মধুর প্রেমের অভাবে, সে উপস্থিতির উপভোগ্যতাও ক্রমে কমিয়া যায়। প্রেমের মধুর রস-বিহীন দাস্য রস মাত্র উপজীব্য ভক্তের নিকট ভগবান ক্রমশঃ অনুপভোগ্য inertia হইতে পারেন। এই কাঙ্গালিনীর ভাগ্যে তাহাই শেষে ঘটিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি প্রেমের পরিবর্দ্ধনার্থে বিরহ-বর লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন অর্থাৎ বিধাতা কাঙ্গালিনীর কল্যাণার্থেই সেই বরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাই এখন কাঙ্গালিনী—

"বুকে যারে আমি রাখি কোথা পলাইল সখি
খুঁজি বেড়াই বিপিন মাঝারে।"

কিন্তু, ভাবুক ভক্ত কি সাধক ভক্তের একথা সহজে শুনিবার পাত্র! আর, বিরহ রস-বিলাসী ভক্তে ভগবানের বিভূতি কি কখনও কম হইতে পারে! অতএব উপরোক্ত উক্তির উত্তরে—

"বলে বলরাম দাসে ঝাঁপিয়া রাখিয়া বাসে
কেন ফাঁকি দিতেছ সখীরে॥"

তৃতীয়া সখী, কুলকামিনী। ইহাঁর ভক্তি ও প্রেম সংমিশ্রিত সাধন। কুলকামিনীর সংগঠনে কবি, কল্পনা নৈপুণ্যের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। স্বামী স্ত্রীর প্রণয়ের আকারে ভগবানের সহিত সাধকের শনৈ শনৈ সংযোগ, এই কুলকামিনীর কাহিনীতে অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। কুলকামিনী কহিতেছেন—

শৈশবে বিবাহ নাহি চিনি নাথ
কাণে শুনি, নাহি জানি।
যৌবন অঙ্কুরে মনে হ'ল তারে
কিসে পাব অনুমানি॥
পতি পরদেশ না জানি উদ্দেশ,
আমি ভাসি নিরাশ্রয়।
ভরণ পোষণ করে কোনজন
কিসে ধর্ম্ম রক্ষা হয়॥"

কুলবালা, "খেলায় ধূলায়" কখন এ কথা ভুলে যান; কখন আবার খেলা ধুলা ছাড়িয়া বিরলে বসিয়া ভাবেন। লজ্জারূপিনী কুল-কামিনী লজ্জায় পতি-কথা কাহাকে সুধাইতেও পারেন না। ক্রমে লজ্জা পরিহার করিয়া নিরুদ্দেশ পতি সংবাদ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নানা জনে নানা কথা বলিল। কেহ বলিল, মন্ত্রৌষধি কর; ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র হোম যজ্ঞ কর। কেহ বলিল,হরিনাম জপ কর। কুলকামিনী সবই করিলেন কিছুতে কিছু হইল না। পতি আসিলেন না। সংবাদও আসিল না।

"পুনঃ ভাবি পতি নহে সর্প জাতি
মন্ত্রে বশ হবে কেনে?"

আর কেবল নাম জপ করিয়াই বা কি হইবে! তাহাতে কেবল কণ্ঠ শুকাইয়া যায়; নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার কত বাকী আছে, তাহারই দিকে মন ধায়। পরন্তু, সংসারে চিন্তান্তরে মগ্ন থাকিয়া

"তার নাম লই আন কথা কই;
সতীত্বে কলঙ্ক হয়।"

তারপর কুলকামিনী আর কিছু না করে কেবল পতি চিন্তা আরম্ভ করিলেন। পতির

উদ্দেশে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। "তুমি কেমন, তুমি কোথায় আছ, তুমি আছ কি হায় তুমি নাই" ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন। কিন্তু,

"না পাই উত্তর তবু সুখে ভোর
পতি চিন্তা বড় মধু।"

এক এক দিন "সুবেশ করিয়া, সিন্দুর পরিয়া," পথে যাইয়া বসিয়া থাকেন; যদি পতি আসেন। পতি আসেন না; অভাগিনী কাঁদিয়া প্রত্যাগমন করেন। তারপর এক দিন

"আঁচল পাতিয়া ভূমেতে শুইয়া
কান্দি আমি শূন্য ঘরে।"

এমন সময়ে, পতি-মিলনের ন্যায় মুহূর্ত্তের জন্য, স্বপ্নে ভগবানের সহিত সঙ্গ হইল। সে স্বপ্ন "যবে সত্য ভাবি আনন্দ উথলে; মিথ্যাভাবি যদি ভাসি আঁখি জলে।" তারপর

"করিলা স্মরণ বিচিত্র বসন
সিন্দুরের কৌটা দিয়া।
বিবিধ গহনা মুক্তার মালা,
দিল মোরে পাঠাইয়া॥
কলম কাগজ পড়িবার পুঁথি
পাঠায়েছে সেই সনে।
লিখিতে পড়িতে হইবে আমায়
ভাবিলাম মনে মনে।"

তাহার পর কুলকামিনীর কুলিন স্বামীর নিকট হইতে এক পত্র আসিল। কিন্তু সন্দেহ ঘুচে না। ইহা কাহার প্রেরিত বস্ত্রালঙ্কার, কাহার প্রেরিত পত্র, কেহ ত প্রবঞ্চনা করে নাই? স্বামীর পত্র থানিতে লিখিত:—

"যাইতে না পারি এই কয় ছত্র।
পাঠানু তোমারে উপদেশ পত্র॥
চাহ অলঙ্কার পাঠাব তোমারে।
যদি চাহ মোরে যাইব সত্বরে॥
তেমন হইব যেমন হইবে।
যেরূপ বাঞ্ছহ সেরূপে পাইবে॥"

সুতরাং শরীর মন সুন্দর করিতে লাগিলেন। কিন্তু, কুল কামিনীর সেই প্রবাসী স্বামীর রূপখানি কেমন? কখন ত তিনি তাঁকে দেখেন নাই। আর কেমনতর রূপ লাবণ্যই বা কুলকামিনী কামনা করেন? কাজেই দিবানিশি তাঁহার ছবি "মুছি আর আঁকি, আঁকি আর মুছি" এইরূপ চলিতে লাগিল।

"যেন সেই ছবি জীবন পাইয়া
সপ্রেম নয়নে চায়।"

প্রিয়তমের আগমন-আশায় কত কত বার উদ্যোগ হইল। কত বিলাস-বস্তু, কত বাসর সজ্জা হায় বৃথা হইল! কত ভাল ভাল গাঁথা মালা শুকাইয়া গেল। তাহার পরে,—বহুদিনের বিরহ ব্যাথার পরে সেই কঠিন-হৃদয় আর আমি বিবেচনা করি, বহুপত্নীকও বটে,— কুলিনটী আসিলেন,— বিদেশীর বেশে। কিন্তু, কামিনী কখনও স্বামী দেখেন নাই। বড়ই বিভ্রাট উপস্থিত হইল। বিদেশী বলিলেন "আমি তোমার স্বামী নই। তাঁহার প্রেরিত পরিচারক; তোমার রক্ষণাবেক্ষণ ও আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি। বল, কি করিতে হইবে?" এ আরও যে বিপদ! কামিনী কি করিবেন! বিদেশী পরপুরুষের পানে তাকান্ না; তাঁহার পরিচালনায় চলেন না। কিন্তু, বিদেশী ব্যক্তি সর্ব্বদাই ছায়াবৎ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেন, কামিনীর কাণের কাছে ঘুন ঘুন করেন হায়! কুলবালার এ কি জ্বালা! বিদেশী ব্যক্তিটী স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবার জন্য কত স্থানে—কত দেব দেবীর নিকট কামিনীকে লইয়া গেলেন। কিন্তু, কাহাকেই কামিনীর প্রাণ চাহিল না; কাহাকেই তিনি প্রাণনাথ স্বামী রূপে গ্রহণ করিলেন না। অতঃপর প্রকৃত প্রাণেশ্বরের সহিত সম্মিলন হইল।

তখন অতীতের জন্য কামিনীর আক্ষেপ উপস্থিত হইল ;—

"আছে কিনা আছে সমুদয় মিছে
রহিব কি হব লয়।
ইহাই ভাবিয়া তোমা না ভজিয়া
জীবন করিনু ক্ষয়॥"

উত্তরে কামিনীর কর্ত্তাটী কহিতেছেন ;—

———"বলি প্রিয়া শুন॥
সন্দেহ কেবল পিরীতি বন্ধন
সন্দেহ জীবের বহুমূল্য ধন
বিয়োগ সন্দেহ যদি না রহিত।
তবে কি সংসার সরস হইত॥"

চতুর্থী সখী প্রেম-তরঙ্গিনী, কেবল মাত্র অবিমিশ্র প্রেম দ্বারা পরমেশ্বরের পরিচারিকা। ইনিই "মাধবীতলায়" অচেতন অবস্থায় ছিলেন। পরন্তু, পঞ্চমা—সজল-নয়না প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে সংপ্রাপ্তা রমণী। ইহারাও স্ব স্ব সমুন্নত সাধন কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু, কর্কশ হস্তে, আমি তাহার বিমল সৌন্দর্য্য-বিভূতি বিলোড়িত করিব না। রুচি হয়, পাঠক নিজেই তাহার অনুসন্ধান করিবেন।

পরন্তু, পঞ্চ-সখী-সভায় সন্ন্যাসীর উপস্থিতি। এই চিত্রে শিশির বাবু পরিহাস রসিকতার সহিত পরমার্থ তত্ত্বের পরিপাটী মিশ্রণ করিয়াছেন। সাধুর সহিত সখীদের কৃষ্ণ কথার একটু আলোচনা হইতেছে। সাধু বলিতেছেন ;—

"উপবাস করি, শরীর শুকাও,
তবে কৃষ্ণ-কৃপা পাবে।
কৃষ্ণের করুণা, ক্রমে বাড়ি যাবে,
যত দেহ শীর্ণ হবে॥"

সাধু-মুখে এ সংবাদ শুনিয়া সুন্দরীরা ত অবাক্, বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন।

"মোরা দুঃখ পাব, কৃষ্ণ সুখী হবে,
এত বন্ধু হ'তে নারে।
দুঃখের কাহিনী, শুনিলেই তিনি,
কাঁদি হন আত্মহারা।
দুঃখ মোরা নিব, তারে কাঁদাইব,
এ ভজন কেমন ধারা॥"

সাধু হাসিয়া বলিতেছেন "বাছা সকল! তোমরা বালিকা, সে বৃহৎ ব্যাপারের কি বুঝিবে? তা, ঐ চাঁচর চুলের রাশি রাখ্‌লে ত চোল্‌বে না,—যা'র উপর তোমাদের অত যত্ন—

কেশের মমতা ঘুচাইতে হবে
মুড়াইতে হবে মাথা।
তুলসী তলাতে মস্তক কুটিলে
তুষ্ট হবে কৃষ্ণ পিতা॥"

সৌন্দর্য্য-সেবী রসরঙ্গিণী, এ কথায়, সর্ব্বাগ্রেই শিহরিয়া বলিলেন। "না ঠাকুর, সেটী হতে পারছিল না,—

"কেশ ঘুচাইব, বেণী না বাঁধিব,
কোথা গুঁজি খোব চাঁপা।
মালতীর মালা, চিকণ গাঁথিয়া,
কেমনে বেড়িব খোঁপা॥
সে ভঙ্গিম বেণী, রসিক শেখর
দেখি যত সুখ পাবে।
তার মন জানি, রসে যত সুখ,
উপবাসে তা না হবে॥"

কাঙ্গালিনী কহিলেন।

"রাঙ্গাপদ ধুই, নয়নের জলে,
মুছাইয়া থাকি কেশে।
কেশ মুড়াইব, বন্ধু পদ ধুয়ে,
বল মুছাইব কিসে?"

অতপর রস-শক্তি-রূপিনী রাধিকার উৎপত্তি, কৃষ্ণের সহিত তাঁহার সম্মিলন, বৃন্দাবন লীলা রহস্য, সাধুর সাধনা-সিদ্ধি প্রভৃতি যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব ও নিগূঢ় রস-মাধুর্য্য এই গ্রন্থে আছে, তাহা আমি স্পর্শ মাত্র করিলাম না। তাহা কেবল সম্ভোগেরই বিষয়,—সমালোচনার নহে।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

জীবন।

ও কার বিরাট ছায়া
আবরিল বিশ্বকায়া ?
অসাড় বিশ্বের স্পন্দ শুনা নাহি যায় ;
মহা নীরবতা ল'য়ে,
উঠিল সজীব হ'য়ে,
কালান্তের অন্ধকার নিশীথ ধরায়।
কে আছে না আছে ভবে ?
কে ছিল হেথায় কবে ?
এ যে শুধু নীরবতা, শুধু অন্ধকার।
বিশ্ব যেন বিশ্ব নয়,
শ্মশান সমাধিময়,
সচেতনে অচেতন, সবে শবাকার।
এ মহা-ঘুমের দেশে
কে এসে ধরিল কেশে
জাগিয়া চাহিয়া ভাবি—এ কি সে ভুবন ?
এই কি জীবের বাস ?
জীব আঁধারের দাস ?
এমনি কি ঘুমাইতে মানব জীবন ?
জাগিয়া ঘুমায় কেহ,
নড়ে কি না নড়ে দেহ ;
জাগিয়া স্বপন দেখে, জানে না কি করে,
অলস ঘুমের ঘোরে,
আছে যেন বেঁচে ম'রে ;
জীবন কি এরি তরে ? জীব এরি তরে ?

২

খেয়ে ঘুমাইয়ে মরে,
সে.ত পশুতেও করে ;
পশুতে মানবে তবে প্রভেদ কি নাই ?
জীবনে জীবন নাই,
ঘুম-ঘোর সর্ব্বদাই ;
মানব জীবন তাই ? কে বলিবে তাই ?
এমনি নিয়ত কত,
নদীর প্রবাহ মত,
জীবন প্রবাহ কত উঠিয়া মিলায়।
কেই বা গণনা করে ?
কে তাদের নাম ধরে ?
খুঁজে দেখ ইতিহাস, চিহ্ন নাহি তায় ?
এমন জীবন যার
কিবা আশা আছে তার,
কেন সে বাড়ায় মিছে আর ভব-ভার ?
স'রে যাক, স'রে যাক,
তার স্থান শূন্য থাক ;
যোগ্যতর কতজন পশ্চাতে তাহার।

৩

মানব জীবন যার
ইচ্ছা-জ্ঞান-ভাবে তার
কেশ হতে নখাবধি পূর্ণ নিরবধি ;
শত ঝড় বয়ে যাক,
সম্মুখে পর্ব্বত থাক,
পড়ুক সে মরুভূমে, শুকাবে সে নদী।
মানব জীবন যার
চরিত্রে জীবনে তার
ঘুচে ভব-অন্ধকার মৃতে প্রাণ পায় ;
তার মনোভাব যত
আকারেতে পরিণত ;
কাল-স্রোতে কীর্ত্তি-সেতু রচিয়া সে যায়।
সে কীর্ত্তিতে কীর্ত্তিমান
থাকে চির মূর্ত্তিমান ;
এ ধরণী গরবিনী তারে বক্ষে লয়ে ;
তাহারি গুণের কথা
ইতিহাসে যথা তথা ;
বংশ পরম্পরা ধন্য তার কথা ক'য়ে।

সম্মুখে ঐ তরুবর
কেন এত মনোহর ?
কিবা ইতিহাস তার ? কেন সে এমন ?
ক্ষুদ্র এক বীজ-কণা
প্রসারি অযুত ফণা
দিগন্ত ছাইতে চায়, পরশে গগন ।
আলোক উত্তাপ লয়ে,
কর্ষণ বর্ষণ সয়ে,
যুগ-যুগান্তর হতে ধরণী প্রস্তুত ;
প'ড়ে বীজ ভূমিতলে,
ফেটে গেল কুতূহলে,
দেখিতে দেখিতে তার অঙ্কুর প্রসূত ।
কি এক দুর্জ্জয় টানে,
কে তারে টানিয়া আনে,
আর কি সে বাধা মানে ? আর স্থির রয় ?
দুই মুখ উচ্চে নীচে
ছুটে যায় আগে পিছে,
এ দেয়, ও পিয়ে রস পরিপুষ্ট হয় ।
দিন নাই, রাত নাই,
এক কথা—ছুটে যাই ;
কেন সে এতই ছুটে আকাশের পানে ?
সে দিন সে ক্ষুদ্রতম,
আজ সে অরণ্য সম,
আজ সে জুড়ায় প্রাণ ফল-ছায়া দানে ।
এমনি এমনি যেন,
মানব জীবন হেন ;
আরম্ভে সে কত ক্ষুদ্র ? কিবা পরিণাম !
সেদিন সূতিকা-ঘরে,
আজ সে মহাসমরে !
আশা আকাঙ্খার তার কোথায় বিরাম ?
সে জীব আসিবে ব'লে,
রাখিয়া গেলেন চ'লে,
যত দেশে যত সাধু জ্ঞানী মহাজন,

জীবন-আলোক কত,
আলোক-স্তম্ভের মত,
চরিত্র উত্তাপ কত, কত সত্য-ধন ।
সে আলোকে, সে উত্তাপে,
সে মহাশক্তির চাপে,
জীব-বীজ ফাটে যবে, জীবত্ব সফল ;
ফাটিলে দ্বিজত্ব তার,
দ্বিজত্বে, বীজত্ব সার,
না ফাটিলে প'চে যায়, বীজত্ব বিফল ।
অঙ্কুর উদ্গত যবে,
আর কি সে ঘুমে রবে ?
পান করে সত্য রস পায় বিশ্বে যত;
সেই রসে পুষ্ট হ'য়ে,
সে সব আদর্শ ল'য়ে,
অনন্ত উন্নতি তরে আকুল সে কত ।
যতই বাড়িয়া যায়,
ততই বাড়িতে চায় ;
আপনাকে আপনাতে পারে না রাখিতে
আত্ম বিকশিত হ'য়ে,
জীবন চরিত্র ব'য়ে
ফুটে সে বাহির হয়, পারে না ঢাকিতে ।
সে আশ্রয়-ছায়া তলে,
কত জীব দলে দলে,
আসিয়া জুড়ায় কত তাপ-তপ্ত মন ।
এমন জীবন যথা,
নিশ্চয় নিশ্চয় তথা,
জীবন প্রসব করে মানব জীবন ।

৬

তবে জীব ঘুম-ঘোরে
কি ভাবিছ চুপ করে ?
জীবন সৌন্দর্য্যময়, ভাবিছ কি তাই ?
মিছে কথা, ভুলে যাও,
ঘুমাবে কি ? জাগ, চাও ;
জীবন কর্ত্তব্যময়, তাকি মনে নাই ?

দারিদ্র্যের মহাভার
বুঝিবে কবে বা আর ?
দেখনি কি কাল-দূত ঘেরে চারি দিক ?
কি করিতে ভবে এলে ?
কি বল করিয়া গেলে ?
হিসাবের দুই দিক হয়েছে কি ঠিক ?
আপনি ও আপনার,
বুঝেছিলে, এই সার !
গণ্ডী দিয়ে বন্দী হ'লে আপনারি ঘরে !
করিবার কিছু নাই ?
ঘুমায়ে পড়িছ তাই ?
মানব জীবন পেলে শুধু এরি তরে ?
ঘুমাও ঘুমাবে কত,
শোও শুতে পার যত ;
তোমারি প্রকৃতি হবে বিদ্রোহী তোমার;
সে দিন সুদূরে নয়,
ধীরে অগ্রসর হয় ;
কিছুতেই তার হাতে নাহিক নিস্তার,
প্রকৃতির প্রতিশোধ
কে করিবে প্রতিরোধ ?
যা তোমার প্রায়শ্চিত্ত, করিতেই হবে ;
তুমি চাও, নাহি চাও,
ভয়েই পলাতে যাও,
একগুণে শত গুণ জোর ক'রে লবে।

৭

তবে ও গণ্ডীতে আজ,
পড়ুক পড়ুক বাজ,
ভেঙ্গে যাক, মুছে যাক,সীমা রেখা তার
বাঁচ কিম্বা মরে যাও,
খেটে যাও, খেটে যাও,
সর্ব্বস্ব তোমার দাও চরণে ধরার।
সেই ত বেঁচেও মরে,
যে বাঁচে নিজের তরে ;
নিজেরি বিষেতে নিজে জ্ব'লে পুড়ে মরে ;
সেই ত মরেও বাঁচে
সে গড়া দেবত্ব ছাঁচে,
যে বাঁচে যে খাটে—মরে জগতের তরে।
রাখিবার তরে নয়,
জীবন হারাতে হয় ;
বিপরীত শাস্ত্র তার, কয় জন মানে ?
রাখিলে পচিয়া যায়,
হারালে ফিরিয়া পায় ;
পেতে গেলে দিতে হয়,কে না ইহা জানে ?
যে যত করিবে ব্যয়,
তার তত তোলা রয় ;
অমরত্ব তারি তরে চির অঙ্গীকার ,
যে যত করে না ব্যয়,
তার তত হয় ক্ষয় ,
কৃমি-কীট-ভোজ্য সে যে,কিবা মূল্য তার ?
তবে এ জীবন নিয়ে,
কে রহিবে ঘুমাইয়ে ?
কেবা তার প্রাণ দিয়ে করিবে না কাজ ?
জয়ী হ'ক নাই হ'ক ;
কীর্ত্তি র'ক নাই র'ক ;
তবু যুঝে ম'রে যাবে. কিবা ভয় লাজ ?

শ্রীকালীনাথ ঘোষ।

ইউরোপ-ভ্রমণ। (৩)

গোথা খাল।

জীতে বোর্জ * হইতে ষ্টক্‌হলম্ † পর্য্যন্ত একটী খাল-পথ করিবার জন্ত বহুকাল হইতে চেষ্টা হয়। পূর্ব্বে দুই একবার উদ্যোগও হইয়াছিল, কিন্তু অল্প আরম্ভ হইয়াই বন্ধ হয়। শেষে ইংরাজ ইঞ্জিনিয়র টেলফোর্ড * সাহেবের সহকারিতায় স্থানীয় বিশ্বকর্ম্মা

* Goteborg স্থানীয় নাম; ইংরাজীতে Gothenburg বলে।
† Stockholm.

* Thomas Telford.

প্লাটেন * সাহেব কর্ত্তৃক ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ২২ বৎসরের অনবরত পরিশ্রম দ্বারা বিপুল অর্থ ব্যয়ে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই খাল সমাপ্ত হয়। ৭৮টী ছোট বড় হ্রদ মধ্যে পাওয়াতেই বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

পালাস্ † জাহাজে আমরা নানা দেশীয় ৩০।৩৫ জন যাত্রী বেলা ১২টার সময় আরোহণ করি। কাপ্তেন সুইড জাতীয়, বড় রসিক পুরুষ; ইংরাজী ভাষা বেশ জানিতেন, এবং সিঙ্গাপুর পিনাং প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলে অনেকবার যাতায়াত করিয়াছিলেন; সুতরাং আমাদের ভাব গতিক কতকটা তাঁহার গোচর ছিল। জাহাজে আমরা দুই জন মাত্র প্রাচ্য জীব—পঞ্জাবী বুলাকিরাম ও আমি। জাহাজে উঠিবার ২ ঘণ্টা পরে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন হইল। এইখানে প্রথম স্মোর্গাস ‡ প্রথা দেখিলাম। খানায় টেবিল সাজান হইলে, সেখানে বসিবার পূর্ব্বে, ভোক্তাগণ পার্শ্বস্থ এক টেবিলে দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করতঃ গলা ভিজাইয়া লইয়া থাকেন। এই সময়ে এক প্রকার অতি তীব্র রকমের সুরা অল্প পরিমাণে সকলেই গলাধঃকরণ করেন। বোধ হয়, ক্ষুধা উত্তেজিত করিবার উদ্দেশেই এই জলযোগ ও সুরাপান। ইহা শেষ করিয়া টেবিলে সাধারণ ভাবে সকলে ভোজনে বসেন। সুইডেন দেশের সর্ব্বত্র এই নিয়ম প্রচলিত। গটেনবর্গে টাবল-ডোটে § আহার আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই, তাই সেখানে উহা দেখিতে পাই নাই। ভোজনান্তে প্রাচীন বোহস * দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে দেখিতে ৩½ টার সময় প্রথম কপাটে † উপস্থিত হওয়া গেল। যাঁহারা কখন এ দেশের খালে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা কপাটের ব্যবস্থা অনায়াসেই বুঝিবেন। খালের সম্মুখে উচ্চ বা নীচ সমতলের কোন নদী, হ্রদ প্রভৃতি জলাশয় উপস্থিত হইলে, কপাটের বন্দোবস্ত ভিন্ন খালের জল পরিমাণ ঠিক রাখা যায় না। কপাট পার হইয়া ২০০ হস্ত প্রশস্ত একটী প্রপাতের পার্শ্ব দিয়া বেলা ৫ টার সময় বিখ্যাত ট্রল-হাটান ‡ প্রপাতের নিকট আসা গেল। লক্ প্রবেশের পূর্ব্বে যাত্রীগণ সকলেই জাহাজ হইতে নামিলাম। হাঁটিয়া না দেখিলে এই বিখ্যাত রমণীয় স্থানের দৃশ্য উপভোগ করা যায় না।

ট্রল-হাটান প্রপাতের কথা পূর্ব্বে অনেক পর্য্যটকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, ইহা খ্যাতিতে নায়েগেরার নীচেই, এখন স্বচক্ষে দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল যে, দৃশ্যটী বড় সহজ ব্যাপার নয়। প্রপাত না বলিয়া ইহাকে ৪০০ হাত পরিসরের র‍্যাপিড্ শ্রেণী বলিলে ঠিক হয়।§ প্রথম প্রপাত ২৩ ফিট মাত্র খাড়াই। ঐশী প্রভাব ব্যতীত এই ভয়ঙ্কর অপ্রতিহত শক্তিকে আর কিছুতেই অবরোধ করিতে পারে না। প্রপাতের পূর্ব্বধারে অনেক গুলি করাতের কল ও অন্যান্য কারখানা উহা দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। একটী কারখানা হইতে ধাবমান স্রোতের অতি নিকট পর্য্যন্ত একটী মঞ্চ ¶

* Batzar Bogeslaus Von Platen.
† SS"Pallas".
‡ Smorgas.
§ Table d'hote অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলের একত্র ভোজন।

* Bohus ruins.
† Lock—কপাট।
‡ Trolhattan Falls.
§ A series of tremendous rapids.
¶ Platform.

প্রস্তুত হইয়াছে। প্রপাতের ঠিক মাঝে একটী ও কিঞ্চিৎ নিম্নে আর একটী দ্বীপ আছে; সেতু দ্বারা তথায় যাওয়া যায়। এই সেতুর মাঝখানে দাঁড়াইয়া নীচেকার ও চারি দিকের কোলাহলময় জলক্রীড়া দেখিতে বড়ই চমৎকার। কিন্তু এই অতীব রমণীয় দৃশ্য উপভোগের জন্য বিশেষ ভাবে প্রবল স্নায়ুর প্রয়োজন। ঠিক নীচে ৪২ ফিট খাড়া প্রপাত, তাহার ও চারি দিকের জলের ভীষণ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই কর্ণগোচর হয় না। সেতুটী তত শক্ত বোধ হইল না, ভাঙ্গিয়া পড়িলে কি দশা উপস্থিত হয়, এ অবস্থায় স্থির চিত্তে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা সহজ পরীক্ষা নয়।

সুন্দর অপরাহ্নে চারি দিকের কল কারখানা, ভীষণ অথচ মনোরম জলকেলি, লকের ইঞ্জিনিয়ারি কৌশল প্রভৃতি পরিদর্শন করতঃ কয়েক ঘণ্টা বিশেষ আমোদ সম্ভোগান্তে আমরা পুনরায় জাহাজে উঠিয়া রাত্রি ৯টার সময় বেনয়ণ * হ্রদ তীরবর্ত্তী বেনর্সবোর্জ † নগরে উপনীত হইলাম। ঠিক এই স্থান হইতে গোথা নদী বাহির হইয়াছে। নগরটীতে ৬ হাজার মাত্র লোকের বাস, ছোট জায়গা, কিন্তু চারিদিকের নৌকা ও জাহাজাদির গতিবিধির মধ্যস্থান বলিয়া একটু গুলজার বোধ হইল। এইখানে রাত্রি ৯॥ টার সময় উত্তর পশ্চিম দিকে ‡ সূর্য্যাস্ত হইল, এবং ঠিক পশ্চিমে চন্দ্র দেখা দিলেন।

হ্রদের মধ্যে অনেকগুলি কাঠের ঝাড় ও দুই এক খানা জাহাজ দেখা গেল। হ্রদটী ৫০ ক্রোশ দীর্ঘ ও স্থানে স্থানে ২৪।২৫ ক্রোশ প্রস্থ, সমুদ্র বলিয়া ভ্রম হয়; কখন কখন ঝড়টড়ও পাওয়া যায়। মানুষের বসতি দুই চারিটী দ্বীপও আছে।

এই হ্রদ অতিক্রম করিয়া পুনরায় খালে প্রবেশ করতঃ পরদিন মধ্যাহ্নে ক্ষুদ্র বাইকেন হ্রদ* বাহিয়া কার্লসবোর্জ† নগরের নীচে বেট্টর্ণ-হ্রদে ‡ পড়া গেল। বাইকেন হ্রদে প্রবেশের পূর্ব্বে একস্থানে খালটী চক্রাকার হইয়াছে। এইখানে, কাপ্তেন বলিলেন, আমরা এখন খালপথের সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিয়াছি। তন্নিদর্শন স্বরূপ তীরে এক খণ্ড প্রস্তরে § খোদিত আছে "সমুদ্র হইতে ৩০৮ ফিট উচ্চ"। বাইকেন হ্রদটী খুব ছোট, কিন্তু উভয় তীরস্থ ক্ষেত্রাদি ও বৃক্ষলতাসমূহ এমনি সুন্দর ভাবে সাজান যেন চারিদিকের দৃশ্য ঠিক একখানি ছবি। বেট্টর্ণ হ্রদ ৪০ ক্রোশ লম্বা ও ৬ক্রোশ চৌড়া। বাইকেন অপেক্ষা এই হ্রদের জল ১২ ফিট নীচে, লক্ হইতে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তীরবর্ত্তী দৃশ্য মনোরম ও জল অতি পরিষ্কার কিন্তু প্রায়ই বিষম ব্যাত্যাতাড়িত। কার্লস্বোর্জে একটী প্রাচীন দুর্গ ও সামরিক বিদ্যালয় আছে। হ্রদের পশ্চিম পারে একটী সুন্দর পাহাড় ও মধ্যে অনেকগুলি দ্বীপ থাকাতে এই স্থানটীর শোভা বর্দ্ধিত করিয়াছে। কার্লস্বোর্জের অপর পারে বাদস্তেনা ¶ নামক পুরাতন নগর ও ৬ শত বৎসরের একটী প্রাচীন মঠ ‖ প্রথমে ইহা একটী কাস্‌ল্ @ ছিল, এখানে অনেক রাজা কারাবাস করিয়াছেন।

এই স্থান হইতে অল্পদূর আসিয়া পুনরায় খাল পাওয়া গেল। প্রবেশ করিবার সময় পাঁচ কপাটের লক্ পার হইতে অনেক সময়

* Lake Venun. ‡ N. N. W.
† Venersborg.

* Lake Viken. † Karlsborg.
‡ Lake Vettern.
§ Granite obelisk. ¶ Wadstena.
@ Castle. ‖ Monastery

লাগিবে, এইজন্ত আমরা সকলে নামিয়া মুতালা* পর্য্যন্ত পদব্রজে চলিলাম। পথে দেশীয় নিম্নশ্রেণীর বালকেরা সাধারণ ভাবে সেলাম দ্বারা ও বালিকাগণ হাঁটু ভাঙ্গিয়া আমাদের সকলকে অভিবাদন করিতে লাগিল। ইহাতে বুঝা গেল, এদেশের ছোট লোকেরাও বিনয়ী ও সভ্য। এই ১৩০ক্রোশ খালপথের মুতালা মধ্যস্থান। ইহার সন্নিকটে খালের ধারে বিশ্বকর্ম্মা প্লাটেন মহাত্মার সমাধিস্থান। মুতালা সুইডেন দেশের প্রধান কলকারখানার স্থান। এখানকার লেস্† অতি প্রসিদ্ধ।

সন্ধ্যা ৭টার সময় (বৈকাল বলিলে ভাল হয়, কারণ তখনও ২॥ ঘণ্টা বেশ বেলা আছে) আবার পাঁচ কপাটের লক দ্বারা আর এক হ্রদে ‡ পড়া গেল। ৫ ক্রোশ লম্বা এই জলাশয় পার হইয়া যে খাল পাওয়া গেল, তাহা অনেকটা দূর পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকের জমি অপেক্ষা বহু উচ্চে চলিয়াছে; আমবা বেশ নীচের দিকে তাকাইয়া ক্ষেতখোলা দেখিতে দেখিতে জাহাজ ভাসাইয়া চলিলাম,—এ এক সম্পূর্ণ অভিনব অভিজ্ঞতা সন্দেহ নাই, আর কোথাও এরূপ দৃশ্য ঘটিয়াছে, বলিয়া বোধ হয় না। ইহার পরেই ১৬ কপাটের লক দ্বারা ১২০ ফিট নীচে নামিয়া জাহাজ রক্সেণ § হ্রদে পড়িল। প্রায় ৯ ক্রোশ লম্বা এই হ্রদ পার হইয়া অল্প খানিকটা খাল বাহিয়া একটী অতি ক্ষুদ্র জলাশয় অতিক্রম করতঃ পুনরায় কতদূর খালে গিয়া মেম ¶ নামক স্থানে আসিয়া শেষ লক্ পার হওয়া গেল। এই খানে একখানি মার্ব্বেল পাথরে খোদিত আছে "ঈশ্বর স্বয়ং গৃহ নির্ম্মাণ না করিলে মানুষের সকল চেষ্টা বৃথা।" বাস্তবিক বিধাতা না সহায় হইলে এ সকল কার্য্য ক্ষুদ্র মানুষের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এইখানে আমরা খাল পথের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। একটী কথা বলিতে ভুলিয়াছি। খাল পারাপার হইবার জন্ত পথিমধ্যে বহুস্থানে এক একটী স্ত্রীলোকের জিম্মায় ছোট ছোট কাঠের পুল আছে; জাহাজ আসিলে তাহারা একটি কল ঘুরাইয়া পুল খুলিয়া দেয় এবং পরে জুড়িয়া লয়।

পর দিন প্রাতে আমরা সমুদ্রের খাড়িতে ভাসিলাম। ক্রমে মধ্যাহ্নে যখন জাহাজ বল্টিকে* পড়িল, তখন বিলক্ষণ সমুদ্র-দোলন আরম্ভ হওয়ায় অনেককে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। বল্টিক সাগরের এই অংশটীতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। বৈকালে একটি ছোট খাল দিয়া মালারণ † হ্রদে প্রবেশ করা গেল। ইহার অপর নাম "সহস্র দ্বীপের হ্রদ", বাস্তবিক এই ৩৩ ক্রোশ দীর্ঘ জলাশয়ে ১৪০০ দ্বীপ আছে। ইহার বহুসংখ্যক সুন্দর হর্ম্ম্যোদ্যানাদি সুশোভিত। আমাদের জাহাজ যখন দ্বীপ গুলির পাশ দিয়া চলিতে লাগিল, দ্বীপস্থ বালকবালিকাগণ রুমাল উড়াইয়া অমাদিগকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। এই প্রেমের দৃশ্য দ্বারা হৃদয়ে এক নূতন ধরণের আনন্দ অনুভূত হইল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার সময় সুইডেনের রাজধানীর প্রাসাদ ভজনালয়াদির চূড়া দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে আমরা ষ্টকহলমে উপনীত হইলাম।

* Motala. † ace.
‡ Lake Boren. § LLake Roxen.
¶ Mem.

* Baltic Sea.
† Lake Malaren—"The lake is one of the most entrancing and delightful regions in Europe".
—Richard Lovett, M.A.

খাল ভ্রমণ ফুরাইল; যাত্রীগণের মধ্যে দুই চারি জন সম্বন্ধে কিছু বলিয়া উহার বৃত্তান্ত শেষ করিব। ইতিপূর্ব্বে পঞ্জাবী ভ্রাতা বুলাকিরাম শাস্ত্রীর বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। এবারে আর কয়েক জনের কথা বলিব। যাত্রীগণ মধ্যে একটী আমেরিকান দল ছিল। ৭।৮টী যুবতী কুমারী ও দুইটী প্রবীণা শিক্ষয়িত্রী ইউরোপ ভ্রমণে একত্র আমেরিকা হইতে বাহির হইয়া এই পথে আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ জাতির প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন, এমন কি, ইংরাজ নাম পর্য্যন্ত ঘৃণা করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে এক জন অত্যন্ত হাস্যামোদ-প্রিয় ছিলেন; খানার টেবিলে, আরামের স্থানে, ডেকের উপরে সদা সর্ব্বদা নানাবিধ হাস্য কৌতুকের গল্প দ্বারা যাত্রীগণকে আমোদিত করিতে তাঁহার আলস্য ছিল না। কয় জন আমেরিকান পুরুষও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাদের বিশেষত্ব আর কিছুই ছিল না, কেবল ভোজনের সময় ভাল ভাল আহারীয় দ্রব্যাদি হাদেখ্‌লের ন্যায় তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া আত্মসাৎ করিতে তাঁহারা বড়ই মজ্‌বুত ছিলেন। তাঁহাদের দৌরাত্ম্যে ভাল ফলমূল আর কাহারও পাইবার জো ছিল না। ইংরাজ যাত্রীগণ হাঁ করিয়া তাঁহাদের কাণ্ড দেখিতেন, আর অবাক হইয়া থাকিতেন। বলা বাহুল্য, এই মার্কিন যাত্রীগণ ভদ্রলোক।

আর এক জনের কথা বলিয়া পালাস জাহাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। আমার পক্ষে ইনি যাত্রীগণ মধ্যে প্রধান ছিলেন। সমস্ত অবকাশ কাল আমি ইঁহার সহিত কথোপকথন দ্বারা রুশিয়া সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহে নিযুক্ত থাকিতাম। ইনি অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় ৺ আড্‌মিরাল কোজাকর ভিশের * বিধবা পত্নী। আড্‌মিরাল মহাশয় বহুকাল মধ্য আশিয়ার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আমুর নদীস্থ একটী দ্বীপ তাঁহার নামে অভিহিত। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। রুশ-মহিলার বয়স আড্‌মিরাল অপেক্ষা ২।৪ বৎসর মাত্র কম হইবে; কিন্তু বেশ শক্ত সমর্থ। ইনি অতি সহৃদয়, আমাদের দেশের গিন্নিবান্নি গোছের লোক। ইংরাজী ও ফরাসি ভাষা উত্তম রূপ জানিতেন, ইতিহাস ও সাধারণ সাহিত্যাদিতে বিলক্ষণ দখল ছিল। ষোড়শবর্ষীয় একমাত্র পুত্র তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন। ইংরাজ গবর্ণেস্ † রাখিয়া তাঁহাকেও বেশ ইংরাজী শিখান হইয়াছে। বালক ব্লাডিমির ‡ খুব লম্বা চৌড়া ছোকরা গোঁপ দাড়ির অভাব দ্বারাই টের পাওয়া যাইত, নতুবা ২৫।২৬ বৎসরের জোয়ানের মত আকার প্রকার। ব্লাডিমির মায়ের মত সদাশয় শান্ত প্রকৃতি। এই মাননীয়া মহিলার সঙ্গে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা দ্বারা রুশিয়া সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যাইতে পারে। পরিচয়ের পর আমার প্রশ্ন মত তিনি যে সকল উত্তর দিলেন, তাহা অতি প্রাঞ্জল ও সারগর্ভ, ভরসা করি পাঠকগণ উহা দ্বারা রুশিয়ার প্রকৃত অবস্থা অনেকটা বুঝিতে পারিবেন।

প্রশ্ন—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রুশিয়ার কিরূপ লালসা?

উত্তর—তোমাদের দেশের উপর আমাদের কোন্ প্রকার কুদৃষ্টি নাই।

---

* Admiral Kozakervitch.

† Governess.

‡ Vladimir Petrorvetch Kozakervitch.

প্র—তবে যে সর্ব্বদা শুনা যায়, মধ্য-আশিয়াতে রাজ্য বিস্তার কেবল ভারতবর্ষ আক্রমণের উদ্দেশে। পিটর সম্রাট * এ সম্বন্ধে আপনার উইলে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এবং ইদানীং সেনাপতি † স্কুবেলফ্ যেরূপ তাঁহার মতলব প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ত আশঙ্কা না করিয়া থাকা যায় না। তিনি ত স্পষ্ট বলিয়াছেন "আমাদের শেষ উদ্দেশ্য বিপুল আশিয়াটিক অশ্বারোহী দল প্রস্তুত করত তদ্দ্বারা তৈমুরলঙ্গের মত রক্তপাত ও লুটপাট করিতে করিতে ভারতবর্ষ আক্রমণ করা।"‡

উ—(সহাস্য বদনে) "পিটরের উইল ত আমার বিবেচনায় জাল। আর সেনাপতি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, সে সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ওরূপ আপনাপন মনের কথা বলা অতি সহজ ব্যাপার। তিনি মধ্য-আশিয়ার প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তাঁহার নিজের ওরূপ খেয়াল হইতে পারে ; কিন্তু সাম্রাজ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না। আমাদের ঘরের অবস্থা এত খারাপ যে, সর্ব্বাগ্রে তাহা ঠিক করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। যে বৃহদ্রাজ্য হাতে করা হইয়াছে, তাহাই সামলাইবার আমাদের ক্ষমতা নাই, এখন আর বেশী দখল করিবার কথা মনে আনাই পাগ্‌লামী। আসল কথা টাকা, আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থা ভাল নয় ; সে দিকে উন্নতির চেষ্টা এখন অতীব গুরুতর ভাবে প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজধানী হইতে বরাবর সাইবিরিয়ার * ভিতর দিয়া কামটস্কাটকার † সীমা পর্য্যন্ত রেলপথ প্রস্তুত করা আগে চাই ; ইহা শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।‡ সাইবিরিয়া প্রদেশে যে সকল ধনরত্ন আছে, তাহা করতলস্থ করিতে গেলে ঐ প্রকাণ্ড রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রশান্ত সাগর পর্য্যন্ত রেলপথ অত্যাবশ্যক। ঐ রেলপথ চলিলে সাইবিরিয়ার ধনে সাম্রাজ্যের বিলক্ষণ ধনী হইবার সম্ভাবনা আছে। উহাতে আরও এক বিশেষ লাভ এই হইবে যে, প্রশান্ত সাগরের তীরে বন্দর নির্ম্মাণ করত ওখানে নৌ-সেনা স্থাপনের ব্যবস্থা হইবে। বর্ত্তমান সময়ে নৌ-সেনা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে ; রুশিয়ার উত্তর ও পশ্চিমদিকস্থ সমস্ত জল বারমাস ব্যবহারের উপায় নাই, শীতের কয়মাস ঐ সকল স্থান বরফময় হয়। এই কারণে প্রশান্ত সাগর ভিন্ন আমাদের আর এমন কোন জল নাই, যেখানে বারমাস জাহাজ রাখিবার সুন্দররূপ ব্যবস্থা হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমাদের দেশের উপর এখন আমাদের লোভ করা কিরূপ দেখায়।"

"আমাদের সাম্রাজ্যের প্রধান দোষ এই যে, প্রধান প্রাধান কর্ম্মচারীগণ সাধারণের মত গ্রহণ না করিয়া নিজেদের মনের মত এক একটা খাম্‌খেয়ালি প্রস্তাব করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না। রুশিয়ার সম্রাটগণের নামে যে সকল কলঙ্ক পৃথিবীতে

* Peter the Great.

† General Skobellof.

‡ "It will be in the end our duty to organise masses of Asiatic cavalry, and to hurl them into India under the banner of blood and pillage as a vanguard as it were, thus reviving the times of Tamerlane." ইংরাজিতে এই ভাবে লিখিত আছে।

* Siberia.

† Kamaschtka.

‡ কয়েক বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

প্রচারিত হইয়া থাকে, বাস্তবিক তাঁহারা হয় ত তাহার কিছুই জানেন না। বাহিরের লোকে মনে করে, আমাদের স্বেচ্ছাচারী সম্রাট, আপনার ইচ্ছা-মত যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন, কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন না; প্রকৃত পক্ষে তাহার ঠিক বিপরীত। সম্রাট যদি সদভিপ্রায়ে কিছু করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং তাঁহার পরিষদবর্গ যদি দেখেন, তাহাতে তাঁহাদের কোন প্রকার স্বার্থহানির সম্ভাবনা, অমনি তাঁহারা নানা উপায়ে সম্রাটের হস্ত অবরোধ করিতে চেষ্টা পান। একটা দৃষ্টান্ত বলি। ভরসা করি তুমি ফিনলণ্ড * যাইবে, সেখানে গিয়া শুনিবে। ফিনলণ্ডে স্বায়ত্ত-শাসন প্রথা প্রচলিত, এবং তাহাদের দত্ত কর সম্রাট দেশের হিতোদ্দেশে তাহাদিগকে ফেরত দেন, বলিয়া সর্ব্বদাই আমাদের মন্ত্রীসমাজে কোলাহল— কেন ফিনলণ্ড সমগ্র রুশ সাম্রাজ্যের নিয়মবহির্ভূত থাকিবে?—এইরূপে সকল কাজেই জানিবে মন্ত্রীবর্গেরই হাত, জার † বেচারির কেবল দুর্নাম মাত্র।"

প্রঃ—গত বৎসর (১৮৯০) ইংলণ্ডে একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। জনৈক পণ্ডিতা রুশ মহিলা কর্ত্তৃক উহা আপনাদের সম্রাটকে লেখা হয়। তাহাতে সাম্রাজ্যের অনেক কলঙ্ক প্রচার করা হইয়াছে। পত্রখানির কথা কি সমস্ত ঠিক? উহা আপনাকে পড়িয়া শুনাই।

Addressed by Madame Tchebrikova, a popular Russian authoress of good family to the Czar of Russia.

"Your Majesty;—The laws of my country punish free speech. All that is honourable in Rüssia is condemned to see thought persecuted by an arbitrary Administration. We witness the moral and physical massacre of youth, the spoliation and flagellation of a people condemned to remain speechless. But liberty, Sire, is the primordial necessity of a people, and sooner or later the hour will come when the citizens, having, under the tutelage, exhausted their patience will raise their voices, and then your authority will have to yield.

There are also in the lives of individuals moments when they are ashamed of their silence, and then they dare to risk all that is dear to them, so as to say to the person who holds in his hands all the power and all the strength, the person who could put an end to so much evil and so much shame: "Look at what you allow to take place; look at what you are doing either consciously or not."

The Russian Emperors are obliged to see and hear only what their functionaries, the Tchinovniki, allow them to see. The latter form a thick wall between the Czar and the Zemstres—that is the millions of inhabitants who are not in the employ of Government, The terrible death of Alexander II has thrown a lugubrious shadow on your accession to the throne. You were told that this death was the result of the ideas in favor of freedom which had been developed in consequence of the reforms introduced during the previous reign, and you were inspired to take measures by which it was desired to make Russia go back to the sombre epoch of Nicholas I. They frighten you by agitating the spectre of revolution, of a revolution which would suppress monarchy; and this at the present time, and in such a country as yours is a pure illusion. After the catastrophe of the 1st March the regicides themselves did not hope to see the convocation of a Constituent Asssembly. The enemies of the Czar have been executed, every one obeys blindly the will of the monarch. Then by what fatal misunderstanding does the Government suppress all traces of those reforms projected during the best years of Alexander II's reign. It was not the reforms enacted during the previous reign that brought our terrorists into existence, it was their insufficiency.

* * * * *

Do you imagine that because you are an anointed sovereign, you are a divinity possessing knowledge of all things? If you could, Sire, like the sovereign in the fable, pass over the towns and villages so as to know what life the Russian people live, you would see its misery, you would see how the Governors bring up your soldiers to shoot down the peasants and the workmen. You would see that this order, maintained by thousands of soldiers, by legions of functionaries, by an army

* Finland † Czar

of spies—this order in the name of which every word of protestation is suppressed—that this order is not order at all, but a state of administrative anarchy".

উ—এই গ্রন্থকর্ত্রীর নাম আমি শুনিয়াছি। কথা বা লেখার স্বাধীনতা আমাদের দেশে নাই। যেখানে সেখানে যা খুসি বলিলে অনেক গোয়েন্দা আছে, তাহারা পুলিশকে খবর দিয়া বক্তাকে গ্রেপ্তার করাইবে। লেখা সম্বন্ধে একজন বিশেষ রাজ কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত কোন প্রকার মুদ্রিত বিষয় প্রকাশ হইতে পারে না।

রাজ কর্ম্মচারীগণের অত্যাচার সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সম্রাটকে বাধ্য হইয়া সর্ব্বদা পরের মুখে ঝাল খাইতে হয়। আমাদের শাসন প্রণালীতে নানা কারণে দোষ প্রবেশ করিয়াছে। রুশিয়ার সিবিল বিভাগের * কর্ম্মচারিগণ এক বিশেষ শ্রেণীর লোক হইতে বরাবর নিযুক্ত হইয়া আসিতেছে। ইহারা উচ্চ বা নীচ কোন শ্রেণীর মধ্যে গণ্য নয়, মাঝামাঝি এক শ্রেণীর লোক, সংখ্যায় অতি অল্প। আমাদের দেশে এক বড় লোক এক ছোট লোক, মধ্যবিৎ লোক বলিয়া কোন শ্রেণী নাই; ইহারা এই দুইয়ের সংস্রবে উদ্ভূত, কাজেই অল্প সংখ্যক। ইহাদের নিয়োগ, বিয়োগ, পদোন্নতি, সমস্তই প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, মন্ত্রী বা অন্যান্য বিভাগীয় কর্ত্তাদের মরজির উপর নির্ভর করে। চাকরির স্থিরতার অভাব, কখন আছে কখন নাই; তার উপর বেতন বড়ই কম; উপরওয়ালাদের মন সদসৎ সকল উপায়ে সর্ব্বদা যোগাইয়া চলা নেহাত দরকার; ইত্যাদি কারণে তাহারা যারপরনাই অত্যাচারী ও অর্থলোলুপ :—কাজেই দেশ বা প্রজার হিতাহিতের দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া, তাহারা যেন তেন প্রকারেণ কেবল নিজের পেট পূরাইতেই চব্বিশ ঘণ্টা ষোল আনা ব্যস্ত। রাজ-কার্য্য * যে ভাবে চলুক না কেন, সে বিষয়ে বেখাতির।

* Civil Service

"১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় আলেক্জাণ্ডর অনেক গুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন, নানা কারণে সেগুলি শীঘ্রই বন্ধ করা হয়। এ বৎসরও (১৮৯১) সহস্র সহস্র স্কুল বন্ধ করা হইতেছে। আমার বোধ হয় না যে, অন্য কোন হেতু প্রজার শিক্ষা বিস্তার অবরোধ করা ইহার কারণ। বিশেষ কারণ আমি দেখিতেছি এই যে, আমাদের ছাত্রগণ লেখা পড়া শিখিয়া কেবল সরকারী চাকরি দাবী করে, বিদ্যালাভ দ্বারা যেন তাহারা ইহাই বুঝে যে, অন্যান্য কাজ না করিয়া কেবল রাজ সরকারে চাকরি করিবার জন্যই তাহারা উপযুক্ত হইয়াছে। আমাদের মত দরিদ্র রাজ্যে অপ্রভু বিদ্যার ছড়াছড়ি বোধ হয় অমঙ্গলের কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

"প্রজার প্রতি অত্যাচার অনেক সময় ঘটিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। গুপ্ত চরগণের রূপেও অনেককে গ্রেপ্তার করাইয়া পাও। এরূপ গ্রেপ্তার মধ্য রাত্রিতেই হইয়া , কারণ সে সময় সকলকেই বাড়ীতে রূপে যায়। অনেক নির্দ্দোষী ব্যক্তি হয়ত গ্রহণ মাত্র সন্দেহের দরুণ বা দুষ্ট কর্ম্মপূ

* তৃতীয় আলেকজাণ্ডর কয়েক বৎসর হইল না ইহা নিরাকরণের জন্য বিশেষ যত্নবান হইয়া নিয়োগ বিয়োগাদির ভার অনেকটা নিজের হাতে লন; এবং পরিদর্শনের জন্য একটী বিশেষ বিভাগ স্থাপন করেন। তাহার নাম Special Inspection department.

চারিদের অন্যায় কোপগ্রস্ত হইয়া বিনা বিচারে যাবজ্জীবনের জন্য সাইবিরিয়াতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। রাজ্যশাসনের গূঢ় রহস্য নিচয় ভেদ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। অনেক সময়ে দারুণ কঠোর শাসন নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং সেই শাসন-যন্ত্র সকল সর্ব্বাবস্থায় ঠিক নিক্তির তৌলে ব্যবহার ও প্রয়োগ অতিশয় দুরূহ কার্য্য, সন্দেহ নাই। জাতি, ধর্ম্ম, শিক্ষা, অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে এরূপ বিভিন্ন প্রকারের নানাবর্ণের প্রজা আমাদের এই বিপুল সাম্রাজ্যে বাস করে, ইহাদের সকলকে লইয়া চলিতে গেলে কোথাও না কোথাও ত্রুটি লক্ষিত হইবেই হইবে।

"রুশিয়ার নিন্দা তোমরা অনেক শুনিয়াছ, কিন্তু আমার গুটিকতক কথা শুনিলে অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, আমরা সংসারের হিতসাধনে যত্নবান কি না। দেখ মধ্য-আসিয়া আমাদের অধীনে আসিবার পূর্ব্বে কি ছিল, আর এখনই বা কি হইয়াছে :—কোথায় দিবারাত্রি তুর্কমানদের লুটতরাজ, নানা প্রকার উপদ্রব অত্যাচার, গোলাম ব্যবসায়, আর কোথায় জীবন ও বিভব নিরাপদ জানিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে আহার বিহার সুখে নিদ্রা এবং কৃষি বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন। একজন মাত্র রুশ কর্ণেল ৮ জন দেশীয় সহকারীর সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে ত্রিশ হাজার প্রজাকে সুশাসনে রাখিতে সমর্থ, ইহা কি আমাদের গৌরবের বিষয় নয়। কর্ণেল আলিখানফ, যাঁহার আসল নাম আলি খাঁ, একজন তাতার মুসলমান, রুশিয়ার অধীনতা স্বীকার করিয়া যুদ্ধবিভাগে চাকরি পাইয়া শত শত গোলামকে মুক্ত করিয়াছেন এবং গোলামী উন্মূলিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। মোটামুটি ফরাসিরা ৬০ বৎসর ধরিয়া আল্‌জিরিয়াতে * যতদূর করিতে না পারিয়াছে, আমরা ২০ বৎসর মধ্যে তাতার মুলুকে তদপেক্ষা অধিক করিতে সমর্থ হইয়াছি। এতকাল পরেও আল্‌জিরিয়ার এমন অবস্থা যে, আজ অবকাশ পাইলে তাহারা ফরাসি শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে প্রস্তুত; কিন্তু মধ্য-আসিয়া আমাদিগকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। প্রকৃতিবর্গ অতি সুখে বাস করিতেছে।

তারপর, ভরসা করি, তোমরা ইউরোপের ইতিহাস সম্বন্ধে ভালরূপ জ্ঞাত আছ, আমার কথা কতদূর প্রামাণ্য বেশ বুঝিতে পারিবে যে, সভ্যজগতের হিতে রুশিয়ার হস্ত কতদূর বিস্তৃত। তোমরা "রুশিয়ার দুরাকাঙ্ক্ষা ও রাজ্য গৃধ্নুতার কথা অনেক শুনিয়াছ, নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, অনেক স্থলে আমরা বিপরীত ভাব প্রকাশ করিয়া উদারতার পরিচয় দিয়াছি। নেপোলিয়ন যখন প্রথম বার এল্‌বাতে † তাড়িত হন, তখন রুশিয়া ব্যতীত আর সবাই লম্বা লম্বা হাত বাড়াইয়া দুর্ব্বল প্রতিবাসীর রাজ্যভাগ আপনাপন কোলে টানিতে বসিয়াছিলেন। সে সময়ে ফরাসিদেশে তাহাদের পুরাতন রাজবংশকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার মত সকলেরই হইয়াছিল, কেবল আমাদের সম্রাট তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ফরাসিদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা সাধারণ-তন্ত্র প্রচারের পক্ষপাতী কি না। দুর্দ্দান্ত নেপোলিয়ন রাহু বিনাশের প্রধান সহায় রুশিয়া :— মস্কোদাহ † ও লাইপজিক ‡ যুদ্ধ তাহার

* Algerea † Elba
‡ Burning of Moscow

জীবন্ত সাক্ষী। তারপর নেপোলিয়ন ধ্বংসের পর অবধি ইউরোপের অরাজকতা ও বিপ্লবের প্রধান শত্রু রুশিয়া। গ্রীস, রুমানিয়া *; সর্বিয়া † মনিটনিগ্রো ‡ ও ইটালির স্বাধীনতা ও জর্ম্মনি একীকরণের প্রধান সহায় রুশ সম্রাট। গ্রীস্ ও রুমানিয়ার বন্দোবস্তের সময় ইংলণ্ড পর্য্যন্ত কতক কতক বিপক্ষতাচরণ করেন, কিন্তু রুশিয়া ষোল আনা সহায়। ইংরেজ প্রতিবন্ধক না হইলে গ্রীস্ আরও বেশী পাইতেন; রুমানিয়ার বেলায় তাঁহার কথা খাটে নাই। অনেকের মনে আছে, সে দিনকার কথা, কেবল মাত্র ২০।২২ বৎসর গত হইয়াছে, যুদ্ধাবসানে সন্ধি সংস্থাপনের পর জর্ম্মন সম্রাট উইলিয়ম § আমাদের জার আলেক্জাণ্ডরকে ¶ পত্র লেখেন, "প্রুশিয়া ‖ কখন ভুলিতে পারিবে না যে, কেবল মাত্র আপনার জন্য এই যুদ্ধ ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে নাই। জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আপনার চিরকৃতজ্ঞ বন্ধু।"

প্র—দ্বিতীয় আলেক্জাণ্ডর যেরূপ সর্ব্ব প্রকারে সদাশয় লোক ছিলেন, তাঁহাকে বধ করাটা কি ভয়ানক নৃশংস ব্যাপার।

উ—তিনি যেমন বাহিরের ব্যাপারে উচ্চ উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, প্রজাবর্গের হিত সাধনেও তেম্‌নি কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ তারিখে তিনি এক ঘোড়ায় এক খানি গাড়ীতে যাইতেছিলেন, হটাৎ তাঁহার গাড়ীর নিচে একটি বোম ছুটিল। তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আহতদিগের জন্য ব্যবস্থার আদেশ দিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পায়ের নীচে নিক্ষিপ্ত একটি বোমের দ্বারা তাঁহার পা দুখানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। সেই দিনই বৈকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্বে প্রথম আলেক্জাণ্ডরের পিতা পাল ও * দুষ্ট প্রজা কর্ত্তৃক হত হন। এ সকল অর্থহীন ব্যাপার এক জন ক্ষিপ্ত লোকের কাজ। পিটর দি গ্রেট † হইতে আমাদের সকল সম্রাটই দেশের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াও প্রজাদের এরূপ নৃশংস ব্যবহার প্রাপ্ত হন। কেবল মাত্র অসভ্য রুশিয়াকে সুসভ্য করণোদ্দেশে পিটর মহাত্মা হলণ্ড ইংলণ্ড ভ্রমণ দ্বারা নানা বিষয়ে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া আসিয়াছিলেন। বিদেশে অতি সামান্য লোকের মত দিনযাপন করিয়া ছুতার কামারের কাজ, জাহাজ ও ঘড়ি নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহুবিধ প্রয়োজনীয় শিল্প শিক্ষা করতঃ এবং কলকারখানা, চিকিৎসা বিদ্যালয়, হাঁসপাতালাদি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনান্তর ঐ সকল বিষয়ে প্রজাবর্গকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। রুশিয়ায় গেলে তাঁহার অনেক কীর্ত্তি দেখিয়া প্রীতি হইবে।"

রুশিয়ার প্রসিদ্ধ 'নাইহিলিষ্ট' ‡ সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন সম্বাদ ইহার নিকট পাওয়া গেল না।

জাহাজের কাপ্তেন ও যাত্রীগণের বিশেষ রূপে উক্ত রুশ মহিলার, নিকট বিদায় গ্রহণান্তর হোটেলাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছিলেন, আবার নামিবার সময় কাপ্তেন বলিলেন, "বাথ § অর্থাৎ স্নানাগার দেখিতে যেন ভুলিও না"।

শ্রীচন্দ্র শেখর সেন।

* Roumania　† Servia
‡ Montenegro　§ Emperor William
¶ Czar Alexander II　‖ Prussia

* Paul　† Peter the Great
§ Batht　‡ Nihilist

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ। (১৩)

পাঠকগণ! আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে যে, সূর্য্যনারায়ণ কশ্যপ ঋষির পুত্র; এবং হনুমান এক সময়ে তাঁহাকে কক্ষ মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, ও উদরস্থ করিয়াছিলেন। কুন্তী দেবীর আহ্বানে তিনি তাঁহার সহিত সহবাস করিয়াছিলেন। আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, অনাদিকাল হইতে ত্রিজগতের একমাত্র প্রকাশক যাঁহার আংশিক তেজে সমগ্র জগৎ সন্তপ্ত হয়, যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারণ সেই জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ যাঁহাদের পুত্র; সেই পিতা মাতা কীদৃশী তেজসম্পন্ন হইবেন, তাহা সহজে অনুমান করা দুঃসাধ্য। আর তাঁহাদের বাড়ী ঘর কোথা আছে, তাঁহারা এক্ষণে জীবিত কি মৃত, কেহ বলিতে পারেন কি? আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, বানর একটা হাত পা বিশিষ্ট জন্তু, সূর্য্যনারায়ণ হইলেন অগ্নি ও জ্যোতিঃস্বরূপ, যাঁহার এক কণা তেজে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভস্ম হইয়া যায়, তাঁহাকে যে একটা সামান্য জন্তু হনুমান গিলিয়া ফেলিল ও বগলে পূরিয়া রাখিল ইহা অতি অসম্ভব কথা! যে হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করিতে যাইয়া সূর্য্যনারায়ণের অংশ অগ্নি দ্বারা নিজের মুখ পোড়াইয়াছিল ও যাহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিল, সেই হনুমান পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণকে এতাদৃশী দুরবস্থা করিয়াছিল, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা আর কিছু হইতে পারেনা। রামায়ণে লেখা আছে যে, যখন শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধে হতাশ হইলেন, তখন মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত আসিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন যে, আপনি কেন হতাশ হইতেছেন? আপনি জগদ্বিখ্যাত সূর্য্যবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, জগৎ প্রকাশক সূর্য্যনারায়ণ আপনার আদি পুরুষ, আপনি সেই আদি পুরুষকে ভক্তি পূর্ব্বক অর্ঘ প্রদান করুন, তাঁহার পূজা করুন, তাঁহার বরে নিশ্চয় আপনি রাবণবধ করিতে পারিবেন। রামচন্দ্র ভগবান অগস্তের উপদেশানুসারে সেই আদি পুরুষের পূজা করিলেন ও ভক্তি পূর্ব্বক অর্ঘ প্রদান করিয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন তাহাকে বাণ মারিলেন অমনি সেই বাণেই রাবণ বধ হইল। রাবণ নিধন হইলে লঙ্কাবিজয় ও সীতা উদ্ধার হইল। এক্ষণে দেখুন যে, সেই রামচন্দ্রের ভক্ত দাস হনুমান তাঁহার আদি পুরুষ জগৎ প্রসবিতা সূর্য্যনারায়ণকে বগলে পূরিয়া রাখিয়াছিল ও গিলিয়া ফেলিয়াছিল, ইহা কিরূপ সঙ্গত কথা?

পাঠকগণ! আমাদের শাস্ত্র রূপকে পরিপূর্ণ। সেই রূপকজাল ভেদ করিয়া সারভাব গ্রহণ করা অতীব কঠিন। যাহা হউক, আমি সংক্ষেপে সারভাব বুঝাইয়া দিতেছি, আপনারা সূক্ষ্মভাবে গ্রহণ করিবেন। কশ্যপ শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম আকাশস্বরূপ বিরাট-ব্রহ্ম। অদিতি শব্দে বিদ্যা—জ্ঞান; যাঁহার মধ্যে দ্বিতীয়ভাব নাই। সেই অদিতি অর্থাৎ জ্ঞান হইতে জ্ঞানী অর্থাৎ দেবতাগণ, যাঁহারা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপকে জানেন, তাঁহারা জন্মেন। দিতি শব্দে মায়া, অজ্ঞান, অবিদ্যা। দিতির গর্ভে রাক্ষস, অসুর অর্থাৎ পরমাত্মাবিমুখ অজ্ঞানীগণ জন্ম গ্রহণ করেন। নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্ম আকাশ স্বরূপ কশ্যপ পিতা হইতে সূর্য্যনারায়ণ জগৎ প্রসবিতা স্বতঃই প্রকাশ হয়েন ও তিন লোককে প্র

কাশ করেন। হনুমান শব্দে হরিভক্ত জন। যিনি ইন্দ্রিয়গণকে হনন করিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণকে গিলিয়া ফেলেন, অর্থাৎ ভক্তি পূর্ব্বক ধারণ করেন। ইহাই হনুমান সূর্য্য-নারায়ণকে গিলিয়া ফেলার অর্থ; আর বগলে পুরিয়া রাখার তাৎপর্য্য এই যে ভিতর বাহির সূর্য্যনারায়ণ ভিন্ন আর কাহাকেও দেখেন না। লঙ্কা শব্দে মায়া—অজ্ঞানতা; সীতা পরমাশক্তি জগজ্জননী ব্রহ্মময়ী; রাবণ অহঙ্কার, রাম জীবাত্মা; জ্ঞান বাণ। যখন জীবাত্মা রামচন্দ্র পরমাত্মারূপীসূর্য্যনারারণয়কে ভক্তি-পূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণ করিলেন, তখন অহঙ্কার মহামোহরূপী রাবণ সহজেই বধ হইল। সোণার লঙ্কা অর্থাৎ সংসার-বন্ধনকারী মনোহারিণী মায়া জ্ঞান অগ্নি দ্বারা ভস্ম হইয়া গেল। তখন পরমাপ্রকৃতি পূর্ণব্রহ্মরূপিণী জগজ্জননী কুলকুণ্ডলিনী সীতা উদ্ধার হইল। অর্থাৎ—জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন হইল। অর্থাৎ মহামোহ মায়া প্রভৃতি সাধনা-রূপ যুদ্ধে হত হইলে জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানের উদয় হইলে সাধকের আর ভেদজ্ঞান থাকে না, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম পৃথক বোধ হয় না। তখন সকলই ব্রহ্মময় বোধ হয় নিজের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না।

কুন্তীদেবীর সহিত সহবাস সম্বন্ধে এস্থলে যাহা বিবৃত হইবে, তাহার সূক্ষ্মভাব আপনারা বিচার করিয়া গ্রহণ করিবেন। আপনারা দেখুন যে, জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণের হাত পা ইন্দ্রিয়াদি কিছুই নাই, কেবল মাত্র তেজোময়। তিনি একজন স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যে স্ত্রীর সহিত তিনি সহবাস করিলেন, সে স্ত্রীলোক ত স্থূলবস্তু। সে ত সূর্য্যনারায়ণের স্পর্শ মাত্রেই ভস্ম হইয়া যাইবে। জ্ঞানীমাত্রেই জানেন যে, জগৎ প্রসবিতা সবিতা নিরাকার ও সাকার অখণ্ডাকার ভিতর বাহির বিরাটরূপে বিরাজমান আছেন। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে নাই; সমস্ত জগতই তিনি, অতএব দ্বিতীয় স্ত্রীলোক কোথা হইতে আসিল যে, তিনি তাহার সহিত সহবাস করিলেন? পাঠকগণ! তোমরা ভক্তি সহকারে উপাসনা ও যোগ কর, তাহা হইলে সূর্য্যনারায়ণকে চিনিতে পারিবে ও তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারিবে।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (৫)

আমরা এই প্রবন্ধের বিগত চতুর্থ সংখ্যায়, বেদান্তদর্শন কি যুক্তি সামর্থ্যে ন্যায়দর্শনের পরমাণুবাদ খণ্ডিত করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। পাঠক দেখিয়াছেন, বেদান্তের যুক্তি সমূহ কেমন মনোহর। সাধ করিয়া লোকে বেদান্তকে দর্শন শাস্ত্রের "শিরোমণি" বলে নাই। যাহা হউক, মত-গত গুণ দোষ বিচারের জন্য আমরা এ প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। যদি বিধাতার ইচ্ছা থাকে, তবে সে সম্বন্ধে সময়ে দুই চারি কথা বলিব। আমরা পূর্ব্ব সংখ্যার শেষাংশে স্বীকার করিয়াছিলাম যে, সাংখ্যের সেই উৎকৃষ্ট প্রকৃতি পুরুষবাদের বিরুদ্ধেও বেদান্ত স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করে নাই। সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টি সম্বন্ধীয় মত ও যুক্তিগুলিকেও বেদান্ত খণ্ডন করিয়া দিয়াছে। এ সংখ্যায় আমরা কিরূপে ও কি যুক্তিবলে বেদান্ত-দর্শন, সাংখ্যের সেই

অতি সুন্দর প্রকৃতি পুরুষবাদের মূলোচ্ছেদ করিতে প্রয়াসী হইয়া, একমাত্র ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পাইব।

সত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ ব্যতিরিক্ত জগতে অন্যরূপ গুণের অস্তিত্ব নাই। এই ত্রিবিধ গুণের মিশ্রণ বা অল্পাধিক বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক সৃষ্টপদার্থেই পরিলক্ষিত হয়। এই গুণত্রয়, সুখদুঃখ ও মোহাত্মক। এই গুণত্রয় যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন তাহাকেই "প্রকৃতি" বলা যায়। নির্গুণ চৈতন্যময় পুরুষ, ভোগাপবর্গ সাধনের জন্য, কর্ম্ম বা অদৃষ্ট বশতঃ সেই অচেতন প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হয়। তাহা হইতেই প্রকৃতির কার্য্যাকারে পরিণাম হয়। সেই সংযোগ ফলে, প্রকৃতির মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়। অর্থাৎ সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইয়া একটী গুণ অপর অপেক্ষা কিছু বেশী প্রবল হয়;—সেই বৈষম্য ক্রিয়া বলেই মহত্তত্বাদি ক্রমে সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হয়। প্রকৃতি অচেতন ও জড়;—পুরুষ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও চেতন। সুতরাং সমস্ত জগতের কারণ সেই অচেতন প্রকৃতি। প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণাম হইতেই এজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ ইহাই সাংখ্যমত। একথা আমরা এই প্রবন্ধের প্রথম সংখ্যায় বলিয়া আসিয়াছি।

বেদান্ত, সাংখ্য-প্রবর্ত্তিত এই প্রকৃতি-পুরুষবাদের যথাযথ খণ্ডন করিয়া স্বমত প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। বেদান্তের যুক্তি-সমূহ প্রধানত নিম্নে বিবৃত হইল।

১। সাংখ্য বলেন, অচেতন সুখদুঃখ মোহাত্মক প্রকৃতিই সৃষ্ট বিষয় বা পদার্থ সমূহের কারণ। যেমন ঘটশরাবাদি জড় পদার্থ সমূহ মৃত্তিকা প্রভৃতি সমন্বিত বলিয়া, মৃত্তিকা প্রভৃতিই ঐ ঘটাদির কারণ;—সেইরূপ বাহ্যিক ও আন্তরিক সমুদয় পদার্থ সুখদুঃখ মোহাত্মক বলিয়া, উহাদের কারণও সুখদুঃখ মোহাত্মক। সেই সুখদুঃখ মোহাত্মক অচেতন ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি চেতন পুরুষের ভোগাপবর্গ সাধনের জন্যই স্বভাবতঃ গুণবিক্ষোভবশতঃ বিচিত্র জগদাকারে স্বয়ংই পরিণতা হইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এজগতে কোথায় দেখিয়াছ যে, অচেতন পদার্থ, কাহারও কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, চেতন দ্বারা চালিত না হইয়া স্বয়ংই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে? চেতন দ্বারা প্রেরিত বা অধিষ্ঠিত হইলে, তবে অচেতন কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। অচেতনা প্রকৃতি কি করিয়া কেবল স্বভাবতঃই পরিণত হইয়া এজগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে? অতএব সাংখ্যের সেই "পুরুষার্থ এবং হেতুঃ, ন কেন চিৎ কার্য্যতে করণং"—এ উক্তি নিতান্তই অসার। সৃষ্টিকার্য্যে কেবলমাত্র পুরুষার্থই (ভোগাপবর্গ) কারণ হইতে পারে না, উহা চেতন দ্বারা চালিত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। অচেতন জড় মৃত্তিকাদি যদি চেতন কুম্ভকারাদি কর্ত্তৃক প্রেরিত বা চালিত না হয়, তবে যুগসহস্রেও সেই মৃত্তিকাদি হইতে একটী ঘট উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, চেতন দ্বারা অচালিত বা অনধিষ্ঠিত হইয়া, অচেতন প্রকৃতি স্বয়ং এ জগতের কারণ হইতে পারে না।

তারপর, সাংখ্য সমস্ত পদার্থ সুখদুঃখ মোহাত্মক বলিয়া, তাহাদের কারণেও সুখ দুঃখ মোহাত্মক প্রকৃতিকেই দেখিয়াছিলেন

কিন্তু শব্দাদি সমুদয় বিষয় মাত্রই বাহ্যিক। আর সুখ দুঃখাদি বাহ্যিক নহে;—ইহারা আন্তরিক বা মানসিক ধর্ম্মমাত্র। অতএব পদার্থ সমূহ যে সুখ দুঃখ মোহাত্মক, একথা ভ্রান্তিপূর্ণ। কেননা, বাহ্যিক পদার্থ কিরূপে আন্তরিক সুখ দুঃখ মোহাত্মক হইতে পারে? আবার দেখ, একই বিষয়, লোক, বাসনার বৈচিত্র্যবশতঃ, কাহারও পক্ষে দুঃখজনক; কাহারও পক্ষে সুখাত্মক, আবার কাহারও নিকটে সেই বস্তুই মোহজনক হইয়া থাকে। একই বনিতা-বদন, স্বামীর নিকটে পরমানন্দজনক; আবার উহাই, সপত্নীর মহাবিদ্বেষ ও পরম দুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব বিষয় বা পদার্থ সমূহ স্বয়ং সুখ দুঃখ মোহাত্মক—একথা হইতেই পারে না।

তারপর সাংখ্যের আর এক যুক্তি এই যে, সৃষ্ট পদার্থ যখন পরিমিত (Limited), তখন উহার কারণ অবশ্যই প্রকৃতি। কথাটা একটু অনুধাবন করিয়া বুঝিতে হইবে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারই পরিমাণ আছে (Measure); অর্থাৎ যে বস্তুরই ইয়ত্তা বা সীমা পরিচ্ছিন্ন করা যায়, দেখা যায় যে, দুই তিন বা ততোধিক কারণের সংসর্গে বা মিশ্রণে তাহার উৎপত্তি। যেমন দেখ, বৃক্ষের মূল, অঙ্কুরাদি পদার্থ "পরিমিত" (Limited)। উহারা নিশ্চয় বীজ, ভূমি, ও জলাদির একত্র সংসর্গে বা মিলনে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই যখন পরিমিত, তখন ইহা ঠিক্ অনুমান করা যাইতে পারে যে, সৃষ্ট পদার্থও দুই তিনটীর সংসর্গে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ইহাদের কারণ হইতে পারে না। কেননা, অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ত আর পরস্পর 'সংসর্গ সম্ভব হয় না। অতএব পদার্থ মাত্রই সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিবিধ গুণের সংসর্গে বা মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যের এরূপ উক্তি শ্রুতি মধুর মাত্র। কেননা, বস্তু "পরিমিত" হইলেই যদি তাহা অন্য কয়েকটীর "সংসর্গ" হইতে উৎপন্ন হওয়া নিয়ম হয়, তবে সত্ত্ব, রজ ও তম—ইহারাও যখন পরস্পর পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন;—তখন ইহারাও ত পরিমিত। সুতরাং সত্ত্ব রজ তমেরও আবার "সংসর্গজন্য" কোন কারণ স্বীকার করা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু প্রকৃতির ত আর কারণান্তর নাই। অতএব অচেতন প্রকৃতি পরিণত হইয়া জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে—এ যুক্তি অসার ও অলীক।

২। সৃষ্টির প্রাক্কালে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে। সৃষ্টিকালে, প্রকৃতির বৈষম্য হয় অর্থাৎ কোন গুণ প্রধান, কোন গুণ অপেক্ষাকৃত অপ্রধান হইয়া পড়ে; তৎপরে এইরূপ বৈষম্য হইলে পর মহদাদিক্রমে সৃষ্টি হয়। ইহাই সাংখ্য মত। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রকৃতির এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব কি না? মৃত্তিকাদি বা রথাদি, কখনও কুম্ভকারাদি বা অশ্বাদি কর্ত্তৃক চালিত না হইলে, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। সুতরাং অচেতন প্রকৃতির স্বভাবত কি করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে? প্রবৃত্তি বা কার্য্যের আশ্রয় স্বরূপ দেহাদি-সম্বলিত চেতনেরই কার্য্যকারিতা দেখা যায়। কেবল চেতন বা কেবল অচেতন পদার্থের কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতেই পারে না। অচেতনে, চেতনের ক্রিয়া বা অধিষ্ঠান না হইলে, কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিতেই পারে না। যদিও চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মের কোনরূপ প্রবৃত্তি নাই, তথাপি, প্রবৃত্তি-

রহিত-রূপাদি যেরূপ চক্ষুরাদির প্রবর্ত্তক, সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মও সর্ব্ববিধ কার্য্যের প্রবর্ত্তক। অতএব অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব;—সুতরাং সাংখ্য মতে সৃষ্টিও অসম্ভব হইয়া পড়িল।

৩। যেমন গোদুগ্ধ অচেতন হইলেও, গোবৎসের পুষ্টির জন্য স্বভাবতই ক্ষরিত হয়; যেমন জল অচেতন হইলেও, লোকোপকারার্থ স্বভাবতই স্যন্দিত হয়;—তদ্রূপ প্রকৃতি অচেতন হইলেও, পুরুষার্থ সাধনের জন্য স্বতঃই প্রবৃত্ত হইবে—ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কিন্তু সাংখ্যের এরূপ যুক্তি তত সাধু নহে। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে, দুগ্ধ ও জল উভয়েতেই চেতনাধিষ্ঠান রহিয়াছে। ধেনু চেতন;—চেতন ধেনুর ইচ্ছা বা স্বীয় বৎসের প্রতি স্নেহের জন্যই ত দুগ্ধ ক্ষরিত হয়। চেতন বৎসও ত আকর্ষণ করিয়াই দুগ্ধ ক্ষরিত করায়। অতএব নিরপেক্ষ ও নিরবচ্ছিন্ন অচেতনই স্বভাবত প্রবৃত্ত হয়, ইহা ত কোথাও দেখা যায় না। তারপর, সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতিতে কে তবে কার্য্য উৎপন্ন করায়? পুরুষ ত সাংখ্যমতে নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন। সুতরাং নিষ্ক্রিয় পুরুষ কদাপি প্রকৃতির প্রবর্ত্তক হইতে পারেন না। কে তবে প্রকৃতিতে প্রথম বৈষম্যরূপ বিক্রিয়া উপস্থিত করিল? অদৃষ্ট বা কর্ম্ম ও প্রবর্ত্তক হইতে পারে না। কেননা, সাংখ্যমতে, প্রকৃতি ব্যতিরিক্ত কর্ম্মের সদ্ভাব কোথায়? কর্ম্মও ত প্রকৃত্যাত্মক এবং অচেতন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতির নিজের যখন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সামর্থ্য নাই, এবং উহার যখন অন্য কোন প্রবর্ত্তক নাই, তখন সৃষ্টি ক্রিয়াও আরম্ভ হইতে পারে না।

৪। আমরা উপরে দেখিয়া আসিয়াছি যে, প্রকৃতির বিনা কারণে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। প্রকৃতির বিক্রিয়া বা কার্য্য হইতে হইলেই তাহার একটী প্রবর্ত্তক বা কারণ আবশ্যক। আর যদি তর্কের অনুরোধে স্বীকারই করা যায় যে, প্রকৃতি পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়;—এরূপ স্বীকার করিলেও বিষম দোষ আসিয়া পড়ে। স্বীকারই করিয়া লইলাম যে, প্রকৃতি স্বভাবতই কার্য্যাকারে পরিণত হয় এবং বাহ্য কোন সাধনের অপেক্ষা করে না;—তাহা হইলেই জিজ্ঞাসা করি, যদি সহকারী কোনরূপ কারণের অপেক্ষা না থাকে, তবে বল যে, কোন "প্রয়োজনেরও" অপেক্ষা নাই। তবে আর তুমি কেমন করিয়া বলিতে পার, যে "প্রকৃতি প্রাণীর ভোগাপবর্গ সাধনরূপ প্রয়োজনের জন্যই কার্য্যাকারে পরিণত হয়।" এরূপ "প্রয়োজন" স্বীকারেরই বা প্রয়োজন কি? তারপর আর এক আপত্তি এই যে, এ কিরূপ প্রয়োজন? 'ভোগ'ই যদি প্রয়োজন হয়, তবে যিনি কূটস্থ, যিনি সুখ দুঃখাদি হইতে বহুদূরে অবস্থিত, সেই অসঙ্গ উদাসীন পুরুষের আবার 'ভোগ' কিরূপ? নিঃসঙ্গ পুরুষের আবার সুখদুঃখ ভোগ কি? আর যদি "অপবর্গের" জন্যই প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয় বল, তবে প্রবৃত্তির পূর্ব্বেও ত অপবর্গ বা মুক্তি বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং প্রবৃত্তি অনর্থক হইয়া পড়ে। আর যদি "প্রকৃতির ঔৎসুক্য-নিবৃত্তি"র জন্যই প্রবৃত্তি জন্মে বল, তবে একটী দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অচেতন প্রকৃতির 'ঔৎসুক্য' সম্ভবে না;—এবং শুদ্ধ নির্ম্মল পুরুষেরই বা ঔৎসুক্য আসিবে কোথা হইতে?

৫। সাংখ্যের আর একটী যুক্তি এই

যে, যেরূপ একটী পঙ্গু (যাহার দৃষ্টিশক্তি আছে, কিন্তু চলৎশক্তি বা প্রবৃত্তি শক্তি নাই), অপর একটা অন্ধকে (যাহার দৃষ্টি-শক্তি নাই, কিন্তু প্রবৃত্তি আছে) চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে; যেরূপ চুম্বক লৌহকে আকর্ষিত করে; তদ্রূপ পুরুষও প্রকৃতিকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে সাংখ্যের এ যুক্তিও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে। সাংখ্যমতে পুরুষ উদাসীন। উদাসীন পুরুষ কি করিয়া প্রকৃতিকে চালাইবে? পঙ্গুও ত অন্ধকে বাক্য ইত্যাদি দ্বারা প্রবর্ত্তিত করায়। কিন্তু পুরুষ ত নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ। আর যদি বল যে, চুম্বক যেমন লৌহের সন্নিকর্ষে থাকিয়াই, তাহাতে ক্রিয়া উৎপাদন করায়, তদ্রূপ পুরুষ ও প্রকৃতির সন্নিকর্ষ বা সান্নিধ্য হইলেই প্রবৃত্তি হইবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, পুরুষ ও প্রকৃতির ত সর্ব্বদাই সন্নিকর্ষ রহিয়াছে। তবে নিত্যই সৃষ্টি হউক না কেন? সুতরাং পুরুষ উদাসীন বলিয়া, প্রকৃতি অচেতন বলিয়া, এবং এতদুভয়েরর পরস্পর মিলন বা সমন্বয়ের তৃতীয় কোনরূপ কারণের অসদ্ভাব বশতঃ প্রকৃতির কদাচ কার্য্যাকারে পরিণাম হইতেই পারে না। অতএব সাংখ্যমতে সৃষ্টিই হইতে পারে না। অতএব সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষবাদ তত সমীচীন নহে।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

খোকার বিলাতের পত্র। (১)

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,—

পুনঃ পুনঃ আমার ভ্রমণের বৃত্তান্ত জানিতে চাহিতেছ। পথে, যেইখানেই সুযোগ পাইয়াছি, সেখান হইতেই পত্র লিখিয়াছি, যতদূর সম্ভব পথের সংবাদ দিয়াছি। কিন্তু তবুও তাহাতে তোমাদের মনস্তুষ্টি হয় নাই। যাহা হউক, আমার খাতা হইতে যতদূর সম্ভব পথের সমস্ত 'সবিশেষ' কথা লিখিতে বসিলাম। এবিবরণ বড়ই সংক্ষিপ্ত হইল।

ইংরাজি নবেম্বর মাসের ৩রা, শনিবার-রাত্রে তোমরা আমাকে জাহাজে একাকী ফেলিয়া চলিয়া গেলে। যখন তোমাদের নৌকাগুলি ফিরিতেছিল, আমি তখন ডেকের উপরে। যতক্ষণ সম্ভব, কেবল তোমাদের পানে তাকাইয়া রহিলাম। দুষ্ট অন্ধকার তোমাদিগকে তাহার কোলে লুকাইল। আর তোমাদের দেখিতে পাইতেছি না, তবুও তাকাইতেছি, খুঁজিতেছি। বোধ হয়, ভুলিয়া তোমরা একটা জিনিষ আমার সঙ্গে দাও নাই। আমার বেশ মনে আছে, আমরা বাড়ী ছাড়িবার সময় অতিকষ্টে সেটাকে জাহাজ পর্য্যন্ত আনিয়াছিলাম; কিন্তু ভুলিয়া জাহাজে তোলা হয় নাই। আমি তুলিতে পারি নাই—তোমরাও দাও নাই। তোমরা ফিরিয়া গেলে, আমার প্রাণটাকেও লইয়া গেলে? কি বিষম ভুল! প্রাণ লইলে কি প্রাণী বাঁচে? আমি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। ডেকের উপর তখনও দাঁড়াইয়া আছি। ঐ বুঝি তাহারা ফিরিয়া আসে। কই?—কিছুই নয়, আকাশ-কুসুম। ১১টা, ১২টা, ১টা বাজিয়া গেল, তবু তোমরা আসিলে না। তখন নিরাশায় আমার ক্ষুদ্র ঘরে ফিরিলাম।

কেমন সুন্দর ঘর। সাদা দুধের মত পরিষ্কার বিছানা। আয়না, চিরুনি, ব্রুস্, তোয়ালে, পিপাসা-নিবারণের জন্য শীতল জল, গ্লাস, সুন্দর, পরিষ্কার, পরিপাটী, কিছুই অভাব নাই। কেমন সুন্দর বৈদ্যুতিক আলো! সবই সুন্দর, কিন্তু আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। যত গ্রীষ্ম কি আমার ঘরে?--জানালা (Port-hole) খুলিয়া দিলাম-বাতাস নাই। বাক্স খুলিলাম, তোমরা যে পাখা দিয়াছিলে,তাহা বাহির করিলাম। বাতাস করিতে করিতে হাত ব্যথা হইল, প্রাণ ঠাণ্ডা হইল না। প্রাণই নাই,—ঠাণ্ডা হইবে কি ছাই! বিদায় দিবার সময় তুমি ব'লেছিলে—'কষ্ট হইলে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে। প্রার্থনাই আমাদের এক মাত্র সম্বল।' সে কথা আমি ভুলি নাই। একবার, দুইবার, কতবার যে তাঁহার নিকটে সান্ত্বনা ভিক্ষা চাহিলাম, ঠিক নাই। রাত্রি প্রায় শেষ হইতে চলিল। ঘড়ি টুন্‌টুন্ করিয়া তিনটা বাজিল। এখন একটু ভাল লাগিতেছে;—রাত্রি শেষে প্রায়ই শীতল বাতাস বহিয়া থাকে। এই সুযোগে কি জানি কখন নিদ্রাদেবী আমার চক্ষের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিলেন। ক্ষণেকের জন্য বেশ ঘুমাইলাম। কত কি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। যদিও সেই সব স্বপ্ন ঘুমের ব্যাঘাৎ জন্মাইতেছিল, তবুও ক্লান্তির পর ঘুমাইলাম বেশ। এখন ভোর পাঁচটা। আর ঘুম হইল না। ষ্টিমারের শিকল সমূহের কড়-মড় শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইলাম। ডেকের উপরে যাইতেছি, দেখিলাম,(Mr. Rowe) রো সাহেব আমার খোঁজ করিতেছেন; (Steward) কে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আমি তাঁহার নিকটে গেলেম; সহজেই বেশ আলাপ হইয়া গেল। এমন ভাল লোক আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহার সহিত উপরে গেলাম। তিনি আমাকে মিসেস্ রো (Mrs. Rowe) এর সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা করিয়া অনেকটা শান্তি পাইলাম। আজ রবিবার, মেটেবুরুজের কাছে আমরা গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইলাম। মিঃ রো বলিলেন 'প্রায় একমাস আর উপাসনালয় (Church) দেখিতে পাইব না, দেখিলেও যোগ দেওয়া হইবে না।'

আমরা এ জাহাজে (Eriden) অনেক লোক নই। জোর ৫০ জন ভদ্রলোক যাত্রী। জাহাজে লোকের সহিত আলাপ হওয়া বড়ই সহজ। সকলেই জানে, মানুষ একাকী থাকিতে ভালবাসে না। জাহাজে তাতে আবার কোন কাজ কর্ম্ম নাই। চুপটী করিয়া কোন কাজ না করিয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব। কাজেই সহজেই পরস্পরে আলাপ হয়। কলিকাতা হইতে লণ্ডনের যাত্রী মোটে পাঁচ জন ছিলাম। Mr. Rowe, Mrs. Rowe, Mr. Nutter, Dr. Alock এবং আমি। প্রথম দুইজনকে তোমরা চেন। তৃতীয় ব্যক্তি বোম্বাইতে British Marine Service এ কাজ করেন। বয়স বড় বেশী নয়, ২০।২১। বাড়ী স্কটলণ্ডে। এক বৎসরের ছুটি লইয়া দেশে যাইতেছেন। ইনি আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে ইহার অনেক কথা লিখিতে হইবে। তারপর, Dr. Alcock, ইহাকেও বোধ হয় তোমরা জান। আমাদের কলিকাতার যাদুঘরের ইনি তত্ত্বাবধায়ক (Supdt.) পনর মাসের ফার্লো পাইয়া এক বার বাড়ী যাইতে...

তেছেন। ইনি অত্যন্ত বিনীত, অহঙ্কার-শূন্য। আমি ইহাকে চিনিতাম না, কিন্তু ইনি স্বয়ং আসিয়া আলাপ করেন। ইনি যে এত বড় লোক বুঝিতে পারি নাই, কেন না, তিনি স্বভাবত সুমিষ্ঠ আচার ব্যবহারে বুঝিতে দেন নাই। আমাদের দেশী কোন লোক যদি এত উচ্চপদ পান, গর্ব্বে ফুলিয়া উঠেন, আর কাহারও সহিত কথা বলেন না। সভ্যতার তারতম্য কি এই খানে নাই?

আগেই বলিয়াছি, রাত্রে ঘুম হয় নাই। সেই জন্য শরীর কেমন কেমন করিতে লাগিল। রো সাহেবের আদেশ মত বেশ করিয়া মাথা ধুইয়া ফেলিলাম। আমাদের ব্রেকফাষ্টের সময় পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা। স্নানাদি করিতে প্রায় দশটা বাজিল। এই আমার প্রথম দিন;—টেবিলে গেলাম। আচার ব্যবহারে যদিও আমি অভ্যস্ত নই, তবুও পুঁথিগত বিদ্যা আমার বেশ ছিল, ওয়েব (Webb) সাহেবের বই খানি পড়িয়া প্রায় মুখস্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম। তাই আমাকে কোন বিশেষ লজ্জায় পড়িতে হইল না। অন্ততঃ ডান হাতে চামচ, বামহাতে কাঁটা ধরিতে জানি। কিন্তু কাঁটা ধরা জানিলে হইবে কি?—পেট ভরে কই? আমার ইচ্ছা করিতেছিল, একবার ধাঁ করিয়া খানিকটা হাত দিয়া খাইয়া ফেলি, কিন্তু পারিলাম কই? পেট ভরিলনা, ক্ষুণ্ন মনে ঘরে আসিলাম। সঙ্গে যে সমস্ত দেশী খাবার ছিল, তাহা খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিলাম।

এখন বেলা ১১টা। জাহাজ এখনও গঙ্গাতে। একখানা দুইখানা জাহাজ দেখিতে পাইলাম। এখনও জোয়ার আছে। তবুও জাহাজ আস্তে২ চলিতেছে, কি জানি পাছে ডাঙ্গায় লাগিয়া যায়। ক্লান্তি হেতুও বটে, আর পূর্ব্ব রাত্রির অনিদ্রা হেতুও বটে, গঙ্গার সুন্দর শীতল বায়ুতে, ডেকের উপরে চেয়ারে বেশ ঘুমাইলাম। বড় সুন্দর ঘুম হইল। কতক্ষণ ঘুমাইলাম, জানি না, কিন্তু যখন বেলা প্রায় সাড় তিন, সেই সময়ে নঙ্গর সিকলের ভয়ানক শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এখনও আমারা নদীতে, নদী নয়, যাহাকে সকলে গঙ্গাসাগর বলে। চারিধারেই জল, সম্মুখে একটু চড়া দেখা যাইতেছে। হঠাৎ মধ্য নদীতে নঙ্গর করিতে দেখিয়া একটু ভয় হইল। ভাবিলাম, বুঝি চড়ায় ঠেকিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে সকলের মুখ প্রসন্ন দেখাইত না। আমি রো সাহেবকে এইরূপ স্থানে থামিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন,"কোন ভয়ের কারণ নাই। এখন ভাঁটা পড়িয়াছে, এবং এই সমস্ত স্থান তত গভীর নয়, সেই জন্য আবার জোয়ার হওয়া পর্য্যন্ত জাহাজ এইখানে থাকিবে।" ক্রমে আরও দুই এক খানি জাহাজ আসিয়া আমাদের আশে পাশে নঙ্গর করিল। আমাদের জাহাজ নঙ্গর করে প্রায় সাড়ে তিনটার সময়। সূর্য্যের এখন তত তেজ নাই, প্রায় ডুবু ডুবু হইতেছে। আমরা এই সময়ে চা খাইতে আমাদের খাবার ঘরে গেলাম। চা খাইতে আমার বড় কষ্ট হইল না, কেননা ইহাতে বেশী কোন চাল-চলন (etiquette) নাই। ওয়েব সাহেবের বইখানি একবার দেখিয়া লইলাম। চামচ দিয়া চা পান করা নিষেধ। চামচটী কেবল শোভার জন্য ও নাড়িবার জন্য। পেয়ালা ধরিয়া পান করা নিয়ম। এই রীতি দেখিয়া আমার কোন বেশী কষ্ট হইল না, কেননা পেয়ালা ধরিয়া চুমুক দেওয়াত

বেশ সহজ; ঐ একটু ২ ক'রে চামচ দিয়ে খাওয়াই কঠিন। হায়, অনভ্যাস হেতু চামচে আবার কিছুই উঠে না, সব পড়িয়া যায়। কোন রকমে কয়েক খণ্ড রুটি, এক প্যালা চা খাইয়া আবার ডেকে গেলাম।

বিদায় গ্রহণের সময় প্রায় সকলেই অতি নম্র, বিনীত হইয়া থাকে। প্রায় পাঁচটা বাজে। আমাদের গাঢ় অন্ধকারে ফেলিয়া সূর্য্যদেব বিদায় লইবার সুযোগ দেখিতেছেন। এখন আর তাঁহার সেই উগ্র মূর্ত্তি নাই। কত নম্র! দিবসের উগ্রতার জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, এখন তিনি লজ্জায় রক্ত-বর্ণ হইয়াছেন। না আর সহ্য হইল না, ধীরে ২ সমুদ্রের এক কোণে ধীরে ২ মুখ লুকাইতে লাগিলেন। সমুদ্র আনন্দে আট খানা; কেমন প্রফুল্ল মনে তাহাকে স্নেহ-কোল দিতেছে, ধীরি ২ নৃত্য করিয়া সূর্য্যকে ডাকিয়া লইতেছে। এখন পাখীগুলিও বিদায় দিবার জন্য বাহির হইল। ঝাঁকে ২ তাহারা ঘুরিয়া ২ উড়িতে লাগিল। কেমন সুন্দর দৃশ্য! তুমি ত এই দৃশ্য দেখিয়াছ, বেশ বুঝিতেছ। আমরা ডেকের উপরে পাইচারি করিতে লাগিলাম ও স্বভাবের এই আশ্চর্য্য লীলা খেলা দেখিয়া মোহিত হইলাম। বেশীক্ষণ দেখিতে পারিলাম না। ডিনারের ঘণ্টা বাজিল। সকলকে নীচে যাইতে হইল। ডিনার ছয়টার সময়। এইবার একটু ভাল করিয়া খাইতে পারিলাম। যাহা তাহা করিয়া খাইয়া অন্য সকলে কি প্রকারে আহার করে, তাই দেখিতে লাগিলাম। এইরূপ দেখিতে ২ শীঘ্রই বেশ ভাল করিয়া খাইতে শিখিলাম। ডিনারে খাইতে দেয় একটা ঝোল (soup), বিফষ্টেক, মাটন, কফি, আলু, কলা, লেবু, আপেল, আনারস, কখন ২ আতা, নেশপাতী, বাদাম, কিস্‌মিস্, মনক্কা, তারপর কুল্‌পি বরফ, (Ice-cream) শেষে চা কি কাফি। এই জাহাজে মদটা জলের মত ব্যবহৃত হয়। ক্লারেট কিম্বা বিয়ার যে যত চায়, সে তত পায়, কেবল ডিনার সময়ে। অন্য সময়ে কিনিয়া খাইতে হয়। যাহারা মদ না খায়, তাহাদের জল ভিন্ন উপায় নাই, কারণ লিমনেড্ ১টা ছয় পেন্স, সোডা ৩½ পেন্স।

গত রাত্রে ঘুম হয় নাই, গরমের জন্য। আর জানিয়া শুনিয়া কি ঐ পায়রার খুবরীতে ঘুমাইতে পারি? রো সাহেবের কথা মত ষ্টুয়ার্ডকে বলিয়া ডেকের উপরে বিছানা করাইলাম। আমরা সকলেই ডেকের উপরে ঘুমাইলাম। ঘুম বেশ হইল। নদীর শীতল বায়ুতে কার না ঘুম হয়?

সোমবার, ৫ই অক্টোবর, ৯৬। পাঁচটার সময়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এখন জোয়ার আসিয়াছে। জাহাজ ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছে। উঠিয়া যাঁহাকেই সম্মুখে দেখিলাম, তাহাকেই গুড্‌মর্নিং (good morning) করিলাম, কেননা, এইরূপ যে না করে, সে নিতান্ত অসভ্য। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার বাবু ইহা শিখাইয়া দিয়াছিলেন। আধ ঘণ্টা পরে জাহাজ ছাড়িল। প্রাতঃকালের দৃশ্য আরও সুন্দর! কেমন সুন্দর সহাস্য বদনে সূর্য্যদেব শীতল সমুদ্র-জলে স্নান করিয়া পবিত্র ও নির্ম্মল হইয়া উদিত হইতেছেন। সাধে কি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ইঁহাকে দেবতা রূপে বর্ণনা করেন। আমার ইচ্ছা হইল, একবার সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি। কিন্তু তাঁহাকে না করিয়া সূর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, পিতার পিতা, মাতার মাতা, অসহায় সমুদ্রবক্ষে একমাত্র সহায় সম্বল, ভবার্ণবের কাণ্ডারী, দয়াময় দীন-

বন্ধুকে অন্তরের ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য আমার নিজঘরে গেলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার পূজা করিয়া, শান্ত হইলাম। অবশেষে স্নান করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে ফরাসী জাহাজের কষ্টে পড়িতে হয় নাই। এতক্ষণ তাহারা যাহা দিয়াছে, তাহাই খাইয়াছি। আমার কিছুই চাহিতে হয় নাই। এখন তোয়ালে চাই, বোঝেনা, সাবান চাই, দেয় না। তাহাদের দোষ কি, তাহারা ইংরাজি কিম্বা হিন্দি, কিছুই বুঝিতে পারে না। আমি মহা মুস্কিলে পড়িলাম। সেই ফরাসী বই খানি দেখিয়া দুই একটী কথা শিখিলাম। কোন রকমে তাহাদের জানিতে দিলাম, আমি ফরাশী ভাষা জানি না। স্নান করিতে চাই, সাবান তোয়ালে দাও। তোয়ালে দিল বটে, কিন্তু সাবান কই, কি বলে ছাই ভস্ম কিছুই বুঝিনা। তার পর তাহাদের ভাব ভঙ্গিতে বুঝিলাম যে, সাবান দেওয়া তাহাদের নিয়ম নয়। বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। স্নান করিয়া নিজের ঘরে গেলাম। এখন এইরূপ অসময়ে আবার নিদ্রাদেবী কৃপা করিলেন। বিছানায় বেশ ঘুমাইয়া পড়িলাম। ১০টা বাজিয়া গেল, হুস্ নাই। আমার লোক (waiter) আমাকে ডাকিয়া, ব্রেকফাষ্টের সময় হইয়াছে, জানাইল। শরীর ভাল লাগিতেছে না। মন ভাল না থাকিলে কি শরীর ভাল লাগে? কোন রকমে একটু খাইলাম। সেই সিদ্ধ পোড়া মাংস দেখিয়াই বমি আসিতে লাগিল। এখনও আমার রুচি সুমার্জ্জিত হয় নাই। খাইয়া বমি বমি লাগিতে লাগিল। দুই একখানা বেলের মোরব্বা খাইলাম। আবার ঘুমাইব, ভাবিলাম। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একবার ডেকে বেড়াইতে গেলাম। ও কি! অকূল— অকূল নীল জল, কেবল নীল। ধু ধু করিতেছে নীল জল। দূরে আকাশ সমুদ্রকে চুম্বন করিতেছে। যে দিকে চাই, কেবল জল আর আকাশ। অতবড় জাহাজখানি এখন যেন অতল অসীম জল রাশির মধ্যে তৃণ কণার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। দূরে দেখিলাম, তোমাদের Sea-Gull আসিতেছে। অনেক ক্ষণ দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে ক্লান্ত হইলাম, আর ভাল লাগিল না। Sea-Gull আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। আমিও সময় বুঝিয়া চেয়ারের উপরে ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া তোমাদের কথা স্বপ্নে দেখিতে লাগিলাম। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াও নিস্তার নাই, কত কাঁদিলাম, জাগ্রত অবস্থায় কখনও এত কাঁদি নাই।

চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখি, Mr Rowe, Mrs. Rowe এবং অপর অপর ব্যক্তি পাশে গল্প করিতেছেন। আমি সকলের নিকট ক্ষমা চাহিলাম (Excuse me) রো বলিলেন,—বেশ ঘুমাইয়াছ। আমি—হাঁ। রো বলিলেন, 'জানিবে, সমুদ্রে দুই চারি দিন ঘুমাইতে পারিলেই ভাল, পরে সহিয়া যায়। আর কোন অসুখ হয় না।'' তারপর Mr Nutter এর সঙ্গে পাটাতনের উপর পাইচারি করিতে লাগিলাম। জাহাজে অনেক লোক, সকলেই আমাকে আদর করে, তবে আমার নামটা বড়ই বড়। যাহারা অধিক ঘনিষ্ঠ, তাহারা Mr. Ray বলিতে নারাজ, আমিও ভালবাসি না। অবশ্য অন্যান্য সকলেই ঐ নামে ডাকে, তবে আমার বন্ধুগুলি কেন ঐ নামে ডাকিবে? আমার নাম জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, বড়ই কঠিনা,—প্র-ভা-ত। তাঁহারা সকলে মিলিয়া আমার Patrick নাম দিলেন। আমি ক্রমে

ক্রমে জাহাজে ঐ নামেই চলিলাম। মিঃ রো এখনও চিঠিপত্রে 'My dear Patrick' লিখিয়া থাকেন। বেড়াইতে বেড়াইতে ছয়টা বাজিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রায় মাইল দুই তিন বেড়াইয়াছি। বেশ লাগিতেছিল। কিন্তু ক্ষুধা পাইয়াছে, আর ডাকও পড়িয়াছে। সকলের সঙ্গেই আলাপ হইয়াছে,এখন আর টেবিলে বেশি লজ্জা করে না। সমস্তই বন্ধু 'নাটারের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে পারি। খাইয়া নিজের ঘরে গিয়া ঘণ্টা দুই আইন পুস্তক পড়িলাম। আর ভাল লাগিল না; গরম বোধ হইতে লাগিল! উপরে গেলাম। অপরাপর বন্ধুগণের সহিত আলাপ করিলাম। অনেক ক্ষণ গল্প করিলাম। তার পর সকলে ডেকের উপর ঘুমাইলাম। বেশ ঘুম হইল, বেশ সুন্দর ঠাণ্ডা বাতাস। আরামে ঘুমাইলাম।

মঙ্গলবার, ৬ই অক্টোবর। যদিও প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমুদ্র বেশ শান্ত ছিল, যদিও নির্ম্মল জলরাশির মধ্য দিয়া আমাদের তরীখানি ভাসিতে ভাসিতে,দুলিতে দুলিতে কত কি রঙ্গ করিতেছিল, যদিও সূর্য্যদেব নির্ম্মল মেঘ-শূন্য আকাশ হইতে প্রখর কিরণ বিস্তার করিয়া রাত্রের শীতলতাকে বিনাশ ও দিবসের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিলেন, যদিও আজ প্রকৃতি রীতিমত নূতন সাজে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণা হইয়া জগতকে মুগ্ধ বিমুগ্ধ করিতে কুণ্ঠিত নন; তবুও কি জানি কেন, কোন অজানিত কারণে আমার এ সব ভাল লাগিতেছে না। প্রথম প্রথম সমুদ্র দেখিব বলিয়া কত উৎসাহের সহিত আমি জাহাজে আসিয়াছিলাম। তুমি যখন 'উৎকল-ভ্রমণ' করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সমুদ্রের গল্প করিতে,কত ইচ্ছা হইত,একবার দেখিয়া আসি। ঐ নামে পুস্তকখানি বাহির হইলে কত উৎসাহের সহিত সমুদ্র-বর্ণনা পাঠ করিতাম। পুরাতন সাধ পূর্ণ হইবে বলিয়া কত আনন্দ হইয়াছিল। বিধাতা সমুদ্র দেখিবার সুযোগ দিলেন বটে, কিন্তু এই তিন দিনেই আমার সাধ বেশ মিটিয়াছে। আজ আর ভাল লাগে না। শরীর ভাল লাগে না, মন কি চায়, পায় না, প্রাণ উদাস উদাস। সমস্তই অবসাদগ্রস্ত। সুযোগ বুঝিয়া শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। কি করি, কোথায় যাই, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। পূর্ব্ব দুই দিন ডেকের উপরে শয়ন করিয়া একটু একটু সর্দ্দিও লাগিয়াছে, বড় বিশ্রী লাগিতে লাগিল। একবার কেবিনে, একবার সেলুনে (saloon) একবার ডেকের উপর, এইরূপ ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। একবার ভাবিলাম, যাই, সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করি, মন প্রফুল্ল হইবে। কই কিছুই হইল না; বরঞ্চ বাঙ্গালী জাতির বিষম সমালোচনায় আমার বিরক্তি হইল। তাহারা যেরূপ ভাবে আরম্ভ করিল, কি করি,পদে পদে আমাদের নীচতা স্বীকার করিতে হইল। একটু তর্ক করি, আর পারি না। ক্রমে ক্রমে বুঝিতেছি, আমাদের দেশ পাশ্চাত্য জগতের কত পশ্চাতে! শেষে আমি বলিলাম, বেশ, আমি বাঙ্গালী বলিয়া আমাকে ঘৃণা করেন নাকি? তাঁহারা আমাকে বড় ভালবাসেন, এই প্রশ্ন শুনিয়া বুঝিলেন, আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। আর ঐ বিষয়ে কোন কথা (অন্ততঃ সেই দিন) বলিলেন না। আমি তিক্ত বিরক্ত হইয়া নির্জ্জনতার অন্বেষণে, একেবারে জাহাজের পশ্চাৎ ভাগে চলিয়া গেলাম। সুবিধা পাইয়া চারিদিক হইতেই আমাকে চাপিয়া ধরিল।

তোমাদের কথা মনে পড়িল। স্মৃতি আসিয়া আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। জাহাজ সম্মুখে চলিয়াছে; সমুদ্র খুব শান্ত, ঠাণ্ডা; আমি বসিয়াছি,ঠিক হালের উপরে,পশ্চাতে যতই চলিতেছে,ততই আমি তোমাদের থেকে দূরে, —আরো দূরে পড়িতেছি। পশ্চাতে অনন্ত—কত অনন্ত যেন ফেলিয়া চলিয়াছি। আমি দেখিলাম, যেখান দিয়া জাহাজ যাই-তেছে, পিছনে ঠিক একটি পথ ফেলিয়া যাই-তেছে। যতদূর চক্ষু গেল, পথটী দেখিলাম। এই পথ দিয়া স্মৃতি আসিয়া রাক্ষসির মত চাপিয়া ধরিল। আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

কাঁদিলাম তোমাদের কথা মনে করিয়া, কাঁদিলাম, আমার দেশের দুর্ব্বলতার জন্য, কাঁদিলাম, আমার অপদার্থতা চিন্তা করিয়া, কাঁদিলাম, আরও কত কিছুর জন্য, তাহা লেখা দুঃসাধ্য এবং অযোগ্য। আমি পাঁচটার সময় আমার বন্ধুদের ছাড়িয়া আসিয়া নির্জ্জনে বসিয়াছি। কখন কি জানি, খাবার ডাক পড়িয়া গিয়াছে, শুনিতে পাইনাই। আমার লোক (waiter) আসিয়া আমাকে ডাকিল। একদিন এইরূপ ঘুমাইয়া পড়িয়া আহারের সময় উপস্থিত হইতে পারি নাই। আজ আবার সেইরূপ; বড় লজ্জায় পড়িলাম আমি বলিলাম,আমার ভাল লাগিতেছে না, আমি টেবিলে যাইব না। আমাকে এক প্যালা দুধ আনিয়া দাও। সামান্য চাকর, তাহার শিষ্টাচার দেখিলে অবাক হইতে হয়। সে বুঝিল, আমার অসুখ হই-য়াছে। দেখিলাম, সে চিন্তাযুক্ত হইয়াছে। কিছু পরে সে ডাক্তার সাহেবকে ডাকিয়া আনিল। আমি আশ্চর্য্য হইলাম। বাস্ত-বিক আমার তেমন কোন পীড়া হয় নাই। আমি ডাক্তারকে বলিলাম 'না মহাশয়, আমার বেশী কিছুই হয় নাই, তবে পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত।' 'আমার লোক আমাকে বিস্কুট, দুধ, চা, লিমনেড প্রভৃতি আনিয়া দিল। আমি তৃপ্তির সহিত আহার করিলাম, কেননা, যদিও দুই তিন দিন পোড়া মাংস খাইতেছি,তবু তাহা ভাল লাগে না। আমার যদিও সর্দ্দি হইয়াছে, তবু ডেকের উপরে শুইবার সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করিলাম না। সকলে মিলিয়া পুনরায় নির্ম্মল পবিত্র উন্মুক্ত বায়ুতে সুখে নিদ্রা গেলাম। গাঢ় নিদ্রার মত আর ঔষধ আছে কি না,জানি না। অন্ততঃ দুঃখের হাত হইতে বিশ্রাম লইবার উহা এক অব্যর্থ ঔষধ।

বুধবার, সাতই অক্টোবর। পূর্ব্ব দিনের মত আজও আমরা বঙ্গোপসাগরের অনন্ত (?) জল-রাশির মধ্য দিয়া যাইতেছি। বুঝিতেই পারি-তেছ,আমাদের কেমন লাগিতেছে। তবে কিনা, আমার সর্দ্দি কম, মাথাধরা মোটেই নাই, আর আমরা মান্দ্রাজের কাছে আসিতেছি, সেই আশা। স্নান করিয়া, Breakfastএর সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না, এত ক্ষুধা পাইয়াছে। ক্ষুধার চোটে আজ ঐ মাংস বেশ লাগিল। কোন রকমে দিনটা কাটিয়া গেল। আমরা রাত্রি ১২-টার সময় মান্দ্রাজে পৌছি। কিন্তু গভীর রাত্রে বন্দরে প্রবেশ নিষেধ বলিয়া আমা-দের বাহিরেই নঙ্গর করিতে হয়। পর দিন প্রত্যুষে উঠিয়া দেখি, আমরা বন্দরে প্রবেশ করিতেছি।

মান্দ্রাজ-বন্দর।

জাহাজ হইতে মান্দ্রাজ সহর অতিশয় সুন্দর দেখাইতেছে। বন্দরটী অত্যন্ত সুন্দর। কেমন চারি দিকে প্রস্তর-নির্ম্মিত দুর্গে

ঘেরা। একটী অতিশয় প্রকাণ্ড মুখ-ওয়ালা চৌবাচ্চা। কত ২ জাহাজ রহিয়াছে। কেহ জিনিষ তুলিতেছে, কেহ নামাইতেছে, কেহ বা নিস্তেজ নিষ্কর্ম্মা হইয়া কেবল বন্দরের শোভা-বর্দ্ধন কার্য্য সমাধা করিতেছে। প্রায় সাড়ে ছয়টার সময় আমাদের জাহাজ বন্দরের মধ্যে নঙ্গর করিল। দেখিতে দেখিতে অনেক গুলি নৌকা আমাদের দিকে অগ্রসর হইল। আমাদের জাহাজের মাল সমস্ত নামাইতে আরম্ভ করা হইল। মাল নামিলে আবার মাল লওয়া হইবে। Notice Boardএ বিজ্ঞাপিত হইল, জাহাজ রাত্রি ১০ ঘটিকার পূর্ব্বে ছাড়িবে না। এই সুযোগ বুঝিয়া, আমরা মান্দ্রাজে নামিব স্থির করিলাম, কতকটা দেখিবার জন্ত, আর বিশেষতঃ (আগেই বলিয়াছি ইহারা সাবান দেয় না) সাবান কিনিবার জন্য। আমরা কেহই সাবান আনি নাই। সকলেই জানিতাম, জাহাজে পাওয়া যাইবে। আবার সাবান ব্যতীত সমুদ্র জলে স্নান করা বিষম দায়। আমরা চা খাইয়া ডেকে আসিলাম। দেখি, ডেকের উপরে এক প্রকাণ্ড বাজার বসিয়াছে। রেশম, পশম, তুলার জিনিষ, জুতা, ফিতা, কাপী, ব্রস, মুচি, নাপিত, দর্জ্জি, ধোপা, যত কিছু সমস্তই উপস্থিত। মান্দ্রাজ যাদুখেলার জন্ত নাকি বিখ্যাত। আমাদের জাহাজে নানা প্রকার খেলা আসিয়াছিল। সাহেবগণ খেলার আমোদ ভোগ করিবার জন্য তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। নানা প্রকার মজার খেলা দেখিলাম। কত প্রকার ধাঁধাঁ সকলে কিনিলেন। তিন দিন পরে আবার জমি আসিয়াছে, সকলেই উৎফুল্ল।

জাহাজ হইতে মান্দ্রাজের হাইকোর্টের উপরিস্থিত নূতন আলোক-মঞ্চ দেখা যাইতেছে। দূরে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড বাড়ী। সারি সারি জাহাজ আফিস রহিয়াছে। বৈদ্যুতিক ট্রাম গাড়ী সকল আসিতেছে, যাইতেছে। দূর হইতে আমার মান্দ্রাজ বেশ লাগিতে লাগিল। বড় সাধ হইল, একবার পাড়ে গিয়া দেখিয়া আসি। রো সাহেব ও বন্ধু নাটার পাড়ে যাইবেন, আমাকে লইয়া যাইবেন, বলিলেন। প্রাতঃ ভোজনের পরে আমরা চারিজন মান্দ্রাজে গেলাম। ভাড়া পাইবার জন্য অনেক নৌকা আমাদের জাহাজের নিকটে আসিয়াছিল। এক খানা ভাড়া করা গেল। পাড়ে লাগিবামাত্র কতকগুলি পাণ্ডার মত লোক আসিল। সমস্ত স্থানে লইয়া যাইবে, সমস্ত কথা বলিয়া দিবে। আমাদের ঐ প্রকার লোকে বড় বেশী প্রয়োজন ছিল না। অনেক সময় আছে, প্রায় ১২ ঘণ্টা, ইহার মধ্যে সমস্ত স্থান সুন্দর রূপে দেখিতে পারিব। আমরা পাণ্ডা লইলাম না। সর্ব্ব প্রথমে ডাক ঘরে গেলাম। অতি সুন্দর বাড়ী। তবে আমাদের কলিকাতার ডাকঘরের মত গুম্বজ নাই। পোষ্টকার্ড কিনিয়া চিঠি পত্র লিখিয়া আমরা হাইকোর্টে গেলাম। হাইকোর্ট প্রকাণ্ড অট্টালিকা। ঘুরিয়া ২ অনেক গুলি এজলাস দেখিলাম। দেশী ব্যারিষ্টার এবং উকিল মোক্তার সকলেই শূন্যপদে বিচরণ করিয়া থাকে! তাহারা কেহই পাদুকা ব্যবহার করে না! মন্দ নয়, জুতার অনবরত মস্ মস্ শব্দ হয় না; তবু যেন কেমন আপ্ছা ২ দেখায়। চোগা, চাপকান, পেনটুলেন (বা মান্দ্রাজী রেশমী ধুতি) পরা, কিন্তু পা খালি! আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল! কত স্থানে কত প্রকার রীতি, দেখিলে অবাক হইতে হয়। তার পর দেখি-

লাম,আলোক-স্তম্ভ; সময়ের অল্পতা হেতু এবং অন্যান্য কারণে আমরা আর উঠিলাম না। সেই থান হইতে আমরা ষ্টেসনে গেলাম। ষ্টেসনটি দেখিবার জিনিষ। প্রকাণ্ড, বেশ সুবন্দোবস্ত। কিছুক্ষণ ষ্টেসনে বেড়াইয়া আমরা সাবান কিনিতে গেলাম। এমন ময়লা ও ধূলিময় স্থান আমি নিশ্চয়ই আর কখনও দেখি নাই। সে আর বলিবার নয়। রাস্তায় বোধ হয় কোন কালে জল দেওয়া হয় নাই। চাহিলে,বুঝি বা,সমুদ্রও বুজান যায়। এদিক ওদিক দেখিয়া, সাবান কিনিয়া ফিরিলাম। ফিরিবার সময় অনেক আঙ্গুর কেনা গেল। যদিও মান্দ্রাজ বড় সুন্দর স্থান নয়, অন্ততঃ জাহাজ হইতে যত ভাবিয়াছিলাম, তত নয়, তবুও তিনদিন পরে জমিতে বেড়াইয়া বেশ আনন্দ হইল, সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্বেও তৃপ্ত হইলাম। ফিরিয়া গেলাম, তখন বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটা। আধ ঘণ্টা বিশ্রামের-পরই আহার করিতে গেলাম। ক্ষুধা হইয়াছিল, বেশ আহার করিতে পারিলাম। রাত্রি দশটার সময় আমাদের জাহাজ ছাড়ে। আমাদের অনেক বন্ধু এই খানে অবতরণ করেন, আবার অনেকে আরোহণ করেন। যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন উল্লেখ-যোগ্য—Mr. Macpherson, এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ, স্কট্‌লণ্ড বাসী। এমন লোক আমি আজও দ্বিতীয় দেখি নাই। এমন ভয়ানক সমালোচক যে কাহারও সহিত তাঁহার বনিবনাও হইত না। তিনি যত স্থান দেখিয়াছেন, সমস্তই খারাপ। এমন কি, তাঁহার নিজের দেশও তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি তাহারও নিন্দা করিতেন। যে লোক স্বদেশকে ভালবাসিতে না জানে, সে কি? নীচ পশুদের মধ্যেও স্বদেশ-হিতৈষণা আছে। সহজেই বুঝিতে পারিবে, তিনি আমাদের দেশকে কিরূপ সমালোচনা করিতে লাগিলেন। আমি একেবারে চুপ, কি করিব, নীরবে ক্রন্দন করা ব্যতীত আর উপায় ছিল না। ক্রমে ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। জাহাজে এমন লোক ছিল না, যে তাঁহার উপর বীতরাগ না হইয়াছিল। তিনি অন্য বিষয়ে কথা কহিতে,বোধ হয়,জানিতেন না। শেষে ভয়ে তাঁহার সহিত কেহ মিশিত না; কাছে গেলেই দেশের নিন্দা, দেশের লোকের নিন্দা! এমন লোক কেহ দেখিয়াছ কি? ক্রমে ২ ইঁহার দুই এক কথা লিখিতে হইবে, যথা স্থানে লিখিব। কাল আমরা ফরাসী নগর পণ্ডিচারী পৌঁছিব।

আজ অক্টোবর মাসের নয়দিন। ইহার মধ্যে এত সাহেব হইয়াছি যে, আজ আশ্বিন কি ভাদ্র, জানিনা, জানিবার উপায় নাই। তবে বাঙ্গালার জানার মধ্যে জানি আজ শুক্রবার। প্রত্যূষে উঠিয়া দেখি, আমরা ভারতের তীর দিয়া যাইতেছি। মান্দ্রাজের অত্যাশ্চর্য্য পর্ব্বত-মালা আমাদিগকে মোহিত করিল। সমস্ত দিন কেবল দেখিতে লাগিলাম। আহা, সমুদ্রের ঢেউগুলি গড়াইয়া গড়াইয়া অবশেষে সেই পর্ব্বত-শ্রেণীতে আঘাত পাইতেছে। অন্ধ তরঙ্গ উৎফুল্ল অন্তরে যাইতেছিল, দুষ্ট পর্ব্বত তাহাকে যেন বাধা দিল। বীর তরঙ্গ গর্জ্জিয়া উঠিল। শত হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়া ভীম পরাক্রমে পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু অহঙ্কার পরক্ষণেই চূর্ণ হইল। ভীষণ গর্জ্জনে পর্ব্বতের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। লজ্জায় মুখ ধবল হইয়া গেল, সমুদ্রের অর্দ্ধেক লজ্জাব্যঞ্জক ফেন রাশিতে ঢাকিয়া ফেলিল। বন্ধুর

এইরূপ পরাজয় দেখিয়া আরও কত শত বীচিমালা পর্ব্বতকে শাস্তি দিতে চলিল। কেমন ভালবাসা! কেমন সুন্দর একতা!! সমুদ্র দুই দিনের পরে বড়ই কঠোর বোধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই সমুদ্রের সহিত ভূমির দ্বন্দ্ব বড়ই সুন্দর ও ভয়ানক। যদিও সমুদ্র সর্ব্বদাই জয়ী, তবুও ভূমি স্থানে স্থানে দুর্গাদি দ্বারা বেষ্টন করিয়া কোন মতে সমুদ্র হইতে রক্ষা পাইতেছে। যদি কেহ জল রাশির পরাক্রম দেখিতে চান, তাঁহাকে বেশী দুর যাইতে হয় না। সামান্য পদ্মাই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! ঘনঘটাচ্ছন্ন বর্ষাকালে রাক্ষসী মূর্ত্তি পদ্মাকে গোয়ালন্দের নিকট যিনি দেখিয়াছেন, তিনি বিশেষরূপে জলরাশির পরাক্রম অবগত আছেন। সমুদ্র ত কত প্রকাণ্ড!

একটু বেলা হইতে না হইতেই আমরা মনোহর বন্দর পণ্ডিচারীতে পৌছিলাম। এখন বেলা প্রায় সাতটা। আমাদের আগমন দেখিয়া দুর্গ হইতে তোপ ধ্বনি হইতে লাগিল। আমাদের জাহাজও তোপ ছুঁড়িল। পরস্পরে এইরূপ অভ্যর্থনা করার পর কোন এক সৈনিক পুরুষ আমাদের জাহাজ দেখিয়া গেলেন। আমাদের জাহাজের অনেক খানসামাই পণ্ডিচারীর লোক, বাড়ীর নিকটে আসিয়া কাহারও অসুখ, কাহারও মাতার পীড়া, কাহারও বিবাহ উপস্থিত হইল। অধ্যক্ষের নিকট ছুটি লইয়া তাহারা বাড়ী গেল। প্রায় পাঁচ জন নামিয়া গেল! মাল নামাইয়া দিয়া ও গ্রহণ করিয়া আমাদের এরিডেন আবার চলিল। জাহাজ ছাড়িল বেলা ১০ টায়। আমরাও আহারাদির পর ডেক-চেয়ারে ঘুমাইলাম।

আজকাল শুক্লপক্ষ। রাত্রে চাঁদ দেখিয়া বুঝিলাম, তৃতীয়া কি চতুর্থী। চাঁদের আলোকে সমুদ্রের খেলা কত সুন্দর, লিখিয়া বর্ণনা করিতে আমার ত সাধ্য নাই। প্রত্যহই রাত্রে আমরা চাঁদের আলোতে বসিয়া গল্প করিতাম। কি সুন্দর, অমন দিন আর হইবে না। গল্পে গল্পে ঘুমাইয়া পড়িতাম, চাঁদও ইত্যবসরে বিদায় লইত। পরদিন শনিবারও আমরা ঐ রূপ ভাবে আনন্দে উপকূল দিয়া চলিলাম। আজ আর ভারতের নয় (?) লঙ্কা-দ্বীপের।

রবিবার প্রাতঃকালে আমরা কলিকাতা ছাড়ি, আজ আর এক রবিবার। দেখিতে দেখিতে আট দিন হইয়া গিয়াছে। এই আট দিনে তোমাদের হইতে নিকট প্রায় ১২০০শত মাইল দূরে! এখনও আমাদের প্রায় ৬০০০ হাজার মাইল যাইতে হইবে!! সমস্ত ভাবিতেছি, দূরে ধূ ধূ অসংখ্য অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। বাড়ীগুলির ছাদ প্রায়ই খোলা টালির। চাল বলিলেই হয়। কিন্তু দেখিতে বড় সুন্দর। আমাদের মত গোল গোল খোলা নয়। আলিপুরের চিড়িয়া-খানায় অথবা হিন্দু হোটেলে যে প্রকার টালির ছাদ, ঠিক সেই রকম। নানা রংয়ারা চিত্রিত। যথার্থই বড় মনোহর। এখন কেবল ঐ সমস্ত চালই দেখিতেছি। প্রায় নয়টা বাজে। আমরা কলম্বো বন্দরের মুখে। সেই খানেই আমাদের জাহাজ থামিল, আমরা (বিলাত-যাত্রীগণ) সিডনী জাহাজ আসিতেছে কিনা দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। দূরেই সিড্‌নীকে দেখিতে পাইলাম। শীঘ্রই সে বন্দরে প্রবেশ করিল। আমরা পূর্ব্বে আসিয়াও বন্দরের ডাক্তার সাহেবের অপেক্ষায় পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরেই একখানি ছোট ষ্টিমারে ডাক্তার সাহেব উপ-

স্থিত হইলেন। খালাসী, খানসামা, ইত্যাদি সকলেই তাহাদের নিজ নিজ সাজে সাজিয়া এক সারে ডেকের উপর দাঁড়াইল। কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। ডাক্তার সাহেব রেজেষ্টারি লইয়া এক এক করিয়া পরীক্ষা করিলেন। ষ্টুয়ার্ড আসিয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, কেহ কি বোম্বাই হইতে আসিয়াছেন? বোম্বাই-মহামারির ভয় কলম্বো পৌঁছিয়াছে! প্রায় এক ঘণ্টা কাল পরে আমরা পাশ পাইলাম। বন্দরের মধ্যে আমাদের জাহাজ প্রবেশ করিল।

১০ টার সময় আমরা আহার করিলাম। ইতিপূর্ব্বেই আমাদের জিনিস পত্র যথা স্থানে গুছাইয়া রাখিয়াছিলাম। প্রায় ১১ টার সময়ে আমাদের জিনিস পত্র একখানি ছোট জাহাজে(Steam-Launch)এ তোলা হইল। আমরা এরিডেন ছাড়িলাম। এরিডেনের খানসামাগণ বড় ভাল লোক। আমরা তাহাদের কিছু কিছু বক্সিস দিলাম।

সিডনীতে গিয়া দেখি, ইহা জাহাজ নয়, যেন সহর। কত প্রকাণ্ড, তাহা ভাষায় জানান কঠিন তোমরা এরিডেন দেখিয়াছ, সিডনী তাহাকে ছোট নৌকার মত বহন করিয়া লইতে পারে। এরিডেনে দ্বিতীয় শ্রেণীতে মোটে ৩০।৩৫ জনের থাকার বন্দোবস্ত ছিল, এখানে প্রায় দুই শত লোকের বন্দোবস্ত। উপরে গিয়া দেখি ডেক নয়, যেন গড়ের মাঠ! মহা বাজার বসিয়া গিয়াছে। কলম্বোর ফেরিওয়ালা-গণ সব উপস্থিত। এমন জিনিস নাই, যাহা পাওয়া যায় না। গরু, বাছুর, ভেড়া, মুরগি, টার্কি, পায়রা, ইত্যাদি নানা প্রকার জীবন্ত জন্তু দেখিলাম। পি এণ্ড ও কোম্পানীতে রক্ষিত মাংস ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এ জাহাজে সব (জীবন্ত) সদ্য। অনেকগুলি আমাদের দেশী বাঁদর, হনুমান ফ্রান্সে চলিয়াছে। ইহা ব্যতীত তিনটী ঘোড়া আমাদের সহযাত্রী। গানের ঘর (Music-Room) ধূমপানের ঘর (Smoking Saloon) নাপিতের ঘর(Hair cutter's saloon) আরো কত কি। কি যে নাই, জানিনা। তাই বলিতেছিলাম, ইহা জাহাজ নয়, ছোট সহর। প্রথম শ্রেণীর খাইবার ঘর (Saloon) দেখিবার জিনিষ। বৃক্ষ লতাদি দ্বারা কেমন সুসজ্জিত! তাড়াতাড়ি করিয়া আমরা জাহাজ খানি দেখিয়া লইলাম। আমাদের ঘরে জিনিষ পত্র রাখা হইল, কলম্বো দেখিতে গেলাম। পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম

কলম্বো সহর

বড় মনোহর। না দেখিলে কোন জিনিস উপলব্ধি করা যায় না। হাজার লোক সন্দেশ অতিশয় উপাদেয়, সকলেই বলুক না কেন উহার মত উত্তম জিনিস আর নাই, কিন্তু যতক্ষণ না উহার স্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে, ততক্ষণ কিছুই বোঝা হয় নাই। আমরা অতিশয় ব্যগ্র হইয়া সহরে উপনীত হইলাম। একটু দূরে গিয়াই দেখিলাম, কলম্বোর গ্রাণ্ড হোটেল—প্রকাণ্ড বাড়ী। Mr. ও Mrs Rowe সেখানে গেলেন। আমরাও দেখিতে গেলাম। এত বড় হোটেল আমি আর দেখিয়াছি কিনা, জানি না; অবশ্য আমাদের দেশে।

অষ্ট্রেলিয়ার একজন ভদ্রলোক আমাদের সহিত বরাবর আসিতেছিলেন। বৃদ্ধ হইয়াছেন, বয়স অশীতি বৎসর হইবে! বৃদ্ধ বয়সে ভারত দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। এখন পুনরায় অষ্ট্রেলিয়া যাইতেছেন। অষ্ট্রেলিয়া ইহার উপনিবেশ। ইহার বাড়ী ইয়ারলণ্ডে। অষ্ট্রেলিয়ার জাহাজ না আসা পর্য্যন্ত

কলম্বোতে থাকিবেন। আমাদের ছাড়িবার সময় আমাদিগকে (Mr. Nutter কে এবং আমাকে) তাঁহার হোটেলে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। আমরা তাঁহার হোটেলের নাম ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে তিনি যাইতেছেন দেখিতে পাইলাম। আমরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। তিনি আমাদের জন্যই যাইতেছিলেন। কেবল জাহাজের আলাপ! মানুষ কি এত ভালবাসিতে পারে!! হোটেলের নাম Galle Face Hotel, সুন্দর Billiard খেলিবার টেবিল ছিল। বন্ধু নাটার আর তিনি একবার, দুইবার, তিন বার খেলিলেন। আমি খেলা জানিতাম না। বুঝিতাম বটে। চা, লিমনেড, কেক্, বরফ ইত্যাদি আমাদের জল-যোগের জন্য প্রস্তুত ছিল। ডিনার খাইতে আমরা অনুরুদ্ধ হইলাম, কিন্তু সাহস হইলনা, পাছে জাহাজ ছাড়িয়া দেয়। তিনটা পর্য্যন্ত হোটেলে থাকিয়া আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম। তিনখানি মানুষ টানা গাড়ী ভাড়া করা গেল। চড়িতে বড় সুন্দর। অনেক মানুষ টানা গাড়ী। সে গুলকে ইংরাজিতে Rickshaw বলে। Breakwater কলম্বোর দেখিবার জিনিষ। আমরা বরাবর সমুদ্রের পাড় দিয়া চলিতে লাগিলাম। এমন সুন্দর দৃশ্য আমি দেখি নাই। এই জন্যই Empress of the East ইহার নাম হইয়াছে। তারপর সমস্ত স্বাভাবিক হ্রদ দেখিলাম। Chinamon Garden এর নাম শুনিয়াছিলাম। একবার খুব তাড়াতাড়ি দেখিয়া লইলাম। আজ পর্য্যন্ত অনেক জায়গা দেখিয়াছি, কিন্তু কলম্বোর মত ছোট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, স্বাভাবিক শোভায় পরিপূর্ণ স্থান আর দেখি নাই। স্বভাবের কবিমাত্রেরই কলম্বো দেখা আবশ্যক। যদিই বা লঙ্কা সুবর্ণ মণ্ডিত হইত, তবুও বোধ হয় এখনকার অবস্থা হইতে সুন্দর দেখাইত না। প্রকৃতই কলম্বো স্বভাবের রাজধানী।

সন্ধ্যা হইয়াছে। পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে, আমরা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। আমাদের বৃদ্ধ অষ্ট্রেলিয়ান বন্ধু ঘাট পর্য্যন্ত আসিলেন। তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমরা নৌকায় উঠিলাম। জাহাজে গিয়া প্রথমত আমাদের ক্যাবিনে গেলাম। আমাদের ক্যাবিনে পাঁচটি বিছানা, কিন্তু লোক আমরা দুইজন এবং আর এক জনের জিনিস দেখিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরেই জিনিসের মালিক আসিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত Mr. Macpherson. যদিও তিনি তত ভাল লোক নন, তবুও অপরিচিত ব্যক্তি অপেক্ষা ভাল বিবেচনা করিলাম। কিন্তু পরের বিবরণে জানিতে পারিবে, তাহা নয়। যাহাহউক, আমরা মুখ হাত ধুইয়া ডেকের উন্মুক্ত বাতাসে গেলাম। সমুদ্র কল্লোলস্নাত পবিত্র সুবিমল বায়ুতে আমাদের ক্লান্তি কথঞ্চিত দূর হইল বটে, কিন্তু নানা প্রকার চিন্তা আসিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা দিতে লাগিল। ভাবিলাম, এই রবিবার সন্ধ্যাকালে তোমরা কি করিতেছ? না জানি কত লোক আসিতেছে, যাইতেছে। আবার ভাবিলাম, এখানে যদি আমার অসুক হয়, কে কাছে আসিয়া বসিবে? আবার দেখিলাম, এই যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আমার নবজীবন আরম্ভ হইতেছে, যখন ফিরিয়া যাইব, নূতন মানুষ! আরও মনে হইল, ভগবান আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য ম্যাক্‌ফারসনের মত লোকের সহিত মিশাইতেছেন। আমি যেন শুনিলাম, হাজার লোকে তোমাকে অবজ্ঞা,

ঘৃণা, নিন্দা, অপবাদ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা করুক না, তুমি কেবল ক্ষমা কর। যদি না করিতে পার, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে না। আবার মহাত্মা যীশুর কথা মনে হইল, যদি তুমি তোমার ভাই মানবের সামান্য ক্রটী মার্জ্জনা করিতে না পারিলে, কি করিয়া তুমি ভগবানের নিকটে তোমার প্রতি মুহূর্ত্তের শত শত গুরুতর অপরাধের ক্ষমা চাহিতে পার? তখন আবার হৃদয়ে জাগিল "মেরেছ মেরেছ কলসীর কাণা, তাই ব'লে কি প্রেম দেব না'। এই সব ভাবিয়া মন একটু আশ্বস্ত হইল। ভাবিলাম, যাহা হয় হইবে। ভগবান সহায়!

ক্রমে রাত্রি ১০টা বাজিল। আমাদের জাহাজ ছাড়িয়া দিল। আমরা এতক্ষণ ভারতের নিকটে ছিলাম। এইক্ষণ প্রায় তিন বৎসরের জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমি সর্ব্বদাই দেশ ভালবাসি, কিন্তু আজকার মত স্বদেশ-প্রেম আমাতে আর কখনও জাগে নাই। ভাবিলাম, একবার স্বদেশকে চুম্বন করিয়া যাই। তিন বৎসর আর দেখিতে পাইব না। শেষে মনে হইল—

"রেখ মা দাসেরে মনে
এ মিনতি করি পদে—
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করোনাক তব মনঃ
কোকনদে।"

এইরূপ ভাবিতেছি, এদিকে জাহাজ চলিতেছে। প্রকাণ্ড জাহাজ পরাক্রান্ত অকূল সমুদ্রের ভিতরে সামান্য তৃণকণার মত ভাসিতে ভাসিতে যাইতে লাগিল। সমুদ্র কৃপা করিলে এমন শত সহস্র, কোটী কোটী অর্ণবপোতকে ইহার বিশাল গর্ভে নিহিত করিতে পারে। কিন্তু তাহার এইক্ষণ ক্ষুধা নাই, নিস্তব্ধে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। কোন আন্দোলন নাই, কোন গোলমাল নাই। আমাদের তরণী নিঃশব্দে বেগে তাহার উপর দিয়া ধাবিত হইল। বস্তুতঃ চারিদিক নিস্তব্ধ। আমাদের জাহাজের যাত্রীগণ, কলম্বো দেখিতে গিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, সকলেই নির্জ্জনতাকে আরো নির্জ্জনতার মধ্যে দেখিয়া বিশ্রামের জন্য বিশ্রামাগারে গিয়াছেন। ডেকের উপরে আমি আর দুইএক জন ভদ্র লোক। নূতন জাহাজ, কাহারও সহিত এখনও আলাপ হয় নাই। কিছুক্ষণ নির্জ্জনতার সুধা ভোগ করিলাম, কিন্তু অল্পক্ষণেই ক্ষুধা নিবারণ হইল। নির্জ্জনতার সুধা ভোগ করিতে গেলেই 'স্মৃতি' উদরের পীড়া আসে, জানিতাম না। সুধা ভোগ করিতে করিতেই এই সুযোগে পীড়া আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। দুঃখে, কষ্টে, যাতনায় আমি 'নির্জ্জনতার' সম্মুখে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম! কেহই বোধ হয় আমাকে দেখিতে পায় নাই। যাহা হউক, সুধার উপরে বীতরাগ হইয়া আমি আমার ভগ্ন হৃদয়ে শয্যায় গেলাম। ভাবিয়াছিলাম, নূতন ঘরে, সাহেবদের সঙ্গে (এই আমার প্রথম সাহেবের সঙ্গে বাস) ঘুম হইবে না। কিন্তু দিবসের ক্লান্তির পর কখন কি করিয়া ঘুম আসিল, জানিতে পারিলাম না। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখি, সকাল হ'য়েছে। বন্ধু নাটার তাহার হাত মুখ ধুইতে আরম্ভ করিয়াছেন। অপর ব্যক্তি ম্যাকফারসন এখনও উঠেন নাই। চক্ষু মেলিয়া গুড্ মর্ণিং বলিলাম, উঠিলাম, হাত মুখ ধুইলাম, কাপড় পরিয়া আহার করিতে গেলাম।

রো সাহেবদের ঘর আমাদের ঘরের নিকটেই। জাহাজে লোক অনেক হওয়ায় তাঁহারা, (তিনি ও তাঁহার স্ত্রী) একটী ঘর পান নাই। তবে অধ্যক্ষ বলিয়াছে, প্রথম বন্দরে লাগিলেই কিছু লোক কমিবে, তখন একটী ঘর দেওয়া হইবে। মিসেস্ রো এক ঘরে কোন এক সন্ন্যাসিনী (Nun) এর সঙ্গে থাকেন। মিঃ রো,ডাঃ এলকক ও অপর একটী ফরাসী ভদ্রলোক আপাততঃ এক ঘরে। প্রথমতঃ যে বন্দোবস্তে আমরা পড়িলাম, তাহাতে সকলেরই কষ্ট হইতে লাগিল। আমার ম্যাকফারসনকে ভাল লাগে না, কেননা বড় খিট্‌খিটে রকমের লোক। কেবলই নিন্দা, কেবল অপর দেশের অপবাদ ইত্যাদি। আমাকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সবে নূতন আমি সাহেব-সংস্পর্শে পড়িয়াছি,—কোথায় না ভাল করিয়া বলিয়া দিবে, এই কর, ঐ কর ; তা না, সে কেবল দেশের নিন্দা, রো সাহেবের নিন্দা, সুধু তাই কি,একদিন মুখ ধুইব,সে জল খরচ করিতে দিবে না! যাক্ পরের নিন্দায় কাজ নাই। মোটের উপর আমি ও আমার বন্ধু নাটার জ্বালাতন হইতে লাগিলাম। মিসেস্ রোয়ের ঘরে সন্ন্যাসিনী, তিনি কখন স্নান কিম্বা গা পরিষ্কার করেন না। নিকটে গেলে পেটের ভাত চাল হ'য়ে যায়, বাঘ পালায়। তারপর বিষম গরমে তিনি জানালা খুলিতে দিবেন না!! আমরা মিসেস রোয়ের বিছানা ডেকের উপরে দুই খানা বেঞ্চের উপরে করিয়া দিতাম। তিনি সেই খানে ঘুমাইতেন। এরিডেনে আমাদের বিছানা ডেকের উপরে করিয়া দিত বটে, কিন্তু সিডনীতে সে নিয়ম নাই। মিঃ রো অনেক লোকের সঙ্গে ঘুমাইতে পারেন না। তাহারও কোন রকমে ডেকে শু'তে হইত! এই সমস্ত কারণে আমাদের কাহারই ঘর মনের মত হয় নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জাহাজ খানি প্রকাণ্ড। জাহাজে লোকও অনেক। সর্ব্বসমেত তিন শ্রেণী জড়াইয়া প্রায় দুই শত হইবে। প্রথম শ্রেণীতে জন দশ পনর। আমাদের শ্রেণীতেই বেশী, প্রায় শত জন, বাকী সব তৃতীয় শ্রেণীর। আমাদের জাহাজ খানি চীন হইতে জাভাদ্বীপ হইয়া আসিতেছে, জাহাজে এত প্রকার লোক যে, সচরাচর দেখা অসম্ভব। জাপানী, চীনদেশবাসী, জাভাদ্বীপবাসী, বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী, সিংহলবাসী, ইটালিয়ান, জার্ম্মান, ডাচ্, নরওয়েবাসী, ফরাসী, আমেরিকার নিউইয়র্কবাসী, সুইজারলণ্ডবাসী, ইংরাজ, স্কটলণ্ডবাসী, গোয়ানিজ্ ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় এককুড়ি জাতি! কখনও এত প্রকার লোক দেখিয়াছ কি? সমস্ত লোকের সঙ্গেই অল্পাধিক আলাপ হইয়াছিল। নানা জাতির ব্যবহার জানিবার ইহা কি কম সুবিধা!!! কাহার সহিত কি প্রকার কথা হইত, আমার লিখিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে, কেননা, আমি নানা প্রকার কথায় বড়ই উপকৃত হইতাম। কিন্তু তোমরা শুনিবে কি না, জানি না। যাহা হউক,ক্রমে ক্রমে একটু একটু সকলের বৃত্তান্ত দিব ইচ্ছা আছে। বেশীক্ষণ কষ্ট দিব না। খুব সংক্ষেপেই শেষ করিব।

জাপানকে কে না ভালবাসে? স্বাধীনতা-প্রিয় জন সমাজ মাত্রই জাপানের পক্ষপাতী। নয় কি? আমাদের জাহাজে জাপান-লিগেসনের (দূত) প্রধান সম্পাদক (Primer Secretary to the Lagation of Japan) ছিলেন! তিনি সপরিবারে

ইউরোপের নানা স্থান পরিভ্রমণে যাইতেছেন। তাঁহার পত্নী অতিশয় ভদ্র। আমার সহিত বেশ আলাপ হইয়াছিল। সামান্য ইংরাজি জানেন। তাঁহার একটি একবৎসরের বালক সঙ্গে ছিল। তোমরা জান, আমি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বড়ই প্রিয়! আমার মনে হয়, তাহারাই ভগবানের স্বর্গরাজ্য। মহাত্মা যীশুর কথা আমি সর্ব্বথা বিশ্বাস করি (অন্ততঃ এই স্থানে) তিনি বলিতেছেন,—"Suffer the little children to come unto me, and forbid them not; for of such is the kingdom of God" Mark. X. 13 14. তাহারা কেমন সুন্দর, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র, সরল। আমি সেই শিশুর সহিত বেশ আমোদ করিতাম। সে আমাকে বড় ভালবাসিত, কেবল আমার কাছে থাকিত। যাক্ কি বলিতেছিলাম;—সেই ভদ্রলোক একদিন আমাদের দেশের কথা পাড়িলেন,—"আচ্ছা, ভারতে কি বীর নাই,—কেবল পরাধীনতার পরবশ হইয়া রহিয়াছে?"

আমি—"হাঁ, দুই এক জাতি ভয়ানক বলবান, সাহসী। কিন্তু তা হইলে কি হইবে, এক জাতির সহিত অপর জাতির মিল কই?'

ভদ্রলোক (সহাস্যে)—বাঙ্গালীরা বড় ভীরু, নয়?

আমি—"হাঁ, যদিও তাহারা যুদ্ধকার্য্যে, কিম্বা দ্বন্দ বিবাদে বিশেষ পটু নয়, তবুও তাহারা লেখা পড়া, বুদ্ধিচালনা, মস্তিষ্কের কাজ করিতে অদ্বিতীয়। তাহাদের উন্নতি অন্যান্য সমস্ত জাতি অপেক্ষা উচ্চ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাস করিতে তাহাদের সমকক্ষ কেহই হইতে পারে না। এবৎসর একজন বাঙ্গালী Civil service পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছেন।"

তিনি—"বেশ, আমি জানি, অধ্যাপক বসু অনেক বৈদ্যুতিক বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন। সে ত বেশ; নাই বা হলো সাহসী, নাই বা হলো যুদ্ধপ্রিয়। বাঙ্গালী বুদ্ধি জোগাইতে ত খুব পটু। এখন কেবল চাই একতা, মৈত্রী! এক জন অন্ধ এবং এক খঞ্জ, দুই বন্ধু। অন্ধ খঞ্জকে কাঁধে করিয়া লয়, খঞ্জ পথ দেখাইয়া দেয়। এই ত চাই। আমি আশা করি, শীঘ্রই ভারতের সমস্ত জাতি একত্র হইয়া, এক প্রাণে, এক মনে, এক কার্য্যে লাগিবে।"

আমি—"আজকালকার ভদ্রসমাজ সেই চেষ্টাতেই আছেন, কেবল হিন্দুদের মধ্যেই যে কত প্রকার বিভিন্ন সম্প্রদায়, তাহার গণনা করা দুরুহ। তার পর মুসলমান। তাহাদের মধ্যেও দুই তিন শ্রেণী। হিন্দু মুসলমানে চির বিদ্বেষ!!! কবে যে এই বিদ্বেষ যাইবে, বলা যায় না। তবে ইংরাজ-শাসন আমাদের দেশের অনেক উপকার করিতেছে। আমার পিতার মতে অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর ইংরাজ আবশ্যক। দেখিয়া দেখিয়া রাজনীতি সমুচিত শিক্ষা করিলে পরে ভারত হয় স্বাধীন, অথবা ইংরাজরাজ্য (British Colony) হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে! আজি কাল ইয়ারলণ্ডে যেমন বন্দোবস্ত, কেনেডায় যেমন শাসন প্রণালী, ভারতেও তাহাই হইবে। ভারতে পার্লামেণ্ট, হইবে এবং ভারত-শাসন ভারতবাসীর হাতে ন্যস্ত হইবে!!! অথবা সমুচিত উন্নত হইলে ইংরাজ-সৈন্য-বিভাগ পরাস্ত করিয়া ভারত স্বাধীন রাজ্য হইবে! হায়, সে দিন অনেক দূর। আমাদের মত তিন চারি জীবন পশ্চাতে লুকাইয়া আছে।!!"

তিনি স্বাধীন মানুষ, লাফাইয়া উঠিলেন। "হাঁ, যথার্থই তখন জাপান ভারতকে সাহায্য

করিতে পারে ”। আমি দেখিলাম, স্বাধীন জাতির ও আমাদের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরাধীন জাতিতে কত তফাত। যদিও আমি অত্যন্ত উত্তেজিত ভাষায় অন্তরের অন্তরতম স্থানের প্রকৃত বিশ্বাসের কথা বলিয়াছিলাম, তবু নিশ্চয় বাঙ্গালী ইহাতে কিছু মাত্র উত্তেজিত হইত না। হয়ত “বটে বটে” করিয়া সারিত। কিন্তু এই দৃশ্য কি ভয়ানক! সৈনিক পুরুষ দাঁড়াইয়া তরবারি হস্তে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—‘হাঁ সেদিন জাপান ভারতকে সাহায্য করিতে পারে !!!”

আমি বলিলাম—“আমার বিশ্বাস,ভারত সাদরে জাপানের সাহায্য গ্রহণ করিবে। কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা। আজ কাল আমাদের দেশে ইংরাজ-শাসন বড়ই সুন্দর। যদিও দুর্দ্দান্ত নীচজাতি ইংরাজবর্গ নানা প্রকারে অন্যায় ব্যবহার করে, তবু সে সমস্ত ভারতের পক্ষে বিষম শিক্ষা। রাজনীতি কাহাকে বলে, ভারত জানিত না। জানিলেও বহু দিন পূর্ব্বে। এখন পরিচালনা অভাবে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন আবার প্রথম হইতে শিক্ষা করিতেছে। আমার মতে ইংরাজ শাসন হইতে পুনরায় হাতে খড়ি হইয়াছে। ইংরাজ শাসন, রাজনীতির মহা বিদ্যালয়! এখানে দেখিয়া,ভুগিয়া অবশেষে দাঁড়াইতে হইবে। নয় কি ?”

তিনি বলিলেন—“হা,শুনিয়াছি, ইংরাজ ভারতকে উত্তম শাসন করিতেছে। আমার ইচ্ছা আছে, আমি একবার ভারতে গিয়া দেখিয়া আসি। আচ্ছা, এখন যদি কোন বাঙ্গালী রাজা হয়, তবে কি হইবে ?”

আমি—“রাজনীতি বিশেষ না জানা দরুণ, রাজ্য হয়ত ছারে খারে যাইবে। হয়ত, রাজার মন্ত্রী একজন ইংরাজ হইবেন! রাজা তাহাদের হাতে সমস্ত ন্যস্ত করিয়া, অন্দর মহলে শত শত সুশ্রী মহিলাবর্গ বেষ্টিত থাকিয়া নিজকে সুখী মনে করিবেন। একবারও রাজ্যের বিষয় কিম্বা প্রজার কথা স্মরণ করিবেন না। সুধু তাই কি ? তাঁহার উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী পদে পদে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে। বিশ্বাসঘাতকতা তাহাদের ধর্ম্ম! সৎ কি অসৎ, যে কোন উপায়ই,স্বীয় কামনা ও বাসনা চরিতার্থতার জন্য অর্থ পাইলেই হইল!”

তিনি—“কি আশ্চর্য্য, আমাদের দেশে সামান্য ঘুষ্ পর্য্যন্ত লয় না। সামান্য কর্ম্মচারী কখনই ঘুষ লইবেনা !!!”

এই প্রকার অনেক কথা হইল। আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহা ভুল হইতে পারে, কিন্তু আমি যত দূর দেখিয়াছি, তত দূর বলি নাই। তোমরা কি মনে কর ? আমি কি বড় ভুল করিয়াছি ? কেন তোমরাত আগরতলার কথা জান! রাজার না কয় শত কচ্ছ রাণী !! যথার্থই দেশের কথা ভাবিলে কান্না পায়। দুই একটী সুরেন্দ্রনাথ, সামান্য একটী জাতীয় সভা, হায়, তাহা কি দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে। বোধ হয় না! চরিত্র কই, জীবন কই ? এবারের জাতীয় মহাসভার বিবরণ এখনও পাই নাই ; জানি না,কি হইয়াছে। এইবারইত ভাঙ্গিবার উদ্যোগ হইতেছিল। হিতবাদীর হিত বচনে, সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় আমাদের কাহার কাহার হিংসাপ্রিয়তায় (?) কিম্বা কোমর-বাঁধা অভ্যাসে আমাদের অতিশয় প্রিয় প্রাণের সভা অসময়ে, অকালে, শৈশবাবস্থায়ই কালগ্রাসে পতিত হইতে চলিতেছিল !! তাহাতে আবার দিন দিন, দরিদ্র ভারতের সহায় সম্বল, উজ্জ্বল নক্ষত্র সকল ধীরে ধীরে অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে! আশা কোথায় !!

উদ্যম কাহাকে বলে, আমরা বড় বেশী জানি, বিশ্বাস হয় না। আমাদের সহিত নরওয়ে বাসী পাঁচজন লোক ছিলেন। তাঁহারা বাণিজ্যের জন্য সাইবিরিয়াতে গিয়াছিলেন। জাহাজ ডুবি হওয়ায় পুনরায় দেশে যাইতেছেন। তাঁহারা সকলেই পুনরায় বাণিজ্যে আসিবেন, বলিতেছেন। তাঁহাদের নিকট সেই সমস্ত গল্প শুনিতে খুব ভালবাসিতাম। যখন জানিলাম, তাঁহাদের মধ্যে একজন ছয়বার জাহাজ ডুবিতে পড়িয়াছিল, তখন আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল। আমাদের দেশের একে ত কাহারও জাহাজ নাই। থাকিত যদি, তবু একবার জাহাজ ডুবিলেই ঢের! বাপ্ আবার!! সভ্যতার তারতম্য নয় কি? আমি এখন আরও দুই একটি ঘটনা বলিব।

পাশ্চাত্য পরসেবা যেমন বিখ্যাত, আমাদের পরের ক্ষতি করা সেইরূপ। নূতন জাহাজে আসিবার পূর্ব্বে, আমরা যখন এরিডেনে ছিলাম, তখন আমাদের সঙ্গে কলিকাতা হইতে এক ইংরাজ-মহিলা আসেন। তিনি বোধ করি, কোন প্রচারিকা হইবেন। যাহা হউক, তিনি বেশ বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, বেশ সুন্দর লিখিতে পারেন। তাঁহার পণ্ডিচারীতে যাইবার কথা ছিল। কিন্তু মন্দ্রাজে আমাদের জাহাজ আসিলে, এক রুগ্ন মহিলা আমাদের জাহাজে আরোহণ করেন। তাঁহার সহিত অপর কেহই ছিল না। পূর্ব্বলিখিত মহিলা এই নবাগতার সমস্ত ভার লইলেন। তিনি যখন বমন করিতেন, তিনি অম্লান চিত্তে পরিষ্কার করিতেন। সারাদিন তাঁহার বিছানার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন! রাত্রে খাবার দিলে নিকটে থাকিয়া বাতাস দেওয়া ইত্যাদি নানা প্রকারে তাঁহার সেবা করিতেন। তিনি পণ্ডীচারিতে নামিলেন না। লঙ্কা পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে গেলেন!!! কলম্বোতে রুগ্না বায়ুপরিবর্ত্তনে যাইতেছিলেন। তোমরা এই ঘটনাকে কি মনে কর, জানি না, আমি কিন্তু একেবারে স্বর্গের ছবি দেখিলাম! দেশে কটা এই প্রকার ঘটনা দেখিয়াছ?—অপরিচিতের কথা দূরে যাক্, পরিচিতের কথাই জিজ্ঞাসা করি।

টেবিলে আমি, প্রথমে, রো সাহেব এবং সেই ম্যাক্ফার্সনের মধ্যে বসিতাম, আমার সম্মুখে এক ইটালিয়ান-মহিলা বসিতেন। তাহার পার্শ্বে মিসেস রো। মিঃ রো সাহেবের ডানদিকে ডাঃ এলকক বসিতেন। ম্যাকফারসন, খাইবার সময় কেবল জ্বালাতন করিত। এটা নয়, ওটা নয়। এই কাঁটা ধরা হ'ল না। ঐ রকম প্রণালী নয়, ইত্যাদি নানা প্রকার খুঁত ধরিয়া বেড়াইত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেশের নিন্দা তাহার ব্যবসা। সে টেবিলে বসিয়াও সে কার্য্য হইতে বিরত থাকিত না! মিঃ রো এ সমস্ত ভালবাসিতেন না। আমি যাহা করি, আমার আচার ব্যবহার ইতিমধ্যে এমন হইয়া পড়িয়াছে, যেন ঠিক সাহেব!! সে সমস্তই মিঃ এবং মিসেস রোয়ের অনুমোদিত। তবে যে ম্যাকফারসন বলে, সে কেবল আমাকে বিরক্ত ও নিজের বিজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য! সে যে সুধু আমাকেই বলে, তাহা নয়। সকলেই তাহার উপর বীতরাগ। জাহাজে এত লোক, তাহার মধ্যে তাহার পক্ষপাতী, একজন নাই, পক্ষপাতী হওয়া দূরে থাক্, সকলেই বিরোধী!!! "যেমন ব্যবহার করা যায়, তেমন ব্যবহার পাওয়া যায়।" যাক্ কি বলিতেছিলাম। কি বলিলাম,—একদিন সে আমাকে বলিতেছে, একটু মদ্যপান কর। আমাকে

আপ্যায়িত কর্‌লেন আর কি! আমি বলিলাম—"না মহাশয়,আমি কখনও মদ খাই নাই, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কখনও খাইব না। ও সুধারস পান আপনাদের জন্য। আমি পাশ্চাত্য জগতে মদ্যপান শিক্ষা করিতে যাইতেছি না!" তবুও সে ছাড়ে না!!! মিঃ রো পার্শ্ব থেকে বলিলেন,—"No Sir, his father does not want him to take wine." তিনি এমন গম্ভীর স্বরে বলিলেন যে, সব চুপ্। ইহা কি ঠিক পিতার কার্য্য নয়? পর দিন মিসেস্ রো তাঁহার পাশে আমাকে লইয়া বসাইলেন। আমি সেই দুর্দ্দান্তের হাত হইতে রক্ষা পাইলাম। মাতা আর কি বেশী করিয়া থাকে!! যথার্থই মিঃ এবং মিসেস্ রো আমাকে মা বাবার মত ভালবাসেন। একদিন মিঃ রো খাইবার সময় বলিতেছেন, "Mary, the boy in your left looks like your another child.' কি সুন্দর!

১১ই, ১২ই, ১৩ই, ১৪ই, ১৫ই, ১৬ই, ১৭ই, আজ সাত দিন আমরা কলম্বো ছাড়িয়াছি, কিন্তু এ কয় দিন কেবল জল, একটুও স্থল দেখি নাই। দুই একখানি জাহাজ,দুই একটী পাখী। উড্ডয়নশীল মৎস্য নাম শুনিতাম, কিন্তু কখনও দেখি নাই। এখন কত যে দেখিতেছি, জানি না। এক দিন ভোরে একটা আমার ঘরে উড়িয়া আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি ধরিলাম। ষ্টুয়ার্ডকে বলিয়া বাল্‌তিতে জল আনাইলাম। কিন্তু বেচারি জল আনিবার পূর্ব্বেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মাছটী বড় বেশী বড় নয়। কই মাছের মত বড় হয়। তাহা অপেক্ষা কখন বড় হয় না। দেখিতে রুই মাছের মত। অথবা পাশে মাছের মত। ডানা দুইটী তাহার শরীর হইতে অনেক বড়। আর দেখিতে পাই, অনেক শুশুক। এক এক স্থানে প্রায় পাঁচ ছয় শত দেখিতাম। মনে হইত, সমুদ্র ছাইয়া পড়িয়াছে। এই সাত দিন পরে আজ আমরা জমির কাছে আসিয়াছি। আমাদের জাহাজ এডেনে থামিবে না। আফ্রিকা উপকূলে ফরাসীবন্দর জিবুটীতে (Djibotil) থামিবে। বেলা ১০টার সময় সেইখানে পৌছিলাম। কেবল মরুভূমি—বালী ধু ধু করিতেছে। আর গরম বিষম। তিষ্ঠান দায়। আমি ভুলিয়া গরম কালের পোষাক আনি নাই। আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। এখানে আমাদের জাহাজ কয়লা লইবে। কয়লা লইতে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগিবে। জাহাজ ছাড়িবে বোধ হয় ৬টার সময়। আমি একবার ভাবিলাম, নামিয়া স্থানটা দেখিয়া আসি। কিন্তু বিষম গরম, তাই গেলাম না। আমাদের সহিত একজন জাবা-দ্বীপবাসী উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি জীবুটী দেখিতে যান। তিনি ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম, তিনি সাত মাইল ঘুরিয়া পাঁচ প্রকার গাছ আনিয়াছেন। একটীও বড় গাছ নাই। সমস্তই ছোট চারা। ১০টা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া হাত দশেক জাগা দেখিতে পান সবুজ। সেইস্থানেও তাহার কাছে কাছে এই কয় প্রকার উদ্ভিদ!!! ইহাকেই বলে আফ্রিকার মরুভূমি! তিনি পিপাসায় জলের চেষ্টায় গিয়াছিলেন। মাইল কতক ঘুরিয়া সামান্য জল পাইলেন। হোটেল গিয়া লেমনেড্ চাহিলে, তাহারা হা করিয়া থাকে, লেমনেড্ কি?

বৈকাল ছয় টার সময় জাহাজ ছাড়িল। আমরা শীঘ্রই লোহিত সাগরে আসিয়া পড়িলাম। বিষম গরম! সাহারার উষ্ণ বায়ু আমাদের যেন প্রাণ কাড়িয়া লইতে লাগিল

১৯শে, ২০শে, এবং ২২শে আমরা এইরূপ Redseaর ভয়ানক উত্তপ্ত বায়ু সেবন করিয়া চলিলাম। ২৪শে অক্টোবর আমরা সুয়েজে পৌছিলাম। সুয়েজ খালের বিশেষ বিবরণ পরসংখ্যায় লিখিব, এইবার এই পর্য্যন্ত।

স্নেহের সেবক প্রভাত।
২৭ শে নবেম্বর, ১৮৯৬, শুক্রবার,
১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৩।

বিদেশী বাঙ্গালী। (৪)

গোলোকনাথ।

যে অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাত্মার নাম এই প্রস্তাবের শীর্ষদেশে উল্লেখ করা গিয়াছে ইনি বাঙ্গালী খ্রীষ্টান-কুলের অন্যতম ভূষণ ছিলেন। সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশে ইহাঁর নাম ও গুণাবলী মহাভক্তি ও প্রেমের সহিত সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া থাকে; বিদেশী বাঙ্গালী সমাজের পক্ষে গোলোকনাথ কেবল অন্যতম নেতা ছিলেন না, দয়া দাক্ষিণ্য, মমতা, স্বদেশবৎসলতা—সাধুতা প্রভৃতি অসাধারণ গুণাবলীর তিনি আকর ছিলেন। গোলোক নাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী চারি অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম বাল্যজীবন, ২য় খ্রীষ্ট-জীবন, ৩য় ধর্ম্মপ্রচারক*এবং চতুর্থ শিক্ষক ও পরোপকারক।

গোলোকনাথের পিতা কলিকাতায় নীলকুঠীর কর্ম্ম করিতেন; * এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ আলেক্জান্দর ডফ্ সাহেব কলিকাতা নগরীতে দেশীয় বালকদিগের ইংরাজী শিক্ষার জন্য একটি স্কুল স্থাপনা করেন, গোলোকনাথ এই স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রেরিত হন। এখন এই স্কুলটি ফ্রিচর্চ্চ-মিশন কলেজ নামে খ্যাত। গোলোকনাথের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ক্রমে যিশুখ্রীষ্টের দিকে প্রণত হইতেছে দেখিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্কুল হইতে গৃহে লইয়া যান এবং বাইবেল পড়িতে নিষেধ করেন। অল্পকাল পরে গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় গৃহ হইতে পলাইয়া যান, পলাইবার সময় তাঁহার সঙ্গে কয়েকটি মাত্র রৌপ্য মুদ্রা, দু একটা স্বর্ণালঙ্কার, একটা তাম পাত্র এবং দুই একখানা পুরাতন বস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই ছিলনা। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তদশ বৎসর বয়ক্রম কালে গোলোকনাথ গৃহত্যাগী হয়েন। সে সময়ে রেল বা টেলিগ্রাফ ছিলনা। পথের সর্ব্বত্র দস্যুভয় এবং সমগ্র দেশ অশান্তিতে পরিপূর্ণ; পুলীশের বন্দোবস্ত নাম মাত্র ছিল বলিলেই হয়। সন্ন্যাসীর বেশে তিনি বাঙ্গালা দেশ পরিত্যাগ করেন, লেখা পড়া তাঁহার জানা ছিলনা, সঙ্গে সহায় কেহই নাই এবং বঙ্গদেশের বাহিরে যে সকল ভাষা প্রচলিত, তাহারও তিনি কিছুই জানিতেন না। একখানি উর্দ্দু গ্রন্থে, বৃদ্ধ বয়সে পণ্ডিত-প্রবান গোলোকনাথ লিখিয়াছিলেন, "আমি সোণার সংসার পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে আসিয়াছিলাম; দেবতুল্য পিতা, দেবীরূপী মাতা, যুবতী স্ত্রী, স্নেহময়ী ভগিনী প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া আমি দেশত্যাগী হইয়াছিলাম। হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থা স্বদেশ পরিত্যাগের প্রধান কারণ।" যাহা হউক, নানা স্থানে নানা প্রকার কষ্টে দিনপাত করিয়া বালক গোলোক বারাণসী

* This paper forms the substance of a lecture on the life of the Revd. Golak Nath Chatterjee delivered by the writers at a special meeting of the Chintadripettah Christian Association in Madras on the 6th day of November, 1896.

ধামে পৌঁছিলেন ; তথা হইতে আলাহাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি পঞ্জাবের লুধিয়ানা নগরীতে বিশ্রাম লাভ করিলেন। এথানে কোনও কার্য্যালয়ে অতি সামান্য বেতনে তাঁহার একটি চাকুরী যুটিল, শেষে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পাদ্রী নিউটন সাহেব কর্ত্তৃক গোলোকনাথের খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-গ্রহণের চিহ্ন স্বরূপ বাপ্তিস্ম ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। হিন্দু গোলোকনাথ খ্রীষ্টান হইলেন।

খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গোলোকনাথের সমস্ত জীবন যেন পরিবর্ত্তিত হইল। শারীরিক ও মানসিক তেজ এবং সৌন্দর্য্যে দিনে দিনে গোলোকনাথ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ; আধ্যাত্মিক বলেও তিনি শেষে প্রকৃষ্ট রূপে বলীয়ান হইয়া উঠেন। দেখিতে দেখিতে নানা ভাষায় গোলোকনাথ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন ; সুন্দর স্বভাব, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, শারীরিক বল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা,ধন, মান, যশ, আধিপত্য প্রভুত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার সময়ে পঞ্জাব প্রদেশে কেহই সমকক্ষ ছিল না। গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় নিজের মানসিক গুণ ও সুন্দর স্বভাবের বলে অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নীত হইয়া একজন মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ভগবানে আত্মসমর্পণ এবং পরদুঃখ-মোচনের জন্য স্বকীয় স্বার্থত্যাগ গোলোকনাথের জীবনের মহা সৌন্দর্য্য।

লুধিয়ানায় অবস্থান করিতে করিতেই গোলোকনাথ সংবাদ পাইলেন, তাঁহার বাল্যবিবাহের সহধর্ম্মিণী পরলোকগতা হইয়াছেন। ইহাতে কিছুকাল তিনি দুঃখিত অন্তঃকরণে যাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভগবানে ভরসা থাকায় তাঁহার চিত্তের শান্তি লোপ পায় নাই। অনন্তর গোলোকনাথ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় যে সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন, সে সময়ে ভারতবর্ষে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী ব্যতীত খ্রীষ্টান মিশনরীদিগের প্রভুত্ব হয় নাই ; পঞ্জাব তখন শিখদিগের শাসনাধীন,সুতরাং পঞ্জাবে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করা আর স্বহস্তে স্বপদে কুঠারাঘাৎ করা প্রায় সমতুল্য ছিল। কোন ব্যক্তি বলিয়াছেন—

"Golak Nath became a convert to Christianity when the dawn of Christian religion was yet far below the horizon in the Panzab: He became a Christian at a time when a handfull of European missionaries in Ludhiana stood as watchmen upon the walls of Zion looking expectantly and prayerfully for the first rays of the light of the sun of righteousness amid the surrounding gloom of error and superstition".

যাহা হউক, গোলোকনাথ লুধিয়ানা এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে খ্রীষ্টের মাহাত্ম্য প্রচার এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের কার্য্য করিতে লাগিলেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি পত্রের স্বর্ত্তানুসারে শিখ সর্দ্দারগণের অতুলনীয় প্রভুত্ব তখন পঞ্জাবের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চনদের চারিদিকে শিখেরা এতদূর যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল যে, যে দিকেই দেখ "নরহত্যা, ব্যভিচার, সতীত্বনাশ, ডাকাইতি, লুণ্ঠন, সুরাপান, ধর্ম্মহীনতা, কুসংস্কার, মূর্খতা এবং পাশব প্রবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই বিদ্যমান ছিলনা।" সদাচার, শান্তি, ভদ্রতা, ধর্ম্ম, বিনয়, এ সকল যেন দেশ হইতে দূরে পলাইয়া গেল। দুষ্টের দমন করিবার কেহ ছিলনা, যিনি রক্ষক তিনিই ভক্ষক হইয়া উঠিলেন। শিখ-সর্দ্দারগণের হস্তে, রাজা কাঠের পুত্তলিকাবৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া রহিলেন। ঠিক

এই সময়ে গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় পঞ্জাবের সমাজ-সংস্কার এবং পঞ্জাবে শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য লুধিয়ানা পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন; খ্রীষ্টের দেবোপম চরিত্রের কথা পঞ্জাবের প্রজাকুলকে শুনাইবার জন্য তিনি প্রথমে উৎসুক হইলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে শতদ্রু পার হইয়া অপর তটে যাওয়া বড়ই দুষ্কর ব্যাপার ছিল; সরকারী পরোয়াণা ব্যতীত পঞ্জাবী ভিন্ন আর কেহ এই নদ পার হইবার অধিকারী ছিলনা; বিশেষতঃ দেশীয় বা ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদিগকে শতদ্রুর অপর পারে যাইতে দেখিলেই শিখেরা তাহার মস্তক চ্ছেদন করিত। নির্ভয়ে গোলোকনাথ শতদ্রু পার হইলেন; অপর পারে গিয়া "বিদ্যা-শিক্ষার আবশ্যকতা" এবং "নির্ম্মল চরিত্রের গুণ" সম্বন্ধে দুই দিন ওজঃস্বিনী বক্তৃতা করিলেন, প্রজারা শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিল, কিন্তু তৃতীয় দিবসে যখন তিনি "খ্রীষ্টের উদার চরিত্র ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরাবতার" এই বিষয়ে ব্যক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন সমগ্র শিখ, হিন্দু ও মুসলমান তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। অবশেষে গুরুতর রূপে আঘাত করিয়া সায়াহ্নে ফিলোর দুর্গের অভ্যন্তরে অশিক্ষিত দুষ্টেরা গোলোকনাথকে বন্দী করিয়া রাখিল, এই দুর্গ শতদ্রু তটে এখনও বর্ত্তমান, সম্প্রতি এখানে একটি রেলওয়ে ষ্টেশনও নির্ম্মিত হইয়াছে। গোলোকনাথের এই অবস্থা সম্বন্ধে জনৈক লেখক লিখিয়াছেন—

"There, while like a brave watchman, he was lifting the lamp of the Gospel amid the surrounding darkness of heathenism, and on a soil where no Gospel messenger's foot had ever trodden, Golak Nath was suddenly seized by the neck from behind, and the infuriated anti-Christian mob dragged him mercilessly towards the part which was built by Ranajit Sing after the treaty of 1809. In this deadly part amidst a forest, Golak Nath was made secure under the crushing weight of two huge stone-mills and deprived (for hours togethers) of food and waters."

সমস্ত রাত্রি উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তনে গোলোকনাথ মহানন্দে যাপন করিলেন, তাঁহার অতুলনীয় ধর্ম্মভাব দেখিয়া দুষ্টেরা ভয় পাইল, দুর্গরক্ষকদিগের পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইল; অবশেষে প্রভাতে তাহারা গোলোকনাথকে মুক্তি দান করিল।

১৮৫৭ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে গোলোকনাথ "পাদ্রী" বা "রেভরেণ্ড" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া জলন্দরে প্রেরিত হইলেন। জলন্দর তখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ; জঙ্গল কাটাইয়া, পাদ্রী গোলোকনাথ অতি রমণীয় মিশনাশ্রম স্থাপন করিলেন। এই মিশনাশ্রমে গির্জ্জা, দাতব্যখানা, পাঠাগার, পুস্তকালয়, অনাথালয়, প্রভৃতি সংযুক্ত হইল। অথচ গোলোকনাথ মিশন হইতে একটি পায়সাও লয়েন নাই। চাঁদা উঠাইয়া এই সকল বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদন করিলেন। সকল শ্রেণীর লোকের নিকট তিনি এতদূর প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, কৃপণেরাও তাঁহাকে সাহায্য দান করিত। গোলোকনাথের সমস্ত জীবন পরোপকারে ব্যয়িত হইয়াছিল। অনাথের সেবা, দরিদ্রের পালন, মূর্খকে শিক্ষাদান, পীড়িতের চিকিৎসা, অধার্ম্মিকের সংস্কার প্রভৃতি কার্য্যেই তাঁহার আনন্দ লাভ হইত। গোলোক নানা ভাষায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার নানা ভাষায় বিরচিত গ্রন্থাবলী পঞ্জাব ট্রাক্‌ট্ সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। ১৮৫৭ অব্দে জলন্দরে এবং

জলন্দর পার্শ্বে বিদ্রোহী সিপাহীরা শত সহস্র লোকের প্রাণ বধ করে, অনেক দেশীয় খ্রীষ্টান এবং অনেক ইংরাজ তাহাদের হস্তে শমন সদনে প্রেরিত হয়, কিন্তু গোলোক নাথের মস্তকের একটি কেশও কেহ স্পর্শ করে নাই, গোলোকনাথ সর্ব্বত্রই "মহাপুরুষ" এবং "দেবানুগৃহীত মহাত্মা" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই সময়ে কর্পূরতলার মহারাজা বিদ্রোহী সিপাহিদিগের সহিত মিলিয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতা করিতে ইচ্ছুক হয়েন, গোলোকনাথ মহারাজাকে অনেক বুঝাইয়া নিরস্ত করেন এবং অবশেষে তাঁহারই পরামর্শ মতে কর্পূরতলার মহারাজা গবর্ণমেণ্টের "মদৎগার" অর্থাৎ সহায় হয়েন। বিদ্রোহের শান্তি হইলে, মহারাজাকে পুরস্কার দিবার জন্য গোলোকনাথ গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর কর্পূরতলার মহারাজাকে অযোধ্যার অন্তর্গত বরাইচ তালুকদারী জায়গীর স্বরূপে উপঢৌকন দেন। সেই হইতে কর্পূরতলার রাজবংশের সহিত গোলোক নাথের মহামিত্রতা জন্মিল, ঐ জায়গীর এখনও কর্পূরতলা-ষ্টেটভুক্ত। রেভরেণ্ড গোলোক নাথ বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন; পাদ্রী আবদুল্লা এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী এখনও জীবিত, ইহারা গোলোক নাথের শিষ্য। বিখ্যাত রেভরেণ্ড মিষ্টর আবদুল্লার এক কন্যা পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট বালিকা বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শিকা, অপর কন্যা একজন সুপ্রসিদ্ধা চিকিৎসিকা। গোলোকনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্যের কথা আমরা এখনও বলি নাই; কর্পূরতলার মহারাজাধিরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স যুবরাজ হরনাথ সিংহ বাহাদুর গোলোকনাথ কর্ত্তৃক খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পিতৃসিংহাসন ও পিত্রালয় পরিত্যাগ করেন; পিতা আপন পুত্রকে বরাইচ তালুকদারী দান করিয়াছেন, প্রিন্স হরনাথ সিংহ বাহাদুর বরাইচে এখনও জীবিত। শ্রীমান হরনাথ সিংহ কেবল গোলোকনাথের শিষ্য নহেন, গোলোকনাথের জামাতাও বটেন। ইনি পাদ্রী গোলোকনাথের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রিন্স হরনাথ সিংহ এক্ষণে জি, সি, এস, আই, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি বিলাতে গিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরীয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তথায় মহা সমাদর প্রাপ্ত হয়েন। মহারাজা হরনাথ সিংহের রাণী জীবিতা; তাঁহার কয়েকটি পুত্র (অর্থাৎ গোলোকনাথের দৌহিত্র) ইংলণ্ডে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। গোলোক নাথের দ্বিতীয়া স্ত্রী কাশ্মীর দেশীয়া ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন; পাদ্রী গোলোকনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র পঞ্জাবে বারিষ্টার, দ্বিতীয় পুত্র অম্বালায় পাদ্রী, তৃতীয় পুত্র লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজে অধ্যাপক এবং চতুর্থ পুত্র সিভিল সার্ভিসে প্রবিষ্ট। গোলোকনাথ নিঃসম্বলাবস্থায়, বাল্য বয়সে সহায়হীনতায়, মূর্খের ন্যায় বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন; চরিত্র ও সাহস এবং অধ্যবসায় ও স্বয়ম্ভু সমুত্থানশক্তিবলে পঞ্জাবে অদ্বিতীয় পুরুষ হইয়া উঠেন। ধনে, মানে, প্রভুত্বে, বিদ্যায়, তাঁহার সময়ে পঞ্জাবে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। তিনি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হইতে কুলী মজুর পর্য্যন্ত সকলেরই প্রিয় ও সম্মানার্হ ছিলেন; তাঁহার নামে পঞ্জাবে "বাঘে ছাগে" এক ঘাটে জল খাইত। গোলোকনাথ অতুল ধনের অধিকারী হইয়া মৃত হয়েন, তিনি নগদ তিন লক্ষ টাকা রাখিয়া মরেন এবং তদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক ভূসম্পত্তি স্থানস্থানে খরিদ করিয়া গিয়াছেন।

গোলোকনাথের চেষ্টায় পঞ্জাবে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষার সূত্রপাত হয়। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ এ বিষয়ে চেষ্টা করেন নাই। তিনি নানাস্থানে ইংরাজী স্কুল ও দেশীয় ভাষার পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, বহু স্থানে চিকিৎসালয়, লেক্‌চর-হল, রিডিংরুম, লাইব্রেরী, অনাথাশ্রম এবং ধর্ম্মালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, পঞ্জাবের তদানীন্তন লেঃ গবর্ণর সার রবার্ট মণ্টগমরীর সাহায্যে তিনি পঞ্জাবে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত করেন এবং কয়েকটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে জলন্দরে ৭৬ বর্ষ বয়ক্রম কালে গোলোকনাথের মৃত্যু হয়। তাঁহার সমাধি সময়ে তিন সহস্র লোক উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পরে পঞ্জাবের খ্রীষ্টান ও অ-খ্রীষ্টান ভদ্র লোকেরা চাঁদা তুলিয়া গোলোকনাথের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। জলন্দরের দ্বিতীয় গির্জ্জা Golak Nath memorial Church' গোলোক নাথের স্মৃতিচিহ্ন।

মহাত্মা রেভরেণ্ড গোলোকনাথ মরিয়াছেন কিন্তু মৃত হইয়াও তিনি জীবিত। "He died with a nation's weeping" সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশের প্রজাকুলের হৃদয়ে তিনি এখনও জীবিত; পঞ্জাবের আজি কালিকার শিক্ষিত যুবকেরা তাঁহার চেষ্টার ফল স্বরূপ। পঞ্জাবের স্ত্রীশিক্ষা, পুরুষ-শিক্ষা, ধর্ম্মচর্চ্চা, সমাজ-সংস্কার, এ সকলের গোলোকনাথই প্রধান ও মূল। পঞ্জাবের দাতব্যালয় সমূহের তিনিই প্রথম উৎসাহদাতা। পঞ্জাবে গোলোকনাথের নাম কখনই লুপ্ত হইবে না; "Golak Nath was the Pioneer of education in the Land of the five waters". Mrs. Mackenzie's Journal. পঞ্জাব প্রদেশে, কোনও বিদেশী পুরুষ গোলোকনাথের স্থানাধিকার করিতে পারে নাই; পঞ্চনদে বাঙ্গালী মাহাত্ম্যের গোলোকনাথই মূল। খ্রীষ্টধর্ম্ম ও খ্রীষ্টসমাজ সম্বন্ধে পঞ্জাবে গোলোকনাথ যাহা করিয়া গিয়াছেন, ইউরোপীয় মিশনরীর শত বৎসরের চেষ্টায় তাহার অর্দ্ধাংশ হওয়াও সুকঠিন।

বিদেশী বাঙ্গালী সমাজের গোলোকনাথ অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা; বঙ্গদেশের বাহিরে দেশীয় খ্রীষ্টান সমাজের গোলোকনাথ ভিন্ন আর কোনও বাঙ্গালী-খ্রীষ্টান বিদেশে এত বড় মহাপুরুষ হইতে পারেন নাই। এই দৃষ্টান্তে বেশ বুঝা যায়, খ্রীষ্টান হউক আর হিন্দু হউক, ধীমান বাঙ্গালী যদি উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র পান, যদি মানসিক বলের পূর্ণ স্ফুর্ত্তির স্থান পায়, তাহা হইলে শীতপ্রধান, গ্রীষ্মপ্রধান প্রভৃতি যে স্থলেই হউক না, তিনি স্বজাতির ও স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইতে পারেন। বাঙ্গালীর বিদেশ গমনের যাঁহারা বিরোধী, তাঁহারা দেশের মহা বৈরী; ঈশ্বর করুন সমুদ্র পারেও—সুদূর ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকা ভূমিতেও—বাঙ্গালীর নামে ফুল চন্দন পড়ুক।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

বিচ্ছেদ।

বেহাগ

জাগিতে ঘুমাতে রে পড়ে মনে
সেই কাল বরণ
ঘুমায়ে স্বপন দেখি, কানাই কানাই বলে ডাকি
মা বলে, কোথায় তোর কানাই এখন,
অমনি মনে পড়ে সেই কালবরণ।
মার ডাকে চেয়েদেখি, লাজে পুন মুদি আঁখি
হৃদয় মাঝারে পুন' করি দরশন
জাগিতে ঘুমাতেরে সেই কালবরণ।
কেমন মোহন কাঁতি, অলকা পুরিত ভাঁতি,
পাশে বসি নত আঁখি মধু পরশন,
জাগিতে ঘুমাতেরে পড়ে মনে সেই কালবরণ।
কুসুম তুলি ভরি ডালা, গাঁথয়ি চিকণমালা,
গলে তোর দিতে যাই ও কাল বরণ
সরমে মুদলি আঁখি, আঁখি পরে অনাদ থাকি,
আঁশুতে আঁধার করে মুদয়ে নয়ন
অমনি হৃদয় মাঝে সে কাল বরণ॥
জাগিতে ঘুমাতেরে পড়ে মনে
সেই কাল বরণ
খেলা ঘর বেঁধে আয়, আবার খেলি দুজনায়
আনাদরে পড়ে আছে ছেলেমেয়ে সব এখন।
চিরদিন খেলার সাথী তুইরে আমার
কাল বরণ
লুকোচুরি কত খেলা, কানাইরে সাঁজের বেলা,
বেঁধেছি যে প্রেমের পাশে লুকাবে কি
কাল বরণ।
জাগিতে ঘুমাতেরে পড়ে মনে
সেই কাল বরণ।
ধুলোদিব ধুলোনিব ধুলোয় ধুলোয় সাজাইব,
চড়দিব চুমোদিব, হাসাইব কাঁদাইব
খেলার সাথী খেলি আয় কালবরণ
সাজের বেলায় গেলি কোথায়
ফেলে আমায় কালবরণ,
জাগিতে ঘুমাতেরে পড়ে মনে
কাল বরণ।

প্রেমদাস বৈরাগী

দেবপুষ্পরথ।

১

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ!
নবগ্রহ তার চাকা,
কনক রজত মাখা,
উজলিয়া উঠিয়াছে উদয় পর্ব্বত!
ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ!

২

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ,
হেমন্তে আগুন মাসে,
মেঘে শীত জমে' আসে,
মরকতে মোড়া যেন নভ নীল পথ!
ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ!

৩

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ,
কমল-কলস চুড়ে,
পলাশ পতাকা উড়ে,
মরাল বাহনে তারে বহে মনমথ!
ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ!

৪

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ,
চন্দ্রসূর্য্য গেছে নিবা,
সেরূপে মলিন দিবা,
চাকায় চাকায় ঘোরে বসন্ত শরৎ!
ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ!

৫

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ,
যে দেশে সে 'রাঙ্গামেলা',
বটতলে করে খেলা,

কংগ্রেস্, উহার শক্তি ও সাহিত্য এবং শরীর-গঠন।

(সমালোচনা)

কংগ্রেস্ দ্বাদশ অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশ বৎসরে পড়িয়াছে। উহার "কনিষ্টিটিউসন্" নির্ম্মিত, লিখিত বা নিয়ম-বদ্ধ না হইলেও, বয়সে বিকাশ লাভ করিয়াছে। উহার শারীরিক ক্রিয়া আছে; অতএব শরীরও আছে। শক্তিও কিঞ্চিৎ জন্মিয়াছে। সর্ব্বোপরি উহার সাহিত্য সবিশেষ পুষ্ট হইয়াছে। কংগ্রেসের বিগত দ্বাদশ অধিবেশন-উৎসব উপলক্ষে, উহার সাহিত্য, শক্তি ও শরীর গঠন এ স্থলে কিঞ্চিৎ আলোচ্য।

কংগ্রেস্-জাত সাহিত্যের কলেবর কৃশ নয়, উহা, ক্রমে স্থূল স্থূলতর, বৃহৎ বৃহত্তর হইয়া চলিয়াছে। দ্বাদশ বৎসরের বক্তৃতা-রাশি একত্র সংযুক্ত হইলে, বোধ হয়, অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমিত স্থান অধিকৃত ও আবৃত করিতে পারে। তদ্ভিন্ন, পত্র,প্রবন্ধ, অনুবন্ধ, মন্তব্য, মিনিট্, বিচার-বিশ্লেষণ ও সমালোচনা প্রভৃতি, কংগ্রেসের অন্যান্য অবয়বে ও অঙ্গে, ঐ সাহিত্যের শরীর, দীর্ঘে প্রস্থে, এখনি বড় কম প্রকাণ্ড হয় নাই। কংগ্রেসের কার্য্যক্ষেত্রের বিপুলতা ও কর্ম্মিবর্গের বহুলতার ন্যায়,উহার সাহিত্য-শরীরও যে অতি বিস্তীর্ণ হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। ফলত কংগ্রেস্ কল্পে, এ দেশীয়দিগের, কর্ত্তৃক যে রাজনৈতিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা কেবল সাহিত্যের হিসাবে ধরিলেও সুবৃহৎ বটে। তবে আক্ষেপ এই যে, কংগ্রেস্ কৃত এই রাজনৈতিক সাহিত্য-সৌধের আপাদ মস্তক ইংরেজী। উহার গঠনে ভারতীয় ভাষা-নিচয়ের একটী বর্ণেরও ব্যবহার নাই;—একটী শব্দেরও সংস্পর্শ নাই। সুতরাং "ভারতীয় জাতীয় মহা-সমিতির" সাহিত্য, ইংরেজী-অনভিজ্ঞ ভারতীয় মহাজাতির অবোধ্য। সুতরাং "ভারতীয় জাতীয় মহা সমিতির" রাজনৈতিক আলোচনা-আন্দোলনে ভাবী ভারতবর্ষের ধন ধান্যের ও সুখ শান্তির সমৃদ্ধির যতই সম্ভাবনা থাকুক্, ভারতীয় জাতীয় মহা-সমিতির সুবৃহৎ সাহিত্য দ্বারা ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির কোন ভাষা পুষ্ট, পোষিত ও উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা, আপাতত বড় দেখা যাইতেছে না।

ভারতীয় জাতীয় সমিতির সাহিত্য ভারতীয় জাতির অবোধ্য; ইহা অস্বাভাবিক বটে। এরূপ সমিতি এবং এবম্বিধ সাহিত্যের কথা শুনিবা মাত্রই তাহাকে অসম্ভবের সাধনা—অস্বাভাবিকের উপাসনা বলিয়াই বোধ হয় বটে। কিন্তু,মানব জীবনে ও মনুষ্য জাতির ইতিহাসে, অভিনব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা কখনও যে না ঘটে, এমন নহে। "ইতিহাস অপনাকে আপনি পুনরুক্ত করে" এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, ইতিহাস অপর দিকে, অভূতপূর্ব্ব অভিনবত্বও অঙ্গীকার করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্থান-পতন ও উক্ত পুনরুক্তের ন্যায় অপূর্ব্বত্ব এবং অভিনবত্বও মানব-জাতির জাতীয় ইতিহাসের অঙ্গ ও উপাদান।

অভিনব কার্য্য-কারণ-পরম্পরার সমবায়ে অসম্ভব হইতে সম্ভব ও অস্বাভাবিক হইতে এক প্রকৃতির স্বাভাবিকতা উৎপন্ন হইতে পারে। আমার বোধ হয়, এ স্থলে তাহাই হইতেছে। দৈনিক জীবনের, অতি সাধারণ ঘটনা-স্রোতে অভিনব কার্য্য কারণ-পরম্পরা

এমন ধীরে ধীরে, আসিয়া সমবেত, সম্মিলিত ও সমষ্টি-নিবন্ধন শক্তি-সমন্বিত হয় যে, লোকে তাহা সবিশেষ লক্ষ করে না; অজ্ঞাতে তাহার মাধ্যাকর্ষণে কেন্দ্রাকৃষ্ট হয়, কার্য্য করে, চিন্তা করে না, চিন্তার কারণ উৎপন্ন করে।

মানুষ, কলের পুতুলের মত কাজ করে, সম্ভবের বা অসম্ভবের কেন্দ্রাকৃষ্ট হইয়া ঘোরে; পূর্ব্বাপর বড় বেশী চিন্তা করে না। ইহার এক মাত্র ব্যাখ্যা;—'প্রকৃতির রহস্য।' অসম্ভব হইতে সম্ভব উৎপন্ন হওয়ারও এক কথায়, 'কৈফিয়ৎ" তাই।

"জাতীয় মহা-সমিতির" ভাষা, বিজাতীয়—মহা বিজাতীয়! সে ভাষা, নবাবিষ্কৃত-ভাষা-বিজ্ঞানানুসারে "ইণ্ডু-য়ুরোপীয়" পরিবারস্থ হইলেও, নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের কোন ভাষা নয়। তাহা বরং "সেমিটিক্" সংসারের কোন ভাষা হইলে উর্দ্দু পারসীর পাশাপাশী পড়িয়া ভারতবাসী বহু সংখ্যক হিন্দু মুসলমানের বোধগম্য হইতে পারিত। কিন্তু, তাহা যাউক্।

ভারতবাসীর ভারতবর্ষীয় সমিতির ভাষা-ও সাহিত্য ভারতবর্ষীয় নয়,—ইংলণ্ডের ইংরেজী। জাতীয় সংযোগ ও সংমিলনের মূল গ্রন্থিই এ স্থলে, বিজাতীয়। ইহা বিসদৃশ বটে। ইহা বিপর্য্যয়করও হইতে পারে। কিন্তু, এ স্থলে, বিসদৃশ হইতে সাদৃশ্য ও বিপর্য্যয়-বীজের মধ্য হইতে পর্য্যয় উৎপন্ন হইয়াছে। কথাটীর তাৎপর্য্য প্রহেলিকার মত অপরিষ্কার, আত্ম-বিরোধী ও কঠিন হইলেও, অবস্থাও ঘটনা-পরম্পরা ক্রমে এত সর্ব্ববাদিসম্মত ও এত অবিসম্বাদিত স্বীকার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ব্যাখ্যা করিয়া না বলিলেও চলে। সোজা কথা ছিঁড়িয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝিতে গেলেই বরং তাহা বিলক্ষণ বাঁকা হইয়া দাঁড়ায়।

ইংরেজী ভারতবর্ষের কোন পুরুষের প্রচলিত ভাষা নয়। উহা বিদেশীয়—বিজাতীয়। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, উহা হইতে—ঐ বিদেশীয় ও বিজাতীয় হইতেই, আমাদের এই স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় প্রজা-সূয় মহা সমিতি। ইংরেজের ইংরেজী, ইংরেজের স্কুল, ইংরেজের রেলপথ প্রভৃতিই এই "ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল্ কঙ্গ্রেসের" আদি কারণ এবং সর্ব্বপ্রধান সাধারণ সম্মিলন ও বন্ধন-গ্রন্থি। পরন্তু, ইংরেজের রাজনীতি-বিজ্ঞান—মিল্টন বেকান, মিল বেন্থামই—কংগ্রেস-কৃত প্রজানীতির উপাদান ও প্রাণ স্বরূপ। এক কথায়, ইংলণ্ডের ইংরেজী ব্যতীত ভারতবর্ষের এবম্বিধ কঙ্গ্রেস্ কখনও সম্ভবপর হইত না। সম্ভবপর হইত না বলিয়া যে অসাধ্যই হইত এমন বলি না। এরূপ সহজসাধ্য হইত না, ইহাই বলা যায়। যাহা সহজসাধ্য, তাহার শক্তিও সহজ—যাহা দুঃসাধ্য বা বহু আয়াস সাধ্য, তাহার শক্তি দুরন্ত। ইংরেজী-বিচ্ছিন্ন ও ইংরেজ-বিরহিত, ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক সম্মিলন যদি বহু আয়াস ও আয়োজনেও সাধ্য হইত, তাহা হইলে, সে কঙ্গ্রেসের প্রকৃতি ও শক্তি অন্য প্রকারের হইত, ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু, সে কথা বলিতেছি না।

একমাত্র ইংরেজী হইতেই এই কঙ্গ্রেস্ উদ্ভূত। ইংরেজী ইহার শক্তি, সম্বল, যথা-সর্ব্বস্ব,—ইহার অবলম্বন-যষ্টি, ইহার জ্ঞান আলোক। ইংরেজী হইতে ইহা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না; ইংরেজী ব্যতীত এক মুহূর্ত্ত কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। ইংরেজী হইতে কঙ্গ্রেসের সৃষ্টি, ইংরেজীতেই স্থিতি;

অতএব ইংরেজীর বিরহে উহার বিলয়। ইণ্ডিয়ান্ ন্যাসানাল্ কংগ্রেসে ইংরেজী অনিবার্য্য।

অতএব, এস্থলে দেখিতেছি, বিজাতীয় হইতেই স্বজাতীয়তার জন্ম। বিসদৃশ হইতে সাদৃশের, অসম্ভব হইতে সম্ভবের, ও অস্বাভাবিক হইতে স্বাভাবিকতার সৃষ্টি। অন্য ব্যাখ্যার অপেক্ষা না করিয়া, ইহাকে হিন্দু মায়াবাদের "অঘটন পটিয়সী লীলা" এবং মহম্মদীয় "কিস্মতের" "ক্যাখুবি কুদ্রত্" কহা যাইতে পারে।

ইংরেজ রাজার বৈচিত্র্য-বিহীন শাসন-প্রণালী, ইংরেজী শিক্ষা-প্রণালী এবং তাড়িত বার্ত্তা ও বাষ্পীয়পন্থা-প্রণালী, ভারতবর্ষের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টির বিরাট সমষ্টি সঙ্কলন করিয়াছে। অতি দূরস্থকে অতি নিকটস্থ করিয়াছে; পৃথক্ পৃথক্ পরমাণু-কণা এক কেন্দ্রে আকৃষ্ট করিয়াছে;—এক কথায় আমাদের কংগ্রেস্টীকে খাড়া করিয়াছে; আমাদের 'রাজনৈতিক জাতীয়তা যোড়া দিয়া জুড়িয়া দিয়াছে;—কিন্তু, জোড়া দেওয়াইবা বলি কেন? এ জাতীয়তার জন্ম, বিজাতীয় ইংরেজীতেই দিয়াছে।

বৃহৎ ব্যাপার! বিপুল বিপ্লব! কঠিন সাধনা! একটু ডুব দিয়া দেখিলে, প্রকৃতিই "অঘটন পটিয়স্" কার্য্য,—ইহা ইংরেজের বা অদৃষ্টের! আবার, অপর দিকে, ভারতবর্ষবাসীর দৈনিক জীবন-স্রোতে ইহা এমন শনৈ শনৈ, অতি সাধারণ ঘটনার ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে,—এমন সহজ-সেব্য শরবৎ পানের ন্যায়, এই অপরিমেয় পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে, উহার ঐকান্তিক অভিনবত্ব সত্ত্বেও উহা আর অভিনব নয়, উহার বিরাট বিস্ময়কারিতা সত্ত্বেও, উহা আর বিন্দু মাত্র বিস্ময়কর নয়! উহা, এখন একান্ত অভ্যস্ত, ইতরীকৃত;—নিশ্বাস প্রশ্বাস-প্রবাহের মত অতীব সহজ, স্বাগত, সচারাচর সংঘটিত; অতএব শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়স্থ লোকেরই প্রায় একই রূপ অলক্ষণীয়! আসল কথা, এই যে উহার তল দেশে আর আমরা তাকাই না, তাকাইবার প্রয়োজনই মনে করি না। অতীত ও ভবিষ্যত্ প্রায়ই আমাদের চিন্তার বিষয় হয় না। আমরা বর্ত্তমান্ লইয়াই ব্যস্ত আছি। পরন্তু, উহার আরও একটী কারণ এই যে, উপরোক্ত সিদ্ধির যে কঠোর সাধনা, সে সাধনা আমাদের নয়,—সে সাধনার শক্তি আমাদের নয়, কিছুই আমাদের নয়,—সে সাধনার সংযমও আমাদের নাই। সুতরাং স্বভাবতই আমরা সে সাধনার প্রতি তত লক্ষ করি না; তৎপ্রদত্ত সিদ্ধিকে স্বাগত ও সহজ মনে করি; আর সেই সিদ্ধির কথঞ্চিৎ সুবিধা উপভোগ করিয়া কিঞ্চিৎ লাফাই ঝাঁপাই। সাধক সে দৃশ্য দেখিয়া কি বিবেচনা করেন, বলা যায় না।

কোথায় ইংলণ্ড, ইংরেজ ও ইংরেজী ছিল? আর কোথায় ছিল ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী, পুরাতন হিন্দুজাতি ও পরবর্ত্তী মুসলমানগণ! ঘটনা-স্রোতের কি বিচিত্র, কি বিস্ময়কর তরঙ্গাঘাতে আজ উভয়ে এই উপন্যাসবৎ চিত্তোন্মাদক সংযোজন-সংবর্ধণ-ইতিহাস! এবং সেই ইতিহাসের এক অধ্যায়ের একটী অক্ষর আমাদের অদ্যকার এই কংগ্রেসের এই দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশনোৎসব। ইহা প্রধানত ইংলণ্ডের ও ইংরেজীরই নিজের ইতিহাস। ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর ইতিহাসের সহিত ইহার যে কিছু সংস্রব, তাহা কংগ্রেসের অভিনয়-সূত্রে, অতএব গৌণকল্পে।

"কংগ্রেস কিছু নয়" যাঁহারা বলেন, যদি কেহ বলেন, তাঁরা হয় আহাম্মক, নয় উন্মত্ত নয় ঈর্ষাপরতন্ত্র, তাঁদের সমালোচনা বা শ্লেষ উভয়ই নিরর্থক। "কংগ্রেস্ কিছু নয়"নহে,—বিলক্ষণ কিছু। কংগ্রেসের কৃতিত্ব আছে। কিন্তু, সে কৃতিত্ব ইংলণ্ডের নিজের, ভারত বর্ষের নিজের নহে।

ভারতবর্ষীয় ভাবে কংগ্রেস্ "জাতীয়" জিনীস নহে—হইতেই পারে না। তথাচ যদি সেই ভাবে "জাতীয় সমিতি" বলা হয়, সে কেবল জোর করিয়া বলা। কারণ, কংগ্রেস যে প্রকৃতির জাতীয় সমিতি, সে প্রকারের প্রকাণ্ড ও 'পাঁচ মিশিলি' জাতি ও জাতীয়তা হিন্দুস্থানে পূর্ব্বে কখনও ছিল না; হিন্দুর বেদ ও মুসলমানের কোরাণে তাহা নাই এবং বেদ ও কোরাণ উভয়ের কাহারও আদেশানুসারে এখন তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না; তথাচ এই কংগ্রেস্ "জাতীয় সমিতি"ই বটে। কিন্তু সে 'জাতি' বা 'জাতীয়তা' ইংরেজের শাসন প্রণালী ও ইংরেজী ভাষা কর্ত্তৃক সৃষ্ট অভিনব ও আধুনিক জাতি বা জাতীয়তা। তাহা, সম্যক রূপে শাসননৈতিক জাতীয়তা, আপাতত সামাজিক ও ধর্ম্ম-নৈতিক জাতীয়তা নহে। পুনশ্চ, আপাতত উহা ইংরেজী শিক্ষিতেরই জাতীয়তা, অশিক্ষিতের জাতীয়তা নহে। কারণ অশিক্ষিত ইংরেজ শাসনাধীন হইয়াও ঐ সভার সদস্য ভাবে নাই বা অতি-অল্পই আছে।

কিন্তু, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে (যাহাই বল) এই জাতি-শাসন-নৈতিক জাতীয়তা ও ইংরাজী শিক্ষিতের জাতীয়তা যদি অচিরাৎ বা কালক্রমে,সামাজিক ও ধর্ম্ম-নৈতিক জাতীয়তায় সংযুক্ত ও সম্মিলিত হয়, এবং ইংরেজী-শিক্ষিতের এই কাংগ্রেসিক জাতীয়তা ইংরেজী অশিক্ষিত অগণিত জন সাধারণের জাতীয়তায়ও পরিণত হয়, তাহা হইলেই, য়ুরোপীয় হিসাবে, ভারতবাসীর পুরাপুরী একজাতিত্ব—ঐতিহাসিক অখণ্ড একজাতিত্ব সাব্যস্ত হইতে পারে। এবং সেই অসম্প্রদায়িক, আকাশভেদী ইংরেজী বা যাবনিক একজাতিত্বে জীবন্ত ও বলীয়ান হইয়া যদি হিন্দুস্থান এক দিন দণ্ডায়মান হইতে পারে তাহা হইলে, যে যৎসামান্য রাজনৈতিক অধিকারের জন্য কংগ্রেস্ আজ কোলাহল ও কাঁদাকাটা করিতেছেন, তাহা পাইতে ক্ষণ মাত্র বিলম্ব ত হয়ই না, তাহা অপেক্ষা আরও অনেক উচ্চাধিকার আসিয়া আপনা হইতে উপস্থিত হইতে পারে।

কিন্তু, সে রূপ অখণ্ড ও পূর্ণ একজাতিত্ব 'অন্তত, আপাততঃ কংগ্রেসের অভিপ্রেত নয়। কারণ সে অভিপ্রায় হইলে, কংগ্রেস্ এখন, মুহূর্ত্ত কালও টিকিতে পারে না। পরন্তু, ইংরাজী শিক্ষা এখনও তাদৃশ বিস্তার ও বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই, যাহাতে করিয়া তদ্রূপ অসাম্প্রদায়িক ও সামাজিক ব্যবধান-বিরহিত একজাতিত্ব, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংস্থাপিত হইতে পারে। ইংরাজী শিক্ষা যে পরিমাণে বিস্তৃত ও ইংরেজী শিক্ষার শক্তি যে পরিমাণে বিকশিত হইয়াছে, তাহারই ফল এই শাসননৈতিক একজাতীয়তা-মূলক এই "জাতীয় মহা সমিতি" বা কংগ্রেস্। অগ্রেই বলিয়াছি এ জাতীয়তা অভিনব ও ইংরেজী-মূলক। যে প্রকৃতির জাতীয়তা এদেশে কখনও প্রচলিত ছিল না, ইংরাজী শাসন ও ইংরেজী শিক্ষা তাহা অন্তত, আমাদের কতক লোককে দিয়াছে। একটী জাতিকে বা ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি জাতিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র

প্রকৃতির একটী জাতিত্ব প্রদান করা বড় সোজা কথা নয়। অতএব এস্থলে ইংরেজী-রই শক্তি শরণীয়।

কিন্তু, ইংরেজ ইতিহাস লেখক ও সংবাদ-পত্র-সম্পাদক যে বলেন, হিন্দু-জাতি কখন এক জাতি ছিল না; ইহাও মহা ভ্রম। হিন্দু হিন্দু-জাতিই ছিল এবং এখনও আছে এবং ধর্ম্ম-বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত ও বিজাতীয় বর্ণ সঙ্কর‍ত্ব প্রাপ্ত না হইলে, বোধ হয়; ভবিষ্যতেও থাকিবে। তবে, হিন্দু মুসলমানে ও খ্রীষ্টানাদিতে মিলিয়া এক জাতি ছিল না বটে। নহিলে হিন্দু, হিন্দুই ছিল ও মুসলমান মুসলমানই ছিল। তাহা, য়ুরোপীয় হিসাবে, এক-জাতিত্ব না হইতে পারে; কিন্তু, এদেশীয় হিসাবে, এক জাতিত্ব ভিন্ন দ্বিজাতিত্ব নহে। তবে, হিন্দু জাতির মধ্যে বহু শাখা বহু সম্প্রদায় আছে, আচার ব্যবহার আহারাদি-গত পার্থক্য আছে, ইহা সত্য। কিন্তু কেবল এক আহার ব্যতীত আর সকল বিষয়ে সে রূপ পার্থক্য মুসলমান ও খ্রীষ্টান জাতির মধ্যেও বিলক্ষণ বিদ্যমান।

শিক্ষিত হিন্দুদিগের মধ্যে অল্প সংখ্যক ও মুসলমানদিগের মধ্যে বোধ হয় তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক এমন অনেক আছেন, যাঁহারা বলেন "যে কঙ্গ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলন অনুষ্ঠানে এদেশীয়দের জাতি ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, যাহা আছে "শাসন নৈতিক জাতীয়তা, তাহা ক্রমে সামাজিক ও ধর্ম্ম-নৈতিক এক জাতিত্বে মিশিয়া গিয়া সব "একাকার" হইয়া যাইবে, অতএব কঙ্গ্রেস্ যত শীঘ্র কৃষ্ণ প্রাপ্ত হয়, ততই এ দেশীয়দের কল্যাণ, কেহ কঙ্গ্রেসের কাছে ঘেঁষিও না, কঙ্গ্রেস্ জাতি খাবার কল, তাহা জাতি ভ্রষ্ট জন কতক লোকের কুহক বই আর কিছুই নয়, ইংরেজীও জাতি মারা বিদ্যা; অতএব, ইংরেজী না পড়াই উচিত।" কঙ্গ্রেস্-বিরোধী মুসলমান বলেন, ইংরেজী স্পর্শেও পাপ আছে। হিন্দু বলেন, ইংরেজীই এদেশীয়দের অধঃপাতের কারণ জাতি নাশ করিয়া সব একশা করার শক্তি ইংরাজীতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আছে। ইংরাজ রাজনীতির গৌণ ও গুপ্ত উদ্দেশ্য সব একাকার করা,—ম্লেচ্ছ খ্রীষ্টান করা। কারণ, তাহা হইলেই রাজ্য শাসনের সুবিধা হয়, ও কোনও কালে রাজ্য নাশের শঙ্কা থাকে না। সমগ্র হিন্দুস্থান, এখনি ম্লেচ্ছ হউক্, দেখিবে, রাজনৈতিক সত্বাধিকারের কোন অভাব থাকিবে না। রাজা তখন প্রত্যয় করিবেন, রাজ-প্রসাদ দিতে ইতস্ততঃ করিবেন না। ইংরাজী 'বিস্তারের' 'পলিসি' জাতি নষ্ট করা, কঙ্গ্রেসের পলিসিও জাতি ধর্ম্মের বিলয় করা। অতএব সাবধান, এ উভয় হইতেই দূরে থাক। অপার্য্যমাণে ইংরাজী যদিও পড়, খবরদার কঙ্গ্রেসের কাছে কেহ ঘেঁষিও না। হিন্দুর হিন্দুত্ব ও মুসলমানের মুসলমানত্ব বজায় থাকিলে, অটুট অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে, এক দিন না এক দিন তাহাদের সময় আসিলেও আসিতে পারে, পরাধীনতার দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন হইলেও হইতে পারে, জাতি ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকিলে, তাহা হওয়াই খুব সম্ভব, তবুও যদি তাহা না হয়, তাহাতেও অনিষ্ট নাই। জাতি ধর্ম্ম অব্যাহত থাকিলে, আপাতত ঐহিক মঙ্গল না হউক্, ভবিষ্যতে পারত্রিক কল্যাণ, —আধ্যাত্মিক উন্নতি,—স্বর্গ, অপবর্গ, বৈকুণ্ঠ-বাস বা '[illegible]' নিশ্চয়ই হইবে। অতএব, প্রলোভে পড়িয়া পতঙ্গবৎ পুড়িয়া মরিও না। ঐহিক পারত্রিক উভয়ই হারাইও না। ঐহিক

উন্নতির জন্য জাতি-ধর্ম্ম নষ্ট করিলে পরকালে নরকে পুড়িয়া মরিবে। ইংরেজীর উন্নতি-আকর্ষণ ও কঙ্গ্রেসের কুহক কুমন্ত্রনায় কেহ অনন্ত নরকের পথে উঠিও না।' ইত্যাদি।

কথন কিছু স্পষ্ট, প্রায়শঃ অস্পষ্ট স্বরে উপরি-উক্ত মর্ম্মাত্মক উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা, 'অর্থোডক্স' হিন্দু বা মুসলমানের উক্তি। হিন্দু, হিন্দুভাবে, ও মুসলমান তাঁহার নিজের মুসলমানীয়ভাবে, কঙ্গ্রেস্ ও ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে ঐ রূপ বলিয়া থাকেন ও ঐ প্রকারের অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন। মুসলমান অভিমতের আর এক মাত্রা অতিরিক্ত আছে, তাহা যাউক্। কঙ্গ্রেস্-ক্যাম্পে এ মত, অশিক্ষিতের অভিমত বলিয়া উক্ত। আমরাও আপাতত এ মত রীতিমত পরীক্ষা করা প্রয়োজন মনে করিতেছি না। সংক্ষেপত ইহা বলিলেই এখন প্রচুর হইবে যে, উপরোক্ত অভিমত শিক্ষিতের বা অশিক্ষিতেরই হউক্, 'অর্থোডক্স' বা অতিরঞ্জিত হউক, ইহা এ দেশীয় অসীম রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মত এবং এক মাত্রা কূটনীতি-প্রবণও তাহাতে সন্দেহ নাই। পরন্তু, ইহার অনুদারতাও উগ্র একদেশ-দর্শিতা সত্বেও ইহাতে আত্ম-রক্ষা-মূলক এক মাত্রা উচ্চ"পলিটিক্সের" আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। অপিচ, এবম্বিধ অত্যুগ্র অভিমত যতই অনুদার ও একদেশদর্শী হউক্, ইহা সঞ্চালিত হইতে দেখিলে রাজ-শক্তি কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হন, সুতরাং শাসন-দণ্ড সম্প্রসারণ করিয়াও ইহাকে সম্ভ্রম করিয়া থাকেন। তাঁহার কারণ এই যে, এই রূপ ঐকান্তিক আত্ম-কেন্দ্র-পরতন্ত্র প্রবৃত্ত সংকীর্ণ নীতি হইতে সহসা সংক্ষোভ উপস্থিতির সম্ভাবনা। সঙ্কীর্ণতাতে স্বভাবত সুতীক্ষতা অধিক; অনুদারতার উগ্রতা উদারতার অপেক্ষা অনেক অধিক। রাজনৈতিক ইতিহাসে, ধর্ম্মোন্মত্ততার পরাক্রম ও প্রসার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রমাণিত। সুতরাং আশ্চর্য্য নহে যে, রাজ-শক্তি রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা ধর্ম্মান্দোলন ও ধর্ম্মাভিমতের প্রতি অধিকতর সতর্কতা, সম্ভ্রম ও শঙ্কার সহিত লক্ষ করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিশাল কঙ্গ্রেস্ অপেক্ষা সামান্য গোরক্ষিণী সভা গবর্ণমেণ্টের অধিকতর মনোযোগ, সতর্কতা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করে। ফলত রাজ-নীতির নিকট সর্ব্বজন-বিদিত, সম্ভ্রান্ত ইণ্ডিয়ান্ ন্যাসানাল্ কঙ্গ্রেস্ অপেক্ষা একটী অপরিচিত নগণ্য গোরক্ষিণী সভার শক্তি অধিক। অতএব সর্ব্বজাতিক জাতীয় কঙ্গ্রেস্-সভা গবর্ণমেণ্টের বরং উপেক্ষণীয় হইতে পারে; কিন্তু, অজ্ঞাতনামা কোন হিন্দু গোরক্ষিণী সভা বা তৎসদৃশ কোন মুসলমান সমিতিকে উপেক্ষা করিবার অবসর নাই। কঙ্গ্রেস্ যাহা কিছু করিয়াছেন ও করেন, তাহা সমস্তই ইংরেজীর সহায়তা দ্বারা হইয়াছে ও হয়, কিন্তু, গরিব গোরক্ষিণী সভার ন্যায় কোন সভা যাহা করিতে পারে, তাহাতে ইংরেজ ও ইংরেজীর এক বিন্দুও আবশ্যক হয় না। তাহা আপনার আভ্যন্তরীণ শক্তিতেই সমূহ শক্তিমান, স্বকার্য্য-সাধনে পরকীয় শক্তির উপর নির্ভর করে না। কিন্তু, কঙ্গ্রেস্ ভারতীয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমিতি হইয়াও, সর্ব্বাংশে, ইংরেজের ও ইংরেজীর শক্তি সাপেক্ষ। তোমার আমার তুচ্ছ, ইংরেজী-শিক্ষিতের উপেক্ষিত ক্ষুদ্র গোরক্ষিণী সভা আপনার অশিক্ষিত ও অমার্জ্জিত শক্তি সঞ্চালনে, অল্প-সময়ে ও অত্যল্প ব্যয়ে বা বিনা ব্যয়ে সমগ্র হিন্দুস্থানের হিন্দু একত্র করিতে পারে, উত্তেজিত ও

রণোন্মত্ত করিতে পারে। কিন্তু, কঙ্গ্রেস্ বার বৎসর কাল বহু ব্যয় ও বহুতর বক্তৃতা করিয়াও স্বল্প সংখ্যক ইংরেজী অভিজ্ঞ লোক মাত্র এক স্থানে একত্র করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অথচ কঙ্গ্রেস্ কত বড় প্রকাণ্ড কাণ্ড এবং গোরক্ষিণী সভা কতই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান।

অতএব রাজনৈতিক দৃষ্টিতে,'অর্থোডক্স' অভিমত, আন্দোলন ও অনুষ্ঠান আদৌ উপেক্ষণীয় ও অগ্রাহ্য নয়। প্রত্যুত তাহাই অধিকতর অনুধাবন ও আলোচনার বিষয়। কারণ, তাহার শক্তি চিরন্তন ও সনাতন সংস্কার মূলক,সুদৃঢ় স্বাভাবিক শক্তি। পক্ষান্তরে, কঙ্গ্রেসের শক্তি ইংরেজী সাহিত্য ও য়ুরোপীয় রাজনীতি হইতে অনুকৃত artificial) বা অল্পাধিক পরিমাণে কৃত্রিম শক্তি। কঙ্গ্রেসের রাজনৈতিক অন্দোলনে গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন; নিশ্চিন্তই আছেন। কারণ, তাহা constitutional; রাজ-বিধি ও আইন কানুনানুবর্ত্তী. অতএব, নির্বিঘ্ন। কঙ্গ্রেস যাহা চাহে, আপাতত যে শাসন-সংস্কার ও প্রজাই সত্বাধিকার প্রার্থনা করে, তাহা এমন কিছু বৃহৎ বিষয় নয়, যাহা একেবারেই দেওয়া যাইতে না পারে;—অনুগ্রহ ও দয়া করিয়া তাহার কিছু কিছু ক্রমে ক্রমে দিলেই চলিবে। আর তাহার কিছু মাত্রও না দিলেও কোন অনিষ্টাশঙ্কা বা সাধারণ সংক্ষোভের সম্ভাবনা নাই। কেবল, কাঁদাকাটা, constitutional agitation মাত্র করিবে; তাহার অধিক কঙ্গ্রেসের সম্বল নাই; সামর্থ্যও হইবে না। কঙ্গ্রেস্কারী অস্ত্র ধারণে অক্ষম; নিরস্ত্র সমগ্র জাতির সহিত তাহার শরীরের emasculation একরূপ হইয়াই গিয়াছে। পরন্তু, উদার ইংরেজী শিক্ষা, অবাধ চিন্তা, ও য়ুরোপীয় আদর্শ ও অভ্যাসের প্রভাবে, স্বদেশীয় সংস্কার সম্বন্ধেও তাহার চিত্ত মনের emasculation সংঘটিত; অতএব অত্যুগ্র স্বধর্ম্ম-বিশ্বাস-জনিত যে প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা, ঐকান্তিকতা-জনিত সুপ্ত শক্তির উত্তেজনা, তাহারও সম্ভাবনা নাই। অপিচ, কঙ্গ্রেসের অত্যুচ্চ আকাঙ্ক্ষা',-সে রূপ-আকাঙ্ক্ষা যদি কস্মিন্ কালে কখনও আদৌ অভিব্যক্ত হয়,—আয়র্লণ্ডের আকাঙ্ক্ষিত "হোম রুল" ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন-তন্ত্রের ন্যায় ভারতীয় পার্লামেণ্ট, বড় জোর "ইংলিস্ সিটিজন গিপের" অনুরূপ সত্বাধিকারের অধিক নয়। কল্পনা যত দূর যাইতে পারে, কঙ্গ্রেসের চরম আকাঙ্ক্ষা-এই,—ইহার বেশী নয়। কিন্তু, এ আকাঙ্ক্ষা বিকাশ লাভ করা বহুকালের কথা, আগামী নূতন শতাব্দী সমাপ্ত হওয়ার পরে ভিন্ন পূর্ব্বে নহে; কঙ্গ্রেস্ যদি ততকাল থাকে ও আত্ম-ক্ষেত্রে তদনুরূপ উন্নতি দেখাইতে পারে, তবেই; নহিলে নহে। ফলত কঙ্গ্রেসের চরম উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা-কল্পনা করিয়া লইলেও তাহা constitutional ও ইংরেজী পন্থা-পরতন্ত্র; অতএব কঙ্গ্রেস্ সময়ে সময়ে, ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের বিরক্তির কারণ হইলেও, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কোন চিন্তার কারণ হইতে পারে না। কারণ কঙ্গ্রেস ইংরেজের স্বকীয় শক্তি হইতেই উদ্ভূত এবং সর্ব্বাংশে সেই শক্তি-সাপেক্ষ। ইংরেজী শক্তি ব্যতীত কঙ্গ্রেসের আত্মশক্তি অল্পই আছে, অথবা কিছুই নাই।

উপরে উল্লেখ করিয়াছি, "কঙ্গ্রেস্ আপাতত শাসনৈতিক জাতীয়তা-মূলক জাতীয়-মহা-সমিতি। সমগ্র বৃটিস ইণ্ডিয়া ও তাহার অধিবাসী ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী

ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায়স্থ প্রজা জাতি একই রাজ-শক্তিতে, একই রূপ শাসন-প্রণালী দ্বারা শাসিত, প্রায়ই এক প্রকার বিধি ব্যবস্থায় বদ্ধ; অতএব সমগ্র বৃটিস ভারতের প্রজা মাত্রের সকলেরই সুখ দুঃখ, সমান ও মোটের উপর এক, সকলেরই অভাব,আকাঙ্ক্ষা ও অভিযোগ, রাজনৈতিক হিসাবে, প্রায় একই রূপ। কাজেই সম-শাসন-সূত্রে ইহারা সকলেই পরস্পরে সম-বেদনা যুক্ত। এখন, সম-শাসনের একতা ও তজ্জনিত সমবেদনার একতা নিবন্ধন যে জিনীস তাহাই আপাতত ইহাদের জাতি-ত্বের একতা, অর্থাৎ প্রজানৈতিক রাজনৈ-তিক বা শাসন-নৈতিক জাতীয়তা,—কি-না Political Nationality. এ দেশীয়েরা যখন রাজার জাতি নহে, এবং এখন রাজ-শক্তি-বিহীন, তখন এ জাতীয়তাকে রাজনৈ-তিক বা শাসননৈতিক জাতীয়তা না বলিয়া বরং প্রজানৈতিক জাতীয়তা বলা বোধ হয়, বরং প্রকৃত অর্থপ্রদ। যাহা হউক্, এই জাতীয়তা-সূত্রে আমাদের এই কঙ্গ্রেস্ এবং কঙ্গ্রেসে শুভ সম্মিলন ও সৌভ্রাত্রালিঙ্গন। একই দায়ে ঠেকিলে, একই দণ্ডে দণ্ডিত হইলে, ও একই পাকে পড়িলে, যেমন হস্তী ও পিপীলিকা, সিংহ ও শশক, ব্যাঘ্র ও মৃগ, সর্প ও ভেক, মার্জ্জার ও মূষিক মিলিত হইয়া এক জাতি হইতে পারে, এ স্থলে, অবশ্য ঠিক সে রূপ নয়; তবে ইষন্মাত্রায় সেই রূপ বটে; নহিলে জমিদারে রায়তে, খাদকে ও খাদ্যে, ধন-কুবেরে ও কাঙ্গালে, সম্পদে ও শ্রমে, হুজুরে ও তাঁবেদারে, গোঁসায়ে ও গোলামে, ব্রাহ্মণে ও যবনে কি রূপে এক জাতির জাতীয় কঙ্গ্রেস্ হইতে পারিত?

একদায়ে দায়গ্রস্ত হইয়াই এই জাতীয়তা। অতএব সেই দায় যতটা যায়, ততটা পর্য্যন্ত এই জাতীয়তার সীমা, তাহার অধিক নয়। এখন সেই সীমাই আমরা গ্রহণ করি ও তাহারই অভ্যন্তরে থাকিয়া আলোচ্য বিষয়ের পরীক্ষা করি। সে সীমার বাহিরে বেশী যাইব না; গেলে, পরস্পর-বিরোধী-স্বার্থের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া সঙ্কটাপন্ন হইতে হইবে।

প্রজানৈতিক, অথবা অপর কথায়, বৈষয়িক সমবেদনা হইতে এই জাতীয়তা বা একতা উৎপন্ন হইয়াছে। সামাজিক সম-বেদনার সহিত আপাতত ইহার সংস্রব নাই; পূর্ব্বে বলিয়াছি, পরে আরও কিছু বলিব। আপাতত বৈষয়িক সমবেদনাই ধরা যাউক্; —সমতা নহে, তাহা নাই; তাহা প্রায় স্বভা-বতই অসম্ভব।

এখন, এই বৈষয়িক স্বার্থের সমবেদনা যতটা ধরিয়া কঙ্গ্রেসের জাতীয়তা সংস্থাপিত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণীত করা হইয়াছে, তাহা, ভাবিয়া দেখিলে, অতি অল্পকালই টিঁকিতে পারে। জমিদারে ও রায়তে মূল-ধনে ও শ্রমে বৈষয়িক স্বার্থের সমবেদনা, কতটুকু ও কি রূপ বলুন দেখি? দৃষ্টান্ত স্বরূপ জমিদার ও কৃষকই এ স্থলে গ্রহণ করুন। ইহাদের বৈষয়িক স্বার্থের সমবেদনা ইণ্ডিয়ান্ পেনাল্ কোড, অস্ত্র আইন, লব-ণাদির কর, পুলিষের অত্যাচার,—সামরিক ব্যয়, শাসন ও বিচারের বা দেওয়াণী ও ফৌজাদারির একতান্ত্রিকতা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে, অবশ্যই অল্পাধিক পরিমাণে আছে। কিন্তু, সেই স্বার্থগত সমবেদনা বেঙ্গল টেনেন্সী অ্যাক্ট সম্বন্ধীয় স্বার্থগত বৈষম্য বিরোধের তুলনায় প্রায় কিছুই নয়। রায়ত রক্ষার

উদ্দেশ্যে যখন ঐ প্রজাস্বত্ব আইনের অনুষ্ঠান হয়,—(বেশী নয় ১৩।১৪ বৎসরের কথা) তখন জমিদার পক্ষ হইতে কিরূপ আকাশ-পাতালভেদী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, আমাদের অনেক পাঠকেরই মনে থাকিতে পারে। রায়ত পক্ষ সমর্থনের কেহই প্রায় ছিল না; ছিলেন কেবল গবর্ণমেণ্ট। তথাচ, লর্ড রীপন, এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ানী ইলবার্ট বিল আন্দোলনে যেরূপ,জমিদারদের কর্ত্তৃক,রেণ্ট বিল আন্দোলনেও, সেইরূপ হাড়ে হাড়ে কাঁপিয়াছিলেন। ইলবার্ট বিলের ন্যায়, রেণ্ট বিলেরও অনেক অত্যাবশ্যকীয় ধারা আন্দোলনের বিরাট ঝটিকায় ঝটিত বিষ্ণু-লোকে গমন করিয়াছিল। রেণ্টবিল, বিকলাঙ্গ হইয়া পাশ হইয়াছিল। তাদ্বরা রায়তি-স্বত্ব যতটুকু রক্ষিত হইয়াছিল, সেই পাপে, লর্ড রিপন প্রস্তর-মূর্ত্তি পাইলেন না; অথচ কত সিধু নিধু তাহা পাইয়াছে। সেইপাপে লর্ড রিপন ভূস্বামী ধনকুবেরদের নিকট হইতে এক বিন্দু বিদায়-অভিনন্দন পান নাই, বিষাক্ত নিন্দার বিদায়-নৈবিদ্য পাইয়াছিলেন। রিপন-ভক্ত ও রিপন-কলেজ-কর্ত্তা সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্গের "প্রিমিয়ার জমিদার" প্রিন্স, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ত এখন কোলাকুলি করিয়া কঙ্গ্রেসের প্রজানৈতিক বৈষয়িক একজাতীয়তা সংস্থাপন করিতেছেন,—(অতি সুন্দর পেট্রিয়টিক দৃশ্য সন্দেহ নাই) কিন্তু উপরোক্ত কথা কি এখন তাঁদের কিছু কিছু মনে পড়ে? অবশ্য পূর্ব্ব ও বিগত বৈষম্য-বিরোধ বিস্মৃত হওয়াই মহত্বের লক্ষণ। কিন্তু, এখনি যদি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট দুর্ব্বল রায়তের রতি পরিমিত উন্নতির জন্য বেঙ্গল টেনান্সী-অ্যাক্টের এক বিন্দু পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে অবস্থাটী কি রূপ দাঁড়ায়, কঙ্গ্রেস কোন্ পক্ষ অবলম্বন করেন? অসংখ্য দুর্ব্বল ও নিরন্ন কৃষক রায়তের পক্ষ কঙ্গ্রেস অবলম্বন করিলে, কঙ্গ্রেসের কোটি-বন্ধ ও স্কন্ধ-স্তম্ভ রাজা মহারাজাদি ভূমি-কুবের—কঙ্গ্রেসের ক্যাস বক্স গুলি কোথায় থাকেন? কঙ্গ্রেসের "কর্ম্মকাণ্ডের" বিরাট ব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহিত হয়? "জ্ঞান কাণ্ড" প্রকৃত ও পরমার্থ-প্রদ পদার্থ হইলেও, কঙ্গ্রেস-ক্ষেত্রেও ত কর্ম্ম কাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ডের উচ্চে এবং অগ্রে। অতএব অবস্থা যেরূপ দাঁড়ায় বেশ জানা যাইতেছে; সে দিন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিহার কেডাষ্ট্রাল সার্ভের প্রবর্ত্তনের সময়ে বিলক্ষণই জানা গিয়াছিল। কঙ্গ্রেসের প্রখর প্রজানৈতিকগণ প্রজা-মেধ-যজ্ঞে জমিদারের যজমানত্ব গ্রহণ করিয়া ঋত্বিকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পবিত্র প্রজাই-স্বত্বের নামে, প্রজার শোণিতাক্ত স্বার্থ জমিদার-যজ্ঞের জ্বলিত হোমানলে আহুতি অর্পিত হইতেছিল। সে হোমের প্রধান হোতা যিনি হইয়াছিলেন এবং সেই কৃষক-মেধ যজ্ঞের সর্ব্ব প্রধান যজমান যিনি ছিলেন, কে না জানে? কে না জানে, সে মহাযজ্ঞে, বঙ্গে ও বিলাতে কত অধ্যাপক বিদায় হইয়াছিল এবং পদ-বিদলিত বিহারী কৃষকের দাস-বৃত্তি বদ্ধমূল রাখিবার জন্য, রেণ্টবিল আন্দোলনের ন্যায়, সেদিনকার সার্ভে সেটেলমেণ্ট-আন্দোলনেও কৃষাণ শোণিত-শোষিত কি বিপুল অর্থ রাশি বাষ্প হইয়া উড়িয়া গিয়াছিল!

স্বার্থ-বৈষম্যের ও স্বার্থ-বিরোধের ইহা যদৃচ্ছা গৃহীত একটী দৃষ্টান্ত মাত্র। এমন অনেক আছে। এখন উল্লেখের আবশ্যক নাই। এই যে স্বার্থের কথা বলা হইল, সে

স্বার্থ কৃষক রায়ত সমাজের প্রাণের স্বার্থ—জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধীয় স্বার্থ, মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব সম্বন্ধীয় স্বার্থ, স্বাধীনতা ও দাসত্ব সম্বন্ধীয় স্বার্থ, সুভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় স্বার্থ; কোনও সখের স্বার্থ নহে, নাম মাত্র রাজনৈতিক অধিকার-সূচক স্বত্বও নহে। বরং সামাজিক বৈষম্য সত্ত্বেও,যবনে, ব্রাহ্মণে,চণ্ডালে ও চূড়ামণি মহাশয়ে এক জাতিত্ব সম্ভবে, (বিষয় ব্যাপারে সম্যক সদ্ভাব ও স্বার্থ-সমতা জনিত তাহা বিস্তর আছেও) কিন্তু, এবম্বিধ বৈষয়িক স্বার্থ-বৈষম্য বিরোধে ও খাদ্য খাদক সম্বন্ধে জাতিত্বের একতা কদাচিৎ সম্ভবপর। তথাচ, যে সকল স্থলে, এবম্বিধ বিরোধী সম্প্রদায়ে স্বার্থের সাধারণত্ব,সমতা বা একতা থাকে, সে সকল স্থলে,কাঙ্গ্রেসিক জাতীয়তা সূচিত ও সংস্থাপিত হইতে পারে, হউক, উত্তম। কিন্তু, অতঃপর কঙ্গ্রেস হইতে, কৃষক রায়ত সমাজের কৃষি-স্বার্থের কথা, একেবারেই ছাটিয়া ফেলা শ্রেয়। গত দুই বৎসরের বাৎসরিক অধিবেশনে, এ সম্বন্ধে কঙ্গ্রেস, কিয়ৎপরিমাণে, আয় সীমা নির্ণয় করিয়া বড় ভাল করিয়াছেন। উহা অধিকতর স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাবে করিলে আরও ভাল হইবে; তাহা হইলে আর কাহারও কোন কথা থাকিবে না। "কঙ্গ্রেস শিক্ষিত ভারতবাসীর জাতীয় সমিতি" কঙ্গ্রেস এত দূর এখন স্বীকার করিয়াছেন। অতঃপর, আর গুটী দুই কথা স্পষ্ট স্বরে ব্যক্ত করিলেই যেমন এক দিকে বিষয়টী বিশদ হয়, অপর দিকে তেমনি কঙ্গ্রেস কর্ত্তৃক কখনও কঙ্গ্রেস-বহির্ভূত কোনও সম্প্রদায়ের স্বার্থে আঘাত লাগিলে, কেহ কলঙ্ক আরোপ করিতে পারিবে না; অপিচ, আঘাত-প্রাপ্ত সম্প্রদায়েরও তাদৃশ অনিষ্টাশঙ্কা থাকিবে না। মহিলে, অপ্রকৃত প্রতিনিধিত্বে, পদে পদে, লোকের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। কঙ্গ্রেসের বিধিবদ্ধ "কনষ্টিটিউসন" নির্ম্মিত না হওয়াতে, সময়ে সময়ে, বাহিরের লোকেরও নেতাত গোল বাঁধিতেছে। কঙ্গ্রেসের একাদশ অধিবেশনে উহা হয় নাই; দ্বাদশ অধিবেশনেও হইল না। যাহা হউক, কোন কোন প্রেসিডেন্টের মুখে ব্যক্ত হইয়াছে "কঙ্গ্রেস ইংরাজী শিক্ষিতের সভা।" ইহা সত্য এবং প্রকৃত। অতঃপর যে সত্য ও প্রকৃত কথা বাক্যে (কার্য্যে হইয়াছে ও হইতেছে) ব্যক্ত ও ঘোষিত হওয়া উচিত, তাহা এই—"কঙ্গ্রেস শিক্ষিত ও ধনীদিগের বৈষয়িক স্বার্থের প্রতিনিধি।" "কঙ্গ্রেস কৃষিজীবী রায়তের জমি জমা সম্বন্ধীয় স্বার্থের প্রতিনিধি নহে।" এই একটী মাত্র কথা কঙ্গ্রেস কর্ত্তৃক স্বীকৃত এবং প্রকাশ্য ও বিশ্বস্ত ভাবে ব্যক্ত হইলে, অনেক গোল মিটিয়া যায়।

দেশের উপস্থিত অবস্থায় ও কঙ্গ্রেসের নিজের বর্ত্তমান গঠনে কঙ্গ্রেস যেমন হিন্দু বা মুসলমান সমাজের সামাজিক প্রতিনিধিত্ব করিতে অসমর্থ, তেমনি অসীম কৃষক সম্প্রদায়ের জমি জমা সংক্রান্ত স্বার্থের প্রতিনিধি হইতে অপারক। পরন্তু, উপস্থিত ক্ষেত্রে কঙ্গ্রেস বরং Capital বা মূল ধনের প্রতিনিধি হইতে পারেন,কিন্তু,কার্য্য গতিকে Labor বা শ্রম ও নিম্ন শ্রেণীর শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতিনিধি হইতে পারেন না। এ কথাও স্পষ্ট করিয়া বলা কঙ্গ্রেসের কর্ত্তব্য। তবে, এদেশে, এখনও য়ুরোপের ন্যায় ও য়ুরোপীয় অর্থে capital এর ও Labor এর তাদৃশ বিস্তার এবং (নীল ও চা ক্ষেত্রের অত্যাচার ও কুলী-চালানী পৈশাচিক ব্যভিচার ব্যতীত) ততটা বিরোধ উপস্থিত

হয় নাই। কংগ্রেসে কুঠিয়াল সম্প্রদায় যোগদান না করা পর্য্যন্ত (বোধ হয় করিবে না) কংগ্রেস কুলী স্বার্থ সমর্থনে সমর্থ হইবেন। কিন্তু কৃষক-স্বার্থ,বিশেষতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল নিচয়ের কৃষক-স্বার্থ (যাহা এদেশে Labor এর অপার নাম) সমর্থন ও সংরক্ষণে কংগ্রেস কখনও অন্ততঃ আপাততঃ সামর্থ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। অতএব সে কথা স্পষ্ট স্বীকার ও প্রচার করা একান্ত উচিত। নহিলে সেই নিরন্ন,নির্ব্বাক ও আজীবন অন্ন-কষ্ট-পীড়িত অসংখ্য প্রাণীর মহা অনিষ্ট ঘটিবে এবং কংগ্রেসের নিজেরও দুরপনেয় কলঙ্ক রটিবে। নির্ব্বাকের নিজের কথা যাহা নহে, তাহা যদি তুমি তাহারই নিজের প্রাণের কথা বলিয়া প্রতিপন্ন ও প্রচার কর,তাহা হইলে সে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারক হইবে না; কেহই তাহার প্রতিবাদ করিবে না; কৃষকের কে আছে? তোমার প্রমাদপূর্ণ প্রতিনিধিত্বে তাহার সর্ব্বনাশ ও তোমার কলঙ্ক হইবে। উপকার তোমার ও তাহার, কাহারই হইবে না। দুঃখীর দুঃখ ভার, দেশের দারিদ্র্য-ভার অধিক বর্দ্ধিত হইয়া কেবল বিলাসীর বিলাস-স্রোত আরও বেগে বহিবে।

পক্ষান্তরে, তুমি স্পষ্টাক্ষরে তোমার প্রতিনিধিত্বের প্রতারণা পরিত্যাগ করিলে তোমার নিন্দা হইবে না; প্রত্যুত প্রশংসাই হইবে। এবং সেরূপ স্থলে, কংগ্রেস যে স্বদেশীয় কৃষি-বলের একেবারেই কোন উপকার করিবেন না বা করিতে পারিবেন না,তাহাও নহে। সাধারণ রূপে, পৃথক পথে, কংগ্রেস কৃষি-বলের প্রভূত উপকার করিতে পারিবেন। যে সকল স্থলে, কৃষক রায়তের স্বার্থ দেশের অন্যান্য স্বার্থের সহিত সংলিপ্ত বা সমান, সে সকল স্থলে, সাধারণ কল্যাণের সহিত কৃষক শ্রেণীরও কল্যাণ হইবে। কেবল যে সকল স্থলে, জমীদারী স্বার্থের সহিত কৃষকের জমী জমা সংক্রান্ত স্বার্থের জীবন মরণ বৈষম্য ও বিশেষ বিরোধ, সেই সকল স্থলে কংগ্রেস জমিদার শ্রেণীর প্রকৃত প্রতিনিধি হওয়াতে ও কৃষক সম্প্রদায়ের অপ্রকৃত ও অনভিজ্ঞ প্রতিনিধি না হওয়াতে, কংগ্রেসের কথায় শেষোক্তের তত অসুবিধা হইবে না এবং তাহাদের কথঞ্চিৎ স্বার্থোন্নতি পথে বাধা পাইয়া গবর্ণমেণ্টও তত গোলে পড়িবেন না।

"বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন" প্রকাশ্যত জমিদার-স্বার্থ সংরক্ষণী সভা হইয়াও কি কখনও রায়ত শ্রেণীর কোন উপকার করেন নাই? কেন করিবেন না? জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে অনেক উপকার করিয়াছেন। কেবল যে সকল স্থলে জমিদারী স্বার্থের সহিত রায়তী স্বার্থের সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় ও হইয়াছে, সেই সকল স্থলেই, স্বীয় স্বভাব ও অঙ্গীকারানুসারে প্রথমোক্তের ইষ্ট ও শেষোক্তের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। ইহাতে উক্ত অ্যাসোসিয়েসন তত অপরাধী হইতে পারে না, কারণ জমিদারী স্বার্থ রক্ষাই তাহার অঙ্গীকৃত সংকল্প ও অস্তিত্বের কারণ। কিন্তু পক্ষান্তরে "ইণ্ডিয়ান-অ্যাসোসিয়েসন" প্রজা-স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিজ্ঞা করিয়াও ক্রমে ক্রমে এখন প্রায় দ্বিতীয় "বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান" বা বিহার-ল্যাণ্ড-হোলডারস-অ্যাসোসিয়েসনে পরিণত হইতেছে।

অতএব, বোধহয়,য়ুরোপের ন্যায়,এদেশে, অদ্যাবধি আসল "ডেমেক্রেটিক অ্যাসেমব্লী" সংগঠিত হওয়ার সময় উপস্থিত হয়

নাই। "সামাজিক সাম্য" যেমন এদেশে আদৌ অসম্ভব (এবং সম্ভবতঃ অশুভকর) তেমনি বৈষয়িক 'ডেমোক্রেসী' শুভকরী হইলেও, হয় ত এখনও অসম্ভব। কংগ্রেস নিজে যে গণনা গ্রহণ করিয়াছেন, তদনুসারেই, অস্মদ্দেশে কৃষিজীবীর সংখ্যা শত করা ৮০ জন। অতএব এই কৃষিবল লইয়া প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ এবং এই কৃষিবলই ভারতবর্ষের প্রকৃত সম্বল। কিন্তু, ভারতের এই ভগ্নাবশিষ্ট শক্তির যেরূপ সাংঘাতিক শোচনীয় অবস্থা, তাহার সবিস্তার বৃত্তান্ত কংগ্রেস বিলক্ষণই জানেন। পরন্তু, তাহার প্রত্যক্ষ, প্রজ্বলিত, দুরন্ত দেদীপ্যমান প্রমাণ,—এই করালমূর্ত্তি বর্ত্তমান—বর্ত্তমানের বহ্নি এবং বিষ—১৩০৩ সালের সর্ব্বান্তকরূপী মহা মন্বন্তর।

ভারতবর্ষের কৃষিবল বৎসরের প্রায় বার মাসই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, অভুক্ত, অর্দ্ধভুক্ত, পরন্তু, এ বৎসরের সমগ্র ভারত-ব্যাপী বিপুল দুর্ভিক্ষ-বহ্নিতে তাহারা, কৃষাণ কৃষাণী, কঙ্কালসার মানুষ মানুষী, শ্রমোৎপন্ন শস্য মাত্র উপজীব্য অসংখ্য প্রাণী, কিরূপে পতঙ্গবৎ পুড়িতেছে, তাহার হৃদয়-বিদারক চিত্র আমি এস্থলে অঙ্কিত করিতে বসিব না। সহৃদয় পাঠক প্রতিদিনই তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া মর্ম্মাহত হইতেছেন, হয় ত হাতের অন্নগ্রাস নিজের মুখে না দিয়া, অশ্রু-সিক্ত করিয়া, তাহা বহুদিন অভুক্ত ক্ষুধাতুরের মুখে তুলিয়া দিতেছেন! হয় ত অভাগা, সাগ্রহে প্রদত্ত আপনার অন্নগ্রাস গ্রহণ করিয়া গলাধঃকরণ করিতে পারিল না; কোটরস্থ নয়ন বহুদিনের পর অন্ন দেখিয়া উৎফুল্ল হইল, অভাগার আত্মা নিঃশব্দে আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিল; কিন্তু, হায়! শুষ্ক কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছে, শীর্ণদেহ অবশ হইয়াছে; প্রাণ বায়ুর অল্পাবশিষ্ট নিশ্বাসটুকু তখনি নিবিয়া গেল! আপনি, হয়ত, পুনঃ অন্ন লইয়া অন্য এক অভাগার মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। দুর্ভিক্ষের নিদারুণ দৃশ্য দিগ্বিদিকে আজ কাল দৃষ্ট, তাহার আলেখ্য উঠাইয়া দেখাইতে চাই না।

পরন্তু, কংগ্রেস এই উপস্থিত বিপদে যে ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন; তাহাও উল্লেখ করিব না। লজ্জার কথা, হৃদয়হীনতার কথা উল্লেখের অযোগ্য।

কংগ্রেস কৃষক সমাজের চিরস্থায়ী অন্ন ক্লেশ নিবারণ কল্পে যে কয়েকটী বাঁধা প্রস্তাব উক্ত ও পুনরুক্ত করেন, এবং এ বৎসর যে সম্বন্ধে যাহা কিছু ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা প্রচুর নহে। কেবল, সামরিক ব্যয় কমিলে, বা হোম চার্জ না থাকিলে, বা বাটা বৃত্তি না দিলে বা ধনীর ধনের টেক্স কমিলে বা ঐ প্রকৃতির অন্যান্য "ইকনমিক" প্রশ্ন উত্থিত বা মীমাংসিত হইয়া অসম্ভব সম্ভব হইলে, আমাদের আর যতই উন্নতি হউক, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, কৃষক শ্রেণীর ক্লেশ ও দেশের সংক্রামক দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইবার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু, গবর্ণমেণ্টের খাসমহল ও অস্থায়ী বন্দোবস্ত মহলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া, জমিদার ও জমিদারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেও (যাহার জন্য কংগ্রেস অতিশয় ব্যস্ত হইয়া বার বার রেজলিউসন পাস করিতেছেন) কৃষককুলের দুঃখ ঘুচিবে না, তদ্দ্বারা সে দ্রব্যটা বরং আরও অধিক স্ফীত হইয়া দাঁড়াইবে। অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই ইহা জানেন। ইহার প্রমাণও প্রভূত আছে। অতএব কৃষক-শ্রেণীর অর্থাৎ দেশের প্রায় তের আনা রকম, অথবা তাহারও অধিক

সংখ্যক লোকের সংক্রামক অন্ন কষ্ট নিবারণ বা প্রশমন করিতে হইলে প্রথমতঃ যে যে দিকে ব্যবস্থা করিতে হয়, কঙ্গ্রেস সে দিক স্পর্শ করিতেই সাহসী হইবে না। পক্ষান্তরে, অজগর গবর্ণমেণ্ট,পুনর্ব্বার সিপাই মিউটিনীর মত, অথবা তাহার অপেক্ষা বহু বিস্তৃত সমগ্র দেশময় আর একটী মিউটিনীর মুখ না দেখা পর্য্যন্ত, বোধ হয়, সে দিকে তাকাইবেন না। অতএব সে কথা এখন উপর-পড়া হইয়া, উত্থাপন করা, অরণ্য মধ্যে বৃথা রোদন করা মাত্র। অতএব সে কথা যাউক।

যে দেশে কৃষিজীবী লোকের সংখ্যা শত করা ৮০ জন, সে দেশ প্রকৃত প্রস্তাবে কাহাদের? হায়! যাহাদের দেশ, যাহাদের নিঃশব্দ নিরলস অবিশ্রান্ত শ্রমে দেশ রক্ষা হইতেছে, দেশের দশদিকে বিলাস-স্রোত বেগে বহিতেছে, তাহারাই কেবল, তাহারাই অহরহ অন্ন-কষ্টে কাতর; তাহাদের আপনার নিজের বলিতে কিছুই নাই! নিজের শ্রম-লব্ধ অন্নগুলির অগ্রভাগ, অধিক ভাগ, অপরের মুখে তুলিয়া দিয়া, আপনারা অর্দ্ধাশনে অনশনে কাটাইতেছে! অতীত, বিস্মৃত মুসলমান আমল হইতে, উপস্থিত বর্ত্তমান ইংরেজের আমল পর্য্যন্ত, দেশের বিপুল কৃষিবল দেশের সর্ব্বপ্রধান শক্তি পদদলিত, লুণ্ঠিত, প্রতারিত হইয়া আসিতেছে! যাহাদের দেশ, যাহাদিগকে লইয়া দেশ, তাহাদেরই দশা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়, তাহারাই সম্বলহীন, সম্মানহীন। কঙ্গ্রেসের পেট্রিয়ট বাবুও কৃষককে বলেন operative! কৃষক, কুলী, কলের চাকা, হালের গরু, গোলামের গোলাম, ভারবাহী গর্দ্দভবৎ ব্যবহৃত, অপমানিত, নিষ্পেষিত! কিন্তু, দেখুন! যত কালেই হউক, প্রকৃতির প্রতিশোধ আছেই। বহু শতাব্দের সুপ্ত শক্তি এক সময়ে অবশ্যই সময়ে জাগিবে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ করিবেন না। নিদ্রিত ও নির্জ্জীব যে দিন জাগিবে, সে দিন যে দুরন্ত আগুন জ্বলিবে, তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হইবে না। তদ্দ্বারা, হয়, কৃষি-শক্তির স্বাভাবিক স্বত্বাধিকার সংগঠিত ও সংস্থাপিত হইবে, নতুবা সমগ্র দেশ ভস্মসাৎ হওয়ার পর পুনঃ নূতন রাজ্যের পত্তন হইবে। সে দিনের বড় বেশী বিলম্ব আছে, তাহাও মনে করা যায় না। ভারতবর্ষের বিপুল কৃষি-বল যদি একান্তই আত্মশক্তিতেও সচেতন না হয়, য়ুরোপীয় উদার "ডেমোক্রেসী" তাহাকে উত্থিত করিবে। ইহা নিশ্চয়।

ইংরেজ শাসন ও ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারে অস্মদ্দেশে য়ুরোপীয় ধরণে নানা বিষয়ক স্বত্বের ও স্বার্থের সভা সমিতি উত্থিত হইলেও এবং সর্ব্বোপরি, রাজনৈতিক আন্দোলন ও প্রজানৈতিক স্বার্থের মহা কেন্দ্র কঙ্গ্রেস সভা আজ দ্বাদশ বৎসর কাল সংস্থাপিত হইলেও, অদ্যাবধি কৃষি-স্বার্থের ও কৃষক-স্বত্বের কোন সভা সমিতি দেখা যাইতেছে না; অথচ দেশীয় লোকের শতকরা ৮০ জন কৃষক। ইহার কারণ, কৃষক য়ুরোপীয় রাজনীতি আজও চিনিতে পারে নাই। হিন্দু ও মুসলমান কৃষক তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম চিনে; কিন্তু, রাজনীতি চিনে না; তাহার কোন সংবাদ রাখে না। যাহা তাহারা চিনে, তাহার জন্য প্রাণ লইয়া হাজির হয়। এই কারণেই হিন্দুর গোরক্ষিণী সভার এত জোর, মুসলমানের মহরমে মসজিদে এত মায়া, যে তজ্জন্য তাহারা মৃত্যুকে অতি তুচ্ছ মনে করে। তাহাদের মুখের অন্ন পরে কাড়িয়া খায়, ইহা যে তাহারা খুব

নাই। করে, তাহাও নয়; মুখের অন্নে যদি কাহারও মমতা থাকে, দরিদ্র কৃষকের তাহা বিলক্ষণই আছে; কারণ তাহার প্রত্যেক শস্য-কণা কৃষকের স্বেদ ও শোণিত হইতে উৎপন্ন। কিন্তু, অদৃষ্ট ও অদৃষ্টবৎ অপরিজ্ঞাত রাজনীতির ও দুরন্ত দেশাচারের কি রূপ বৈষম্যে, কোন বিভ্রাটে যে তাহাদের অনন্ত দুঃখ, তাহা তাহারা জানে না। আপন আপন দুর্দ্দশাকে প্রারব্ধে ও কিসমতের ক্রোড়ে শোয়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। রাজবিধি, শাসন নীতি ও বিসদৃশ বৈষয়িক লোক-ব্যবহারাদিকে তাহারা অদৃষ্ট বলিয়াই বুঝে,তাহাদের প্রতারক ও প্রপীড়কগণ, ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াও দেয় তাই, আবহমান কাল হইয়া আসিতেছে তাই; কাজেই তাহারা অনড়, অচল। কিন্তু, রাজনীতি অন্ততঃ ইংরেজ-রাজনীতি যে একেবারে প্রারব্ধবৎ অপরিবর্ত্তনীয় নহে, শাসননীতি যে ন্যায় ও প্রজা সাধারণের অভিমত মানিয়া চলে, বিসদৃশ ব্যবহার, ভূমির স্বত্বাধিকার ও তন্নিবন্ধন অত্যাচার যে ভগবানের নিয়ম নহে, মনুষ্য-কৃত কৌশল, অতএব একান্ত অখণ্ডনীয় নয়; পরন্তু, রাজদ্বারে যে সমষ্টি ভাবে কৃষক কুলীরও সম্ভ্রম আছে, গুরুত্ব আছে, সুবিচার প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে; তাহা তাহারা জানে না; এক কথায় রাজ-নীতি তাহারা চিনে না। কাজেই স্রোতের শৈবালবৎ ভাসিয়া বেড়ায়। তারপর রাজশক্তি, আইনের সহায়তা নিকটস্থ করিয়া দিয়াছেন, বিচার গৃহের দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছেন সত্য, কিন্তু, হায়! কত সময়ে আইন নিজেই ভ্রান্ত, পদে পদে বিভ্রাট-ময়! বিচারালয় চাতুরীর বারদ্বারী গৃহ। উকিল ঠকায়, মোক্তার ঠকায়, আমলা ঠকায়, পিয়াদা ঠকায়, ধর্ম্মাধিকরণ প্রতারণার পঞ্চতীর্থ! তথায় সবল মিথ্যার জয়, দুর্ব্বল সত্যের পরাজয়। তথায় উৎকোচ ও শঠতা ও কৌশল জাল দিনকে রাত্রি, রাত্রিকে দিন করে। শস্য-ক্ষেত্রের সরল শ্রমজীবী তাহা একবার দেখিয়াই আজীবন অতঙ্কে শিহরে; মনে করে, উহাও তাহার কিসমত। শত অত্যাচার, পীড়ন, প্রবঞ্চনা নীরবে সহ্য করে, প্রতিকার প্রত্যাশায় পার্য্যমানে আইনের পানে তাকায় না। আইন, তাহার নিকট, অত্যাচারের অন্যতম যন্ত্র; অত্যাচারীই তাহাকে আইনেও আকৃষ্ট করিয়া নিষ্পেষণ করে।

ইহা রাজবিধির ব্যভিচার, বিচার গৃহের অবৈধ বিড়ম্বনা,—রাজশক্তির উদ্দেশ্য নহে, রাজনীতি আরও উচ্চে, তাহার নিকট এ ব্যভিচার-বিড়ম্বনারও প্রতিকার আছে, শাসন সঙ্কট একেবারেই অচিকিৎস্য ব্যাধি নহে, অত্যাচার, অনাচার, অবৈধ অন্যায় ও অস্বাভাবিক ব্যবহার মাত্রই প্রজাপুঞ্জের সমষ্টিত শক্তি দ্বারা প্রতিকার-সাধ্য; রাজশক্তি সমষ্টিত প্রজা-শক্তি উপেক্ষা ও অবহেলা করেন না এবং কৃষি-বলই এদেশের সর্ব্ব প্রধান প্রজা শক্তি, কৃষক সমাজ ইহা জানে না; তাহারা নিজের অপরিমেয় শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, প্রজা-শক্তি বুঝে না, রাজনীতি চিনে না! কংগ্রেসের উচিত ছিল চিনাইয়া দেওয়া, বুঝাইয়া দেওয়া। কিন্তু, কংগ্রেস তাহা দেন নাই, দিতে পারেন না; দিতে সাহসী নন। দিতে হইলে,কংগ্রেসের কতক গুলি স্কন্ধ-স্তম্ভ খসিয়া পড়ে, ক্যাসবাক্স বাহির হইয়া যায়। পরন্তু, প্রভুত্ব ও সম্পদ-আকাঙ্ক্ষী শিক্ষিতের স্বার্থেও আঘাত লাগে। সুতরাং তাহা অসম্ভব।

সুতরাং কঙ্গ্রেসের সহিত সুবৃহৎ কৃষক সমাজের খাঁটী-স্বার্থের সংশ্রব ও সম্বন্ধ নাই। তাহা থাকিলে এই দ্বাদশ বৎসরে কঙ্গ্রেসের শক্তি যেরূপ দাঁড়াইত, তাহা কেবল অনুমেয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কৃষি-বল অর্থাৎ দেশের সর্ব্ব প্রধান শক্তি কঙ্গ্রেসের সংশ্লিষ্ট নহে। অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে সংশ্লিষ্ট নহে। তবে কল্পনা করিয়া, জোর করিয়া যদি সে শক্তি সংশ্লিষ্ট আছে, বলা হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। শক্তি শক্তির পরিচায়ক; বাক্য বা কল্পনা নহে।

কঙ্গ্রেস হইতে কৃষিবল বাদ দিলে, দেশের লোকের শত করা ৮০জন লোক বাদ পড়ে। অবশিষ্ট থাকে ২০ জন। এই ২০ জনের মধ্যে যদি পাঁচ জনকে শিক্ষিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও বোধ হয় বিস্তর। এখন ইংরেজী শিক্ষিত মাত্রেই যে কঙ্গ্রেসে যোগ দিয়াছেন বা উহার সহিত সমবেদনা যুক্ত, নানা কারণে এমন, বোধ হয়, বলা যায় না। ঐ পাঁচজনের মধ্যে যদি এক জনকেও "কঙ্গ্রেস ম্যান" বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত সংখ্যা অপেক্ষা বোধ হয় কম হইবে না; কিছু বেশীই হইবে। অতএব কেবল সংখ্যার হিসাবে ধরিলে কঙ্গ্রেসের শক্তি এই। দেশের লোক-সাগরের অনুপাত ধরিলে, এ সংখ্যা খুবই কম, নেহাতই microscopic minority, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাচ এই শত করায় স্বল্প সংখ্যকেরও সমষ্টি করিলে সঙ্কলন-ফলটী বড়কম দাঁড়ায় না। তাহার উপর যখন দেখা যায় যে, সেই সমষ্টি, ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্ষীর এবং সর স্বরূপ, শিক্ষিতের মধ্যেও অধিকতর শিক্ষিত বাছা বাছা বিদ্বান লোক, পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত লোক, এবং ধনবান লোক, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, পরম শত্রুও স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, কঙ্গ্রেস শক্তিহীন সামগ্রী নহে। শক্তি যতই অল্প হউক, যতই ক্ষীণ হউক, যতই অস্পষ্ট ও অপ্রাপ্ত-বিকাশ হউক, শক্তি অবশ্যই উহাতে কিছু আছে। রাজ-শক্তির সাগরের সমীপে উহা গোষ্পদবৎ, সলিল-বুদ্বুদবৎ বটে, তথাচ সলিল-বুদ্বুদ সলিল হইতেই উদ্ভূত, গোষ্পদস্থ বারি বারিরই ক্ষুদ্রায়তন। অপিচ, বিপুল বারিধি ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দুরই সমষ্টি, শিশির বিন্দু সন্নিপাতে বহু শস্য বর্দ্ধিত হয়। কঙ্গ্রেসের কিঞ্চিৎ শক্তি সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। তবে, সে শক্তি, কঙ্গ্রেসের সাহিত্যের ন্যায় সম্পূর্ণ রূপে ইংরেজী। কঙ্গ্রেসের প্রবর্ত্তক, পরিচালক, প্রতিনিধি কঙ্গ্রেসী মাত্রই ইংরেজী-উৎপন্ন জীব। Representative men এই আখ্যা যদি ইংরেজী শিক্ষার ও শিক্ষিতের প্রতিনিধি অর্থে ইহাঁদের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে, তাহা কতকাংশে প্রকৃত বটে। কিন্তু, যে অর্থে দেশীয় দলপতি, সমাজপতি, পঞ্চায়ৎ-চালক, বা প্রধান প্রভৃতি এ দেশে ব্যবহৃত হয়; অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও ব্যবস্থাদাতা প্রভৃতি অধিনায়কত্ব বাচক বাক্য স্ব স্ব জন-সাধারণ-মান্য শক্তি সহ দেশের বা দলের সামাজিক বা শাস্ত্রীয় বা বৈষয়িক কার্য্য সম্বন্ধীয় পরিচালকত্ব ও প্রভুত্ব ধারণ বা বহন করে, সে অর্থে ইহাঁদের অধিকাংশই Representative men নহেন। এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, এক জন অশিক্ষিত ইতর শ্রেণীর লোক পল্লীবাসী কাজী, হল চালক কৃষাণও হয় ত সে অর্থে সাধারণ মতের ও মন্ত্রণার Representative man হইতে পারেন; কিন্তু আবার এক জন অতি

সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, ধনী বা পদস্থ ব্যক্তি তাহা হইতে পারেন না, ইহা বলা বাহুল্য। পরন্তু, ইংরেজী শিক্ষিত, অত্যুচ্চ পদস্থ, ধনী, উকিল, বারিষ্টার, জমিদার, জজ, প্রভৃতি বড় লোকেরা ধনে-মানে-বিদ্যায় যথেষ্ট সম্ভ্রম আকর্ষণ করিলেও তাঁহারা অশিক্ষিত ইতর সাধারণের সহিত অতি অল্পই (in-touch) সংস্পৃষ্ট; ইহাও উহার আর এক কারণ। এদেশীয় অশিক্ষিত ও ইতর সাধারণের আন্তরিক বিশ্বাস ও প্রাণের বশ্যতা আকর্ষণ করা অতীব কঠিন। বরং যিনি যত বেশী বিদ্বান, ধনী ও বড় লোক, তিনি তাহা হইতে তত অধিক দূরে। ফলতঃ আজ কাল Representative man, Leading man, Natural leader প্রভৃতি প্রতিনিধি ও পরিচালক বাচ্য ইংরেজী শব্দ এদেশীয় ও য়ুরোপীয় লেখকদিগের কর্তৃক প্রায়ই বড় অসংযত ও অর্থ-শূন্য অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, তাহাতে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ অনিষ্টও ঘটে।

কিন্তু, অভিনব ও য়ুরোপীয় অর্থে, কংগ্রেসীদিগকে অন্ততঃ উহার উচ্চতর স্তরের লোকদিগকে কুলীন বলিয়া অবশ্যই স্বীকার ও সমুচিত সম্ভ্রম করিতে হয়। বল্লালী কুলীন, এখন প্রায় অধঃপাতে গিয়াছেন। কিন্তু এক সময়ে, তাঁহারাও গুণের কুলীন ছিলেন এবং গুণ গৌরবে কৌলীন্য পাইয়াছিলেন। কন্গ্রেসীগণও গুণের কুলীন; তবে, তাহার সহিত ধনের কৌলীন্যও মিশিয়াছে। ফলতঃ কন্গ্রেস্ কুলীন সভা বটে। বিদ্যা বুদ্ধির কৌলীন্য, বাক্‌শক্তির কৌলীন্য, লিপি-কুশলতার কৌলীন্য, সম্ভ্রম-সম্পদ ও পদের কৌলীন্য, একত্রে কংগ্রেস-ক্ষেত্রে মিলিত। অতএব ইংরেজী কথায় বলিলে, ইহাকে অবশ্যই Aristocratic সমিতি বলা যাইতে পারে। উহা আমাদের প্রজানৈতিক পার্লামেণ্টে House of Lords বা তদনুরূপ। House of Commons আজও জন্মে নাই। যদি কখনও এ দেশে শ্রম-স্বত্বাধিকার ও কৃষক স্বার্থের কন্গ্রেস হয়, তাহাই হইবে "হাউস অব্ কমন্‌স" বা কোটী কোটী লোকের অকুলীন সভা। কিন্তু, এখনও তাহার কিছু বিলম্ব আছে। যদি য়ুরোপীয় শক্তির সবিশেষ সহায়তা গ্রহণ করিয়া ও তদ্দ্বারা সঞ্চালিত, সতেজ ও সুদৃঢ় হইয়া তাহা সংগঠিত হয়, তাহা হইলে তাহা আংশিক অঙ্কুরিত হইতে এখনও অন্ততঃ আরও অর্দ্ধ শতাব্দীকাল লাগিবে। এ দেশীয় ইতর সাধারণের উদ্ধার সাধনকল্পে, ইংরেজ শাসন ও য়ুরোপীয় "ডেমোক্রেসী" অধিকতর কার্য্যকরী ও ফলোপদায়ক হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব এ সম্বন্ধে তাঁহাদেরই উপর নির্ভর করা নির্বিঘ্ন, এবং তাঁহাদের প্রদত্ত পথ ও সুবিধা সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। দেশীয় অ্যারিসটোক্রেসী দ্বারা ইতর সাধারণের ও কৃষি স্বার্থের অনেক উপকার হইতে পারে, এবং হইয়াছে; কিন্তু, তদ্দ্বারা তাহাদের চিরান্ধকার বিমোচন ও দাসত্ব-গ্রন্থি ছেদন হইবে না। তাহা, যত দিনেই হউক, ইংরেজ শাসন ও ইংরেজ প্রবর্ত্তিত শিক্ষা দ্বারাই হওয়া সম্ভব। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে—অপার কৃষক-সমাজ-সাগরে সমধিক পরিমাণে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্ট (তাহার শত ত্রুটী ও অসাবধানতা সত্ত্বেও) যেরূপ সযত্ন ও সতত সচেষ্টিত; এমন ত আর কেহই নহে—এমন ত তথা কথিত প্রজা-বন্ধুবর্গ নহেন! কন্গ্রেস্ ত এই বার বৎসর হইয়াছেন; কই, এ সম্বন্ধে

কয়টী কথা কহিয়াছেন? কতটুকু যত্ন করিয়াছেন? কয়টী রেজলিউসন পাস করিয়াছেন? একথা কি রাজনৈতিক কথার অন্তর্গত নহে? ইহার সহিত সংক্রামক দুর্ভিক্ষের ও সর্ব্বজন-বাঞ্ছনীয় সুভিক্ষের কি কোন সম্বন্ধ নাই? দেশের কয়টী সভা সমিতি, কয়খানি সংবাদ পত্র, নিম্ন শিক্ষা-বিস্তারের পোষকতা করিয়া থাকেন? সুলভ মূল্যের সংবাদ পত্র, যাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহাতে সবিশেষ স্বার্থ আছে, ভুলিয়াও কি ইহার উন্নতি কল্পে কখনও একটী কথা লিখিয়া থাকেন? শিক্ষিত কুলীন সম্প্রদায় উচ্চ শিক্ষার জন্যই ত যাহা কিছু ব্যস্ত, নিম্নতর শ্রেণীর সুলভ শিক্ষার জন্য প্রায়ই ত কখনও একটী বাক্যব্যয়ও করেন না। গবর্ণমেণ্টের অভিযোগানুসারে (যদিও সে অভিযোগ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শোভনীয় নয়) উচ্চ শিক্ষার অত্যধিক ব্যয়ই বরং নিম্ন শিক্ষার অন্তরায় স্বরূপ। উচ্চ শিক্ষা সর্ব্বথা অতীব প্রার্থনীয়; কিন্তু, নিম্নশিক্ষা বা নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা ঠিক সেইরূপ অথবা উপস্থিত অবস্থায় ততোধিক বাঞ্ছনীয়। নয় কি? বাল্যকালে শুনিতাম, উচ্চ শিক্ষা নিম্ন শিক্ষার ফিল্‌টার স্বরূপ কার্য্য করিবে। কিন্তু, কই এত কালে ত সে সাধের ফিল্টার হইতে নিম্নদিকে বড় বেশী কিছু চোঁয়াইতে দেখা গেল না! বিন্দু-পাতও, হায়, হইয়াছে কি? অথবা কেবল গর্জ্জন, বর্ষণ নাই।

কেশব বাবুর সমৃদ্ধি সময়ে ইতর শ্রেণীর শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রশ্ন শিক্ষিত দলে, বিলক্ষণ একটু প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার ন্যায় নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষাও উক্ত সমাজের সবিশেষ মনোযোগের বিষয় হইয়াছিল। পূর্ণ বয়স্ক কৃষক, কারিকর, মুটে মজুর প্রভৃতির জন্য এই সহরের ও, বোধ হয়, মফঃস্বলের স্থানে স্থানে রজনী পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল এবং সর্ব্বোপরি, এ বিষয়ের আন্তরিক আন্দোলন ও উদ্যোগ আয়োজন চলিয়াছিল। বঙ্গের সর্ব্ব প্রথম সুলভ সংবাদ পত্র, "সুলভ সমাচার" এই উপলক্ষেই, বোধ হয়, প্রবর্ত্তিত হইয়া, সুলভ পত্রের পথ দেখাইয়া দেয়। "সুলভ সমাচার" সুমহৎ ও পবিত্র পন্থার কার্য্য করিয়া, অতি অল্প দিনে, জ্ঞানান্ধ গরিব লোকের যে উপকার করিয়াছিল, সে পন্থার ও সে মহত্বের সহিত, একাল পর্য্যন্ত কিছু কার্য্য হইলেও নিম্নশিক্ষা অনেক উচ্চ হইত, শ্রমজীবীদের মধ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইত বলিয়া বোধ হয়। কেশবচন্দ্রের "ইণ্ডিয়ান রিফরম অ্যাসোসিয়েসন" হইতেই, মনে হইতেছে, এই সব সদনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কিন্তু তাহার পর, শিক্ষিতদের মধ্যে, সংস্কারক সম্প্রদায়ে, ব্রাহ্মসমাজে, সর্ব্বত্রই যেন এ প্রশ্ন নিবিয়া গিয়াছে। এ ক্ষেত্রে কেবল গবর্ণমেণ্ট, ও স্থানে স্থানে খ্রীষ্টীয় মিশনরী ব্যতীত আর কোথায়ও কেহ আছেন বলিয়া জানি না।

পুনশ্চ, বঙ্গ ও বিহারের লক্ষ লক্ষ রায়তের যাঁহারা অধীশ্বর, সেই রাজা, মহারাজা, হুজুর জমিদার মহাশয়েরা, তাঁদের নিরক্ষর রায়তের শিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ মনোযোগী? অবশ্য ইহাদের কেহ কেহ হয় ত স্বগ্রামে বা এলাকা মধ্যে এক আধটা "এডেড্ স্কুল খুলিয়া নাম কিনিয়া থাকিবেন; কিন্তু, তাহাই কি প্রচুর? [illegible] কি প্রকৃত কর্ত্তব্য-পালন? তাহার পর আমাদের ভূস্বামী মহোদয়গণ মোটের উপর নিম্ন শিক্ষার সপক্ষ,—না বিষম বিপক্ষ? আমরা কোনও

মহারাজা বাহাদুরের বিস্তৃত রাজ্যে এ বিষয়ের যেরূপ ব্যবস্থা, কিঞ্চিৎ অবগত আছি। উক্ত রাজ্য যখন কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের শাসনাধীনে ছিল, তখন এষ্টেটের কোন কোন স্থানে স্কুল ও পাঠশালা স্থাপিত হইয়া কতক কতক রায়ত-বালকের কথঞ্চিৎ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কোর্ট অব্ ওয়ার্ড, এষ্টেটের ব্যয়ে, জনৈক ডেপুটী ইনেস্পেক্টর নিযুক্ত করিয়া স্কুল পাঠশালা গুলি পরিদর্শনের ও পরিচালনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু, রাজ্যের মালিক মহারাজার বয়প্রাপ্তি ও রাজ্য প্রাপ্তির কিছু কাল পরেই, একে একে স্কুল পাঠশালা কয়টীর প্রায় সবই শাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে !! কেন ? কেন তাহা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? রাজ্যের ব্যয়ে রাজ্য মধ্যে শিক্ষা-শালা রূপ সাংঘাতিক অস্ত্র—অমন অহিতকর আবর্জ্জনা কি রাখিতে আছে! রায়তের চক্ষু ফুটিলে, রায়ত আলোক দেখিলে যে, রাজ্যের অকল্যাণ ! অন্ধকার ! অন্ধকার ! এস অন্ধকার, থাক অন্ধকার—আমার প্রিয় পদার্থ ! আমার ঐশ্বর্য্যের, আমার একাধিপত্যের, আমার অত্যাচারের অনন্ত সঙ্গী।

মহাশয় ! মার্জ্জনা করিবেন। নিজের দেশ, নিজের দেশীয় প্রভুত্ব—নিজের গৃহের পানে বারেক চাহিয়া গবর্ণমেণ্টের উপর গালি পাড়িলে ভাল হয়।

নিম্ন—নিম্নতর স্তরে শিক্ষালোক প্রবিষ্ট হইয়া কথঞ্চিৎ কার্য্য করিতে এখনও সময় লাগিবে,৫০—৬০—৭০ বৎসর ; প্রায় শতাব্দ কাল। এ কংগ্রেস্ যদি ততকাল জীবিত থাকার পথ, ক্রমোন্নতির দ্বারা, পরিষ্কার করিয়া লইতে পারেন, তখন উহাতে প্রকৃত প্রজা শক্তি পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবে। তখন আমাদের "হৌস অব্ কমন্স" সৃষ্টি হইবে। কঙ্গ্রেস্ এখন কুলীন-সভা। প্রথমত উহাতে "কমন্স-সভা" হইবার উপক্রম হইতেছিল। কিন্তু, তাহা নানা কারণেই হইতে পারে নাই। অনিবার্য্য নিয়তি বশে, উহা অভিনব তন্ত্রের কুলীন সমিতিতে পরিণত হইয়াছে।

অগ্রেই একাধিক স্থলে উল্লেখ করিয়াছি, কঙ্গ্রেস্, শাসন একতায়, জাতীয়তা-মূলক জাতীয় সমিতি। সামাজিক জাতীয়তা,অজাতীয়তার সহিত এ পর্য্যন্ত উহার সংস্রব নাই। "সোস্যাল কনফারেন্স"বা সামাজিক মজলিস, উহা হইতে আপাততঃ একরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তবে উহার পশ্চাতে আছে বটে। তা, থাকিলেও উহার সহিত একত্র হইতে, অঙ্গে অঙ্গ মিলাইতে পারিতেছে না। গত বৎসর পুনায় উহা কঙ্গ্রেসের প্যাণ্ডাল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। মারহাট্টী ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় সজোরে লাঠি ধরিয়াছিলেন। কলিকাতায় এবার "কনফারেন্স" শুনিলাম, প্যাণ্ডালে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু কঙ্গ্রেসী হিন্দুপত্রিকাদিতে তাহার নাম গন্ধও প্রকাশিত হয় নাই।

যে কারণে কঙ্গ্রেস্ সমাজ সম্পর্কীয় প্রশ্নে, সামাজিক সমস্যায়, সামাজিক একজাতীয়তা অগ্রসরে সংলিপ্ত হইতে পারেন না ; কতকটা তদ্রূপ কারণেই প্রকৃত কৃষি-স্বার্থের সহিত উহা আপনার একত্ব স্থাপনে অপারক। কিন্তু প্রথমোক্ত কারণ দ্বিতীয় অপেক্ষা অনেক প্রবল ও প্রচণ্ড। এজন্য সামাজিকতা হইতে একরূপ সম্পূর্ণরূপে ও প্রকাশ্যভাবে স্বতন্ত্র থাকিতে ও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এবং দ্বিতীয় বিষয়টির

সহিত কার্য্যতঃ পৃথক থাকিয়া,কার্য্যতঃ কৃষি-স্বার্থের ও কৃষক-সত্বের বিপক্ষে থাকিয়া ও বিরুদ্ধাচরণ করিয়া,বাক্যতঃ তাহার সপক্ষতা ও তাহার সহিত একত্ব দেখাইতেছেন, নহিলে বড় বিসদৃশ দেখাইবে, বোধ হয়, এই কারণেই ঐ সপক্ষতা। অগ্রেই বলিয়াছি, এই আবৃত আচরণে উক্ত স্বার্থের ও সত্বাধিকারের অনিষ্ট ঘটিতেছে।

কিন্তু উপরোক্ত দুই বিষয়ে সমাজ ও ভূমিস্বত্ব সম্বন্ধে কঙ্গ্রেস্ এখন যে স্থান গ্রহণ ও যেরূপ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট নীতি সংগঠন করিয়াছেন বা করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে না। সে স্থান ও সে নীতি হইতে কঙ্গ্রেস্‌কে অগ্রসর বা পশ্চাৎপদ বোধ হয় হইতেই হইবে। অমন সঙ্কট স্থানে বহুদিন টিকিয়া থাকা সম্ভব নহে। পরন্তু, সাধারণ রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কঙ্গ্রেস্ এখন যে নীতিচক্র পরিক্রমণ করিতেছেন এবং যে প্রকৃতির নম্র ও কভু ঈষদুগ্র পলিসি প্রচার করিয়া রাজদ্বারে আত্মপরিচয় দিতেছেন, কেবল তাহাই উপজীব্য করিয়া বহুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন না। এখনকার নির্দ্দিষ্ট নৈতিক কেন্দ্র হইতে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইবে,কার্য্যের ও পলিসির প্রসার বৃদ্ধি ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তন ও শক্তিবহ ও শক্তিপ্রদ করিতে হইবে, নতুবা স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক পঞ্চত্ব অবশ্যম্ভাবী। ইহা আমরা বুঝি বা না বুঝি, ইংরেজ রাজশক্তি বিলক্ষণ বুঝেন। কথা হইতে পারে যে, কঙ্গ্রেস্ ইংরেজ রাজনীতির ও শাসন ব্যবস্থারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিবে এবং উহা যে সময়ে যেরূপ আকার ধারণ করে বা বিকাশ লাভ করে, তাহার বিচার, বিশ্লেষণ, প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিবে। কিন্তু, এই কার্য্য—কেবল এই কার্য্য কঙ্গ্রেসের মত সমিতির অস্তিত্ব বহন পক্ষে প্রচুর নহে। এইরূপ কার্য্যের জন্য স্থানীয় সভা সমিতি ও সংবাদ পত্রই প্রচুর। কঙ্গ্রেস্ ঐরূপ কার্য্য উপজীব্য করিয়া কেবল সমালোচক স্বরূপ জীবিত থাকিতে পারে না। প্রজাশক্তি সংগ্রহ, সঙ্কলন ও সৃজন করা, তাহা নৈতিক পরিধির ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে সঞ্চালিত ও সংস্থাপিত করা উহার প্রথম ও প্রধান কার্য্য ও উহার অস্তিত্বের মৌলিক আবশ্যকতা। রাজশক্তি-সম্ভূত প্রজাশক্তি পরিচালিত ও নিয়মিত করা যেমন উহার এক কার্য্য, তেমনি, প্রজার আত্মস্থ ও অজাগ্রত শক্তিও বিকশিত ও জীবিত করিয়া, প্রয়োজন মত প্রস্তুত করিয়া রাজশক্তির সাহচর্য্যে,সহায়তায় ও সংস্কারে প্রেরণ করা আবশ্যক—কেবল আবশ্যক নহে, উহার অস্তিত্ব ধারণের মূল কারণ।

কংগ্রেসের সামাজিক নিরপেক্ষতা, অন্তত আপাততঃ অনিবার্য্য স্বরূপ এবং উহার অত্যুৎকৃষ্ট নীতি। এ নীতি যত সুদৃঢ় ও অটল থাকে ও হয়, ততই উহার মঙ্গল। কিন্তু, এ নীতি ধরিয়া, উহা থাকিতে পারিবে কি, এবং পারিলেও সম্যকরূপে উহার স্বকার্য্য উদ্ধার সম্ভব হইবে কি? ইহা এক সমস্যা। এ সমস্যা পূরণ করিতে বসা এখন বৃথা। অবস্থায়, কালে ও তদুপযোগী কর্ত্তব্যে উহাকে যে দিকে লইয়া যাইবে, সেই দিকেই উহাকে যাইতে হইবে। সে বিষয়ের কোন শুভ বা অশুভ কল্পনা আনয়ন করাতে ফল নাই। তাহা তোমার আমার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে না। তাহার গতি সে নিজেই স্থির করিবে। হইতে পারে, সে গতি ও তাহার পরিণাম শুভ বা অশুভ।

কিন্তু, সে শুভাশুভ কাহারও হস্তারত্ত নহে। তাহা, কাল-স্রোতে কার্য্য-কারণ পরম্পরার ফল। প্রকৃতির সে স্রোত রোধ করা মানুষের অসাধ্য; বিশেষতঃ উপস্থিত অবস্থাপন্ন হিন্দুস্থানের একান্ত অসাধ্য। অনিবার্য্য য়ুরোপীয় প্রভাবে যদি এমনি ঘটে যে, সমগ্র হিন্দুস্থান কালক্রমে একই জাতি, একই ধর্ম্ম ও বর্ণে পরিণত হইয়া সমস্ত "একাকার" হইয়া যায়, হিন্দু মুসলমানাদির চিহ্ন মাত্র না থাকিয়া, তাহার নাম মাত্র কেবল পুরাবৃত্তের বিষয় হয় এবং সেই একীকৃত সংমিশ্রিত জাতি য়ুরোপীয় শক্তিতে সতেজ হইয়া ইংলণ্ডের অন্যতম "কলোনী" স্বরূপ অথবা ইংলণ্ড হইতে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়,—তাহা, সে সুদূর পরিণাম, তোমার আমার ইচ্ছাধীন নহে; তোমার আমার ক্ষুদ্র প্রতিবাদ ও প্রতিবন্ধকে রহিত হইবে না। অতএব যদি অদৃষ্টবাদী হিন্দু হও বা কিসমৎবাদী মুসলমান হও, সে পরিণতিকে "নিয়তি কেন বাধ্যতে" বলিয়া কাজেই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এখন কংগ্রেসের সমাজ-নিরপেক্ষতা বা তাহার সংস্কার-সপক্ষতার আসক্তি চিন্তা-পোযোগী বিষয় হইলেও practical politics এর বিচার্য্য হয় না। কংগ্রেস্ এখন কার্য্যত, বাক্যত ও দৃশ্যত সমাজ ও ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ; ইহাই যথেষ্ট। তবে তাহার পার্শ্বেও পশ্চাতে এমন সকল শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, যাহা ঐ দুই পুরাতন পদার্থের সংস্কার-প্রার্থী ও নূতন সংগঠন-প্রবণ, ইহাও প্রত্যক্ষ। যেমন গবর্ণমেণ্ট জাতি ও ধর্ম্ম নিরপেক্ষ হইলেও তাহার পার্শ্বে, পশ্চাতে, চতুর্দ্দিকে, এমন সকল শক্তি কার্য্য করিতেছে, যাহা লোকের জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে পুরাতনের পরিবর্ত্তে নূতন সংগঠন করিতে সচেষ্টিত। ফলতঃ গবর্ণমেণ্টের রাজশক্তি ও কংগ্রেসের প্রজাশক্তির সহগামী যে ঐ সকল অবান্তর শক্তি ও তাহাদের কার্য্য,—উহা অনিবার্য্য। পক্ষান্তরে, উহাদিগকে পরাভূত, প্রশমিত ও খর্ব্বীকৃত করিবার জন্য যে সকল সংরক্ষণশীল শক্তি ও তাহাদের প্রতিঘাত, তাহাও সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। প্রকৃত উন্নতি ও তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য পূর্ব্ব সংরক্ষণ ব্যতীত কখনও সম্ভবে না। এখনকার উন্নত জাতির অতীত ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থাও ইহার সাক্ষী। ইংলণ্ড ত অত্যুন্নত ও প্রথম শ্রেণীর শক্তি, কিন্তু, সামাজিক রক্ষণশীলতায় এমনি সুদৃঢ় যে, হিন্দুও তাহার নিকট হার মানে। রক্ষণ শীলতার প্রতি সংকীর্ণতাপবাদ দেওয়া তাদৃশ উদারতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না।

স্বয়ং উন্নতিও এক পদ অধিক অগ্রসর হইলে উচ্ছৃঙ্খলতা। রাজনৈতিক উন্নতির যে প্রকার পরিণতির মূর্ত্তি উপরে কল্পনা করা হইয়াছে—তাহা হিন্দু দৃষ্টিতে ঐ স্বরূপ-সমন্বিত। উহা সম্ভব। পক্ষান্তরে ইহাও অসম্ভব না হইতে পারে যে, হিন্দুস্থানের জাতি নিচয়, বিশেষতঃ হিন্দু জাতি যদি হিন্দুত্বের আভ্যন্তরিক আত্ম-সংরক্ষণ শক্তি দ্বারা, পূর্ব্ববৎ দৃঢ় থাকিয়া বহিঃবিপ্লবে বিচলিত না হইয়া, আপনার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অব্যাহত রাখিতে পারে, তাহা হইলে ইহাও অসম্ভব নহে যে, হিন্দু হিন্দু থাকিয়া বিভিন্ন জাতি ও বর্ণ সঙ্করাদিতে বিলুপ্ত বা বিকৃত না হইয়া, বর্ত্তমান শাসন শক্তির ন্যায়, ভবিষ্যতে বৃটিশ রাজ-নীতির সর্ব্বোচ্চ প্রসাদ—প্রজানৈতিক প্রকৃত আত্ম-শাসনাধিকার

প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহা অপেক্ষা আরও উচ্চতর উন্নতিও লাভ করিতে পারে। যাহা হউক, বিদেশীয় ও বিজাতীয় শাসনের যদি এরূপ পরিণাম কোনও কালে—দূর ভবিষ্যতে, এদেশে সম্ভব হয়, তাহা হইলে, পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অপূর্ব্ব ও সম্পূর্ণ অভিনব অধ্যায়ের আবির্ভাব হইবে।

কংগ্রেসের সমাজ-সংস্কার-নিরপেক্ষতা-নীতি সমীচীন। সমাজ নীতির এস্থানে, কংগ্রেস, কত দিন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবেন, দূর ভবিষ্য কাল তাহার মীমাংসা করিবে। কিন্তু, কংগ্রেসের কৃষি-স্বার্থ সম্বন্ধীয় নীতিকে অচির-কাল মধ্যেই, হয় পশ্চাতাকুঞ্চন, নয় অগ্র-প্রসারণ করিয়া অসন্দিগ্ধ ও অন্ধকারহীন পরিষ্কার স্থান গ্রহণ করিতে হইবে। 'উভয় সঙ্কট' মধ্য স্থলে দাঁড়াইয়া, কার্য্যত সমর্থন ও বাক্যত দুর্ব্বলের রক্ষণাভিনয় করিলে চলিবে না। এ সম্বন্ধে হয়, অকপটে কৃষক পক্ষে, নয় কুলাচার্য্যবৎ কুলীন পক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে। কোনও না কোনও দিন রাজনীতি নিজেই তাহা করাইবে। ইংরেজ রাজনীতির যে ন্যায়পরতা ও নিম্নোত্তলন-কারিণী শক্তি প্রভাবে আজ এই কংগ্রেস্ ও কংগ্রেসে,মধ্যবিত্ত ও বৃত্তিহীন ভদ্র সন্তান-দিগের সহিত অসূর্য্যম্পশ্যা, অগাধ সম্ভ্রমা-হঙ্কার উদ্ধত, অভিমান-স্ফীত রাজা মহা-রাজ, জোনাব জমিদার মহাশয়দের মিলন, হস্ত কম্পন, মিষ্টহাসি—মিশামিশি; পরন্ত রাজ-নীতির যে শক্তি প্রভাবে কংগ্রেস্ আজ সাধারণ অভিমতের মুখপাত্র সাজিয়া চন্দ্র সূর্য্য বংশীয় দুর্দ্ধর্ষ দেশীয় দিকপালদিগের রক্ষার্থেও "রেজলিউসন" প্রচার করিতে পারেন, সেই ঐন্দ্রজালিক শক্তিই ক্রমে কংগ্রেসকে শিখাইয়া দিবে, কিসে কি? আমরা অনবধানে অন্ধ, তাই সে শক্তির প্রচ্ছন্ন প্রক্রিয়া দেখিয়াও দেখি না। আত্ম বিস্মৃতির মযুজে আপনাদিগকে "মস্ত" মনে করি। তা, তত বেশী বিলম্বও করিতে হইবে না; ভূস্বামী ও রায়তের সম্বন্ধ নিয়া-মক এক বিন্দু উদার ব্যবস্থার একটী বিল কখনও ব্যবস্থাপক বৈঠকে উঠিলেই বুঝা যাইবে, কংগ্রেস্ কেমন গরিব কৃষকের বন্ধু এবং তখন কি করেন।

ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের আবিষ্কর্ত্তা—আদি জোটক ও ঘটক মিষ্টার হিউম—ইংরেজ হিউম—ডেমোক্রেটিক হিউম চিরস্থায়ী বন্দো-বস্ত-সমর্থন-নীতি ও দেশীয় রাজগণ সম্বন্ধীয় নীতি কংগ্রেসে প্রবেশ করিতে দেন নাই। বোধ হয়, তাঁহার শঙ্কা ছিল যে, উহার দ্বারা কংগ্রেস পাছে কৌলীন্য সভায় পরিণত হয়। উপস্থিত প্রকৃতির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনি-বার্য্য অনিষ্টের মূল বলিয়া হিউমের ধারণা ছিল। কিন্তু, হিউমের অনুপস্থিতিতে ঐ উভয় নীতিই কংগ্রেসের অঙ্গালিঙ্গন করি-য়াছে। গত কয়েক বৎসর হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুকীর্ত্তি কীর্ত্তন ও বিস্তারাকি-ঞ্চন চলিয়া আসিতেছে, এবৎসর দেশীয় রাজন্যবর্গও, আমাদের অনুগ্রহ ও পেট্রনেজ প্রাপ্ত হইয়া কংগ্রেস রেজলিউসনের বিষয়ী-ভূত হইয়াছেন!!

দেশীয় রাজা ও রাজ্য, হায়! আমাদের অতীত, বিস্মৃত জাতীয় জীবনের ভগ্নাবশিষ্ট উপল খণ্ড! নব্য হিন্দুস্থানের পুরাতন স্বপ্নের শেষ স্মৃতি! অতএব তাহার শত অশাসন, অশান্তি ও পূর্ব্বপদস্খলন সত্ত্বেও হিন্দু (এবং মুসলমানেরও বটে) মাত্রেরই উপাস্য সামগ্রী, বড় আদরের ও এখনও একটু অহঙ্কারের বস্তু। তা, তাঁদের প্রতি কংগ্রেসের মত

প্রজা-সভার এই স্পর্দ্ধান্বিত পেট্রনেজটুকু—এই অযাচিত অনুগ্রহ টুকু কি কিছু স্থান, কাল পাত্রানুপযোগী, অতএব বিলক্ষণ কি বিদ্রূপকর ও সম্ভবতঃ অনিষ্টকর নহে? ইহাতে দেশীয় রাজাদের ইষ্টাপেক্ষা অধিক অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই কি? ইহাতে কংগ্রেসেরও নিজের কোন আশঙ্কা নাই কি? বৃটিশ রাজনীতির অপর একটী অঙ্গ আছে, যাহা রাজশক্তির আদিম ও অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ,—কঙ্গ্রেস্ কি তাহাও ইদানীং বিস্মৃত? হইতে পারে, স্বদেশীয় রাজন্য-বল কঙ্গ্রেসে মিলিত হইলে, কঙ্গ্রেস বিপুল বলশালী হইতে পারে। কিন্তু, তাহা কি সম্ভব? সম্ভব হইলে দেশীয় রাজন্যবর্গ আপনারাই কি আপনাদের একটী কঙ্গ্রেসও করিতে পারিতেন না? পাটনা ও ঝালওয়াড়ের সমর্থন কি সিন্দিয়া, হলকর, হয়দ্রাবাদ, বরদা, ত্রিবাঙ্কোর বা আর কেহ বা সকলে মিলিয়া করিতে পারিতেন না? বড়ই কঠিন কথা। রাজনীতি এস্থলে সাহিত্য লীলা নহে। কঙ্গ্রেস আমাদের নমস্য; কিন্তু, রাজনীতিও ক্রীড়নক নহে। অতএব এ কথা যাউক

ফলতঃ কঙ্গ্রেস্ কার্য্যগতিকে, ক্রমে প্রায় কৌলীন্যেরই প্রতিনিধি হইয়া দাঁড়াইতেছেন। এদেশীয় গবর্ণমেণ্ট "বরোক্রেসী" বলিয়া উক্ত। কঙ্গ্রেসকে, "অ্যারিষ্টক্রেসী," যদি এক মাত্রা অত্যুচ্চ হয়, বরং বাবু-ক্রেসী বলা যাইতে পারে। বরোক্রেসীতে যতটা "ডেমোক্রেসী" আছে, বাবু-ক্রেসীতে তাহারও কম। কিন্তু, অকৃত্রিম ও আসল ডেমোক্রেসীর উত্থান ব্যতীত শাসন-সংস্কার ও রাজনৈতিক সবিশেষ কোনও সত্বাধিকার উদ্দেশে সাধনা-সিদ্ধ হইবে না।

কঙ্গ্রেসের সাহিত্য-স্পর্শ মাত্র করিয়া উহার কথা উঠান গিয়াছিল, এখন সেই সাহিত্যেই কথা শেষ হউক। দেখা গিয়াছে, কঙ্গ্রেসের বিপুল সাহিত্য ও বিন্দুমাত্র শক্তি, উভয়ই ইংরেজী। নানা কারণে ইংরেজী, তাহা অনিবার্য্য, আবশ্যকীয়। অতএব আপত্তি করা অন্যায়। সংস্কৃতে বা অন্য কোনও স্বতন্ত্র প্রদেশীয় ভাষায় কঙ্গ্রেসের মধ্য কেন্দ্রের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। ইংরেজী ব্যতীত এবম্বিধ কঙ্গ্রেস সম্ভবই হইত না, তাহা সকলেই জানে। তবে, যে সকল স্থলে নহিলেও চলে, ও ইংরেজীরই অধিকতর উপযোগীতা ও ইষ্টকারিতা, সে সকল স্থলেও যে ইংরেজীর উপদ্রব, ইহাই আক্ষেপ। আক্ষেপ, কেবল দেশীয় ভাষার আয় বৃদ্ধি না হওয়ার জন্য নহে, কঙ্গ্রেসের নিজের উন্নতি ও আত্ম মত বিস্তারে বাধা পড়ার জন্যও বটে। কঙ্গ্রেস-সাহিত্য ও কঙ্গ্রেস-বক্তৃতায় ইংরেজীর এই আবশ্যকাধিক অতিরিক্ত ব্যয় ও ব্যবহারও ইতর-সাধারণের মধ্যে কঙ্গ্রেস কথা ব্যাপ্তি লাভ করিবার প্রবল অন্তরায়। কঙ্গ্রেস আপাততঃ ইংরেজী হ্যাটকোটে জন-সাধারণের মধ্যে জায়গা পাইবেন না; পাইতেছেনও না। উহা বস্তু কি, তাহারা বুঝেই না। জন-সাধারণের সংস্পর্শ-বিরহে কঙ্গ্রেসের জাতীয়ত্ব ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে। ইংলণ্ডের উদার রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সহিত কঙ্গ্রেসের কুটুম্বিতা। তাহারই অনুরূপ আপনার অভিমত ও আকাঙ্ক্ষা অঙ্গীকার করেন, অথচ জানি না কিরূপে কার্য্যতঃ ইতর সাধারণে উপেক্ষা করিয়া ক্রমে কুলীন সভা হইয়া দাঁড়াইতেছেন। দেশীয় প্রজা শক্তির উপস্থিত ক্ষীণ ও হীন অবস্থায় অবশ্য অকুলীন কুলীন

উভয় শক্তিরই সংযোজন আবশ্যক। উভয়ের কাহাকেই ত্যাগ করা যায় না, তাহা জানি। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, তাহা হইতেছে কি? উভয়ের সমবায় সম্ভব, সত্য ও সফল করিতে হইলে, দরিদ্রের, পদদলিতের ন্যায়ানুমোদিত স্বার্থের দিকে বারেক তাকাইয়া ধন-কুলীনদিগের সম্প্রদায়-গত স্বার্থ কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত করিতে হয়; এবং তাহাই প্রকৃত "পেট্রিয়টিজম" পদবাচ্য হইতে পারে। নহিলে কেবল বহু কালের পরিপুষ্ট ও প্রবল স্বার্থের পরিপোষণার্থে ও পীড়ন ক্ষমতা-বর্দ্ধনার্থে পেট্রিয়ট সাজিয়া কংগ্রেসে যোগ দেওয়া পাপের উপর আরও পাপ, তাহাতে কেবল কংগ্রেসকে কলুষিত করা হয়। অতএব কংগ্রেসকে জন সাধারণের ইতর ভদ্রের—কুলীন অকুলীনের জাতীয় সভা করিতে হইলে, আপাততঃ উপরোক্ত পক্ষে দৃষ্টি রাখিয়া ইংরেজীর ন্যায় দেশীয় যাবতীয় প্রদেশীয় প্রচলিত ভাষার সবিশেষ সহায়তা গ্রহণ করিয়া, তাহার পথ প্রশস্ত ও পরিষ্কার করিতে হয়। পরন্তু, কংগ্রেসের যেখানকার ও যখনকার যে অধিবেশনই হউক, ব্যাপারটা বিলাতী সার্কাস থিয়েটারের মত একান্ত পেশাদারী ও সংকীর্ণ টিকেটী কাণ্ড না করিয়া, অন্ততঃ দেশীয় বারইয়ারীর মত উদার সার্ব্বজনীন প্রথায় জাতীয় উৎসব বা স্বদেশ পূজা সম্পন্ন করা ভাল। কথাটা খুব তুচ্ছ, কিন্তু, অনেক সময় তুচ্ছ ঘটনাতেই বৃহৎ ব্যাপার বেশী ব্যথা পায়, উন্নতির অনেক সুবিধা ও সহানুভূতি হারায়। যখন যে প্রদেশে কংগ্রেসাধিবেশন হয়, অন্ততঃ একটা দিনও সেই প্রদেশীয় ভাষায় কংগ্রেসের কার্য্যাদি লোকসাধারণকে মোটামুটী রকম বুঝাইয়া দিলে মন্দ হয় না। এবং তাহা বোধ হয় একান্ত অসম্ভবও হয় না। এই যে সে দিন বিডনবাগানে দ্বাদশ কংগ্রেস হইয়া গেল, কলিকাতার প্রায় পোনেরো আনারও অধিক ইতর লোক বুঝিল না যে, উহা বস্তুটী কি। কেহ বলিল "ঘোড়ার নাচ" কেহ বুঝিল, "আগজিবিসন"—আমরা স্বকর্ণে কংগ্রেসের নিকটবর্ত্তী স্থানে ঐ দুটী কথা অনভিজ্ঞের মুখে শুনিয়াছিলাম। অথচ তাহারা বুদ্ধিমান বিষয়ী লোক; যে কথাই হউক, বাঙ্গালা কথায় বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে পারে।

কিন্তু "কংগ্রেস ক্যাম্পে, অভ্যাসে ও অজ্ঞাতে ইংরেজীই এখন আমাদের আপনাদের নিজের; যেমন কাহারও কাহারও কাছে ইংলণ্ড আমাদের "হোম।" এবং যেমন আমাদের কেহ কেহ সর্ব্বাংশেই (Thoroughly English) দ্বাদশ কংগ্রেসাধিবেশন সভার বর্ণনা উপলক্ষে প্রকৃত স্বদেশপ্রাণ, কংগ্রেসের সবিশেষ পৃষ্ঠপোষক আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ "পত্রিকা" লিখেন;—

"English is a foreign tongue to an Indian—is it not? But the orators delivered themselves as British orators, trained in the British Parliament would have done under similar circumstances. * * * And after making the gifted Indians so thoroughly English, the Anglo-Indians want to keep them slaves."

ইহা প্রকৃত বর্ণনা। যিনি কংগ্রেস-সভা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তাঁহাকে এ কথায় সায় দিতেই হইবে। অন্ততঃ আমাদের কতক লোক কংগ্রেসের শক্তিশালী সদস্য ও বক্তাগণ, ইংরেজীকে অবিকল ইংরেজেরই মত, অনেক ইংরেজ অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছেন। কংগ্রেসের বক্তৃতা, বস্তুতই বৃটিশ পার্লামেন্টের বক্তৃতার মত বৃটিশ এবং বক্তাগণ বিচক্ষণ, বহুদর্শী, স্বাভাবিক বাগ্মীতাসম্পন্ন এবং সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে বৃটিশবৎ

নহে, বৃটিশ। অভ্যাসে, আচরণে, হাবভাবে, ধীরতায়, গাম্ভীর্য্যে, পরিচ্ছদে, পারিপাট্যে, প্রাজ্ঞতাদি সকল বিষয়েই সর্ব্বতোভাবে তাঁহারা Thoroughly English, ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য। পরন্তু, পত্রিকার উপরি-উদ্ধৃত বর্ণনাংশ বিদ্রূপাত্মকও নহে। উহা সুধীর ভাবে সুখ্যাতিব্যঞ্জক সত্য বিবৃতি। কংগ্রেস এবং কংগ্রেসী Thoroughly English কিন্তু, তথাচ হায়! Slave গোলাম—পরাজিতপদ-দলিত, ক্রীতদাস!! "পত্রিকা" দৃষ্টান্ত দিয়া, নাম ধরিয়া পুনঃজিজ্ঞাসা করিতেছেন, ও তাহার উত্তর দিতেছেন;—

"What is W. C. Bonerjee? He is slave."

তা, এমনই যখন, তখন আমাদের যে এই ইংরেজী ও এত ইংরেজী ও ইংরেজত্ব, ইহাকে কি বলিব? ইসফ্ উদ্ধৃত করিয়া কাক ও ময়ূর-পুচ্ছের কথা কি বলিব? না, তাহা ঠিক নয়। আমাদের এই ইংরেজী, ইংরেজত্ব, শিক্ষা, স্বার্থ ও আসক্তি-প্রণোদিত অভ্যাস। অভ্যাস "দ্বিতীয় প্রকৃতি" হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি নহে। হাঁ, ইহা অভ্যাস বটে। কিন্তু বিলক্ষণ আত্ম-বিস্মৃতিও বটে। নহিলে আমরা slave কেন? এত ইংরেজী শিখিয়া ও এমন ইংরেজ হইয়াও গোলাম নফর কেন? নফর গোলাম থাকিয়াও ইংরাজ সাজি কেন? ময়ূর না হইয়াও ময়ূর পুচ্ছ ধারণ করি কেন? অতএব ইহা আত্ম-বিস্মৃতি বই কি? পরন্তু, ইহা বৃথা আত্ম-বর্জ্জনও বটে। নহিলে "বন্দ্যোপাধ্যায়" বর্জ্জন করিয়া "বোনার্জ্জী" গ্রহণ করি না? আমার আর্য্যবংশ—আমরা বায়স-কুলায় পরিত্যাগ করিয়া ময়ূরালয়ে যাইয়া অপমানিত হই কেন? আপন বাসায় বসিয়া, না মরিয়া ময়ূর সাজিয়া মরিতে যাই কেন? মরণই যখন নিশ্চিত, ব্যক্তিগত স্বার্থের ছটী পুঁইশাকের পাতার প্রলোভে যখন আমি এমন অস্বাভাবিক মরণ মরি, আত্ম বিসর্জ্জন দিই, আত্মবংশ, পুরুষ পরম্পরাগত পবিত্র স্মৃতি, সম্মান, গোত্র, জাতিত্ব, জাতিত্ব, সংস্কার, হায়, সবই অনায়াসে অম্লান বদনে বিসদৃশ বা বর্ব্বরোচিত ভাবিয়া বর্জ্জন করি এবং যখন সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া অভ্যাস ও আকাঙ্ক্ষার দাস হইয়া পরস্বের প্রাপ্তি কামনা করি, তখন মহাশয় আমি slave হইবারই কি উপযুক্ত নই? master হইবার মত মালমসলা আমাতে কই, তদনুরূপ মনই বা আমার কই? এ মন্তব্য, মনের এই অনিবার্য্য মর্ম্মান্তিক ক্রন্দন কেবল সাধারণ ভাবেই প্রযোজ্য। নহিলে সম্মানভাজন "পত্রিকা" যে কয়টী নামের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মনুষ্যত্বের মাহাত্ম্যে ও মনস্বীতায় আদর্শ স্থানীয়। বিশেষতঃ যে মহাত্মার নামটী আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, ভগবান তাঁহাকে মনুষ্যত্বের অত্যুচ্চ উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অসাধারণ মানসিক শক্তি ও ধীরতা সর্ব্বজন-বিদিত। কিন্তু তদীয় বদান্যতা, স্বজন-প্রিয়তা, স্বাভাবিক মুক্তহস্ততা, সর্ব্বোপরি তদীয় অপরিসীম মাতৃভক্তি ও পারিবারিক প্রীতি-স্নেহের কথা ও পরদুঃখকাতরতার কথা সকলে হয়ত শুনেন নাই। বস্তুতঃ তাহা শুনিয়া বিমোহিত হইতে হয়। পরন্তু স্বজাতির জাতিধর্ম্মে তদীয় সংরক্ষণ-প্রবণতার বিষয় শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া থাকি। তদীয় সামাজিক অবস্থায় অবস্থিত কোন ব্যক্তির যদি হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠা থাকে, তাহা কেবল তাঁহারই আছে। অন্ততঃ তাঁহার যাদৃশ প্রভূত পরিমাণে আছে, তাদৃশ প্রায় আর কাহারও নাই। তথাচ যে

এই মহাত্মা স্বকীয় সম্ভ্রান্ত সমাজের, স্ববংশের ও স্ববান্ধবের বিপরীত ও বিসদৃশ, বিজাতীয় অবস্থায় অবস্থিত, ইহা শিক্ষারই প্রভাব ও হিন্দুসমাজের ও ব্রাহ্মণকুলেরই দুরাদৃষ্ট। দুরাদৃষ্ট নহিলে এমন দুর্লভ রত্ন নিকটস্থ থাকিয়া দূরস্থ হইবে কেন? শিক্ষার প্রভাব নহিলে স্বভাবের বিরোধী ঘটনা ঘটিল কেন?

যাহাই হউক, এখন আমাদের এই ইংরেজী ও ইংরেজাভিনয় ও ইংরেজীকে আপনার জ্ঞান আর কিছুই নয়—আত্মবিস্মৃতি, আত্মবর্জ্জন ও অস্বাভাবিক অভ্যাস। উহার আত্মার অভ্যন্তরে "পেট্রিয়টিজম্" থাকিতে পারে, স্বদেশ-প্রীতি থাকিতে পারে এবং আছেও; কিন্তু উহার আপাদমস্তকে, অঙ্গে, অঙ্গে, উহার আচরণে ও আহার ব্যবহারে স্বদেশ-দ্রোহিতা, স্বজাতি-অশ্রদ্ধা বিদ্যমান।

আমরা কঙ্গ্রেস করিয়াছি। কিন্তু, কঙ্গ্রেস কাহার? ইংলণ্ড ও ইংরেজী যাঁদের, এ কঙ্গ্রেসও তাঁদেরই। যাঁদের প্রসাদে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাঁদেরই পদাঘাতে ইহা চূর্ণ হইয়া এখনি পঞ্চত্ব পাইতে পারে। ইংলণ্ড ও ইংরেজী যেমন আমাদের, কঙ্গ্রেসও তেমনি আমাদের; তথাচ যে উহাকে আমাদের বলি, ইহা আত্ম-বিস্মৃতি। অদ্বৈত মতের মায়া মোহের আত্ম বিস্মৃতি, অপ্রত্যক্ষ দার্শনিক মিথ্যা। আমাদের এ আত্ম-বিস্মৃতির কুহক প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক মিথ্যা। এই মুহূর্ত্তে সম্মুখস্থ সংবাদ পত্রে দেখিতেছি,—আমাদের সর্ব্বোচ্চ আত্মশাসন-কেন্দ্র রাজধানী কলিকাতার মহামুনিসিপাল স্বায়ত্তশাসন মেকেঞ্জি ক্রোধানলে কত লাঞ্ছিত হইয়াছে। রীতিমত রাজবিধি-সংস্থাপিত নিত্য পূজিত প্রতিমারই যখন এই পরিণাম, তখন রাজবিধির বহিঃ প্রাঙ্গণস্থ কঙ্গ্রেসকে অপমানিত হইতেই বা কতক্ষণ লাগে? মুনিসিপাল মেকেঞ্জি-বিতণ্ডায় কমিসনরদিগকে লক্ষ্য করিয়া পাওনিয়র বলিয়াছিলেন "They are riding for a fall" কঙ্গ্রেস সম্বন্ধেও কোন্ একথা পুনরুক্তর না করা যায়? আত্মবিস্মৃত হইয়া অতিবেগে অশ্ব চালনায় পতনের সম্ভাবনা পদে পদে। এ তবুও বরং ক্ষুদ্র পতন; আত্মাবিস্মৃতি অনন্ত পতন সংঘটন করে। বৃটিশ প্রজা-নীতি, বৃটিশ "কনিষ্টিটিউসন," বৃটেন ভূমির উদারতা মূলক আইন কানুন—সর্ব্বোপরি বৃটিশ পার্লামেণ্টের উপর আমরা নির্ভয়ে নির্ভর করি, তাহাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া সেই আদর্শে কার্য্য করিতে যাই বটে, কিন্তু আসল ইংরেজ প্রজায় যাহা সম্ভবে ও শোভনীয় হয়, তাহা কি এখন আমাদিগের পক্ষে সম্ভব ও সমীচীন? আত্ম-স্মৃতি ও সাবধানতাই আমাদের প্রধান ও প্রথম পলিটিক্স হওয়া উচিত। "কনষ্টিটিউসন" উত্তম বটে। তথাচ তদনুমোদিত কার্য্যও অনেক সময়ে আমাদের পক্ষে নির্ব্বিঘ্ন নহে। তাহা প্রায় নিত্যই ত দেখা গিয়া থাকে। ফল কথা এই যে, দৈহিক "কনষ্টিটউসন"টী সবল ও কর্ম্মঠ না থাকিলে, আইনের বা আর কিছুর কনিষ্টিটিউসন বড় বেশী উপকার করিতে পারে না। কঙ্গ্রেসের কনিষ্টিটিউসন এখন যেরূপ, পূর্ব্বেই বিচার করা হইয়াছে।

তথাচ, যদি ইংরেজী আমাদের হয় ও ইংরেজত্ব আমরা কতক লোকে প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা হইলে শাসন-সংস্কার বা দেশোদ্ধারের ত তাদৃশ প্রয়োজন দেখা যায় না। দেশ ইংরেজ শাসনাধীন। আমরাও thoroughly English, অতএব দেশ ও তাহার উভয়ইত আমাদের নিজেরই আছে। অতএব "কি তার উদ্ধার!"

নতুবা আমরা যদি সত্য সত্যই পত্রিকা-কথিত স্লেভ সকলেই হই, তাহা হইলে অনর্থক ইংরেজ হইব কেন? "স্লেভ" গিরি ঘুচাইতে যদি দেশ শুদ্ধ সকলেরই সাহেব সাজিতে হয়, একান্তই thoroughly English হইতে হয়, সময়ে সকলে একত্রেই তাহা হইলে হইবে; অগ্রে কাহার কাহারও হওয়াতে ত কিছু উপকার হইতেছে না।

আমরা দেখিলাম, কংগ্রেসের কনিষ্টিটিউসন অদ্যাবধি লিখিত না হইলেও কার্য্যতঃ তাহা মোটের উপর কিরূপ দাঁড়াইতেছে; কংগ্রেসের শক্তি কি পরিমাণে ও কি প্রকৃতির জন্মিয়াছে; পরন্তু তাহার সাহিত্যের স্বভাব সাধারণতঃ কীদৃশ। কংগ্রেসী সাহিত্যের বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি যেরূপ বৃহৎ,বৈচিত্র্য অবশ্য তেমন অধিক নহে, হইতেই পারে না। একই প্রণালীর শিক্ষা, একই প্রকৃতির দীক্ষা,একই দিক্ দিয়া দৃষ্টি,একই রূপ শাসন ও নিয়মে পরিপুষ্ট,অতএব ভারতবর্ষের ভিন্ন প্রদেশের ব্যক্তিগত মানসিক সত্তা এখন প্রায় একই রূপ উপাদানে নির্ম্মিত, একই গঠনে গঠিত; সুতরাং তদ্রূপ চিত্ত-স্বরূপে সাধারণতঃই বোধ হয় বৈচিত্র্য তত বেশী থাকা সম্ভাবিত নয়। তবে উৎকর্ষের অনুশীলনের অবস্থাগত মানসিক স্ফূর্ত্তির এবং স্বাভাবিক শক্তি প্রতিভাদির ইতর বিশেষে যাহা অল্পাধিক বৈচিত্র্য। এইরূপ বৈচিত্র্যবিহীন একই প্রকার শিক্ষা-সংগঠিত মানসিক সত্তার বা শক্তির ব্যষ্টির সমষ্টি হইতে কংগ্রেস। তাহার উপর কংগ্রেস উহার স্বভাবতঃ ও প্রয়োজন বশতঃ একই প্রকৃতির ও প্রণালীর চিন্তা-প্রসূত, একইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভূত অভিমত মন্তব্যাদি প্রচারের সভা। সুতরাং কংগ্রেস-মণ্ডপে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতিগত ও ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহার-সমন্বিত বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের, মূর্ত্তির ও পরিচ্ছদাদির বহু বৈচিত্র্য সত্বেও বক্তৃতাদিতে অতি অল্পই বৈচিত্র্য দেখা যায়। অতএব কংগ্রেসের সাহিত্য সাধারণতঃ বৈচিত্র্যহীন। মত-বৈচিত্র্য কার্য্যতঃ অসম্ভব। মন্ত্রণা-বৈচিত্র্যেরও অবসর নাই। তবে, নিরূপিত মত, পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট মন্তব্যাদির অবতারণ, সমর্থন ও পরিপোষণ প্রভৃতিতে যুক্তি তর্ক নূতন তথ্য ও বাক্য-বিন্যাসাদির বৈচিত্র্য বিকাশের অবসর আছে। অতএব কংগ্রেস-সাহিত্যে সচরাচর সেই পক্ষেই অল্পাধিক বিশেষত্ব দেখা যায় না। কংগ্রেসের রাজনৈতিক রেকর্ডকে সাহিত্যের হিসাবে লইয়া সাহিত্য-দৃষ্টিতেই এ কথা বলা যায়। নহিলে কার্য্যের ও অভিমতের একতা এবং সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য সর্ব্বথা শুভদায়ক। এবং বিভিন্ন ও বহুলোক সমষ্টিত এরূপ বৃহৎ সভায় এমন মতৈক্য যারপর নাই প্রশংসার বিষয়। সভ্য দেশের শক্তিজাত অনেকানেক জাতীয় সমিতি বাক্‌বিতণ্ডা, কলহ, চপলতা প্রভৃতি অসংযম ও অভদ্রতাদির জন্যও কম প্রসিদ্ধ নহেন। ধীরতা ও গাম্ভীর্য্যে আমাদের এ কংগ্রেস তাঁহাদের আদর্শ স্থল। ইহা এদেশীয়ের সুশীলতা ও সংযত স্বভাবেরই এক অংশ। তবে কেবল করতালির মাত্রা, উহার সঘনতা ও শব্দ কিছু কমিলে বোধ হয় ভাল হয়; সভা আরও শিষ্টভাব ধারণ করে; বক্তা ও শ্রোতা উভয় পক্ষেরই সুবিধা হয়।

কংগ্রেস-সাহিত্য সবিশেষ বৈচিত্র্যবিহীন হউক,—তথাচ ইহা নব্যভারতের, সমগ্র শিক্ষিত হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতর মস্তিষ্ক-

প্রসূত ফল. একস্থানে একত্রে গ্রথিত। ইহা দেখিয়া চিত্ত পুলকিত হয়, ইহা ভাবিয়া চিত্ত বিস্মিত হয়—ইহা পাঠ করিতে করিতে নব্যভারতের সজাগ অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়, মনে হয়, স্বজাতীয় ও সমবেদনাযুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সকলেরই সহিত আলাপ করিতেছি—তাঁদের আন্তরিক স্বদেশ ভক্তির আবেগময় উচ্ছ্বাসে যেন ভাসিয়া চলিয়াছি, ক্ষণে ক্ষণে আপনার ক্ষুদ্র সংকীর্ণ স্বার্থপরতাময় অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া তাহাতে যেন মিশিয়া যাইতেছি। উদ্দীপনাংশে কঙ্গ্রেসের কোন কোনও বক্তৃতা উচ্চ স্থানীয়।

কঙ্গ্রেস-সাহিত্য আধুনিক ইংরেজী আর্য্যভূমির রাজনৈতিক চিন্তার এক বৃহৎ অট্টালিকা—এক বিস্তৃত স্রোতস্বিনী। কঠিন সমালোচনা-শিলে, সে চিন্তা পূর্ণ করিলে, হয়ত, তাহার কতক কাটছাট পড়িতে পারে, অত্যল্প আঘাতেই হয়ত তাহার কতকাংশ স্খলিত গলিত হইয়া যাইতে পারে, তাহার অপরিপক্কতা, তাহার অন্তঃসারশূন্যতা, তাহার দূরদর্শন ও সূক্ষ্ম দর্শনের অভাব, বা তাহার পরিণাম-দর্শনের অপ্রাচুর্য্য প্রভৃতি বাহির হইতে পারে; পরন্তু, সে চিন্তা-স্রোত পরিমাপ করিলে, হয় ত তাহার গভীরতা খুব অল্পই দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া এবং তর্কস্থলে, ক্ষণেকের জন্য স্বীকার করিয়া লওয়া সত্বেও এমন কখনও হইতে পারে না যে, স্বদেশের সমগ্র শিক্ষিত মণ্ডলীর ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন চিত্তের চিন্তা কিছুই নয় এবং তাহা একতা-প্রাপ্ত ও এক স্রোতপ্রবাহিত হওয়াতেই একেবারে অশুদ্ধ, অসার ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে! এরূপ মনে করা অহঙ্কারের ও আত্ম বুদ্ধি প্রশংসার পরাকাষ্ঠা বটে; কিন্তু, এক মাত্র আহ্লাদকীও বটে। তা, দেশশুদ্ধ বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচিত লোক মাত্রই যদি নির্ব্বোধ হইয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুদ্ধি মহাশয়েরও বসবাসের স্থান কই?

কঙ্গ্রেসের দ্বাদশাধিবেশনের বহু বক্তৃতাই বিশিষ্ট। সম্মাননীয় সভাপতি সয়ানী মহাশয়ের বক্তৃতা কার্য্যতঃই বৃহৎ; উহা রাজনৈতিক বহু তথ্য পূর্ণ এবং সেই তথ্য নিচয় হইতে কঙ্গ্রেসের মূল সিদ্ধান্তাদি সমর্থনে সমর্থ। সভাপতি সবিশেষ দক্ষতার সহিত তৎসঙ্কলিত ঐতিহাসিক ও শাসননৈতিক তথ্য নিচয়ের সমালোচনা করিয়াছেন। দ্বাদশ সভাপতির বক্তৃতা, একাদশ সভাপতির বক্তৃতা অপেক্ষা আর যে যে অংশেই ন্যূন (যদি কোনও অংশে হয়) হউক, গুরুত্বে ও কঙ্গ্রেসের পক্ষ সমর্থনে ন্যূন নহে; বরং শ্রেষ্ঠ বলিয়াই বোধ হইবে। বিশেষতঃ মুসলমানদিগকে কঙ্গ্রেসের পক্ষ অবলম্বনার্থে আহ্বান—তাহার উপযোগিতা ও উপকারিতা প্রদর্শন এবং কঙ্গ্রেস সম্বন্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের আপত্তি খণ্ডন,—এই মুসলমান সভাপতি যেরূপ দক্ষতা ও দূরদর্শিতার সহিত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। তদ্দ্বারা কঙ্গ্রেসের কিছু উপকার হইলেও পারে। কিন্তু, তাহা সংবাদ পত্রের কলমে ও কঙ্গ্রেসের বাৎসরিক পত্রিকায় ইংরেজী অক্ষরে আবদ্ধ থাকিলে উপকার হইবে না। উহা অন্ততঃ উর্দ্দু ও বাঙ্গালাতে অনুবাদিত হইয়া মুসলমান-প্রধান স্থান মাত্রেই বিতরিত হওয়া আবশ্যক।

এ বৎসরের সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, উপাদেয় ও সুন্দর বক্তৃতা স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের। এবম্বিধ বক্তৃতার সংখ্যা কঙ্গ্রেস-সাহিত্যে বিরল। ইহা যেমন সুচিন্তিত,

তদ্রূপ সুলিখিত। ইহা উচ্চতায়, বক্তার স্বস্থানের মত সম্ভ্রান্তশীলতায় তদ্রূপ বিনীত; ইহা চিন্তাশীলতায় শীতল ও গভীর, অথচ আন্তরিক উত্তাপে চিত্তাকর্ষক। পরন্তু ইহা স্থানে স্থানে প্রচ্ছন্ন পরিহাস-রসিকতায় সরস এবং সর্ব্বত্র সুরুচি-সম্পন্ন ও সবল। স্যার রমেশচন্দ্রের বক্তৃতা সাহিত্যাংশে এই। অপিচ, স্যার রমেশচন্দ্রের কঙ্গ্রেসাভিমতের এই অভিব্যক্তি কঙ্গ্রেসের উপকারে আসিবে, ইহা বলা বাহুল্য। ইহা দ্বারা অন্ততঃ কতক লোক কঙ্গ্রেসে কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্বাসবান হইবে এবং আকৃষ্ট হইলেও পারে। কিন্তু, বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়া প্রচার হওয়া আবশ্যক। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের এই বক্তৃতা ও কঙ্গ্রেসের আরও কোন কোনও বিষয় সময়ান্তরে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল। এখন উপসংহারে কেবল এইমাত্র বক্তব্য যে, এই প্রবন্ধে বহু কথা বিচারের আকাঙ্ক্ষায়, অনেক স্থলে হয় ত, অল্প-বুদ্ধি প্রবন্ধ-লেখকের ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে, অনেক স্থলে হয় ত চিন্তাবেগ বশতঃ অশিষ্টাচার হইয়া থাকিবে। কিন্তু, বিষয়টী যেরূপ বৃহৎ ও বিশিষ্ট, উহার এই আলোচনাকারী তদ্রূপ ক্ষুদ্র ও অক্ষম এবং এই আলোচনা তদ্রূপ অকিঞ্চিৎকর। পরন্তু, এই প্রবন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, সম্পূর্ণ সরল বিশ্বাস ও কঙ্গ্রেসের সহিত সমবেদনা ও তৎপ্রতি ও তাহার ন্যায্য প্রাপ্য ন্যায্য সম্ভ্রম প্রণোদিত হইয়া লিখিত হইয়াছে। অপিচ বুদ্ধির ভুল, বিচারের ভুল, তথ্যানভিজ্ঞতার ভুল যাহা ঘটিয়াছে, সরল ও শান্তভাবে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক কেহ প্রদর্শন করিলে, তাহা স্বীকার করিতে ও তদ্দ্বারা সংশোধিত হইতে বিনীতান্তঃকরণে প্রস্তুত আছি। অতএব, এই সকল কারণে, আমাদের যে কিছু ভ্রম প্রমাদ ও ত্রুটি হইয়া থাকে, তাহা প্রবীণ ও সমীচীন পাঠকবর্গের নিকট মার্জ্জনীয় হইবে, এমন আশা করা যায়। বৃহৎ ক্ষুদ্র সকলেরই কর্ত্তৃক কঙ্গ্রেস কথায় ভাল মন্দের আলোচনায় কঙ্গ্রেসের মত পদার্থের ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট নাই, ইহা বিজ্ঞ কঙ্গ্রেসীবর্গ অবশ্য বুঝেন; নিম্নাধিকারীদের ও বুঝা আবশ্যক।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

বিদেশী বাঙ্গালী। (৫)

দুর্লভ গোস্বামী।

ভক্তাধিক ভক্ত, গায়ককুলাগ্রগণ্য, পরম সাধু দুর্লভ গোস্বামী মহাশয় ভারতের এক মহাধর্ম্মবীর। ইনি বর্ণে বৈদ্য, ধর্ম্মে হিন্দু, চর্ম্মে বাঙ্গালী, সম্প্রদায়ে বৈষ্ণব এবং সাংসারিক জীবনে স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ। দুঃখের বিষয় যে দেশে ইঁহার জন্ম, যে জাতির ইনি অলঙ্কার, সেদেশে ও সে জাতি মধ্যে ইঁহার নাম সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। দুর্লভের নাম বাঙ্গালা দেশে কেহই জানেন না; দাক্ষিণাবর্ত্তে দুলু গোঁসাই নামে একজন বঙ্গবাসী প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে সুন্দর স্বভাব, নির্ম্মল চরিত্র, ধর্ম্মপ্রচার, মানবজাতির দুঃখাপনোদন জন্য কিরূপ যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন, দক্ষিণাবর্ত্তে কিরূপে তিনি চরিত্র বলে একজন অসাধারণ পুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, হিন্দু ও মুসলমান সমাজে কিরূপে তিনি

বাঙ্গালী-অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালী জাতি মধ্যে এ কথার কেহই সংবাদ রাখেন না। আমিও যে সংবাদ রাখিতাম, এমত নহে; আমিও দুর্লভ গোস্বামীর কীর্ত্তিকলাপের কথা শ্রবণ করি নাই; ইংরাজী ১৮৮৮ অব্দের জানুয়ারী মাসে আমি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী ভ্রমণ করিতে করিতে এই বাঙ্গালী মহাত্মার নাম, গুণ ও মাহাত্ম্যের কথা সর্ব্ব প্রথমে শুনিতে পাইলাম। কয়েক স্থানে বহু অনুসন্ধান করিয়া এই প্রাচীন পুরুষের সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই এস্থলে লিপি-বদ্ধ করিতেছি।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ত্রিপতি নাম্নী নগরী দক্ষিণাবর্ত্তের হিন্দুর এক মহা-তীর্থ স্থান। ইহা বৈষ্ণবদিগের মহাপীঠ, ইহা অতি প্রাচীনা ভূমি। ত্রিপতি নগরী উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা, রেল-ওয়ে ষ্টেশন হইতে নগর প্রায় অর্দ্ধ মাইল। ত্রিপতি নগরীতে একজন মহাধনশালী মোহান্ত বাস করেন এবং এখানে বহুসংখ্যক বৈষ্ণবাচার্য্যের "আখেড়া" আছে। সহর হইতে কয়েক মাইল দূরে গোকর্ণ গিরি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারই উপরে প্রকৃত ত্রিপতি নগরী স্থাপিতা। সিটি ত্রিপতি রেল-ওয়ে ষ্টেশনের নিকটে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বসা-ইয়াছেন, সুতরাং ইহা প্রাচীনা ত্রিপতি নহে।

খ্রীষ্টীয় ১৮৮৮ অব্দে আমি ত্রিপতি সিটিতে পৌঁছিয়া তত্রত্য মুন্সেফ মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম; ইনি জাতিতে তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ এবং সম্প্রদায়ে বল্লভাচার্য্য-বৈষ্ণব। একদিন বাঙ্গালী জাতি এবং চৈতন্য মহা-প্রভুর প্রসঙ্গ হইতেছিল, এমন সময়ে মুন্সেফ মহাশয় বলিয়া উঠিলেন "বহুশতবর্ষ পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী বৈষ্ণব ত্রিপতিতে আসিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক পর্ব্বতোপরে বাস করিয়াছিলেন, তিনি একজন অসাধারণ দৈববলসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁহার সমস্ত জীবন ধর্ম্মালোচনায়, ঈশ্বরোপাসনায় এবং পরোপকারে ব্যয়িত হইয়াছিল, ঐ মহাত্মার সমাধি গোকর্ণ গিরির বৈষ্ণব-গোস্বামী আচার্য্যদিগের রমণীয় সমাধি শ্রেণী মধ্যে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে; শত সহস্র নর নারী ফুল চন্দন দিয়া ঐ সমাধির এখনও পূজা করে।" বন্ধুবর মুন্সেফের এই কথা শুনিয়া আমার রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল; অবশেষে এতই কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া উঠি-লাম যে, পর দিবস পদব্রজে আমরা সেই বাঙ্গালী সাধুর সমাধি দেখিবার জন্য গোকর্ণ গিরিতে যাইয়া পৌঁছিলাম। এই গিরি অতি উচ্চ, ইহার সর্ব্বত্র নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলোৎস দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও কোনও স্থানে পর্ব্ব-তের গাত্রে অতি প্রাচীন গুহা বিদ্যমান, এই গুহায় অনেক যোগী বাস করেন বলিয়া শুনা যায়; আমরা একটা গুহায় প্রবেশ করিয়াছিলাম, উহার অভ্যন্তরে দিব্য মন্দির, মনোহর কূপ, ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান, ছোট, ছোট কুটীর ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। যাহা হউক, অনেক কষ্টে গোকর্ণ গিরির উপরে আরোহণ করিয়া, বিনা অনুসন্ধানে—অতি সহজেই—দুর্ল্ভ গোস্বামীর সমাধিকে ভক্তি-ভরে দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম। ইহাতে এই বুঝিলাম যে, দুলু গোঁসাই বা দুর্ল্ভ গোস্বামী নামে এক পূজ্যপাদ ব্যক্তি অতি পুরাতন কালে ত্রিপতিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু "তিনি বাঙ্গালী ছিলেন কি না?" এই তর্ক মনোমধ্যে উদয় হইল।

দুলু গোঁসাই যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি, সে কথা এখন বলিতেছি।

বন্ধু বলিলেন, প্রবাদ, জনশ্রুতি এবং বহুকাল হইতে প্রচলিত বৈষ্ণব সমাজের ক্রিয়াকাণ্ড মতে ইহা প্রমাণীত হইয়াছে যে, দুলু গোঁসাই বাঙ্গালী ছিলেন। মুন্সেফের এই কথা গুলি বিচার করিয়া দেখিবার জন্য আমি অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। অনুসন্ধানারম্ভের পুর্ব্বেই কয়েকটি অকাট্য প্রমাণ দ্বারা দুলুকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারিলাম। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিলেন, এই সমাধিস্থ মহাপুরুষের প্রকৃত নাম (Full Name) দুর্লভচন্দ্র সেন; ইনি গোঁসাইগিরিতে দীক্ষিত হইবার পরে বৈষ্ণবেরা ইহাঁর দুর্লভ গোস্বামী নামকরণ করেন। 'দুর্লভ' এই নাম বাঙ্গালী ভিন্ন আর কোনও দেশীয়ের মধ্যে প্রচলিত নাই; "দুর্লভচন্দ্র" এই নাম বাঙ্গালী ভিন্ন আর কাহারও যে হয় না, যাঁহারা ভারতবর্ষ পরিব্রজন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা সহজেই বুঝিয়া লইতে পারেন। "দুর্লভচন্দ্র সেন"—এই নাম যে বাঙ্গালীর, তাহা দশম বৎসরের বালকও বলিয়া দিতে পারে। সেন উপাধি বাঙ্গালীর একচেটিয়া, বঙ্গদেশের বাহিরে এ উপাধি চলেনা; মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী মধ্যে দুর্লভচন্দ্র সেন কোনও দেশীয় ব্যক্তির নাম হয় না। তদ্ভিন্ন সমগ্র দেশ-ব্যাপী—সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজ ব্যাপী—বহুকালের জনশ্রুতি দ্বারাও দুলু গোঁসাইয়ের বাঙ্গালীত্ব প্রমাণীত হইতেছে। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটি সুন্দর প্রমাণ আছে। পাঠক মহাশয়ের বোধ হয় জানা আছে যে, পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গালী জাতি ব্যতীত আর কোনও জাতিই মস্তককে অনাবৃত রাখেনা, এই জন্য বঙ্গদেশের বাহিরে বাঙ্গালীর "মাথা খোলা" উপাধি হইয়াছে। মান্দ্রাজ অঞ্চলে রেল বা তার খোলা হইবার পুর্ব্বে, মহাপ্রভু চৈতন্য এবং তাঁহার সহচরগণ ব্যতীত আর কোন বাঙ্গালী এ দেশে প্রাচীন সময়ে আসিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় না। দুর্লভ গোস্বামী বাঙ্গালী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মাথা খোলা ছিল, তামিল ভাষায় এখনও একটা শ্লোক আছে যাহার অর্থ এই যে "দুলু বাঙ্গালী গোঁসাই ভিন্ন মাথাটা আর কাহারও খোলা দেখ্‌লাম না।" এই শ্লোকটার কিয়দংশ অনুবাদ করিলে এইরূপ হয়—

"তৈলঙ্গী, তামিলী আর মালোয়ালের লোক,
পাগ্‌ড়ীর ভারে, গেল মরে, ক'চ্ছে কত শোক।
চেয়ে দেখ, দুলু গোঁসই, বাঙ্গালার বড় বীর,
আর কোথাও কি দেখিয়াছ, এমন খোলা কেশের শির।"

এই দুলু গোঁসাই মহাত্মা কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং কোন্ কুলের মুখোজ্জ্বল করেন, তাহার কিছুই জানা যায় না। যে সময়ে মহা প্রভু চৈতন্য এবং তাঁহার সহচরগণ দক্ষিণাবর্ত্তে ধর্ম্ম প্রচার জন্য আগমন করেন, দুর্লভচন্দ্র সেন তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন; সেন মহাশয় তখন অর্দ্ধ-সংসারী অর্দ্ধ-বৈরাগী। ইনি চৈতন্যের অথবা তাঁহার সহচরগণের চিকিৎসক হইয়া অথবা সেবক রূপে দাক্ষিণাত্যে আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্য অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, কেবল এক জন দুর্লভ গোঁসাইয়ের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যে ইনি আইসেন নাই। ইহার সহিত আমাদের প্রস্তাবের দুলু গোঁসাইয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই। দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে প্রত্যাগত হইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে সকল ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা ক্রিয়াকলাপ প্রচার করেন, তৎসম্বন্ধে বৈষ্ণব

সাহিত্যে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে,তাহাতে দুর্লভ গোঁসাইয়ের নাম নাই ; নাম না থাকিবারই কথা, কারণ এই যে—দুর্লভ গোঁসাই চৈতন্যদলকে পরিত্যাগ করিয়া যান এবং যে সময়ে পরিত্যাগ করেন, সে সময়ে তাঁহার নাম বা যশঃ বিস্তৃত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার নাম উল্লিখিত হয় নাই। এস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা উচিত যে,বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বঙ্গদেশের বৈদ্য সমাজ যেরূপ ঘনতর রূপে মিলিয়া মিশায়াছিল, আর কোনও সমাজ সেরূপ মিশিয়া ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বৈষ্ণব সাহিত্যের অর্দ্ধাংশ হইতেও অধিক গ্রন্থ বৈদ্য-লেখনী প্রসূত। দুর্লভ গোস্বামী এই বৈদ্যকুলের মুখোজ্জ্বল করেন। ত্রিপতি হইতে শ্রীচৈতন্য দক্ষিণে চলিয়া গেলে,দুর্লভ তাঁহার সঙ্গে আর যান নাই ; কেন যান নাই, আমরা তাহা জানিনা। তিনি ত্রিপতিতে থাকিয়া কিছুকাল বৈদ্যের ব্যবসা (চিকিৎসা) করেন, তখন "তিনি সেন বাবু" বা "দুর্লভ সেন" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তদন্তর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের সামাজিক প্রথামতে গোস্বামী মতে দীক্ষিত হয়েন এবং দুর্লভ গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। আমরা এইবার দুর্লভের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছু বলিব।

মহাত্মা দুর্লভ গোস্বামী একজন প্রকৃত ধর্ম্মবীর ছিলেন। সংসার পরিত্যাগ করিয়া তীব্র বৈরাগ্য-ব্রত গ্রহণ করিবার পরে নিষ্কাম ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছু পালন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার সমস্ত জীবন সংসারের উপকারে ব্যয়িত হইয়াছিল। নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, অপরের সুখে তিনি সদা সুখী থাকিতেন। দরিদ্রের দুঃখ মোচন, পীড়িতের সেবা, অনাথের পালন, দুশ্চরিত্রের সংশোধন, অজ্ঞানীর সংস্কার, সত্য ধর্ম্মের আলোচনা, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, ব্রহ্মোপাসনা, যোগাভ্যাস প্রভৃতি কার্য্যেই তাঁহার আনন্দ ছিল। বৃদ্ধ, যুবা, বালিকা, হিন্দু, মুসলমান, শাক্ত, শৈব—সকলেরই তিনি নমস্য ও প্রিয় ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ একটী কথাও বলিত না, যেহেতু তাঁহার বিরুদ্ধে বলিবার কোনও হেতুই ছিল না। প্রভাতে উঠিয়া তিনি উপাসনার পরে আপনার আশ্রমের সম্মুখে গো, মেষ, মহিষ, ছাগ, পক্ষী প্রভৃতির জন্য চাউল প্রভৃতি শস্য ছড়াইয়া দিতেন,এবং ইষ্টক-নির্ম্মিত এক বৃহৎ "হৌজে" নির্ম্মল জল স্বহস্তে ভরিয়া রাখিতেন, এই জলে বহুসংখ্যক তৃষিত জীবের পিপাসার শান্তি হইত। গ্রীষ্মকালে পর্ব্বতের যে রাস্তা দিয়া পথিকেরা গোকর্ণে উঠিত, তাহার স্থানে স্থানে তৃষিত যাত্রীর জন্য তিনি জলের কলস বসাইয়া রাখিতেন। পশু-পক্ষীদের আহার হইলে,তিনি দরিদ্র ও পীড়িতদিগের ঘরে ঘরে গিয়া দেখিয়া আসিতেন এবং বিনা মূল্যে ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া বিতরণ করিতেন। জাতিতে বৈদ্য ছিলেন বলিয়া অনেক ঔষধাদি তাঁহার জানা ছিল। তদন্তর ভিক্ষা দ্বারা যাহা কিছু প্রাপ্ত হইতেন,তাহাই স্বহস্তে পাক করিয়া পরমানন্দে ভোজন করিতেন। অপরাহ্ণে শাস্ত্র ব্যাখ্যা, সায়াহ্নে সঙ্কীর্ত্তন এবং রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত নগরের প্রধান প্রধান স্থানে বীণা বাজাইয়া ব্রহ্মগুণ গান করিতেন। মধ্যরাত্রে যোগ সমাপন করিয়া নিদ্রিত হইতেন এবং খুব প্রভাতে উঠিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন। মধ্যে মধ্যে দেশ দেশান্তরে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার

করিতেন। প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের তিনি প্রচারক ছিলেন; স্বার্থত্যাগ, স্বদেশের ও স্বজাতির উপকার,এক ব্রহ্মোপাসনা, জাতি-ভেদের অলীকতা, পরোপকার পরম ধর্ম্ম, এ সকল কথা তিনি শাস্ত্র প্রমাণ দিয়া বুঝা-ইতেন। তাঁহার শরীর যেমন সুস্থ, সবল ও সুন্দর ছিল, মানসিক বলেও তিনি তেমনি বলীয়ান ছিলেন; লোকে তাঁহাকে জ্ঞানের বারিধি বলিত। তাঁহার সুন্দর চরিত্র এবং নির্ম্মল স্বভাব অতি সহজেই লোকের চিত্তাকর্ষণ করিত। আশ্রমে চৈতন্যের একটী প্রতিমূর্ত্তি ছিল, শুনিলাম, কম্বোকনম নগরের-জনৈক ব্রাহ্মণের বাটীতে উহা এখনও বিদ্যমান আছে। দুর্লভ গোস্বামীর নিত্য পাঠ্য চৈতন্য-চরিতের কয়েক পৃষ্ঠা ত্রিপতি বৈষ্ণবাচার্য্য মন্দিরে এখনও সযত্নে রক্ষিত।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

শোক-সঙ্গীত। *

মোগল-সম্রাট-কেশরী আকবরের রাজত্বকালে রাজস্থানের প্রায় সমস্ত হিন্দু রাজন্যবর্গ দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করেন। অম্বরের রাজা মানসিংহ প্রভৃতি কেহ কেহ মোগল সম্রাট পরিবারের সহিত উদ্বাহ-সম্বন্ধ স্থাপন পুর্ব্বক দিল্লীশ্বরের অধীনে উচ্চরাজ কার্য্যে নিযুক্ত হন। কেবল চিতোরের হিন্দুসূর্য্য মহারাজা প্রতাপসিংহ সূর্য্যবংশের গৌরব অক্ষুণ্ন রাখেন, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিয়া চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। অবশেষে দিল্লীশ্বর বহু সৈন্য সামন্ত সহিত নিজপুত্র সেলিমকে প্রতাপসিংহের প্রতিকূলে প্রেরণ করেন। হলদীঘাটের পবিত্র সমরক্ষেত্রে প্রতাপসিংহ অতুলনীয় শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন,কিন্তু তাঁহার কতিপয় সহস্র সৈন্য অবশেষে সম্রাটের অগণ্য সৈন্যের নিকট পরাভূত হয়। এই যুদ্ধে সহস্র সহস্র রাজপুত বীর রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করেন, এবং মুসলমান সৈন্যের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য রজনীতে শত শত রাজপুত কুলাঙ্গনা জলন্তচিতা আরোহণ করেন। এই চিতারোহণ উপলক্ষে এই সঙ্গীতটি রচিত হয়।

(১)

সান্ধ্য আকাশে লোহিত দিনমণি
তিমির সাগরে ডুবিছে রে॥
পর্ব্বত-কন্দরে উচ্চ বিলাপে
শৈল-সমীরণ স্বনিছে রে।
মন্থর গমনে ওই ক্ষুদ্রা তরঙ্গিণী
কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলিছে রে॥
দিগন্তবেষ্টিত ভীম শ্মশানে
লোহিত করজাল পরকাশিছে রে।
আজি বিশাল প্রাঙ্গণে শোণিত রঞ্জিত
রাজপুতগণ চিরনিদ্রিত রে॥
জীবন বিসর্জ্জিয়া জননীচরণে
রাশি রাশি দেহ রাজি শোভিছে রে।
শিশিরের ছলে যত স্বর্গসীমন্তিনী
তাহে নয়ন আসার বরষে রে॥
হেনকালে দিল দেখা ভূধর উপরে
শত শত রাজপুত রমণী রে।
রকত বসনে সকলে বসানা
বনফুলে শোভিত বেণী রে॥
নৈশ আন্ধারে ডুবিল ধরা
স্বর্গের পটখানি শোভিল রে।
জ্বলিল চিতা ভীম গরজনে
শত রাজপুত রমণী গাইল রে॥

(২)

ঘোর আন্ধারে ডুবিল দেশ
নরনারী ক্রন্দন ছুটিল রে॥
ওগো ও জন্মদে! স্নেহময়ি জননি!
বিদায় মাগি হে তব চরণে রে।

---

* "যমুনা লহরীর" সুর।

নিরখি তোমারে আকুল হিয়া
হৃদয়-আগার আন্ধার রে ॥
আর্য্য শোণিতে লভেছি জনম
আর্য্যের মত প্রাণ সঁপিব রে।
সাক্ষী থাকহে তুমি দেবী বিভাবরি!
তারকামালিনী যামিনি! রে ॥
বীর-রমণী মোরা বীর প্রসূতি
যাই চলি পতিপুত্র যেখানে রে।
জয়দেব হুতাশন বিশ্ব-পবিত্রা
প্রণমিছে রাজপুত রমণী রে ॥
বলিতে বলিতে তবে অনল প্রবেশিল
শত শত নারীবেশী দেবী রে।
পর্ব্বত-কন্দরে সিংহী গরজিল
স্বরগ ভূধর কাঁদিল রে ॥
দেখিতে দেখিতে কুসুমাসারে
পর্ব্বত প্রাঙ্গণ ছাইল রে।
দেখিতে দেখিতে বিদ্যুৎ রূপে
চিতানল আকাশে মিশিল রে ॥
কোথা সবে জননি গো কাঁদিছে পরাণ আজি
দুনয়নে জলধারা বহিছে রে ॥
সোনার ভারত এবে ভীম শ্মশান
ঘনঘটা আকাশে খেলিছে রে।
বজ্র গরজনে ঝঞ্ঝা বহিছে
ভারত দুঃখিনী মূর্চ্ছিতা রে ॥
জাগাও জাগাও সবে ভীম নিনাদে
জাগাও এ নির্জীব ভারত রে।
জীমূত মন্দ্রে বিদ্যুৎরূপে
ভারতাকাশে পরকাশিয়া রে ॥
জাগাও জাগাও সবে আর্য্য রমণী
দেখ সবে ম্রিয়মাণা রয়েছে রে।
স্বর্গীয় তেজে পূরাও সবারে
দুন্দুভি নাদে ধরা কাঁপাও রে ॥
নৈশ ঝটিকাসনে এসগো ছুটিয়া
শত শত স্বর্গীয় দেবী রে।
সবে শিয়রে বসিয়া দেখাও স্বপন
নিদ্রিত যুবকে জাগাও রে ॥
মিলিয়া সকলে নগরাজ শৃঙ্গে
সিংহীর গরবে দাঁড়াও রে।
কাঞ্চন-জঙ্ঘা স্বর্ণ কিরীটী
নবরাগ-রঞ্জিত শোভিবে রে ॥
স্বরগ মরত ভূধর সাগর
জয় জয় নাদে পূরিবে রে।
গঙ্গা যমুনা সিন্ধু কাবেরী
নাচিয়া নাচিয়া বহিবে রে ॥
স্বর্গের দূত হেমপক্ষ প্রসারি
ভারত আকাশে উড়িবে রে।
হাসিবে কাঁদিবে নাচিবে গাইবে
ওই চিতাভস্ম মাখিবে রে ॥

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন।

আহার-তত্ত্ব।

ভেতো বাঙ্গালী বলিয়া আমাদের একটা দুর্নাম আছে। ভাত কি হেয় পদার্থ? তবে এ দুর্নাম কেন?

আবার কেবল বাঙ্গালীরাই ভেতো নহে। বঙ্গ-উপসাগরের তিন পার্শ্বের লোকেরই ভাতগত প্রাণ। মান্দ্রাজ, উড়িষ্যা, বাঙ্গালা ও ব্রহ্মদেশ, এই কয়েক প্রদেশেই ধান্যের প্রচুর আবাদ এবং এই কয়েক প্রদেশে ভাতই প্রধান খাদ্য।

অবশ্য হিন্দুজাতি ভেতো নহে। কিম্বা ভারতবাসী ভেতো নহে। সমুদয় ভারত লইতে গেলে, ভাত অল্প লোকের প্রধান খাদ্য। গম, যব, জোয়ার, বাজরা, দাইল ইত্যাদি ভারতবাসীর খাদ্য। তবে বঙ্গউপসাগর বেড়িয়া কয়ে-

কটা প্রদেশে ছাতু ও আটা যেরূপ, ভারতের অপর প্রদেশে ভাত সেইরূপ। কেবল ধনী-লোকের রসনার তৃপ্তি সাধন করে।

ভাতের দোষগুণ বিচারের পূর্ব্বে আহারের প্রয়োজনটা বুঝা কর্ত্তব্য। কিন্তু আহারের প্রয়োজন বুঝেন না কে? আহার ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব, এ কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। কিন্তু আহার করাটা নিত্য ব্যাপার বলিয়াই একটু বিচার করা আবশ্যক। প্রত্যহ যাহা করিতে হয়, তাহার ভাল মন্দ সবিশেষ বিবেচনা করিয়া করা কর্ত্তব্য।

ছেলেবেলায় দুর্ভিক্ষের কথা শুনিলে মনে হইত,দেশে কত গাছপালা, কত মাটি-জল আছে, সেই সব খাইয়া লোকে পেট ভরায় না কেন? মাটি জলের ত অভাব নাই। আর পেট খালি হয় বলিয়াই ত ক্ষুধা বোধ করি। তখন কেহ যদি বলিত, মাটি খাইতে মিঠে লাগিবে কেন? অমনই উত্তর হইত, নুন তেল মাখাইয়া ভাজিয়া বা রাঁধিয়া খাইলে চলে না? অনেক শাক কাঁচা খাইতে মাটি অপেক্ষা সুস্বাদু বোধ হয় না। আমাদের মধ্যে যে বুদ্ধিমান ছিল, সে বলিত "মাটি যে খাবার জিনিস নয়।" তা'ত নয়, কিন্তু কেন নয়? আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

এক ব্যক্তি একটি নূতন পুষ্করিণী কাটাইয়াছিলেন। পুষ্করিণী করিলেই তাহাতে মাছ করিতে হইবে। বড় পুষ্করিণী, অনেক জল। অনেক মাছ ছাড়া হইল। কিন্তু দুই বৎসর গেল,মাছ যেমন ছিল, তেমনই রহিল। বড় পুঁটি মাছ অপেক্ষা রুই কাতলা বড় হইল না। এমন সাধের পুকুরে মাছ হইল না, পুষ্করিণীর কর্ত্তার দুঃখের অবধি রহিল না। নির্ম্মল জল, লতা পাতা নাই, পুকুরের চারি পাড় পরিষ্কার; অথচ মাছ বাড়ে না। কেহ বলিয়াছিল, পুকুরের মাছ খাইতে পায় না। কর্ত্তা শুনিয়া অবাক হইয়াছিলেন। পুকুরে কি মাটি জল নাই?

এক দিন খাইতে না পাইলেই শরীর অবসন্ন হয়,নড়িতে চড়িতে,কাজকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয় না। শাস্ত্রে শরীরটা নবদ্বারযুক্ত বলা হইয়াছে। কিন্তু দ্বার সংখ্যা নয় হউক বা দশ হউক, কয়েকটি দ্বার দিয়া আমরা অবিরত ব্যয় করিতেছি। এই ব্যয়টা বন্ধ করিতে পারিলে আহার চিন্তা থাকিত না।

কিন্তু ব্যয় হয় বলিয়াই শরীর যন্ত্রটা রক্ষিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে একটা পুরাতন দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের দেহটা একটা ষ্টীম এঞ্জিন বা বাষ্পীয় যন্ত্র। একখানি এঞ্জিন থাকিলেই তদ্দ্বারা কাজ পাওয়া যায় না। এঞ্জিন দ্বারা কাজ পাইতে হইলে খরচ করিতে হয়। সকলেই জানেন, এঞ্জিনের খরচ কাট বা কয়লা। তবেই কাট বা কয়লা পোড়াইলে যে শক্তি জন্মে, তাহাই এঞ্জিনের কাজ করিবার শক্তি। এঞ্জিন দ্বারা যত কাজ হয়, সমুদয় সেই কাঠ বা কয়লার শক্তি দ্বারা হয়।

কাঠ বা কয়লা পোড়াইলে যত শক্তি প্রকাশিত হয়, তাহা পরিমাণ করিতে পারা যায়; আবার কত শক্তি দ্বারা কত কাজ হইতে পারে, তাহাও পরিমিত হইয়াছে। এই ভাবে দেখিলে, এঞ্জিনে যত কাঠ বা কয়লা পোড়ান হয়, তাহা অত্যল্পই আমাদের কাজে আসে। কাঠ বা কয়লার সমুদয় শক্তির প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ আমাদের কাজ করে। অবশিষ্ট তাপের আকারে বায়ুর সহিত মিশিয়া বৃথা নষ্ট হয়।

তাহা ছাড়া এঞ্জিনের মধ্যে একখান বড়

চাকা ঘুরে এবং সেই ভ্রাম্যমান চাকার শক্তি দ্বারা ময়দার কল বা রেলেরগাড়ী চলে। কিন্তু সেখানি ছাড়া আরও কত ছোট বড় চাকা ঘুরিতে থাকে। সে গুলা চালাইতেও শক্তি চাই। এই শক্তি-ব্যয়টা কি বৃথা ব্যয় নহে?

বৃথা ব্যয় নহে। কেন না, বড় চাকাটা চলিতে পারিবে বলিয়াই এই সকল ছোট চাকা চালাইতে হয়। এগুলা ঠিক না চলিলে বড় চাকা চলে না এবং ময়দা ভাঙ্গাও হয় না। তবেই দেখা গেল, এঞ্জিনে তাপের আকারে বৃথা ব্যয় ছাড়া আর এই রকমে শক্তি ব্যয়িত হয়। (১) ছোট চাকা গুলা চালাইতে যে শক্তি ব্যয় হয়, তাহাকে আভ্যন্তর ব্যয় বলা যাইবে এবং (২) বাহিরের বড় চাকা ঘুরাইতে যে শক্তি ব্যয় হয়, তাহাকে বাহ্য ব্যয় বলা যাইবে।

আমাদের শরীর-যন্ত্রে এঞ্জিনের বৃথা ব্যয়টা নাই। কিন্তু অপর দুই প্রকার ব্যয় আছে। বুকের ভিতরে যে হৃদ্‌যন্ত্র দিবারাত্রি ধক্ ধক্ করিতেছে, তাহার জন্য অনেক খানি শক্তি আবশ্যক হয়। ফুস্‌ফুস্ আছে, আহার পরিপাক করিবার জন্য পাকযন্ত্র আছে, আরও কত কল শরীরের মধ্যে চলিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয়, শরীরকে সর্ব্বদা একই ভাবে উষ্ণ রাখিতে হইতেছে, গাত্রচর্ম্ম দিয়া জল বাষ্পীভূত করিতে হইতেছে। এ সমস্ত কাজের জন্য শক্তি চাই। ইহাদের উপর, বাহিরের কাজ কর্ম্ম করিতে শক্তি আবশ্যক।

স্থূল দৃষ্টিতে আমাদের দেহের আভ্যন্তর ব্যয়টা বৃথা বোধ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এঞ্জিন খানা গড়িতে কত শক্তি লাগিয়াছিল, উহার জীর্ণসংস্কার করিতে শক্তি আবশ্যক হয়। আমাদের দেহ নিজেই আপনাকে নির্ম্মাণ করিতেছে, নিজেই আপনার জীর্ণসংস্কার করিতেছে। শরীরকে সর্ব্বদা উষ্ণ রাখিতে হইতেছে। নতুবা প্রাণ রক্ষা হয় না।

তবেই দেহযন্ত্র কার্য্যক্ষম অবস্থায় রাখিতে এক ব্যয় এবং তদ্দ্বারা বাহিরের কাজ করিতে আর এক ব্যয়। প্রথম ব্যয়টা বন্ধ করিলে দেহযন্ত্রটাই যায়। দ্বিতীয় ব্যয়টা ইচ্ছানুসারে কমাইতে বাড়াইতে পারি। যদি কোন প্রকার কাজ না করিয়া কেবল দেহখানাই বাঁচাইয়া রাখিতে চাই, তাহা হইলে দ্বিতীয় ব্যয়টা করিতে হইবে না। অবশ্য এরূপ স্থলে জড়ভরত হইয়া দিন কাটাইতে হইবে।

সময় ও অবস্থা বিশেষে আমরা প্রথম ব্যয়টাও কিছু কমাইতে পারি। শীতকালে দেহ অনাবৃত রাখিলে দেহের অনেক শক্তি তাপরূপে বৃথা নষ্ট হয়। আগুন জ্বালিয়া কিম্বা শীতবস্ত্রে বা ভস্মাদিতে দেহ আবৃত করিয়া এই অপব্যয় কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। সর্পাদি কতিপয় প্রাণী দেহের যন্ত্রগুলিকে এমন অবসন্ন অবস্থায় রাখিতে পারে যে, তাহারা কয়েক মাস আহার করিয়া অন্ন হইতে শক্তি সঞ্চয় না করিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অবশ্য এই সময়ে তাহাদের শরীর শীর্ণ হইতে থাকে।

দুই এক দিন কিছু না খাইলে যে শরীর শুকাইয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, তখন আমরা শরীরের আভ্যন্তর শক্তি ব্যয়টা শরীর দ্বারাই সম্পাদন করি। বস্তুতঃ উপবাসী ব্যক্তি নিজের শরীর ভক্ষণ করে। এজন্য শরীর শীর্ণ হয় এবং শক্তির অভাবে অবসন্ন হয়। কিন্তু যদি কর্ম্মঠ হইতে চাই, তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যয়টা যথোচিত করিতে হইবে।

কিন্তু বিধাতা এমনই নিয়ম করিয়াছেন

যে, আয় না থাকিলে ব্যয় করা চলে না। সুতরাং জীবন ধারণ করিতে হইলে আহার আবশ্যক এবং যিনি যত কাজ করিতে চান, তাঁহাকে তদনুরূপ আহার করিতেই হইবে। আহার দ্বারা দেহ রক্ষিত হয় এবং দেহে শক্তি সঞ্চিত হয়। কিন্তু এজন্য অন্ন কেবল উদরস্থ করিলেই চলিবে না। অন্নকে দেহসাৎ করা চাই। অর্থাৎ অন্নকে আমাদের রক্ত মাংসাদিতে পরিণত করিতে না পারিলে আহারে কোন ফল হয় না। পুষ্করিণী জল-পূর্ণ করিতে হইলে যেমন জল নির্গম পথ খুলিয়া রাখিলে তাহা কখন পূর্ণ হইতে পারে না, তেমনই দেহে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইলে অন্নকে দেহস্থ করা চাই।

এই বিষয়ে দেহযন্ত্র বাষ্পীয় যন্ত্র হইতে পৃথক্। বাষ্পীয় যন্ত্রে কাঠ বা কয়লা যেমন দেওয়া যায়, তাহা তেমনই পুড়িয়া শক্তি উৎপাদন করে। কিন্তু দেহযন্ত্রে অন্ন যেমন প্রবেশিত করা যায়, তেমনই আকারে উহার অত্যল্পই পুড়ে। অধিকাংশই শরীরের রক্ত মাংসে পরিণত হইয়া পুড়ে। এই কথাটী স্মরণ রাখিলে আমাদের কি প্রকার অন্ন আবশ্যক, তাহা বুঝা যাইবে। অন্ন এমন হওয়া চাই যে, তাহা সহজে দেহস্থ করিতে পারা যায়। অতএব যদ্দ্বারা আমাদের রক্ত-মাংসাদি গঠিত হইতে পারে, তাহাই অন্ন।

কি প্রকার অন্ন আবশ্যক, তাহা শরীরের ব্যয় দেখিয়াও বুঝিতে পারা যায়। আমাদের দেহে তিনটি প্রধান ব্যয়স্থান আছে (১) ফুসফুস (২) মূত্রাশয় (৩) গাত্র। এই তিন দ্বার দিয়া যে সকল পদার্থ অবিরত দেহ হইতে চলিয়া যাইতেছে, তৎসমুদয় পূরণ করিতে পারিলে দেহ যেমন, তেমনই থাকে। শৈশবাবস্থায় শিশু যাহা দেহস্থ করে, তাহার কিয়দংশ আভ্যন্তর এবং বাহ্য-ব্যয়ে এবং অবশিষ্ট দেহবর্দ্ধনে নিযুক্ত হয়। যৌবনাবস্থার পরে দেহ বৃদ্ধি আবশ্যক হয় না, এজন্য তখন ব্যয়ানুসারে আহার রূপ আয় করিলেই চলে। অতএব শরীরের পরিমাণের তুলনায় বালকদিগকে প্রৌঢ় অপেক্ষা অধিক আহার করিতে হয়।

দেখা গেল, অন্নের শক্তিই আমাদের দেহের শক্তি এবং দেহের উপাদানই অন্নের উপাদান। দেহের মূল উপাদান অনেক। তন্মধ্যে কার্বণ বা কয়লা, হাইড্রজ, অক্সিজ, নাইট্রজ, গন্ধক, ফস্ফর, এবং কয়েকটী ধাতু প্রধান। এই মূল উপাদানগুলি উপ-যুক্ত পরিমাণে দেহস্থ করিতে পারিলেই আয় ব্যয় সমান থাকে।

আবশ্যক মূল উপাদানগুলি দুষ্প্রাপ্য নহে। কার্বণ বা কয়লা কাঠে, হাইড্রজ জলে, অক্সিজ জলে ও বায়ুতে, নাইট্রজ বায়ুতে এবং গন্ধক ফস্ফর ও ধাতুগুলি মৃত্তিকায় আছে। কিন্তু থাকিলে কি হয়, যেমন ময়দার কলে ইঁট ভাঙ্গা চলে না, তেমনই মূল উপাদান দেহের বড় একটা কাজে আসে না। কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝা যাউক। ঐ সকল মূল উপাদান লইয়া দেহের রক্তমাংস গড়িতে অবশ্য শক্তি চাই। দেহ নিজেই অপর শক্তির অপেক্ষা করে, সুতরাং উহা মূল উপাদান যুড়িয়া রক্তমাংস গড়িবার শক্তি পাইবে কোথায়?

এ বিষয়ে উদ্ভিদ্ প্রাণী হইতে ভিন্ন। তাহারা মূল পদার্থ গ্রহণ করিয়া দেহ নির্ম্মাণ করিতে পারে না বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সামান্য যৌগিক পাইলেই নিজ নিজ পত্র-কাণ্ড গড়িতে পারে। তাহাদের দেহ আরও জটিল যৌগিক দ্বারা গঠিত। সুতরাং তাহা-

দিগকে অল্প জটিল হইতে অধিক জটিল পদার্থ গড়িতে হয়। অবশ্য এজন্যও শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি তাহারা সূর্য্য হইতে লইতেছে। কেননা, সূর্য্যের আলোক না পাইলে তাহারা স্ব স্ব দেহ নির্ম্মাণোপযোগী যৌগিক প্রস্তুত করিতে পারে না।

কিন্তু আমাদের ঠিক বিপরীত। আমরা অধিক জটিল পদার্থ ভাঙ্গিয়া অল্প জটিল করিতেছি। আমাদের দেহের উপাদান যত জটিল, দেহের ব্যয়িত পদার্থ তত জটিল নহে। জটিলকে ভাঙ্গিয়া বা পোড়াইয়া সহজ করিয়াই আমরা শক্তি পাই।

কিন্তু একেবারে কোন মূল পদার্থ আমরা আহার করি না, এমন নহে। বায়ুর অক্সিজ আমরা অবিরত দেহস্থ করিতেছি। আমরা বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকি, এ কথা শুনিলে অনেকে হয়ত বিস্মিত হইবেন? কিন্তু যাহা খাইয়া প্রাণ ধারণ করি, তাহাই অন্ন। তবে অক্সিজ মুখ দিয়া না খাইয়া নাক দিয়া খাই এবং উহা কঠিন কিম্বা দ্রব না হইয়া বায়ু। কিন্তু তা বলিয়া উহার অন্নত্ব বিলুপ্ত হইবে কেন? এই বায়ুরূপ অন্ন পরিমাণেও অল্প নহে। প্রত্যহ প্রায় ৸৹ পোয়া অক্সিজ আমরা দেহসাৎ করিতেছি।

অনেক লোক চাউল, দাইল, জল কত বাছাই করিয়া আহার করে, এবং আবশ্যক হইলে বেশী দাম দিয়াও ঐ সকল অন্ন ক্রয় করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বায়ুটা সহজ লভ্য বলিয়া উহার ভাল মন্দ বড় একটা বিচার করে না। এই শীতকালে লোকে ঘরের দ্বার জানালা আটঘাট বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যায়, কিন্তু সরু চাউল পাওয়া যায় না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করে। তাহাদের অনেকে আবার নাক মুখ লেপ চাপা দিয়া সুখে নিদ্রা যায়। মানব চরিত্র এমনই বিচিত্র বটে!

যাহা হউক, যেমন বায়ুর অক্সিজ ব্যতীত কাঠ পুড়ে না, তেমনই আমাদের দেহও পুড়ে না। কাঠ পুড়িলে যেমন তাপ জন্মে, দেহের মাংসাদি পুড়িলেও তেমনই তাপ জন্মে। প্রভেদের মধ্যে কাঠ পুড়িবার সময় জ্বলিয়া উঠে, দেহের মাংসাদি এমন মন্দ মন্দ পুড়ে যে, জ্বলিয়া উঠে না।

মূল পদার্থের মধ্যে কেবল অক্সিজ বায়ু আমরা শরীরে গ্রহণ করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন, জল ও কয়েকটী ধাতব পদার্থও আমাদের অন্ন। উহাদিগকে সামান্য যৌগিক বলা যায়। জলের ভাল মন্দ বিচার অনেকেই করিতেছেন; তৎসম্বন্ধে এখন কোন কথা বলা আবশ্যক নাই। আমাদের দেহের প্রায় ৷৷৶৹ আনা জল, শিশুদের ৸৴৹ আনা। কিন্তু আমরা কেবল জল পান করিয়াই দেহে জল প্রবেশিত করি না। শিশুদের প্রাণ মানুষদুগ্ধে প্রায় ৸৶৹ আনা জল, গাভীদুগ্ধে ৸৴৹ আনা। শাক সবজি ফল মূলে বিস্তর জল। লাউ কুমড়া শাকে প্রায় ৸৶৹ আনা জল। তরমুজে ৸৶৹ আনা, আলুতে ৸৹, মৎস্য মাংসে গড়ে ৷৷৶৹। চাউল দাইল ময়দার মোটামুটি ৶৹ আনা জল।

ধাতব পদার্থের মধ্যে খাদ্য লবণ, ফস্ফর, গন্ধক, ক্ষার, চূণ ইত্যাদি প্রধান। নুন আমরা প্রত্যহ খাইয়া থাকি। অপরাপর পদার্থ এইরূপে পৃথক্ খাই না বটে, কিন্তু শাকাদির সঙ্গে উহাদিগকে উদরস্থ করিতেছি। কাঠ পোড়াইলে যে ভস্ম অবশেষ থাকে, তাহাই উদ্ভিদ দেহের ধাতব পদার্থ। এ গুলিকে রাসায়নিকেরা সামান্যতঃ লবণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। আমরা সকলেই

উদ্ভিদভোজী। এজন্য এ সকল পদার্থের জন্য ভাবনা নাই। অবশ্য সকল উদ্ভিদে সমান পরিমাণে ধাতব পদার্থ নাই। ১০০ সের পরিষ্কার চাউল পোড়াইলে ॥০ সের মাত্র ভস্ম পাওয়া যায়। দাইলে অপেক্ষাকৃত অধিক ধাতব পদার্থ আছে। তন্মধ্যে ৩৷০ সের চাউলে যত ফস্ফর, ১ সের অড়র দাইলে তত আছে। স্থূলতঃ বলিতে গেলে, দাইল ইত্যাদির খোসায় অপেক্ষাকৃত অধিক ধাতব পদার্থ আছে।

বায়ু, জল, মৃত্তিকা, (ধাতব পদার্থ) এই তিন প্রকার অন্নের উল্লেখ করা গেল। কিন্তু এতদ্দ্বারা আমরা কার্ব্বণ এবং নাইট্রজ পাই না। মৃত্তিকায় সোরা আছে এবং সোরায় নাইট্রজ আছে। সেইরূপ বায়ুতে নাইট্রজের পরিমাণ প্রায় ৸৴০। কিন্তু এই এই আকারে নাইট্রজ আমাদের কাজে লাগে না। সুতরাং কার্ব্বণ ও নাইট্রজ, এই দুইটীর উপায় করিতে পারিলেই আহার সংস্থান হয়।

ইহাদের পরিমাণও অল্প নহে। আমরা প্রত্যহ প্রায় ২৩ তোলা কার্ব্বণ এবং ১.৬ তোলা নাইট্রজ দেহ হইতে ব্যয় করিতেছি। উহাদের অনুপাত প্রায় ১৪ ভাগ কার্ব্বণ ১ ভাগ নাইট্রজ।

এই কার্ব্বণ ও নাইট্রজ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয় বলিয়াই অন্ন চিন্তা বিষম হইয়াছে। উহাদিগকে মূল আকারে কিম্বা সামান্য যৌগিক আকারে পাইলে হয় না। উহাদিগকে বিশেষ জটিল আকারে পাওয়া আবশ্যক। ইহার কারণ পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে উহারা আবশ্যক জটিল আকারে বিদ্যমান। এজন্য উদ্ভিদ কিম্বা প্রাণীদেহ হইতে ঐ দুই পদার্থ গ্রহণ করা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। অর্থাৎ এই কারণে উদ্ভিদ কিম্বা প্রাণীদেহ কিম্বা উভয়ই আমাদের অন্নের মধ্যে হইয়াছে।

উদ্ভিদ ও প্রাণী লইয়া জীব। তাহাদের দেহ জৈব পদার্থ। তবে আমাদের অন্ন গুলি এই কয়েক প্রকার—(১) বায়ুর অক্সিজ (২) জল, (৩) ধাতব লবণ (৪) জৈব পদার্থ। জৈব পদার্থ আমরা তিন আকারে গ্রহণ করিয়া থাকি। (১) সাবু, আরারুট, চিনি প্রভৃতি যে সকল পদার্থে নাইট্রজ নাই, কিন্তু কার্ব্বণ, হাইড্রজ, অক্সিজ আছে। এ গুলিকে রাসায়নিকেরা কার্ব্বহাইড্রেট নামে অভিহিত করেন। (২) ঘৃত তৈল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যে ঐ তিনটী পদার্থ আছে, কেবল হাইড্রজের তুলনায় অক্সিজ কম আছে। (৩) মৎস্য মাংসাদি, যাহাতে ঐ তিন পদার্থ ছাড়া নাইট্রজ আছে। এই শেষোক্ত পদার্থে নাইট্রজ আছে বলিয়া উহাকে নাইট্রজেত পদার্থ বলা যায়।

কার্ব্বহাইড্রেট পদার্থে কার্ব্বণ ।৵০ আনা, চিনিতে একটু প্রভেদ আছে। উহাতে কার্ব্বণ ।৵১৫। ঘৃত তৈলে কার্ব্বণ ও হাইড্রজ বেশী এবং অক্সিজ কম। এজন্য উহাদিগকে পোড়াইলে কার্ব্বহাইড্রেট অপেক্ষা বেশী তাপ পাওয়া যায়। যাহা হউক, ঘৃত তৈলে, কার্ব্বণ গড়ে ৸০ আনা। নাইট্রজেত পদার্থের একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ ডিম্বের শ্বেতাংশ। সেইরূপ দাইল ও ময়দার অংশ বিশেষ এবং মেদ ও অস্থি বিযুক্ত মৎস্য ও মাংস, দুধের ছানা প্রভৃতি নাইট্রজেত পদার্থ। এই সকল পদার্থে গড়ে নাইট্রজ ৵১০ আনা এবং কার্ব্বণ ॥৵৷০ আনা। উভয়ের অনুপাত ১: ৩.৩।

এই সমুদয় জৈব অন্ন ব্যতীত আমরা লেবু, তেঁতুল প্রভৃতি অম্ল, লঙ্কা হলুদ গোলমরিচ প্রভৃতি মসলা খাইয়া থাকি। ইহাদের

পরিমাণ অল্প বলিয়া এখানে ধরা গেল না। অবশ্য এগুলিরও প্রয়োজন আছে।

এই কয়েক রকম জিনিসই আমাদের আবশ্যক। অবশ্য কেবল চিনি কিম্বা আরারুট কিম্বা তৈল বা ঘৃত খাইলে চলিবে না। কেননা, তৎসমুদয়ে নাইট্রজ নাই। মাংসাদি নাইট্রজেড পদার্থে কার্ব্বণ ও নাইট্রজ, উভয়ই আছে। কেবল ঐ প্রকার অন্ন খাইলে ক্ষতি কি?

কিন্তু দেখা যায়, নাইট্রজেড পদার্থে নাইট্রজ ও কার্ব্বণের অনুপাত ১ : ৩·৩। কিন্তু আমাদের চাই ১ : ১৪। সুতরাং আবশ্যক নাইট্রজ পাইতে গেলে কার্ব্বণ কম পড়ে, আবার আবশ্যক কার্ব্বণ পাইতে গেলে নাইট্রজ বেশী হয়। কিন্তু ভাগে নাইট্রজ বেশী পড়িলে ক্ষতি কি? ক্ষতি এই যে, নাইট্রজেড পদার্থ হইতে আবশ্যক পরিমিত কার্ব্বণ পাইতে হইলে ঐ পদার্থ অনেক খানি উদরস্থ করিতে হয়। অতখানি পদার্থ জীর্ণ করিতে পাকযন্ত্রকে তদনুরূপ শক্তি দিতে হয়। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, আমাদের অন্নের শক্তিই মূলধন। সুতরাং যেমন টাকা আদায় করিবার সময় ব্যয়ের দিকটা কম করাই উচিত, তেমনই অন্ন হইতে শক্তি সঞ্চয় করিবার সময়েও অধিক শক্তি ব্যয় বাঞ্ছনীয় নহে।

ইহার উপর আরও কথা আছে। পাকযন্ত্র একটী নহে, অনেকগুলি আছে। কোন যন্ত্র দ্বারা কেবল কার্ব্বহাইড্রেট, কোনটি দ্বারা কেবল ঘৃতাদি তৈল পদার্থ, কোনটি দ্বারা নাইট্রজেড পদার্থ এবং কোনটি দ্বারা সকলগুলিই অল্প পরিমাণে জীর্ণ হইতে পারে। এখন সভ্যসমাজে যেমন লোকের কার্য্যক্ষমতানুসারে ব্যবসায় ভাগ দ্বারা কাজের সুতরাং সমাজের সুবিধা ঘটে, তেমনই পাকযন্ত্র রূপ সমাজের লোকদিগের কার্য্যক্ষমতানুসারে সকলকেই স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত রাখা উচিত। নতুবা কোন যন্ত্রটা নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিবে এবং কোনটা বা অতিরিক্ত গুরু পরিশ্রমে শীঘ্র অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। তবেই আমাদের দৈব অন্ন এমন হওয়া আবশ্যক যে, (১) পাকযন্ত্রের সমুদয় যন্ত্রগুলিই স্ব স্ব কর্ম্ম পাইবে এবং (২) কোন যন্ত্রকেই অতিরিক্ত কাজ করিতে হইবে না। অর্থাৎ ভোজ্য অন্নের কেবল উপাদান দেখিলেই চলিবে না। তাহা সুপাচ্য কি না, তাহা দেখা আবশ্যক। নতুবা দুর্ভিক্ষের সময় বনের লতা পাতা খাইলে চলিতে পারিত।

অনেক পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে, আমাদের ভোজ্য নাইট্রজেড, কার্ব্বহাইড্রেট এবং তৈল পদার্থত্রয়ের পরস্পর অনুপাত ১.৩ ; ৩.৫ : ১ হইলে দেহযন্ত্র সুচারু চলিতে থাকে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তৈল পদার্থের পরিমাণ কিছু কম করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কার্ব্বহাইড্রেট গ্রহণ করিলে কোন ক্ষতি হয় না। এজন্য আমরা ১·৫ : ৪·৫ : ১ অনুপাতে ঐ তিন পদার্থ গ্রহণ করিতে পারি। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা যায় যে, এমন কোন একটী খাদ্য নাই, যাহাতে ঐ তিন পদার্থের অনুপাত ঐ প্রকার। এজন্য আমাদিগকে ঐ তিন রকম পদার্থ মিশাইয়া খাইতে হয়।

দৈনিক অন্নের ব্যবস্থা করিবার সময় কোন্ পদার্থে কত কার্ব্বণ, কত নাইট্রজ আছে, তাহার হিসাব করিয়া খাওয়া চলে না। এজন্য আর একটা সহজ উপায় করা উচিত। ঘৃত তৈলের উপাদান এবং পোড়াইলে কত তাপ জন্মে, তাহা বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১ ভাগ ঘৃত তৈলাদি পদার্থ ২.৩ ভাগ কার্ব্বহাইড্রেটের তুল্য

ফল দেয়। এতদনুসারে আমাদের জৈব অন্ন দুই ভাগ বিভক্ত করা চলে। যথা, (১) নাইট্রজেত এবং (২) কার্বহাইড্রেট। উপরের লিখিত আমাদের তিন প্রকার জৈব অন্নের অনুপাত ভাঙ্গিলে দেখা যায় যে, নাইট্রজেত এবং কার্বহাইড্রেটের অনুপাত ১: ৪॥ কিম্বা ১:৫ রাখা উচিত। এই অনুপাতে নাইট্রজেত এবং কার্বহাইড্রেটের কার্বণ ও নাইট্রজ হিসাব করিলেও আসে। ইহাদের অনুপাতকে পুষ্টিদ অনুপাত বলা যাইবে।

নিম্নে আমাদের প্রচলিত কয়েক প্রকার জৈব অন্নের স্থূল উপাদান দেখান গেল। প্রত্যেক পদার্থের শতভাগে কোন্ পদার্থ কত আছে এবং তৈল পদার্থকে কার্বহাইড্রেটে পরিণত করিয়া নাইট্রজেত ও মোট কার্বহাইড্রেটের পুষ্টিদ অনুপাত দেওয়া গেল।

	নাইট্রজেত	কার্বহাইড্রেট	তৈল	পুষ্টিদানুপাত
আরারুট	০·৮	৮৩·৩	—	১:১০৪
মাণ্ডুয়া চাউল	৭·৩	৭৩·২	১·৫	১:১৩
চাউল	৭·৩	৭৮·৩	০·৬	১:১০·৮
আলু (নূতন)	২	২১	০·২	১:১০·৭
জনার	৯·৫	৭০·৭	৩·৬	১:৮·৩
জোয়ার	৯.৩	৭২.৩	২.০	১:৮.৩
যবের ছাতু	১১.৫	৭০.০	১.৩	১:৬.৩
ওট (oats)	১০.১	৫৬.০	২.৩	১:৬
চীনের বাদাম	২৪.৫	১১.৭	৫০.০	১:৫.২
গম	১৩.৫	৬৮.৪	১.২	১:৫.২
গড়গড়ে	১৮.৭	৫৮.৩	৫.২	১:৩.৮
কপিশাক	১.৮	৫.৮	০.৫	১:৩.৮
বুটের দাইল	২১.৭	৫৯.০	৪.২	১:৩.১
অড়র দাইল	২২.৩	৬০.৯	২.১	১:৩
মাষ কলাই *	২২.২	৫৪.১	২.৭	১:২·৭
কুলথ কলাই	২২.৫	৫৬.০	১.৯	১:২.৭
মসুর দাইল	২৫.১	৫৮.৪	১.৩	১:২.৫
মুগ কলাই	২৩.৮	৫৪.৮	২.০	১:২.৫
শিম	২০.০	৫৫.০	১.৯	১:২.৫
বরবটী কলাই	২৩.১	৫৫.৩	১.১	১:২.৫
খেড়ী কলাই	২৩.৮	৫৬.৬	০.৬	১:২.৫
মটর	২৮.২	৫৫.০	১.৫	১:২.৪
খেসারী	৩১.৯	৫৩.৯	০.৯	১:১.৭৫
ঝিনুক	১১.৭	—	২.৪	১:০.৮
মৎস্য	১৮.১	—	২.৯	১:০.৪
পক্ষীমাংস	২১.০	—	৩.৮	১:০.৪
ডিম্ব	১৩.৫	—	১১.৬	১:২
ঐ শ্বেতাংশ	২০.৪	—	—	১:০
ঐ পীতাংশ	১৬.	—	৩০.৭	১:৪.৪
ছাগ ও মেষ মাংস				
মেদহীন	১৮.৩	—	৪.৯	১:০.৬
মেদযুক্ত	১২.৪	—	৩১.১	১:৫.৮
গো দুগ্ধ	৪.১	৫.২	৩.৯	১:৩.৫
সর	২.৭	২.৮	২৬.৭	১:২৪
ছানা (ননীতোলা)	৪৪·৮	—	৬.৩	১:০.৩
ঐ (ননীযুক্ত)	৩৩·৫	—	২৪.৩	১:১.৭

এই তালিকা দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, এমন কোন একটি খাদ্য নাই, যাহা আমাদের আবশ্যক কার্বণ ও হাইড্রজ দিতে পারে। এ জন্য দুই তিনটি খাদ্য মিশাইয়া খাইলে হয়। গমে আর একটু তৈল পদার্থ থাকিলে উহা উৎকৃষ্ট অন্ন হইতে পারিত। ঐ অভাব পূরণ নিমিত্ত রুটী বা লুচীর আকারে ঘৃত সংযুক্ত করা হইয়া থাকে। ভাতে তৈল পদার্থ আরও কম। এজন্য উহাও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া খাইবার রীতি আছে। কিন্তু এরূপে পুষ্টিদানুপাত আরও কম হয়। তাহা ছাড়া, আমরা ভাত রাঁধিবার সময় উহার ফেন ফেলিয়া দিই।

* কলাইর খোসা বাদ দিলে নাইট্রজেত ও কার্বহাইড্রেটের পরিমাণ কিছু অধিক হয়। কিন্তু এরূপ প্রভেদ শতভাগে ১৷২ ভাগ মাত্র।

ফেনের সঙ্গে উহার ফস্ফরস্ চলিয়া যায় এবং নাইট্রোজেন পদার্থও কিঞ্চিৎ নষ্ট হয়। একে চাউলে ধাতব পদার্থের অত্যন্ত অভাব, তাহাতে যাহা কিছু আছে, তাহাও ফেলিয়া দেওয়া উচিত নহে। * এজন্য যেমন "পোড়ের ভাত" কিম্বা খিচড়ি বা পোলাওতে পরিমিত জল দিয়া ভাতে ফেন হইতে দেওয়া হয় না, তেমন করিয়া ভাত রাঁধিবার রীতি হইলে ভাল হয়। যাহা হউক, দেখা গেল, কেবল ভাত খাইলে আমরা আবশ্যক উপাদান পাই না।

গম অপেক্ষা বিলাতী ওট উৎকৃষ্ট অন্ন। উহাতে আবশ্যক পদার্থ প্রায় আবশ্যক পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু এদেশে ওটের চাষ অল্পই হইয়া থাকে। জনার, মাণ্ডুয়া, জোয়ার প্রভৃতি অন্নগুলি চাউল, ময়দা, যবের ছাতুর মত সুপাচ্য নহে। দাইলের মধ্যেও তেমনই প্রভেদ আছে। একথা সকলেই জানেন। কিন্তু লোকে ভাতের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ দাইল পায় কি? শাক ভাত খাইয়া আমাদের অনেকে জীবন ধারণ করে। কিন্তু শাকে অল্পই সার পদার্থ আছে। কপির উপাদান দেখিলেই কথাটা বুঝা যাইবে।

এখন কয়েক প্রকার প্রচলিত অন্নের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করা যাউক। প্রথমে দাইল রুটী লওয়া যাউক। মনে করুন, এক সের আটা, ✓০ ছটাক ঘৃত এবং ।০ পোয়া বুটের দাইল লইয়া কেহ অন্ন প্রস্তুত করিতে চান।

দেখা যায়,

	নাইট্রোজেন	কার্বহাইড্রেট	তৈল।
৮০ তোলা আটায় †	১০·৮	৫৪·৭	১ তোলা
২০ ,, বুটের দাইলে	৪·৩	১১·৮	০·৮ ঐ
৭·৫ ,, ঘৃতে	—	—	৭·৫ ,,
	১৫·১	৬৬·৪	৯·৩ ,,
অনুপাত	১·৬	৭	১
আবশ্যক অনুপাত	১·৫	৪·৫	১

সুতরাং ঘৃতাদির অনুপাত প্রায় ঠিক দেখা যাইতেছে। ১ ভাগ ঘৃত ২·৩ ভাগ কার্বহাইড্রেটের তুল্য ধরিয়া দেখা যায়, নাইট্রোজেন ও কার্বহাইড্রেটের অনুপাত ১:৫·৮ হয়। সুতরাং এদিকেও এই প্রকার অন্ন উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে।

আটার রুটী অপেক্ষা কেবল লুচী ভাল নহে। ১ সের ময়দার লুচী করিতে ।০ পোয়া ঘৃত লাগিলে

	নাইট্রোজেন	কার্বহাইড্রেট	তৈল।
১ সের ময়দায়	১১	৫৫	১ তোলা
।০ পোয়া ঘৃতে	—	—	২০ ,,
	১১	৫৫	২১ ,,
অনুপাত	১	৫	২
পুষ্টিদানুপাত	১:৯		

সুতরাং কেবল লুচী কোন দিকেই ভাল নহে। উহার সঙ্গে দাইল বা অপর কোন নাইট্রোজেন প্রধান খাদ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

আর কয়েকটি প্রসিদ্ধ অন্ন বিচার করা যাউক। প্রথমে নিরামিষ ভোজীর খিচড়ী দেখা যাউক।

	নাইট্রোজেন	কার্বহাইড্রেট	তৈল।
চাউল ১ সেরে	৫·৮	৬২·৬	০·৫ তোলা
মসুর দাইল ১ সেরে	২০·১	৪৬·৭	১·০ ,,
ঘৃত ।০ পোয়া	—	—	২০·০ ,,
	২৫·৯	১০৯·৩	২১·৫
অনুপাত	১·২	৫	১
পুষ্টিদানুপাত	১:৬		

* সিদ্ধ চাউল সুখপাচ্য বটে কিন্তু আতপ চাউল অপেক্ষা তাহাতে ফস্ফরস্ আরও কম পড়ে।

† গম এবং গমের আটা কিম্বা ময়দার মধ্যে উপাদানের একটু প্রভেদ পড়ে। গম অপেক্ষা আটায় এবং আটা অপেক্ষা ময়দায় নাইট্রোজেনের ভাগ একটু কম পড়ে।

নিরামিষভোজীর জন্য

চাউল ১ সের	৫·৮	৬২·৬	০·৫	"
মুগের দাইল।০ পোয়া	৪·৮	১১·০	০·০৪	"
ঘৃত /০ ছটাকে	—	—	৫·০	"
দুগ্ধ /১ সেরে	৪·১	৫·২	৩·৯	"
	১৪·৭	৭৮·৮	৯·৪৪	
অনুপাত	১·৬	৮·৩	১	
পুষ্টিদানুপাত	১:৬·১			

নিরামিষভোজীরা দুগ্ধ এবং দুগ্ধ হইতে জাত ঘৃত ছানা দধি বাদ দেন না। এ গুলা আমিষান্ন না হইয়া নিরামিষান্ন হইল কেন, বলিতে পারি না; যাহা হউক, মৎস্যের, মাংসের এবং নিরামিষ-ভোজীর জন্য ছানার পোলাও উৎকৃষ্ট খাদ্য।

১॥০ সের চাউলে	৮·৭	৯৩·৯	০·৭	তোলা
১॥০ সের মৎস বা				
১।০ সের মাংস বা				
॥০ সের ছানায়	২২·০	—	৩·০	"
।০ পোয়া ঘৃতে	—	—	২০·০	"
	৩০·৭	৯৩·৯	২৩·৭	"
অনুপাত	১·৩	৪	১	
পুষ্টিদানুপাত	১:৪·৮			

কিন্তু অনেকে খিচড়ী পোলাওকে গুরু-পাক অন্ন বলিয়া থাকেন। অবস্থা বিশেষে উহারা গুরুপাক বটে। যে ব্যক্তির প্রত্যহ আরারুট খাওয়া অভ্যাস, তাহার পক্ষে নাইট্রজেত কিম্বা ঘৃতের পরিমাণ একটু অধিক হইলে দুষ্পাচ্য হইবার কথা। তাহা ছাড়া আরও কথা আছে। অনেকে এরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য ভাতের মত আকণ্ঠ খাইয়া বসেন। মাংস খাইতে হইবে, তাহাকে নানাবিধ মসলা দিয়া পাক করিয়া এক বাটী পূর্ণ মাংস খাইয়া বসেন। বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট অন্নের এই এক গুণ যে, শরীর রক্ষার্থ কিম্বা শারীরিক পরিশ্রম-জনিত ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত উদর পরিপূর্ণ করিয়া খাইবার প্রয়োজন হয় না। অনেকে দশটার সময় ভাতে জলে এমন এক পেট খাইয়া থাকেন যে, আফিসে যাইতে তাহাদের প্রাণান্ত ঘটে, অবশ্য আহারের পরক্ষণেই শারীরিক কাজ করা উচিত নহে। কেন না, তখন আভ্যন্তর কাজ বেগে চলিতে থাকে। এ সময় বাহ্য কাজ করিতে সহজেই শক্তির অভাব ঘটে।

খাদ্য সম্বন্ধে আরও একটা কথা আছে। আজ কাল কেহ কেহ সন্দেশ মিঠাইর প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন। সবিশেষ বিবেচনা করিয়া ছানার সন্দেশ কিম্বা দাইলের মিঠাই পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। কেন না, সন্দেশ মিঠাই কেবল যে জিহ্বার প্রীতিকর, এমন নহে, উহা আমাদের পুষ্টিকর খাদ্য। কেহ কেহ মিষ্টান্নে চিনি থাকে বলিয়া মনে করেন যে, বুঝিবা চিনি খাইলে মধুমেহ রোগ জন্মিবে। কেহ বা মনে করেন যে, সাহেবেরা যখন মিষ্টান্ন খান না, তখন উহা ভাল জিনিস হইতে পারে না।

দেশের এটা দুর্গতি বলিতে হইবে। কেন না, পূর্ব্বাপেক্ষা বিলাতে চিনির ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িতেছে। * পূর্ব্বে সেখানে কম ছিল, কারণ চিনি তত সুলভ ছিল না। বস্তুতঃ চিনি যত সহজে দেহসাৎ হয়, অপর কোন খাদ্য তত সহজে হয় না। বালক-গণের পক্ষে চিনি এই কারণে একটী উপাদেয় খাদ্য হইয়াছে। যে খাদ্যটি খাইতে ভাল লাগে, তাহা অহিতকর হইবে কেন?

* সাহেবদের মিষ্টান্ন আমাদের মিষ্টান্ন অপেক্ষা কম মিষ্ট নহে।

তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে বলিতে হয়, প্রকৃতির নিয়মের উপরে মানুষ উঠিয়াছে। বাস্তবিক দুগ্ধপায়ী শিশুদিগের দুগ্ধে একটু চিনি মিশাইয়া দিলে দুগ্ধের নাইট্রজেত ও কার্বহাইড্রেটের পরিমাণ আবশ্যকমত হয়, এবং তৎসঙ্গে দুগ্ধ পান করিতেও শিশুরা আনন্দ অনুভব করে। অন্যদিকে, শিশুরা ঘৃত পদার্থ খাইতে ভাল বাসে না। সুতরাং তাহাদিগকে জোর করিয়া ঘৃত খাওয়ান উচিত নহে; দেখিতে গেলে, প্রৌঢ় ব্যক্তিগণের ঘৃত ভোজন দ্বারা উপকার হয়।

দুগ্ধের উপাদান দেখিলে জানা যায় যে, শুধু দুগ্ধ গলাধঃ করা অপেক্ষা, তাহাতে ভাত কিম্বা সের প্রতি প্রায় ৵০ পোয়া চিনি মিশাইয়া খাইলে পরিপাক করিবার পক্ষে সুবিধাজনক হয়। এজন্য কেহ কেহ গো বৎসের স্তন্যপান দেখিয়া তাহার মত অল্প অল্প করিয়া দুগ্ধপান করিতে বলেন। যাঁহাদের দুগ্ধ পরিপাক হয় না, তাঁহারা এই প্রকারে দুগ্ধপান করিলে দুগ্ধ পরিপাক করিবার অভ্যাস করিতে পারেন। ইহা সাধারণ নিয়ম বলা যাইতে পারে যে, কেবল নাইট্রজেত বা কোন কার্ব্বহাইড্রেট বা কেবল তৈল পদার্থ না খাইয়া সকলগুলি যথোচিত পরিমাণে মিশাইয়া খাইলে জীর্ণ করিবার সুবিধা হয়। এতদনুসারে ভাতে দাইল মাখিয়া খাইবার রীতি চলিত আছে। এক বেলা ভাত অন্য বেলা মৎস্য বা মাংস না খাইয়া, ভাতের সঙ্গে মাংসাদি খাইলে ভাল। আমরা তাহাই করিয়া থাকি।

অন্নের উপাদানের অনুপাত দেখিয়া উহার ব্যবস্থা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু প্রত্যেকের কি পরিমাণ আহার করা কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্দেশ করা তত সহজ নহে। সহজ না হইবার কারণ এই যে, আমাদের ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ ঠিক জানিতে পারা যায় না। বাহিরে কত শক্তি কাজে লাগাই, তাহা পরিমাণ করিতে পারিলেও, শরীরের তাপ রক্ষার্থ এবং অভ্যন্তরের যন্ত্র সমূহের কার্য্যের নিমিত্ত কতখানি শক্তির প্রয়োজন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। যাহা হউক, দেখা যায় যে, (১) শীতকালে যত শক্তি আবশ্যক, গ্রীষ্ম কালে তত আবশ্যক হয় না; (২) গুরু পরিশ্রম করিতে যত আবশ্যক, লঘু পরিশ্রম করিতে বা আলস্যে দিন কাটাইতে তত আবশ্যক হয় না; (৩) ভারী দেহীর শক্তির পরিমাণ যত আবশ্যক, লঘু দেহীর তত নহে।

আবার, মনুষের দেহের দৈর্ঘ্যানুসারে দেহের ভার না থাকিলে ক্ষীণ দেখায়। গড়ে ফুট প্রতি শরীরের ভার ১৩৷৷০ সের হইলে দেহ সুন্দর দেখায়। এইরূপে, যে ব্যক্তির দেহ ৫৷৷০ ফুট লম্বা, তিনি ১৸৪ মণ হইলে তাঁহাকে নাতিস্থূল নাতিক্ষীণ দেখায়।

কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ অনুপাত অল্প লোকেরই দেখা যায়। জেলখানায় এই হিসাবে ধরা হইয়া থাকে। পাঁচ ফুট ১৵৯ মণ হইয়া পাঁচ ফুটের পর দৈর্ঘ্য যত ইঞ্চি হয়, তত ১৷৷০ সের যোগ করা হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা যায়, ৫৷৷০ ফুট দীর্ঘ লোক ১৷৮ মণ পড়ে। সাহেবদের ওজন গড়ে ১৸৩ মণ ধরা হইয়া থাকে। আমাদের দেশের লোকদের দেহের ওজন গড়ে ১৷৬ মণ মাত্র। সুতরাং সাহেবদের তুলনায় আমাদের কাজের এবং আহারের পরিমাণ কম হইবে।

কাজ পরিমাণ করিতে হইলে, কাজের একটা একক নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। ১ মণ ভারী জিনিস ১ হাত উচ্চে তুলিলে যে কাজ

হয়, তাহাকে কাজের একক ধরা গেল।† ইহাকে এক মণ-হাত কাজ * বলা যাইবে। এখন দেখা যায়, ১।৷৪ মণ ভারী কোন লোক ২০ মাইল হাঁটিয়া গেলে তাহার ৫৪০০ মণ-হাত কাজ করা হয়। কিন্তু প্রত্যহ ২০ মাইল পথ চলা আমাদের দেশের কয় জন লোক পারে? গড়ে প্রত্যহ ১৫ মাইল ধরিলে আমাদের পক্ষে মন্দ কাজ হয় না। এতদ্দ্বারা প্রত্যহ ৪,৪০০ মণ-হাত কাজ হয়। অর্থাৎ দেহের ভারের সের প্রতি ৭০ মণ-হাত মাত্র কাজ হয়। এরূপ কাজ জেলখানার কয়েদী-দিগকে প্রত্যহ করিতে হয়; দেখা যায় যে, সকল কয়েদীকে পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা-দের দৈনিক অন্নের পরিমাণ এই—চাউল ৮/০ ছটাক, দাইল ১/০ ছটাক, তৈল ১।০ তোলা, লবণ ১।৷০ তোলা, তরকারী ১/০ ছটাক।

নুন, তেল, তরকারী বাদ দিয়া চাউল ও দাইলের † পরিমাণ দেখিলে জানা যায় যে, প্রত্যেক কয়েদী প্রায় পৌণে ২ছটাক নাইট্র-জেত এবং বার ছটাক কার্ব্বহাইড্রেট খাইয়া থাকে। উভয়ের অনুপাত ১ : ৭ এবং মোট ওজন পৌণে চৌদ্দ ছটাক।

বেহারী কয়েদীর জন্য ৮/ ছটাক চাউল না হইয়া ।৷/ ছটাক চাউল এবং ।/ ছটাক গমের আটা কিম্বা ।৷/ ছটাক জনারের ছাতু নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার সঙ্গে দাইল ১/০ ছটাক লইয়া উপাদান হিসাব করিলে, নাইট্রজেত প্রায় পৌণে দুই ছটাক এবং কার্ব্বহাইড্রেট দশ ছটাক পড়ে। তৈলের অনুপাত ১ : ৫।৷০ এবং মোট ওজন প্রায় বার ছটাক।

যিনি যাহাই বলুন, জেলখানায় কয়েদী-দিগের যে প্রকার আহারের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে তাহাদের শরীর শীর্ণ হইবার কথা নহে। বরং কোন কোন স্থানে কয়েদীদিগের শরীর বলিষ্ঠও হইতে দেখা যায়। আমাদের দেশের সাধারণ লোকে যেরূপ খাইয়া থাকে, জেলখানার কয়েদীদিগকে তদপেক্ষা কম বা নিকৃষ্ট অন্ন দেওয়া হয় না। আমাদের দেশে কয়জন লোকে প্রত্যহ ১/০ ছটাক † দাইল বা তদনুরূপ মৎস্য বা মাংস খাইয়া থাকে? নুন লঙ্কা, বা শাক বা দিয়া ১ সের চাউলের ভাত খাইলে নাইট্রেজেত ও কার্বহাই-ড্রেটের অনুপাত ১: ৭ হয় না।

যে ব্যক্তির ওজন ১।৬ মণ, তাহার পরি-শ্রম অনুসারে কেহ কেহ এই প্রকার খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। (ক) আদৌ পরিশ্রম না করিলে, (খ) অল্প পরিশ্রম করিলে, এবং (গ) গুরু পরিশ্রম করিলে,

	নাইট্রজেত	কার্বহাইড্রেট	তৈল। *
(ক)	৫.৭	২০.১	২ তোলা
(খ)	৭.৯	৩৩.৫	৩.৮ ,,
(গ)	৯.৭	২৯.৯	৬.৭ ,,

তৈলকে কার্বহাইড্রেটে ভাঙ্গিয়া নাইট্র-জেত ও মোট কার্বহাইড্রেটের পরিমাণ এইরূপ দেখা যায়।

	নাইট্রজেত	কার্বহাইড্রেট।	
(ক)	৫.৭	২৪.৭ তোলা।	মোট৩০.৪ তোলা বা ।৷/০ ছটাক অনুপাত ১:৪.৩
(খ)	৭.৯	২০.৬ তোলা।	মোট ৫০ তোলা বা ৷৷/০ ছটাক অনুপাত ১:৫.৩

* ১৮ মণ-হাতে 1 foot-ton ধরা গেল। ১ হাত ১ হাত — ½ metre ধরিলে ভুল হয় না।

* মটর দাইল লইয়া হিসাব করা গেল। মধ্যে মধ্যে কয়েদীদিগকে মৎস্য, মাংস এবং দই দিবার ব্যবস্থা আছে। এরূপ স্থলে ইহাদের ।/০ ছটাক দিলে /০ দাইল কম করা হইয়া থাকে।

(গ) ৯.৭   ৪৫.৩ তোলা। মোট ৫৫ তোলা
বা ৷৶০ ছটাক
অনুপাত ১:৪.৭

তবেই জলশূন্য নাইট্রোজেন ও কার্ব-হাইড্রেট ১০৷১২ ছটাক খাইলেই স্বচ্ছন্দে চলে। এইরূপ ।৶০০ ছটাক অন্ন খাইয়া থাকিতে হইলে কেবল প্রাণ রক্ষা করা হয় মাত্র। এই সকল পরিমাণের সহিত নিম্ন-লিখিত দৈনিক আহারের পরিমাণ তুলনা করুন। কোন ভদ্রলোক প্রত্যহ এই প্রকার আহার করিয়া থাকেন।

		নাইট্রজেন	কার্বহাইড্রেট	
চাউল	।৶০ ছটাক	২.২	২৩.৭	তোলা
মুগদাইল	৴০ ,,	১.২	৩.০	,,
মৎস্য	৶০ ,,	১.৮	০.৩	,,
দুগ্ধ	৴১ সের	৩.৩	১১.২	,,
ছানার সন্দেশ	৶০ ছটাক	০.৫	৩.৩	,,
ঘৃত তৈল	৴০ ,,	—	১১.৫	,,
তরকারী—				
		১১.০	৫৩.০	তোলা

। উভয়ের অনুপাত ১: ৪.৭। মোট ওজন ৮৶০ ছটাক, ইহার শরীরের ওজন ২৷ মণের অধিক। কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম করেন না বলিয়া আহারের পরিমাণ অধিক বলিতে হইবে। তবে, ভদ্রলোকে আহারের সময় পাত পুঁছিয়া খায় না।

পরিমাণ যাহাই হউক, কার্বহাইড্রেট ও নাইট্রজেনের অনুপাতের দিকে একটু লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ভেতো বাঙ্গালীর পক্ষে কার্বহাইড্রেটের পরিমাণ সহজেই অধিক হয়। উহার সহিত নাইট্রজেন পদার্থের মিশ্রণ আবশ্যক। কিন্তু নাইট্রজেন পদা-র্থের এত প্রয়োজনের কারণ কি? কারণ এই, এতদ্ভিন্ন কার্বহাইড্রেট বা তৈল দ্বারা শরীর-ক্ষয় পূরণ হয় না। অবশ্য নাইট্র-জেন পদার্থেও শক্তি আছে। বস্তুতঃ ১ভাগ তৈল পদার্থ ২.২ নাইট্রজেন এবং ২.৩ কার্ব-হাইড্রেটের তুল্য শক্তি প্রদান করিতে পারে। অর্থাৎ ঐ তিন পদার্থ হইতেই শরীরে তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শরীরের দৈনিক তাপ-ব্যয় অল্প নহে। কাজের হিসাবে, ঐ তাপের পরিমাণ প্রায় ৫৪,০০০ মণ হাত এবং প্রাত্যহিক ভুক্ত অন্নের শক্তি হইতে প্রায় ৬১,২০০ মণ হাত কাজ পাওয়া যাইতে পারে। অতএব ৭২০০ মণ-হাত কাজের শক্তিদ্বারা দেহের আভ্যন্তর ও বাহ্য ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

দেহের শক্তিরূপ আয় ব্যয় দেখা গেল। রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে আহার তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা গেল। কিন্তু মানবদেহ রাসায়-নিকের সূক্ষ্ম তুলা-যন্ত্র অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা যে পদার্থ ধরা যায় না, শরীরগত হইতে তাহাকে দেহযন্ত্র জানিতে পারে। এই সকল কারণে কেহ বা আতপ চাউলের ভাত, কেহ বা নূতন চাউলের ভাত জীর্ণ করিতে কষ্ট বোধ করেন। কিন্তু রাসায়নিক বিচার তাদৃশ সূক্ষ্ম না হইলেও এতদ্দ্বারা ভোজ্য বস্তুর স্থূল নিরূপণ হইতে পারে। তাহার সাহায্যে দেখা গেল, সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্য আজ কালকার কঠিন জীবন সংগ্রামের পক্ষে উপযুক্ত নহে। এখানে নিরামিষ ভোজন ভাল, না আমিষ ভক্ষণ ভাল, তাহার কথা হইতেছে না। কেবল কার্বহাইড্রেটের তুলনায় নাইট্রজেন পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে বলা যাইতেছে। শাক ভাত খাইয়া একজন স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া আছে, এ কথা ইহার বিরুদ্ধ প্রমাণ হইল না। কার্বহাইড্রেট

দ্বারাও শরীর গঠিত হয়। তবে, পরিশ্রমী লোকের দেহে নাইট্রজেত পদার্থ যত সহজে দেহসাৎ হয়, কার্ব্বহাইড্রেট তত সহজে হয় না, এবং প্রাণিজ নাইট্রজেত যত সহজে হয়, উদ্ভিজ নাইট্রজেত তত সহজে হয় না।

আর একটি কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হওয়া যাক্। সে দিন এক ব্যক্তি দেশের লোকের মূর্খতা দেখিয়া দেখিয়া দুঃখ করিতেছিলেন। এই মহার্ঘ আটা চাউলের দিনে লোকে সস্তা আলু খায় না দেখিয়া তাঁহার দুঃখ। চাউলের সের ৵০ আনা, আলুর সের ⁄০ আনা। স্থূল দৃষ্টিতে আলু সস্তা বোধ হয়। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, নূতন আলুতে ৸০ আনা জল এবং শুষ্ক চাউলে ৵০ আনা মাত্র। তবেই এই হিসাবে ১ সের চাউলের দাম ৵৫ পয়সা, কিন্তু আলুর সের ।০ আনা পড়ে। অন্য দিকে দেখুন, ১ সের চাউলের ভাত রাঁধিলে জলযোগে তাহা ২॥০ সের হয়। কিন্তু ভাতে যে পরিমাণ সার থাকে, কাঁচা নূতন আলুতে প্রায় সেইরূপ। সুতরাং ভাত এবং নূতন আলুর পুষ্টিকারিতা একরূপ। এখানে আমারা হিসাব করিয়া যাহা দেখিলাম, সাধারণ লোকের তাহা অজ্ঞাত নহে।

এইরূপ, দাইল অপেক্ষা মৎস্য মাংস উৎকৃষ্ট হইলেও, উহাদের মূল্য কখনও দাইলের সমান হইবে না। দাইল ৵০ আনা সের এবং মৎস্য ⁄০ আনা সের হইলেও মৎস্য মহার্ঘ হইল। কেননা, জল বাদে ৵০ আনায় ৸৵০ ছটাক দাইল পাওয়া গেল, কিন্তু ॥০ সেরের অধিক মৎস্য পাওয়া গেল না।

তেতোবাঙ্গালী দুর্নামটা তবে মিথ্যা নহে। বেহারী কয়েদী যাহা খায়, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী কয়জন খায়? কেহ যেন বলিয়াছিল যে, আমাদের দেশের লোকেরা অর্দ্ধাশনে থাকে। কেন না, দুইবেলা পেট ভরিয়া ভাত পায় না। কিন্তু এক পেট ভাত খাইলেই পূর্ণাশন হইল, বলিতে পারা যায় না। সাহেবদের দেহের ওজন, কাজ করিবার শক্তি আমাদিগের অপেক্ষা অধিক হয় কেন?

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

খোকার বিলাতের পত্র। (২)

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

এ বিড়ম্বনা কেন, বুঝি না। কোন কালে দুই ছত্র সাজাইয়া লেখা অভ্যাস নাই, আমার উপরেই সেই ভার! বিলাতের পথে যে আসে, সেই একটু না একটু কিছু লিখিয়া থাকে। আমার পাগলামি, আমিও আরম্ভ করিয়াছি! এক ত তোমরা বারে বারে আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিয়াছ, তাতে আবার আমার মনের ইচ্ছা যোগ দিয়াছে। এত সুন্দর সমস্ত জিনিস দেখিয়াছি, এত প্রকার লোকের সহিত মিশিয়াছি, এত উপভোগ করিয়াছি, বোধ হয় জীবনে আর করিব কিনা, জানি না। এই সমস্তের আস্বাদন তোমরা পাও নাই, ইহাতে বড়ই আমাকে দুঃখ দিয়াছে। যখনই কোন আশ্চর্য্য জিনিস দেখিয়াছি, অমনই মনে হইয়াছে, আহা, বাড়ীর সকলে যদি থাকিত, দেখিতে পাইত। তাহা যখন হয় নাই, আমি আমার পোড়া লেখনী দ্বারা তোমাদিগকে সেই স্থানে দণ্ডায়মান করিতে প্রয়াস পাই-

তেছি! তোমরা ইহা পাঠ করিয়া, সেই সমস্ত স্থানে ও সেই সমস্ত অবস্থায় থাকিয়া যে উপকার ও যে অভিজ্ঞতা পাইতে, সেখানে না থাকিয়া যাহাতে তাহা পাইতে পার, এই আমার অভিলাষ! কি উচ্চ আশা! সাধারণে জানিলে না জানি কত হাঁসিবে! এই পাশ্চাত্য জগতে ঐ ব্যবহার নাই। পাঠযোগ্য হইলে শিশু বা কি, যুবাই বা কি? অপাঠ্য প্রবীণের বচনও হাস্যস্পদ!

২২শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, প্রায় দশটা কি এগারটার সময় সুয়েজে পৌঁছিলাম। এখানে জাহাজ বেশীক্ষণ থামিবে না। আমাদের জাহাজের খালে ঢুকিবার পালা আসিলেই ছাড়িবে। যদিও আমাদের জাহাজে ফরাসী মেল ছিল, এবং আমাদের জাহাজ ফরাসীদের, তবু আমাদের প্রায় ঘণ্টা দুই তিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ফরাসী জাহাজ বলার অর্থ এই যে, সুয়েজ খাল্ কোম্পানী ফরাসীদের, কোন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ইহা নির্ম্মাণ করেন। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে নাকি সুয়েজে আর একটী খাল ছিল। এখনও তাহার অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। এই খাল নীল নদের সহিত লোহিত সমুদ্রকে সংযুক্ত করিত। মিশর যখন স্বাধীন ছিল, তখন এই খাল আরম্ভ করা হয়। নেকো (Necho) নামক কোন শিল্পী এই কার্য্য ভার প্রাপ্ত হন। ইহা আজ প্রায় ২৫০০ হাজার বৎসরের কথা। দরিয়জ (Darius) নামক জনৈক কৃতবিদ্য ব্যক্তি ইহা সম্পূর্ণ সমাধা করেন। (Herod ii, 157) এই স্থান কেবলই বালুকাময়, প্রস্তরময় (Sandstone), মধ্যস্থলে কয়েকটী হ্রদ আছে। এই গুলির জল এমনই লবণাক্ত যে, ইহাদের নাম 'কটু হ্রদ, (Bitter lakes) হইয়াছে। এই হ্রদ গুলির উত্তরে আরও হ্রদ আছে। আমাদের জাহাজ মধ্যস্থলে দাঁড়াইল। সুয়েজ খালে যেখানে প্রবেশ করা যায়, তাহাকে তেওফিক বন্দর কহে। এখন আমরা বন্দরের এক মাইল দূরে। সুয়েজ-সহর আরও দূরে, প্রায় দেড় ক্রোশ দূর। দূরে আমরা ঐ সমস্ত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা দেখিতেছি, ঐ ধুধু করিতেছে, ঐ সহর।

এখানে দেখিবার বড় একটা কিছু নাই। এসিয়ার দিকে মুশার কুয়া Moses' wells আছে, সে অনেক দূর। জাহাজ কখন ছাড়ে, ঠিক নাই, আমরা তাই নামিলাম না। জাহাজের উপর হইতে যত দূর সম্ভব, উপভোগ করিতে লাগিলাম। এখান হইতে রীতিমত ইস্মাইলিয়া, কাইরো এবং আলেকজাণ্ডারিয়ার জন্য ট্রেণ ছাড়ে। আমরা অপরাহ্নে, প্রায় দুইটার সময়, খালে প্রবেশ করিলাম। খালটী বড়ই সরু। একখানি জাহাজের বেশী আসা যাওয়া করা অসম্ভব। জাহাজ থেকে, মনে হয়, যেন পারে লাফ দিয়া পড়া যায়। আফ্রিকা উপকূলেই প্রায় সমস্ত ষ্টেসন। ষ্টেসন অত্যন্ত নিকটে২। এক হইতে অপর প্রায়ই দেখা যায়। ষ্টেসনগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। বহু যত্নে সুন্দর বৃক্ষ সমূহ পালিত হইয়াছে। যে স্থান দিয়া জাহাজ যাইবার কথা, অর্থাৎ যে স্থল সর্ব্বাপেক্ষ গভীর, সেই স্থল লৌহ-স্তম্ভ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

খাল সাধারণতঃ তিন প্রকার। কতকগুলি খাল উচ্চ ভূমির মধ্য দিয়া গমন করে। এই অবস্থায় নানা প্রকার কল কব্জা দ্বারা জল রক্ষিত হয়। যেমন আমাদের মেদিনীপুরের খাল, সেখানে কত লকের প্রয়োজন হইয়াছে। এই সমস্ত খাল সঞ্জী-

বিত রাখিবার জন্ত কোন স্বাভাবিক হ্রদ বা অন্ত কোন জলের আকরের প্রয়োজন। অপর কোন প্রকার স্বাভাবিক উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি না করিতে পারিলে, অগত্যা অস্বাভাবিক উপায়ে চৌবাচ্চা (Reservoir) সমস্ত প্রস্তুত করিতে হয়। জল-আকর্ষণ-যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। ফ্রান্সের Lanquedoc Canal, অথবা স্কটলণ্ডের Caledonion Canal এই এই প্রকার খালের সুন্দর উদাহরণ।

দ্বিতীয় প্রকার বলিতেছিলাম, যে খাল নিম্নভূমি দিয়া যাইয়া থাকে। এই সমস্ত খালে ডবল কার্য্যকারী লক দরকার। জোয়ারের সময় জল যাহাতে আসিয়া একেবারে ভাসাইয়া দিতে না পারে, আবার ভাঁটার সমস্ত জল যাহাতে না বাহির হইয়া যাইতে পারে; মোট কথায় খাল সর্ব্বদাই একভাবে থাকে, এইজন্ত ডবল কার্য্যকারী দরজার প্রয়োজন। এইরূপ খাল হলণ্ডে এবং অন্যান্ত নিম্ন দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বড় এই প্রকার খালের ব্যবহারের কথা শুনি নাই।

তৃতীয় প্রকার। আমাদের দেশের যে খানে সেখানে এই খালের উদাহরণ। খাল বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তাহাকেই আমি এই বিভাগভুক্ত করিয়াছি। দুই জলরাশির সহিত যে মানবকৃত ক্ষুদ্র জলরাশি সম্মিলিত হয় এবং অন্ত কোন প্রকার দরজা (lock) ইত্যাদি কিছুরই আয়োজন হয় না, অর্থাৎ ঐ জলরাশি এই খালকে সর্ব্বদা পূর্ণ রাখিতে পারে, ইহাই আমার তৃতীয় শ্রেণীর খাল। আমাদের দেশে এরূপ অনেক আছে বটে, কিন্তু সমুদ্রের সহিত সমুদ্রের সংযোগ করিয়াছে, এই শ্রেণীভুক্ত আজ পর্য্যন্ত একটী মাত্র খাল হইয়াছে, তাহার নাম সুয়েজ খাল।

আমাদের বাঙ্গালা কথা 'খাল' বলিলে (lock) ইত্যাদি কিছুরই কথা মনে হয় না। ওমুক নদীর সহিত ওমুক নদী পর্য্যন্ত খাল আছে, কেহ কি বুঝিলেন, কতগুলি বাঁধ, কতগুলি চৌবাচ্চা ইত্যাদি আছে? বস্তুত উড়িষ্যা মেদিনীপুরের খালই আমাদের আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। এ আবার কি? কিন্তু ইংরাজী Canal কথা ব্যবহার করিলেই ঐসব lock, reservoir, gate,pumping engine,এই সমস্তের কথা হৃদয়-পটে অঙ্কিত হয়। হয় না কি? কোন বিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থকার এই সুয়েজ খাল সম্বন্ধে লিখিতে লিখিতে বলিতেছেন—

"* * * Though it is called a canal ; it bears little resemblance to the works we have described under that name, for it has neither locks, gates, reservoirs, pumping-engines, nor has it, indeed, anything in common with canal except that it affords a short route for sea-bourne ship. It is in fact, correctly speaking, an artificial strait or arm of the sea connecting the Mediterranean and the Red Sea from both of which it derives its watter-supply."

Encyclopedia Britannica.

এই দুই সমুদ্র এক সমতলে হওয়াতেই এই খালের সৃষ্টি, এই সহজ উপায়ে হইয়াছে। নতুবা ঐ সমস্ত পদার্থের প্রয়োজন হইত। এই সহজ উপায়ে সমাধা করার পক্ষে আর একটা সুবিধা ছিল,এই দুই সমুদ্রই জোয়ার ভাঁটায় বড় বাড়ে কমে না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি,এই স্থানে সুয়েজযোজকে পূর্ব্বে এক খাল ছিল। আধুনিক সময়ে এই স্থানে খাল করিবার কথা ফ্রান্সের বিখ্যাত সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নই, বোধ হয়,প্রথম উত্থাপন করেন। তিনি ইংরাজী সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে M. Lepere নামক জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের নিকট হইতে এই স্থানের এক বিবরণ প্রাপ্ত হন। কিন্তু সে সমস্ত বিবরণ,

সে সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়। আমরা অতীতের দিকে চাহিয়া বেশ বিচার করিতে পারি, তখন এই খাল হয় নাই বেশ হইয়াছিল। এই খালের তখন বড় প্রয়োজনও ছিল না। এই খাল যদি প্রস্তুতও হইত, অতি অল্প নাবিকই এই চড়া ও লুক্কায়িত পর্ব্বতময় ভূমধ্য ও লোহিত সাগরের ন্যায় ক্ষুদ্র জলাশয়ে কেবল তাহাদের পালের উপর নির্ভর করিয়া আসিত, উন্মুক্ত সমুদ্রে তাহারা "সেই ঘুরিয়ে নাক দেখান" পথে যাইতেই ভালবাসিত। কে চড়ায় ঠেকিয়া মরিতে যায়! বস্তুত পরে যখন বাষ্পীয়-পোত,নব স্ক্রু-ষ্টিমার আবিষ্কার করা হইল, তখন এই প্রকার খালের সময় আসিয়াছে। এখন আর বাতাসের উপর নির্ভর করিতে হয় না, খুব বাতাস বহিলেও বড় ক্ষতি নাই, না বহিলেও ভালই। এখন লোকে উহার প্রয়োজনীয়তা বোঝে, কিন্তু তখন ততদূর বুঝিত না। তাই বুঝি বিধাতা তখন এই খালের সৃষ্টি করিয়াও করিলেন না। জগৎ জানিল, ঐ স্থানে কোন খাল হইতে পারে, সে তাহার পোতের উন্নতির দিকে মন দিল। যখন আশানুরূপ পোত নির্ম্মাণ কার্য্য সুসম্পন্ন হইল, তখন জগন্মাতা ভগবতী ফার্দ্দিনন্দ লেসেপসের (M. Fardinand Lesseps) হাতে এই কার্য্যভার অর্পণ করিলেন। তিনি এই কার্য্য তাঁহার কৃপায় সুসম্পন্ন করিলেন।

আমরা যখন সুয়েজে আসিলাম, তখন সুয়েজ খাল নির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত জানিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল। এই সামান্য খাল জগতের কত উপকার করিতেছে, বলা যায় না। পূর্ব্বে পশ্চিম ইউরোপ হইতে ভারতের পথ প্রায় ১১৩৭৯ মাইল ছিল। এখন এই খালের মহিমায় ৭৬২৮ মাইল মাত্র হইয়া পড়িয়াছে!! যে জিনিস জগতের প্রতি জাতিরই এত উপকার করিতেছে, সেই মহান পদার্থের বিষয় একটু জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? তোমরা সকলেই ইহার বিষয় বেশ জানিতে পার, কিন্তু তবুও একটু যদি বলি, তবে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। বিশেষতঃ এই অতি আশ্চর্য্য,সুকৌশলপূর্ণ,সুশোভন বিষয়কে একেবারে অনালোচিত রাখিয়া ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না।

মুসেঁ ফার্দ্দিনন্দ লেসেপ্সের ইচ্ছা ছিল, সুয়েজ যোজকের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড খাল কাটেন। খাল সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হওয়া চাই, এবং খুব সহজেই হওয়া চাই। এই স্থানে কয়েকটী উপত্যকার ন্যায় স্থান অর্থাৎ নিম্নভূমি আছে, সে গুলির সুযোগও তিনি লইবেন, মনস্থ করিলেন। মেনজালা হ্রদ, বালা হ্রদ, তিমসা হ্রদ এবং পূর্ব্বোক্ত তিক্ত বা কটু হ্রদ, এই গুলি তাঁহার অনেক শ্রমের লাঘব করিয়াছিল।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল চেস্‌নি ভূমধ্য ও লোহিত সাগরের মধ্যস্থ স্থান পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং একটী প্রবন্ধ লেখেন। সেই সময়ে এই দুই সমুদ্রে ত্রিশ ফিটের তফাৎ জানা ছিল। সকলেই জানিত ভূমধ্য লোহিত সাগর হইতে ত্রিশ ফিট উপরে!! সেইজন্য চেস্‌নি সাহেবের খালের নকসাও সেই মতের উপরে স্থাপিত।

১৮৪৯ হইতে ১৮৫৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত মহাত্মা লেসেপ্স এই বিষয়ে তাহার জ্ঞান বুদ্ধিকে প্রখরতর করিতে লাগিলেন। কি উপায়ে খাল কর্ত্তন করা যায়, কোথা হইতে কোন স্থান দিয়া কি প্রকারে যাইলে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় হইবে, এই সমস্ত চিন্তা তাঁহার মানস-পটকে একেবারে এই ছয় বৎসর ধরিয়া পূর্ণ করিয়া রহিল। তিনি বলেন,এমন সময়

নাই যখন তিনি এবিষয় চিন্তা করেন নাই। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ সৈয়দ পাশা মিশরের রাজপ্রতিনিধি হন। তিনি তৎক্ষণাৎই লেসেপ্সের জন্য লোক পাঠাইলেন। খাল কর্ত্তন বিষয়ে কোন বিশেষ কথার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে বলিলেন। এই সাক্ষাতেই এই মহৎ কার্য্যের আরম্ভ হইল। সেই বৎসরে,৩০শে নবেম্বর,লেসেপ্সের উপর ভার দিয়া কেহরো হইতে সহি করা এক কমিশন পত্র আসিল যে, তিনি "সাধারণ সুয়েজ খাল কোং" নামে এক কোম্পানি খুলিতে পারেন।* পর বৎসরে অর্থাৎ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা লেসেপ্স, রাজপ্রতিনিধির হইয়া, কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাধারণ কার্য্যের অধ্যক্ষ বলিয়া অথবা সুশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া,বিখ্যাত,গণ্য,মান্য,সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে একটা আন্তর্জাতিক সভা করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। সেখানে খাল সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচিত হইবে, এই তাঁহার উদ্দেশ্য।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দেরই ডিসেম্বর মাসে এবং পর বৎসরের জানুয়ারিতে মিশরে দুই কমিশন বসিল। কমিশন উভয় সমুদ্রের বন্দর, সমূহকে এবং তন্মধ্যস্থ মরুকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিল। অনেক পরীক্ষা, অনুসন্ধান এবং চিন্তার পর স্থির হইল, ভূমধ্যের পেলুসিয়ম উপসাগর হইতে সুয়েজের নিকট দিয়া লোহিত সাগরের সহিত এক খাল কাটা যাইতে পারে, কিন্তু কি প্রকারে খাল কাটা যাইতে পারে, কোনটী সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়, এই বিষয়ে সকলের মত নানা প্রকার দাঁড়াইল। তিন জন ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তাঁহাদের মত বড়ই মজার! তাঁহারা বলেন, খাল সমুদ্র হইতে ২৫ ফিট উচ্চে করা হউক। খালের এক দিকে পেলুসিয়ম উপসাগরে, অপর দিক লোহিত সাগরে মিশিবে। মধ্যে অনেক দরজা, কব্জা, চৌবাচ্চা করা হইবে। এবং আবশ্যক মত নীল নদ হইতে জল শোষণ করিয়া আনা হইবে! তাঁহাদের মতে এই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায়। সহজ দিকে আর বুদ্ধি যায় না। অন্যান্য বিদেশী সভাগণ সমুদ্র হইতে ২৭ ফিট নিম্নে খাল কাটার কথা বলিলেন। তাঁহাদের মতে লক ইত্যাদির কিছুই দরকার নাই। সমুদ্র হইতে সমুদ্র যুক্ত হইবে, সমুদ্রই ইহাকে পরিপোষণ করিবে। খালের দুই দিকে দুই বন্দর করা হইবে।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মহাসমারোহে পারিস মহানগরীতে এই কমিশনের এক অধিবেশন হয়। সেখানে ইংরাজ শিল্পীগণের মত একেবারে অগ্রাহ্য করা হয়!!! অপর উপায়েই খাল কর্ত্তন করা হইবে,স্থির হইল। কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইল। কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইবার পরে মহাত্মা লেসেপ্সকে আরও দুই বৎসর অর্থের জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। চারিদিকে অর্থ সাহায্যের জন্য সভা হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার সমস্ত কার্য্যাদি শেষ করিয়া এই কার্য্যে লাগিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অর্দ্ধেক অর্থ য়ুরোপ হইতে সংগৃহীত হয়। তন্মধ্যে ফরাসীগণই অধিক দান করে। অপরার্দ্ধ রাজপ্রতিনিধি পাশাই দেন। মহম্মদ সৈয়দ প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি প্রয়োজন হইলে জোর করিয়া কুলি দিবেন। আরও কিছু সময় কাটিয়া গেল। অবশেষে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পশ্চাদ্ভাগে এই মহাকার্য্য আরম্ভ হইল।

* The Universal Suez Canal Co.

২৫,০০০ হাজার হইতে ৩০,০০০ হাজার পর্য্যন্ত লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। প্রায় লোকই জোর করিয়া আনা হয়।

১৮৬২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত কার্য্য যথানিয়মেই পরিচালিত হইল। কিন্তু তখন রাজপ্রতিনিধি মহম্মদ সৈয়দপাশা আন্তর্জাতিক মহামেলা দেখিতে আসেন। সেখানে সার জন হক্‌সারের (Sir John Hawkshaw) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহাকে খালকার্য্য পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করেন। পাশা এত টাকা খরচ করিতেছেন, নিজে নিন্দার ভাগী হইয়া এত হাজার লোককে জোর করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, কার্য্য সফল না হইলে তাহার কত কষ্ট! তাঁহার এই বিষয় জানিতে একান্ত ইচ্ছা হইল। যাহাতে অন্য কোন কর্ম্মচারী হক্‌সাকে ঠকাইতে, ভুলাইতে না পারে, তাহার জন্য পাশা আদেশ করিলেন যে, হক্‌সার সহিত কোন কর্ম্মচারী যাইবে না। হক্‌সা আর কিছু করুন বা নাই করুন, তিনি খাল কাটার বিরুদ্ধে কয়েকটী কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। কি কি বিষয় তিনি বলিলেন, তাহা এখানে উল্লেখ অনাবশ্যক, এই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, যে আপত্তিগুলি তিনি করিয়াছিলেন, সেগুলির কোনটাই আজ কাল ঘটিতেছে না, ঘটেও নাই।

সৈয়দপাশা তাঁহার রিপোর্ট পাইবার পূর্ব্বেই মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁহার ভ্রাতা ইস্‌মাইল তাঁহার পরে রাজপ্রতিনিধি হন। ইস্‌মাইল হক্‌সার বিবরণ পাইয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। যখন খাল কর্ত্তন বিষয়ে সম্পূর্ণ আশা নাই, ইস্‌মাইল জানিতে পারিলেন, তিনি তাঁহার প্রজাবর্গকে বৃথা জোর করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ইহা ত অস্বাভাবিক নয়। কাজ বন্ধ হইয়া গেল। সমস্ত লোকই প্রায় চলিয়া গেল। এই সময়ে কি করা উচিত, লেসেপ্স ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি এই ব্যাপার ফরাসী সম্রাটের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। সম্রাট দেখিলেন, কাজটা হয় না, তাই, জোর করিয়া কাজ করান তুলিয়া লওয়ায় অথবা দেশী কুলি না পাওয়ায় খাল-কোম্পানীর যে ক্ষতি হইবে, তাহার পূরণ স্বরূপ সম্রাট দয়া করিয়া ৩৮০,০০০০ হাজারপাউণ্ড তাহাদিগকে দিতে রাজপ্রতিনিধিকে আদেশ করিলেন। এই টাকা দ্বারা বহুকষ্টে নানা প্রকার কল কব্জা নানা স্থান হইতে ক্রয় করিয়া কাজ চালান হইতে লাগিল। বহু শ্বেতকায় কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। অধিক অর্থ ব্যয় হইল, তাহাদের থাকিবার জন্য অনেক নূতন গৃহ সমস্ত প্রস্তুত করিতে হইল। সামান্য এক হক্‌সার কথার জোরে মহাত্মা লেসেপ্সের অনেক কষ্ট ভুগিতে হইল, কিন্তু তিনি অসীম সাহসের উপর নির্ভর করিয়া অমানুষিক অধ্যবসায় অবলম্বনে এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিবার নয়। ভূমধ্যসাগর হইতে ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে জল বহিতে আরম্ভ করে। সেই বৎসরের জুলাই মাস হইতে লোহিত সমুদ্রের জল বহিতে আরম্ভ করিল। অক্টোবর মাসে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজ লোহিত হইতে ভূমধ্য এবং ভূমধ্য হইতে লোহিত সাগরে যাতায়াত করিতে থাকে। পূর্ব্বে যে হ্রদগুলির কথা বলিয়াছি, সেগুলি এখন হ্রদ হইয়াছে, পূর্ব্বে নিম্নভূমি, শুষ্ক মরুভূমি মাত্র ছিল। তিমসা হ্রদ ৫ মাইল লম্বা, কটু হ্রদদ্বয় প্রায় ২৩ মাইল। সমস্ত খালটী ৮৮ মাইল লম্বা, তাহার

মধ্যে ৬৬ মাইলই খাল কাটিতে হইয়াছে। ১৪ মাইল জলের নীচে কাটিতে হইয়াছে (dredging) এবং অপর আট মাইলে মাত্র কোন কাজেরই প্রয়োজন হয় নাই। যেখানে সেখানে ১৯৬ ফিট চওড়া ২৬ ফিট্ গভীর। তলায় বরাবরই ৭২ ফিট্ চওড়া।
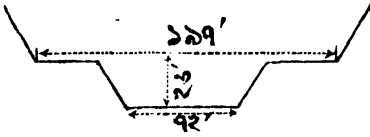
আর যেখানে হ্রদ,সেখানের পাড় আরও ঢালাও করা হইয়াছে; কেন না, সেখানের বালি আসিয়া খালকে বুজাইতে পারে।
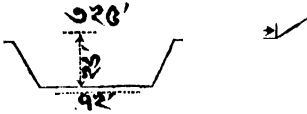
হ্রদের মধ্যে গভীরতম স্থান লৌহস্তম্ভ দ্বারা (Iron-beacons) দর্শিত হইয়াছে। এই চিহ্ন গুলি প্রায় ২৫০ ফিট তফাতে। শুনা যায়, নাকি ৮,০০,০০০০০কোটী ঘন বর্গ গজ মাটি খাল হইতে কাটিয়া বাহির করা হয়!!! পূর্ব্বে বলিয়াছি, কত লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের পানার্থে পাম্প করিয়া নীল নদী হইতে জল আনা হইত; আশে পাশে মিটা জলের নামও ছিল না! ৩০টী মাটী কাটা জাহাজ লাগিয়াছিল। মোটে নাকি২০,০০০০০০ কোটী পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল। সকলেই, বোধ হয়, অবগত আছেন, এখন ১৬ টাকার কমে পাউণ্ড হয় না। সৈয়দ বন্দরে (Port Said) এদুইটী (Break water) আছে। পশ্চিমেরটী ৬৯৪০ ফিট এবং পূর্ব্বেরটী ৬০২০ ফিট লম্বা। ১৮৮৩ খ্রীঃ ১০ ফ্রাঙ্ক, ৫০ সেণ্টিম (ইংরাজিতে ৮ সিলিং, ৪ পেন্স, ৩ ফার্দ্দিং, আমাদের বাঙ্গালা মুদ্রায় প্রায় ছয় টাকা) প্রতি টনে দিতে হইত। তখন মাঝির (Pilot) জন্যও মোটের উপর টন প্রতি ৭০ সেণ্টিম দিতে হইত। ৭০ সেণ্টিম আমাদের প্রায় ছয় আনা। ১৮৮৪ সালের ১লা জুন তারিখে মাঝির ভাড়া উঠিয়া গিয়াছে। এখন ১৮৮৫ খ্রীঃ হইতে টন প্রতি কেবল ৯ ফ্রাঙ্ক ৫ সেণ্টিম দিতে হয়। এতেও কি কম টাকা! প্রতি টনে ৫ টাকা করিয়া ধরিলে, ৫০০০ টাকার কম কখন পড়ে না।

এই ৮৮ মাইল যাইতে আমাদের ২২শে অক্টোবর বেলা একটা কি দুইটা হইতে ২৩শে শুক্রবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত লাগিল। তবেই বুঝিতে পার, জাহাজ কত আস্তে ২ অগ্রসর হইতেছে! ঘণ্টায় পাঁচ মাইলের কিছু বেশী চলিতেছে। দুই পারে কেবল মরুভূমি দেখিতে লাগিলাম। রাত্রি হইলে আমাদের জাহাজের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক আলো জ্বালান হইল। সেই আলোকে খাল বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। রাত্রিকে দিন করিতে পাশ্চাত্য জগত খুব মজবুত! আমরা আলোটী দেখিতে গেলাম। দেখিবার অনেক ছিল। আমি ও আমার বন্ধু নাটার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিলাম; কিন্তু প্রায় একটা রাত্ হইয়াছে, দেখিবার সাধ না মিটিলেও, আমরা নিদ্রার তাড়নায় আর পারিলাম না। আমাদের ঘরে গেলাম। ঘরে গিয়া সেই ম্যাকফারসনের সহিত মহা ঝগড়া হইল। নাটার বলে, আমাদের যখন ইচ্ছা আমরা ঘরে আসিব, তাতে আপনার বলিবার অধিকার কি আছে? যদি আপনি রুগ্ন হইতেন, ভিন্ন কথা। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। পরদিন হইতে ম্যাককারসনের সহিত থাকা

দুঃসহ হইয়া উঠিল। সাহেব রো আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইয়াছে?' আমি কিছুই বলিতে চাহিলাম না। যাহা হউক, তিনি বলিলেন, "আমি যখন তোমার ভার লইয়াছি, তখন কোন মতেই ঐ প্রকার লোকের সহিত থাকিতে দিতে পারি না। আমি কমিসায়ারের কাছে গিয়াছিলাম, তিনি সৈয়দ বন্দরের পরে তোমাদের এক ভিন্ন ঘর দিবেন।" পরে আমরা এক ভিন্ন ঘর পাই।

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা সৈয়দবন্দরে পৌঁছিলাম। এখানে আমাদের জাহাজ আবার কয়লা লইবে। প্রাতঃকাল হইতেই কয়লা বোঝাই হইতে আরম্ভ হইল। আঃ এমন ময়লা যে বলা যায় না। সমস্ত কালীময় হইয়া গেল। প্রাতঃভোজ খাইয়া আমরা বন্দর দেখিতে যাইব মনস্থ করিলাম। প্রায় ১১ টার সময় আমাদের কালীময় জাহাজ ছাড়িয়া বন্দর দেখিতে গেলাম। আমরা পাঁচ জন। বন্ধু নাটার, মিসেস রো, মিষ্টার রো, ডাক্তার আলকক্ এবং আমি। আমরা প্রথমে কিং (Henry S. King) কোম্পানীর আপিষে গিয়া কাগজ পত্র পড়িলাম। তারপর সহর দেখিতে গেলাম। এখানে দেখিবার বড় কিছুই নাই। তবে দোকান ইত্যাদি খুব ভাল। এসিয়া বিভাগের প্রায় সমস্ত জিনিস এইখানে পাওয়া যায়। এই সমস্ত দোকান দেখিয়া আমরা আমাদের এজেণ্ট কুকের বাড়ীতে গেলাম। সেখানে কিছুক্ষণ কাটাইয়া, আমরা জাহাজে ফিরিব মনে করিলাম। পথিমধ্যে একটা নাপিতের দোকান দেখিয়া মিঃ রো আমার সুন্দর দাড়ী জোড়া কামাইয়া ফেলিতে বলিলেন। তোমরা যদি আমার এখনকার ছবি দেখ, বোধ হয়, চিনিতে পারিবে না। যাহা হউক, তিনি নিজের পয়সায় আমার সাধের জিনিসকে বিদায় দিতে বাধ্য করিলেন। লণ্ডনে আসিয়া করিতেই হইত, তাঁহার কৃপায় আমার পূর্ব্বেই সে কাজ করা হইয়া গেল। এখানকার একটা কথা বলি। এইস্থান বড় প্রলোভনময়। মিঃ রো যদি আমার সহিত না থাকিতেন, নিশ্চয় আমাকে বিপদে পড়িতে হইত। প্রতি দোকানে এমন অশ্লীল সমস্ত ছায়ালিপি (Photograph) চিত্র আছে যে, অত্যন্ত সাধু ব্যক্তিও অবিচলিত থাকিতে পারিবেন না। আমি আগেই মিঃ রো দ্বারা সতর্কিত হইয়াছিলাম এবং অনেক দোকানদার আমাকে সেই সমস্ত ছবি দেখিতে ডাকিলেও আমি যাই নাই। তাহাদের এক গোপনীয় ঘর আছে, যেখানে দর্শকগণ ঐ সমস্ত অশ্লীল, কদর্য্য এবং অবশ্যই দৃষ্টির অযোগ্য ছবিগুলি দেখিতে যায়।

আমাদের জাহাজ সেই দিনই সন্ধ্যার সময় সৈয়দবন্দর পরিত্যাগ করে। আমরা এখন পাশ্চাত্য জগতে। এখন আমরা আর লোহিত সাগরে নাই, ভূমধ্যে। পোর্ট সৈয়দ ছাড়ি আমরা ২৩শে অক্টোবর, শুক্রবার। আমরা মারসেলে (Marseilles) পৌঁছি ২৮শে অক্টোবর, দ্বিপ্রহরের পরে। এই পাঁচদিন আমাদের ভূমধ্যের মধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। আমরা ভূমধ্যের সুন্দর সুশোভন মনোহর দৃশ্য দেখিতে ২ চলিলাম। আমরা কেণ্ডিয়া দ্বীপের পার্শ্ব দিয়া সিসিলি এবং ইতালীর মধ্যস্থ মেসিনা যোজকের ভিতর দিয়া, বীর নেপোলিয়নের কীর্ত্তি ধ্বজা কর্সিকার উত্তর দিয়া মারসেলে পৌঁছিলাম।

আমরা আয়েয় গিরি এট্না, এবং মনোরম মেসিনা যোজক দেখিয়াছি। ইহা ভিন্ন বড় বেশী একটা কিছু এই কয় দিনে দেখি নাই,—তবে মধ্যে ২ আমরা অনেক জলের মধ্যে আলোক মঞ্চের ন্যায় বিশাল প্রস্তর খণ্ড দেখিয়াছি। সে দৃশ্য বড় সুন্দর। আর এক কথা। আমি, আমি কেন, আমরা সকলেই,এতদিন আফ্রিকার মরুভূমির উত্তপ্ত বায়ুতে দগ্ধ হইতেছিলাম। কিন্তু এখন আর সে সমস্ত কিছুই নাই। দগ্ধ হওয়া দূরে থাক, যতই আমাদের যাত্রা শেষ হইয়া আসিতেছে, ততই যেন অধিকতর শীতলতা বোধ করিতে লাগিলাম। অবশেষে মারসেলের কাছে আসিতে আসিতে প্রায় জমিয়া যাইবার গোছ হইয়া উঠিল!

আমরা মারসেলে পৌঁছিলে, আমাদের বিভিন্ন এজেণ্টের ইণ্টারপ্রেটার আসিয়া আমাদের জিনিস পত্রের ভার লইল। আমরা সকলেই আমাদের জাহাজের বিল শোধ করিয়া জাহাজ ত্যাগ করিবার জন্য উৎসুক হইলাম? জাহাজের বিল আবার কি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জাহাজ কোম্পানী লেমনেড কিম্বা সোডা ওয়াটার দেয় না। আরও খাবার সময় ভিন্ন কোন মদ খাইলেই তাহার পূর্ণ দাম দিয়া পান করিতে হয়। সমুদ্রে একটু অসুখ হইলেই লেমনেড সকলের সহায়। এই উপায়ে জাহাজ কোম্পানী বেশ পয়সা উপার্জ্জন করে। তোমরা ভাবিতে পার, খাইবার সময় ভিন্ন কেহ মদ খায় না। কিন্তু আমি দেখিলাম, পাশ্চাত্য জগত মদের দাস, সকলে না হইলেও অনেকেই! আমাদের জাহাজে একজন ইংরাজ ছিল, জানিলাম, সে ব্যবসায়ে দর্জ্জি। মান্দ্রাজে ব্যবসায়ের জন্য গিয়াছিল। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া ক্ষুণ্ণমনে গৃহে ফিরিতেছে। সেই ভদ্রলোক রোজ বাবুগিরি করিয়া এক বোতল দু বোতল সুরা দেবীর সেবা করেন। নেশার চোটে কি যে না করেন, বলিতে পারি না! রোজই তবু পান করা চাই। জ্ঞান হইলে একটু লজ্জা হয় বটে, কিন্তু আবার পানের সময় হইলেই, আরম্ভ করেন। আহারের সহিত যাহা দেওয়া হয়, তাহাতে তাঁহার কুলায় না, তিনি আবার অন্য সময়ে পান করেন। বেশ বাপু, টাকা থাকে, কর, তবুও সয়। এ ব্যক্তির টাকা নাই, তবু পান করা ছাড়িবেন না। মারসেলে আসিলে তাঁহার মদের বিল প্রায় পাঁচ পাউণ্ড হইয়াছে! নিজের হাতে এক পয়সাও নাই!!! একি ব্যাপার! এখন তাঁহার ব্যাগ, জিনিস পত্র সমস্তই বিক্রয় করিতে লইয়া যাইতে চায়, পূর্ব্বে মনে ছিল না। আমার বন্ধু সহৃদয় নাটার তাহার সমস্ত বিল পরিশোধ করিলেন। এই এক ঘটনায় দুই দিক দেখা যায়, জগতে মদ কি সর্ব্বনাশ করিতেছে এবং পাশ্চাত্য জগত পরসেবায়, দানশীলতায় কতদূর অগ্রসর। নিশ্চয় জানি, বন্ধু নাটার তাহার নিকট হইতে সে টাকা ফিরিয়া পাইবার আশায় দেন নাই। সেই [illegible] সহিত [illegible]রের জাহাজের আলাপ মাত্র, তাহার সম্বন্ধে কোন বিষয় জানা নাই। এই অবস্থায় আমাদের দেশের কোন ব্যক্তি কি [illegible]উও (প্রা[illegible]) ত দূরের কথা, [illegible] অগ্রসর হইতেন? [illegible] বোধে যে, এই লোক যথার্থই প্র[illegible]য়াছে, তাহাকে সর্ব্বদাই প্রাণ পণে সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

আমাদের এজেণ্ট জিনিস পত্র ক্ষমাসী

কাষ্টম হাউসে লইয়া গেল বটে, কিন্তু আমাদের জিনিস পরীক্ষা করিতে কেহই আসে না। খোসামোদ করিতে পারিলে হয়। তবে এখানে খোসামোদ সর্ব্বদা খাটে না। আসল জিনিস না দিতে পারিলে সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইবার নয়। তবে কি না, কখনও ঘুস দেওয়া অভ্যাস নাই, উহাকে পাপ বলিয়াও মনে করি, আর ঘুস দিবারও তেমন ক্ষমতা নাই, কমে ত হইবে না, কাজেই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। অবশেষে এক মহাত্মা আসিয়া আমার জিনিস পত্র ঘাঁটকাইয়া এক খড়ির দাগ মারিয়া চলিয়া গেলেন। আমাকে এখন আর ঘণ্টা খানেক ধরিয়া গুছাইতে হইল। আমার জিনিস কুকের এজেণ্টের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। সহর দেখিতে গেলাম। শীতে প্রাণ যায়, সহর দেখিব কি ছাই। প্রথমেই কুকের আপিসে গেলাম। সেখানে গিয়া কাগজপত্র পড়িব আশা ছিল, কিন্তু সমস্তই ফরাসী ভাষায়। মেসিলা নামক কোন ব্যক্তি এই স্থানকে স্থাপন করেন বলিয়া নাকি নাম মারসেলে হইয়াছিল। ইহা অত্যন্ত পুরাতন সহর। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব প্রায় ৬০০ বৎসরে এই স্থান স্থাপিত হয়। এখন ইহাই ফ্রান্সের সর্ব্বোত্তম বন্দর। প্রকাণ্ড ডক, প্রচুর গুদাম ঘর, এবং বন্দর সুন্দর দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত। এখানে দেখিবার আর বেশী কিছু থাক আর নাই থাক, আমার স্থানটী বেশ লাগিল। সমস্ত সহরটাই পাহাড় কাটিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। এখানে অনেক বাড়ী দেখিলাম, যাহার একদিকের দেয়াল পাহাড়। Chateau d'if' বলিয়া সমুদ্রের মাঝখানে একটী দেখিবার যোগ্য পাহাড় আছে। আমরা পূর্ব্বে এই প্রকার পাহাড় অনেক দেখিয়াছি বটে, কিন্তু এটা লোকালয়ের, মারসেলের এত নিকটে বলিয়াই এত বিখ্যাত হইয়াছে। এখানে মিরাবো প্রভৃতি অনেক রাজবন্দী কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি এই স্থানকে বেশী জানি, আলেকজাণ্ডার ডুমোর বিখ্যাত মন্‌টিক্রষ্টোর (Monte Cristo) সেই আশ্চর্য্য ভয়াবহ ঘটনাবলীর দৃশ্য স্থান বলিয়া। ইহা ভিন্ন এখানে দেখিবার যাদুঘর ইত্যাদি অন্য কিছুই বড় নাই। আমরা এই স্থানটীর গির্জ্জাটী দেখিতে গেলাম। এটা একটা দেখিবার জিনিস। একটি পাহাড়ের উপর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সেইখানে বৈদ্যুতিক ট্রাম গাড়ীতে উঠিতে হয়। ট্রাম গাড়ী [illegible] তোমরা বুঝিবে, মাটীর উপর দিয়া রেল [illegible] য়াছে, এ তাহা নহে। সেই অত্যুচ্চ স্থান হইতে নীচ পর্য্যন্ত দুই মোটা মোটা তার আসিয়াছে, সেই তারের গায় ধরিয়া এই গাড়ী গমনাগমন করে। গাড়ী শূন্যের মধ্য দিয়া যায় !!

আমরা এই সমস্ত দেখিয়া অবশেষে কোন হোটেলে গিয়া আহার করিলাম। ইতিমধ্যে আমরা ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছি। মিঃ এবং মিসেস রো কখন কোথায় গিয়াছেন, আমরা দেখি নাই। ডাঃ আলককের সহিত সেই যে ছাড়াছাড়ি, আজও দেখা হয় নাই। তবু আমরা প্রায় আটজন। সেই দর্জ্জি ভদ্রলোকও আমাদের সঙ্গে আছেন। তাঁহার খাইবার খরচ আমাদের দিতে হইল। আমরা রাত্রে কোথায় আর যাইব, পাছে পথ হারাইয়া ফেলি, তাই পূর্ব্ব হইতেই ষ্টেসনে গিয়া বসিয়া রহিলাম। ট্রেন ছাড়িবে ১০টার সময়, কিন্তু আমরা ৭টা হইতে ষ্টেসনে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলাম। অনেক দিন এ সুখ পাওয়া হয় নাই। প্রায়

নয়টার সময় আমাদের এজেণ্ট জিনিস পত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা টিকিট করিতে গেলাম। আমাদের দেশে মুটে আনা দুই পাইলে একেবারে রাজা হয়। এখানে মুটে রাঙ্গা-মুখ। বোধ হয়; আমাদের অপেক্ষা বেশী উপায় করে। তাহাদের সামান্যে হইবার নয়। ফ্রান্সের ট্রেণ সমূহের ভাড়া অত্যন্ত বেশী। মোটের জন্য প্রতি ২২ পাউণ্ডে (১১ সেরের কম) ৭ফ্রাঙ্ক, ৯৫ সেণ্টিম, আমাদের টাকার প্রায় ৪৷৵০। আমাকে আমার এই এক বাক্সের জন্য প্রায় ১৫ সিলিং দিতে হইয়াছিল। আমরা ট্রেনে উঠিয়া চলিলাম আটজন। সকলে মিলিয়া আমোদে চলিলাম। প্রাতঃকালে প্রায় ৬॥ টার সময় আমরা লিয়নে পৌঁছিলাম। এখানে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এই ভোরে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে আমরা জিনিস পত্র লইয়া গাড়ী পরিবর্ত্তন করিলাম। কেমনে সে দারুণ শীত বুঝাইব, বলিতে পারি না। আমি পূর্ব্বে কখনও এত শীত ভোগ করি নাই। বরফ হাতে করিয়া থাকিলে যে প্রকার বোধ হয়, আমার সেই প্রকার লাগিতে লাগিল। এত কাপড় থাকা সত্ত্বেও আমার গা ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। আমার সে কষ্ট বলিবার নয়। ৭টা ১০ মিনিটে গাড়ী ছাড়িল। গত রাত্রে আমরা কিরূপ স্থান দিয়া আসিয়াছি, কিছুই জানি না। অন্ধকারে সমস্তই ঢাকা ছিল। প্রাতঃকালে ফ্রান্সের অনির্ব্বচনীয় শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা চলিলাম, ট্রেন এত বেগে চলে যে, দেখা বড়ই দুষ্কর। আমাদের ক্ষুধানল জলিয়াছে, তাই এই সমস্ত তত বেশী উপভোগ করিতে পারিতেছি না। তবুও ফ্রান্সের সেই প্রান্তরের ক্ষেত, সেই ঘন শ্যাম বর্ণের দূর্ব্বাদল সুশোভিত পর্ব্বতমালা, সেই সমস্ত মধুর বীণাধ্বনির ন্যায় শব্দায়মান ঝরণা, আহা! সেই মধু মধু চাতকের সুমধুর সঙ্গীত, দূরে ঘনকুয়াশা রাশির মধ্যে বীর পরাক্রান্ত সূর্য্যের আরক্তিম লুক্কায়িত বদন মণ্ডল, মনোমুগ্ধকর সেই সমস্ত দৃশ্য, জীবনে আর দেখি বা না-ই দেখি, হৃদয়ে একেবারে ছায়াচিত্রের ন্যায় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, কখনও মুছিবে না। আমার সাধ্য কি সে প্রকৃতির খেলাকে তোমাদের নিকট জ্ঞাপন করি। আবার এক এক স্থানে স্বভাবের সহিত মানব-কারুকার্য্যের যোগ, সৌন্দর্য্যকে কত শত গুণ বাড়াইয়া দিয়াছে। মানুষ এক জিনিস করিয়াছে, প্রকৃতি আসিয়া তাহার সুরম্য হরিৎবর্ণের বৃক্ষলতাদি দ্বারা সেই পদার্থকে সুশোভিত ও মনোরম করিয়াছে, করিতেছে। ফ্রান্স প্রায়ই পর্ব্বতময়। আমাদের ট্রেণ কখন নিম্নে, কত শত হস্ত দূরে সমস্ত লোকালয় ফেলিয়া তাহাদের উপর দিয়া দারুণ গর্জ্জনে ছুটিয়া চলিল। আবার কখন কখন পর্ব্বত ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিবা দ্বিপ্রহরকে ঘণ্টা দুই একের জন্য অন্ধকার রাত্রি দ্বিপ্রহর করিয়া মানবজাতির কৌশল, তাহাদের লীলা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মানবপিতা ভগবানের কৃপা প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে নানা স্থানে নানা ভাব, নানা স্থানে নানা প্রকার প্রকৃতির লীলাময় খেলা দেখিতে দেখিতে আমরা হৃদয় মনে সুস্থ হইতে লাগিলাম। কিন্তু এগুলি মস্তিষ্কের ক্ষুধা, এগুলি প্রাণের ক্ষুধা নিবারণে পটু, জঠরানল নিবারণ করা দূরে থাক্, আরো উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। আমরা ডিজন নামক (Dijon) স্থানে

আমরা ব্রেকফাষ্ট করিলাম। আমার এখনও কাঁটা চামচায় খাওয়া তত অভ্যাস হয় নাই। অন্ততঃ খাইতে পারিলেও হাতে খাওয়ার মত শীঘ্র হয় না। এখানে ট্রেণ আহারের জন্য ১০ মিনিট থামিবে। অর্দ্ধেক খাওয়া না হইতে হইতেই ঘণ্টা বাজিয়া গেল। দৌড়িয়া গাড়ী ধরিলাম। আর কিছু না পারিয়া হোটেলে যে রুটি খানা দিয়াছিল, সেখানিকে পকেটে করিয়া লইয়া আসিলাম! তাহা খাইয়াই ক্ষুধানল নিবাইলাম! কি দুর্দ্দশা!

এখন আমরা যতই উত্তরে যাইতেছি, যতই দিবা শেষ হইয়া আসিতেছে, ততই শীতের তীব্রতা বৃদ্ধি হইতেছে। কম্বল ইত্যাদি দ্বারা কোন রকমে জড়াইয়া প্রাণ বাঁচাইলাম। আমাদের ট্রেণ প্যারিসে ৫টা ৪৩ মিনিটে পৌছিল। পাশ্চাত্য জগতের স্বাভাবিক রীত্যনুসারেই সূর্য্যদেব, (সূর্য্যদেব বলি কেন, তাঁহাকে ত এ মুল্লুকে দেখাই যায় না) দিবা-বিদায় লইয়াছেন। এখনই রাত্রি হইয়াছে। আমরা এখানে আমাদের ডিনার খাইয়া আবার ট্রেণ পরিবর্ত্তন করিলাম। প্যারিসে দুইটী ষ্টেসন, একটি দক্ষিণে, অপরটি উত্তরে। দক্ষিণ ষ্টেসন হইতে উত্তর ষ্টেসনে যাইতে আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা লাগিল। তবেই বুঝিতেছ, কত বড় সহর। সেখানে আবার ট্রেণ পরিবর্ত্তন করিবার কথা ছিল। কিন্তু ট্রেণ পরিবর্ত্তন করিয়া করিয়া আমাদের একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে! আমরা কোন কর্ম্মচারীর নিকটে গেলাম, তাঁহার নিকটে আমাদের কথা বলিলাম। তিনি একটু ইংরাজি জানেন, সেইজন্য আমাদের গাড়ী খানা ক্যালের ট্রেণের সহিত যোগ করিয়া দিলেন। আমরা জিনিস পত্র লইয়া ছুটাছুটি হইতে একেবারে বাঁচিয়া গেলাম।

ক্যালে হইতে রাত্রি ১৷৷ টার সময় জাহাজ ছাড়িবে, তাই আমরা আর ঘুমাইলাম না। শীতে আমরা সকলেই কষ্ট পাইতেছি, বিশেষতঃ আমি। সমস্ত রাত্রি এই ভাবে উঠা নামা করিতে হইবে, এই ভাবিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল! যাহা হউক, গাঢ় মধ্য-রাত্রে আমরা ক্যালে পৌছিলাম। শীতে এক পা বাড়াইতে পারিতেছি না। তাহা হইলে কি হয়, যাইতেই হইবে, আমাদের জন্যে জাহাজ আর দাঁড়াইবে না। জাহাজের মধ্যে ক্যাবিনে গেলাম। সেখানে একটু গরম। বড় ক্লান্ত হইয়াছিলাম, সেইখানে একটু ঘুমাইলাম। বেশীক্ষণ আর ঘুম হইল না। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা ডোবারে (Dover) এ আসিলাম, তখন দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। আবার জিনিস পত্র লইয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি, পুলিস বাধা দিল; কাষ্টম হাউসে যাইয়া পূর্ব্বে পাশ আনিতে হইবে। এই রাত্রে জিনিস পত্র লইয়া কাষ্টম হাউসে গিয়া মহাশয়াদের জন্য দাঁড়াইয়া থাকা কেমন কষ্ট, সকলেই বুঝিতে পারেন। আমার মুটের পয়সা সব সময়ে দিবার সুবিধা নাই এবং দিতেও পারি নাই। আমার বাক্স বহিয়া বহিয়া হাত ব্যথা হইয়াছে। তাতে আবার কাষ্টম অফিসার আসিয়া সমস্ত জিনিস হাটকাইয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। আমি আর কি বলিব! বিলাত আসার সাধ বেশ মিটিয়াছে, আমার চক্ষে জল আসিল, হায়! এই দারুণ অবস্থায় ভগবান আমাকে কেন ফেলিলেন। বন্ধু নাটার আমাকে সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। উভয়েই পরস্পরের জিনিস পত্র লইয়াছি। যাহা হউক, যাত্রা প্রায় শেষ

হইয়া আসিয়াছে। মনে এই আশা জাগাইয়া আমাদের জিনিস গুছাইয়া আমরা আমার ট্রেণে উঠিলাম। এই ট্রেণে প্রাতঃকালে ভোরে ছয়টার সময় লণ্ডনে পৌছিলাম। এখানে পুনরায় কাষ্টম হাউসে গিয়া আমরা আমাদের জিনিস পাশ করিয়া আনিলাম। এখনও একখানি গাড়ী আসে নাই। আমার জন্য কোন লোকজন আসেন নাই। আমিও টেলিগ্রাফ করিবার সময় পাই নাই। রাত্রে কোথায় টেলিগ্রাফ আপিস, কে জানে! বন্ধু নাটারের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, তাঁহার অযাচিত সাহায্য করায় জন্য ধন্যবাদ দিয়া এক মুটে করিলাম। সে আমার জিনিসগুলি এক ক্যাবের (গাড়ী) উপর চাপাইয়া দিল। আমি গাড়োয়ানকে আমার বাসার ঠিকানায় হাঁকাইতে বলিলাম। সহজেই আমার বাসায় পৌছিলাম। আমার বন্ধুগণ আমাকে হঠাৎ দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইলেন।

৪ঠা পৌষ ১৩০৩ | শুক্রবার।

স্নেহের সেবক—
প্রভাত।

দার্শনিক মতভেদ। (২)

হিন্দুদর্শনে যে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, আমরা দেখাইয়াছি, তাহা বিভিন্ন জ্ঞানাধিকারীর নিমিত্ত। এই জ্ঞানাধিকারিগণকে হিন্দুদর্শন তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) দ্বৈতজ্ঞানী, (২) দ্বৈতাদ্বৈতজ্ঞানী এবং (৩) অদ্বৈতজ্ঞানী। যতদিন ঐন্দ্রিয়িক বিষয়জ্ঞান প্রবল, ততদিন আমরা অদ্বৈতজ্ঞানে উপনীত হইতে পারি না। যতদিন ভেদজ্ঞান (Relative knowledge) বর্ত্তমান, ততদিন অভেদ অপরিচ্ছিন্ন নির্ম্মল (Absolute) জ্ঞান অসম্ভব। সাংখ্যবাদিগণ এই কথাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। কাপিল সাংখ্যে আমরা যে অদ্বৈতবাদের নিরাস দেখিতে পাই, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কপিল দেখাইয়াছেন যে, দ্বৈতজ্ঞানীর অনুমান-তর্কে অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ নহে। যুক্তি ও অনুমানে যেমন সগুণ ব্রহ্মবাদ অসিদ্ধ, অদ্বৈতবাদ তেমনি অসিদ্ধ। অনুমানে যাহা অর্জ্জিত নহে, তাহা অনুমানে পরিমেয় নহে। যাহারা অনুমান দ্বারা অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে যাইবেন, তাঁহারা নিশ্চয় বিফল হইবেন। শঙ্কর তাই কেবল শ্রুতির শাসন দ্বারা অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। অনুমানে যদি অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হইত, তবে সবাই বিনা প্রয়াসে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হইতে পারিতেন; তবে কষ্টসাধ্য যোগপথের আবশ্যকতা ছিল না। সামান্য অনুমান ও তর্কে অখণ্ড অদ্বৈতজ্ঞান অসিদ্ধ বলিয়া তজ্জন্য স্বতন্ত্র পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই স্বতন্ত্র পথ পুরুষার্থ সাধন। এই পুরুষার্থ সাধন দ্বারা বিবেকোদয় হইলে আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। তৎপূর্ব্বে অদ্বৈতজ্ঞান অসম্ভব। আত্মসাক্ষাৎকার ঘটিলে তবে সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া যায়। তখন সমস্তই "একমেবাদ্বিতীয়ং," সুতরাং আত্মজ্ঞান ভিন্ন যখন অদ্বৈতজ্ঞান অসম্ভব, তখন অনুমান দ্বারা সেই অদ্বৈতবাদ স্থাপন করা বৃথা। সাংখ্যশাস্ত্রে যখন আত্মজ্ঞানই প্রতিপাদ্য, তখন অনুমান দ্বারা অদ্বৈতবাদের নিরসন করিয়া সেই অদ্বৈতজ্ঞানের প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশ করাই যে সেই

উদ্দেশ্য-সাধক বলিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন—

"যে শাস্ত্রের যে বিষয় মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই শাস্ত্রে সেই বিষয় বর্ণিত হইলেই, সে শাস্ত্রে সপ্রমাণ ও অবিরুদ্ধ বলিতে হইবে। অংশত কোন নিন্দিত বিষয় থাকিলে শাস্ত্রকে নিন্দিত বলা যায় না। যদি বল সাংখ্য শাস্ত্রে বহুপুরুষ স্বীকৃত আছে, সেই অংশ অবশ্য নিন্দনীয়। সে অংশ নিন্দনীয় নহে। * * * যেহেতু জীবের ইতর-বিজ্ঞানই সাংখ্যের প্রধান প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনসিদ্ধি বা অর্থের বাধ হইলে তাহাকে অপ্রামাণ্য বলা যাইতে পারে। নানাবিধ শ্রুতি স্মৃতিতে আত্মার নানাত্ব এবং একত্ব বর্ণিত হইয়াছে। আত্মার নানাত্ব ব্যবহারিক এবং একত্ব পারমার্থিক। সুতরাং ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক জ্ঞানে সেই নানাত্ব এবং একত্ব উভয়ই সিদ্ধ ও অবিরুদ্ধ। ব্যবহারিক জ্ঞানে নানাত্ব প্রতিপাদিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে আত্মার একত্বই সুসিদ্ধান্ত। এ সকল বিষয় আমরা ব্রহ্মমীমাংসাতে সবিশেষ বর্ণন করিয়াছি।"

বিজ্ঞানাচার্য্য যেমন সাংখ্যের ভাষ্যকার, তেমনি ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বভাষ্য ব্রহ্মমীমাংসায়ও বৃত্তিকার। ব্রহ্মমীমাংসায় পূর্ণপ্রজ্ঞ মাধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদই প্রতিপাদন করিয়াছেন; কিন্তু দ্বৈতবাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া নির্গুণ ব্রহ্মবাদকে একেবারে বিরুদ্ধ বলেন নাই। সেই নির্গুণ ব্রহ্মবাদ তাঁহার বিষয়ান্তর্গত নহে। যতদিন না জীবের ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হয়, ততদিন সে দ্বৈতজ্ঞানী। এই ভেদজ্ঞান যে একেবারে তিরোহিত হয়, তাহাও সম্ভাবিত নহে। জীব যত ধ্যানপরায়ণ হয়, ততই তাহার সূক্ষ্মবিষয়ে মনঃসংযোগ হয়। স্থূল ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের যতই সূক্ষ্মতা সম্পাদিত হয়, ততই অদ্বৈতজ্ঞানের আভাস অন্তরে উদিত হয়। সাদিজ্ঞান হইতে অনাদির আভাস, সসীম হইতে অসীমের আভাস, অনিত্য হইতে নিত্যের আভাস, বহু হইতে একের আভাস পরিবর্ত্তনশীল জগৎ ও জ্ঞেয় হইতে একমাত্র নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, অজ্ঞেয়ের আভাস, অনিত্য নামরূপ হইতে অনাম ও অরূপের আভাস প্রভৃতি যত অদ্বৈতের আভাস অন্তরে সঞ্চারিত হইতে থাকে, এবং যতই সেই আভাস অন্তরে প্রগাঢ়তা লাভ করে, ততই ভেদজ্ঞান ক্রমে সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া পরম সূক্ষ্ম আত্মপদার্থে চিত্ত সন্নিবেশিত হইতে থাকে। স্থূল হইতে এইরূপ সূক্ষ্মজ্ঞানের আবির্ভাব এবং প্রগাঢ় সংস্কার জন্মিলে যে অভেদের আভাস অধ্যাসিত হয়, তাহাই ক্রমশঃ ভেদ প্রতিষেধক হইয়া উঠে। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের সীমা এই পর্য্যন্ত। ইউরোপীয় সূক্ষ্মদর্শনেরও এই সীমা। এই দ্বৈতাদ্বৈত বাদই ভেদাভেদজ্ঞান।

আমাদের হিন্দুতত্ত্বদর্শী এই ভেদাভেদ জ্ঞান পর্য্যন্ত গিয়া জ্ঞানের পথে একেবারে থামিয়া যান নাই; তিনি আরও অগ্রসর হইয়াছিলেন। যে পথ দিয়া এই সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহাই সমাধিপথ। ইউরোপীয় তত্ত্বদর্শিগণ এপথে মূলেই আসিতে চাহেন না; আসিতে চাহেন না কি, এ পথের এখনও পর্য্যাপ্ত অনুসন্ধান পান নাই। যাহা কিছু শুনিয়াছেন, তাহাই শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া তাহাকে Mysticism বলিয়াছেন। শ্রুতিতে এই ত্রিবিধ জ্ঞানই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই ত্রিবিধ মতানুযায়ী রামানুজ শারীরিক সূত্রের ভাষ্য লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে তিনি উক্ত ত্রিবিধ মতই প্রদর্শন করিয়াছেন। অধিকারভেদে ঐ ত্রিবিধ পথই প্রামাণ্য। যাহারা নিতান্ত স্থূলদর্শী, তাহাদের নিমিত্ত দ্বৈতজ্ঞান, যাহারা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের সূক্ষ্মতা সাধনে তৎপর, তাহাদের নিমিত্ত দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদজ্ঞান এবং যাঁহারা নির্গুণ পর-

আত্মদর্শনের আকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের জন্য অভেদ অদ্বৈতজ্ঞান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মহোপনিষদের মতানুসারে রামানুজ ভগবান বোধায়নাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি আলোড়ন করিয়া শারীরিক মীমাংসার ভাষ্য প্রণয়ন পূর্ব্বক বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ বিবৃত্ত করিয়াছেন।

ভেদ, ভেদাভেদ এবং অভেদ জ্ঞানানুসারে যেমন বেদান্তের ত্রিবিধ প্রস্থানের উৎপত্তি, পাশুপত দার্শনিকগণও তেমনি দ্বৈত এবং অদ্বৈত প্রস্থানে বিভক্ত হইয়াছে। মাধবাচার্য্য যাহা শৈবদর্শন নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সেই মত দ্বৈতপ্রস্থান, প্রত্যভিজ্ঞা এবং রসেশ্বর দর্শন অদ্বৈতপ্রস্থান।

দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত এবং অদ্বৈতজ্ঞান অধম, মধ্যম এবং উত্তম অধিকারীর নিমিত্ত। দ্বৈত জ্ঞানীর জ্ঞানালোচনা যত সূক্ষ্মতায় আইসে, ততই তিনি দ্বৈতাদ্বৈতভাবে পরিপূর্ণ হইতে থাকেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সূক্ষ্মজ্ঞানে আমরা অদ্বৈতের অনেক দূর আভাস প্রাপ্ত হই। সসীম হইতে ক্রমশঃ অসীমে, সান্ত হইতে ক্রমশঃ অনন্তে উঠিতে থাকি। বাস্তবিক ভাবিতে গেলে, অনন্তের কখনই অংশত্ব বা সান্তভাব সম্ভাবিত নহে; তবে যে আমাদের নিকট সকল বস্তুই সান্ত ও সসীমরূপে প্রতীত হয়, সে কেবল আমাদের মায়িক জ্ঞানের দোষে। মায়িকজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া আমরা অনন্তকে সম্যক্ উপলব্ধ করিতে পারি না। উপলব্ধ করিতে না পারি, তাহাকে ভাবিবার জন্য এই মায়িকজ্ঞানের সহায়তা একান্ত আবশ্যক হয়। মায়িকজ্ঞানে আমরা সসীম ও সান্তকে উপলব্ধ করিয়া, তবে সেই সান্ত ও সসীমের মধ্যে অনন্তকে ভাবিতে সমর্থ হই। তাই বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মসূত্রে আছে :—

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ।
বেদান্তদর্শন। ৩অ, ২পা, ৩৩সূ।

শঙ্কর বলেন বুদ্ধ্যর্থ, উপাসনার্থ। সামান্য জ্ঞানে অনন্তকে আনিবার জন্য শ্রুতিতে সেই অনন্তের পাদকল্পনা করা হইয়াছে। অপরিমেয়ক পরিমেয়রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বাস্তবিক, অনন্ত নির্গুণ সত্বার মায়িক ত্রিগুণাত্মক কোন অংশ বা খণ্ড সম্ভাবিত নহে; কিন্তু আমাদের মায়িকজ্ঞানও অখণ্ড নহে। খণ্ডজ্ঞানে অখণ্ডের ভাবনাই উপাসনার অঙ্গ। সুতরাং বুদ্ধ্যর্থঃ অর্থে জ্ঞানার্থঃ এবং উপাসনার্থঃ বুঝাইতেছে।

ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে অখণ্ড ও নির্গুণ ব্রহ্মের এইরূপ পাদ কল্পিত হইয়াছে :—

"পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"

"ত্রৈকালিক ভূতসমুদায়রূপী এই জগৎ সেই বিরাটের একপাদ মাত্র। অবশিষ্ট আরও তিনটি পাদ আছে, উহা অমৃতস্বরূপ। সেই অমৃতাত্মা পাদত্রয়, ইঁহার স্বপ্রকাশ স্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে।"

ব্রহ্মব্রতসামাধ্যায়িকৃত অনুবাদ।

শঙ্কর বলেন, এই শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের পাদ কল্পনা দৃষ্ট হইতেছে, তাহা কেবল সামান্য জ্ঞানে সেই বিরাটকে আনিবার জন্য। শঙ্করের এই অর্থ বিস্তারিত করিয়া ব্রহ্মব্রত মহাশয় বলিতেছেন :—

"ব্রহ্ম নিরবয়ব হইলেও তাঁহার মায়া ত সাবয়বা। এই মায়ার অবয়বত্ব তাঁহাতে আরোপ করিয়া তাঁহাকে চতুষ্পাদরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। উপাসনার জন্য এইরূপ নিরংশে অংশের আরোপ, ভোগবৎ। দেখ অন্নপানাদি বা স্ত্রীপুত্রাদি বা গৃহশয্যা প্রভৃতি জনিত ভোগ হয়। কেবল ভোগ অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং ভোগ করিতে হইলে যেমন অন্ন পানাদির সংসর্গ অত্যাবশ্যক, তদ্রূপ উপাসনা করিতে হইলেও মায়ার অংশ গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। অধিক কি, ব্রহ্ম বৃহৎ বা নিরবয়ব, এই মাত্র জ্ঞানেও দেখ, মায়ার অংশ গৃহীত

হইয়াছে, যেহেতু, বৃহৎ জ্ঞান, ক্ষুদ্রজ্ঞান সাপেক্ষ এবং নিরবয়বজ্ঞান অবয়বজ্ঞান সাপেক্ষ। অতএব মায়ার অংশ গ্রহণ না করিলে ব্রহ্ম-ভাবনাই অসম্ভাবিত। ব্রহ্মকে 'অতিবৃহৎ' এইমাত্র ভাবনা করিতে হইলেও ষোলকলা এবং চারিপাদ এইরূপ মায়ার অংশ অগ্রে কল্পনা করিতে হইবে, পরে উপাসনা করিতে পারিবে; নতুবা এ পর্য্যন্ত এমন কোন উপায় বা যুক্তি উৎপন্ন হয় নাই, যদ্দ্বারা বিনা মায়ার সাহায্যে ব্রহ্মের নিরংশত্ব স্বরূপও ধ্যানের বিষয় হইতে পারে।"

ব্রহ্মমীমাংসায়ও ঐ বেদান্তসূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইয়া থাকে :—

"জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ বিজ্ঞাপনার্থ যেমন ঈশ্বরের পদে অপ্রসিদ্ধ হইলেও 'পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি' ইত্যাদি শ্রুতিতে ঈশ্বরের পাদশব্দ প্রয়োগ হয়, সেইরূপ জীব ও ঈশ্বরের অংশাংশিত্ব ভাববিজ্ঞাপনার্থ অলৌকিক ঈশ্বরানন্দের আনন্দ শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে। পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, যেমন লোকজ্ঞানার্থ রাজাতে দেবরাজ শব্দ প্রয়োগ হয়, সেইরূপ, অলৌকিক ঐশ্বরিক জ্ঞান বিজ্ঞাপনার্থ জ্ঞানাদি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।"

কি ব্রহ্মমীমাংসা, কি অদ্বৈত শাঙ্করভাষ্য, সকল মতেই শ্রুতির প্রতিপাদ্য নির্গুণ ও অখণ্ড ব্রহ্মই গৃহীত হইয়াছে; কেবল উপাসনার্থ তাঁহার রূপ ও নাম কল্পিত হইয়া সামান্য জ্ঞানে তাঁহার ধ্যান করা হইয়াছে মাত্র। এই সামান্য জ্ঞানের ধ্যান অবলম্বন করিয়া উপাসনা-পথে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম জ্ঞানে উপনীত হয়েন। দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞানের চরমসীমায় আসিয়া ভক্ত সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় সিদ্ধ হন। এই সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান ও উপাসনা ক্রমে ক্রমে কেমন উত্থিত হয়, রামানুজ তাহা বলিতেছেন:—

"অর্চ্চায় প্রতিমাদির উপাসনা করিলে দুরিত রাশি বিদূরিত ও তৎসহকারে বিভব বা ঐশ্বর্য্যোপাসনায় অধিকার জন্মে। পশ্চাৎ ব্যূহের (অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব এই চতুর্ব্যূহযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা) উপাসনায় অধিকারী হওয়া যায়। তদনন্তর সূক্ষ্মের উপাসনায় সামর্থ্য জন্মে। পরে অন্তর্যামী সাক্ষাৎকরণের শক্তি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।" *

এই ধ্যান কিরূপে সঞ্জাত হয়, রামানুজ তাহা বলিতেছেন:—

"ধ্যানঞ্চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নস্মৃতিসন্তানরূপা।"

তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিপরম্পরা স্মৃতির আবির্ভাবের নাম ধ্যান।

স্থূল জগতে ভগবানের যে স্থূল প্রতিমা প্রতিবিম্বিত আছে, সেই স্থূল প্রতিমার ভাবনা ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম ঈশ্বরে সমুত্থিত হইতে থাকে। এই সূক্ষ্ম সগুণ ঈশ্বরের ভাবনায় ক্রমে ব্রহ্মের বিভব বা ঐশ্বর্য্যভাবনা ও জ্ঞানস্রোত হৃদয়ে উদিত হইতে থাকে। তৎপরে সেই ভাবনাস্রোত তৈলধারাবৎ ভগবানের সূক্ষ্মতর চতুর্ব্যূহভেদ করিতে থাকে। সূক্ষ্ম ও সম্পূর্ণ ষড়্‌গুণবিশিষ্ট বাসুদেব হৃদয়ে ধ্যানস্থ হইলে অন্তর্যামী পরমাত্মধ্যানে চিত্ত সংযোজিত হয়। ব্রহ্মধ্যানের এই পর্য্যায়ানুসারে যে স্মৃতি বা ভাবনাপরম্পরা তৈলধারাবৎ অবচ্ছিন্নরূপে অনুভূত হয়, তাহাই ধ্যানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রামানুজ সগুণ সূক্ষ্মের এই ধ্যান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এইখানে দ্বৈতাদ্বৈতজ্ঞান পরিসমাপ্ত হইয়াছে; কারণ, রামানুজ বলেন, এইখানে ভক্ত "শেষরূপী ব্রহ্মে লীন হইয়া সমুদায় অভীপ্সিত সিদ্ধি সম্ভোগ করেন।"

রামানুজের এই ধ্যান গীতায় অভ্যাস যোগরূপে বিবৃত হইয়াছে :—

"অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্।" ৮অ ৮

"হে পার্থ! অভ্যাসযোগযুক্ত অর্থাৎ পুনঃ

* সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে রামানুজদর্শন।

পুনঃ স্মরণরূপ যোগযুক্তযোগী একাগ্রচিত্তে দিব্য পরমপুরুষকে স্মরণ করিতে করিতে সেই পরম পুরুষকে লাভ করে।"

একাগ্রচিত্তে এইরূপ ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে শেষে কিরূপে শেষরূপী ব্রহ্মে লীনতা জন্মে, তাহাও গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥" ৬অ ২৯।

"যোগাভ্যাস দ্বারা যাঁহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে এবং যিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্মই দর্শন করেন, সেই সমাহিতচিত্ত সমদর্শী যোগী ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সেই সমস্ত ভূত দর্শন করেন।"

জীব যখন এই দ্বৈতাদ্বৈতজ্ঞানে ব্রহ্ম ভাবনায় ধ্যানস্থ ব্রহ্মে লীন হয়েন—অবিচ্ছিন্নরূপে লীন হয়েন, তখন তাঁহার সমাধির অবস্থা। এই সমাধি-সম্পন্ন জীব ক্রমে নির্গুণ ধ্যানে অধিকারী হয়েন।

দ্বৈতজ্ঞানির চিত্তে সগুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত; নির্গুণের জ্ঞানে তিনি অন্ধ। এই সগুণের ধ্যান যত কেন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতমে অগ্রসর হউক না, সে সমস্ত জ্ঞানই সাকার ও মূর্ত্তজ্ঞান। এজন্য আর্য্যশাস্ত্রে উপাসনা দ্বিবিধ হইয়াছে, সাকার ও নিরাকার। সমস্ত ধ্যানই সাকার, কেবল একমাত্র নির্গুণের ধ্যান নিরাকার। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে এই দ্বিবিধ উপাসনা কথিত হইয়াছে। রামানুজ যে নিদিধ্যাসনের কথা কহিয়াছেন, সেই সগুণ ঈশ্বর ধ্যান সমস্তই মূর্ত্তধ্যান। রামানুজের সাকার উপাসনা পর্য্যায়ক্রমে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে :—
উপাসনা—(১) স্থূলসাকার, (২) মানসিক সাকার, এবং (৩) সূক্ষ্মসাকার।

(১) স্থূল সাকার

অর্চ্চা, বা, প্রতিমাদি — বিভব, বা রামাদি অবতার

(২) মানসিক সাকার, বা, চতুর্ব্যূহ।*

অনিরুদ্ধ — প্রদ্যুম্ন — সঙ্কর্ষণ — বাসুদেব

(৩) সূক্ষ্ম সাকার

সূক্ষ্মবাসুদেব — অন্তর্যামী।

এই ধ্যানপর্য্যায় Herbert Spencer এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন :—

"The coalescence of Polytheistic conceptions into the Monotheistic conception and the reduction of the monotheistic conception to a more and more general form in which personal superintendence becomes merged in universal immanence."
First Principles.

সমগ্র দেবতাদিগের ধ্যানস্বরূপ এক ব্রহ্মের ধ্যানস্বরূপে এবং সেই ব্রহ্মরূপ বিধাতা—বিশ্বব্যাপী, অন্তর্যামী, পরমাত্মায় বিলীন হয়।

গীতায়ও উক্ত হইয়াছে :—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥" ৪অ-১১।

এই সাকার উপাসনাই ধ্যানপথের শেষ সীমা নহে। সাকার উপাসনায় দ্বৈতজ্ঞানী

* শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে এই চতুর্ব্যূহতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামীর টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠকমাত্রেরই এই চতুর্ব্যূহতত্ত্ব জানা আছে।

ক্রমে দ্বৈতাদ্বৈতভাবে উপনীত হইলে অদ্বৈত-জ্ঞানের অধিকারী হইলেন। তখন তাঁহার অবিচ্ছিন্ন ঈশ্বরভাবনা বা স্মৃতিপরম্পরা শেষ-রূপী ব্রহ্মে লীন হইলে, তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ধ্যানাধিকারে উপনীত হইলেন। এই ব্রহ্ম-ধ্যানে তাঁহাকে "নির্ব্বিষয়" হইতে হইবে। রামানুজ যেখানে সাকার উপাসনা শেষ করিলেন, সেইখান হইতে সাংখ্যের অধিকার আরম্ভ হইল। রামানুজও অধম ও মধ্যম অধিকারীর জন্য যে নিদিধ্যাসন ও ধ্যানযোগ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সাংখ্য তাহার পরিশেষ করিয়া সমস্ত সমাধি-পথ সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। এই ধ্যানপথের দ্বৈতাদ্বৈত সীমার পরই অদ্বৈতসীমার প্রারম্ভ। সাংখ্যের অধিকার এই নির্গুণের ধ্যান। তাই রামানুজ যে ধ্যানের লক্ষণ দিয়াছেন, তাহা অদ্বৈত-জ্ঞানমূলক নির্ব্বিষয়ক ধ্যান-লক্ষণ হইতে ভিন্ন হইয়াছে। সাংখ্যের ধ্যান নির্ব্বিষয়ক; মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করাই উদ্দেশ্য। চিত্তে সংসারবীজ মূলেই না থাকে, এরূপ উদ্দেশ্যে নির্গুণের সমাধি। সেই নির্ব্বিষয়ক, নির্ব্বিকল্প এবং নির্বীজ সমাধি লক্ষণ কপিল দেব এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ। ৬অ-২৫।

রামানুজ এবং কপিলদেবের ধ্যানলক্ষণে আপাততঃ বৈষম্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু যখন আমরা এইরূপ অধিকারভেদ দেখি, তখনই কেবল বুঝিতে পারি, তাঁহাদের মতভেদের কারণ কি? এরূপ বৈষম্যকে মতভেদ বলা অন্যায়। তাঁহারা একই পথের বিভিন্ন দেশের ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন মাত্র। ধ্যান-পথের বিভিন্ন অবস্থায় ধর্ম্ম কখনই এক হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাঁহাদের ধ্যান লক্ষণ অবশ্যই বিভিন্ন হইয়াছে। একজন তরুণবয়স্ক এবং একজন বৃদ্ধের চিত্র কখনই সমান হইতে পারে না।

রামানুজের ধ্যান ভগবানের শেষ (অনন্ত) রূপে নিমজ্জিত হইয়া বিলীন হইয়াছে। এই ধ্যান তীব্র হইলে সালোক্য লাভ হয়, আরও তীব্র হইলে সামীপ্য এবং তদপেক্ষাও তীব্র হইলে সারূপ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু যখন জীব সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া একেবারে ভগবৎসত্ত্বার শেষরূপে নিমগ্ন হইয়া বিলীন হন, তখন তাহার সাযুজ্য মুক্তি লব্ধ হয়। সগুণ ব্রহ্ম ধ্যানপথে এই শেষরূপী ভগবানে বিলীন হওয়াই শেষ সীমা। তখন তীব্রধ্যানে ব্রহ্ম দর্শন ঘটে। তৎপরে সাংখ্যের নির্ব্বাণ মুক্তি। যখন জীব অনন্তে বিলীন হন, সেখানেও সাংখ্য বলিতেছেন, এখনও জীব প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারেন নাই; কারণ, অনন্তেও ত্রিগুণ রহিয়াছে। অনন্ত মূল প্রকৃতির প্রধানা মূর্ত্তি। সাংখ্যে তাহা মহত্তত্ত্ব বা মহান্ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই সূক্ষ্ম জ্ঞানময় মহত্তত্ত্ব হইতে চিন্ময় নির্গুণ পুরুষে উপনীত হইতে হইলে নিস্ত্রৈগুণ্য * সাধন করিতে হয়। এই নিস্ত্রৈগুণ্য সিদ্ধ হইলে তবে ত্রিগুণাতীত পুরুষের সাক্ষাৎকার ঘটে, এই সাক্ষাৎকারে নাম আত্মসাক্ষাৎকার বা পরম পুরুষ বা পরমাত্মদর্শন।

এই আত্মসাক্ষাৎকারে উপনীত হইবার দুই পন্থা আছে, এক সগুণ ঈশ্বরের ধ্যান

* গীতায়ও এই নিস্ত্রৈগুণ্যের উপদেশ। প্রথম অধিকারীর পক্ষে সাকার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। এই সাকার উপাসনায় কর্ম্মযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তকে একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ করিয়া নিবৃত্তি ও নিষ্কাম পথে অগ্রসর হইলে তখন স্বতঃই বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং জ্ঞানযোগের অধিকার জন্মে।

পথ; অন্য, সাংখ্যের তত্ত্বজ্ঞান পথ। রামানুজ, পতঞ্জলি, গৌতম, কণাদ প্রভৃতি সগুণ ব্রহ্মবাদিগণ সগুণ ঈশ্বরের ধ্যানপথে গৌণভাবে অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে উপনীত হয়েন, কাপিল সাংখ্য সগুণ ঐশ্বরিক ধ্যান-নিরপেক্ষ কেবল প্রকৃতিবিবেকসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সেই যোগসিদ্ধিলাভ করিতে চাহেন। এই খানে সাংখ্যযোগ হইতে অন্য যোগের প্রভিন্নতা। সগুণ ঈশ্বর-ধ্যান কোথায় আসিয়া সাংখ্যযোগের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সাংখ্যযোগীগণের সহিত অপরাপর যোগীর প্রভেদ এই, সাংখ্যযোগী প্রকৃতিতত্ত্বদর্শন মধ্যে সগুণ ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখেন না, অপরাপর যোগীগণ সেই প্রকৃতি তত্ত্বে ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখিতে পান। সাংখ্যযোগী যে প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞানে, মূলবস্তুর উপলব্ধি করিতেছেন, যাহা প্রকৃতির কর্তৃত্বশক্তি ও চিদাভাস, তাহা অপরাপর যোগীগণের নিকট ঐশ্বরিক তত্ত্ব। কিন্তু সাংখ্যের নিকট তাহার নাম প্রকৃতির ত্রিগুণাত্মক মূলতত্ত্ব। সাংখ্যযোগীগণ কেবল ঐশ্বর্য্যের প্রতিষেধার্থ বস্তুতত্ত্বজ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া ধ্যানে ঈশ্বরমূর্ত্তির অবলম্বন ছাড়িয়া দেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐশ্বর্য্য-বৈরাগ্য সাধনই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহারা সেই মূলতত্ত্বকে প্রকৃতি বলিলেন এই জন্য যে, তাহা হইতে নাম-রূপ ও আকার সম্ভূত হয়; প্রকৃতি নাম-রূপ ও আকার সৃষ্টিকারিণী; যাঁহার প্রথম পরিণাম অনন্ত বা শেষরূপী মহত্তত্ত্ব। এই সগুণ মূলতত্ত্বই ঈশ্বর। যাহা প্রকৃতির অশেষ পরিণাম মধ্যে নিত্য, যাঁহার রূপই প্রকৃতি, তাহাই ঈশ্বর—ঈশ্বরই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্ত্তা। তিনি সর্ব্বশক্তিমান নিত্যবস্তু, সর্ব্বশক্তির শক্তি কার্য্যকারণ-অতীত অপরিবর্ত্তনীয় কর্তৃত্বাধার। তাহা ত্রিগুণধারিণী ঐশ্বর্য্যশালিনী প্রকৃতির মধ্যে চিদাভাস; তাহা সগুণ চিৎশক্তি। সাংখ্যের সগুণ মূলতত্ত্বের সহিত যোগীগণের সগুণ ঈশ্বরের বিভিন্নতা এই মাত্র। মহানরূপে যে প্রকৃতি বিভিন্ন ধর্ম্ম, করণ ও আকারের সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাই পুরাণে ব্রহ্মারূপে উক্ত হইয়াছেন। মূলতত্ত্ব এক হইলেও বিভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত দার্শনিকগণ দর্শনকে নানা পন্থায় বিভক্ত করিয়াছেন। কেহ দ্বৈতপথে, কেহবা দ্বৈতাদ্বৈত পথে ঐশ্বরিক সাধনতত্ত্ব দেখাইয়াছেন, কেহ বা অদ্বৈতপথে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই জন্য, তাহাদের বিভিন্ন নামকরণ এবং বিভিন্ন সাধনাবস্থার বিভিন্ন ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকলেরই উদ্দেশ্য সেই একই, নিত্য পরমতত্ত্বে উপনীত হয়েন; বিভিন্ন দার্শনিকেরা একই পন্থার বিভিন্ন অবস্থা বা একই স্থানে উপনীত হইবার বিভিন্ন পন্থার নিরাকরণ করিয়াছেন মাত্র।

আমরা এমত কথা বলি না যে, নির্গুণবাদী সাংখ্য একেবারে দ্বৈতজ্ঞান-বিরহিত। দ্বৈতজ্ঞান-প্রধান ন্যায়, বৈশেষিক, এবং ব্রহ্ম-মীমাংসায় আত্মার ভেদজ্ঞান, অংশত্বজ্ঞান, এবং বহুত্ব থাকিলেও সেই আত্মার একত্ব একেবারে অস্বীকৃত হয় নাই; তবে সেই একত্ব তাহার মুখ্য প্রতিপাদ্য নহে। তজ্জন্য সেই দ্বৈতবাদী দর্শনসমূহে আত্মার বহুত্ব এবং ব্রহ্মের সগুণত্ব পারমার্থিক হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, সাংখ্যদর্শনে আত্মার বহুত্ব পারমার্থিক নহে, তাহা ব্যবহারিক জ্ঞান মাত্র। যত দিন না প্রকৃতি পুরুষের যথাযথ জ্ঞানোদয় হয়, যত দিন না সেই জ্ঞানোদয় হেতু বিবেকের সঞ্চার হয়, তত

দিন দ্বৈতজ্ঞাননিবন্ধন আত্মার অংশত্ব ও বহুত্ব জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতির তত্ত্বজ্ঞান যত দিন বিচার্য্য থাকে, তত দিন সাংখ্যযোগীকে দ্বৈতজ্ঞানী হইয়া প্রকৃতির পরিণাম এবং আত্মার বহুত্বও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাই সাংখ্য-তত্ত্বজ্ঞানে আত্মার বহুত্ব ব্যবহারিক রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই ব্যবহারিক জ্ঞানাবলম্বনে সাংখ্যযোগী ক্রমে ক্রমে আত্মার একত্বে উপনীত হয়েন বলিয়া সেই অদ্বৈত-জ্ঞানই তাহার পারমার্থিক। প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্বনির্ণয় কালীন সাংখ্যযোগী অবশ্য এমত এক অবস্থায় উপনীত হয়েন, যখন তিনি ভেদজ্ঞানী এবং অভেদজ্ঞানী, উভয়ই। যখন তাঁহার এই অবস্থা, তখন তাহার দ্বৈত ও অদ্বৈত, উভয় জ্ঞানই আংশিকরূপে বর্ত্তমান। কিন্তু রামানুজ যেখানে দ্বৈতাদ্বৈতের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নির্গুণবাদী সাংখ্য সেখানে কোন সীমাই নির্দ্দেশ করিতে চাহেন না। সাংখ্য সেখানে বিলক্ষণ সগুণ-ভাব বিদ্যমান দেখেন; সুতরাং এক দ্বৈত-জ্ঞানের সামান্য আখ্যায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদিকেও নিক্ষেপ করেন; সেই দ্বৈতাদ্বৈতবাদের আর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না। এইজন্য অদ্বৈতবাদীগণ, কি দ্বৈতাদ্বৈত, কি দ্বৈত-বাদ, উভয়কেই এক সামান্য দ্বৈতবাদ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

ঈশ্বরোপাসনা সকল দ্বৈতবাদীর স্থির লক্ষ্য। যদি লক্ষ্যই স্থির না থাকে, তবে উপাসনা কাহার জন্য। এজন্য দ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ উপাসনার সৌকর্য্যার্থ নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্য ঈশ্বরো-পাসকগণের এই স্থির লক্ষ্য স্বরূপ নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করিতে চাহেন না। কারণ, সগুণ বস্তু মাত্রেরই ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্ম অনিত্য এবং পরিবর্ত্তনশীল। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সাধর্ম্ম্যই এই। পাছে সাংখ্যযোগী-গণ এই কীলকে আসিয়া বাঁধিয়া পড়েন, তাই তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য সাংখ্যকার দেখাইয়া দিয়া গেলেন যে, এই সগুণ ঐশ্বর্য্যে প্রকৃতির ভাব বিদ্যমান থাকাতে তাহা অনিত্য জানিবে; তোমা-দের লক্ষ্য এ অনিত্যধামে নহে। যে নির্গুণ চৈতন্য নিত্য, স্থির ও অচঞ্চল, সেই নিত্য ধামে তোমাদের লক্ষ্য।

নির্গুণবাদী জৈমিনিরও এই মুক্তি লক্ষ্যস্থানীয়। সেইজন্য তিনিও সেই সগুণ ঈশ্বরের লক্ষ্য ভেদ করিয়া নির্গুণ পরমা-ত্মায় বিরামলাভ করিয়াছেন। জৈমিনি ও কপিল নিজে নিজে যে স্থলে আসিয়া বিরাম লাভ করিয়াছেন, অপরকেও সেই গন্তব্য স্থলে লইয়া যাইতে চাহেন বলিয়া তাঁহারা নিজ নিজ দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু বুঝাইয়া দিলেন, কপিল কেবল নিজ নির্দ্দিষ্টপন্থার ব্যাঘাত নিবারণ জন্য সগুণ ঈশ্বরের অবলম্ব পরিহার করিয়া-ছেন মাত্র; তাই তিনি বলিয়াছেন, ঈশ্বর অসিদ্ধ; নহিলে তিনি এমত কথা বলেন নাই যে, ঈশ্বর একেবারে নাই। তাঁহার অর্থ, সাংখ্যযোগপথে ঈশ্বর অসিদ্ধ হইলেও; যাঁহারা সে অবলম্ব ধরিয়া সমাধিপথে অগ্র-সর হইতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে ঈশ্বর, ভক্তি অসিদ্ধ নহে। পাতঞ্জল সাংখ্যে সে কথা আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। ভগবান্ পতঞ্জলি সেই ভক্তিপথ ধরিয়া জ্ঞানপথে উঠিয়াছিলেন এবং অপরকেও তাহা উপ-দেশ দিয়া গিয়াছেন। তাই, ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, যে ঋষি যে পথ ধরিয়া সিদ্ধি-

লাভ করিয়াছেন, তিনি সেই সাধনপথে সম্পূর্ণ পারদর্শী হইয়া অপরকে তাহা নিঃসংশয়ে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পাতঞ্জল যোগসূত্রে যোগপথের পদে পদে অঙ্কপাত হইয়াছে। কোন খানে কোন বিঘ্ন ঘটিলে তাহার নিবারণ জন্য ঋষি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। গৌতম প্রভৃতি সগুণ ঈশ্বরবাদিগণ নানা যুক্তি দিয়া দ্বৈতপ্রস্থানকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং হিন্দুদর্শনে বৈদিক মুক্তিপথের সকল দেশে সমান আলোকপাত হইয়া অতি পরিষ্কৃত হইয়াছে। সকলেই একই নির্ব্বাণমুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। যিনি যে অধিকারীর নিমিত্ত নিজ নিজ দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সেই অধিকারীর পক্ষে ধ্রুবতারা। অপর অধিকারীর পক্ষে সে পথ তত প্রশস্ত না হইতে পারে, কারণ, অপর অধিকারীর নিমিত্ত তাহা প্রস্তুত হয় নাই; কিন্তু যে অধিকারীর জন্য তাহা প্রস্তুত হইয়াছে, সে অধিকারী তাহাতে সম্পূর্ণ উপদেশ লাভ করিয়া নিজ পথে অগ্রসর হইতে পারেন। প্রাচীন কালে যখন কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানপথের অনেক পথিক পাওয়া যাইত, তখন সেই সেই পথের পারদর্শিতা প্রতিপন্ন হইত। একালে যখন সেই পথই পরিত্যক্ত হইয়াছে, তখন সে পথের নানা দোষোদ্ঘাটন করা কেবল মিথ্যা বাক্য ব্যয় মাত্র। এক্ষণে যাহা মতভেদ বলিয়া প্রতীত হইতেছে, তাহা আমাদের মিথ্যাদৃষ্টি মাত্র। প্রাচীনকালে সেই সেই গন্তব্যপথের পথিকগণের নিকট তাহা প্রতি পথকে সুদৃঢ়, নিষ্কণ্টক, পরিষ্কৃত ও সমলঙ্কৃত করিয়াছিল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

সমাজ-সমস্যা।

ভারত-সমাজে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু কেন ঘটিল?

(১) ইংরাজের পরিচ্ছদ আঁটা সাঁটা, আমাদের শিথিল; ইংরাজ বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে বিবাহিত হয়েন না, আমরা বাল্যে বিবাহিত হই; ইংরাজ সমাজে বিধবা নবভর্ত্তা গ্রহণ করিতে পারেন, আমাদের সমাজে শ্রেষ্ঠ জাতীয় বিধবাগণ তাহা পারেন না; বঙ্গ সমাজে কোন জাতীয় বিধবাগণই তাহা পারেন না বা করেন না। ইংরাজ বলিয়া যে একটা জাতি, তাহাদের মধ্যে পরস্পরের সহিত আহারাদি এবং আদান প্রদান চলে, তবে বংশগৌরবাদি উপেক্ষিত হয়, তাহা নয়। কিন্তু আমাদিগের দেশে অনেক "জাতি;" তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরে আহার বিবাহাদি চলে না। ইংরাজের ভোজন প্রণালী আমাদের মতন নহে; উপবেশন পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। কথা এই, ইংরাজে এবং এদেশীয়ে প্রভেদ এত বেশী যে, তাহার সংখ্যা করা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু ইংরাজ বিজেতা, আমরা বিজিত; ইংরাজ প্রভু, আমরা দাস। উপযোগী বা অনুপযোগী হউক, উপকারী বা অপকারী হউক, যাহা প্রভু-সমাজে প্রচলিত, তাহার প্রতি দাসবর্গের একটু টান থাকা স্বাভাবিক। এই কারণে অনেক লোক আত্ম-সমাজ-বিদ্বেষী এবং পর-সমাজ-প্রিয়। বিদ্বেষ বা অনুরাগ কেবল মনে মনে থাকে না, কার্য্যেও পরিণত হয়; এবং তাহা হইয়াছেও।

(২) দোকানের সম্মুখে একটা ষাঁড় শুই-য়াছিল, ইহাই দেখিয়া একজন ময়রার দোকান চিনিয়া রাখিয়াছিলেন। সে গল্প সকলেই জানেন। ইংরাজ ক্ষমতাশালী; ইংরাজের জাতীয়ত্ব আছে। ইংরাজ আমাদের প্রভু। কিন্তু আমরা দাস, এবং আমাদের আছেই বা কি গুণ! যদি কোন গুণ থাকিত, তবে দাস হইব কেন? যাহারা ক্ষমতাশালী এবং প্রভু, তাহাদের মধ্যে যে সকল প্রথা পদ্ধতি দেখা যায়, বোধ হয়, সে গুলি ক্ষমতা এবং প্রভুতা বৃদ্ধির উপযোগী। এই প্রকার বিচারে অনেকে দেশীয় প্রথার প্রতি বিরক্ত এবং বিদেশীয় প্রথাদির প্রতি অনুরক্ত। এপ্রকার ন্যায়, ষাঁড় দেখিয়া দোকান স্থির করিবার মত। কিন্তু এ প্রকার যুক্তি ও সিদ্ধান্ত অনেক লোকের পক্ষে স্বাভাবিক।

(৩) ইংরাজ আমাদের রাজা। রাজার সহিত ব্যবহারে ইংরাজী ভাষাই চলে। কাজেই ইংরাজী শিক্ষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। সম্পদ, সম্মান ও গৌরব লাভ করিতে হইলে ইংরাজীতে সুশিক্ষিত না হইলে চলে না। কাজেই ইংরাজী সাহিত্যের চর্চ্চাই অধিক। ইংরাজ উন্নতিশীল জীবন্ত জাতি; তাঁহাদের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানাদিও প্রভূত। সে সকল বিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে, ইংরাজের প্রতি অনুরক্ত হইবেন, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

(৪) যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ ইংরাজীতে লিখিতে ও কথা কহিতে পারে, সে সুশিক্ষিত বলিয়া আদৃত হয়। যে ইংরাজের চালে চলে, লোকে তাহাকে ইংরাজীতে সুশিক্ষিত বলিয়া মনে করে, কারণ বহু শিক্ষার ফলে উক্ত প্রকার চাল চলনে অনুরাগ হয় বলিয়াই লোকের অনুমান। আদর পাইবার জন্য অথবা মনে মনে আত্মাভিমানের তৃপ্তির জন্য অনেক ইংরাজী প্রথার অনুকরণ করিয়া থাকেন।

(৫) ইংরাজের সহিত মিশিবার আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। দেশের লোকের সহিত আমাদের মিশ না খাইলেও ক্ষতি নাই; কারণ চাকুরী ত দেশীয়েরা দিবে না? ইংরাজের সহিত মিশিতে হইলে অথবা সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কার করিতে হইলে, ইংরাজ যে প্রকার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়েন, তাহা অবলম্বন করিবার জন্য লোকের প্রবৃত্তি জন্মে। "সাহেবেরা এরূপ কার্য্য না করিলে কি ভাবিবে," এই চিন্তায় অনেক দেশীয় আচার ব্যবহারাদির বিরোধী হইয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন আবার সাহেবদিগের সামাজিক শিষ্টাচারের বাঁধা নিয়ম জানা, এবং তাহার অবলম্বন, সাহেবদিগের সহিত মিশিবার জন্য প্রয়োজনীয়। এজন্যেও অনেকে ইংরাজী প্রথার অনুবর্ত্তী হয়েন।

(৬) ৫ম কারণটির আরও একটু বিশদ বিবৃতির প্রয়োজন। যাঁহারা উচ্চ পদস্থ, তাঁহাদের পক্ষে সাহেবদিগের সহিত ঘনিষ্টতা স্থাপন প্রয়োজনীয় হয়। যাহাদের পারিবারিক ব্যবহার ইংরাজ জাতির অনুরূপ নহে, সাহেবেরা তাহাদের বাড়ীতে দেখা শুনা করিতে যান না। উচ্চ পদস্থ লোকদিগের পক্ষে এরূপ মেশামেশিতে উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হয়; সেই জন্য তাঁহাদের পক্ষে ইংরাজ জাতির ব্যবহারাদি প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়।

(৭) অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এমন অনেক সাহেব আছেন, যাঁহারা দেশীয় লোকদিগকে বিদেশীয় প্রথানুবর্ত্তী হইতে দেখিলে চটিয়া যান। "ইহারা আমাদের সকলের

হইতে চায়” ভাবিয়া কষ্ট হয়েন। কিন্তু এ প্রকার মনের ভাব অপেক্ষা বিপরীত রকমের মনের ভাব অধিক। সে কথা দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছি। একজন ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক ব্রাহ্মণ নগ্নপদে সামান্য পরিচ্ছদে একজন সুবেশ-ভূষিত হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত। সে ব্যক্তি হাকিমের করুণা ভিক্ষা করে; তাঁহাকে হুজুর বলে, অথচ তাঁহার স্পর্শ অপবিত্র বলিয়া জ্ঞান করে। ইহাতে হাকিমের মনে বিরক্তি এবং অভিমান জন্মে। তিনি ভাবেন যে, যে ব্যক্তি বিজিত, আমি যাহার রাজা বা প্রভু, এবং যাহা অপেক্ষা আমি কত গুণে উন্নত, সে ব্যক্তি কেন আমাকে ঘৃণা করিবে? কেন সে আপনাকে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাবিবে? কিন্তু যে ব্যক্তি ইংরাজের করস্পর্শ পাইলে সৌভাগ্যবান ভাবে, ইংরাজের প্রথা পদ্ধতি ভাল বলিয়া অবলম্বন করে, এবং স্বদেশীয় অবস্থা ঘৃণিত বলিয়া চিন্তা করে, তাহাকে দেখিলে হাকিমের মনে হইবে যে, এই স্থানে দেশ জয় সম্পূর্ণ হইয়াছে; ইহারাই যথার্থ দাস। কাজেই ইংরাজী প্রথা অবলম্বিত দেখিলে যে ইংরাজ দেশীয়দিগের উপর বিরক্তই হইয়া থাকেন, একথা সকল সময়ে ঠিক নহে। ইংরাজী প্রথা অবলম্বনে সাহেবদের নিকট সুশিক্ষিত এবং সংস্কৃত-রুচি সম্পন্ন এবং সৎসাহসী বলিয়াই আদৃত হইবার সম্ভাবনা অধিক। একারণেও অনেকে ইংরাজের সামাজিক প্রথার অনুকূলে।

(৮) এমনও অনেক লোক আছেন, যাঁহারা বিচার দ্বারা নিষ্পন্ন করিতেছেন যে, ইংরাজ জাতির কোন কোন আচার অনুষ্ঠান সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। ভিন্ন রকমের আচার ব্যবহার প্রথা পদ্ধতিগুলি রাত্রি দিন দেখিতে হয়; তাহাতে তাহার গুণের সমালোচনা ও উপযোগিতার বিচার চিন্তাশীলের নিকটে অপরিহার্য্য। শুধু চিন্তা করিয়াই চুপ করিয়া থাকেন, এমন লোকও আছেন, কিন্তু এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা যাহা উপযোগী এবং কল্যাণকর বলিয়া মনে করেন, তাহার অনুষ্ঠান করেন এবং সমাজে প্রবর্ত্তিত করাইবার জন্য চেষ্টা করেন।

(৯) পরিবর্ত্তন, নিয়ম। সহজেই সকল সমাজেই পরিবর্ত্তন ঘটে। চীন সমাজেও পরিবর্ত্তন হইতেছে। তাহার পর বিদেশীয়ের সংঘর্ষ, ভিন্ন প্রকারের আচার ব্যবহারের সংঘর্ষ। পরিবর্ত্তন নিরুদ্ধ হইবার নহে; তবে নিয়মিত হইতে পারে।

ভারত-সমাজে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এবং প্রতিনিয়তই অধিকতর পরিবর্ত্তনের দিকে সমাজের গতি দৃষ্ট হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের ফলে অনেক প্রাচীন আচার ব্যবহার, প্রথা পদ্ধতি, বিলুপ্ত হইয়াছে, বা বিলুপ্ত-প্রায় হইতেছে, এবং বহুতর নূতন প্রথা পদ্ধতি প্রাচীনের স্থান অধিকার করিতেছে। যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাই মন্দ, এবং যাহা নবীন, তাহাই ভাল, এ কথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন না; এবং ইহার বিপরীত কথাও সাহস করিয়া বলা যে অবিবেচকতা, তাহার সন্দেহ নাই। পরিবর্ত্তনের ফলে যে কোন ২ উপযোগী এবং মঙ্গলদায়ক সংস্কার ও অনুষ্ঠান তিরোহিত হইয়াছে, তাহা পরে প্রদর্শন করিব। যাহা উপযোগী এবং মঙ্গলপ্রদ, তাহার তিরোধানে যে সমাজে অসুখ অসুবিধা এবং অনিষ্ট সংঘটিত হয়, তাহা আর বলিতে হইবে কেন? কোন ২ স্থলে আবার প্রাচীনতা অটুট রহিয়াছে বলিয়া অথবা

এই পরিবর্ত্তনের সময়ে কালোচিত মঙ্গলপ্রদ নবভাব সমাজ শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারিতেছে না বলিয়া, ক্লেশ, এবং অশান্তি উৎপাদিত হইয়াছে। ক্লেশ অসুবিধা এবং অশান্তি সকলেই অনুভব করে, কিন্তু এ সকল কি কারণে ঘটিল, তাহা সাধারণ লোকে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পরিবর্ত্তন ইহার কারণ, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের কোন্ অবস্থা ইহার কারণ, তাহা স্থির করা দুরূহ। এই জন্য সাধারণ লোকে যে কোন পরিবর্ত্তনকেই অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেছে এবং তাহার বিরোধী হইতেছে। যাঁহারা শিক্ষিত এবং বিবেচক, তাঁহাদের মধ্যেও কারণ নির্দ্দেশ বিষয়ে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে।

সামাজিক পরিবর্ত্তনের উপর যখন আমাদিগের জাতীয় জীবন নির্ভর করিতেছে, তখন এ বিষয়ের সমালোচনায় যদি সমগ্র বঙ্গ সাহিত্য নিয়োজিত হইত, তাহা হইলেও ক্ষতি ছিল না। কতকগুলি কুশিক্ষিত এবং চিন্তাবিহীন লোকের হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যারূপ উন্নত চীৎকারে, দেশে কাণ পাতিবার যো নাই। সাধারণ লোক সর্ব্বত্রই লঘু-প্রকৃতিক; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের দেশে এই লঘুতা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, অনেক সময়ে দেশের উন্নতির আশায় হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। এই কোলাহল এবং উন্মত্ততার মধ্যেও কয়েক জন বুদ্ধিমান এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি সামাজিক পরিবর্ত্তন এবং তাহার ফলাফল বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জানি না, এ সকল গ্রন্থ দেশে বহুল পঠিত হইয়াছে কি না। এই প্রবন্ধে যদি সেই সকল গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে সমাজ-সমস্যার কথা আলোচিত হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ সেই গ্রন্থগুলির প্রতি অনেক লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারিবে, আশা করা যায়। আমি মুখ্যভাবে তিন জন গ্রন্থকারের পুস্তক অবলম্বন করিয়া সমালোচনা আরম্ভ করিতেছি; কিন্তু পরোক্ষভাবে অন্যান্য ব্যক্তির মতামতও সমালোচিত হইবে। প্রথমতঃ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত সামাজিক-প্রবন্ধ, পারিবারিক-প্রবন্ধ, আচার-প্রবন্ধ, এবং স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, দ্বিতীয়তঃ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রণীত যুগান্তর এক বক্তৃতামালা; তৃতীয়-শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রণীত হিন্দুত্ব, এই সমালোচনার আলোচ্য মুখ্য গ্রন্থাবলী।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (৬)

অন্যচ্ছ্রেয়োহন্যদুতৈব প্রেয়
স্তে উভে নানার্থে পুরুষংসিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়ো বৃনীতে।

(কঠোপনিষৎ, ২।১)

"শ্রেয় (পরমার্থ) ও প্রেয় (সংসার সুখ) পরস্পর বিভিন্ন। এই উভয় বিভিন্নরূপে পুরুষকে আবদ্ধ করে। যে এই দুইয়ের মধ্যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে, তাহার মঙ্গল হয়; আর যে প্রেয়কে গ্রহণ করে, সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়।"

(সীতানাথ দত্ত কৃত অনুবাদ)।

বিদ্যা এবং অবিদ্যা, শ্রেয় এবং প্রেয়

চিরদিন মনুষ্যের উপর আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। আপাত-মধুর অবিদ্যার বিবিধ লাস্যলীলাময়ী মোহিনীমূর্ত্তি দুর্ব্বল মনুষ্য হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে মোহ-মুগ্ধের ন্যায় করিয়া তোলে। মানব তাহার সেই সৌন্দর্য্যে—বাহ্যবেশভূষার আত্মহারা ও দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া, সেই মোহিনী-দত্ত মদিরাপানে উন্মত্ত হইয়া, সমস্ত ভুলিয়া যায়। কিন্তু দুইটী দিন মাত্র চলিয়া যাউক্‌, দেখিবে, সেই মোহিনীর যে কটাক্ষবিভ্রম তোমার চিত্তের একটা যুগান্তর উৎপাদিত করিয়া তোমায় সর্ব্বতো-ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহাই দুইটী দিন পরেই কাল-ভুজঙ্গের মত তোমার অন্তঃকরণে হলাহল ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আর তুমি সেই তীব্র বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করি-তেছ ;—সেই বিষের প্রতাপে তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি, মন, দেহ একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যাহাকে পরমামৃতবোধে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া—প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াছিলে, হায়! তাহাই আজ—এই দুই দিনের পরেই—ঘোরতর জ্বালাময় বিষাকারে পরিণত হইয়া তোমার অন্তর্দাহ উপস্থিত করিয়াছে। অবিদ্যা রাক্ষসীর প্রতা-পই এইরূপ ; সংসারাসক্তির পরিণামই এইরূপ। এইরূপেই ঐ দুষ্টা মানবকে মজাইয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যা এরূপ নহে। বিদ্যার সংসর্গে মনুষ্যহৃদয় এক অপূর্ব্ব পীযূষধারায় অভিষিক্ত হইয়া থাকে। যদিও, বিদ্যা যখন প্রথম মুহূর্ত্তে মানবের নয়নপথবর্ত্তী হয়, তখন যদিও আপাততঃ তাহাকে বড় কদা-কার বলিয়া বোধ হয় ; বড় ভয়ানক বলিয়া মনে হয়, তথাপি ইহার সংসর্গ পরি-ণামে অমৃতরস অভিসিঞ্চন করিয়া দেয়। বিদ্যা যখন প্রথম উপস্থিত হয়, তখন মনে হয় যেন এ কি এ? কে এই ঘনকৃষ্ণ বসন পরিধান করিয়া, ঘোরকৃষ্ণবসনে স্বীয় শরী-রের সর্ব্বাংশ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিয়া আমার সম্মুখে উপনীত হইল? কে এ, যাহার শরীর হইতে—যাহার আচ্ছাদিত বপুঃ হইতে দারুণ জ্যোতিরাশি বহির্গত হইয়া একটা দারুণ উষ্ণতার উচ্ছ্বাস আন্দোলিত করিয়া তুলিল? কিন্তু একবার ঐ অবগুণ্ঠন মোচন কর, ঐ তেজ একবার মাত্র কোন রূপে সহ্য করিয়া উহাকে হৃদয়ে তুলিয়া লও, দেখিবে, কোথায় সে কৃষ্ণচ্ছায়া চলিয়া গিয়াছে, কোথায় সেই দাহকারী তেজ অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে কমনীয় পরমাশান্তি বিধায়িনী ও সহস্রক্লেশের পরমৌষধিময়ী স্নেহমাখা একটী দেবীমূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া শুভ্র-হাস্যের কিরণমালায় তোমার হৃদয়ে এক অতি সুন্দর সুষমার আবির্ভাব করিয়া দিয়াছে!! বিদ্যার প্রতাপই এইরূপ; আপাতকঠিন হইলেও পরমার্থের পরিণামই এইরূপ।

এই অবিদ্যার নাম জগৎ এবং এই বিদ্যার নাম ব্রহ্ম। জগৎ ও ব্রহ্ম, অবিদ্যা ও বিদ্যা দ্বারা মানব দৃঢ়নিয়মিত এবং নিয়ত-নিবদ্ধ। শ্রুতি বলেন—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সংপরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।" (কঠোপনিষৎ)।

"জ্ঞানী ব্যক্তিই ব্রহ্মকে গ্রহণ করেন, আর অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিই যোগ ক্ষেম-অভি-লাষে সংসারে আসক্ত হইয়া পড়ে।" হায় মনুষ্য! এই মহা দাবদাহদারুণ সংসারে শতবার সুদগ্ধ হইয়াও বুঝিলে না! সাধ

নিগূঢ়রূপে দূর হইতে জাল পাতিয়া রাখিয়াছে;—তুমি তাহাতে শতবার পড়িয়াও, আবার বহ্নি-মুখ-বিবিক্ষু পতঙ্গবৎ, তাহাতেই পড়িবার জন্য পুনরপি ধাবিত হইতেছ। হায়! এমন করিয়া কি লোকে মজিতে পারে? এমনি করিয়া কি বুদ্ধি-জ্ঞান-বিশিষ্ট মানব নিজপদে কুঠারাঘাত করিতে পারে? হা অন্ধ! ঘোরান্ধকারে ক্ষণ-প্রভাবৎ—যে একটু ক্ষণিক সুখের আশায় এইরূপে নিয়ত প্রধাবিত হইতেছ,—জানিতেছ না যে, উহা পরক্ষণেই আবার তোমারই চক্ষে শত-সূচী-ভেদ্য অন্ধকারের দারুণ জ্বালার আবির্ভাব করাইয়া তোমায় পথভ্রান্ত, ক্ষুব্ধ ও পাতিত করিয়া দিবে? তাই বলি, এমন অন্ধতা কেন? দেখিতেছ, বুঝিতেছ যে, যাহার আশায় জালে পড়িতেছ, সে যে দুই দিনের জন্য। যাহা দুই দিনের জন্য—যাহার পরিগ্রহ পরক্ষণেই বিষাদ আনিয়া দেয়,—যাহার প্রাপ্তি পরমুহূর্ত্তেই আরও আশা বাড়াইয়া দিয়া নিয়ত চিত্তচাঞ্চল্য-জনিত ঘোর তৃষ্ণার উৎপাদন করায়,—বলি, বুঝিয়া জানিয়া দেখিয়া—এই স্বাধীনতা-পূর্ণ মানব তাহার জন্য এত লালায়িত হয় কেন?

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ,
স্বয়ংধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ,
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।"

এইরূপ মূঢ়ের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষেপ-কারি-অবস্থা সাধ করিয়া লোকে ডাকিয়া আনে কেন? মানবমনে বিধাতা শক্তি (Preferential Power) এবং স্বাধীনতা (Free-will) নিহিত করিয়া দিয়াছেন। একটু পরিচালনা করিলেই, মনুষ্য আপন-পথের কণ্টক বাছিয়া লইয়া, সুগম করিয়া লইতে পারে। তবে কেন এই অজ্ঞানতা? তবে কেন নিজ হাতে তুলিয়া বিষ-পাত্রে চুম্বন? কে বলিবে, ইহার কারণ কি?

মানুষ নিজেই নিজের পথে, অতি যত্নে—ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বহস্তে—কণ্টক রোপণ করিয়া ফেলিয়াছে। সাধে এ সংসার দুঃখময়? সাধে কি এই দারুণ যন্ত্রণা ও হাহাকার অহরহ মনুষ্যকে ব্যতিব্যস্ত ও দিশেহারা করিয়া তুলিয়াছে? এই যে চীৎকার, এই যে চারিদিকে ভয়াবহ দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়া—ঘোরগর্জ্জনে অশান্তির উষ্ণবায়ু চালিত হইয়া, প্রতিমুহূর্ত্তে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে,—ইহা মনুষ্যের স্বহস্তে-বিরচিত কার্য্যের পরিণাম মাত্র! এ দুঃখের জন্য দায়ী কে? ঐ যে অদূরে ভয়ার্ত্ত অন্নহীন কঙ্কাল-মূর্ত্তির "ভিক্ষা দে"—"মুষ্টিভিক্ষা দে" চীৎকার ও আর্ত্তনাদ শুনিতেছ—ঐ যে নীরব নিঃশ্বাসাপ্লুত অনুতপ্ত পাপীর অশ্রু-সিক্ত-বদনে নৈরাশ্যের ভয়াবহ চিহ্ন দেখিতেছ,—কে ইহার জন্য দায়ী? পুরাকালে খ্রীষ্টানদিগের সেই সুবিখ্যাত ধর্ম্মগ্রন্থে যে আদিম নরনারীর বিধাতার উদ্যানস্থ "ফল-হরণ" বৃত্তান্ত রহিয়াছে, তাহাতে যে বিধাতার আদেশ-উল্লঙ্ঘন-জনিত মানবজাতি-মধ্যে প্রথম দুঃখ ক্লেশের বীজ উপ্ত হইবার অতি মনোহর গল্প লিখিত আছে,—তুমি কি মনে কর, উহা উপন্যাস মাত্র? যদি তাহা মনে করিয়া থাক, তবে আমি বলিব, তুমি ভুল বুঝিয়াছ! আমি বলি, উহার প্রত্যেক অক্ষর সত্য। মানবই ত নিজে সাধ করিয়া—ইচ্ছাপূর্ব্বক—এই ধরাধামে—মঙ্গলময় ঈশ্বরের পরমমঙ্গলময়রাজ্যে—এই দুঃখবহ্নির বীজ নিজ হাতে রোপণ করিয়াছে। তাই ত এই ক্রন্দন! তাই ত এই হায়! হায়! রবে

দিগন্ত অহর্নিশ প্রতিধ্বনিত!! দুইটী ভিন্ন পথ ছিল না। মনুষ্যের চলিবার জন্য, বিধাতার এই রাজ্যে দুইটী মাত্র পথ ছিল। যথোপযুক্ত ক্ষমতারও অভাব ছিল না; বিধাতা শক্তিও দিয়াছিলেন। তুমিই ত ভুল করিলে!! তুমিই ত ঈশ্বরদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া ফেলিলে!! এক পথ দিয়া চলিলে শান্তি পাইতে; দুঃখ থাকিত না; বিধাতার পুত্র বিধাতার নিকটেই পৌঁছিতে পারিতে। তখন তোমার হাস্যে এসংসার হাসিত; তোমার স্ত্রী পুত্র আত্মীয় হাসিত। তুমিই ত পথ বাছিয়া লইতে পারিলে না। সেই সুখের পথ ছাড়িয়া দিয়া, এই দুঃখের পথ দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে। যখন দুঃখ পথে, পাপ পথে ইচ্ছা পূর্ব্বক তুমি পদ-নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তখনই ত বিধাতা তোমার বিবেক (Conscience) দ্বারা ঐ পথে চলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কৈ, তুমি ত তাঁহার আদেশ গ্রাহ্য করিলে না। সেই দিনই ত তোমার 'কপাল ভাঙ্গিয়াছিল'। সেই দিনই জানি, তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছিল'। সেই দিনই জানি, তোমার অদৃষ্ট পড়িল। তাই বলি, মানব! তুমি দোষ দেও কাহাকে? নিজে যে পথ বাছিয়া লইয়াছ, কাহারও আদেশ না শুনিয়া, স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া—যে পথ দিয়া চলিয়াছিলে, সে পথে আজ যদি তোমার পদে কণ্টক বিদ্ধ হয়, সে পথে আজ দস্যু-তস্কর তোমার সর্ব্বস্ব লুটিয়া লয় ও তোমার জীবনান্ত উপস্থিত করে—তবে সে জন্য দায়ী কে? সে জন্য কে দোষী?

অদৃষ্ট বল, কর্ম্মফল বল, ভগবদিচ্ছা বা বিধাতার লীলা, যাহাই বলনা কেন, একথা কিন্তু স্থির, নিশ্চয় যে, মানব সংসারে বিজড়িত থাকিয়াও, উহার আপাততঃ মনোমুগ্ধকর লীলার বিষম পরাক্রমে আত্মহারা হইয়াও, যাঁহারা দৃঢ়চেতা,—যাঁহারা স্বাধীনতা ও শক্তির পরিচালনা করিতে পারেন, তাঁহারা জানেন যে না, না, সংসারের এ পদগৌরব, এ বিদ্যা-বিভব, এ ক্ষমতা-ঐশ্বর্য্য, এ সুখ-সম্পদ ইহারা কিছুই নহে। ইহাদের জন্য, অসারের পরিভোগের জন্য, প্রাণীরাজ্যের শ্রেষ্ঠ জীব মানব কখনই নির্ম্মিত হয় নাই। অবিদ্যার জন্য মানব নহে। মনুষ্য বিদ্যার জন্য। তাই বলি, নাই কি? তেমন মানুষ আছেন, যাঁহারা "জগতের" মনোমাদন বেণুনাদে মুগ্ধ হন না। তাঁহারা চান, সেই আত্মার—"ব্রহ্মের" স্ফুটতর বংশীরব। যাঁহারা দুইচারি দিনের সুখসম্পদে, ভোগ-বিলাসিতায়, গা ঢালিয়া দেন না; তাঁহারা চাহেন, সেইরূপ আনন্দ, যাহার আর কদাচ বিরাম ঘটিবেনা; যাহা পরিণামে বা ভোগে বিরস হইবে না; এবং যাহা পাইলে আর অন্য কোন আনন্দের অভিলাষ থাকিবে না।

সে আনন্দ কিরূপ? সে আনন্দ,—এক মাত্র ব্রহ্ম। এ নীরস জগতে সে আনন্দ মিলে না। ঐ বিশাল আনন্দের মহাসাগর সেই একমাত্র ব্রহ্ম। যাঁহা হইতে এ জগৎ প্রকটিত, অথবা যাঁহা ভিন্ন জগতে দ্বিতীয় কিছুই নাই,—সেই আনন্দে মজিলে আর কিছুতেই চিত্ত মজিতে চায় না। তাঁহাকে পাইলে আর মন কাহাকেও পাইতে চায় না।

সাংখ্য, ন্যায় ও বেদান্ত—সমস্ত দর্শনেরই এক মাত্র প্রয়োজন "নিরতিশয় আনন্দলাভ"। সেই নিরতিশয় সুখ কি? বেদান্ত বলেন—"নিরতিশয়ং সুখঞ্চ ব্রহ্মৈব"। আমরা এই প্রবন্ধের বিগত পাঁচ সংখ্যায় সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে

ত্রিবিধ দর্শনের ত্রিবিধ সিদ্ধান্ত দেখাইয়া আসিয়াছি। সেই প্রণালীত্রয় পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু 'প্রণালীতে' যত মতদ্বৈধ থাকুক্ না কেন, 'ব্রহ্ম প্রাপ্তি' সম্বন্ধে ত্রিবিধ দর্শনের কোনও রূপ মতদ্বৈধ নাই। এখানে এক পথ। এখানে "ঋজু কুটিল নানা পথজুষাং নৃনামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব"। এখানে গম্য-স্থান একটী মাত্র। সমুদয় দর্শনের মতে, এ আনন্দলাভের উপায়—এ বিদ্যাপ্রাপ্তির এবং অবিদ্যা-পরিহারের—একমাত্র উপায় জ্ঞানার্জ্জন। একমাত্র "জ্ঞান' উপার্জ্জন করিতে পারিলেই সংসারাসক্তি আপনা আপনি শিথিল হইয়া যায়। তখন চিত্তবিক্ষেপ দূরে যাইয়া নিরতিশয় আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। একমাত্র জ্ঞানই, ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ ও মোক্ষ জনক। "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থাবিদ্যতেহয়নায়'। এজ্ঞান কিরূপে লাভ করা যায়, দর্শনশাস্ত্রে তাহারও মীমাংসা আছে। কিন্তু সে কথা আর একদিন বলিব।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

আসুর-যুদ্ধজয়ী বীরের কথা।

মানব-জীবন এবং সংসার-প্রাঙ্গণ মহা সংগ্রামময়। অন্তরে এবং বাহিরে অবিরত মহা সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামে নরনারী আকুল,ব্যাকুল এবং অস্থির। দুনিবার্য্য তাহার আক্রমণ, দুরতিক্রমণীয় তাহার পরাক্রম, সূচিভেদ্য তাহার তীব্রতা। মহাসংগ্রামে সকলে ত্রাহি ত্রাহি রবে ভুবন পূর্ণ করিতেছে। প্রজ্জলিত চুল্লির তীব্র দাহন, মহা শঙ্কট। মানুষ অবিরত তাহাতে পুড়িয়া মরিতেছে। বুঝিবা এ সংসার রসাতলে যায়!

অন্তরে মহাসমর—শ্রেয় এবং প্রেয়ে,—নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তিতে, বৈরাগ্য এবং আসক্তিতে। শ্রেয়ের, নিবৃত্তির এবং বৈরাগ্যের মহা অস্ত্র—সংযম। প্রেয়ের, প্রবৃত্তির এবং আসক্তির মহা অস্ত্র—মোহ এবং অহঙ্কার। সংযম, ক্রমাগত, তরঙ্গায়িত মহা সমুদ্রের কর্ণধারের ন্যায়, স্বর্গের সোজাপথ মানুষকে দেখাইতেছে,—এক গতি, এক-লক্ষ্য, এক পরিণাম—একই মুক্তি। বলিতেছে—"চাঞ্চল্য বিনাশ কর,কঠোর হইতে কঠোর হও, রিপুকে সাধন-যূপ-কাষ্ঠে বলি দেও, তারপর সরলমনে সরল পথে চল। না-ই বা পাইলে লোকের প্রশংসা, না-ই বা পাইলে জগতের সম্মান, না-ই বা পাইলে ধন ঐশ্বর্য্য, তাতে কি? ঐ দেখ স্বর্গ, ঐ দেখ মুক্তি, ঐ দেখ ভক্তি, ঐ দেখ প্রেমময়ী মহাবিদ্যা—মা। কি ছার সংসার, উহা ক্ষণস্থায়ী, দুদিনের, এ শরীর অস্থায়ী, এরিপু সকল অস্থায়ী, ইন্দ্রিয়গণ অস্থায়ী। সার এবং নিত্য-কালস্থায়ী যে অবিনশ্বর প্রেম পুণ্য, যোগ ভক্তি, তাহার জন্য লালায়িত হও,—দেখ, দেখ, চাহিয়া দেখ,ঐ বিশ্ব-বিমোহিনী, অরূপ-রূপ-ধারিণী, নিরাকারে-সাকারা চিন্ময়ী মাতৃমূর্ত্তি। বল মাভৈঃ মাভৈঃ—কিসের ভয়? রিপুকুলকে বলি দেও, ইচ্ছা এবং বাসনা-দৈত্য সকলকে বিনাশ কর, নিবৃত্তি-নিরাঞ্জনা-তটে স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে বিসর্জ্জন

দিয়া, দেব-বসন পরিধান করিয়া, নিষ্কাম যোগীবেশে মহামায়ার মহা পবিত্র মন্দিরে প্রবিষ্ট হও।" শ্রেয়ের এই সুমহান, সুপবিত্র,অমোঘ উপদেশ-নির্দেশিত পথে চলিতে কাহার না সাধ হয়? মানুষ অন্তরে মহেশ্বরীর মহাবাণী শুনিয়া দলে দলে ছুটিতেছে। স্ত্রীপুরুষ,জ্ঞানী-মূর্খ, ধনী দরিদ্র, বৃদ্ধ বালক, অবিভেদে সকলে দল বাঁধিয়া মহাপ্রাঙ্গণে ছুটিতেছে। একটী নয়, দশটী নয়—কোটী কোটী নরনারী সমবেত, কোটী কোটী সম্প্রদায় একত্রিত। মানুষ ভেদাভেদ ভুলিয়া যেন মহাপ্রাণতায় বদ্ধ হইয়াছে। সকলে হুঙ্কারে বলিতেছে,মাভৈঃ মাভৈঃ। কিন্তু একি? আসিতে আসিতে সকলেই থামিয়া যাইতেছে কেন? কোটী কোটী লোক যাত্রা করিয়াছিল, লক্ষ্যে আসিল কয়টী—লক্ষ্যধামে পৌঁছিল কয়টী? কে যেন সকলকে পথ হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে! সত্য সত্যই পথে মহা সংগ্রাম বাঁধিয়া গিয়াছে মার-পিশুনের অত্যাচারে যাত্রীগণ অস্থির। প্রেয়ের মহাদূত মোহ এবং মায়া, পথিমধ্যে যাত্রীগণকে মধুস্বরে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে,"কোথায় যাও? দুগ্ধ-ফেননিভ সুখশয্যা ভুলিয়া, সুখের নিকেতন যুবতী ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া কোথায় মরিতে যাইতেছ? মানব-শাক্য ফের, ফের, ফের। ঐ পথে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, রিপু-বিচ্যুতি, শরীর-পাত, বিপদ, বিপদ—কেবল বিপদরাশি। ক্ষুধার আহার নাই, পিপাসার জল নাই, শয়নের শয্যা নাই, ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি নাই—নাই, নাই, কিছুই নাই। সুখ নাই, তৃপ্তি নাই, ধন নাই,সম্পদ নাই, গাড়ী নাই, বাড়ী নাই, যশ নাই, সম্মান নাই; আছে কেবল কষ্ট, দুঃখ, এবং বিপদ। কেন মত্ত মাতঙ্গের মত ধাইতেছ, ফের, ফের। এ রাজ্যে আমি তোমাকে রাজা করিয়া দিব। রিপুর পরিচর্য্যার জন্য দাস দাসী দিব, বিলাসের উপযোগী আতর দিব, গোলাপ দিব, আর কি চাও? যশ দিব, মান দিব, গাড়ী দিব, বাড়ী দিব। ফের ফের, দশের মধ্যে এক মহাজন হইয়া থাক।" মানুষ চাহিয়া দেখিল,কি একটা মনোমুগ্ধকর মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া মোহন স্বরে এই সব কথা বলিতেছে। আর কি পা চলে! কুহক-মন্ত্রে সে যেন হতজ্ঞান, আসিতে আসিতে দাঁড়াইতেছে, কেহ পলাইতেছে, কেহ অগ্রসর হইতে হইতেও ভাবিতেছে। এই স্থলে সংযম এবং অহঙ্কার ও মোহের ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে। এই মহা সমরে—মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক,সব লোপ পাইতেছে! শেষে অনেক মানুষই পরাজিত হইতেছে। আসিতে আসিতে ফিরিয়া যাইতেছে, পোনে ষোল আনা লোক। লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছে, এ জগতে কয় জন?—অঙ্গুলির কর গণিয়া তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এই ত গেল ভিতরের যুদ্ধ। বাহিরের যুদ্ধ ইহারই প্রতিরূপ,কিন্তু আরো ভীষণতর। ভিতরে যাহার উপদেশ,বাহিরে তাহার কাজ। দলে দলে লোক ধর্ম্ম-মন্দিরে আসিতেছিল, পথে কাহাকেও সুন্দরী স্ত্রীর প্রলোভনে, কাহাকেও অধর্ম্মের কুহক মন্ত্রে ভুলাইয়া নরকের পথে লইয়া যাইবার জন্য পাপ দস্যুগণ অবিরত চেষ্টা করিতেছে,টানাটানিতে সকলে অস্থির। কেহ বার আনা পথ আসিয়া বৃদ্ধ বয়সে শেষে যুবতীর প্রণয়ে পড়িয়া মারা গেল,কেহ বা টাকার মায়ায় দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিয়া নির্ম্মম-রাস্তায় গগনভেদী বড়মানুষী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ধনে মানে পূজিত হইতে লাগিল। ভিতরের যুদ্ধের আড়ম্বর নাই,শব্দ নাই—কিন্তু

বাহিরের যুদ্ধের আড়ম্বরে ও হুজুগ-শব্দে জগৎ পরিপূর্ণ। ভীষণ সংগ্রাম। কেহ গৈরিক জামা আঁটিয়া, গৈরিক পাগড়ী মাথায় দিয়া ধর্ম্মমন্দিরে যাইতেছিলেন, অমনি আসক্তি-সিপাই ও চৌকিদার তাঁহাকে কাণে ধরিয়া গাড়ীতে চড়াইয়া, প্রশংসা যশের মুকুট মস্তকে তুলিয়া মহাবাদ্য সহ আসক্তির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাইয়া বেড়াইতেছে; এবং জগৎকে দেখাইতেছে, কার শক্তি কত? কেহ স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্যে যাইতেছিলেন—প্রবৃত্তি তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া সহস্র নারীর এক-পতি করিয়া বিলাসের মধ্যে শোয়াইয়া দিতেছে! এবং দেখাইতেছে, কার শক্তি কত? কেহ ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া, চিরকৌমার-ব্রত লইয়া বক্তৃতার চোটে গগন ফাটাইত, আজ সংসার-যোগ-মন্দিরে তাহাকে রমণীর পদ-তলে লুণ্ঠিত করিতেছে, কেহ প্রতিবাদরূপ মহা অস্ত্র হস্তে করিয়া পাপী-দমনের জন্য ধর্ম্মের সহরে ঢুকিয়াছিলেন, আজ তিনি মত্তমাতঙ্গের ন্যায় পাপ-পঙ্কে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, এবং নিজ-স্বভাব দোষে, তবুও, আজও, অন্যের নিন্দা করিয়াই স্বীয় স্বভাবের পরিচয় দিতেছেন। মহারাজ্যে মহাসমর—মহা সংসার-চক্র-ব্যূহে শত শত অভিমন্যু মহারথী প্রাণ হারাইতেছেন! সংসারটা যুড়িয়া এখন যেন কেবল দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতেছে। জয় পরাজয় বিধাতা অন্তরীক্ষে থাকিয়া লিখিতেছেন। মহাচক্রীর মহালীলা।

পাঠক, ক্ষণকাল ভাবিয়া দেখ—কথাগুলি সত্য কি না? তোমার অন্তরে বাহিরে মহা সংগ্রাম চলিয়াছে কি না? তুমি যাহা করিবে ভাবিতেছ, করিতে পারিতেছ, না পদে পদে বাধা পাইতেছ? পদে পদে তোমাকে প্রবৃত্তি-কুলের হস্তে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হইতে হইতেছে কি না? ভাবিয়া বলত, যাহা বলিতেছি, তাহা ঠিক কি না?

পৃথিবীর ধর্ম্ম-ইতিহাস একথা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই যে, যুদ্ধে পুণ্যবলেরই জয় হইতেছে। অসংখ্য জাতি এবং সম্প্রদায় আসুর-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া মরণের পথে যাইলেও, এখনও পুণ্যবলের শক্তি অপরাজিত। কিন্তু সে পুণ্যরাজ্য এবং সে পুণ্যজাতি আজ কোথায়, যেখানে কেবল সংযমের জয়, মোহ এবং অহঙ্কারের পরাজয়। আমি খুজিয়া খুজিয়া হয়রাণ হইলাম, সে রাজ্যের খোজ খবর পাই না। হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রীষ্টান, সব সম্প্রদায় খুজিয়া দেখিয়াছি, সেই অনাবিল, অপরাজিত, বিমল পুণ্যজ্যোতি অতি অল্পই দেখিয়াছি। নবোত্থিত ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের কথাই বল এবং পুনরুত্থিত হিন্দুসম্প্রদায়ের কথাই বল, পুণ্যজ্যোতিতে যাঁহার বদন উজ্জ্বল হইয়াছে, মহাসংযমে যাঁহার রিপুকুল ধ্বংশ হইয়াছে, চরিত্রের অজেয় সিংহাসনে যে দৃঢ় এবং অটল, নির্ব্বিকার এবং নিরমল, সদা প্রসন্ন এবং নিরলস, এমন লোকের সহিত অতি অল্পই সাক্ষাৎ হইয়াছে। গেরুয়া পরিয়া ধনের পুঁটুলি লইয়া বিলাস গাড়ী হাঁকায়, এমন যোগী দেখিয়াছি, যুবতীর চরণে চরিত্র উৎসর্গ করিয়া মহাজনত্ব পায়, এমন ধার্ম্মিকও (?) দেখিয়াছি;—দীর্ঘ তিলকধারী নিরামিষভোজী পর ধন লুণ্ঠনকারী বৈষ্ণব দেখিয়াছি, দীর্ঘ উপাসনা-সম্বল হিংসুক, নিন্দুক, কপট, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারী ভণ্ড তপস্বী দেখিয়াছি, কিন্তু এমন লোক কম দেখিয়াছি, পাপে পরাজিত হওয়া যাঁহার পক্ষে অসম্ভব, যিনি খ্রীষ্টের ন্যায় বিশুদ্ধ চরিত্রে চিরকৌমার্য্য অবলম্বন

করিয়া, কেবল পরসেবায় এবং পরচিন্তায় জীবন কাটাইতেছেন। ধর্ম্ম কথায়, উপাসনায়, বক্তৃতায়, পোষাক পরিচ্ছদে, না চরিত্রে এবং জীবনে, তুমি ভাই বলিতে পার কি?

সুদীর্ঘ জীবনপথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া দুই দশ জন আড়ম্বরহীন জীবন্ত, জয়ী সাধকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে মাত্র। আর যত দেখি, সব যেন সংসার-সংগ্রামের পরাজিত জীব। আজ এক বীরের কথা বলিতেছি। একজন পবিত্র লোক—তিনি চিরকুমার—এখন তাঁহার কাল চুল দাড়ি শ্বেত হইয়াছে—এবার কলিকাতায় মাঘোৎসব দেখিতে আসিয়াছিলেন। যখন পূর্ণ উৎসাহে মাঘোৎসব চলিতেছে, এমন সময়ে তাঁহার একজন "বসুধৈব-কুটুম্বকম" আত্মীয়ের দারুণ জ্বর হয়। মাঘোৎসব কোথা দিয়া চলিয়া গেল, তিনি ঐ রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অহরহ কেবল শুশ্রূষা করিতেছেন। সভা হইল, সমিতি হইল, কত উপাসনায় কত জনের প্রাণ সরস হইল, কত বক্তৃতায় স্রোত বহিল, কত ইভিনিং-পার্টিতে আমোদ চলিল, বৃদ্ধের উৎসব-ক্ষেত্র রোগীর শয্যা। আজ ফাল্গুন মাসের ১০ তারিখ, আজ তিনি "বসুধৈব-কুটুম্বকম" দেশে যাত্রা করিলেন !! উল্লাস নাই, নৃত্য নাই, বক্তৃতা নাই, কথা নাই,—নীরব আড়ম্বরহীন একটী বৃদ্ধ কেবল দরিদ্রের সেবা, কেবল পরসেবা করিয়া ধন্য হইতেছেন। সাধন তাঁহার পরসেবা, যোগ তাঁহার পরসেবা, বক্তৃতা তাঁহার পরসেবা—জীবন তাঁহার পরসেবা। খাটিয়া খাটিয়া, কেবল পরের জন্য খাটিয়া খাটিয়া জীবন প্রায় শেষ করিয়াছেন। তাঁহার নাম এদেশের বড় কেহ জানে না। তাঁহার কথা বড় কোন সংবাদপত্রে উঠে না। তিনি যে দলে, তাঁহাকে লইয়া সে দলও বড় উচ্চবাচ্য করে না। গাড়ী নাই, বাড়ী নাই, সহায় নাই, সম্বল নাই, তিনি গরিব, তিনি অতি গরিব। তাঁহার মান নাই, সম্মান নাই, তাঁহার আহার সামান্য—কেবল কতকগুলি শুধু ভাত বলিলেই হয়। পরিধান সামান্য—কেবল সামান্য থানের কাপড়। আকৃতি চেহারা, কিছুই ভাল নহে। তিনি বড় গরিব, তিনি বড় গরিব। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে, বোধ হয়, তিনি যেন জীবন-সংগ্রামের মহাযুদ্ধে জয় লাভ করিয়া আসিয়াছেন। আসুর-সংগ্রামে কেহ কখনও তাঁহাকে পরাজিত হইতে দেখে নাই। তাঁহাকে দেখিলে, বোধ হয় যেন, তাঁহার শ্বেত শ্মশ্রু ভেদ করিয়া কি এক স্বর্গীয় পবিত্রতার জ্যোতি বাহির হইতেছে। মুখে কথা নাই, তবু শাস্ত্র আছে; হাত নীরব, কিন্তু কাজে ভরা; সে জয়ী বীর মৃত্যুময় রাজ্য ছাড়িয়া এক অমৃত এবং অমর রাজ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। দেখিয়া দেখিয়া, আমি সে অপরূপ দেখিয়া দেখিয়া মজিয়াছি। তিনি দেশবিখ্যাত বিবেকানন্দ নহেন, তিনি অমর ভক্ত কেশবচন্দ্র নহেন, তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নহেন, তিনি নেতা শিবনাথ নহেন, তিনি যোগী বিজয়কৃষ্ণ নহেন, তিনি বড় গরিব, তিনি বড় গরিব। তিনি যেন রিপু জয় করিয়া অমূল্য সংযমব্রতে দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ। শুনিয়াছি, তিনি যেস্থানে থাকেন, সেখানকার লোকেরা ঋষী বলিয়া তাঁহাকে মান্য করে। ব্রাহ্মসমাজের আর সব লোককে যাহারা নিন্দা করে, তাহারাও তাঁহার নাম শুনিলে অবনত-মস্তক। তিনি চরিত্র-গুণে অমর ভুবনমোহনরূপে প্রতিষ্ঠিত। সে গরিব, এই ধরায় যেন কি এক নিত্যানন্দ লাভ করিয়া মহাবীর হইয়াছেন। তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে কোটী কোটী প্রণাম। •

আমি সংসারে তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠত্ব দি, যিনি অতীন্দ্রিয়ত্ব পাইয়াছেন; যিনি অসার ছাড়িয়া সার ধরিয়াছেন, যিনি নিজ ইচ্ছা এবং নীচবাসনাকে পরাজয় করিয়া দেব-ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। তিনি রাম-কৃষ্ণই হউন, বা তিনি শাক্য-সিংহই হউন, তিনি মেরী-তনয় যিশুই হউন, বা তিনি ম্যাটসিনিই হউন, তাঁহাকে কোটী কোটী প্রণাম। আর আমি, তুমি, সে, যাহারা কেবলস্রোত-তাড়িত শৈবালের ন্যায় প্রবৃত্তি-তাড়নায় ভাসিয়া ভাসিয়া সংসারের ঘাটে ঘাটে, তটে তটে ফিরিতেছে, তাহারা নীচ হইতেও নীচ, দীন হইতেও দীন। আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে সংসার-সংগ্রামে পরাজিত হই-তেছি এবং অহঙ্কারে জগৎ কাঁপাইয়া নিজ নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতেছি! আমা-দের টাকা কড়ি, যশ মান, বিদ্যাবুদ্ধিতে ছাই পড়ুক। যাহাতে আমাদিগকে অমর করিতে পারে না, তাহাকে আদর করিয়া বৃথা জীবন কাটাইলাম! প্রবৃত্তি-সাগরে ভাসিলাম, কিন্তু নিবৃত্তি-হ্রদে ডুবিলাম না। মোহে মজিলাম, কিন্তু সংসারের অতীত হইতে পারিলাম না। পরাজিত হইতে জন্মিয়াছি, প্রবৃত্তিকুলের দ্বারা পরাজিত হইতেই লাগিলাম। আমাদের সাধন ভজন সবই ভণ্ডামী নহে কি? অটল ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া, প্রবৃত্তিকে পরাজয় করিয়া, সংযমকে এক মাত্র সহায় করিয়া যে ব্যক্তি যশ মানের অতীত ধামে নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত এবং নিরলস না হইতে পারিল, তাহার কার্য্য কি মহাছেলেমী নয়? কে বলিবে, নয়?

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩৬। আসাম প্রদেশের বিশেষ বিবরণ।—শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত ও শ্রীগঙ্গাগতি দাস প্রণীত, মূল্য ।৵০; কলিকাতা, কলেজ ষ্ট্রীট, এম, এম, মজুমদারের দোকানে প্রাপ্তব্য। আমরা এই পুস্তক খানি পড়িয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আসাম প্রদে-শের সমস্ত জ্ঞাতব্য কথা ইহাতে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। এত সংক্ষেপে কোন দেশের সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যায়, আমাদের ধারণা ছিল না। লেখকগণের ক্ষমতা দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। পুস্তক খানি শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ পাঠ্য-তালিকা ভুক্ত করিলে আমরা সুখী হইব।

৩৭। চরিত-মুক্তাবলী।—শ্রীকাশী-চন্দ্র ঘোষাল প্রণীত, মূল্য ॥০। অশোক, মণিকা, থিওডোসিয়স ও কনষ্টান্সিয়া, তুকা-রাম, দয়ানন্দ সরস্বতী, সক্রেটিস, তেগ বাহাদুর, টেলিমেকাস এবং বলরাম হাড়ির কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কাশী বাবু কয়েক খানি ক্ষুদ্রপুস্তকে সাধু মহাজনদিগের জীবন-কথা লিখিয়া আমাদের বিশেষ ধন্য-বাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার নির্ব্বাচন ভাল, ভাষা প্রাঞ্জল। কাশী বাবু এইরূপ সংগ্রহের দ্বারা বাঙ্গলার প্রভূত উপকার করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

৩৮। মর্ম্মগাথা।—শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা মুস্তোফী প্রণীত, মূল্য ৵০। কোমল এবং মধুর-প্রকৃতি বালিকা এবং মহিলাগণ সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিয়া প্রতিপন্ন করি-তেছেন, স্ত্রীশিক্ষায় প্রদেশে সুফল ফলি-য়াছে। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনে যত্নবান, তাঁহাদিগের আনন্দের সীমা নাই। বিধা-তার কৃপায়, মাতৃজাতি অশিক্ষার ঘোরান্ধ-কার হইতে মুক্তি পাইতেছেন, ইহাপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? মর্ম্মগাথার গ্রন্থকর্ত্রী বালিকা, কিন্তু তিনি এই গ্রন্থে যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রবীণার যোগ্য। তাঁহার লেখা এখনও দোষ-শূন্য হয় নাই বটে, কিন্তু আশা করা যায়, শক্তির অপ-ব্যবহার না হইলে এবং সাধনা থাকিলে, কালে তিনি পরিচয়ের যোগ্য লেখিকা হইতে পারিবেন। বিধাতা এই কবির মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

৩৯। শিক্ষাপ্রবেশ।—শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত, মূল্য।৵। টেক্সটবুক-কমিটী কর্ত্তৃক এই পুস্তক পাঠ্যতালিকা ভুক্ত হইয়াছে। শম্ভুচন্দ্র বয়সে এবং সুশিক্ষায়, দয়া এবং কার্য্যদক্ষতায় প্রবীণ ব্যক্তি। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইনি উপযুক্ত ভ্রাতা। তাঁহার অনেক সৎ গুণ ইঁহাতে আছে। লেখার শক্তি, তন্মধ্যে প্রধান। শিক্ষাপ্রবেশে অনেক অত্যাবশ্যকীয় বিষয়, প্রাঞ্জল ভাষায়, নিপুণতার সহিত বিবৃত হইয়াছে। কৃষি-কার্য্য সম্বন্ধীয় যে সমুদায় কথা ইহাতে আছে, তাহা বহুদর্শনের ফল। প্রাইমারী বিদ্যালয়ে এ পুস্তক পঠিত হইলে, ছাত্রদিগের বিশেষ উপকার হইবে।

৪০। ভারতীয় চরিতমালা—মহারাজ প্রতাপাদিত্য।—শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত, মূল্য ১৲। সংস্কৃত ডিপজিটরিতে প্রাপ্তব্য। ভারতীয় চরিতমালার প্রথম গ্রন্থ—ছত্রপতি শিবজীর জীবনচরিত, দ্বিতীয় গ্রন্থ—প্রতাপাদিত্য। প্রতাপাদিত্য বঙ্গকায়স্থ-কুলের গৌরব, কেবল তাহা কেন, তিনি বঙ্গের এবং ভারতের গৌরব।

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজকায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায়, কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত নৃপতি দ্বারস্থ।
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতি, অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।"

ভারতচন্দ্রের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে মহারাজের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতাপাদিত্যের কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য জীবনচরিত না থাকিলেও, এদেশে লোকের মুখে মুখে তিনি অমর। অসাধারণ প্রতিভা, ধর্ম্মভাব এবং বীরত্ব একাধারে সঞ্চিত থাকায় তিনি আমাদের সকলের পূজ্য।

স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, বাসুকী পাতালে,
প্রতাপ আদিত্য দাতা, অবনী মণ্ডলে।

এই প্রবাদে তাঁহার দয়ার অলিখিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রতাপের অসীম সাহস এবং নির্ভীকতার কথা সকলেই জানেন, ভারতের সম্রাটগণ তাঁহার ভয়ে সিংহাসনে প্রকম্পিত হইতেন; সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক কিছু লেখা বাহুল্য। তাঁহার ধর্ম্মভাব কিরূপ ছিল, শাস্ত্রীর ভাষায় তাহা উল্লেখ করিতেছি।

"প্রতাপ, শক্তি-উপাসক ছিলেন। তিনি এরূপ কঠোরতা সহকারে ভগবতীর অর্চ্চনা করিতেন যে, জনসাধারণ তাঁহাকে দেবীর পরমানুগৃহীত ও বরপুত্র বলিয়া বিবেচনা করিত। তাঁহার ঈশ্বর নির্ভরতা অসাধারণ, কি ঘোরতর যুদ্ধস্থান অথবা নানা প্রকার ভোগ্য পরিপূর্ণ বিলাস ভবন, কোন স্থলেই তিনি মুগ্ধ হইতেন না, সকল সময়েই তাঁহার ঈশ্বর-নির্ভরতা প্রকটিত হইত। তিনি শাক্ত হইলেও বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন না। ধর্ম্ম বিষয়ে তাহার অসীম উদারতা ছিল। তিনি মুসলমান প্রজাদিগের জন্য আপন বাসের স্থানে স্থানে মসজীদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন।"

প্রকৃত ধর্ম্মের উদয় উদয় হইলে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা তিষ্ঠিতে পারে না, মহাজনদিগের জীবন-ইতিহাসে তাহা প্রকটিত রহিয়াছে। প্রতাপাদিত্য কেবল বীরত্বে নয়, ধর্ম্মেও মহাপুরুষ ছিলেন। এই মহাত্মার পুণ্যময় জীবন কাহিনী পাঠ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? শাস্ত্রী মহাশয় আপন অসাধারণ কৃতিত্ব এবং প্রতিভা, গবেষণা এবং বিজ্ঞতা সহ এই অমূল্য জীবনচরিত সংগ্রহ এবং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখনীতে পুষ্প চন্দন বর্ষিত হউক। তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। শাস্ত্রী মহাশয় ভারতের লুপ্ত রত্নোদ্ধার করিতে যে কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন, সময়ে সময়ে পুলিসের অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়াও আপন ব্রত পরিত্যাগ করিতেছেন না, ইহা আমাদের, এই হতভাগ্য ভারতবাসীদের, কথাসর্ব্বস্ব ব্যক্তিদিগের আদর্শ। শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের সকলের প্রণম্য। তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া অকাতরে মাতৃসেবার জন্য খাটিতেছেন। ঘোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াও তিনি দেশসেবায় রত রহিয়াছেন। তাঁহার গভীর স্বদেশপ্রাণতা আমাদের অনুকরণীয়। তাঁহার জীবনের এই স্বদেশপ্রাণতা, এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত। যেমন গবেষণা, তেমনি ভক্তিবিহ্বলতা। তিনি তন্ময়চিত্তে তেজস্বী ভাষায় প্রতাপ-গুণকীর্ত্তন

করিয়াছেন। এখন এ দেশে তাঁহার এই বহু যত্নের ধন সাদরে গৃহীত হইলে হয়। কিন্তু তাহা কি হইবে না? আমাদের আশা আছে, যে দেশে মাইকেল এবং বিদ্যাসাগরের জীবনীর প্রথম সংস্করণ অতি অল্প সময়ে নিঃশেষ হইয়াছিল, সে দেশে, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ন্যায় অতি সুন্দর জীবনচরিত অতি অল্প সময়ে নিঃশেষ হইবে। গল্প, ছবি, উপকথা এবং কবিতার স্থলে এইরূপ সার গ্রন্থের আদর হইলেই বাঙ্গালীর মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে।

৪১। শকুন্তলা-রহস্য।—অর্থাৎ পদ্মপুরাণান্তর্গত শকুন্তলোপাখ্যান ও মহাকবি কালিদাস-কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলের আলোচনা। শ্রীবিহারিলাল সরকার সঙ্কলিত, মূল্য ১৲ এক টাকা। কালিদাসের শকুন্তলা, এদেশের অমর গ্রন্থ। যতদিন যাইতেছে, ততই পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট ইহার আদর বাড়িতেছে। বঙ্গভাষায় শকুন্তলাতত্ত্ব লিখিয়া চন্দ্রনাথ অমর হইয়াছেন। চন্দ্রনাথের চিন্তা শক্তি, কাব্যানুরাগ, গভীর গবেষণা, তদীয় শকুন্তলা-তত্ত্বের প্রতি ছত্রে প্রজ্বল্যমান রহিয়াছে। বিহারিলাল অভিনব প্রণালীতে শকুন্তলা-রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পদ্মপুরাণের গল্প এবং কালিদাসের গল্প সমালোচনা করিয়া, এই গ্রন্থে গ্রন্থকার অসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে, কালিদাসের প্রতিভা, অসাধারণত্ব এবং বিশেষত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পুরাতন কথা লিখিলেও যে তাহা নীরস হয় না, চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিলেও যে মিষ্টত্ব যায় না, কালিদাসের নাটক শকুন্তলা তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বলিলে মিথ্যার পুনরুক্তি হয় না যে, কালিদাস কেবল এই গ্রন্থ খানি লিখিলেও অমর হইতে পারিতেন। বিহারিলাল কালিদাস-প্রতিভা প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রভূত যত্ন ও কষ্টস্বীকার করিয়াছেন, এ জন্য সকলের নিকটই তিনি ধন্যবাদের পাত্র।

বিহারিলালের ক্ষমতা অসাধারণ, তাঁহার গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যও অসাধারণ। তদুপরি তাঁহার ভাষাজ্ঞান আরো অসাধারণ। যে সকল প্রতিভাসম্পন্ন লেকখগণের মহীয়সী শক্তিতে এখন বাঙ্গালা ভাষা গৌরবান্বিত, বিহারিলাল তন্মধ্যে একজন। এই গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ "নিজস্ব ও পরস্ব" প্রবন্ধে তাঁহার এই অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় রহিয়াছে। যাঁহারা বাঙ্গালাভাষায় পাঠযোগ্য উপযুক্ত পুস্তক নাই বলিয়া দুঃখ করেন, তাঁহাদিগকে আমরা হরপ্রসাদশাস্ত্রীর বাল্মীকির জয়, চন্দ্রনাথের শকুন্তলাতত্ত্ব ও অন্যান্য পুস্তক সমূহ, ভূদেবের প্রবন্ধ-পুস্তক সমূহ, রাজকৃষ্ণের বিবিধপ্রবন্ধ এবং জ্ঞানেন্দ্রলালের প্রবন্ধলহরী প্রভৃতি পড়িতে অনুরোধ করি। সেই সঙ্গে সঙ্গে বিহারিলালের এই শকুন্তলা-রহস্যও পড়িতে বলি। বঙ্কিমচন্দ্র এবং কালীপ্রসন্নের গ্রন্থ সকলের উল্লেখ করিলাম না, কেননা, তাঁহারা সুপরিচিত। বিহারিলালের এই গ্রন্থে যে অসাধারণ ক্ষমতা পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা পড়িয়া আমরা মোহিত হইয়াছি আমাদিগকে এই পুস্তক উপহার দেওয়ার জন্য গ্রন্থকারকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

৪২। **Helps to Logic** by Kokileswar Bhattacharjea, M.A., মূল্য ।৵০ কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, বি, বানর্জির দোকানে প্রাপ্তব্য। Designed for F. A. Students, কোকিলেশ্বর বাবু নব্যভারতের পাঠকগণের নিকট বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। তাঁহার পাণ্ডিত্য, অতি অল্প সময়ের মধ্যে, পাঠকগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে, অনুমান করি। এখানি তাঁহার ইংরাজি গ্রন্থ। এ পুস্তকে তাঁহার ঐ পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিস্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। কোন জটিল বিষয়কে সহজ করিয়া বুঝান সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। দর্শন-সমুদ্র-মন্থন করিয়া কোকিলেশ্বর বাবু, সংক্ষেপে, সরল ভাষায় যে অমূল্যতত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতেছেন, তাহা পড়িয়া বুঝিয়াছি, কঠিন বিষয় সহজ করিয়া বুঝাইবার শক্তি কোকিলেশ্বর বাবুর অসাধারণ। এই এক গুণে তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র। মুন্সিগঞ্জ কলেজে অধ্যাপনা কালে, বোধ হয়, তিনি লজিকের জটিল তত্ত্ব সমূহ পাঠকগণকে

বুঝাইবার সহজ উপায় ভাবিতেছিলেন। এই Helps to Logic সেই চিন্তার ফল। লজিক্ তত্ত্বকে সরল, সহজ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কোকিলেশ্বর বাবু গভীর পাণ্ডিত্য শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তক খানি এফ-এ পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগণের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এই একখানি পুস্তক পড়িলে এই বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সহজ হইবে, আমাদের বিশ্বাস। পরীক্ষার্থিগণ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

৪৩। চণ্ডী।—শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত, এবং চণ্ডী-মাহাত্ম্য শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্-এ বিরচিত; মূল্য ৸০। এই পুস্তক খানি উপহার পাইয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। বাল্যকাল হইতে চণ্ডী-পাঠ শুনিয়া আসিয়াছি। চণ্ডী-তত্ত্ব-মাহাত্ম্যে আমাদের প্রাণ পরিপূর্ণ। পিতৃদেব আমাদের ঘরে প্রতি মাসে চণ্ডী-পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে এখনও সে বিধান আছে। যে সকল পরিবার শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত, চণ্ডী তাহাদের অন্ন, পান, জল। বাল্য হইতে আমাদের সমাদৃত চণ্ডী আজ বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, গৌরবের সীমা নাই। "পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের অনুবাদ এখন দুষ্প্রাপ্য। কবিবর নবীনচন্দ্রের অনুবাদ অক্ষরানুবাদ বলিয়া সাধারণের পাঠোপযোগী নহে।" নবীন চন্দ্রের অনুবাদ অপেক্ষা এই অনুবাদ যে বিশিষ্ট, তাহা প্রতিপন্ন করিয়া বাবু গোবিন্দ লাল দত্ত একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা নব্য-ভারতে মুদ্রিত করিতে এখনও ইচ্ছা আছে। সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই। ফরিদপুরের ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয় চণ্ডীর আর একখানি পদ্যানুবাদ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, সে গ্রন্থের উল্লেখ পর সংখ্যায় করিবার ইচ্ছা আছে। বঙ্গে চণ্ডীর আদর এত বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা আমাদের বিশেষ আনন্দের বিষয়। মহেন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থের পরিশেষে দেবেন্দ্র বাবুর চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে। দেবেন্দ্র বাবুর দার্শনিক জ্ঞানের গভীরতা এবং তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রখরতা দেখিয়া আমরা মোহিত, স্তম্ভিত এবং অবাক্ হইয়াছি। উহা এতই সুন্দর হইয়াছে যে, বলিতে সঙ্কোচ হয় না, উহা বাঙ্গালা ভাষায় গৌরব-স্বরূপ। পুস্তকে প্রকাশিত না হইলে উহা আমরা পাঠক-গণকে উপহার দিতাম। বঙ্কিম বাবুর লেখনী নীরব হইয়াছে অবধি এমন সরস লেখা আমরা আর পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই প্রবন্ধটী পুস্তকাকারে ছাপাইয়া বিনা-মূল্যে বিতরণ করা উচিত। শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত এখন কোন ভক্ত এদেশে নাই কি, যিনি এই কাজ করিয়া ধন্য হইতে পারেন? মহেন্দ্র বাবুর বাঙ্গালা ভাষার ক্ষমতার প্রভূত পরিচয় এ গ্রন্থে পাইয়াছি, তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের যোগ্য। অধিক ধন্য-বাদের যোগ্য এই জন্য যে, তিনি দেবেন্দ্র বিজয় বাবুর দ্বারা "চণ্ডী-মাহাত্ম্য" রূপ অমূল্য রত্নের উদ্ধার করিয়াছেন। ঘরে ঘরে চণ্ডী এবং তৎসহ চণ্ডী-মাহাত্ম্য, গীতার ন্যায়, পঠিত এবং প্রতিষ্ঠিত হউক।

৪৪। অপূর্ব্ব স্বপ্ন (কবিতা) শ্রীকাম পাল মিশ্র কর্ত্তৃক উৎকল ভাষায় রচিত। লেখক এখনও বিদ্যালয়ের ছাত্র। এই অবস্থায়ও তিনি যে প্রকার রচনা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রশংসা করিতে হয়। প্রশংসা করিতে একটু ভয়ও হয়, কারণ অনেক ছাত্র এই প্রকার বাহবা পাইয়া অনেক সময়ে উদ্দেশ্য-বিমুখ হইয়াছেন, দেখিয়াছি। কবিতা লেখা ভাল, কিন্তু তাড়াতাড়ি পুস্তকাকারে ছাপাইবার প্রয়োজনীয়তা কি? নবীন লেখকদিগের পক্ষে একজন প্রবীণ সুলেখকের উপদেশের কথা উল্লেখ করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন যে, কোন নবীন লেখক যেন কোন রচনা লেখার পর একবৎসর অতিবাহিত না হইলে তাহা প্রকাশ না করেন। এ উপদেশের সারবত্তা বয়স না হইলে বুঝিতে পারা যায় না।

হীরাঝিল।

সিরাজের সাধের হীরাঝিল ও তাহার উপরিস্থিত প্রাসাদ অনেকদিন হইতে কাল-গর্ভে নিমগ্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার নিজ স্মৃতি যেমন বিস্মৃতির মহান্ধকারময় অনন্ত গর্ভে চিরনিদ্রিত রহিয়াছে, সেইরূপ তাঁহার প্রাসাদাদির চিহ্নও কালসমুদ্রে নিমগ্ন হইতে হইতে না জানি কোন্ অনিশ্চিত দেশে আশ্রয় লইতেছে। বিধাতার ইচ্ছা, মুর্শিদাবাদের সহিত সিরাজের সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়। যে হতভাগ্য অতুলনীয় রূপ-রাশি ও অতুল সম্পত্তি লাভ করিয়াও সংসারে দুইদিন ভোগ করিতে পাইল না, তাহার আর স্মৃতিচিহ্ন থাকিবার প্রয়ো-জন কি? মুর্শিদাবাদ তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর হইলেও, হতভাগ্যের প্রদত্ত অল-ঙ্কার সে অনায়াসে ভাগীরথী জলে বিসর্জ্জন দিতে পারে। তাই কাল একে একে মুর্শিদাবাদের সকল অলঙ্কারগুলি খুলিয়া কতক বা ভাগীরথী জলে, কতক বা বসুন্ধরা-হৃদয়ে মিশাইয়া দিয়াছে। যদিও সকলের প্রদত্ত অলঙ্কার রাশি মুর্শিদাবাদনগরী একে একে উন্মোচন করিতেছে, তথাপি যাহার দ্বারা সিরাজ তাহাকে শোভাশালিনী করিয়া-ছিলেন, সেইগুলি কালপ্রবাহে ভাসাইয়া দেওয়া তাহার সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত হই-য়াছে। কারণ সিরাজ যে তাহাকে প্রাণা-পেক্ষা ভাল বাসিতেন ও সৌন্দর্য্যময়ী করি-বার জন্য প্রতিনিয়ত যত্ন পাইয়াছিলেন। সিরাজ বড় সাধ করিয়া হীরাঝিল ও তাহার উপরিস্থিত প্রাসাদের নির্ম্মাণ করেন। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার অধীশ্বর হইয়া সেই প্রাসাদে মহানন্দে জীবন কাটাইবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়া-ছিল। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিবার কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পরে তিনি ইহ জগৎ হইতে চিরবিদায় লইতে বাধ্য হন। সিরাজের যৌবরাজ্যকালে হীরাঝিলের প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। মোগল সম্রাটদিগের মধ্যে বাদসাহ সাহ জাহানের ন্যায় মুর্শিদা-বাদের নবাবদিগের মধ্যে সিরাজেরও সৌন্দর্য্যপ্রীতির কথা শুনা যায়। মুর্শিদা-বাদের দ্বিতীয় নবাব সুজা উদ্দীনেরও সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা ছিল বটে, কিন্তু সিরাজ তাঁহার সে প্রীতিকে অনেক পরিমাণে অতিক্রম করিয়া-ছিলেন। সৌন্দর্য্যপ্রীতি দেবতারও বাঞ্ছ-নীয়। যদিও সিরাজহৃদয়ে তাহা বিলাসাব-রণে আচ্ছাদিত ছিল, তথাপি সময়ে সময়ে তাহাকে আবরণোন্মুক্তও দেখা গিয়াছে।

হীরাঝিলের প্রাসাদ মুর্শিদাবাদের মধ্যে অতি মনোরম দৃশ্য ছিল। হীরক-স্বচ্ছ ঝিলসলিলরাশি তাহার পদপ্রান্ত চুম্বন করিয়া বেড়াইত, এবং নিজ বক্ষে তাহার প্রতিচ্ছবি লইয়া ঈষৎ সমীর তাড়নেও কাঁপিয়া উঠিত। যখন জ্যোৎস্নালোকে বিধৌত হইয়া সেই সৌন্দর্য্যসারভূত প্রাসাদরত্ন হাসিতে হাসিতে ঝিলসলিলের ক্রীড়া নিরীক্ষণ করিত, সেই সময়ে কিছুদূরে ভাগীরথীবক্ষ হইতে তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা দেখিলে মনঃপ্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিত। এই সুন্দর প্রাসাদে সিরাজ যৌবনসুলভ আমোদোপভোগ করিতে আরম্ভ করেন। আলিবর্দ্দি খাঁর সহিত প্রতি-নিয়ত অবস্থান করায়, তাঁহার বিলাসোপ-ভোগের তাদৃশ সুযোগ ঘটিয়া উঠিত না, হীরাঝিলের প্রাসাদে সেই পিপাসা মিটা-

হইতে তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। অপ্সরাকণ্ঠ-বিনিন্দিত নর্ত্তকীবৃন্দ লইয়া তিনি সেই প্রাসাদে বিলাসতরঙ্গে ভাসমান থাকিতেন, এবং আসবপানে বিভোর হইয়া কলকণ্ঠী-গণের মধুর সঙ্গীতে আরও আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। সিরাজ সিংহাসন প্রাপ্তির পূর্ব্বে মাতামহের অনুরোধে সুরাপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যৌবনারম্ভে তাহাতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়েন। কখনও বা মোসাহেব ও অনুচরবর্গের তোষা-মদবাক্যে এবং ভাঁড় বা কাহিনী-কথক-দিগের রহস্যালাপে বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন। সময়ে সময়ে নর্ত্তকী ও মো-সাহেববৃন্দ লইয়া সাধের তরণী আরোহণে হীরাঝিলের স্বচ্ছ সলিলরাশি আন্দোলিত করিয়া বেড়াইতেন। জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীতে ঝিলবক্ষবিহারিণী তরণী হইতে যখন নর্ত্তকীগণের কণ্ঠধ্বনি দিগন্ত স্পর্শ করিতে ধাবিত হইত, তখন তাহাদের মধুর চুম্বনে ভাগীরথীর তরঙ্গলহরীও মূর্চ্ছিত হইয়া তীরক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িত। এই প্রাসাদেই সিরাজ উদ্দৌলা তাঁহার মনো-মোহিনী ফৈজীর রূপসুধা পান করিয়া উন্মত্ত হইতেন, এবং অবশেষে তাহার বিশ্বাসঘাতকতায় তাহাকে জীবন্ত অবস্থায় গৃহাবদ্ধ করেন।* এই খানেই তিনি তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী লুৎফ উন্নেসার সহিত পবিত্র প্রণয় উপভোগ করিয়াছিলেন এবং রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতেই একে একে সকল প্রকার বিলাস বিভ্রম বিসর্জ্জন দিতে আরম্ভ করিয়া আলিবর্দ্দির সিংহাসনের পবিত্রতা রক্ষা করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন।

হীরাঝিলের প্রাসাদকে দেশীয়গণ মনসুর-গঞ্জের প্রাসাদ বলিয়া থাকেন। সিরাজ উক্ত প্রাসাদে মসনদ স্থাপন করিয়া দরবার-কার্য্য সমাধা করিতেন। ফলতঃ রাজকার্য্য হইতে সামান্য আমোদ প্রমোদ পর্য্যন্ত সিরাজের সমস্ত ব্যাপারই হীরাঝিলের প্রাসাদে সম্পাদিত হইয়াছিল। সিরাজের সেই সাধের হীরাঝিল এক্ষণে ভাগীরথীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, এবং তাহার উপরিস্থ প্রাসাদও কালগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে। দুই একটী চত্বরের ভিত্তিভূমি জঙ্গলাবৃত হইয়া এখনও তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। আমরা এস্থলে হীরাঝিলের নির্ম্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সহিত সংসৃষ্ট প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

আলিবর্দ্দি খাঁ ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরের প্রাসাদে বাস করিতেন। মুর্শিদাবাদের যে স্থানকে সাধারণতঃ কেল্লা বলিয়া থাকে, সেই খানে বহুদিন হইতে নাবিকদিগের প্রাসাদ ছিল। সিরাজ সৌন্দর্য্যপ্রিয় হওয়ায়, তথা হইতে অন্য কোন স্থানে একটী মনোরম প্রাসাদ নির্ম্মাণের কল্পনা করেন। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বর্ত্তমান জাফরাগঞ্জের সম্মুখ-ভাগে তাহার স্থাননির্ণয় হয়। হিন্দু ও মুসলমান গৌরবের সমাধিস্থল গৌড় হইতে নানাবিধ প্রস্তরাদি আনীত হইয়া প্রাসাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইয়াছিল। প্রাসাদ সাধারণতঃ ইষ্টকে নির্ম্মিত হয়। কিন্তু স্থানে স্থানে প্রস্তর বসাইয়া সিরাজ তাহাকে শোভাশালী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তরঙ্গায়িত পল তুলিয়া প্রাসাদের কার্ণিস-গুলি অপরিসীম সৌন্দর্য্য বিস্তার করিত। ভিন্ন ভিন্ন চত্বরে প্রাসাদ বিভক্ত হয়, অথবা এক একটী পৃথক চত্বরই, এক একটী বিভিন্ন

*ফৈজির বিবরণ লুৎফ উন্নেসা নামক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

প্রাসাদেই পরিণত হয়। তাহারা এম্‌তাজ মহাল, রঙ্গমহাল প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। এই বিশাল প্রাসাদ এত দূর বিস্তৃত ছিল যে, কোন বিদেশীয় লেখক বলিয়াছেন যে, ইহাতে তিনটী ইউরোপীয় নরপতির আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিত। * প্রাসাদের প্রান্তদেশে এক কৃত্রিম ঝিল খনন করিয়া তাহার নাম হীরাঝিল প্রদান করা হইয়াছিল, নওয়াজিস্ মহম্মদ খাঁর মতিঝিলের অনুকরণে সম্ভবতঃ সিরাজের হীরাঝিল হইয়া থাকিবে। † ঝিলের উভয় পার্শ্ব ইষ্টক দ্বারা বাঁধান হয়। এই সুচারু প্রাসাদের নির্ম্মাণ শেষ হইবার পূর্ব্বে সিরাজ মাতামহ আলিবর্দ্দি খাঁকে প্রাসাদ দর্শনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। বৃদ্ধ নবাবের সহিত অনেক কর্ম্মচারী, রাজা, জমীদার ও জমীদারদিগের প্রতিনিধিগণও ...বী নবাবের সুরম্য প্রাসাদ দেখিতে অগ্র...র হইলেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ প্রাসাদ ...খিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হন। তাঁহার অনুচরবর্গও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সিরাজের রুচির ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন। কেহ বা ভিন্ন ভিন্ন চত্বরের, কেহ বা সুরম্য কক্ষশ্রেণীর, কেহ বা পলতোলা কার্ণিসের এবং কেহ বা হীরাঝিলের প্রশংসায় সিরাজের বালকসুলভ অন্তরকে অধিকতর স্ফীত করিয়া তুলেন। যখন সকলে ভিন্ন ভিন্ন চত্বরে বা প্রকোষ্ঠে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় বৃদ্ধ নবাব কোন একটী প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, সিরাজ মাতামহের সহিত কৌতুকচ্ছলে তাঁহাকে সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। নবাব দৌহিত্রের রহস্য বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে, আজ তোমারই জয় হইয়াছে, এক্ষণে তোমাকে কি উপহার দিলে আমাকে মুক্ত করিয়া দিবে। সিরাজও হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন যে, আমার প্রাসাদের জন্য কোন বন্দোবস্ত না করিলে ইহার নির্ম্মাণশেষ ও সৌন্দর্য্যরক্ষা হইবে না। তজ্জন্য ইহার কোনরূপ উপায় বিধান করিতে হইবে। নবাবের প্রকোষ্ঠমধ্যে রুদ্ধ হওয়ার কথা শুনিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার সমস্ত অনুচরবর্গ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সিরাজ তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন যে, এই সকল জমীদার ও জমীদারদিগের প্রতিনিধির নিকট হইতে একটী করের ব্যবস্থা করা হউক। নবাব সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাতে সম্মত হইয়া হীরাঝিলের প্রাসাদের জন্য যে কেবল কর নির্দ্দেশ করিলেন, এমন নহে, কিন্তু সিরাজের জন্য একটী গঞ্জও স্থাপন করিয়া দিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে ৫০১৫৯৭ টাকার আবওয়াব আদায় হয়। * মনসুর শব্দে বিজয়ী বুঝায়। সিরাজ মাতামহের উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার প্রাসাদের নাম মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ ও নবস্থাপিত গঞ্জটীও মনসুরগঞ্জ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যে স্থলে গঞ্জটী স্থাপিত হয়, তাহাকে অদ্যাপি মনসুরগঞ্জ বলিয়া থাকে। দেশীয় গ্রন্থকারগণ সিরাজ উদ্দৌলার প্রাসাদকে মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। †

* Seir Mutuqherin Vol II P. 28. (Translator's note)

† লং হণ্টার প্রভৃতি মতিঝিল হীরাঝিলে এক মনে করিয়া ভ্রম করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে তাহারা বিভিন্ন, এক নহে। মতিঝিল ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে ও হীরাঝিল পশ্চিম তীরে ছিল।

*Grant's Analysis of the finances Bengal 5th Report P. 285.

† Mutaqherin, and Riyazu-s-salatin.

কিন্তু ইউরোপীয়গণ সাধারণতঃ তাহাকে হীরাঝিলের প্রাসাদ বলিয়াছেন। * হীরাঝিলের প্রাসাদ নির্ম্মাণ হইলে, যুবরাজ সিরাজ মুর্শিদাবাদে অবস্থান কালে সেই খানেই বাস করিয়া আমোদ প্রমোদে কাল্যাতিবাহিত করিতেন। কেল্লার মধ্যে থাকিলে বিলাসোপভোগের তাদৃশ সুবিধা হইত না বলিয়া, তাঁহার হীরাঝিলের প্রাসাদে বাস করাই একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তথায় তাহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়। তিনি নবাব হইলেও কেল্লা পরিত্যাগ করিয়া মনসুরগঞ্জ মসনদ স্থাপন পূর্ব্বক রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাহার পর রাজ্যচ্যুত হইয়া প্রিয়তমা মহিষী লুৎফ উন্নেসার সহিত কিয়ৎ পরিমাণ সম্পত্তি লইয়া ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২৪শে জুন শুক্রবার রাত্রিতে সাধের হীরাঝিলের প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তাহার পর আর সিরাজকে হীরাঝিলের প্রাসাদে পদার্পণ করিতে হয় নাই। মুর্শিদাবাদে ধৃত হইয়া আনীত হইলে তিনি জাফরাগঞ্জে নিহত হন।

সিরাজউদ্দৌলার পলায়নের পূর্ব্বেই মীরজাফর পলাশী প্রান্তর হইতে আসিয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। তিনি সিরাজের পলায়নের কথা শুনিয়া মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ অধিকার করিয়া বসেন। কিন্তু ক্লাইবের আগমনের পূর্ব্বে মসনদে উপবিষ্ট হন নাই। ক্লাইব পলাশী হইতে দাদপুরে, পরে বহরমপুরের নিকট মাদাপুরে শিবির সন্নিবেশ করেন। তাহার পর ২৯শে জুন পর্য্যন্ত কাশীমবাজারে অপেক্ষা করিয়া, ঐ দিবস মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। হীরাঝিলের উত্তর মোরাদবাগে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। মোরাদবাগ হইতে ক্লাইব মনসুরগঞ্জের প্রাসাদে মীরজাফরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। মনসুরগঞ্জের প্রাসাদের দরবার গৃহের উত্তর দিকে বিশাল নবাবী মসনদ স্থাপিত ছিল, সিরাজ সেই মসনদে বসিতেন। ক্লাইব মীরজাফরের হস্তধারণ করিয়া মসনদের উপর উপবেশন করাইয়া নূতন নবাবকে এক পাত্র মোহর নজর প্রদান করিলেন।* তাহার পর অন্যান্য ইংরাজ ও দেশীয় কর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত জনগণ তাঁহাকে যথারীতি নজর প্রদান করিলে, মীরজাফর সমস্ত নগরে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব বলিয়া বিঘোষিত হইলেন। মীরজাফরের মসনদে উপবেশন করার পর, হীরাঝিলের প্রাসাদস্থিত সিরাজউদ্দৌলার ধনাগার লুণ্ঠনের ব্যবস্থা হইল। মীরজাফর, ক্লাইব, তাঁহার সহকারী ওয়ালস্, কাশীমবাজারের ওয়াট্‌স্, লশিংটন, দেওয়ান রামচাঁদ এবং মুন্সী নবকৃষ্ণ প্রভৃতি সেই কোষাগার লুণ্ঠনের সময় উপস্থিত ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার এই প্রকাশ্য ধনাগারে ১ কোটী ৭৬ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা, ৩২ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা † দুই সিন্ধুক অমুদ্রিত স্বর্ণপিণ্ড, ৪ বাক্স অলঙ্কারখচিত হীরা জহরত, ও ২ বাক্স অখচিত চুণী পান্না প্রভৃতি প্রস্তর খণ্ড মাত্র থাকার উল্লেখ দেখা যায়। এই প্রকাশ্য ধনাগার ব্যতীত সিরাজউদ্দৌলার অন্তঃপুরস্থ আর একটী ধনভাণ্ডারের কথা কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া থাকেন। তৎকালে অর্থশালী ভারতবাসী মাত্রেই নিজ নিজ

* Orme and Vansittart.

* Mutaqherin Trans. Vol I. P. 772, also Orme, Vol II. P. 181.

† হণ্টার ভ্রমক্রমে ২ কোটী ৩০ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার কথা লিখিয়াছেন।

অন্তঃপুরে একটী স্বতন্ত্র ধনাগর স্থাপন করিতেন। নবাব বাদসাহের ত কথাই নাই। কথিত আছে যে, সিরাজউদ্দৌলার ধনাগার মধ্যে ৮ কোটী টাকা সঞ্চিত ছিল। ইংরাজেরা নাকি তাহার কোনই সন্ধান পান নাই। তাহা মীরজাফর, তাঁহার কর্ম্মচারী আমিরবেগ খাঁ, রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। রামচাঁদ পলাশীর যুদ্ধের সময় মাসিক ৬০ টাকা বেতনে কার্য্য করিতেন, কিন্তু তাহার দশ বৎসর পরে মৃত্যুকালে তিনি নগদে ও হুণ্ডীতে ৭২ লক্ষ টাকা, ৪০০ বড় বড় সোনার ও রূপার কলস, তন্মধ্যে ৮০টী সোণার ও অবশিষ্টগুলি রৌপ্য নির্ম্মিত। এতদ্ব্যতীত ১৮ লক্ষ টাকার জমীদারীও ২০লক্ষ টাকার জহরত রাখিয়া যান। নবকৃষ্ণও মাসে ৬০ টাকা বেতন পাইতেন, তিনিও মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।* মীরজাফরের প্রিয়তমা ভার্য্যা মণিবেগম হীরাঝিলের প্রাসাদ লুণ্ঠনের জন্যই অগাধ সম্পত্তির অধিশ্বরী হন। তাঁহার যাবতীয় হীরা, জহরত এই লুণ্ঠন হইতেই লব্ধ।† রামচাঁদ, নবকৃষ্ণ যে সমস্ত অর্থ পাইয়াছিলেন, যদি ক্লাইব তাহা জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর তাহার অংশ পাইতে হইত না, সমস্তই সেই ব্রিটিশপুঙ্গবের হস্তগত হইত। মীরজাফরের নিকট হইতে ইংরাজেরা ৩৩৮৮৫৭৫০ টাকা লাভ করেন। কিন্তু একেবারে সমস্ত টাকা দেওয়া হয় নাই, ঐ টাকার কতকাংশ সিরাজের প্রকাশ্য ভাণ্ডার হইতে দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, ধনাগার উন্মুক্ত হইবামাত্র তাহা হইতে ৮০ লক্ষ টাকা নৌকাযোগে কলিকাতায় রওনা হইয়াছিল।* ইংরাজ সাধারণের প্রাপ্য অর্থ হইতে একা ক্লাইব সাহেবই ২৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে সিরাজের সমস্ত সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া যায়। সিরাজের প্রাসাদ ধনে পরিপূর্ণ থাকায়, বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ভগ্নাবশিষ্ট প্রাসাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে এখনও অনেক অর্থ পাওয়া যাইতে পারে।

মীরজাফর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথমে হীরাঝিলের প্রাসাদেই বাস করিয়াছিলেন। তিনি তথায় চিরদিন বাস করেন নাই, কিছুকাল পরে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে কেল্লামধ্যে আলিবর্দ্দির প্রাসাদে আসিয়া বাস করেন।† নবাব হইবার পূর্ব্বে জাফরগঞ্জের প্রাসাদ তাঁহার আবাস স্থান ছিল, কিন্তু মসনদে উপবেশন করার পর স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণকে জাফরাগঞ্জের প্রাসাদ দান করেন। মীরণের বংশধরেরা অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন। মীরণের বংশধরেরা জাফরাগঞ্জের প্রাসাদ অধিকার করায়, নবাব পুনর্ব্বার তথায় গমন করেন নাই, এবং নিজে মুর্শিদাবাদ-কেল্লা মধ্যস্থিত প্রাসাদে আসিয়াই বাস করেন। তাঁহার রাজ্যচ্যুতির পূর্ব্বে যখন কলিকাতার গবর্ণর ভান্সিটার্ট মোরাদবাগে উপস্থিত হন, মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে যে, সেই সময়ে নবাব মোরাদবাগে ভান্সিটার্টের সহিত সাক্ষাতের পর পুনর্ব্বার ভাগীরথী পার হইয়া তাঁহার প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন।‡ মোরাদবাগ ভাগীরথীর

* রামচাঁদ আন্দুলরাজবংশের ও নবকৃষ্ণ শোভাবাজারবংশের আদিপুরুষ।

† Mutapherin Trans. Vol. I. p. 773.

* Hunter's Statistical Account of Murshidabad P. 188.

† Mutaqherin. Trans. Vol II P. 8.

‡ do do do P. 14.

পশ্চিম তীরে হীরাঝিলের নিকটেই অবস্থিত ছিল। সুতরাং নবাব মীরজাফর খাঁ যে সে সময়ে পূর্ব্বতীরের প্রাসাদে বাস করিতেন, ইহা হইতে তাহা বিশদরূপে বুঝা যাইতেছে। * ভান্সিটার্ট মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মীরকাশীমকে মসনদ প্রদান করেন। ভান্সিটার্ট মীরজাফরকে হীরাঝিলের প্রাসাদে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। † কিন্তু মীরজাফর তাহাতে সম্মত না হইয়া স্বীয় প্রিয়তমা ভার্য্যা মণি বেগমের সহিত কলিকাতা চিতপুরে আসিয়া বাস করেন।

মীরকাশীমের সহিত যখন ইংরাজদিগের বিবাদ আরম্ভ হয়, সেই সময়ে জগৎশেঠদিগকে ইংরাজদিগের পক্ষ জানিয়া, তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবার জন্য মীরকাশীম বীরভুমের ফৌজদার মহম্মদ তকীখাঁকে আদেশ দেন। মহম্মদ তকীখাঁ শেঠদিগকে প্রথমতঃ হীরাঝিলের প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে মুঙ্গের হইতে নবাবের প্রেরিত লোক উপস্থিত হইলে তাহাদের হস্তে জগৎশেঠদিগকে সমর্পণ করেন।

ইহার পর হইতে আর হীরাঝিলের সহিত সম্বন্ধ কোন ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় না। এক্ষণে সে প্রাসাদ কালগর্ভে অন্তর্হিত। জাফরাগঞ্জের পরপারে অদ্যাপি তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। হীরাঝিল ভাগীরথীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে; কেবল তাহার পোস্তার কিয়দংশ ও একটী পয়ঃপ্রণালীর নিদর্শন ভাগীরথীর জলাপসরণে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সিরাজ উদ্দৌলার প্রাসাদকে সাধারণে লালকুঠী বলিত। সে প্রাসাদের অধিকাংশই বিলুপ্ত, কেবল এম্‌তাজ মহল নামক চত্বরের ভিত্তির কতক ভগ্নাবশেষ আজিও অবস্থিতি করিতেছে। তাহার পশ্চিম পার্শ্বের ভিত্তিটী সম্পূর্ণই আছে, পূর্ব্ব পার্শ্বের সমস্ত ভিত্তি ও উত্তর, দক্ষিণের কতকাংশ এক্ষণে ভাগীরথীগর্ভস্থ। এই ভিত্তি উত্তরদক্ষিণে দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২৫ হস্ত হইবে, পূর্ব্ব পশ্চিমেও সম্ভবতঃ তাহাই ছিল, কিন্তু ভাগীরথীস্রোতে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, এক্ষণে কেবল উত্তর দক্ষিণে, দুই পার্শ্বেই প্রায় ৭৫ হস্ত মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই চত্বরের মধ্যস্থলে একটী গৃহের ভিত্তি আজিও বিরাজ করিতেছে। তাহা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান, ও প্রায় ৩০ হস্ত হইবে। এই সকল ভিত্তি এক্ষণে নিবিড় জঙ্গলের দ্বারা আবৃত, আম্র প্রভৃতি দুই একটী বৃহৎ বৃক্ষও তাহাদের উপর জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই একটী পথশ্রান্ত পক্ষী সময়ে সময়ে সেই সকল বৃক্ষের শাখায় বসিয়া, সিরাজের সাধের ভবনের ভগ্নাবশেষ দেখিবার জন্য বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে পথিকদিগকে আহ্বান করিয়া থাকে। সিরাজ উদ্দৌলার সমস্ত চিহ্নই প্রায় মুর্শিদাবাদ হইতে লয় পাইয়াছে, কেবল ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে তাঁহার নির্ম্মিত মদীনাটী ও সিরাজ উদ্দৌলার বাজার প্রভৃতি দুই একটী স্থান অদ্যাপি তাঁহার ক্ষীণ স্মৃতি আনয়ন করিয়া দেয়। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, হীরাঝিলের প্রাসাদ নির্ম্মাণের সময় আলি

* হীরাঝিলের প্রাসাদ ভঙ্গ করিয়া মীরজাফর কেল্লামধ্যে পরে নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। মুতাক্ষরাণের অনুবাদক হীরাঝিলের প্রাসাদকে ভগ্নদশায় পতিত দেখিয়াছেন। তিনি আলিবর্দ্দির প্রাসাদেরও উক্ত দশা দেখিয়াছেন। আলিবর্দ্দির প্রাসাদকেও লোকে সিরাজ উদ্দৌলার প্রাসাদ বলিত।

† Vansittart's Narrative Vol I P. 124.

বর্দ্দি খাঁ সিরাজ উদ্দৌলার জন্য একটী গঞ্জ স্থাপিত করিয়া দেন, এবং তাহার নাম মনসুরগঞ্জ হয়। যে স্থলে গঞ্জটী স্থাপিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহাকে মনসুরগঞ্জ বলে, মনসুরগঞ্জ আজিমগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে, এবং হীরাঝিলের ভগ্নাবশেষ হইতেও বড় অধিক দূরে নহে। হীরাঝিল হইতে প্রায় অৰ্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে মোরাদবাগ অবস্থিত ছিল, রেণেলের কাশীমবাজার দ্বীপের মানচিত্রে হীরাঝিল ও মোরাদবাগ উভয়েরই নির্দ্দেশ দেখা যায়। মুর্শিদাবাদের মধ্যে মোরাদবাগ ও মতিঝিল ইংরাজদিগের প্রিয় বাসস্থান ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইব মোরাদবাগে আসিয়া অবস্থান করেন। মীরজাফরের পুত্র মীরণ এইখানে তাঁহার অভ্যর্থনায় নিযুক্ত থাকিতেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়া মোরাদবাগেই বাস করিয়াছিলেন। মীরজাফরকে অপসৃত করিয়া মীরকাশীমের হস্তে রাজ্যভার দিবার জন্য ভান্সিটার্ট মোরাদবাগে আসিয়া বাস করেন।

হীরাঝিলের অব্যবহিত দক্ষিণে একটী ভবনের কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় একটী গৃহের ভিত্তি ও দেওয়ালের কতক ভগ্নাবশেষ আজিও বিদ্যমান আছে। এই ভবনটী রাজা মহেন্দ্র বা রায় দুর্লভের। রায় দুর্লভ সিরাজের রাজত্ব কালে মন্ত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং মীরজাফরের সময়েও দেওয়ানের পদে অভিষিক্ত হন। হীরাঝিলের নিকটেই তাঁহার বাসভবন ছিল। গৃহটীর ভগ্নাবশেষ ব্যতীত ভবনের চতুর্দ্দিকেই ইষ্টকরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। ভূগর্ভে প্রোথিত সোপানাবলীর কয়েকটী সোপানও দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মহেন্দ্র সায়র নামে একটী নাতিদীর্ঘ পুষ্করিণী রাজা মহেন্দ্র বা রায়দুর্লভের নাম ঘোষণা করিতেছে। বর্ষাকালে তাহার সহিত ভাগীরথীর সংযোগ হয়। রায়দুর্লভের সেই বাসভবনের ভূমি এক্ষণে কৃষক কর্ষণ করিয়া শস্য বপন করিতেছে। কালে সমস্ত মুর্শিদাবাদের যে উক্ত দশা না হইবে, ইহা কে বলিতে পারে? শ্রীনিখিলনাথ রায়।

আত্ম বা নিগূঢ় বৈষ্ণব দর্শন। (৪)

৪২। অনেকের (তাহাদের মধ্যে সাধনাভিমানী ও সাধনাশ্রিত লোকেরও নিতান্ত অসদ্ভাব নাই) এরূপ ধারণা যে, যে-কোন পাত্র-বিশেষেই হউক, প্রেম জন্মিলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি লাভ হয়। শুদ্ধসত্ত্ব অথবা নিরঞ্জনাখ্য বিষয়রত্নের সঙ্গপ্রাপ্তির তাদৃশ কোন বিশেষ আবশ্যকতা নাই—সরাগ ভাবঘন অন্তরঙ্গসম্পন্ন ব্রহ্মাত্মা সজ্জন ভগবজ্জন সাধুর—সদ্গুরুর সঙ্গপ্রাপ্তিরও তাদৃশ কোন বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নাই স্ত্রী পুত্রাদি বহিরঙ্গ জাতীয় যে কোন এক বিষয় হউক, তৎপ্রতি প্রকৃত নিঃস্বার্থ প্রেম সঞ্চারিত হইলেই, সকলই সিদ্ধ হইল—সকলই করতলন্যস্ত হইল। অন্ধভাবে অবিচারে, এই প্রকৃত নিঃস্বার্থ প্রেম, যে কোন আধার বিশেষে উপরত হইয়া দাঁড়াইবে, সে আধার সমল হউক আর নির্ম্মলই হউক, অসারগর্ভই হউক আর সারগর্ভই হউক, অসাধু অসতীই হউক আর সাধু সাধ্বীই হউক, ভগবদ্বেষীই হউক আর ভগবদ্ভক্তই হউক, ইতর প্রাণীই

হউক আর শ্রেষ্ঠ জীবই হউক, আধার-গত কোন বিশেষত্বের অপেক্ষা নাই, সে আধার প্রাপ্ত প্রেমের বিনিময়ে সর্ব্বত্র, সর্ব্বকাল, সমভাবে পূর্ণফল প্রদান করিবে। এই ধারণা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ, অশাস্ত্রীয় এবং পূর্ব্বগত প্রকৃত সাধুদিগের অভিজ্ঞতা মূলক জ্ঞান-সংস্কারের সঙ্গে অসঙ্গত। শুদ্ধ তাহা নহে, এই ধারণা নিরতিশয় দোষাবহ, অমূলক ও প্রকৃত সাধন-বিরোধী।

৪৩। রাসায়নিক সংযোগে অধমর্ণ ও উত্তমর্ণ বা ঘাতক ও মহাজন ভাবাপন্ন দুই বিরুদ্ধ সম্বন্ধ পদার্থে মিলিয়া, একাকার গত হইয়া যায়। উল্লিখিত বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দুই স্বতন্ত্র মানুষও দৈব ঘটনায় পরস্পরে একত্রিত ও পরিচিত হইলে, সময়ে উভয়ে অন্তর্ম্মুখে তদেক হইয়া যায়। উভয়ের তখন এক মন এক প্রাণ। যখন উভয়ের এই অন্তর্ম্মুখিন্ তদেকত্ব বা প্রেমমিলন লাভ হয়; তাহাদের উভয়েরই তখন কাজে কাজেই একই স্বার্থ, একই শক্তি, একই উদ্দেশ্য একই ভাব। পরস্পরকে পরস্পরে স্বতঃই আত্মীয় বা আত্মীয়তর জ্ঞান করে, পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ হইলে উভয়েই অপূর্ব্ব তৃপ্তি লাভ করে, পরস্পরের সুখ দুঃখে পরস্পরে সুখ দুঃখ অনুভব করে। প্রেমে মিলিত দুই জনের নিজ নিজ স্বার্থ ও সুখ, তখন আত্মবিন্দু অবহেলা করিয়া, পরস্পরের পরকীয় বিন্দুগত হইয়া দাঁড়ায়। তখন উভয়ের কেহ, শুদ্ধ নিজের সুখে সুখানুভব করে না, শুদ্ধ নিজের স্বার্থে স্বার্থানুভব করে না, পরন্তু পরস্পরের সুখ ও স্বার্থে, সুখ ও স্বার্থানুভব করিয়া থাকে। প্রেম-প্রবীণ পদকর্ত্তা সুবিখ্যাত চণ্ডীদাস নিম্নোদ্ধৃত একটী পদাংশে প্রেমিকের ভাব অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।"

প্রেমে মিলিত দুই জনের আবাস ভূমি নিজ নিজ দেহে নহে, কিন্তু পরস্পরের পরকীয় দেহে, এবং তাহাদের আপনার জন নিজে নিজে নহে, কিন্তু পরস্পরে—তাহাদের আপনার জন্যও অন্যান্য ব্যক্তিগত, তাহাদের আবাসস্থানও অন্যোন্য দেহগত। যেমন রাসায়নিক সংযোগে, তেমনি অন্যান্য ব্যাপারে মিলিত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে কোন বিশেষ স্বরূপগত পরিবর্ত্তন (constitutional change) লক্ষিত হয় না। বিশেষ কোনরূপ স্বরূপগত ঔৎকর্ষসিদ্ধি বা তদভিমুখে সংক্রান্ত হইবার জন্য,পরস্পরের মধ্যে স্বরূপগত পরিণামসিদ্ধির সূচনা কুত্রাপি কখনও দেখা যায় না। যে কিছু পরিবর্ত্তন পরস্পরের মধ্যে লক্ষিত হয়,তাহা শুদ্ধ ঘাতকের স্বরূপে মহাজনের স্বরূপ-মিশ্রণ ফল, অথবা উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ ভাবের যোগ-সমষ্টি ফল। তদতিরিক্ত আর কিছুই নহে! দুয়ের মিলনে অবশ্যই উভয়ের সামাজিক শক্তি ও বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কিন্তু স্বরূপ-গত কোন অতিরিক্ত ঔৎকর্ষ লক্ষিত হয় না।

৪৪। পাত্রান্তরের সঙ্গে মিলিত হইলে, মানুষ অজ্ঞাতসারে, অন্তর্ম্মুখে, তদাকারে আকারিত হইতে থাকে—তদীয় অন্তঃসত্ব স্বকীয় স্বরূপে, স্বকীয় প্রকৃতিতে আশ্রয়দান করিতে থাকে। প্রেম সম্বন্ধের এবং সম্বন্ধ মাত্রেরই ইহা একটী অবশ্যম্ভাবী বৈজ্ঞানিক ফল। শৈশবকালে কোন কোন শিশু (কেহ কেহ তাহাদের মধ্যে তিন চারি বৎসর বয়স্কও হইয়াছিল) দৈব কর্ত্তৃক ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি জন্তুর হস্তে নিপতিত হইয়া, সেই সেই জন্তুর স্নেহে ও যত্নে যথাবিধানে প্রতিপালিত হইবার সং

বাদ সময়ে সময়ে প্রামাণিক সূত্রে জনসমাজের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। আজকাল সভ্য জগতে এরূপ ঘটনা অসম্ভব বা অপ্রকৃত বলিয়া উড়াইয়া দিবার স্থল নাই। সেই সেই ব্যাঘ্রাদি জন্তুর সংসর্গে ও আনুগত্যে ২।৩ বৎসর মাত্র বাস করিয়া সেই সেই দুর্ভাগ্য শিশুগণের অবস্থা শীঘ্রই আশ্রয়জাতীয় পশ্বাদির প্রকৃতি ও চলন চর্য্যাতে পরিবর্ত্তিত হইয়া, তাহাদের ঈশ্বর-দত্ত মনুষ্য প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ গতি, পরিণাম ও বিকাশ পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ ও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। এরূপ অনেক গুলি ঘটনা লোকচক্ষে পতিত হইয়া, প্রামাণিক ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠায় স্থান প্রাপ্ত হইতেছে। এখানে এই সকল শিশু শীঘ্রই আশ্রয়জাতীয় প্রতিপালক জন্তুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ স্নেহ-সম্বন্ধ-হেতু তাহার স্বভাবসিদ্ধ বস্তুত্বের যেমন এক দিকে বিলোপ হইতেছে, তেমনি অপরদিকে প্রতি-[illegible]লক জন্তুর নিকৃষ্টজাতীয় বস্তুত্ব, সেই স্থানে শনৈঃ শনৈঃ সঞ্চারিত হইতেছে, এবং অবশেষে তাহাদিগকে পূর্ণপাশব প্রকৃতিতে পরিণত করিতেছে। অমৃতের অধিকারী স্বাধীনতার অভিমানী, নিজের ব্যক্তিত্বের গর্ব্বে পূর্ণগর্ব্বিত [illegible]নুষের, সংসর্গদোষে, কি পর্য্যন্ত না অধঃগতি, কি পর্য্যন্ত না দুর্গতি সংঘটিত হইল !!! এক [illegible]র্গ দোষে মানবপ্রকৃতি বহুনিম্নভূমিতে অধনীত হইয়া পাশব প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইল !!! সংসর্গগুণে, সৎসংসর্গে, মানবপ্রকৃতি কি উন্নীত হয় না? আত্ম ও পরমাত্মতত্ত্ব-সম্পন্ন সাধু সজ্জনের সংসর্গে ও আনুগত্যে মানুষ কি ততদূর পর্য্যন্ত উচ্চ অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না?

৪৫। "সংসর্গজা দোষা গুণা ভবন্তি" ইহা সম্পূর্ণ শাস্ত্রোক্তি না হইলেও, অবশ্যই বিষ্ণুশর্ম্মার ন্যায় কোন অভিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের উক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।" ইহা বেদান্তদর্শন—ভাষ্যকার মহা-শাস্ত্রজ্ঞ অভিজ্ঞতার পারদর্শী মহাপুরুষ ভগবান শঙ্করাচার্য্যের উক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতবর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী "সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়, লবা মাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয়" এই উক্তিতে সাধুসঙ্গের বৎপরোনাস্তি ও যথাযথ গুণ কীর্ত্তনই করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে"তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ" সাধুরা দর্শন মাত্রেই পবিত্র করেন, এই উক্তি অবশ্যই শাস্ত্র বাক্য বলিয়া বহুসংখ্যক লোকের কাছে আদরণীয় হইয়া থাকে। প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত" "তৎ বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" সদ্‌গুরু আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া নিবোধিত হও, পরম পুরুষের সম্যক জ্ঞান লাভার্থ তিনি গুরু সন্নিধানে গমন করিবেন, ইত্যাদি শ্রুত্যুপদেশ সর্ব্বজনমান্য বেদান্ত শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত। সর্ব্বকালের সাধু সজ্জনগণের ও সর্ব্ব শাস্ত্রের সদুক্তি সকল এক বাক্যে সাধু সঙ্গেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি" হইতে "ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এই শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে ভগবানের ধর্ম্ম স্থাপনার্থে সাধুরূপে অবতারণারই উল্লেখ হইয়াছে। এরূপ কথা কোন প্রকৃত শাস্ত্রে, কোন প্রকৃত অভিজ্ঞজনের উক্তিতে প্রকাশ নাই যে, অন্যসঙ্গে, "যার-তার-সঙ্গে" প্রেম সম্বন্ধ সংঘটনা হইলে, সর্ব্বার্থ সিদ্ধি লাভ হয়। সুতরাং সাধু সঙ্গ ভিন্ন সদ্গতি লাভের আর অন্য পথ নাই—"নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়ন ওনায়" ইহা সাধুক্ত শাস্ত্র-উক্তিতে এক বাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে।

৪৬। যেরূপ রাসায়নিক ব্যাপারে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ দুটী স্বতন্ত্র পদার্থপরস্পর সান্নিধ্য ও সাহিত্য প্রাপ্ত হইলে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া, একাঙ্গভুক্ত হইয়া যায়, মনুষ্য বা জৈবিক ব্যাপারেও অনুরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত দুটী মানুষ বা জীব দৈব কর্তৃক সান্নিধ্য বা সাহিত্য প্রাপ্ত হইলে, অন্তর্ম্মুখে পরস্পরের দিকে সন্নিহিত হইতে থাকে। মহাজন ধর্ম্মীর সস্নেহে ধন দান, এবং খাতকধর্ম্মীর সানুগত্যে ও সকৃতজ্ঞচিত্তে সেই ধন গ্রহণ, এই ভাবে, উভয়ে ধনাংশে সমান হইয়া, একত্র হইতে থাকে। একদিক্ হইতে মহাজন, খাতকের স্বরূপানুপ্রবিষ্ট হইয়া তৎসঙ্গে আত্মসাৎ হইতেছে, আর এক দিক্ হইতে খাতক তদ্ধনে ধনবান, এবং তদৈশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবন্ত হইয়া, তদাকারে পরিণত হইতেছে—অন্তর্ম্মুখে একাকার প্রাপ্তি হইতেই—গাঢ় প্রেমের উৎপত্তি হয়। মহাজন সন্নিধানে তাহার খাতক তাহারই একটী ধন ভাণ্ডার; যে ধন সে নিজেই; খাতক সন্নিধানে তাহার লব্ধ ধনৈশ্বর্য্য তাহার মহাজনেরই সম্পত্তি বা সেই মহাজন নিজেই এবং সে তাহার কাছে সেই ধন প্রাপ্তিহেতু অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণগ্রস্ত। এই রূপে এখানে দুজনেরই আমিত্ব তুমিত্বগত হইয়া যাইতেছে। এইরূপে যখনই উভয়ে এক ভাবাপন্ন হইল, যখনই উভয়ে ধনাংশে ঐশ্বর্য্যাংশে স্বরূপাংশে সমান হইল, তখন প্রেম সম্পূর্ণ হইয়া উভয়ে, স্ব স্ব দেহগত প্রভেদ সত্ত্বেও, এক প্রাণ এক মন হইয়া দাঁড়াইল। প্রথম মিলনে হয়ত চরাচর কোন প্রেম চিহ্ন প্রকাশ পায় না। শুক্ল প্রতিপদের চন্দ্রকলার ন্যায়, সেই প্রেম চিহ্ন অব্যক্ত ও অননুভূত থাকে, কিন্তু কিছু ব্যাপক কাল উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিদ্বয় মিলিত হইতে হইতে তাহাদের অন্তরস্থ প্রেম চিহ্ন কলায় কলায় বর্দ্ধিত হইয়া, প্রকাশ পাইতে থাকে এবং সময়ে তাহা পূর্ণ মাত্রা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মলিন হৃদয়ে এই ঋণজনিত প্রেম বীজ ক্ষেত্রের অপ্রস্তুত অবস্থা হেতু শীঘ্র অঙ্কুরিত হইতে পারে না।

৪৭। প্রকৃত প্রেম সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন ঋণদায়ে অস্থির, সর্ব্বত্রই ঋণ ভারে ভারাক্রান্ত এবং নানা উপায়ে প্রাণান্ত স্বীকার করিয়াও সেই ঋণ পরিশোধের চেষ্টায় নিবৃত্ত, সেই জ্বালায় সর্ব্বক্ষণ জ্বালাতন। যেখানে জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারে হউক, এই ঋণদায়ের স্বভাবসিদ্ধ অস্থিরতা—এই ঋণভারের অবিশ্রান্ত পেষণ পীড়া, এই ঋণপরিশোধের স্বতঃসিদ্ধ চেষ্টা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, সেই খানেই প্রেমের বীজ প্রকৃত প্রস্তাবে অঙ্কুরিত হইয়াছে, বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। লৌকিক ভাবে উপকার ঋণ প্রত্যুপকারে পরিশোধ করিবার যে চেষ্টা, তাহা প্রকৃত না হউক, কোন প্রকার কৃতজ্ঞতা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা তদতিরিক্ত আর কিছুই নহে। চেষ্টাসাধ্য বহু প্রকার প্রত্যুপকার চেষ্টা করিতে করিতে যখন খাতক দেখিতে পায় যে, তাহার ঋণ মাত্রা কোনক্রমেই হ্রাস হইতেছে না, এবং সহস্র সহস্র প্রত্যুপকার সাধনেও তাহার হ্রাস প্রাপ্তির কোন প্রকার সম্ভাবনা দেখিতে পায় না, তখনই সেই হৃদয়ে প্রকৃত প্রেমাঙ্কুর হইয়াছে বলিয়া মানিতে হইবে। যে ঋণ প্রত্যুপকারে পরিশোধিত হইল বা হইতে পারে, মনে হয়, তাহা প্রকৃত কৃতজ্ঞতাও নহে, প্রেমত নয়ই। ঋণ হইতে প্রকৃত কৃত-

জ্ঞতার উৎপত্তি এবং প্রকৃত কৃতজ্ঞতার মধ্যে প্রেমবীজ নিহিত থাকে। প্রেম দরদে প্রকাশ পায়,—ব্যথায়, বেদনায়—জ্বালায় প্রকাশ পায়। প্রেমিক আর ব্যথিত একই কথা। প্রেমিক দরদের দরদী, ব্যথার ব্যথিত, বেদনার বেদনী। যেখানে এই অকারণ ঋণ সম্বন্ধ ঘটে, সেখানে এই ঋণ প্রেমবীজ রূপে খাতকের অন্তরে নিপতিত হয়। যেখানে এই অকারণ ঋণ প্রাপ্ত হইয়াও খাতক সে সম্বন্ধ যথা-যথ অনুভব করিতে পারে না এবং প্রেমের কোন চিহ্ন সেখানে প্রকাশ পায় না, সেখানে ইহা নিশ্চয় যে, খাতকের হৃদয়গত কোন আবর্জ্জনায়, সেই প্রেমবীজ প্রাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। অথবা তাহা প্রকৃত আশ্রয় স্থল প্রাপ্ত হইতেছে না। যেখানে প্রাপ্ত-ঋণের পরিবর্ত্তে কৃতজ্ঞতা-সূচক কোন প্রকার প্রত্যুপকার স্ফূর্ত্তি হওয়া দূরে থাকুক, অনিষ্ট ও অপকার চেষ্টা পর্য্যন্ত দেখা যায়, সেখানে ইহা নিঃসংশয় যে ক্ষেত্রেতে হৃদয়মালিন্যের অবধি নাই। কিন্তু একবার এই আকরণ ঋণ সম্বন্ধ ঘটিলে খাতকের আর কোন ক্রমেই নিস্তার নাই। সত্বরই হউক আর বিলম্বেই হউক, ইহজন্মেই হউক আর জন্মান্তরেই হউক, জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাত সারেই হউক, যখনই আত্মোন্নতির স্বাভাবিক হেতু পরম্পরায় সেই চিত্ত-মালিন্য ক্ষালিত বা অপসারিত হইয়া যাইবে, তখনই তাহার অন্তর্নিহিত প্রেমবীজকে অঙ্কুরিত হইতেই হইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ঋণ-ভারে প্রপীড়িত হইয়া,সেই ঋণ-দায় হইতে অব্যাহতি লাভের স্বভাবতঃই আয়োজন করিতেই হইবে। দেহলীলা সম্বরণ করিয়া, অন্যত্র গমন করিলেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। এই ঋণ-দায় সম্বন্ধে কোন বঙ্গীয় সাধক ভক্ত কবি বলিয়াছেন, যে।

> শমন সঙ্গে আছে তার, স্বর্গে গেলেও নাই নিস্তার,
> আস্‌তে হবে পুনর্ব্বার, পরিশোধ দিতে।
> পলা'য়ে না পাবে পার,এ ঋণ থাকিতে॥

৪৮। ইহারেই নাম ঋণের দায়ে, প্রেমের জ্বালায় বিব্রত হওয়া। ঋণ দাতা, মহাজনের সন্নিধান হইতে যত দূরবর্ত্তী থাকুক না কেন, ঋণ-সম্বন্ধ সংঘটনার কাল হইতে যতকাল ব্যবহিত থাকুক ও গত হউক না কেন,তাহার চিত্তাবর্জ্জনা, তাহার অন্তর হইতে বিদূরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে খাতক, প্রাপ্ত ঋণের পরিশোধ দায়ে বিষম দায়গ্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহার সেই অপরিশোধিত ঋণ তখন দাবানল রূপ ধারণ করিয়া, তাহার অন্তরকে দগ্ধ করিতে থাকে। এই জ্বালা, মহাজনের সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া,কৃত ঋণ পরিশোধের উপায়-সুলভ না হইলে, কিছুতেই নিবারিত হইবার নহে। এই অপরিশোধিত ঋণদায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য,—এই দুঃসহ ঋণভার বিমোচন জন্য, খাতককে হয়ত ইহসংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ পর্য্যন্তও স্বীকার করিতে হয়। এই জন্ম গ্রহণ তাহার ঋণদাতা মহাজনকে ধরিবার জন্য—তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবার জন্য। তাঁহাকে পাইতেই হইবে। সেই ধনী মহাজন সমক্ষে আত্ম বিক্রয় করিবার জন্য—তাহার অলিখিত ঋণখৎ পরিশোধ করিবার জন্য, প্রেমদানে, প্রত্যুপকার দানে, তাহার পূর্ব্বকৃত ঋণভার কথঞ্চিৎ লাঘব করিবার জন্য, তাহার প্রাণ এখন প্রবল পরাক্রমে তাহার মহাজনাভিমুখে টানিতে থাকে,তাই তাহাকে ইহ সংসারে পুনরাবর্ত্তন পর্য্যন্তও স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই তাহার তৃপ্তি লাভ হয় না—

স্বর্গ-সুখ ভোগেও সে সুস্থির থাকিতে পারে না। ঋণী যদি কখনও জ্ঞাতসারে প্রত্যুপকার সাধনে, প্রাপ্ত ঋণের বিপরীত পরিশোধ দিয়া থাকে, তাহা হইলে এখন তাহার জ্বালা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যখন তাহার তাদৃশ চিত্ত শুদ্ধি হয় নাই, তখন তাহার অবস্থা বরং ভাল ছিল, কিন্তু চিত্ত শুদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যন্ত্রণারও ক্রমশঃ আধিক্য প্রাপ্তি হইতে লাগিল। কেবল নির্ম্মল চিত্তেই অনিচ্ছোৎপন্ন অকাম অনুতাপাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে।

৪৯। এই সংসার-ক্ষেত্রে কখন কখনও এমনও হয় যে, দুই জনের পরস্পর সাক্ষাৎ মিলন হইবা মাত্র, একজন আর এক জনের গাঢ় প্রেমে নিপতিত হইয়া পড়ে। একজন সম্বন্ধে অপরের এমনি মর্ম্মান্তিক বেদনা আচ্ছাদিত থাকে যে, হয় ত তাহার চাক্ষুষ মাত্রই সে অমনি মর্ম্ম-বেদনায় মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়ে। এরূপ ঘটনা স্থলে সচরাচর দুইটী কারণ উল্লিখিত হইতে পারে। তন্মধ্যে একটী এই যে, বিরুদ্ধ ধর্ম্মাত্মক দুই জনে পরস্পরের অজ্ঞাতসারে পরস্পরের জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক বা প্রাকৃতিক কারণে সংসৃষ্ট হইয়া, দৈবযোগে বা হটাৎ, মিলিত হইয়া, উভয়ে গাঢ়-প্রেম সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া পড়িল। আর একটী কারণ, এবং যাহা ইতিপূর্ব্বেই ইঙ্গিত হইয়াছে, তাহা এই যে, কোন জন্মান্তরে কোন ঋণ সম্বন্ধ সংঘটন হেতু অপরিশোধিত ঋণ-জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হওয়াতে, তাহা যথানুষ্ঠানে কথঞ্চিৎ নিবারণ সঙ্কল্পে ইহ সংসারে আসিয়া, অনেক অজ্ঞাত অনুসন্ধানের পর দৈব কর্ত্তৃক কোন সুসময়ে তাহার প্রকৃত অথচ অজ্ঞাত মহাজনকে সহসা প্রাপ্ত হইয়া, ঋণী তদ্রূপ বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িল। অথবা পূর্ব্বজন্মের অপরিতৃপ্ত ও অপরিশোধনীয় প্রেম সম্বন্ধ, যাহা সহসা কোন দৈব বিচ্ছেদ ঘটনাতে অবরোধ প্রাপ্তি হেতু প্রেমিকের সংস্কার বা আতিবাহিক দেহে প্রসুপ্ত ছিল; এবং যে জন্য তাহার প্রেম-প্রবণ হৃদয়, এতদিন কোন ক্রমেই প্রসন্নতা লাভ করিতে সক্ষম ছিল না, তাহা যথা পাত্র দর্শনে সহসা প্রেমিক হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া, সেইভাবে প্রেমোচ্ছ্বাস প্রাপ্ত হইল। যাঁহারা প্রকৃত কোন প্রেমের কিছু মাত্র তত্ত্ব বুঝেন, তাঁহাদের কাছে এই শেষোক্ত কারণটী নিতান্ত অজ্ঞেয়তার আবরণে প্রাবৃত হইলেও, সুসঙ্গত বলিয়া অনুমিত হইবে। দৃষ্ট কারণের অসদ্ভাবে সর্ব্বত্রই অদৃষ্ট কারণান্তরই অনুমান-সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত কারণটীতে ঋণ বা প্রেম ব্যাপারের উল্লিখিত বেদনা, দরদ, জ্বালা, অস্থৈর্য্য ও মর্ম্মপীড়া প্রভৃতি স্ফূর্ত্তি পাইবার স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রেমের দায়ে অস্থির হইবার, ঋণভারে ভারাক্রান্ত হইবার, যথেষ্ট যুক্তি প্রথমোক্ত কারণে সম্ভবপর বলিয়া অনুমান-সিদ্ধ হয় না। সে প্রেমে লোকে বিষম ঋণদায়ে, কেন অকারণে আপনাকে দায়গ্রস্ত মনে করিবে? সে প্রেমে পূর্ব্বপ্রাপ্ত ঋণের ভারত্ব ও গুরুত্ব লোকে কেন অকারণে সেরূপ অনুভব করিবে? সে প্রেমে স্থল বিশেষে "a debt immense of endless gratitude and endless obligation" লোকের অন্তরে অকারণে কি জন্য স্থান পাইবে? প্রকৃত প্রেমে খাতক, মহাজনের কার্য্যসাধনে নিঃস্বার্থ ভাবে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও যেন আরও কত করিতে অবশিষ্ট রহিল, এরূপ অতৃপ্তি তাহার সকৃতজ্ঞ-চিত্তে সর্ব্বক্ষণ উদয় হইতে থাকে

প্রথম কারণে এরূপ অকারণ অতৃপ্তি কেন জন্মিবে? প্রথম কারণটী এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দানে অপারক। দ্বিতীয় কারণে ঐ সকল প্রশ্নের এক প্রকার সঙ্গত উত্তর পাওয়া যায়। প্রাণ দিয়াও যে ঋণীর সম্যক্ পরিতৃপ্তি লাভ হয় না, অথচ তাহার যে কি ঋণ এবং কত ঋণ, তাহা তাহার কিছুই জানা নাই। ঋণ ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই রহিল,অথচ তাহার দায়ে ঋণী যৎপরোনাস্তি বিরত হইয়া পড়িল। কি দিয়া যে সেই অজ্ঞাত ঋণ সে শোধ করিবে, তাহা সে ভাবিয়াই পায় না। এরূপ ভাবস্ফূর্ত্তি মূল কেবল দ্বিতীয় কারণেই অনুমান-সিদ্ধ হইয়া থাকে।

৫০। কিন্তু এই সমস্ত ঋণ অধিকাংশ স্থলে নির্ম্মল পাত্র কর্ত্তৃক বিতরিত না হওয়াতে, সেই ঋণ-সম্বন্ধ হইতে ঋণীর অন্তরে যে মহাজনজাতীয় তদাকারত্ব লাভ হয়, তাহা কোন ক্রমে তাদৃশাতীত বা তদতিরিক্ত নির্ম্মল হইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই। মহাজন যেখানে সাধু সজ্জন, নিরঞ্জন-অন্তরঙ্গ-সম্পন্ন ও কৃষ্ণপ্রেমে জরজর দেহ, সেইস্থলেই কেবল নির্ম্মল তদাকারত্ব-প্রাপ্তি কৃষ্ণ বা বিশ্বজনীন প্রেম এবং আত্ম ও পরমাত্ম বা স্বরূপ-তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি সম্পাদিত হইতে থাকে। কেবল এই জাতীয় ঋণ সম্বন্ধে বা তজ্জনিত প্রেম-সম্বন্ধে লোকের অন্তর্ম্মল ক্ষালিত হইয়া চিত্ত-নৈর্ম্মল্য লাভ হয়। অন্য ঋণে বা অন্য প্রেমে তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। ঋণী যে জাতীয় ধন ঋণ-প্রাপ্ত হয়, সেই ধনের সারত্ব অথবা ঋণদাতা ধনীর প্রকৃতি-গত সারত্বই অন্তর্নৈর্ম্মল্যের নিমিত্ত-কারণ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন সেখানে অন্য কারণ প্রত্যক্ষ বা অনুমান-সিদ্ধ হয় না। প্রেম তাহার কারণান্তর হইতে পারে না। এই জন্য শ্রীচৈতন্য-পার্শ্বদবর প্রেমিক-শিরোমণি পূজ্যপাদ রায় রামানন্দ তাঁহার সুবিখ্যাত অগাধ জ্ঞানগর্ভ সাধ্য-সাধন-নির্ণয়-তত্ত্বে বলিয়াছেন—যে "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি (হেতু) শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥" অগ্রে শুদ্ধচিত্ত না হইলে, চিন্ময় ধনের ঋণ প্রাপ্তিতেও তখনই তখনই কৃষ্ণ প্রেমোদয় হয় না। তবে তাহার নিরন্তর সমাগমে চিত্তের আবর্জ্জনা যে তখন হইতে দগ্ধ হইবার সূত্রপাত হয়,তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সাধু সজ্জনের অন্তরঙ্গ নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণ বা বিশ্বজনীন প্রেমে জর জর বলিয়া তদঙ্গ-নিঃসৃত নিরঞ্জন, পরানন্দ ধন, মনুষ্য প্রকৃতি-নিহিত,নিত্যসিদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেমের 'বিদেহ বীজকে সদেহ বীজে পরিণত ও অঙ্কুরিত করিয়া যথা সময়ে তাহাকে দেহব্যাপী কৃষ্ণ-প্রেমান্ধে তদাকারিত করিয়া তুলে। এই নির্ম্মল চিত্ত-মলঘ্ন চিন্ময় ধনের মহাজনীতেও প্রেমোৎপত্তি হেতু চিত্তশুদ্ধি হইবার কোথাও কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু সর্ব্বত্র চিত্তশুদ্ধি-হেতু প্রেমোদয় হইবার কথাই আছে। সর্ব্ববিধ প্রেম-সঞ্চার স্থলে এ কথা সমান খাটিতেছে—যে, "প্রেমে চিত্ত-শুদ্ধি লাভ হয় না"; ঋণীর চিত্ত নির্ম্মল হইলে, সেখানে স্বতঃই সহজেই প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। সাধু মহাজনের উক্তি প্রসিদ্ধই আছে যে "শুদ্ধচিত্তে উপজয় পিরীতি রতন।" সুতরাং চিত্তশুদ্ধি ও ঋণ প্রাপ্তি,এই কারণ দ্বয়ের মিলন হইতে সর্ব্বত্র প্রেম জন্মিয়া থাকে। পরানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ দেহের সংসর্গ কামনায় ও তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ অনুধ্যানে, চিত্ত-শুদ্ধিলাভ হওয়াতে ব্রজগোপীগণের প্রাকৃত কামও অপ্রাকৃত নির্ম্মল প্রেমে পরিণত হইয়াছিল, এবং অহরহঃ তাঁহার সভয় ভাবনা প্রযুক্ত তাঁহার

শত্রুগণেরও সঙ্গতি লাভ হইয়াছিল, ভাগবতাদি শাস্ত্রে এরূপ অনেক উল্লেখ আছে। অধ্যাত্ম রামায়ণে (?) কুম্ভকর্ণ সঙ্গে রাবণের সীতাহরণ সম্বন্ধে যে কথোপকথন হয়, তাহাতে রামচন্দ্রেরই রূপ পরিগ্রহ করিয়া সীতাহরণ কার্য্য সমাধা করিলে, এতাদৃশ কোন অনর্থোৎপত্তি হইতে পারিত না; এরূপ ভাব ব্যক্ত হইলে, রাবণ উত্তর করিলেন যে, সে রূপ পরিগ্রহণ কিরূপে করিব? তাহার পৌর্ব্বাহ্নিক আয়োজন স্বরূপ সেইরূপ ধ্যানে ধরিতে গিয়া দেখি যে, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সুখৈশ্বর্য্য ঈশীত্ব ও ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত আমার তুচ্ছজ্ঞান হইতে লাগিল; সীতাসহবাসসুখ কোন ছার!!!

কু—"আনীতা ভবতা যদা পতিব্রতা সাধ্বীধরিত্রীসুতা,
স্ফূর্জ্জদ্রাক্ষসমায়য়া নচ কথং রামা সমর্জীকৃতং।
র—স্মর্ত্তুং চেতসি পুণ্ডরীক নয়নং দুর্ব্বাদল শ্যামলং,
তুচ্ছং ব্রহ্মপদং ভবেদনুদিনং পরবধু-সঙ্গ প্রসঙ্গঃ কুতঃ॥"

নির্ম্মল চিন্ময় দেহের এমনি পবিত্রকারিতা শক্তিই বটে!!! মলিন দেহ সংসর্গের কি মোহপ্রদ, মালিন্যপ্রদ শক্তি নাই? মলিন জাতীয় প্রেম কি মোহোৎপাদক নহে? সে প্রেমের নাম কি মোহ নহে? স্ত্রী পুত্রাদিতে নিঃস্বার্থ ভাবে আসক্ত হইয়া কি জীব বদ্ধ হয় না? মৃগ-শিশুতে আসক্ত হইয়া কি ভরত রাজার সাময়িক দুর্গতি লাভ হইবার কথা শাস্ত্রাদিতে প্রচারিত নাই?

৫১। মানুষ যেখানে পরমাত্ম-তত্ত্ব লাভ করিয়া, কৃষ্ণপ্রেমে দিবানিশি জর জর অঙ্গ, সেখানে সেই প্রেম কৃষ্ণপ্রেমিক মহাজনের ব্যষ্টিদেহ অতিক্রম পূর্ব্বক স্বভাবতঃই সর্ব্বব্যাপী—বিশ্বব্যাপী হইয়া বিশ্বজনীন প্রেমে পরিণত হয়। তখন তাহার নবীন পারমাত্মিক চক্ষে তাহার কৃষ্ণপ্রেমিক মহাজনের ব্যষ্টিগত ব্যবহারিক খণ্ডত্ব, সমষ্টিগত অখণ্ড সত্তাতে পরিব্যাপ্ত। তাহা তখন যাবতীয় ব্যষ্টি আধারগত—সর্ব্বাধারগত হইয়া প্রকাশ পায়। তখন তাহার ঋণভারের গুরুত্ব কেবল এক মাত্র ঋণদাতা মহাজনের ব্যষ্টি আধার সম্বন্ধে উপলব্ধি হইয়া ক্ষান্ত হয় না, কিন্তু যাবতীয় আধার সম্বন্ধে তাহার উপলব্ধি হওয়াতে সেই প্রেম অনন্ত অসীম আকার পরিগ্রহণ করে। তখন তাহার ঋণভারেরও সীমা নাই, প্রেম বিস্তারেরও সীমা নাই। তখন সে ঋণ নিত্যকাল অপরিশোধনীয় আকার ধারণ করিয়া অব্যাহত থাকে। বিশ্বজনীন নিত্য দাসত্ব-ব্রত অঙ্গীকার করিয়াও অনন্ত ভবিষ্যতে সেই দুরন্ত ঋণমোচনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণ-প্রেম।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীনাথ দত্ত।

নবযুগ।

(১)

বেজেছে নূতন বাঁশী জীবন-পুলিনে;
হৃদয়ে বিশ্বাস ভরি,
পুরাতনে পরিহরি,
এস সবে ত্বরা করি যে চাহ নবীনে;—
বেজেছে নূতন বাঁশী জীবন পুলিনে।

(২)

শুন, শুন প্রতিধ্বনি গভীর বিশাল,
সুরে সুরে ছাইতেছে আকাশ পাতাল!
কলির কলুষ প্রাণ
হ'য়ে গেছে অবসান,
দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া পুন সত্যকাল!"

(৩)

হের, ওই চরাচর উঠেছে জাগিয়া,
চৌদিকে আঁধার জাল পড়িছে খসিয়া।
আনন্দে অসীমে লুটে
ব্রহ্মাণ্ড চলেছে ছুটে,
নবযুগে নব গীতি গাহিয়া গাহিয়া।

(৪)

লাগিছে গানের ঢেউ আকাশের গায়,
অগণ্য তারকারাশি ফুটিতেছে তায়;
আহ্লাদে আপনা হারা
নব জন্ম ল'য়ে তারা
কি-যে-কি করিবে সবে ভাবিয়া না পায়।

(৫)

লেগেছে ধরার গায়ে বাঁশীর লহরী,
পুলকেতে কায়া তার উঠিছে শিহরি;
রোমাঞ্চ-ফুলের হাসি
ফুটিতেছে রাশি রাশি
নব আশা, নব ভাব প্রাণের ভিতরি।

(৬)

গুহা হ'তে শুনিবারে পেয়েছে তটিনী
জীবনের সমুখেতে নূতন কাহিনী;
গলিত নির্ঝর-ধারে
রোধিবারে নাহি পারে,
চলিয়াছে, ছুটিয়াছে কুল-বিপ্লাবিনী।

(৭)

একেবারে শত পাখী উঠেছে মাতিয়া,
শত কবি অশ্রুধারা ফেলেছে মুছিয়া।
বিমুক্ত হয়েছে বন্ধ,
গাঁথিয়া নূতন ছন্দ
সরল উচ্ছ্বাস শুধু দিতেছে ঢালিয়া।

(৮)

একিরে নূতন যুগে নূতন উচ্ছ্বাস!
শিশু মুখে অর্থপূর্ণ বচনের রাশ!
হেথা সখাগণ ভাষে,
হোথা সখীগণ হাসে,
বিশ্বপ্রাণে নবতর প্রেমের বিকাশ।

(৯)

দাঁড়ায়ে সমুদ্র তীরে মুগ্ধ কবিবর,
অসীমে বিস্তৃত তাঁর দৃষ্টির প্রসর,
পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞের মত
পড়িছেন অবিরত
বিশ্বের বিশাল কাব্যে সত্যের আঁখর!

(১০)

ছুটিয়াছে কোটী যাত্রী অনন্ত সঙ্গমে;
তীর্থযাত্রা নাহি শুধু বাঙ্গালী-ধরমে?
মোরা কি কীটের মত
ধূলি-আলিঙ্গনে রত
প'ড়ে রব মর্ম্মজ্বালা রুধিয়া মরমে?

(১১)

কোথা নব বৃন্দাবনে যমুনার তীরে
জগতের নাম ধ'রে কে ডেকেছে ধীরে;
জগৎ ছুটিছে তাই,
আমরাও চল যাই
ভাসায়ে এ মিথ্যারাশি বিস্মৃতির নীরে।

(১২)

গাও তবে, গাও আজি নূতনের জয়,
পুরাতন চ'লে যা'ক্, হউক বিলয়;
পশ্চাতে মর্ত্তের রাতি,
সমুখে স্বর্গের ভাতি,
এক ভাষা, এক ধর্ম্ম,—শান্তির আলয়।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

সুজা বাই

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর উষায় রাজপুতানা-বুঁদী রাজকুমারীর নির্ম্মম জীবন কাহিনী। বুঁদীরাজ্য তখন বীরত্বে বিখ্যাত, গৌরবগর্ব্বে উন্নত। এমন সময়ে রাজা নারায়ণদাসের গৃহে মাধুরীময়ী, কলহাস্য-পরায়ণা তন্বী সুন্দরী বালিকা সুজাবাই তাহার শৈশবের চঞ্চল সুন্দর শোভাখানি লইয়া পিতৃ গৃহের অন্তরঙ্গ অভিভাবক-আশ্রিত অনুগত সকলের সম্মুখে সর্ব্বদা ক্ষুদ্র পরী রাণীর মতন হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত।

বুঁদীরাজ নারায়ণদাস গৃহে যেমন স্নেহময় ছিলেন,তেমনি যুদ্ধ প্রতিভার জন্য তাঁহার দেশব্যাপী সুনাম ছিল। অনেক রণক্ষেত্রে তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া কীর্ত্তিমান হইয়া গিয়াছেন। রাজপুত রমণীরা গোধুম পেষণ করিতে করিতে মধুরকণ্ঠে, উদ্বেল হৃদয়ে তাঁহার অদ্ভুত বীরত্ব গাথা গান করিত; রাজ্যের অবাধ্য উশৃঙ্খল মন্দ লোকেরা রাজা নারায়ণদাসের শাসন ভয়ে সংযত থাকিত। তাঁহার সাহসের কথা শোনে নাই,তখনকার দিনে দেশে এমন কেহই ছিলনা। ভয় কাহাকে বলে, তিনি জানিতেন না!

কিন্তু একাধারে অনেক গুণের সমাবেশ সত্বেও সর্ব্বোপরি দোষ ছিল,অহিফেণ-সেবনাসক্তি। জীবনের ঐ এক কলঙ্ক ভিন্ন দ্বিতীয় দোষ কিছু ছিলনা। ইহারই বিষময় তন্দ্রালস প্রভাব তাঁহাকে সময়ে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিত। শারীর মানস অনেক বিষয়ে তিনি আত্মসংযমী ছিলেন, কিন্তু এই মন্দ অভ্যাসটীর এত বশ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ক্রমেই মাত্রা অধিক হইতে অধিকতর হইয়া চলিতেছিল। তবে, রাজা নারায়ণদাসের চরিত্রের দোষগুণ একত্র করিলে গুণের ভাগই যে অনেক অধিক হইয়া পড়ে,তাহাতে সন্দেহ নাই।

সুজা বাইয়ের জননী চিতোর রাজবংশের কুমারী কন্যাকে তিনি যেমন ঘটনায় লাভ করিয়াছিলেন,তাহা শুনিতে নিতান্তই কৌতুহলজনক। বুঁদী ও চিতোর, এই উভয় রাজবংশ তখন পরস্পর মধুর মিত্র-সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল; একের আবশ্যকে অন্যে প্রাণপণেও সাহায্য করিতেন। চিতোরের রাণা রায়মল্ল একবার পাঠানদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিরুপায়ের ভরসা, অসহায়ের সহায় রাজা নারায়ণকে সংবাদ দিবামাত্র তিনি সহস্রার্দ্ধ মনোনীত সৈন্যসঙ্গে বন্ধুর উদ্ধারে চলিলেন। বুঁদীর নগরদ্বার হইতে শস্ত্র সজ্জিত গর্ব্বিত সৈন্যশ্রেণী দৃঢ়পদক্ষেপে ক্রমাগতঃ রাজপথ বহিয়া গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হইল। ক্রমে মধ্যাহ্ন সময়ে সৈন্যদের আহার ও শ্রান্তিদূরের জন্য একটি ছায়া-শীতল গ্রাম মনোনীত হইলে,তখন বিশ্রামের জন্য রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল। অশ্বাবতারিত রাজা প্রথমেই তাঁহার প্রাত্যাহিক 'মৌতাতের' মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। পরে সময়ে আহারাদি শেষ হইল। এদিকে মৌতাত ধরিয়া উঠিয়াছে, নিদ্রিত না হইয়া তিনি আর পারেন না। অদূরবর্ত্তী একটী বৃক্ষছায়াস্নিগ্ধ সুন্দর স্থানে রাজা তখন রাজ-শয্যায় শায়িত হইলেন। এমন সুখস্বপ্নের ঘোরে যখন তিনি পাঠান জয় করিতেছিলেন, তখন অধরোষ্ঠ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং দন্তপাঁতি

ও শুষ্ক জিহ্বা নির্গত হইয়া পড়িয়াছে, কষ্ট শ্বাস একবার সশব্দে আর একবার নিঃশব্দে চলিতেছে এবং মক্ষিকাদল নিশ্চিন্তে রাজার মুখ ও ললাট অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এমন সময় ঐ গ্রামস্থ তৈলকারের যুবতী স্ত্রী বৃক্ষতলবর্ত্তী কূপে জল আনিতে কলসী কক্ষে সেখানে উপস্থিত। যুবতী জল ভরিল, কলসী কক্ষে তুলিল, পরে সে বিখ্যাত রাজা নারায়ণদাসকে দেখিবার কৌতুহলটীও ত্যাগ করিতে পারিল না। কিন্তু দেখিবামাত্র রমণীর স্ফূরিত অধর ও বিস্ফারিত নয়নে বিদ্রুপবিস্ময় চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে; আবার তাহা যেন মলিন হইয়া গেল, ধীরে সে বলিল,—"পোড়া কপাল আমাদের রাণার, ইহাঁরি ভরসায় আছেন, তবেই বিলক্ষণ!" কথাটী কহিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সবে সে পা বাড়াইয়াছে, অমনি সর্ব্বনাশ, রাজা নারায়ণদাস শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া পলকের জন্য একবার সেই বিদ্রূপপরায়ণা, গমনোদ্যতা যুবতীকে তীব্র অপাঙ্গ ভঙ্গীর সঙ্গে দেখিয়া লইলেন। পরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মর্দ্দানি, মৎ ভাগো!" ভয়-বিহ্বল রমণী আর অগ্রসর হইতে পারিল না, রাজা যাইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। তখন বিনা বাক্যব্যয়ে রাজা একখানি লৌহদণ্ড আনাইলেন। বুঝি মস্তক চুর্ণের ব্যবস্থায় অতবড় লোহার লাঠি আনা হইল, এই আতঙ্কের অতিশয্যে রমণীর মুখ ফুটিতেছিল না, শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিতেছিল। রাজা লৌহদণ্ড উঠাইলেন, পরে দুইদিকে দুইখানি হাত দিয়া অবলীলাভঙ্গে, অনায়াসে, লোকে যেমন নরম বেতের একখানি দীর্ঘ সরল লাঠির দুই প্রান্ত একত্র করে, তেমনি তিনি লৌহদণ্ড খানিকে ইচ্ছানুরূপ গোলাকার করিয়া ঠিক্ একটী হাঁসলীর মতন করিলেন। তাহাই রমণীর গলায় পরাইয়া দিয়া তাহাকে বলিলেন,—"আমার পুনরায় না আসা পর্য্যন্ত তুমি তোমারি যোগ্য এই সুন্দর অলঙ্কার পরিয়া থাক, আর ইহার মধ্যে যদি তোমার মনোনীত কোনও বীরপুরুষ ইহা খুলিতে পারেন, ভাল, রাজা নারায়ণদাস তাহাকে হাজার আসরফি এমদাদ্ দিবে।"—বিস্মিত, অনুতপ্ত, লজ্জিত রমণী রাজদত্ত অভিনব অলঙ্কার গলায় পরিয়া গৃহে গেল, এদিকে রাজা দ্রুতগতিতে চিতোরের দিকে অগ্রসর হইলেন। যথাকালে চিতোরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখেন, দুর্দ্ধর্ষ পাঠানেরা দলে দলে চিতোর নগর ঘিরিয়া আছে; প্রজাসাধারণ উৎপীড়িত, ধনধান্য লুণ্ঠিত, রাণা রুদ্ধদ্বার নগরে আবদ্ধ। তখন বিনাবাক্যব্যয়ে রাজা নারায়ণ দাস তাঁহার সুশিক্ষিত,সাহসী সৈন্যদল সঙ্গে পাঠান সৈন্যের উপর পড়িলেন। চিতোর হইতে নগর প্রাচীরের বাহিরে হিন্দু-মুসলমান সৈন্যের দারুণ যুদ্ধ কোলাহল শোনা গেল। অল্পকালের মধ্যেই বুঁদীরাজ সৈন্যের অমানুষিক সাহস ও সমর কৌশলে পাঠান সৈন্যদলের জয়কোলাহল বিস্পষ্ট আর্ত্তনাদে পরিণত হইয়াছে। একদল পলায়িত পাঠানসৈন্য তাড়িত পশুপালের মত প্রাণ বাঁচাইল। চিতোরের রক্তাক্ত পথ তখন পরিষ্কার হইয়াছে। উপকারী বীরবন্ধু বুঁদীরাজের জন্য তখন চিতোর নগরদ্বার আনন্দ আপ্যায়িত উৎসবের সহিত উন্মুক্ত হইয়াছে। বুঁদীরাজ চিতোরে উপস্থিত হইলে কৃতজ্ঞ মহারাণা প্রেমা লিঙ্গনের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার এই শুভাগমন উপলক্ষে সমুদায়

চিতোরনগরে উৎসবের উচ্ছ্বাস বহিতে লাগিল। রাজপথে পত্র-পুষ্প-পতাকার শোভা, পণ্যবীথিকায় লোহিত বস্ত্র ও ফুলমালার শোভা, জনতা স্রোতে স্ত্রীপুরুষ সকলের মুখে আনন্দচিহ্ন, প্রাসাদ ও পর্ণকুটীর সমস্তই সজ্জিত। রাজা নারায়ণের বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্যের এই বীরোচিত দৃষ্টান্ত, তাঁহার সাহস ও সমর কৌশলের কথা অবিলম্বে রাজান্তঃপুরের রমণীরা বিস্ময়-আনন্দ একাগ্রতার সঙ্গে শুনিলেন। ভারতে তখন স্বাধীনতার দিন, তখনকার শিক্ষা, তখনকার সাধনা, তখনকার মানুষের মনের ভাবের সঙ্গে এখনকার তুলনা হয় না। কুলবালারা সে সময়ে গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে বীরপুরুষের কীর্ত্তিকাহিনী গান করিত, কুমারী কন্যা সাহসী যোদ্ধাযুবকের কণ্ঠে বরমাল্য দান করাকে পরমলাভ মনে করিত। চিতোররাজান্তঃপুরে যখন সকলেই প্রশংসাকণ্ঠে রাজা নারায়ণের অপূর্ব্ব বীরত্বের কথা বলিতেছিল, তখন রাণা রায়মল্লের অনূঢ়া সুন্দরী ভ্রাতপুত্রী প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন "আমি রাজা নারায়ণের রাণী হইব, নতুবা আমরণ কুমারী রহিব।" বুঁদীরাজ কোনসূত্রে একথা শুনিতে পাইলেন। এবার তাঁহার ভাগ্যে যে একযাত্রায় একাধিক লাভ লেখা ছিল, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বীরবালার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া রাজা নারায়ণ দাসের শুষ্ক হৃদয়ে সহসা কেমন অজ্ঞাতপূর্ব্ব সুখের হিল্লোল বহিতে লাগিল। তিনিও তাঁহাকে লাভ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। রাণা আনন্দের সহিত এ বিবাহে সম্মতি দিলে অবিলম্বে জয়োৎসবের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহোৎসবের মধুর বাদ্য বাজিয়া উঠিল। রাণার অভিপ্রায়ে বিবাহোৎসবের এক অঙ্গও অপূর্ণ রহিল না। ক্রমাগতঃ কয়েকদিন পর্য্যন্ত রাজবাটীর লুচি মণ্ডা, পায়স পিষ্টক লোভে চারিদিকে দেহি দেহি রব উঠিল। নৃত্যগীতবাদ্যে নগর অশান্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে, যথাকালে, সকলের শুভ আশীর্ব্বাদ ও আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে বুঁদী রাজ তাঁহার নবপরিণীতা রাণী সঙ্গে আপনার রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে, এই উপলক্ষে রাজা নারায়ণদাস যে কুমারী তরুণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই সুজা বাইয়ের জননী।

যশস্বী বুঁদীরাজ নারায়ণদাস সুখে জীবন অতিবাহিত করিয়া ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক হইতে বিদায় হইলে, তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা সুজা রাজ্যের ভার গ্রহণে বাধ্য হইলেন। পিতার ন্যায় যদিও অমন অসাধারণ গুণগ্রামে অলঙ্কৃত ছিলেন না, তথাপি সেই অপূর্ব্ব শারীরিক ও মানসিক শক্তি তাঁহাতেও যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়াছিল। যে কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত ছিল, সেই আন্তরিক অনুরক্ত না হইয়া পারে নাই। তখনকার সমুদয় রাজপুত্রদিগের মধ্যে সকলে তাঁহাকে একজন সপ্রতিভ ও সৌজন্যপরায়ণ বলিয়া জানিত। আজানুদীর্ঘবাহু, কমনীয়কান্তি রাজা সুজার শরীর সৌষ্ঠবের কথা ইতিহাস একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাঁহার সুলক্ষণ ও সদগুণে মুগ্ধ আত্মীয় অন্তরঙ্গ এবং প্রজাপুঞ্জ সকলেই তাঁহার শোচনীয় পরিণামে ভগ্নহৃদয় হইয়া গিয়াছিল। বড় ইচ্ছা ছিল, আশ্রিত অন্তরঙ্গদের সুখী করিবেন, কিন্তু করাল কাল তাহা অপূর্ণ রাখিয়াছে। তাঁহার মূল্যবান জীবন প্রস্ফুটিত হইতে না হইতে

অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছিল; সেই সঙ্গে দেববালার ন্যায় রূপগুণবতী, নিরপরাধিনী বালিকা সুজাবাইয়ের সহিত দুর্ল্লভ সৌন্দর্য্যরাশি চিতাভস্মে পরিণত হইয়াছিল।

পিতার কথা মনে করিয়া রাজা সুজা চিতোর রাজবংশের সহিত পূর্ব্বভাব অব্যাহত রাখিতে অনিচ্ছা করিলেন না। চিতোরের তৎকালীন রাণা রত্নের একটী ভগ্নীকে তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন এবং তাহারি পরিবর্ত্তে রাণা রত্ন বুঁদী রাজকুমারী সুজাবাইকে পত্নী রূপে লাভ করিয়া সুখী হইলেন। এই দাম্পত্যমিলনফলে প্রথম কিছুদিন বড় সুখেই কাটিল। দেবদুর্ল্লভ রূপমাধুরীর অপূর্ব্ব আকর্ষণে সুজাবাইকে তাঁহার স্বামী তদ্গতচিত্তে ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল তাহাই নয়, তাঁহার মধুর কৌতুকপরায়ণ বিশুদ্ধ প্রফুল্ল স্বভাবে চিতোরের নবীন রাণা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়, সেই স্বভাবই যে কালস্বরূপ হইবে, কে জানিত? এ সুখভোগ যে অতি অল্প দিনের জন্য, তখন স্বপ্নেও কেহ ভাবে নাই। নিদারুণ নিয়তির নির্ম্মম মুহূর্ত্ত অবিলম্বে উপস্থিত হইল এবং আরও দুঃখের বিষয় সুজাবাইয়ের অকপট, সরল, স্বাভাবিক বিদ্রূপপরায়ণ অভ্যাসজনিত একটী সামান্য কথায় রাজস্থানে এই শোচনীয় বিয়োগান্ত নাট্যের অভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছে;—তাঁহারি সদাস্নিগ্ধ, মধুর কৌতুকহাস্যে তিনি..আপনি আত্মবিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

একবার রাজা সুজা চিতোরে আসিয়াছেন। সুজাবাইয়ের আনন্দ উল্লেখ করা বাহুল্য। এই উপলক্ষে তখন চিতোরের সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। ভ্রাতার এই আগমন উপলক্ষে সুজাবাইয়ের একদিন বড় সাধ হইয়াছে, অন্তঃপুরে স্বহস্তে আয়োজন করিয়া রাণা ও রাজা সুজাকে আহার করাইবেন। সেদিন শিশিরধৌত মল্লিকা ফুলের মতন প্রত্যুষেই স্নাত হইয়া সুজাবাই শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিলেন; তাঁহার আর্দ্র আলুলায়িত কৃষ্ণকেশরাশি পৃষ্ঠদেশ ছাইয়া পড়িয়াছে; উৎফুল্ল উৎসাহমনে সুজা রন্ধনশালার ভারপ্রাপ্ত রমণীদের সঙ্গে যোগদান করিয়া একাগ্রমনে রন্ধনশিল্পের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। অন্তঃপুরের অন্যান্য মহিলা এবং পরিচারিকারা তাঁহাকে এত পরিশ্রম না করিয়া কেবল পর্য্যবেক্ষণ করিতে অনুরোধ করিলে হাস্যমুখে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ভাই ও স্বামী যে সব দ্রব্য ভালবাসেন, তাহা স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে একবিন্দু ক্লান্তি প্রকাশ করিলেন না। রাজান্তঃপুরের সুবেশ সুন্দর পরিচারিকাগণ সযত্নে, সাগ্রহে তাহাদের রাজলক্ষ্মী রাণীর সঙ্গে ছায়ার ন্যায় থাকিয়া কাজ করিতেছে। মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত সুদৃশ্য আহার গৃহে পুষ্পগুচ্ছ ও মালার শোভা অপূর্ব্ব দেখাইতেছিল। সুপরিচ্ছিন্ন আহার স্থানে মূল্যবান বস্ত্রাসন বিছাইয়া সম্মুখে, পার্শ্বে আর্দ্র, স্নিগ্ধ, সুবাসিত সুন্দর পত্রপুষ্পশোভিত ফুলদানী সাজাইয়াছে। যথাকালে রাণা ও রাজা সুজা অন্তঃপুরে আসিলেন। তখন যেন মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা সুজাবাই আপনহস্তে একে একে বিবিধ খাদ্যপূর্ণ সুবর্ণ রজত পাত্র সকল তুলিয়া আনিয়া উভয়ের সম্মুখে সাজাইয়া দিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যবান শ্রীমন্ত গৃহের স্বর্গীয় পারিবারিক সুখদৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। বাহিরের শুষ্ক কঠিন রাজনৈতিক অশান্তি উদ্বেগ কোলাহল হইতে অবসর লাভ করিয়া

গৃহের এই অপার্থিব পবিত্র শোভা শান্তি এবং নিঃস্বার্থ সরল সযত্ন স্নেহের স্নিগ্ধ সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহারা উভয়েই বিশুদ্ধ সুখানুভব করিলেন, উভয়েরই মুখশ্রী আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু রাণা অশ্রান্ত উৎসাহিত সুজাবাইয়ের স্বেদকণাসিক্ত সুন্দর মুখখানির দিকে একবার তাকাইয়া দেখিয়া পরক্ষণেই পার্শ্ববর্ত্তী রাজা সুজাকে সম্বোধনে একটু বক্রভাবে কহিলেন,—"দেখ, আজ তোমার জন্যে মহারাণী কেমন পরিশ্রম করিতেছেন!" শুনিয়া ভাই ভগ্নী দুইজনেই নিতান্ত সরল মনে শুধু মৃদু হাসিলেন। উভয়ে আহারে বসিলে মক্ষিকার ভয়ে সুজাবাই তাঁহাদের নিকটে বসিয়া ধীরে ধীরে সুবাসিত স্নিগ্ধ পুষ্পবৃন্ত ব্যজন করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই আহার গৃহে সুজাবাই গল্পেসল্পে উভয়ের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে আহার-পরায়ণ রাণা ও রাজার বাক্যালাপ ও সুজাবাইয়ের প্রফুল্ল কণ্ঠস্বর এবং মধুর হাস্যধ্বনি শুনা যাইতেছিল। কিন্তু সেই আনন্দই সকলের শেষ আনন্দ এবং সুজাবাইয়েরও তাহাই শেষ হাসি। আহার শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় সুজাবাই কিছু কৌতুকের ভাবে এবং কিছু বা নিশ্চয়ভাবে বলিলেন,—"সুজা সিংহের মতন বীরোচিত আহার করিয়াছেন, আর মহারাণা যেন ছেলেখেলা খেলিয়াছে!"— এমন কৌতুক কথা কতজনে বলিয়া থাকে, কেহই কিছু মনে করে না, কিন্তু সুজাবাইয়ের এই কথায় রাণারত্ন আপনাকে দারুণ অপমানিত বোধ করিলেন। মনের এই অবস্থা তিনি সংযত করিতে পারিলেন না। সুজার কথার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মুখের ভাব আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সেখানে কাহারই বুঝিতে বিলম্ব হইল না, হিতে বিপরীত হইয়া উঠিয়াছে। রাণা ক্রোধারক্তিম নয়নে পত্নীর দিকে দেখিলেন, আবার তখনি ঘৃণার সঙ্গে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া রাজা সুজার দিকে তাকাইলেন। রাণার ক্রোধোদ্রেকের এই কারণটিকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিয়া রাজা সুজা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন এবং তিনি রাণাকে বলিলেন, তাঁহার ভগিনীর এই কথার মধ্যে কোনও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। তাহা মনে করাও অস্বাভাবিক। সুজার কৌতুকপরায়ণ স্বভাবের উহা একটি অগ্র-পশ্চাৎবিবেচনাহীন উক্তি বৈ আর কিছু নয়। পরন্তু, বড় অপরাধ করিলেও সুজা-বাইকে তাঁহার ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। সরল ভাবে ইহাই বলিয়া তিনি রাণাকে নির্ব্বন্ধা-তিশয়ে অনুরোধ করিতে লাগিলেন যেন এজন্য তিনি নিজগুণে সুজাকে ক্ষমা করেন। রাণা, অবশেষে স্বীকৃত হইলেন। স্বীকৃত হইলেন কিন্তু প্রাণের দারুণ জ্বালা জুড়াইল না। বাহিরে আপাততঃ শান্তমূর্ত্তি দেখাইলেন, কিন্তু রাজা সুজার সহিত তাঁহার তুলনার সেই কথাটী তাঁহাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতে লাগিল। এই ঘটনার পর রাজা যে কয়দিন চিতোরে রহিলেন, রাণার পূর্ব্ববৎ আপ্যায়িত আলাপের কোনই ত্রুটি হইল না। রাজা সুজা ক্রমে সে দিনের সে কথা ভুলিলেন, কিন্তু কুটিলস্বভাব রাণা রত্ন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, প্রতি-শোধ না লইয়া তিনি ছাড়িবেন না। সিংহের জীবনবিনিময়ে তাঁহার গৌরবগর্ব্ব রক্ষিত হইবে, নতুবা নহে।

অনুতপ্ত, ভ্রাতৃস্নেহময়ী সুজাবাইয়ের উদ্বেগের অন্ত নাই। "হায়, কেন বলিতে

যাইলাম” বলিয়া নিভৃতে নীরবে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। স্বামীর ক্রুদ্ধ স্বভাবের কথা তিনি জানিতেন, তাই তাঁহার পিতৃগৃহের একমাত্র স্নেহাবলম্বন, সমুদায় বুঁদী রাজ্যের একমাত্র আশা ভরসাস্থল রাজা সুজার অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নিরপরাধিনী শতবার, সহস্রবার আপনি আপনাকে ধিক্কার দিয়াছেন। এই ভাবে ক্রমাগত কয়েক দিন অতীত হইলে, রাজা সুজা নিরাপদে চিতোর হইতে গৃহে ফিরিবার পর,চিতোরে তাঁহার বুঁদী উপস্থিত সংবাদ আসিলে, সুজাবাই অপেক্ষাকৃত শান্ত হইলেন। তাঁহার প্রতি রাণার ব্যবহারেও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, পূর্ব্বেরই মতন তিনি স্বেচ্ছায় সুজার কক্ষে কাল কাটাইতেছিলেন। সুজাও ক্রমশঃ নিশ্চিন্ত হইতেছিলেন। আরও দিন গেল, ততদিনে ক্রমে সে কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু, রাণার হৃদয়ের সেই বিদ্বেষবিষ বিলুপ্ত হয় নাই ; অনুক্ষণ তাঁহার অভিসন্ধির সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই নির্ম্মম প্রতিহিংসাপরায়ণতায় কি ভয়ানক ফল ফলিবে, তিনি বারেকের জন্যও ভাবিলেন না ; এই অযোগ্য, অসঙ্গত ক্রোধের পরিণামে ভগ্নীটির কি অবস্থা হইবে, সে চিন্তাও মন হইতে মুহূর্ত্তের মধ্যে মুছিয়া ফেলিলেন। রাজ্যাধীশ্বর তিনি মোহের অধীন হইয়া স্বেচ্ছায় আপনি পুড়িয়া মরিলেন, অন্যকেও নিরপরাধে নষ্ট করিলেন ;—সেই সঙ্গে সর্ব্বনাশের সহিত সহসা বিস্তীর্ণ রাজ্যময় একটী মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন-কোলাহল জাগিয়া উঠিল।—শীতাবসানে সুন্দর বসন্ত ঋতু তাহার নবীন মধুর পরিপূর্ণ শোভাসম্পদরাশির সঙ্গে পৃথিবীতে দেখা দিল, কিন্তু হায় সেই বিবিধবিহঙ্গকাকলিগীতমুখরিত, সুবাসিত, ফুল্লকুসুমিত বনভূমির অন্তরালে যেন অদূরবর্ত্তী ভবিষ্যতের কি একটী নিদারুণ বিষাদবেদনার মর্ম্মান্তিক করুণাপ্লুত আভাষ লুকাইয়া ছিল, কেহই দিন থাকিতে তাহা জানিল না!

এমন সময় রাণা রত্ন একদিন রাজা সুজার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, “বসন্তোৎসব উপস্থিত, তিনি স্বীকৃত হইলে উভয়ে একত্রে কয়েক দিন মৃগয়ার আনন্দ ভোগ করিতেন। বুঁদীরাজের বিখ্যাত অরণ্যে এ অভিলাষ যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হইতে পারে।”—সংবাদ পাইবা মাত্র উদারবুদ্ধি, সরলপ্রাণ রাজাসুজা আনন্দ আপ্যায়িতের সঙ্গে রাণা-রত্নকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারি অধিকার মধ্যে চম্বল নদীর পশ্চিম দিকে উচ্চ পর্ব্বতের পাশে পাশে বহুদূরব্যাপী মহারণ্যশ্রেণী রাজকীয় মৃগয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই মহাবনে নানাবিধ ভয়ানক হিংস্রজীব জন্তুর অভাব ছিল না। নির্ভীক দুর্দ্দান্ত জন্তু হইতে নানা জাতীয় বিচিত্র সুন্দর হরিণ এবং খরগোস দলে দলে বিচরণ করিত। ইহাদের দিবানিশি অবিরাম সশব্দ ক্রীড়ায় সমুদায় বন প্রদেশ আন্দোলিত হইত। তাহারি মধ্যে সাহসী পুরুষেরা অস্ত্রসজ্জিত হইয়া মহানন্দে বীরবিক্রমে সিংহ-শার্দ্দূল-ভল্লুক বরাহমহিষ প্রভৃতি বিবিধ হিংস্রজন্তুকে কখন বা অস্ত্রে এবং কখন বা একাকী বাহুবলে বিনাশ করিতেন। মৃগয়াক্রীড়ায় রাজপুতের যেমন তন্ময়তা,এমন আর কিছুতেই নয় ; এই উপলক্ষে তাহারা সকলই ভুলিয়া যাইত।

যথাসময়ে সেই বনের একস্থানে রাণা এবং রাজাসুজার উভয় দলে দেখা হইলে কোনও মনোনীত স্থান শিবির সন্নিবেশের

জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। সে দিন সেই মহারণ্য মধ্যে চারিদিকে সৈন্য ও শিবির বেষ্টিত স্থানে অস্ত্র সজ্জিত রাজাসুজা তাঁহার ভগিনী-পতিকে সাদর আহ্বানে গ্রহণ করিতে অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন; তাঁহার বীরত্বোজ্জ্বল নবীন মুখশ্রীতে এই উপলক্ষে আনন্দ ও উৎসাহ চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছিল। উভয়ে সাক্ষাৎ হইবামাত্র রাজাসুজার ন্যায় রাণা রত্নও আপ্যায়িত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পরদিন মৃগয়ার আনন্দ উপভোগ আশায় রাজাসুজা নিশীথে শিবির মধ্যে সুখকল্পনা করিতেছিলেন, আর একদিকে ক্রূর, ক্রুদ্ধ, দুর্ভাগ্য রাণা তাঁহার ধ্বণিত অভিসন্ধির কৃতকার্য্যতা অদূরবর্ত্তী ভাবিয়া অধীর আনন্দে নিদ্রাহীন রজনী অতিবাহিত করিতেছিলেন। ক্রমে নিশাবসানে সকলে জাগ্রত হইল। বুঁদী ও চিতোর রাজের সঙ্গে যে ক্ষুদ্র সৈন্যদল আসিয়াছিল, তাহাদিগকে অরণ্যের ভিন্ন ভিন্ন দিকে মৃগয়া করিবার অভিপ্রায় দিয়া রাজাসুজা ও রাণা-রত্ন নির্দ্দিষ্ট কয়েকটিমাত্র শরীর রক্ষক সঙ্গে অবিলম্বে প্রস্তুত হইলেন। দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী সৈন্যদের উৎসাহ শব্দ ও আলোড়নে ও তাহাদের দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত, আঘাতিত জীবজন্তুর আর্ত্তনাদে বনভূমি চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই মহানন্দোচ্ছ্বাসের দিনে রাজা হইতে সামান্য সৈনিক পর্য্যন্ত সকলেই আপনাপন শীকারে ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক, কাহারও দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। যে কয়জন মুষ্টিমেয় অশ্বারোহী শরীররক্ষক রাণা ও রাজাসুজার সঙ্গে ছিল, তাহারা দুইজনের নিকটে থাকিয়াও, মৃগয়ার কোলাহলোচ্ছ্বাসে অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছে। সেই বিরাট বনভূমিমধ্যে যখন বীরবাঞ্ছিত মৃগয়ার এই মহামহোচ্ছ্বাস বহিতেছিল, তখন অল্পক্ষণের মধ্যে রাণা ও রাজা পরস্পর একটু সরিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ দৃষ্টিরন্তরাল হইয়া যান নাই। ঠিক্ এমনি সময়ে রাণা তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী একজনকে উন্মত্তের মতন চীৎকার স্বরে বলিলেন,—"বড় শীকারের এইত এখন সময়!" বলিয়াই সেই হিতাহিত বুদ্ধিহীন, ক্রূর, ক্রোধাতুর, পামর রাণা রাজাসুজাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার অব্যর্থ শরসন্ধান করিল। রাজাসুজার ভাগ্যে নিরীহ হরিণ শিশুর ন্যায় ব্যাধহস্তে মৃত্যু লেখা ছিল না, তাই সৌভাগ্যবশতঃ সহসা তিনি বিস্ময়-চকিত দৃষ্টিপাতে দেখিতে পাইলেন, রাণার নিক্ষিপ্ত শর মুহূর্ত্তে তাহাকে নষ্ট করে। নিমেষের মধ্যে রাজা সুজা আশ্চর্য্য কৌশলে হাতের ধনুক সম্মুখে উঠাইলেন, আর তখনি তাহাতেই সবলে প্রতিহত হইয়া বিষাক্ত তীক্ষ্ণ মারাত্মক শর ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। তখনও, এমন ভয়ানক অবস্থাতেও, উন্নত উদারবুদ্ধি রাজা সুজা নিশ্চয় বোধ করিলেন, সহসা অন্যমনস্কতায় রাণার মনোবুদ্ধির অগোচরে ইহা ঘটিয়াছে; কিন্তু আবার—তখনি সুজা বিস্মিত, ব্যথিত, ব্যাকুল ভাবে দেখিলেন, কোন ভয়ানক চক্রান্তফলে আজ হত্যাকারীদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছেন, হায়, রাণা-রত্ন তাহারি একজন!

দেখিতে দেখিতে আর একটী—আরো একটী তীর আসিয়া পড়িল। রাজা সুজা আপনাকে রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইতেছেন, এমন সময় আর কালগৌণমাত্র না করিয়া বিমূঢ় রাণা উন্মত্ত ঝড়ের মতন ঘোড়া ছুটাইল, অমনি দেখিতে দেখিতে উলঙ্গ তরবারী দ্বারা রাজাকে অতি গুরুতর

আঘাত করিল। রাণার এই অমানুষিক উদ্যম দেখিবামাত্র রাজা সুজা বিস্ময় এবং মনোবেদনায় ক্ষণেকের জন্য আত্মহারা হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার এতদিনের প্রিয় ভগিনীপতিকে একটী কথা জিজ্ঞাসারও অবসর পাইলেন না; অস্ত্রের দারুণ আঘাতে অবসন্ন, মূর্চ্ছিত ও অশ্বপৃষ্ঠ হইতে সশব্দে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার জ্ঞানের সঞ্চার হইল; মারাত্মক আঘাতে কাতর, রক্তাপ্লুত, ধূল্যবলুণ্ঠিত রাজাধিরাজ বুঁদীশ্বর একবার চোখ মেলিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন, অন্তিমকালে নিকটে তাঁহার কেহই নাই, অদূরে পরম শত্রু ভগিনীপতি অশ্বারোহণে পলায়ন করিতেছে। তখন তাঁহার জ্যোতিহীন নয়ন ও শোণিতশূন্য শুভ্রমুখে অব্যক্ত অনুতাপ যাতনা-চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল; সেই রক্তাক্ত অবসন্ন শরীরে সবলে উঠিতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। কিন্তু তখনি দারুণ কষ্টকর প্রয়াসের সঙ্গে তীব্রকণ্ঠে পলায়মান রাণাকে পাপী, কাপুরুষ সম্বোধনে তাহার বাহুবল পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। রাণা রত্ন ফিরিয়া দেখিল। দেখিল সে যা চায়, তাহা তখনও শেষ হয় নাই। অশক্ত, দুর্ব্বল রাজা সুজা ভূমি শয্যায় অর্দ্ধোপবেশনে থাকিয়া তাহাকে তখনও অপমান বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, ইহা তাহার অসহ্য বোধ হইল। পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া সে রাজা সুজাকে শেষ অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় মৃতকল্প, প্রতিশোধ-পিপাসু রাজাসুজা তাঁহার অন্তিম কর্ত্তব্যের অনন্যসাধারণ প্রয়াসের সহিত অশ্বারোহী রাণাকে অতি বলে আকর্ষণ করিলেন। শত চেষ্টা করিয়া রাণা স্থির থাকিতে পারিল না, মাটীর উপর পড়িয়া গেল। তখন উভয়েই ভূশয্যায়, কিন্তু রাণা আঘাতিত অথবা কোন অংশেই অবসন্ন নয়, তথাপি মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজাসুজা কি এক অসম্ভব শক্তি অনুভব করিয়াছেন, তিনি হত্যাকারী, কাপুরুষ, বিভ্রান্ত রাণাকে নীচে ফেলিয়া তখনি তাহার উপরে যাইয়া পড়িলেন। যাতনা-কাতর তিনি অসীম ধৈর্য্য এবং কৃতনিশ্চয়তার সঙ্গে তখন রাণার বুকের উপর উঠিয়া বসিয়াছেন। রাণা দৈত্যবল প্রকাশ করিয়াও সে অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না। তখন রাজাসুজা একহস্ত রাণার কণ্ঠ আকর্ষণে, আর একহস্ত ছোরার জন্য প্রসারণ করিলেন। আলোক-রশ্মিপাতে সুশাণিত অস্ত্র জ্বলিয়া উঠিল, তখনি দৃঢ়হস্তে হতভাগ্য রাণার বক্ষে তাহাই আমূল বিদ্ধ করিলেন! বিকৃত মৃত্যু যাতনা-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য ক্রোধাতুর চিতোরাধিপতির জীবন-রঙ্গমঞ্চের যবনিকা পতিত হইল। পরানিষ্ট সাধনের জন্য এত দিনের অস্থিরতা, উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তা এ সকলেরই অবসান হইয়া গেল। ঐ যে রাজা সুজার হাতের ছুরিকা হস্তচ্যুত হইয়াছে, আবার তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিয়াছেন, এবারে তাঁহারও প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল; শান্ত, তৃপ্ত, প্রফুল্লমুখে তিনি ভগিনীপতির জীবনহীন দেহের উপর নীরবে পড়িয়া গেলেন। এইরূপে "সিংহের জীবন বিনিময়ে" রাণা রত্নের সব সাধ মিটিল।

সকলের মনোবুদ্ধির অগোচর এই নিদারুণ ঘটনায় উভয় রাজ্যের সমবেত হাহাকার ও ক্রন্দন কোলাহল বর্ণনার অতীত। এই অসম্ভব ভয়ানক দুর্ঘটনার সংবাদে দেশের বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী যে যেখানে ছিল, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিল

না। কিন্তু তাহারি মধ্যে দুইটি প্রাণীর মনোবেদনার সঙ্গে আর কাহার তুলনা? দারুণ শোকসন্তাপে তাঁহাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। চিতোর ও বুঁদী রাজান্তঃপুরের দুইটি নিরপরাধিনী অবলা তাঁহাদের অকলঙ্ক জীবনের উষাকালে একই দিনে উভয়ে উভয়ের অনন্যাবলম্বন প্রাণাধিক পতি ও ভাই হারাইয়া সংসারের অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও নিতান্ত আশ্রয়হীন ও মন্দভাগ্য বোধ করিতেছিলেন। সর্ব্বোপরি, হতভাগিনী সুজাবাইয়ের কোমল প্রাণ অসহ্য শোক সন্তাপের সঙ্গে অনুতাপে পুড়িয়া যাইতেছিল। কুক্ষণে অন্তঃপুরে সেই আহারের অনুষ্ঠান, কুক্ষণে সুজাবাইয়ের সেই কথা। না বলিলে নিতান্তই এমন সর্ব্বনাশ হইত না!

পরিতাপের এই খানেই অবসান হয় নাই। সুজাবাই প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয়া হইয়াছেন। চির-আনন্দ-কৌতুকময়ীর উজ্জ্বল মুখশ্রী আজ গভীর বিষাদ ছায়ায় আচ্ছন্ন। জীবনের কেবল মধ্যাহ্নে তাঁহার সমুদায় সুখসাধ বিদায় দিয়া যে শৈলসঙ্কুল মহাবনে তাঁহার প্রাণাধিকেরা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেইখানে, তাঁহাদের পার্শ্বে আপনাকেও বিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হইলেন। অপার্থিব মহিমাময়ী, কৃতনিশ্চয়া সুজাবাইকে সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিতে কাহারও সাধ্য হইল না। আর রাজা সুজার প্রেমময়ী পত্নী যিনি ভাগ্যক্রমে দেবোপম স্বামীকে তাঁহার ইহ পরকালের অবলম্বন মনে করিয়া সুখে দিনপাত করিতেছিলেন, তিনিও সহসা মর্ম্মভেদী অশ্রুপাতের সঙ্গে সুজাবাইকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"তোমার পায়ে পড়ি আমায় ফেলিয়া তুমি একাকিনী মরিতে যাইও না। এ অভাগীকেও সঙ্গে লইয়া যাও।"—রাজাসুজার সেই স্নেহ প্রেম-পুত্তলীকে সুজা ফিরাইতে পারিলেন না। দুই জনের নিকটই পৃথিবী তখন অন্ধকার, দুই জনেরই সাধ আহ্লাদ সব পুড়িয়া ভস্মীভূত; ধীরে ধীরে তাঁহারা তখন পতিগৃহ, পিতৃগৃহ, আত্মীয়, স্বজন, আশ্রিত, ভৃত্য সকলের নিকট নিঃশব্দে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সে দিনের শোকাশ্রু মুছিতে না মুছিতে আবার অভিনব অশ্রুজলে সকলের বুক ভাসিয়া গেল।

হায়, নন্দাত্যের মহাবন! যেখানে রাজাসুজা ও রত্নের দেহাবশেষ তখনও যেমন তেমনি ছিল, সেইখানে আর এক চিতাগ্নি সহস্র লোহিত লোল জিহ্বা বিস্তারে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সিঁথীতে সিন্দুরবিন্দু ও আভরণভূষিত দুইটী নিরপরাধিনী নিরুপমা অনায়াসে, অম্লানমুখে প্রাণাধিকের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। অপূর্ব্ব, অতুলনীয় রূপ যৌবন-মাধুরী মুহূর্ত্তে ছাই হইয়া গেল!

শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

বিদেশী বাঙ্গালী। (৬)

লালা বাবু।

জন্মাবধি যে ব্যক্তি কাঙ্গাল, তাহাকে আর কাঙ্গাল সাজিতে হয় না। মাতৃগর্ভ হইতেই যে ব্যক্তি চক্ষুহীন হইয়া জন্মিয়াছে, তাহার আর অন্ধ সাজিয়া ফল কি? ভাগ্যদোষে বাল্যাবস্থা হইতেই যে ব্যক্তি নিঃসম্বল, কপর্দ্দকশূন্য এবং ছিন্ন কন্থাবৃত, তাহার পক্ষে বৈরাগ্য অবলম্বন করা বড় কঠিন কথা নহে;

দরিদ্রতা যাহাকে স্বাভাবিক বৈরাগী করিয়াছে, তাহাকে আর নূতন করিয়া বৈরাগ্যব্রতে দীক্ষিত হইতে হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল কুসুমশয্যায় উপবিষ্ট হইয়া সুবর্ণ মুকুটে মস্তকাচ্ছাদন পূর্ব্বক অতুল প্রতাপের সহিত রাজকীয় সুখ স্বচ্ছন্দতা ভোগ করেন, তাঁহার পক্ষে সহসা বৈরাগ্য অবলম্বন করা বাস্তবিক আশ্চর্য্য এবং অসাধারণ কথা বলিতে হইবে। যাঁহার প্রসূনতুল্য কোমল পদে কখনও কণ্টক স্পর্শ করে নাই, জগতের 'দুঃখ ও অভাব' যাঁহার কাছে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই, তিনি কেন বৈরাগী হইবেন? খণ্ডসুখ পরিত্যাগ করিয়া যিনি অখণ্ডসুখের জন্য লালায়িত হয়েন, ক্ষণভঙ্গুর জীবনের তুচ্ছ সুখের দিকে না তাকাইয়া যিনি অনন্ত জীবনের অনন্ত সুখের দিকে আধ্যাত্মিক চক্ষু উন্মীলন করেন, তিনিই প্রকৃত বৈরাগী এবং তিনিই প্রকৃত ফকির। কোনও বিশিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গীতপুস্তকে জনৈক মহাপুরুষ গাহিয়াছেন—

"ফকিরি করবি? পারবি তো মন?
ফকিরি নয় সামান্য, হ'তে হয় দীন দৈন্য
ফকির ছিল শ্রীচৈতন্য,
যাঁর ধর্ম্মেতে জীবন।
ফকিরি কোর্ব্বি—কিন্তু পার্ব্বি তো মন?"

এই প্রস্তাবের শীর্ষদেশে যে প্রসিদ্ধ মহাত্মার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি বাস্তবিক এক প্রকৃত বৈরাগী ছিলেন। তীব্র বৈরাগ্য তাঁহার জীবনের রমণীয় ভূষণ ছিল; পারলৌকিক উন্নতির জন্য ইহলৌকিক সুখকে বিসর্জ্জন করিয়া তিনি তীব্র বৈরাগ্য ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এরূপ মহাত্মা সচরাচর মিলে না, এমন আশ্চর্য্য "ফকির" সহজে পাওয়া যায় না। যাঁহারা বৃন্দাবনে গিয়াছেন, অথবা বৃন্দাবনের বিবরণের পাঠ করিয়াছেন, লালা বাবুর পরিচয় তাঁহাদের নিকট নূতন নহে। এই মহাত্মা অতুল ধন ধান্য, সুন্দর সম্পত্তি, ইন্দ্রাবতী তুল্য গৃহ, ইন্দ্রজিৎ তুল্য পুত্র, অতুলনীয় প্রভুত্ব, দেব-দুর্লভ সাংসারিক সুখ, গন্ধর্ব্বকুলবাঞ্ছিত সোণার সংসার, এ সকল অসার শুষ্ক তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া, দরিদ্রতর হইতে দরিদ্রতম অবস্থায় ধর্ম্মজীবন যাপন করেন। সুদূর অযোধ্যা এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে লালা বাবু "অবতার" বলিয়া খ্যাত; বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা এখনও বালক বালিকাদিগের সম্মুখে বসিয়া লালা বাবুর উপকথা, লালা বাবুর কাহিনী, লালা বাবুর "ভজন" (সঙ্গীত), লালা বাবুর দোঁহা, লালা বাবুর জীবনী প্রভৃতি শুনায়। ধন্য লালা বাবু! তোমার স্বর্গস্থিত আত্মায় পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ পড়ুক!

এই প্রস্তাবের মহাপুরুষ লালা বাবু নামে বিখ্যাত হইলেও, তাঁহার আদি নাম লালা বাবু নহে। ইহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। যে সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশের ইনি বংশধর এবং যে প্রাচীন হিন্দুবংশের ইনি মুখোজ্জ্বল করেন, সেই বংশের কিছু পরিচয় না দিলে, লালাবাবুকে আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না।

কলিকাতার উত্তরে প্রসিদ্ধ পাইকপাড়া পল্লীতে বহুপ্রাচীন কাল হইতে এক অতি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশ "পাইকপাড়ার রাজবংশ" বলিয়া সুপরিচিত। এই উত্তররাঢ়ী কায়স্থ বংশের আদিপুরুষ দিল্লীতে মোগল সম্রাটের অধীনে অতি উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন, ক্রমে এই বংশের লোকেরা দিল্লির সম্রাটের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার নবাব

সাহেবের মন্ত্রীত্ব প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে থাকেন। ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস সাহেবের (পার্লা-মেণ্টে) বিচার কালে সুমতি বর্ক সাহেবের মনোমোহিনী বক্তৃতামালায় যে অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ও অতুলনীয় প্রভুত্বশালী দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নাম বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে,তিনি এই বংশ-আকাশের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন ; এবং সে দিন যে যুবাপুরুষ একটা মার্জ্জার ও মার্জ্জারীর বিবাহে তিনলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কলিকাতা নগরবাসীবর্গকে উচ্চহাস্য হাসাইয়াছিলেন, সেই উচ্ছৃঙ্খলচেতা যুবকও এই বংশের বংশধর। বলা বাহুল্য, সুপ্রসিদ্ধ লালা বাবু এই রাজবংশেরেই অন্যতম নেতা ছিলেন। এই কায়স্থবংশ "সিংহ" উপাধিতে খ্যাত। এই বংশ চিরকালই ধনধান্যে পরিপূর্ণ এবং এই বংশের লোকেরা চিরকালই রাজসম্মানে সম্মানিত।

লালা বাবুর বাল্যকালের বিবরণী আমরা পাই নাই। যৌবনকালের জীবন সম্বন্ধে যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহার মধ্য হইতে সত্য নিষ্কাষণ করা বড়ই দুষ্কর। এই সময়ের কথা লইয়া অনেকে অনেক প্রকার অভিমতি দিয়াছেন। যাঁহারা নিন্দাযোগ্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন,তাঁহারা এ পর্য্যন্ত নিন্দার কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ দিতে পারেন নাই। এত বড় লোকের জীবনী সম্বন্ধে নিন্দার কথার বিশেষ বিশ্বাস যোগ্য সুপ্রমাণ না পাইলে, আমরা পত্রস্থ করিতে সম্মত নহি। শোনা কথা সোণার ন্যায় সহসা কেমন করিয়া গ্রহণ বা বিশ্বাস করিতে পারি? কিন্তু একথা বলা বাহুল্য, যাঁহারা দুই একটা কথা লইয়া নিন্দাযোগ্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন "লালা বাবুর নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্মজীবন, বাঙ্গালী জাতির পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন এবং অতুল।"

লালাবাবুর সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথা আমরা তাঁহার নিজের উক্তি হইতে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। বৃন্দাবনে গিয়া বৈরাগীর জীবন যাপন করিবার সময়ে, তিনি নিজে বলিয়াছেন :—

"যে সময়ে আমি আমাদের বাটীর নেতা অর্থাৎ কর্ত্তা ছিলাম, সে সময়ে আমাকে সাহায্য করিবার কেহই ছিলনা, সকল কর্ম্ম নিজের হাতে করিতে হইত, নিজের চক্ষে দেখিতে হইত। আমিও নিজের হাতে কাজ করিতে ভাল বাসিতাম। দেওয়ান, নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি ছিল বটে, কিন্তু কাহারও হাতে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না। অন্দরের সাংসারিক কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বাহিরের কাছারীর এবং বিস্তৃত জমিদারীর সমুদয় কর্ম্মই আমি নিজে করিতাম। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত গাধার ন্যায় খাটিতাম, মাথার স্বেদ পায়ে পড়িত, তথাপি কর্ম্মের শেষ হইত না, সুতরাং ধর্ম্মালোচনার অবকাশ ছিলনা। সায়াহ্নে মুখ হাত ধুইয়া শয্যার গদিতে বসিয়া তুলসী অথবা পদ্মকাষ্ঠের মালাটি লইয়া কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত 'রাম' 'রাম' অথবা কৃষ্ণ কিম্বা হরি হরি উচ্চারণ করিতাম, তদনন্তর গৃহ দেবতার মন্দিরে গিয়া দেবমূর্ত্তি দর্শন করতঃ অন্দরে ফিরিয়া আসিতাম। কখন কখন ভাগবৎ বা রামায়ণ অথবা মহাভারত শুনিতাম, কখন বা বৈষ্ণবদিগকে ডাকাইয়া হরি সংকীর্ত্তন করিতাম।"

তিনি আরও বলিয়াছেন,"ধর্ম্মালোচনার সময় ছিল না বটে, কিন্তু তজ্জন্য চিন্তিত অন্তঃকরণে জীবন যাপন করিতাম। সময়ে সময়ে চিত্তের শান্তি নষ্ট হইত, কখনও বা গোপনে কাঁদিতাম, কখনও বা বিলক্ষণ দুঃখের সহিত আহার করিতে বসিতাম, ভাবিতাম, পশুর ন্যায় পেট ভরিতেছি, কিন্তু আত্মার জন্য কিছুই করিতেছি না।" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এইরূপে তাঁহার সাংসারিক জীবন অতিবাহিত হইত।

আমাদের দেশের বড় বড় ধনবান তালুকদার বা জমিদারেরা স্বচক্ষে আপনাদের বিস্তৃত জমিদারী প্রায়ই দেখেন না। লালা বাবুও এ পর্য্যন্ত নিজের চক্ষে জমিদারী দেখেন নাই। বাটী হইতে অনেক দিন অনুপস্থিত থাকিলে কর্ম্মের বিশেষ ক্ষতি হইবে ভাবিয়া নিকটস্থ জমিদারী গুলি স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দেওয়ানকে ডাকাইয়া বলিলেন, "চব্বিশ পরগণার কয়েকটা প্রধান প্রধান জমিদারী দেখিবার ইচ্ছা আছে, অতএব আমার যাতায়াতের বন্দোবস্ত কর।" আজ্ঞা পাইবা মাত্র, দেওয়ানজী লালাবাবুর সম্মানযোগ্য বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন করিলেন। যথা সময়ে লালাবাবু জমিদারী দেখিতে রওনা হইলেন। সুপ্রিয়া সহধর্ম্মিণীর নিকটে যথাবিধি বিদায় গ্রহণ করিয়া লালাবাবু শিবিকায় আরোহণ করিলেন। প্রমীলারূপী সহধর্ম্মিণীর "বামেতর নয়ন নাচিল।" লালা-সহধর্ম্মিনী বুঝিলেন না যে, এই বিদায়ই শেষ বিদায়; তিনি জানিতে পারিলেন না যে, তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর স্বামীকে তিনি আর দেখিতে পাইবেন না। লালাবাবু পাল্কীতে চড়িয়া চলিয়া গেলেন, পাল্কী অদৃশ্য হইল, সহধর্ম্মিণী অট্টালিকার ছাদ হইতে নীচে আসিয়া গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্তা হইলেন। একমাস কাল পর্য্যন্ত জমিদারী দেখিয়া লালাবাবু পাইকপাড়ায় ফিরিয়া আসিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন, সহচর ও সেবকদিগকে যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করিবার জন্য আদেশ দিলেন, আগমনের বন্দোবস্ত যথারীতি শেষ হইল। সঙ্গে পাল্কীবাহক আট জন বেহারা, চোপ্দার, আড়দালী, চাপরাসী, চাকর, খানসামা, পাচক ব্রাহ্মণ, গোমস্তা, নায়েব, তরবারীবাহী হিন্দুস্থানী পাইক, লাঠিবাহী গ্রাম্যলাঠিয়াল প্রভৃতি মেদিনী কম্পিত করিয়া চলিল। সুবর্ণ ও রৌপ্য-খচিত মনোমোহক শিবিকায় আরোহণ করিয়া গৃহাভিমুখে কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ রওয়ানা হইলেন। বৈশাখ মাস, গ্রীষ্মকাল, অত্যন্ত গ্রীষ্ম, অনেক দিন বৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং প্রাতেঃ, অপরাহ্ণে এবং রাত্রিতে পাল্কী চলিত, রৌদ্রের সময় যাত্রীরা বিশ্রাম লাভ করিত। পাল্কী আসিতে আসিতে হঠাৎ একস্থানে থামিয়া গেল; শিবিকাভ্যন্তর হইতে লালাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "পাল্কী থামিল কেন?" ভৃত্যেরা বলিলেন, "হজুর! পাল্কী যাইবার পথ নাই।" ঘুরাইয়া লইয়া গেলে অন্য পথ দিয়া যাইতে হয়।" লালাবাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "এখানে কি মোটেই রাস্তা নাই?" নায়েব উত্তর দিল "মহাশয়! একটা রাস্তা আছে কিন্তু ঐ রাস্তা দিয়া যাইতে হইলে জনৈক গৃহস্থের বাটীর ভিতর দিয়া যাইতে হয়।" লালাবাবু বলিলেন, "গৃহস্থটা কে, তাহার অনুসন্ধান কর।" অনুসন্ধানে জানা গেল, যাহার বাটীর ভিতর দিয়া রাস্তা, সে লোকটা একজন রজক অর্থাৎ ধোবা। শিবিকাভ্যন্তর হইতে হুকুম হইল, "ক্ষতি নাই, এই বাটীর অন্দরস্থ পথ দিয়াই পাল্কী লইয়া চল; দেখিও তোমরা কোনরূপ অত্যাচার অথবা গোলমাল কিম্বা অভদ্র ব্যবহার করিও না।" মুহূর্ত্ত মধ্যে ঐ বাটীর মধ্যে শিবিকা প্রবেশ করিল। তখন অপরাহ্ণ শেষ হইয়াছে, সন্ধ্যার প্রথম অবস্থায় প্রকৃতি সুন্দরীর মলিন মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। রজকের বাটীতে পাল্কী প্রবেশ করিলে লালাবাবু দেখিলেন, তিনদিকে কয়েকটা

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটীর, এক দিক খালি, মধ্যে এক অনতিবিস্তৃত অথচ প্রশস্ত সমতল ভূমি খণ্ড, ইহার স্থানে স্থানে কদম্ব, বকুল, পলাশ, টগর, রঙ্গণ প্রভৃতি ফুলের গাছ; ইহাই ধোবার বাটীর "উঠান" (yard) অথবা "ছত্র"। এই রমণীয় এবং পরিষ্কার ভূমিখণ্ড দেখিয়া লালাবাবু পাল্কী হইতে নামিলেন এবং একটা গাছের তলে গালিচা প্রসরণ করিয়া তদুপরে উপবেশন পূর্ব্বক ধূম্রপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চাকরেরা স্বুবর্ণ-নির্ম্মিত মুখ-নল এবং রৌপ্য নির্ম্মিত আল্‌বোলা লইয়া নিকটস্থ সরোবরে ভরিতে গেল, কেহবা সেকালের প্রথা মত চক্‌মকি প্রস্তরের সহিত লৌহের বিবাদ ঘটাইয়া সর্ব্ব-ভুকের দর্শনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে প্রায় সন্ধ্যা দেখা দিল। লালাবাবু দেখিলেন, এই উঠান-খণ্ডের এক পার্শ্বে এক সুদৃশ্য স্থলপদ্ম ফুলের গাছের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটী দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা আপন পিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছে "বাবা! দিন গেল, সন্ধ্যা হ'লো, বাসনায় আগুন দে।" এই কন্যা এই গৃহ-স্বামী রজকের একমাত্র দুহিতা। পল্লীগ্রামের অনেক স্থানে ধোবার (বস্ত্র সিদ্ধ করিবার) "ভাটী"কে "বাসনা" বলে, বিশেষতঃ চব্বিশপরগণায় এই 'বাসনা' শব্দ 'ভাটী' অর্থে ব্যবহৃত হয়। বৃদ্ধ ধোবা আফিম্-খোর ছিল, আফিমের নেশায় হুকা হাতে করিয়া ঝিমাইতেছিল, এই জন্য কন্যা স্মরণ করিয়া দিল "বাবা! দিন গেল, সন্ধ্যা হলো, বাসনায় আগুন দে।" রজক-কন্যা যে অর্থে এস্থলে "বাসনা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছে, পাঠক মহাশয়কে আমরা তাহা বুঝাইয়াছি, কিন্তু এই কয়েকটি কথা ইন্দ্রের বজ্রাপেক্ষা অধিক তেজে লালা বাবুর অস্থিতে অস্থিতে প্রবেশ করিল। লালাবাবু ভাবিলেন, "দিন যাইতেছে, সন্ধ্যা হইতেছে, আবার দিন যাইতেছে, আবার সন্ধ্যা হইতেছে, কিন্তু বাসনায় কি আমরা আগুন দিয়াছি? এ ঘোরতর সংসার-রূপী বাসনাকে তীব্র-বৈরাগ্য রূপী অগ্নি ভিন্ন কে জ্বালাইতে পারে?" পাঠক মহাশয় দেখিবেন, যে অর্থে রজক-কন্যা 'বাসনা,' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিল, লালাবাবুর হৃদয়-সরোবর সেই শব্দের অন্য অর্থ দ্বারা আলোড়িত হইতেছিল। লালা বাবু আবার ভাবিলেন, "জীবন-দিন গত হইতেছে, সন্ধ্যা-মৃত্যু নিকট প্রায় পরকালের জন্য কি প্রস্তুত হইতেছি? কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপু-ছাগদিগকে কি বলি দিয়াছি? মায়ামরিচাকায় মন-মৃগ নিত্য জ্বালাতন হইতেছে, কিন্তু তবুও সংসারের অসার মায়াকে ত্যাগ করিতে পারিলামনা; সুখের বাসনাকে বৈরাগ্যের জ্বলন্ত অগ্নিতে জ্বালাইতে পারিলামনা।" লালাবাবুর জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইল, দিব্য-চক্ষু খুলিয়া গেল, তিনি পরিবর্ত্তিত হইলেন; সেই রজকের গৃহের উঠানে সায়াহ্ন সমীরণের সঙ্গে সঙ্গে লালা বাবুর মন-পাখী যেন উড়িয়া গেল, তিনি যেন নূতন জীবন, নূতন মন, নূতন ধন পাইয়া সুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার যেন স্মরণ হইল—

"দিবা অবসান হ'লো, কি কর বসিয়া মন।
এ ঘোর ভব-নদী উত্তরিতে, করেছ কি আয়োজন?"

যাহা হউক, রজক-কন্যাকে পুরস্কার দিয়া লালা বাবু আপন সেবক ও সহচরদিগকে পাল্কীর সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "তোমরা পাইকপাড়ায় ফিরিয়া যাও; বলিও কৃষ্ণচন্দ্র "কৃষ্ণচন্দ্রের" অনুগামী হইয়াছে

আর তিনি পাইকপাড়ায় আসিবেন না।” চাকরেরা অনেক মিনতি করিল, কিছুতেই লালা বাবুর মন ফিরিল না, সুতরাং সেবকেরা এই অত্যাশ্চর্য্যজনক অথচ অসুখকর সমাচার জানাইবার জন্য দ্রুতপদে পাইকপাড়ার দিকে দৌড়িল। তাহারা অদৃশ্য হইলে, লালা বাবু আপনার পোষাক খুলিয়া ফেলিলেন এবং ধূতির এক পার্শ্ব ছিঁড়িয়া কৌপীন মাত্র সম্বল করিয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। মূল্যবান পোষাক তথায় পড়িয়া রহিল। রাত্রি দশটার সময় একটা ক্ষুদ্র গ্রামে যাইয়া পৌছিলেন, এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আহার দিল, পর দিবস সেকালের নবাবী রাস্তা ধরিয়া পদব্রজে বৃন্দাবন অভিমুখে প্রয়াণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক মাস কষ্ট ভোগ করিয়া খ্রীষ্টীয় ১৭৯২ অব্দের এপ্রেল মাসে, লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে, লালা বাবু শ্রীবৃন্দাবনে পৌছিলেন। পাইকপাড়ায় হাহাকার ধ্বনি উঠিল, কলিকাতায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল, নানা লোকে নানা উপকথা উড়াইল; কিন্তু কেহই লালা বাবুর সন্ধান পাইল না। বৃন্দাবনে গিয়া তিনি সংবাদ দিলেন, সে সংবাদ পাইকপাড়ায় পৌছিল, সমগ্র সহর তাঁহাকে ধন্য ধন্য বলিতে লাগিল।

শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ আর কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ রহিলেন না। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ধনবান কায়স্থের সম্মানিত উপাধি স্বরূপে “লালা” শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই লালা শব্দের প্রকৃত অর্থ—যে লালন করে, অর্থাৎ যাহার দ্বারা অপরে প্রতিপালিত হয়, সুতরাং ইহা অত্যন্ত বড়লোকের খেতাব। এখন এই প্রাচীন উপাধি উত্তর পশ্চিম, অযোধ্যা, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সমুদয় হিন্দু ধনবান পুরুষের সম্মানার্থ ব্যবহৃত হয়, সুতরাং ব্রজধামে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ লালা বাবু উপাধিতে সম্মানিত হইলেন, তাঁহার বাঙ্গালীত্বের চিহ্ন স্বরূপ ‘বাবু’ উপাধিও ‘লালা’ উপাধির সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল, কেহ কেহ “রাজা বাবু” বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেন, কিন্তু লালা বাবু উপাধিতেই তিনি এখন ভারত-বিখ্যাত।

বৃন্দাবনে তিনি মস্তক মুণ্ডন করাইলেন এবং বৈরাগ্য-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া বৈরাগী বৈষ্ণব সম্প্রদায়-ভুক্ত হইলেন। প্রার্থনা, উপাসনা, পূজা, দ্বারে দ্বারে হরি-সঙ্কীর্ত্তন, ভিক্ষা দ্বারা জীবন যাপন, দুঃখীর দুঃখ মোচন, হরিকথা শ্রবণ ইত্যাদি দ্বারা বৃন্দাবনে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপিত হইতে লাগিল। যতটুকু খাদ্য হইলে তাঁহার ক্ষুধার শান্তি হইতে পারে, ততটুকু পক্কান্ন মাত্র ভিক্ষা করিতেন। ভিক্ষা দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেই যমুনার ঘাটে বসিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া তাহা ভক্ষণ করিতেন, সঙ্গে জলপাত্রও রাখিতেন না, কর দ্বারা যমুনার জল উঠাইয়া পান করিতেন। ক্রমে ক্রমে লোকে জানিতে পারিল, তিনি সামান্য লোক নহেন, লালা বাবু কলিকাতার একজন বড় ধনবান রাজা। সমগ্র ব্রজধাম লালা বাবুকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, সমগ্র উত্তর পশ্চিম প্রদেশে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের কথা প্রচার হইয়া পড়িল। এ দিকে কলিকাতা হইতে লালা বাবুর সেবক, কর্ম্মচারী ও গৃহের লোকেরা আসিয়া পৌছিল, লালা বাবুর অনুজ্ঞা ও ইচ্ছামত যাহা কিছুর আদেশ হইল, তাহা প্রদত্ত হইল, লালা বাবু টাকা লইয়া ব্রজধামে এক সুবিস্তৃত জমিদারী খরিদ করিলেন, ঐ জমিদারী এখনও বর্ত্তমান, উহা লালা বাবুর ষ্টেট্‌নামে

খ্যাত, ইহার বার্ষিক আয় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। এই জমিদারী চালাইবার জন্য রীতিমত ট্রষ্টি, দেওয়ান, নায়েব ও কাছারী আছে, বৃন্দাবনে ইহার হেড্ কোয়ার্টর। লালা বাবু এই সম্পত্তি খরিদ করিয়া হুকুম দিলেন "এই জমিদারীর আয়ের একটি পয়সাও আমার বাটীতে যাইবে না, ইহা দেবসেবা ও পরোপকারের জন্য ব্যয়িত হইবে।" এপর্য্যন্ত ঐ নিয়ম অবাধে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। বৃন্দাবনে ছয় বর্ষকাল অধিবাস করিবার পরে লালা বাবু এক প্রকাণ্ড মন্দির প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, ঐ মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। উহা নির্ম্মাণ করিতে নয় বর্ষকাল ব্যয়িত হয়। ঐ মন্দিরে কৃষ্ণচন্দ্রের বিগ্রহ স্থাপন করেন, তদন্তর গোবর্দ্ধনগিরিতে গমন করিয়া তপঃ অবলম্বন পূর্ব্বক একাকী ভগবৎ ভজনে নিযুক্ত হয়েন। গোবর্দ্ধনে সপ্তবর্ষকাল অবস্থান কালের পরে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। গোবর্দ্ধনে তাঁহার রমণীয় সমাধি এখনও বর্ত্তমান, প্রতি বৎসর মহাসমারোহে উহার উৎসব হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে, ভিক্ষা করিয়া যমুনা তটে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে একটা দ্রুতগামী (পলায়িত) তেজস্বী অশ্বের সম্মুখে পড়িয়া তিনি তুরঙ্গ কর্ত্তৃক পদদলিত হয়েন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। লালা বাবু ব্রজধামে "অন্যতম অবতার নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহার সম্বন্ধে অসংখ্য কাহিনী শুনা যায়, প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে সে সকল কথার উল্লেখ করিব না। তিনি যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, অতিথি, পরিব্রাজক, কাঙ্গাল প্রভৃতির অন্ন সংস্থান হয়। বন্দোবস্ত আরও ভাল হইলে আরও উপকার হইতে পারে। *

লালাবাবুর ধর্ম্ম জীবন বিনয়, নম্রতা, সুশীলতা, ভক্তি, প্রেম, পরোপকার প্রভৃতিতে যাপিত হয়। তাঁহার ধর্ম্মজীবন প্রকৃত বৈরাগীর—প্রকৃত বৈষ্ণবের ধর্ম্মজীবন ছিল। এখনকার কালে পেটে অন্ন না থাকিলেই লোকে বৈরাগী হয়, এই জন্য এত বড় "বৈরাগী" বা "বাবাজী" কথাগুলা এখন বাঙ্গালা দেশে তামাসার শব্দ বলিয়া পরিগণিত হয়। লালাবাবুর বৈরাগ্য-জীবন ভক্তি ও প্রেমমাখা ছিল; তাঁহার বৃন্দাবন জীবন যথার্থ ধর্ম্মের জীবন ছিল। আবার, বিচার জ্ঞান, বিবেক, বিজ্ঞান, ভদ্রতা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি মহাসিদ্ধ ছিলেন; অসাধারণ প্রেম ও ভক্তিবলে তিনি পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তিরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। খালি পায়ে, খালি গায়ে, খালি মাথায় তিনি দ্বারে দ্বারে যখন মধুর স্বরে হরি-সংকীর্ত্তন করিতেন, তখন রাস্তায় লোকের অত্যন্ত জনতা হইত, হিন্দুস্থানীরা অবাক হইয়া এই অসাধারণ বাঙ্গালী-রাজ-যোগীকে দেখিত। শুনা যায়, লালাবাবুর কেশ-শূন্য মাথায় কখনও কখনও খাদ্য দ্রব্য থাকিত, পক্ষীরা আসিয়া তাহা খুঁটিয়া খাইত। আমরা লালাবাবুর জীবনী সমাপ্ত করিলাম, এমন মহাপুরুষের জীবন লিখিতে লিখিতে আমাদের যে আনন্দ হইয়াছে, অনেক ধনবানের ধনভোগে তাহা হয় না। ধন্য লালাবাবু! বঙ্গের বাহিরে তুমি বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছ, তোমার আত্মায় ভগবানের আশীর্ব্বাদ পড়ুক।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

* এই প্রবন্ধের কোনও কোনও অংশের সমাচার জন্য বৃন্দাবনস্থ লালাবাবুর ষ্টেটের বর্ত্তমান ম্যানেজার বাবু শিবকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ আছি।—লেখক

রাজগৃহ। (৩)

স্থান-মাহাত্ম্য সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের মহাজনেরা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে স্থান-মাহাত্ম্যাপেক্ষা তীর্থ-মাহাত্ম্যেরই আদর অধিক। কাশী-বৃন্দাবন, পুরুষোত্তম-কামাখ্যা যাইতে এদেশের বহু লোকের আগ্রহ আছে, কিন্তু বুদ্ধের জন্মস্থান, বিহারস্থল, এবং কীর্ত্তিস্থল, শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি, রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি দেখিতে কাহার সাধ? অকীর্ত্তির অন্ধকারময় স্থান সমূহ আজ মহা ধুমধামে পূর্ণ, আর এদেশের মহাজনদিগের জন্মভূমি, বিহার-ভূমি বনে, জঙ্গলে পরিপূর্ণ!! বলিলে কি হইবে?—এদেশ হুজুগের জন্যই মুক্ত-হৃদয়।

রাজগৃহে পদার্পণের পর হইতেই আমাদের হৃদয় মনকে দারুণ চিন্তা-জ্বর আক্রমণ করিল। যে দিকে চাই, কেবল ধ্বংসাবশেষ! কিন্তু সব ব্যাঘ্র ভল্লুকের বিহার-ক্ষেত্র। কোন মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন, "যে দেশে একজন মহাপুরুষও জন্মিয়াছে, সে দেশ ধন্য।" মহাপুরুষ বলিয়া মহাপুরুষ নহে—বুদ্ধদেবের ন্যায় মহাপুরুষ এই ধরায় বড় অধিক জন্ম গ্রহণ করেন নাই। এহেন মহাপুরুষের বিহার এবং সাধন স্থল রাজগৃহের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে এমন লোক নাই, যাহার অশ্রুপতন না হয়। কিন্তু দেখে কে? দেখিবার লোক এ ভারতে অধিক মিলে কি? অকীর্ত্তি-কীর্ত্তনের লোক এদেশে অনেক মিলে, ভণ্ড মহাজনের গাড়ী টানার লোক অনেক জুটে, কিন্তু প্রকৃত মহাপুরুষের গুণাবলী ও স্থান-মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবার লোক মিলে না! মিলে না প্রকৃত মহতের মহাপূজা—প্রকৃত সাধুর সম্মান। পঞ্চপাহাড় বেষ্টিত রাজগৃহে দেখিবার কি আছে? ভগ্ন অট্টালিকা রাশির ইষ্টক-স্তূপ আছে, ভগ্ন প্রাচীরের চিহ্ন আছে, অসংখ্য পুষ্করণীর শুষ্ক বক্ষ আছে—আর রাস্তাহীন জঙ্গল, জঙ্গল—কেবল জঙ্গল আছে। হোসেঙ্গবাদের নবাবের জঙ্গলে বিনা পয়সায় কাঠ কটিতেছে অসংখ্য লোক, কিন্তু তবুও জঙ্গল নিঃশেষ হয় না। কণ্টকে কণ্টক, শাখায় শাখা মিশাইয়া অসংখ্য কণ্টকীবৃক্ষ পূত-মহাজন-চরণরেণু সুরক্ষা করিতেছে। পাখীগণ মধুর হইতেও মধুরতর সুরে, নানা ভঙ্গিতে গাইয়া, গাম্ভীর্য্য আরো গাম্ভীর্য্য মিশাইতেছে, এক শব্দ প্রতিধ্বনিতে শত শব্দ হইয়া প্রাচীনত্বের ঔদাসীন্য ঘোষণা করিতেছে এবং বন্য জন্তুদল এই মাহাত্ম্যময় স্থানে বিহার করিয়া প্রাচীন মাহাত্ম্যের গৌরব সুরক্ষা করিতেছে! পঞ্চ পাহাড়ের মধ্য দিয়া সরস্বতী মৃদু মৃদু বহিতেছে—কিন্তু একখানি কৃষকেরও কুঁড়ে ঘর নাই! নিবিয়াছেও নির্ব্বাণই ভাল, নীরব হইয়াছেত উদাসীনতাই ভাল, প্রকৃতি দিবারাত্রি যেন এই কথাই বলিতেছে। কদাচিৎ পথশূন্য কণ্টকাবৃত জঙ্গলে আমাদের ন্যায় কোন হতভাগ্য যদি কখনও যায়, তাহার কাণে কাণে কে যেন এই কথাই বলে—"কেন আসিয়াছ, যে দেশ ডুবিয়াছে, তাহার পূর্ব্বস্মৃতির উদ্দীপনায় আর কাজ কি? নির্জ্জনতা ছাড়িয়া সহরে যাও, সহরে যাও।" একদিন নয়, দুদিন নয়, প্রায় এক মাস কাল, দিবসে এবং রজনীতে—বিজন প্রদেশের এই মহা উদাস

সঙ্গীত, মহা ইঙ্গিত আমাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছে। আমরা রাজগৃহে যাহা যাহা দেখিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব, প্রতিশ্রুত হইয়াছি। কিন্তু পরিচয় দিয়া লাভ কি? যাহা ডুবিয়াছে, তাহা কি এ ভারতে আর জাগিবে? বুদ্ধদেবের মহা সাধনার মাহাত্ম্য এদেশে আর কি প্রতিষ্ঠিত হইবে? নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মহা শিক্ষা আর কি পুনরুদ্দীপিত হইবে? ধর্ম্ম এখন কথায়, চরিত্র এখন বাহ্যপোষাকে, জাঁক-জমকে, হিতৈষণা এখন ভণ্ডামি এবং কপটতায় আচ্ছন্ন,এই হুজুগপ্রিয় মহাযুগে এ সকল কাহিনী বর্ণনায় ফল কি? এক বৎসর পর্য্যন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া বুঝিতেছি, কোনই ফল নাই। রাজগৃহের গভীর নীরবতা আমাদিগকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিতেছে, রাজগৃহের কুহক-স্বপ্ন আমাদিগকে জগৎ হইতে ক্রমাগতই অন্ধকারের দিকে যাইতে আদেশ করিতেছে। নির্ব্বাণ, নির্ব্বাণ—মহা নির্ব্বাণই যেন ভাল, বলিতেছে। তবে কেন প্রতিশ্রুতির কঠোরতা স্মরণ করিয়া আবার রাজগৃহের কথা লিখিতেছি? বিড়ম্বনা, মহা বিড়ম্বনা।

বিহার হইতে রাজগৃহাভিমুখে যে রাস্তা আসিয়াছে, তাহা ডাক-বাঙ্গলা পর্য্যন্ত আসিয়াই একরূপ শেষ হইয়াছে। আর একটু দক্ষিণে যাইয়াই, সরস্বতী উপকূলে, অথবা কুণ্ড সমূহের তীরে শেষ হইয়াছে। তারপরও একটী রাস্তা, পাহাড়ের মধ্য দিয়া, চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তার দুই দিকেই জঙ্গল। এই রাস্তা জরাদেবীর মন্দিরকে পশ্চিমে রাখিয়া, বাণ-গঙ্গার উপর দিয়া" দক্ষিণে—আরো দক্ষিণে, নোয়াদার দিকে চলিয়া গিয়াছে। ডাক-বাঙ্গলার উত্তরে কীর্ত্তি স্তূপ—প্রাচীর-বেষ্টিত বৃহৎ প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণ বহু বিস্তৃত। ইহার তিন দিকের প্রস্তর এবং মৃণ্ময়,এবং সুদৃঢ় পাহাড়-সম উচ্চ প্রাচীর অদ্যাবধিও দণ্ডায়মান। উত্তরের প্রাচীর আধুনিক রাজগৃহ গ্রামের দস্যুরা লুটিয়া লইয়াছে,তাহার চিহ্নও নাই। এই প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাঙ্গণ ভূমিতে একটী প্রাচীন শিব মন্দির আছে, মহামায়ার মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে, দুই তিনটী পুকুরের চিহ্ন আছে, আর আছে অসংখ্য ইষ্টক এবং প্রস্তর খণ্ড। শুনিলাম, এই প্রাঙ্গণ হইতে ইষ্টক খুড়িয়া লইয়া আধুনিক ভেঙ্গান (?) রাজগৃহ গ্রাম মস্তক তুলিয়াছে। বহুস্থানে মৃত্তিকা খনিত রহিয়াছে, দেখিলাম, ছোটছোট ইট এবং ছেলেট প্রস্তর রাশি লোকেরা ফেলিয়া গিয়াছে,বড় বড় সব অপহরণ করিয়াছে। যেখানে খনন করা যায়, কেবল ইট এবং পাথর পাওয়া যায়। এতটা জমী পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু চাষ করার উপায় নাই, কেবল ইট, কেবল পাথর। লোকেরা বলে, এখানে কোন রাজার বাড়ী ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ইহাকেই রাজা বিম্বসরের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাঁহারই বাড়ী হউক, এ যে এক মহা সমস্যাপূর্ণ, মহাকীর্ত্তিপূর্ণ স্থান, তাহাতেই আর সন্দেহ নাই। সায়ংকালে কতবার এই প্রাঙ্গণ-প্রাচীরের উপরে উঠিয়া ভাবিয়াছি, হায়, সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইয়াছে, মহাকালের গর্ভে এই ভগ্ন প্রাচীর, প্রাচীন-কাহিনী বক্ষে ধারণ করিয়া মহা স্বপ্ন মানব-প্রাণে জাগাইতে আজও কেন বিদ্যমান? এই দেশের লোকেরা সাধারণত অশিক্ষিত, কোন চিন্তা নাই। চিন্তা—পশুদিগের ন্যায় কেবল আহার এবং রিপুচালনা, তাহারা ভাবে না, জানে না

এই প্রাচীর কতকাল ধরিয়া ধরিত্রী বক্ষে দাঁড়াইয়া মহাযুগের মহাকাহিনী ঘোষণা করিতেছে! বিস্মৃতি এবং স্মৃতি, দুই যেন এখানে জাগ্রত। চৈতন্য এখানে বিস্মৃত; জড় এখানে জাগ্রত স্মৃতিতে প্রজ্বলিত। প্রস্তর স্তূপ নয়—যেন স্মারক-লিপিরাশি। মানবাপেক্ষা এই প্রাচীন জড়-প্রাচীর,নীরব ভাষায়, আমাদিগকে অনেক কথা বলিয়াছে, শিখাইয়াছে। সে সকল তত্ত্ব কথা কতক কতক "পুণ্যপ্রভা" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সরস্বতী নদী, পঞ্চ-পাহাড়-বেষ্টিত প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া বৈতরণীর দিকে * যাইতেছিল; কেহ তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া, ডাক বাঙ্গালার পূর্ব্বদিক দিয়া, কৃষির উৎকর্ষ সাধনের জন্য নূতন পথ কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। তাই এখন ডাক বাঙ্গালার পূর্ব্বে কর্ত্তিত সরস্বতী। এইখান দিয়াই বার মাস জল চলে; পশ্চিমের পথ রুদ্ধ। তবে বর্ষার সময় পাহাড়ে নদী রোধ করে, কাহার সাধ্য? সেই সময়ে পশ্চিম দিকের স্রোত বহমান হয়। ডাকবাঙ্গালার কতকটা পশ্চিমে বৈতরণী তীর্থ; সেখানে অনেক কৃত্রিম কুণ্ড আছে। কৃত্রিম এই অর্থে বলি, পয়সার খাতিরে পাণ্ডারা তাহা করিয়াছে, বোধ হয়। উষ্ণপ্রস্রবণ সকল মানুষে করে নাই। পাহাড় সকল মানুষে করে নাই। আরো যে সকল কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আছে, তাহাও আমাদের ন্যায় মানুষে করে নাই। তাহা নর-দেবতার সৃষ্টি। তাহা অকৃত্রিম, পুণ্য-প্রবাহ। ডাকবাঙ্গালার পূর্ব্ব-দক্ষিণে অনেক দরগার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। আরো পূর্ব্ব দক্ষিণে মুকদুম কুণ্ড। দক্ষিণে, সরস্বতীর পূর্ব্ব-কূলে, বিপুলাচলের নীচে, সূর্য্যকুণ্ড প্রভৃতি। সরস্বতীর পশ্চিম উপকূলে, বৈভার পাহাড়ের একটু উপরে, ব্রহ্ম ও সপ্তঋষি কুণ্ড প্রভৃতি। ডাকবাঙ্গালা আম্রবৃক্ষরাজিতে বেষ্টিত। স্থানটী সুশীতল, কবিত্বপূর্ণ, স্মৃতিপূর্ণ, ভীতি-পূর্ণ, নির্জ্জন—মহানির্জ্জন। এই কবিত্বের খনি নির্জ্জন কুটীরে আমরা এক মাস কাটাইলাম। কি সুখ-স্বপ্নে উৎসাহ-মদিরায় আমাদের দিন কাটিয়াছিল, একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। নির্জ্জনতার মহাপ্রাণ যিনি, তিনি যেন আমাদিগকে কোলে করিয়া এই স্বপ্নময়, স্মৃতিময়, মাহাত্ম্যময় রাজ্যে রাখিয়াছিলেন। যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা লিখিতে লেখনি কম্পিত হয়! আমরা রক্ত-মাংসধারী মানুষ হইয়াও একমাস মহা-যোগে যেন যুক্ত ছিলাম। স্থান-মাহাত্ম্য, পাঠক, তোমরা মান আর না মান, আমি মানি। আমি মানি, স্থান-মাহাত্ম্যে মাটী সোণা হয়, বিষ্ঠা চন্দন হয়, পাপী উদ্ধার হয়। ভক্তের পূত চরণ-রেণু স্পর্শে আর কি হয়, তাহা ভক্তগণই জানেন। আমি তাহা কি লিখিতে পারি? ডাকবাঙ্গালার পেয়াদা রামলাল হইল আমার উপদেষ্টা, সামান্য পাণ্ডা লোকনাথ হইল যেন গুরু,ভৃত্য হইল বন্ধু,দিবসে মধুকর এবং রজনীতে ভল্লুক-দল হইল সাথী। ঘুরিয়া,ঘুরিয়া,বসিয়া বসিয়া, শুইয়া শুইয়া, অস্পষ্ট এবং অস্ফুট কত তত্ত্বই যে শুনিয়াছি,মহা নীরব আকাশ তাহার সাক্ষী রহিয়াছে। স্থান-মাহাত্ম্য তুমি পাঠক,না মান, আমি মানি। কিন্তু স্থান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে পারি, সে শক্তি আমার নাই। আমি বাঙ্গালী, আমি হুজুগপ্রিয় অধম বাঙ্গালী।

আমাদের যোগ-কুটীরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণেই দুই প্রকাণ্ড পাহাড়। পাঠক ম্যাপের

* উৎকলের বৈতরণী নয়, এখানেও বৈতরণী তীর্থ আছে। পরে তাহার কথা বলিব।

প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। পূর্ব্বে বিপুল,পশ্চিমে বৈভার। মধ্যে সরস্বতী নদীতে একটী কুণ্ড করা হইয়াছে; এখানে পদধৌত করিয়া পশ্চিমের বৈভার পাহাড়ের উপরে উঠিতে হয়। ইহাই প্রথম কুণ্ড। ইহার নাম সরস্বতী কুণ্ড।

যে দিন আমরা রাজগৃহে পৌছিলাম, তাহার পর দিন-বড়গাঁয়ে মেলা বসিয়াছিল। প্রতি পর্ব্ব উপলক্ষে সেখানে মেলা বসিয়া থাকে। তা ছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবারেই মেলা বসে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এখন যেন মেলার-সমাধি। এখানে কোন সময়ে যে কিছু ছিল, অসভ্য লোকেরা বংশপরম্পরায় তাহা স্মৃতিতে বহিয়া বহিয়া আনিয়াছে। লোকেরা এই স্থানের মায়া ছাড়িতে পারে না। প্রতি দিনই লোক আসিতেছে, প্রতি সপ্তাহেই মেলা বসিতেছে, প্রতি মাসেই,প্রতি বৎসরেই কত নরনারী সাজিয়া দলে দলে মিলিতেছে। আমরা দেখিলাম, প্রতি দলের সঙ্গেই দুই একটী ঢাক বাজিতেছে, আর নর নারী মহা উৎসাহে মাতিয়া চলিয়াছে। বড়গাঁয়ের মেলার পর দিন রাজগৃহে প্রাতে মেলা বসিল। কত দূর দূর—অতি দূরতর স্থান হইতে প্রত্যুষ হইতে কত নর নারী সমবেত; প্রতি দলের সঙ্গেই ঢাক। ঢাকের বাদ্যে পাহাড় প্রতিধ্বনিত, আজ প্রকম্পিত। সূর্য্যকুণ্ড আজ লোকে পূর্ণ, এখানে আজ স্নান করিলে মহাপুণ্য। সরস্বতী কুণ্ডের পূর্ব্বধারে বিপুলের নীচে সূর্য্যকুণ্ড, রামকুণ্ড, গণেশ কুণ্ড, চন্দ্রমা কুণ্ড (সোম-কুণ্ড) সীতাকুণ্ড। একটী ছাড়া আর সকলের জলই উষ্ণ, বোধ হয় যেন একটী উষ্ণ ঝরণা বিভক্ত হইয়া এই সকল কুণ্ড উৎপন্ন করিয়াছে। ইহার নিকটেই একটী প্রাচীন মন্দিরে হাটকেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। আমরা প্রত্যুষে মেলা দেখিতে গেলাম। সে জনতা ভেদ করে, কাহার সাধ্য? রাজগৃহের কনষ্টেবল আমাদিগকে জনতা ভেদ করিয়া লইয়া চলিল। অতিকষ্টে সূর্য্যকুণ্ডের ধারে পৌছিলাম। সূর্য্য কুণ্ড প্রায় ১২হাত চওড়া,১২ হাত দীর্ঘ; এই সঙ্কীর্ণ স্থানে অসংখ্য লোকের স্নান। নির্ম্মল উষ্ণ জলরাশি আজ কর্দ্দমময় হইয়া গিয়াছে। সেই কর্দ্দমে অসংখ্য নরনারী সানন্দে এবং সোৎসাহে ডুব দিতেছে। নারীদিগের হস্তে মোয়া এবং পিষ্টক। কুণ্ডের চৌবাচ্চার পূর্ব্ব প্রাচীরে সূর্য্যের মূর্ত্তি, সেখানে দুই চারিটী প্রদীপ জ্বলিতেছে,কয়েকজন পাণ্ডা দাঁড়াইয়া পিষ্টক ও মোয়া মূর্ত্তিকে স্পর্শ করাইয়া কতক ফেরত দিতেছে, কতক রাখিতেছে। কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য পাণ্ডা পয়সা রোজগারের চেষ্টা করিতেছে। স্নান হইলে বাদ্য বাজাইয়া দলে দলে নরনারী আর্দ্র বস্ত্রে নিজ নিজ গ্রামাভিমুখে যাইতেছে। প্রায় দশটা পর্য্যন্ত এই মেলা দেখিলাম। কি জানি যেন অনেকেই আমাদিগকে খুব আদর অভ্যর্থনা করিল। নানকসাহীর দুই চারি জন বাবাজি আমাদের চেহারা দেখিয়া বড়ই প্রশংসা করিলেন। কনষ্টেবলের সঙ্গে আমরা এই দিনই মুকদুম কুণ্ড দেখিতে গেলাম। ইহা বিপুলাচলের উত্তর গাত্রে; সূর্য্যকুণ্ডের পূর্ব্বে, ডাকবাঙ্গালার পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে সংস্থাপিত। পূর্ব্বে ইহাকে শৃঙ্গীঋক কুণ্ড বলিত। উষ্ণ জল প্রবল ধারায় পাহাড় ভেদ করিয়া ইহাতে অবিরত পড়িতেছে। মুসলমান সাধু মুকদুম সাহ ইহাকে আশ্রয় করা অবধি ইহার নাম মুকদুম কুণ্ড হইয়াছে। এখানে যাহা যাহা দেখিলাম এবং অন্যান্য স্থানে যাহা দেখিলাম, পরে বিবৃত করিব। এই দিন রাত্রে একটী ঘটনায় আমরা বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম! আমাদের ডাকবাঙ্গালার পেয়াদা রামলালের স্ত্রী স্বামীর জন্য ১৩ ক্রোশ

পথ হাটিয়া উৎসবের পিষ্টক লইয়া উপস্থিত হইয়া ছিল। কি জীবন্ত ভালবাসার আকর্ষণ। অসভ্য মহিলা স্বামীসেবার জন্য অম্লানচিত্তে তীব্র রৌদ্র এবং উন্মত্ত ধূলির বন্যা মাথায় বহিয়া কতদূর হইতে আসিয়াছে! স্বামী এই উপাদেয় তণ্ডুল ও গুড়মিশ্রিত মালপোয়া না খাইলে সব যেন ব্যর্থ হয়, তাই এতদূর আসিয়াছে। পথ কষ্টে ডাকবাঙ্গালায় আসিয়াই রাত্রে ভেদ বমি আরম্ভ হইয়াছে। রাত্রে রামলাল হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলিল, তাহার স্ত্রী মারা যায়। আমি ছুটিয়া গেলাম। যাইয়া দেখি, বাস্তবিকই ওলাউঠার লক্ষণ, হাতে পায়ে খিল ধরিয়াছে। মৃত্তিকা শয্যায় রাম-লাল স্ত্রীকে কোলে করিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছে। ডাক্তার নাই, ঔষধ নাই, পথ্য নাই—আমাদের সঙ্গে অধিক লোকও নাই! গ্রাম অনেক দূর, একাকী ভৃত্য রাত্রে গ্রামে যাইতে সাহস পায় না, রাত্রে ব্যাঘ্র ভল্লুক বাহির হয়। কি করা যায়, ভাবিতে লাগিলাম। আমি বিধাতার উপর নির্ভর করিয়া গ্রামে যাইব, স্থির করিলাম। ইতিমধ্যে হঠাৎ একটা প্রক্রিয়া মনে হইল। কুণ্ডের পরিষ্কার জল ঘরে ছিল, বিধাতার নাম স্মরণ করিয়া ৫ মিনিট অন্তর অন্তর ঐ জল দিতে বলিলাম। ঐরূপ দিতে দিতে, বিধাতার কৃপায়, রোগী একটু ভাল হইল। ভেদ বমি থামিল। জল ত জল নয়, আজ যেন বিধাতার কৃপারূপে রামলালের স্ত্রীর শরীরে প্রবেশ করিতেছে। কিসে কি হয়, কে জানে? সামান্য শীতল জলে দারুণ ওলা-উঠা আরোগ্য হইতে লাগিল। শেষ রাত্রে দেখা গেল, রোগীর পেট ফুলিয়াছে; তখন জল বন্ধ করিলাম। পর দিন রোগী একই অবস্থায় রহিল। ১ কি ২টা বাজে, তবুও প্রস্রাব হয় নাই। এক মাত্র উপায় ঐ শীতল জলের পটী তলপেটে দেওয়া গেল এবং শিলাওর সরু চিড়া ভিজাইয়া তাহার জল রোগীকে পথ্য দিলাম। কি আশ্চর্য্য, এক কি দেড় ঘণ্টা পরেই রোগীর প্রস্রাব হইল। দুই দিন পর রোগীকে অন্ন দিলাম। আরো চারি দিন রাখিয়া শেষে সঙ্গীসহ রোগীকে বাড়ী পাঠান গেল। বিধাতার কৃপা যখন অবতরণ করে, তখন সামান্য জিনিস মহা ঔষধের কাজ করে। রামলালের কুটীরে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। দাম্পত্য প্রেমের যে গভীর মনোমুগ্ধকর নীরব অভিনয় দেখিলাম, তাহা কখনও ভুলিব না। ভালবাসা বড় লোকের ঘরে, না কাঙ্গাল গরিবের কুটীরে, তাহা কে জানে?

ক্রমশঃ

বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য।

প্রথম ভাগ।

শ্রীদীনেশচরণ সেন, বি-এ, প্রণীত।

বহুদিন হইতে আমরা দীনেশ বাবুর এই গ্রন্থখানির অপেক্ষা করিতেছিলাম। রয়াল আটপেজী ৪৩০ পৃষ্ঠায় প্রথম ভাগ সমাপ্ত হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। দেখিলে বুঝা যায়, বাঙ্গালার ছাপাখানার কত উন্নতি হইয়াছে। কুমিল্লা চৈতন্য-যন্ত্রে পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, মফঃস্বলের ছাপাখানায় ভ্রম সংশোধনের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত নাই। এজন্য বিস্তর মুদ্রাপ্রমাদ গ্রন্থ মধ্যে রহিয়া গিয়াছে।

ছয় বৎসর পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থকার এ পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। পুস্তকে

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের আলোচনা করা হইয়াছে। ছয় বৎসরেও যে মফঃস্বলে বসিয়া প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস সংগ্রহ করা যাইতে পারে, ইহা কেবল অসীম ধৈর্য্য, একান্ত অনুরাগ, অবিরাম পরিশ্রম ও অটল অধ্যবসায়ের নিদর্শন।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্গভাষার ইতিহাসের বীজ বপন করেন। সেই বীজ হইতে দীনেশ বাবুর এই প্রকাণ্ড কাণ্ড। তাঁহার গ্রন্থে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ ভিন্ন বাঙ্গালার ধর্ম্ম,সমাজ ও আচার ব্যবহারের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে বাঙ্গালার এই অপূর্ব্ব ইতিহাস দীনেশ বাবু সংগ্রহ করিয়াছেন। এই ইতিহাস সংগ্রহ করিতে প্রাচীন পুস্তকের অনুসন্ধানে পর্ব্বতে জঙ্গলে তাঁহাকে কতদিন অনাহারে অনাশ্রয়ে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। একাকী, অসহায়, বৃহৎ পুস্তকালয় বা সুশিক্ষিত সাহিত্যবিৎ হইতে দূরে থাকিয়া,জটিল সাহিত্য-রহস্যের মীমাংসায় কতদিন নিরুদ্যম ও ভগ্নোৎসাহ হইতে হইয়াছে। ইহার উপর তাঁহার নিজের তাদৃশ সচ্ছলতা ছিল না,—এত যত্নে সংগৃহীত ইতিহাসখানি কেবল হাতের লেখা পুঁথিতে আবদ্ধ থাকিয়া কীটের ভক্ষ্য হইবে; কি কোন দিন মুদ্রিত হইয়া বিদ্বৎ সমাজের সম্মুখে উপহার দিতে পারিবেন। আবার সে সমাজ পূর্ব্ব বঙ্গীয় অজ্ঞাত অপরিচিত লেখকের লেখায় কোন দিন কি স্নেহের পক্ষে দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন? সহস্র বাধা,সহস্র বিড়ম্বনা বাঙ্গালা-লেখকের—বিশেষতঃ যাহারা মৌলিক ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত। সেই সহস্র বাধা দীনেশ বাবু অতিক্রম করিয়াছেন; বাঙ্গালা ভাষার অনেকগুলি গুপ্তরত্ন তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং এই সুবৃহৎ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। কিন্তু শুনিয়া আমরা ত্রাসিত হইয়াছি, তিনি শয্যাগত হইয়াছেন। ভগবান তাঁহার মঙ্গল করুন। শিক্ষিত বাঙ্গালীর পুস্তকাগারে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' আসন সংগ্রহ করিবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

একাকী এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে হইলে পুনরুল্লেখ, অসমীকরণ, মতবিপর্য্যয়, রীতিভঙ্গ প্রভৃতি দোষ অনতিক্রমণীয়। আহ্লাদের বিষয়,এ গ্রন্থে আমরা মত বিপর্য্যয়ের কোন নিদর্শন পাই নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক ক্রম-ভঙ্গে দুঃখিত হইয়াছি।

আমরা গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে তাহার প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন হইবে, আশা করিয়াছিলাম। আমাদের সে আশা সফল হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস লিখিবার জন্য দীনেশ বাবু রত্ন-ভাণ্ডার সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু ইতিহাস লেখেন নাই। মাসিক পত্রিকার কতকগুলি প্রবন্ধ একত্র করিয়া দিলে যেমন দেখায়, তাঁহার গ্রন্থখানি সেইরূপ হইয়াছে। ভাষাও ইতিহাসের উপযোগী হয় নাই, গাম্ভীর্য্য ও ওজস্বিতাকে বিসর্জ্জন দিয়া মাধুর্য্য ও চটুলতাকে আশ্রয় করা হইয়াছে। বিশেষতঃ ইংরাজী গ্রন্থের তুলনা বা ইংরাজী শব্দের ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলে ভাল হইত।

বঙ্গভাষার ইতিহাসের এখন উপকরণ সংগ্রহের সময়। ইতিহাস লিখিবার এখনও সময় হয় নাই। সঞ্জয়, কবীন্দ্র, খেলারাম প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ

রূপে সংগ্রহ হয় নাই, হইয়া থাকিলেও মুদ্রিত হয় নাই, মুদ্রিত হইলেও সাধারণ্যে প্রচারিত হয় নাই। সুতরাং সেই সকল গ্রন্থের সমালোচনা ভাল কি মন্দ হইল, পাঠকগণের বিচার করিবার অধিকার নাই। পক্ষান্তরে তাঁহাদের রচনা-কাল-নির্দ্ধারণে ঐতিহাসিক যথেচ্ছ ব্যবহার করিলেন কি না, তাহারও বিচার হইতে পারে না। অথচ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, এইরূপ গ্রন্থ সকলের সমালোচনায় পরিপূর্ণ। গ্রন্থকারের জীবনী সংগ্রহে প্রয়াস তাদৃশ দেখা যায় না, গ্রন্থ-সমালোচনার আয়াস যত অধিক। বঙ্গদেশের প্রাচীন গ্রন্থকারের জীবনীসংগ্রহ গ্রন্থকারের (অতি দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু দীনেশ বাবুর মত উপযুক্ত লোকও শীঘ্র মিলিবে না। আবির্ভাব কাল নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন না হইলে, ভাষার ক্রমবিকাশে তাঁহাদের স্থান কোথায়, নির্ণয় করিবার উপায় নাই। অন্য দিকে যে সকল কথা পরিত্যাগ করিলে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার কোন ক্রটী হইত না, তাহার আলোচনা যথেষ্ট আছে। বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে গ্রন্থকার কোন স্বাধীন মত প্রকাশ করেন নাই, বিদ্যাপতির দানপত্র জাল বলিয়া এক কথায় উড়াইয়া দিয়াছেন, দানপত্রের তারিখটী কীটদষ্ট হইয়া থাকিবে ও পরে নূতন তারিখ বসান হইয়া থাকিবে, ইত্যাদি আরোপ করিয়া এবং তাম্রশাসন কীটদষ্ট হইবার দ্রব্য নহে, স্মরণ না করিয়া, তাড়াতাড়ি বিদ্যাপতির জীবন বৃত্তান্ত সমাপন করিয়াছেন। চণ্ডীদাস বা গোবিন্দদাস, কেতকী বা জ্ঞানদাসের জীবনবৃত্ত জানিবার জন্য আমরা উন্মুখ হইয়াছিলাম, তাহা পাই নাই। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপ ক্রটী সত্ত্বেও বলা যাইতে পারে, দীনেশ বাবুর গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষার একটী অমূল্য রত্ন। কাব্য সমালোচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। আমরা একটী চিত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

"কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রাই-উন্মাদিনীই বিশেষ প্রসংশনীয় কাব্য। এই পুস্তকের প্রতি পত্রেই চৈতন্য-দেবকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার বিষয় আছে। যাঁহারা চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি পুস্তক পড়েন নাই, তাঁহারা রাই উন্মাদিনীর স্বাদ ভাল করিয়া পাইবেন না। অঙ্কিত চিত্রখানা বৃন্দাবনের উন্মাদের নামে নবদ্বীপের উন্মাদের। কৃষ্ণকমল পুস্তকের সূচনায় বলিয়াছেন "স্বাদিতে নিজ মাধুরী, নাম ধরি গৌরহরি, হরি বিরহেতে হরি, কাঁদি বলে হরি হরি।" আমরা আত্মরূপে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ দিয়া থাকি, বাহিরের বস্তুতে কে কবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে? বাহিরের বস্তু উপলক্ষ করিয়া আমরা স্বীয় আদর্শরূপেরই সত্ত্বা অনুভব করিয়া থাকি; এইরূপের আদর্শ ব্যক্তিগত, রূপ বস্তুগত হইলে সুন্দর ফুল স্নিগ্ধ পল্লবটী দেখিয়া মানুষের ন্যায় ইতর প্রাণীগণও মুগ্ধ হইত, জাতিগত হইলে চীনদেশের ক্ষুদ্রপদ দেখিয়া আমরা সুখী হইতাম, সমাজগত হইলে দুই প্রতিবাসীর রুচি স্বতন্ত্র হইত না। আমরা প্রত্যেকে নিজের মাধুরী দেখিয়া পাগল, সুতরাং ভালবাসাকে একার্থে আত্মরমণ বলা যাইতে পারে, নিজের কামনার প্রতিবিম্বই রূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে অনুসরণ করিয়া থাকে। গৌর অবতারে এই প্রেমলীলা অতি পরিস্ফুট, নিজকে দুই ভাবিয়া এই প্রেমের উদ্ভব, তখন—"দুটী চক্ষে ধারা বহে অনিবার, দুঃখে বলে বার বার, স্বরূপ দেখাবে একবার, নতুবা এবার মরি। ক্ষণে গোরাচাঁদ হৈয়ে দিব্যোন্মাদ, উদ্দীপন ভাবে ভেবে কালাচাঁদ, ধরতে যায় করিয়া দৈন্য।"

কৃষ্ণকমলের চক্ষে এই বিরহী গৌরচন্দ্রের মধুর মূর্ত্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাই তিনি রাই উন্মাদিনীরূপ উৎকৃষ্ট রূপ চিত্রে পরিণত করিয়াছেন। কৃষ্ণ কমল এই প্রেমস্নিগ্ধ গোরারূপের তুলনায় অন্য সমস্ত রূপ অপকৃষ্ট মনে করিয়াছিলেন।

চাঁদে যে কলঙ্ক আছে
ছি ছি চাঁদকি গোরাচাঁদের কাছে।

প্রেমিক নিজেই পূর্ণ, তবে বিরহ কেন? গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন।

"তবে যে গোপীকার হয় এতই বিষাদ,
তার হেতু প্রোষিত ভর্ত্তৃকা রসাস্বাদ।"
স্ফূর্ত্তিরূপে মূর্ত্তি যখন দেখেন নয়নে।
তখন ভাবেন বুঝি এল বৃন্দাবনে॥
অদর্শনে ভাবেন কৃষ্ণ গেছেন মধুপুরী॥"

এই মিলন-বিরোধী পথের অন্তরায় যমুনা, যাহা অদ্বৈত ভাবটীকে দ্বৈতভাবে দ্বিখণ্ড করিয়া বিরহের সৃষ্টি করিতেছে, তাহা আত্মবিস্মৃতি মাত্র।

কৃষ্ণ কমলের রাধিকা চৈতন্য দেবের ছায়া। তাঁহার প্রেমের আবেগ নির্ম্মল, নিষ্কাম ও আত্মবিস্মৃতি পূর্ণ। রাধিকা এই প্রেমের আবেশে জড় জগতের স্তরে স্তরে কৃষ্ণ সত্বা অনুভব করিতেছেন। তাঁহার প্রেম বিলাপ প্রলাপের ন্যায় অসম্বদ্ধ, মধুর ও আত্ম-বিহ্বলতার কারুণ্য মাখা। কবি প্রেমচিত্রের মোহিনী মুগ্ধ, রাধিকাকে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে সুন্দরী করিয়া গড়িয়াছেন। তাঁহার মধুমাখা কণ্ঠধ্বনি ও প্রেমাশ্রু উদ্বেলিত চক্ষুর সৌন্দর্য্য বুঝাইতে কম্বু কি কমলের তুলনার আবশ্যক নাই। চন্দ্রাবলী মূর্চ্ছাপন্ন রাধিকার রূপ দেখিয়া বলিতেছেন—

"যখন বঁধুর বামে দাঁড়াইত,
আবার হেসে হেসে কথা কত,
তখন এই না মুখে,
মুখের কতই যেন শোভা হত,
তা নৈলে এমন হবে বা কেন,
বঁধু থেকে আমার বক্ষঃস্থলে,
কেঁদে উঠিত রাধা বলে,"

এইরূপ মৌলিক সমালোচনায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রত্যেক পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ। দীনেশ বাবু নিজে কবি। সহানুভূতি গুণে কাব্য-সমালোচনায় তিনি সহজ-সিদ্ধ। আর্য্য-লিপির উৎপত্তি, বঙ্গভাষার জননী কে, বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির আবির্ভাব কাল নির্ণয়, ইত্যাদি বিষয়ে দীনেশ বাবুর সহিত আমাদের মতের ঐক্য নাই, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির বৈষ্ণব কবিগণের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট মতভেদ আছে। যদি অবসর পাই, সে সকল কথার সমালোচনা সময়ান্তরে করা যাইবে। এই সকল মতভেদ আমাদের দৃষ্টি অন্ধ করিতে পারে নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, এই গ্রন্থগুণে দীনেশ বাবু অমরত্ব লাভ করিবেন। বীজ ও প্রফুল্ল কুসুমে যত প্রভেদ, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের গ্রন্থ ও দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থে ততই প্রভেদ।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

সাহ আকবর এবং শ্রীমচ্চৈতন্য সম্প্রদায়। (১)

(শ্রীধাম নীলাচলবাসী শ্রীযুক্ত ভগবন্ত দাস মোহান্ত মহারাজের পত্রের উত্তর।)

হিন্দি ভক্তিমালা প্রভৃতি গ্রন্থ এবং পদ সমুদ্র হইতে উদ্ধৃত।

৪০০ শত বৎসরের পূর্ব্বে অর্থাৎ যবনাধিকার সময়ে যবন কর্তৃক ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুদিগের সনাতন ধর্ম্মের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার এবং যতদূর আততায়িতার কার্য্য সংঘটিত হইতে হয়, তা হইয়াছিল।

যবন সৈন্যগণ যবন-সম্রাটের প্রশ্রয় পাইয়া, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দলে বলে উপস্থিত হইয়া, হিন্দুধর্ম্ম উচ্ছেদ মানসে এক হস্তে শাণিত

তরবারি অস্ত্র হস্তে কোরাণ লইয়া হিন্দুদিগের ধন প্রাণ, মান সম্ভ্রম, এ সমুদায় হরণ, দ্বিতীয় হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থস্থানের দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও দেবমন্দির ধ্বংস, তৃতীয় ধর্ম্মপুস্তক সকল জলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ ও ভস্মরাশি এবং হিন্দুদিগের অতি পূজ্য গৃহপালিত গো, এবং বৎস্য প্রভৃতি হিন্দুর গৃহেই হত্যা এবং সেই মাংস হিন্দুর পবিত্র গৃহেই পাক এবং আহার করিয়া সেই উচ্ছিষ্ট এবং নিষ্ঠীবন হিন্দুদিগের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া অনেক হিন্দুর জাতি নষ্ট করিয়াছিল। সেই ধর্ম্মবিপ্লবে ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় রক্ষাকর্ত্তা কেহই ছিলেন না। ইতিহাসের ইহাই সংক্ষেপ বিবরণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন ;—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ঈশ্বরের এই বচনানুসারে মহাজনে বলেন, যিনি সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ আর ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। বেদ, উপনিষদে, শ্রীমন্নারায়ণের ধ্যানে ;—

"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী
নারায়ণ ; সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ
কেয়ূরবান্ কণককুণ্ডলবান্ কিরীটিধারী
হিরণ্ময় বপু" ধৃত শঙ্খ চক্র ॥

অর্থাৎ বেদের যে অংশে ঈশ্বর নিরূপণ ও গুণাবতারের যেরূপ নির্দ্দেশ আছে, সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বদেবাত্মক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হিরণ্ময় নরবপু ধারণ করিয়া ১৪০৭ শকে গৌড়দেশান্তর্গত শ্রীধাম নবদ্বীপে (মায়াপুরে) অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসীবেশে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গাদি দেশ পরিভ্রমণ করত সাঙ্গোপাঙ্গ সমভিব্যাহারে হরিনাম জোরডঙ্কায়, জগৎ কাঁপাইয়া ও মাতাইয়া, দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন এবং যুগধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন। যথা পুরাণে আছে ;—

"কলৌ তদ্ধোরি কীর্ত্তনাৎ'

কেবল হরিনাম। এই যুগধর্ম্ম স্থাপনান্তে ১৪৫৫ শকে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের ৯ বৎসর পরেই, ১৪৬৪ শকে আকবরের জন্ম হয়। তিনি ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমে অক্ষুণ্ণ প্রতাপের সহিত ভারতের রাজা হইয়া, ৬৩ বৎসর নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যসুখ ভোগ করণানন্তর, ১৫২৭ শকে ইহলোক ত্যাগ অর্থাৎ পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। যে সময়ে সম্রাট সাহ আকবর বিবিধরত্ন-খচিত দিল্লীর রাজতক্তে উপবিষ্ট, সেই সময়ের কিছু পূর্ব্বে কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র গৌড়-পাতসাহের প্রশংসনীয় মন্ত্রী শ্রীমৎ সনাতন এবং শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী (দুই ভাই) কর্ত্তৃক শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ সমুদায় উদ্ধার এবং সম্রাটের প্রিয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত মানসিংহ কর্ত্তৃক শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর স্থাপিত শ্রীবৃন্দাবনে যোগপিঠে বিরাজিত শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর প্রস্তর-নির্ম্মিত শ্রীমন্দির সম্রাটের অনুমোদনেই ১৩ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে ভক্তিমালা গ্রন্থেও জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ আছে।

সম্রাট আকবর যদিও যবনকুলে উদ্ভব হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অধিক আস্থা ছিল। এমন কি, তৎপূর্ব্বে কোন বিজাতীয় রাজা তাঁহার ন্যায় হিন্দু সমাজে পূজিত হন নাই। তিনি প্রকৃত জনকের ন্যায় প্রজাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

পক্ষপাত রূপ কলঙ্ক কখনই তাঁহার হৃদয়কে

কলুষিত করিতে পারে নাই। প্রজার মঙ্গল কামনা এবং হিতসাধন তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দু কি বৈষ্ণব শাস্ত্র কখনও অবজ্ঞা করিতেন না। আদদের সহিত সর্ব্বতোভাবে মান্য, এবং বর্ণ বা ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া লোকের গুণানুরূপ এবং পুরস্কার স্বরূপ রাজকার্য্যে নিয়োগ ও সম্মান করিতেন। হিন্দুদিগের ন্যায় কৃতজ্ঞ জাতি অতি বিরল, তাঁহারা তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে কখনই ক্রটী করিতেন না। তিনি এ পর্য্যন্ত আমাদিগের প্রাতঃস্মরনীয়।

কথিত ও প্রতিষ্ঠা আছে—"দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা।" কিছু কম ৩০০ শত বৎসর হইল সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে,তথাপি অনেক হিন্দু "শ্রীরামচন্দ্রি মোহরের ন্যায়" আকবরের স্বর্ণ মোহরের পূজা করেন। সাধারণের ইহা বিশ্বাস যে, উহা গৃহলক্ষ্মীর হাঁড়ির ভিতর থাকিলে লক্ষ্মী অচলা হয়েন।

দিল্লীশ্বর, সুযোগ্য অমাত্য মৌলবী ফৈজু ও আবুল ফজল এবং মিত্র রাজা তোড়ল মল, ও মান সিংহ প্রভৃতি সভা-সদ্বর্গকে লইয়া সর্ব্বদাই রাজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। এবং মিত্র রাজাগণের মন্ত্রণা মতে প্রায় সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ঈশ্বরের স্তুতিপাঠ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ এবং সঙ্গীতানুশীলনে তাঁহার অধিক যত্ন ও অনুরাগ ছিল। তাহারই চর্চ্চায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। আরব্য ও পারস্য বিদ্যায় অতি সুদক্ষ ও সুলেখক ও সুপণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। সকল ভাষাই জানিতেন। সংস্কৃত নল দময়ন্তি ও লীলাবতী প্রভৃতি অনেক গুলি গ্রন্থ পারস্যভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার দরবারে সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদ বিখ্যাত "কালোয়াৎ" মিঞা তানসেন ও সঙ্গীত-অধ্যাপক সরিমিঞা প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও অনেকানেক যন্ত্রবিৎ বিজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে সময়োচিত রাগ রাগিণী সঙ্গীত আলাপ ও বীণাদি যন্ত্র বাদন দ্বারা সম্রাটের চিত্ত বিনোদন করিতেন।

একদিন, রাজার দরবারে সঙ্গীত চর্চ্চা কালীন তানসেনের গানে রাজা মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করেন,হে কিন্নর! আপনার সুকণ্ঠ-নিসৃত বহু প্রকার ঈশ্বরের স্তোত্র-পাঠ-গীত শুনিয়াছি, কিন্তু বর্ত্তমান কালের গৌড়ের ঈশ্বর সঙ্গীত-গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর স্তুতি-পাঠ শুনি নাই কেন? তাঁহার শিষ্য শ্রীসনাতন গোস্বামী দেব ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃতে যে একখানি গীতাবলী লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন,এক সময় পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, তাহা অতি মধুর এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেই পরমার্থ ভাবের কোন গীত কি আপনার শিক্ষা আছে? সেই গীত শুনিতে আমার অধিক বাসনা। সম্রাট কর্ত্তৃক এই আদেশ হইবা মাত্রই রাজার ইচ্ছা পরিপূরণার্থে তানসেন শিষ্যদিগকে লইয়া তান, মান,লয়,এবং সুর সংযোগে ;—

রাগিণী কেদার, তাল ধামার।

অখিল কলিমল নাশক! পরদেব! সেবক পালক।
নব ভূমীশ! হে শ্রীগৌরাঙ্গ! নিখিল যুগভয়-হারক।
জয়তু মানব, ব্যাস-মুনিকৃত, লুপ্তধর্ম্ম বিকাশকঃ।
গোষ্ঠীং বিভো! কুরু সদানন্দং জন-মনোরথপূরকঃ।
পাদপদ্মে যান্তু ভৃঙ্গ, স্তব নিমর্জ্জতু, শীতলে,
দুষ্ট সঙ্গ ; হে হরে! জহি পাতু বর্ব্বয় শোধকঃ।
যাচমের মেলচ্ছ কুসুম, ভাব যাচক শর্ম্মদঃ।
বিলসতু সদা মম মানসে কলি দুষিতে ভব নাবিকঃ।

(গীতাবলী)

অদ্যাপি যাঁহার সে সময়ের সে প্রতিমূর্ত্তিকে অরুন্ধতী নক্ষত্রের অমন জ্যোতির ন্যায় পূজা করে, সে স্বর্গপ্রণয়িনী শকুন্তলা সংসারে একবার একটী বই আর ফোটে নাই।"

কালীপ্রসন্ন বাবুর দুঃখে সুখ, নদীর জল প্রভৃতি পড়িতে হৃদয় স্নিগ্ধ হয়, নয়ন জাহ্নবীর সলিল কলবাহী মরুত হিল্লোল হৃদয়ের উপর দিয়া বহিয়া যায়। চোখের জলে প্রাণের সহিত আমরা আশীর্ব্বাদ করিয়াছি তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া এইরূপে মাতৃভূমির সেবা করুন।

৬৯। **ভারতের জন্য ব্রাহ্মসমাজ কি করিয়াছেন।**—শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চাশত্তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এই প্রবন্ধটী পঠিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম সমাজের অসাধারণ ক্ষমতা, পাদরী ডফের মত বিচক্ষণ লোক এক দিন অনুভব করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ইতিহাস-লেখককে ব্রাহ্ম-সমাজশক্তির পরিমাণ করিতে হইবে। সমাজ, সাহিত্য, শাসন প্রণালী, সকল বিষয়েই ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব [illegible]। অবিবেচক লোকে [illegible], কিন্তু কোথা হইতে সে [illegible] লাভ হইল, তাহার বিচার করিতে অপেক্ষা করে না। এজন্য ব্রাহ্ম সমাজের এখন কিছু অনাদর, অবিবেচক লোকের নিকট ঘটিয়াছে। এজন্য এরূপ একখানি গ্রন্থের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থকার বিশেষ গবেষণার সহিত দেখাইয়াছেন, ভারতবর্ষ ব্রাহ্মসমাজের নিকট কত বিষয়ে ঋণী হইয়াছেন।

সম্ভবতঃ এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। সেজন্য গ্রন্থকারকে আমরা কয়েকটী অনুরোধ করিতে চাই। একটী শক্তির ফল দেখাইতে হইলে সচরাচর স্থূল বিষয়গুলি উল্লেখ করা যায়; গ্রন্থকারও তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু অস্থূল বিষয়ে শক্তির সঞ্চার অনুসরণ করায় প্রকৃত কৃতিত্ব প্রকাশ পায়, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহার কিরূপে ব্রাহ্মসমাজ প্রভাবিত করিতেছে, গ্রন্থকার সে গুলি দেখাইয়া দিলে ভাল হইবে। অন্য পক্ষে যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা পূর্ণমাত্রায় দেওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সমাজ, সাহিত্য ও শাসন প্রণালী কোন একটী শক্তি বিশেষের ফল বলিয়া বোধ হয় না। বিদ্যাচর্চ্চা, য়ুরোপীয় সমাজের আদর্শ, ইংরাজের শাসন প্রণালী, ব্রাহ্ম সমাজের ন্যায় অল্প বা বহু পরিমাণে ভারত সমাজকে প্রভাবিত করিতেছে; হয়ত ব্রাহ্মসমাজই ঐরূপ সমবেত শক্তির অংশ। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের সমক্ষে এইখানে। এই সকল বিদ্যমান অর্থী প্রত্যর্থীর প্রার্থনা সুবিচারের তুলাদণ্ডে নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে, পক্ষপাতের ভাগী হইতে হয়। এজন্য, বোধ হয়, ব্রাহ্মসমাজ ভারতের জন্য কি করিয়াছেন, ইহার মীমাংসা একজন ব্রাহ্ম অপেক্ষা একজন নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু অন্য-সম্প্রদায়ী নির্দ্দেশ করিলে, সাধারণের নিকট অধিকতর সম্মাননীয় হইবার সম্ভাবনা। যতদিন অন্যধর্ম্মাবলম্বী অপরে ব্রাহ্ম সমাজের চিত্র নিরপেক্ষ ভাবে চিত্র না করিবেন, ততদিন ব্রাহ্মকেই সে ভার লইতে হইবে, এবং এভার গ্রহণ করিবার পক্ষে নবকান্ত বাবুর ন্যায় নিরপেক্ষ, সত্যপ্রিয়, সংযত লেখক সর্ব্বাপেক্ষা সম্মাননীয়। কিন্তু যোদ্ধার মুখে যুদ্ধের সংবাদ শুনিতে হইলে, কিছু বাদ দিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। সমাজ-সমরে নবকান্ত বাবু সামান্য সৈনিক নহেন, একজন সেনাপতি; অথচ তিনি সাধ্যমত নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়াছেন। এজন্য আমাদের নিকট সম্মাননীয় হইয়াছেন।

৭০। **মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত।**—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ২৲। অতি অল্প দিনের মধ্যে এই গ্রন্থের দুই সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়, এ পুস্তকখানি কত মূল্যবান হইয়াছে। বস্তুতঃ যোগীন্দ্র বাবুর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত ও চণ্ডী বাবুর বিদ্যাসাগর-চরিতের ন্যায়, এ পুস্তকখানি পুস্তকাগারে না থাকিলে, পুস্তকাগার সুশোভিত হয় না। প্রথম সংস্করণের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, তৃতীয় সংস্করণ প্রায় ছয় গুণ বড় হইয়াছে। এই সংস্করণে রাজার জীবনী সম্বন্ধীয় অনেক নূতনকথা ও রাজনৈতিক, সামাজিক

এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে রাজার মতামত এবং রাজার অধিকাংশ গ্রন্থের সারমর্ম্ম দেওয়া হইয়াছে। পাঠকদিগের বোধসৌকর্য্যার্থে রাজার রচনা অনেক স্থলে নগেন্দ্র বাবু আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের, বাবু দ্বারকা নাথ ঠাকুরের, লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক এবং ডেভিড হেয়ারের প্রতিকৃতি ও রাজার সমাধি মন্দিরের প্রতিকৃতি এবং বংশ-তালিকা দিয়া অতি সুন্দর আকারে এবং ভাল বাধাইয়া গ্রন্থখানি প্রচার করা হইয়াছে। পুস্তকের রচনা সম্বন্ধে আমরা বারম্বার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছি। সুতরাং এবারে আর নূতন কিছু বলিবার নাই। এমন সুন্দর গ্রন্থ খানি লিখিয়া নগেন্দ্র বাবু আপনি ধন্য হইয়াছেন এবং আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

৭১। ছেলেদের রামায়ণ।— শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি এ প্রণীত। মূল্য ।৵০, বাঙ্গালা ভাষার অস্থি মজ্জায় রামায়ণ ও মহাভারত। বাইবেল না জানিলে যেমন ইংরাজী ভাষা শিক্ষা হয় না, তেমনি রামায়ণ মহাভারত না জানা থাকিলে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা হয় না। ঐতিহাসিক এক চক্ষে এই সকল গ্রন্থ দেখিবেন, হিন্দু অন্য চক্ষে দেখিবেন, পণ্ডিত অন্য চক্ষে দেখিবেন। আমরা ভাষাবিতের চক্ষে দেখিলাম। পুস্তক এবং প্রচলিত কথায়, রামায়ণ মহাভারতের উদাহরণ সর্ব্বত্র। এজন্য রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যায়িকা ভাগ অতি বাল্যকাল হইতে ছেলে মেয়েদিগকে শিখান উচিত। পূর্ব্বে কর্ত্তা ও গৃহিনীরা গল্পচ্ছলে শিশুদিগকে এই সকল আখ্যায়িকা শিখাইতেন। নানা কারণে তাঁহাদের এখন সে অবসর নাই।

ছেলেদের বোধগম্য ভাষা লেখা কত দুরূহ, যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। আবার অঙ্গভঙ্গী করিয়া কথকেরা যে ভাবে আখ্যায়িকাগুলি শ্রোতার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেন, গ্রন্থকারের সে সুবিধা নাই। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, উপেন্দ্র বাবু ভাষাকে সহজ করিতে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, অথচ গ্রাম্যতা দোষে দূষিত হন নাই। পক্ষান্তরে স্বহস্তে অতি সুন্দর চিত্র খোদিত করিয়া শিশুদের চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন. তাঁহার ছেলেদের রামায়ণ বাঙ্গালা ভাষার [illegible] পূর্ণ করিয়াছে। ছেলেদের রামায়ণের ভাষা কেমন সহজ হইয়াছে, তাহার একটু নমুনা এইখানে দেখান গেল।

"[illegible] রাণীর একটা দাসী ছিল, তার নাম মন্থরা। মন্থরার পিঠে কুঁজো, শরীর বাঁকা ও দেখিতে যতদূর [illegible] হইতে হয়। তার [illegible] আবার তেমনি হিংসুকে। রাম যে দিন রাজা [illegible], সেই দিন ভোর বেলা মন্থরা ছাতে উঠিয়াছিল। ছাতে উঠিয়া সে দেখিল যে, চারিদিকেই লোকেরা [illegible] আনন্দ করিতেছে। ঘর দুয়ার সাজাইয়াছে। গান বাজনা হইতেছে। সকলেই ভাল ভাল পোষাক পরিয়াছে। এ সব দেখিয়া মন্থরা [illegible] জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাগা, এ সব কিসের গোলমাল?" সেই [illegible] বলিল "তাও জান না? [illegible] যে আমাদের রাম রাজা হবেন।" এ কথা [illegible] মন্থরার বড় হিংসা হইল।

৭২। [illegible]। মাইকেল মধুসূদন [illegible] জীবনচরিত প্রণেতা শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু, বি-এ, প্রণীত, মূল্য ৷৷০। মহাপ্রস্থান, মাতৃস্নেহ, পুরুরাজ ও আলেকজান্দর, [illegible] চক্রধ্বজের প্রতি বিষ্ণুপ্রিয়া, অনাথিনী, [illegible], একনাথস্বামী, স্বর্গারোহণ (বিদ্যা [illegible] মুগ্ধ [illegible]) দধীচের তনুত্যাগ, মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্বপ্ন, ধ্রুবের তপস্যা, চিত্রদর্শন [illegible] এই [illegible] বিষয়ে পু[illegible]কখানি সমাপ্ত হইয়াছে। পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত হইয়াছে। পুস্তকখানি সমস্ত পাঠ করিয়া আমরা যার-পর নাই পরিতৃপ্ত হইয়াছি। বিষয় নির্ব্বাচনে গ্রন্থকার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। কবিতার সরসতায়, ভাষার প্রাঞ্জলতায় এবং বিশুদ্ধতায় এবং মার্জ্জিত রুচির সমন্বয়ে এ পুস্তকখানি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। মাইকেল-জীবন-চরিতে যোগীন্দ্রবাবুর যে অসাধারণ [illegible] জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এই পুস্তকের পদে পদে [illegible] তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। আমরা [illegible] রূপ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, এ পুস্তকখানি ছাত্র[illegible] শ্রেণীর [illegible] উপযোগী হইয়াছে। পাঠ্য[illegible] কমিটী এই পুস্তকখানিকে পাঠ্য [illegible] করিবেন, আমরা [illegible] পাঠ্য-নির্ব্বাচক [illegible] নিকট [illegible] মনে [illegible] বৃন্দের [illegible] উপকার [illegible] বলিতে [illegible]।

রাগ রাগিণীর কৌতুক তরঙ্গ দেখাইবার কালেই সম্রাট ভাবে বিহ্বল হইয়া গদ্গদ কণ্ঠে তানসেনকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন ;—হে সঙ্গীতবিৎ! আপনার সঙ্গীত-গুরু কে? তিনি কোথায় থাকেন, এখন কি কাজে লিপ্ত? তাঁহাকে সঙ্গীত-সভায় আহ্বান করিলে উপস্থিত হইতে পারেন কি না? তানসেন উত্তর করিলেন:—হে নরেন্দ্র! আমার গুরু শ্রীশ্রীবঙ্কুবিহারী দেবের কৃপা পাত্র "আজমীর নিবাসী" স্বামী হরিদাস। তিনি এখন শ্রীবৃন্দাবনে যমুনা-তটে পর্ণকুটীরে বাস করেন। শুনিয়াছি, মহা-শক্তিসম্পন্ন অতিবদান্য শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীমদ্রূপ এবং শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট প্রভৃতি গোস্বামী প্রভু পাদগণের অনুগত। তাঁহাদের সঙ্গলাভে, এখন কোথাও যাইতে ও কাহারও সহিত আলাপ করিতে ভালবাসেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীহরিরাম ব্যাস এবং কনিষ্ঠ শ্রীআনন্দ ঘন এবং মধ্যম স্বয়ং শ্রীহরিদাস স্বামী, অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিষয়-কার্য্য ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। এখন তাঁহারা অবধূত বেশে অৰ্দ্ধ-উন্মীলিত লোচনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম গান ভজনে উন্মত্ত। আনন্দ ঘন (মিরাবাই তুল্য) একজন বিখ্যাত সঙ্গীত কবি অর্থাৎ পদকর্ত্তা। জ্যেষ্ঠ হরিরাম রঙ্গ মহলে থাকিয়া শ্রীশ্রীকিশোর কিশোরী জীর সেবা করেন। হরিরামের সেবা হস্তে পিকদানী; আনন্দ ঘনের সেবা পাদ-সম্বাহন এবং স্বামীজীর সেবা চামর-ব্যজন।

এস্থলে শ্রীমন্নাভাজী হিন্দি ভক্তমালে দোহাছন্দে লিখিয়াছেন,—

"নবকুমার চক্রচূড়া নৃপতি সামরো।"ইত্যাদি।

বঙ্গানুবাদে শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী পদ্য ভক্তমালে লিখিয়াছেন,—

> ব্যাসজীর সেবা, সদা পিকদানী হাতে।
> থাকেন যুগল পার্শ্বে, রঙ্গ মহলেতে॥
> হরিদাস ঠাকুরের, চামর ব্যজন।
> আনন্দ ঘনের সেবা, পাদ-সম্বাহন॥
> এতেক শুনিয়া রাজা, আনন্দ হইল।"
>
> (ভক্তমাল)

প্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী যে মহা প্রভাবশালী, সম্রাট তা পূর্ব্বেই রাজা মানসিংহের প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়াছিলেন। তানসেনের মুখে তাঁহার আবার প্রতিষ্ঠা এবং হরিদাস স্বামীর গুণ গান শুনিয়া তাঁহাদের দর্শন ও গীত শ্রবণের নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। পরন্তু মনের ভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না।

পরদিন, শ্রীবৃন্দাবন গমনের নিমিত্ত রাজ পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বহু মূল্য মণিমাণিক্য গুপ্তভাবে সঙ্গে লইয়া মিয়া তান সেন সমভিব্যাহারে পদব্রজে আগ্রা রাজধানী হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। অন্যান্য শিবিকাদি যান, হয়, হস্তি, পদাতি পাশ্চাৎ গমন করিল। সঙ্গে মণি মাণিক্য গুপ্ত অর্থ লইবার তাৎপর্য্য, কোন দেবালয়ে কি সাধুর নিকট গমন করিলে রিক্তহস্তে যাইতে নাই; প্রভু সনাতন যদি কোন দেবালয় স্থাপনের ইচ্ছা করেন, রাজা মান সিংহ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীর শ্রীমন্দির যেরূপ নির্ম্মাণ হইয়াছে, ততোধিক টাকায় দেবমন্দির স্থাপন করিবেন, রাজার ইহাই ইচ্ছা। কিন্তু সে কথা অপরের নিকট অপ্রকাশ্য। ক্রমশঃ

শ্রীহারাধন দত্ত।

স্বামীজীর সহিত কথোপকথন।

বঙ্গের কায়স্থ বংশ অনেক উজ্জ্বল রত্ন প্রসব করিয়াছে। রাজা প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম পাঠান ও মোগল শাসনের শেষ সময়ে স্বনামখ্যাত বীরপুরুষ—স্বচেষ্টায় উন্নত ও স্বাধীন রাজ্যের স্থাপয়িতা। তাঁহারা তত্তৎ সময়ের বঙ্গের শিবজী। পুণ্যভূমি যশোহরে বর্ত্তমান সময়েও এক বীর পুরুষের নাম শুনা যায়। ইনি সুদূর ব্রাজিলে

নেথরয়ের যুদ্ধে বিখ্যাত বাবু সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস। ইনি ধার্ম্মপলীর যশোগৌরব ম্লান করিয়া জগতে যশস্বী হইয়াছেন। ধর্ম্মাধিকরণের অত্যুজ্জ্বল রত্ন ৺ দ্বারকা নাথ মিত্র ও শ্রীযুক্তেশ্বর রমেশচন্দ্র মিত্রের কথা কে না জানে? বিজ্ঞান-বিভাগে বাবু জগদীশ চন্দ্র বসু আজ সমস্ত জগতে খ্যাত। ধর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্রে অতীব যশস্বী বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত আমাদের জন্য বিদ্যুতগতিতে যে প্রকার সমুদয় ঋক্ বেদের অনুবাদ এবং সমুদয় হিন্দু শাস্ত্রের মূলানুবাদ সহ সার সংগ্রহ—ওল্ড ও নিউ টেষ্টেমেণ্টের ন্যায়—সমুদয় শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, ইতিহাস লিখিয়া ব্যাসের মহাভারতের ন্যায় আপন মহাভারত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার তুল্য নাম ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু আমরা যে কায়স্থ সন্তানের কৃতিত্বের বিষয় উল্লেখ করিতেছি, তাঁহারও ধীশক্তি কম নহে। ইনি প্রচ্ছন্ন নামে খ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ। ইহার প্রকৃত নাম নরেন্দ্র নাথ দত্ত। ইনি কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধিধারী—এমেরিকা ও ইউরোপে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সম্প্রতি গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন। ইহার সহিত বসুমতী-সম্পাদকের যে কথপোকথন হইয়াছিল. তাহাই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। ঐ কথোপকথনের কতকাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি

প্র। ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম্ম এখনও আছে কেন?

উ। দুই কারণে। খ্রীষ্টধর্ম্মে যেরূপ প্রকৃতির উপযোগী, সেরূপ সরলবিশ্বাসী অনেক মহাত্মা আছেন বলিয়া এবং উহা পৈত্রিক ধর্ম্ম বলিয়া এখানে আজকালকার অশাস্ত্রীয় ছুঁই ছুঁই ধর্ম্ম—শাস্ত্রীয় ধর্ম্মবোধে সরল বিশ্বাসে এক শ্রেণীর লোক তদনুরূপ অনুষ্ঠান করে, অপর শ্রেণী ইহা না মানিলেও পৈত্রিক আচার বলিয়া রক্ষা করে মাত্র।

প্র। আগে কি এরূপ ছুঁই ছুঁই ভাব ছিল না?

উ। না। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি আধুনিক পুরাণ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া দেখুন, শাস্ত্রে কুত্রাপি এমন পাইবেন না যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই ত্রিবর্ণের মধ্যে পরস্পরের স্পৃষ্ট অন্নাহার সম্বন্ধীয় কোন ও বাধা ছিল। শুদ্ধ তাহা নহে, পূর্ব্বে দ্বিজ বর্ণের পাচক শূদ্রই ছিল। এখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন না। আপনারা কি মনে করেন—বাঙ্গালার এত লোক মুসলমান হইয়াছিল কেবল তরবারীর জোরে? বাঙ্গালী মুসলমান জাতিকে সকল নাটকের বদমাইসের স্থানীয় করিয়া মুসলমান চিত্র বড়ই বিকৃত করিয়া আঁকিয়াছে। মুসলমানের সদংশ বাঙ্গালী আদৌ দেখিতে পায় না। মুসলমানধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের ইতর শ্রেণীর পক্ষে জুড়াইবার আশ্রয় স্থান স্বরূপ হইয়াছিল বলিয়া এত মুসলমান হইয়াছিল আমি দেখিয়াছি, মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণ যে পথে যান, চণ্ডাল সে পথে যাইতে পায় না; কিন্তু সেই চণ্ডাল খ্রীষ্টান হইলে অবাধে সেই পথে যাইতে পারে।

প্র। যে হিন্দুধর্ম্মে অদ্বৈতবাদ রহিয়াছে, সে হিন্দু ধর্ম্মে এত ছুঁই ছুঁই ভাব দেখি কেন?

উ। খ্রীষ্টধর্ম্মের স্রোতে আমাদের জাতীয়তা নাশ করিতেছিল, মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় সেই জাতীয়তা বজায় রাখিয়া তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই মহান উদ্দেশ্য সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জনকয়েক লোক পাশ্চাত্য মত প্রচার দ্বারা আমাদিগকে জাতীয়তাশূন্য করিতে প্রয়াসী হইতেছিল; এখনও দুই এক জন করিতেছে। ইহারই বিরুদ্ধে একটী প্রতিক্রিয়া এখন চলিতেছে। এই ভাব নষ্ট করিবার জন্য কয়েক বর্ষ ধরিয়া এক বিপুল আন্দোলন স্রোত চলিতেছে। তাহাতে শাস্ত্রীয় তত্ত্ব প্রচারের সঙ্গে স্থানীয় আচার-প্রসূত জাতিবিদ্বেষও প্রচারিত হইতেছে। তাই আপনি এ সময়ে এই ছুঁই ছুঁই ভাবের এত প্রাবল্য দেখিতেছেন। এখনও ঠিক সাম্যাবস্থা হয় নাই। আমাদের পরেই যে বংশাবলী আসিতেছে, তাহারা ঠিক শাস্ত্রীয় পন্থার অনুসরণ করিবে। তখন আর ছুঁই ছুঁই ভাব থাকিবে না, অথচ সকলে পূর্ণ হিন্দু হৃদয় লাভ করিবে। এই প্রতিক্রিয়া না থাকিলে আমরা এতদিন জাতীয়তা হারাইতাম।

প্র। সকল বর্ণের কি সন্ন্যাসে অধিকার আছে?

উ। আছে।

ইউরোপে এখনও খ্রীষ্টধর্ম্ম আছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া তিনি যে প্রকারে হিন্দু ধর্ম্ম-সংস্কারের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই নামের উপযুক্ত; আর বোধ হয় যদি বুথ সাহেব হিন্দু হইতেন, তবে তিনিও ঐরূপ উত্তর করিতেন। উহাতে এদেশের সমস্ত হিন্দু জাতির অবস্থাজ্ঞান ও তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সম্যক্ জ্ঞান যে বক্তার হৃদয়-কন্দরে লুকা-

যিত, তাহা অনুভূত হইতেছে। সার্ব্বভৌম হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকের নিকট ভিন্ন এরূপ সহৃদয় অবস্থাজ্ঞান আর কাহার নিকট আশা করা যাইতে পারে?

এই "ছুঁই ছুঁই ভাব" যে হিন্দুধর্ম্ম নহে, ইহা যে অশাস্ত্রীয়, একথা ব্যক্ত করিয়া, অযাচিত ভাবে ব্যক্ত করিয়া স্বামীজী সকল হিন্দুর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্মের মহিমা এই স্পর্শ-দোষ প্রথা-রূপিনী রাক্ষসী হরণ করিয়াছে। ইহাকে বধ করাই প্রধানতম হিন্দু-প্রচারকের চিন্তার বিষয় হইবে না ত কি হইবে?

দ্বাদশ খণ্ড নব্যভারতের দ্বাদশ সংখ্যায় "স্পর্শ দোষ প্রথার রাক্ষসী মূর্ত্তি" নামে যে প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে এই প্রথাকে সাত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১। বৈদ্যুতিক স্পর্শ দোষ। ২। ছায়া-স্পর্শ দোষ। ৩। গাত্রস্পর্শ দোষ। ৪। জল-স্পর্শ দোষ। ৫। খাদ্যস্পর্শ দোষ। ৬। দেব-স্পর্শ দোষ। ৭। পরমাত্মা স্পর্শ দোষ।

স্বামীজী স্বয়ংই বৈদ্যুতিক স্পর্শ দোষের এক উদাহরণ দিয়াছেন। মান্দ্রাজে যে পথে ব্রাহ্মণ যায়, চণ্ডালকে সে পথে যাইতে দেওয়া হয় না। কি জানি চণ্ডালের দৃষ্টিতে কোন বৈদ্যুতিক শক্তি বলে যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ধ্বংস হয়। ছায়া, গাত্র, জল ও খাদ্য নামীয় স্পর্শদোষে যে অনেক হিন্দু জাতি দূষিত, তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। দেবস্পর্শ-দোষে অনেক ব্রাহ্মণও দূষিত আছেন। ব্রাহ্মণ হইয়া না জন্মিলে জন্মান্তরেও যে মুক্তি নাই, ইহাকেই আমরা পরমাত্মা স্পর্শদোষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। এই কদর্য্য সপ্তবিধ স্পর্শদোষ প্রথাই বর্ণ-বিদ্বেষ প্রচারক পত্রসমূহে, অধিকার ভেদ বলিয়া প্রচ্ছন্ন নামে প্রচারিত হইয়া থাকে। কেননা, এই পিশাচীকে যাহারা আপন কার্য্যের সহায় করিয়া লইয়াছে, তাহারাও ইহার নামোল্লেখে সাহসী নহে। এই পিশাচী আজ হিন্দুধর্ম্মকে পূর্ণগ্রাসে কবলিত করিয়াছে। স্বামীজী বলিতেছেন, ইহা অশাস্ত্রীয়। ইহা বেদে নাই এবং ইহা আধুনিক পুরাণেও নাই। এই যদি ঠিক কথা, তবে স্বামীজী এই প্রথা নিরসনের জন্যে বঙ্গে কোন আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারেন কিনা? ইহা আমাদের এক বিনীত প্রার্থনা।

স্বামীজী যে বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন, কর্ম্মই তাহাদের ধর্ম্ম। যাহা কর্ত্তব্য, প্রাণ গেলেও তাহা আমাদিগকে করিতে হইবে। প্রাচীন ক্ষত্রজাতি এই ভাবে অহরহ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন। বিশেষতঃ সমাজ সংস্কার জন্য প্রাচীন কাল হইতে শক্তি ও প্রতিভা-শালী, সমাজের মানদণ্ডস্বরূপ এই ক্ষত্র বা কায়স্থানুরূপ মধ্যবর্ত্তী জাতিই প্রসিদ্ধ। পুরাণে যে সকল অবতারের কল্পনা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে এক পরশুরাম ভিন্ন সকলই বিবেকানন্দের বর্ণেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরশুরামকে রামের সমকালে, কল্পিত করিয়া পুরাণকার স্পষ্টাক্ষরে ইহাই দেখাইতেছেন যে, যে বর্ণে আর্য্যানার্য্যের রক্ত সমতুল্য, এমন মিশ্রবর্ণোৎপন্ন নবদূর্ব্বাদল শ্যামল (না কৃষ্ণ না গৌরবর্ণ) রামচন্দ্রই হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার উপযুক্ত ধুরন্ধর। কেননা এতাদৃশ ব্যক্তিরই আর্য্যানার্য্যের সংযোগ হইবার উপযুক্ত সকল বর্ণের পূর্ণ বিশ্বাসের উপযুক্ত পাত্র। হিন্দুধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য গর্ব্বী ব্রাহ্মণের প্রয়োজন অল্প।

ফলে নিম্নশ্রেণীকে উন্নত করিয়া, উচ্চ শ্রেণীকে সংযত করিয়া, নিজে নম্র হইয়া, সমাজকে সাম্যাবস্থায় আনয়নপূর্ব্বক নব বলে বলীয়ান করার ভার বিধাতা কায়স্থাদি মধ্যবর্ত্তী জাতির উপরই ন্যস্ত করিয়াছেন। গন্তব্য পথে গমন করিতে আমাদের যে সাহস হইবে, আর কাহার তাহা হইবে না। স্থির নিশ্চিত পথে গমন করা—বীরের ন্যায় সমাজ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদেরই জাতীয় ধর্ম্ম। স্বামীজী স্বয়ংই ইহার এক উদাহরণ স্থল। এই কথা যদি সত্য হয়, তবে স্পর্শদোষ প্রথা পদদলিত করিবার জিনিস হইলে আমরা তাহা কেন করিব না? শত শত অনাচারণীয় হিন্দুদিগকে আলিঙ্গন করিয়া রামচন্দ্রের ন্যায় স্বর্গরাণী সীতারূপিণী ইন্দ্রাণীর কেন পুনরুদ্ধার করিব না? কেন

হলবাহিনী সীতাদেবী অনসনে, অমানে ও অপমানে চিরদিন রোদন করিবেন ?

স্বামীজী বঙ্গীয় মুসলমান বা কোরাণিক হিন্দুর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা আরও তত্বশালিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী। তিনি বলিয়াছেন "বাঙ্গালী মুসলমান জাতিকে সকল নাটকের বদমাইসের স্থানীয় করিয়া মুসলমান চিত্র বড়ই বিকৃত করিয়া আঁকিয়াছে।" দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের নিত্যপঠিত, বঙ্কিমচন্দ্র এতাদৃশ নাটককারগণের প্রথমাসনে উপবিষ্ট।

"মুসলমান ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের ইতর শ্রেণীর পক্ষে জুড়াইবার আশ্রয় স্থান" বলিয়া তিনি যে বঙ্গীয় মুসলমানগণের উৎপত্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও অতীব সত্য। নব্য বঙ্গের হিন্দুপাঠকের অবনতির জন্ত আমরা এস্থলে বঙ্গদেশের হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা দিতেছি। বাঙ্গালা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের অধীনে—

হিন্দু ৪,৫২,১৭৬১৮

মুসলমান ২,৩৬,৫৮,৩৪৭

যদি ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, বিহার ও পশ্চিম বঙ্গ বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে—

মুসলমান ১,৮৫,৪৩,১৫৮

হিন্দু ১,১৬,৬৮,৬৮৬

এইরূপে বঙ্গে বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও মধ্য বঙ্গে যে মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া এক জাতিকে যে প্রায় সম্পূর্ণ দ্বিধাকৃত করিয়াছে, তজ্জন্ত স্পর্শদোষ প্রথা দায়ী। একথা কেবল স্বামীজীর মত এমত নহে। ডাক্তার হণ্টর, মিষ্টর রিজলী, মিষ্টর বেবার্লী প্রভৃতি বিজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও ঐ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এস্থলে ১৮৭২ সালের জন-সংখ্যা-রিপোর্ট হইতে মিষ্টর বেবার্লী সাহেবের মত উদ্ধৃত করিতেছি।

"But probably the real explanation of the immense preponderance of the musalman religious element in this portion of the delta is to be found in the conversion to islam of the numerous low castes which occupied it. The Mahomedans were ever ready to make conquests with the Koran as with the sword under Sultan Jelalud din for instance it is said that Hindus were persecuted almost to extermination. The exclussive caste system of Hinduism again naturally re-couraged the conversion of the lower order from a religion under which they were no better than dispered outcastes, to one which recognized all men as equals".

এই প্রকারে স্পর্শদোষ ও বর্ণ ভেদের অত্যাচার দ্বারা আমরা কোটি কোটি লোককে জাতীয় ধর্ম্ম ও সমাজ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়া দুরপনেয় কলঙ্ক ও পাপে মগ্ন হইয়াছি, ইহার কি কোন প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না ? এই দেখুন, বিলাত-ফেরত বাবু অমৃতলাল রায় বৈদ্যসমাজে পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়া, বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ কায়স্থ সমাজে পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়া তত্তৎ সমাজে মিশিতে পারিয়াছেন। সেই প্রকারে কি করিম উদ্দিন, ছলী উদ্দিন সাহেব হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রবিষ্ট হইতে পারেন না ? খাদ্য বিচার লইয়া কথা কহিলেও, এমন অনেক মুসলমান আছেন, যাঁহারা মাংসাহার করেন না, মহম্মদ ও কোরাণকে মানেন না, মাংসাহারী ও ঈশ্লামী মুসলমানের পক্ক অন্নাহার করেন না, এবং তদবধি মুসলমানের সহিত আদান প্রদানের পরে আর কোন সংশ্রব রাখেন না, ইঁহারা কি, খাদ্য বিচারের চক্ষে দেখিলেও বাবু অমৃতলাল ও নগেন্দ্রনাথের অপেক্ষা হিন্দুত্ব লাভ করিতে কম সম্ভবান ? এইরূপ মুসলমানের সংখ্যা এখন দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। তাহা হইলেও যে উঁহাদের সংখ্যা লক্ষাধিক এক্ষণেও আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইঁহারা অনেকেই শম্ভুনাথ পণ্ডিত বা তাঁহার শিষ্যের শিষ্য। স্বামীজী কি এই সকল কোরাণিক হিন্দুকে হিন্দু ধর্ম্মের ক্রোড়ে পুনরানীত করিবার জন্ত বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজকে উৎসাহিত করিবেন ? কি প্রায়শ্চিত্ত করিলে কোরাণিক ও বৈদিক হিন্দুর সম্মিলন দৃঢ়ীভূত হয়, ইহা কি তাঁহার মত একজন প্রথম শ্রেণীর প্রচারকের চিন্তার বিষয় নহে ?

ফিরিয়াছেন তিনি বঙ্গে, অঙ্গে অঙ্গে এক্ষণ তাঁহার উচ্চ শ্রেণীর শক্তি সঞ্চালিত হইবে, কিন্তু ধর্ম্ম প্রচারকের প্রকৃত কৃতি-

ন্থের সূত্রপাত জনসমাজের নিম্নস্তর হইতে। তাঁহার হৃদয় যেরূপ প্রশস্ত, চিন্তা যেরূপ সর্ব্বত্র-প্রসারিণী, যদি কার্য্যকারিণী শক্তি সেইরূপ বিকশিত হয়, বা অন্যত্র হইতে আসিয়া জোঠে, তবেই বঙ্গে প্রকৃত সমাজ-সংস্কারের পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে। সমগ্র হিন্দু জাতিকে উদ্বোধিত করিতে হইলে, তাহাদিগকে নূতন বন্ধনে এক জাতীয়তায় বাঁধিতে হইলে, সহজ, সরল ও সর্ব্বজনাভীপ্সিত এই স্পর্শ-দোষ-প্রথা নিবারণই আদ্য সংস্কারের স্থানীয় করিয়া লওয়া উচিত। আমরা কি স্বামী-জীর এ দিকে কোন মনোযোগের চিহ্ন দেখিব না?

শ্রীমধুসূদন সরকার।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

৪৫। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ।—শ্রীশশী ভূষণ রায় প্রণীত। ইহা উৎকল ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থে ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মুখ্য বিষয় অপেক্ষা গৌণ বিষয়ের বর্ণনা অধিক দৃষ্ট হয়। লেখক অল্পবয়স্ক। আশা করা যায়, বয়সের পরিপক্কতা জন্মিলে, এই শ্রেণীস্থ গ্রন্থ দ্বারা তিনি উৎকল সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিতে পারিবেন। ভাষা বিষয়োপযোগী এবং সুমার্জ্জিত।

৪৬। অক্রূর সংবাদ।—ধর্ম্মমূলক নাটক, শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত, মূল্য ॥০। নামেতে সকলেই বিষয়-ব্যাপার বুঝিতে পারিতেছেন। গ্রন্থকার একজন প্রকৃত কবি, ইহার যথেষ্ট পরিচয় এগ্রন্থে পাওয়া যায়। পুরাতন কথা নূতন সাজে প্রচার করিয়া মন আকর্ষণ করা, সহজ কথা নয়। গ্রন্থকার ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আধুনিক নাটকী ছন্দ পুস্তকের গাম্ভীর্য্য কিছু নষ্ট করিয়াছে, মনে হয়।

৪৭। দানলীলা।—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত, মূল্য ।০। এখানিও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারের একখানি গীতি-নাট্য। এপুস্তকে কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম; কিন্তু রুচি কিছু অমার্জ্জিত।

৪৮। চরিত-কুসুম-মালা।—শ্রীকাশী চন্দ্র ঘোষাল প্রণীত; মূল্য ।০। কাশী বাবুর এ পুস্তকখানিও সুন্দর হইয়াছে। তবে একটী কথা এই, ইহাতে যে কয়টী লোকের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের কথা অন্যান্য যে যে পুস্তক এবং পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কথা উল্লিখিত হইলে ভাল হইত। তাহা উল্লেখ না করিয়া "প্রণীত" শব্দ ব্যবহার করিলে লোকের ভ্রম জন্মিতে পারে।

৪৯। বরাহনগর সুমতি সমিতির কার্য্যবিবরণ।—১৩০২-৩। এই অতি সংক্ষিপ্ত সমিতির কার্য্যবিবরণ পড়িয়া সুখী হইলাম।

৫০। শ্রীমৎ হরিদাসঠাকুরের জীবন-চরিত।—শ্রীঅচ্যুত চরণ চৌধুরী প্রণীত; মূল্য ।৵০। এই জীবনচরিতে সাধু হরিদাসের অনেক কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যত পড়া যায়, ততই আনন্দ পাওয়া যায়। হরিদাস যবন ছিলেন না। ইহাই এই গ্রন্থকারের প্রধান বক্তব্য বিষয়। হরিদাস ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মিয়া যবন-গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, গ্রন্থকার ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই বিষয় লইয়া পত্রিকাদিতেও অনেক বাদ বিচার গিয়াছে। এসম্বন্ধে নানা জনের নানামত থাকিলেও, হরিদাসের সাধুত্বের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, হরিদাস একজন প্রকৃত ভক্ত সাধু ছিলেন। হরিদাসের জীবন-কথা অমৃত সমান।

৫১। সরল-গৃহ-চিকিৎসা।—ডাঃ জে, সি, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।০। যত সংক্ষেপে সম্ভব, এলোপ্যাথিমতে, সচরাচর গৃহে যে সকল রোগ জন্মে, তাহার

চিকিৎসার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অনেকের উপাকারে আসিবে।

৫২। ওঁ সার নিত্যক্রিয়া।—পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী কৃত, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ।০। স্বামী মহোদয় একজন প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি। এই পুস্তক সেই জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

৫৩। দয়ানন্দচরিত।—প্রথম খণ্ড ৫০, শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এই পুস্তকখানি উপহার পাইয়া আমরা গ্রন্থকারের নিকট বড়ই বাধিত হইয়াছি। পুস্তক সমাপ্ত হইলে বিস্তৃত সমালোচনা করার ইচ্ছা আছে।

৫৪। দুলালী।—দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত মূল্য ৫০; প্রথম সংস্করণের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছি। এ পুস্তকে গ্রন্থকারের বিশেষ লিপি-চাতুর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে।

৫৫। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ।—শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নগেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দের আদর করে না, এদেশে এমন লোক বিরল। আমরা গীতগোবিন্দের এই বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ পড়িয়া যারপর নাই সুখী হইয়াছি। উপযুক্ত হস্তে এই সর্ব্বাদৃত গ্রন্থের সম্মান বাড়িয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করি।

৫৬। সেক্সপিয়র।—দ্বিতীয় ভাগ, শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত সঙ্কলিত, মূল্য ১।০। প্রথম ভাগের যে প্রশংসা করিয়াছি, দ্বিতীয় ভাগও তাহার যোগ্য। প্রাঞ্জল বাঙ্গালায় হারাণ বাবু সেক্সপিয়রের গল্প বিবৃত করিয়া সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। হারাণ বাবুর লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক।

৫৭। শোকোচ্ছ্বাস।—শ্রীমহীন্দ্র মোহন চন্দ প্রণীত। লেখক কাব্য-কাননে ভ্রমণ করিলে কালে সিদ্ধ-মনোরথ হইবেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তক তাহার কিছু পরিচয় পাইলাম।

৫৮। শুশ্রুষা-প্রণালী।—ডাক্তার ভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৲। এ পুস্তকের নামকরণ সার্থক হইয়াছে; কেননা, এই একখানি পুস্তক পড়িলে অচিকিৎসকও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রোগীর শুশ্রূষা ও সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারিবে। গ্রন্থকারের বহুদর্শনের ফল ইহাতে সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৫৯। মানস-প্রসূন।—শ্রীমহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তি-কৃত, মূল্য ৵০। সরল কথায় কেমন সুন্দর কবিতা হয়, এ পুস্তক তাহার দৃষ্টান্ত। কবির ভাষাজ্ঞান আছে, কবিত্ব আছে এবং তদুপরি বালক ভুলাইবার শক্তি আছে।

৬০। প্রেমাঞ্জলি।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বি-এ, এল এম-এস প্রণীত, মূল্য ।৵০। এপুস্তকে অনেক ভাল কথা আছে। প্রকৃত বৈষ্ণবত্ব প্রতিপন্ন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকারের লেখা সরল এবং ভাবময়। স্থানে স্থানে পড়িতে পড়িতে সন্দেহ হয়, গদ্য না পদ্য পড়িতেছি। সকল বিষয়ে আমাদের মতের মিল না থাকিলেও পড়িয়া সুখী হইলাম।

৬১। আয়ুর্ব্বেদ-সোপান।—কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ কবিভূষণ পরিকল্পিত ও প্রকাশিত, মূল্য ১৲। সহজে ডাক্তারী শিক্ষা যেমন সরল-গৃহ-চিকিৎসায়, সহজ কবিরাজি শিক্ষা, তদ্রূপ, এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উভয় পুস্তকেই রোগের বিবরণ অনুসারে ঔষধের ব্যবস্থা আছে। ডাক্তারী ঔষধ অপেক্ষা, গ্রামে, বণিকের দোকানে দেশের ঔষধ অল্প আয়াসে, অল্প ব্যয়ে পাওয়া যায়। উপকারও তাহাতে যথেষ্ট হয়। যে দেশের পীড়া, সেই দেশেই তাহার চিকিৎসার ঔষধ আছে। আয়ুর্ব্বেদ-সোপান প্রতি গৃহস্থের পড়া উচিত।

৬২। গীতি পুষ্পাঞ্জলি।—শ্রী ললিতমোহন মণ্ডল প্রণীত। মূল্য ✓০। কয়েকটী ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীতে এই পুস্তকপূর্ণ। পড়িয়া সুখী হইলাম।

৬৩। বিশ্বজীবন।—মাসিক আকারে জীবন-চরিত বাহির হইতেছে। ১৩নং

মৃজাপুর ষ্ট্রীট হইতে শ্রীমহেন্দ্রনাথ হালদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। আমরা দুই সংখ্যা পাইয়াছি। উদ্দেশ্য মহৎ, লেখা ভাল। চেষ্টা সফল হইলে অনেকের উপকার হইবে। সম্পাদক আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র।

৬৪। নববিধান কি ?—শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন প্রণীত, মূল্য ।৷৹। গভীর গবেষণা, ধর্ম্মজ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও চরিত্র একাধারে মহাত্মা কৃষ্ণবিহারীতে পরিশোভিত হইত। জ্ঞানে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বিনয়ে তিনি সকলের পায়ের নীচে, পণ্ডিত্যে যিনি প্রবীন, ধর্ম্মবিশ্বাসে তিনি শিশুর ন্যায়—আমরা কৃষ্ণবিহারীর জীবনে এই কথার জীবন্ত পরিচয় পাইতাম। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ বর্ষের অধিক কাল এই চরিত্রসংস্পর্শে বসবাস করিয়াছি। সময়ে সময় তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়াছি, কিন্তু এক দিনও তাঁহার সহিত কথা বলি নাই—নিত্য চিন্তায় সহবাস করিয়াছি। এই মহাত্মা আজ দেবধামে, অমর-কুলে পরিবেষ্টিত। এই জীবনে কি দেখিলাম? সে কি স্বর্গের স্বপ্ন ?

দেবতা চলিয়া গিয়াছেন, পড়িয়া রহিয়াছে কি ? তাঁহার অমর-চরিত্রের কায়া লইয়া যে অশোকচরিত এবং "নববিধান কি" রচিত, তাহা পড়িয়া রহিয়াছে। গ্রন্থযুগলকে প্রণাম করি। কৃষ্ণবিহারী এই দুই গ্রন্থ তাঁহার চরিত্রের ছায়ায় এবং জ্ঞানের জ্যোতিতে রচনা করিয়া গিয়াছেন।

নববিধান কি করিয়াছে, অধিক কথায় তাহা বুঝাইতে হয় না। যে ধর্ম্মবিধান কৃষ্ণবিহারীর ন্যায় মহাত্মার সৃষ্টি করিয়াছে, সে ধর্ম্মবিধান পৃথিবীকে একদিন জয় করিবেই করিবে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের ন্যায় অসংযত, দুর্ব্বিনীত, চরিত্রহীন, আড়ম্বর-সর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণের দ্বারায় পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা পরিম্লান হইতেছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু জীবন্ত যাহা, অসার লোকের অসারতায় কদাচ চিরদিন তাহা ঢাকা থাকিবে না। একদিন না একদিন তাহা জয়-মুকুট মস্তকে ধারণ করিবেই করিবে। তুমি কে যে, লোকের নিন্দা করিবার সময় ধর্ম্মের নিন্দা করিতেছ ? ধর্ম্ম চিরোজ্জ্বল, চিরমধুর, চির-স্নিগ্ধ, চির-তৃপ্তিকর। এক জন লোক ও যে ধর্ম্মের দ্বারা জীবন ও চরিত্র পাইয়াছ, তাহাকে তুচ্ছ করিও না। রসনা এবং জীবন কলুষিত হইবে। নববিধান কি ?—সম্বন্ধীয় পুস্তকের কথা বলিবার সময় এ সব কথা লিখি কেন ? এ পুস্তকখানি আর কিছুই নয়—ইহা যেন এক মহাপুরুষের জীবনের সঞ্চিত এবং উপার্জ্জিত সত্যরাশিতে পূর্ণ। এ পুস্তক পড়িতে গেলেই একটা জীবন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। এ পুস্তক অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় নহে, এ যেন একটী প্রদীপ্ত জীবন কাহিনী। মহা জীবনের মহা কাহিনী কেহ পাঠ করিতে চাও, এই পুস্তক পাঠ কর। মহাজ্ঞানীর মহাজ্ঞানের কেহ পরিচয় পাইতে চাও, এই পুস্তকের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন কর। নিন্দা, নিন্দা—কেবল নিন্দা লইয়া, ব্রাহ্ম, তুমিও মজিও না, এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া দেখ, বুঝিবে, তুমি আমি কোথায় ? এ পুস্তক পাঠ করিয়া যদি আমরা মানুষ হইতে পারি, তবে ধন্য হইবে, অমর আত্মার অমর কীর্ত্তি থাকিবে।

৬৫। শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক কেন ?—শ্রীনবকুমার দেবশর্ম্মা নিয়োগী কর্ত্তৃক প্রণীত। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা শ্রীকৃষ্ণকে শঠ, লম্পট প্রভৃতি কতই অপবাদ দেন। শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুর আরাধ্য ধন। তাঁহার নিন্দায় গ্রন্থকারের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবৎ, এই অপবাদের মূল। মহাভারত ও হরিবংশের শ্রীকৃষ্ণ সাধু, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক—শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। মহাভারত, হরিবংশ ও শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা হইতে শ্রীকৃষ্ণের এই চরিত্র-বৈপরীত্য গ্রন্থকার প্রমাণ করিয়াছেন। এবং এই বিপরীত বর্ণনা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে যে, এক

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই প্রতিবাদী গ্রন্থ সকলের রচয়িতা? মত ও ঘটনার বিসম্বাদিতা প্রমাণ করিতে মহাভারত, হরিবংশ ও শ্রীমদ্ভাগবৎ বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, গ্রন্থকার আপন লেখনীকে সংযত করিতে পারেন নাই।

ইহাও বোধ হয় গ্রন্থকার ভাবিয়া দেখেন নাই যে, গ্রন্থগুলির রচয়িতা এক ব্যক্তি নহে। ইহা প্রমাণ করিতে পারিলে শ্রীমদ্ভাগবতের পৌরাণিকতার অপ্রমাণ হয় না। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবত কি গুণে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সহস্র সহস্র বৈষ্ণবের জীবন-সর্ব্বস্ব হইয়াছে, লম্পট, শঠ, চোরচূড়ামণির চরণে কেন লক্ষ লক্ষ লোক মস্তক পাতিয়া দিয়াছে, এ সকলের মীমাংসা করিতে তিনি কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই।

৬৬। রাজমালা।—শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত। মূল্য ৩্। বাঙ্গালার বর্ত্তমান লেফটেনেণ্ট গবর্ণর এক দিন বলিয়াছিলেন যে "গাইকোবাড় বা সিন্ধিয়া কোন অপরাধ করিলে তাহার দণ্ড বা তিরস্কার হয়, কিন্তু ত্রিপুরার রাজাকে শাসন করিবার কোন বন্দোবস্ত নাই। অথচ পাহাড়ের বাহিরে ইংরাজ রাজ্যে তিনি একজন সামান্য জমিদার মাত্র।" * পার্ব্বতীয় ত্রিপুরা এক প্রকার স্বাধীন রাজ্য। হিন্দুরাজত্বের দোষগুণ পূর্ণ পরিমাণে এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও ত্রিপুরায় অসামান্য, এখনও প্রাচীন জঙ্গলে ব্যাঘ্র হস্তী অকুতোভয়ে বিচরণ করিতেছে। হিন্দুদিগের অনুকরণে রাজবংশ হিন্দু আচার ব্যবহার প্রচলিত করিতেছেন সত্য, তথাপি বর্ব্বর জাতির প্রাচীন আহারের চিহ্ন এখনও লোপ হয় নাই। সুতরাং স্বদেশানুরাগী প্রত্নতত্ত্ববিৎ, মানব প্রকৃতির অনুসন্ধিৎসু বা মৃগয়াপ্রিয় বীরপুরুষ, ত্রিপুরা সকলেরই নিকট অসামান্য আদরের বস্তু। হ্যাইন সাহেব প্রণীত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনচরিতে ত্রিপুরার সম্বাদ যাহা পাওয়া যায়, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। বাবু নীলমণি দাসের জীবনচরিত অদ্যাপি লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রত্নতত্ত্বে বহুদিন যাপন করিয়াছেন, ত্রিপুরার রাজসংসারে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা বহুদিন চাকরি করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও ত্রিপুরায় কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন, রাজমালা, কৃষ্ণমালা প্রভৃতি ত্রিপুরবংশের ইতিহাস, সনন্দ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কাগজ পত্র তিনি সংগ্রহ করিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে ত্রিপুরার এই বৃহৎ ইতিহাসখানি লিখিয়াছেন। পাঠ করিয়া আমরা যারপর নাই সুখী হইলাম।

দুঃখের বিষয়, ত্রিপুরার অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যথেষ্ট সংবাদ এস্থলে পাওয়া যায় না। কোন কোন বিষয়ে হণ্টার সাহেবের ত্রিপুরা-বিবরণে যাহা লেখা আছে, কৈলাস বাবুর রাজমালায় তাহার অন্যরূপ দেখা যায়। সম্ভবতঃ কৈলাস বাবুর সংবাদই প্রামাণ্য। তথাপি গ্রন্থ মধ্যে হণ্টার সাহেবের মত খণ্ডন দেখিলে আমরা সুখী হইতাম।

৬৭। ত্রিদব-বিজয়।—কাব্য। শ্রীশশধর রায় প্রণীত। এ একখানি মহাকাব্য। বৃত্রসংহারের পরে এমন কাব্য বাঙ্গালা ভাষায় আর লিখিত হয় নাই। কোথায় কোথাও গ্রন্থকার মাইকেল মধুসূদন ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অতিক্রম করিয়াছেন।

মহেশ্বরের অনুগ্রহে তারকাসুর স্বর্গের সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। দেবগণ পলায়ন করিয়া হিমালয়ের গুহায় আশ্রয় লইয়াছেন। সেই নীরব নির্জ্জন প্রদেশে অনুতাপে দেবরাজের প্রায়শ্চিত্তের আরম্ভ।

ছিনু দেবরাজ আমি স্বর্গ অধিপতি।
দশদিকপালে দিয়া রাজকার্য্যভার,

*A gross outrage committed in the dominions of Holkar or Sindia would be reported to Government by the Resident, and the grave remonstrance or effectual intervention of the Paramount power would probably follow. But no control is exercised over the Tipperah Chief although on the plains he is a British subject and a Zamindar.

সপ্ত-সপ্ত বায়ু কুলে জীবের রক্ষণ,
পালন সে মেঘরাজে, নিশ্চিন্তে কাটাতু
কাল বৈজয়ন্ত ধামে। আনন্দে সতত
নন্দন কাননে সুখে করিতাম কেলি।
পারিজাত পরিমল, বিহগ কুজন,
নির্জ্জন ঝঙ্কার মৃদুবাসন্ত সমীর,
মোহিত ইন্দ্রিয় সদা—

* * * *

কভু নাহি প্রজাবৃন্দে হেরিনু নয়নে!
দিকপাল-বায়ুপতি কিম্বা মেঘরাজে
কভু না সুধা'নু রাজ্য কিভাবে চলিছে।
পরিণামে অত্যাচার জীবের পীড়ন,
অনিবার্য্য ফল তার ফলিতে লাগিল।

* * * *

হাহাকারে জীবকুল পূরিল চৌদিকে।
কিন্তু দিকপালগণে কুচক্র প্রকাশি,
আশুগতি মতি লয়ে উড়াইলা
শূন্যপথে, না শুনিনু কিছু। কভু যদি
সুদূর হইতে বাণী লয়ে প্রতিধ্বনি
আসিতেন শুনাইতে, অবিশ্বাসি তাহে
রোধিতাম কর্ণপথ।

আর একদিন বিজয়ী বলদর্পিত তারকাসুরকে এইরূপে অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। বিশ্বাস-রাজ্যের সম্রাটদিগের প্রতি ইহা মহোপদেশ।

"—রাজ দোষে মজে রাজ্য। কিন্তু
পুরবাসী, রাজ, রাজগণে, কি সহিবে,
করিবে কি ভেদজ্ঞান? হয়ত করেনা।
শুনেছি বিষম দম্ভে অসুর স্বগণ
মথিছে নাগরী মন; তাই বুঝি মন্ত্রী
বুধ সম কহিলেন সার ভাষা আজি,—
দাম্ভিকতা, দম্ভোলি হইতে পীড়ে গুরু-
তর।" অসুরের দল তৃণ সম জ্ঞান
করে বিস্তীর্ণ নগরে, নাগরিকে। কভু
শুনি, দিগন্তের কোণে, স্বর্গনিবাসিনী
বধূ লয়ে, অত্যাচারে। কভু বা কলহে
মত্ত, কভু বা আঘাতে পুরজনে: অর্থি-
কুল নিরর্থ বিলাপে, ধর্ম্মাধিকরণ-
দ্বারে বৃথা আর্ত্তনাদে। শুনিয়াছি এই
কথা, এ বারতা আমি বারম্বার।"

দেব বা দৈত্য, স্বর্গের সিংহাসনে যাহারই অধিষ্ঠান হউক, প্রজার ভাগ্যে অত্যাচার চিরদিনই সমান। বস্তুতঃ এই মহাকাব্যের নায়ক ইন্দ্র বা তারকাসুর এবং উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে,আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তেজে, ভক্তিতে ও সাধনায় তারকাসুর ইন্দ্রের সিংহাসন অধিকার করিবার উপযুক্ত পাত্র। দুর্ব্বল ভিখারী পরমুখাপেক্ষী, পর প্রসাদে জীবিত সর্ব্বস্ব দেবরাজ কৃপার পাত্র। এ কাব্যে দেবতার অসুরত্ব ও অসুরের দেবত্ব দেখিয়া কবির ভূয়সী প্রশংসা করিতে বাসনা হয়।

বস্তুতঃ ত্রিদিব-বিজয়ের নায়ক কার্ত্তিকেয়। প্রদীপ-দীপ্তি যেমন মাঝে মাঝে বর্ত্তিতাকে পরিত্যাগ করিয়া শূন্য মার্গে এক একটা লাফ দিয়া আপন বল বুঝিয়া লয়, শশধর বাবু, কালিদাস মিণ্টন প্রভৃতি মহাকবিগণের অঞ্চল ধরিয়া চলিতে চলিতে এক একবার অঞ্চল ছাড়িয়া দৌড়িয়া যাইয়াছেন এবং সেখানেই তাঁহার বল ও কৃতিত্ব দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ত্রিদিব-বিজয় বাঙ্গালীর গৌরবের সামগ্রী।

এমন সুন্দর কাব্যে দুএকটী কলঙ্ক রহিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণের সময় গ্রন্থকার সেগুলি সংশোধন করা আবশ্যক কিনা,বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম। দু এক স্থানে গ্রাম্যতা দোষ জন্মিয়াছে। এ অতি সামান্য দোষ। তথাপি এগুলি পরিহার করা কর্ত্তব্য। ইহা অপেক্ষা গুরুতর দোষ নারদের চরিত্রাঙ্কনে ঘটিয়াছে। মহর্ষি নারদের মহত্ত্ব মহাকাব্যে অপলাপিত হয়, ইহা প্রার্থনীয় নহে। অশিক্ষিতা রমণীর কল্পিত কন্দলপ্রিয় নারদ মহর্ষির কলুষিত কল্পনা।

"দূরহ এপুরী হ'তে জনমের মত
শান্তি; তোরে কভু আমি না পারি সহিতে।
আলস্য, ভীরুতা, শাঠ্য, অনুচর যত,
তা সহ যা চলি ত্যজি এ পুণ্যমরতে।
আইস, আইস, দেবি, তুমি তেজোময়ী
মত্ততা, হৃদয়-পদ্মে রচ পদ্মাসন;
আন সঙ্গে ঘোর রঙ্গে সঙ্গী মধুময়ী
একাগ্রতা; মহামন্ত্রে মাতাও ভুবন।"

এ শান্তি কোন্ দেশীয় শান্তি,যাহা শাঠ্যের অনুচরী এবং এ মত্ততা কোন্ দেশীয় মত্ততা, মধুময়ী একাগ্রতা যাহার সঙ্গিনী? গ্রন্থের আরম্ভে কবি হিমালয়কে নগরাজরূপে সুন্দর সাজাইয়াছেন, কিন্তু এক পৃষ্ঠা অতিক্রম না করিতেই তাহাকে অচেতন পর্ব্বত মালায় পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। চরিত্র-চিত্রে কবি তাদৃশ সফলতা লাভ করেন নাই। কার্ত্তিকেয় বা পুরন্দরের চিত্র আদৌ হৃদয়পটে প্রতিফলিত হয় না।

এই সকল দোষ সত্ত্বেও আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, মেঘনাদবধ ও বৃত্র-সংহারের পরে এরূপ মহাকাব্য বাঙ্গালা ভাষায় আর রচিত হয় নাই।

৬৮। নিশীথচিন্তা।—শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। গ্রন্থকার বঙ্গীয় সাহিত্যে কৃতিমান পুরুষ। তাঁহার চিন্তাগুলি অসামান্য ও মূল্যবান। চিত্রকরের চিত্রশালিকায় নানা অবস্থার আলেখ্য মালা দেখা যায়, কোন খানি পূর্ণ, অধিকাংশই অল্পাধিক অসম্পূর্ণ। প্রদর্শনীতে অসম্পূর্ণ আলেখ্য চিত্রকর আলম্বিত করেন না। নিশীথ-চিন্তার "নদীর জল ও "দুঃখে সুখ" পূর্ণচিত্র, মহামূল্য। অপরগুলি অল্পাধিক অসম্পূর্ণ।

কবি প্রেম-বীক্ষণে এক একটী পদার্থের অংশ বিশেষ পর্য্যালোচনা করেন,—প্রচ্ছন্ন রহস্য আবিষ্কার করিয়া ভীত, বিস্মিত বা স্তম্ভিত করিয়া থাকেন। কিন্তু অন্য অংশ লক্ষ্য মধ্যে পতিত না হওয়ায় অন্ধকার সাগরে ডুবিয়া যায়। নিশীথ চিন্তা গদ্যকাব্য, কালীপ্রসন্ন বাবু কবি, তাঁহার চিন্তার গম্ভীরতায়, বুদ্ধির প্রখরতায় আমরা তৃপ্ত হইয়াছি, কিন্তু কবি-সুলভ অসর্ব্বাঙ্গীনতা তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এজন্য, কবির তুলিকায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ের চিত্রাঙ্কণ আমরা কোন দিন অনুমোদন করিতে পারি নাই। বিজ্ঞানের আরম্ভ কবিতায় ও অন্ত কবিতায়, তথাপি সম্যক আলোচনা-সিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সম্বন্ধে কল্পনা-প্রিয় চিত্রকরকে বিশ্বাস করিতে আমাদের সাহস হয় না।

বিরহ প্রবন্ধে চিত্রকরের প্রয়াস যথেষ্ট আছে, কিন্তু সহানুভূতি নাই। যাঁহার "প্রেম জ্বালাময়," তাঁহার বিরহ কল্পনা মাত্র, এভুক্তভোগীর পরিদর্শন নহে। বস্তুতঃ যে সকল পদার্থ গবেষণা ও পর্য্যালোচনার কঠোরতা বহন করিতে পারে, সেখানে কালী প্রসন্ন বাবু সিদ্ধহস্ত। যেখানে পেলব শিরিষ কুসুমে সুকুমার স্পর্শের আবশ্যক, কালী বাবু সেখানেই ত্রস্ত ও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন, ভাষাও সেখানে "থতমত' খাইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাঁহার বিরহের ভাষা এইরূপ :—

'প্রেমের প্রকৃত বিকাশ অর্থাৎ উহার শক্তির পুষ্টি ও সৌন্দর্য্যের প্রকর্ষ বৃদ্ধি মিলনে না বিরহে? যাহাদিগের হৃদয় আছে এবং হৃদয়ে প্রীতির প্রতিমা অঙ্কিত আছে যাঁহারা প্রেমসন্মিলন আর বিরহ যন্ত্রণাকে বিলাস-তরঙ্গ-নটলীলা মাত্র মনে না করিয়া হৃদয়-রহস্য ও অধ্যাত্ম তত্ত্বের নিগূঢ় কথা জ্ঞান করেন, সেই সাধু-হৃদয় প্রেমিকেরা এইরূপ চন্দ্র তারাময়ী চারুযামিনীর অপরূপ গাম্ভীর্য্যে অনুপ্রাণিত হইয়া এই প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করুন।"

পাঠান্তরে দৃষ্টিক্ষেপ করুন;—

"শকুন্তলা কখন সুখে ছিলেন? কণ্বের কুসুমাস্তীর্ণ তপোবনে না কশ্যপের আশ্রমে? আমার হৃদয় সখি-সমাবৃতা প্রিয়-সম্ভাষণ-পুলকিতা আনন্দ দুলিতা শকুন্তলা অপেক্ষা অবহেলিতা, প্রবঞ্চিতা, অশ্রুরত-প্রত্যাখ্যাতা তপস্বিনী শকুন্তলাকেই অধিকতর সুখী বলিয়া হিংসা করে। মৃদুনাদিনী মালিনী ধীরে বহিয়া যাইতেছে, বসন্তের মৃদু মধুর ও সুশীতল সমীর সে মালিনীর জলে স্নাত হইয়া মল্লিকা ও মালতীর সৌরভের সহিত ধীরে ধীরে খেলা করিতেছে, মধুলুব্ধ ভ্রমর সে বসন্ত সমীরে তাড়িত হইয়া সুন্দরীর সুকুমার মুখারবিন্দে উড়িয়া পড়িতেছে, সমানবয়স্ক সখিরা ভ্রমরের সে ভ্রমান্ধতা এবং ভ্রমর-ভয়-বিহ্বলা সুন্দরীর সে বিনোদ বিভ্রম দর্শনে প্রণয়ে গলিয়া প্রণয়ে ঢলিয়া পরিহাস করিতেছে।"

"যে প্রেম অপমানের অনন্ত বৃশ্চিক দংশনে টলে না, প্রিয়তমের অভাবনীয় দুর্ণীত ব্যবহারে এবং সঙ্গে সঙ্গে সংসারের অশেষবিধ দুরুচ্চার নিগ্রহেও আপনার মহামন্ত্র ভোলে না, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়াবহ ও সমস্ত জগতের পূজা-যোগ্য। যে শকুন্তলা কক্ষে জলপূর্ণ কলসী লইয়া আলবালে জলসিঞ্চন করিয়াছিলেন এবং আপনার কটিপিনদ্ধ বল্কল বন্ধনের সুখদ ক্লেশে সখিমুখে যৌবন সমাগমের সুখের কথা শুনিয়া সলজ্জ প্রণয়-কোপে ঝঙ্কার দিয়াছিলেন, তাদৃশ শকুন্তলা জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর ন্যায় যারপর নাই মধুময়ী হইলেও জগতে দুর্লভ নহে। কিন্তু যে শকুন্তলা অঙ্গে পূর্ণায়ত যৌবন ও পূর্ণ বিকসিত রূপের বোঝা এবং অন্তরে দুঃখের অপার ও অতল সমুদ্র বহন করিয়াও কুলপতি কশ্যপের আশ্রমে পবিত্র প্রেমের জ্বলন্ত শিখার ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন, মনুষ্য